ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একচত্বারিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৬০—

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অঞ্চল (কবিতা)—শিশিরকুমার দাশ ২৮২
অন্নপূর্ণা (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৫৭
অপরাহ্নে (কবিতা)—কল্পনা দেবী ১১০
অভাবনীয় (গল্প)—শ্রীনির্মলকান্তি বসুমজুমদার ২৩
অভিসার (কবিতা)—শ্রীকৃষ্ণধন দে ৪১৪
অরণ্য-স্মৃতি (শিকার কাহিনী)—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২২০, ৪১২
অলঙ্কার (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী ৪০৯
আত্মহত্যা (অনুবাদ গল্প)—শ্রীঅরুণকুমার বসু ৭২
আনন্দমঙ্গল (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৫৩১
আমার কবিতা (কবিতা)—প্রভাকর মাঝি ৩৪৪
আমার পৌর প্রতিবেশীর জীবনযাত্রা (প্রবন্ধ)—
শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৪৭১
আফ্রিকার বিদ্যাসাগর কোয়েমীর আগ্রে (প্রবন্ধ)
—শ্রীসুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৪
আশাবরী (গল্প)—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১৪
উচ্চ প্রাঙ্গণের পাখী (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ৩২২
একটি প্রেমের কাহিনী (অনুবাদ গল্প)—শ্রীউমা বাগচী ... ২৮৩
একটি প্রাচীন তামিল কাব্য (প্রবন্ধ)
—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৯
একটু সিঁদুর (গল্প)—শ্রীসন্তোষ সিংহ ২২৪
এম্বারেন্ড বুদ্ধের বেশ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ২০৪
কবি আমির খুসরোর প্রেমকাব্য (প্রবন্ধ)—শ্রীকেদারচন্দ্র দাস ১
কথকথার কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী ... ৭৮
কাশ্মীর-বধূ (কবিতা)—নবনীতা দেব ৪৪৭
কুড়ানো ঘড়ি (অনুবাদ গল্প)—শ্রীঅরুণকুমার বসু ৪৭৭
কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজের ধর্মগুপ্ত (প্রবন্ধ)—শ্রীকালিদাস রায় ২০
ক্যানভাসার (গল্প)—শ্রীবিশ্বেশ্বরনারায়ণ রায় ৫৭৬
কোনো সাধনা অতিক্রম দিয়ে ফুলিয়ার মতো নয় (কবিতা)
—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ১০০
খ্যাতি আন্দোলন (প্রবন্ধ)—আবা সাহেব সহস্র বুদ্ধে ৯৭
খেলাধূলা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৮৩, ১৯৯, ২৮৯, ৩৮১, ৪৯১, ৫৮৫
গতি ও গন্তব্য (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনঘ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
গান (কবিতা)—শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ৪৮৬
গান (কবিতা)—শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ২২
গান (কবিতা)—শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য ৫৯৪
গান ও স্বরলিপি—গোপাল ভৌমিক ও বুদ্ধদেব রায় ৪২৭
গানে রামপ্রসাদ (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ১১১
গানের স্বরূপ (কবিতা)—শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্মকার ২৭৭
গান্ধীবাদ ও প্রমনীতি (প্রবন্ধ)—শ্রীনিমলচন্দ্র কুণ্ডু ২০৪
গীতা কি প্রক্ষিপ্ত ? (প্রবন্ধ)—ডক্টর শ্রীবতিলাল দাশ ৪২১
গৌড়মল্লার (উপন্যাস)—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
৭, ১১৪, ১৯৯, ২৯৬, ৩৯৮, ৪৯৭
চলার পথে (কবিতা)—শ্রীমতী বীণা দে ... ৪৬৮
চেতনার অভিনন্দন (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ৪৯৪
চিরন্তনী (কবিতা)—শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ ১৭৩
ছেঁদী (গল্প)—শ্রীমতী বীণা দে ৩১১
জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন (প্রবন্ধ)—
শ্রীরুদ্রকুমার পাল
জাপানে (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীদিলীপকুমার রায়
জ্ঞানী (প্রবন্ধ)—শ্রীকেদারচন্দ্র গুপ্ত
জ্ঞানের অনুশীলন (প্রবন্ধ)—শ্রীকেদারচন্দ্র গুপ্ত
টানা (গল্প)—শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ
ডক্টর শরৎচন্দ্রের বহু (জীবনী আলোচনা)—
শ্রীঅতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আন্তর্জাতিক যুবকদের মিলন (প্রবন্ধ)—নির্মল বসু ৩১৫
ইর্ষা-পাখি (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব ... ৩৮৮
কেরোসীনের পুতুল (গল্প)—শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় ... ৪১১
খেলা-বিরোধ—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৩২৭, ৪৪৯, ৪৯২
গৈরিক (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য ... ৩১৮
গ্রন্থপঞ্জি (গান ও স্বরলিপি)—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২২৯
গ্রন্থবাস (কবিতা)—শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ ... ২৫২
চন্দ্রিকেতা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন গুপ্ত ১৪২
চরকীয় ব্যাধি লাঘব (প্রবন্ধ)—শ্রীসরীন্দ্রনাথ সিংহরায় ... ৩৮৮
জনসমাটে পল্লী-সম্মেলন (আলোচনা)—শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ ১২২
জীবের ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)—শ্রীসতীন্দ্রনাথ ধাবগুপ্ত ... ১২৪
ঝিলন্ধপ (উপন্যাস)—শ্রীপুলিনচন্দ্র ভট্টাচার্য ৫২, ১৩১, ২০৯, ৩৩৩, ৫৪২, ৪৪৩, ৪৯৩
পড়িয়ে ফাগুন প্রাতে (কবিতা)—শ্রীহেমমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৯
পরমকাম (উপন্যাস)—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৯১, ১৭৮, ২৭৯, ৩৫২, ৪২১, ৪৮৩
পরিবর্তন (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত ... ১২৯
পাশ্চাত্য দর্শন (সমালোচনা)—অধ্যাপক শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মিত্র ৫২২
পিতামহ (উপন্যাস)—বনফুল ৩২, ১৪৯, ২৭৯, ৩৪২, ৪৩৩, ৪৮৯
পুনর্ঘটিকার (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ২১০, ৩৩৮, ৪৩১, ৪৮৪
পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষ (প্রবন্ধ)—শ্রীবিমলরঞ্জন রায় ... ৩২৮
প্রতীক্ষা (কবিতা)—বীণা সাহানা ... ৪১৮
প্রাচীন মিশরে শিল্প-সৃষ্টি (প্রবন্ধ)—শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৩
প্রাচীন ভারতের খনিজ-সাধনা (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন ৫৪৮
প্রার্থনা (কবিতা)—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ... ৪৯৯
প্রেতলোক ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রতিমা ঘোষ ... ২০৪
বন্দী (কবিতা)—আলা দেবী ... ২৪৪
বাংলার ইতিহাসে শিশুশিক্ষা (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ২৭২
বঙ্গসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের স্থান (আলোচনা)—শ্রীতারকচন্দ্র রায় ৩৩৬
বাক্-বিভূতি (প্রবন্ধ)—ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস ... ১১৩
বাংলা ও বাঙ্গালী সমাজ (প্রবন্ধ)—বিমলনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭
বাংলার নাটক ( )—শ্রীসমরেশচন্দ্র কর ... ১২০
বাংলার শিল্প আন্দোলনের ধারা (প্রবন্ধ)—নরেন্দ্র দেব ... ২৪৩
বাড়ির বদল (অনুবাদ গল্প)—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৫১
বাংলা সাহিত্যে পাদরি ও সতীশচন্দ্র ঘটক (আলোচনা)—শ্রীহরদেব রায় ... ৪৪৪
বাহির-বিশ্ব (আন্তর্জাতিক রাজনীতি আলোচনা)—শ্রীঅতুল গুপ্ত ৪১৮
বিচ্ছুপ্রিয়া (কবিতা)—শ্রীবিভূ দত্তবটী ... ২১৯
ভাদ্রপদ-ধর্ম (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন ... ৩৮৫
ভাষার বিবর্তন (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীবীরবল ঠাকুর ... ৩০২
ভুলি নাই (কবিতা)—নবনীতা দেব ... ৭৪
ভূধান-যজ্ঞ (প্রবন্ধ)—শ্রীঠাকুরদাস ভাণ্ডারী ... ২৬
মনহামী চাষপাহাড় (নাটক)—মন্মথ রায় ৩৯, ১৮৭, ...
মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক বিমলরঞ্জন গুহ ৪১৪
মহুয়াকবীর শুধুল বন্ধন (কবিতা)—শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় ... ৫১
মহালয়া (কবিতা)—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ... ৪৪১
যুদ্ধের কাটা ঘায় (অনুবাদ গল্প)—লেখক : সবার সেট মাম অনুবাদক : শ্রীহেমন্ত মাহাতী ... ৪৪৪
যান্ত্রিক শক্তির ব্যবহার (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রমোদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭
যোগ যাযাবর (যাযাবর) - শ্রীলাবণ্য পালিত ... ৪৭৫
যৌতুক (অনুবাদ গল্প)—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ... ১৪৮
রামায়ণী (প্রবন্ধ)—শ্রীঅনিলকুমার হালদার ১৯৩, ৩৪৯, ৪৫৯, ৪৮৬
রাধারমণের গল্প (প্রবন্ধ)—অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত ১৭৬
রাত্রির ব্যথা (কবিতা)—নবিতা চট্টোপাধ্যায় ... ৪৮৫
শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র (সংগ্রহ)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায় ২৮, ১৫৩, ২৪৫, ৩৫৩, ৪৭৮
শরৎচন্দ্রের পত্রের ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)—শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ... ৪৭৮
শরৎ-সাহিত্যে বাংলার সমাজ চিত্র (প্রবন্ধ)—শ্রীউষা বিশ্বাস ২২৯
শারদ প্রতিমা (কবিতা)—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ... ৪৪১
শারদীয় দেহি (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৪৪৩
শিল্পাচার্য বামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (প্রবন্ধ)—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৩
শিশুমনোবিজ্ঞা (প্রবন্ধ)—শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু — ৩৯৬
শিশু ও পিতামাতা (প্রবন্ধ)—শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু ... ৪৭১
শ্যামাপ্রসাদ (কবিতা)—নরেন্দ্র দেব ... ১৪৩
শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণ (প্রবন্ধ)—শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য ১৬১
শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)—বিমলনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ২৪৮
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে তন্ত্রের প্রভাব ও মূর্তিরহস্য (প্রবন্ধ)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ... ১৩৯
শ্রীহট্টী (কবিতা)—প্রভাময়ী মিত্র ... ১৯
শ্রীরামকৃষ্ণ (কবিতা)—সত্যবান ... ২৬৭
সংকেত (কবিতা)—শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত ... ৩৫৩
সনেট (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৩২৭
সমাচার (প্রবন্ধ)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৬৯
সাময়িকী ৮২, ১৮৩, ২৭৮, ৩৫৪, ৪৮৭, ৫৪৪
সমুদ্র-পথ (ভ্রমণ বৃত্তান্ত)—শ্রীবিমলরঞ্জন রায় ... ৪৫৮
সাহিত্য-সংবাদ ২৬, ১২২, ২৮৮, ৩৮৪, ৪৯২, ৫৪৮
সোভিয়েট দেশে (ভ্রমণ কাহিনী)—শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ৩৬, ১৭১, ২৮৯, ৩১৮, ৪০৪, ৪২৪
স্মৃতিরেখা—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ধাবগুপ্ত (আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীগোপেন্দ্রনাথ মিত্র ২০৬
গান ও স্বরলিপি (কথা : শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় সুর ও তালাপ চক্রবর্তী ... ১৩৬
স্বয়ম্ভূরী সিঁড়ি (ভ্রমণবৃত্তান্ত)—শ্রীবিমলরঞ্জন রায় — ৪১৬
স্বাস্থ্য ও জীবন (ব্যায়াম)—শ্রীবীরেনচন্দ্র ঘটক সিটলম্যান্ ... ৪৮৩
হিংলাজ পথে (ভ্রমণবৃত্তান্ত)—শ্রীচারুমোহন চক্রবর্তী ... ৪৮৭
হৈমন্তী (কবিতা)—বিনাকর সেনরায় ... ৮১

চিত্র-সূচী—বাসানুক্রমিক

আষাঢ় ১৩৯০—বহুবর্ণ চিত্র—'কর্মশ্রেষ্ঠ' ও এক রঙা চিত্র ৩৪ খানি
শ্রাবণ —'সাঁওতালী বৃত্য' ; বিশেষ চিত্র—'পূর্ণকুম্ভ' ও এক রঙা চিত্র ১৭ খানি
ভাদ্র —'কৃষ্ণকলি' ও এক রঙা চিত্র ১৩ খানি
আশ্বিন —'হর পার্বতী' ও এক রঙা চিত্র ১৪ খানি
কার্তিক —'নাম সংকীর্তন' ; বিশেষ চিত্র—মেঘ লোক থেকে পরতের মেঘ' ও 'পিকায়' এবং এক রঙা চিত্র ২০ খানি
অগ্রহায়ণ —'বাজহাঁস' ; বিশেষ চিত্র—'সাঁতারু' এবং আনমনা ও এক রঙা চিত্র ১৮ খানি

কর্ম্মস্রোত

আষাঢ়—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

কবি আমীর খুসরোর প্রেমকাব্য

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

দেবলা দেবী ছিলেন গুর্জর রাজপুতবংশে পরম রূপসী রাজকন্যা।

তার প্রেম ও তার প্রতি প্রেম নিয়ে অমরকাব্য 'ইশকিয়া' রচনা করেছিলেন আমীর খুসরো। খুসরো একদিন সুলতান আলাউদ্দিনের বড় ছেলে খিজর খানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন শাহজাদা দেবল রাণীর প্রতি তার প্রেম সম্বন্ধে একটি কাব্য লিখতে অনুরোধ করেন। যুবরাজ হৃদয়ের আবেগ নিজেই ভাল করে লিখে রেখেছিলেন। কবি খুসরো সেটিকে কাব্য-ছন্দে ঢেলে সাজিয়েছিলেন।

শাহজাদার আত্মপ্রেমকাহিনী পড়তে পড়তে কবি দেখলেন যে তার মধ্যে বেশীর ভাগ শব্দই হচ্ছে হিন্দি। হিন্দির তখন শৈশব চলছে। তবু কবি স্বীকার করলেন যে একটু ভেবে চিন্তে বিচার করলে দেখা যাবে যে হিন্দি ভাষা ফারসীর চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ফারসীতে শব্দের ঐশ্বর্য্য খুব বেশী ছিল না। আরবী যথেষ্ট পরিমাণে না মেশালে চলত না। কিন্তু কবির মতে হিন্দি আরবীর মতই পুষ্ট ভাষা ছিল; এর নিজের ব্যাকরণ অলঙ্কার প্রভৃতি ভাল করেই ছিল। তিনি লিখেছেন যে হিন্দির এই গুণ-গানে তার নিজের ভাই বেরাদররা আপত্তি করবে। কিন্তু, কবির মতে যে গঙ্গা আর হিন্দুস্থান দেখেনি, সেই নীল আর তাইগ্রিস নদী নিয়ে অহঙ্কার করবে। "যে বাগানে শুধু চীনের পাপিয়া দেখেছে সে কি করে জানবে হিন্দুস্থানের বুলবুল কি ?.....যে খোরাসানী প্রত্যেক হিন্দুকেই বোকা মনে করে সে পানকেও ঘাসের চেয়ে বেশী দাম দেবে না।... এবং যদি কেহ পক্ষপাতী হয়ে কথা বলতে চায় সে নিশ্চয়ই আমার (হিন্দুস্থানের) আমকে (বিদেশী) ডুমুরের নীচে স্থান দেবে।...তোমাদের হিন্দুস্থানকে স্বর্গস্থান হিসাবে দেখা উচিত।"

আমীর খুসরো হিন্দিতেও কবিতা লিখতেন। আর হিন্দি ও ফার্সী মিশিয়ে যে নতুন উর্দু ভাষা তৈরী হচ্ছিল তার গোড়া পত্তন করে গিয়েছিলেন। জানতেন একদিন

এদেশে মুসলমান সাম্রাজ্যের সব জায়গাতেই এ ভাষার চল হবে, আর কাজ চালাবার সুবিধা হবে। পৃথিবীতে খুব কম কবিই খুসরোর মত এত বেশী কবিতা লিখে গিয়েছেন। কাব্য-প্রতিভার জন্য তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল বুলবুল-ই-হিন্দ। তার মত কবির লেখনী নতুন গড়ে-উঠা হিন্দির ঐশ্বর্য্য যে কত বাড়িয়েছে তা বলা যায় না।

খুসরো তার নতুন ভাষাতে যে সহজ সরল ঢঙ এনে দিলেন, তার ফলে হিন্দি সংস্কৃত ভাষার অলঙ্কার, রূপক সমাস এসবের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল। মনের কথা সুখের সহজ ভাষায় প্রকাশ পেল। হিয়া ভরা দরদ দিয়ে তিনি লিখলেন,—

সখী, পিয়াকো জো মৈ ন দেখুঁ
তো কৈ সে কাটুঁ অঁধেরী রতিয়াঁ।

যেন রাধেশ্যামিনী শ্রীরাধার বিরহ আমাদের গাঁয়ের কোনের পল্লীবালার মধ্যে রূপ পেয়ে গেল।

এমনি সহজ সরল আবেগে খুসরো লিখলেন—

গোরী সোয়ে সেজ পর, মুখ পর ডারে কেস
চল খুসরো ঘর আপনে, রৈন ভই চহুঁ দেস।

আলাউদ্দিনের বিজয়বাহিনী তখন অক্টোপাসের বাহুর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ জয়ের নেশার সঙ্গে মিশেছে ধনরত্ন লুটের লোভ। তার আগের সুলতান একবার এমন লুটের সামগ্রী পেয়েছিলেন যে তার সৈন্যরা সে ধনরত্নের বোঝার ভারে দিনে এক মাইলের বেশী চলতে পারে নি। দক্ষিণ দেশে মাত্র একটা রাজা জয় করেই আলাউদ্দিন এত ঐশ্বর্য্য পেলেন যে তা একটা পাহাড়ের চেয়েও বেশী ভারী ছিল। কবি প্রার্থনা করলেন যেন এই ভাগ্যবান রাজা "দিল্লীতে বসে থেকেই শুধু চোখের ভুরুর নাচনেই মালাবার দেশ ও সমুদ্রগুলি লুট করতে পারেন।"

ধনরত্ন পাবার জন্য কিছু দিন পরেই আলাউদ্দিন গুজরাট আর সোমনাথ জয় করবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। রাজা কর্ণরায়ের সমস্ত মণিমাণিক্য, স্ত্রীপরিবার শত্রুর হাতে ধরা পড়ল। সে সবই সুলতানের কাছে ভেট হিসাবে এল। তার মধ্যে ছিলেন কমলা দেবী, যার রূপে মুগ্ধ হয়ে আলাউদ্দিন তাকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিলেন।

কমলা দেবীর দুই মেয়ে ছিল। দুটিই কর্ণরায়ের সঙ্গে পালাতে পেরেছিল। কিন্তু বড়টি রাস্তায় মারা যায়, আর ছোটটি, দেবলা দেবী, বাপের সঙ্গেই পালিয়ে বেঁচে রইলেন।

এদিকে মাতৃস্নেহে অন্ধ কমলা দেবী মেয়েকে ছাড়া বাঁচা শক্ত মনে করলেন। তিনি আলাউদ্দিনকে ধরলেন যে মেয়েকে তার কাছে এনে দিতে হবে। আলাউদ্দিন তখন একেবারে কমলা দেবীর হাতের মুঠোয়। তার উপর এমন একটা প্রস্তাবে কোন্ পাঠানের না মন নেচে উঠবে?

আবার সাজল বিরাট সৈন্যদল। ভয় পেয়ে কর্ণরায় গুজরাট ছেড়ে মেয়ে ও সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে আশ্রয় চাইতে গেলেন দেওগিরের (দেবগিরি, দৌলতাবাদ) রায়-রায়ান রামদেবের কাছে। রায়-রায়ান দেবলা দেবীকে বিয়ে করতে চাইলেন। রাজপুত রাজার কাছে এমন প্রস্তাব নূতন নয়। তিনি রাজী হলেন, কিন্তু রাজকন্যা নিরাপদ আশ্রয় পাবার আগেই পাঠান সেনা এসে হানা দিল। একটা তীরের ঘায়ে দেবলা দেবীর ঘোড়া গেল খোঁড়া হয়ে, আর তিনি ধরা পড়ে দিল্লীতে মায়ের কাছে চালান হয়ে গেলেন।

এদিকে শাহজাদা খিজর খানের বয়স হল দশ। ফুটফুটে বালককে দেখতে একেবারে ঠিক কমলা দেবীর ভাইয়ের মত। সুলতান চাইলেন দুজনের বিয়ে দিতে। কমলা দেবীরও আপত্তি ছিল না, কারণ খিজর খানের দিকে তার খুব টান হয়ে গিয়েছিল। দুটি বালকবালিকা একসঙ্গে খেলে খেলে বাড়তে বাড়তে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলল। দুটি গোলাপের কাড় বাগানে সুখে বিকশিত হল, তারা পরস্পরের সুরভিত সুগন্ধ আঘ্রাণ করে খুশীতে ভরে গেল। দুটি বাতি রাতে চাঁদোয়ার তলায় জ্বলে উঠল, তারা পরস্পরের জ্বলে উঠা ভাল করে নিল। দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা যারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে উৎসুক ছিল তারা শেষ পর্য্যন্ত মিলে গেল, যদিও তাদের চোখ আর অন্তর আলাদা ছিল, দুটি দেহ এক হয়ে গেল।

কিন্তু হায়, প্রেমের পথ এত মসৃণ নয়।

খিজর খানের মার এই বিয়েতে মত হল না। তিনি চান তার ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হয়। ভাই আলপ খানেরও তাড়াতাড়ি এই শুভকর্ম সারার ইচ্ছা।

কারণ শুধু যে তুর্কীর সঙ্গে হিন্দুর বিয়ে বন্ধ হবে তা নয়, খিজর খানেরই যে পরে সুলতান হবার কথা।

অতএব রাজনীতি এসে প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াল। ওদের দুজনকে আলাদা করে দেওয়া হল। আলাদা ঘরে তাদের থাকতে হবে। তবুও তারা লুকিয়ে দেখা শোনা করতে লাগলেন, আর চারজন করে সখা-সখী তাদের গোপন প্রণয়বার্তা নিয়ে যাওয়া আসা করতে লাগল। সে প্রেম মাটিতে শিকড় নিয়েছিল, তা ডালপালা মেলে চারার রূপ নিয়ে দুঁড়ে বের হল।

সুলতানা এবার ঠিক করলেন যে দেবলাকে খিজরের চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। ঠিক করা হল যে লালপ্রাসাদে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুলতানের নিজের হারেমে। সে খবর পেয়ে খিজর খান্ পাগলের মত হয়ে গেলেন। নিজের কাপড় চোপড় ছিঁড়ে ফেললেন, দুঃখ সহ্য করবার শক্তি রইল না। শেষ পর্যন্ত ছেলে পাগল হয়ে যাবে এই ভয়ে সুলতানা তার মতলব বদলালেন। আস্তে আস্তে রাজপুত্র প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন, আর একদিন গোপনে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা করলেন। ভাবের আবেগে সেদিন তাঁরা শুধু আত্মহারা নয়—জ্ঞানহারাও হয়ে গেলেন। বাজপাখীর মত দৃষ্টি থাকে তুর্কী নারীর। সুলতানার নজর এড়াল না।

আবার হুকুম হল লালপ্রাসাদের হারেমে যেতে হবে দেবলাকে। এবার যেতে হবেই। কোন ওজর আপত্তিতে ফল হবে না। যাবার পথে একবার ক্ষণেকের দেখা হল দুজনে। রাজপুত্র রাজকন্যাকে দিলেন নিজের চুলের একটি গোছা স্মরণচিহ্ন হিসাবে, আর পেলেন রাজকন্যার চাঁপা ফুলের মত আঙুলের আঙটি।

মনে রেখো, রেখো মনে।

সংসারে এর চেয়ে বড় কাতর মিনতি আর কিছু নেই।

হায় রাজপুত্রদের এ সংসারে নিজের মনের মত বিয়ে করার কোন স্বাধীনতাই নেই। রাজতক্তে বসে বা বসবার ইচ্ছা থাকলে হৃদয়ের হিসাব করা চলবে না। সেই ত্রেতা-যুগের রামচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের খিজির খান —সায় এই শতকের ডিউক অব উইণ্ডসর পর্যন্ত।

শ্যামা আলপ খানের মেয়ের সঙ্গে খিজর খানের বিয়ে হয়ে গেল। সে যুগের রাজপুত্রের বিয়ের উৎসবে তামাসার সুন্দর বর্ণনা এখানে আছে। বিজয়-তোরণ ত তৈরী হলই। সে তো মামুলী ব্যাপার। নাচ, গান, দেওয়ালী, ভাসুমতীর খেল—সে যা হল তার তুলনা নেই। বায় দড়ি পাড় করিয়ে তার উপর নাচা পর্যন্ত। যে রোপ-ওয়াকিং এখন একবার দেখাতে পারলে গোটা আমেরিকাকে গোড়ালীর উপর ভর করে পাড় করিয়ে খেলা সম্ভব হত এই আজকের মায়াহীন বিজ্ঞানের যুগতেও। "যাদুকর জলের মত একটা তরোয়ালকে গিলে ফেললে—যেন খুব ঢেঁড়া পেয়ে একজন সরবৎ খেয়ে ফেলছে। সে নাকের ভেতর দিয়ে একটা ছোরা বিঁধিয়ে দিল। ছোট ছোট কাঠের ছোট শরীরের ভিতর থেকে বড় বড় শরীর বের হতে লাগল। একটা জানালার ভিতর দিয়ে একটা হাতীকে, আর একটা ছুঁচের ভিতর থেকে একটা উটকে বের করা হল। বহুরূপীরা অনেক রকম ঠগবাজী দেখাল। কখনো দেবদূত, কখনো রাক্ষসের চেহারা তারা ধারণ করল।.....তারা এমন মন-গলান গান করল যে মনে হল যে কোন মানুষ মারা যাচ্ছে, আর তার খানিক পরে আবার বেঁচে উঠল।"

এমনি ঝাঁকজমকের মধ্যে দিয়ে ত শাহজাদার বিয়ে হয়ে গেল। এদিকে দেবলার দিন কাটে কি করে? তিনি অনেক অনুযোগ করে চিঠি লিখলেন, কিন্তু যা উত্তরে পেলেন তাকে অসহায়ের অদৃষ্টবাদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? দুজনেই দুঃখে ব্যাকুল হয়ে অসহায়ের সহায় সেই উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সুলতানার মন গলল। মুসলমান শাস্ত্রে চারটি স্ত্রী রাখা যায় এটা যখন তাকে বোঝান হল, তিনি দেবলার সঙ্গে খিজরের বিয়েতে রাজী হলেন। আর আলাউদ্দিন ত আগেই মত দিয়ে রেখেছিলেন। লালপ্রাসাদ থেকে আনিয়ে দেবলার বিয়ে দেওয়া হল। এবার এত আনন্দ হল যে কবি লিখলেন—

সুলতানা সুখী অতি হরষে
ধমনীতে বেগে খুন নাচে
পরণে গহনা সম সরসে
হিয়া যেন চুনী সেজে আছে।
দুটি আঁখি হরষেতে ভরি
চকমকি' ফুটে উঠে সুখে,

দুটি কানে দুলুয়া হরণী
কেশে ওহে যেন টুকটুকে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বাঙালপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। এই দুই নিরীহ দম্পতীর প্রেমেও ছিল কারো অভিশাপ। এত ভালবাসা ও বিরহ সহ্য করার পর মিলন হল, কিন্তু সুখ হল না।

সীমাহীন শারীরিক অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে আলাউদ্দিনের স্বাস্থ্য খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়, আর মানসিক শক্তিও নষ্ট হয়ে যায়। তার পেয়ারের ক্রীতদাস মালিক কাফুরই রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে দাঁড়ায়। খিজর খান্ বাপের সেরে ওঠার জন্যে মানৎ করে পায়ে হেঁটে তীর্থে যাচ্ছিলেন—এমন সময় সুলতান একটু সেরে উঠলেন আর শাহজাদারও পায়ে পড়ল কোস্কা। অনুচররা তাকে বুকিয়ে সুকিয়ে ঘোড়ায় চড়াল, আর রঙ চড়িয়ে পারাপভাবে এই অবিবেচনার কাধ্যের বাপের কাছে করল মালিক কাফুর। সুলতানের অপমান করেছেন শাহজাদা। সত্যি কথা বলতে কি—তার আরোগ্য হওয়াই চান না তার সুযোগ্য পুত্র।

বাদ্।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের শালা আর ছেলের শ্বশুর আলাপ খানের ঘোল গলান। তারপর ছেলের কাছে গেল নির্মম চিঠি—আমার দেওয়া রাজপুত্র, 'দরবার' অনুষ্ঠান, হাতী, ঘোড়া, মোটমাট যত খেলাৎ পেয়েছ সবদাও পত্রপাঠ ফিরিয়ে, আর আমার হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত আমার সামনে হাজির পর্য্যন্ত হয়ো না। থাক নির্বাসনে গঙ্গার ওপারে পাহাড়ী তরাইয়ে শুধু শিকার আর জংলী পশুদের নিয়ে।

এই ফরমান পাঠান হল সবচেয়ে কদাকার এক দূতকে দিয়ে। চোখের জলে ভাসা বুক নিয়ে শাহজাদা সব খেলাৎ ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু মাত্র দুদিন পরেই আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে তিনি বিনা হুকুমেই মরণোন্মুখ বাপের কাছে ফিরে এলেন। পিতা মার্জনা করলেন, কিন্তু রাজা মালিক কাফুরের কন্দীতে অন্ধ হয়ে নিজে সেরে না উঠা পর্য্যন্ত খিজর খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখলেন। তার মা মালিকা-ই-জাহানকে লালপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক হল যে যেন "একটা আত্মা দু টুকরো হয়ে গেল।" কাফুরকে দিয়ে সুলতান শুধু শপথ করালেন যে শাহজাদার প্রাণহানির চেষ্টা যেন না করা হয়। এর বেশী আর কিছু করার মত মানসিক শক্তিও দিগ্বিজয়ী আলাউদ্দিনের মধ্যে বাকী ছিল না। শুধু ছিল একটা ভারী হৃদয়, আর আহত আত্মা।

আমীর খুসরো ছবির মত ভাষা দিয়ে সুলতানের অবস্থা ফুটিয়ে তুলেছেন। শাহানশাহ হয়ে গিয়েছিলেন "নিম-জান বা জান্‌বরলব" অর্থাৎ বেদনায় ভরা শরীরে প্রায় আধমরা, আর "নান্দ নিম্ ই জান্ দরদস্" অর্থাৎ দু টুকরো করে কাটা শরীরের মত।

সেইখানে, সেই শত ঐতিহাসিক হত্যার স্মৃতি আর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ঘেরা গোয়ালিয়র দুর্গে দেবলরাণী নিজে যেচে এই দুঃখময় কারাবাসের সঙ্গী ও সান্ত্বনা হয়ে স্বামীর সঙ্গে রইলেন।

আলাউদ্দিনের আর বেশীদিন বাকী ছিল না। তার মৃত্যুর পর চটপট করে কাফুর সুলতানের একটা উইল বের করে সবাইকে দেখিয়ে পাঁচ বছর বয়সের সব চেয়ে ছোট শাহজাদাকে মসনদে বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গোয়ালিয়রে একজন অনুচরকে পাঠিয়ে যার সুলতান হওয়া উচিত ছিল সেই খিজরখানকে অন্ধ করে দিল।

কবি দুঃখ করে লিখছেন—

ব্যথা যাহা পেত সুর্মা পরশ মাখিতে
এ হেন দুঃখ কেমনে সহে সে আঁখিতে?
নার্গিস কুলী আঁখি হ'তে খুন নিকালে,
সরাব উলটি করে যেন পাড় মাতালে।

কিন্তু আলাউদ্দীনের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত এখানেই শেষ হল না। কাফুর অবশ্য নিজেই অল্প দিনের মধ্যে খুন হয়ে যায়, আর তার প্রতি খিজরখানের অভিশাপ সফল হয়। তবু তিনি এত বড় শত্রুর হত্যার খবরেও দুঃখিত হয়ে ধুলোতে মাথা ঘষে ঘষে শুধু নিজের কষ্টের জন্য, শত্রুর জন্যেও চোখের জল ফেলেছিলেন। আমীর খুসরোর এই বর্ণনা পড়ে সংস্কৃত কবিতার কথা মনে পড়ে—

বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী-
বিললাপ বিকীর্ণ মূর্দ্ধজা।

এর পর খিজরের ছোট এক ভাই কুতুবুদ্দিন সব চেয়ে

ছোট ভাই সুলতানকে বন্দী করে ফেলে নিজে তখ্‌তে বসেই দাদাকে হুকুম করলেন, দেবলাদেবীকে নিজের হারেমে পাঠিয়ে দিতে।

খিজরখান, অন্ধ অসহায় খিজরখান এই সঙ্কটের সময়ে যে মনের জোর দেখিয়েছিলেন তা আরো আগেই দেখান উচিত ছিল। মাথা উঁচু করে অন্ধদৃষ্টিতে বিশ্বের বিষ আর সাহস ঢেলে তিনি বললেন—

যতদিন আমার প্রেয়সী আমার কাছে আছে, বরং আমার মাথা কাটা যাবে সেও ভাল, আমি তাকে ছেড়ে দিব না।

আর দেবলাদেবী? তাঁর কি উত্তর হয়েছিল তা সেই অলিখিত পুরাকাল থেকে আজো সব হিন্দুনারী নিজের মর্মে মর্মে জানেন।

কুতবুদ্দিন অন্ধ দাদা ও অসহায় বৌদিদির এই স্পর্ধার শাস্তি দিতে দেরী করল না। তার নিজেরই জীবনের উপর একটা ষড়যন্ত্র—যাতে তার বন্দী ও অন্ধ ভাইদের কোন হাতই ছিল না—ব্যর্থ হওয়ার পর সে ভাবল যে এবার সিংহাসনের আর কোন দাবীদারের সম্ভাবনাও রাখা ঠিক হবে না। বিপদের জড় মেরে দেওয়াই ভাল। তাই সে নিজের দেহরক্ষীদের সর্দারকে (শিলেদার) গোয়ালিয়রে পাঠিয়ে দিল তিনটি ভাইকেই হত্যা করবার জন্য।

ঘাতকরা ঢুকল বন্দীর ঘরে। অন্ধের শেষ সহায় বালোর প্রাণপ্রিয়া, কৈশোরের পত্নী, বন্দীদশায় সঙ্গিনী দেবলাদেবী দুটি হাত দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরলেন। ওগো তোমায় মারতে দেব না, তোমায় আমার অচল অসহায় এই হাত দুটি আড়াল করে রাখবে সব বিপদ, সব আঘাতের হাত থেকে। ওগো, ওগো, আমার যে এই হাত দুটি ছাড়া আর কোন বর্মই নেই তোমাকে রক্ষা করবার জন্য।

দেবলাদেবীর সেই সুন্দর বাহু দুটি ঘাতকের তরোয়ালের আঘাতে স্বামীর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেটে মাটিতে পড়ে গেল। যে হাত দুটি চার হাত এক হয়ে যাবার পর স্বামীর কাছ ছাড়া হয়নি কখনো।

কিন্তু রক্তের ডাক এখনো শেষ হয়নি। কুতবুদ্দিন নিজেও অলঙ্ঘরিত্রতার শেষ সীমায় এসে এক নীচ বংশের ক্রীতদাসকে সব ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল। সেই প্রিয়পাত্র খসরুখানই শেষ পর্যন্ত কুতবুদ্দিনকে এক রাত্রিতে নিজে গুপ্তহত্যা করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে খিজরখানের হত্যার পর দেবলাদেবীকে কুতবুদ্দিনের হারেমে নিয়ে আসা হয় জোর করে। আর পরে গুপ্তঘাতক সুলতান খসরুখান পর্যন্ত তাকে দখল করে। ঐতিহাসিক বরণী এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব। আমরা শুধু আশা করতে পারি যে এই নারীদের যেন এমনভাবে তিলে তিলে মৃত্যুর অধম মৃত্যু না হয়ে থাকে।

কিন্তু অমর প্রেম?

যে প্রেমের গাথা কবিতা যুগে যুগে এসেছেন, যার মহিমা আমাদের দেয় আশা, দেয় ভাষা, দেয় সান্ত্বনা সেই প্রেমের কি এই হল শেষ পরিণাম?

খিজর খানের হত্যার পর তার আত্মা যেন দেবলাদেবীর সঙ্গে সঙ্গেই থেকে গিয়েছিল। ইহলোকে যারা সব দুঃখ দুর্দশার মধ্যে দিয়েও একসঙ্গে ছিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাদের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ টেনে আনতে পারে নি। তাই ত দেবল রাণী বলেছিলেন—

পরাণের প্রাণ ওগো পরাণ আমার
তব তরে বিসর্জিনু জীবন সংসার।
শুধু তোমারই লাগি ত্যজেছি আত্মারে
ভুলো না আমার প্রেম ভুলো না আমারে।
যেথাই আমার রক্ত পড়িয়াছে মিতে
প্রেমসম দুর্বাদল গজালে নিভৃতে।
খুঁজে দেখো মোর রক্তে রাঙা মাটী সনে
স্থহিবে রঙীন ধাতু প্রেম রসায়নে।

এইটুকু বিশ্বাস ছাড়া প্রেমের নেই আর কোন সম্বল। দূর্বাঘাস ছাড়া নেই কোন মনে করানর মত ধন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কর্ণসুবর্ণ

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইতে বড় প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আসিল। দেখিল সার্থের সকলের ঘুমাইয়া উঠিয়া নিজ নিজ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অধিপতু হাস্যমুখে তাহার ঘোড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।

দুইজনে কাছাকাছি আসিল। বড় বলিল—'ভাই, এবার দুজনে এক হইলাম। এখন এ-পথে ফিরি আর ওপথে চলা হবে।'

অধিপতু হাসিয়া কহিল 'কবে ফিরবেন?'

বড় বলিল—'তা জানিনা। তুমি সাথেই থাকবে তো?'

অধিপতু একেবারে হাসিয়া বলিল—'তাহলে থাকব না। আমি ঘোড়ার আরোহী খুঁজছি। শুনেছেন, বলেছেন আমাকে নালন্দায় নিয়ে যাবেন।'

'সে কথা?'

'আমি ঘোড়ার সন্ধানই পেয়ে গিয়ে এসে।'

বড় দেখিল, অধিপতুর মুখে চোখে উচ্ছলিত আনন্দ। সে জিজ্ঞাসা করিল—'নালন্দায় গিয়ে কি হবে? সেখানে কি তুমি অন্য কাজ করবে?'

অধিপতু বলিল—'না, এখানে যে-কাজ করছি সেখানেও তাই করব। কিন্তু সে যে নালন্দা—মহাতীর্থ! তদন্ত বৌদ্ধভদ্র ছাড়াও কত জ্ঞানী মহাপুরুষ, কত সিদ্ধ—অর্হৎ আছেন। তাদের দেখা পেলে আমি ধন্য হব।'

অধিপতুর উদ্ভাসিত মুখের পানে চাহিয়া বড়র অন্তর ক্ষণেকের জন্য উতলা করিয়া উঠিল। অধিপতু যে-পথে চলিয়াছে তাহা কেমন পথ, কোন্ আনন্দঘন শান্তিনিকেতনে তাহার শেষ? আর বড় যে-পথে পা বাড়াইয়াছে তাহারই বা সমাপ্তি কোথায়?

দুইজন বিপরীত পথের যাত্রী সাথের সম্মুখে পরস্পর আলিঙ্গন করিল। তারপর বড় কর্ণসুবর্ণের পথ ধরিল।

• • • •

কর্ণসুবর্ণ নগর একদিকে ভাগীরথী ও অন্যদিকে ময়ূরাক্ষী—দুইটির সম্মিলিত ধারার দ্বারা পরিখীকৃত, তাই তাহার আকৃতি ত্রিভুজের ন্যায়; উত্তরে প্রশস্ত, দক্ষিণে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্গমস্থলে কোণের আকার ধারণ করিয়াছে। নগরের উত্তর প্রান্তে বিস্তীর্ণ প্রাকার স্থলপথে নগরকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিকেল প্রায় আসন্ন, তখন বেশি লোক নয়, তাহার মধ্যে লক্ষাধিক লোকের বাস। তাহা ছাড়া প্রাকার পরিখার বাহিরেও বহুলোকের বসতি। দক্ষিণে মৌরীর পরপারে যাহারা বাস করে তাহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক, নগরে যজ্ঞ কুশ শাক-পত্র যোগান দেওয়া তাহাদের জীবিকা।

কর্ণসুবর্ণ নূতন নগর; মথুরা বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন নয়। তাহার পথগুলি ঋজু, গলিঘুঁজি বেশি নাই। পথের দুই ধারে নানা বর্ণের চূর্ণলিপ্ত দ্বিতল ত্রিতল গৃহ; গৃহচূড়ায় ধাতুকলস। পথে পথে বহু দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ চৈত্য নাই। নগরের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রাজপথ গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে। পথের পূর্ব ধারে অসংখ্য ছোটবড় ঘাট, স্নান ঘাট, খেয়া ঘাট, বন্দর। পথের অপর পার্শ্বে ধনী নাগরিক ও রাজপুরুষদিগের তুঙ্গশীর্ষ প্রাসাদ। এই পথ দক্ষিণদিকে যেখানে শেষ হইয়াছে সেই নদীরচিত কোণের উপর দুর্গাকৃতি রাজ অট্টালিকা। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শশাঙ্কদেব গৌড়ের অধীশ্বর হইয়া এই জলদুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন; তারপর দুর্গের ছায়াতলে নগর গড়িয়া উঠিয়াছে।

ভাগীরথী-তীরস্থ অগণ্য ঘাটের মধ্যে একটি ঘাট সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—নাম হাতীঘাট। একশত রাজহস্তী এই ঘাটে একসঙ্গে স্নান করিতে পারে। শুধু তাই নয়, ইহাই নগরের বন্দর। ঘাটের সম্মুখে গভীর জলে বহু সমুদ্রগামী তরণী বাঁধা, তাহাদের ঊর্ধ্বোত্থিত গুণবৃক্ষ শরবনের ন্যায় জলপ্রান্ত কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে। বণিক ও শ্রেষ্ঠীদের পণ্য ক্রয়বিক্রয়ের ইহা একটি প্রধান কেন্দ্র। আবার সাধারণ

নগরবাসীর ইহা হইও বটে। মৎস্য হইতে আরম্ভ করিয়া কদলী কুষ্মাণ্ড অলাবু; মুড়ি চালভাজা পর্যন্ত তিলখণ্ড; ফুল মালা কর্পূর চন্দন—কোনও বস্তুরই এখানে অপ্রতুল নাই। অপরাহ্নে বায়ুসেবনেচ্ছু নাগরিকেরা এখানে সমবেত হয়; তখন বহুবিস্তীর্ণ ঘাটে তিল ফেলিবার ঠাঁই থাকেনা। গান, পঞ্চালিকার নাচ, অহিতুণ্ডিকের সাপ খেলানো, মায়াবীর ইন্দ্রজাল; সব মিলিয়া ঘাট গমগম্ করিতে থাকে।

বন্ধু যেদিন প্রাতঃকালে কর্ণসুবর্ণে আসিয়া উপনীত হইল সেদিন নবারুণ কিরণে নগর ঝলমল করিতেছিল। চারিদিকে নবজাগ্রত নগরের কর্ম-চাঞ্চল্য, গো-রথ অশ্বরথ চলাচলের ছুটাছুটি। দেব-দেউলে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে। স্নানার্থীরা ঘাটের দিকে চলিয়াছে, পূজার্থীরা মন্দিরে বহিতেছে; করণেরা তাম্বূলচর্বণ করিতে করিতে অধিকরণে চলিয়াছে। পথে পদচারিদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক, দুই চারিটি নারীও দেখা যায়। পুরুষদের মাথায় উষ্ণীষ নাই, তৈলসিক্ত কেশ কাঁধ পর্যন্ত পড়িয়াছে। সেকালে বাঙ্গালীর চুলের আদর বড় বেশী ছিল; পাছে কেশকলাপের শোভা ঢাকা পড়ে, তাই তাহারা মাথায় কোনও প্রকার আবরণ দিতনা। কেবল যাহারা রাজপুরুষ বা সৈনিক তাহারা মাথায় পাগ পরিত।

বন্ধু চারিদিক দেখিতে দেখিতে রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার মুখ শান্ত, উত্তেজনার কোনও চিহ্ন নাই; মুখ দেখিয়া অনুমান করা যায়না যে তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বহিতেছে। সে পূর্বে কখনও নগর দেখে নাই; গ্রামে থাকিতে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত নগর কিরূপ! কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহার কল্পনা বামন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল—এই কর্ণসুবর্ণ নগর! এই আমার পিতৃপিতামহের লীলাভূমি!—

জন্মান্তরের প্রীতিসূত্রের ন্যায় কর্ণসুবর্ণ নগর তাহার নাড়ীতে টান দিল, দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি বিপরীত-মুখী মনোবৃত্তি যেন নিভৃতে থাকিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল—বিষ দেখিয়া ভুলিও না, জলবিম্বের ভিতরে কিছু নাই, বুদ্বুদ কাটিলে কিছুই থাকেনা—সাবধান! সতর্ক হও!

লক্ষ্যহীন মোহাক্রান্তভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বন্ধু এক মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অনুভব করিল তাহার উদর শূন্য। ভাণ্ডারে থরে থরে মিষ্টান্ন সাজানো রহিয়াছে—দধি, ঘনাবর্ত দুগ্ধ, মোয়া খাঁড় পিঠা পুলি। মিষ্টগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া বহু রক্ত-পীত বরণা আসিয়া জুটিয়াছে। নগ্নদেহ মোদক বসিয়া বৃহৎ কটাহে রসপড়া ভাজিতেছে।

বন্ধু ময়রার দোকানে প্রবেশ করিল। কোমর হইতে কয়েকটি কড়ি ও ক্ষুদ্র ধাতুমুদ্রা বাহির করিয়া বলিল—'আমার কাছে এই আছে। এতে যা খাবার হয় আমাকে দাও।'

ময়রা দেখিল বিপুলকায় আগন্তুক কানসোনার লোক নয়, বিদেশী। সে পুত্রকে ডাকিয়া ভিয়ানে বসাইল, নিজে উঠিয়া গিয়া চত্বরের উপর পিঁড়ি পাতিয়া বন্ধুকে বসিতে দিল। তারপর তাহার দোকানে যত প্রকার মিষ্টান্ন ছিল একে একে পরিবেশন করিতে লাগিল। সেকালে বাংলা দেশে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ছিল না; বিশেষত সম্প্রতি বহির্বাণিজ্য বন্ধ পড়ায় দেশজাত সকল বস্তুই সুলভ হইয়াছিল। সোনা-রূপারই অভাব হইয়াছিল, অন্নবস্ত্রের অভাব কখনও হয় নাই।

ময়রা যত দিল বন্ধু তত আহার করিল। আহার করিতে করিতে সে দেখিল একটি লোক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। লোকটি তালপত্রের ন্যায় কৃশ কিন্তু সাজসজ্জার পারিপাট্য অতি অদ্ভুত। পরিধানে সূক্ষ্ম মলের ধৌতি ও উত্তরীয়, মাথায় ফুলের মালা জড়ানো। হাতের নখ দীর্ঘ ও ত্রিকোণ করিয়া কাটা, তদুপরি আলতার প্রলেপ। অধরও অলক্তরাগে রঞ্জিত, কানে শঙ্খের কর্ণফুল। বৃশ্চিকপুচ্ছের ন্যায় বক্র একজোড়া গোঁফ। চক্ষু দুটি গোল, তাহার উপর ভ্রূযুগল আকৃষ্ট ধনুর ন্যায় চক্রীকৃত।

বন্ধু এরূপ বিচিত্র জীব কখনও দেখে নাই। সে জানিত না কর্ণসুবর্ণের রসিক ও বিলাসী নাগরিকেরা এইরূপ বেশভূষা করিয়া নাগরবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সেও কৌতূহলী হইয়া লোকটিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ চলিবার পর লোকটি উঠিয়া আসিয়া বন্ধুর পাশে বসিল এবং আরও কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিল। তাহার কাঁকড়া বিছার ন্যায় গোঁফ নাড়িতে লাগিল। তারপর সে বিস্ময়-কৌতুক-ভরা মিষ্টি সুরে হাসিয়া উঠিল। তারপর বলিল—'তুমি তো দেখছি একটি পিণ্ডখৌর হে! দোকান প্রায় শেষ করে এনেছ, এবার কি ময়রাকে ধরে কামড় দেবে নাকি?'

বহু উত্তর দিল না, আপন মনে আহার করিতে লাগিল। লোকটি তাহার উরু ও বাহুর পেশী টিপিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল—'উঁ, একেবারে সাক্ষাৎ মধ্যম পাণ্ডব, যাকে বলে নরপুঙ্গব। তুমি তো কানসোনার লোক নয় বাপু। নাম কি? নিবাস কোথায়?'

বহু এবারও উত্তর দিল না। লোকটি তখন তাহার পঞ্জরে অঙ্গুলির একটা খোঁচা দিয়া বলিল—'আরে কথা কও না যে। তুমি বাঙাল নাকি হে? বলি, কোন্ সুন্দরী-বৃক্ষ থেকে নেমে এলে!'

ভাগীরথীর পূর্বপারে বাঙাল দেশ। তথাকার ভাষার বিকৃতি লইয়া গৌড়ীয় নগর-বিলাসীদের মধ্যে ব্যঙ্গ-পরিহাস চলিত।

বহু দেখিল, লোকটি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। সে ডান হাতে আহার করিতে করিতে বাঁ হাত দিয়া লোকটির মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিল। পাট-কাঠির মত হাতের হাড় বহুর মুঠির মধ্যে মট্ মট্ করিয়া উঠিল। লোকটি মিহি গলায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'আরে আরে, কর কি! উঁহু—ছাড় ছাড়, হাত ভেঙে গেলে কাব্য লিখব কি করে?'

বহু হাত ছাড়িল না, মুঠি একটু শিথিল করিল মাত্র। নির্লিপ্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'নাম কি?'

লোকটি ক্রতকণ্ঠে বলিল—'নাম? আমার নাম বিম্বাধর—কবি বিম্বাধর। এবার ছেড়ে দাও বাবা, বাড়ী যাই।'

বহু প্রশ্ন করিল—'কবি বিম্বাধর কাকে বলে?'

বিম্বাধর বলিল—'কবি বিম্বাধর বুঝলে না? তুমি দেখছি একেবারেই—' না না, তুমি ভারি সজ্জন। তা—আমার নাম বিম্বাধর কিনা, তার ওপর আমি কবি, কাব্য লিখি—তাই লোকে আমাকে কবি বিম্বাধর বলে। বুঝলে

বহুর আহার সমাধা হইয়াছিল, সে ঘটির জল গলায় ঢালিয়া জলপান করিল। বলিল—'বুঝলাম না। কাব্য কী?'

বিম্বাধর হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার ধনুরাকৃতি ভ্রূযুগল আরও গোল হইয়া গেল। শেষে সে বলিল—'কাব্য কাকে বলে জান না! মেঘদূত পড়নি? নৈষধ পড়নি? বল কি হে, তুমি যে অবাক করলে! কাব্য—কাব্য-রসের কথা—শ্লোক—কান্তিং কান্তা—শৃঙ্গার রস—'

কিন্তু কাব্য কী তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিকে বোঝানো সকলের কর্ম নয়, বিম্বাধর কবি হইয়াও তাহা বুঝাইতে পারিল না। বহুরও বুঝিবার দুর্নিবার আগ্রহ ছিলনা, সে বিম্বাধরের হাত ধরিয়া দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একটু হাসিয়া বলিল—'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। আমি নতুন লোক, তুমি আমাকে কানসোনা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারবে।'

বিম্বাধর বড় ফাঁপরে পড়িল। সে স্বভাবত লঘুপ্রকৃতি ও রঙ্গপ্রিয়; বহুকে মোদকালয়ে আহার করিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল ভোজনপটু গ্রামীণটাকে লইয়া দুদণ্ড রগড় করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু রগড় করিতে গিয়া অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বিপরীত, গ্রামীণটাই তাহাকে বানর-নাচ নাচাইতেছে। তাহার বজ্রমুষ্টি ছাড়াইয়া যে পলায়ন করিবে সে উপায় নাই, যেমন দৈত্যের মত চেহারা, জোরও তেমনি।

বিম্বাধর মনে মনে পলায়নের ফন্দি খুঁজিতেছে, এমন সময় রাস্তার দক্ষিণ দিক হইতে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বহু সেইদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল, একটি চতুর্দোলা আসিতেছে। চারিজন অসুরাকৃতি বাহক দোলা স্কন্ধে বহন করিয়া আনিতেছে। দোলার সম্মুখে পশ্চাতে কয়েকজন বংশীবাদক মিঠা সুরে বাঁশী বাজাইতে বাজাইতে চলিয়াছে। একটি দাসী সোনার থালায় পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া দোলার পাশে পাশে যাইতেছে।

চতুর্দোলা কাছে আসিতে লাগিল। চতুর্দোলার আসনে দুকূল বস্ত্রের বেষ্টনীমধ্যে যিনি বসিয়া আছেন তাঁহাকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু অনেকখানি অনুমান করা যায়; মনে হয় যেন শরৎ-প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন সরোবরের মাঝখানে স্বর্ণকমল ফুটিয়া আছে। যে দাসীটি পাশে পাশে চলিয়াছে সে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া অন্তরালবর্তিনীর সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছে। দাসীটি ষোলযৌবনা, দেহের বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায়, কিন্তু সে রূপসী। তাহার নাম কুহু। কুহু শুধু রূপসী নয়, চটুল ছলনাময়ী রতি-রস-চতুরা—

কিন্তু কুহুর কথা পরে হইবে।

চতুর্দোলা বহুর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সহসা তাহার আবরণ উন্মোচিত হইল। যিনি এতক্ষণ অচ্ছাদ্য তিরস্করিণীর অন্তরালে রহস্যময়ী হইয়া ছিলেন বহু তাঁহাকে মুখোমুখি

দেখিতে পাইল। অত্যুগ্র আলোকে মানুষের যেমন চোখ ঝলসিয়া যায়, বজ্রেরও তেমনি চক্ষু ধাঁধিয়া গেল।

দোলার পর্দা দুই হাতে সরাইয়া রমণী তাহার দিকেই চাহিয়া আছেন। ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, চক্ষুতারকা নিশ্চল, স্তনপট্ট অল্প স্খলিত, দেহভঙ্গীতে মদালসতার সহিত প্রগল্‌ভতা মিশিয়াছে। রমণী নব-যুবতী নয়, প্রগাঢ়যৌবনা; তন্বী নয়, পরিপূর্ণাঙ্গী; গায়ের রঙ দুধে-আলতা, আলতার ভাগ কিছু বেশী। চক্ষু দুটি হরিণায়ত, কিন্তু দৃষ্টিতে তীব্রতা মাখানো, অধর পক্ক-বিম্বফলের ন্যায় সুপুষ্ট ও গাঢ় রক্তবর্ণ, আবার নবপল্লবের ন্যায় কোমল। সব মিলিয়া মুখখানি অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য ছাড়াও মুখে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষের স্নায়ু-শোণিতে আগুন ধরাইয়া দেয়, বুকে উন্মাদনার সৃষ্টি করে—

নারী নয়, ললন-শিখা লালসার বহ্নি।

বজ্র চাহিয়া রহিল, দোলা তাহার সম্মুখ দিয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। রমণী কিন্তু একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তিনি অস্ফুটস্বরে দাসীকে কিছু বলিলেন; অমনি দাসী ঘাড় ফিরাইয়া বজ্রের দিকে চাহিল।

দাসীর চোখে বিজলী খেলিয়া গেল; সে মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। তারপর দেখিতে দেখিতে দোলা দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। বাঁশীর রেশও ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল।

কবি বিম্বাধর এতক্ষণ শিকলে বাঁধা পাখীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল এবং বজ্রের মুঠি হইতে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। এখন বজ্র তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিয়া উঠিল, 'দেখলে তো? কানসোনায় আর কিছু দেখবার নেই। এবার হাতটি ছেড়ে দাও, বাড়ী গিয়ে শ্লোক লিখি। মাথায় পদ্য এসেছে।'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'দোলায় যিনি গেলেন—উনি কে?'

বিম্বাধর বলিল—'হায় হতভাগ্য, তাও জান না! রাণী—রাণী, গৌড়ের রাজমহিষী দেবী শিখরিণী।'

রাণী! হাঁ, রাণীর মত রূপ বটে। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের মনে পড়িল তাহার মায়ের মুখ। না, এ রাণী বয়সে তরুণী বটে, কিন্তু তাহার মায়ের মত সুন্দর নয়। রঙ্গনা রাজহংসী, আর শিখরিণী চক্রবাকী, উভয়ের তুলনা হয়না।

উপরন্তু রাণীর হাবভাব যেন নির্লজ্জতার সূচক! কিন্তু কিছুই বলা যায়না, রাণীদের পক্ষে এইরূপ হাবভাবই হয়তো স্বাভাবিক। বজ্র অনভিজ্ঞ গ্রামবাসী, নগরের রীতিনীতি আচার-আচরণ কী বুঝিবে?

বজ্রের চিন্তায় বাধা দিয়া বিম্বাধর বলিল···'ভ্রাতঃ চাতক, তুমি যে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলে। তা আমার হাত মোচন করে হতভম্ব হলেই পার। হাতে যে ঝিন্‌ঝিনি ধরে গেল!'

বজ্র জিজ্ঞাসা করিল—'রাণী কোথায় গেলেন?'

বিম্বাধর বলিল—'মন্দিরে পূজা দিতে গেলেন। ঐ যে চতুষ্পথের ওপারে প্রকাণ্ড মন্দির—কামেশ্বর শিবের মন্দির—রাণী ওখানে প্রায়ই পূজা দিতে যান। তা তুমিও যাও না, দেবমন্দিরে যেতে কারুর মানা নেই! যাও যাও, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।'

বিম্বাধরের বক্রোক্তি না বুঝিয়া বজ্র বলিল—'না, আমার অন্য কাজ আছে।'

বিম্বাধর আনন্দিত হইয়া বলিল—'বেশ বেশ। তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই, বিলম্বে কার্যহানি। তুমি নিজের কাজে যাও, আমিও বাড়ী গিয়ে শ্লোকটা লিখে ফেলি। তা এবার হস্তটি উন্মোচন কর।'

বজ্র বলিল—'উন্মোচন করতে পারি, কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। আমি এখানে কিছু চিনিনা, আমাকে একটি স্বর্ণকারের দোকান দেখিয়ে দিতে হবে।'

বিম্বাধর অমনি উৎকর্ণ হইল। ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বজ্রের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল—'স্বর্ণকারের দোকান! সোনাদানা কিনবে নাকি?'

বজ্র মৃদু হাসিয়া বলিল—'কিনব না।—দেখিয়ে দিতে পারবে?'

বিম্বাধর বজ্রের বাহুতে তাগা-বাঁধা লক্ষ্য করিয়াছিল, সোৎসাহে বলিল—'পারব না। সোনা বিক্রি করবে বুঝি! এতক্ষণ বলনি কেন? এস এস, এই যে কাছেই স্যাকরার বাড়ী—'

বজ্র বিম্বাধরের হাত ছাড়িয়া দিল। বিম্বাধরের পলায়ন-স্পৃহা আর ছিল না; যেখানে সোনারূপার গন্ধ আছে সেখান হইতে কবি বিম্বাধরকে মারিয়া তাড়ানো যায় না।

এতক্ষণ সে বন্ধুকে কৃপণস্বভাব গ্রামীন মনে করিয়াছিল বলিয়াই পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল, এখন ছোঁকের মত তাহার গায়ে ছুড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নাগর বন্ধু

সকল বৃহৎ নগরেতেই ইহলৌকা-জাতীয় এক শ্রেণীর লোক থাকে যাহারা কোনও কর্ম করে না, নিঃসাড়ে পরের রক্ত-শোষণ করিয়া উদরপূর্তি করে। কবি বিশ্বাধর সেই শ্রেণীর লোক। সে রঙ্গ-রসিক ও বাক্‌পটু, ধনী ব্যক্তিদের অশ্লীল কবিতা ও গল্প শুনাইয়া কবিখ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। চাটুকার্য ও বিদূষক-বৃত্তি ছিল তাহার জীবিকা। অর্থের জন্য কোনও নিকৃষ্ট কার্য করিতে সে পশ্চাৎপদ ছিল না।

বন্ধুর মধ্যে শাঁস আছে বুঝিয়া বিশ্বাধর পরম আগ্রহে তাহাকে স্বর্ণকারের গৃহে লইয়া চলিল। বেশী দূর যাইতে হইল না, ঐ পথেরই কয়েকখানা বাড়ী পরে এক স্বর্ণকারের দুকান। বিশ্বাধর বন্ধুকে সেখানে উপস্থিত করিয়া স্বর্ণকারকে বলিল—'ওহে অক্রূর, এই নাও, এক বিদেশী ভদ্র তোমার সঙ্গে ব্যাপার করতে চান।'

অক্রূরদাস পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি, শান্ত মন্থর প্রকৃতি। সে প্রাতঃকালে নিজ কর্মকক্ষে বসিয়া দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করিয়াছিল, সোনার সোহাগা দিয়া পিত্তলের নালিকা দ্বারা প্রদীপ শিখা ফুঁ দিয়া দিয়া সোনা গলাইতেছিল। বন্ধু ও বিশ্বাধরকে সে সমাদর করিয়া বসাইল।

বন্ধু প্রবাস হইতে প্রথমে নীলবস্ত্রের বস্ত্রবন্ধন মোচন করিল, তারপর অঙ্গদ খুলিয়া অক্রূরদাসকে দিল। বলিল—'এই অঙ্গদ থেকে এক মাসা কেটে নিয়ে তার দাম দাও।'

অক্রূর অঙ্গদ লইয়া গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। পাথরের মত ভারী সুন্দর গঠন অঙ্গদ দেখিয়া বিশ্বাধরের জিহ্বা লালায়িত হইয়াছিল, সে সংচেত-স্বরে বলিল—'সোনা নাকি?'

অক্রূরদাস অঙ্গদ হইতে চক্ষু তুলিয়া বন্ধুর পানে চাহিল, বলিল—'হাঁ সোনা।—এ অঙ্গদ আপনি কোথায় পেলেন?'

অক্রূরের প্রশ্নের মধ্যে বিপজ্জনক কণ্টক আছে অনুভব করিয়া বন্ধু তাচ্ছিল্যভরে বলিল—উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তুমি সোনা কিনতে রাজি থাক তো বল, নচেৎ অন্যত্র চেষ্টা করি।'

অক্রূর বলিল—'রাজি আছি। আপনি যদি গোটা অঙ্গদটা বিক্রয় করেন আমি কিনতে রাজি আছি।'

বন্ধু বলিল—'না, কেবল এক মাসা সোনা বিক্রি করব।'

অক্রূর বলিল,—'ভাল। এমন সুন্দর অঙ্গদ কাটতে কিন্তু মায়া হচ্ছে। ত্রিশ বছর আছে কানসোনাতে এক কারুকর ছিলেন, তাঁর হাতের কাজ আমি চিনি। এ অঙ্গদ তাঁরই রচনা। তিনি ছিলেন শশাঙ্কদেবের রাজ-কারুকর।'

বন্ধু ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'তা হবে। আমার পিতা যুদ্ধক্ষেত্রে এই অঙ্গদ লাভ করেছিলেন।'

'গোটা অঙ্গদ আপনি বিক্রি করবেন না?'

'না।'

অক্রূর তখন অতি সাবধানে এক মাসা সোনা কাটিয়া লইল, অঙ্গদের শিল্পশোভা ক্ষুণ্ণ হইল না। তারপর হিসাব করিয়া সোনার মূল্য কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা, কিছু দ্রব্য ও কপর্দক বন্ধুকে দিল।

মূল্য পাইয়া বন্ধু গাত্রোত্থান করিলে অক্রূর সবিনয়ে বলিল—'আবার যদি সোনা বিক্রি করেন আমার কাছে আসবেন, আমি উচিত মূল্য দেব। আর যদি গোটা অঙ্গদ বিক্রি করেন আমি যেকোন মূল্য দেব।'

'ভাল' বলিয়া বন্ধু বাহির হইল। বিশ্বাধর তাহার সঙ্গে চলিল।

দুইজনে রাজপথে নামিয়া একদিকে চলিল। বন্ধু বিশ্বাধরের দিকে সচকিত কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'কৈ, তুমি কবিতা লিখতে যাবে না?'

বিশ্বাধর বলিল—'কবিতা! হাঁ হাঁ, লিখতে হবে বটে।—তা, তুমি এখন কোনদিকে যাবে?'

বন্ধু বলিল—'এবার একটা বাসস্থান খুঁজে নিতে হবে। কানসোনায় দু'চার দিন থাকব স্থির করেছি। কোথায় বাসস্থান পাওয়া যায় বলতে পার?'

বিশ্বাধর বন্ধুর বাহুর সহিত বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া বলিল—'বন্ধু যার গাঁটে কড়ি আছে তার আবার বাসস্থানের চিন্তা! চল, তোমাকে ভাল বাসস্থানে নিয়ে যাব। পান

ভোজন সব পাবে। ভাল কথা, তোমার নাম তো বললে না।'

একটু চিন্তা করিয়া বন্ধু বলিল—'আমার নাম মধুমথন।'

বিম্বাধর বলিল—'বন্ধু মধুমথন, তোমার দেশ কোথায়?'

বন্ধু বলিল—'উত্তরে, মৌরী নদীর তীরে।'

'তুমি যে বংগাল নও তা তোমার কথা শুনেই বুঝেছি। —তা কি কাজে কানসোনায় এসেছ?'

'কাজ কিছু নেই, ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

'বেশ বেশ। ভ্রমণ-রমণের এই তো বয়স। চল, তোমাকে উপযুক্ত স্থানে নিয়ে যাই।'

উৎফুল্ল বিম্বাধর বন্ধুকে লইয়া উত্তর দিকে চলিল।

এই সময় আবার বংশীরব শুনা গেল! রাণী শিপরিণী পূজা দিয়া ফিরিতেছেন; আন্দোলিকার পাশে দাসী কুহু রিক্তহস্তে যাইতেছে। বন্ধুর কাছাকাছি আসিয়া আবার দোলার দুকূল-আচ্ছাদন উঠিয়া গেল; রাণী শিপরিণীর তপ্ত-তীব্র চক্ষু দুটি বৃশ্চিকীরের ন্যায় বন্ধুকে বিদ্ধ করিল। বন্ধু কিন্তু একবার চক্ষু তুলিয়াই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল, আর ওদিকে তাকাইল না।

দোলা দক্ষিণে রাজপুরীর দিকে চলিয়া গেল। বন্ধু ও বিম্বাধর বিপরীত মুখে চলিল। তাহারা জানিতে পারিল না, দোলা কিছুদূর যাইবার পর রাণী শিপরিণী কুহুকে চোখের ইসারা করিলেন; কুহু অমনি দোলার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর পিছু লইল। চাঁপা রঙের উত্তরীয়টি মাথার উপর টানিয়া একটু আড়-ঘোমটা দিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিতে হাসিতে সন্তর্পণে বন্ধুর অনুসরণ করিল।

বিম্বাধর বন্ধুকে লইয়া এপথ ওপথ ঘুরিয়া শেষে নগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে এক জনবিরল পাটকে উপস্থিত হইল। পথটি অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ, গৃহগুলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গৃহ। পথের শেষ প্রান্তে নগর-প্রাকারের কাছে একটি মদিরা ভবন।

মদিরা-ভবনে দিনের পূর্বাহ্নে গ্রাহকের ভিড় ছিল না, শৌণ্ডিক মেঝেয় বসিয়া পিঁড়ির উপর ছক কাটিয়া এক প্রতিবেশীর সহিত কড়ি চালিতেছিল। মদিরা-ভবনটি শুধু পানশালা নয়, অড্ডা খেলার আড্ডাও বটে, আবার বহিরাগত পথিকের চটি। সম্মুখের ঘরটি বড়, আশে পাশে কয়েকটি ছোট ছোট কুঠরী আছে।

শৌণ্ডিক লোকটি গোর কৃষ্ণবর্ণ, শুষ্কদেহ, বিরলদন্ত। বিম্বাধর ও বন্ধু প্রবেশ করিলে সে স্বভাব-রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া চাহিল। বিম্বাধর বলিল—'বটেশ্বর, তোমার জন্য গ্রাহক এনেছি। ইনি কানসোনায় নূতন এসেছেন, কিছুদিন থাকবেন। তাই তোমার আড্ডায় নিয়ে এলাম।'

বটেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল, বন্ধুকে আপাদমস্তক মেপিয়া লইয়া বিম্বাধরের পানে চক্ষু ফিরাইল। বিম্বাধর একটু ঘাড় নাড়িল। তখন বটেশ্বর পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, কাঁতার ঘর্ঘর শব্দের মত ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ঘরা-ঘরা গলায় বলিল—'আসতে আজ্ঞা হোক। আমার ঘর আপনার ঘর, যতদিন ইচ্ছা থাকুন।'

বন্ধু একটি রৌপ্যমুদ্রা বটেশ্বরের হাতে দিয়া বলিল—'এতে কতদিন চলবে?'

সসম্ভ্রমে মুদ্রা কপালে ঠেকাইয়া বটেশ্বর বলিল—'এক মাস। স্বতন্ত্র ঘর পাবেন, তাছাড়া পান আহার শয়ন সেবা।'

বটেশ্বর বন্ধুকে লইয়া গিয়া একটি প্রকোষ্ঠ দেখাইল। প্রকোষ্ঠটি গৃহের এক প্রান্তে, বাহিরে যাইবার স্বতন্ত্র দ্বার আছে। আকারে ক্ষুদ্র ও নিরাভরণ, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বন্ধু কক্ষটি মনোনীত করিল। তখন বটেশ্বর ভৃত্য ডাকিয়া মেঝের উপর উত্তম শয্যা পাতিয়া দিল, জলের নূতন কলস ভরিয়া ঘরের এক কোণে রাখিল, দীপদণ্ডের শীর্ষে তৈলপূর্ণ প্রদীপ আনিয়া অন্য কোণে রাখিল। ব্যবস্থা দেখিয়া বন্ধু প্রীত হইল।

বিম্বাধর বলিল—'ভাই মধুমথন, চিন্তা কোরো না, তুমি সুখে থাকবে। বটেশ্বর পাকা লোক, ওর বাপের নাম ঘটেশ্বর, ঠাকুর্দার নাম ষণ্ডেশ্বর—ওরা তিন পুরুষে আড্ডাধারী। তোমার কোনও অসুবিধা হবে না, যখন যা চাইবে হাতের কাছে পাবে। এমন কি—'বলিয়া অর্থপূর্ণ-ভাবে চোখ টিপিল।

বিম্বাধরের সরল ইঙ্গিত বন্ধু বোধহয় বুঝিল না, সে বলিল—'ভাল।'

বিম্বাধর বলিল—'এখন তবে চললাম। কিন্তু আবার আসব। তুমি নূতন মানুষ, নগরের সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে হবে তো।'

বিম্বাধর যে আবার আসিবে, তাহার এত সহৃদয়তা নিস্বার্থ নয়, তাহা বন্ধু বুঝিয়াছিল। সে একটু হাসিল।

তারপর বিস্বাধর গমনোদ্যত হইলে সে বলিল—'একটা কথা। কানসোনার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে এক ব্রাহ্মণ থাকেন—নাম কোদণ্ড মিশ্র। তাঁকে চেন কি?'

বিস্বাধর বলিল—'বামুন? চাণক্য? তার সঙ্গে তোমার কী প্রয়োজন?'

বন্ধু বলিল—'প্রয়োজন নেই। পুরানো পরিচয় আছে।'

বিস্বাধর মাথা নাড়িল—'কোদণ্ড মিশ্র? কৈ না, কখনও নাম শুনি নি। বটেশ্বর, তুমি চেনো?'

বটেশ্বর বলিল—'না। ব্রাহ্মণ মহোদয়ের আমার আজ্ঞায় পায়ের ধুলো দেন না, চিনব কি করে?'

অতঃপর বিস্বাধর আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া বিদায় হইল।

মদিরা-ভবনের বাহিরে একটি গাছের আড়ালে কুহু দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে দেখিল বিস্বাধর চলিয়া গেল, কিন্তু বন্ধু বাহির হইল না। কুহু আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল, কিন্তু বন্ধু আসিল না। তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল। বন্ধু কোথায় থাকে এইটুকুই আপাতত তাহার জানার প্রয়োজন ছিল।

• • •

বন্ধুর নাগরিক জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। কর্মহীন অলস দিনগুলি একে একে কাটিতে লাগিল।

মদিরা-ভবনের পিছনে অনতিদূরে ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর মিলিত স্রোত বহিয়া গিয়াছে, নদীর ধারে ধারে প্রস্তর বাঁধ। দুই চারিটি ঘাটও আছে, কিন্তু ঘাটের কোনও শোভা নাই। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া স্বল্পতোয়া নদীতে বড় কেহ স্নান করিতে আসে না।

বন্ধু মাঝে মাঝে নির্জন বাঁধে গিয়া বসিত। ময়ূরীর খাত আঁকিয়া বাঁকিয়া দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া থাকিত। সে বেতসগ্রাম ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু ময়ূরী নদী তাহাকে ত্যাগ করে নাই। বাঁধের উপর দিয়া সে নগরসীমা পার হইয়া ময়ূরাক্ষী ও ময়ূরীর সঙ্গমস্থলে যাইত, ময়ূরীর উপল-বিকীর্ণ তীরে হাঁটু গাড়িয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিত। ময়ূরীর জলের চির-পরিচিত স্বাদ মুখে বড় মিষ্ট লাগিত। গ্রামের জন্য হঠাৎ প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত।

কিন্তু তবু সে কর্ণসুবর্ণের মায়া কাটাইয়া বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যহ তাহার মনে হইত, কেন এই নিরর্থক পুরীতে পড়িয়া আছি? পিতার সংবাদ পাইয়াছি, তিনি জীবিত নাই; তবে এখানে থাকিয়া লাভ কি? ফিরিয়া যাই, যেখানে মা আছেন শুশ্রূষা আছে সেই স্নেহের নীড়ে ফিরিয়া যাই!—কিন্তু তবু সে যাইতে পারিত না; কর্ণসুবর্ণ নগর অদৃশ্য মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিত।

কবি বিস্বাধর প্রথমে ঘন ঘন আসিত। বন্ধুকে লইয়া সে রাজপুরী দেখাইল, নাটকের অভিনয় দেখাইল, বিদগ্ধ-স্ত্রীর নৃত্যগীত শুনাইল, নানাভাবে তাহাকে আমোদ-প্রমোদে আসক্ত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্রমে সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। বন্ধুর ললিত-কলিতার প্রতি লোভ নাই, মদ্যপানে আসক্তি নাই, দ্যূতক্রীড়ায় অনুরাগ নাই। এরূপ অরসিক অসামাজিক মানুষের পিছনে কতদিন ঘুরিয়া বেড়ানো যায়! বিস্বাধর আসা যাওয়া কমাইয়া দিল। কিন্তু একেবারে বন্ধ করিতে পারিল না। বন্ধুর বাহুতে পাথরের মত ভারী অঙ্গদটির কথা সে ভুলিতে পারে নাই।

বটেশ্বরের মদিরা ভবনে বন্ধুর অশন বসনের কোনও অসুবিধা ছিল না। অপরাহ্ণে মদিরা ভবনে যখন জন-সমাগম হইত, মদ্যপায়ীরা সুরাভাণ্ডসহ ভক্তিত পর্পট ও ইরীশমৎস্য লইয়া বসিত, দ্যূত-ব্যসনীরা হল্লোড় করিয়া কড়ি চালিত ও বিতণ্ডা করিত, তখন বন্ধু নিম্ন প্রকোষ্ঠের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িত। কখনও পথে পথান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত, কদাচ প্রাকারে উঠিয়া ইতস্তত বিচরণ করিত। প্রাকারে রক্ষী নাই, সংস্কারের অভাবে স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কিছু দেখে না, নগর শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নগর রক্ষার কথা কেহ চিন্তা করে না। সর্বত্র অবহেলার চিহ্ন।

বন্ধু দুই একবার রাজপুরীর দিকেও গিয়াছিল। প্রাকার-বেষ্টিত বিশালপুরী; তোরণ দ্বারে দুই চারিজন প্রহরী আছে বটে কিন্তু তাহারা নিজেদের মধ্যে রহস্যালাপ করিতেছে, যে-সকল নরনারী তোরণপথে যাতায়াত করিতেছে তাহাদের সহিত রঙ্গ পরিহাস করিতেছে। বন্ধু পথে দাঁড়াইয়া ভীমকান্ত দুর্গপ্রাসাদ নিরীক্ষণ করিত আর ভাবিত—এই গড় আমার পিতামহ গড়িয়াছিলেন—আমার পিতা এই

গড় রক্ষা করিতে প্রাণ দিয়াছিলেন! নিশ্বাস ফেলিয়া সে ফিরিয়া আসিত।

অধিকাংশ দিন বজ্র হাতীঘাটে গিয়া বসিত। সায়ংকালে হাতীঘাট বিচিত্র জনসমাবেশে মুখর ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠিত। পুরুষ নারী বালক বৃদ্ধ; কেহ স্নান করিতে আসিয়াছে, কেহ বায়ু সেবনের জন্য। কদাচিৎ রাজার হাতী স্নানের জন্য ঘাটে আনীত হইত। হাতীরা গভীর জলে জলক্রীড়া করিত, শুঁড়ে জল ভরিয়া পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইত।

নানা লোকের নানা কথা বজ্রের কানে আসিত। বেশীর ভাগ জল্পনা ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া। গৌড়ের সামুদ্রিক বাণিজ্য রসাতলে যাইতেছে, কেহ আর পণ্য লইয়া সমুদ্রে যাইতে সাহস করে না। রাজা ও রাণী সম্বন্ধে কেহ কেহ শ্লেষপূর্ণ বক্রোক্তি করিত। বজ্র এই সব কথা শুনিত এবং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করিবার চেষ্টা করিত।

ঘাটে বাঁধা সমুদ্রতরীগুলিও বজ্র লক্ষ্য করিত। দিনের পর দিন বিপুলকায় বহিত্রগুলি ঘাটে পড়িয়া আছে; মাঝি-মাল্লা নাই, গুণবৃক্ষে পাল নাই। উত্তর হইতে দুই চারিটি বাণিজ্যপোত আসে বটে কিন্তু তাহারা আবার উত্তরে ফিরিয়া যায়, সমুদ্রের দিকে যায় না।

এই ভাবে ঘাটে বসিয়া বজ্রের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। অন্ধকার নামিয়া আসিলে ঘাটের জনসংঘ ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইত। বজ্র শূন্য ঘাট হইতে ফিরিয়া চলিত।

ক্রমশঃ

প্রাচীন মিশরে শিল্প-সৃষ্টি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

কেউ যদি বলেন, মিশরের ইতিহাস প্রধানত শিল্পেরই কাহিনী, যে-শিল্প ধর্মকে কেন্দ্র করে', পরলোককে জড়িয়ে ধরে' প্রস্তর সৌধ, প্রস্তর মূর্তি, কারুকর্ম ও চিত্রাবলীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তাহলে তার সেই বর্ণনা অসত্য হবে না। হিক্‌সোসদের আক্রমণের পূর্বে যুদ্ধ বিগ্রহ মিশরে দেখা দেয় নি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পূর্ণক অবস্থান শিল্প চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছিল মিশরীয়দের। ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকেই এমন উন্নত ধরণের শিল্প-সৃষ্টি দেখতে পাই আমরা সেখানে, যার বিরাটত্ব শৈলী ও সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তারপর সাম্রাজ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের ফলে যখন ধনরত্ন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, তখন আবার সৃষ্টি কার্যে নূতন উদ্যম দেখা দিয়েছিল, প্রাচীনকালের বিরাট সৌধ ও বিশাল মূর্তি নির্মাণে পূর্বের পুনরভিনয় আরম্ভ হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে অল্পদেশে প্রগতিকে যেমন ধাপের পর ধাপ বেয়ে উঠতে দেখা যায়, মিশরে তেমনটি ঘটে নি। অকস্মাৎ বিরাট নির্মাণ কার্যগুলির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে প্রতিটি স্তর প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে।

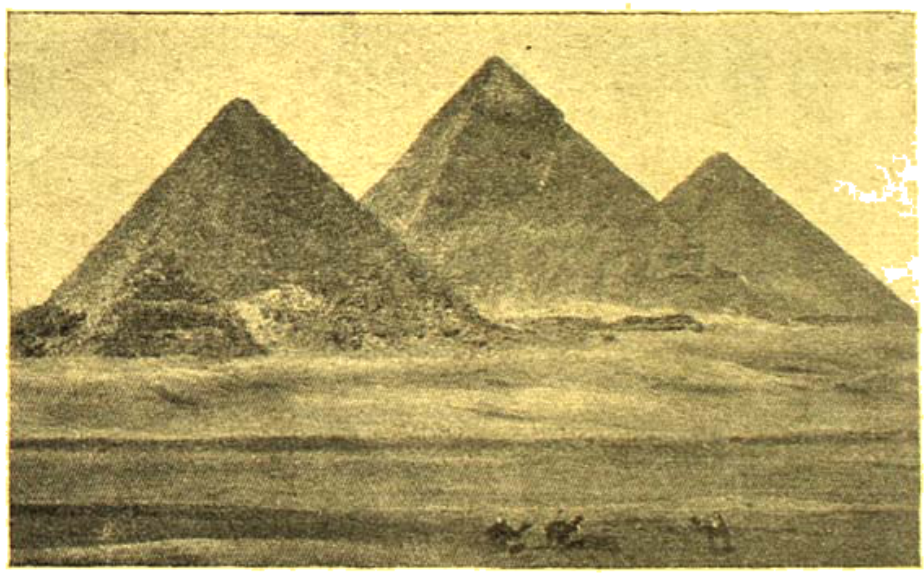

তিনটি পিরামিড। গিজে।

প্রাচীন শিল্পের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ্যা (architecture)। আকারের সৌষ্ঠবে ও ও ঔৎকর্ষ্যে স্থাপত্যের প্রভাবে এই শিল্পের কল সৃষ্টি স্বভাবত চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া স্থপতির নির্মাণকার্যের ব্যবহারিক

মূলাও আছে। প্রাচীন যুগে এই শিল্প-নিদর্শন পিরামিডগুলিকে ঘিরে তুলেছিল তার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। খাফরের স্ফিন্ক্সের (Sphinx) সামনে যে-মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল তার ছাদের কোনো কোনো দীর্ঘ ছেদক ধরণের কাট জানালা (clere-story windows) দেখছে, তেমনি ছেদক জানালার ব্যবস্থা পরবর্তীকালে গ্রীস ও রোমের সৌধ-নির্মাণ কার্যে দেখা গিয়েছিল। পরিশেষে এই ছেদক পদ্ধতির আবির্ভাব ঘটেছিল খৃষ্টানদের উপাসনা 'বাসিলিকা' নামক হলের মূল অংশটিতে (the nave of the Christian basilica Church)। মুসলমান দেশ যাদ, ইউরোপে খৃষ্টানদের 'ক্যাথিড্রেল'

স্ফিনক্স্ (গিজে)

(cathedral) বা গীর্জাগুলির স্থাপত্যের পরিকল্পনা ৩০০ বছর আগেকার কারাও খাফরের সেই হলের আদর্শেই রচনা করা হয়েছিল।

পিরামিড যুগের আদর্শ কিন্তু মিশরে স্থায়ী হয়নি। এক শতাব্দীর মধ্যেই মিশরীয়দের সৌন্দর্যজ্ঞান ও সৌষ্ঠববোধ হলের বড় বড় চৌকা থামের পরিবর্তে সুদৃশ্য, লম্বা, গোল স্তম্ভ এবং তার ওপর চূড়া (capital) নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। এরূপ গোল থামের শ্রেণী মিশরে খৃ পূ ২৮০০ শতাব্দী থেকেই নির্মাণ করা হয়েছে। পূর্বে কখনও এই ধরণের থাম পৃথিবীর কোথাও তৈরি হয়নি। সাধারণ-যুগে মন্দির নির্মাণ করা হত পাথর দিয়ে নয়, পাহাড় কেটে, যেমন দেখা যায় আমাদের দেশে ভরণ্ড ইলোরা প্রভৃতি স্থানে। কিন্তু গুহা-শিল্পের প্রারম্ভ সামন্তযুগের মিশরে। তখন পিরামিড তৈরি না করে অভিজাতবর্গ পাহাড় কেটে গুহা সমাধি মন্দির (cliff tombs) নির্মাণ করাতেন, এবং সেখানেই শবাধারে তাদের মানিকে রাখা হত। মধ্য রাজ্যের দ্বাদশ বংশীয় নৃপতিদের সময় বেনি-হাসান (Beni Hasan) নামক স্থানে 'আমেনির সমাধি' (Tomb of Ameni) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে সমাধি-কক্ষ। থামগুলির সৌন্দর্য অতুলনীয়। হাওয়ারার মন্দিরে একটি 'গোলক-ধাঁধা' (Labyrinth of Hawara) আছে, সেটি তৈরী

হাইপোস্টাইল হল (কারনাক)

করেছিলেন তৃতীয় আমেন-এম-হাট। গোলক-ধাঁধার করিডরটি নানা রকম পাথর দিয়ে গাঁথা ছিল, নির্মাণ কৌশল এমনই চমৎকার যে তাই দেখে অভিভূত হয়ে প্রকাশ করেছিলেন গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস।

সাম্রাজ্য যুগের কীর্তির অবশেষগুলির অধিকাংশই রয়েছে রাজধানী থিবিস (Thebes) নগরে ও তারই নিকটবর্তী কারনাক (Karnak) ও লাকসার (Luxor) নামক স্থানে। কায়রো থেকে ৪০০ মাইল দক্ষিণে নীল নদীর তীরে থিবিসের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—বিস্তৃত

গোরস্থানের ও বিরাট মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ। গিজে (Gizeh)-র বিশ্বপ্রসারী গোরস্থানে আমরা পেয়েছি পিরামিড-যুগে মানুষের জীবনযাত্রা, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয়, তেমনি সাম্রাজ্য-কালের সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে হয় থিবিস, কারনাক, লাকসার ও আমরনা থেকে। কীর্তি-সৌধগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান কারনাকের' জুপবিখ্যাত বিশাল মন্দির। মন্দিরের খিড়কি দরজা থেকে নদীতীরে নদর গেছে পর্যন্ত ½ মাইল। মন্দিরের এই বিস্তৃতি দুই হাজার বছর ধরে' প্রসারের ফল—প্রাচীনতম অংশ মধ্য রাজ্যের রাজাদের আমলে তৈরি, আর সর্বশেষে নির্মাণ করা হয়েছিল গ্রীক রাজা টোলেমিদের (Ptolemy)

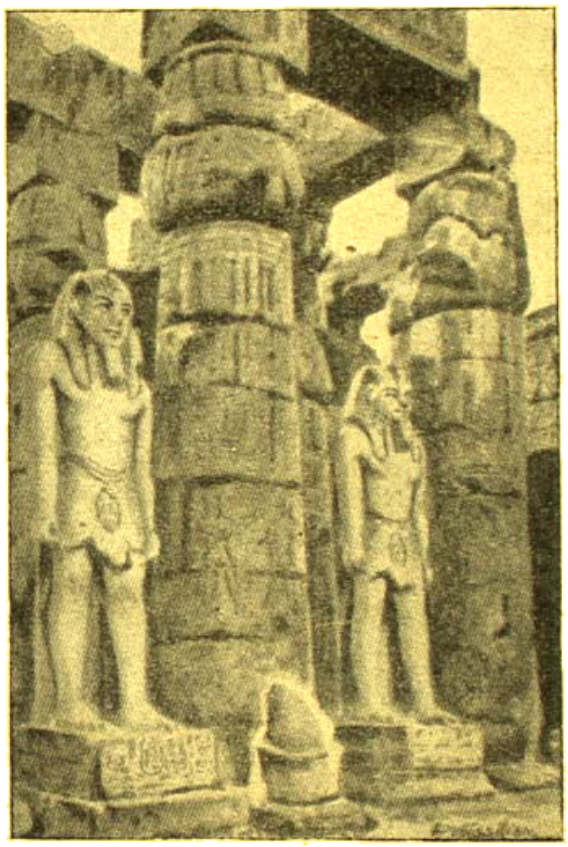

দ্বিতীয় রামেসিসের মূর্তি (আকসার)

কালে। মন্দিরের মধ্যস্থলে রাণী হাটসেপসুটের ওবেলিস্ক (obelisk) স্তম্ভ। পূর্বে এখানে রাণীর আরও একটি ওবেলিস্ক ছিল। তারপর দেখা যায়, স্তম্ভযুক্ত বিরাট প্রাঙ্গণ, যার নাম 'কারনাকের হাইপোস্টাইল হল' (Hypostyle Hall of Karnak)। এই হলের প্রাচীর গায়ে সাম্রাজ্য কালের বড় বড় যুদ্ধের দৃশ্য খোদাই করা হয়েছে (bas-relief-s)। সারি সারি গোলাকৃতি বিরাট স্তম্ভ, প্রত্যেকটির উপরিভাগের চূড়াদেশে (capital) একশ জন লোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। সম্মুখের প্রকাণ্ড প্রাচীর থেকে নদীর ঘাট পর্যন্ত দুই সারি 'মেষের বা স্ফিংক্সের এভিনিউ' (Avenue of Rams or sphinxes)। এই 'মেষের এভিনিউ'র বাঁ দিকে ছিল একটি পবিত্র হ্রদ (sacred lake)। এখন সেটি একটি এঁদো পুকুরে পরিণত হয়েছে। নদীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত পর্বত-সমাধিগুলিতে (cliff tombs) সাম্রাজ্য যুগের রাজা ও অভিজাত কুলের ব্যক্তিরা শায়িত রয়েছেন।

স্তম্ভযুক্ত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ লাকসার, দের-এল-বাহেরি (Der-el-Bahri) প্রভৃতি স্থানেও দেখা যায়। দের-এল-বাহেরিতে রাণী হাটসেপসুটের বিশাল স্তম্ভ-শ্রেণী (Colonnades) ছাড়াও রয়েছে 'রামেসিয়াম' (Rameseum), 'রামেসিয়াম' দ্বিতীয় রামেসিস্ (Rameses II) নির্মাণ করেছিলেন তার স্থপতি ও শ্রীতদাসদের সাহায্যে। বিরাট আকৃতির প্রস্তরমূর্তি (Colossal statues) ও সুবিশাল স্তম্ভশ্রেণীর একটি ভগ্নাবশেষ রয়েছে এই রামেসিয়ামকে।

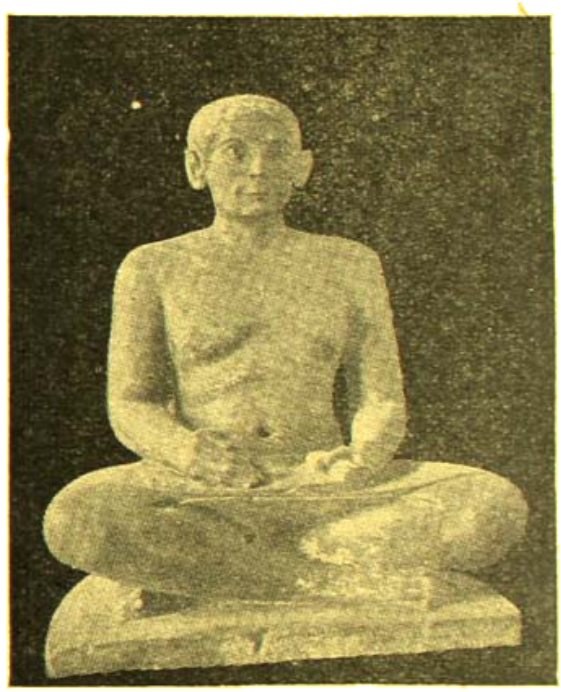

লেখক (scribe) (সুস্থার)

দারি সারি মূর্তি, সবগুলিই রামেসিসের। ইখনাটনের রাজধানী আমরনা—প্রাচীন নাম 'আখেটেটন'—খনন করে রাজপ্রাসাদ ও সূর্য-প্রাচীরের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। একজন ভাস্করের কর্মশালাও উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে পাওয়া গেছে ভাস্কর্যের অনেকগুলি সুন্দর নমুনা, যা সে-যুগের শিল্প বিষয়ে জ্ঞানকে গভীরতর করেছে। নগরের পশ্চিম-দিকে পাহাড়ের শ্রেণী, সেখানে ইখনাটনের অনুগত ব্যক্তিদের সমাধি। স্মরণ থাকতে পারে, পুরোহিতদের পীড়নের ফলে থিবিস নগর ছেড়ে দিয়ে আমরনায় রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন ইখনাটন এবং তার মৃত্যুর পর রাজধানী আবার যেমন থিবিসে স্থানান্তরিত হল, আমরনাও সেই সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। পাহাড়ের সমাধি মন্দিরগুলির (Amarna chapels) গায়ে সেই বিকৃত শতাব্দীর জীবনযাত্রার দৃশ্যগুলি অতি

স্বকৌশলে খোদাই করা হয়েছে—আর কাছে সেখানে ইখনাটনের অবিসুরণীয় স্তোত্রগুলি দেয়ালের গায়ে উৎকীর্ণ।

মিশরের স্থাপত্য যেমন অতুলনীয়, ভাস্কর্যও তেমনি উচ্চাঙ্গের। ইতিহাসের প্রবেশ দ্বারে সর্বপ্রথম চোখে পড়ে সেই বিরাট 'স্ফিংক্স,' মূর্তি তার মাথা মানুষের আর দেহটি সিংহের, দ্বারীর অমিত শক্তির পরিব্যঞ্জক। মেমফিসের জাদুঘরের সোনার নাকের ডগাটি ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও—সেই মূর্তিটির যে-শক্তি ও গাম্ভীর্য পরিস্ফুট, যে-সৌন্দর্য ও শক্তিচিহ্ন বিরাজমান, এবং সর্বোপরি যে-সূক্ষ্ম অবাক্ত হাসির রেখা রহস্যের একটি অপরিচয় টেনে দিয়েছে মুখের ওপর—তাই দেখে অনেক মনীষী মনে করেন, ওই শুধু একটি পাথরে গড়া প্রতিমূর্তি মাত্র নয়, তার মধ্যে একটি গোপন

দম্পতিবরের স্বামী-স্ত্রী (বার্লিন)

রহস্যের আভাস ফুটে উঠেছে, 'যে-রহস্যের সাড়া পাওয়া যায় সর্বত্র, কিন্তু পূর্ণ বিকাশ হয় নি কোথাও' ("It seeks to give expression to a secret hinted at everywhere but no where fully manifested"—Edward Caird)। এমনি রহস্যের আভাস দিয়েছেন ইতালীয় শিল্পী লিওনার্ডো-দা-ভিন্সি (Leonardo-da-Vinci) তাঁর বিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসা'র (Mona Lisa)। স্ফিংক্সকে মোনা-লিসার প্রস্তর সংস্করণ বলা যেতে পারে।

কায়রো মিউজিয়মে খাফরের একটি প্রস্তর মূর্তি আছে, পিছন দিকে ঘাড়ের ওপর বসে বাজপাখীরূপী হোরাস পক্ষপুট দিয়ে তাকে রক্ষা করছেন। ভাস্কর্যের এমন নিপুণ সৃষ্টি সত্যই বিরল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু কালের কোন চিহ্নই পড়ে নি এই মূর্তিটির ওপর। সে-যুগের প্রধান শিল্পীরাই ছিলেন মূর্তিনির্মাতা। মূর্তি তৈরি হত পাথর বা কাঠ দিয়ে, তারপর রং করা হত। চোখ দুটিতে বসানো হত স্ফটিক যেন জীবনের রশ্মি ঠিকরে বের করে। ভাস্কর্যের ইতিহাস তখন নবে সুরু হয়েছে, কিন্তু সেই অল্প কালের মধ্যে এমন জীবন্ত মূর্তি-সব তৈরি করা হয়েছিল যার তুলনা কোন যুগেই বড় একটা পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ দুইটি মূর্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—একটি পাথরে তৈরি, অপরটি দারু মূর্তি। প্রস্তর মূর্তিটি একজন লেখকের (scribe)—লুভার মিউজিয়মে রক্ষিত। লেখক আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, নগ্ন দেহে, কোলের ওপর প্যাপিয়াস রেখে কলম দিয়ে লিখতে উদ্যত, আর একটি অতিরিক্ত কলম রয়েছে কানে গোঁজা। দেখলেই মনে হয়, লোকটি বিশেষ

ইখনাটন ও নেফারটিটি

পরিশ্রমী, হিসাব নিকাশ বা কি একটা রচনা নিয়ে খুবই চিন্তা করছেন। কাষ্ঠ মূর্তিটি কায়রো মিউজিয়মে রয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে,—'শেখ-এল-বেলেদ' (Sheikh-el-Beled), অর্থাৎ গ্রামের প্রধান। আসলে, সে প্রধান নয়, মন্দুরের পর্যবেক্ষক। পরিপুষ্ট দেহ, হাতে দীর্ঘ যষ্টি, প্রভুত্বের নিদর্শন। মূর্তির শ্রেণীর মানুষের মতই স্থূল কটিদেশ, হাসি হাসি ভুলো-ভুলো মুখ—যেন নিজের পদ মর্যাদা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সচেতন। মাথার টাক, কটিবাস অবিন্যস্তভাবে জড়ানো। সেই আদি যুগে, উচ্চ-শ্রেণীর ব্যক্তিদেরও পরিধেয় ছিল কটিবাস, উর্ধ্বাঙ্গ সবই থাকতো, পদত্রাণ পাদুকা-বিহীন। কাষ্ঠ-নির্মিত হলেও সৌভাগ্যক্রমে মূর্তিটির সৌষ্ঠব সম্পূর্ণ বজায় আছে। কী নিপুণ হস্তেই না সেই সরল মানবতার সৌষ্ঠব মূর্তিতে তোলা হয়েছে। মাসপেরো (Maspero) বলেন,—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের যদি কোন

প্রদর্শনী খোলা হয় তবে মিশরীয় শিল্পের সম্মান রক্ষার জন্য আমি এই মূর্তিটিকে প্রতিনিধিরূপে পাঠাব যেন সেখানে "(If some exhibition of the world's masterpieces were to be inaugurated I should choose this work to uphold the honour of Egytian Art.")।

প্রাচীন রাজ্যের শিল্পী হাস্য-রস বর্জিত নয়। একটি শুঁড়ি (beer-brewer) আর বামন নেমহেটেপ (Dwarf Knemhetep)-এর বিখ্যাত মূর্তি দুটিতে হাস্য রস সৃজন করা হয়েছে যথেষ্ট। এ-কথা সত্য যে প্রথম শিকটায় এ-যুগের শিল্প ছিল স্থূল ও অমার্জিত। কতিপয় নির্দিষ্ট রীতিনীতি (convention) শৈলীকে সারা যুগ ধরে বেঁধে রেখেছিল, তার বড় চড় বড় হয় নি। যেমন, বিভিন্ন ব্যক্তির দেহের স্বাভাবিক গঠনের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে একই প্রণালী মত সকল দেহকেই এক রকম করে নির্মাণ করা, সকল নারীকে যুবতী আর সকল রাজাকে বলিষ্ঠ পুরুষ করে সৃষ্টি করা, আর মূর্তি এমনভাবে তৈরি করা যেন দেহ ও চক্ষু সামনের দিকে তুকে পড়েছে দেখা যায়। কিন্তু এত সব বাঁধা-ধরা নিয়ম সত্ত্বেও, সে-যুগের শিল্পীর শক্তি ও কল্পনার গভীরতা স্থূল জীবন্ত রূপ-রেখার সৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্য দান করতে ত্রুটি করে নি। বস্তুতঃ লেখক ও সেখ মূর্তির ক্ষেত্রে রীতি-পদ্ধতির ব্যতিক্রমই দেখা গেছে। সামন্ত যুগে কয়েক শতাব্দী ধরে ভাস্কর্যের অধোগতি চলেছিল, তার কারণ—ধর্মের রক্ষণশীল মনোভাব শিল্পের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মূর্তির প্রয়োজন হত মন্দিরে ও সমাধিক্ষেত্রে যেখানে ছিল পুরোহিতের প্রাধান্য। মূর্তিকে রূপদানের রীতি রীতিগুলি পুরোহিতদের চাপে বিশেষ করে মেনে চলতে হত, শিল্পীর স্বাধীনতার অবকাশ বড় একটা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও একাদশ বংশীয় নৃপতি নেবহেটেপ-রা (Nebhotép-Ra)-র রাজত্বকালে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। রাজ-শিল্পী ছিলেন তখন মারটিসেন (Martison)। তিনি তাঁর আত্মকাহিনীতে লিখে গেছেন, "এক দক্ষ শিল্পী ছিলাম আমি। জীবন্ত রূপের ছবি আঁকতে হলে, প্রতিটি অঙ্গের প্রকৃত স্থান সম্বন্ধে যে-জ্ঞানের প্রয়োজন, আমার সেই জ্ঞান আছে। পুরুষের চলে বেড়াবার সময়কার মূর্তি আর নারীর গতি ভঙ্গী, দুটোই আমার জানা ছিল। জল-চরণী শিকারের সময় অস্ত্র-ক্ষেপনের ভঙ্গী আমি জানি। দৌড়াবার কালে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিমাও আমার অজানা নেই।" দ্বাদশ-বংশীয় পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের শাসনকালে শিল্প যেন নূতন উদ্যমে আবার ফেলে উঠে পুরানো বহুত কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিল, যেমন দেখা যায় তৃতীয় আমেন-এম-হেট ও সেনুসার্টসের মূর্তিগুলিতে। কিন্তু হিকসোসদের আক্রমণের ফলে দেশ যেমন পরাধীন হয়েছিল, শিল্প সৃষ্টির উদ্দীপনাও তখন আর রইলো না। আর এক দফা অধঃপতন দেখা দিল সেই সঙ্গে, বস্তুতঃ শিল্প একরকম অন্তর্ধানই করেছিল।

শিল্পের দ্বিতীয় পুনরভ্যুত্থান হয়েছিল অষ্টাদশ-বংশীয় নৃপতিদের রাজত্ব-কালে। রাণী হাটসেপশুট, কতিপয় থাটমোস, কয়েকজন আমেনহটেপ এবং পরিশেষে ইখনাটনের আমলে শিল্প সে-উন্নতির পর্যায়ে উঠেছিল, তারই ঢেউ টেনে দিয়েছিলেন ঊনবিংশবংশীয় রামেসিসেরা। সাম্রাজ্যের নানা স্থান থেকে ধন-দৌলতের অজস্র সমাগম রাজপ্রাসাদ ও দেউলগুলির সৌষ্ঠব বর্ধন আর শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব করে তুলেছিল। হাটসেপশুটের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্তি রয়েছে নিউ-ইয়র্কের মিউজিয়মে। তৃতীয়

মাহিষক্ষিনক্সের রাজপথ (কারনক)

থাটমোসের বিরাট প্রতিমূর্তি আর আধু সেনবেন নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে দ্বিতীয় রামেসিসের ৭০ ফুট উচ্চ গগনস্পর্শী প্রস্তর মূর্তিগুলি যেন পাহাড়ের বিখ্যাত সিংহের সঙ্গে আড়া-আড়ি আরম্ভ করেছিল। কায়রো মিউজিয়মে তৃতীয় থাটমোসের একটি পাথরের 'বাষ্ট' আছে। ভাস্কর যে-কতদূর উৎকর্ষ লাভ করেছিল সে-যুগের মিশর তা বোঝা যায় এই থেকে যে, 'বাষ্ট'র মুখের ছাঁদের সঙ্গে থাটমোসের আসির মুখাকৃতির অবিকল মিল রয়েছে। তৃতীয় আমেনহটেপের একটি সিংহস্ মূর্তি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। লুভার মিউজিয়মে ইখনাটনের উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি অপরূপ শিল্প মাধুর্যের প্রতীক। ইখনাটনের পত্নী নেফেটেটির (Nefretete) মূর্তিগুলিও জীবন্ত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। বস্তুত ইখনাটনের দরবার পুরানো বাঁধা-ধরা রীতিগুলি বর্জন করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল স্বভাব-ধর্মী শিল্প-শৈলীর (Naturalism) প্রবর্তন হয়েছিল। সেই বাস্তবতাকেই প্রতিফলিত দেখতে পাই আমরা মন্দির গাত্রে রামেসিসের

গ্রিক যুদ্ধ-নৃত্যগুলিতে। দ্বিতীয় রামেসিসের অর্ধশায়ান মূর্তিটির ভঙ্গী অনুধাবনীয়। চুনিনে রক্ষিত আরো একটি বিখ্যাত প্রস্তর মূর্তি এই নৃপতির। পরিচ্ছদ সাধারণ রকমের, কোন জাঁক-জমক নেই— রামেসিসের যৌবনের প্রতিমূর্তি কেবল মনুষ্য মূর্তি নয়, পশু মূর্তি নির্মাণেও শিল্পীর দক্ষতা ও নৈপুণ্য অসাধারণ। বের-এল-বেহরির 'ভাবমগ্ন গাভী' মূর্তি (meditative cow) শিল্প কৌশলে গ্রীক ও রোমান শিল্পের সমকক্ষ।

দ্বিতীয় রামেসিসের পর থেকে শিল্প ক্রমের পতনোন্মুখতার পথ ধরে অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। কিন্তু মিশরীয় ইতিহাসে পূর্বে যেমন ঘটেছে, শীর্ষ-কালে ক্ষয়ের চিহ্নের পূর্বে বলয় রচনা করে, তেমনি দিয়েছিল। প্রাচীন

দিবিত—উপের হাটের দেয়াল চিত্র

কালের সরল স্বভাব শিল্পীকে শিল্পের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল 'সেইটি রাজাদের (Saite Kings) আমলে, কিন্তু এই প্রচেষ্টাই ছিল নির্বাণোন্মুখ দীপের শেষ উজ্জ্বলতা—কেন না এর পরই বিদেশের অধীনতা চিরদিনের তরে বিলুপ্ত করেছিল। সে-সময়ের শিল্পের একটি নমুনা—বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত মন্টুমিহাইটের (Montumihait) উপবিষ্ট প্রস্তর মূর্তি। রাজ্ঞীর মূর্তি নির্মাণ কিরূপ উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, লেডি-টিকোসেট (Lady Tekoschet)-এর ব্রঞ্জ মূর্তিটি দেখলে তা বিলক্ষণ বোঝা যায়। শিল্প যখন এমনি করে আবার তার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছিল,তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লো পারসিকেরা যার যেমন পড়ে বেরসানের ওপর, এবং সমগ্র দেশটিকে দলন করে প্রভু শক্তির দাপটে গুজনের উৎসব-মুখরকে দিলে বন্ধ করে—আর শিল্পও সেই সঙ্গে চিরদিনের তরে পাথর-চাপা পড়লো।

পাথরকে পুরোপুরি কেটে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি (figure in the round) ও 'খাই' (bas) প্রস্তর ছাড়াও পাথর খোদাই করে' নানা রকম চিত্র ফুটিয়ে তোলার কায়দাকে মিশরীয়রা আয়ত্ত করেছিল মিশরীয়। এ-রকম প্রস্তর শিল্পের নাম 'বাস রিলিফ' (bas relief)। এই শিল্পটি খাঁটি ভাস্কর্য ও খাঁটি চিত্রাঙ্কনের মাঝামাঝি। মোহিতলাস্করে রাণী হাটসেপ-সুটের পুনট (সোমালিল্যাণ্ড) অঞ্চলে সৌ-অভিযান বা পূর্বে বলা হয়েছে, তারই প্রতিকৃতি খোদাই করা হয়েছে বের-এল-বেহরির মেয়ালের গায়ে। পাল তোলা জাহাজ ঘাট বেয়ে চলেছে, সমুদ্রের জলে মাছেদের জল জন্তু—যেমন পুরুষুল কাঁকড়া প্রভৃতি। কাহিনীকে 'হাইপোষ্টাইল হলের বাইরে ১০০ ফিট লম্বা দৃশ্যাবলী খোদাই করা হয়েছে পাথরের ওপর। তার মধ্যে একটি দৃশ্যে রাজ্ঞীকে দেখা যায় অশ্বযুক্ত 'রথে চড়ে' ধনুর্বাণ হাতে যুদ্ধ করতে। সাম্রাজ্য-যুগের এই চিত্রটিতে অশ্বযুক্ত রথের প্রথম আবির্ভাব, যে-অশ্ব ও রথকে মিশরবাসীরা এনেছিল হিকসোসরা। ঘোড়ার প্রতিমূর্তি দীর্ঘায়ত, নিপুণভাবে খোদাই করা। ছবির মতই নামাবলী রঞ্জিত করা হয়েছিল এই খোদাই কার্যটিকে।

গ্রীক রাজা টোলেমিদের (Ptolemies) রাজত্বের পূর্বে মিশরীয় শিল্পে চিত্রাঙ্কনের কোন স্বতন্ত্র স্থান নির্দেশ করা হয় নি। চিত্রাঙ্কন ছিল তখন স্থাপত্য ভাস্কর্য ও খোদাই কার্যের আনুষঙ্গিক শিল্প। প্রস্তর-শিল্পীর সাধনা ও ধারণা যে, রঙ রেগে যায় পাথরের ওপর, চিত্রশিল্পী তাই তড়াক করে তোলে রং দিয়ে। কিন্তু এমন ধারা পরিপূরক ও আনুষঙ্গিক শিল্প হলেও চিত্রাঙ্কন ব্যাপক ভাবেই চলেছিল সর্বত্র। মূর্তি, পাথরের খোদাই কাজ, দেউলের দেয়াল সবই চিত্রিত করা হত। চিত্রের পারিপাট্য কাল অল্প, তা সত্ত্বেও চিত্রিত আলেখ্যের অনেকগুলি নমুনা এখনো টিকে আছে মিশরে। 'পিরামিড যুগের শিল্প' প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রাচীন রাজ্যের নানা ছবির কথা বলা হয়েছে। তখনকার অধিকাংশ ছবি সামাজিক বা গার্হস্থ্য জীবনের দৃশ্যাবলী, যা থেকে সমাজ জীবনের অনেক দিকের হদিশ পেয়েছি আমরা। মধ্যম রাজ্যের 'আমেনি-সমাধি' (Tombs of Ameni) ও খেনি-হাসানের দেয়াল চিত্রে অনেক পশু-পক্ষীর ছবি আছে, যেমন 'হরিণ ও কৃষক' 'বিড়ালের ওৎ পাতা' (Cat watching the prey)—সেগুলি গতিশীল ও জীবন্ত। আমেনির সমাধি-গাত্রে কৃষীরের মল্লযুদ্ধের একটি সরস চিত্র সত্যই উপভোগ্য। কর্মের বিন্যাস-কৌশল ও রেখাগুলির কলা-সৌষ্ঠব এমনই বিচিত্র যে ছবিটির তুলনা করা চলে শুধু গ্রীক মৃৎপাত্র যে-চিত্রাঙ্কন (vase-painting) দেখা যায়, তারই সঙ্গে।

চিত্র-শিল্পের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যের যুগে। বহুবর্ণজাত বসনের মত বর্ণশোভায় যেন মাতোয়ারা করে' তুলেছে এ-যুগের শিল্প। শিল্পী তখন রামধনুর সবকটি বর্ণের বিন্যাসকে আয়ত্তের মধ্যে এনেছে, তাই সে রং-এর নানারকম খেলা দেখাতে উন্মুখ। গৃহ,

প্রাসাদ, মন্দির সমাধি যেখানেই আছে দেয়াল আর ছাদের সিলিং সেখানেই কর্ণোজ্জ্বল জীবন্ত ছবি এঁকে ভরে' দিয়েছে সে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, নীলাকাশে উড়ন্ত পাখী, সন্তরণশীল মাছ, বনের পশু। রং-করা মেঝেটিকে দেখা যায় যেন স্বচ্ছ সরোবর, ছাদের সিলিংটি যেন নক্ষত্র-খচিত আকাশ। 'বাচ-ওয়ালী', 'নৌকায় পাখী শিকার' প্রভৃতি ছবি শিল্পীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও শৈলীর মৌলিকত্বের পরিচয় দেয়। পাথর-খোদাই জানে যেমন, চিত্রাঙ্কনেও তেমনি রেখা-টানগুলি খুবই নিপুণ, কিন্তু রচনায় ত্রুটি দেখা যায়। সমষ্টি-চিত্রে ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধটি যেমন ফুটে ওঠা দরকার, মিশরীয় শিল্পে সেই যোগাযোগের একান্ত অভাব। ব্যক্তিগুলি ছাড়া-ছাড়া ভাবে আঁকা, পরস্পর সম্পর্ক-শূন্য। পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বলে কোন বস্তুই নেই আলেখ্যগুলিতে। দূর নিকটের ব্যবধানের দিকে শিল্পের দৃষ্টি অন্ধ, আর রীতি-নীতির (convention) বাঁধন দিয়ে শৈলীকে যেমন গোড়া থেকে আটক করে রাখা হয়েছিল, সেই বন্ধন থেকেও তাকে মুক্তি দেওয়া হয় নি। যেমন, নারীমূর্তি চিত্রিত করবার রীতি ছিল শ্বেত বর্ণ, আর পুরুষের মূর্তি অঙ্কনে লাল রং ব্যবহার করা হত। কিন্তু এ-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও শিল্প-সৃষ্টি ছিল আশ্চর্য রকমের সজীব, জীবন্ত প্রকৃতিরই প্রতিরূপ—রূপ-রেখার মাধুর্যে, বর্ণোজ্জ্বলের ছটায় অতুলনীয়।

এই ত গেল প্রধান শিল্পগুলির কথা। তা ছাড়াও যে সব কারিগরি শিল্প গড়ে উঠেছিল সেগুলির নির্মাণ নৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য পিরামিড যুগ থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছিল। পিরামিড যুগের আলোচনায় বয়ন, চুড়ারের কাজ, কুমারের কাজ, অলঙ্কার নির্মাণ প্রভৃতি অনেক কারিগরি শিল্পের কথা বলা হয়েছে। সাম্রাজ্যযুগের কারিগরি শিল্পের নমুনাগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায় যে পিরামিড যুগের শিল্পধারাই চলে এসেছে সুদীর্ঘ দুই সহস্র বছর পর্যন্ত। শিল্প এমন সুখ-পরিপুষ্ট লাভ করেছে, নানা সাজসজ্জায় পরিশোভিত হয়েছে। ইতিহাসের সোনা পালিশ, পর্দা, আসনের ওপর নানা রং-এর ব্যবহারে কারুকার্য দেখা যায়। সেই জিনিসগুলি সিরিয়ায় রপ্তানি হত। আজিও সিরিয়ায় ঐ নমুনার সোনা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। টুটেন খামেন (Tutenkhamen)-এর সমাধিগর্ভে সোনালপার মোড়া সুন্দর কারু-করা কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার প্রভৃতি তৈজস পাওয়া গেছে, সেগুলি মিশরীয় ভোগবিলাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিচিত্র কারুকার্য করা স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র এবং প্রস্তরতাও শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

সারা প্রাচীন জগতে যেমন মিশরেও তেমনি—আর্ট ছিল ধর্মেরই সহচর। আর্ট ফর আর্টস্-সেক—অর্থাৎ শিল্পের জন্যই শিল্প (Art for Art's sake) এই ভাবটি সে-যুগে বোধ করি কোথাও জেগে ওঠে নি। রাজ্যের ও ধর্মের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে আর্টেরও উন্নতি দেখা দিয়েছে। রাজ্যের সম্পদ শিল্পকে পরিপুষ্ট করেছে, আর ধর্ম জুগিয়েছে তার প্রেরণা, ভাব ও লক্ষ্য। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের এই যোগাযোগের ফল অবিমিশ্র শুভ হয় নি। গাঁট ছড়ার বাঁধ নানা রকম বাঁধা ধরা পদ্ধতি (Convention) দিয়ে শৈলীকে আড়ষ্ট করে রেখেছে, আর সেজন্য স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীনতার মধ্যে শিল্প কখনও মুক্তরিত হতে পারে নি মিশরে। তাই জাতি যখন স্বধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছে, তাহার শিল্পের সজীবতাও তখন নষ্ট হয়ে গেছে।

এক কথায় মিশরীয়দের 'প্রাচীনকালের আমেরিকান' বলা যেতে পারে। আমেরিকানদের মতই আকারের বিরাটত্ব, বিশাল পরিকল্পনা তাদের চিত্ত আকর্ষণ করেছে। পরিশ্রমী ও কর্মী ছিল তারা, তাই প্রস্তরশিল্প মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ ব্যাপারে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে ইতিহাসের চরম রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত স্থল মিশর। কালের প্রভাবে পরিবর্তন মিশরেও ঘটেছে এবং যতই পরিবর্তন ঘটেছে, ততই দেখা গেছে,—মিশর যে-কে-সে।

শ্রীমতী

প্রভাময়ী মিত্র

প্রশান্ত নলিন নেত্রে সুগভীর দৃষ্টি,
কোন বিধাতায় তুমি মায়াভরা সৃষ্টি ?
শিহরায় সারা তনু চমকায় হিয়া,
কোন শ্যামলের তুমি আলো করা 'পিয়া'।
চির বন্দী সুনিবিড় বাহুর বন্ধনে,
ছন্দে গীতে সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে।

মধুমাধবের বুকে কৈশোরের মায়া—
সেই বৃন্দাবন-ঘন-নীপ-বন ছায়া।
ধীর ধারা নীলনীর ঘিরে ব্রজভূমি,
উজান বহিয়া ফিরে তীর তট চুমি।
কাজল মেঘের তলে বাদল বাতাসে
ব্যাকুল বিরহী হিয়া কাতার আভাসে।

কে সঁপেছে নিঃশেষে আরাধনা তার
কে তোমারে দিতে পারে বিনিময় তার !

কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

বর্তমান বাংলার সবচেয়ে বড় সমস্যা অন্নসমস্যা। এ সমস্যা এখন বড়ই প্রখর হইয়া উঠিয়াছে বটে কিন্তু এ সমস্যা একেবারে বহুকাল হইতেই বর্তমান আছে। খাদ্যের প্রাচুর্য কোনদিনই এ দেশে ছিল না। খাদ্যসমস্যা এই শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে সবচেয়ে বিচলিত ও সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল তাঁহার সম্বন্ধে আজ দুই কথা বলিতে চাই। আজ অন্ততঃ তাঁর সেই মহাপুরুষের কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে। আজ যে অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে সরকার বহুব্যয় করিতেছেন এবং নানা ব্যবস্থা করিতেছেন, এই মহাপুরুষ ত্রিশ বছর আগে সেই অভিযান সুরু করিয়াছিলেন এবং বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এই নিবন্ধে তাহাই আলোচ্য।

এই মহাপুরুষের নাম রাজেশ্বর দাশগুপ্ত। ফরিদপুরের এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে তাঁহার জন্ম। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে কৃষিবিদ্যার ডিগ্রি ছাত্ররূপে তিনি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯০৭ সনে তিনি প্রথম কৃষিবিভাগের চাকুরি গ্রহণ করেন। তারপর ক্রমে নিজের ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা ও কৃতিত্বের বলে কৃষিবিভাগের উচ্চতম পদে আরূঢ় হন। কেহ যদি তিনি সরকারী চাকুরি করিয়া নিজের ধনমান বৃদ্ধি করিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহার কথা স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইত না। যেমন আজ বহু বহু বাঙ্গালী আমলারা ও বিদ্যাবত্তার বলে উচ্চপদ আরূঢ় করিয়া নিজের পরিবারের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের মন হইতে কোন বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। রাজেশ্বরবাবু সে শ্রেণীর সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন না। তাঁহার রাজসেবার অর্থ ছিল দেশসেবা। সরকারী চাকুরী করিয়া কি ভাবে দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করা যায়—রাজসেবা ও দেশসেবার যে বিরোধ নাই, রাজেশ্বরবাবু সারা জীবনের সাধনায় তাহার আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তিনি দেশের কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য কি কি কার্য করিয়া গিয়াছেন তাহাই এখানে উল্লেখ করিব।

কৃষির উন্নতিসাধনের জন্য তিনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার সাহিত্য ভাণ্ডারে এইগুলি অমূল্য সম্পদ। সবগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। কৃষি-বিজ্ঞান ১ম খণ্ড কৃষির মূলনীতি, কৃষি-বিজ্ঞান ২য় খণ্ড—। ফসল সম্পদ ও ফল। নামক গ্রন্থখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছে। কৃষি-বিজ্ঞান ৪র্থ খণ্ড—। খোপালন। গ্রন্থখানিও সত্বর প্রকাশিত হইবে। খোপালন পুস্তকখানিতে খোপ্রজনন ও খোপালের উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। খোপালন কৃষিরই অঙ্গ। এই গ্রন্থগুলিতে কৃষিবিদ্যার সারতত্ত্ব যেমন উপনিবদ্ধ আছে, তেমনি সেই তত্ত্ব কতটা একেলের পক্ষে উপযোগী তাহারও আলোচনা আছে। বক্তব্যবার ইহার পূর্বে এইরূপ পুস্তক আর রচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। অতএব ইহা আমাদের শিক্ষাবিভাগের একটি অভাব পূরণ করিয়াছে।

তিনি এই গ্রন্থগুলিতে যে সকল কথা বলিয়াছেন কৃষিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রগতির ফলেও সেগুলির মূল্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইংরাজিশিক্ষিত নগরবাসীদের সঙ্গে কৃষির কোন যোগ নাই—পল্লী গৃহস্থদের সঙ্গেই কৃষির যোগাযোগ। সেজন্য লেখক বইগুলি ইংরাজিতে না লিখিয়া বাংলায় লিখিয়াছেন। ইহাতে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতিরও একটি প্রধান অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

কেবল কৃষিবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই এই বইগুলিতে আলোচিত হয় নাই—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সেগুলির প্রয়োগেরও নির্দেশ ও উপদেশ এইগুলিতে উপনিবদ্ধ আছে। এমন ভঙ্গীতে ও ভাষায় গ্রন্থগুলি রচিত যে অল্পশিক্ষিত কৃষিজীবীদেরও বুঝিতে অসুবিধা হয় না। প্রাচীন পদ্ধতি হইতে ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হইয়া কেমন করিয়া কৃষিকার্য বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে এই গ্রন্থগুলিতে সে কথাও আলোচিত হইয়াছে বেশ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে।

আকস্মিক মৃত্যুর জন্য রাজেশ্বরবাবু তাঁহার অন্য সব বইগুলি এবং অনেক অন্যান্য রচনা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতী পুত্র স্বর্গত রমেশচন্দ্র সেগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র নিজে সুলেখক ছিলেন এবং কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান তিনি পিতার সাহচর্যে ও উপদেশে অর্জন করিয়াছিলেন। পিতার মূল্যবান পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন; তাঁহারই পরিশ্রমের ফলে রাজেশ্বরবাবুর পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া সকল বিদ্যার শিক্ষা দেওয়ার কথা উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলির বাংলায় শিক্ষাদানে অসুবিধা আছে বলিয়া কোন কোন শিক্ষাব্রতী মনে করেন, কৃষিবিজ্ঞানের পক্ষে সে অসুবিধা রাজেশ্বরবাবু দূর করিয়াছেন। কেবল তিনি প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলি রচনা করিয়া যান নাই, কৃষিবিজ্ঞানের পুস্তক রচনার আদর্শ ও ধারারও তিনি প্রবর্তন করিয়াছেন এবং কৃষিবিজ্ঞান রচনার ভাষার ও পারিভাষিক শব্দগুলিরও তিনি প্রবর্তক। তাঁহার পুস্তক প্রকাশের পর এখন এ বিষয়ে পুস্তক রচনা অনেক সহজ হইয়াছে।

রাজেশ্বরবাবু কেবল গ্রন্থ রচনার দ্বারাই কৃষির উন্নতির চেষ্টা করেন নাই তিনি কৃষিবিভাগের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বহুবিধ নূতন অনুপাতি, ফসল বাড়াইবার জন্য, কৃষির উৎপন্নের সাধনের জন্য ও কৃষিকার্যে ব্যয়সংক্ষেপের জন্য নানাবিধ কৌশল ও উপায়েরও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি এক প্রকারের উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন—এই লাঙ্গলে চাষ করায় চাষীদের ব্যয় অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এই লাঙ্গলের

নাম "রাজেশ্বর তন্ত"। এই ব্যাপারে তিনি সরকারী সাহায্য পান নাই তিনি নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় এই লাঙ্গল চালাইতে পারিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চাকরির অঙ্গীভূত কাজ ছিল না। কৃষকদের সুবিধার জন্যই তিনি এই কাজে ব্রতী হন।

রাজেশ্বরবাবু কৃষিবিদ্যা সম্বন্ধে আজীবন গবেষণা করিয়াছেন। এই গবেষণার ফল তিনি চাষীদের মধ্যে প্রচারের জন্য প্রাণপাত শ্রম স্বীকারও করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলায় আদর্শ সরকারী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও সমস্ত দেশে সুপরিণত বীজরক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে চাষীদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ জানিয়া তাঁহাদের উপদেশ দিতেন এবং সে উপদেশে তাহারা লাভবান হইত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তিনি জানিতেন দেশের জমিদারদের সহায়তা ছাড়া প্রজাদের কৃষিকার্য্যকে প্রগতির পথে লইয়া যাওয়া যায় না। চাষীরা চিরপ্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ করিয়া যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট। নূতন কোন পদ্ধতি তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে চায় না। সেজন্য তিনি উন্নত পদ্ধতির ছোট ছোট আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠায় জমিদারদের উৎসাহিত করিতেন। আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে আশাতীত সুফল প্রসব দেখিলে সাধারণ প্রজাদের মনে দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর হইত। তাহারাও উন্নত পদ্ধতি অনুসরণে উৎসাহিত হইত।

প্রথম বিশ্বমহাসমরের সময় যখন পাটের দর খুব মন্দা, বিদেশে রপ্তানির সুযোগ বন্ধ, তখন কলে বোনা চটের থলি তৈরী হইত সবই যুদ্ধের জন্য সরকার করা হইত। এদেশে ব্যবহারের জন্য ছালা, চট ইত্যাদি পাওয়া যাইত না। তখন রাজেশ্বরবাবু পাটচাষীদের পাট হইতে সুতা ও দড়ি পাকাইয়া, তাঁতের পরিকল্পিত তাঁতে চট বুনিতে এবং তাহা হইতে ছালা চট ইত্যাদি তৈরী করিতে উৎসাহিত করেন। এজন্য পাটচাষীদের সরকারী সহায়তারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এইভাবে চাষের উন্নতির জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেবল পাট শিল্প নয়, অন্যান্য কুটীর-শিল্পের প্রচলনের ও উন্নতির জন্যও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এদেশে কাকিয়া বোম্বাই পাট, চিনসুরা গ্রীণ পাট প্রভৃতির চাষের প্রচলন হইয়াছিল।

আলুর বীজের অভাবে আমাদের দেশে বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষে কাহারও উৎসাহ ছিল না। তিনি দার্জ্জিলিঙের আলুচাষী ও ব্যবসায়ী-দের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া হাজার হাজার মণ আলুর বীজ অল্প ব্যয়ে আনাইয়া দেন। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গে আলুর চাষের বিস্তার হয়।

কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে ছোট ছোট পুস্তিকা ও ইস্তাহার ছাপিয়া তিনি চাষীদের জন্য বিলি করেন। সরকারী কৃষিবিভাগ হইতে 'কৃষিকথা' নামে একখানি মাসিকপত্র তাঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে প্রকাশিত হয় এবং তিনি নিজে ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। কৃষির উন্নতির জন্য এবং দেশের কৃষির অবস্থা লইয়া আলোচনার জন্য তিনি কৃষি-সম্মেলনের প্রবর্ত্তন করেন। এই সকল সম্মেলনে চাষীরা, সরকারী কর্ম্মচারীরা এবং শিক্ষিত জনসাধারণ যোগদান করিতেন।

দেশের সর্ব্বত্রে তিনি কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এই প্রদর্শনীগুলি কেবল কর্তৃপক্ষের ও বিশেষজ্ঞ কৃষিতত্ত্ববিদের প্রশংসা অর্জ্জন করে নাই, দেশের চাষীরাও ইহাতে উপকৃত হইয়াছে। উৎকৃষ্টতর ফলফসল উৎপাদনের জন্য ইহাতে চাষীদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল।

গবাদি পশুর উন্নতির জন্য তিনি সুব্যবস্থার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি পশুধিগণনা (Cattle Census) যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করেন। তিনি দেশের কৃষিব্যবস্থা একটা আকস্মিক বিপ্লব আনিবার চেষ্টা করেন নাই। বিদেশীয় কৃষিপদ্ধতি রাতারাতি এদেশে চালাইবার চেষ্টাও করেন নাই। সহসাগতির উন্নততর বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এদেশে চালানো সম্ভব নয় বলিয়া কোন দুরভিসন্ধি সাধিত হইতে পারে না, এই মত পোষণ করিয়া তিনি অন্যান্য কৃষিতত্ত্ববিদ্দের মত নিষ্ক্রিয় থাকেন নাই। যে পদ্ধতিতে চিরকাল এদেশে চাষীরা চাষ আবাদ

কৃষিতত্ত্ববিদ্ রাজেশ্বর দাশগুপ্ত

করিয়া থাকে, সেই পদ্ধতির মূল কাঠামোটা বজায় রাখিয়া তিনি যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিনা আয়াসে বিনা খরচে যে সকল সার গ্রামে পাওয়া যায় সে সকল সারের, বৃদ্ধি, রক্ষণ ও সঞ্চয়ের জন্য তিনি গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করিতেন। বৈঞ্চা গাছ জমিতে লাগাইয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য ও পচা পুকুরের পাঁক প্রচুর পরিমাণে জমিতে দেওয়ার জন্যও তিনি উৎসাহিত করিতেন। শেষোক্ত ব্যবস্থায় সেঁচের পুকুরগুলি পরিষ্কৃত হইত এবং সেগুলিতে শীতকালেও জল থাকিত। তিনি জানিতেন যে কলের লাঙ্গল ব্যবহারের সংগতি এদেশের কৃষকের নাই। তাহা ছাড়া, যেভাবে এদেশের মাঠে জমি ভাগ করা ও ছড়ানো, তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ লাঙ্গল ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সেজন্য প্রচলিত লাঙ্গলেরই তিনি যতদূর সম্ভব উন্নতি সাধন করেন।

আমি পূর্ব্বে তাঁহার রচিত যে পুস্তকগুলির কথা বলিয়াছি সেগুলিতে কৃষির মূলতত্ত্ব যেমন আলোচিত হইয়াছে, তেমনি খুব সহজভাবে সেই তত্ত্ব কয়টী কাজে পরিণত হইতে পারে সে কথাও বিস্তৃত ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা পরিবর্ত্তন, জলবায়ু, ভূমিসংস্থান, ভূমিস্তর, বাঙ্গালীর আর্থিক অবস্থা, সরকারের মনোভাব ইত্যাদি নানা দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাংলাদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া গ্রন্থগুলি রচিত। সেক্রেটারিয়েট বোর্ড অব এডুকেশন কৃষিবিষয়ক অন্যতম পাঠ্যে বিশেষ ঘুরিয়া নূতন পাঠ্যপুস্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে। ঐ পুস্তকগুলি তাহাতে বিশেষ কাজে লাগিবে আশা করা যায়। কৃষিবিদ্যার ছাত্রেরা এইগুলি পাঠ্য হইতে পারিবে। ভবিষ্যতে যাঁহারা বাংলাদেশের কৃষিবিদ্যার পুস্তক রচনা করিবেন, রায়েন্দ্রবাবু তাঁহাদের গুরুস্থানীয়। বর্ত্তমানযুগে যাহারা চাষী, কেবল তাহাদেরই চাষ উপজীবিকা হইয়া থাকিবে না। যে কোন ব্যক্তি চাষকে উপজীবিকা করিতে পারে। দেশের বহু শিক্ষিত লোককেও বাধ্য হইয়া চাষে নামিতে হইবে। কিন্তু চাষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান না থাকিলে চাষের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না, চাষে প্রবৃত্তিও হয় না।

রায়েন্দ্রবাবুর পুস্তকগুলি সকল শিক্ষিত লোকেরই পড়িয়া দেখা উচিত। তাহাতে দুঃখের বিষয় কোন লোকসান নাই। এইগুলি হইতে চাষ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জ্জনে অনেকের চাষে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এবং তাহাই উপজীবিকা হইয়া উঠিতে পারে। কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া বিদেশে কোন চাকরি করিলে চাকরির চেয়ে চাষ ভাল, বিশেষতঃ অল্পদিনে আমাদের যেরূপ মূল্য দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে সকলেরই এদিকে অনুধাবিত মন হওয়া উচিত।

বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের দিনে শিক্ষিত লোকদের চাষে মন দিলে দেশে অন্নসংস্থান অনেকটা বাড়িবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়। বাঙ্গালীর প্রধান পুঁজি চাষ, ব্যবসায় বাঙ্গালীর ধাতে সয় না। চাকরী দিন দিন দুর্লভ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় চাকুরিজীবদের পিতামহ কিংবা প্রপিতামহ যুনিয়ন কৃষাণ রাখিয়া চাষই করিতেন। কৃষির প্রতি অনুরাগ বাঙ্গালী মাত্রেরই রক্তে প্রচ্ছন্ন আছে। তাই বলি, শিক্ষিত লোকদেরও রায়েন্দ্রবাবুর বইগুলি পড়িয়া দেখা উচিত। ঐ সকল বই পড়িয়া তাহাদের কাহারও চাষের দিকে মন গেলে তাহাতে তাহাদের এবং দেশের মঙ্গলই হইবে। তাহা ছাড়া বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে বা উঠানে, গোলা ছাদের টবে ফুল, আনাজ ইত্যাদি উৎপাদন করিতে চান তাঁহারাও উপকৃত হইবেন।

রায়েন্দ্রবাবুর অকাল মৃত্যুতে বাংলা দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। রায়েন্দ্রবাবু আজ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার বয়স হইত ৭৩। তিয়াত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বহু বাঙ্গালী শিক্ষিত লোক বাঁচিয়া আছেন। শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, কর্ম্মঠ থাকিয়া আপন আপন ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করিতেছেন। আজ এই অন্নাভাবের দিনে, Grow more food অভিযানের দিনে, এই ঊষান্ত সময়ের দিনে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বাংলার স্বাধীন সরকার তাঁহার কাছে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিতে পারিতেন। সরকার সাহায্য না চাহিলেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতে পারিতেন। কারণ তাঁহার জীবনের ব্রতই ছিল দেশবাসীর কল্যাণসাধন, বিপন্নের পরিত্রাণ, অসহায়কে আশ্রয়দান, দেশে শিক্ষাসংস্কৃতির প্রচার এবং জাতির সম্পদ বর্দ্ধন। আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে তাঁহার মতন দেশশ্রেষ্ঠী মহাপুরুষকে হারাই। তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রথম অবস্থাতেই হারাইয়াছি। তাঁহার রচিত সারগর্ভ পুস্তকগুলি বর্ত্তমান আছে, তাঁহার আদর্শ এখনো উজ্জ্বল হইয়া আছে, তাঁহার অবদান দেশের কৃষি-বিভাগে অঙ্গীভূত হইয়া আছে। আমরা দেশের উৎসাহী যুবকবৃন্দকে তাঁহার পথ, মত, ব্রত ও আদর্শকে অনুসরণ করিতে আহ্বান করি।

গান

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার হাত ছিলো
আমার হাতে।
একই স্বপন দুটী
নয়ন পাতে।
তখন মধুমাস,
বাতাসে ফুলবাস,
ডাকিতেছিল পাখী
তরু-শাখাতে।

কোথায় তুমি আজি ?
পাইনে দেখা !
আঁধার ঘরে আমি
কাঁদি যে একা !
মেঘেরা গরজায়,
তটিনী কেঁদে যায়,
ঝরিছে বারিধারা
শ্রাবণ রাতে।

অভাবনীয়

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

আমাদের জীবনের এক একটা অধ্যায় যেমন হঠাৎ আরম্ভ হয় তেমনি হঠাৎ শেষ হয়ে যায়। স্বচ্ছ আকাশ ও সোনার ধানের পটভূমিকায় আশ্বিনের ছুটির সানাই আগমনীর যে আনন্দ জাগায় প্রখর পৌষের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের বিদায়-ব্যথায় তা বিলীন হয়ে যায়। বর্ষার মিলন-ঘন উচ্ছ্বাসে যে কাব্যের সূচনা হয় বসন্তের নিঃসঙ্গ নিশ্বাসে তার সমাপ্তি ঘটে। কেন এমন হয় এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিচার বুদ্ধির বাইরে। জীবন প্রবাহ এমনিভাবেই চলে। আমাদের অন্তরের নিভৃত অন্তরীক্ষে কত জ্যোতিষ্কই না আনাগোনা করে। কোথায় তাদের উদয়াচল, আর কোথায় বা অস্তাচল কিছুই জানিনে। তারা কেন আসে আর কেনই বা চলে যায় তাও বুঝিনে। তবে এটুকু স্বীকার না করে উপায় নেই যে অন্তর পুলকিত আলোকিত বিকশিত হয়। আমার জীবনের এক অখ্যাত অধ্যায়ে এমনি একটি জ্যোতিষ্ক বিচিত্র বর্ণের রেখাপাত করেছিল। আজ বর্ষা-মুখর রাতে সেই কাহিনীই লিখতে বসেছি।

বিশ বছর আগেকার কথা। সবে এম, এ পাস করেছি। কলেজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত পাঠাই আর ছাত্র ছাত্রী পড়াই। মফঃস্বল শহরের শ্লথ মন্থর জীবন। মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যের আয়োজন করে 'আলাপনী'। সেদিন 'আলাপনী'র বসন্তোৎসব। দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দিনে ফাগের ছড়াছড়ি, রাত্রে আলোর প্লাবন। একটি মেয়ে রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করলে। মেয়েটির নাম রত্না। রত্না কলকাতার মেয়ে। ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন থেকে বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস ক'রে আই, এ পড়ছিল। হঠাৎ পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পড়াশুনা ছেড়ে মামার বাড়ী চলে এসেছে। এখন মামাই তার অভিভাবক। তিনি তার অপূর্ব কণ্ঠ শুনে সংগীত চর্চার ব্যবস্থা করেছেন এবং স্থির হয়েছে সে সুবিধামতো প্রাইভেটে আই, এ পরীক্ষা দেবে। রত্নার মামা নীলরতনবাবুর সংগে আলাপ হল এবং তাঁর কাছেই পেলাম এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

নীলরতনবাবু ছিলেন পুরুলিয়ার কোন এক স্কুলের হেড মাষ্টার। সম্প্রতি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। লোকটি সাহিত্যরসিক ও সংগীতানুরাগী। তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই গানের জলসা হয়। 'আলাপনী'র সভ্য হিসাবে আমিও সেখানে যাবার সুযোগ পাই। পরের কাছে নিজেকে উন্মুক্ত ক'রে দেওয়াতেই শিল্পীর আনন্দ—জীবনের ব্যাপ্তির মধ্যেই কবি, চিত্রী ও গায়কের সার্থকতা। তাই অল্প দিনের মধ্যেই নীলরতনবাবুর পরিবারের সংগে একটা সহজ আত্মীয়তা গড়ে উঠল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে নীলরতনবাবু বললেন - আপনার সাহায্য পেলে রত্না আই, এ, পরীক্ষাটা দিতে পারে। যদি অনুমতি দেন তো ও মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করবে। অবশ্য আপনার সুবিধা অনুযায়ী নির্দেশ দেবেন—সে বিষয়ে কোন সংকোচ বোধ করবেন না।

তরুণ বয়স। ছেলেবেলা থেকে গান শুনতে ভালো-বাসি। তাছাড়া পড়ানোই আমার পেশা। কাজেই আমার 'না' বলার উপায় ছিল না। সেই থেকে রত্না দুচার দিন অন্তর আমাদের বাড়ী আসা যাওয়া আরম্ভ করলে।

রত্নার বৈশিষ্ট্য গুণে,রূপে নয়। বর্ণ শ্যাম, মুখশ্রী সাধারণ, স্বভাব ধীর গম্ভীর। দেখে মনে হয় ছেলে মানুষ, কিন্তু লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় তার মনের বয়স দেহের বয়সকে অতিক্রম করে গিয়েছে। কম কথা বলে কিন্তু তাহার মৌন ভাবের পূর্ণতাই প্রমাণ করে। তার বাইরের প্রকাশ যে পরিমাণে কম, অন্তরের অনুভূতি সেই পরিমাণে বেশী। তাই গানে ও লেখাপড়ায় সে সাধারণের অনেক উপরে। রত্না আসে, জিজ্ঞাসা করে, আলোচনা করে, লিখে নেয়, লেখা দেখায়, চলে যায়। নিত্য নৈমিত্তিক নিয়মের নিগড়ে তার

জীবনের ছন্দটি বাঁধা। তার অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা দেখে মনে হয় সে যেন পরীক্ষারই প্রতিমূর্ত্তি। একদিন কি একটা কারণে আমাকে দুপুরে অনেকক্ষণ বাইরে থাকতে হয়েছিল। বাড়ী ফিরে দেখি রত্না একখানা পাঠ্য পুস্তক খুলে পড়ছে। লজ্জিত হয়ে বললাম—পরের বাড়ীতে তোমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রাখার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। হঠাৎ এমন একটা জরুরী কাজে পড়ে গেলাম যে তোমাকে খবর দেবার সময় হল না।

'পরের বাড়ী' কথাটার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ক'রে রত্না আমার পানে চেয়ে রইল—চোখে পলক নেই, মুখে কথা নেই। সেই অদ্ভুত ভাবান্তরের অর্থ খুঁজে পেলাম না। আমি কি তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেছি? তাকে অপমান করেছি? আঘাত দিয়েছি? ভুল বুঝেছি? মনে নানা প্রশ্ন উঠতে লাগল। কি এক দুর্জ্ঞেয় কারণে আমাদের যোগসূত্রটা ছিঁড়ে গেল! কি এক দুষ্ট ব্যবধান আমাদের পৃথক ক'রে দিল! নিতান্ত বেসুরো ভাবেই সেদিনের পড়াশুনার পালা শেষ হল।

তারপর রত্নার মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা গেল এক অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন। হাসি ভরা মুখ, চকিত দৃষ্টি, চঞ্চল চলাফেরা, অনর্গল কথা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ প্রসঙ্গের অবতারণা—আধুনিক বাংলা সাহিত্য, বাংলা সবাক্ চিত্রের অবস্থা, ছাত্র আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর স্থান, সহ শিক্ষার দোষগুণ—আরও কত কি। সব কিছুর মধ্যেই দেখতে পেলাম রত্নার নূতন রূপ। এ যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ! এযে মহাসাগরের গানে প্রাণ জেগে ওঠা! ক্রমে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে ও সংক্ষিপ্ত অনুশীলনে দেখা দিল শৈথিল্য; কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা আর রইল না। রত্না জগৎকে জানতে চায়, জীবনকে বুঝতে চায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের আদর্শ গড়তে চায়। রত্নার রূপান্তর স্বাভাবিক পরিমণ্ডল পেরিয়ে চলে গতিতে। ঋতুর দ্রুত-গতিতে। ঋতুর পর্য্যায় আসে যায়। বসন্তমাসের উন্মাদনার পর গ্রীষ্মের গ্লানি দুঃসহ হলেও বিচিত্রতা আনে। মানুষের মনের ঋতু পরিবর্ত্তনেরও হয়তো তেমনি প্রয়োজনীয়তা আছে। সাধনার জ্যোতির্ময় জীবনের পথ মুক্ত মনের তীর্থ-যাত্রা চলকা চলেও নূতন অনুভূতি জাগায়। নীলরতনবাবুর সংগে দেখা হয়। তিনি বাস্তবনমস্কারে কৃতজ্ঞতা জানান। রত্নার সম্বন্ধে তিনি অনেকখানি আশা রাখেন এবং গৌরব বোধ করেন। তাঁর কাছে রত্না যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। আদর্শবাদীরা এমনিই অন্ধ হয়।

রত্না সহসা আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে। 'আলাপনী'র আসরেও তাকে দেখা যায় না। ব্যাপার কি! হয়তো সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হয়তো আরম্ভ হয়েছে অধিকন্তু অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া। মানুষ আপনাকে কতটুকুই বা জানে! আজ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের ভরে যে কাজ করে, কাল শান্ত অবসরে তার জন্য পরিতাপ করে। আজ সম্মুখের আহ্বানে স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে চলে, কাল পশ্চাতের টানে হতবুদ্ধির মতো থমকে দাঁড়ায়। মানুষের বর্ত্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি। আমাদের ভিতর অজানার আকর্ষণও আছে। সংস্কারের তিরস্কারও আছে। দ্বিধাতে ভিজতে ভিজতে নীলরতনবাবুর বাড়ী খবর নিতে গেলাম। উদ্বেগকাতর মুখে তিনি বললেন—রত্না অসুস্থ। ডাক্তারের মতে শারীরিক পীড়া অপেক্ষা মানসিক উত্তেজনাই বেশী। পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।

রত্নাকে দেখলাম শীতের দিনের শীর্ণ নদীর মতো—না আছে তরঙ্গলীলা, না আছে কলধ্বনি। তার পাণ্ডুর মুখ, উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক তনুর সম্মুখে নির্বাক্ হয়ে বসে রইলাম। মৌনীতে মৌনীতে ভাব বিনিময় হয় চোখের ভাষায়। রত্না বাষ্পাকুলনেত্রে ও মৃদুকণ্ঠে বললে—আজ থাক। পরে আপনাকে সব কথা বলব।

রত্নার 'সবকথা' বলা হল না। সপ্তাহ যেতে না যেতেই সে চলে গেল মধুপুরে। তার সংগে সেই আমার শেষ দেখা।

রত্না আমার জীবনপথে এসেছিল সুদূরের সুগন্ধ হাওয়ার মতো। তার সৌরভময় অস্তিত্ব অনুভব করে-ছিলাম কিন্তু সে ধরাছোঁয়া দেয়নি। সে অকস্মাৎ অদৃশ্য হল দুর্বোধ রহস্যের মতো। আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম :—

"বিচলিত কেন মাধবী শাখা,
মঞ্জরী কাঁপে থর থর।
কোন্ কথা তার পাতায় ঢাকা
চুপি চুপি করে মরমর।"

দশ বছর পরের কথা। কর্মস্রোতে বাংলার নানা শহরে ভেসে বেড়িয়েছি। শেষে ভাগ্য-দেবতা সুপ্রসন্ন

হয়ে নিয়ে এসেছেন দেশে পাকা চাকরিতে। সংসারে প্রবেশ করেছি। গৃহিণী ঘরে এসে জেঁকে বসেছেন। এমন সময় একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে রত্নার একখানা চিঠি পেলাম দিল্লি ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকাবিদ্যালয় থেকে। চিঠিতে লেখাছিল :—

• • •

এতদিন পরে আমার চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই খুব বিস্মিত হবেন। জীবনে অভাবনীয়েরও একটা স্থান নেই কি? অনেক কষ্টে জেনেছি আপনি এখন স্বদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে লিখতে বসেছি।

যে বছর আপনাদের কাছ থেকে চলে আসি সে বছর আমার আই-এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পরের বছর প্রাইভেটে পাস করি কলকাতায় আমার এক মাসীমার বাড়ী থেকে। দুবছরে যথা সময়ে বি-এটাও পাস করি। তার পর কিছু দিন ছদ্মনামে রেডিওতে গান করতাম আর সংবাদপত্রে 'বৈতালিক'এর সাপ্তাহিক আলোচনা পড়বার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। নিউ থিয়েটার্সের সংগে সংশ্লিষ্ট এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় আমাকে সিনেমায় টানবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রথমে প্রলুব্ধ হলেও অনেক চিন্তার পর শেষ পর্যন্ত আত্মীয়টিকে নিরাশ করলাম। শুধু তাই নয়, রেডিওর সংস্রবও ত্যাগ না ক'রে পারলাম না। জানিনা কোথা থেকে একটা উচ্চতর আদর্শের প্রেরণা এল। রেডিও সিনেমায় পয়সা ও প্রচার দুইই হয় স্বীকার করি। কিন্তু ব্যাঙ্কে জমার অঙ্ক বাড়ানো আর সকাল সন্ধ্যায় তরুণ তরুণীর আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়াই কি খুব বড় জিনিস? মঞ্চ ও চিত্রের প্রতিষ্ঠা তো ঢেউয়ের মতো—তাতে স্থায়িত্ব কোথায়? তার আনন্দ তো ফুলিঙ্গের আনন্দ। আজকের দিনে আমাদের দেশের শিক্ষিতা মেয়েদের কঠোরতর কর্তব্য ও গুরুতর দায়িত্ব নেই কি? তাই দীর্ঘ বিবেচনার পর শিক্ষাব্রতীর নিরাভরণ জীবনকে বরণ করাই স্থির ক'রে ফেললাম। গত বছর বি-টি পাস ক'রে এই শিক্ষায়তনে যোগদান করেছি। ইচ্ছা আছে কিছুদিন ছুটি নিয়ে ওয়ার্ধার নূতন শিক্ষা পরিকল্পনার সংগে সাক্ষাৎ পরিচয় ক'রে আসব।

যে কথা আপনাকে আজও বলা হয় নি—জানিনা তার জন্য ঔৎসুক্য আপনার এখনও আছে কিনা। হয় তো সে দিনের স্মৃতি ঢাকা পড়েছে অনিত্যের আবর্জনার স্তূপে। সাত বছর আগে এক সিক্ত শ্রাবণ সন্ধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম আমি তা ভুলতে পারিনি। আজ সেটা পালন করতে চলেছি নইলে যে অপরাধিনী থেকে যাব। আমার মামীমার বিদ্যার দৌড় বেশী না হলেও কলকাতার শিক্ষিত বংশের মেয়ে ব'লে অহংকার ছিল যথেষ্ট। মামাবাবু মাটির মানুষ—তাঁর কথার উপর কথা কইতেন না। গৃহের শান্তিভঙ্গের ভয়ে মামীমার ঘাঁটারি নীরবে সহ্য ক'রে যেতেন। আপনার সংস্পর্শে আমার যে পরিবর্তন ঘটেছিল সেটা মামীমার ভালো লাগেনি। যে কথা একদিন তিনি স্পষ্ট ক'রে আমাকে বললেন। আমি অত্যন্ত আঘাত পেলাম এবং বাড়ীর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিলাম। পড়াশুনা, গানবাজনা সব গেল থেমে। মামাবাবুর দৃষ্টিতে সহানুভূতি এবং ব্যবহারে বেদনা ফুটে উঠত, কিন্তু মামীমার অন্যায়ের মৃদু প্রতিবাদ করার সাহসও তাঁর দেখা গেলনা। সন্দেহের বিষাক্ত বাতাসে যে অন্তর্দাহ রেখা দিল তাতে শরীর গেল ভেঙে, পালিয়ে এলাম পিসীমার বাড়ী মধুপুরে।

আমি আপনাকে ভুল বুঝিনি এবং বিশ্বাস করি আপনিও আমাকে ভুল বোঝেননি। আপনার সান্নিধ্যে পেয়েছি অনাবিল প্রীতির পরশ। আপনাকে দিয়েছি পেলব প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের সম্পর্কে ছিল না মাটির মালিন্য। ছিল স্বর্গের সুষমা। সে সম্পর্কের গৌরব আজও অমলিন রয়েছে—হয় তো চিরদিন থাকবে। আমি আপনার ব্রত নিয়েছি—আমার পথ গিয়েছে আপনার পথে মিশে। আপনার সংগে দেখা হলে খুবই সুখী হব। পূজার ছুটিতে একবার এদিকে আসবেন কি? জানিনা আজকের 'আপনি' সেদিনের 'আপনি' আছেন কিনা। মানুষের খেয়ালী মন জীবনের গতিকে ছন্দবহুল না ক'রে পারে না। সেদিন আপনাকে যতটুকু জানতাম তারই জোরে আজ এতখানি দাবি ক'রে ফেললাম। যদি অন্যায় হয়ে থাকে ক্ষমা করবেন।

• • •

রত্নার রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর একে একে কেটে গিয়েছে আরও তেরোটি বছর। বৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কত জনপদ, অস্তমিত হয়েছে কত শুকতারা। খিড়কি বাগানের আমগাছটা তেমন বড় ফল দেয় না। উত্তরের

ফাঁকা মাঠে গড়ে উঠেছে উদ্‌বাস্তু উপনিবেশ। বাবার আমলের কাকাতুয়াটা পরলোকে। পরিবারের এত পুরানো বন্ধু আর কে আছে? জলাঙ্গীতে বন্যা আসে না। তার নিঃস্ব রূপ দেখে কান্না পায়! মরা নদীর কি মাধুরী আছে? যৌবনের কুসুম কানন পিছনে ফেলে প্রৌঢ়ত্বের বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছি। ছেলেরা বড় হয়েছে। সংসারে নিত্য নূতন সমস্যা। বাড়ীর প্লান নিয়ে এঞ্জিনিয়ার কনট্র্যাক্টরের অফিসে ছুটাছুটি ক'রেছি। অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি। যারা ছিল হৃদয়ের কাছাকাছি, তারা কে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে বিস্মরণের বিজন বনে। এ বয়সে সব মানুষই বোধ হয় এমনই হয়। ক-দিন ধ'রে ঘন বরষা চলেছে। বাইরে বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা, অন্তরে অহেতুক বেদনার সুর। অন্যমনস্কভাবে পড়ার ঘরের আলমারির বইগুলো নাড়াচাড়া করছি। একখানা বইয়ের ভিতর পাওয়া গেল রত্নার দিল্লি থেকে লেখা সেই চিঠি। রত্নার চিঠির উত্তর দিয়েছিলাম, কিন্তু তার অনুরোধ রাখতে পারিনি। নিমেষে টুটে গেল বিশ বছরের ব্যবধান—মূর্ত হয়ে উঠল রত্নার সংগে শেষ দেখার দৃশ্য। সেদিন ছিল সজল শ্রাবণ সন্ধ্যা। আজও তাই। অলভরা আকাশের পানে চেয়ে আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না। আকাশের রঙ্গশালায় মেঘ, আর পৃথিবীর রঙ্গশালায় মানুষ—এদের কিছু ঠিক ঠিকানা নেই। এদের আবির্ভাব ও তিরোভাব দুইই অভাবনীয়। রত্না এখন কোথায় আছে—কেমন আছে—কোন খবরই রাখিনে। হয়তো তার সংগে আমার দেখা হবে—হয়তো হবে না। আজ শুধু তার উদ্দেশে 'মহুয়া'র কয়েকটি ছত্র স্মরণ ক'রে আমার আখ্যায়িকা শেষ করছি :—

"তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখি জলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
র'বে তব বিস্মৃতি তলে॥"

ভূদান-যজ্ঞ

শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

ভূদান যজ্ঞ কি? সোজা ও সরল কথায় যে ভূমিহীন দরিদ্র—যে চাষ জানে ও চাষ করতে চায় কিন্তু অন্যের জমি-চাষ বা শ্রমিক বৃত্তি ছাড়া যার অন্য কোন জীবিকা নাই—তার জন্য ভূমিদান। ঈশ্বরের দান বায়ু, আলোক ও জল যেমন সকলে সমান ভাবে ভোগ করতে পারে—তাতে যেমন সকলের সমান অধিকার, তেমনি ঈশ্বরের দান ভূমিতেও সকলের সমান অধিকার। কিন্তু সমাজের বহুদিনব্যাপী অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে সেই ভূমি ভাগ হয়ে গিয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। একজনের আছে—অন্যজনের নাই। একজনের আছে অত্যধিক—অন্যজনের প্রায়ে নিতান্ত কম। তাই বর্তমানে ভারতের সব চাইতে বড় ও জরুরী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—ভূমি সমস্যা। এই সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের উপর ভারতের স্থায়ী কল্যাণ নির্ভর করছে। ভারতের কর্ষণযোগ্য ৩০ কোটি একর ভূমির মধ্যে এক ষষ্ঠাংশ ৫ কোটি একর ভূমি যদি ভূমির বর্তমান মালিকদের হাত থেকে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকের হাতে এসে যায় তবেই এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। ভূমিই উৎপাদনের মৌলিক উপাদান। খাদ্য, পরিধেয়, আবাসগৃহ নির্মাণের দারুণীয় দ্রব্যাদি মানুষের অন্তরে স্বাভাবিক ভূমি-ক্ষুধা। ভূদান-যজ্ঞ শান্তি ও প্রেমের পথে এই ভূমি-ক্ষুধা তৃপ্ত করবার প্রচেষ্টা। ভূদান যজ্ঞ মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ভগবানের নিকট আবেদন—"তুমি জাগ্রত হও। ভূমিতে সকলের সমান অধিকার। মানুষের হৃত অধিকার তাকে ফিরিয়ে দাও। ভূমিহীন দরিদ্রের জন্য ভূমি দাও।" এই আবেদনে কি মানুষ সাড়া দেবে? এত বড় বিরাট সমস্যা কি এইভাবে সমাধান করা সম্ভব? ভূদান যজ্ঞের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই আশঙ্কা দূর হবে আশা করি।

ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনের প্রষ্টা আচার্য বিনোবা ভাবে। তিনি মহাত্মা গান্ধীর আশ্রমে থাকতেন। অতঃপর ওয়ার্ধায় ও পরে ওয়ার্ধার নিকটে পাওনার গ্রামে তাঁর পরমধাম আশ্রমে থাকতেন। গত মহাযুদ্ধের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে প্রথম সত্যাগ্রহী মনোনীত করেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি অহিংসা প্রয়োগের পথ অন্বেষণ করছিলেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে হায়দ্রাবাদের নিকটস্থ শিবরাম-পল্লীতে সর্বোদয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন ভূমিসমস্যার ব্যাপারে হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চল হিংসার লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এই নিয়ে তিনি অনুক্ষণ ভাবছিলেন। সম্মেলন অন্তে তিনি তেলেঙ্গানা পরিভ্রমণ করছিলেন। সেদিন ১৮ই এপ্রিল। পচমপল্লী নামক এক গ্রামের পরিজনেরা তাঁর কাছে জমি চাইল। আর তিনি সেই হরিজনদের জন্য গ্রামবাসীদের কাছে জমি চাইলেন। ৮০ একর জমির প্রয়োজন ছিল।

একজন গ্রামবাসী তাঁর কথা মেনে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একশত একর জমি দান করলেন। এই অপ্রত্যাশিত দানে তাঁর মনে ভূদান-যজ্ঞের কল্পনা উদয় হয়। তাঁর নিশ্চিত ধারণা হলো—ভগবান তাঁকে তেলেঙ্গানার ভূমি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তেলেঙ্গানা ভ্রমণে তিনি ভূদান যজ্ঞের প্রয়োগ করেন। দুমাসে যার হাজারে একর জমি তিনি পেলেন। তেলেঙ্গানার জমির মালিকেরা তৎপূর্বে হিংসাবিধ্বস্ত হয়েছিল। তাই সন্দেহের অবকাশ রইলো—অন্য স্থানে যেখানে তেলেঙ্গানার পটভূমিকা নাই সেখানে এইভাবে জমি পাওয়া যাবে কিনা। এ আশঙ্কা নিরসন করে অন্য প্রদেশে ভূদান যজ্ঞের পরীক্ষা করার আবশ্যকতা ছিল। সেই সুযোগও বিনোবাজী পেলেন। সে বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তাঁকে দিল্লী যেতে হয়েছিল। তিনি পদব্রজে চললেন—সেখানে পৌঁছতে দুমাস লাগলো। পথে ভূদান যজ্ঞের জন্য ভূমি চাইতে চাইতে গেলেন। এই দুমাসে ১৮ হাজার একর ভূমি পেলেন। তার পরে তিনি উত্তর প্রদেশের ব্যাপকক্ষেত্রে ভূদান যজ্ঞের সূত্রপাত করলেন। ১০ মাসে সেখানে তিনি প্রায় চার লক্ষ একর ভূমি পেলেন। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে যুক্তপ্রদেশের সেবাপুরী আশ্রমে অনুষ্ঠিত সর্বোদয় সম্মেলনে ভূদান যজ্ঞ আন্দোলনকে সারা ভারতব্যাপী করবার এবং প্রথম কিস্তি স্বরূপ দু বৎসরে ২৫ লক্ষ একর ভূমি সংগ্রহ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হলো। প্রতি প্রদেশে একটী করে ভূদান যজ্ঞ কমিটী গঠন করা হলো ও সকল প্রদেশেই ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন সুরু হলো। গত ১৪ই সেপ্টেম্বরে বিনোবাজী যুক্তপ্রদেশ হতে বিহারে প্রবেশ করেছেন। বিহারের ভূমি সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি বিহার ত্যাগ করবেন না—এই সঙ্কল্প তিনি নিয়েছেন। বিহারের চাণ্ডিলে এবৎসর সর্বোদয় সম্মেলন হলো। সেখানে এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়েছে যে, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে ৫ কোটি একর ভূমি সংগ্রহ করা হবে। এযাবৎ যুক্তপ্রদেশে পৌণে পাঁচ লক্ষ একর, বিহারে সাড়ে পাঁচ লক্ষ একর এবং অন্যান্য সকল প্রদেশে সওয়া একলক্ষ একর—একুনে সারা ভারতে সাড়ে এগার লক্ষ একর ভূমি সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া তিনখানি সমগ্র গ্রামও পাওয়া গিয়েছে, অর্থাৎ গ্রামের লোকেরা তাদের সমস্ত ভূমি ভূদান যজ্ঞে দান করেছেন—যুক্তপ্রদেশের মসরোটি, বিহারের সিয়াডিহি এবং উড়িষ্যার মানপুর। এই সন্ন্যাসী পরিব্রাজক পদব্রজেই যাবার ভ্রমণ করছেন—এযাবৎ পাঁচ হাজার মাইল অতিক্রম করেছেন।

ভূমি দান নূতন নয়। এতদিন লোকে ভূমিদান করে এসেছে ব্রাহ্মণকে, মন্দিরকে, মসজিদকে বা ধর্মস্থান প্রতিষ্ঠানে। উদ্দেশ্য—পুণ্য-সঞ্চয় বা সম্পত্তি সংরক্ষা। ভূমির স্বামিত্ব বিসর্জনের জন্য তথা ভূমিহীনের জন্য ভূমিদান জগতে এই প্রথম। এ দানের কল্পনা পরোপকার নয়—এ দানের কল্পনা—'দরিদ্রান ভর কৌন্তেয়' নীতি পালন নয়। এ দানের অর্থ—ভূমির সমবণ্টন। 'দানং সংবিভাগঃ' অর্থাৎ সম্যক বিভাজন (যুক্ত বণ্টন)। তাই ভূমিহীন দরিদ্রের অধিকারের দাবীতে এই দানের জন্য আবেদন।

অন্যের সুখ সম্পাদনের জন্য মানুষের মধ্যে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি বিদ্যমান। কিন্তু তার গণ্ডী সাধারণতঃ নিজের পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভূদান যজ্ঞের উদ্দেশ্য পরিবারের পরিধির ধারণাকে দূরসারিত করা—প্রেম ও ত্যাগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করা। গ্রামকে—সারা সমাজকে নিজের পরিবার রূপে গণ্য করতে হবে। ভূমিহীন দরিদ্রকে নিজের অঙ্গ সন্তান রূপে গ্রহণ করতে হবে। সবই ভূমি ভগবানের (সবইভূমি গোপালকী) অর্থাৎ ভূমি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—এই বোধ মানবের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জাগ্রত করতে হবে। এই বিচার বিপ্লব—এই চিন্তা বিপ্লব সমাজে সৃষ্টি করতে হবে। মানুষের আত্মায় শক্তি—মানুষের আত্মত্যাগের শক্তি অপরিসীম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মধ্যে তা সুপ্ত। কি ভাবে তা জাগ্রত হলে কার্যকরী হবে? তার উপর ভূ-দান যজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করছে।

আমাদের মধ্যে যখন এমন মানুষের আবির্ভাব হয়, অন্যের সুখ বিধানের জন্য আত্ম ত্যাগ ভিন্ন যাঁর জীবনে আর কিছু নাই, যাঁর প্রেম সর্ব্বব্যাপ্তি হয়েছে তাঁর আহ্বানে—তাঁর দর্শনে আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত ত্যাগ প্রবৃত্তি—সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়—আমাদের মধ্যে নির্বাপিত আলো প্রজ্বলিত হয়। হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ তখন বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজ কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়। এমন একজন মানুষ সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন—তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী। এখন বিনোবাজীতে অনুরূপ বিভূতি প্রকাশ পাচ্ছে। তাই লোকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সাড়ে এগার লক্ষ একর ভূমি তাঁর হাতে প্রেম ভরে সঁপে দিয়েছে। সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ব বৃহৎ দান দিয়েছে। আমাদের সমস্যার তুলনায় এ অল্প হলেও এই অল্প সময়ে এই পরিমাণ ভূমিপ্রাপ্তিতে আশ্চর্য্য বোধ হবার কথা।

সমাজে দারিদ্র্য তথা ধন-বৈষম্যের উৎপত্তির মূল কোথায়? উৎপাদনের ক্ষেত্র ও উৎপাদন ক্ষেত্রের মালিকত্ব যখন উৎপাদক চাষী ও উৎপাদক শিল্পীর হাত হতে অনুৎপাদক ধনিকের হাতে চলে যায় তখনই শোষণ ও দারিদ্র্যের সূত্রপাত হয়। তাই শোষণ তথা দারিদ্র্য-দূরীকরণের একমাত্র উপায়—উৎপাদনের মৌলিক ক্ষেত্র ভূমিকে শ্রমিক চাষীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের যন্ত্রাদির মালিকত্ব উৎপাদক শ্রমিককে প্রত্যর্পণ করা। তার অর্থ ভূমির সম বণ্টন ও শিল্পের ক্ষেত্রে কুটীর শিল্পের প্রবর্তন। তাই ভূ-দান যজ্ঞ অহিংস সমাজ-রচনার প্রথম পদক্ষেপ।

এ কথা সত্য যে ভূ-দান যজ্ঞের অন্যতম উদ্দেশ্য হিংস্র বিপ্লব নিবারণ করা। কিন্তু যদি হিংস্র বিপ্লব ঠেকানই ভূ-দান যজ্ঞের একমাত্র লক্ষ্য হতো, তাহলে তা কাপুরুষতার সামিল হতো। ভূ-দান যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য সমাজে অহিংস বিপ্লব সাধন করা। এ বিপ্লব মাত্র বাহ্য নয়। এ বাহ্য ও আন্তরিক দুই-ই। অন্তরে চিন্তা-বিপ্লব ও বিচার-বিপ্লব সব ভূমি গোপালের বা সমাজের। মাত্র উৎপাদকেরই ভূমিতে অধিকার—অন্যের নয়। তাই অনুৎপাদককে বিচার বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তার কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করে ভূমির স্বামীত্ব বিসর্জন দিতে হবে। এই বোধ সার্বজনীন ভাবে জাগ্রত হবে। বাস্তবতঃ তাহাই কাম্য সাধিত হবে। হিংস্র বিপ্লবের চাইতে এ যে কত মহান তা সহজেই অনুমেয়।

ভূ-দান যজ্ঞ ভূমি বণ্টনের জন্য আইন প্রণয়নে কোন বাধা সৃষ্টি করবে না। বরং তা সমাজে চিন্তা বিপ্লব সাধন করে আবশ্যকীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির সহায়ক হবে। কিন্তু ভূ-দান যজ্ঞের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও শক্তি অর্থাৎ রাষ্ট্র শক্তি নিরপেক্ষ অহিংস জন-শক্তি নির্মাণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করা। তাই ভূদান যজ্ঞ গ্রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সাধন স্বরূপ।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[বহু বছর যাবৎ ভারতবর্ষ এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য পত্রিকায় শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা শরৎচন্দ্রের বহু চিঠিপত্র আমার হাতে আসে। এই সব চিঠি থেকে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের অনেক মূল্যবান উপকরণ পাওয়া যায়। এই সময়ে আমি ব্যাপকভাবে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র সংগ্রহে মন দিই। ফলে, আগে কারও চিঠি সংগ্রহ করার অভ্যাস না থাকায় শরৎচন্দ্রের অনেক চিঠি নষ্ট হয়ে গেলেও, বহুলোককে লেখা শরৎচন্দ্রের অসংখ্য চিঠি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই।

এই সব সংগৃহীত চিঠির মধ্যে কিছু চিঠি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বহু চিঠি আজও অপ্রকাশিত রয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত এবং এই অপ্রকাশিত চিঠিগুলি নিয়ে "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" নাম দিয়ে কোই সম্পূর্ণ পত্র-সংকলন গ্রন্থ বার করতে মনস্থ করেছি। ভারতবর্ষে বর্তমান সংখ্যা থেকেই কয়েক মাস শরৎচন্দ্রের কিছু অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। সাধারণের বুঝবার সুবিধার জন্য প্রত্যেক চিঠির সঙ্গে চিঠির পরিস্থিতি হিসাবে যথাসম্ভব পাদটীকাও দেওয়া থাকবে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের একখানি অপ্রকাশিত চিঠি প্রকাশ করা গেল। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল মেটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র এই চিঠিখানি লিখেছিলেন, আবার রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এই চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সেই দুখানি চিঠিও বিশেষ কাজে এই সঙ্গে ছাপা হ'ল। সবকখানি চিঠিই একটা বিশেষ সাহিত্য-মূল্য বহন করছে।]

রবীন্দ্রনাথকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিখানি হাতেলেখা সাংবাদিক ইস্তাহারের চৌহদ্দীর মধ্যে প্রাপ্ত। শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি দু'খানি প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে বাধিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দু'খানির নকল (রবীন্দ্রনাথের পেছনের লেখা প্রায় সমস্ত চিঠিরই নকল থাকত) বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র মিউজিয়ামে রয়েছে, আর মূল চিঠি দু'খানি আছে ডঃ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে। শরৎচন্দ্র, তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠি উমাপ্রসাদবাবুকে রাখতে দিয়েছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু সেই চিঠিগুলি যত্নসহকারেই রেখে দিয়েছেন।

রবীন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি দুইটির নকল ১৩৫৬ সালের কার্তিক—পৌষ সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এখানে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের চিঠি দু'টি ডঃ উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট রক্ষিত মূল চিঠি থেকেই নেওয়া।]

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র তাঁর "বেনা-পাওনা" উপন্যাসখানির নাট্যরূপ দেন। নাটকে রূপান্তরিত হ'লে তখন "বেনা-পাওনা"র নাম হয় "বোড়শী।" এই বছরই আগষ্ট মাসে বোড়শী প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৩৩৪ সালের ২২শে শ্রাবণ নাট্যাচার্য শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক "নাট্য-মন্দির" রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। বোড়শী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'লে শরৎচন্দ্র একখানি বোড়শী রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নাটকটি সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ বোড়শী প'ড়ে শরৎচন্দ্রকে তখন এই চিঠিখানি লিখেছিলেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার বোড়শী পেয়েছি।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তা হলে চেষ্টা করতুম, কেন না, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের স্বাকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র-চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেন না, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্য টিঁকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়।

যোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুসি করতে চেয়েচ, এবং তার দামও পেয়েচ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করেচ। সে যোড়শীকে এঁকেচে সে এখনকার কালের ফরমাসের, মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না,—কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্ত্তারূপে তোমার কর্ত্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিক কালের চল্‌তি সেন্টিমেণ্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড়ো সাধক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুসি থাকতে পারো—কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে? ইতি ৪ ফাল্গুন ১৩৩৪

তোমার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির উত্তরে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে নিম্নের চিঠিখানি লেখেন—

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারি নি। কালের দিক দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্চে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে সে হতে পারে তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে, একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি থাকে বলেছেন, এ দেশের লোক-যাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য-সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি কোরে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে ঠেকা কোরে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা কিছুই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার যোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

এমনি আমার আর একখানা বই আছে পল্লী-সমাজ, এর বিক্রীও তত, খ্যাতিও তত। অথচ যতই লোকে এর প্রশংসা করে, ততই মনে মনে আমি লজ্জা পাই। জানি এ টিঁকবে না। কারণ এ-ও সত্যে মিথ্যায় জড়ানো। মিথ্যেও বরঞ্চ টিঁকে, কিন্তু সত্যের বোনেদের ওপর যে অসত্য, সে পড়তে দেরি হয় না। কথাটা হঠাৎ যেন উল্টো মনে হয়।

এক সময়ে আমি শুধু ছবি আঁকতাম। ছবিতে এর

মুণ্ড, ওর ধড়, হাত পা এক কোথে চমৎকার জিনিস পাড় করানো যায়। কারণ সে কেবল বাইরের বস্তু, চোখে দেখেই তার বিচার চলে। কিন্তু সাহিত্যে চরিত্র সৃষ্টির বেলায় তা হয় না। মানুষের মনের খবর পাওয়া কঠিন। সেখানে নিজের খেয়াল বা প্রয়োজন মত এর একটু, তার একটু, কতক সত্য, কতক কল্পনা জোড়া-তাড়া দিয়ে উপস্থিত মতে লোকরঞ্জন করা যায়, কিন্তু কোথায় মস্ত ফাঁকি থেকে যায়, এবং উত্তর কালে এই ফাঁকটাই একদিন ধরা পড়ে। কি জানি, হয়ত এই ভয়েই আজকাল প্রখর বাস্তব সাহিত্যের চলন সুরু হয়েছে। তাতে দলে দলে লোক আসে সবাই ছোট, সবাই সত্য, সবাই হীন, কারও কোন বিশেষত্ব নেই, অর্থাৎ যেমনটি সংসারে দেখা যায়। অথচ, সমস্ত বইখানা পড়ে মনে হয়, এতে লাভ কি? কেউ হয়ত বলবে, লাভ নেই—এমনি। মাঝে মাঝে হয়ত, অত্যন্ত সাধারণ মামুলি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও নিপুণ বর্ণনা থাকে,—তার ভাষাও যেমন আড়ম্বরও তেমনি,—কিন্তু তবুও মন খুসি হয় না, অথচ এরা বলে এই ত সাহিত্য।

রোঁদাঁর সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারি নি। শুধু এইটুকুই বুঝেচি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এতে দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোট, গোল জিনিস চাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন্ সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্ত্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে। এ নিয়ম ক্যামেরার মত যন্ত্রকেও মেনে চলতে হয়। তার ব্যতিক্রম নেই। কিন্তু সাহিত্যের বেলা তো এর তেমন কোন বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির পরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোন নির্দ্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির perspective এবং সাহিত্যের perspective কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্ত্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নর-নারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত কাব্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা concrete উদাহরণ নিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণে অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে তার কত রকমের নাম, কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেলো তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয়, এবং কবির কাছে এই হয়ত সেকালের লোকে ভিড় কোরে চেয়েছিল, এবং পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে, সাহিত্যের দূরব্যাপী perspective বলতে কি আপনি এই ধরণের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন?

আমি পূর্ব্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দুএকটা লেখার ইচ্ছে হয়, কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক যে কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারওয়ালারা, না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর চাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড্ সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।

পরিশেষে আপনি আমার শক্তির উল্লেখ করে লিখেছেন, "তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তা হলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে।" আপনি নানা কাজে ব্যস্ত, কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছে হয়, আপনার কাছে গিয়ে এই জিনিসটা ঠিক মত জেনে আসি। কারণ উপস্থিত কালটাও যে মস্ত ব্যাপার, তাঁর দাবী মানবো না বললে, সেও যে শাস্তি দেয়।

আপনি অনুমতি না দিলে আপনার সময় নষ্ট করে দিতে আমার সঙ্কোচ হয়। আমার চিঠি লেখার ধরণটা ভারি এলো মেলো—কোন কথাই প্রায় গুছিয়ে বলতে

পারি নে। লেখার দোষে কোথাও যদি অপরাধ হয়ে থাকে মার্জনা করবেন। ইতি—২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৪

সেবক
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের উত্তর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে আবার এই চিঠিখানি লেখেন—

ওঁ

কলকাতা

কল্যাণীয়েষু—

আমি জ্বরে পড়ে আছি, তবু তোমার চিঠির উত্তর দিতে বসলুম। ভয় হয়েছিল পাছে আমার সমালোচনা পড়ে তুমি অতিশয় বিরক্ত হয়ে থাক। তোমার চিঠিখানি পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি।

গোড়াতেই একটা কথা তোমাকে বলে রাখি। তোমার প্রতিভা আছে বলেই তোমার কাছে দাবী করি—সে দাবী সাহিত্যের তরফের দাবী। অন্য অনেক বিষয়েই এক এক যুগের বর্ত্তমানের ভোগ বর্ত্তমানেই নিঃশেষ হয়ে যায়—রাজ্য-সাম্রাজ্যও তারি অন্তর্গত। সাহিত্যে প্রত্যেক জাতি তার চিরকালের সম্পদ কামনা করে। এই সম্পদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা যাদের আছে বর্ত্তমানের কোনো প্রলোভন এসে তাদের তপোভঙ্গ না করে এই আমরা একান্ত মনে ইচ্ছা করি। বর্ত্তমান কালের মন জোগাবার জন্যে বায়না নিয়ে যারা মর্ত্যলোকে এসেচে তাদের সংখ্যার সীমা নেই—তারা প্রচুর পরিমাণেই নগদ বিদায় পেয়ে থাকে—মাসিকে সাপ্তাহিকে সভাসমিতিতে তারা আসর সরগরম করে রেখেছে। তাদের বারোয়ারির আসর—বাঁশে বাঁখারিতে তৈরি; তোমরা সেখানে যদি পা দেও তবে তোমাদের জাত যাবে। তুমি লিখেছ "উপস্থিত কালটাও যে একটা মস্ত ব্যাপার।" সেইখানেই সে বস্তুতই মস্ত যেখানে অনুপস্থিত কালের মধ্যেও তার প্রবেশাধিকার আছে। বর্ত্তমানকালের একটা বৃহৎ অংশ আছে যেটা ক্ষণজীবীদের—মোটের উপর তাদের ক্ষমতা কম নয়, তাদের ভোগের আয়োজনও প্রচুর, আধুনিক ডিমক্রাসির যুগে সাহিত্যের দরবারে তারাও তারস্বরে ফরমাস করে থাকে। এই ফরমাস এড়িয়ে চলা এখানকার কালে একটা বিষম সমস্যা—এ সমস্যা আগেকার দিনে এত কঠিন ছিল না। হাল আমলের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতির প্রচলিত বুলি দশের মুখে মুখে কেবলি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্চে—সেই দশের দল এই সমস্ত বুলিরই সর্ব্বত্র পুনরাবৃত্তির জন্যে উদ্যত। তোমার মতো সাহিত্যিক যেন সেই দশকে এই কথাই বলে যে, তোমাদের বুলি আমার বুলি নয়—তোমাদের খাঁচার পাখী না হলে তোমাদের দানাপানি আমার ভাগ্যে না জুটতে পারে কিন্তু আমার খাদ্য বৃহৎ কালে, বৃহৎ দেশে। দাশুরায়ের আমলের উপস্থিতকাল দাশুরায়কে প্রচুর পুরস্কার দিয়েছিল—কিন্তু সে যে চেক্ সই করেছিল আধুনিকালের ব্যাঙ্কে তা ক্যাশ করা চলে না। অথচ মনসিংহের গাথাকাব্য লোক-সাহিত্য, আজও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় নি—তা অশিক্ষিত লোকের সহজ ভাষায় লেখা কিন্তু তা চিরকালের ভাষায় লেখা। দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের অগভীর কৃত্রিমতায় সত্য ছিল না। মনসিংহের গাথায় সত্য ছিল। আধুনিক কালের মুখরোচক বুলিগুলো সেই দাশুরায়ের শ্লেষ অনুপ্রাসের জায়গা জুড়েচে—এরা প্রতিদিন সাহিত্যের সত্য নষ্ট করচে। এরা কচুরিপানার মতো সাহিত্যের সকল স্রোতকেই রোধ করতে বসেচে। আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি তাতে তুমি অতি অনায়াসে চিরকালের সত্যকে মূর্ত্তি দিয়েচ—দশের বাণী তোমার বাণীর মধ্যে প্রবেশ করে ঐ সত্যের ছবিতে নিজের দাগা দেগে দিতে পারে নি। তখন তুমি জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে ছিলে। তোমার এখনকার লেখা পড়তে আমার ভয় হয় পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভিড়ের লোকের মনটা ভর করেচে। সে এতবড়ো লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।

তোমার নাটকে যে perspectiveএর কথা বলেছি সে হচ্চে নাটকের আখ্যান বস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লিগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা-কিছু বলতে চেয়েচ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তাহলে ভাষায় ঘটনায় অন্য রকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হলে তবেই সেটা সত্য হয়।

একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার এই নাটক সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করলুম যদি তোমার নিজের মনে হয় সেটা অসঙ্গত তাহলে সেটাকে মন থেকে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ো। তোমার নিজের সৃষ্টির আদর্শ তোমার নিজেরই মনে, যদি সেটাকে রক্ষা করে থাকো তাহলে বলবার কথা কিছু নেই—যদি জনসাধারণের ফরমাস তোমার লেখনীকে বিচলিত করে থাকে তাহলেই ভাববার কথা।

এখন কলকাতায় আছি—যদি কোনদিন দেখা হয় মোকাবিলায় আলোচনা হতে পারবে। ইতি১১ই মার্চ্চ ১৯২৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পিতামহ

ঠিক কথাই তুমি লিখিতেছিলেন।

"পুলিশের কর্তাটীর শিখরের দিকে নির্নিমেষ বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমার চোখের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় আশাতীত রূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চোখের দিকে চেয়ে শিখর মৃদু হেসে বললে—"অমন করে' দেখছিস কি?"

"হে কৃষ্ণ! তুই যে সেদিন পুলিশের চোখে ধরা উঠবি তা ভাবতেই পারি নি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে সত্যি"

শিখর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। সেই ফাঁকে ফেরেণ্ডেই আমি তাকে আবার ফিরে পেলাম যেন, সেই কিশোর শিখরকে, যার চোখের দৃষ্টিতে অকারণ বিস্ময় আভাসিত হ'ত মাঝে মাঝে, যাকে ছোট্ট সহজ যুক্তিতে পাড়ি দিতে পারত যে এক নিমেষে। আমার ঘিরে আসত, মুখে অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠত, মুচকি হেসে আড়চোখে চেয়ে দেখত তার এই আকস্মিক স্বপ্ন-প্রয়াণ আমরা লক্ষ্য করেছি কি না।

আমার কথার উত্তরে সে হেসে বললে, "বাইরে হয়তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আমি বদলাই নি। যা ছিলাম ঠিক তাই আছি—"

"আমাদের কাপড়ের ব্লাইরেটা নিয়েই। সেইটে বলেছে বলেই অদ্ভুত লাগছে। তোর ভিতরের একটা খবর অবশ্য পেয়েছিলাম—"

কথাটা শেষ করলাম মুচকি হেসে।

"সে খবরটাও অবশ্য খবর কিন্তু আসল খবর নয়"

"আসল খবরটা কি তাহলে"

"আসল খবর আমি উৎসুক, আমি কৌতূহলী!—"

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল সে।

"ওরে বাবা, ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠেছিস দেখছি। পুলিশের কোন ডিপার্টমেণ্টে তুই আছিস"

"আই. বি."

"আমাদের অঞ্চলে আগমন কোনও ফেরারীর উদ্দেশে না কি"

"একটা কালোবাজারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি"

আমার বাসার সামনে যে বিরাট বোর্ডিং হাউসটা ছিল সেইটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "আমার পরিচয় কিন্তু কাউকে বোলো না যেন। আমাকে যে চেন তা-ও প্রকাশ কোরো না কারো কাছে। ওই বোর্ডিংয়ের তিনতলায় একটা রুম নিয়ে আমি থাকব ভাবছি। এখানে আমার নাম হবে—এস. কে. দাস, হার্ডওয়্যার মার্চেণ্ট। যদি আমাকে কোনও কারণে প্রয়োজন হয় ওই নামেই আমার খোঁজ কোরো। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায়" কত সামান্য কারণে মানুষের মনে আঘাত লাগে। শিখরের এই কথায় কেমন যেন আহত হলাম একটু। মনে হল যেন ওর কথায় একটা পুলিশী মনোভাব ব্যক্ত হল, একটা আদেশ যেন অনুরোধের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যাপারটা ভাল করে' বিশ্লেষণ করে' এখন বুঝছি ওটা মজ্জাগত ঈর্ষ্যারই একটা ছদ্মবেশ। শিখর যে জীবনে উন্নতি করেছে সহসা সেটা আবিষ্কার করে' আমার অসুস্থ সত্তাটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেদনাতুর করেছিল মনকে, শিখরের ব্যবহারে কোন দোষ ছিল না।

··· দিন কয়েক পরেই দেখলাম তিতলের একটি ঘরে শিখর এসে আড্ডা গেড়েছে। শিখরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না আমার, দূর থেকেই আমি তার গতিবিধির সব খবর রাখতাম। আমার কাছে দূরবীন্ ছিল।···

ভক্ত যেমন নিয়মিত ভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করে আমি ঠিক তেমনি ভাবে রোজ দেখতাম আলেয়াকে। ওটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখনই হাতে কাজ থাকত না তখনই আমি দূরবীনটি নিয়ে জানলার কাছে বসতাম। এমন ভাবে বসতাম যাতে আশপাশের বাড়িতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে। আমি যে দূরবীন নিয়ে জানলার ধারে বসে আছি তা দেখতেই পেত না কেউ বাইরে থেকে। জানলার কপাট দুটো প্রায় বন্ধ থাকত, সামান্য একটু ফাঁক রাখতাম দূরবীনটির জন্য শুধু। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিছু। আলেয়াকে অবশ্য রোজ দেখতে পেতাম না। এমন অনেক দিন গেছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দেখতে পাই নি। এর ফাঁকে ফাঁকে শিখর সেনকেও দেখতাম। দিনের বেলা প্রায়ই দেখা যেত না তাকে। প্রায়ই চোখে পড়ত তাদা ঝুলছে তার ঘরের সামনে। একদিন দেখতে পেলাম দোতলার একটা কোণের ঘর থেকে ছিমছাম ফিটফাট একটি মেয়ে বেরুচ্ছে। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, তার চোখে মুখে এমন একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পরদা-প্রথা উঠে গেছে আজকাল। পথে ঘাটে আজ-কাল অনেক রূপসী দেখা যায়, মনে হয় চেষ্টা করলে তাদের নাগালও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় ও যেন উল্কা, ওকে কোনও দিন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গটগট করে' নেবে এল দেখলাম। তারপরই দেখতে পেলাম বেশ দামী একটা মোটর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে এসে চড়তেই গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরুল সেই ঘরের বন্ধদ্বারের উপর দূরবীক্ষনের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তার পর। দেখলাম দ্বারের পাশেই একটা নাম লেখা প্লেট, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিস এ. মুখার্জি—নার্স। এই এ মুখার্জি যে অবন্ধনা মুখার্জি তা কল্পনা করতে পারি নি। পারলে যে আনন্দ আমি সে কদিন উপভোগ করেছিলাম তার তীব্রতাটা যে অনেক কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করেছিলাম যে শিখর মেয়েটির সঙ্গে বেশ মেলামেশা শুরু করেছে। রাত্রে প্রায় ওর ঘরে গিয়ে বসে, অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করে দু'জনে। দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। একনিষ্ঠা প্রেমিক শিখরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে' মনে মনে বড় কুণ্ঠিত ছিলাম আমি। মনে হত বিয়ে করে' আমি যেন অনেক নেমে গেছি, আলেয়ার প্রতি অবিচার করেছি। প্রেমের জন্য গৃহত্যাগী শিখরের একনিষ্ঠতার কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করত, পীড়িতও করত। সেই শিখরকে এখন নিজের দলে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল সত্যি। মিস এ. মুখার্জি যে অবন্ধনা এ খবর পেলে আমার আনন্দ অনেকটা কমে' যেত। অবন্ধনাকে আমি চিনতে পারি নি, কারণ তাকে আমি দেখি নি কখনও। এই বোর্ডিং-এ শিখরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটা আমি জেনেছি অনেক পরে। তার ডায়েরি থেকে, চন্দ্রমোহন যে ডায়েরি দিয়েছিল সে ডায়েরি থেকে নয়। এই দ্বিতীয় ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম উমেশ মামার কাছ থেকে। উমেশ মামা শিখর সেনের সহকর্মী, তিনিই তার জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই ডায়েরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ডায়েরি থেকে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি।

"দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে আমাদের দেশের দার্শনিক সমাজে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন অমোঘ দৈবের কাছে পুরুষকার নিষ্প্রভ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়, শত চেষ্টা করেও মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে না। আর একদলের মতে না আমরা দৈব বলে' মনে করি তা আমাদের কল্পনা বিলাস মাত্র, পুরুষকার দ্বারাই মানুষ নিজের ভাগ্য গঠন করে। আমরা যে অপ্রত্যাশিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি তার কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না সত্য। কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, এর জন্যে একটা কাল্পনিক দৈবশক্তিকে খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার সুখদুঃখ সম্পূর্ণরূপে আমার পুরুষকারেরও ফলাফল নয়, আরও অনেকের কর্মধারা আমার সুখদুঃখকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ আরও অনেক লোকের পুরুষকার আমার পুরুষকারকে কখনও আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার অজ্ঞাতসারে সফল বা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের অপ্রত্যাশিত সুখদুঃখের এ-ও একটা কারণ। এর

জন্মে দৈব নামক একটা অলৌকিক ব্যাপারকে আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তৃতীয় আর একদল বলেন পুরুষকারই সব। এজন্মে যেটা আমরা দৈব বলে' মনে করছি সেটা পূর্বজন্মের পুরুষকারের ফল। বীজ বপন করবামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফলফুল শোভিত গাছ জন্মে না, তেমনি কোনও সুকর্ম বা দুষ্কর্ম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরজন্ম পর্য্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এইটেকেই আমরা দৈব বলে' মনে করি।

উপরোক্ত তত্ত্ব আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে' বিস্ময়ে কল্পনায় অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনাকে আমি ভালো বেসেছিলাম, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে, কিন্তু সে ভালবাসার যথার্থ মূল্য দেবার শক্তি ছিল না আমার। নির্য্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল আমি সভয়ে সরে' দাঁড়িয়েছিলাম। সাধারণ প্রেমিকের মতো তাকে বলতে পারি নি—ভয় নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তুমি। তাই সে চলে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার ভীরুতার ফলভোগ করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আগুনে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আমি যে তাকে চেয়েছিলাম, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম—তার ফল কি এতদিনে ফলল? সেটাকে দৈবাৎ বলে' মনে হচ্ছে সেটা কি আমার পুরুষকারেরই ফল!

গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘুষ খেয়ে অনেক অন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা তাঁকে ঘুষ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন না কি এই বোর্ডিংয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। তাঁরই গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি আমি। এখানে অবন্ধনার দেখা পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল। তিনতলায় একটা ঘরে আছি আমি। স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে দোতলার একটা ঘরে অবন্ধনা আছে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে। আমি নাবছিলাম, সে উঠছিল। আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। সেই দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। "শিবব্রতদা! তুমি এখানে হঠাৎ?"

"অবু?"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যে অবন্ধনাকে চিনতাম এ ঠিক সে নয়। এর শাড়ির পারিপাটো, ফাঁপানো চুলের কায়দায়, এর গালের রঙে, চোখের কাজলে, এর ভ্যানিটি ব্যাগে আর সৌখীন স্যাণ্ডালে যে পরিচয় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত দামাল সেই কিশোরী অবন্ধনার কোনও মিল নেই। কিন্তু অমিলটাই আমাকে যেন পুলকিত করে' তুলেছিল ক্ষণিকের জন্য। মনে হয়েছিল সেই পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত মেয়েটা আমার নাগালের বাইরে ছিল, এই কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব হবে না। ওর পোষাক পরিচ্ছদে, ওর প্রসাধনে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ আভাসিত হচ্ছে যেন! তখন বুঝতে পারি নি যে অবন্ধনা চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার প্রশ্নে একটা শাণিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবন্ধনার চোখে। "হাঁ, আমি অবু। ঠিক অবু নই, মিস. এ. মুখার্জি"

"কি রকম?"

"তুমি এখানে এলে কি করে!"

"আমি তেতলার একটা ঘরে থাকি যে"

অবন্ধনা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল ক্ষণকাল।

"এই বোর্ডিংএর তেতলার ঘরে?"

"হাঁ—"

"কোন নম্বরে"

"বাইশ। সমস্ত ঘরটাই আমি নিয়েছি"

"কোলকাতায় কি করছ"

"চাকরি। তুমি কি করছ এখানে"

"আমিও এখানে থাকি। দোতলায় সাত নম্বরে। একেবারে কোণের ঘরটা—"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি এখানে কেন—"

"আমি নার্স হয়েছি। মিডওয়াইফারিতে প্র্যাকটিস করি।"

"ও। তা এই বোর্ডিংএ কেন।

"অন্য কোথাও ভাল বাসা পাই নি। এখানে ভালই আছি। তুমি ক'দিন এসেছ এখানে?"

"পরশু"

"কি করছ এখানে"

"চাকরি"

"কি চাকরি"

আমি যে পুলিশের লোক তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। বললাম, "মার্চেন্ট আপিসে কেরাণীগিরি করি"

"আমার ঘরে যাবে? এস না"

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল এখন ওর সঙ্গে ওর ঘরে গেলে ছদ্ম আবরণটা খুলে পড়বে। নিজেকে সামলাতে পারব না হয় তো।

"একটু দরকারি কাজে বেরুচ্ছি। পরে আসব এখন। দোতলায় সাত নম্বর তো?"

"সন্ধের পর এস তাহলে"

"আচ্ছা—" ক্রমশঃ

খাদি আন্দোলন

আম্বা সাহেব সহস্র বুদ্ধে

চরকা সঙ্ঘ এ যাবত খাদি উৎপাদন, বিক্রয়, বস্ত্র-অন্বেষণী সৃষ্টি করা এবং খাদি উৎপাদনের প্রক্রিয়া শিক্ষাদান-আদি কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে খাদির মূলীভূত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আন্দোলন সৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া চরকা সঙ্ঘ মনে করে।

খাদি আজ এক অভিনব পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে খাদির বিক্রয় হ্রাস পাইতেছে। খাদি উৎপাদনের পুঁজি ইহার ফলে আটক পড়িয়াছে এবং খাদি উৎপাদনে নিযুক্ত কারিগরদের পারিশ্রমিক পাওয়া বন্ধ হইয়াছে। বিগত ছয় মাসকাল যাবত খাদির কাটতি হ্রাস পাওয়ায় কোন কোন কেন্দ্রে খাদি উৎপাদনের কাজ যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। এই ভাবে উৎপাদন হ্রাস করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনুমিত হয় যে প্রায় আট লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের খাদি দেশে জমিয়া গিয়াছে। উৎপাদন হ্রাস না করিলে নতুন খাদির মূল্য ইহার দ্বিগুণ বা ততোধিক হইত।

অথচ গত বৎসরের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। সে সময় দেশের শাসনকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত পদস্থ নেতৃবৃন্দ চরকা সঙ্ঘ এবং দেশবাসীর নিকট বার বার খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার কথা বলেন। তদনুসারে খাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করার যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে খাদির কাটতি কি ভাবে হয়, এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে খাদি উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত কারিগরদের কাজ দিবার সমস্যাও আছে। কোন কোন খাদি উৎপাদন ক্ষেত্রে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অবস্থা পরিদৃষ্ট হইলেও খাদির কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। তামিলনাদ এবং কেরল অঞ্চলের অবস্থা এইরূপ যে চরখা সঙ্ঘ ঐ সকল অঞ্চলে বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার খাদি উৎপাদন করে এবং গত বৎসর মাসোয়ার সরকার দ্বারা উৎপন্ন খাদির মূল্য কুড়ি লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু খাদির বিক্রয় হ্রাস পাওয়ায় চরখা সঙ্ঘ এবং সরকার, উভয়কেই উৎপাদন হ্রাস করিয়া দিতে হয়। কোন কোন এলাকায় সাড়ে তিন আনা হইতে চার আনা মূল্যের সুতার গুটি (৮৫০ গজ) হয় পয়সা দিয়া ক্রয় করিবার লোক নাই। বিহার হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে আশি হাজার কাটুনী বেকার হইয়া পড়িয়াছে। বিহার খাদি সমিতিকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ২২০ জন কর্মীকে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে।

অতীতে খাদির চাহিদা হ্রাস পাইলে ফেরী করিয়া, খাদির গুটি বিক্রয় করিয়া এবং বিশেষ কমিশন আদি দিয়া অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। আজও সে সকল উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইতেছে এই যে, এই সকল উপায় দ্বারা আমরা কি সমস্যার মূলে পৌঁছাইতে পারিব? বস্তুতঃ দেশে বেকারত্ব এবং আংশিক বেকারত্বের তীব্র প্রকোপ দেখিয়া মনে হয় যে খাদির উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। সুতরাং বর্ত্তমানে নতুন খাদি কোন রকমে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। খাদির উৎপাদন যতই বাড়ান হউক, তাহার কাটতি হইতে পারে। সুতরাং প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান আবিষ্কার করা। গ্রামবাসীদের গ্রামাবলম্বনের দিকে অগ্রসর করিয়া ইহার সমাধান সম্ভব। অতএব খাদি আন্দোলনের নায়কত্ব গ্রামবাসীদের এই নীতি যোগান প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

কর্মিগণ কাটুনীদের প্রতিনিধি হইয়া এযাবত চরখা সঙ্ঘের কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। কর্মীরা দেশের দুরতম গ্রামে উপস্থিত হইয়া দারিদ্র্য-পীড়িত কাটুনীদের নিকট হইতে সুতা সংগ্রহ করিয়া তাহার যুনাইএর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য পাওয়া ছাড়া এ কার্য্যের ফলে কাটুনীদের নিজেদের মধ্যে কোন রকম সংগঠন হয় নাই বা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার আগ্রহ অথবা বিশ্বাস ও তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় নাই। অবশ্য এতই শোচনীয় যে আজ সহস্র সহস্র কাটুনীর জীবিকা নির্ব্বাহের পথ রুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের তরফ হইতে কোনরূপ আন্দোলন বা সাড়া শব্দ নাই।

বিশেষজ্ঞদের হিসেব থেকে মন্ত্রীর ঝুলি পূর্ণ হয়ে ফুলে ওঠে। তাই তাঁরা ভূমিকা সমস্তগুলির উপর হইতে আলোচনা সুরু হয় এবং সরকারও তাঁদের দাবী সম্বন্ধে সদা সচেতন ও সচেতন থাকেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু দুঃখের মন্ত্রী বেকারসমস্যা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির উদরান্নের সংস্থান আজ নষ্ট হইতেছে। ঐ সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে এ বিষয় সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্ব চরখা সঙ্ঘ অনুভব করিতেছে। গ্রামস্বাবলম্বনের আদর্শ যদি গ্রামবাসীদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়, শুধু তাহা হইলেই তাঁহারা, "প্রত্যেকের জন্য গ্রামেই কাজের সংস্থান হওয়া প্রয়োজন"—এই রূপ দাবী জানাইতে পারিবেন। নিজ গ্রামে উৎপন্ন পণ্যই আমাদের সদা সর্বদা ব্যবহার করা উচিত—এই আদর্শ যদি আমরা গ্রামেগ্রামে প্রচার করিতে পারি, তাহা হইলে কাটুনীদের পক্ষে সহজেই কাজ পাওয়া সম্ভব হইবে। এই অবস্থায় কোন গ্রামে উৎপন্ন খাদি সেই গ্রামেই বিক্রয় করা হইবে। এই আদর্শকে কার্যকরী করিবার জন্য অতঃপর গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যথাসাধ্য সাহায্য হইতে বিরত হবে এবং সহরে নির্মিত অন্যান্য দ্রব্যের বহিষ্কার করার কথা বিবেচনা করিতে সক্ষম হইবেন। অতএব চরখা সঙ্ঘের কর্মিগণ কর্মিদের ঐ সব কাটুনীদের ঘরে ঘরে যাইয়া এবং মন হইতে প্রাণান্তরে ভ্রমণ করিয়া এই আদর্শের প্রচার করিবার সংকল্প গ্রহণ করিতে হইবে। সরকার কর্তৃক পরিমিত হারে খাদি বোর্ড স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে। খাদি উৎপাদন কার্যে কিছু কিছু সাহায্য করিবার কথাও সরকার বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু চরখা সঙ্ঘের বক্তব্য হইতেছে এই যে দেশের বেকার সমস্যার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দেশের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য সরকারকে নিম্নলিখিত সর্তগুলি পালন করিতে হইবে :—

(১) কাটুনীরা প্রথমতঃ নিজ পরিবারের প্রয়োজন পূর্তির জন্য সুতা কাটিবে এবং ইহার উপরন্তু তাহারা যত সুতা আনিবে, তাহা ক্রয় করিবার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাহায্য দানের দৃষ্টিতে কাটুনীদের সমস্ত সুতা ক্রয় করিবার দায়িত্বও সরকারের উপর পড়িতে পারে। সরকার তাহাদের জন্য কোন কাজ দিতে সমর্থ না হইলে এই বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে।

(২) আমাদের মতে ইহার জন্য কোন না কোন উপায়ে মিলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন দেখা দিবে এবং সরকারকে ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) জাতীয় বেশরূপে যাহাতে খাদি সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়, সরকারকে তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে এবং প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যাহাতে খাদিই হয়, সরকারকে তজ্জন্য নির্দেশ জারী করিতে হইবে।

(৪) খাদির আশ্রম সঙ্ঘের কথা বিবেচনা করিয়া খাদির সাথে সাথে অন্যান্য কুটীর শিল্পকেও সরকারী সংরক্ষণ দিতে হইবে। মিল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহ যাহাতে কুটীর শিল্পজাত হয় সরকার তাহার জন্য সচেষ্ট থাকিবেন।

অপরিচ্ছন্ন কাজ নিষ্পন্ন করার ভার যে সরকারের উপর পড়ে এ কথা আমাদের প্রচার করিতে হইবে। তবে শুধু সরকারের পক্ষে একা দেশের ব্যাপক বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, এ সমস্যার সমাধানের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। গ্রামবাসীদের মনে গ্রাম স্বাবলম্বনের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া দরকার এবং গ্রামের বেকার সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও যে গ্রামবাসীদের এ ধারণা ও তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য গ্রামবাসীদের সর্ববিধ উপায়ে প্রচার করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই গ্রামে উৎপন্ন প্রত্যেকটি কুটীর শিল্পজাত পণ্যের কাটতি গ্রামেই হইবে ও গ্রামবাসীর প্রয়োজন পূর্তির পর উদ্বৃত্ত দ্রব্য অন্যত্র প্রেরণের প্রশ্ন উঠিবে। এই ভাবে কাজ করিলে গ্রামবাসীর সংগঠনী শক্তিও যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং সরকার সহজে পূর্বোক্ত দায়িত্ব পালন করার শক্তি খুঁজিয়া পাইবেন। সে অবস্থাতেও সরকার যদি কোন কারণে এ কাজ করিতে অনিচ্ছুক হন তবে জনসাধারণের সংগঠনী শক্তি যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় অবশেষে সরকারকে নতিস্বীকার করিতে হইবে।

চরখা সঙ্ঘের খাদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইতেছে গ্রামে গ্রামে এই আদর্শ প্রচার করা। ঘরে ঘরে যাইয়া খাদির উপরিউক্ত বাণী প্রচার, খাদি বস্ত্র বিক্রয়, গ্রাম সংগঠন এবং গ্রাম স্বাবলম্বনের জন্য গ্রামবাসীদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজন আজ তীব্র ভাবে অনুভূত হইতেছে। এ যাবত গ্রামে উৎপন্ন খাদি সহরে বিক্রয় হইত। ভবিষ্যতেও কিছু খাদি সহরে বিক্রয় করিতে হইবে। এতদসত্ত্বেও যদি ব্যাপক ভাবে দেশে খাদি উৎপন্ন করা আমাদের লক্ষ্য হয় তবে মূলতঃ বস্ত্র স্বাবলম্বনের জন্যই খাদি উৎপন্ন করিতে হইবে এবং গ্রামবাসীদেরও গ্রামস্বাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। চরখা সঙ্ঘ যদি খাদি আন্দোলন দ্বারা এই কাজ করিতে সক্ষম হয় তবে গ্রামস্বাবলম্বনের নীতির ভিত্তিতে গ্রামরাজ্য স্থাপন করার যথেষ্ট গতি সঞ্চারিত হইবে। ভূদান যজ্ঞের আন্দোলন ও স্বভাবতই ইহার মধ্যে আসিয়া পড়ে। কারণ গ্রামে যদি সকলকে কাজ দিতে হয় এবং গ্রামস্বাবলম্বন করিতে হয় তবে জমির পুনর্বণ্টন হওয়া অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। ভূমির পুনর্বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের এই কথাটী স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রত্যেক গ্রামবাসীকে পুরা কাজ দিবার দায়িত্বও তাঁহাদের লইতে হইবে। এই দুই নীতি গ্রামকে স্বাবলম্বনের লক্ষ্যাভিমুখে লইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে চরখা সঙ্ঘ খাদি আন্দোলন দ্বারা গ্রামে এই ভাবে কাজ করিতে অভিলাষী।

ত্রিবিলনাড় এবং কেরল প্রদেশে চরখা সঙ্ঘের তরফ হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাদির কার্য্য চলে। সেখানকার অবস্থা বিশেষ জটীল হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য এই আন্দোলনের সূচনা ঐ এলাকাতেই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও যথাসাধ্য এই আন্দোলনে চালান হইবে। এই বৎসরের চরখা জয়ন্তীর প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আন্দোলন সুরু হইবে। *

* মূল হিন্দি হইতে শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত

বাংলা ও বাঙালী সমাজ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

এতোবড় দুর্বিপাক আর দুর্দিন বাঙালী জাতির জীবনে এর পূর্বে কোনো দিন আসেনি। কোনো দিন এমন দুর্ভাগ্যের কল্পনাও করেনি বাঙালী। স্মরণীয় কালের মধ্যে বাঙালী সমাজকে এমন ভয়ানক বিপর্যয়ের মুখোমুখী হ'য়ে জীবন সংগ্রামে কখনো অবতীর্ণ হ'তে হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হয়েছে—যতো নব নব রাজশক্তির উত্থান পতন ঘটেছে—ধর্মবিপ্লবের যতো ঝড়াবহ ঝড় বন্যা ব'য়ে গেছে এই বাংলার বক্ষস্থল দলিত মর্দিত ক'রে; কিন্তু তথাপি বাঙালী জাতিকে ছত্রভঙ্গ করতে পারেনি কেউ—কোনো শক্তিই একে দ্বিধা বিভক্ত করতে সমর্থ হয়নি। বাঙালীর অনেকেই অবশ্যার চাপে বাধ্য হ'য়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে—হিন্দু, বৌদ্ধ হয়েছে, মুসলমান হয়েছে—কিন্তু সামাজিক জীবনে নানাবিধ বাধা নিষেধ আর প্রত্যাখ্যান উপেক্ষা করেও অর্থনৈতিক আদানপ্রদানে এবং পরস্পরের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারে বাঙালী বাঙালীয়ানার ধারা যথাযথ বজায় রাখার প্রয়াস পেয়ে এসেছে। আপন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, তাকে গড়ার মধ্য দিয়ে মন্থর জীবনধারা অতিবাহিত করেছে দুর্দীর্ঘকাল ধরে। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় বাঙালীর জাতীয় জীবনেও অতি আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছিল সেদিন। এই বাঙালী হিন্দু মুসলমান সেদিন এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়েছিল—হয়েছিল তাদেরই "জাতীয়তাবোধ-শক্তিহীন স্বার্থান্ধ এবং চরিত্রহীন কতিপয় অভিজাত নেতার বিশ্বাসঘাতকতায়। সেদিন বাঙালী অতি অসহায়ভাবে মাথা নত ক'রে দাঁড়িয়েছিল বৃটিশ রাজশক্তির সামনে।

ভারতের ইতিহাসে, বাংলার ইতিহাসে সে এক কলঙ্কময় অধ্যায়—এক অভূতপূর্ব ঘটনা! যার পরিণতি বাংলার বুকে, গোটা ভারতের বুকে গভীর রেখাপাত ক'রে গেল। এতে শুধু রাজশক্তির পরিবর্তনই ঘটলো না, সমগ্র সমাজ-জীবনের ওপর এলো প্রচণ্ডতর আঘাত। বাংলার হিন্দু-মুসলমান যখন নিজেদের আচার-ধর্ম আর রক্ষণশীলতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ—যখন অতীত শতাব্দীর গতানুগতিক অভ্যস্ত চিন্তাধারা দলপুষ্ট, ঠিক সেই সময় মহাসাগরের বিপুল তরঙ্গের মতো ধেয়ে এলো য়ুরোপের বেগবান নতুন সভ্যতা। আছড়ে পড়লো বাংলার বদ্ধজলমতি সমাজ-জীবনের ওপর—ভেঙে চুরে খান খান ক'রে দিতে চাইলো তাকে। বদলে দিতে চাইলো তার রূপ। বদলে দিতে চাইলো তার হাজার হাজার বছরের প্রচলিত সমাজ-সাধনার প্রথাকে, তার সংস্কৃতিকে, তার কৃষ্টিকে। এক নতুন জাতির নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হ'ল ভারতবর্ষ। সবিস্ময়ে শুনলো আমেরিকার গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কথা। আশ্চর্য হয়ে গেল ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী শুনে।—রিনেসাঁসের যুগের যুক্তিপন্থী কল্পনার-বুদ্ধিমুক্ত বিশুদ্ধ জ্ঞান সাধনার ইতিহাস আর জড়-বিজ্ঞানের আশ্চর্য আবিষ্কার ভারতবাসীকে শুধু বিহ্বল ক'রে দেয়নি সেদিন—এক নবীন আদর্শে সচেতন ক'রে তুলেছিল—উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলেছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সুসঙ্গত ও শোভন সম্পর্ক সম্বন্ধে একটা নতুন বোধ জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু নির্জীব মনে সজীব মন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বাঙালীর মন মরা নয়—বাঙালীর মন অভ্যস্ত সচেতন; তাই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পাশ্চাত্যের শিক্ষা সভ্যতাকে স্বীকার করার পূর্বেই—বাংলা অসংকোচে তাকে স্বাগত অভিনন্দন জানিয়েছিল। বাঙালী নিজের প্রতিভা দ্বারা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সংযোগ ঘটাবার ঐকান্তিক সাধনা গ্রহণ করেছিল। এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হ'ল তারপর। বাঙালী তার ধর্ম আর সমাজ সংস্কার আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে এসে উপনীত হ'ল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের তোরণ-দ্বারে। বাঙালী কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো:

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়?

সমগ্র ভারত বাঙালীর সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের আহ্বানে চঞ্চলিত হ'য়ে উঠেছিল। ধীরে ধীরে উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল আন্দোলন।

বাংলায়—এই হিন্দু-মুসলমানের জন্মভূমি বাংলায় শুরু হ'ল রাজনীতিক জাতিগঠনের কাজ—জেগে উঠলো বাংলা নব-জাতীয়তাবাদের নবীনতম আদর্শে। বিদেশী বণিকরাজা—সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকসম্প্রদায় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল—প্রমাদ গণেছিল বাংলার সেই দুর্বার স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বিচার ক'রে। কিন্তু ক্ষমতা যাদের মুঠায় আবদ্ধ—অনুগ্রহ আর নিগ্রহ করার শিক্ষা যাদের আয়ত্তে—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কূট-কৌশল তারা নিপুণভাবেই প্রয়োগ করলে বাংলার ওপর। ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রসমাজের জাতীয় ঐক্যের আন্দোলনকে ভেদ এবং অনৈক্য দিয়ে বিশ্লিষ্ট ক'রে দেবার প্রয়াস করলে তারা কৌশলের ভাবে। সমস্ত বাধা সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পীঠস্থান এই বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে দিলে। সে অপমান, সে বেদনার কথা বাংলা ভোলেনি।

শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মধ্যে ইতিমধ্যেই যে নিবিড়তম ঐক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল—যে ভ্রাতৃত্ব বোধ অন্তরে ধারা বেঁধেছিল—তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি কিন্তু রাজশক্তির মুকুটের-শাসন। বিচ্ছেদের ফলে যেন আরো স্পষ্ট আরো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠলো। রাজনৈতিক চালে বাংলার মাটিকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে দিলেও বাঙালীর প্রতি বাঙালীর প্রীতির সত্তাকে—অন্তরের প্রণয়কে বিচ্ছেদের আঘাতে ভেঙে দিতে পারেনি বৃটিশ। অধিকন্তু এই বিচ্ছেদে মিলনের একাগ্রতা আরো যেন বেড়ে উঠেছিল—'বাঙালীর ঘরে যতো ভাইবোন' তাদের সকলকে এক করার সংকল্প যেন আরো কঠিন, আরো অমোঘ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজ বৃটিশ ভেদনীতির চাতুর্যে মুগ্ধ বিমুগ্ধ রইলো। বাংলার সে আন্দোলনে তারা যোগ দিলে না। মুসলিম নেতাদের কতটা অংশ সাম্প্রদায়িক পৃথক স্বার্থবাদের রাজনীতি গ্রহণ করলে।

"ঘরের ছেলের হাতে তোলেনি বিশ্ব তুলের হার,
বাঙালীর হিয়া অমির মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছড়ায়ে ভুবনময়,—
বাঙালীর ছেলে হাতে বুহতে গড়ায়ে সমুদয়।"

বাঙালী ক্ষুদ্র নয়—বাঙালী স্বার্থসর্বস্ব অনুদার নয়—বাঙালী সমন্বয়মুখী প্রতিভার অধিকারী। ভারত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বাঙলাই। তাই বাংলাকে নিশ্চিহ্ন করার সর্বপ্রকার কৌশল প্রয়োগ করলে বৃটিশ রাজশক্তি। বাঙালীকে নিছক নিঃস্বার্থে নিরীহ করতে পারলে অতীপ্সা অপূর্ণ থাকবে না সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজের। মর্মে মর্মে এ সত্য উপলব্ধি করেছিল তারা। বুকেছিল ভারতে আধিপত্য স্থায়ী এবং সুদৃঢ় করতে হ'লে প্রথমে বাংলার শক্তি খর্ব করতে হবে—তাকে পঙ্গু ক'রে দিতে হবে। কিন্তু বাঙালী ইতিমধ্যেই জেগে গেছে। বাঙালীর জাতীয় নেতৃত্বের অন্ত হ'য়ে গড়ে নেই। তারা নির্দেশ দিলেন—এই নিরক্ষর আর ধর্মান্ধতার দেশে শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা মানুষের মনের চোখ খুলে দিতে হবে; নইলে জাতীয় কল্যাণবিরোধী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। বিশ্বিত অবস্থাপন্ন বাঙালী প্রধানরা শিক্ষা-বিস্তারের কাজে অর্থব্যয় করতে লাগলেন মুক্তহস্তে। রাজশক্তির সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা ক'রে সমস্ত বাংলায় : বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে গড়ে উঠলো বে-সরকারী বহু ইস্কুল-কলেজ। স্বার্থান্বেষী চরিত্রবান অসংখ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক তুলি গ্রামের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর ঠিক এমনই সময় ইংরেজবন্ধুত্বকামী একদল যুবক—অগ্নিবীর্য শক্তি আর দুঃসাহস নিয়ে বিপ্লবের অভিযান শুরু করলেন। বাংলা সমিতি পাঠাগার এবং ব্যায়ামাগারের মধ্য দিয়ে জাতি গঠনের নতুনতর উদ্যম মেতে উঠলেন তাঁরা। তাদের এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো সমগ্র বাংলায়—সমগ্র ভারতবর্ষে। ছড়িয়ে পড়লো হিন্দু মুসলমানের মধ্যে, ছড়িয়ে পড়লো কৃষক মজুর বুদ্ধিজীবী সমস্ত শ্রেণীবিভাগগুলির মধ্যে। নির্ভরশীল গোলাম শ্রেণীর প্রতিকূলতার মধ্যে রাজশক্তির সমস্ত বাধা নিষেধ উপেক্ষা ক'রে দুস্তর সাধে দুরুহ কাজে শুরু করলেন তাঁরা। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ, বুদ্ধিহীন অন্ধকার ধর্মান্ধ গোঁড়ামি—যুক্তিহীন এবং বিরুদ্ধযুক্তির আচার নিয়ে কোনো কিছুই তাঁদের কাজপথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশ্ব শতাব্দীর মহাবিপ্লবের প্রলয়োত্তর-ইতিহাসে সে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রক্তাক্ষরে অঙ্কিত হয়ে আছে। কিন্তু ধর্মান্ধতার দুর্বুদ্ধি আর সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে বাঙালী তার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পারলে না।

বাঙালী চিরদিন আত্মভোলা জাতি। ভারতের স্বাধীনতার জন্যে হাসিমুখে আত্মবলী দিতে বাধে নি তার কোনোদিন। বাংলার বেইমানী কৌশল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করার দুরাশায় অযথা দুঃখ বরণ করেছে—অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছে। তাতেও নি পশ্চাতে—এতোটুকু ক্ষোভ প্রকাশ করেনি কোনোদিন কোনো স্বার্থত্যাগে—দেশজননীর মুক্তি সাধনায় সমস্ত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে। সমস্ত সুখ সাধ নাম, আরাম আয়েস পরমলিত ক'রে এগিয়ে গেছে সে চিরদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল উদ্ধারণে।

তারপর ভারতের নেতারা আপোষ করলেন বৃটিশের সঙ্গে। বৃটিশ ভারতকে দ্বিধাবিভক্ত ক'রে পাকিস্তান হিন্দুস্থান দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য সৃষ্টি ক'রে শাসনদণ্ড তাদের হাতে তুলে দিতে চাইলেন। অশোভনীয় লোভাতুরতায় নেতারা ইন্দ্র প্রত্যাহিত করলেন এবং কোনরূপ পরিমান চিন্তা না করেই বাংলাকে অনুরোধ করলেন—স্বাধীনতার জন্যে বাংলার দেহ খণ্ডিত করতে হবে। বাঙালী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়—বাঙালী স্বার্থপরও নয়—তাই অম্লানবদনে আত্মপরীক্ষা দ্বিধাবিভক্ত ক'রে স্বাধীনতার চরম মূল্যদান করলে বাঙালী। অর্ধ শতাব্দীর পৃথক না হওয়ার সংকল্প—বেমালুম, ধুয়ে, পদ্মা আর ব্রহ্মপুত্রের অগাধ সলিলে ভাসিয়ে দিয়ে বাঙালী চোখের জলে নিরুদ্দেশের যাত্রী হ'ল। ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত এবং উদগ্র পরধর্ম বিদ্বেষ বাঙালী মুসলমানের চিত্তে আর বুদ্ধিতে বিষক্রিয়া সৃজন করলে। দুইশত পাঁচ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্যে—সমস্ত মিলিত ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী সংগ্রাম শুরু করলে।

আজ বাঙালীর ঘোর দুর্দিন। বাঙালীর সমাজ-সংসার ছিন্নভিন্ন—থাকার ঠাঁই নেই, ক্ষুধার অন্ন নেই। বাঙালী আজ সর্বহারা পথের ভিক্ষুক—রাষ্ট্রের গলগ্রহ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আজ এসে উপনীত হয়েছে বাঙালী জাতি। ভারত রাষ্ট্রের নায়কদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর ক'রে আজ বাংলার জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করতে হ'চ্ছে। অথচ এই বাংলাই ভারতের স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু—এই বাংলাই নিজের অস্তিত্বকে ক'রে ভারতমাতার মুক্তির ধাম দিয়েছে। বিপন্ন বাংলার সংস্কৃতি আজ পরিম্লান, ভাষা রুদ্ধকণ্ঠ। যে ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে পরিগণিত। যে ভাষায় কাব্য সাহিত্য রচনা করে বাংলার কবি কিংবা সাহিত্য সৃষ্টির আলোড়ন এনেছেন—যে ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সাগ্রহ প্রচেষ্টা চলেছে সাগরপারের সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষা আজ তাঁরই জন্মভূমি ভারতবর্ষে লাঞ্ছিত উপেক্ষিত। ভারত-রাষ্ট্র-পরিচালকদের কানে বাংলার বাণী আজ পৌঁছায় না, বাঙালীর প্রার্থনা ভিক্ষুকের প্রার্থনার ন্যায় পরিত্যক্ত।

একদা শাসন সুবিধার অজুহাতে বৃটিশ যখন বাংলার একটা অংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে বিহারের সঙ্গে মিলিত ক'রে দিয়েছিল সেদিন ভারতের জননায়করা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। বৃটিশের সে আচরণের নিন্দা করেছিলেন। বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—স্বাধীনতা অর্জিত হ'লে বাংলার স্থান বাংলাকে প্রত্যর্পণ করবেন। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতে বাংলার সেই চল্লিশ বছরের ন্যায় সঙ্গত দাবী—রাষ্ট্রনায়কগণের কাছে অযৌক্তিক—বাঙালের প্রলাপ রূপে উপেক্ষিত। সেদিন বাংলার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ বিহারের সকল নেতারা বাংলার স্বরূপ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। আর আজ—ছিন্নমূল বাঙালী সমাজের দিকে তাকিয়ে বিহার সরকার ঘোষণা করছেন—'বাংলায় কোনো পৃথক সত্তা নেই—বাংলা ভাষা নেই—বাঙালী জাতি নেই।'—অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস!

আজ বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বাংলার ভবিষ্যৎ ভেবে ভীত শঙ্কিত। একটা প্রগাঢ় অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বাংলাকে গ্রাস করতে। সকলেরই মনে এক প্রশ্ন—বাংলার এই দুর্গতির শেষ কোথায়?

কিন্তু আজিকার এই দুঃখ-দুর্গতি যতই আত্যন্তিক হোক না কেন—বাঙালী মরবে না, বাঙালী বাঁচবে, আবার বাঙালী-সমাজ আত্মস্থ হবে। বাংলার আজ যোগ্যতর বলিষ্ঠ নেতা নেই। নাই থাক! কিন্তু বাংলার নেতা নেতাজীর বাণী বেঁচে আছে। নেতাজী বলেছেন: "বাঙালীকে সর্বদা এই কথা মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষে, শুধু ভারতবর্ষে কেন—পৃথিবীতে তার একটা স্থান আছে এবং সেই স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে।"—সুতরাং কর্তব্যবোধ হীনতা যেন বাঙালীর শক্তিকে লজ্জিত না করে। হতোদ্যম নৈরাশ্যে ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে বিলাপ আর দীর্ঘশ্বাস। নিষ্ক্রিয়তার অবসর এখন বাঙালীর নেই। নিজের শক্তির 'পরে নির্ভরশীল হ'য়ে বাঙালীকে দাঁড়াতে হবে—জাগতে হবে। নতুন উপনিবেশ, নতুন বসতির ঝুড়ো পড়ে তুলতে হবে বাঙালীর নতুন সমাজ। সত্যদ্রষ্টা বিশ্বকবি 'বাঙালী রবীন্দ্রনাথের' বাণীকে মন্ত্র ক'রে বাঙালীর নতুন পথে নতুন যাত্রা শুরু করতে হবে—

"বাংলার ঘরে যতো ভাই বোন
এক হোক, এক হোক
এক হোক হে ভগবান।"

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের পূর্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত

জয়ন্ত ॥ তারপর ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুর হুকুমে তাজমহলটাকে গুর্খা চাকরটা যেই সরাতে গেছে, বাবা ছুটে গেলেন তাকে বাধা দিতে। অন্ধ গুর্খাটা তখন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। মাথায় খুব চোট পেয়ে বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখেন তাজমহলটা নেই। চারদিকে তাকিয়ে তাজমহল খুঁজতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধারণা হয়ে গেল—তিনিই সম্রাট সাজাহান। ভুজংগ হচ্ছে ঔরংজীব—তার হাতে বন্দী তিনি। আমি জাহানারা, আর তুমি দারা। উন্মাদ তিনি ছিলেন না—কিন্তু এর পর থেকেই তিনি উন্মাদ হয়েছেন।

জয়ন্ত ॥ সে তাজমহলটা ফিরে পেলে হয়তো—কোথায় সেটা ?

জয়া ॥ ভুজংগবাবুও ওর মূল্য বুঝেছেন। সরিয়ে ফেলেছেন। সারা হাসপাতাল আমি খুঁজেছি—পাই নি।

জয়ন্ত ॥ ভুজংগ তা হলে তা শুধু সরায় নি—চুরমার করেছে—হয়তো বা পুকুরে ফেলে দিয়েছে। কোথা থেকে কী হয়ে গেল !

জয়া ॥ হতাশ হলে চলবে না, জয়ন্তবাবু। বাবা পাগল হয়েছেন সত্য, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। প্রকৃত ঘটনা জন-সাহেবকে জানাতে হবে। তাঁকে বোঝাতে হবে কত বড় একটা ষড়যন্ত্রে এত বড় একটা মহৎ প্রাণ কেন আজ অকারণ নষ্ট হতে চলেছে।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু জনসাহেব তো আর পাগল ভালো করতে পারবেন না। বরং আমি কলকাতায় যাচ্ছি—এখন সবচেয়ে বড় দরকার ওঁর চিকিৎসা। কিন্তু ভয় কী জানেন, জয়াদেবী ? চিকিৎসার সময়ও হয়তো পাব না।

জয়া ॥ কেন ? কেন, বলুন তো ?

জয়ন্ত। যে কোন মুহূর্তে হয়তো শুনবেন—"পাগলটা হাসপাতালে ছিল—ভুল করে বিষ খেয়ে মারা গেছে"। বাবাকে হাসপাতালে রাখার মতলবটাই তাই।

জয়া ॥ আপনি ভাববেন না। সে আমি দেখব।

জয়ন্ত ॥ এক সময় মনে হয়েছিল, আমার জীবনে যে আপনি এলেন—সে ছিল শুধু আমার একটা খেয়াল। এখন দেখছি তা নয়। আমার জীবনে—বাবার জীবনে তোমার আবির্ভাব বিধাতার বিধান।

জয়ন্ত চলিয়া গেল

জয়া ॥ কিন্তু জানি না—জানিনা, জয়ন্তবাবু, এর শেষ কোথায় ?

দরজার বাহির হইতে যুধিষ্ঠিরের গলা শোনা গেল—"বউদিদিমণি !"

জয়া ॥ কে ?

নেপথ্যে যুধিষ্ঠির ॥ আমি যুধিষ্ঠির—আসব ?

জয়া ॥ এসো।

একটি মোচকা মাড়ে লইয়া লাঠি হাতে যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ। লাঠি ও মোচকা নামাইয়া রাখিয়া সে খড় হইয়া জয়াকে প্রণাম করিল।

যুধিষ্ঠির ॥ কর্তাদাদা চলে গেলেন, বউদিদিমণি ?

জয়া ॥ হাঁা, কলকাতায় গেলেন। কিন্তু তুমিও চললে দেখছি।

যুধিষ্ঠির ॥ হাঁা, দিদিমণি। ওই কলকাতায়—অধম-তারণ কলকাতায়।

জয়া ॥ কেন, যুধিষ্ঠির ? তুমি আমার কাছে থাক।

যুধিষ্ঠির ॥ আর কোন্ মুখে এখানে থাকব দিদিমণি ? চুরি করা আমার একটা বদরোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চুরি করতাম—ধরা পড়তাম—তবু কর্তাবাবার দয়ায় মারধর হত না। অসুখটা বেড়েছে বলে আদর যেন আরো বেড়ে যেত। এখন ? এখন চুরি করব কি মায়ের চোটে পিলে ফাটবে। যুধিষ্ঠিরকে আর কে দেখবে, দিদিমণি ?

জয়া ॥ তা ঠিক। যে তোমাকে দেখত—সবাইকে

দেখত—সেই হয়ে গেল পাগল। (হঠাৎ যুধিষ্ঠিরকে) তুমি তাকে ভালো না করে—তার ভালো হওয়া না দেখে—তাকে ছেড়ে চলে যাবে, যুধিষ্ঠির ?

যুধিষ্ঠির। তাও তো বটে! কিন্তু কোন্ সাহসে থাকি, দিদিমণি? যে বদরোগটিতে ভুগছি—ধরা পড়লে—ক্ষেমাবেন্না কেউ তো করবে না, দিদিমণি। ধরবে আর পিলে ফাটাবে।

জয়া। বেশ—চলেই যেও তুমি, যুধিষ্ঠির। কিন্তু যাবার আগে—শেষ একটা চুরি করবে ?

যুধিষ্ঠির। সে কী, দিদিমণি? তুমি আমাকে চুরি করতে বলছ ?

জয়া। হাঁ যুধিষ্ঠির, বলছি। চুরি নয়—চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যুধিষ্ঠির। ওটা হল খিদে ভারি মজার কাজ। বলুন, দিদিমণি। মরা দেহে যেন আবার প্রাণ এল। বলুন—বলুন—

জয়া। তোমার কর্তাবাবার বড় সাধের ধন ছিল ওই তাজমহলটা।

যুধিষ্ঠির। তা আর জানি না। সেদিন কত কাণ্ড হল ওটা নিয়ে! ওটা সরালাম না বলেই তো আমার জবাব হল।

জয়া। কর্তাবাবার ওই সাধের জিনিসটা ভুজংগবাবু লুকিয়ে রেখেছেন—চুরি করেছেন। অথচ ওটা হারিয়েই তোমার কর্তাবাবা আজ পাগল। গোটা হাসপাতাল আমি খুঁজে দেখেছি—নেই। ভুজংগবাবু হয়তো বাড়িতে সরিয়েছেন।

যুধিষ্ঠির। না—না, সেটা তাঁর বাড়িতেও নেই।

জয়া। কোথায়—কোথায়, সেটা ?

যুধিষ্ঠির। আমার এই বোঁচকায়, আবার কোথায় ?

যুধিষ্ঠির বোঁচকা খুলিল। দেখা গেল, অন্যান্য অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে তাজমহলটি রহিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাজমহলটি জয়ার হাতে দিল। জয়া তাহা আবেগে বুকে চাপিয়া ধরিল।

জয়া। যুধিষ্ঠির! যুধিষ্ঠির!!

যুধিষ্ঠির। এইজন্যেই তো যাবার আগে আমার এখানে আসা। যার জন্যে আমার চাকরি গেল—আমার কর্তাবাবা পাগল হল—ভুজংগবাবুর সাধ্য কী তা গাপ করেন! উনি সরালেন বাড়িতে—আমি সরালাম বোঁচকায়। নাও—আমার কাজ ফুরোল। কর্তাবাবু ভাল হলে আমার নাম করে ওটা তাঁকে দিও। বোলো—দয়া করে এই অধমকে যেন মনে রাখেন। আসি, দিদিমণি—আমার আবার ট্রেনের সময় হল।

জয়া। দাঁড়াও।

জয়া ভ্যানিটি ব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া জয়ার হাতে দিল।

যুধিষ্ঠির। তা দিচ্ছ, দিদিমণি—নিচ্ছি। কিন্তু এমন নেওয়ায় সুখ পাই না, দিদিমণি—এমনি আমার বদরোগ। তা পিলেটা যদি না ফাটে—আবার আসব।

বোঁচকা বাঁধিয়া লইয়া জয়াকে প্রণাম করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান। জয়া তাজমহলটি একটা সুটকেসের ভিতর রাখিল। ভৃত্য সনাতন আসিল।

সনাতন। বউদিদিমণি, আপনার সঙ্গে একজন লোক দেখা করতে চায়। বড্ড কাল্লাকাটি করছে।

জয়া। কে, সনাতন ?

সনাতন। এই হাসপাতালের একজন রোগী।

জয়া। রোগী ? এখানে কেন ?

সনাতন। আপনার কাছে চুপি চুপি কিছু বলতে চায়।

জয়া। ডাকো।

সনাতন বাহিরে গিয়া অপেক্ষমান রোগী হলধরকে লইয়া আসিল।

হলধর। প্রণাম হই, মা। আমি হলধর—এই হাসপাতালের রোগী। ম্যালেরিয়ায় ভুগছি।

জয়া। কী বলবে—বল।

হলধর। যা বলব, তা আমার একার কথা নয়। হাসপাতালের সকল রোগীর পক্ষ থেকেই আমি বলছি মা। দয়াল ডাক্তারের হাতে ঘড়ি দিয়ে ভুজংগ ডাক্তার আমাদের মেরে ফেলছে—এ কি আপনি দেখেও দেখছেন না? ওষুধের টাকা—পথ্যের টাকা—সব নিজে খেয়ে, আমাদের না খাইয়ে শুকিয়ে মারছে। এর কি কোন প্রতিকার নেই মা ?

জয়া। এ অঞ্চলের লোকেরা সবাই তো এ সবই দেখছে; কিন্তু কেউ তো এগিয়ে আসছে না, হলধর। কেউ যখন কিছু করছে না—আমি কী করতে পারি ?

হলধর ॥ তোমাকে কিছু করতে হবে না, মা। তুমি শুধু আমাদের বল—দয়াল ডাক্তার সত্যি পাগল—না, তাঁকে জোর করে পাগল করা হয়েছে।

জয়া ॥ তোমরা রোগী—তোমরা অসুস্থ। এর ভেতর তোমরা এসো না, হলধর।

হলধর ॥ ও! ভাবছ, মা—আমরা রোগী—আমরা অসুস্থ—আমাদের গায়ে শক্তি নেই—কেউ হয়তো উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যাই—কারো হয়তো উঠবার শক্তি নেই। কারো হয়তো এখন-তখন! কিন্তু, মা, জেনো—'মরণকামড়' বলে একটা কথা আছে—'মরণকামড়'! ওকে আমরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব!

উত্তেজনায় হলধর কাঁপিতে লাগিল

জয়া। ছিঃ, হলধর, তুমি থাম। দুষ্কৃতের শাস্তি দেন ভগবান—তোমার-আমার শক্তি কতটুকু! তাঁকে ডাক, হলধর—তাঁকে ডাক। এমনি করিয়া চরে তাঁকে ডাকলে—দয়া তাঁর হবেই। সনাতন, ওকে রেখো এস।

সনাতন তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই সনাতন ফিরিয়া আসিল।

জয়া ॥ কী সনাতন?

সনাতন ॥ ছোটকর্তা।

জয়া ॥ কোথায়?

সনাতন ॥ বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?

জয়া ॥ একটু অপেক্ষা করতে বল—আমি শাড়িটা বদলে নিই।

সনাতন চলিয়া গেল। জয়া ক্ষিপ্রতার সহিত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর সুটকেসটি রাখিয়া আলমারি বন্ধ করিল এবং নিজেই পর্দা সরাইয়া দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—

জয়া ॥ আসুন, ভুজংগবাবু।

ভুজংগের প্রবেশ

নমস্কার।

ভুজংগ ॥ নমস্কার।

জয়া ॥ বসুন।

দুইজনে দুইটি আসনে বসিল

ভুজংগ ॥ হলধরকে দেখলাম। কী দুঃসাহস দেখুন—শেষকালে আপনাকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে এসেছে!

জয়া ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কোন প্রশ্রয় দিই নি। স্পষ্ট বলে দিয়েছি—আমি হাসপাতালের কেউ নই।

ভুজংগ ॥ মিথ্যা কথা।

জয়া ॥ মিথ্যা কথা?

ভুজংগ ॥ মিথ্যা নয়তো কী। আজ হাসপাতালের সকলে আপনার মুখের দিকেই চেয়ে আছে।

জয়া ॥ কেন, বলুন দেখি?

ভুজংগ ॥ দয়াল ডাক্তারের আর কিছু না থাক—উৎসাহ ছিল, উদ্দীপনা ছিল। সে উৎসাহের, সে উদ্দীপনার উৎস-ছিল প্রেম—সহধর্মিণী মমতার প্রেম। মমতার মৃত্যুতে তাই গড়ে উঠল এই মমতাময়ী হাসপাতাল—প্রেমের তাজমহল। আজ আমার ওপর হাসপাতালের ভার পড়েছে—কিন্তু কোথায় আমার উৎসাহ—কোথায় আমার উদ্দীপনা—কোথায় আমার প্রেরণার উৎস!.....যদি তুমি দয়া না কর, জয়া।

আকস্মিক এই 'আক্রমণে' লজ্জায়, ঘৃণায় জয়া বক্রিম হইয়া উঠিল। কী বলিবে—কী করিবে, ভাবিয়া পাইল না। তাহার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া ভুজংগ পুনরায় বলিতে লাগিল—

ভুজংগ ॥ তুমি যদি কারো বিবাহিতা বধূ হতে—এ আশা, এ সাহস আমার হত না। এসব কথা আমার বলাও হত পাপ। আজ তোমার ওপর জয়ন্তের যে দাবি—আমার হৃদয়ের দাবি তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। (আবেগে) জয়া—জয়া—

জয়া ॥ আপনি থামুন। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নি—এ কথা এক শুধু আপনিই জানেন। এখানে আর কেউ তা জানে না। আপনার এ কথা শুনলে—তারা কী ভাববে?

ভুজংগ ॥ যে শুনলে ভাবনার কথা ছিল—সে আজ জগতের সব কথার বাইরে, জয়া। আর কে কী ভাববে—তার জন্যে আমি ভাবি না। তুমিও ভেবো না, জয়া।

জয়া ॥ কিন্তু এও তো হতে পারে, ভুজংগবাবু, যে, দীনদয়াল চৌধুরী আবার ভাল হতে পারেন।

দুরাগ ॥ শুধু এই তোমার ভয়, জয়া ?

জয়া ॥ কী অগাধ স্নেহই না তাঁর কাছে আমি পেয়েছিলাম ! ভাগ্য হয়ে যদি তিনি শোনেন—তিনি দেখেন যে, আমি—

দুরাগ ॥ আমি বলছি—ভাল হবার তাঁর কোন আশা নেই, জয়া।

জয়া ॥ ইনগারেবেলে তবে কোন চিকিৎসা নেই বলুন !

দুরাগ ॥ কেন থাকবে না ? চিকিৎসা আছে। কিন্তু যা দিয়ে চিকিৎসা হবে—দয়াল ডাক্তারের তা নেই।

জয়া ॥ আপনি বোধহয় ওই তাজমহলটার কথা বলছেন ?

দুরাগ ॥ কথাই তোমার মনে ছিলাম—এখন দেখ ছলাম তোমার চোখে।

না—না, তখন—তাজমহলটা তো আছে।

আছে ! কোথায় আছে ?

কেন, চোখে তোমার ?

দুরাগ ॥ নেই—নেই।

জয়া ॥ কেন ফেলিনি যে ওই শুখাটা—

দুরাগ ॥ শুখাটা ? হাঁ শুখাটা—তবে শোন জয়া। শুখাটা ফেলেছিলে—তাজমহলটাকেই আমি সইতে পারছিলাম। তাই আমি সরাতে বলছি। মনিবকে খুশি করবার জন্য শুখাটা তাজমহলটাকে শুধু ঘর থেকে সরায় নি—পৃথিবী থেকেই সরিয়েছে—চুরমার করে ফেলেছে।

জয়া ॥ (কণ্ঠে আর্তনাদ) স্যাঁ !

দুরাগ ॥ হাঁ—হাঁ। ওই তাজমহলটা সরিয়েছিলাম বলে দয়াল ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়েছে। ফিরে পেলে আবার হয়তো ভাল হত। সে আশা আর যখন নেই—আমি কেন তোমাকে আশা করব না জয়া ! বল—বল ? ...না—না, চুপ করে থেকো না, জয়া। ডাক্তার বোসের রিপোর্ট পেয়ে এক মেডিকেল কমিশন আসছেন। তাতে থাকবেন ডাক্তার বোস—আরো দুজন বড় ডাক্তার সেই মেডিকেল কমিশন আজই এখানে এসে দয়াল ডাক্তারকে পরীক্ষা করবেন।

জয়া ॥ আজই ?

দুরাগ ॥ হাঁ, আজই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় দয়াল ডাক্তারের পরিণাম কী আমি জানি। কিন্তু আমার পরিণাম তোমার হাতে।...আমি উত্তর চাই, জয়া।

জয়া ॥ উতলা হবেন না, দুরাগবাবু। একটা তাজমহল গেছে। আর একটা তাজমহল আমরা গড়ব। চিন্তা কী ?

দুরাগ ॥ সত্যি সত্যি এ আশা তবে আমি করতে পারি ?

জয়া ॥ ধৈর্য ধরুন, দুরাগবাবু। মেডিকেল কমিশন আসছে বিকেলে। কয়েক ঘণ্টা বাদে। তাজমহল গড়তে সময় লাগে। এই কয়েক ঘণ্টা অন্তত অপেক্ষা করুন।

দুরাগ ॥ হুঁ ! জীবনে অনেক মেয়ে নিয়ে খেলেছি ; কিন্তু তোমার মত সুচতুরা-সুদর্শনা মেয়ে আমার জীবনে এসেছে দেখছি এই প্রথম। শোন, জয়া, তাজমহলটা চুরমার হয় নি, চুরি গেছে। কেন চুরি হয়েছে, কে চুরি করেছে, এখন বুঝছি—তোমার ওই হেঁয়ালিভরা কথায়। তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ভাগ্যের এই জুয়াখেলায় যদি আমি হারি—তাজমহল ফিরে পেয়ে সম্রাট সাজাহান যদি আবার দীনদয়াল হন—তোমার প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার কথা তাঁকে জানিয়েই বিদায় নেব। দীনদয়াল যত দয়ালই হোন—তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন না। বিদেয় হতে হবে তোমাকেও—সংগে সংগে। একবার ভেবে দেখ, জয়া, দীনদয়াল যদি সম্রাট সাজাহান রূপে বন্দী থাকেন, তাতেই বোধহয় মঙ্গল—শুধু আমার নয়, তোমারও। আচ্ছা আসি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শিল্পাচার্য্য যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

যে দেশে অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর—সে দেশে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র খুবই প্রসারিত—একথা বলা চলে না। এ রকম পরিবেশে সে দেশে যথার্থ একজন প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব সত্যই বিস্ময়কর।

ইউরোপে যেমন Corotকে Futher of the Landscape painter বলা হয়, সে রকম যামিনীপ্রকাশকেও আমাদের দেশের Father of the Indian landscape painter বলা চলে। বস্তুতঃ যামিনীপ্রকাশের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার মত দর্শাঙ্গীন বস্তু-সম্পূর্ণ ভূদৃচিত্র এ দেশে কেহ আঁকিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

১৮৭৯ খৃঃ ৭ই অক্টোবর যামিনীপ্রকাশ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। গুণেন্দ্রনাথ শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের পিতা এবং যামিনীপ্রকাশের পিতা জ্যোতিঃপ্রকাশের মাতুল। যামিনী-প্রকাশ ও অবনীন্দ্রনাথ একই বাড়ীতে একত্রে মানুষ হইয়াছিলেন। তখন কে জানিত এই দুই বিভিন্নমুখী শিল্প প্রতিভা একদিন ভারতের শিল্পাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত অবস্থান করিবেন? অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের শিল্প-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল—ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন—আর যামিনী-প্রকাশের জীবনব্যাপী সাধনা—পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে অঙ্কন প্রচেষ্টা—তাহার

যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

সর্দ্দারজী

সাধনায় শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন জগতের রূপ আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া ধরা পড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পের তথাকথিত রাজা রবিবর্ম্মার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যে শিল্পপ্রবাহ প্রায় নিষ্ফল হইয়া পড়িয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যামিনীপ্রকাশ তাহার পুনরুজ্জীবনের জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে যে যামিনীপ্রকাশই রাজা রবিবর্ম্মার শিল্পধারার বাহক ও পরিপোষক।

বাঙ্গালী একদিন সমস্ত ভারতে সর্ব্ববিষয়ে প্রাধান্যবিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহার সে দিন নাই। বাংলার আয়তন সঙ্কুচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীও যেন বড়ই দীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শিল্পাচার্য্য যামিনীপ্রকাশ পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টার হিসাবে সমস্তভারতীয় শিল্পীমণ্ডলে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার

বেদদূত

মৃত্যুর সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িল—বাংলার সে সম্মানেরও সমাধি ঘটিল।

বাল্যকালে যামিনীপ্রকাশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। স্বাস্থ্যলাভের জন্য অভিভাবকেরা তাঁহাকে ঠাকুরবাবুদের পাবনার জমিদারীতে মাঝে মাঝে বোটে করিয়া ভ্রমণ করাইবার ব্যবস্থা করাইতেন। এই সময় হইতেই বৃক্ষ-চিত্রের দিকে তাঁহার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

সমস্ত দিন বোটে বসিয়া বালক যামিনীপ্রকাশ খাতা ও রঙিন পেন্সিল লইয়া ছবির পর ছবি আঁকিয়া যাইতেন। আকাশ, নদী, হরিৎ ক্ষেত্র, দূর গ্রামের বৃটির ছোঁয়া, তীরের ঘন নীল বৃক্ষরাজি বালকের মনে অপূর্ব্ব রং-এর নেশা লাগাইয়া দিত। যতক্ষণ দিনের আলো থাকিত, ততক্ষণ বালকের ছবি আঁকার কাজ বন্ধ হইত না। তাহার নিকটের গাছ-পালাগুলির গাঢ় রং ও দূরের গাছ-পালাগুলি ধূসর হইতে ধূসরতর হইয়া যাইত। রং ব্যবহারের এই পরম সত্যের সন্ধান বালক বোটে বসিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই ভাবেই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনের দৃশ্য চিত্র অঙ্কনের প্রথম পাঠের সূচনা হয়।

ঠাকুরবাড়ি হইতে পাল্কী করিয়া তিনি সিটি কলেজিয়েট স্কুলে পড়িতে আসিতেন। সেখানে কালীবাবু নামে একজন ড্রইং শিক্ষক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা তাঁহাকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। দেশ-বিদেশের বড় বড় চিত্রকরদের কথা তিনি বলিতেন এবং বালক বাড়িতে যেসব ছবি আঁকিতেন স্কুলে বসিয়া তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া দিতেন।

এই সময়ে তাঁহার পিতা জ্যোতিঃপ্রকাশ ঠাকুরবাড়ি হইতে ১৭১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে চলিয়া আসেন এবং যামিনীপ্রকাশ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলে থাকা-কালীন স্কুলের থিয়েটারের জন্য তিনি একখানি সিন আঁকিয়াছিলেন। থিয়েটার দেখিতে আসিয়া তদানীন্তন লেপ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণরের দৃষ্টি সিনখানির উপর আকৃষ্ট হয়। তিনি উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং যামিনীপ্রকাশকে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হইতে উপদেশ দেন। এখান হইতে ভূনিয়ার কেথি্‌ড্রল পাশ করিয়া তিনি ১৮৯৬ সালে আর্ট স্কুলে ভর্ত্তি হন। তখন, ও. সিলার্চি সাহেব আর্ট স্কুলের

প্রিন্সিপাল। সাহেবের হাতের কাজ দেখিয়া প্রিন্সিপাল তাঁহাকে প্রথমেই থ্রী-নাইক ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লেন। কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে তিনি তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

পোর্ট্রেট ও লাণ্ডস্কেপের কর্ত্তার পাইয়া পরম পুলকিতচিত্তে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। তখন ভারতীয় প্রতিভাশালী চিত্রকরেরা মাত্র একটানার মোহে প্রাচীন পদ্ধতির অনুকরণ-সাধনায় ছবিতে রংএর ওয়াস

যাদব দিনে

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে পোর্ট্রেট আঁকিবার ডাক পাবার সঙ্গে একজন ইংরেজ চিত্রকর আসেন। তিনি মহারাজার অনেকগুলি পোর্ট্রেট করেন। তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ দুই জনেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবনীন্দ্রনাথ কিছুদিন পরেই পোর্ট্রেট আঁকা ছাড়িয়া দিলেন; কিন্তু যামিনীপ্রকাশ একাদিক্রমে তিন বৎসর তাঁহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতে পোর্ট্রেট পেণ্টার হিসাবে তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। লাইফ হইতে লিটিং নিয়া তিনি যত কাজ এই সময় হইতেই করিতে আরম্ভ করেন।

বধা দিনের আলো

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমাদের দেশীয় রাজা, মহারাজাগণ সাহেবিয়ানায় মাত্র প্রথম পাঠ শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের মোগল আমলের সাজ পোষাক ছাড়িয়া রিজেণ্ট সাহেবদের নিকট হইতে ইউরোপীয় সাজ পোষাক, গৃহ সজ্জা, আদব কায়দা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সময়ে ঐ সব রাজ দরবার হইতে বিলাতী চিত্রকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকার

ছিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন শুধু মাত্র পোর্ট্রেট ও লাণ্ডস্কেপ করিয়া বিদেশী চিত্রকরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা এই দেশ হইতে লইয়া গিয়াছে, তাহার খবর

আমরা ভরতম হাজি : হয়েলা, সাহিবেলা, হরদুর, বোধপুর, বিকানীর, মহলপুর, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের প্রাসাদ-কক্ষগুলির মিঃ মিস্ প্রাসাদ

ইংলণ্ডের লর্ডদের গৃহের অনুরূপ করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। আমাদের দেশের কোন এক মস্ত বড় জমিদার তাঁহার প্রাসাদখানিকে ঠিক বাকিংহাম

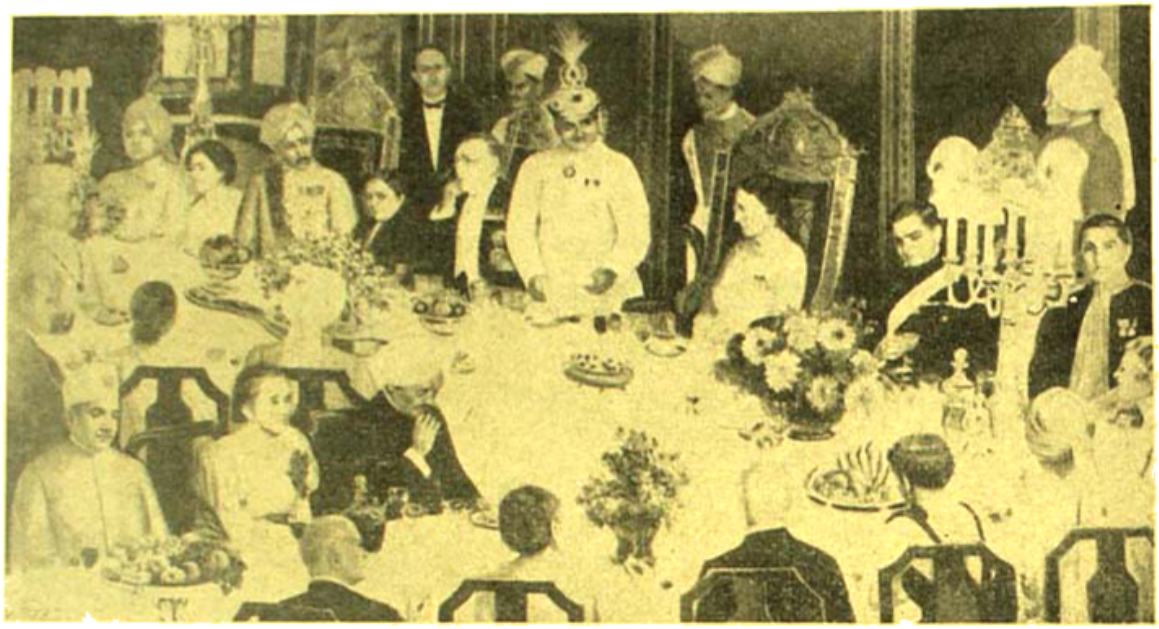

প্রাসাদের চক্র প্রতিযোগিতায় তাঁহার চিত্রকরদের চিত্র চক্র করিতে চক্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেশবাসীর জন্যের ছবিগুলি ও তাহাদের

চক্র লক্ষ্য

ব্যক্তিগণও বিলাতী শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্র দিয়া তাঁহাদের গৃহ একেবারে

প্যালেসের মত করিবার জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বাকিংহাম প্যালেসের কোন্ কোন্ কোণে এবং কোন্ কোণে কোন্ কোন্ ছবি আছে, তাহার ফটোগ্রাফ ও রঙিন প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া, বিলাতী চিত্রকরের হাতে ঐ সব বৃহদাকার চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ছবিগুলি যদি তৃতীয় শ্রেণীরও হইত তবুও দুঃখ থাকিত না। উক্ত জমিদার এই কার্য্যে যত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন তাহার এক চতুর্থাংশ দিয়াও যদি কোন বিদেশী শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের দুই একখানি চিত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন তবে আমাদের দেশের চিত্র লক্ষ্মীছাড়া হইত। আসল কথা ছবির চক্র তাঁহার মোটেই মাথাব্যথা ছিল না; ছিল লাহেবিয়ানাতে—সকলের উপর টেক্কা দেওয়াই ছিল তাঁহার মূল উদ্দেশ্য। কি করিলে ও কি বলিলে সাহেব মহলে মান, খাতির, প্রতিপত্তি বাড়িবে, কি করিলে বলনাচে "বোষ্ট আপ টু ডেট" বলিবে—ইহা লইয়াই ছিল তাঁহাদের যত চিন্তা, যত ভাবনা। এমন কি, অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে রাজা, মহারাজা, ও জমিদারদের পুরাতন হল ঘরে বা বৈঠকখানাতে একটা করিয়া সকল কালার মেস রাখারও রেওয়াজ হইয়াছিল। অবশ্য কালার মেস ডেকোরেশনের ব্যবস্থাও যথারীতি ব্যয়বাহুল্যের আড়ম্বরের সহিতই সম্পন্ন হইত।

সে যাহা হউক, এই সব বিদেশী ভাগ্যান্বেষী চিত্রকরদের নিকট হইতে বা এই সব শিল্পী ব্যাপারের মুখ হইতে কিছুটা অংশ সর্ব্বপ্রথম ছিনাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিন জন বাঙ্গালী চিত্রকর। তাঁহাদের একজন শশী সেন, একজন যামিনীপ্রকাশ এবং একজন শ্রীপুলিন বসু।

যামিনীপ্রকাশই ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের দেশের শিল্প ক্ষেত্রে শক্তি দেবের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনই বিস্ময়কর—ময়মনসিংহের এক অখ্যাত পল্লীতে দীন-দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করিতে করিতে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় কলিকাতা আসিয়া, আর্ট স্কুল, তার পর ইটালী এবং তার পর সমস্ত ইউরোপ হইতে কি ভাবে তিনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা এক চমকপ্রদ কাহিনী। তুলিতে তাঁহার যেমন দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু, কি এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি সর্ব্বদা উদভ্রান্ত থাকিতেন যে যতখানি নিষ্ঠা ও আগ্রহ নিয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিতেন, কাজ শেষ করা পর্য্যন্ত ততখানি নিষ্ঠা আর তাঁহার বজায় থাকিত না। এজন্য দেশে তাঁহার স্থান হইল না। তিনি বিদ্যুতের মত একবার জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিভাইয়া গেলেন।

যামিনীপ্রকাশের আরেক বন্ধু শ্রীযুক্ত পুলিন কুণ্ডু মহাশয় উনবিংশ শতকের শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতকের প্রথম ভাগের মধ্যে বহু রাজামহারাজার দরবারে অর্থ, মান ও মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। দেশীয় চিত্রকরের আঁকা ছবি যে সাহেব-চিত্রকরের ছবি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, পুলিন কুণ্ডু মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন।

যামিনীপ্রকাশ রাজামহারাজাদের দরবারে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগী বিদেশী শিল্পীগণের নিকট নিজের দেশের প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর পক্ষে ইহা পরম গৌরবের কথা।

অবশ্য ইহাও সত্য যে যাহা দেশের জনসাধারণ বা তাঁহার ছবি দেখিয়াছে অথবা তাঁহার নাম শুনিয়াছে। যাঁহাদের ছবি কাগজে প্রকাশিত হয় তাঁহাদেরই দুই চারিজনকে লোকে চিনে। যামিনী-প্রকাশের ছবি প্রায় সবই তাঁহার দৃষ্টির ওই তাঁহারই রাজামহারাজাদের প্রাসাদে চলিয়া যাইত। এইজন্য দেশের জনসাধারণ তাঁহার ছবি দেখিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। দুই চারিখানি ছবি মাত্র

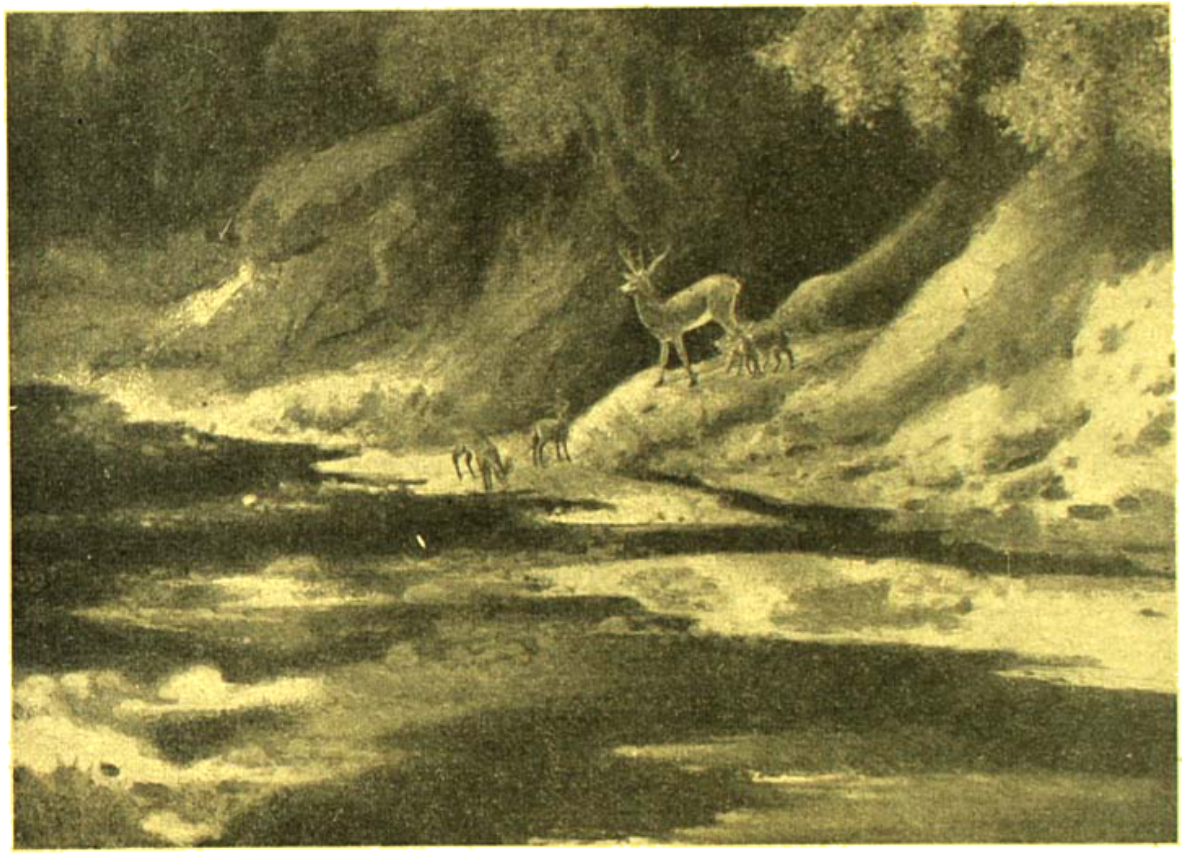

পার্ব্বতী শ্রোতস্বিনী

চিত্র প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইত তাহাই দুইদিনের লোকে দেখিবার মাত্র।

সম্প্রতি একাডেমি অব ফাইন আর্টসের সুযোগ্য সভানেত্রী লেডি রাণু মুখার্জ্জি যামিনীপ্রকাশের একটি রিট্রোস্পেক্টিভ এক্সিবিশনের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। যে সব রাজা দরবারে তাঁহার ছবি রহিয়াছে, এই উদ্দেশ্যে ঐ সব বহুমূল্য বৃহদাকারের ছবি সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা তিনি করিবেন। এই বিরাট তথা বহুব্যয়সাধ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হইলে দেশের জনসাধারণ যামিনীপ্রকাশের ছবিগুলি একসঙ্গে দেখিবার

সুযোগ পাইবে। আমরা এতদ্বিষয়ে সহায়ভূতির এই দান একান্তে অভিনন্দিত করিতেছি।

যামিনীপ্রকাশের বয়স যখন ২৯।৩০ বৎসর, তখন তিনি কাশ্মীরের উপাখ্যান অবলম্বনে কয়েক দুইখানি বিশালকায় কম্পোজিসন করেন। একখানি "সুরথের রাজ্যলাভ", অপর খানি "ভগ্নমুখে উপাখ্যান শ্রবণ।" যদি কখনো বাংলা দেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাস লেখা হয়, তবে যামিনীপ্রকাশের এই কম্পোজিসন দুইখানিকে বাংলার সর্বপ্রথম সার্থক ও শক্তিশালী উদ্যম বলিয়া লেখা হইবে। "সুরথের রাজ্যলাভ" ছবি-খানি প্রায় বৎসরখানেক হইতে ১৮ সংখ্যক রহিয়াছে। "উপাখ্যান

মুর্শিদাবাদের নবাবের পোর্ট্রেট
অঙ্কনরত—শিল্পাচার্য যামিনীপ্রকাশ

শ্রবণ" ছবিখানি শিল্পী তাঁহার পতন কাকাকে উপহার দিয়াছিলেন। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, ছবিখানিকে ধূলি ধূসরিত অবস্থায় পতনবাগানের সিঁড়িকোঠার তলায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। উপহারপ্রাপ্ত জিনিষ বলিয়াই বোধ হয় ছবিটির ভাগ্যে এমন দারুণ অশ্রদ্ধা ও তাচ্ছিল্য জুটিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতে ছবি দুইখানির বৃহদাকার লিথো প্রতিলিপি করা হইয়াছিল, তাই দেশের লোক ছবি দুইখানি দেখিয়া আনন্দ পাইতেছে।

এই সময়েই তিনি ওয়াটার কালারে কতকগুলি ছোট ছোট কম্পোজিসন করেন; তাহার মধ্যে "রাধাষ্টমী", "জন্মাষ্টমী", 'বংশীধারী' প্রভৃতি কয়েকখানি ছবি আজও তাঁহার বাড়িতে রহিয়াছে। এতদিনের আঁকা ছবি, কিন্তু রংএর ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও ম্লান হয় নাই।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সিমলার চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা "গঙ্গার ঘাট" ছবিখানি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। লেডি কার্জন ছবিখানি ক্রয় করেন। এই সময় হইতেই তিনি আভিজাত মহলে পরিচিত হন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার "মেঘদূত" ছবিখানি বোম্বাই চিত্র প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। নিউইয়র্ক আর্ট গ্যালারী এই বৎসরই তাঁহার দুইখানি ছবি ক্রয় করে। তাঁহার বিখ্যাত ছবি "যুদ্ধের পূর্বাভাস" এবং "পূর্বরাগ" এই সময়েরই আঁকা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবার হইতে ভারতসম্রাট পঞ্চমজর্জ এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীকে একখানি সম্মান পত্র প্রদান করেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনিসে যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় তাহাতে—ভারতবর্ষ হইতে মাত্র যামিনীপ্রকাশের তিনখানি ছবি স্থান পায়। এর মধ্যে ছিল দুইখানি পদ্মা নদীর এবং একখানি কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য চিত্র।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বোম্বাই চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁহার "গ্রে এণ্ড গোল্ড" (শিল্পীর কন্যার প্রতিকৃতি) ছবিখানি সর্বশ্রেষ্ঠ একজিবিটরূপে আদৃত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় ছবিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যামিনীপ্রকাশ রংএর যে সামঞ্জস্য ও রং ব্যবহারের যে অপূর্ব কৌশল দেখাইয়াছেন তাহা প্রকৃতই অনবদ্য। পরবর্তী জীবনে তিনি যত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, 'গ্রে' এণ্ড গোল্ড' এই দুইটি রংই ছিল সেগুলির প্রাণস্বরূপ। তাঁহার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' গ্রে এণ্ড গোল্ড, তাঁহার "পদ্মা" গ্রে এণ্ড গোল্ড, তাঁহার বিশালকায় হিমালয়ের ছবিও গ্রে এণ্ড গোল্ড। তাঁহার পোর্ট্রেট, তাঁহার ল্যাণ্ডস্কেপ সবই গ্রে এণ্ড গোল্ড। এক কথায় বলিতে গেলে তাঁহার সমস্ত চিত্রই ঐ দুইটি রংএর অপূর্ব সমাবেশ। ইহা যামিনীপ্রকাশের সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

এই বছরেই তিনি সর্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাসবিহারী ঘোষের ছবি আঁকিবার অর্ডার পান। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অর্চারী কাজের ইহাই আরম্ভ।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল পার্সি ব্রাউন সাহেব যামিনী-প্রকাশকে আর্ট স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল রূপে কার্যভার গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। তদবধি ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে যোগ্যতার সহিত অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে নানা রাজদরবার হইতে তাঁহার ডাক পড়িতে সুরু করে। ত্রিপুরা কোচবিহার, যোধপুর, জয়পুর, কুপাল, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের রাজামহারাজাদের পোর্ট্রেটের কাজই তখন বেশি হইয়াছিল। কোচবিহার হইতে তিনি এক সঙ্গে আটখানি লাইফ সাইজ পূর্ণাবয়ব ছবির অর্ডার পান। তাহার মধ্যে জিতেন্দ্র-নারায়ণ ভূপবাহাদুর ও মহারাণী ইন্দিরা দেবীর ছবি দুইখানি বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে এবং বর্ণ ব্যঞ্জনায় অপূর্ব। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই সব বৃহদাকার অয়েল পেইন্টিংগুলি তিনি মাত্র ৭।৮ দিনের মধ্যে

শেষ করিয়া ফেলিতেন। এত বড় বড় পোর্ট্রেট, তাহাতে অসংখ্য মণিমাণিক্যযুক্ত সাজ-পোষাক, নানাপ্রকারের, নানাবর্ণের ফেব্রিক্স্‌ওত সাজসজ্জা, ব্যাক-গ্রাউণ্ডে কারুকার্য্যখচিত মোগল ইত্যাদি, সবই যেন ছোকরাদের মত শিল্পীর তুলিকায় মুখে দ্রুত পরিস্ফুট হইত। আমরা তাঁহার ছবি আঁকার সময় দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি—তিনি কি হইতে কি করিতেছেন, তাহার কোন হদিস কখনো পাই নাই।

পার্সি ব্রাউন সাহেব তৎকালে প্রিন্সিপাল ছিলেন বটে; কিন্তু আমরা কখনো তাঁহাকে কোন ক্লাসে যাইতে দেখি নাই। শুধু শুনিতাম সাহেব আছেন—এইটুকুই আনন্দ। কখনো শুনিতাম—সাহেব বাহিরে গেলেন, কখনো শুনিতাম সাহেব খাস কামরায় আছেন,—এমনকি, মাসে ২।৩ দিন ব্যতীত তাঁহার সঙ্গে ছাত্রদের দেখা সাক্ষাৎই হইত না। উপরের ক্লাস দুইটী যামিনীবাবুই নিতেন। সকালে দশটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাদা প্যাণ্ট, সাদা কোর্ট, সাদা জুতা পরিয়া 'দেবদূতের' মত স্কুলে প্রবেশ করিতেন। অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত আমাদের—মাষ্টারমশাইকে সর্ব্বদা মনে হইত তিনি যেন সকলের উর্দ্ধে—সকলের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। দশটা হইতে দুইটা পর্য্যন্ত তাঁর ঘরে বসিয়া তিনি আপিসের কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। ক্লাসে মডেল বসিয়া থাকিত, আমরা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মত, ছবিতে রং চাপাইয়া তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতাম। কখনো বা তাঁর' দরজার ফাঁক দিয়া দেখিতাম, তিনি অফিসের ফাইল লইয়া মহা ব্যস্ত রহিয়াছেন। দুইটা বাজা মাত্রই তিনি ক্লাসে আসিয়া প্রথমে যে ছেলেটি ইজেল পাইতেন নিঃশব্দে তার রংএর পেলেট খানি হাতে তুলিয়া লইতেন। দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁর কাজ দুরস্ত করিয়া পরবর্ত্তী ছেলের ইজেলে যাইতেন। এই ভাবে প্রতি দিন ১০।১৫টি ছেলের ছবি দেখাসত করিয়া দিয়া চারিটার সময়, তাঁহার দরদরে সাদা রুমাল খানিতে হাত পুঁছিয়া চলিয়া যাইতেন। বিদ্যুৎ গতিতে তিনি পোর্ট্রেট মিলাইয়া যাইতেন। এ দক্ষতা যে কত দিনের সাধনার ফল এবং এ বর্ণ

পুষ্পস্তবক

গ্রে এণ্ড গোল্ড

সামঞ্জস্য যে কত গভীর অন্তর্দৃষ্টির অভিব্যক্তি, আমরা তখন তার মর্ম্ম কি বুঝিব?

ধনীর দুলাল ছিলেন তিনি, অদ্ভুত শিল্প প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনে তিনি যত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ছিলেন, ভারতের

কোন চিত্রকরের ভাগ্যেই তাহা সম্ভবপর হয় নাই। আজ যাঁহারা দেশের যে কয়েক শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর নাম আমরা জানি, সকলেই তার জন্য,—যামিনী রায়, অতুল বসু, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্র গুপ্তকুলী, বীরেশ্বর সেন, ডাক্তার কস্তগীর, ডাক্তার মোহিনী সেন, পরেশ মজুমদার, উপেন কর্মকার, বরদা পাত্র সবই তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। কিন্তু জীবনে তিনি কোন দলে যান নাই; বা একটা নিজস্ব দল পাকাইবার কোন চেষ্টাই করেন নাই।

আমাদের দেশে যতটুকু ছবি আঁকা হইয়াছে, বাবামুবাদ ও কালঘোঁটাঘুঁটি হইয়াছে তার চাইতে অনেক বেশী। তিনি ইচ্ছা করিলে এই সব সুযোগে শিল্পের নিয়ে একটা দল সৃষ্টি করিয়া চাক ঢোল বাজাইয়া অনায়াসে কেন্দ্রস্থলের মতলবের হইয়া বসিতে পারিতেন। কিন্তু সেই দিক দিয়াই তিনি যান নাই। এমন ভদ্রলোক, এমন এক কথার মানুষ, এমন সরল অমায়িক, এবং এমন অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

তিনি বলিতেন, "আমি কথা বা দল বা মতবাদ লইয়া কি করিব? আমি যাহা বলিতে চাই তাহা ত আমার ছবিতেই প্রকাশ পাইতেছে—তাহা ভাল কি মন্দ, এদেশী কি ওদেশী তাহা আমি জানি না। শুধু এই মাত্র জানি ছবিই আমার কথা, ছবিই আমার দল।"

আমাদের শিল্পীসমাজ অতি ক্ষুদ্র হইলেও আমরা যে দল পাকাইতে কাহারও অপেক্ষা কম যাই এ কথা স্বীকার করিব না। কিন্তু এই যে একটি মানুষ: মানুষের জীবনে যাহা কিছু কাম্য সবই যাঁহাকে ভগবান অকৃপণ ভাবে দিয়াছিলেন। তিনি এমন নিঃস্পৃহ, এমন সংযতভাবে অর্থ পত্নীর উপরে—আমাদের দেশে, আমাদেরই মতন মানুষ নিয়া কাটাইয়া গেলেন—কোন মন্ত্র বলে? তাঁহার সমালোচকেরা তাঁহাকে, "সাহেব," "রাজা মহারাজাদের আর্টিষ্ট," "দেশের নাড়ীর সহিত তাঁহার কোন যোগসূত্র নাই", "বিলাতী ধরণের ছবি," "ভাব শূন্য ছবি" বলিয়া, বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি অবিচলিত চিত্তে—তাহা হজম সহ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কাহারও কোন কথায়—কখনো প্রতিবাদ করেন নাই। নিজের ইডিওতে বসিয়া আপন মনে ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

১৯২১ সালে ফাইন আর্ট সোসাইটী নামে একটী সোসাইটী আর্টস্কুলে স্থাপিত হয়। শিল্পী অতুল বসুর আগ্রহে ও অন্যান্য পরিশ্রমেই উহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ১৯২২ সালে গুরুপ্রসন্ন স্কলারসিপ্ লইয়া অতুল বসু বিলাতে চলিয়া গেলে সোসাইটির সম্পূর্ণ ভার যামিনীপ্রকাশের উপরে পতিত হয়। সাত আট বৎসর এই সোসাইটী বর্ত্তমান ছিল। এই ৭।৮ বৎসর যামিনীপ্রকাশ যে কি গুরুতর পরিশ্রম ও নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ঐ সোসাইটী চালু রাখিয়া ছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তিস্তা

পৃথিবীতে কেহই বোধ হয় অজাতশত্রু নয়। না হইলে এমন মানুষেরও শত্রু মেলা দিল! তাহার অতুল অর্থ উপার্জ্জনই প্রতিপক্ষের মর্ম্মপীড়ার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়াছিল। সে জন্য তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় ১৯২৮ খৃঃ তাঁহাকে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে তাঁহার পক্ষে শাপে বর হইল। চাকুরী ছাড়ার—চার বৎসরের মধ্যে তিনি রামপুরের নবাবের—প্রায় চার লক্ষ টাকা মূল্যের ছবি আঁকিবার অর্ডার পান। ছবি গুলির মধ্যে পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ সবই ছিল। সেগুলি আয়তনেও যেমন বিরাট, চিত্রের উৎকর্ষতার দিক দিয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে। তাহার মধ্যে হিমালয়ান ল্যাণ্ডস্কেপ, কাশ্মিরী ভ্যালি, দেওয়ার হোম ল্যাণ্ড ও নবাব পরিবারের সাত আট খানি পোর্ট্রেট—সত্যসত্যই দর্শনীয় বস্তু।

১৯২৯ খৃঃ একজন ইটালীয়ান ধনী ব্যক্তি এদেশে আসেন ও যামিনীপ্রকাশের চার খানি চিত্র ক্রয় করিয়া, ইটালীর রাজা ইমানুয়েলকে উপহার দেন। রাজা ইমানুয়েল ঐ গুলি পাইয়া যামিনীপ্রকাশকে 'ক্যাভেলিয়ার' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। এ সম্মান মাত্র কয়েক জন বিখ্যাতনামা চিত্রশিল্পীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে যেমন—সারজেণ্ট, সার জন কলিয়ার, সার জন রীড্, অগাষ্টস্ জন, ইত্যাদি। ভারতীয়দের মধ্যে আর কেহই ঐ সম্মানের অধিকারী হন নাই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্বে বিটাইকের অনুষ্ঠিত চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁহার আঁকা "গঙ্গার তীর" ছবি খানি পুরস্কৃত হয়। শিল্পী জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর তিনি দারভাঙ্গার মহারাজের অনেকগুলি ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। তাহার মধ্যে একখানি লর্ড ও লেডি উইলিংডনের সহিত দারভাঙ্গার মহারাজা ও অপর খানি একখানি ডোম সভার ছবি. এই ছবিখানিতে পঁচিশটি পোর্ট্রেট আছে। এই ধরণের পোর্ট্রেট কম্পোজিসনের ছবি ভারতের অপর কোন চিত্র শিল্পী আঁকিয়াছেন বলিয়া জানিনা। তাঁহার শেষ বয়সের আঁকা সর্দ্দার বল্লভভাইএর ছবিতে তিনি যে উৎকর্ষতা ও বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন তাহা যথার্থই অনির্ব্বচনীয়।

তাঁহার আঁকা গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দুইখানি পোর্ট্রেটের দিক দিয়া অনবদ্য। এইভাবে আমরা দেখিতে পাইব, কি স্বদেশে কি বিদেশে যামিনীপ্রকাশ সর্বত্রই সমানভাবে আদৃত হইয়াছেন। ভারতের এমন কোন রাজা মহারাজার প্রাসাদ নাই, সেখানে যামিনীপ্রকাশের ছবি নাই। বাংলাদেশে এমন কোন ধনীব্যক্তি নাই, যাঁহার গৃহে যামিনীপ্রকাশের ছবি নাই। এমন অকৃত্রিম কর্ম্মী চিত্রশিল্পী আমাদের দেশে কেন, বিদেশেও দুর্লভ।

যামিনীপ্রকাশের সংসারিক জীবন সুখের ছিল না। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র চিররুগ্ন। স্ত্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংসারে তিনি, সংসার বিরাগী উদাসীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্ব হইতেই তিনি চক্ষুর রক্তস্থ রোগে আক্রান্ত হন। চক্ষু রোগেও তিনি অধিক ছবি আঁকিয়াছিলেন। তারপর বৃদ্ধ বয়সের রোগে (Enlarged Prostrate) এ একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন ও তার জন্যে অস্ত্রোপচার করিতে হয়। অস্ত্রোপচারের প্রায় দুই মাস পরে ৮ই মাঘ রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় তিনি সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

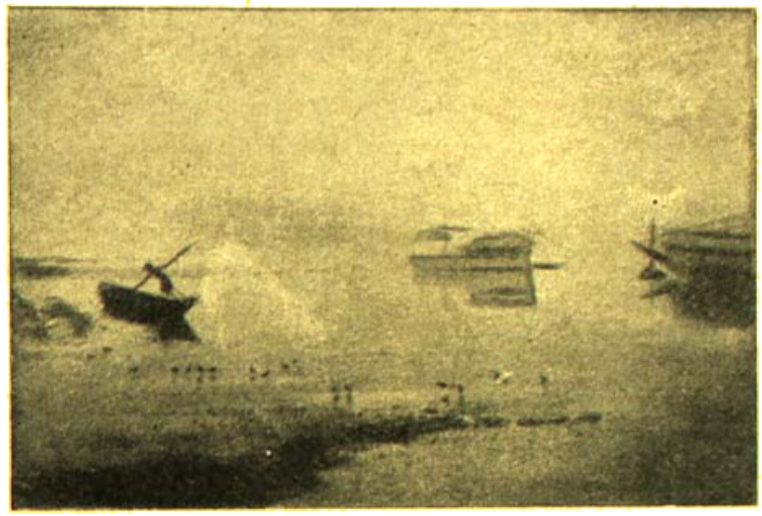

রবিবাসরে পঠিত

আমি তাঁহার এক অকৃতী অধম ছাত্র। তিনি জলে পেন্টার ছিলেন, আমি তাহা নই, তিনি সাধারণতঃ পোর্ট্রেট ও ডাকুরেপ পেন্টার, আমি তাহাও নই। আমার অঙ্কন পদ্ধতি ভিন্ন, আমার কর্ম্মপন্থাও পৃথক। তথাপি আমি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে যামিনীপ্রকাশের শিষ্য বলিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়া যাইব।

ময়ূরাক্ষীর শৃঙ্খল বন্ধন

শ্রীচিন্ময়কুমার রায় আই-এ-এস্

বিহারে মশান জোড়ে ক্ষুদ্র পল্লী মাঝে
সুপ্তির স্তব্ধতা ভেদি কর্ম্মধ্বনি বাজে।
ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টর করে দরাদরি
পাঞ্জাবী মাদ্রাজী আর বাঙালী বিহারী
কোল ভীল সাঁওতাল আরও কত শত
ছোট বড় নরনারী কর্ম্মে অনুরত।
প্রস্তরের আবেষ্টনে গতি অবরোধি
সযতনে বাঁধে তারা ময়ূরাক্ষী নদী
গ্রীষ্মকালে শীর্ণকায়া বরষায় স্ফীত
উচ্ছৃঙ্খল জলরাশি হবে নিয়োজিত
নানা দিকে নানা ভাবে দেশের কল্যাণে
মশানজোড় মুখরিত আজি সেই গানে।

এ মহা কল্যাণ-যজ্ঞ জেরি জাগে প্রাণে
যে কথা লিখিত আছে রামায়ণ গানে
উচ্ছৃঙ্খল স্ফীত বন্য দমনের লাগি
শত শত নরনারী দিবানিশি জাগি
বিশ্বের কল্যাণ তরে অতীতের কালে
সমুদ্র বাঁধিয়াছিল শৃঙ্খলার জালে।
বিশ্বের কল্যাণ যজ্ঞে হইয়া প্রণত
উত্তাল তরঙ্গ করি শান্ত সমাহত
সমুদ্র করিল যবে বন্ধন স্বীকার
প্রচারিল এই বার্ত্তা বিশ্বে বারম্বার
বাহিরের আবেষ্টনী বাঁধে বারে বারে
অথও অনন্ত প্রাণে কে বাঁধিতে পারে ?

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দৃষ্টিতে ভিজিয়া ভগবতীর জ্বর হইয়াছে—

দুই তিন দিনের মধ্যে বুকে একটু বেদনা ও শ্লেষ্মার প্রকোপ দেখা গেল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িয়া ভগবতীকে হতচেতন করিয়া ফেলিল। শশধর ও পরিবারের সকলের মুখেই দুর্যোগের কালো ছায়া পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। ভগবতীর বয়স হইয়াছে, প্রবল রোগের সহিত লড়াই করিবার শক্তি আর তাহার নাই।

দিঘির গ্রাম হইতে কবিরাজ আসিয়াছেন, তিনি মাথা নাড়িয়া একটু বিষণ্ণ মুখেই কহিলেন—সান্নিপাতিক ক্ষেত্রে জ্বর বিকারে।

উষধ পথ্য সবই চলিল, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ ওরুতর বিকারে পরিণত হইল এবং পরদিন সকালে হতচেতন ভগবতীর শয্যার পার্শ্বে শশধর তাহার মাতা ও পিসিমা উদ্বেগ মলিন মুখে দাড়াইয়া রহিয়াছেন—বনলতা দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া একান্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া আছে। অনিবার্য্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহারা এখনও যেন অনেকটা উদাসীন। মতিঠাকুর কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া উপস্থিত হইলেন। নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মতিঠাকুর মহাশয়কে সংক্ষেপে কহিলেন—এখন সূচিকাভরণ দেওয়া ছাড়া পথ নাই।

মতিঠাকুর চমকাইয়া উঠিলেন, কিন্তু কোন কিছু না বলিয়া কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া বাহিরে আসিলেন। কবিরাজকে বিদায় করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে তাঁহার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া জল গড়াইয়া পড়িল—ভগবতী তাঁহার অতি আপনার প্রিয়জন চিরদিনের মত বিদায় লইতে বসিয়াছে—

চণ্ডীমণ্ডপে নটবর নীলমণি প্রভৃতি সকলে কর্ত্তার সংবাদের জন্য বসিয়াছিল। তাহারা প্রশ্ন করিল—ঠাকুর মশায়, কর্ত্তা কেমন ?

মতিঠাকুর অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিলেন—সূচিকাভরণ ব্যবস্থা করলেন ক'বরেজ মশায়।

নীলমণি বিস্মিত ব্যথিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—সূচিকাভরণ কথাটার তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিয়াছিল। নব তাঁতি, গোবিন্দ প্রভৃতি পুনরায় প্রশ্ন করিল—এখন কেমন ?

মতিঠাকুর কহিলেন—নাড়ীটা কচিৎ ছিন্ন, কচিৎ ভিন্ন, এখন ভগবান যা করেন। মতিঠাকুর আর একবার অশ্রু-মার্জ্জনা করিয়া যেন সবল হইতে চাহিলেন কিন্তু কোনমতেই অশ্রু দমন করা যায় না। তিনি প্রবেশদ্বারে ক্ষণিক দাড়াইয়া রহিলেন—তাহার পর সারদা প্রভৃতি কয়েকজন নিঃশব্দে ঠাকুর মশায়ের পিছন পিছন অন্দরে ঢুকিল।

চণ্ডীমণ্ডপে নীলমণি কহিল—হ্যাঁ নটবরদা, কর্ত্তা কি বাঁচবেক নাই ?

নটবর জিভ কাটিয়া কহিল—সে কি ? কর্ত্তা না বাঁচলে মোরা সব ত ম'রবেক—ভগবান কি এমনি করবেক ?

ভগবতীর সংবাদ লইতে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে বহু লোক সমাগম হইল। সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সংবাদের অপেক্ষা করিতেছে—

বাড়ীর ভিতরে হঠাৎ একটা কোলাহল শোনা গেল—বাবা, বাবা গো—

নটবর চোখে কাপড়ের খুঁট দিয়া কহিল—নীলমণি কর্ত্তা ত আর নাই রে—আর নাই—

চণ্ডীমণ্ডপে ব্যথিত কণ্ঠের একটা কলগুঞ্জন উঠিল—কর্ত্তা নাই—কর্ত্তা নাই !

সেই সময়ে শশধর কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া বাহির বাড়ীর উঠানে পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবা গো—কোথায় গেলে গো—বাবা—

নীলমণি প্রভৃতি সকলে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কহিল—বড়দা, বড়দা—কি হ'ল বটে ! কি হ'ল !

মতিঠাকুর মশায় ছুটিয়া আসিয়া শশধরকে বুকের মাঝে টানিয়া আনিয়া কহিলেন—বাবা কেঁদো না। জগতের গতি এই—আত্মা অমর, দেহ পুরাতন হলে আত্মা তা ত্যাগ করে নূতন দেহ গ্রহণ করে, যেমন আমরা পুরাতন বস্ত্র ফেলে নতুন বস্ত্র পরি। তুমি অধীর হয়ো না বাবা, অধীর হয়ো না। জন্ম হলেই মৃত্যু হয় ; দেহ থাকলেই ব্যাধি হয় তার জন্যে শোচনা করা ভুল—বাবা—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

সান্ত্বনা দিতে দিতে মতিঠাকুর মহাশয় নিজেই কাঁদিতে লাগিলেন—আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

শশধর পুনরায় কাঁদিয়া উঠিল—বাবা—বাবা গো, আমি কি করবো, আমি কেমন করে থাক্‌বো—

নীলমণি অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া কহিল—বড়দা মোরা আছি ডর কি? আমরা জান দেবেক—ডর কি?

সমবেত জনতা একসঙ্গে কহিয়া উঠিল—জান দেবেক বড়দা, জান দেবেক—ডর কি?

নীলমণি কহিল—কর্ত্তা ছেড়ে চল্‌লেক বড়দা, মোরা আছি—

সমবেত জনতা কহিল—কর্ত্তা ত মোদের ধরম বাপ বড়দা—মোরা জান দেবেক—

ভগবতীর মৃত্যু সংবাদ দেখিতে দেখিতে গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়া গেল। বাগ্দী কুর্ম্মী পাড়ার কামিনরা চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া উঠিল—মোদের ধরম বাপ, ম'রলেক রে!

আদুরী পাড়ায় ধান ভানিতেছিল, সে ঢেঁকি হইতে নামিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে ছুটিল। ভরত উঠানে বসিয়া ঝুড়ি বুনাইতেছিল। আদুরী কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল—ভরত তু হেথা রে! কর্ত্তা চলে গেল রে—

ভরত চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কর্ত্তা সরলেক আদুরী! মোর বাপ ম'রলেক রে—মোর বাপ ম'রলেক—

ভরত সাশ্রুনেত্রে দ্রুত চণ্ডীমণ্ডপের দিকে ছুটিল।

গঙ্গাতীর বার ক্রোশ দূরে—

দাহ কার্য্য কোথায় হইবে তাহা লইয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল। নীলমণি কহিল—কর্ত্তার পুণ্যির দেহ মোরা গঙ্গাতীরে দেবেক। হেথা দেবেক নাই—

মতিঠাকুর কহিলেন—কিন্তু শশধর?

নটবর আগাইয়া আসিয়া কহিল—কাঁধে করে লেবেক ঠাকুর মশায়, কাঁধে করে পাকী করে লেবেক, গঙ্গাতীরে মোরা যাবেকই—

গঙ্গাতীরেই যাওয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গ্রামের সমস্ত সবলদেহ পুরুষ খোল করতাল নিশান প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত হইল। গ্রামান্তের প্রজারা নিশান করতাল লইয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সহস্রাধিক লোক জড় হইয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কহিলেন—এত লোক যেয়ে কি হবে নীলমণি। তোমাদের অর্দ্ধেক গেলেই যথেষ্ট—নটবর তোরা আর যাস্ না—

নটবর কহিল—কর্ত্তার সাথে মোরা যাবেক নাই? মোরা যাবেকই।

কেহই থাকিতে সম্মত হইল না, কর্ত্তার শবানুগমন করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর, আজকার এই দুর্যোগে তাহারা কেহই পিছাইয়া থাকিতে পারে না। ভগবতী তাহাদের পিতৃতুল্য, তাহার শবানুগমন তাহাদের অবশ্য করণীয়।

সহস্রাধিক লোকের এক শব শোভাযাত্রা কীর্ত্তনসহ গ্রাম হইতে বাহির হইয়া চণ্ডীতলার পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। পথিপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল সহস্রাধিক নারী—তাহাদের চোখ দিয়া অবিরল অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে—

আদুরী তাহার মায়ের কাঁধে ভর দিয়া আকুল কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—মোরা সাতপুরুষের বাপ্ হারালেক রে! বাপ্ হারালেক।

আদুরীর কথায় সমবেত জনতা, আর একবার কাঁদিয়া উঠিল—তাহারা সকলেই যেন আজ পিতৃহারা হইয়াছে।

তিরিশ বছর পরের কথা।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। দলিল সড়ক গিয়াছে আর্য্যাবর্ত্তের বুক চিরিয়া—কলিকাতা হইতে পেশোয়ার—তাহার আশে পাশে নীল আকাশের কোলে দেখা যায় চিম্‌নি—চিম্‌নি-নিঃসৃত কয়লার ধোঁয়া, পরিচ্ছন্ন আকাশের কোলে কলঙ্ক রেখার মত। আশে পাশে কয়লার খাদ—উপরে চক্রের আবর্ত্তন ভূগর্ভের কর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে—রাস্তা দিয়া চলে গাড়ী, মোটর, পাশে পাশে ছোটে রেলগাড়ী—দেশ দেশান্তরে চলে লোকজন পণ্যদ্রব্য। দেশে নতুন বিদ্যা, নতুন ব্যবস্থা চলিয়াছে দ্রুত, সাহেবগণকে সকলে সমীহ ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। ইংরেজী জানা ও বলাটাই আজ শিক্ষার লক্ষণ। সংস্কৃত পণ্ডিতগণ আজ হইয়াছেন সংস্কারান্ধ মূর্খ।

গোপালপুরের নূতন ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে। পুরাতন যাহারা তাহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাহাদের বংশধরগণ আজ গ্রামের লোক। ক্ষয়িষ্ণু ছোটলোকের পাড়ায় আছে কয়েক ঘর লোক—কতক এখানে ওখানে চলিয়া গিয়াছে, কতক গিয়াছে, কলে বা খাদে কাজ করিতে আর যাহারা রহিয়াছে তাহারা চাষ করে। যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে নীলমণির ছেলে শিবদাস, নটবরের ছেলে নিতাই, আর ভরত-আদুরীর ছেলে বলাই উল্লেখযোগ্য। বলাইএর ভগ্নি, তথা আদুরীর কনিষ্ঠা কন্যা এই সেদিন পলাশডাঙ্গায় মনুরকে সাঙ্গা করিয়া সেই গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। তাহার একটা ইতিহাস আছে—

ভরতের মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই আদুরীর মৃত্যু হয়, তখন কনিষ্ঠা কন্যা সরোজিনী মোড়ল কিন্তু স্বামী নিরুদ্দেশ। তখন স্বজাতি মোড়লগণ ব্যবস্থা দিয়া সরোজকে এই সাঙ্গার অনুমতি দেয়। সরোজ সাঙ্গার বিবাহে কাপড় জামা এবং কিছু গহনা পাইয়াছে—

বৃদ্ধপ্রায় শশধর জমিদারী রেখে, বৃদ্ধ গোপাল তাহার পুরোহিত। চাঁদমোহন ইংরাজি শিক্ষা পাইয়া কলিকাতার চাকুরী করে, বেশ মোটা রোজগার। মতিঠাকুর মহাশয়ের পুত্র হরিহরও বিদেশে চাকুরী করে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে আসে।

তাঁতি, তিলি প্রভৃতি নবশাক পাড়ার অনেকে চলিয়া গিয়াছে—কেহ কেহ এখনও আছে, দোকান, চাষ বা সামান্য পৈতৃক ব্যবসায় লইয়া। মাঝে মাঝে দুই একখানা প'ড়ো বাড়ী—কেহ বা কৌৎ হইয়া গিয়াছে, কেহ বা শহরে বসবাস করিতেছে, গ্রামের বাড়ী পরিত্যক্ত হইয়া ধীরে ধীরে বাসের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। শশধরের দুই পুত্র স্কুলে পড়িতেছে—একজন ঐবছরই এক পাশ দিয়া কলেজে প্রবেশ করিবে।

চণ্ডীমণ্ডপে আর পাশার আড্ডা বসে না। সে সময় আর কাহারও নাই, পূজার বন্ধে বা কোন কোন উৎসবে তাস প্রভৃতি খেলা হয়। ভাগবত, রামায়ণ-গান এখন আর কেহ শুনে না—এদিকে ওদিকে সখের থিয়েটার বা অপেরা শুনিতে যায়। শশধর সাবেক নিয়মেই সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। বনলতা গৃহিণী, পূজাপার্ব্বণের কোনটি বাদ না পড়ে সেদিকে তাহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য।

মাটির দেয়াল খড়ের চাল, রেড়ির তৈলের প্রদীপ নাই। এখন টিনের চাল, হারিকেন লণ্ঠন ও উৎসবে গ্যাস বাতি জ্বলে।

পূজা আসিয়াছে—

চাঁদমোহন আজ কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিবেন। চারি ক্রোশ দূরে রেল ষ্টেশন, দুই জোড়া গাড়ী পাঠান হইয়াছে। সকলে সাতটার গাড়ীতে পৌঁছিবেন এবং বেলা দশটা নাগাদ গ্রামে পৌঁছিবেন। শশধর সকাল হইতে ব্যস্তভাবে ঘর-দোর পরিষ্কার করা, ভ্রাতার খাদ্যাদির ব্যবস্থা করা লইয়া ব্যস্ত আছেন। দোতলার দক্ষিণ দিকের দুইটি ঘর তাহাদের জন্য নূতন করিয়া সাজান হইতেছে। চাঁদমোহন, তাহার কুমারী কন্যা লতিকা, পুত্র প্রভাত আসিবেন। তাহারা শহরে থাকিতে অভ্যস্ত, গ্রামে যেন কোন কষ্ট না হয় সে বিষয়ে শশধর যত্নবান।

শশধরের পুত্র কানু ও কালো চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত যাইয়া কাকার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ভিতরে চাকর চরণ ও ঝি বিন্দুকে সব বুঝাইয়া দিয়া বাহিরে আসিল। পূজার কম্বল, কাঠ, চাউল, পাঁঠা, কাপড় প্রভৃতি বহু দ্রব্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, পূজার দালান ও সংলগ্ন উঠান পরিষ্কার করিতে হইবে, রোধনতলা তৈয়ারী করিতে হইবে। শশধর ব্যস্তভাবে পূজার চাকরাণ জমি ভোগী লোকজনকে খাটাইতেছেন, এমন সময় কানু আসিয়া সংবাদ দিল—কাকা আসছেন, কাকীমা, লতিকাদি, প্রভাতদা সব।

কিছুক্ষণ পরেই চাঁদমোহনের গাড়ী বৈঠকখানার সম্মুখে আসিয়া থামিল। তিনি তাহার দেহটাকে সযত্নে এবং ধীরে ধীরে গাড়ী হইতে বাহির করিয়া কহিলেন—বাবা, একি আসা যায়? দেহ আর নেই—গরুর গাড়ীতে কি মানুষে আসে।

শশধর ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—কেন কষ্ট হ'য়েছে খুব?

—বাবা:, এত কষ্টে আর বাড়ী আসা চলে না। চাঁদমোহন শশধরের পায়ের নিকট মাথাটা একটু নোয়াইয়া কহিল—তিনদিন যাবে গায়ের ব্যথা ম'রতে—

লতিকা ও প্রভাত নামিয়া জেঠামহাশয়কে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। বধূ মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া বাড়ির ভিতরে

প্রবেশ করিলেন। শশধর ও উপস্থিত লোক সবিস্ময়ে দেখিল লতিকার পায়ে জুতা! মেয়েরা জুতা পায় দেয় বা দিতে পারে, একথা এ গ্রামে কেহ পূর্ব্বে ভাবে নাই।

চাঁদমোহনের স্ত্রী কলিকাতার না হইলেও ঐ অঞ্চলের মেয়ে। তাহার নাম কি তাহার প্রয়োজন নাই, তিনি লতার মা বা ছোটবৌ বলিয়াই সমধিক পরিচিতা। তিনি অন্দরে প্রবেশ করিয়া বনলতার পায়ের কাছে অনিচ্ছাকৃত একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন—ওঁকে একশ'বার বলি, এমন দেশে আসা বাবা আমার পোষায় না। গরুর গাড়ীতে কি মানুষে চড়ে, হাত পা সব বেদনায় বিষ হ'য়ে উঠেছে—

বনলতা কহিলেন—ও কথা ব'লতে নেই ছোট-বৌ। শ্বশুরের ভিটেয় কষ্ট করেও ত আসতে হয়। তিনি কত করেছেন আমাদের জন্যে। তা এখন জিরিয়ে নাও—সব সেরে যাবে—

লতিকা জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে গেলে বনলতা কহিল—লতা মা জুতো ছেড়ে এসো, জুতো পায় ছুঁয়ো না, ঠাকুর ঘরে যাবো—

লতা থামিয়া গেল—অর্থটা যেন এইরূপ যে জুতা ছাড়িয়া প্রণাম করিতে হইলে সে করিতে প্রস্তুত নয়। ছোট-বৌ ধমক দিয়া কহিলেন—এটা কলকাতা নয়। জুতো এখানে পরতে পাবিনে, যেখানে যেমন সেখানে তেমন ক'রতে হয়। জুতো ছেড়ে প্রণাম কর—

লতিকা জুতা খুলিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু সে প্রণাম একান্তই শুষ্ক। বনলতা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—হ্যাঁমা, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। পূজোর দিন, এখন ছোঁয়া মেশা হ'য়ে যাবে—

প্রভাত কহিল—জুতো পায়ে দিয়ে ছুলেই কি জাত যায় জেঠিমা—ও সব বাজে—আমরা মানি না—

বনলতা কহিলেন—তা বাবা তোমরা না হয় মেনো না, কিন্তু পূজোর কটা দিন ত মান্‌তেই হবে।

বাছা চউক ঠাকুরের ভোগের দালান, রান্নাঘর প্রভৃতিতে জুতা না চলিলেও জুতা ব্যবহার চলিতে লাগিল। পাড়ার মেয়েরা বিস্মিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল—চাঁদমোহন ত মেয়েকে মেমসাহেব করিয়াছে। ছেলেরা না হয় জুতা পরুক, কিন্তু মেয়েরা কেন?

আজ ষষ্ঠীর বোধন।

গোপাল সকালে বিল্ববৃক্ষের মূলে বসিয়া দেবীর আহ্বান করিয়াছে। যথা সময়ে ঘটস্থাপন প্রভৃতি শেষ করিয়া গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছিল। শশধর আসিয়া কহিল—ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠান্তে একবার বৈঠকখানায় যাবেন।

গোপাল শুনিল, কিন্তু চণ্ডীপাঠ ত্যাগ করিয়া কোন জবাব দিল না। চণ্ডীপাঠ সমাপনান্তে গোপাল বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল। শশধর ও চাঁদমোহন দুই ভাই বসিয়া কি যেন একটা বিষয়ে আলোচনা চলিতেছিল, গোপালকে দেখিয়া উভয়ে চুপ করিয়া গিয়াছে। শশধর একটু বিষণ্ণ মুখে কহিল—ঠাকুরমশায়, চাঁদ বলছে তিনদিন গ্রামের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ ক'রবার দরকার নেই—আপনি কি বলেন?

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিল—কেন? হঠাৎ এ রকম হবার কারণ কি? জন্মাবধি আমরা দেখ্‌ছি পূজার তিনদিন গ্রামে কারো হাঁড়ি চড়ে না। আজ হঠাৎ তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কর্ত্তা ত তাঁর সঙ্গে কিছুই নিয়ে যান্‌নি, তা ছাড়া চাঁদ ত কিছু রোজগার করে—তবে?

—টাকা থাকলেই সব খরচ ক'রে ফেল্‌তে হবে এমন কিছু নয়। আর সারাগ্রাম না খাওয়ালে পূজা করা যাবে না এমনও কিছু ত নয়। আমি বলছি, বরং যাদের ব'লবো তাদের ভাল করে খাওয়াবো—নতুন জিনিষ যা খায়নি কোনদিন—

গোপাল অদূরে একখানা আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল—কিন্তু সারাগ্রাম আশা করে আছে। একদিন গ্রামের ইতর ভদ্র একত্র হবে, এই ত চলে আস্‌ছে—

শশধর কহিল—নবমীতে যাত্রাগানেও ওর মত নেই, পূজা অঙ্গেও ও খর্চ্চ কমাতে ব'লছে—শাড়ী, কাপড়, দক্ষিণা—

গোপাল বিস্মিত হইয়া কহিল—কেন? এ সব কেন হবে তা'ত আমি বুঝতে পারি না। কর্ত্তার সমস্ত সম্পত্তিই আছে, সবই আছে অথচ হবে না কেন?

চাঁদ কহিল—জমিদারীটা বাবা রেখে গেছেন, পরকে খাওয়িয়ে উড়িয়ে দেবার জন্যে ত নয়। আমাদের বড় হতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে। সময় বদলে গেছে—এখন

কলকাতায় আমাকে একখানা বাড়ী করতে হবে, ছেলেকে পড়াতে হবে। চাষাভূষো খাটিয়ে নিজের পরকাল খোয়াতে ত আমি পারবো না? নামের জন্যে হয়ত পূজাটা করা দরকার, তাই বলে বাজে লোক খাওয়াতে হবে কেন?

গোপাল কহিল—মানুষ কখনও বাজে হয় না চাঁদু। তাদের উপরেই তোমার জমিদারী, তাদের তোমাকে রক্ষা করতে হবে, খাওয়াতে হবে, তবেই তোমার জমিদারী থাকবে। কাউকে বঞ্চিত করে বড় হওয়া ত বড় হওয়া নয়, সকলকে রক্ষা করে, সকলের মঙ্গল করে বড় হওয়াই প্রকৃত বড় হওয়া।

চাঁদু হাসিয়া কহিল—ঠাকুরমশায় তাকি হয়, পাঁচশ টাকা পাঁচজনে ভাগ করলে হয় একশো, আর পাঁচশ লোকের কাছ থেকে এক টাকা করে নিলেই পাঁচশ টাকা হয়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, survival of the fittest যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাকে। বাঘ মশা খায়, সাপে বাঘ খায়, গোসাপে সাপ খায়, মানুষে গোসাপ খায়, এমনি করে যে শক্তিশালী সেই বেঁচে থাকবে, যার শক্তি নেই সে লোপ পায়। কাজেই শক্তি অর্জ্জন করা দরকার, আজকার শক্তি হচ্ছে ধনশক্তি, কাজেই তার অপচয় করা কি ঠিক? যে অপচয় করবে সে বেকুব—

গোপাল কহিল—কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে সমাজ-কল্যাণের শক্তিই শক্তি, আর ধনও সমাজমঙ্গলের জন্যে। তোমার শক্তি ধন বিদ্যা বুদ্ধি তোমাকে বড় করে যদি অন্যকে নিষ্পিষ্ট করে তবে সে শক্তি আসুরিক, তা দানবিক, সেটা মানুষের ধর্ম্ম নয়—আমরা শাস্ত্রে এই শিক্ষাই পেয়েছি—

চাঁদু হাসিয়া কহিল—শাস্ত্র ত ব্রাহ্মণগণেরই সৃষ্টি, তাঁরা তাঁদের সুবিধামতই বচন দিয়ে গেছেন। ধর্ম্মানুষ্ঠান মাত্রেই ব্রাহ্মণকে দান করতে হবে—কেন? গরীবকে দান করলেই ত ভাল। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখেই ত ব্রাহ্মণকে দানের কথা বলেছেন—

গোপাল প্রতিবাদ করিলেন—তা নয় চাঁদু, ব্রাহ্মণ বিদ্যার্জ্জন ক'রে, সমাজ সেবা করেন। নিজের বিদ্যা ও জ্ঞানমত সমাজকল্যাণের পরামর্শ দেন, তাই—সমাজ তাকে ভরণ-পোষণ করে দানের দ্বারা—সেটা পূজানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে তারা পান এবং পূজানুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের ধর্ম্ম-প্রাণতাকে রক্ষা করেন।

চাঁদু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—সেইজন্যেই ত পূজার ফর্দ্দটা অত মোটা, শাড়ী ১০, ধুতি ১২ ইত্যাদি। কিন্তু দেবতা কাপড় পরেন না—পরেন ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রটা ব্রাহ্মণগণ রচিত বলেই এমনি তা বুঝ্‌তে পারেন?

গোপাল হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন, চাঁদুর এই যুক্তির বিরুদ্ধে তাহার যুক্তির অভাব ছিল না কিন্তু গোপাল তাহা বলিলেন না। তিনি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—যে দান তিনি এতদিন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ছিল শ্রদ্ধার দান, আজ তিনি যাহা পাইবেন তাহা একান্তই অনুগ্রহের দান। অকস্মাৎ মনের মাঝে এই কথাটা যেন তীব্র দংশন করিয়া সহসা তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এমন কথা গোপাল জীবনে শুনেন নাই।

চাঁদু কহিল—আপনি পূজায় যথেষ্ট পাচ্ছেন ঠাকুরমশায়, কিন্তু সমাজের কি সেবা আপনি করেন—বলুন!

গোপাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—শাস্ত্রমত সৎবুদ্ধি দান করি, শাস্ত্রের কথা বলি, লোককে শাস্ত্রমত কাজ করতে বলি, এইত আমাদের সেবা!

চাঁদু কহিল—হাঁ তাই, সকলকে খাটিয়ে মজুর হওয়ার সৎপরামর্শ দাদাকে দিচ্ছেন। এমনি করলে জমিদারী কদিন থাকবে—

গোপাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আকস্মিক ভাবাবেগে তাঁহার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল, তিনি আবেগ ভরে কহিলেন—বাবা চাঁদু, তোমরা কেমন শিক্ষা বা কি শিক্ষা পেয়েছ জানিনা, তবে আমরা যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমার দাদা মতিঠাকুরমশায় এই যুক্তিই দিতেন, কিন্তু তাতে তার জমিদারী নষ্ট হয়নি বরং দিনে দিনে বেড়েই গিয়েছিল। তার ডাকে দশহাজার লোক প্রাণ দিত। আমার গুরু সেই মতিঠাকুরমশায়, আমি যা শিখেছি তাই তোমাকে বললাম, সে সময়ে এমনিই চল্ত এতদিন তাই হ'য়েছে। তোমরা এখন যা ভাল বুঝবে তাই করবে। যে সময় এসেছে, যে সমাজ এসেছে তাতে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি আর কোন কাজে লাগবে বলে মনে হয় না—

গোপালঠাকুর গভীর বেদনা ও অসম্মানের দুঃসহ বোঝা বুকে লইয়া আরক্ত সাশ্রুনেত্রে বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আজ অকস্মাৎ পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছে—উদরান্নের জন্য অনুগ্রহের দান তাঁহাকে আর গ্রহণ করিতে হইবে? অত্যন্ত অশ্রদ্ধা অবহেলা ও করুণা মিশ্রিত দান তিনি কেমন করিয়া দু'হাত পাতিয়া গ্রহণ করিবেন। (ক্রমশঃ)

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

বৌদ্ধ পুরোহিতগুলি স্তবগানের পর সুর ক'রে আবৃত্তি সুরু করলেন যাকে ইংরাজিতে বলে intonation : সঙ্গে সঙ্গে মারুত চেঁচিয়ে উঠলাম—ও কি?—প্রতি মোহান্ত এক হাতে তুলে ধরলেন আমাদের দেশের তালপাতার লেখা চওড়ায় মতন এক একটি বই ও বইয়ের পাতা ক'রে পড়তে লাগলেন জলপ্রপাতের মতন নিচের হাতে। একবার ডান হাত উপরে ওঠে তখন বাঁ হাত নিচে থেকে পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি ধরে, যেমন যাদুকর ধরে এক হাতে অপর হাত থেকে টানা তাস—তারপরে বাঁ হাত উপরে ওঠে তখন ডান হাত ধরে নিচে থেকে। বুকলাম এও ওদের একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গ। কিন্তু তারপরে যখন ওরা প্রত্যেকে বক্তার সুরু ক'রে দিল মাই, আই-ই, আই-ই-ই ব'লে তখন আর পারলাম না। পিতৃদেবের গান মনে পড়ল, ছিলাম "চল্লিশ পরিপাটি।"

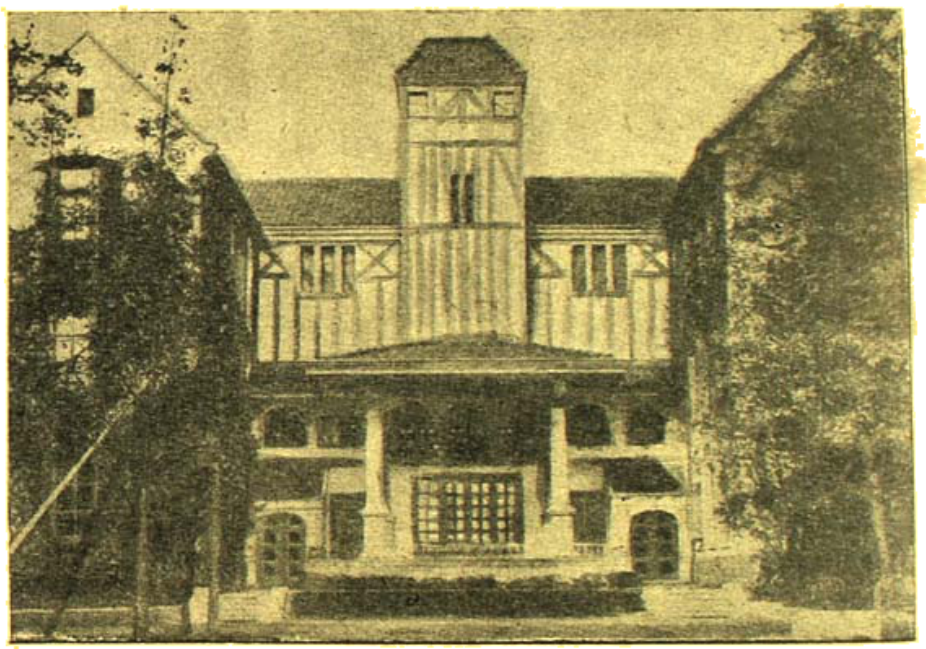

টোকিয়োর কাবুকি থিয়েটার্স

মোহান্ত বন্ধুকে কিছু বললাম না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়েছিল—কেন এ ধরণের প্রাণহীন মন্ত্রপাঠ প্রবৃত্তি তাঁরা জীইয়ে রেখেছেন। বাড়ি এসে বন্ধুবর মাজদুতকে বললাম। যে জাপানে দেখলাম দুটি জিনিষ : সৌন্দর্যপূজা অতিজীবন্ত, তথা দেবপূজা মৃত না হোক জীবন্মৃত। অথচ মনে হয় এক সময়ে এ-সব মন্ত্রপাঠের পিছনে ছিল প্রাণশক্তি—যখন অর্থাৎ যা জিজ্ঞাসুর মন ভগবানকে উপাসনা করত অন্তরকে অঞ্জলি দিয়ে, বাইরের আনুষ্ঠানিক তাকে এত বড় ক'রে না দেখে। তবে এ-বিষয়ে আমার ধারণা ভুল হ'তে পারে। তাই যেন হয়। কারণ ভাবতে খারাপ লাগে—মন্দির আছে, প্রতিমা আছে, পুরোহিত আছে, মন্ত্রপাঠ আছে—নেই কেবল হৃদয়ের কোনো বালাই। ধর্ম যে আজকের দিনে অধিকাংশ চিন্তাশীল তথা সচেতন মনের কাছে অগ্রাহ্য হ'য়ে উঠেছে তার একটি মস্ত হেতু নিশ্চয়ই এই প্রাণহীন আবৃত্তি, গতানুগতিক মন্ত্রপাঠ, অর্থহীন পুষ্পাঞ্জলি—এক কথায় শুষ্ক লোকাচার। কিন্তু তবু বলব ভারতে এখনো ধর্ম জীবন্ত—নানা তিথিতে প্রার্থীর ভিড়, কুম্ভমেলায় সাধুসন্তের সমাবেশ, নানা মন্দিরে নানা উৎসবে বহু ভক্তের সাগ্রহ অভিযান, তীর্থযাত্রায় বৃদ্ধ বৃদ্ধারও পথশ্রমে বহু কষ্টের দুরাভিসার ইত্যাদি কোন্ বাণী জ্ঞাপন করে? সে লোকাচার বহুক্ষেত্রেই প্রাণবত্তাকে নিষ্প্রভ করলেও বহু ধর্মার্থীর অন্তরে ধর্মানুরাগ এখনো বেঁচে আছে। আমি একথা প্রমাণ করতে পারব না। তবে মনে হয় কোনো চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ মানুষ যদি আজকের দিনেও নিরপেক্ষভাবে চোখ মেলে দেখেন জাপানের ধর্মাচার ও আমাদের দেশের ধর্মানুরক্তি তাহ'লে তিনি মানবেনই মানবেন যে জাপানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা শোচনীয় জীবন্মৃত—যেখানে ভারতে এই অধঃপতিত যুগেও সে আজ বেঁচে···এমন কি বাইরে যাঁরা দেখতে অবিশ্বাসী তাঁদের মধ্যেও সবাই না হোক অনেকেই সত্য সাধু দেখলে মাথা নোয়ান। শক্তি ও ধনের প্রতিপত্তি অন্য দেশে যে ভাবে সমীহ পায় তার চেয়েও বেশি সমীহ পায় আমাদের দেশে খাঁটি সাধু, নির্ভেজাল ঋষি, আন্তরিক ভক্ত। জাপানে এসে যেন তার ভাব একটা নতুন চোখে দেখতে শিখলাম। মনে হ'ল শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দ নিছক দেশভক্তিবশেই এ ঘোষণা করেন নি যে ভারতের প্রাণপুরুষ আজও বিরাজ করছে তার শিল্পে নয়, কলকারখানায় নয়, বৈভবে নয়, এমন কি বুদ্ধিবাদী দর্শনের গবেষণাতেও নয়—ভারতের প্রাণপুরুষ আজও থাকে থাকে

করতে তার অসুস্থতাজনিত বৈরাগ্য ও ভক্তির মনিকোঠায়। সুরোপে না-আছি প্রতিষ্ঠার চীৎকৃত, জাপানে পূজাহুতি আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত কিন্তু ভারতে ধর্ম আজও ঈশ্বর—ভক্তি আর ঈশ্বরপ্রেম আজও পৌত্তলিকী না হ'লেও প্রাণের উদ্বোধনে সমাহৃত, বিশ্বাসের সিঞ্চনে মুকুলা মুকুল পল্লবকামনা।

* * *

সকলের আগেতে বললাম : জাপানী অভিনয় ও নৃত্যগীত দেখতে হবে। তিনি টোকিয়োর বিখ্যাত ইম্পিরিয়াল থিয়েটারে আমাদের নিয়ে

জাপানে কাবুকি অভিনেত্রী

গেলেন। অতবড় থিয়েটারে একটিও আসন খালি ছিল না। তবু ওরা হাজারজনকে খাতির করল বৈ কি। চারটে স্পেশাল চেয়ার এনে সামনে বসাল। আমি, ইন্দিরা, ডাক্তার রাউফ ও নায়ার। নায়ার জাপানী জানেন ব'লে একটু সুবিধা হ'ল।

নাটকটির নাম বুকি শুমি, মানে তুষার পরিষৎ। নাটকটির গল্প ছেলেমানুষি! জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে একটি অতি বাজে গল্প। আড়ম্বর ভালো লাগল কিন্তু তাকে য়ুরোপীয় অভিনয়ের নিষ্ফল অনুকরণ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কেবল আমি একটি জিনিস লেখে আশ্চর্য হলাম : জাপানীরা খুব হাসে। একটি দৃশ্যে কেবলই হাসির ফোয়ারা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেমি ওরা কান্নাও সমান ভালোবাসে। নায়িকা কী কান্নাই কাঁদল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—আর কখন তখন! আর শুধু কি নায়িকা? অমন যে পাষাণ গোছের—যে মেয়ে কেবল নায়িকাকে সে-ও থেকেই অস্থির! মোটামুটি বলতাম, যদি নাটিকাটির প্রায় গোপালাও না নাচত। ইয়া কথায় কথায় নাচ! সঙ্গে নির্ভেজাল য়ুরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীত ওরফে অর্কেস্ট্রা। জাপানী নাটকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত য়ুরোপীয় মার্কামি—য়ুরোপীয় ঢঙের পরিচালনা—পিলানো বেহালা বাঁশি—সব য়ুরোপীয়। কেবল পোষাক ও ভাষা ছাড়া জাপানী কিছুই নেই এদের আধুনিক থীয়েটারে। বইয়ে পড়েছিলাম জাপানী সঙ্গীত ব'লে কিছু নেই, মানে ঋ-আছে সে না থাকলেই জাপানের মর্যাদা বাড়ত। কিন্তু বইয়ে পড়া এক, আর চোখে দেখা আর। এ নাট্য-নৃত্যটি যে আদ্যন্ত য়ুরোপীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউজিকাল কমেডির তৃতীয় শ্রেণীর অনুকরণ! অবশ্য বেশভূষার চমক, আলোর কৌশল, দৃশ্যের নৈপুণ্য—যেমন একটি কড়ের বৃক্ষ, সমুদ্রের ধারে—মনকে মুগ্ধ করে, কিন্তু কোথায় নাটকীয় সংঘাত, অভিনয়-চাতুর্য, নৃত্যগীতের বৈশিষ্ট্য? আঃ। জাপানী অভিনয় মনকে আবিষ্ট করতে পারে না। সবচেয়ে আক্ষেপ হ'ল দেখে যে জাপানী গানবাজনা ব'লে কিছুই নেই জাপানী নাট্যনৃত্যে। চোখ বুজলে এ গানবাজনা শুনতে শুনতে মনে হয় কোনো য়ুরোপীয় সহরে ব'সে আছি। মানুষের সৃষ্টিরও হয়ত নানারকম সংস্কার আছে, হয়ত কোনো চিন্তাই পুরোপুরি স্বাধীন নয়, কিন্তু তবু একটা কথা বোধহয় বলা চলে : ভগতে সব জাতির আচার, সংস্কৃতি, বেশভূষা, চালচলন, প্রকাশরীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু একই ধরণের হ'লে তাতে ক'রে বিশ্বমানবের ক্ষতি বৈ লাভ নেই। তাই জাপানী সুকুমারতা, ভাবালুতা, চিত্রকারু প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যে যে-পরিমাণে মুগ্ধ হয়েছিলাম জাপানী নাট্যনৃত্যে তথা সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যহীনতায় সেই পরিমাণেই আহত হ'তে হ'ল।

* * * *

ডাক্তার রাউফ তথা নায়ার বললেন, জাপানী কাবুকি নৃত্যে যিনিষে যা আমি চাইছি—জাপানের জাপানিত্ব। তথাস্তু : সেদিন কাবুকি নাট্যালয়ে কাবুকি নাট্যানন্দ উপভোগ করতে।

কিন্তু ও মা! এ কী কাণ্ড! কোথায় নাটক, কোথায় সঙ্গীত, কোথায় অভিনয়! আছে শুধু দৃশ্য ও আলোর বাহার। ব্যস্। যেমন অন্য জাপানি-চয়া এদের সেক্ষেনে অভিনয়, স্বরভঙ্গি, প্রণাধন, সর্বোপরি দুঃসহ জাপানী গান ও সাজিসেন বাদন—তেমনি অর্থহীন এদের নাটকীয় গল্পের ঘট। একটি মাত্র একাঙ্কিকা নাটিকার গল্প সংক্ষেপে বলি। এক যে ছিল জাপানী কুমারী। ভালোবাসলে এক জাপানী বীরযোদ্ধার অভিজাতকে। প্রণয়ীর ভালোবাসা সত্য কি না পরখ ক'রে কুমারী ছেড়ে দেবেন তাদের বাড়ির একটি ছবিতে রেকাবি। প্রণয়ী বিরক্ত হ'লেও রাজী হলেন অগত্যাধর্ম প্রণয়িনীকে। কিন্তু পরে সেই

প্রণয়িনী বললেন তিনি প্রথমটির প্রণয়কে পরখ করতেই বেরিয়ে ছেড়েছেন অমনি তাকে কেটে ফেলে রাস্তার আড়িনায় একটি কুয়োয় কলসশ ক'রে ছুটলেন কোথায় লড়াই হচ্ছিল সেখানে। বীর বটে! সাবাস জোয়ান! নারীকে এক সঙ্গে নর হত্যা এই চোখেই দেখছ—স্বেচ্ছাচারী পেরালের পুতুল—কিন্তু এমনো ভাব কি রঙ্গমঞ্চে দেখাতে পারে কেউ?

আর একটি নায়িকারও অমনিতরই ছট্। মন ঘাই পায় না—এরি নাম বিখ্যাত কাবুকি! এ যে উন্মাদের প্রলাপ গো! বহু চেষ্টা করলাম এসব কুলীন মেজাজকে ঠিক চোখে দেখতে। কিন্তু পারলাম না। দুটি একাঙ্কিকা নাটিকা দেখে বললাম ডাক্তার রাউফকে: আর বরদাস্ত হচ্ছে না—চলুন।

আমরা যতই ঘড়াই করি না কেন পুরাকাহিনী নিয়ে, একটা কথা বোধ হয় কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে কালিদাস মিথ্যা বলেন নি: "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্"। যেমন একালেরও সব কিছুই সাধু নয়, তেমনি সেকালেরও সব কিছু প্রশংসা ছিল না। কিছু পাই কিছু হারাই দিনে দিনে, কিন্তু তবু যা ছিল তাকে পুরোপুরি ধরায় রাখা যায় না। অতীতও ডাকে। চাই দুয়ের সামঞ্জস্য-সাধন। জাপানী নাট্যসাহিত্যের সর্বত্র অতীত হয়েছে কিন্তু কাবুকিতে অতীকৃত হয়েছে আধুনিকতা। অতীত অমর—মানি। কিন্তু শুধু প্রেরণায়। মানি আনন্দের একটা অংশ আছেই শাশ্বত, সনাতন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গিকে হ'তেই হবে চলমান, নিত্য-পুনর্নব। জাপান আজ হয়ত একটা আদর্শ-সংকটের সামনে দাঁড়িয়ে। য়ুরোপীয় সভ্যতা তার উপর চড়াও হ'য়ে এসেছে তাকে বদলাতে। হয়ত তার অনেক কিছু বদলাতেই হবে। অথচ জাপানে দেখি কাবুকি নৃত্যে জাপানীর কী উৎসাহ! কাবুকি আন্দোলনে গিয়েছিলাম একদিন। সেখানকার অধ্যক্ষ বললেন যে, কিছুদিন আগে জাপানীর কাবুকি-উৎসাহে ভাঁটা প'ড়েছিল কিন্তু ফের সে-উৎসাহ উজিয়ে উঠেছে। এক কথায় দুটো স্রোত তাকে ঠেলছে। একটা বলে: "ছাড়ো অতীতকে পুরোপুরি, ধাও ধাও সামনে দ্রুতগতিতে।" আর একটা বলে: "সাধু, সাবধান! দাবেকী কৌলিন্য বজায় রাখো। যা কিছু জাপানী আদর করতে শেখো। দেশের কুকুরও বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে আদরণীয়।"

আমাদের চরকা-প্রীতির সঙ্গে জাপানের কাবুকি-প্রীতির যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেশে কত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ লোকেও তো চরকা বলতে আত্মহারা! তেমনি ওদের। "কাবুকি! আহা মরি মরি!"—এই মনোভাব দেখলাম বহু জাপানীর মধ্যে ফুটফুল। পূর্বপুরুষ-পূজারবৃত্তি নেই কার মধ্যে? কিন্তু হায় রে, যেমন কোনো পিতাই চিরদিন বাঁচেন না, বাঁচতে হ'লে জন্মগ্রহণ করেন পুত্রের মধ্যে—তেমনি অতীতকে ছিইয়ে রাখা যায় না তাকে পুরোপুরি বজায় রাখতে গেলে। দামনের দিকে এগুনো মানেই পিছনকে খানিকটা অন্তত বিদায় দেওয়া। যা কাল ছিল তা আজ অবিকল অবিকল থাকতে পারে না। অতীতের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব, সম্ভব কেবল নবরূপ। তাই না শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "Traditions of the past pave great

টোকিয়োর জাপানী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী

in their own place—that is, in the past. But that is no reason why we should go on repeating the past. A great past ought to be followed by a greater future."

জাপান বড় ভাল। জাপানী চরিত্রের গুণাবলী অসংখ্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই ভরসা রাখবার পথ আছে যে জাপানী জ্ঞানী ও ভাবুকরা জাপানকে যথাযথ পথনির্দেশ দেবেন, যার ফলে যেমন অতীতের মধ্যেও তারা কারারুদ্ধ থাকতে পারবে না, তেমনি আধুনিকতাও তাকে পারবে না মোহমুগ্ধ ক'রে রাখতে।

* * * *

১৭ই জানুয়ারি টোকিয়োর বিখ্যাত কাবুকি "আজাদিজা"-র কর্তৃপক্ষের হল ঘরে ছ'ল আমার গানের সঙ্গে ইন্দিরার নৃত্য। লোক হয়েছিল

অজস্র। বহু লোক বসবার জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়েই ছিল সমস্তক্ষণ। জাপানী রাজকুল, শিল্পীকুল, সাহিত্যিক রাজদূতবৃন্দ, কবি তথা উপসংস্কৃত জাপানী মহলারী ছিলেন উপস্থিত। বৃত্তাকীর্তের শেষে বহু লোকই নিজে থেকে এসে আমাদের উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানালেন অভিনন্দন। তাই আশা করা যায় জাপান ভারতীয় বৃত্তাকীতে সাড়া দিয়েছিল। এক জাপানী ইংরাজি কাগজে লিখল পরদিন: "A concert of Indian music was presented on saturday evening under the auspices of the Indian Embassy at the Asahi Building, To Lyo. The concert featured the playing and singing of Shri Dilip Kumar Roy and a display of Indian dancing by Shrimati Indira Devi. Roy sang six selections, Miss Devi dancing to three of these. Several songs were sung in English as well as in their original words. Roy explaining their moods and significance. The music, although somewhat strange to the uninitiated, was stirring and beautiful. Miss Devi danced very gracefully, conveying the meaning and mood of each song with great skill."

জাপানে জাপানীদের মধ্যে আমাদের বৃত্তাকীর্ত এতটা সমাদর পাবে তা সত্যিই ভাবি নি, কিন্তু মনে হয় আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে যে বিশ্বজনীন আবেদন আছে তার মর্মবাণীটি হৃদয়ের আবেগের মাধ্যমে ওদের হৃদয়ের সমবায়ে পৌঁছিয়ে দিতে যে ভাবেই হোক। নৈলে আমাদের ভক্তিসঙ্গীত বা রবীন্দ্রনাথের বৃত্তাকীত ওদের হৃদয়কে এভাবে স্পর্শ করতে পারত না কখনই।

স্পর্শ যে করেছিল তার প্রমাণ পেলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। জাপানী রাজদূতের এক অভিভাষে এসেছিলেন। ইন্দিরা যখন বৃত্তাকেন পরদিন তখন তিনি এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইন্দিরাকে নিমন্ত্রণ করলে সে রাজপ্রাসাদে নাচতে রাজি আছে কি না। ইন্দিরা বলল যে আমরা পরদিনই আমেরিকান সিয়ানে হনোলুলু রওনা হচ্ছি, কাজেই রাজপ্রাসাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব।

এছাড়া আরো অনেক প্রমাণ পেলাম। করাসী রাজদূত, আমেরিকান রাজদূতের স্ত্রী কন্যা সাগ্রহে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রে যে-ভাবে আমাকে বন্ধুত্বের দিকে এগিয়ে এলেন তার মধ্যে শুধু লোকাচারের দুর্নীতা ছাড়াও কিছু প্রকট হয়েছিল। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী নোগুচির পুত্র সইচি এসেছিলেন ত্রিশ মাইল মোটরে ক'রে। গান শুনে তিনি গভীর তৃপ্তি প্রকাশ করলেন।

কিন্তু এই আসরে আমি নিজে সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম এক ফরাসী মহিলার প্রশংসায়। আমি পিতৃদেবের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ" গানটি চারটি ভাষায় গেয়েছিলাম সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি ও ফরাসি ভাষায় সব শেষে। তিনি সোচ্ছ্বাসে তারিফ করলেন আমার ফরাসি উচ্চারণের। এ-প্রশস্তিকে অবশ্য লৌকিক বলা চলতে পারত যদি না পরদিন তিনি বিশমাইল মোটরে ক'রে আসতেন বিমান-ঘাঁটিতে আমাদের বিদায়সম্ভাষণ জানাতে। তাঁর এতখানি উচ্ছ্বাসে আর্দ্র হ'য়ে তাঁকে প্রশ্ন করলাম: "এই শীতে এতদূর ধাওয়া ক'রে এলেন কেন এত কষ্ট ক'রে।" তিনি বললেন: "আপনার কাছে যা পেয়েছি তার প্রতিদান যেওয়া আমার অসাধ্য, কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানাবার আর কোনো উপায় খুঁজে পেলাম না।"

রোলাঁর অবিস্মরণীয় মনে পড়ল: "তোমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে যে-বিশ্বজনীন সৌন্দর্যের আবেদন আছে তা সুকুমারহৃদয় সঙ্গীতরসিক মাত্রেরই হৃদয়ে অনুরণন তুলবেই তুলবে—দেখে নিও। আর এ-সঙ্গীতের প্রচার তোমাকেই করতে হবে—একথা তুমি যেন না ভোলো।" এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনা এমন কি তর্কাতর্কিও করেছি এক সময়ে। পত্রেও তাঁকে লিখেছি একাধিকবার যে আমার মনে হয় না আমাদের ষড়ঙ্গপন্থী সঙ্গীতে বিদেশীরা রস পেতে পারে। কিন্তু তার পরে বহু ক্ষেত্রেই দেখেছি যে তাঁর কথাই সত্য আমার ধারণাই ছিল, সম্পূর্ণ না হোক, অনেকখানি ভ্রান্ত। জাপানে বিমানঘাঁটিতে হঠাৎ একথা মনে পড়ল এই নাম-না-জানা ফরাসি মহিলার গভীর উচ্ছ্বাসোক্তিতে। মনে মনে নমস্কার করেছিলাম তখন এই অনামাক্ত সঙ্গীতরসিকাকে। কারণ যে-কোনো উচ্চবিকশিত সঙ্গীতের শ্রোতা মিলতে পারে অনেক, কিন্তু স্রষ্টা বিরল—সব দেশেই। তবে শুধু সঙ্গীতেই বা বলি কেন? সব কিছুতেই সৃষ্টির পায় কোইতে লোকিক জন।

* * * *

টোকিয়োতে এবার যে আমেরিকান বিমানে উঠলাম তাকে বলে ফ্লাইং-বোট—মানে ডুবজা—জাহাজের মতন, উপর থেকে নিচে নামা যায়। আর নিচে এসে—ও মা! চমৎকার বৈঠকখানা! সেখানে ব'সে ক্যাপ্টেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি মহা উৎসাহ প্রকাশ করলেন আমি গায়ক শুনবামাত্র। তাঁর বাসনার নিবেদন—সান ফ্রান্সিস্কোয় আমাদের আসরে যেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে না ভুলি।

জাহাজে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হয়—যদিও সবের আলাপই ফুলে পুনর্দর্শন যেন কথাচিৎ। কিন্তু এই বিমানে এক আমেরিকান যুবকের সঙ্গে আলাপ হ'ল যে ইউ-এস-ওর কাছে ভ্রমণান্তে স্বদেশে ফিরছিল—তাকে বলা যেতে পারে এ নিয়মের ব্যতিক্রম। রাত চারটের বিমান নামল "ওয়েক দ্বীপে"। এখানে শুধু বিমান নামে ও সেই জন্যেই কয়েকশো লোক মোতায়েন করা হয়েছে। টোকিয়োর খাবার খাওয়ার পর শেষ রাতে যখন সবাই মিলে এ-দ্বীপে নামলাম তখন দেহ মন যেন জুড়িয়ে গেল অবশ্যই মনের হাওয়ায়ে। চীনের দেশে হাওয়া অশুভ। অথচ মশলাদিনের কী অপরূপ আদর! মনটা হঠাৎ প্রায় উচ্ছ্বাসী হ'য়ে ওঠে আর কি—মনে হ'ল যেন স্বদেশের স্পর্শ পেলাম পরমস্নেহের এ-পরিচিত স্নেহসম্ভাষণে। সেখানে কেমে সরবৎ খাচ্ছি এমন সময়ে সেই আমেরিকান যুবক এসে গল্প জুড়ে দিল—একথা সেকথা কত কথা! পুলকিত হ'লাম তার মুখে শুনে যে সে আমার Among the Great পড়েছে। হনোলুলুতে ও সানফ্রান্সিস্কোয় এ আমাদের খুব সমাদর তথা উপকারও করেছিল নানা ভাবে। ছেলেটি বড় অমায়িক ও ভদ্র। কিন্তু মানুষের নৈতিক ধারণা কত বদলে দেছে হঠাৎ টের পেলাম তার একটা কথায়। কথাটা সে এমন ভাবে বলেছিল যে ভারি মজা লেগেছিল। বলি।

ইন্দিরাকে কথায় কথায় সে বলল: "মেঘুন! ভারতীয়রা ভারি চমৎকার লোক—কিন্তু তাদের ধরণ ধারণ একটু যেন অদ্ভুত।

"অদ্ভুত? কেন?"

"আর কেন? আমি ছিলাম একটি হিন্দুপরিবারে। সেখানে একটি তরুণীর সঙ্গে ভাব হ'ল। তাকে একদিন বললাম আমার সঙ্গে দুচারদিন কোথাও বেড়িয়ে আসতে। কিন্তু সে গেল না। অদ্ভুত নয়?"

ইন্দিরা শুনে খুব হেসেছিল। কিন্তু আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ সে যে এতে অবাক হয়েছিল, ভাবতে আমার যেন আরো বেশি অবাক লেগেছিল। মনে জেগেছিল প্রশ্ন: "তবে কি বলব এক যুগ আর এক যুগের মনোভাবকে কখনোই বুঝতে পারে না পুরোপুরি? পুত্রকে পিতা ভালোবাসতে পারেন কিন্তু চিনতে পারেন কি? আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের চলার ছন্দ এখনো মন্থরাক্রান্তাই বলব। তাই না ভাবনা। ওদেশে গিয়ে কী দেখব কে জানে? কী বলব আর ওরা কী বুঝবে?

* * * (ক্রমশঃ)

—সাত—

"Como voce esta bonito"!

মন্দির নয়—মায়ালোক।

বীণা, বাঁশি আর মৃদঙ্গের ধ্বনিতে যেন গন্ধর্বলোকের ঐকতান। ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো পরিণত হয়েছে জ্যোতিঃর তরঙ্গে—ফুল আর ধূপগন্ধ আবর্তিত হচ্ছে সুরের রেণু রেণু পরাগের মতো। চারদিক থেকে সরে গেছে মন্দিরের দেওয়াল—দূরের সমুদ্র যেন সঙ্গীতের তরল তরঙ্গ হয়ে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আর সেই সমুদ্রের শীর্ষে ধ্বনি-গন্ধের একটি সহস্রদল শুভ্র পদ্মের ওপর দেবদাসীর দেহ লীলায়িত হচ্ছে বিক্ষুব্ধমানসী উর্বশীর মতো।

একটি ফেন-বুদ্বুদের মতো আলোক তরঙ্গের চূড়ায় জেগে রইল শঙ্খদত্তের চেতনা।

দক্ষিণ হাতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে শঙ্খমুদ্রায় পূজোর শুভ-সংকেত জানালো দেবদাসী—সংযুক্ত দশাঙ্গুলির যোগচিহ্নে কর্কট মুদ্রায় তুলল শঙ্খরব; মুক্তপাণির পুষ্পপুট মুদ্রায় দেবতাকে অর্ঘ্য দিয়ে অঞ্জলি মুদ্রায় জানালো ভক্তিনত প্রণাম।

তারপর চামর হাতে নিয়ে চলতে লাগল তার ছন্দিত পদক্ষেপ।

বাতাসে দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরী। নির্মল—নিষ্পাপ। শঙ্খদত্ত স্বপ্ন দেখছে। একটা সুগন্ধ পদ্মের ওপরে মাথা রেখে সঙ্গীতময় মহাসমুদ্রে ভেসে চলেছে সে। তার আদি নেই—সে অনন্ত।

—প্রেমী!

উদ্ধবের ছোঁয়ায় তার চমক ভাঙল। নৃত্যোৎসব শেষ হয়েছে। দেবতার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে দেবদাসী। একটা করুণ মূর্ছনায় ভেসে আসছে মৃদঙ্গ আর বীণার আওয়াজ। একটা বিহ্বল মাদকতায় সমস্ত মন্দির স্বপ্নার্পিত।

উদ্ধব বললে, চলুন!

শরীরের কোথাও যেন কোনো ভার নেই—ধূপের ধোঁয়ার মতোই তা লঘু হয়ে গেছে। এখনো যেন একটা পদ্মের ওপরে মাথা রেখে অলস মায়ায় ভেসে চলেছে সে।

প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পথে নামতে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল সে। রাত্রির শেষ প্রহর। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে শীতের কুয়াশা। নিষ্প্রাণ নির্জনতা চারদিকে—কুকুরগুলো পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। মাধবী পান করে যে জুয়াড়ীরা পথের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিল, তাদের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও।

নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল দুজনে

খানিক পরে উদ্ধবই জিজ্ঞাসা করলে, কেমন লাগল?

—অপূর্ব।

—দেবদাসীর যে নাচ সাধারণে দেখতে পায়, তা নয়।

—নাঃ!—একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলে শঙ্খদত্ত জবাব দিলে।

—এখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই কেন, আশা করি বুঝতে পারছেন।

—হুঁ—আন্দাজ করছি।

উদ্ধব বলে চলল, সব মানুষের মন সমান নয়।

এখানেও মন্দিরের গায়ে যে-সব মিথুন মূর্তি আছে, সাধারণে তার তাৎপর্য বুঝতে পারে না। তাই এ নাচও তাদের মনে কুভাব জাগাবে।

একবার চমকে উঠল শঙ্খদত্ত, বুকের মধ্যে সিউরে গেল একবার। তারপর ভাবল দিনে, তা ঠিক।

—দেবদাসী দেবতার বধূ। তাই দেবতার কাছে তার কোন সংকোচ নেই—কোনো আবরণ নেই। নিজের যেমন, লাজলজ্জা—সব নিঃশেষে নিবেদন করে দিয়েই সে ধন্য।

শঙ্খদত্ত এতক্ষণে আত্মস্থ হয়ে উঠল। মৃদু গলায় বললে, দক্ষিণের মন্দিরে মন্দিরে আমি অনেক দেবদাসী দেখেছি। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

উদ্ধব বললে, সে অনেক কথা। যৌবন আসবার আগেই কুমারী কন্যাকে দেবতার কাছে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়—তারপর গুরুর কাছে নৃত্যগীত শিখে সে দেবতাকে বন্দনা করবার অধিকার পায়।

—এরা কোথা থেকে আসে?

—নানা ভাবে। কেউবা নিজেকে মন্দিরের কাছে দান করে দেয়—তাকে বলে দত্তা। কেউবা দেবতার পায়ে নিজেকে বিক্রী করে দেয়—সে হয় বিক্রীতা। কেউ ভক্তি করে মন্দিরের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে—সে ভক্তা। রাজা-মহারাজেরা বহুমূল্য অলঙ্কারে সাজিয়ে কাউকে মন্দিরে দান করেন—সে অলঙ্কৃতা। কেউ বেতন নিয়ে মন্দিরে নৃত্যগীত করে—সে গোপিকা। আবার বাকে অপহরণ করে এনে মন্দিরে নিবেদন করে দেওয়া হয় সে হৃতা—

শঙ্খদত্ত বললে, থাক। ও দীর্ঘ তালিকা শুনে লাভ নেই। আচ্ছা যাকে মন্দিরে দেখলাম, সে—

শঙ্খদত্তের অসমাপ্ত কথাটা তুলে নিয়ে উদ্ধব বললে, ওর নাম শম্পা। মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী ও। হৃতা।

—হৃতা!—শঙ্খদত্তের বুকের মধ্যে একটা ঘা লাগল যেন।

—সেই রকমই শুনেছিলাম। কেরল দেশ থেকে নাকি একদল তীর্থযাত্রী বৈশবে ওকে হরণ করে আনে, তারপর পুণ্যের আশায় সঁপে দেয় জগন্নাথের মন্দিরে। এখানকার একজন প্রধান পুরোহিত ওকে লালন-পালন করেছেন—সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ওকে শিক্ষা দিয়েছেন ললিতকলা। শম্পা এ মন্দিরের গৌরব।

গৌরব! তা নিঃসন্দেহ। শঙ্খদত্তের চোখের সামনে অম্লান রজনীগন্ধার মতো নিষ্কলঙ্ক দেহখানি ভেসে উঠল। সুকুমার নগ্ন দেহটি সুরে-ছন্দে অতীন্দ্রিয় হয়ে গেছে—উজ্জ্বল কালো চোখে যেন স্বর্গের দীপ্তিরেখা। কিন্তু হৃতা! কোন্ মায়ের কোল থেকে, কোন্ সুখের সংসার থেকে ওকে নিষ্ঠুর হাতে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কে জানে! সংসারের প্রেমে ভালোবাসায় যে সার্থক হতে পারত, তার নিষ্ফল যৌবন এখানে একটি একটি শুকনো-পাপড়ির মতো ঝরে যাবে—কেউ একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবেনা।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলে শঙ্খদত্ত।

—যখন ওর যৌবন চলে যাবে, আর নাচতে পারবেনা, তখন?

উদ্ধব হাসল: তখন এই মন্দির থেকেও ওকে বিদায় নিতে হবে।

—তারপর ওর চলবে কী করে?

—যতদিন বাঁচবে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করা হবে মন্দির থেকে।

—ওঃ!—শঙ্খদত্ত চুপ করে গেল। তারপর চোখ তুলে দেখল, উদ্ধবের বাড়ির সম্মুখে এসে পৌঁচেছে দুজনে।

রাত সামান্যই বাকি—ঘুমোনোর আর চেষ্টা করলেন শঙ্খদত্ত। প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইল জানালার পাশে। একটু একটু করে সরে যেতে লাগল চাঁদের আলো—হাওয়ায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগল কুয়াশার ক্ষণবৃত্তি। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে শুধু কানে আসতে লাগল দূরের সমুদ্র গর্জন—শীতের ম্লানতায় অনেক-খানি নির্জীব হয়ে গেলেও তার আকৃতির বিরাম নেই।

দেবলোকের শূন্যপট থেকে শঙ্খদত্ত একটু একটু করে নামতে লাগল মাটিতে। তারও চোখের সামনে থেকে এখন সরে যাচ্ছে সুরের কুয়াশা—রক্তমাংসের একটি নারীমূর্তি আত্মপ্রকাশ করছে তার মধ্য থেকে। দেবদাসী নয়—একটি মানবী; সোনার ফলেভরা চলন্ত মঞ্জরী।

হৃতা।

ধারালো অস্ত্রের আঘাতের মতো শব্দটা। বুকের মধ্যে

তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা জাগিয়ে তুলছে বার বার। কোথা থেকে একটা অক্ষম ঈর্ষা সঞ্চারিত হতে লাগল শঙ্খদত্তের মনে। এই মন্দিরের ওপরে ঈর্ষা—দেবতার ওপরে ঈর্ষা। মানুষের প্রাপ্য কেড়ে নিয়েছে মন্দির—জোর করে অধিকার করেছে দেবতা। স্বেচ্ছায় আসেনি—পুণ্যকামনায় নিজেকে সঁপে দেয়নি দেবসেবায়। ও যেন দস্যুর লুঠ করা ধন।

মন্দিরের পবিত্রতা নয়—একটা সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি তার মস্তিষ্কের ভেতরে পদক্ষেপ করতে লাগল এইবার। তার দেহে-মনে মোহের ঘোর ঘনাতে লাগল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল শরীর, কপালে দেখা দিতে লাগল ঘামের বিন্দু। মাত্র কিছুক্ষণ আগেকার স্বর্গীয় পরিবেশ এমন করে বদলে যাবে কে জানত সে কথা!

ওই মেয়েটিকে আর একবার অন্তত দেখা চাই—কাছে আসা চাই যেমন করে হোক। তার দক্ষিণ পাটন, তার বহর, মোগল পাঠানের আসন্ন সংঘর্ষ—করম আলীর কথাগুলো সব যেন এক সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। নেশাটা ক্রমেই বেড়ে চলল—রক্তের মধ্যে শুরু হল অস্থির মাতলামি। জীবনের এতগুলো বৎসর শঙ্খদত্ত সযত্নে যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এসেছে, আজ সেই ব্যাধিই যেন সংক্রামিত হতে লাগল তার মধ্যে।

দেবদাসী। কিন্তু দেবতার কাছে এই দাসীত্বের ভেতর দিয়ে কী পায় সে—কতটুকুই বা পায়? এত রূপ, এত পূর্ণতা, সারা দেহে এমন আশ্চর্য ছন্দ! পাথরের বিগ্রহ কী প্রতিদান দেয় তাকে? স্বর্গের প্রেমে কতখানি পূর্ণ হয় রক্তমাংসের মানুষের জীবন?

নিদ্রাহীন রাত—উত্তেজিত স্নায়ু—বাইরে রাত্রি শেষের পিচ্ছলতা। একটা ঝোড়ো হাওয়ার দমক থেকে থেকে ভেঙে পড়ছে মাথার মধ্যে। চোখের সামনে ক্রমাগত দুলছে রজনীগন্ধার মঞ্জরীটি। বৃন্তছিন্ন। প্রাণহীন পাথরের পায়ে একটি একটি করে পাপড়ি শুকিয়ে ঝরে পড়বে তার। যেদিন জরা আসবে, অক্ষমতা এসে স্পর্শ করবে শরীর, নাচের ছন্দে, মুদ্রার বিন্যাসে যেদিন প্রতিটি অঙ্গ তার দীপশিখার মতো দুলে উঠবেনা, সেইদিন—

সেইদিন তার মুক্তি। তার বিশ্রাম। ব্যর্থতার মধ্যে চিরনির্বাসন। অথচ—

শম্পা! নামটি গানের মতো কানে বাজছে। তার উজ্জ্বল রূপ একটা জ্বালার মতো ঘুরে ফিরছে রক্তে। শঙ্খদত্ত আর থাকতে পারলনা। উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে, পার চল পাথরের সিঁড়ির শীতল অন্ধকার—এসে দাঁড়ালো বাইরে।

হু হু করে বইছে সমুদ্রের হাওয়া। তীর্থযাত্রীরা চলেছে স্নানের উদ্দেশে। রাস্তার একটা হাতী চলে গেল গলার ঘন্টা বাজিয়ে। মন্দিরের দিক থেকে শঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি।

বাংলা দেশের একদল বৈষ্ণব চলে গেল হরি-সংকীর্তন করতে করতে। নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য প্রচার করেছেন এই হরি-সংকীর্তন—কিছুদিন আগেই তিনি দেহরক্ষা করেছেন এই জগন্নাথধামে। বৈষ্ণবদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন, বাংলা দেশের উদ্ধারণ দত্তের মতো বণিকেরা পর্যন্ত হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হচ্ছেন। উড়িষ্যাতেও নাকি চৈতন্যের অনেক ভক্ত সৃষ্টি হয়েছে, এমন কি রাজারাও নাকি—

কিন্তু বৈষ্ণবদের সম্পর্কে শঙ্খদত্তের কোনো কৌতূহল নেই। লোকগুলোকে দেখলে তার হাসিই পায়। কতগুলো পুরুষ মানুষ সমস্ত দিন আকাশে হাত তুলে নেচে নেচে বেড়ায়, কথায় কথায় মেয়েদের মতো পথের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে। লোকে বলে, ও নাকি 'দশাপ্রাপ্তি।' কেমন হাসি পায় শঙ্খদত্তের। সপ্তগ্রামের পণ্ডিতেরা ঠাট্টা করেন:

'ইন্ধনমালা বলয়িত বাহু—
পরধন গ্রহণে সাক্ষাৎ রাহু'—

পরের পংক্তিটি অকথ্য। তারপরে আছে 'কীর্তনে পতনে মত্ত শরীর।' তাতে সন্দেহ নেই—লোকগুলোর আছড়ে পড়বার ক্ষমতা অদ্ভুত।

আর এই বৈষ্ণবদের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠেন গুরু সোমদেব।

মাথার ওপরকার জটাগুলো যেন সাপের মতো ফণা তোলে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসে।

—জীবের দেশকে আরো ক্লীব করে দিচ্ছে ওরা। যেটুকু পৌরুষ অবশিষ্ট ছিল, ওরাই তা শেষ করবে। এই পাষণ্ড বৈষ্ণবগুলোকে ধরে একটার পর একটা করে মহাকালীর পায়ে বলি দেওয়া উচিত।

সোমদেব। হঠাৎ ভয় পেল শঙ্খদত্ত—হঠাৎ বিভীষিকা দেখল চোখের সামনে। রাত্রের সেই মোহ মাদকতা তাকে

বেনী চাবুক মারল। দেশে, সমাজে রাহ্মণের মুখ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখছেন সোমদেব, আর সেই কাজে তাঁর সহযোগিতা করবার সংকল্প নিয়েছে সে। এই কি সেই সহযোগিতা? একটা দেবদাসীর আকর্ষণে অগ্নিপ্রদুষ্ট পতঙ্গের মতো এই অস্থিরতা। সোমদেব যদি কখনো এই দুর্বলতার খবর পান, আর মুখ দর্শন করবেন না তার। হয় তো অভিশাপ দেবেন—হয় তো—

যেন একটা প্রকাণ্ড চাবুকের ঘা পড়ল পিঠে। না—আর এখানে নয়। এখান থেকে আজই নোঙর তুলতে হবে তাকে। অনেক দূরের পথ দক্ষিণ পাটন, অনেক সমুদ্র এখনো তাকে পাড়ি জমাতে হবে—এখনো তার অনেক কাজ বাকী।

ধীরে ধীরে সে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

জল বেঁধে স্নানার্থীরা আসছে যাচ্ছে। চকিতের জন্যে মনে অন্যেরার ছায়া পড়ল: আবার করম আলীর সঙ্গে দেখা হবেনা তো? লোকটাকে সে ঠিক বুঝতে পারে না—দেখলেই একটা অদ্ভুত ভয়ে কাতর হয়ে ওঠে। মোগল-পাঠান-ইস্টান। খমথমে কিছু একটা ঘনিয়ে আসছে আকাশ বাতাসে। করম আলীর মুখে চোখে তারই সংকেত। সমুদ্রে ভয়ঙ্কর কোনো ঝড় আসবার আগে যেমন এক আপটা অশুভ সিন্ধ-শকুন দেখা দেয়—সেই রকম।

স্নানের ঘাট পেরিয়ে নির্জনে বালিডাঙার ওপরে এসে দাঁড়ালো। দূরে-কাছে রাশি রাশি কেয়াবন আর কাঁটা ঝোপের অসংলগ্ন ব্যাপ্তি। জলের কাছাকাছি ঝুড়ি আর কিনুকের সারির মধ্যে বসন্তের হাওয়ায় ঝরা গাঢ় রক্ত কৃষ্ণচূড়া ফুলের মতো লাল কাঁকড়ার আনাগোনা। আর একটু ওপাশে সেই বালিয়াড়ীটা দেখা যাচ্ছে—যেখানে কাল সে এসে বসেছিল করম আলীর সঙ্গে।

চকিতে সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে সে—তাকালো দূর সমুদ্রে। শান্ত শীতের সাগরে অল্প অল্প ঢেউ ভাঙছে—সেই ঢেউয়ের রেখার ওপারে তার বহর দাঁড়িয়ে। নীল জলে রক্তদান করে এখন সবে উঠে পড়েছে সূর্য, তার রক্তাভ সোনালি আলোয় বহরটাকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে।

আজই কি বহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়া যাবে।

শঙ্খদত্ত ভ্রূকুটি করলে। বাতাসের গতি উপকূলমুখী—তাকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। তা ছাড়া আর একটু এগোলেই কূলের কাছাকাছি আছে ডুবো-পাহাড়, তার ওপর গিয়ে পড়লে বিপদের সীমা থাকবে না। যতদূর মনে হচ্ছে, আজও বোধ হয় এখানেই থেকে যেতে হবে। যাই হোক—'কাঁড়ার'দের কাছে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে একবার।

রাত্রির ক্লান্তি আর অবসাদে জর্জরিত শরীর। নেশার রেশটা এখনো তাকে বিস্বাদ করে রেখেছে। সামনে স্নিগ্ধ নীল জলের হাতছানি। অবগাহন স্নানের প্রলোভনে তার মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

আজটায় স্নান করা নিরাপদ নয়। হাঙরের আনা-গোনা আছে—শুকর মাছের চাবুকের ভয় আছে। তা ছাড়া কখনো কখনো করাত মাছেও আক্রমণ করতে পারে। তবু সমুদ্রের লোভনিটাকে দমন করতে পারল না শঙ্খদত্ত। গায়ের জামা খুলে সে নেমে পড়ল জলে।

স্নিগ্ধ জলের কবোষ্ণ আলিঙ্গনে দেহের আগুনটা নিবে এল—ছোট ছোট ঢেউয়ের লীলাস্পর্শে মুছে নিতে লাগল সঞ্চিত অবসাদের গ্লানি। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে সে। পায়ের তলা দিয়ে একটা মস্ত বড় শঙ্খ খল্‌খল্ করে পালিয়ে গেল—ইতস্তত সঞ্চরণ করতে লাগল মুঠো মুঠো ঝিনুক। চিন্তাহীন—কর্মহীন নিবিড় বিরামের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইল শঙ্খদত্ত।

তারপর সূর্যের রোদ যখন প্রখর হল, যখন তীক্ষ্ণ নোনা জলে চোখ মুখ জ্বালা করতে লাগল, তখন জল ছেড়ে উঠে পড়ল সে। অজস্র উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় আধখানা করে নিংড়ে-নেওয়া ভিজে কাপড়টা শুকিয়ে নিতে তার দেরি হলনা, তারপর মন্থর পায়ে সে ফিরে চলল উদ্ধবের বাড়ির দিকে।

অন্যমনস্কভাবে সে আসছিল—আসছিল চারদিকের মানুষগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে। হঠাৎ কানে এল বাজনার শব্দ—সম্মিলিত নারীকণ্ঠের তীব্র মধুর গানের উচ্ছ্বাস।

তাকিয়ে দেখল, পথের দুধারে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে লোক। অলস কৌতূহলে কী যেন দেখছে।

শঙ্খদত্তও দাঁড়ালো। একটা বিয়ের শোভাযাত্রা আসছে।

—খুব সমারোহ দেখছি। কোনো বড়লোকের বিয়ে বুঝি?—স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করলে শঙ্খদত্ত।

—হুঁ। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডার ছেলের বিয়ে—পাশ থেকে কে উত্তর দিলে।

শঙ্খদত্ত দেখতে লাগল। দীর্ঘ শোভাযাত্রা আসছে। আগে আগে চলেছে বাদ্যকরের দল। মাঝখানে মঙ্গল গান গাইতে গাইতে চলেছে মেয়েরা। তাদের পিছনে সোনা-রূপোখচিত খোলা পালকিতে কিশোর বর—তার পাশে বালিকাবধূ।

শঙ্খদত্তের শিথিল দৃষ্টি হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—থমকে গেল এক জায়গায়। হৃৎপিণ্ডের ভেতরে আছড়ে পড়ল উচ্ছলিত রক্ত। মুহূর্তের জন্যে মনে হল, অলস-অসুস্থ কল্পনায় সে স্বপ্ন দেখছে। দিবাস্বপ্ন।

কিন্তু স্বপ্ন নয়—মায়াও নয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় রাত্রের সেই রজনীগন্ধা নীলপত্রপুটে ঘেরা কেতকীর মতো ফুটে উঠেছে। নীল শাড়িপরা যে অপূর্ব রূপবতী মেয়েটি দলের সকলের আগে গান গাইতে গাইতে চলেছে—সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে যার কণ্ঠহার, যার হাতের কঙ্কণ, যার স্বর্ণাভরণ, সে আর কেউ নয়! আর কেউ সে হতেই পারেনা।

তীব্র উত্তেজনায় সে বলে ফেলল, ওকে? নীল শাড়ী-পরা কে ও?

পাশের লোকটি জবাব দিলে, ওকে চেনো না? ও যে মন্দিরের শ্রেষ্ঠ দেবদাসী—ও শম্পা।

শঙ্খদত্তের ঠোঁট কাঁপতে লাগল—তুফান ছুটে চলল রক্তে। কয়েক মুহূর্ত একটা শব্দ সে উচ্চারণ করতে পারল না—অসুস্থ চোখ মেলে চেয়ে রইল আনীলপত্রাবৃত কেতকীর দিকে।

—কিন্তু এখানে কেন? কেন এই শোভাযাত্রার সঙ্গে?

—বাবে, তাই তো প্রথা!—যে লোকটি জবাব দিচ্ছিল, সে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে শঙ্খদত্তের দিকে। কেমন অস্বাভাবিক মনে হল তার। নিশ্চয় বিদেশী এবং নির্বোধ।

—প্রথা কেন?—নির্বোধের মতোই জানতে চাইল শঙ্খদত্ত।

লোকটি অনুকম্পার হাসি হাসল: দেবদাসী হল দেবতার বধূ। দেবতা অমর, তাই দেবদাসী চিরসধবা, তার কখনো বৈধব্য হয়না।

—ওঃ!

—তাই এই সব শুভকাজে দেবদাসীকে সমাদর করে ডেকে আনা হয়। সবাই আশা করে, দেবদাসীর মতো নববধূও চিরসধবা থাকবে—কখনো তাকে বৈধব্যের দুঃখ ভোগ করতে হবেনা।

শোভাযাত্রা ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। জনতার ভিড়ে আর দেখা যাচ্ছেনা শম্পাকে। ঐকান্তিক আগ্রহে চোখের দৃষ্টিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করেও নয়।

হঠাৎ অসুস্থের মতো অস্বাভাবিক একটা প্রশ্ন করে বসল শঙ্খদত্ত।

—কোথায় থাকে ওই দেবদাসী? ওই শম্পা?

লোকটা হঠাৎ হেসে উঠল।

—কোথাকার মানুষ হে তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি? ওসব মতলব ছেড়ে দাও। বরং স্বর্গে যাওয়া সোজা—কিন্তু শম্পার কাছেও কোনোদিন পৌঁছুতে পারবেনা।

শঙ্খদত্ত কোনো জবাব দিলেনা। আস্তে আস্তে সরে গেল লোকটার পাশ থেকে। তারপর মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেইদিকেই পা চালালো—যেদিকে শোভাযাত্রাটা এগিয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হোটেলে ফিরে আসতেই সোভিয়েট বন্ধু ইউরি অলোককুমার, আমাদের ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদলের [illegible] (অলোকদা) [illegible] (সেনগুপ্তদাদা) [illegible] ঘরে আসতে বলে [illegible]। ইউরি [illegible] চলচ্চিত্র অফিসের [illegible] করতেন, সিনে ডাইরেক্টর [illegible]। অলোক-বিদেশে পরিচিত-জনকে পেয়ে অলোককুমারও মহা-খুশি···কাজের কথা ভুলে সোৎসাহে তিনি গল্প-আলাপে মেতে উঠলেন।

তাঁর বাসনা ছিল, লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গে মিলবেন ; তারপর একসঙ্গে মস্কোতে ফিরবেন। সোভিয়েট রাজ্যে এসে নামবেন। কিন্তু ওঁদের 'নাসিংহোমে' তাঁর অসুস্থা পত্নীর 'অপারেশন্' এবং পরিচর্যার ব্যবস্থাদি করতে আটকে পড়ায় মস্কোতে পৌঁছতে তাঁর বিলম্ব ঘটেছে।

মস্কোর মুখ্যরাজপথ—গোর্কী ষ্ট্রীট। দূরে ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন কলের জার সম্রাটদের আমলের 'STATE DUMA' বা পরিষদ ভবন। অধুনা সোভিয়েট আমলের এ ভবনটি হচ্ছে State Historical বা রাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা

আলাপ-আলোচনা করে উঠেছিল বেশ ···হঠাৎ কাঁটা ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি—রাত ছুটো বাজে ! কাজেই সেরাত্রির মত আলোচনা মুলতুবি রেখে বিদায় নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে এলুম। পরের জন্য সঙ্গীরা তখন নিজেদের কামরায় গিয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।···অত রাতেও পথে লোক চলছে···গাড়ী-চলাচল বন্ধ নয়। নীচে হোটেলের নাচ-ঘর থেকে ভেসে আসছে ওর্কেস্ট্রার বিচিত্র মধুর সুর-ঝঙ্কার···শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলো প্রত্যুষে। বিছানা ছেড়ে ঘরের বিরাট সার্সির ধারে এসে দাঁড়ালুম—মস্কো শহরের প্রভাতী দৃশ্য দেখবার মানসে। রাস্তার ওপারে পুরানো ধরণের বিরাট ছ'সাতটা বাড়ীগুলোর পিছনে কুয়াশাসের ভোরের আকাশে সবে ফুটি-ফুটি করছে উষার প্রথম আলোক-রেখা ! নৈশ বিরামের পর ঘুমন্ত শহরের পথে লক্ষ দেখেছে কর্মচঞ্চল লোকজনের প্রাণ-হিল্লোলের সাড়া ! চোখে পড়লো, ওদেশের বাড়ুয়ার-সাড়ুয়ারীদের চেহারা···সাদাসিধা-ছাঁটের ছাই-রঙের পোষাক পরা, পথের ধুলো-কাদার ছোঁয়াচ থেকে সে পোষাক বাঁচাবার উদ্দেশ্যে

অঞ্চাবয়বের সাজে যাঁরা সারা চত্বরের আজ্ঞাবহী। সাড়ুবারদীদের হাতে ঘড়ি, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় রুমাল বাঁধা···লম্বা চাওলওয়ালা কোট হাতে সামনে সুচারুভাবে ভজ্জাল সাফ্ করে চলেছে। মুখে আওয়াজ নাবণা, চোখে-মেজে এতটুকু লোকামি বা কর্মব্যস্তার ঘোপ্ নেই—তাদের সাজ-পোষাকে বা আচার-ব্যবহারে কোথাও। সে কালের রুশীয় 'জার'দের আমলে গুমেশের পথ-ঘাটের অবস্থা ছিল যেমন বিশ্রী, তেমনি নোংরা···কিন্তু সোভিয়েট সুব্যবস্থার গুণে এখন আর তেমন নেই! আধুনিক সোভিয়েট দেশের সর্বত্রই সুপ্রশস্ত পথ-ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে অভিনব রীতির প্রচলন হয়েছে। গুমেশের সামাজিক-কানুন অনুযায়ী গ্রামের এবং সহরের প্রত্যেকটি গৃহাঙ্গন এবং বাড়ীর সামনেকার ফুটপাথ ও পথের এলাকাটুকু আবর্জনাহীন এবং তকতকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব সেই অধিবাসীদের। হয় নিজেরা পালা করে, না হয় নির্বাচিত ভাড়ুয়ার ভাড়ুবারীদের দিয়ে ওঁরা নিত্য নিজেদের গৃহাঙ্গন এবং বাড়ীর সম্মুখের পথ-প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিয়ে রাখবেন—এই হলো নিয়ম। এর এতটুকু অন্যথা ঘটলে রাষ্ট্রের দিবাদে অপরিচ্ছন্নতা ও গাফিলতীর অপরাধে গৃহবাসীদের দণ্ডভোগ করতে হয়! এ-ব্যবস্থার ফলে, পথ-ঘাট এবং বাড়ী-ঘর-দোর তকতকে রাখার সম্বন্ধে গুমেশের বাসিন্দারা বেশীমুখ প্রত্যেকেই বিশেষ সচেতন। শুধু ফুটপাথ আর বাড়ীর সামনেটুকু পরিচ্ছন্ন রাখা নয়···গ্রাম এবং সহরের সড়ক আর রাজপথের ভজ্জাল আবর্জনাদি সাফ্-সুতরো করার উদ্দেশ্যে গুমেশে বিশেষ ধরণের মোটর-যান ব্যবহৃত হচ্ছে। এ-সব মোটর-যানের আকৃতি আমাদের কলকাতার কর্পোরেশনের ভজ্জাল ফেলা লরীর মত···তবে পার্থক্য এই, এ-সব গাড়ীর সামনের চাকার অগ্রভাগে রেল-এঞ্জিনের Cow-Catcher Plateএর মত সুদীর্ঘ বুরুশ আঁটা থাকে···তার সাহায্যে গাড়ী পথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে পথের দু'দিকে ভজ্জাল ঝেঁটিয়ে সাফ্ করে নিয়ে যায়। শীতকালে গুমেশের পথ বরফে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তখন পথের ভজ্জাল সাফ করবার এ-সব মোটরযানের সামনে বিচিত্র 'বুরুশ-ঝাঁটার' বদলে চুমি থেকে চমাট তুষারের স্তূপ

লেনিন লাইব্রেরী—মস্কো

মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ কলাশিল্প যাদুঘর—'মুসিয়' ইজোব্রাজিতেলনিখ' বা Museum of Art

ছেঁচে ফেলবার জন্য বিশেষ ধরণের সুদীর্ঘ কোদালের পাত সংলগ্ন করা হয়। এ-সব ব্যবস্থা ছাড়া সহরের ট্যাক্স এবং 'বার্ষিক-বুরুশ'-আঁটা 'পদ-ধোলা' বিচিত্র এক ধরণের মোটরযানের ব্যবস্থা—পথঘাট নিত্য-নিয়মিত এমন পরিপাটিরূপে ঘুরে সাফ হয়, সহরের কোথাও ধুলো কাদা বা ভজ্জাল আবর্জনার চিহ্ন দেখা যায় না।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে সোভিয়েট দেশের এই বিচিত্র দৃশ্যাবলী

দেখছি—স্বপ্নে লোকজনের ভিড় বাড়ছে—আমাদের দেশের মতই কেউ বেরিয়েছে দৈনন্দিন কাজে, কেউ চলেছে বাজারের দলি হাতে, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেউ বেরিয়েছে প্রাতর্ভ্রমণে! যাত্রী আনবার মোটর, লরী, ট্রলী-বাসের চলাচল সুরু হয়েছে পথে। সদ্য-জাগা সহরের চারিদিকে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে দৈনন্দিন জীবনের কর্মচাঞ্চল্য।

পৃথিবীর পূর্ব্ব-প্রান্তে অর্থাৎ প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে, আমাদের দেশে পরদেশের যেসেলেবি ভোর ৮টা নাগাদ আকাশের বুকে জাগে প্রভাতী-সূর্য্যের ছটা। পশ্চিম-প্রান্তে সোভিয়েট দেশে কিন্তু সূর্য্যোদয় হয় সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ—অর্থাৎ আমাদের সময়ের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে। তার কারণ, পৃথিবীর পূর্ব্ব দক্ষিণ দিক প্রান্ত ভূ-ভাগ থেকে পশ্চিম-উত্তর দিকে প্রতীচ্যের পানে যত এগিয়ে যাবে—সূর্য্যোদয়ের সময়ও তত যাবে পেছিয়ে এবং সেই ভাবে দেশ-কাল-অনুসারে ঘড়ির কাঁটাকে মিলিয়ে ঠিক করে নিতে হবে।

ঘরের বাইরে চাইতে আমরা তখন বেশ—দিনের আলো ফোটার

মস্কোর রাজপথ—গোর্কিবোইয়া ষ্ট্রীট

সঙ্গে সঙ্গে স্নানাদির পাট চুকিয়ে পরম পোষাক পরে আমরা সদলে এসে জুটেছি হলুস হোটেলের একতলায় খানা-কামরায়! প্রাতরাশের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত! খানা-টেবিলে বসে স্থির হলো, সেদিনের ঘোরা-ফিরা এবং দেখাশোনার প্রোগ্রাম। প্রাতরাশের পর বেরুবো মস্কো সহর পরিদর্শনে ...দুপুরে 'মুজিয়ি ইজোব্রাজিতেলনিখ্' (Museum of Art) বা কারুকলা-যাদুঘরে! বিকেলে সকলে যাবো পরলোকগত সোভিয়েট জন-নায়ক কমিউনিজ্‌মের মহাগুরু মনীষী লেনিনের সমাধি-সৌধ বা Mausoleum দেখতে! সেখান থেকে হোটেলে ফিরে খানিক বিশ্রাম এবং রাতের ভোজপর্ব্ব সেরে আবার সদলে যাবো বোলশই অপেরা হাউসে—'সাদ্‌কো' (Sadko) নামে সুপ্রসিদ্ধ রুশীয় ঐতিহাসিক্যের লীলাভিনয় দেখতে।

সোভিয়েট দেশের প্রত্যেক সহরে, এরোড্রামে, রেল-ষ্টেশনে এবং হোটেলে ওদেশী এবং বিদেশী পর্য্যটকদের সর্ব্ব-সুবিধার জন্য 'Intourist' নামে এক অভিনব পরিভ্রমণ-প্রতিষ্ঠান বা Tourist Bureau ব্যবস্থা আছে! এঁদের কাছে পর্য্যটকদের জন্য প্রয়োজনমত যান-বাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া—টিকিট-সংগ্রহ এবং মাল-পত্রের ঝক্কি সামলানো, দেশের যা-কিছু দ্রষ্টব্য জ্ঞাতব্য সে-সব দেখিয়ে-শুনিয়ে বেড়ানো...এসবি আরো বহু খুঁটি-নাটি। বিদেশী পর্য্যটকদের পক্ষে ওদেশের কিছু বুঝতে, জানতে বা বাক্যালাপ করতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য সোভিয়েট-রাজ্যের প্রত্যেকটি 'Intourist' প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মান, তুর্কী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা-ভাষী রীতিমত-শিক্ষিত বহু 'Tourist-Guide' আছেন। পর্য্যটকদের এঁরা সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করে থাকেন—ওদেশের ছোট-বড় প্রত্যেকটি ব্যাপারে! সোভিয়েট-রাজ্যের প্রথানুযায়ী মস্কোর প্রায় হোটেলেও ছিল Intourist প্রতিষ্ঠানের এক অফিস! আমাদের সোভিয়েট-সহচর ঘোড়াধী-বন্ধু আনাতোলী এবং আলেকজান্দ্রোভার নির্দ্দেশে হোটেলের Intourist-প্রতিষ্ঠানের মহিলা-প্রতিনিধি অনতিবিলম্বে কলকাতার State-Bus বা রাষ্ট্রীয় পরিবহন-বিভাগের মোটর-বাসের মত সুদৃশ্য বিরাট আরাম-প্রদ একখানি অতি-আধুনিক ওদেশী মোটর-বাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। প্রাতরাশের পর সেই মোটর-ব্যাসে চড়ে আমরা সদলে বেরুলুম সহর দেখতে। সঙ্গী হলেন ঘোড়াধী-সহচর-বন্ধু আলেক-জান্দ্রোভা, আনাতোলী এবং মস্কোর Central Documentary Filme Studioর একজন news-cameraman বা সাংবাদিক চলচ্চিত্র-শিল্পী। আমাদের চিত্র-গ্রহণ করাই এঁদের উদ্দেশ্য; প্রতি সপ্তাহে সোভিয়েট রাজ্যের প্রেক্ষাগৃহে যে সব Newsfilm বা সংবাদ-চিত্র দেখানো হয়, সেগুলিতে সন্নিবেশ করবেন বলেই ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের দেশ-পরিক্রমার এ-সব ছবি তুলছেন! তাছাড়া গুনলুম, ষ্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত ওদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ পরিচালক ঐযুত লিওভিচ্, ভার্শাভস্, ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদের সোভিয়েট রাজ্য-পরিক্রমণের বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে স্বতন্ত্র একখানি Documentary Film বা তথ্য-প্রধান চলচ্চিত্র রচনা করছেন—সেজন্য তিনিও আমাদের প্রত্যেকের চিত্র-গ্রহণের ব্যবস্থা করেছেন! বুঝিলে পড়লুম আমরা...আশে-পাশে এত ক্যামেরা এবং ক্যামেরাম্যানের ভিড় দেখে সকলে রীতিমত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলুম! কিন্তু উপায় কি!...ওদেশী চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের উদগ্র-উৎসাহের তোড়ে আমাদের ওজর-আপত্তি টিকলো না।

আমাদের নিয়ে 'ইন্‌টুরিস্ট' প্রতিষ্ঠানের মোটর-বাস বেরুলো সহর পরিক্রমণে ! বেলা তখন প্রায় সাড়ে দশটা···প্রশস্ত পথ-ঘাট, বড়-বড় দোকান-পাট, অফিস-হস্তর, স্কুল-কলেজ-মিউজিয়াম, লোক-জন আর যান-বাহনের ভিড় দিগ্‌বিদিগ্‌ করছে···কিন্তু কোথাও এতটুকু চট্টগোল বা বিশৃঙ্খলা নেই !···সুসংযত ভাব সর্ব্বত্র !

সোভিয়েট-রাষ্ট্রের রাজধানী এবং রুষীয় প্রজাতান্ত্রিক যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রধান জন-পদ মস্কো—বয়সে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য-পরিমাণেও মহান্···প্রায় আটশো বছর আগে ভিত্তি-স্থাপনা করা হয়েছিল এই মহানগরীর ! সে-কালের রুষীয় 'Czar'-দের আমলে মস্কোতেই ছিল ওদেশের রাজধানী হস্তর, পরিষদ এবং রাজার প্রাসাদ-দুর্গ ! ওদেশের প্রাচীন আমলের রাজ-ভবন এবং আধুনিক-যুগের সর্ব্বপ্রধান সোভিয়েট রাষ্ট্রের হস্তর হিসাবে সুবিখ্যাত, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'ক্রেমলিন' দুর্গ-প্রাসাদটি নির্ম্মিত হয় রুষীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। সে আমল থেকে বিগত ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল যাবৎ ক্রেমলিন-প্রাসাদ ছিল রুষীয় 'জার্'-দের আবাস-ভবন ; কিন্তু বল্‌শেভিক বিপ্লবের পর সোভিয়েট আমলে এ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রধান রাষ্ট্রীয় দপ্তরখানা ! সেই প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক-কাল পর্য্যন্ত রাজধানী মস্কো সহরের উপর দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মোন্মাদনার কি ঝড় না বয়ে গেছে—উন্নতি-অবনতির কত না তরঙ্গ··· কত বিদেশী শত্রুর পাঁড়ন অত্যাচার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুণ্ঠন-লালসার তাণ্ডব—তাতে বিধ্বস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহা-নগরী ! তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বিপ্লব, সে-সব সহ্য করে আজো অক্ষত-গৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—প্রাচীন এবং আধুনিক আমলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও কলাকৃষ্টি ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ-সমন্বয়ের প্রত্যক্ষ প্রতীক সুপ্রসিদ্ধ মস্কো সহর ! দীর্ঘকাল ধরে যুগে-যুগে এমনি পুরাতন ও নবীন বর্ণ-বিচিত্র ভাবধারা ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আজকের মস্কো এমন অভিনব অপরূপ রূপ-পরিগ্রহ করেছে—যার তুলনা মেলে না !

(ক্রমশঃ)

সদাচার

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ইংরাজি শব্দ সিভিলিজেসনের একদিন রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন—সদাচার। সাধারণতঃ আমরা সিভিলাইজ্‌ড্‌ শব্দের অর্থ করি সভ্য। সভ্য কি তা খুব স্পষ্ট বুঝি না, বরং সদাচারের অর্থ বোধগম্য। দুটিকে মিশিয়ে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে সদাচারী মানুষই সভ্য মানুষ। সভ্যতা সদাচার।

শব্দ মনের ভাবকে রূপ দেয় নিজের জ্ঞানের আসরে এবং পরের চিত্তে। সাধারণ শব্দের বালাই নাই। জল বললে ঠিক বুঝি নিত্য ব্যবহার্য্য তরল পদার্থটিকে—ঘোলা জল জানি এমন কিছু তার সঙ্গে মেশানো যা বারির স্বচ্ছতাকে নষ্ট ক'রে তাকে করেছে আবিল। কারণ মানে বুঝি সেই যোগাযোগ, যার ফলে অন্য কিছু ঘটে। কিন্তু কারণ-বারি বল্লেই সর্ব্বনাশ। যে উত্তমরূপে কারণ-বারি শব্দের অর্থ জানে বা বোঝে তার কাছে শব্দটির রূপ ও তাৎপর্য্য স্পষ্ট ফোটে বুদ্ধির দরবারে। কিন্তু যে বোঝে না তার কাছে বুদ্ধিমান ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করলেও হয় তো কারণ-বারির স্বরূপ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা প্রকাশ করতে পারে না। এ-উভয়ের বোঝাবুঝি মানব মনের কর্ম্মধারার সাধারণ প্রবাহ। কিন্তু এর বিপদ, বুঝতে গিয়ে ভুল-বোঝা অথচ বুঝেছি এ প্রত্যয়ের বর্শবর্ত্তী হওয়া। যে বুঝলে না সে বল্লে—তোমার ভাষা বোঝার আশায় দিয়েছি জলাঞ্জলি। কিন্তু যে না বুঝে ভাবলে বুঝেছি সে কারণ-বারির মাত্র অন্তর্নিহিত ভাবের শত্রু নয়, সে শত্রু ভাষা, ভাব ও ভাবুকের—যখন সে নিজের অপরিণতবুদ্ধি অন্যের বুদ্ধি গোচর ক'রে তার প্রতীতি জন্মায় যে তার বিবৃতি অভ্রান্ত।

পরিভাষা ও সংজ্ঞার দোষ ও গুণ এইখানে। পারিভাষিক শব্দ যেমন চিন্তার গতি ও ভাব-বিনিময়ে সহায়তা করে, তেমনি তার মধ্যে আবিলতা থাকলে শব্দ,বিশেষ পারিভাষিক শব্দ, হয়ে দাঁড়ায় সমাজদ্রোহী। কারণ সমাজ শ্রদ্ধা করে বিশেষজ্ঞকে, যার ভাষায় ও ভাবে পরিভাষার সঞ্চয় প্রচুর। অথচ বুজরুকের কপটতার অস্ত্রাগার প্রায়ই সজ্জিত থাকে পরিভাষায়—যার অর্থ সে বোঝে না অথচ তার বিকৃত অর্থ তার স্বার্থসিদ্ধির সহায়ক।

বলছিলাম সিভিলিজেসনের কথা। ও শব্দটা যদি আমরা বুঝতাম তাহলে যে দুর্গতি ও অধোগতি আমাদের

সমাজকে আজ ঘিরেছে, তার কবল হতে রক্ষা পাবার কবচের সন্ধান পেতাম। রোগের মূল না দেখে চিকিৎসা করে আনাড়ি ও হাতুড়ে চিকিৎসক। সিভিলিজেসন কি তা' বুঝলে আমরা আজ সিভিলাইজ্‌ড্ কিনা তা' নির্দ্ধারণ করতে পারতাম। আর যদি বুঝি যে, যে কথাটা উচ্চারণ করতেও ভয় হয় আমরা তাই অর্থাৎ আন্‌সিভিলাইজ্‌ড তা হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হতে পারে আমূল সংস্কারের।

তাই আমি বলতে চাই যে সিভিলাইজ্‌ড্ মানুষ সভ্য মানুষ এবং সভ্য মানুষ সদাচারী মানুষ। এ দু'টি বাষ্টির বর্ণনা। সিভিলিজেসন কথাটি ইংরাজিতে সমষ্টি বা কোনো বিশেষ সমাজের অবস্থা বোঝাবার অভিপ্রায়েই ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে বোধ হয় সিভিলিজেসন বোঝাবে জাতীয় সভ্যতাকে এবং সে সভ্যতার যান হবে দেশের জাতীয় বিধানে সদাচারের স্থান রূপ ও গতি। জাতি বা গোষ্টি হিসাবে যে জাতির বিধি-নিয়মে সদাচারের যেমন ব্যবস্থা সে জাতির সিভিলিজেসনের রূপ সেই স্তরের। সদাচার প্রবর্ত্তনের বিধি-ব্যবস্থা সমাজের গতি নির্ণয় করে। আর যে সমাজে সদাচারীর সম্মান, সে সমাজ উন্নত।

কিন্তু সাধারণ একজোড় সিভিলিজেসন কথার অর্থ করে সেই জাতীয়—অবস্থা যে অবস্থায় কোনো জাতির কর্ণধারগণ শিল্প-সাহিত্য ও শিষ্ট আচরণের ব্যবস্থা স্পষ্ট। একদিন আমার নামক এক ইংরাজের ধৃষ্টতা ও সাম্রাজ্য-মাদকতা ভারতবর্ষের বাসিন্দাকে জাতি হিসাবে অসভ্য বলে নির্দ্দেশ করেছিল। সার জন উডরফ তাঁর ইন্‌ ইণ্ডিয়া সিভিলাইজ্‌ড্ গ্রন্থে সে অবুককে যেমন মুখতোড় জবাব দিয়েছিলেন, তেমনি জগতের সামনে ব্যাখ্যা করেছিলেন—কাকে সভ্যতা বলে এবং প্রমাণ করেছিলেন যে সেই উচ্চ মানে ভারতের সভ্যতা অসাধারণ। সুতরাং সমাজ হিসাবে আমাদের সমাজ সভ্যসমাজ কিনা সে বিচার সময় নষ্ট। এ সমাজ সদাচারের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে—ধর্ম্মশাস্ত্রে, কাব্যে, সাহিত্যে এবং মহামানবের চরিত্র বিশ্লেষণ ক'রে সে আদর্শ অতি উচ্চ। আমাদের জীবনে আমরা মহামানব দেখেছি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও গান্ধী প্রভৃতি। উপদেশবাণীর প্রতিধ্বনি শুনেছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের। বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত দেখেছি জগদীশচন্দ্র প্রফুল্লকুমার। আজও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দর্শন পাচ্ছি। অতীতের কথা উঠিয়ে সভ্যতা ও সদাচারীর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আমাদের গর্ব্বিত করতে পারে, পথ দেখাতে পারে। কিন্তু সে পথে না চল্‌লে মান-চিত্রে আঁকা বিদেশের পথের মত পটেই আঁকা থাকবে সে পথরেখা।

সদাচার বোঝায় আচরণ, ব্যবহার, চালচলন। এতো মাত্র নিজের প্রতি নয়—ব্যবহার বা আচরণ বল্লে অন্যকে বোঝায়। সমাজে যাদের সঙ্গে বাস করতে হয়, তাদের সঙ্গে মেলামেশার প্রণালী আচরণ। সেই আচরণ শিষ্ট ও সাধু হলে হয় সদাচার। এই কথার বিরাট ব্যাপক অর্থ বিশ্লেষণ করলে বুঝবো সদাচারের ব্যাপারটা কি? তাই প্রথমেই নিন্দা আরম্ভ করেছিলাম সেই ভাবুক ও বক্তার যে বিশ্লেষণ না ক'রে, নিগূঢ় তাৎপর্য্য না বুঝে পরিভাষা ব্যবহার করে বচনে। সে পরকে ভ্রান্ত করে নিজেকে প্রবঞ্চিত করে। সদাচারী হয় সমাজ, তবু তার জনগণের মধ্যে থাকে কদাচারী। সদাচার যেমন সমষ্টির পক্ষে শিক্ষণীয়—তেমনি কর্ত্তব্য ব্যক্তির পক্ষে সাধনা। সভ্য-অভিমান মানুষকে অসভ্য বর্বর ব্যবহার হতে মুক্ত রাখতে পারে, মানুষ নিজে সদাচারী হলে। আমি সভ্য ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক বা আমি কোনো বেদান্ত মঠের সভ্য সুতরাং আমি সদাচারী—এ গর্ব্বের স্তোক-বাক্য অবধা, ব্যক্তি-পক্ষে।

সদাচার অপরের প্রতি শিষ্ট আচরণ। সমাজ একবার সভ্যতার চরমে উঠে আবার বর্বরতার সাগরের দিকে গড়িয়ে পড়তে পারে। বৌদ্ধ বা খৃষ্ট নীতিকে কাগজে কলমে বা বাক্য-স্রোতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে, কোনো দেশের লোক যখন দম্ভভরে ভিন্ন দেশের লোকের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, তখন সে সভ্য দেশের ঢক্কা-নিনাদের অন্তরে থাকে বর্বরের ছন্দহারা লক্ষ্যীছাড়া রক্ত-নেশার সুর। সে ক্ষেত্রে ছন্দ বাক্যে ও অর্থে সামঞ্জস্য হারিয়ে তাল কেটে ফেলে। সভ্যতা চোট খায়। দেশের প্রধানেরা আবার আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। দেশকে সাধনার পথে ফিরিয়ে আনে।

প্রতি সভ্য গোষ্টিতে বহু অসভ্য মানব থাকে। এদের সদাচারী করবার জন্য দেশে শাসন ও শৃঙ্খলার বিধান। সে বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করে যে, সমাজ বিধান করে তার শাস্তি। সমাজ যত সভ্য হয়, চোর জুয়াচোর প্রভৃতির

সংখ্যা হয় তত হ্রাস। রামরাজ্যেও তারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল অল্প।

সমাজ সভ্যতার আদর্শের দিকে যত অগ্রসর হয় প্রত্যেক প্রজার যা-ইচ্ছা-করবার বৃত্তি তত গণ্ডীর নিগড়ে বাঁধা পড়ে। তার চলাফেরা বলা-কওয়া হয় সংযত। সভ্য সমাজের উদ্দেশ্য প্রত্যেক নাগরিককে অন্যের খাম-খেয়ালী পশু-মেজাজের অত্যাচার হতে রক্ষা করা। সেখায় শিষ্ট আচরণের প্রয়োজনও কর্মক্ষেত্র। সমাজের আদর্শ উচ্চ হতে উচ্চতর হতে পারে কিন্তু সমাজ-ভুক্তরা যদি সে আদর্শ ও বিধি-নিয়মকে পুঁথিগত নীতি ভেবে, প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ধারা ও গতি নির্ধারণ করে, তাতে একের কর্ম অন্যের মর্ম-বিদারক হওয়া সম্ভব। তেমন কর্ম-স্বাধীনতা বর্বরতার নৃত্যভূমি করে সুদ্ধ সমাজকে। তেমন কর্ম কদাচার—সদাচার নয়।

এটা অপ্রিয় সত্য যে আজ আমাদের সমাজে সদাচার বিপন্ন। এই বাক্তি-অসভ্যতা বেড়ে বেড়ে সমাজকে করবে অসভ্য! মানুষের জীবন, চক্রের পর চক্রে ঘেরা। তার কর্তব্য নিয়ত নিজেকে ঘিরে। কিন্তু সেই ব্যক্তির এক বিশাল বিরাট সমাজপুরুষের অঙ্গ। সারা অঙ্গে ক্ষত জন্মালে ঔষধ দেবার স্থান থাকে না।

আমাদের দেশের নীতি এই সব গণ্ডীর পর গণ্ডীর বর্ণনা দিয়েছে এবং প্রত্যেকটির প্রতি কর্তব্য করতে শিখিয়েছে। প্রথম গণ্ডীতে পিতৃদেবোভব, মাতৃদেবোভব নীতি। তার পরের গণ্ডীতে আচার্যদেবোভব। তারপর অতিথিদেবোভব এবং শেষে বুঝতে হবে—যার দ্বারা অন্যের উৎপীড়ন হয় নাএবং অন্যের কর্মে যার উৎপীড়ন বোধ হয় না—হর্ষ, অসহিষ্ণুতা, ভয় এবং উদ্বেগ হতে যে মুক্ত সে জগদীশ্বরের প্রিয়। অন্যত্র ঈর্ষা, অসূয়া, পরস্ত্রীকাতরতা নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বর্জনের উপদেশ লাভ করি।

এমন সব আদর্শ জীবন-পথের প্রতি অলিগলিতে চিহ্ন-রূপে বিরাজ করছে সামাজিক কর্ম-তালিকায়। কিন্তু আজ একি? আমরা কোন্ পথে? রবীন্দ্রনাথের বাণী আজ যেন আমাদের সবিশেষ বর্ণনা করছে—"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরাজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন দ্রষ্টা, তেমনি ছিলেন দেশ-প্রেমিক। তাঁর বাক্য নিষ্ফল হতে পারে না। তিনি সেই মর্মবেদনার চিত্রে আমাদের চরমরূপ দেখেন নি। তিনি দেখেছেন পুনরুত্থানের চিত্র। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো—তিনি ভাবতেন পাপ। তাই কবি বলেছেন—"আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্ম-প্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকার-হীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

এ গড়ানে পথ থেকে স্বজাতিকে মোড় ফেরাতে পারি সমাজের প্রত্যেক চিন্তকামী নিজে রুখে দাঁড়িয়ে ধ্বংসের মহাসাগরের পথ রুদ্ধ করে।

আজ আমাদের কানে ধ্বনিত হক দেশের আর এক মহামানব স্বামীজির বাণী—"শ্রদ্ধাবান হ, বীর্যবান হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর, আর পরহিতায় জীবনপাত কর—এই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।"

"মহামানবেরা যা করেছেন, জাতিও তা করতে পারে এবং করলে সফল হবে। কারণ মহামানবেরা অগ্রদূত ভাবীকালের আদর্শ মানবের"—বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ।

একথা সত্য যে আজ কুৎসিৎ কদাচার আমাদের ব্যতিব্যস্ত করেছে। একথা প্রত্যেকে বুঝি আত্মানুসন্ধানের ফলে। তার ফলে আমরা নিজেকে এবং পরকে অভিযুক্ত করি। কিন্তু নিষ্ফল ব্যর্থতার বিভীষিকা আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। পরের কথা দূরে থাক, নিজের পরিবারের যারা অন্তর্ভুক্ত, তাদের দেখি কদাচার লীন, সদাচার হীন। কিন্তু উৎসাহ নাই, বীর্য নাই, কর্তব্য-বোধ নাই, এ অবস্থার অন্ত করবার। সম্মুখে দেখছি ধ্বংসের অভিযান। প্রেক্ষা-গৃহের দর্শকের মত সে অভিনয়ে আমরা লিপ্ত হচ্ছি। চাই একটা সংকল্প যার সিদ্ধিতে আমরা স্বজাতির স্বদেশের এবং সর্বোপরি আমাদের যুগ-যুগান্তের পৈতৃক সম্পত্তির অধোগতি এবং মূঢ় অপচয় বন্ধ করতে পারি।

যে জাতি একদিন পূর্বে জাপান উত্তরে সাইবেরিয়া পূর্ব—দক্ষিণ ফিলিপিন বালি, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে সভ্যতা বিস্তার করেছিল, সে জাতির উত্তরাধিকারী সদাচার ভুললে জগতের ক্ষতি চলে বিস্তর।

আত্মহত্যা

(ফরাসী গল্প

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এসসি

স্নান বোমানো। আহা কি সুন্দর স্থান, তুস্বর্গ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। এখানে আসিলে ফ্রাউবাটির কথাগুলি স্মরণ হয়, "পৃথিবীতে এমন কয়েকটি স্থান আছে যাহা হৃদয়ে ধরে রাখিতে ইচ্ছা হয়।" কিন্তু কি দুঃখের কথা, স্নান বোমানোতে আসিলে স্বর্গের সেই নিমিষ সুখের কথা মনে হয় যাহা পাইলেও বিপদ ঘটে,অথচ যাইবার কোন সম্বল করাও কঠিন। আনকমন শাস্তি এই নগরের আকাশে বাতাসে বিরাজ করে, অশান্তাপের বিষয় তাহা এখানকার আগন্তুকদের হৃদয়ে অধিকদিন স্থায়ী হয় না। সেখা যায় চতুর্দিকেই বিমর্ষমুখ লইয়া লোকেরা বেড়াইতেছে, আর মাঝে মাঝে হৈয়ালীর মত বলিয়া উঠিতেছে, "আঃ, সাহসে উপর যদি উহা চাপাইতে পারিতাম! পাখী হোকেটা, চল ফুরোবেই সে ডিগ্রিতে, আর একবারও আমি পারিলাম না।"

এই সমস্ত দর্শনকারীরা স্নান-বোমানোর রমণীয় দৃশ্যের প্রতি খুব অল্পই দৃষ্টিপাত করে। পৃথিবীকে তাহারা কুবেরের বাজারে পাশাখেলার ছক বলিয়া গ্রহণ করে। এখানে তাহারা ভাগ্য পরীক্ষা করিতেই যেন আসিয়াছে। আমিও কিছুদিন এইস্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলাম। প্রথম-দিকেই বেশ কিছুটা অর্থ নষ্ট হওয়ায় মর্মাহত হইয়াছিলাম। একদিন এমন অবস্থা হইল যখন আমার নিকট অবশিষ্ট মাত্র বার টাকা অথচ হোটেলওয়ালার পাওনা পনের টাকা। সেই দিনই আমার রিভলবারটি ভালভাবে পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তাহাতে ছয়টি গুলিই রহিয়াছে। ইহার যে কোন একটিই আমার মস্তক বিদীর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ঘরের জানলা খুলিয়া দিয়া আমার 'শেষ সকাল' দর্শন করিলাম। খুবই চমৎকার লাগিতেছিল—গাঢ় নীল আকাশ, সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ আর বাতাসে-ভেসে-আসা কমলালেবুর সুমিষ্ট গন্ধ। প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হওয়ায় হোটেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সমুদ্রতীরে বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় হোটেলের দিকে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে স্থানীয় একখানি পত্রিকা কিনিলাম। দেখিলাম পত্রিকার উপরকার কাগজের চারিধার দিয়া কালো রেখা। কিসের জন্য এই শোক চিহ্ন?

প্রাতঃভোজনের সময় কাগজখানি পড়িতে লাগিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'সাপ্তাহিক আত্মহত্যা।' মনে মনে ভাবিলাম, আমার মৃত্যুর খবরও এইস্থানে প্রকাশিত হইবে। এত দুঃখ সত্ত্বেও একবার মনে হইল আমার মৃত্যুর খবরটা নিজ হস্তেই লিখিয়া পাঠাই। একটা খবর পড়িলাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে 'গতকল্য জোন্তয়া জাকবসন নামক একজন আমেরিকানের মৃতদেহ গাছের উপর ঝুলিতে দেখা যায়। মৃতের পকেট হইতে তিন হাজার টাকা পাওয়া গিয়াছে।'

ভদ্রলোকের সহিত আমার ভালরকমই পরিচয় ছিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া জুয়া খেলিয়াছি এবং একই সঙ্গে সর্বস্বান্ত হইয়াছি। সেদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি তাঁহার শেষ কপর্দক হারাইলেন, আবেগের সহিত আমার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আর বোধহয় দেখা হইবে না। বিদায়, বন্ধু, বিদায়।" এই কথা বলিয়া তিনি বাহিরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সহিত সেই আমার শেষ দেখা। তারপরই বোধহয় গলায় দড়ি লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন। কিন্তু তাঁহার পকেটে

কি করিয়া তিনটি হাজার টাকা আসিল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর কারণটি হঠাৎ আমার মাথায় আসিল। এতক্ষণ এই সহজ ব্যাপারটি চিন্তা করিতে না পারার জন্য নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ঘৃণা করিতে ইচ্ছা করিতেছিল। আরে এটা তো খুবই সোজা ব্যাপার। তাঁহার মৃত্যুর পর হোটেলের মালিক চুপি চুপি টাকাটা তাঁহার পকেটে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সাধারণে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে না যে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার জন্য তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাহাতে হোটেলের দুর্নাম হইবে না, এটা তো স্বতঃসিদ্ধ। ভাবিতে লাগিলাম, আচ্ছা আমি যদি ঐরূপভাবে মরিয়া যাই তাহারা কতটাকা আমার পকেটে রাখিবে। একটা মতলব সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় খেলিয়া গেল। চঞ্চল পায়ে অথচ লঘু হৃদয়ে মালিকের নিকটে গিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আপনার পনের টাকা সন্ধ্যার সময় দিব, অবশ্য যদি তখন বাঁচিয়া থাকি।"

"মহাশয়, আমরা আপনাকে বিশ্বাস করি।"

"আচ্ছা তাহা হইলে দয়া করিয়া আমায় আরও একশ টাকা ধার দিন। সন্ধ্যায় আমার টাকাটা আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশা করিতেছি।"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই দিব।"

টাকাটা লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলাম। কি করিয়া আমার মতলব কার্যে পরিণত করিব তাহার চিন্তায় বিকালটা সমুদ্রতীরে কাটাইয়া দিলাম। সন্ধ্যায় আমার সর্বোৎকৃষ্ট পোষাকে সজ্জিত হইয়া জুয়াখেলার স্থানে আসিলাম। আমার শেষ টাকাটা পর্যন্ত বাজী রাখিলাম, কিন্তু পূর্বের মতই হারিয়া গেলাম। হারিয়া প্রথমে উদ্বিগ্ন ও পরে রাগের ভাব দেখাইলাম। শেষে একেবারে চুপ-চাপ। একজন 'বন্ধু' আমার নিকট আসিল, তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম, "আমি সর্বস্ব হারাইয়াছি।" সে সহানুভূতি দেখাইল এবং সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। বলিল, "যদি আপনি দেশে ফিরিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কর্তা টিকিটের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন।" উত্তরে জানাইলাম, "আমি যেখানে যাইব সেখানে টিকিটের প্রয়োজন নাই।" সে আমার দিকে হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া বলিল, "না, না, ওকি বলিতেছেন? ঐরূপ বোকামী আপনি করিবেন না বলিয়া আমি প্রার্থনা করি।" আমি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া চুপ করিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম সেই লোকটি খুবই আগ্রহের সহিত আমায় লক্ষ্য করিতেছে। রাত্রি এগারটার সময় যখন সকলে চলিয়া গেল, আমি নতমস্তকে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম।

কি সুন্দর সেই রাত্রির রূপ। চন্দ্রকিরণে বনানী উদ্ভাসিত হইতেছে এবং সাগর রজতশুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে। দূরে কোথায় বেহালা বাজিতেছে। তাহার মর্মস্পর্শী করুণ রাগিণী যেন আমার এই শেষ বিদায়ের ইঙ্গিত করিতেছিল। হোটেলের পিছন দিকে যেখানে মরসুমী ফুলের একটি বড় ঝোপ আছে সেইদিকেই চলিলাম। সেখানে জলদেবীর যে সাদা পাথরের মূর্তিটা ছিল মনে হইল আমাকে দেখিয়া যেন মৃদু হাস্য করিলেন। রিভলবার হইতে দুইবার গুলি ছুঁড়িলাম। গুড়ুম, গুড়ুম শব্দে নিস্তব্ধ রজনী জাগিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি নিকটের একটি বেঞ্চিতে—আঘাত না পাই—এইরূপ দস্তুরণে শুইয়া পড়িয়া হোটেলের মালিকের আগমন প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দূর হইতে কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসিতে লাগিল, ক্রমশঃ তাহা নিকটে আসিল, একটা ছায়াও যেন আমার চোখের উপর আসিয়া পড়িল।

"কি সর্বনাশ, এ যে সেই ভদ্রলোক। দু' দুটা গুলি একেবারে দেহ ভেদ করিয়া গিয়াছে।"

তারপর মালিকের গলার আওয়াজ পাইলাম, "তাড়াতাড়ি কর, এখনি লোকেরা আসিয়া পড়িবে। হতভাগারা মরিবার আর জায়গা পায় না?" এই কথা বলিয়া আমার নিকটে আসিয়া আমার জামার পকেটের মধ্যে যে কিছু ঢুকাইয়া দিলেন তাহা চোখ বুজিয়াও বেশ অনুভব করিলাম। হাসিতে আমার দমবন্ধ হইয়া আসিতেছিল। গো গো আওয়াজ করিতে করিতে চোখ খুলিয়া চতুর্দিকে আশ্চর্য হইয়া তাকাইলাম। দেখিলাম হোটেলবাসীর ছোটখাট একটী জনতা আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া আমার টুপি ও রিভলবার কুড়াইয়া লইয়া আমি সোজা হইয়া দাঁড়াইলাম। জনতা আরও বেশী আশ্চর্য হইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। আমি অতিশয় রাগতস্বরে বলিলাম,

"একটা লোককে আপনারা কি নিশ্চিন্তে মরিতেও দিবেন না?" মালিক বলিল, "মহাশয়, এ রকম ঠাট্টার মানে কি? হোটেলের শান্তিভঙ্গের জন্য আমি আপনাকে পুলিশে দিব।"

চাপা হাসিতে দেহ আমার ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে কিন্তু আমি শান্ত স্বরে উত্তর দিলাম, "শান্তিভঙ্গ করিয়াছি আমি? বেশ তো!" এই বলিয়া আমি সেখান হইতে ধীরে ধীরে আমার ঘরে চলিয়া আসিলাম। তারপর দরজা বন্ধ করিয়া প্রাণ খুলিয়া কিছুক্ষণ হাসির ফোয়ারা ছোটাইলাম। তারপরে আমার আত্মহত্যার বিনিময়ে অর্জিত তিন হাজার টাকা হইতে সমস্ত দেনা শোধ করিলাম এবং সেই রাত্রেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

ইহার কিছুদিন পর পর্যন্ত তাহারা টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল। টাকা আমি দিই নাই কারণ আমার মনে হয় টাকাটা আইনতঃ আমার প্রাপ্য। আর তাহা ছাড়া একটা আত্মহত্যার মূল্য তিন হাজার টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী। এখন শুনিতে পাই এই ঘটনার পর হইতেই সমগ্র রোমানোর সেই হোটেলে আত্মহত্যার নির্দ্ধারিত মূল্য অনেকখানি হ্রাস করিয়া দিয়াছে।

ভুলি নাই *

নবনীতা দেব

ইলিনোরা ভুলি নাই তোমারে, তোমার ইতালীরে
অমলিন শ্বেতপদ্ম জেগে আছো মোর স্মৃতিনীরে
তোমার সুকল্প লিপি অংকারিল মোর মর্ম তার—
অকস্মাৎ খুলে গেল অবরুদ্ধ স্মৃতির দুয়ার!
স্মরণে উঠিল ভাসি' ভূমধ্য-সিন্ধুর নীলছবি—
অলিভ-বনের শীর্ষে অস্তগামী আরক্তিম রবি।
যোজন যোজনব্যাপী আঙ্গিগন্থ আঙুরের ক্ষেতে
চিকণ-সোনালী আলো ছায়াসনে নৃত্যে আছে মেতে।
গুচ্ছে গুচ্ছে সুললিত স্ফটিকসন্নিভ দ্রাক্ষারাশি
নন্দনের প্রতিচ্ছবি মৃত্তিকায় তুলেছে উদ্ভাসি'।

ইলিনোরা, ভুলি নাই ভেনিস ফ্লোরেন্স পীসা রোম!
সুদূর শতাব্দী বেলা বাঁচিয়া রয়েছে ছুঁয়ে ব্যোম
ফোরামের ভগ্নস্তূপে, কলোসিয়ামের ব্যাপ্ত দেহে
মেঘচুম্বী ক্যাপিট্রালে, সুগভীর প্যান্থিয়ান গেহে।
র‍্যাফায়েল দা-ভিঞ্চির মিকেলেঞ্জেলোর স্বপ্নলোক
সার্থক করেছে প্রাণ। সার্থক করেছে এই চোখ।
ভুবন-বন্দিতা দেশ সর্বাংগ সৌন্দর্য্যে শিল্পে ছাওয়া
ভুলি নাই জ্যোৎস্নারাতে গণ্ডোলায় ভেসে চলে যাওয়া।
সপ্ত গিরিবরের শীর্ষে চিরন্তনী রোমা মহীয়সী
ঊর্ধ্বে নীল, নিম্নে নীল, মাঝে মহা কীর্তি গরীয়সী।

তোমার কুঞ্চিত কালো কেশ মনে পড়ে ইলিনোরা।
নবনী-কোমল তনু মর্মর খোদিয়া যেন গড়া।
সুকৃষ্ণ ভ্রমর-আঁখি মেদুর-পল্লব-ঘনচ্ছায়;
নিটোল নিখুঁত দেহ সুগঠিত ভেনাসের প্রায়।
হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতিধারে দূরদেশিনীরে
সখিত্বে লয়েছো বরি' ফ্লোরেন্সে আর্ণোনদীতীরে।
ভুলি নাই, ভুলিব না, ভুলিবার নহো তুমি প্রিয়,—
হৃদয় ভরিয়া আছে সুধারসে অনির্বচনীয়।

ইতালীর সুষমাতি আমরণ রহিবে অম্লান
তোমার সৌহার্দ্য মোর আনন্দের ঐশ্বর্য্য মহান্।

---

* ইতালীয় মহিলা Guarnieri Eleonora প্রতি

গতি ও গন্তব্য

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

(৩)

ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার গতি ছিল সংযত ও সহজ। মন্থরতাও ছিল সুনির্দিষ্ট—বিষণ্ণান্তি। আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সৃষ্টির কল্যাণ-কামনাই ছিল তার লক্ষ্য। তুষ্ণীর রোপনাই ঋষিক। তাতে চমক লাগে। স্থায়ী দীপশিখা যে আলো বিতরণ করে—ফুলঝুরির কাছে কি তা আশা করা যায়? তার অনুভূতিও যেমন তীব্র, নির্য্যাণও তেমনি আকস্মিক।

দানবীয় যন্ত্র-কৌশলে যন্ত্রিষ্ণু মানবমন এত বিভ্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত কেন? চাওয়া-পাওয়ার উন্মাদনায় সে তো আজ বহুবিধ সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছে? জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে মানুষের জয়পতাকা উড়িয়েছে? তবু বিষণ্ণান্তি বিদ্বিত হবে, এ আশ্বাসের কারণ কি? সাম্যবাদীরা দাবী করছেন ধনতন্ত্রীকে। ধনতন্ত্রীরা দাবী করছেন সাম্যবাদীকে। তারা উভয়েই উদ্দাম যন্ত্রকৌশলী, প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট ও অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ধাবমান। ক্ষমতার দর্পণে নিজেদের ভয়ঙ্কর মুখাকৃতি দেখে আজ তারা দুজনাই ভয়ে ও বিস্ময়ে শিউরে উঠ্‌ছেন।

ধার্ম্মিক-সভ্যতার পরিপোষক সাম্যবাদকে আমরা বড়ই মুখরোচক ও প্রতিসুখকর মনে করি—ভারতীয় প্রেমধর্ম্মের কষ্টিপাথরে ঘস্‌লে দেখা যায়—সেও সোনা নয়, পিতল। কমরেডরা কি বলতে পারেন—পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতীয় যৌথ-পরিবারের আদর্শ আজ ভেঙে যাচ্ছে কেন? একান্নবর্ত্তিতার মূলে যে সাম্যবাদ নিহিত ছিল তা'র আজ কোথায়? অন্ধ, খঞ্জ ও বিকলাঙ্গ ভাইরা একটি পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠ-ভাইয়ের স্নেহশীতল মমতার আনুকূল্যে কখনই বঞ্চিত হ'ত না। বৃদ্ধ বাপ-মাও পরিত্যক্ত হতেন না, ছেঁড়া বিলাসের মত। প্রিয়জনের কল্যাণ-কামনায় গৃহলক্ষ্মীদের ত্যাগবুদ্ধিই ছিল পারিবারিক সুখ ও শান্তির উৎস। সাম্যবাদের কমরেডদের সঙ্গে যারা সাম্যবাদের গাঁটছড়া বাঁধ্‌তে উদ্‌গ্রীব—মতবাদের লড়াই বাধিয়ে নির্ব্বিচার রক্ত-মোক্ষণের একটা বিরাট পরিকল্পনা, যাদের স্বপ্ন-বিলাস—স্নেহোদর ভাইবোনদের দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনে কতটুকু ত্যাগবুদ্ধির পরিচয় তারা দিয়ে থাকেন? আধুনিক সাম্যবাদের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক্, আদর্শ যতই উদার হোক্, ভারতীয় প্রেমধর্ম্মের বিচারে, তাকে 'ঘর জ্বালানো—পর ভুলানো' পাঠ্য-নীতি ছাড়া আর-কিছু মনে করা যায় না।

একজন তথাকথিত সাম্যবাদী হয়তো বলবেন—সাম্যবাদের ভিত্তিতে তারা এমন এক নূতন সমাজ ও পরিবার গড়ে তুলতে চান—যার সঙ্গে ভারতীয় ভাবাদর্শের কোন বিরোধ নেই। সেই 'নবাদর্শ-রূপায়নে'র জন্যেই তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা-অধিকার একান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব কায়েমী স্বার্থবাদীদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের বর্ত্তমান ঠাণ্ডা-যুদ্ধপড়া ও ভবিষ্যৎ রক্তাক্ত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থবাদীরাও সন্দিগ্ধ ও ভীত। স্বাভাবিক ভাবে এই সন্দেহ আর ভয় যে বিষণ্ণান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশু কারণ, সে বিষয়ে শান্তিকামীদের মধ্যে দ্বিমত নেই। তাদের বিশ্বাস—বর্ত্তমান ঠাণ্ডা-লড়াই যে-কোন মুহূর্ত্তে একটা সর্ব্বনাশা মহোৎসবে পরিণত হতে পারে।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—ব্যক্তি নিয়েই পরিবার, আর পরিবার নিয়েই তো সমাজ? সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রগঠন কি ব্যক্তির সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতি-সাপেক্ষ নয়? ব্যক্তি যেখানে উপেক্ষিত, গণতন্ত্রের ধোঁকাবাজী সেখানে ধরা পড়বেই। সে হিসাবে সাম্যবাদের জনীয় নায়কত্ব গণতন্ত্র বিরোধী। ঘোড়ার সামনে গাড়ী রাখা, আর গাছ না বাঁচিয়ে ফলের মালিকানা রক্ষা করা অযৌক্তিক। বিষণ্ণান্তি অঙ্কুর রাখার জন্য বিরোধী-সাম্যবাদীরা কোন সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থার নির্দ্দেশ দিতে পারেন না। তাদের আনুষঙ্গিক চিকিৎসার ফলে রোগ সারলেও, রোগী বাঁচ্‌বে না—একথা নিশ্চয়। ভারতীয় দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসা ও রোগীকে বাঁচিয়ে রাখার উপায়—প্রেমধর্ম্মের ভিত্তিতে 'ভাগবতী-বুদ্ধির' উন্মেষ।

ভারতীয় সাম্যবাদের আদর্শ একদিন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করেছিল রাম-রাজ্যে। সেই কারণেই গান্ধীজীর 'রামরাজ্য-পরিকল্পনার মূলে ছিল অবিচলিত ভাগবতী-বুদ্ধি। সত্যসন্ধ নির্লোভ রাজা পিতৃসত্য-পালনের জন্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী ছিলেন। প্রজা-বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন—মর্ম্মন্তুদ আত্মনিগ্রহ সহ্য ক'রে, প্রাণাধিক প্রিয়তমাকেও পরিত্যাগ ক'রে। একটি শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য কোন লোকার্ত্ত পিতা যখন রাম-রাজাকে দায়ী করেছিলেন, মাত্র সরযূর তীরে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—'নিষ্পাপ শিশুর অকাল মৃত্যুর জন্য দায়ী ওই সিংহাসন!' খ্রীরাম তার প্রতিবাদ করতে পারেন নি। কোন্ রাষ্ট্রপতি স্বীকার ক'রে থাকেন—ব্যক্তি-জীবনের এতখানি শুভাশুভের দায়িত্ব? লক্ষ লক্ষ পথচারী উদ্বাস্তুর জীবন-মরণ সমস্যা আজ হয়ে পড়েছে—সরকারী দপ্তরী-দুরন্ত প্রাণহীন পরিকল্পনার বিষয় মাত্র। সমৃদ্ধ গৃহস্থাশ্রমীকে রাস্তায় টেনে এনে মুষ্টি-ভিক্ষাদানের এই আয়োজন কার প্রয়োজনে? মৌখিক আগাড়ম্বরে রাষ্ট্রনায়কগণ যতই সহানুভূতি প্রকাশ করুন—মনুষ্যত্বের এই লাঞ্ছনা ও অবমাননার মূলে আছে কতিপয় সুবিধাভোগী ধনিকের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই ধনিকদের মনে যদি ভাগবতী-বুদ্ধির ক্ষণিক জাগরণও সম্ভব হ'ত—তাহলে উদ্বাস্তু-সমস্যার সমাধান হতে পারত মাত্র এক দিনে।

কোথায় গণতন্ত্র? গণতন্ত্রের নামে ধনীয় নায়কত্বই সৃষ্টি করেছে মানবতার চরম দুর্গতি। যন্ত্র-কৌশলে অতি নিম্নস্তরে জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্যবৃদ্ধির স্থায়ী পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে—কতিপয় ধনিকের কায়েমী-স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে। এ পাপচক্রের প্রভাবে তারাও

সুখী হতে পারছে না। তাদেরই বুদ্ধির সন্ধানে হাতের মধ্যেও নয় স্নায়ুবিদ্রোহের ভাব অনুভূত হচ্ছে। প্রাণহীন বিজ্ঞান-বুদ্ধির হাত ধরাটাই আর কত দিন? একটা বিরাট বহ্ন্যুৎসব আসন্ন বলেই মনে হয়।

সাম্যবাদীরা বলেন—রাষ্ট্রীয় চাপে ধনিকের সর্বহর আয়ত্ত করে, সমস্ত ধনবণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেই এ সমস্যার সমাধান হবে। তা' কি সম্ভব? ধরুন চাপ দিয়ে সাময়িকভাবে ক্রয়ের উত্তাপ হ্রাস করলেও—তার পিছে তো কোন ব্যাধি নয়? যে মূল-ব্যাধির কারণে নৈতিক উত্তাপ বৃদ্ধি ঘটে, তার চিকিৎসা কে করবে? সুচিকিৎসক শুধু অ্যান্টিথ্রম্বিনের তয়সায় থাকেন না। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ সন্ধান করেন। মূলব্যাধির লাঘবটাই যে 'ভাগবতী-বুদ্ধির সুচিকাভরণ', সাম্যবাদীরা সেইটুকু স্বীকার করলেই বোধহয় সমস্যার মীমাংসা হতে পারে।

টলস্টয়কে রাসেল বলেছেন—মহাত্মা গান্ধী প্রাচীনপন্থী, সুতরাং এ সমস্যা তাঁর অহিংস-সত্যাগ্রহের বন্দুকটি নাকি বাস-তাণ্ডুকের কাছে হারে। দুটিকাতির চন্দুলজ্জা বেশী বলেই, গান্ধীজী জয়ী হয়েছেন। হয়ে যদি নাৎসী জার্মান—তাহলে গায়ে-সুরসুর আগেই তারা গায়ে-চাপা দিত। অহিংসার মাতাল্লা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। হয়তো রাসেলের এ মন্তব্য সত্যি। কিন্তু গান্ধীজী প্রাচীনপন্থী হলেন কিসে? সাঁতের জন্যে দাঁত, আর নখের জন্যে নখ, কি অতি আধুনিক বস্তু-নীতি নয়? শাশ্বত সত্যের বিনাশ নেই। ভাগবতী বুদ্ধির অনুশীলনে যে মৃত্যুঞ্জয়ী অধিক শক্তির বিকাশ হয়—গান্ধীজী ছিলেন তারই মূর্তপ্রতিক। বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্যে ভারতীয় ভাবধারায় বিদ্যুৎ-চমক। তাকে যদি প্রাচীন বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়—তাহলে এটম-বোমা আরও প্রাচীন—হাড় ও নখের উৎকর্ষ মাত্র। সংযমে আঁচলে বাঁধা সম্ভব হতে পারে, তবু আত্মিক শক্তিকে পাতলা-পেণ্ডলা সম্ভব নয়। যে মানবীয় শক্তি সে ধারাটুকু বোঝাবার চেষ্টা করেছে—তাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। এ তত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হলে, তথাগতকে রাসেলকেও হতে হবে ভারতীয় দর্শনের ছাত্রও।

গান্ধীবাদের রাষ্ট্রনৈতিক কৃতকার্যতা সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করলেও, ব্যক্তিজীবনের অশান্তি বৃদ্ধির জন্যে রাসেলও দায়ী করেছেন অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে। তিনি বলেন—মানুষ শান্তিলাভ করে অভ্যাস-সমষ্টির অনুসরণে। তৈল বাতিতে যে মানুষ সুখী ছিল, বিজলীর বাতি এসে তাকে অসুখী করেছে। ট্রামবাস কেড়ে নিয়েছে পায়ে-হাঁটার সুখ। এইভাবে অভ্যাসের অনিশ্চয়তা প্রতিপদে মানুষের অসুখ-বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞান-বুদ্ধি মানুষকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করলেও তার অভাব-বোধকে বাড়িয়ে দিয়েছে প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে বহুগুণ বেশী। অভ্যাসের সুখ-সুবিধা-তোষের স্থায়ী পথে মানুষ কখনই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। এই অস্থিরতাই তাকে করে তুলছে স্বার্থবুদ্ধিতে অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল।

বৈজ্ঞানিক চাওয়া-পাওয়ার উৎকণ্ঠা একদিকে দিচ্ছে মানসিক বৈকল্য বাড়িয়ে, অন্যদিকে পারছে না বৈষয়িক সুখ-সুবিধা বাড়াতে। রাসেলের মতে, অভ্যাসগত অনিশ্চয়তাই তার মূল কারণ। লাঠি ও তরবারির জমানাতে যে বিবাদের সীমানা ছিল—সেখানে আজ এসেছে বন্দুক কামান ও বোমা, বিবাদের উত্তাপকে আরও বাড়িয়ে দেবার জন্যে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহুবিধ আবিষ্ক্রিয়া রোগবিস্তারের সহায়ক হয়ে উঠেছে। জীবনী-শক্তিবৃদ্ধির উপায়-নির্ধারণ আর ছেলে-গুণের কেরামতি দেখানো তো এক কথা নয়? যার মৃত্যু অসংখ্যারিত—ছেলে-গুণে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা বিলম্বিত করা কি নিরর্থক নয়?

বৈজ্ঞানিক উপায়ে অস্বাভাবিক জনসংখ্যা-বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করে সংখ্যাতাত্ত্বিকরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলছেন—মা-বসুমতী নাকি ইতিমধ্যেই মেইলে-খাওয়ার নাম দেখাবেন। ভাগতিক খাদ্যোৎপাদনে টানাটানি পড়বে! জন্ম-নিয়ন্ত্রণের আশু আবশ্যকতা রাসেলও স্বীকার করেছেন। কেন? এত দুঃখ-দৈন্যের নিষ্পেষণেও যাদের সংখ্যা হ্রাস হচ্ছে না, তারা কারা? এ প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর—যন্ত্র-বিজ্ঞানের লাঘবে যারা অনির্দিষ্ট পন্থায় যাত্রা সুরু করেছেন—অস্বাভাবিকভাবে পরিবেশ বাড়িয়ে নিয়ে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অসংযমীর জীবন-যাপন করছেন—অর্থাৎ মানবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও মানবের সংখ্যা-হ্রাস, সংখ্যাতাত্ত্বিকদের কাল্পনিক ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যন্ত্রিক-কৌশলে আমরা দেখেছি—সমাজ বন্ধনহীন সহরে ভোগ-লালসার প্রতি তীব্র আকর্ষণ, আর পল্লীর স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপন-পদ্ধতির প্রতি বিজাতীয় বিতৃষ্ণা। সহরের আহার্য-পরিবেশনে রেস্তরাঁ, চিত্ত-বিনোদনে সিনেমা, আর চলাফেরার গতিবৃদ্ধি-সহায়ক ট্রাম ও বাস, আত্মনির্ভরশীল পল্লীবাসীকে সহরাভিমুখী করে তুলছে। জনসাধারণের চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সহরের সংখ্যাবৃদ্ধি অপরিহার্য বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষাপতিরাও মানবমনের এ দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করছেন। সহরের উপকণ্ঠে গড়ে তুলছেন—কলকব্জার কেরামতিপূর্ণ বড় বড় কারখানা। এই যন্ত্র-কৌশলের মৌলিকতেই বলি দেওয়া হচ্ছে মেহমতী জনতার স্বাস্থ্য-সুখ ও নৈতিক চরিত্র। কুটির-শিল্পে সমৃদ্ধ পল্লীগুলি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণে কখনই অশক্ত ছিল না। সহর সৃষ্টি আর যন্ত্র-কৌশলে বিলাস-ব্যসনের শিল্পগুলিকে কেন্দ্রিক-করণ-চেষ্টার মূলে ধনিকের অর্থ-লালসা ছাড়া আর কি আছে? মহাত্মা গান্ধী চেয়েছিলেন—বিকেন্দ্রী-করণ বা কুটির-শিল্পের পুনরুজ্জীবন, তাতো হ'লনা? গান্ধী-শিষ্যরা মনের মোড়ক তুলতে পারলেন না। কায়ন-ওয়েলথের গাঁটছড়া খুলতে পারলেন না। আজ শ্যামরাষ্ট্রে নাও-বাওয়ার বার্থ শ্রম স্বীকার করতে হচ্ছে—ভোরের দিকে আবার সেই 'কানাইয়ের মাকে' মেগে! সেই রূপ, সেই রস, সেই গন্ধ আর স্পর্শ যদি অব্যাহতই থাকলো, তাহলে কি প্রয়োজন ছিল বৃটিশ তাড়াবার? বিদেশী ম্যাঞ্চেস্টার-ম্যাটনের সমীতে আমাদের রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছেন—স্বাধীনতার এ বাল-দুলাল বাসা অচল। রাষ্ট্রপতিকে ঘোল ঘোড়ার গাড়ীতে তুলে, তাঁর সম্মানের তোল-সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখার জন্যেই কি গান্ধীজীর আত্ম-নিগ্রহ? বাঙলার বালক ক্ষুদিরাম কি ফাঁসি-কাঠে ঝুলেছিল—লক্ষ লক্ষ বাঙালী উপাস্তর অন্নাবমাননার এই দৃশ্য দেখবার জন্যে? এই কি গান্ধী-পরিকল্পিত রাম-রাজ্য?

দেখুন! ডালডা বনস্পতি কিন্‌লে কত দিক দিয়ে আপনার লাভ হবে

সুস্বাদু অমৃতি কি ক'রে তৈরী করা যায় ?
জানতে চান তো আজই লিখুন:-
দি ডালডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্
পো:, আ:, বক্স, নং ৩৪৩, বোম্বাই ১

ডালডা ব্যবহার কোরে দেখুন—গুণে ও উপকারিতায় সত্যিই ডালডা অতুলনীয়। ডালডা সব রকম রান্নারই স্বাদ-গন্ধ ফুটিয়ে তোলে। সীল-করা টিনে ডালডা তাজা, বিশুদ্ধ আর পুষ্টিকর অবস্থায় পাবেন—আজই কিনে ফেলুন। ডালডায় খরচও কম।

ডালডা

১০পাঃ, ৫পাঃ, ২পাঃ ও ১পাঃ টিনে পাওয়া যায়

HVM. 1888-X52 BO

কথকতার কথা

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ

বাংলার পল্লীই যে মহামাধুরী বহন করে সামাজিকের মনকে সরস করে রাখত তার অনেকখানি ছিল সুর, সঙ্গীত ও কথার মাধ্যমে ভগবদ্গুণগানের। নদীর ধারে ধাঁধের বাড়। তার পাশ দিয়েই গ্রামের পথ একটানা চলেছে অনেক দূর। পথ আঁকা বাঁকা কত ছন্দে চলেছে মরণী বাস্তবীর মত। এই পথের দুধারে গ্রামের চোখজুড়ানো ছিমছাম ঘরদোরবিশিষ্ট খাঁচা ঘরগুলি। মাঝে মাঝে খোড়ালে গরু খোলা চমির উপর বাছুরের ছুটোছুটি। গ্রামের একপ্রান্তে মস্ত বড় অনেকদিনের পুরানো একটা অশ্বত্থ গাছ, সেই গাছের ছায়ায় ভাঙা খেকেলে ধরণের একটি ঠাকুর ঘর আর বারোয়ারীতলা। এইখানে বছরের পর বছর কত গায়ক কত কথকচূড়ামণি এসে গান করেন—কথকতা করেন। তখন আশে-পাশের কত গ্রামের লোক এসে এইখানে তাদের প্রিয় হরিনাম শোনে, রামায়ণ শোনে, কৃষ্ণলীলা শোনে, তখন যে যে কি এক আনন্দের তরঙ্গ ওঠে তা বলে বুঝাবার নয়।

এখন অনেকদিন ধরে সেই অশ্বত্থ গাছের তলায় লোক আসে না—গান হয় না—কথকতাও শোনা যায় না। শুধু সেই পুরণো ভাঙা মন্দিরে বৃদ্ধ পূজারী বসে থাকেন—ঠাকুরের মুখ চেয়ে, আর তাঁদের মানুষের মন এমন হল কেন? তারা হরিনাম শুনতে চায় না, কথকতার আসর করে না—মেলা মহোৎসবে তাদের আগের মত আর উৎসাহ নেই। শুধু যত লোক কি কোথাও নিমেষমাত্র—সেদিকেই ছুটে যাবে?

বেশি দিনের কথা নয়, পঁচিশ বছর আগের কথাই বলি, তখনও দেশে ভালো ভালো কথক ছিলেন মাঝের মত, গুণীলোক এখন আর দেখা যায় না। যাঁরা পল্লীজীবন যারা রক্ষা করেছেন—রসে সঞ্জীবিত করেছেন—শুদ্ধ ভাবপ্রেরণায় বিস্মিত করেছেন এবং নিত্য নব ধর্ম শিক্ষাদান করে জীবন পথিকে সহজ সরল সুন্দর রেখেছেন। সেই কীর্তনীয়া, কবির দল, কথকঠাকুর প্রভৃতি এখন বিরল দর্শন হয়েছেন। যারা ভাল গান করেন তারা সহরে, কবিওয়ালা বিলুপ্তপ্রায়, কথক আর নাই বললে অত্যুক্তি হয় না। এখন যারা ভাগবত রামায়ণ মহাভারত প্রসঙ্গে জনচিত্তে আকর্ষণের ব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরা প্রায়শঃ পাঠক বা ব্যাখ্যাতা। আগেকার দিনের মত কথকতা শুনতে চাইলেও উপায় আর নাই। এই স্রোত চলে চলে হয়তো কিছুদিনের পর সামাজিক কথকতার রস হতে একান্তভাবেই বঞ্চিত হয়ে যাবে। বৈষ্ণবাচার্য প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ একবার এই কথকতা সম্বন্ধে উন্নতিবিধায়ক কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তাতে এই বিদ্যার পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনবোধে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনেরও উপদেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন রীতিতে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন, ভাগবত রামায়ণ সম্বন্ধে শুধু তাঁরাই এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হতে পারেন।

প্রসিদ্ধ কয়েকজন কথকের নাম করেই কথকতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হলো এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। কথকেরা প্রায়শঃ কথা দক্ষিণ। সাহিত্যক্ষেত্রে তাদের দান খুব বেশি নয়। তবে একেবারে কোথাও কিছু নেই, এ কথা বলা তাদের প্রতি অন্যায় করা।

যে সব পাইকারী কথক সহস্র সহস্র লোকের মনে কথার প্রাচুর্যে ভাবের বন্যা সৃষ্টি করেছেন—যাঁরা কবির কাব্যকে সার্থক করেছেন কণ্ঠের মাধুর্যে—যাঁরা ব্যাস বাল্মীকির বর্ণনাকে রূপ দিয়েছেন আত্মিক অভিনয়ে, যাঁরা পদাবলীকে মধুর ছন্দ দিয়েছেন পাঠক্রম চাতুর্যে, সেই কথকদের সৌরভকে চিরন্তন করে রাখবার মত কোনো সাহিত্য নেই কোনো ভাষা নেই কোনো অবলম্বন নেই আছে শুধু তাঁদের ছাপামূর্তি বর্তমানের পাঠক ও ব্যাখ্যাতৃবর্গ। কিন্তু ইহাদের সংখ্যাও এত অল্প যে উহা লোকশিক্ষার পক্ষে মোটেই প্রচুর বলে অঙ্গীকার।

গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, নিরক্ষর জনসমাজকে সাক্ষর করবার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা, অর্থব্যয় ও প্রচেষ্টা চলেছে স্বাধীন ভারতে প্রশংসনীয়ভাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অক্ষর পরিচয়েই মানুষের জীবনছন্দে অভাব মিটে না, একথা আজ আর কারুর অজানা নেই। লৌকিক শিক্ষার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ চাহিদার বৃদ্ধি হয়, সে কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। বৈদেশিক প্রভাব ভারতীয় মনের উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। মনের সন্তোষ চুরি করে সমাজের প্রতিটি স্তরে যে একটা অসন্তোষের আগুন ছড়িয়েছে ভোগলিপ্সা সেটিকে আর চাপা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সমাজহিতকামী নেতৃবৃন্দ আজ এই ভীষণ অবস্থার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারেন না; তার কারণ তাতে এদের নৈতিক মৃত্যু অনিবার্য, আর যুদ্ধের সাহসও তাদের নেই। কেন না, তাঁরা জানেন এই যুদ্ধে জয়ের আশার চাইতে পরাজয়ের শংকাই অধিক। তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের হাতে প্রচারপত্র আছে, বিদ্যালয় আছে, ক্লাব সমিতি সভা আছে, শুধু যা একান্ত আলোচনা কেন্দ্র আছে, যেখানে মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করে নিজেদের হিতচিন্তার উপায় আছে, ব্যবস্থা আছে। ইহাদের সংখ্যা গ্রামে জনসমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে অতি নগণ্য। এই বিরাট সমাজের মনে যদি বিষবাষ্প ছড়িয়ে যায় তাকে রুদ্ধ করে কে?

গ্রামের ঠাকুরদালান ভেঙে পড়লে মেরামত হয় না, কারণ যাঁরা করকাতায় থাকেন। পুষ্করিণী পরিষ্কার হয় না, কারণ কর্তারা নতুন ব্যবসা দিয়েছেন, এদিকে তাদের নজর নেই। বারোয়ারী উৎসব গ্রামে বন্ধ হয়ে গেছে, কারণ যারা মোটা চাঁদা দিতেন তারা এখন গ্রাম ছেড়ে সহরে বাস করছেন। কথকঠাকুর একবার করে এই গ্রামে প্রতি বছর আসতেন—এখন কয়েক বছর আর তাকে দেখা যায় না, কারণ যারা তাকে

গ্রামে আসতেন তারা এখন বালীগঞ্জে থাকেন। গ্রাম এখন অন্ধকার। পাঁচুদের বাড়ীতে একটা মৃদঙ্গ ছিল, সেটি বাজাবার লোক নেই বলে পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে আছে। পল্লবীর ডোরীগুলো ছিঁড়ে গেছে। একতারা আর কেউ বাজায় না, কয়েকটা এস্রাজ আদর হারিয়ে রেখেছে। তবলায় চেটে পেটে শোনা যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু সুরজের তাঁপে তাঁপে বোল আর কেউ মনে করে রাখে নি। শিলেদের বাড়ীতে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। একপাশে কাপড়ে জড়ানো কতকগুলি কি পুঁথি আছে। অনেকদিন আগে তাদের গুরুদেব যখন আসতেন, তিনি সেগুলি কখনো কখনো খুলে দেখাশুনা করতেন। তাতে আর কিছু না হোক বইগুলোর জমাটবাঁধা ধুলো কয়েকদিনের জন্য সরে যেতো। তিনি আর আসেন না গ্রামে, পুরুষ আসেন কই। এবেলা আসেন ওবেলা চলে যান। তার নাকি গ্রামের হাওয়া সহ্য হয় না। তিনি বই পুঁথির ধার ধারেন না। তিনি চাকরী করেন।

কথকতা হবে কোথায়? যাত্রোদ্গারীতলায় এখন অনেকদিন ধরে মাছের হাট বসে। তীব্রপক্ষে তার কাছ দিয়ে যাওয়া আসা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পয়লাদের প্রশস্ত আঙিনা আছে বটে, তাদের ভাইদের ভেতর সদ্ভাব মিল নেই। একজন বলবে হোক—অমনি আর দু'জন বলবে হতে পারে না। ওসব বাবুদের লোক ঠকিয়ে খেয়ার কথা আর চলবে না। এদিকে নতুন সিনেমাঘরটায় দুবার করে 'শো' নিয়মিত-ভাবেই চলেছে। একদিনও বন্ধ নেই—তাতে ক'রে প্রায়ই শোনা যায় এখাড়ী ওখাড়ী করে ছোট ছোট দু'চারটি চুরি প্রতিনিয়তই চলেছে। দুষ্ট লোকেরা বলে ঐ সিনেমার জন্যই চুরি হচ্ছে।

মাঝে মাঝে যাত্রার দল এসে পূজা বাড়ীতে বা উৎসবের আঙিনায় ধ্রুব, প্রহ্লাদ, অম্বরীষের উপাখ্যান অভিনয়ে জনসাধারণের হৃদয়ে একটা তরল সঙ্গীতভাবের উল্লাস সৃষ্টি করে সমর্থ হতো এখন সে যাত্রার দল আর চলে না। তাদের পোষায় না, যুক্তি সমাজ আরও উন্নত ধরণের কিছু আশা করে। সিনেমার বাস্তব জীবনের ছবি কল্পনালোকের ছাপ দর্শন ক'রে সাময়িক তৃপ্তিলাভ হতে পারে কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা বৃদ্ধি ভিন্ন সেখানে রসোদ্রেকের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না প্রায়শঃ। আমাদের বাড়ীর সেই প্রাচীন কথকঠাকুরকে দেখেছি। এ বাড়ীতে তাঁর পদার্পণে নতুন জীবনের সাড়া পাওয়া যেতো। গিন্নি-মানুষের তো কথাই নেই, পাড়ার সবার একটা ভাবান্তর উপস্থিত হতো। সকলের মুখেই প্রশ্ন, কখন কথা সুরু হবে! সেই বৃদ্ধ কথকঠাকুর যেন একটা মস্তবড় বিস্ময়—যেন একটা মহাবস্তু—যেন জনমোহকারী যন্ত্র। শুধু কি তাই? তিনি যেন চলন্ত অন্নদামূর্তি। তাঁকে সম্মান করে সন্তোষ। তার কাছে মাথা নোয়াতে কারুর সঙ্কোচ নেই। বালক বৃদ্ধ যুবা সকল স্তরের লোকের তিনি যেন অত্যন্ত নিকটতম প্রিয় বান্ধব। তাঁর হৃদয়ে যেন সকলকার জন্য প্রশস্ত স্থান করে রাখা হয়েছে। তার কাছে যেতে স্কুলের ছেলেদেরও সঙ্কোচ নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের তো তিনি যেন একজন খেলার সাথী। সদা হাসিমুখ কথায় কথায় ভঙ্গী বিলাস—একটি কথায় সাতটি কথা—তিনি যেন গল্পের খনি। ছেলেরা এসেই বলে দাদু একটা গল্প বলুন। ছোট মেয়েরা এসে বায়না ধরে, একটা গান করুন। বৃদ্ধেরা এসে পরমার্থ প্রশ্ন করেন আর বলেন, তোমরা ছোটরা এখানে কেন? যা যা খেলা করগে। তোরা ওঁর কথায় কি বুঝবি? ছেলেরা বলাবলি করে, ঠাকুরমশায় এলে তার সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলবো তার উপায় নেই। কোথা থেকে সব বুড়োর দল এসে জুটিয়ে বসলেন। কতক্ষণে উঠে যাবেন তার ঠিক নেই।

আমরা আর সময় পাবো কখন। এত বেলা হয়ে গেল এখুণি ঠাকুর যাবেন পুজার ঘরে। পুজা সেরে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়া সেকি কম কষ্ট। আহা ঠাকুর যে কারুর জল পর্যন্ত নেন না। আমাদের তো খোসাই গুরুর কাছে দীক্ষানয় হয়েছে, হলে হবে কি? বলেছিলুম—ঠাকুর আমরা তো দীক্ষিত। জল এনে বলনা তৈরী করে দিলে দোষ কি? ঠাকুর বলেন, না মা, তোমাদের দীক্ষা তো ঠিকই হয়েছে, তবে কিনা তোমরা তো আর যথাশাস্ত্র সদাচার পালন কর না। যারা শৌচের নিয়ম মেনে চলে না গুরুর আদেশে আমি তাদের হাতে জল খাইনে। ঠাকুরের কথায় মনে দুঃখ হয়। কত যত্নে আমাদের রান্না খান, আর উনি বলেন জলও খান না। কি জানি তার কি নিয়ম। তবে এ নিয়ম আর কতদিন চলবে সেইটেই ভাববার বিষয়।

এই সেদিন আমাদের পাশের বাড়ীর এক ব্রাহ্মণ কন্যা দু'বছর আগে স্বামী হারিয়েছে। ছেলেমেয়ের তার কেউ নেই। কথকঠাকুরের সেবা যত্ন করে একটু ধর্ম করবে বলে এসে কত করে বললে। ঠাকুরের ঐ এক কথা আমি কারুর জল নেব না। এমন লোকও হয় এ-কালে?

ঠাকুর নিরামিষ-ভোজী। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, আহার শুদ্ধ না হলে দেহ মন শুদ্ধ হয় না। মন শুদ্ধ না হলে কেমন করে কি হয়? শরীর আর মনই আমাদের যথাসর্বস্ব। দেহ যদি অপবিত্র হয়, মন পবিত্র থাকে না; আর মনটা যদি অপবিত্র চিন্তা করে, শরীরকে যতই পবিত্র রাখবার চেষ্টা কর না, সে শরীরও অপবিত্র। ভাবের ঘরে চুরি হলে সব অন্ধকার।

তিনি নাকি কথকথা সুরু করবার অনেক আগে থেকেই আমিষ আহার একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। শুধু কি তাই তিনি অত্যন্ত অল্পাহারী। দিনের বেলা শুধু আতপ চালের অন্ন ইষ্টদেবতাকে নিবেদিত-ভাবে নিবেদন করে, সেই প্রসাদ ভোজন করেন সঙ্গে ঘৃত দি থাকেই থাকে। যে বাড়ীতে তিনি কথকতা করেন তারা তো খুব ধনীলোক। এবেলা ওবেলা ক'রে কথার আগে পরে প্রায় চার সের দুধ তাঁর পেটে যায়। আর মাঝে মাঝে দুধের দর একটু কম হলেই এগুলো তো আছেই। রাত্রে কথকঠাকুর লুচি আর দুধ খেয়েই কাটিয়ে দেন। তিনি বলেন রাত্রে পেট ভরে খেলে ভাল ঘুম হয় না, আর কণ্ঠও ভাল থাকে না। তবে লুচি একসের মিহি ময়দার হয়, সেই থেকে দু'চারখানা যা থাকে সঙ্গী ভক্তেরাও একটু আধটু প্রসাদ পায়। খুব তাড়াতাড়ি ঠাকুর ঘুমিয়ে পড়েন, আর শয্যাত্যাগ করেন সকলের আগে। কখন যে তিনি প্রাতঃকৃত্য সেরে জপ করতে বসে যান তা কিন্তু আমরা একদিনও টের পাই নি। সত্যিই ঠাকুরের কি শীত কি গ্রীষ্ম সব সময়ে

বিচিত্রভাবে ছোটো বোন পদ্মাতাপের অভ্যাস—এ কিন্তু আমাদের কাছে খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় বলে মনে হতো। লক্ষ্য করেছি যখন তিনি পদ্মার ঘরে পড়তেন, অমনি তাঁর নাক ডাকা সুরু হয়েছে। গভীর ঘুম ঘুমিয়ে আনন্দই তিনি অধিকারী। তাই বুঝি তাঁর শরীরে এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, মুখে অমন আভা, আর কণ্ঠেও সুমধুর সংগীত। ঠাকুর তোমার অভ্যাসের জয়!

সুর টপ্পের সঙ্গে ঘুমঘুমোর গন্ধে আঙ্গিনা আমোদিত হ'য়ে উঠ্‌ল। গ্রামের সব বুদ্ধেরা একে একে এসে আসনে বসে পড়লেন। মায়েরা এলেন। ছেলের দল হুটোহুটি করে এসে জুটল বিস্তীর্ণ দাহিরানার তলায়। তাদের হুরন্তপনায় কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে তাদের তাড়া করলেন সেখান হতে। তারা ছুটে গেল মাঠের দিকে। এলেন বাড়ীর বড়গিন্নি, বর্ষীয়সী প্রবীণবয়সী ক্ষৌমবাস-পরিধানা। মাথায় একগলা ঘোমটা টানা। যদিও লজ্জা করবার মত কোনো ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই তবু এই অহেতুক লজ্জার পরিচায়ক ঘোমটা টানা যেন সেই প্রাচীনার জীবনের উপরও অটলবাহিনীর এক সজীবতার প্রলেপ দিয়ে গিয়েছে। তাঁর হাতে রয়েছে একটি পুষ্পপাত্র—মানা রকম ফুল তাতে একসাথে একটি ছোট ডালায় বাটিতে চন্দন আর দুর্ব্বা, তুলসী প্রভৃতি পূজার দ্রব্য। তাঁর সঙ্গিনীর হাতে আছে ভোগের জন্য বাতাসা মিষ্টি, ফল আর খেজুরে গুড় জল। পাত্রগুলি যথাস্থানে রাখা হল। একটি চাদরকে প্রশস্তভাবে ভাঁজ করে দেওয়া হল ঘুমুচ্ছিতে খানিকটা ঘুরে দেওয়া হল। মায়েরা নিজের নিজের আসনে বসে পড়লেন পদ্মাসনে।

নারকেলের কাপড়ে তৈরী চন্দ্রাতপতলে কথকতার বেদী। এই চন্দ্রাতপটি প্রতি বছরেই এ সময়ে টাঙানো হয়। অনেক দিনের পুরানো হলেও তা তেমন ছেঁড়ে যায় নি। শোনা যায় বড়গিন্নীর শাশুড়ীর বাপের বাড়ী থেকে এই চন্দ্রাতপ এসেছিল। সে অনেক দিনের কথা, সঠিক হিসেব হলফ্ করে বল্‌বার উপায় নেই। গিন্নি বলেন, আমি এ বাড়ীতে আসা পর্য্যন্ত দেখে আস্‌ছি এই চাঁদোয়ার তলায় বসে কথকঠাকুর কথকতা করেন। আমার শাশুড়ী যখন প্রথমবারে পুরাণ যেন তখন আমার বিয়ে হয়নি। শুনেছি এই চাঁদোয়া তখনও ছিল। চাঁদোয়ার তলায় উচ্চাসনের উপর পালিচা। পালিচাখানা কাশ্মীরি কিন্তু শত বর্ষেরও অধিক তার বয়স। স্থানে স্থানে একটু ছিন্ন হয়েছে। সেলাইয়ে পুরুনেলার সিদ্ধহস্তিনেন বড় বউমা। তিনি কথকঠাকুরের জন্য আগ্রা থেকে সুন্দর জালির দেওয়া একখানা রেশমের আসন এনেছেন। সেই আসনখানা পালিচার উপর দেওয়া আছে। পাশেই একটি চাকিয়া। তুলো বেশ যায়, নতুন ওয়াড় দেওয়া হয়েছে। বেশ পরিষ্কার দেখতে হয়েছে। সম্মুখে পুরাণ রাখবার জন্য একখানা ছোট জলচৌকী তার উপর লাল পালুর কাপড় ঢাকা দেওয়া হয়েছে। ডানদিকে কোশাকুশী আর সব কুশে জিনিষপত্র রয়েছে। একখানা রেকাবের উপর একখানা নতুন গামছাও আছে। ঠাকুর সময় সময় কথার অবসরে চোখমুখ মার্জ্জনা করেন এই গামছা দিয়ে। একটি ছোট পাত্রে আলতা গুছানো, নখর প্রস্তুতিও রয়েছে। স্নান করতে কখনও যদি একটু দেরী হয় তাই দিতে পারেন। আমরা কিন্তু আমাদের কথকঠাকুরকে কখনো কথকতার সময় বা পানের সময় আলতা নখর পালে দিতে দেখিনি। তিনি বলেন, এটা একটা বহু অভ্যাস আর নিজের সাধনার উপর অবিশ্বাস। স্নান পাইতে হলে আলতাকুচো নখর চাই এ আবার কেমন কথা?

ঐ শোন কীর্ত্তনের আওয়াজ। ছেলের দল ছুটল নেচে নেচে কীর্ত্তন দলের উদ্দেশ্যে গ্রামের বাঁকা পথে। ভিন্ন গ্রাম থেকে এই দলটি প্রতিদিন নগর-কীর্ত্তন করে এই বাড়ীতে আসে যে দিন কথকতা হয় এখানে। লোকগুলি খুব ভক্ত তাই অত সকালবেলা স্নান সেঁচা করে কীর্ত্তন দিয়ে আসে। ঠাকুর তাদের একদিন বলে দিয়েছেন—তোমরা না এলে আমার পুরাণ সুরু হবে না। ঠিক সময়ে আসবে। সেই থেকে তারা নিয়মিতভাবে আসছে।

"নেচে নেচে যায় রে গোরা নিতাই প্রেমে হয়ে ভোরা"

যেমন তাদের পায়ের গতি সরলতা তেমন তাদের মুক্তকণ্ঠের উদার ধ্বনি। সমস্ত গ্রামখানি তাদের এই কীর্ত্তনের ধ্বনির সঙ্গে নেচে উঠে প্রতিদিন সকালবেলা। কেউ পুরাণ শুনতে আসুক আর নাই আসুক সংকীর্ত্তন ধ্বনি তাদের সকলের মধ্যেপুরাণারম্ভের ইঙ্গিতটিকে সজীব করে যেন ধ্বনির তরঙ্গে। শাঁখ, কাঁসর, ঘন্টা, বেজে উঠল একসঙ্গে। সে কি তুমুল শব্দ। কীর্ত্তনের দল আসরে প্রবেশ করেছে। এবারে পুরাণ সুরু হবে।

"এস ভাই গৌর নিতাই
বিজয়ী বিজয়রাজ হে……"

মূল গায়ক গান ধরিলেন উচ্চকণ্ঠে—

আমি পূজিব চরণ এই আশিকম
রাখিব হৃদয় মাঝে। আসতে হবে হে;

পদের সঙ্গে আঁখর জুটল—একা যদি আসতে নার তাই নিতাইকে সঙ্গে কর—আমার হৃদয়ে মহীয়া কর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে কি উল্লাস সে কি ধ্বনি মনে হয় যেন গৌর নিতাই নেচে নেচে এসে তখনই উদয় হলেন। মূলগায়ক বার দু'এক করতাল বাদককে বাধক দিয়ে ঠিক তালে বাজাবার ইঙ্গিত করছিলেন তাতে দলভঙ্গের উপক্রম হলেও শেষ পর্য্যন্ত আর হয় নি। কীর্ত্তন সমাপ্ত হল।

কথকঠাকুরের পা ধুইয়ে দেওয়া হল। গিন্নিরা গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। ঠাকুর বীরাসনবিন্যাসে বেদীর সম্মুখে প্রণত হয়ে আসনে উঠে বসলেন। আসনের সম্মুখে প্রণাম করার মানে সকলে বুঝে উঠ্‌তে পারে নি, তাই তারা কিস্ কিস্ করে উঠ্‌ল। প্রভু, ঠাকুরমশাই আমার কাকে প্রণাম করলেন। তিনিই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ঠাকুর জানেন এই আসন আমার নয়। এই আসন ব্যাসদেবের। ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাখ্যা করেছেন যে ভাবে আজ তারই বহু লোকের

কাছে ব্যাখ্যা করতে বলেছি। এ ব্যাখ্যার আসনে আমার গুরুপদ পুণ্য মুখার্জির বসে আছেন। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ আমি পুরাণ কথা বর্ণনায় প্রবৃত্ত। সর্বপ্রথম এই আসন আমার পূজার সামগ্রী। আসন স্পর্শ করে তিনি কি যেন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। পণ্ডিতেরা বলেন আসন শুদ্ধ করে আসনে বসতে হয়। কথকঠাকুরের ডানদিকে পৃথক্ আসনে পুঁথি নিয়ে বসলেন ধারক ঠাকুর। ইনি অত্যন্ত ধরতোধী। প্রথম তো মনে করেছিলাম, বুঝি ইনি কথাই বলেন না। সেদিন দেখলুম তিনি অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় কথকঠাকুরের সঙ্গে কি এক শ্লোকের পাঠভেদ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রমোত্তর করে মীমাংসা করে দিলেন। তখন আমাদের সন্দেহ যেন ঘুচে হয়ে। সকলেই সেদিন বুঝেছিল যে অন্তরাধী সেই রোগা লোকটির পেটে কত বিদ্যা।

বাংলার বাইরে কথকঠাকুরকে প্রায়শঃ ব্যাসজী ব'লে সম্মান করে। রামায়ণ-কথককে রামায়ণীজীও বলে। সাধারণতঃ পুরাণ পাঠের সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বরণ করবার রীতি ছিল। বহু মূল্য বেশী হওয়ার ফলেই হউক বা শ্রদ্ধাঅভাবের ফলেই হউক, এখন সেভাবে পাঁচ পাঁচজন লোককে ব্রতী করার উৎসাহ আর দেখতে পাওয়া যায় না। একজন ব্রাহ্মণ প্রায়শঃ বাড়ীর পুরোহিত বা গুরুকে শ্রোতারূপে বরণ করে তাঁর আনুগত্যেই গৃহস্থের পুরাণ কথা শ্রবণের রীতি চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। কথকঠাকুর আসরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমস্কার অভিবাদন করেন—শিষ্টগণের জন্যে এই প্রচলিত রীতি। কালের প্রভাবে সে সব লোপ পাবার উপক্রম হয়েছে।

পুরাণপাঠক, শ্রোতা, ধারক এরা সব সকলদেশের পুরাণের অংশ বিশেষ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করেন—তার নাম পারায়ণ। ব্যাস, বৈশম্পায়ন, শুক, বশিষ্ঠ, যেমন প্রাচীনকালে যজ্ঞের শেষে পুরাণ কথা বলতেন শুনতেন—লোমহর্ষণ সূত উগ্রশ্রবা সূত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুরাণপাঠকের আদর্শ অনুসরণ করে সেইভাবে পবিত্র পরিবেশের মধ্যে তাদের মুখের লয়ছন্দায়িত সেই সহজ সরল মাধুর্যমাখা সংস্কৃত ছন্দে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম যুগের কাহিনীর বর্ণনা সে যে কি গাম্ভীর্য ও তাৎপর্যপরিপূর্ণ তা আর কজন অনুভব করে পারে। তবু আজও শত শত নরনারী মধুর কণ্ঠের আকর্ষণে পাঠকের দিকে অপলকনেত্রে অবোধ্য সেই বাণী শ্রবণ করে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে। তাদের বিশ্বাস ঐ মন্ত্রকথা শ্রবণেই জন্মে মঙ্গল। শুদ্ধ হৃদয়ে তাদের এই মন্ত্রউপাসনা ব্যর্থ হয়নি জীবনের পথে। শাস্ত্রবচন, পুরাণকথা, কথকতা আর কীর্তনের সুর অতি সাধারণ গৃহস্থকে করেছে নীতিবান্, সত্যনিষ্ঠ, বিবেচক ও পরোপকারী। এই ধর্মানুষ্ঠানের পুণ্যধারা গ্রাম গ্রামান্তরের জনগণের প্রেমের বন্ধন সামাজিকতার সম্বন্ধ হয়েছে দৃঢ়তর। অপর আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত করেছে সমগ্র দেশের মধ্যে। সাধুকথায়, গানে, বাদ্যযন্ত্রে যে বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থানুসন্ধান তাকে বাধা দিতে সমর্থ হয়নি কোনো কালে। ঘণ্টা শাঁখ বেজে উঠল। পাঠকের পাঠ সুরু হয়েছে।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোঽজয়মুদীরয়েৎ।

আমায় তাড়াতাড়ি করে গ্রামান্তরে যেতে হবে তাই সেদিন আর আমার ভাগ্যে কথকতা শোনা হলো না, লোভ হল একদিন শুনতেই হবে।

হৈমন্তী

দিবাকর সেনরায়

রাত্রির নির্জনে শিশিরের টুপ্‌টাপ্ পায়েসের, ঘাসেদের বুকে—
তারকার শাড়ী পরে আকাশের রাত জাগা কুয়াসার মেয়েটোপ মুখে।
ফুলের সুবাস নিয়ে বাতাসের আনাগোনা জানালার ঝিল্‌মিল্ দিয়ে,
দূর মেঘ উড়ে চলে আকাশের বুকে যেন স্বপ্নের পরীদের নিয়ে!
কখন যে চাঁদ ওঠে নীলিমার নীল পটে—কালো রাত সাদা হয়ে ফোটে,
পরিচিত মুখগুলো একে একে ভীড় করে—কত মুখ মনে এসে জোটে!
সে মুখেরা কথা কয়, কেউ হাসে—কেউ গায়—কেহ শুধু
চেয়ে থাকে চোখে,
কুয়াসার মেয়া এই আবছায়া রাতে যেন চলে গেছি স্বপনের লোকে!
রাত ক্রমে বেড়ে চলে, স্বপনের ঘোর কাটে রাতজাগা পাখীদের ডাকে—
সব ঘুম মুছে গেছে—অতি পরিচিতখানি যেন কথা বলিবারে থাকে।
হোক্ তবে তাই হোক্ তব মনে কথা হোক্ আজ এই কুয়াসার রাতে—
যে ভাষার কথা নেই—যে ভাষার লেখা নেই—সেই ভাষা বলি দু'জনাতে।
কেহ আর দেখে নেই তাই আর দেখে নেই কথা-চিতা-ছল-ভয়-চাতুরী—
ঘুমভরা এই রাতে কেহ নিয়ে বসে নেই বিশ্বের পাষাণের ভাড়ুরী!
বিশ্বের জটিলতা সংগ্রাম সেই মন ছলনার গুণ্ঠন ঢাকে,
সেই মন খুলে থাক্—সব কথা বলে থাক্ রাত্রির আকাশের ফাঁকে।

* * * * *

নিষ্টিশের আবু কমে চাঁদ ঢলে সীমান্তে প্রান্তিক নভে জাগে লাল—
রাত্রির স্বপ্নের মৌতাত শেষ হয়, ভাঙে দিন জাগে মহাকাল!

ভারতবর্ষের ৪১শ বর্ষ—

ভারতবর্ষ মাসিক পত্র গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাহার জীবনের ৫০ বর্ষ পূর্ণ করিয়া বর্তমান আষাঢ় সংখ্যায় ৫১শ বর্ষে পদার্পণ করিল। বাংলার সংস্কৃতি সাধনার ইতিহাসে ভারতবর্ষের দানের কথা ভবিষ্যৎ-ঐতিহাসিকগণ স্থির করিবেন। আজ এই শুভক্ষণে আমরা স্বর্গত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করি। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রকাশের আয়োজন করিতে করিতে—তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই তিনি সাধনোচিত ধামে যখন মহাপ্রয়াণ করেন, তখন সেই দুর্দিনে যাঁহারা ভারতবর্ষের সহায়ক হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আজ স্মরণীয়। তাঁহাদের মধ্যে পরিচালক শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আজও ভারতবর্ষের কর্ণধাররূপে ইহাকে সুপথে পরিচালিত করিতে সাহায্য করিতেছেন। স্বর্গত জলধর সেন প্রভৃতি বহু সুধী আজ আর আমাদের মধ্যে নাই। এই ৫০ বৎসরের ইতিহাসে যাঁহাদের দান ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাঁহাদের সকলের উদ্দেশে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎ চরণে আমরা প্রার্থনা জানাই, যেন অতীতের মত ভবিষ্যতেও ভারতবর্ষ সকলের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে ব্রতী থাকিতে সমর্থ হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

গত ৩রা এপ্রিল হইতে ২ দিন নদীয়া জেলার শান্তিপুর সাধারণ পাঠাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশশিভূষণ ধান এম-এল-এ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন—অধ্যাপক শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় (বিধান পরিষদের সভাপতি) মূল সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন; কলিকাতায় ন্যাশানাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি-কেশবম্ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক সম্মেলন হয়—তাহাতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ও সভাপতি মহাশয় 'জাতিগঠনে পাঠাগারের ভূমিকা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে পাঠাগারের মধ্য দিয়া বয়স্ক-শিক্ষা ও জনশিক্ষার যে বিরাট ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, এই সম্মেলনের ফলে তাহা সুপরিচালিত হইবে বলিয়া সকলে আশা করেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীনেহরু—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ইংলণ্ডে গমন করায় গত ৫ঠা জুন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মান-সূচক 'ডক্টর অব ল' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৬৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীনেহরু ট্রিনিটি কলেজের এম-এ ও হ্যারো স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁহার এই সম্মান লাভ ভারতীয় মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

গড়বেতায় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী—

গত ২৭শে এপ্রিল মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা সহরে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর এক সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সহরের বাহিরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভা বোধহয় এই প্রথম। ঐ অধিবেশনে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্রীনারায়ণ আগরওয়াল এম-পি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন ও সীমানা পুনর্নির্ধারণ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ভূদান যজ্ঞ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে এই সভায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। মফঃস্বলে এই দুই দিন ব্যাপী অধিবেশনে রাজ্যের সকল জেলার লোকের পরস্পরা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে এবং ইহা সকলকে নূতন প্রেরণা দান করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

ভূদান যজ্ঞ ও শ্রীনেহরু—

নয়াদিল্লীতে এক সর্বদলীয় সম্মিলনে শ্রীজহর লাল নেহরু সকলকে ভূদান যজ্ঞ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য

আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সকলের ভূদান যজ্ঞের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়া এই বিষয়টির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা কর্তব্য। ইহা কোন দল বিশেষের আন্দোলন নহে—ভূদান যজ্ঞে সকল দলের সকল কর্মীর উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে হইবে। উপরাষ্ট্রপতি ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ ঐ সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও সভায় আচার্য্য বিনোবা ভাবের কার্য্য সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্য—

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম রাজ্য পাশাপাশি—উভয় রাজ্যের সংস্কৃতি প্রায় একই রূপ। বর্তমানে আসাম রাজ্যে বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাও কম নহে। এ অবস্থায় উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহাতে প্রীতির সম্বন্ধ বজায় থাকে, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত। খ্যাতনামা সুধী-পণ্ডিত শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী কার্যব্যপদেশে বহু দিন আসামে বাস করিয়াছিলেন—সে সময়ে তিনি অসমীয়া সাহিত্যের সহিত সম্যক পরিচিত হইয়াছিলেন। তাহার ফল স্বরূপ তিনি 'অসমীয়া সাহিত্য' নামে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা বিশ্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য মাত্র ॥০ আনা। যাঁহারা সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী, তাঁহাদের সকলের এই বইখানি পাঠ করা কর্তব্য। নানা কাজে বাঙ্গালীকে আসামে যাতায়াত করিতে হয় বা আসামে বাস করিতে হয়। সে সময়ে আসামের সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে সে দেশের লোকের সহিত মেলামেশার সুবিধা হইবে এবং কোন কোন কারণে উভয় রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে যে মনোমালিন্যের উদ্ভব ঘটে তাহা হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। সুধাংশুবাবু এই পুস্তকখানি লিখিয়া জাতির উপকার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

গত ১৮ই মে ৫৩টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৭০টি কৃষি-পরিবার ও ৩টি শিল্পক পরিবার। মোট লোক সংখ্যা ১৬১, তন্মধ্যে ১৩৭ প্রাপ্তবয়স্ক ও ২৯ অপ্রাপ্তবয়স্ক। প্রত্যেক পরিবার ৩০ বিঘা জমি ও ২ হাজার টাকা ঋণ পাইবে। ১৯৪৯ সালের ১লা মে হইতে এ পর্য্যন্ত ৪০০ পরিবার তথায় প্রেরিত হইয়াছে। দ্বীপটির নাম সুভাষ দ্বীপ রাখারও চেষ্টা করা হইতেছে।

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘ—

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় ৩৩এ, মদন মিত্র লেনে কিছুদিন পূর্বে সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যিকদের এই মিলনক্ষেত্রে সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হয়। ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। উক্ত বিবরণীতে তিনি বলেন, "এ পর্য্যন্ত আমরা ভারতীয় বিভিন্ন সাহিত্যিকের ৫৪টি রচনা অনুবাদ করাইয়া বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছি। সর্বসমেত ৪০ জন সাহিত্যিককে অন্ধ্র প্রদেশের বিভিন্ন সভায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভারতের ৫৪০০টি বিভিন্ন সাহিত্য সমিতি, সংস্কৃতি পরিষদ, বিবিধ প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের সহযোগিতা পাইতেছি। ১৭০০ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকগণ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিয়াছেন এবং আমাদের প্রেরিত সংবাদও রচনাদি প্রকাশের কার্যে আশাতীতভাবে সাহায্য করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত বড় বড় সহরে সঙ্ঘের ১৬টি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রেই বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিক লইয়া ৫ হইতে ১৬জন (সর্বসমেত ১৬২ জন) সম্পাদকের দ্বারা কার্য্য চলিতেছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য সহরেও শাখা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে এবং আরও সমিতি, গ্রন্থাগার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন। যে ভাবে কার্য্য অগ্রসর হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে "বৃহত্তর ভারত" গঠন-সংকল্প সহজসাধ্য হইবে। আমরা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইণ্ডোচীন, যাভা, তিব্বত, চীন ও অন্যদিকে আফগানিস্তান, পারস্য, ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক ও আরবের সাহিত্যিকদের ও তথাকার প্রবাসী ভারতীয় সাহিত্যিকদের এবং সাহিত্য সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে সক্ষম হইব। অনুবাদ সাহিত্যের দিকে আমাদের বিশেষ চেষ্টা আছে। পরস্পর

বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগ সাধন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে আমরা সকলেরই সহযোগিতা কামনা করি।

প্রখ্যাত ব্যায়ামবীর ইন্দ্রীরকুমার সরকার একটি লৌহদণ্ড মাথায় মাথিয়া রাখিয়াছেন। এই খেলাটি তিনি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন

আর-ডব্লিউ-এ-সি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে সমাজ-সেবা শিক্ষা দানের জন্য 'রিলিফ ওয়েলফেয়ার এমুলেন্স কোর' গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক ছাত্রকে অন্ততঃ সেখানে ৬ মাস কাল সমাজ-সেবা-শিক্ষা গ্রহণ করিতে বলা হয়। গত ২২শে এপ্রিল ঐ প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠা দিবসে সভাপতিত্ব করিতে যাইয়া রাজ্যপাল অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ছাত্রগণের এই কার্য্যে উৎসাহ দেখিয়া তাহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। ডাক্তার সুবোধ মিত্র, ডাক্তার অমরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। ছাত্রগণকে এইভাবে জন-সেবার কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া কর্তৃপক্ষ দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

কংগ্রেস পাঠচক্র—

কলিকাতা ৫৯টি চৌরঙ্গী রোডে প্রদেশ-কংগ্রেস-ভবনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্প্রতি সভাপতিত্বে কংগ্রেস পাঠচক্রের উদ্বোধন হইয়াছে। প্রথম দিনে বিধান পরিষদের সভাপতি ডাক্তার শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা মালার প্রথম বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসকর্মীদের যে সকল বিষয় জানা অবশ্য কর্তব্য, কংগ্রেস পাঠচক্রের উদ্যোগে সে সকল বিষয় জানাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের এই সংস্কৃতি প্রচার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়ের অন্ধ বালক-বালিকাদের খেলাধূলা

পুণায় শ্রীমতী রেণুকা রায়—

পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় সম্প্রতি পুনায় নিখিল ভারত মহিলা সম্মিলনের রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসবে সভানেত্রীত্ব করিতে যাইয়া তাঁহার ভাষণে ভারতের মহিলা-সমস্যা সমাধানের বহু নির্দেশ দান করিয়াছেন। তিনি বলেন—ভারতের অধিকসংখ্যক নাগরিক নারী—তাঁহাদের সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীন ভারতকে উন্নত করার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। গত সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ৬০ জন মহিলা ভোট দিয়াছেন। তাঁহাদের এই জাগরণকে গঠনমূলক কাজে লাগাইতে হইবে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য-জীবনের উন্নতির দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। গ্রামের মহিলারা কুটীর-

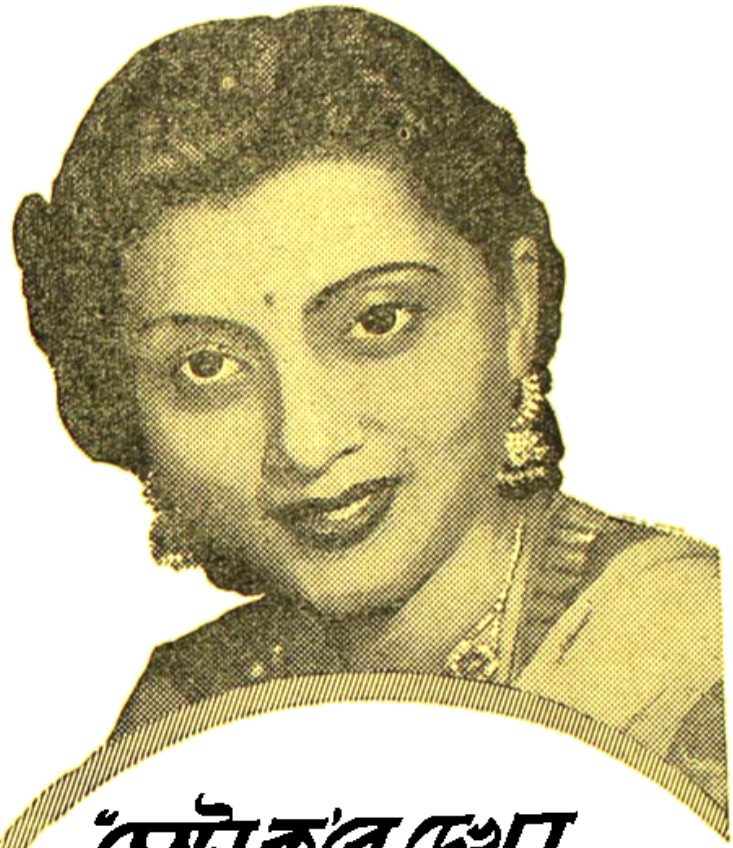

"চেষ্টা ক'রে দেখুন...
লাক্স টয়লেট্ সাবান মেখে
...আপনি আরও সুন্দর হ'তে পারেন।"

"এ এক সৌন্দর্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব সংযোগ," দেবযানী বলেন, "লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সরের মত ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে, লাক্স্ টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বকের এক নতুন সৌন্দর্য্য এনে দেবে।"

দেবযানী বলেন।

লাক্স
টয়লেট্ সাবান
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 371-X50 BO

শিল্পের বিস্তারের দ্বারা এই কাজে সাহায্য করিতে পারেন। এই সকল কাজে স্থানীয় নেতৃত্বকে উৎসাহ দিতে হইবে। শ্রীযুক্তা রায় নিজে বিরাট কর্মী—তিনি এ বিষয়ে কার্যে অগ্রণী হইলে দেশ উপকৃত হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর সহিত শ্রীযুক্তা রায় ফলে ছাত্র—কলিকাতা মুক্ত বিদ্যালয়

কলিকাতায় জলসরবরাহ বৃদ্ধি—

কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় জানাইয়াছেন যে সহরের জলাভাবগ্রস্ত অঞ্চলে ১১টি ৬ ইঞ্চি ও ৮টি ৫ ইঞ্চি—মোট ১৯টি নলকূপ বসাইয়া ভাল জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাতে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। কর্পোরেশনের কর্মকর্তাকে অবিলম্বে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা সহরের আয়তনও বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লোকসংখ্যা অসম্ভব-রূপে বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই দারুণ গ্রীষ্মে সহরে ভীষণ জলাভাব দেখা দিয়াছে ও ফলে কলেরা সংক্রামকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পূর্বেই ইহার প্রতীকারে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন সত্বর এ বিষয়ে কাজ হইলে লোক উপকৃত হইবে।

পরলোকে হরিদাস মজুমদার—

খ্যাতনামা সমাজ-সেবক কর্মী, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য হরিদাস মজুমদার গত ৬ই মে কলিকাতা গীতা-ভবনে (বালীগঞ্জ) ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতার সুবিখ্যাত শীল পরিবারের আইন-উপদেষ্টা ছিলেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। হিন্দু সংকার সমিতি, অমৃত সমাজ প্রভৃতির তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—কিছুদিন কেশরী নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। নানা প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করিয়া তিনি সর্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

কৃতী কৃষককিগকে পুরস্কার দান—

পশ্চিম বঙ্গের ১৯৪২-৪৩ সালের শস্যোৎপাদন প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার ২৫০০ টাকা বীরভূমের কৃতী কৃষক শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়কে প্রদত্ত হইবে। তিনি প্রতি একরে ৯০ মণ ধান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, যথাক্রমে নদীয়া জেলার চেতুগাছির শ্রীহাজারীলাল ঘোষ ও হাওড়া জেলার সোনাবাগের শ্রীউপেন্দ্রনাথ ধান। তাঁহারা প্রতি একরে যথাক্রমে ৮৮ মণ ৫ সের ও ৭৬ মণ ২৪ সের ধান উৎপাদন করিয়াছেন। জেলা ভিত্তিতেও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী প্রতিযোগীদিগকে যথাক্রমে ৩০০, ২৫০ ও ১৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই ভাবে সকল কৃষককে উৎসাহ দান করিয়া দেশে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা প্রশংসনীয়।

খগেন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা—

২৪ পরগণা বরাহনগরনিবাসী বিপ্লবী বীর খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কয় বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভক্ত বন্ধুরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষায় অবহিত হন। সম্প্রতি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা সমিতির চেষ্টায় কাশীপুর শ্মশান ঘাটে তাঁহার শবদাহ স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইতেছে। শুনা যায়, তাঁহার পিতৃভূমি দক্ষিণেশ্বরে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ একটি রাস্তা তাঁহার নামে করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ অঞ্চলে একটি উপযুক্ত স্থানে তাঁহার একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে স্মৃতিরক্ষা সর্বাঙ্গ-

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন

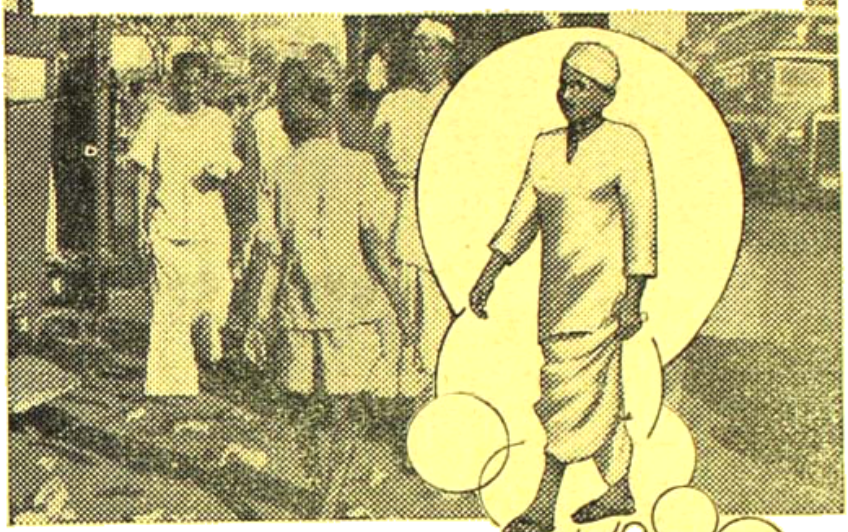

লাইফবয়ের

ফেনার আবরণে

যতোই কেন ইঁদিয়ে হোন্ না—প্রতিদিনই আপনি ধুলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।

লাইফবয়ের চমৎকারী ফেনা ধুলোময়লার রীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও তরতরে রাখে।

লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

L. 230-50 BG

সুন্দর হয়। আমাদের বিশ্বাস, স্বাধীন ভারতের অধিবাসীরা স্বাধীনতা যজ্ঞে যোগেন্দ্রনাথের দানের কথা স্মরণ করিয়া এ বিষয়ে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অবহিত হইবেন।

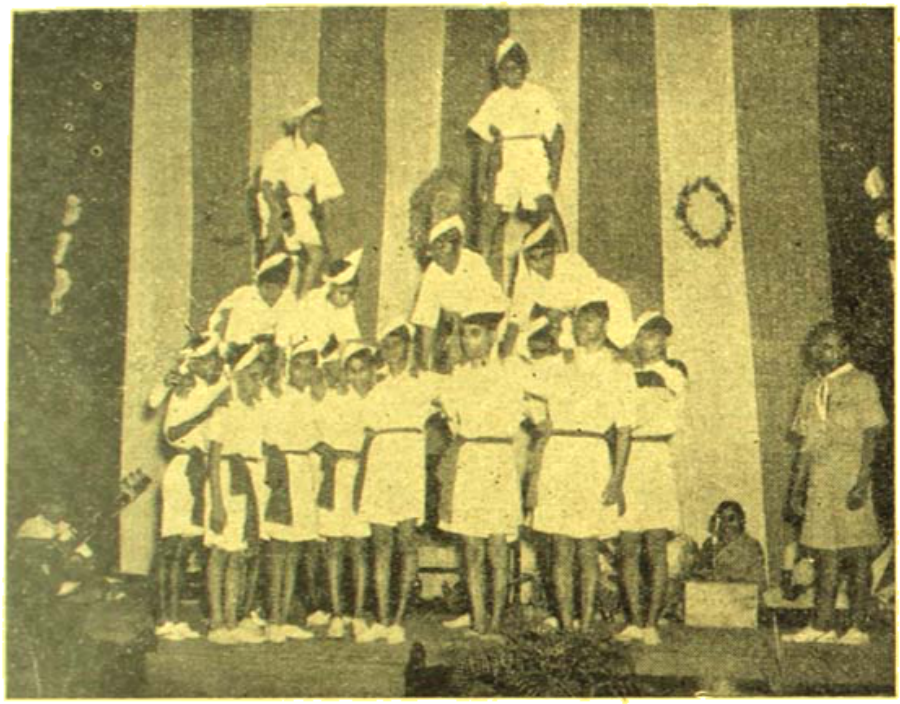

কলিকাতা অন্ধবিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্রীড়াকৌতুক

পরলোকে হেমচন্দ্র নাগ—

কলিকাতার ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্র হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সম্পাদক হেমচন্দ্র নাগ মহাশয় গত ১৬ই এপ্রিল ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোকগমন করিয়াছেন। মৈমনসিংহ জেলার আকুটিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি যৌবনেই সাংবাদিকের কার্য্য গ্রহণ করেন। সার সুরেন্দ্রনাথের সহকারীরূপে তিনি 'বেঙ্গলী'তে কাজ করার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ডে যোগদান করেন। গত ১৯২৭ সাল হইতে তিনি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। সাংবাদিক জগতে তাঁহার মত জনপ্রিয় লোকের সংখ্যা কম।

বৈদ্যুতিক ট্রেণ প্রবর্ত্তন—

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত কয়লা তদন্ত কমিটী নিম্নলিখিত ৪টি বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেণ প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন—(১) হাওড়া বিভাগ—১৪১ মাইল (২) শিয়ালদহ বিভাগ—১৩৮ মাইল (৩) বর্দ্ধমান-গয়া—২১২ মাইল ও (৪) গয়া-মোগলসরাই—১২৬ মাইল। কমিটী কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রেণী বিভাগ ও কয়লা পরিবহনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার ও সুপারিশ করিয়াছেন। সত্বর এই সকল ব্যবস্থা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সে জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে।

নূতন মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

গত ২রা এপ্রিল কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ সভায় শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণেন্দুশেখর বসু যথাক্রমে পুনরায় এক বৎসরের জন্য কলিকাতার মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিরোধী দল সভায় নানাপ্রকার গণ্ডগোল করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভোটে পরাজিত হইয়া চলিয়া যান। নরেশবাবু ও পূর্ণেন্দু-বাবু উভয়েই খ্যাতনামা দেশ-সেবক—কংগ্রেস দলের কর্ম্মী—তাঁহাদের নির্ব্বাচনে যোগ্যতারই সমাদর করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে নূতন নগর নির্ম্মাণ—

কম্যুনিটি ডেভালপমেণ্ট প্রজেক্ট বা গ্রামে বেকার সমস্যা প্রভৃতি দূরীকরণ চেষ্টার সকল প্রতিষ্ঠার কাজ সমগ্র ভারতে আরম্ভ হইয়াছে—পশ্চিম বাংলায় ৮টি কেন্দ্রে পূর্ব্বেই এই

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও মনোরম ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন

রেক্সোনার ক্যাডিলযুক্ত ফেনা আপনার গায়ে আস্তে আস্তে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো নির্ম্মল হ'য়ে উঠছে।

রেক্সোনা

ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান

★ ডক্টরদের ও কেমিস্টদের কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম

BP. 107-50 BQ

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর জন্য থেকে ভারতে প্রস্তুত

ভাবে সহর নির্মাণ কার্য্য সুরু হইয়াছিল। গত ২রা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সহর নির্মাণ বিভাগের ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ জানাইয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে আরও ৬টি কেন্দ্রে শীঘ্রই সহর নির্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট সে জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রথমে বীরভূমে ৩টি, বর্দ্ধমানে ২টি এবং ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় ১টি করিয়া কেন্দ্রে কাজ আরম্ভ হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য অতিরিক্ত চাল—

এ বৎসর উড়িষ্যা রাজ্যে প্রচুর ধান উৎপন্ন হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্বের বরাদ্দ ৩২৮০০ টন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত ২০ হাজার টন চাল দিতে সম্মত হইয়াছেন। তাহা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ২০ হাজার টন ধান পাইবে। উড়িষ্যায় গত বৎসরের দরুণ ২৭ হাজার টন চাউল মজুত আছে—এ বৎসরেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তিন লক্ষ টন চাউল সংগ্রহ করিবেন। উড়িষ্যার চাউল মাদ্রাজ, পশ্চিমবঙ্গ ও হিমাচলের কোটিনকে দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পশ্চিম বাংলার লোক কি প্রয়োজনানুরূপ চাউল পাইবে?

পশ্চিমবঙ্গে তুলা-উৎপাদন—

১৯৪২-৪৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে যে সকল কৃষক তুলার চাষে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়া নদীয়া জেলার তিহুলী গ্রামনিবাসী শ্রীকৃষ্ণকুমার পাহুলী প্রথম পুরস্কার ১৫০ টাকা লাভ করিয়াছেন—তিনি প্রতি একরে ২৯ মণ ৪ সের ১২ ছটাক তুলা উৎপন্ন করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের শ্রীকমলাকান্ত কর্মকার, বীরভূম বাঁকুড়ার শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, মেদিনীপুরের শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ ও উত্তরাঞ্চলের শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র শর্মা প্রত্যেকে ১৫০ টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। ৪ জনকে ১০০ টাকা করিয়াও পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে পশ্চিমবঙ্গে তুলার চাষ বাড়িয়া গেলেই মঙ্গলের কথা।

নূতন পালিত অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার পালিত অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার স্থলে সম্প্রতি ডাঃ বি-ডি-নাথ চৌধুরী নূতন পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ সাহা এখন বিজ্ঞান গবেষণার ভারতীয় পরিষদের পরিচালক পদে নিযুক্ত আছেন।

উদ্বাস্তুগণকে ব্যবসায়-ঋণ দান—

১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম তিন মাসের পশ্চিমবঙ্গের সহর ও গ্রামাঞ্চলের উদ্বাস্তুগণকে ব্যবসা ঋণ দানের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ ৬০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সহরাঞ্চলের ৬১৩২ পরিবার ও গ্রামাঞ্চলের ৪৩২০ পরিবার উপকৃত হইবে। পশ্চিমবঙ্গে আগত ৮৮৭১টি উদ্বাস্তু পরিবারকে পশ্চিমবঙ্গের ১৪টি জেলায় পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগ ১৯৪৩-৪৪ সালের প্রথম ৩ মাসে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কৃষক পরিবার স্থান পাইবে।

কংগ্রেসের শুভেচ্ছার নিদর্শন—

বিহারের ভাগলপুর পূর্ণিয়া নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে দিল্লীর লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচন বাতিল হওয়ায় ঐ স্থানে পুনরায় নির্ব্বাচন হইবে। কংগ্রেস পক্ষের প্রার্থীই ঐ স্থানে গতবার জয়লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আচার্য্য জে-বি-কৃপালনী ঐ স্থান হইতে প্রার্থী হওয়ায় কংগ্রেস ঐ স্থানের মনোনীত প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করিয়াছেন। আচার্য্য কৃপালনীর মত স্বদেশভক্ত নেতা কংগ্রেস দলের না হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রার্থী মনোনয়ন করা কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

পল্লী উন্নয়নে জনসহযোগিতা—

ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রি-সভা ভারতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সম্প্রতি অনুমোদন করিয়াছেন। উহা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রামে ইহার কাজ চলিবে। ইহাতে প্রায় ৮ কোটি গ্রামবাসী উপকৃত হইবে। সম্প্রসারণ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে কতকগুলি স্থান বাছিয়া লইয়া সেখানে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন কার্য্য চালান হইবে। ইহাতে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজকে স্থায়ী পল্লী-উন্নয়নের কাজে রূপান্তরিত করা হইবে। স্থানীয় অধিবাসীদের সহযোগিতা ও উৎসাহের উপর এই কার্য্যের ব্যাপকতা নির্ভর করিবে। সরকার পক্ষ এই কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতেছেন—সকল স্থানের অধিবাসীদের সেই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে ও পরমুখাপেক্ষী না হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট
সাবানের ফেনাতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP

S. 204-50 BG

ভারতে বিদেশী খাদ্য—

গত ১৩ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৯৯৯০০ টন খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী হইতে ঐ দিন পর্য্যন্ত সাড়ে ৪ মাসে বিদেশ হইতে ভারতে নিম্নলিখিতরূপ খাদ্য আমদানী করা হইয়াছে—গম—১৭১০০০ টন, ময়দা—২৩৭০০ টন, চাল—৮২৬০০টন ও মিলো ৯৮২০০ টন। এ বৎসরে দেশের মধ্যে মোট ১২৪৪৬০০ টন খাদ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ বিজয়—

গত ১লা জুন খবর পাওয়া যায়—৩৯ বৎসর বয়স্ক দার্জ্জিলিং নিবাসী ভারতীয় শেরপা তেনজিং ও বৃটীশ অভিযাত্রী দলের অন্যতম সদস্য নিউজিল্যাণ্ডের ৩৪ বৎসর বয়স্ক মিঃ হিলারী সাফল্যের সহিত হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা এভারেষ্টের উপর আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এভারেষ্ট বিজয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয় ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ও এ পর্য্যন্ত ১১ বার এই অভিযান হইয়াছে। গিরিশৃঙ্গে রাষ্ট্রসংঘ পতাকা, নেপালী পতাকা, বৃটীশ পতাকা ও ভারতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উড্ডীন করা হয়। তেনজিং দার্জ্জিলিংয়ের স্থায়ী অধিবাসী ১১টি অভিযানের মধ্যে ৭টির সহিত তিনি যোগদান করেন। তাঁহার পত্নী ও ২ কন্যা আছে। বৃটীশ মহারাণী এলিজাবেথ, ভারত সরকার ও ভারতের অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান তেনজিংকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মহারাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক —

গত ২রা জুন লণ্ডনে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে ক্যাণ্টারবারীর আর্চবিশপ কর্ত্তৃক ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যের ৭ হাজার প্রতিনিধি তথায় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু অন্যতম। ৬শত বৎসর ধরিয়া যে সিংহাসনে ইংলণ্ডের রাজাদের এই রাজ্যাভিষেক উৎসব হইয়াছিল, রাণী এলিজাবেথ সেই সিংহাসনে বসিয়াই উৎসব করেন। যে গির্জ্জায় এই উৎসব হইল, তাহাও হাজার বৎসরের পুরাতন। তাঁহার স্বামী এডিনবার্গের ডিউক মহারাণীর সঙ্গে ছিলেন—বাকিংহাম প্যালেস নামক যে গৃহে তাঁহারা বাস করেন, সেখান হইতে সিল্কাট মিছিলে তাঁহারা ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জ্জায় গমন করেন। বিলাতের এই প্রাচীন ধরণের উৎসব দেখিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশ হইতে হাজার হাজার লোক লণ্ডনে গিয়াছিলেন।

মেদিনীপুরে বিধানচন্দ্র রায়—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় গত ৭ই জুন মেদিনীপুরে যাইয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনের উদ্বোধন করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস, জেলা বোর্ড, পৌরসভা, জেলা স্কুল বোর্ড ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে ডাঃ রায়কে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। উত্তরে ডাঃ রায় বলিয়াছেন—কংগ্রেস সংগঠন প্রয়োজন, কংগ্রেস দল নহে—বাঁচিবার পথ—জীবনের প্রকাশ।

শ্রীযুত রাধারমণ গোস্বামী—

পশ্চিমবঙ্গের সমবায় দপ্তরের তরুণ কর্ম্মচারী শ্রীযুত রাধারমণ গোস্বামী সম্প্রতি ইস্রায়েল হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইস্রায়েল গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণ ক্রমে ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মনোনয়ন পাইয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সেখানে যৌথ-চাষবাস ও বহিরাগত-নিবাসন সম্পর্কে অনুশীলন করিতে গিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের অতিথি হিসাবে সমগ্র দেশের অসংখ্য সরকারী ও বে-

রাধারমণ গোস্বামী

সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছে এবং সমবায়-কৃষিপ্রণালী ও বহিরাগত-নিবাসন সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে তিনি প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। এদেশে সমস্যার অন্ত নাই; সমবায় কৃষির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ শ্রীযুত গোস্বামীর অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইলে যথেষ্ট কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। শ্রীযুত গোস্বামী ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের এক বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধা-সুরেশর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ ঃ

বাঙ্গালোরে রাজেন্দ্র সিংজী ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ১৯৭৩ সালের পুরুষদের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে সার্ভিসেস দল ১-০ গোলে পাঞ্জাব দলকে হারিয়ে এই প্রথম জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়নসীপ পেল। ইতিপূর্ব্বে মাদ্রাজে ১৯৭১ সালের ফাইনালে সার্ভিসেস দল ০-১ গোলে পাঞ্জাবের কাছে হেরেছিল। এই নিয়ে সার্ভিসেস-দলের দু'বার ফাইনালে খেলা হ'ল। অপর দিকে পাঞ্জাব দল ফাইনাল খেলেছে ১০ বার—তার মধ্যে চ্যাম্পিয়নসীপ পেয়েছে ৬ বার—উপর্যুপরি ৩ বার—১৯৪৯, ১৯৫০ এবং ১৯৫১ সালে। এত অধিকবার ফাইনালে খেলা, চ্যাম্পিয়ান-সীপ পাওয়া এবং উপর্যুপরি চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড একমাত্র পাঞ্জাবেরই। এই তিনটি বিষয়ে পাঞ্জাবের রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

আলোচ্য বছরে ১৭টি দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। মাত্র ২টি দল অনুপস্থিত থাকে। সার্ভিসেস দল তাদের প্রথম খেলা কোয়ার্টার ফাইনালে মধ্যভারতদলের সঙ্গে খেলা ড্র করে ১-১ গোলে। দ্বিতীয় দিন ১-০ গোলে জয়ী হয়। সেমি-ফাইনালে বোম্বাইকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়। অপর দিকে পাঞ্জাব প্রথম খেলায় ২-২ গোলে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিন ১-০ গোলে জয়ী হয়। সেমি-ফাইনালে ৪-১ গোলে হায়দ্রাবাদ দলকে হারিয়ে ফাইনালে সার্ভিসেস দলের সঙ্গে মিলিত হয়। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান বাংলা দল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের খেলায় ০-৩ গোলে বোম্বাই দলের কাছে হেরে যায়। প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের পরাজয়ের কারণ, তাদের দশ জন খেলোয়াড় নিয়ে খেলতে হয়েছে। খেলার ২১ মিনিটে বাংলা দলের রাইট ব্যাক রবি দাস আহত অবস্থায় মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'ন আর তারপরই ৬ মিনিটের মধ্যেই বোম্বাই ২টো গোল দেয়, তৃতীয় গোল হয় খেলা ভাঙ্গার মুখোমুখি সময়ে। বাংলা দল এ পর্য্যন্ত ৫ বার ফাইনাল খেলেছে, চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ৩ বার—১৯৩৬, ১৯৩৮ এবং ১৯৫১ সালে।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের বাইটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে বোম্বাইয়ের টাটা স্পোর্টস ক্লাব ২-১ গোলে নাগপুর ইউনাইটেডকে হারিয়ে তৃতীয় বার বাইটন কাপ বিজয়ী হয়েছে। ইতিপূর্ব্বে টাটা স্পোর্টস ক্লাব বাইটন কাপ পেয়েছে ১৯৩৯ এবং ১৯৫০ সালে। অপর দিকে নাগপুর ইউনাইটেড দলের পক্ষে বাইটন কাপের ফাইনালে এই প্রথম খেলা—মধ্যপ্রদেশ থেকে ইতিপূর্ব্বে আর কোন দল ফাইনালে ওঠে নি। টাটা স্পোর্টস ক্লাব সেমি-ফাইনালে ২-১ গোলে গতবারের ফাইনাল বিজয়ী মোহন-বাগান দলকে হারিয়ে আগের বছরের পরাজয়ের শোধ নেয়। অপর দিকের সেমি-ফাইনালে নাগপুর ইউনাইটেড দল ১-০ গোলে ইউ পিকে হারিয়ে ফাইনালে বোম্বাই দলের সঙ্গে খেলে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি ঝড় বৃষ্টির দরুণ খেলাটি পরিত্যক্ত হয়—এই সময় টাটা ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল।

ইংলণ্ড সফরে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল লিণ্ডসে হ্যাসেটের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলতে গেছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে ২০ বার ক্রিকেট সফর ক'রে গেছে। এর আগে শেষ সফর করেছে ১৯৪৮ সালে বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট ধুরন্ধর স্যর ব্রাডম্যানের নেতৃত্বে। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইংলণ্ড সফরে আসে ১৮৭৮ সালে, ডি ডবলউ গ্রেগরার নেতৃত্বে। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াতে প্রথম ক্রিকেট খেলতে যায় ১৮৬২ সালে—দলের অধিনায়ক ছিলেন এইচ ঈফেনসন। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়াতে সফর করেছে ২১ বার। উভয় দেশের মধ্যে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয় ১৮৭৭ সালের ১৫ই মার্চ্চ মেলবোর্নে। ইংলণ্ডের মাটিতে প্রথম টেষ্ট খেলা হয় ওভালে, ১৮৮০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর। আগামী ১১ই জুন নটিংহামে ট্রেণ্টব্রিজ ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৫১তম টেষ্ট সিরিজের প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হবে। এই খেলার আগে পর্য্যন্ত উভয় দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত টেষ্ট সিরিজ এবং টেষ্ট খেলার ফলাফল নিম্নে দেওয়া হ'ল—

টেষ্ট সিরিজের ফলাফল

	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট সিরিজ
ইংলণ্ডে	১০	৮	১	১৯
অষ্ট্রেলিয়াতে	৮	১১	২	২১
মোট :	১৮	১৯	৩	৪০

টেষ্ট খেলার ফলাফল

	ইংলণ্ড জয়ী	অষ্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংলণ্ডে	২১	২০	৩০	৭১
অষ্ট্রেলিয়াতে	৫৫	৪৮	৪	৮৭
মোট :	৪৬	৬৮	৩৪	১৫৮

নটিংহামে ট্রেণ্টব্রিজ ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৮টি টেষ্ট খেলায় প্রতিষ্ঠিত বিবিধ রেকর্ড

	ইংলণ্ডের পক্ষে	অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে
দলগত সর্ব্বোচ্চ রান		
	৬৫৮।৮ উইঃ ডিক্লেঃ); ১৯৩৮	৫০৯ রান ; ১৯৬৮
দলগত সর্ব্বনিম্ন রান		
	১১২ রান ; ১৯২১	১৬৬ রান ; ১৯৩০
ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রান		
	২১৬০—পেণ্টার ; ১৯০৮	২৩২—এস ম্যাকেব ; ১৯০৮
সেঞ্চুরী সংখ্যা :	৬টি	৬টি

আলোচ্য সফরে এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল অপরাজেয় আছে। ১২টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার ৭টি জয় (৬টি খেলায় ইনিংস জয়), ৫টি খেলা ড্র গেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরী ১১টি। নীল হার্ভে করেছেন ৫টি, সর্ব্বোচ্চ রান ২০২ ; কিথ মিলার ২টি, সর্ব্বোচ্চ রান নট আউট ২২০।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে মাত্র ১টা সেঞ্চুরী, ১২২-কেনিয়ন।

ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকা ঃ

অল্ ইণ্ডিয়া ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের নামের ক্রমপর্য্যায় তালিকায় নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ স্থান পেয়েছেন।

সিঙ্গলস—(১) ত্রিলোকনাথ শেঠ (ইউ পি), (২) অমৃতলাল দেওয়ান (দিল্লী), (৩) দেবীন্দর মোহন (বোম্বাই), (৪) মনোজ গুহ (বাংলা), (৫) হেনরী ফেরীরা (বোম্বাই), (৬) গুরু প্রসাদ (পাঞ্জাব)।

ডবলস—(১) দেবীন্দর মোহন এবং হেনরী ফেরীরা (বোম্বাই), (২) এন নটেকার এবং ডি এন ধোনগাঁদে, (৩) অমৃতলাল দেওয়ান এবং সি এল মদন (দিল্লী)।

১৯৫৩ সালের ইংলিশ ফুটবল ঃ

এফ এ কাপ—ইংলণ্ডের ফুটবল এসোসিয়েশন কাপের ফাইনালে ব্লাকপুল ৪-৩ গোলে বোল্টন ওয়াণ্ডারার্স দলকে হারিয়েছে।

প্রথম বিভাগ লীগ—আর্সেনাল (চ্যাম্পিয়ান)

মুষ্টি যুদ্ধে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব ঃ

ইণ্টার ন্যাশানাল বক্সিং কংগ্রেস কর্তৃক সমর্থিত 'ইণ্টার ন্যাশানাল কমিটি' মুষ্টি যুদ্ধের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত যোদ্ধাদের বিশ্বমুষ্টি যোদ্ধা হিসাবে অনুমোদন করেছেন।

হেভী ওয়েট—রকি মার্শিয়ানো (আমেরিকা)
লাইট হেভী ওয়েট—আর্চি মুর (আমেরিকা)
মিডল ওয়েট—খেতাব শূন্য
ওয়াল্টার ওয়েট—কিড্ গ্যাভিলান (কুবা)
লাইট ওয়েট—জেমস কার্টার (আমেরিকা)
ফেদার ওয়েট—জাডি জাড্‌লার (আমেরিকা)
ব্যামটম ওয়েট—জিমী কারথার্স (অষ্ট্রেলিয়া)
ফ্লাই ওয়েট—ইয়োশিয়ো সিরাই (জাপান)

ফুটবল লীগ খেলা ঃ

ক'লকাতার ফুটবল মাঠে দর্শকদের ভীড় বেশ জমে উঠেছে। টিকিটের অপেক্ষায় মানুষের লম্বা সারির পর সারি, মাঠের ধারে পাশের গাছগুলোতে মানুষের অভিযান দেখলে স্বীকার করতেই হবে ফুটবল খেলা দেখার আকর্ষণ বেড়েছে বৈ কমেনি। কয়েক বছর ফুটবল খেলাটা এমনই দলীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, খেলার মাঠের দর্শকদের ভীড় দিয়ে খেলার গুণাগুণ বিচার করা যায় না। দলের সমর্থকেরা গোড়ামি এবং কতকটা অভ্যাসবশে মাঠে খেলা দেখতে যান ; তাঁদের উপর খেলার ভাল-মন্দের প্রভাব যদি থাকতো তাহলে এ মরসুমে খেলার নমুনা দেখার পর মাঠে লোকে এত কায়িক পরিশ্রম সহ্য ক'রে কিম্বা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে গাছে চড়ে খেলা দেখতেন না। অবস্থাপন্ন নামকরা ক্লাবগুলি বাংলার বাইরে থেকে যে সব তৈরী খেলোয়াড় আমদানী করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন যা ভাল খেলছেন। পুরোণো নামকরা খেলোয়াড়দের খেলাও পড়ে গেছে, দু'একজন বাদ।

এ মরসুমে লীগের দুটি খেলায় রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর দর্শক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কালীঘাটের বিপক্ষে মোহনবাগানের গোল নাকচ করায় এবং খিদিরপুর দলের বিপক্ষে মহমেডান দলের কোন খেলোয়াড়ের উপর অফ্‌সাইড আইন প্রয়োগ করায় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দুই ক্লাবের কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছেন। খেলার মাঠে এই ধরণের বিক্ষোভ কোন সভ্য সমাজ অনুমোদন করে না। রেফারীর কোন ভুল সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ভার ক্লাব কর্তৃপক্ষের উপর দিলে মাঠের আবহাওয়া এ ভাবে দূষিত হয় না ; মহমেডান স্পোর্টিং দলের একশ্রেণীর সমর্থক রীতিমত গণ্ডগোল আরম্ভ করে বার ফলে কয়েকজন নিরীহ দর্শক এবং ভ্রমণবিলাসী ভদ্রলোককে আহত অবস্থায় হাসপাতালে যেতে হয়।

ফুটবল লীগের খেলার আলোচনায় আসা যাক্। ১০ই জুন পর্য্যন্ত প্রথম বিভাগের যতগুলি খেলা হয়েছে তার ফলাফলের উপর লীগ তালিকার শীর্ষস্থানে আছে মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স। দুই দলের সমান ১০টা খেলায় ১৬ পয়েন্ট। দুই দলেরই জয় ৬টা, খেলা ড্র ৪টে, কোন খেলায় এ পর্য্যন্ত হার হয়নি। মোহনবাগান খেলা ড্র করেছে ৪টে—কালীঘাট, এরিয়ান্স, রাজস্থান এবং ওয়াড়ীর সঙ্গে। গোল এভারেজ ভাল থাকায় শীর্ষস্থান পেয়েছে।

গত বছরের লীগচ্যাম্পিয়ান ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৯টা খেলায় ১৪ পয়েন্ট পেয়ে ২য় স্থানে আছে—জয় ৬টা, ড্র ২টো—মহমেডান স্পোর্টিং এবং ওয়াড়ীর সঙ্গে এবং হার ১টা—ভবানীপুরের কাছে ০-১ গোলে। রাজস্থান আছে ৩য় স্থানে, ৮টা খেলায় ১২ পয়েন্ট, কোন খেলায় হার হয়নি। লীগের খেলায় এ পর্য্যন্ত তিনটি দল অপরাজেয় আছে, মোহনবাগান, এরিয়ান্স এবং রাজস্থান। লীগচ্যাম্পিয়ানসীপের পথ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, এরিয়ান্স এবং রাজস্থান এই চারটি দলেরই কাছে এখনও সমান উন্মুক্ত আছে ; প্রতি বছরের মত এবারও লীগের খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফল দাঁড়িয়েছে। তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে এরিয়ান্স দল মোহনবাগানের সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা ড্র করেছে, মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে। কালীঘাট এবং ওয়াড়ী মোহনবাগানের সঙ্গে খেলা ড্র করেছে ; ইস্টবেঙ্গল ও ওয়াড়ীর খেলা ১-১ গোলে ড্র গেছে। ভবানীপুর ১-০ গোলে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েছে। জয়লাভ না করতে পারলেও ভাল খেলেছে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং রাজস্থানের বিপক্ষে ওয়াড়ী। রাজস্থান-স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং ডালহৌসি-এরিয়ান্সের খেলা গোলশূন্য ড্র গেছে।

লীগের খেলায় প্রথম চারটি দল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পঃ
মোহনবাগান	১০	৬	৪	০	১৭	৩	১৬
এরিয়ান্স	১০	৬	৪	০	১২	৪	১৬
ইস্টবেঙ্গল	৯	৬	২	১	১৪	৫	১৪
রাজস্থান	৮	৪	৪	০	৯	২	১২

১৯৫৩ সালের প্রথম বিভাগের
হকি লীগ চ্যাম্পিয়ান
ভবানীপুর ক্লাব

ফটো : কে কে সাহার

সাহিত্য-সংবাদ

[illegible] [illegible] প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "কাহার জন্যেই" [illegible] —২।০

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়ার পথে"—২।

ডাঃ বিধুভূষণ [illegible] প্রণীত "মোহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কার" [illegible]—১।০

[illegible] প্রণীত "[illegible]" [illegible]—১।০

[illegible] প্রণীত নাটক "[illegible]" [illegible]—১।

[illegible] প্রণীত "[illegible]"—২।০

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত রামায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
"মধ্যযুগ-সন্ধিক্ষণ"—১৲

ডাঃ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস
"[illegible]"—১।০

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত রহস্যোপন্যাস "[illegible]"—১৲

[illegible] প্রণীত রহস্যোপন্যাস "[illegible]"—২৲, "[illegible]"
১৲, "[illegible]"—১৲, "[illegible]"—১

ডাঃ [illegible] প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—১।০

ইন্দুবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—২।

ঐতিহাসিক উপন্যাস "[illegible]"—২।

[illegible] প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—২৲

[illegible] প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—২৲

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—১।০

প্রমোদকুমার সান্যাল প্রণীত গল্প গ্রন্থ "[illegible]"

ডাঃ [illegible] প্রণীত "[illegible]"—২।

অমিত মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "[illegible]"—২৲

ডাঃ সুখোপাধ্যায় প্রণীত "[illegible]" ও দুইক গাঙ্গুলী—৷৵০

শৈলেন্দ্রকুমার পাল প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "[illegible]"—৸০

[illegible] প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "[illegible]"—২৲

ডাঃ [illegible] প্রণীত "[illegible]" ১ম খণ্ড—২।০

ডাঃ [illegible] প্রণীত "[illegible]" ও ডাঃ [illegible] গ্রন্থে বিজ্ঞানকক্ষ"—৷৵০

ডাঃ [illegible] প্রণীত কাব্য গ্রন্থ "[illegible]"—১।০

[illegible] প্রণীত গল্প গ্রন্থ "[illegible]"—।০

[illegible] প্রণীত উপন্যাস "[illegible]"—৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৷৪।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

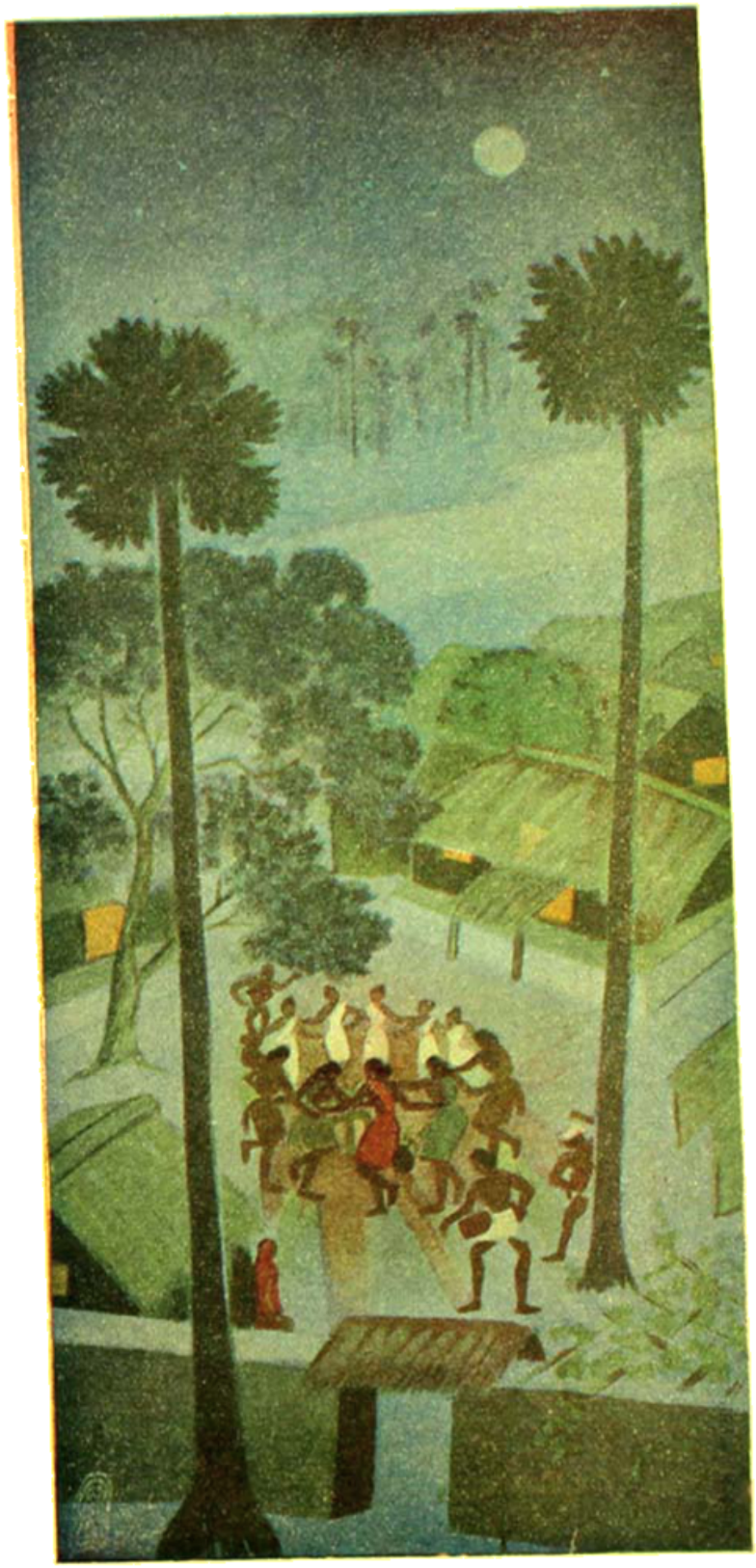

সাঁওতালী নৃত্য

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম-এ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পূর্ণকুম্ভ

শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

শ্রাবণ—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

যান্ত্রিকশক্তির ব্যবহার

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাত্র ২৫০ বছর পূর্ব্বে ইউরোপের সমগ্র দেশ খণ্ড খণ্ড গ্রামে ভাগ হইয়াছিল এবং আমেরিকা ছিল এক বৃহৎ অরণ্য। আজ এই দুই মহাদেশ শিল্পসম্ভারের রাজ্য। অন্য দেশের কাঁচা মাল এইখানে যন্ত্রদানবের সাহায্যে রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে চালান যায়। এই দুই দেশের লোক খায় ভাল, পরে ভাল, থাকে সুখে ও আমোদ আহ্লাদের অবসর পায়।

এই সব দেশ শক্তি-উৎপাদনের ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতির ও মানুষের চেহারা বদ্‌লাইয়া দিয়াছে, মূক প্রকৃতি মানুষের সেবায় নিজেকে অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছে। প্রচুর শক্তি আয়ত্তে আনিয়া এই দেশগুলি তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়া কারখানা বসাইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমানের শিল্পপণ্য ও জাতীয় ধনবলের উৎস এই শক্তির প্রাচুর্য্য। এই শক্তি—বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক যে কোনও রকমেরই হউক না কেন—মানুষের সাহায্যে অসংখ্য নির্ব্বাক শ্রান্তিহীন ভৃত্য সৃজন করিয়াছে।

এই শক্তির আধার প্রায় সব দেশেই বর্ত্তমান। তাহাকে সন্ধান করিয়া কার্য্যে নিয়োগ করিবার ভার রাষ্ট্রের ও শিল্পের কর্ণধারদের। কিন্তু এই শক্তি দিয়া যদি কেবল কারখানা তৈয়ারী হয় তাহা হইলেই কি আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিয়া যাইবে? না, কেবল কারখানা কোন জাতির জীবনের সম্বল হইতে পারে না। প্রতিটি মানুষের জীবনে তাহার কার্য্যক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। নিজের দেহের শক্তি ও সামর্থ্যের সাহায্যে মানুষ তাহার বর্ত্তমান জীবনের সব প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম। তাহার প্রয়োজন খালি উত্তরীয় ও আতপতণ্ডুল নয়। বিরাট পরিবেশে তাহাকে বাঁচিতে হইলে তাহার বহু জিনিষের প্রয়োজন, বহু ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। জীবনটা একটা সংগ্রাম এবং আমৃত্যু এই সংগ্রামের বিরতি নাই। এই জন্য সমাজময় প্রস্তুতি দরকার। এটম বোমা বা এরোপ্লেন তৈয়ারীর কর্ম্মকৌশল নয়। নানা

ছোট ছোট জিনিষ দিয়া জীবনকে সুখী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা চাই।

আমাদের খাদ্যের মাপ কত শক্তি জোগান দিতে পারে সেই হিসাবে হয়। ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার লোকেরা প্রতিদিন ৩০০০ ক্যালোরিসম্পন্ন আহার্য্য পায়। ভারতবর্ষে সেই হিসাবে আমাদের দৈনিক আহার ১৫০০ ক্যালোরির বেশী শক্তি সরবরাহ করিতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকই সেই জন্য ক্ষীণদেহ বা চিরদুর্ব্বল। এই হিসাব অবশ্য এক গড় হিসাব। কারণ ভারতে কিছু পরিবার নিশ্চয়ই বিদেশীখানা বা সমতুল্য খানা খাইয়া থাকেন। আয়ুষ্কাল লোকের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সকলেই জানেন যে আমাদের গড়ে আয়ু ৩০ বৎসর এবং আমাদের দ্বিগুণ আয়ু ইউরোপ-আমেরিকার যে কোন দেশের লোকের। খাদ্যের উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে এবং সেই হেতু সাধারণ লোকের উন্নতি তাহার আহারের রীতি তথা স্বাস্থ্যরক্ষার নীতির উপর নির্ভরশীল। এই জীবনযাত্রার মান শরীরের শক্তি বাদ দিয়া যান্ত্রিক শক্তির মাথাপিছু খরচের হিসাবেও মাপা যায়।

এক টন কয়লা ১০,০০০ অশ্বশক্তি বা ৭৫০০ ইলেকট্রিক ইউনিটের শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক টন কয়লা হইতে আমরা যা শক্তি পাই তাহা হইতেছে ১০০০ ইউনিট। চলতি ব্যাপারে ১০০০ ইলেকট্রিক হীটার একঘণ্টা যদি জ্বলে তাহাদের সমান উত্তাপ এক টন কয়লা হইতে পাই। দেশে দেশে আজ যান-বাহনে—কারখানায় ও ঘরের কাজে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তাহার মাপে প্রতি দেশের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। এক টন কয়লার প্রকৃত শক্তিকে মাপ করিলে আমেরিকার প্রতি লোক বৎসরে ১০ টন কয়লা খরচ করে। ইংল্যাণ্ডে ৪ টন ও সারা পৃথিবীর গড়পড়তা ২ টন। কিন্তু ভারতে ও এশিয়ার প্রায় সব দেশে এই মাপকাঠিতে মানুষ মাত্র আধ টনেরও কম কয়লার শক্তি তাহার কাজকর্ম্মের জন্য পায়। এই শক্তির মাপে উন্নত ও অনুন্নতের তফাৎ ২০ গুণ। এই শক্তির ব্যবহারে এক আমেরিকান বৎসরে ৬,৫০০ টাকা উপায় করে, ইংরেজ ৩,০০০ টাকা এবং আমরা ৩০০ টাকা। এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট দেশের লোক পরস্পর ২০ ধাপ নীচে। এই বিভেদ শক্তি-উৎপাদনের মূলে নিহিত।

ইহা হইতে মনে হইবে যে প্রাকৃতিক শক্তি মানুষ কতটা ব্যবহার করিতে পারে তাহার মূলে আছে আর্থিক সচ্ছলতা। এই সঙ্গে সাধারণ লোকের আর একটা ধারণা আছে যে স্বাস্থ্য ও আয়ু নির্ভর করে কেবল খাদ্যের উপর। প্রাকৃতিক শক্তির সরবরাহ ও সংযোগে জীবনযাত্রার নীতিতে বা রীতিতে কোন ব্যতিক্রম আনা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য-আয়ু-খাদ্য এই সবের হিসাবটা পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু সংখ্যার মাপকাঠিটা সমগ্র জীবনের অবস্থাকে সঠিক বিশ্লেষণ করিতে পারে না।

আমাদের আহারের একটা সীমা আছে, যতই ভাল খাইনা কেন, আয়ুকে অসীমকালে ঠেলিবার কোন পথ বাহির হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান পৃথিবীতে বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির বিবিধ ব্যবহারে জীবনোপভোগের সম্ভার নিত্য নূতন সৃষ্টি হইতেছে। এই বিচারে সভ্যতার বিকাশের মাপকাঠি দাঁড়াইয়াছে শক্তি সঞ্চারে ও তাহার প্রয়োগে। জীবনযাত্রার উন্নতি ও সমাজের কাজে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধ। ধনবল এই দুইয়ের যোগসূত্র এবং অর্থাগম পরস্পরের যুগ্ম ফল।

ঘরে ঘরে আলাদীনের প্রদীপের মত নানা কাজে শক্তিকে লাগাইয়া ইউরোপের ও আমেরিকার লোকের জীবনের ধারা বদলাইয়া গিয়াছে। কলের জোরে বিস্তীর্ণ ভূমিতে চাষ, সেচ, সার দেওয়া ও ফসল কাটা হইতেছে। শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া উৎপন্ন খাদ্যের সংরক্ষণ ও নানা প্রকরণ তৈয়ারী হইয়া সারা বৎসরের জন্য রসদ মজুত থাকিতেছে। পরিষ্কার পরিবেশ, রোগাক্রান্ত স্থান পরিশোধন ও রোগ নিরাময়ের জন্য শক্তিশালী কারখানায় প্রস্তুত নানাবিধ ঔষধ ব্যবহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে। কর্ম্মব্যস্ত দিনের পর বিশ্রাম ও চিত্ত বিনোদনের জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা জীবনকে সুখী করিয়াছে। যন্ত্রের সাহায্যে দৈনন্দিন কাজও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। বহু শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে কর্ম্মক্ষম লোকের অর্থের সংস্থান হইয়াছে এবং সারা দেশময় লোকের কর্ম্ম চাঞ্চল্য ও জীবনের আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া চলিয়াছে।

নানা দিক হইতে নূতন কর্ম্মপ্রেরণা ও যোজনা মিলিয়া যে নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা হইতে আমরা বহুদূরে পিছিয়ে রহিয়া আছি। আমাদের চাষী যে শক্তির অধিকারী তাহার ½ অংশ তাহার (ভাল বলদের শক্তি

সমেত) হাত-পায়ের পেশীর ও বাকী ½ অংশ যন্ত্র বা বিদ্যুতের আধার হইবে। সমগ্র দেশের কলকারখানায় ব্যবহৃত শক্তির খতিয়ানে এই মাথাপিছু হিসাব কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রের সঠিক পরিচয় নয়। চাষী নিজের ও হাল-বলদের গায়ের জোরে তাহার জীবনের প্রয়োজন মিটায়। সে আর কোন বাহিরের শক্তির সাহায্য পায় না। তাহার জীবনে অর্ধাশন ও অনশন, ছিন্ন বসন ও ভূমিশয্যা এবং জীর্ণ কুটীর ছাড়া আর কিছু মিলে না। শিক্ষার আলো, রোগ হইতে মুক্তি এবং মনের আনন্দ তাহার নাই। প্রাকৃতিক শক্তি শিল্পের প্রয়োজন মিটাইতে পারে কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নিষ্ফল, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। অন্যদিকে সমাজের সুখী লোকদের অনাবশ্যক মনোরঞ্জনের জন্য সস্তার সৃষ্টি বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক শক্তির উদ্দেশ্য নয়। যত্র তত্র ভ্রমণ, রং বেরংয়ের কাপড় বা নৃত্য গীতের মঞ্চসজ্জা ইত্যাদির প্রয়োজনের চাপে বিদেশে শক্তির উদ্ভব ও ক্ষয় সূচিত হয় নাই।

প্রাকৃতিক শক্তিকে ঘরে ঘরে কাজে লাগাইতে না পারিলে কোন পাঁচসালা বন্দোবস্ত দেশের লোকের চোখে মুখে হাসি ফুটাইতে পারিবে না। গ্রামে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ আমাদের চোখের সামনে মহীশূর রাজ্যে আছে। এই বৈদ্যুতিক শক্তির বিস্তার আমাদের দেশের লোকেরাই করিয়াছিলেন, ভারত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ কোন বিশেষজ্ঞ আনাইয়া তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার লোক-মনোরঞ্জক রচনা লিখনে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে।

শিল্পের প্রয়োজনের তাগিদেই ইউরোপ-আমেরিকায় শক্তির সন্ধান ও বিকাশ হইয়াছে এই কথা সত্য, কিন্তু ইহাই শক্তি-যোগের সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, সেখানকার মানুষ তাহার নিজের শ্রম লাঘব করিয়াছে। যখন আমরা আমাদের দেশে শক্তি সঞ্চারের কথা বলি তখন কারখানার প্রয়োজনটাই বড় কথা নয়, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিলে আর্থিক সাধনার পথ সফল হইতে পারে বোধ হয়, কিন্তু দেহের বল বয়সের সঙ্গে কমিয়া যায় এবং তাহার উপর অসমর্থ দেহের ক্ষমতাকে নিংড়াইয়া বাহির করিয়া বেশী দিন দেহকে প্রাণবন্ত রাখা যায় না, চাষের কাজে, ঘরের কাজে, যানবাহনের জন্য যান্ত্রিক শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, যে যন্ত্র নিজের দেশের মাল-মসলা দিয়া চালান যায় এই রকম শক্তি সঞ্চারই আশু প্রয়োজন। পেট্রোল-ডিজেলতেল-চালিত এঞ্জিনের যন্ত্র ব্যবহার ব্যয়সাধ্য ও মেরামতীতে অনেক দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। চিনির কলের ছুবড়ায়, কাঠ ও কয়লা-চালিত যন্ত্র এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈদ্যুতিক শক্তিতাড়িত যন্ত্র আমাদের সহরে ও পল্লীতে জনপ্রিয় করিয়া তোলা দরকার।

যুদ্ধের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের খাদ্যশস্য বাড়াইবার তাগিদে যন্ত্রের সাহায্য নিয়া (ট্রাক্টর ও হারভেষ্টার) একজন চাষী তিনগুণ শক্তির অধিকারী হইয়াছে। অনেক লোককে যুদ্ধের কাজে যোগ দিবার জন্য ক্ষেত খামার ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। ১০ বছরে ট্রাক্টরের সংখ্যা বাড়িয়াছে চারিগুণ এবং হারভেষ্টারের (ফসল কাটা ও ঝাড়াই) সংখ্যা বাড়িয়াছে ১১ গুণ। চাষীর আয় বাড়িয়াছে—সে নিজের খাটুনীর সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে বহুগুণ বেশী জমি চাষ বা দেখাশুনা করিতে পারে! রাসায়নিক সার ও অনিষ্টকারী পোকা ও আগাছার ওষুধের সাহায্যে বিদেশের চাষীর পক্ষে দিগন্তবিস্তৃত জমিকে শস্যোৎপাদনের উপযোগী ও পরিষ্কার রাখা সহজ হইয়া গিয়াছে।

চাষের উন্নতির মূলে তাই নানা যন্ত্রপাতি, বাঁধ-নালা ও ঔষধ সারের সম্ভার চাই। হিসাবে দেখা যায় ১২ টাকা চাষের উন্নতির জন্য খরচ করিতে হইলেও সেই সঙ্গে উন্নত কৃষি ব্যবস্থাকে স্থায়ী করিতে হইলে ৫০ টাকা শিল্প-যোজনায় খরচ করা প্রয়োজন। চাষীকে প্রথমে শিখাইতে হইবে নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কম দৈহিক পরিশ্রমে কি ব্যবস্থার সাহায্যে ফসল বাড়ান যায়। নূতন জিনিসের ব্যবহারে তাহার নিজস্ব চিন্তা বুদ্ধির পরিধি নূতন দিকে প্রকাশ পাইবে। তাহার প্রয়োজনের বশে শক্তির সঞ্চার হইলে যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর কারখানা বিস্তার লাভ করিবে। এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহাদের প্রস্তুত যন্ত্রপাতির ব্যবহার সরকারী অর্থে পুষ্ট বিদেশী যন্ত্রপাতি প্রচারের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। আমরা যেন আমেরিকা দেশকে উঠাইয়া আনিয়া এই দেশে বসাইতে চাই!

কোনও উন্নতি-সাধক ব্যবস্থার গোড়ার কথা হইতেছে উন্নতির কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা, সেই কেন্দ্রের উন্নতির সোপান ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সাজান থাকে। এই সোপান শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর যোগসাধন ও পরিপোষণের উপর কল্পিত ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর

করে। "ফসল বাড়াও" এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে কত কাজ। পুস্তিকা বিতরণ ও সচিত্র বিজ্ঞাপনের প্রদর্শনী জমিতেযাও ছড়াইতে পারে না। জমিতে পায়খানা দেওয়া হইতে সুরু করিয়া তাহাতে জলের ব্যবস্থা, সার ও বীজ সংগ্রহ, রোপণ ও শস্য কর্তন এবং সর্ব্বশেষে শস্যের বিক্রয় ব্যবস্থা এই সব কাজে চাষীকে সাহায্য করা প্রয়োজন। এই কাজগুলি মালার সূতোর মত গাঁথিয়া দিলে জমির ফসল বাড়িতে পারে। মাঝপথে উঁকি মারিয়া ফাঁকে ফোড়াতালি দিয়া এই কাজ ফলপ্রসূ হইতে পারে না। একটু চিন্তা করিলেই ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে গ্রামের ও ক্ষেতের মধ্যে চলাচলের রাস্তা, যানবাহনের ব্যবস্থা, পুকুর-নালা কাটান ইত্যাদিতে শক্তির প্রয়োজন। নদীতে বাঁধ বাঁধিয়া প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারের ব্যবস্থা করিলেই আপনা আপনি গ্রামে গ্রামে এই শক্তি ব্যবহারের জন্য গ্রামের চাষীর স্পৃহা বাড়িবে না। তাহাকে নিজের চোখের সামনে ফল না দেখাইতে পারিলে তাহার পুরাতন রীতি-নীতি সে আঁকড়াইয়া থাকিবে, সমাজের সর্বস্তরের জীবনে শক্তির প্রয়োগ শিখাইতে হইবে এবং এই শক্তির ব্যবহারে লোকের নিজস্ব সামর্থ্য ও কর্ম প্রেরণা দেশের বিত্ত বাড়াইবে।

কোন সান্ত্বনা আজিকার দিনে ভুলাবার মত নয়

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীর আজ অতি দুর্দ্দিন চাল ভেঙে তরী ডোবে,
দীপের রেখাও সুদূরে মিলায়ে যায়।
জীবন কথা আজ সমুদ্রে উন্মাদ হোলো ক্ষোভে,
রাতের ছায়ায় মানুষেরা অসহায়।
ধাবিত মানব ভবিষ্যতের পানে
চেয়ে চেয়ে ভাবে, রাত্রি হবে কি শেষ!
অতীতের বাণী ছায়া মূর্ত্তির মত
রূপরেখা টেনে এসেছে বর্ত্তমানে।
সুপশান্তির কোথা পাবো নির্দ্দেশ!
দুঃস্বপনের বিভীষিকা জাগে যত:
রুদ্ধ বটের ক্রন্দন শুনি, বনস্পতিরা মৃত;
ভেঙে পড়ে ঘন-অরণ্যশাখা জনতা হোলো কি ভীত?

পথে প্রান্তরে পার্থিব স্মৃতি দুর্বিষহ রাত্রি মাঝে
কেন প্রেতায়িত! শঙ্কা জাগায় মনে!
ভাঙা আকাশে চাঁদ ডুবে গেছে, তুমি নাহি মোর কাছে,
বিজলী চমকে তামসী মেঘের সনে।
অস্থির দিনে মুখোমুখি দেখা কবে,
সেদিন ছিল না ভালোবাসিবার কথা।
মন্থর ক্ষণে ক্লান্তির পাখা মেলে
কামনা বিহগ চেয়ে ছিল নীল নভে,
সেদিন কেঁপেছে হৃদি অরণ্য লতা।
লঘু চঞ্চল কুসুমের মত এলে
লাবণ্য ধারায় গাহন করিয়া ওগো মণি কুন্তলা!
যে কথা আমার ছিল বলিবার, সেদিন হয় নি বলা।

মণি কুন্তলা! প্রাণের চেয়ে কি চোরাবালি ঘিরে রয়?
বেথায় সতত মরণের আনাগোনা।
কোন সান্ত্বনা আজিকার দিনে ভুলাবার মত নয়,
আকাশ কুসুমে মিছে প্রেম আরাধনা।
বরণ বিভায় দিনের বিভাবরী
এসে ফিরে গেছে কত অভিমান করে!
বিরহ প্রদীপ ভগ্ন কুটীরে জ্বেলে
বসে আছি একা নয়নে অশ্রু ভরি!
এত বিষাদের মাঝখানে যদি গুণ্ঠন খুলি মোরে
ইতিহাস-ছেঁড়া দলিত পত্র তলে
শুনাতে তোমার শুভ সাধনার গান!
আমার কুটীরে হয় তো হোতো গো দুঃখের অবসান।
অকথিত যত ভাবনা আমার কেন হোলো দুঃসহ
কাজল প্রহরে কোথা আছ মোরে কহ?

টান

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

মানুষের দেহে শিরা উপশিরার মত ভারতের বুক চিরে চিরে রেল লাইন কোথায় না গেছে? গেছে মহদাকে ছুঁয়েও। মহদা একটা ষ্টেশন।

জায়গাটা ছোট। ষ্টেশনটীও ছোট। আপ্ ডাউন মিলে চারখানা মাত্র গাড়ী। ঐ চারখানা গাড়ীর জন্যই ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় ষ্টেশন মাষ্টার মৃণালের। ডিউটীর পরে যে কারো সঙ্গে মিশবে তার যো নেই। সব অবাঙালী। নিজের মনে চাকরীর উপর একটা ঘৃণা ধরে গেছে তা'র। বনবাস! মরুবাসী!!

ভোরের ট্রেণখানা এসে থামলো ষ্টেশনে। আধ মিনিট থাকে। মালপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না বীথির সঙ্গে। রোগা স্বামী প্রভাসকে ধরাধরি ক'রে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল প্লাটফর্মে।

ওদের যাওয়ার কথা ছিল এই লাইনের শেষ ষ্টেশন পর্য্যন্ত। ওখানে বীথির একজন ডাক্তার আত্মীয় থাকে তা'র কাছে। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, তা'তে ট্রেণে ছিল খুব ভিড়। তদুপরি রোগের চাতে প'ড়ে আধখানা মানুষ প্রভাস। সারাটা রাত বসে কাটিয়ে অত্যন্ত অসুস্থবোধ করতে লাগল। ট্রেণের ধকল খেয়ে খেয়ে আর কিছুতেই এগোতে চাইল না সে। বীথিকে বল্ল, আর যে পারছি না। টিকেটের মায়া ছাড়ো, নেমে পড় সাম্নের ষ্টেশনেই।

বীথি জানে প্রভাসকে। অসুবিধার শেষ সীমায় না এলে কোনদিনই নিজের এতটুকু অসুবিধার কথা সে কারোর কাছে প্রকাশ করে না। কাজেই ওরা নেমে পড়ল মহদায়। ষ্টেশন যখন—থাকবার জায়গা একটা পাওয়া যাবেই। দু'দিন বিশ্রাম ক'রে পরে যাওয়া যাবে বাকী পথ।

ষ্টেশনের গায়ে তখন বাজার বসেছে। সব জিনিষ সস্তা! বীথি দুধ কিনল আর কিনল কিছু ফল। সঙ্গে ষ্টোভ ছিল। প্রাথমিক অসুবিধা ওদের হ'ল না, কিন্তু হতাশ হতে হ'ল পরে। কোন হোটেল নেই ওখানে। ওয়েটিং রুম যা' আছে তা' শুধু নামেই। এক বিপদ এড়াতে আর এক মহাবিপদে পড়ল বীথি।

বেলা তখন দুপুরের কোঠায়। একখানা ডাউন ট্রেণ আসার সময় হ'য়েছে তখন। প্লাটফর্মে পায়চারি করছিল মৃণাল। সকালের ট্রেণে নেমে ওরা তখনও ওখানে কেন জানবার জন্য ইচ্ছা হ'ল তা'র। মৃণাল এগিয়ে গেল ওদের কাছে—আপনারা এখনও এখানে?

কোথায় যাব বলুন। এখানে আমাদের জানা-চেনা কেউ নেই। কোন হোটেলও নেই যে উঠ্‌ব।—আমার কথা আমি ভাবছি না মোটেই। বিপদ হচ্ছে ওঁকে নিয়ে,—রোগা মানুষ। বীথি বল্ল সব কথা, বল্ল ওদের মহদায় নেমে পড়ার কারণ।

ঝরঝরে বাংলা। দু'বছর হ'ল মৃণাল মহদায় এসেছে। বাঙালী হ'য়ে প্রায় বিদেশী হ'য়ে গেছে সে। বাঙালীর মুখ দেখে না এখানে, বা দেখে ট্রেণের চলন্ত কামরায়। মনটা যেন কেমন করে উঠল মৃণালের। ঝাট্‌সাঁট্ করা কোটের বুকের উপরের কয়েকটা বোতাম খুলে দিয়ে একটু অনুযোগের সুরেই বল্ল সে, এ কি কথা! রোগা মানুষ নিয়ে নিরুপায় হ'য়ে প্লাটফর্মে পড়ে আছেন, অথচ ষ্টেশন-মাষ্টারকে কিছু জানান নি, আশ্চর্য্য! দেখুন, এটা একটা ছোট ষ্টেশন—গ্রাম্য পরিবেশ। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে আমরা যথাসাধ্য লক্ষ্য করি।—থাক্, বেলা দুপুর! আপনারাও বাঙালী আমিও বাঙালী। অন্ততঃ বিদেশে বিভূঁয়ে বাঙালীর উপর বাঙালীর যে দাবী থাকা উচিত, সে দাবীটাও তো এখন আপনারা……

আপনাকে ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!! দেখ্‌তেই

তো পাচ্ছেন আমি রোগা মানুষ। আপনার কোয়ার্টারে গিয়ে আবার আপনাদের কোন রকম অসুবিধা ··

হেসে ফেলল মৃণাল—আমাদের অসুবিধা?—সে কিছু না। দেখবেন গোটা কোয়ার্টারটাই আপনাদের অভ্যর্থনা জানাবে।

মৃণালের কোয়ার্টারে কেটে গেল কয়েকদিন। বীথি দেখল, আপন চেয়ে পর সত্যি ভাল।—তবুও লজ্জায় মুখে যাই যাই করলে বাধা দিত মৃণাল, এখানে কি আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে? অসুবিধা ওদের হচ্ছিলও না, বরং বেশ ছিল মৃণালের খরচে। অবিবাহিত মৃণাল থাকত চাকর শিউপূজনকে নিয়ে। শিউপূজনই তখন বাইরের কাজ শেষ ক'রে রান্না-বান্নার সব যোগাড় করে এনে হাতের উপর দিত বীথির। বীথি মন দিয়ে রান্না করত, খাওয়াত প্রভাসকে—মৃণালকে।

কিন্তু এই কি জীবন! এই জীবনই কি চেয়েছিল বীথি? ধনী ব্যবসায়ী মিঃ মুখার্জীর ছেলে সলিলকে ছেড়ে কবি প্রভাসকে বিয়ে করার কি এই পরিণতি? একদিন যা'র কাব্যখ্যাতি উষার আলোর মত ছড়িয়ে পড়েছিল দেশময়, যা'র কাব্যের ঝঙ্কার নূতন স্পন্দন জাগিয়েছিল পাঠকের মনে—আজ সেই প্রভাস দারিদ্র্যের হাতে বন্দী! কাগজে কাগজে কত আবেদন জানান হয়েছিল কবিকে সাহায্য করবার জন্য, কিন্তু এতটুকু সাড়া পাওয়া যায়নি কারোর কাছ থেকে!—প্রভাস জানতে পেরেছিল তা'। দুঃখে, অভিমানে একদিন বলেও ফেলেছিল, হায় পাঠক! তুমি শুধু ফল পেতে চাও, গাছটাকে বাঁচাতে চাও না।

কথাটা আর শোনেনি কেউ একমাত্র বীথি ছাড়া। শুনে দুঃখ পেয়েছিল স্ত্রী-বীথি, অন্তরালে অনেক কেঁদেছিল। প্রভাসের একজন ভক্ত পাঠিকা কলেজের ছাত্রী বীথি। কিন্তু কবির প্রতি দেশবাসীর এই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ সে একা মোচন করে কি করে?—তবুও দমল না বীথি—যা'র যতটুকু সাধ্য। স্ত্রী হিসাবে তো বটেই, কাব্যের পূজারিণী হিসাবেও তা'র কিছু কর্তব্য আছে বৈ কি?

তুমি এত হতাশ হ'য়ে পড়ছ কেন—বলে বীথি।—আমিই তো আছি। মনে রেখ তোমার রোগ শুধু তোমারই নয়—আমারও। তোমার রোগের সব চিন্তা একাস্তই আমার। তুমি মনে জোর রেখে তাড়াতাড়ি ভাল হ'য়ে ওঠ। তুমি তো কবি! তোমার উপর দেশবাসীর এই নিদ্রুর ব্যবহারের চরম প্রতিশোধ তখন তুমি নিও তোমার নূতনতর প্রতিভায় কাব্য লিখে।

—কথাগুলো যেন বলকারক অষুধের মত মনে হতে লাগল প্রভাসের, কাজেই কথা বলে বীথির ও-কথাগুলোর কোন জবাব দিতে পারেনি সে। তবুও উত্তর সে দিয়েছে বীথির দিকে অপলক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, বীথির একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে অনেকক্ষণ চেপে রেখে।

হাতখানা প্রভাসের হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেই বীথি তাকিয়েছিল জানালা দিয়ে বাইরে। আকাশ দেখা যায়। কিন্তু আকাশ কোথায়? যেন মেঘের রাজত্ব। কালো মেঘের সেকি আনাগোনা! আশ্চর্য্য! সূর্য্য যেন ও-আকাশেই নেই!—কিন্তু না, হঠাৎ এক ঝলক রোদ এসে পড়ল ওদের গায়ে। সূর্য্য উঠেছে। চারদিকে গাছের মাথায়, ঘরের চালে চালে তখন রোদের কিকিমিকি। সেই সকাল থেকে রাতের অন্ধকারের মত মেঘের অন্ধকারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল ওরা। রোদটা তাই লাগল খুব ভাল—ভারি মিঠা!

সূর্য্যের আলোয় জীবনীশক্তিতে বীথি নূতন শক্তি পেল মনে। মনে মনে বেশ খুশি হ'য়ে উঠল শেষ পর্য্যন্ত সূর্য্যের কাছে মেঘের এই পরাজয়ে। মনে করল, সূর্য্যের এই জয়টা যেন তারই জীবন-যুদ্ধের জয়ের ইঙ্গিত। তাড়াতাড়ি হাতখানা প্রভাসের হাতের মুঠো থেকে বের করে নিজের বাঁ হাতের উপর জোরে আঘাত ক'রে বলে উঠল, আমি বলছি তুমি শীগ্‌গীরই ভাল হ'য়ে উঠবে।

—এত জোর তোমার মনে?

—হ্যাঁ এতই জোর। এ জোর আমি পেলাম প্রকৃতি থেকে।

তারপর থেকে কিছুতেই দমে যায়নি বীথি। ছুটেছে পূর্ণবেগে যেন জীবন্ত-সত্যবানকে কাঁধে নিয়ে সাবিত্রী। অর্থের টানাটানিতে অসুবিধায় পড়েছে, তবুও ভীরুর মত ধিক্কার দেয়নি নিজের অদৃষ্টকে। বরং বীথি মনে করেছে কবির সেই বাণী, মেঘ দেখে কেউ করিস্‌নে ভয়!

আড়ালে তা'র সূর্য্য হাসে। ভয় কি! ভাবনারই

বা কি? কত আত্মীয় স্বজন রয়েছে। এই বিপদে হাত পাতলে কে না সাহায্য করবে তাকে?

সত্যি সত্যি সাহায্য পেয়েছে। আত্মীয়স্বজন দশজনেরই দয়ায়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পেতে প্রভাসকে রোগমুক্তির পথে এনেছে সে। এম্বরে করেছে, কোথাও দোষ নেই। তবুও ডাক্তারের উপদেশ, কয়েকটা মাসের জন্য বায়ু-পরিবর্তনে যাওয়া দরকার।

তারপরই এই যাত্রা। মহদায়।

বাবাকে চিঠি দিয়েছিল বীথি সব কথা জানিয়ে। আত্মীয়দের কাছে আর লেখা যায় না। তা'রা এক একজনে চার পাঁচবার করে সাহায্য ক'রেছে। যে আর্থিক দুর্দিন তাতে তা'দের কাছে আর চাইতে ভারী লজ্জা করল বীথির। বিশেষতঃ বিয়ের আগের কথাটা তা'র মনে আছে। বিয়ের আগে একদিন বীথি জোর গলায় বলেছিল, সংসারে টাকা-পয়সার কি দরকার?—চাই প্রভাসকে, কবিকে। নাই বা থাকল তা'র অর্থ, কাব্য তো থাকবে তা'র হাতে। তাই পড়বো। জীবন-পেয়ালা পূর্ণ করে কাব্যের অমৃতরস পান করব। কিন্তু আজ তা'র চোখের সামনে থেকে কল্পনার সে-রামধনু-রঙের রঙীন ছবি কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে বাস্তবের আঘাতে, আঘাতে। আজ বীথি বুঝতে পেরেছে, সংসারে বস্তুর পথে—পথ-খরচ কিছু চাই-ই।

বীথির ইচ্ছা হ'ল ওরা ওখানেই থেকে যায়। কাজ কি শেষ সময় আর একজন আত্মীয়ের কাছে ঋণী হ'তে যাওয়া, তার চেয়ে অনাত্মীয়ের কাছেই ঋণের পরিমাণটা না হয় বেশী হ'ক। তা' ছাড়া ও-জায়গাটা খুব ভালও লেগেছিল প্রভাসের। যে মহদা মরুভূমি আর বনবাস বলে মনে হ'য়েছে মৃণালের কাছে, সেই মহদার শ্যামশোভাই মুগ্ধ করেছিল প্রভাসকে। পাখীর ডাকে তার ঘুম ভাঙত। চোখ দু'টী মেলেই হাসাহাসি করত ফুলের সাথে। বাগানে ফুটে থাকা সেই কত জানা-অজানা ফুলের মিলিত গন্ধ, নীপের বনে মধুপের আনাগোনা, আর অদূরে মুঞ্জরীত মহুয়া শাখার নিলাজ হাতছানি এক নূতন দেশে নিয়ে যেত তাকে।

কিন্তু এই ভাললাগার সঙ্গে লজ্জাও লাগত প্রভাসের। কোন কোনদিন কিছু টাকা বীথি মৃণালের হাতে দিতে চেষ্টা করলে অসন্তুষ্ট হ'ত মৃণাল। বলত, আপনারা আমার অতিথি। তা'ছাড়া জেলের কয়েদীর মত ছিলাম আমি। আপনাদের সাহচর্য্যের মূল্যই তো আমার কাছে অনেক। আর একটা কথা: আপনারা তো যেতেই চেয়েছিলেন, আমিই যেতে দেইনি।

কথা ক'ত হাসতে হাসতে। হাসির পরে মৃণালের অনুপস্থিতিতে প্রভাস বলত বীথিকে, কা'র সাহচর্য্য বীথি? তোমার নিশ্চয়ই?

তাও এতক্ষণে বুঝলে?—ধন্য তোমার কাব্য-প্রতিভা! কিন্তু শুধু কি তাই?—আরও অনেক। আমার হাসি, আমার চোখের চাওয়া এগুলোর মূল্য তো ওর কাছে আরও অনেক বেশী—বলেই এক উচ্ছল হাসিতে ভেঙ্গে পড়ল বীথি।

হাসতে হাসতেই বলত প্রভাস, ভাল অভিনেত্রী তুমি। কিন্তু ভাবছি এ অভিনয় অভিনয় নয়তো?

দেড় মাসের উপর হ'ল মহদায়। বাবার কাছ থেকে টাকার পরিবর্ত্তে এলো চিঠি।—বাসায় তিনজনের অসুখ। অনেক টাকা লাগছে ডাক্তারে এবং অষুধ-পথ্যে। পরে চেষ্টা করে দেখবে।

বিপদ আর কাকে বলে? বীথির মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল আকাশ, আর পায়ের নীচ থেকে সরে গেল মাটী নিদেশে-বিভূঁয়ে। এমনিতে মৃণালের অনেক ব্যয় হচ্ছিল। রোগীর নিজস্ব যে কতগুলো খরচা আছে তা'র জন্য আবার মৃণালের কাছে সরাসরি হাত পাতে কি করে? সঙ্গে যা' নিয়ে এসেছিল এতদিনে ব্যয় হ'য়েছে তা'। ভরসা ছিল বাবা—কথাও দিয়েছিলেন। বাবার উপর একটা অভিমানে ভরা মন ছেয়ে গেল বীথির; বাসায় তিনজনের অসুখ। সে-যে তিনজনেরই হ'ক না কেন, তা'দের তুলনায় প্রভাস কি তা'র বাবার কাছে এত দূরের? এমন পার্থক্য তা'র বাবা কি করে দেখলেন।

প্রভাস সান্ত্বনা দেয় বীথিকে।—বলি, বেলা হ'য়েছে অনেক। রান্না করবে কখন? মৃণালবাবু যে এসে পড়বেন ডিউটী থেকে।

রান্না-বান্না এবং খাওয়া-দাওয়ার পর কিছু সময় হাতে পেত বীথি। মৃণাল ঘুমাত ও-ঘরে, আর এ-ঘরে ঘুমাত প্রভাস। বীথি ঘুমাত না। ওদের এই ঘুমানোর অবসরে সে বই পড়ত। সেদিন বইতেও মন বসল না তা'র। মন খারাপ। খারাপ মন নিয়েই মনের এ্যালবামটার পাতা

একখানা একখানা করে ওল্টাতে লাগল সে। পুরানো স্মৃতির বাহক মনের এই এ্যালবাম্!

বীথিকে বিয়ে করতে না পেরে সলিল আঘাতটা পেয়েছিল খুব বেশী। সলিলের কতদিনের কত কথা সেদিন মনে পড়ল তা'র। ব্যাগ ভর্ত্তি ছিল তার টাকা, আর বুক ভর্ত্তি উচ্ছ্বাস। কিন্তু বীথি অন্য ধাতুর। টাকার লোভ এবং উচ্ছ্বাস দুটোকেই সমানভাবে ঘৃণা করেছে বীথি। কিন্তু সেদিন টাকার বড় প্রয়োজন তার। সলিলও ভুলতে পারেনি তা'কে নিশ্চয়ই—তা' মন্দই বা কি যদি সত্যি সত্যি সলিল তা'কে ভুলে গিয়ে না থাকে?

চোখের উপর থাকলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু এ একেবারে চোখের বাইরে—কাজেই বাবার লেখা 'পরে চেষ্টা করে দেখব' কথাটাতে বীথি আদৌ বিশ্বাস রাখতে পারছিল না। বীথি চিঠি লিখল সলিলকে, প্রিয় মিঃ মুখার্জ্জী! প্রতিশোধ নেওয়ার অপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে তোমার। এ সুযোগ কি তুমি ছেড়ে দেবে?—দেবে না নিশ্চয়ই। তুমি জান হয়তো উনি অসুস্থ। এখানে চেঞ্জে এসেছি। কিছু টাকার দরকার। কলকাতা গিয়ে দেখা করব।

চিঠিখানা পড়ে ভাবনায় হাবুডুবু খেতে লাগল সলিল। মনে মনে একবার চীৎকার করে উঠল, কেন বীথিকা দেবী! সংসারে নাকি টাকার দরকার নেই?—কাবারস পান করেই নাকি সংসার-বৈতরণী পার হওয়া যায়? তবে আজ আর দূর থেকে আমার কাছে হাত পাতা কেন?—কিসের জন্য? লজ্জা হ'ল না অপরের কাছে হাত পাততে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সলিল। রাগের ভাবটা কেটে গিয়ে কোন্ এক দুর্ব্বলতায় যেন টান পড়ল তার! সেই বীথিকা দেবী। এক ভাবুক শিল্পীর আদরে গড়া মূর্ত্তি যেন! সত্যি আর কোন দিন বীথি টাকা চায়নি তার কাছে বরং তার দেওয়া অনেক টাকা, অনেক উপহার ফিরে এসেছে তারই কাছে। চাওয়াটাকে বরাবরই ঘৃণা করত বীথি। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! সেই বীথিই চেয়েছে। নিশ্চয়ই বড় প্রয়োজন, বড় বিপদ তার।

—তা' হ'কগে বীথির বড় প্রয়োজন—বড় বিপদ, তা'তে তা'র কি—ভাবনার মোড় ঘোরে সলিলের। টাকা সে পাঠাচ্ছে না। কিছুতেই পাঠাবে না টাকা। তা'র উপরে বীথির কিসের দাবী।

পরক্ষণেই আবার মন থেকে মুছে গেল ঐ ভাব। আবার ভাবল সলিল, বড় প্রয়োজন বীথির। বীথি চেয়েছে!!

হিসেব করা দিনের দু'দিন বাদে সলিলের টাকা পেল বীথি। আশাতীত টাকা—মহান প্রতিশোধ। রূপার মোড়া অপমান! ও-অপমান গায় মাখল না বীথি। টাকা টাকাই—শুধু ষোল আনায় একটাকা! অলক্ষ্যে যা রইল, তার দিকে চোখ বুজেই রইল বীথি।

কিন্তু প্রভাসের মনে সলিলের ঐ পাঠান টাকা সুদসমেত দেখা দিল। মৃণালের সাথে অকারণে হাসি, সময় পেলেই গল্পগুজব করা অভিনয়ই মনে করত প্রভাস। কিন্তু সলিলের টাকা সে কিছুতেই হজম করতে পারছিল না। ব্যাপারটাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে লাগল প্রভাস।

বীথি বুঝল তা'। একটা না-বলা এবং না-সহ্য করার মত দুঃখ হ'ল মনে। ইচ্ছা হ'ল সেও অভিমান করে থাকে, কিন্তু পারল না। ভয় হ'ল পাছে প্রভাসের সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হয়—শরীরের উপর তারই একটা ছায়া পড়ে। তার চেয়ে অভিমান নয়, প্রভাসের মন থেকে ভাবনার ঐ কালো মেঘখানা দূর করা একান্তই দরকার।

বীথি বল প্রভাসকে, তোমার দৃষ্টিভঙ্গি কি স্বাভাবিক হওয়া উচিত নয়? একি সাধারণ মানুষের মত স্ত্রীর উপর তোমার বিশ্রী ধারণা! ভাবতেও ঘৃণা লাগছে আমার। আচ্ছা! সোনা পুড়িয়ে না খাঁটী করা হয়? আর তোমাকে বাঁচানোর জন্য দুঃখ-দারিদ্রোর সঙ্গে যে আপ্রাণ লড়াই করে চলছি তাতেও কি আমার সেই খাঁটি রূপ তোমার অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে না?

—পড়ছে।

—তবে তোমার মনে এমন সন্দেহ জাগে কেন? একটু চিন্তা করে দেখ দেখি, এমন কোন্ আত্মীয় বাকী আছে যা'র কাছে আবার টাকা চাইতে পারতাম—আর এই টাকা না পেলে কী উপায় হ'ত আমাদের?

বীথির কথায় যেন ভেতরে ভেতরে লজ্জা হচ্ছিল প্রভাসের। লজ্জার ভাবটা কেটে গেলে বীথির হাত

দু'খানি ধরে বল্ল, চল বেড়িয়ে আসি। এমন সুন্দর বৈকালে ঘরে থাকতে ভাল লাগছে না।

দেখতে দেখতে চারমাস কেটে গেল মহুয়ায়। দিব্যি চেহারা তখন প্রভাসের—শীতের পরে বসন্তের আসরে গাছের মত। নূতন প্রাণশক্তিতে ভরপুর প্রভাস; তাই মাঝে মাঝে বলত বীথিকে, ধন্য আমার প্রতি তোমার ভালবাসা! ডাক্তার নয়, তুমিই ছিনিয়ে রাখলে আমাকে যমের হাত থেকে···বলতে বলতে একটু দম নিত প্রভাস। আবার সুরু করত বলতে, কিন্তু মানুষের মন বুঝলে বীথি! না বুঝে অনেক সময় অনেক ভুল বুঝেছি তোমাকে—সেজন্য আমি দুঃখিত। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

কতবার আর তুমি ক্ষমা চাইবে? হাসতে হাসতে জবাব দিত বীথি। কিন্তু থাক্ সে কথা। আমিও বলি মানুষের মনকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তুমি অসুখে পড়ার পর থেকে শুধু তোমাকে বাঁচাবার জন্য যে অভিনয় করে চলেছি, আর পারি না তেমন অভিনয় করে চলতে—বিবেকে লাগে। তুমি যদি সত্যি খুব ভাল হ'য়েছ বলে মনে কর তবে চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই; নাটকের শেষ অঙ্কে যবনিকাপাত করে শেষ করে দেই আমার এই অভিনেত্রী-জীবনকে।

প্রভাস অমত করল না বীথির কথায়, বরং খুশী হ'য়ে উঠল খুব। বীথি লক্ষ্য করল প্রভাসের চোখে মুখে ফুটে ওঠা সে খুশীর প্লাবন।

কিন্তু মুস্কিল হ'ল যাওয়ার কথাটা কি ভাবে মৃণালের কাছে বলা যায় তাই নিয়ে। একটা কিছু অজুহাত দেওয়া দরকার।

সেদিন রাত্রে খাওয়ার পরে কথাটা বলেই ফেল্ল বীথি, মৃণালবাবু! বাবা চিঠি লিখেছেন মার খুব অসুখ। দু'এক দিনের মধ্যেই যেতে চাই আমরা। না গেলে নয়,—অসুখের কথা তো বলা যায় না। কিন্তু দেখুন কি অদৃষ্ট! এ জায়গায় ওঁর স্বাস্থ্য বেশ অনুকূলে যাচ্ছিল, আর দু'এক মাস থাকতে পারলে বেশ হ'ত কিন্তু।

মা'র অসুখ ভাল হ'লে না' হয় আবার ঘুরে আসবেন, বল্ল মৃণাল।

• • •

রাত্রে ঘুম নাম্‌লো না মৃণালের চোখে, মন জুড়ে এলো ভাবনা। এলোমেলো ভাবনা! ভাবল মা'র অসুখ না মিথ্যা কথা? না তা'র মনের কথা ধরা পড়ে প্রভাসের চোখে তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। আবার ভাবল মৃণাল, তা' থাক না। চেঞ্জে এসেছিল, চেঞ্জ তো হ'ল—চলে যাবে এখন, তা'তে তা'র মনেই বা এত আলোড়ন কেন? কিসের জন্য? কিন্তু···না থাক্ আর ভাবতে চাইল না মৃণাল। অথচ না চাইলে কি হবে, তবুও শরতের আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মত ঐ কিন্তুকে নিয়েই ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হ'য়ে গেল তা'র। এলার্ম বেজে উঠল তখন ঘড়িতে। শেষ রাতের ট্রেণখানার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল সে।

পরদিন বীথি আর প্রভাস রওনা হ'ল মহুয়া থেকে। বেলা ৯টার ট্রেন। অনেক দিন ট্রেনখানা লেট্ হয়, কিন্তু সেদিন এক মিনিটও নয়। কাঁটায় কাঁটায় এসে পৌঁছান—প্ল্যাটফর্মে।

গার্ডের বাঁশী বাজল, নড়ে উঠল হাতের নীল পতাকা। মনটাও সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল মৃণালের—বীথি যাচ্ছে। ট্রেন ছেড়ে দিল। বীথি চলে গেল। কিন্তু সত্যিই কি গেল? না বাইরে থেকে বীথি তার অন্তরে এসে বাসা বাঁধলো? কায়ার বীথি ছায়ায় রূপান্তরিত হ'য়ে অন্তর আসন বিস্তার করলে কি তার মনে?

রামায়ণের গল্প

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, পিএচ্-ডি

সরযূর তীরে কোশলনামে বিস্তীর্ণ জনপদ। ইহা ধনধান্য ও পশুসম্পদে পূর্ণ। শালিধান ও ইক্ষুর চাষে ইহার ক্ষেত্রসকল সর্ব্বদা শস্যশালী ছিল এবং প্রজাগণও সকলে হাসিমুখে দিন কাটাইত। বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণের পরিশ্রমে এই দেশে কৃষি ও বাণিজ্য অতি উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ইহাদিগকে রক্ষা ও পালন করিতেন। ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন দৃঢ় শার্দ্দূলতুল্য বীরত্বের আধার, বাহুবলে সিংহ ও হস্তীর দম্ভ উৎপাটনে সমর্থ। ক্ষত্রিয়গণ প্রতি কার্য্যে গুরু-বচনের স্নেহপূর্ণ সেবিনে ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা মানিয়া চলিতেন এবং রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণবিদ্বেষের অপ্রহারে পূর্ণ ছিল।

এই কোশল রাজ্যেরই রাজধানী ছিল বিখ্যাত অযোধ্যা নগরী। ইহা সরযূর বক্ষিমতটে অবস্থিত। ইহা আয়তনে বারশ সহস্র গজ দীর্ঘ ও প্রস্থে তিন সহস্র। অতি প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা ইহা অনেকগুলি খণ্ডে সমে বিভক্ত। রাজপথগুলির অনেকগুলিই ছিল সমান্তর। দুই দিক হইতে রথসকল অনায়াসে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। রাস্তাগুলি সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইত ও তাহাতে জল ছিটাইয়া ও ফুল ছড়াইয়া দিয়া সেগুলির এত শোভা বৃদ্ধি করা হইত যে নগরবাসীর মন যেন ভোর করিয়া রাজপথে টানিয়া আনিত। রাস্তাগুলির দুইধারে সমরূপিতি পুষ্করিণী। ইহার অনেকগুলিই ছিল উচ্চ অট্টালিকা। তাহাদের শিখরে ধ্বজ ও পতাকা উড়িতে থাকিত। নানা শিল্পীদের নিবাসহেতু এই নগর ছিল বৈচিত্র্যের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। নানা দেশ হইতে বণিক সকল আসিয়া অযোধ্যাতে তাহাদের দোকান সকল এত সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছিল যে তাহা দেখিতেই লোকের ভিড় জমিয়া যাইত।

নগরের মধ্যস্থলে বৃত্তপ্রাচীরবেষ্টিত রাজপুরী, যেন একটি বিশাল দুর্গ। সমস্ত রাজধানীটি ঘিরিয়া বাহির প্রাচীর এবং তাহার তিন দিকে গভীর পরিখা বা খাদ, জলে পূর্ণ। উত্তর দিকে সরযূ নদী নিজেই পরিখার কাজ করিত। লঘু হস্ত, অস্ত্রবিশারদ ক্ষত্রিয়বীরগণ এই দুর্গ ও নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। তাহারা ছিল শব্দ-বেধী ও দুর্ভেদ্য লৌহকবচে আবৃত-দেহ, অধ্যবসায় ও পরাক্রমে বলীয়ান্। কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশে জাত এবং বনানুপ্রদেশে উৎপন্ন বহু সুদৃশ্য অশ্ব এই নগরীর সম্পদ ছিল, এবং সিন্ধু ও হিমালয় পর্ব্বতের অরণ্যে পুষ্টদেহ বহু হস্তীর বৃংহনে এই নগরী মুখরিত হইত। আর দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, পণব ও বীণার ধ্বনিতে পুরবাসীদিগের বিপুল হর্ষ সহরটিকে আনন্দে পরিপূর্ণ রাখিত। সর্ব্বোপরি ছিল ব্রাহ্মণকণ্ঠের অপূর্ব্ব বেদধ্বনি, যাহার শব্দে নগরীর আকাশ বাতাস হইতে সমস্ত অশিবতা দূরে চলিয়া যাইত এবং অহিতে তাহাদের প্রদত্ত আহুতির সঙ্গে নগরবাসীদের সমস্ত অকল্যাণ দূর হইত।

* * *

এই রাজ্যের পালক ছিলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ দশরথ। তিনি ছিলেন পৌর ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজাবর্গের অতি প্রিয়। তিনি যজ্ঞকারী ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া সর্ব্বদেশে খ্যাত ছিলেন। ইন্দ্রিয়সকল ছিল তাঁহার বশে। পুরাকালে প্রজাপতি মনু যেমন সমস্ত অন্যায় দমন করিয়া প্রজাদের ধর্ম্মপথে থাকার বিধান করিতেন, মনুর বংশধর মহারাজ দশরথও তেমনি প্রজাদের বিনয়াধীনে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসনে কেহই পরের দ্রব্যে লোভ করিত না; সকলেই নিজ নিজ বিষয়সম্পদে সন্তুষ্ট থাকিত। সুমিষ্ট অন্ন ভোজন করে না বা স্বর্ণ অলঙ্কার ধারণ করে না এমন কোন প্রজা তাঁহার রাজ্যে খুঁজে পাওয়া যাইত না। নর ও নারী সকলেই ধর্ম্মশীল ও সুসংযত ছিল। ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের পূজা করিত এবং বৈশ্য ও শূদ্রজাতি ক্ষত্রিয়ের শাসন মানিয়া চলিত।

রাজ্যশাসনের সহায়করূপে মহারাজ দশরথের আটজন অমাত্য ছিল—ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল এবং সুমন্ত্র। ইহাদিগের মধ্যে সুমন্ত্রই বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া দশরথের অতীব প্রিয় ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজার সুখদুঃখের সঙ্গী এবং সর্ব্বদা তাঁহার মঙ্গলের পরিচালক।

বশিষ্ঠ ও বামদেব ছিলেন দশরথের পুরোহিত ও ঋত্বিক্। ইহাদের পরামর্শ রাজা সমস্ত বিষয়ে গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও কয়েকজন মন্ত্রণাপ্রদানকারী ছিলেন—সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয় এবং কাত্যায়ন। এই ব্রাহ্মণ মন্ত্রিগণ মহারাজকে সব সময়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন এবং তাঁহাদের সম্মতি প্রথমে গ্রহণ করিয়া পরে অমাত্যদিগের সহিত রাজা গূঢ় পরামর্শ করিতেন। অমাত্যগণ রাজার সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করিত। এই অমাত্যদের বুদ্ধিবলে কোন প্রতিবেশী নৃপতি দশরথের প্রতি শত্রুতা সাধনের কল্পনাও করিতে পারিত না, কারণ তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা চক্ষুমুখে জয়ন্ত সুরাষ্ট্র প্রভৃতি অমাত্যগণ আগে হইতেই জানিতে পারিতেন। সামন্ত নৃপতিগণ তাই সর্ব্বদা দশরথের বাধ্য ছিল। অমাত্যগণ সব সময়ে রাজকোষ পরিপূর্ণ রাখার প্রতি দৃষ্টি দিতেন, যাহাতে অতি-বদান্য মহারাজ দুই হাতে অর্থ বিতরণ করিয়া দিয়াও কোষাগারের কোন ন্যূনতা লক্ষ্য করিতে না পারেন। অমাত্যগণ সর্ব্বদা ন্যায়ের অনুসরণ করিতেন এবং নিজ নিজ পুত্রদের প্রতিও গুরুতর জন্য প্রাপ্য দণ্ড বিধান করিতে কোনও ত্রুটি করিতেন না। এই অমাত্যগণ ছিলেন সর্ব্বদা উৎসাহসম্পন্ন এবং প্রজাদের সৎকার্য্যে উৎসাহবর্দ্ধক। এই সমস্ত অমাত্যের সহায়তায় দশরথের রাজ্য প্রজাদের রাজভক্তি ও শুভকামনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

* * *

দক্ষিণ কোশল বা ভাদ্রার-রাজ্যের রাজকন্যা কৌশল্যা দেবীর সহিত

প্রথম যৌবনে দশরথের বিবাহ হয়। তিনি তখনও যুবরাজ মাত্র ছিলেন। ইহার অনেক পরে, রাজ্যলাভের পর, মহারাজ দশরথ কেকয়-রাজ অশ্বপতির কন্যা কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন। অনেকদিন ধরিয়া কৌশল্যার সন্তান-লাভ না হওয়াই এই দ্বিতীয় বিবাহের কারণ। বিবাহের সময় অশ্বপতির নিকট দশরথকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল যে এই দ্বিতীয় মহিষীর গর্ভজাত সন্তানেরও রাজ্যে অধিকার থাকিবে, নতুবা অশ্বপতি তাঁহাকে কন্যাদান করিবেন না। একমাত্র প্রথম ও প্রধানা রাজমহিষীর গর্ভজাত সন্তানই সিংহাসনে বসিবার অধিকারী থাকিত। এ ক্ষেত্রে এই নূতন নিয়ম দশরথকে স্বীকার করিয়া লইতে হইল যে যদি কৌশল্যা অপুত্রক থাকেন অথবা কৌশল্যার পুত্র অপেক্ষা কৈকেয়ীর পুত্র অগ্রজন্মা হয় তবে কৈকেয়ী পুত্রেরও রাজ্যলাভের দাবী অগ্রাহ্য হইতে পারিবে না।

ইহার পরে মহারাজ আরও অনেক বিবাহ করেন, কিন্তু এরূপ প্রতিশ্রুতি আর তাঁহাকে কোথাও দিতে হয় নাই। এই স্ত্রী সকলের মধ্যে পুরোহিত বামদেবের করণ-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সুমিত্রার নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। রাজাদের বিবাহের সময়ে প্রধানা পাত্রীর সহিত তাঁহার জ্ঞাতিবংশীয়া সহচরী এবং পরিচারিকারূপীয়া অন্যান্য অনেক কন্যাও একই সাথে একই মন্ত্রে রাজার সহিত বিবাহিতা হইতেন। ইহারা প্রত্যেকেই রাজার স্ত্রী, কিন্তু ইহারা রাণী বা মহিষী আখ্যা পাইতেন না। মহারাজ দশরথের এইরূপ সাকুল্যে তিনশত স্ত্রী ছিল, কিন্তু মহিষী পদবাচ্যা ছিলেন মাত্র তিন জন—কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। অন্যান্য স্ত্রীসকল কেহ ছিলেন এই তিন প্রধানার সহচরী, কেহ বা ছিলেন তাঁহাদের সামান্য পরিচারিকা মাত্র।

* * *

এত অধিকসংখ্যক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও বহুদিন ধরিয়া মহারাজ দশরথের কোন পুত্র সন্তান জন্মিল না। তখন তাঁহার মনে এই ইচ্ছা হইল যে পুত্রলাভের নিমিত্ত তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন। এই যজ্ঞের বহু বিঘ্ন এবং যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে না পারিলে যজ্ঞকর্তার সদ্য সদ্য বিনাশ হয়। সুতরাং দশরথ কিঞ্চিৎ ভাবিত হইলেন। পরে বাল্যসহচর অমাত্য সুমন্ত্রকে বলিলেন, "শীঘ্র আমার গুরু ও ঋত্বিক ব্রাহ্মণসকলকে ডাকিয়া আন।. আমি তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিব"। সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে রাজার আহ্বান জানাইলেন। সুমন্ত্র, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ এবং পুরোহিত বশিষ্ঠ—ইহারা সকলেই আসিলেন। তাঁহারা রাজার প্রস্তাব শুনিয়া এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহাদের আদেশে সরযূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি প্রস্তুত হইল। সুমন্ত্র ও বশিষ্ঠের পরামর্শে এই পুত্রেষ্টি যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিকের পদে বরণ করা হইল বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে। শুনা যায় যে অঙ্গরাজ্যে বহুদিন অনাবৃষ্টি থাকায় সংসার-নির্লিপ্ত এই কিশোর ঋষিকুমারের পাদস্পর্শে দেবরাজ ইন্দ্র সে দেশে অজস্র বৃষ্টির ধারা বর্ষণ করেন। তারপর অঙ্গরাজ রোমপাদ মহাসমারোহে এই ঋষিপুত্রের সহিত নিজ কন্যা শান্তাদেবীর বিবাহ দেন। রোমপাদ ছিলেন দশরথের বিশিষ্ট বন্ধু, সুতরাং দশরথের অনুরোধে তিনি স্বীয় জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন।

যজ্ঞ যাহাতে সম্যক্ বিধি-নিয়ম অনুসারে অনুষ্ঠিত হইতে পারে সে বিষয়ে স্বয়ং বশিষ্ঠই সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। নানা দেশ হইতে যজ্ঞ-সামগ্রী সকল আহৃত হইল। শুভলক্ষণসম্পন্ন গজীয় অশ্ব নৈঋতপরিবৃত করিয়া বিভিন্ন দেশ পর্যটন করিয়া আনার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল এবং তাহার সাথে চলিলেন উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ। এক বৎসর ধরিয়া এই অশ্ব দেশদেশান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। কেহ যদি এই অশ্ব বল প্রকাশ করিয়া গ্রহণ করে, রাজসৈন্যের কর্তব্য হইবে তাহাকে পরাস্ত করিয়া অশ্বের স্বৈরগতি অব্যাহত রাখিতে। বৎসরাবধি যজ্ঞ চলিতে থাকিবে। বৎসরান্তে অশ্বকে ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞে আহুতি দিতে হইবে। এ নিয়মের ব্যত্যয় হইতে পারিবে না।

পুণ্য চৈত্র মাসে বসন্তের সমাগমে বৎসরের প্রারম্ভ হইলে গজীয় অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এদিকে ঋত্বিক-প্রধান ঋষ্যশৃঙ্গও পবিত্র অগ্নি-শিখার সম্মুখে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজা সকল যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই প্রভূত উপঢৌকন দশরথকে যজ্ঞার্থে প্রদান করিলেন। বহুদূর হইতে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ-সকলকেও আহ্বান করিয়া আনা হইয়াছিল। সকলের জন্যই উত্তম বাসস্থান প্রস্তুত হইল। মুনিষ্ট অন্ন নানাবিধ বিতরণ চলিল। তুর্যতাং ধীরতাং শব্দে চতুর্দিক মুখরিত। স্বর্ণকারিক, শিল্পকর, বর্ধক, খনক প্রভৃতি বিভিন্ন কুশলী শিল্পকার এই যজ্ঞের সমস্ত নির্মাণের সুখসাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতেছিল। দক্ষিণ কোশলের রাজা দশরথের জ্ঞানক ভ্রাতুষ্পুত্র যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলেন। আর আসিলেন রাজশ্বশুর কেকয়রাজ অশ্বপতি; কাশীর রাজা দশরথের সমবয়স্ক সুহৃৎ যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন; অঙ্গেশ্বর রোমপাদ আসিলেন, আর আসিলেন প্রাচ্য-বেশীয়, সৌরাষ্ট্র ও দক্ষিণাপথবাসী নৃপতি সকল।

ঋষ্যশৃঙ্গ ঋত্বিক্‌বৃন্দ প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রের আহ্বান করিলেন, তারপর বিভিন্ন দেবতাদের নামে অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞশত হইতে প্রস্তুত এই যজ্ঞবেদীর পশ্চিমকোণে বিল্ব, খদির, ন্যগ্রোধক ও রেবা বাকুর স্তম্ভ সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। রাণী তিনজনকে দশন যজ্ঞে দীক্ষিতা হইবার জন্য আহ্বান করা হইল তখন—

তাসাং জ্যেষ্ঠাভিকামেন বচনেন সুবর্চসা।
মুনিপত্নস্তথোক্তস্তু পত্নীনাং বিগতাত্মনাং॥

—সেই অতি প্রীতিপ্রদ কল্যাণবাক্যে তাঁহাদের মুখের শ্রী বর্ধিত হইয়া শীতান্তে বসন্তের সমাগমে পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।—

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্তের সমাগমে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইবে। অন্যদিকে যজ্ঞে বলি দিবার পূর্বদিন সারারাত্রি ধরিয়া মন্ত্রপূত অসির সাহায্যে কৌশল্যা নিজে অশ্বের রক্ষায় অনিদ্রায় কাল কাটাইলেন। সকাল বেলা হোতা অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতা মন্ত্রধ্বনি করিয়া অশ্বের পবিত্রতা বিধান করিলে যূপকাষ্ঠে বান্ধিয়া অশ্বটিকে বলি দেওয়া হইল। ঋত্বিক-শ্রেষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ বিখণ্ডিত অশ্বদেহ হইতে চর্বিপিণ্ড মেদ-খণ্ড উদ্ধৃত করিয়া সেই বপা যজ্ঞের

অগ্নিতে আহুতি দিলেন। এই যজ্ঞের পুরুষও স্বয়ং মহারাজ আত্মাও করিলেন এবং ঋত্বিগ্‌গণকেও আহ্বান করাইলেন। এইরূপে সমস্ত পাপ ইহাতে ভূতীভূত হইলে যাজকগণ মাতৃগণের আহ্বান করিবার যোগ্য হইলেন।

যজ্ঞে যখন যে আহুতি প্রদত্ত হইতেছিল সেই সময়ে অগ্নিশিখা আরও উজ্জ্বল করিয়া এক দিব্য মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাহার দেহের কান্তি এবং বস্ত্রালঙ্কার তাহার পরিচ্ছদ। দুই বাহুর মধ্যে এক মায়াময়ী হিরণ্ময়পূর্ণ কলসী বহন করিয়া যজ্ঞপুরুষ আবির্ভূত হইলেন, "তোমার এই পূর্ণ সম্পদ্‌রূপ দিব্য পায়স পত্নীদিগকে ভক্ষণের জন্য দাও। ইহার ফলে তাঁহারা পুত্রলাভে সমর্থ হইবে।" তারপর সেই দেবনির্দ্দিষ্ট পায়সভাণ্ড গ্রহণ করিয়া মহারাজ পায়সের অর্দ্ধেক প্রধান মহিষী কৌশল্যাকে প্রদান করিলেন। বাকী অর্দ্ধেক হইতে অর্দ্ধাংশ সুমিত্রাকে দিলেন এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশের অর্দ্ধেক কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া কি মনে করিয়া যেন শেষ অর্দ্ধাংশ আবার সুমিত্রাকেই অর্পণ দিলেন।

মহারাজাদের ভক্ষণক্রিয়া শেষ হইল। মহারাজ দোতা, অন্তর্ধা-, হইলেন ও ব্রাহ্মণ রূপ চতুর্দ্দেবের মহিমা যজ্ঞকারীকে রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে তাহারা রাজা দশরথকে নিজেদের অক্ষমতা জানাইলেন, কারণ ইহা তাহাদের অধ্যয়ন ও তপস্যার পক্ষে বিঘ্নকর হইবে। রাজোর পরিবর্ত্তে তাহারা রাজসকাশে পরিবারপালনযোগ্য সামান্য অর্থের প্রার্থনা করিলে রাজা হর্ষভরে সেই অর্থ প্রদান করিলেন। দেবতারা নিজ নিজ বেশভূষা ত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং ব্রাহ্মণগণ হৃষ্টচিত্তে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ কুটীরে প্রস্থান করিলেন। বিদায়প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ দশরথের অভিবাদনান্তে আপ্যায়িত হইয়া বন্ধুভাবে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন।

* * *

যজ্ঞ শেষ হইবার বারো মাস পরে পুণ্য চৈত্র মাসের শুক্লনবমীতে মহারাণী কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্রের জন্ম হইল। সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অর্দ্ধাংশ রামচন্দ্রের জন্মের সময় চন্দ্র ছিলেন পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে এবং বাক্‌পতি বৃহস্পতিও তাহার সহিত এক ঘরে অবস্থিত ছিলেন। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি সমস্ত পৃথিবীর বরদাত্রিণী। সুতরাং এই নবজাতক যে জীবলোকের বিশেষ কল্যাণপ্রদ হইবে সকলের মনেই সেই আশার সঞ্চার হইল। এই পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া কৌশল্যা বক্ষঃস্থিত ইন্দ্রের জননী অদিতির মতই শোভা পাইতে লাগিলেন।

ইহার পরে পৌষ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে চন্দ্র পুষ্যনক্ষত্রস্থ নক্ষত্রে থাকিতে থাকিতেই কৈকেয়ীর পুত্র ভরতের জন্ম হইল। জন্ম সময়ে গ্রহাদির অবস্থান দেখিয়া দৈবজ্ঞগণ বলিলেন যে দশরথের এই সন্তান অতি শুদ্ধচিত্ত ও স্থিরবুদ্ধির মুবক হইবে। পরবর্ত্তী বৎসর শ্রাবণ মাসে, রাজের জন্মের সপ্তদশ মাসে, শুক্লা-প্রতিপদে অশ্লেষা নক্ষত্রে সুমিত্রা যুগ্মপুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন।

প্রত্যেকের জন্মের একাদশ দিন পরে স্বয়ং বশিষ্ঠ এই শিশুদের নাম করণ করিলেন। দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র কৌশল্যা তনয়ের নাম রাখা হইল রাম। পরবর্ত্তীকালে ইনিই সর্ব্বলোকের মনোভিরাম হইয়াছিলেন। কৈকেয়ীপুত্রের নামকরণ করা হইল ভরত, আর সুমিত্রার যমজ পুত্রদের নাম দেওয়া হইল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। এই দুইজনের মধ্যে লক্ষ্মণই শত্রুঘ্নের অগ্রজ।

* * *

অষ্টম বৎসরে গুরু বশিষ্ঠ ইহাদের বেদ অধ্যয়ন আরম্ভ করাইলেন। বালকগণের একাদশ বৎসর পূর্ণ হইলে উপযুক্ত উপাধ্যায়ের নিকট মহারাজ স্বয়ং ইহাদের অস্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে রামচন্দ্রই পিতার অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। রাম অস্ত্র শিক্ষায় যেন পিতার বক্ষকেও অতিক্রম করিয়া গেলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার আদেশ পালনে নিযুক্ত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগত হইয়াছিলেন। অগ্রজকে তিনি পিতা অপেক্ষাও পূজা করিতেন এবং আত্মা অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। কেহ তাঁহাকে কোন দুষ্টি আহার প্রদান করিলে রামচন্দ্রকে তাহার অংশ না দিয়া নিজের ভোগে উহা লাগাইতেন না। রাম যখন অশ্বপৃষ্ঠে মৃগয়ায় গমন করিতেন, তখন ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণও ধনুক ধারণ করিয়া রামের পশ্চাদ্‌গামী হইতেন এবং সর্ব্বদা সমস্ত বিপদ হইতে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। সকলে লক্ষ্মণকে বলিত, রামচন্দ্রের "বহিঃ প্রাণ ইবাপর". দেহাতিরিক্ত অন্য একটি প্রাণ।

এইরূপ শত্রুঘ্নও ছিলেন ভরতের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত। ভরতকে তিনি তাঁহার ন্যায় অনুসরণ করিতেন। তিনি লক্ষ্মণের সহোদর, না ভরতের সহোদর নগরবাসীজনেরও সে বিষয়ে ভ্রম হইত।

রামচন্দ্র বর্ণে ছিলেন "ইন্দীবর-শ্যামঃ." নীল পদ্মের ন্যায় শ্যামল আভাযুক্ত। এ বিষয়ে ভরতও রামের তুল্য ছিলেন। শত্রুঘ্ন ইহাদের অপেক্ষা অনেক গৌর বর্ণ ছিলেন। আর লক্ষ্মণ ছিলেন সম্পূর্ণ সুবর্ণচ্ছবি—তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট।

* * *

পনর ষোল বৎসর বয়সে ভ্রাতৃগণ অস্ত্রচালনায় কৃতবিদ্য হইলে একদিন অযোধ্যাপুরীতে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শুভাগমন হইল। তিনি রাজার ধর্ম্মনাকাঙ্ক্ষী হইয়া দ্বারাধ্যক্ষদিগকে বলিলেন যে রাজাকে সংবাদ দাও যে গাধির পুত্র কৌশিকবংশীয় বিশ্বামিত্র দ্বারে, তাঁহার ধর্ম্মাভিলাষী। দৌবারিকগণ সত্বর হইয়া রাজার নিকট ছুটিয়া গেল। রাজাও পুরোহিত বশিষ্ঠকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিয়া মহর্ষিকে ভিতরে আহ্বান করিয়া লইয়া গেলেন। ক্রমে হোমে কর্ম্মিতদেহ এই সত্যসন্ধ মহর্ষির যথোচিত পূজাবিধান করিয়া নৃপতি তাঁহার কুশল প্রশ্ন করিলেন। ঋষিবরও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া সর্ব্বিষয়ে তাঁহার কল্যাণ কামনা জানাইলেন,—পুত্র, কোষে, দুর্গে, জনপদে, সর্ব্বত্রই রাজার হিত কামনা করিলেন। হৃষ্টচিত্তে মহারাজ দশরথ বলিলেন, "বর্ষাগমে অমৃতলাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, অনাবৃষ্টির পর মেঘোদয় দেখিয়া লোকের মন যেমন আশান্বিত হয়, প্রিয় ভার্য্যার পুত্র প্রসবের শুনিয়া অপুত্রক যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আপনার আগমনে আমাদের মনও তেমনি

আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। আপনার সংগ্রাম বিফলার্থ আমি কোন কার্যে নিজকে নিয়োগ করিতে পারি, জানাইলে চরিতার্থ বোধ করিব।" এই সুযোগ যাচ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহর্ষি নিঃসঙ্কোচে বলিতে লাগিলেন, "পূর্ণবিশ্বাসে আপনাকে আমার মনোগত ইচ্ছা জানাইতেছি, কারণ জানি আপনি নিঃসন্দেহে ইহা পূর্ণ করিবেন। সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত আমি মৌন-ব্রত অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করি। যেমনই যজ্ঞভাগ সকল আহুতি হইলে মারীচ ও সুবাহু নামে রাক্ষসদ্বয়ের দুই পুত্র রুধিরবর্ষণে যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেয়। মৌন ভঙ্গ করিয়া আমি তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে পারিয়া; তাহাতে কাহারও প্রতি ক্রোধপ্রকাশ করিতে মনে বিতৃষ্ণা আসে, ব্রতচারীর মন এমনভাবেই শান্তরসে পূর্ণ থাকে। সুতরাং আপনার নিকট প্রার্থনা যে বীর পুত্র কাকপক্ষের দ্বারা মার্জিত কেশ-কলাপে সুশোভিত-ললাট রামচন্দ্রকে আমার ব্রতরক্ষার সহায় করিয়া দিন, যাহাতে রাক্ষসগণ আমার যজ্ঞের কোন বিঘ্ন করিতে না পারে। আশা করি আমার এ প্রস্তাব আপনার মন্ত্রিগণ এবং দেবর্ষি বশিষ্ঠও অনুমোদন করিবেন।"

কিন্তু রামের বিয়োগচিন্তায় অধীর হইয়া দশরথ প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞাপ্রাপ্তির পর দুঃখে ও ভয়ে বিশ্বামিত্রকে জানাইলেন, "আমার পুত্র কমললোচন রামচন্দ্রের বয়স আরিও ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। রাক্ষসদের সহিত ইহার যুদ্ধযোগ্যতা কোথায়? আপনার যজ্ঞরক্ষার্থে অক্ষৌহিণী সেনা পরিবৃত হইয়া আমি নিজে আপনার সঙ্গে যাইব; শত শত অস্ত্রবিশারদ বীরগণ আপনার ব্রতরক্ষা কার্যে জীবনপণ করিয়া আত্মনিয়োগ করিবে। আপনি এতদ অবস্থায় রামচন্দ্রকে লইয়া যাইবার জন্য যত্ন-পরিকর হইবেন না। আমার জন্ম হইতে আজ ষাট বৎসর গত হইতে চলিল। বহুদিন আমি অপুত্রক ছিলাম। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আমি পুত্রলাভে সমর্থ হইয়াছি। সর্বদাই মনে আশঙ্কা, কখন পুত্রহারা হই। আপনি আপনার যজ্ঞ-পণ্ডকারীদের সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বলুন। তাহারা কিরূপ পরাক্রমের, কে তাহাদের সহায়ক, কিভাবে তাহাদের নিরাকরণ করা সম্ভব—সমস্ত শুনিয়া আমি নিজেই যথাযোগ্য প্রতিবিধানে চেষ্টিত হইব।"

"মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই রাক্ষসাধিপতি রাবণের নাম শুনিয়াছেন," —এই বলিয়া বিশ্বামিত্র কথা আরম্ভ করিলেন। "লঙ্কায় তাহার রাজধানী এবং সমস্ত দক্ষিণাপথ তাহার শাসন মানিয়া চলে। বিন্ধ্য-পর্বতের সমস্ত শাখাপ্রশাখার উপরই তাহার কিছু না কিছু আধিপত্য আছে। তাহার অধীনস্থ দুর্বৃত্ত প্রাদেশিকগণ বিন্ধ্যপর্বত ছাড়াইয়া আর্য-রাজ্যগুলির উপরেও অনেক সময়ে অত্যাচার চালাইয়া থাকে। সেই রাবণের অনুচর মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস আমাদের আশ্রমে আসিয়াও ঋষিদের শান্তি নষ্ট করিতেছে। রামকে আশ্রমে লইয়া যাওয়া ছাড়া আমি তাহাদের অত্যাচার নিবারণের অন্য কোন উপায় দেখিতেছিনা।"

রাবণের নাম শুনিয়া স্বয়ং দশরথ ভীত হইয়া পড়িলেন। মারীচ ও সুবাহুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার অর্থই এই রাবণের শত্রুতা নিজের উপর টানিয়া আনা। ইহা তাহার সাধ্যের সম্পূর্ণ অতীত বলিয়া দশরথ বিশ্বামিত্রের নিকট নিজ অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্বামিত্র অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "স্বয়ং আমাকে প্রার্থনা জানাইতে অনুরোধ করিয়া পরে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকার করা কি রঘুকুলের উপযুক্ত কাজ হইতেছে? প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াই যদি আপনার সুখলাভ হয় তবে, হে কাকুৎস্থ, আপনি বন্ধুজনে পরিবৃত হইয়া সুখে থাকুন, আমি অন্যত্র গমন করি।"

বশিষ্ঠের ক্রোধে পৃথিবী পর্যন্ত বিচলিত হইতে পারে জানিয়া পুরোহিত বশিষ্ঠ দশরথকে হিত উপদেশদানে সন্তুষ্টকরণে প্রবৃত্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "বিশ্বামিত্রের কোন লাভের আমাদের উপর অনুগ্রহ প্রকাশবাঞ্ছা। ইচ্ছা করিলে এই শত্রু-প্রধান মহামুনি নিজেই রাক্ষসদের নিরাকরণ করিতে পারেন। রামের সাহায্যপ্রার্থনা শুধু আপনার পুত্রের প্রতি অসীম কৃপাপ্রদর্শন। অযোধ্যাধিপ রামচন্দ্র কৃতবিদ্যই হউন, অথবা তিনি নিতান্তই বালকই থাকুন, কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র যাহার রক্ষণ অনুধ্যান করিতেছেন কোন দুর্বৃত্তেরই সাধ্য হইবে না তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে রামের গমনে অনুজ্ঞা করুন।"

তারপর পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্তৃক নান্দী মাঙ্গলিক কার্যের অনুষ্ঠান করা হইলে দশরথ নির্ভয়ে রামের মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া আশীর্বাদ পূর্বক তাহাকে বিশ্বামিত্রের সহিত প্রেরণ করিলেন। ধনুর্বাণধারী বালক লক্ষ্মণ তাহার সহযাত্রী হইলেন। পীতাম্বরের অঙ্গুলিত্রাণ ধারণ করিয়া শরাসন-তূণ-ধনুর্ধারী সুন্দর কেশকলাপে মণ্ডিত এই রাজপুত্রদ্বয় যখন বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন তখন মনে হইল যেন অশ্বিনী-কুমারদ্বয় পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছেন। অতুল শ্রীসম্পন্ন, বীর্যযুক্ত চারু-বপু ভ্রাতৃদ্বয় যখন সৌষ্ঠবে সর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া ঋষি-প্রদর্শিত পথে গমন করিতেছিলেন তখন সকলেই মনে করিতে লাগিল যেন পাবক-ভাতৃ যুগল স্কন্দদ্বয় অগ্নিবায়ুসহ ভাগ্নেয়ের অনুসরণ করিতেছেন।

সরযূর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অর্ধযোজনের কিছু দূর বেশী পথ অতিক্রম করার পর বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, "বৎস শুদ্ধ-সাধনেচ্ছু আপ। সরযূর পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া শুচি হও।" দুই ভ্রাতা সান্ধ্যকৃত্যাদি শেষ করিলে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামে দুইটি বৈদিক মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। শুচি হইয়া এই মন্ত্রের আবৃত্তি করিলে ক্ষুৎ-পিপাসার প্রকোপ হইতে শরীর মুক্ত হয় এবং যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও কোন শত্রুর নিকট পরাজয় সহ্য করিতে হয় না। রামচন্দ্র শ্রদ্ধার সহিত পুণ্যকীর্তি ঋষির নিকট হইতে এই মন্ত্র-গ্রাম গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাহার তেজ ও কান্তি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে তিনি শরৎকালের মেঘমুক্ত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

* * *

সেই রাত্রি তিনজনে সুখে সরযূর তীরে যাপন করিয়া প্রভাত হইলে আবার পথ চলিতে প্রস্তুত হইলেন। বিশ্বামিত্র কুমারদ্বয়ের প্রাতঃ মধ্যাহ্নকালীন ও সান্ধ্য উপাসনার প্রতি সব সময়েই দৃষ্টি দিতে ছিলেন।

পুণ্য সরযূর জলে স্নানাদি করিয়া পারত্রৈবারে তাঁহারা কবির উপদেশ মত বেত্রবতীর বক্ষনায় যাইবার স্থির করিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে তাঁহারা সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানে শান্তরসাস্পদ কবিদের আশ্রম দেখিয়া রামচন্দ্র শ্রীলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এমন সুন্দর আশ্রমে কোন্ পুণ্যবান ঋষি বাস করেন? মনে হয় বহু শত বৎসর ধরিয়া এখানে তপস্বিগণের বাস ছিল, আশ্রম বৃক্ষ সকল এত বর্দ্ধিত ও ছায়াযুক্ত।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "এই আশ্রম কত প্রাচীন কেহই বলিতে পারে না। শুনা যায় ভগবান্ ব্রহ্মা এই মহানদীর সঙ্গমস্থলে তপস্যা করিতেন। তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য পরম্পরায় এখানে তপস্বিগণ বাস করিয়া আসিতেছেন। আমরা আজ এই শুভ আশ্রমে রাত্রিবাসে আশ্রম লইয়া প্রভাতে নদী পার হইয়া যাইব।" বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই আশ্রমবাসী ঋষিগণ ফল, মূল, বন্যাদি লইয়া অতিথিদের সম্বর্দ্ধনা করিতে অগ্রসর হইলেন। সর্বজনপরিচিত প্রাচীন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পাদবন্দনা করিয়া সকলেই তাঁহাকে রাম লক্ষ্মণ কিরূপ প্রশ্ন করিলেন, তাহারা আশ্রমবাসীদের এই কৌতূহলের বিষয় হইয়াছিলেন। এই প্রকারে সুখে রাত্রিবাস করিয়া কুমারদ্বয়ের সহিত মহর্ষি প্রভাতে গঙ্গা নদী নৌকাযোগে উত্তীর্ণ হইলেন।

নৌকাযোগে দুই রাঘব-ধারিনী গঙ্গানদীর মধ্যস্থলে আসিয়া তিন জনেই তুমুল তরঙ্গধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অতি নিকটেই সরযূ নদী গঙ্গায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই নদীদ্বয়ের জলস্রোতের প্রচণ্ড আঘাতে অনুক্ষণ জল-কল্লোলের সৃষ্টি হইয়া দুই কান প্রায় বধির করিয়া দিতে ছিল। গঙ্গার কিঞ্চিৎ দূরে আসিয়া তাঁহারা পরস্পরে অনেকটা দূরে অতিক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তদবস্থিতি ভূধর বন ও মধ্যে মধ্যে বড় বড় কতকগুলি গাছ ছাড়া কোন তরুমানবের বসতি তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। রামচন্দ্র ইহার কারণ সম্বন্ধে মুনিবরকে প্রশ্ন করিলে বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন, "যেখানে এই বিজন বনের প্রসার দেখা যাইতেছে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেও সেখানে সমৃদ্ধিশালী দুই জনপদ ছিল। মলদ ও করূষ নামে এই দুই জন-পদে বর্ণাশ্রমীতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইত এবং স্বয়ং ইন্দ্র প্রীত হইয়া এখানে প্রভূত ধন বর্ষণ করিতেন। শস্যশালিনী এই ভূমিখণ্ডের রাক্ষসের অত্যাচারে আজ জনশূন্য। রাক্ষস-রাজ রাক্ষসেশ্বর প্রাদেশিক সুন্দ নামক বিখ্যাত যোদ্ধা এখন যখন আর্যাবর্তের শুভ করিতেছিল তখন সে ঋষিদের কোপে পড়িয়া বিনষ্ট হয়। তারপর হইতে তাহার স্ত্রী তাটকা নাম্নী রাক্ষসকন্যাই এই দেশ শাসন করিয়া আসিতেছে। তাহার অধীনস্থ রাক্ষসদিগের অত্যাচারে এ জনের নিকট দিয়াও লোকে যাতায়াত করিতে ভয় পায়।"

বিশ্বামিত্রের কথা শেষ হইতে না হইতেই দূরে ঘোরবপু রাক্ষসসমূহের আবির্ভাব হইল। তাহাদের পশ্চাতে তাহাদের খ্যাতি-কীর্ত্তি সেই-নায়িকা তাটকাকেও দেখা গেল। আর্যমূর্ত্তির দর্শনে রাক্ষসদিগের ক্রোধ বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা প্রথমে রামাদির উপর দারুণ শিলা-বর্ষণ আরম্ভ করিল। রাম লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, মুনিকে লইয়া কোন বড় গাছের আড়ালে আশ্রয় লইতে। তারপর ধনুকে শরযোজনা করিয়া তিনি রাক্ষসদের আক্রমণ নিরাকরণ করিতে লাগিলেন। শাণিত অস্ত্রের আঘাতে অনেকের দেহই আহত হইলে রাক্ষসগণ কর্ত্তব্যজ্ঞানে যাহাদিগকে রেখা করিয়াছিল শিলাবৃষ্টি ছাড়িয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহাদের বধসাধনে সচেষ্ট হইল। কিন্তু রামের অস্ত্রের সম্মুখে কেহই টিকিতে পারিল না। রাক্ষসগণ পলাইতেছে দেখিয়া বিশ্বামিত্র লক্ষ্মণকে লইয়া রামের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে সমূলে সংহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের গায়ে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে রামচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাটকা পুনরায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল। ইহারা প্রথমেই ঋষি বিশ্বামিত্রকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রামের অস্ত্রপ্রভাবে ঋষির কোন অনিষ্ট করিতে না পারিয়া তাহারা রামের প্রতিই ধাবিত হইল। রামচন্দ্রের ক্ষত্রবুদ্ধি তখনও তাহাকে স্ত্রীজনের দেহে অস্ত্রাঘাত করিতে বিরত রাখিল, অথচ নিজে তিনি শত্রু-অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িতেছিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যুদ্ধে স্থির উপদেশ দিয়া বলিলেন, "স্ত্রীজন বলিয়া ইহাকে অবজ্ঞা করা তোমার উচিত হইতেছে না। সন্ধ্যার পর রাক্ষসদের যুদ্ধ শক্তি অনেক গুণ বর্দ্ধিত হয়। তখন ইহাদের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠা শক্ত হইবে। এই তাড়কা বহু সজ্জনের বিনাশ করিয়াছে এবং একটা সমগ্র জনপদ ইহার অত্যাচারে আজ জনশূন্য। ইহাকে বধ করিতে কোনই পাপ নাই। চাতুর্বর্ণ্যের হিতার্থে ইহার শাসন আজ তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং এই অধর্মচারিণীর বধ সাধন করিয়া তুমি প্রজাপালনরূপ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য যত্নবান হও। বৈদিক আখ্যানে রহিয়াছে যে পুরাকালে বিরোচন-সুতা মন্থরা যখন পৃথিবীকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল তখন ইন্দ্র তাহার সংহার করিয়া পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। মহর্ষি উশনার মাতা খলপিনী ভৃগুপত্নী যখন ইন্দ্রের বিরোধ সাধনের জন্য উদ্যুক্তা হইয়াছিলেন স্বয়ং বিষ্ণু তখন তাঁহাকে বধ করিয়া বিশ্বসংসার রক্ষা করেন।"

রামচন্দ্র বলিলেন, "অযোধ্যার সর্বজনকে পিতা আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা সব সময়ে নির্বিবাদে পালন করিতে হইবে। আপনার নির্দ্দেশে বর্ত্তমান থাকায় তাই আমি—

গো ব্রাহ্মণ হিতার্থায় দেশস্য চ হিতায় চ
করিষ্যামি ন সন্দেহ তাটকাবধমুত্তমম্।

গো ব্রাহ্মণের হিতার্থে এবং দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত নিঃসন্দেহে তাটকা বধরূপ ধর্ম্ম কার্য্যে চেষ্টিত হইব। এই বলিয়া রাম ধনুকের জ্যা নিঘোষ করিয়া তাটকার ক্রোধ বৃদ্ধি করিলেন। তখন চারিদিক হইতে তাটকার অনুচরগণ শিলাবর্ষণের দ্বারা রাম লক্ষ্মণকে আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু শরজালে এই শিলাবৃষ্টির নিবারণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, "বেধ লক্ষ্মণ এই নিশাচরীর কি দারুণ বপু, ইহাকে শুধু দর্শন করিয়াই তীক্ষ্ণদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" অতি বৃহদাকার শূল হাতে লইয়া উন্নত-তুণ্ড এই রাক্ষসী যখন প্রায় রামের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন রামচন্দ্র শাণিত শরের আঘাতে ইহার বাহুদ্বয় ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। এমত অবস্থাতেও তাটকা নানা রকম মুখভঙ্গী দ্বারা বিশ্বামিত্রকে যখন বিত্রাসিত করিতেছিল তখন সুমিত্রা-নন্দন লক্ষ্মণ তাহার নাসিকা ও কর্ণাগ্র তীক্ষ্ণ বাণ সন্ধানের আঘাতে পণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ক্রোধে রাক্ষসীর দেহ যেন চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সে শুধু প্রচণ্ডতার শক্তিকে নিষ্পিষ্ট করার আগ্রহে ধাইয়া আসিতেছিল এমন সময়ে রামের বাণ তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল।

এই দুরন্ত রাক্ষস নায়িকার বিনাশ হইলে স্বর্গে দেবগণও যেন রাম-চন্দ্রের জয়গান করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র আসিয়া স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। এই ঘোর বনপ্রদেশও সেই মুহূর্ত্তে যেন আতপাপমুক্ত হইয়া হাসিমুখে অতিথি তিনজনকে আহ্বান করিতে লাগিল। সেই রাত্রি তাঁহারা এই তাটকা বনেই যাপন করিয়া প্রভাতে উঠিয়া বিশ্বামিত্রের আশ্রমের দিকে আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

গানে রামপ্রসাদ

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

চিরবহ্নিময়ী চিরন্তনী চতুরা অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ের নিপুণ হাতে গড়ে তোলা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের জীবন, এই অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে তাঁর জননী, এলোকেশী শ্যামা মা। শাস্ত্রকারগণ এই মহাভাবময়ী এলোকেশীকে নানা রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রসাদ সুরছন্দে তাঁহার হৃদয়ের ভাব দিয়া মহাভাবময়ীকে রূপ দিয়াছেন, সেই রূপটি ধরা পড়ে সাধকের নিকট। আমরা জনসাধারণ সর্বক্ষেত্রে সম্যকরূপে তাহা উপলব্ধি করি না, বাস্তব রূপ দেওয়ার সঙ্গেও অনমনীয় সিদ্ধতার কার্য। পিতৃহারা বালক মায়ের জন্য কাঁদিয়া আকুল, মা ছাড়া থাকিতে পারে না। এই অহরহ-ব্যাপী ক্রন্দনই করিয়াছিল প্রসাদের জীবন গীতিময়, যে গীত-প্রবাহের অন্তর্নিহিত ভাবধারা রত্ন সিংহাসন হইতে জগজ্জননীকে নামাইয়া গৃহীর হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। প্রসাদের লক্ষ্য ছিল গানের ভাবের প্রতি, প্রাণের উপর, কোন বাহ্য সৌন্দর্যের উপর ছিল না, গানগুলি ভাবের বিকাশ মাত্র; কোন প্রযত্নসাধ্য রচনা নহে। রঙ্গরসিক চূড়ামণি রামপ্রসাদ কোনদিন কাহারও কটূক্তি ব্যঙ্গোক্তিতে বিরক্ত হন নাই। স্ত্রীর সহিত রঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন, "আমার কর্ম্ম ফলে", রসিকতা করিয়াছেন "লীলা খেলার অঙ্গণা ফুরায়ে গেল" আবার কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন "যার মন্ত্রে মন্ত্র ভেবে, সেই প্রেয়সী বেচে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে কলে"। মায়ের সঙ্গেও বিচিত্র ব্যবহার। মাতোড়বান্দা বারনাধারা অভিমানী ছেলে, এখনি মায়ের প্রতি গালি বর্ষণ করে, পরক্ষণেই মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়ে—বলে "মা আমার কি হবে মা"। জননীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—"যাবাতে নির্দয়া সর্ব্বনাশী তোমার কুপুত্রের যাবন করে অনোচাত্তে কাশী চলে যাব"। আবার সেই মাকেই বলিতেছেন "আমি শরণ নিলাম চরণ তলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি"। আবার দর্পভরে বলিতেছেন "আমি আপন মনে ভাকি ধনি, যার ছেলে তার কোলে যাব"। স্নেহের পুতলী রামপ্রসাদ, আদরিণী শ্যামা মা তাঁহার সকল আবদার অভিমান সহ্য করিয়া "সন্ধ্যাবেলা কোলের ছেলেকে ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

প্রসাদের কৃষ্ণ সাধন বিশ্বিত হইতে হয়। সংসারে অত্যধিষ্টি কষ্টক্লিষ্টিত প্রসাদ স্বয়ং ত্যাসমৃষ্টি, কর্ত্তব্যপালনে কোনদিন অবহেলা করেন নাই, লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তাঁহার গৃহদ্বার হইতে কোনদিন অতিথি ফিরিয়া যায় নাই। দুঃখ দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়া তিনি নিজ গৃহে স্বর্গের আবির্ভাব করিয়াছিলেন। সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, শুচি অশুচির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বহুত্বের মাঝে চির-একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন—শিব রাম কৃষ্ণ কালীর মানবকল্পিত সকল ভেদাভেদ ঘুচাইয়া মহাসত্যের উচ্চ অধিষ্ঠানে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার বৃহদ্গীতত্ত্বের মহাবাক্য প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন—"পরমাত্মৈব সাম্যোহয়ং মহাবিষ্ণুর্মহা শিবঃ। নিরঞ্জন স্বরূপোহয়ং কৃষ্ণরূপা চ তারিণী"। প্রসাদের গানে—"মন করো না ষেথা সেথা। যদি চাহিবে বৈকুণ্ঠবাসী। ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী"। এলোকেশী নিখিলেরো ব্রহ্মশক্তি, কালী কৃষ্ণ শিব রাম নিখিলেরো ব্রহ্মশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, সাধকের প্রার্থনা অনুসারে পরমের বিক্ষেপ শক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। উপনিষদ ও তন্ত্রে এই চারি মূর্ত্তিকেই বহ্নি ও ব্যোমরূপা (কৃষ্ণবর্ণা, শ্যামবর্ণা ইত্যাদি) বলিয়াছেন এবং ইহা অনুভব করিয়াই "প্রসাদ ভণে অন্তর জানে কালোরূপে মেশামেশি"।

প্রসাদের অধিকাংশ গানই স্তোত্ররূপে গণ্য। লীলা-প্রসঙ্গ পুস্তকে দেখা যায় (পরমহংস)—ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই সকল গান করা নিত্যপূজার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এই সকল গীত গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ব্যাকুল হৃদয়ে বলিতেন—"মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না"। এখানে ইহা উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে পরমহংসদেব বেলঘরিয়ার বাগানে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের সহিত প্রথম সাক্ষাতে একটি রামপ্রসাদী গান গাহিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। এই গানটি—"কে জানে মন কালী কেমন"। আবার একথাও পাওয়া যাইতেছে, পরমহংসদেব গানের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ডাক্তার সরকারকে দিবার জন্য মাষ্টারকে দিয়া বলিয়াছেন "এই সব গান (ডাক্তারের ভিতর) ঢুকিয়ে দিবে। প্রসঙ্গত কয়েকটি গানও বলাইয়া লেন "মন কর কি তত্ত্ব তারে" ইত্যাদি। বিক্রমপুরের (পূর্ব্ববঙ্গ) গুণী সাধক রাজমোহন অধুনী তর্কালঙ্কার বৈদিক ব্যাপারে কলিকাতা আসিয়া রামপ্রসাদের গান প্রসাদী সুরে গাহিবার রীতি শিক্ষার জন্য প্রথমে ঝিঁঝিটবাহির রাগ রাগিণী বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি কোনদিন হালিসহর যান নাই এরূপ অনুমান যুক্তি বিরুদ্ধ হইবে।

রামপ্রসাদের জন্মস্থান হালিসহর পরগণা কুমারহট্ট গ্রাম। এই গ্রাম সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল বৈষ্ণবকেন্দ্র রূপে। ঈশ্বরপুরী, ঈশান নগর, শ্রীবিবাস, শ্রীবাস, কবি কর্ণপুর প্রভৃতি বিশিষ্ট চৈতন্য পারিষদ ও ভক্তগণের সহিত হালিসহরের নাম বিজড়িত। হরিনাম মূর্ত্তি মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এখানে কয়েকবার আসিয়াছিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় শাক্ত সম্প্রদায় সমাজের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে তৎপর হইয়া উঠে এবং উহার ফলে সত্যই নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পারিষদের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছিল! রামপ্রসাদ এ সম্পর্কে দোষীর উপরই দোষারোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরের ধারণা, তাঁহার বক্তব্য বিষয় তিনি গানের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রামবাসী শুনিয়াছিল—"ও মন তোর ভ্রম গেল না। পেয়ে শক্তি-তত্ত্ব হলি মত্ত

হরি—হর হোর এক হয় না। প্রসাদ যদি গেয়েছেন এ যে কপট সন্ন্যাসী, তুমি শ্যামাকে প্রতিষ্ঠা কর চক্ষু থাকতে হবে কাণা। এই গানে অভিব্যক্তি থাকে। তিনি সাধনার সাধনা সম্পর্কীয় একটি সমস্যা পূরণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পুনরায় এই মাত্র বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, আবার গাহিলেন—"মন করো না বেষাবেষি। ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম, সকল আমার এলোকেশী। শিব রূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে ধর বাঁশী। ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালী রূপে ধর অসি। শ্মশানবাসিনী কাশী অযোধ্যা গোকুল বিহারী"। রামপ্রসাদের দ্বিধা সঙ্কোচ ছিল না, তিনি সত্যকে আপন করিয়াছিলেন, অকপট হৃদয়ে সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের রচনায় বিচ্ছুক্তি বা বৈকল্যস্থিতি কোন আশ্চর্য্য ঘটনা নহে। তাঁহার ইষ্টের উপরের উপলব্ধি সাধকের সাধনাপ্রসূত ধারণা, তিনি চিত্র ভাবে দেখেন নাই। এই রকম অভিন্ন দেখা তাঁহার সাধনার বস্তু বৈষ্ণব পদাবলীর স্থানে স্থানে যেমন তাত্ত্বিক ভাব দৃষ্টিগোচর হয় তেমনই রামপ্রসাদের কবিপ্রতিভাও বৈষ্ণব প্রভাব বিমুক্ত নহে। বৈষ্ণব ভাবে সাহিত্যের যুগ হইতে অদ্যাবধি এই দুইশতকালের মধ্যসময়ের শেষ পাদে যে সকল কবি সেই ভাব সাহিত্যের সুরই রক্ষা করিয়াছেন ইহাদের অন্যতম রামপ্রসাদ সেন। বিদ্যাপতির "তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, সাগর লহরী সমানা;" রামপ্রসাদের কথায় "যেমন ঢেউয়ে দিয়ে জলে জল, তার জল সে মিলায় জলে"। পুনরায়, "আর জনম হাম, নিমাই সাজিতুঁ, হর কিছু কহনি না গেলা"। বিদ্যাপতির বর্ষা, রসরঙ্গে মাতল, তোহে হরব কোন বেলা"। রামপ্রসাদ—"প্রভাতে সাত কিরে ছিলে, তার সঙ্গে সাত ভূত ছিলে, ওর পরনে বাঘ সঙ্গে ছিলে, বল না তোরে কখন চিনি। ছিলে এক মাগে ছিলে, ওর সঙ্গেই করি তাই ছিলে"। পুনরায় ঠিক একই ভাবে রামপ্রসাদের—"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তা জান না। মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে ও মন করতে চাও তাঁর উপাসনা।" মধুর দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়—"প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, এ কি বিশ্বিল তোমার প্রতিমা। মন্দির তব কি গড়িব নাথে, মন্দির তব বিশ্বময় নীলিমা" প্রসাদের সৌ বিষয়ে বর্ণনা ও গভীরতর বিষয়ক গানগুলি চণ্ডীদাসের পদাবলীর সহিত তুলনা করা চলে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে—"কেমনে এ নদী যমুনা পেরাব, মোর মনে হেন লয়। তরঙ্গ কথার বহিছে দুবার, হইয়াছে নদীর ভয়"। "পাকা নৌকাখানি পরিয়াছে সুরে, আমার কি আছে সোর"। প্রসাদের, "ওরে নূতন নেয়ে ভাসা নৌকা চল বেয়ে। চুকুল রহিল দূর ঘর গন হানিছে চিকুর; কেমন কেমন করয় বেলা, বাক বহুবার ভাসে খেয়া" সম্প্রতি ইহার রূপান্তর পাওয়া যাইতেছে—"ধীরে ধীরে কর পার। আমি যে অবলা নারী না জানি সাঁতার। মাঝদরিয়ায় ডুবালে তরী কলঙ্ক তোমার"। এই পংক্তি চরণ প্রভৃতি বা বিচ্ছিন্ন সাহিত্য হিসাবে বিচার প্রবন্ধের বিষয় নহে। এইটুকু বলা যাইতে পারে চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের ভাব ভাষা ভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্টি হয় না। আর একটি দেখুন—গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন—"চল চল গোরি অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়। ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মুরছা পায়। হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়। নয়ান ভাঙ্গিতে, বিষম বিশিখে, পরাণ বিন্ধিতে চায়"। প্রসাদের গানে—"প্রথম বয়স রাই রস রঙ্গিণী, চলচল চলচল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী। রাই যে পথে পরান করে, মদন পরাণ ঝুরে, কুলিল কটাক্ষ পরে, জিনিল ধনুষ শরে"। এ কথাও ঠিক যে প্রসাদের ইষ্টদেবী কালী—কৃষ্ণা, কৃষ্ণপ্রিয়া, কালিন্দীজল সঞ্চারণ, কালিন্দী জল পূজিতা। (বৃহন্নীলতন্ত্র) এবং তাঁহার গানেও পাওয়া যাইতেছে—"ছিল বিজন ঘটে, এবে পীঠ ঘটে, এলো চুল চূড়া বংশীধারী। পূর্ব্বে শোনিত সাগরে ভেসেছিলে শ্যামা, এবে প্রিয় তব যমুনা বারি। রামপ্রসাদের জীবন চরিত আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার শ্যাম শ্যামাকে উপযুক্ত স্থান দিতে হইবে, নতুবা জীবন চরিতের একটি মূল্যবান্ অংশ বর্জ্জিত হইবে এবং চক্ষু থাকিতে হবে কাণা। রামপ্রসাদ তন্ত্রমোহিত পথে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—

"জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর বামে, কভু হরহৃদি পরে।
কখন বিষরূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী
কভু শ্যাম সোহাগিনী, কভু রাধার পায়ে ধরে। ইত্যাদি"

প্রবন্ধ সমাপ্তির পূর্ব্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহা সর্ব্বজন বিদিত যে আহুরে ছেলে রামপ্রসাদ তাঁহার অভিভাবক গায়ের নিকট যত আদর পাইয়াছেন তাহার কিছুটা পরিমাণে তিনি চক্ষুঃশূল হইয়াছেন কয়েকজন সমালোচকের নিকট। তাঁহারা প্রসাদী গানের উপর একটা দাবী খাড়া করিতে চাহেন কয়েকটা গানে ব্যবহৃত অল্প প্রমেয়ের শব্দের অনুহাতে। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে আর্য্য-অনার্য্য যুগ হইতে শব্দ, বাক্য, কথা, ভাষা এমন কি জাতিরও মিশ্রণ, সংমিশ্রণ, বিমিশ্রণ পরিবর্ত্তনাদি কি ভাবে সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন শব্দাদি পশ্চিমে ব্যবহার হইয়া থাকিলে যে সেই গান গাধা পূর্ব্বেরই সম্পত্তি হইবে তাহা নহে। একটি গানে রহিয়াছে—"একবারং ভজং সর্ব্বে, দ্বিতীয়া কা ময়াপরা", এ পঙ্‌ক্তিটি মার্কণ্ডের পুরাণের হওয়ায় ইহাও কি স্বীকার করিতে হইবে যে ঐ গানটিও মার্কণ্ডের পুরাণের ঋষি গাহিয়াছেন এবং "গঙ্গায়াং স্নানতঃ মোক্ষ" ও "গঙ্গায়ং গঙ্গ নাস্তি" গান দুইটি সংহিতাকারের রচনা। কিমধিকমিতি।

বাক্-বিভূতি

অধ্যাপক ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাস

(২)

গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে বাক্-বিভূতির প্রথম পরব প্রকাশিত হয়। স্বল্পকাল মধ্যে একাধিক মাসিক পত্রিকায় উহার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি ও সমালোচনা দৃষ্টে মনে হয় বিষয়টি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। তাই উহার দ্বিতীয় পরব প্রকাশের প্রয়াস পাইতেছি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ হানসেন ব্যাধিজনিত অসাড়তা দূরীকরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। সমাজ দেহের প্রতি অঙ্গে আজ যে পোচনীয় অসাড়তা ও কুষ্ঠিত ক্ষত উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা নিরাকরণ করা কোনও একক মানুষের সাধ্য নয়। যাহাতে দেশের সর্বস্তরে সুধীজনেরা এ বিষয়ে সমুচিত তৎপরতা অবলম্বন করেন সেই উদ্দেশ্যে আজ কয়েকজন মুপ্রতিষ্ঠ মনীষীর বাণী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক মূল ফ্রেমাণ হইতে এগুলি পড়িলে আরও লাভবান এবং আনন্দিত হইবেন বলিয়া আমার ধারণা। এই বাণীগুলি কখনও পুরাতন হইবার নয়—পরন্তু যতদিন যাইবে ইহাদের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ততই প্রোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত হইয়া মানবসমাজকে সত্য, শিব ও সুন্দরের পথে চলিতে অনুপ্রাণিত করিবে। এগুলি চিন্তাশীল বাঙালীর মনের 'সুইচ' খুলিয়া দিবে এবং তাহাদিগকে সচিন্তা ও সৎকর্মে প্রবুদ্ধ করিয়া সমাজের সর্বপ্রকার গ্লানি দূর করিবার অপরের শক্তি দান করিবে বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

Abraham Lincoln

(ডিমোক্র্যাসি)

আমি যেমন খ্রীষ্টদাস হইতে চাই না—তেমনই প্রভু হইতেও আমার কোনও সাধ নাই। ডিমোক্র্যাসি সম্বন্ধে ধারণার মূলে আমার এই মনোভাবই বিদ্যমান। যাহা এই ধারণা হইতে বিচ্যুত এবং যে পরিমাণে বিচ্যুত তাহা ডিমোক্র্যাসি নয়।

Thomas G. Masaryk

(ডিমোক্র্যাসি)

ডিমোক্র্যাসি কেবলমাত্র এক প্রকারের শাসনতন্ত্র নয় পরন্তু ইহা মানবের সৃষ্টি এবং সমষ্টিগত জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতীক—প্রকৃত পক্ষে ইহা বিশ্ব-নির্দেশ। মানুষে মানুষে পারিপূর্ণ আদান প্রদান, প্রীতি এবং মানবতার বিকাশই ডিমোক্র্যাসির প্রাণস্বরূপ। সত্যিকারের ডিমোক্র্যাসি শুধু একটি সংস্থা নয়—এর কারবার জীবন্ত মানুষ লইয়া—যাহারা তাহাদের ষ্টেট এবং জাতির লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনবান্ এবং যাহারা একটি মৌলিক আদর্শ দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ। আমাদের ডিমোক্র্যাসি কেবলমাত্র ষ্টেটের কর্মচারী এবং সেবাধর্মকে সভ্যানুগতিক শিক্ষাদান করিয়া এবং তাহাদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত নয়, পরন্তু উহা দেশের সমগ্র মননশীল অধিবাসীকেই আদর্শধারে উদ্বুদ্ধ করে। দেশের প্রত্যেকটি অধিবাসীই ষ্টেটের কৃষি-শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্মের ধারক, বাহক ও রক্ষক বলিয়া মনে করে। এই কারণেই আমাদের ডিমোক্র্যাসি সতত বিকাশশীল বিতর্ক ও বিবাদ—আর এই বিবাদের কেন্দ্র হইতেছে সকল মস্তিষ্ক ও ধরণ-ধারণ ছন্দ।

Immanuel Kant

(স্বাধীনতাপ্রাপ্তির যোগ্যতা)

একথা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে রাজী নই যে, কোনও একটি জাতি এখনও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির যোগ্য হয় নাই। এই নিয়ম মানিতে হইলে স্বাধীনতা কখনও আসিতে পারে না। যেহেতু স্বাধীনতা না দিলে কেহ স্বাধীনতা লাভের যোগ্য কি না তাহা বুঝা যাইবে কি প্রকারে? যাহারা বহুকাল পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ আছে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিলে হয়ত প্রথমে তাহারা ভুলচুক করিবে এবং বহুবিধ ক্লেশ ও অসুবিধাও ভোগ করিতে পারে; কিন্তু ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানুষ আত্মশক্তি বিকাশের ও অনুশীলনের সুযোগ না পাইলে সে কখনও উপযুক্ততা অর্জনে সমর্থ হইতে পারে না।

(অছি)

আলস্য এবং ভীরুতা বশতঃই মানবগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ অপরের পরিচালনা হইতে মুক্ত হইয়াও নাবালক অবস্থাতে থাকিতেই ভালবাসে। নাবালক রাখিয়া থাকা অনেকটা আরামদায়কও বটে। আমি অবশ্য ইহা কখনও প্রয়োজন বলিয়া বোধ করি না যে আমি যখন খরচা জোগাইতে পারি তখন হাট-বাজার করিবার ঝক্কি অপরের ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি। অধিকাংশ মানুষই (তন্মধ্যে সমুদয় স্ত্রীজাতি ও বটেই) সাবালকত্ব প্রাপ্তিকে ভীতির চক্ষে দেখে এবং সেই কারণেই অছিরা তাহাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায়। এ যেন বাড়ির বয়স্কদিগকে বোকা করিয়া এবং ভয় দেখাইয়া রাখা—যাহাতে তাহারা একাকী আর বাহিরে যাইবার চেষ্টা না করে। কিন্তু এই কৃত্রিম ভয় একবার ভাঙিলেই তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণের ক্ষমতা লাভ করিতে পারে।

Johann Wolfgang Goethe

(ষ্টেট ও স্বাধীনতা)

আমরা বিভিন্ন প্রকারের শাসনতন্ত্রের বিষয় বিচার করিতে বসিয়া এই মোদ্দা কথাটি ভুলিয়া যাই যে, যে রকমের গবর্ণমেণ্টই হউক না কেন তাহার মধ্যে স্বাধীনতা এবং তাহার বিপরীত উভয় শ্রেণীর মত অধিষ্ঠিতভাবে দুই প্রান্তে অবস্থিতি করে। যদি ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা আসে, তবে জনগণ হয় তাহার পদানত ; আর যদি জনগণের হাতে ক্ষমতা বর্ত্তায় তবে কষ্ট পড়ে অল্পবিস্তর। এই ব্যাপার ধাপে ধাপে চলে, যতক্ষণ না কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও শুভক্ষণে শুভ মুহূর্তে শুভ সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। ঐতিহাসিকদের নিকট এই ব্যাপার অপরিচিত নয় যদিও সাধারণের পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা কঠিন। স্বাধীনতার বার্ত্তা তখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনি যখন কোনও দল অপর দলকে পদানত করিতে চায় এবং যখন ক্ষমতা, প্রভাব ও ঐশ্বর্য্য এক হাত হইতে অপর হাতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলতঃ স্বাধীনতা শুধু ষড়যন্ত্রকারীদের গোপন মন্ত্রণা, প্রকাশ্য বিদ্রোহীদের যুদ্ধক্ষেত্রের উল্লাস চীৎকার এবং স্বৈরাচারীর সমর্থন বাক্য।—আর এই বাক্য বেশ করিয়া শোন, যার যখন উপযুক্ত ক্ষেত্রের লোকেরা অধীন মানুষের দলকে শত্রুর বিপক্ষে ক্ষেপিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধ শক্তির নিষ্পেষণ হইতে তাহাদিগকে চিরতরে মুক্ত রাখিবার আশ্বাস দান করে।

(বিজাতি-বিদ্বেষ)

নোটের উপর বিজাতি-বিদ্বেষ একটি আশ্চর্য্য বস্তু। সংস্কৃতির নিম্নতম স্তরেই এর প্রভাব সব চেয়ে বেশী। অবশ্য জাতীয় চিত্তোৎকর্ষের এমন একটি স্তর আছে যেখানে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়—সেখানে মানুষ বৃহৎ পরিমাণে জাতীয়তার গণ্ডীর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। এইরূপ স্তরে পৌঁছিলে কোনও একটি জাতি তার প্রতিবেশী জাতির সুখদুঃখকে তার আপন সুখদুঃখের মতই অনুভব করিতে পারে।

(আধুনিক যুদ্ধ)

আধুনিক যুদ্ধ যতদিন চলে ততদিন ইহা অনন্ত মানবের অশান্তি সৃষ্টি করে এবং যখন শেষ হয় তখনও ইহা কাহারও দুঃখ-শান্তির কারণ হয় না।

Johann Gottfried Herder

(জাতীয় গর্ব)

সকল প্রকার গর্বের মধ্যে জাতীয়তার গর্ব আমার কাছে সব চেয়ে বড় মূর্খতা বলিয়া মনে হয়। জাতি কি? এ যেন একটি বৃহৎ অস্ত্র-সজ্জিত পাষাণ—উপকারী চিত্তির এবং আশাভাজে ভর্ত্তি। ভূগোল, মূর্খতা, উৎকর্ষ-অপকর্ষবিজড়িত এই আজব বস্তুটা বিনাবিচারে কে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে? আমরা সাধ্যানুসারে জাতির সম্মানের জন্য শক্তি নিয়োজিত করিব কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ইহার দোষ দেখিতেও বিরত হইব না।

প্রকৃতি হাতার যন্ত্র যুক্তহস্তে ছড়াইয়া দিয়াছে। প্রকৃতির অভিপ্রেত এই যে, ব্যক্তির মত জাতিও বহুত অপরের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিবে এবং মনে প্রাণে স্বীকার করিবে যে কোনও একটি জাতি ঈশ্বরের একমাত্র প্রেরিত বা অনুগৃহীত নয়। সকলকেই সমভাবে মহোৎসব সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে তাহারা এই উদ্যানকে সমবেত চেষ্টায় সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে রচনা করিতে পারে।

জাতীয় গৌরব মানুষকে করে বিভ্রান্ত। ইহা কিয়ৎপরিমাণে আমাদিগকে আশান্বিত এবং মুগ্ধ করে বটে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইহা আমাদিগকে এমন পর্য্যায়ে লইয়া যায় যে, আমরা নিজের ছাড়া বিশ্বে অপর কিছুই দেখিতে পাই না এবং নূতন কোনও ধারণা বা আদর্শ গ্রহণের আর আমাদের ক্ষমতা থাকে না। ঈশ্বর এরূপ জাতীয় গৌরব-বোধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন!

Karl Mark

(জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ)

প্রকৃতি ইতর প্রাণীদের জীবনযাত্রার একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ইহারা সেই সীমা কখনও অতিক্রম করে না যা অপরকে অনুকরণের প্রবৃত্তিও পোষণ করে না ; পরন্তু নিয়মিতভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মানুষকে বিধাতা দিয়াছেন একটি সাধারণ লক্ষ্য—মনুষ্যত্ব এবং নিজেকে উন্নত করিবার প্রবৃত্তি। উপায় অনুসন্ধানের ভার বিধাতা তার নিজের হাতেই ছাড়িয়া দিয়াছেন—যাহার সাহায্যে সে জীবন-সংগ্রাম চালাইতে পারে। সমাজের মধ্যে উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের ভারও তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে থাকিয়া স্বকীয় কর্মপ্রভাবে সে নিজেকে এবং সমগ্র সমাজকে ক্রমোন্নতির পথে চালিত করিতে পারে।

এই নির্ব্বাচনভারূপ বিশেষ ক্ষমতা সৃষ্টির আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কিন্তু জীবনের এই পথ নির্ব্বাচন সাতিশয় বিঘ্নসঙ্কুলও বটে। কারণ নির্ব্বাচন ঠিকমত না হইলে জীবনের সমস্ত পরিকল্পনা, এক কথায় সমগ্র জীবন বিফল ও নষ্ট হইতে পারে। এই হেতু জীবনের পথ নির্ব্বাচন যার পর নাই বিবেচনাসাপেক্ষ এবং যুবকদের ইহা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য।

সর্ব্বমানবের কল্যাণ এবং আমাদের জীবনের পরিপূর্ণতাই হইবে জীবনের পথ নির্ব্বাচনের প্রধান লক্ষ্য। মানবকল্যাণ এবং আত্মবিকাশ এ দুটি বিরুদ্ধবর্ত্তী নয়, পরন্তু মানব প্রকৃতি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, সে নিজের জীবনের পূর্ণতা তখনই লাভ করিতে সমর্থ হয় যখন সে সর্ব্বমানবের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিঃশেষে নিয়োজিত করে।

যখন আমরা সেই পথ নির্ব্বাচন করিয়া লই যাহাতে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বমানবের কল্যাণকল্পে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি তখন কোনও বাধাই আমাদের পথরোধ করিতে পারে না ;—তখন কোনও ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক সুখ আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না—তখন আমাদের আনন্দ প্রতিফলিত হয় লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে—আমাদের কর্ম্ম হয়ে ওঠে চির-সঙ্গীন—অন্তর অনাগতকালে তাহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মায়াজাল

নগর পত্তনের ঘাটে ঘাটে পরিভ্রমণ কালে বন্ধু কুহককে কয়েকবার দেখিয়াছিল। কুহককে সে রাত্রির দাসী বলিয়া চিনিত না; কারণ কুহু যখন রাত্রির দোলার সহিত যাইতেছিল তখন বন্ধুর দৃষ্টি তাহার উপর পড়ে নাই, রাত্রির উগ্রোজ্জ্বল রূপশিখা তাহার চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। কুহককে সে ভাল করিয়া দেখিল একদিন দ্বিপ্রহরে। বন্ধু নৌরীর এক ঘাটের পাশে বাঁধের উপর বসিয়াছিল, ঘাটে আর কেহ ছিল না। সহসা একটি কিশলয়-ভামাঙ্গী যুবতী নৃত্যচটুল ছন্দে নূপুর বাজাইয়া নদীর কিনারায় নামিয়া আসিলেন এবং বন্ধুর দিকে একটি ক্ষিপ্র গোপন কটাক্ষপাত করিয়া বেশবাস বর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে উত্তরীয়টি খসিয়া সোপান পঙ্‌ক্তির উপর পড়িল, তারপর পড়িল কটির ধটী; তারপর যুবতী যখন কাঁচুলির গ্রন্থি খুলিতে উদ্যত হইলেন তখন বন্ধু উঠিয়া রণে ভঙ্গ দিল। নগর-বিলাসিনীদের নিরাবৃতা হইয়া স্নান করাই হয়তো বিধি, কিন্তু বন্ধু তাহা বলিয়া দেখিতে লজ্জা বোধ করিল।

ইহার পর আরও কয়েকবার কুহুর সহিত বন্ধুর সাক্ষাৎ হইল। কখনও নির্জন প্রাকারের উপর, কখনও জনবহুল রাজপথে। কুহু স্মিত-ভঙ্গুর নেত্রপাতে বন্ধুকে নিরীক্ষণ করিত, চোখের সঙ্কেতে তাহাকে ডাকিত। কথা বলিত না, রিমঝিম মঞ্জীর বাজাইয়া চলিয়া যাইত, যাইতে যাইতে পিছু ফিরিয়া আবার চোখের ইঙ্গিতে ডাকিত। কিন্তু বন্ধু নাগরিক নয়, সে হয়তো কুহুর চোখের আহ্বান বুঝিতে পারিত না, কিম্বা বুঝিতে পারিলেও আহ্বান উপেক্ষা করিত।

একদিন বৈকালে কাল বৈশাখীর প্রবল ঝড় বৃষ্টি হইয়া যাইবার পর আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বন্ধু ঘাটোদ্দেশে গিয়া দেখিল ঘাটে লোক কম, সিক্ত সোপানশ্রেণি অধিকাংশই শূন্য। বন্ধু তাহার অভ্যস্ত স্থানে না বসিয়া একটি গোলাকৃতি উচ্চ চত্বরের উপর গিয়া বসিল। সমুদ্রগামী তরিগুলি যেখানে ভিড় করিয়া গুপ্তকের অরণ্য রচনা করিয়াছে সেখানে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। ঝড়ের দাপটে দুই চারিটি তরণীর আড়-কাঠ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, রজ্জু ছিঁড়িয়া ছট পাকাইয়া গিয়াছে। একটি তরণী কাত হইয়া পড়িয়া অন্য তরণীর গুপ্তকের সহিত আপন গুপ্তক আশ্লিষ্ট করিয়া বিপজ্জনক সংস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।

এতদিন নৌকাগুলিতে নাবিক বা দিশারু কাহাকেও দেখা যাইত না। আজ দেখা গেল কয়েকটি নৌকার পট-পত্তনের উপর নাবিকেরা কাজ করিতেছে, সম্ভবত শোধন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছে। বন্ধু আগ্রহের সহিত দেখিতে লাগিল।

বন্ধু যে চত্বরে উপবিষ্ট ছিল সেই চত্বরে আর একজন লোক বসিয়া ব্যাকুল চক্ষে নৌকাগুলির পানে চাহিয়া আছে, বন্ধু তাহা লক্ষ্য করে নাই। লোকটির বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর; দেহ এককালে দৃঢ় ছিল, এখন শীর্ণ ও লোলচর্ম হইয়া গিয়াছে। মুখে আভিজাত্যের চিহ্ন বর্তমান, কিন্তু বেশ-ভূষার পারিপাট্য নাই; অঙ্গের উত্তরীয়টি মলিন। দেখিলে মনে হয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু সম্প্রতি দুরবস্থায় পড়িয়াছে।

লোকটি সহসা 'হায় হায়' করিয়া উঠিল।

বন্ধু চমকিয়া তাহার দিকে ফিরিতেই লোকটি যেন চেতনা ফিরিয়া পাইল এবং অত্যন্ত লজ্জিত কণ্ঠে বলিল—'ক্ষমা করুন, আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি।'

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'কি হয়েছে?'

লোকটি কাতর স্বরে বলিল—'এ বছরও আমার পুঁজি সমুদ্রে যেতে পারলে না। বর্ষা এসে পড়ল, আর কবে যাবে?'

বন্ধু বুঝিল, এ ব্যক্তি কোনও সমুদ্রগামী তরণীর স্বামী।

সে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। বলিল—'আপনার নৌকা সমুদ্রে যেতে পারবে না কেন?'

লোকটি বোধহয় নিজের দুঃখের কথা কাহাকেও বলিবার সুযোগ পায় না, সে অতিশয় আপ্যায়িত হইয়া বলিল—'আপনি দেখছি মরমী সৎপুরুষ। কানসোনায় কি নূতন এসেছেন?'

'হাঁ। আপনি বুঝি নৌ-বণিক?'

'হাঁ। আমার নাম বরুণ দত্ত। কিন্তু কানসোনার লোক আমাকে চারু দত্ত বলে ডাকে।' বলিয়া বরুণ দত্ত করুণ হাসিল।

বন্ধু নাটকীয় শ্লেষ বুঝিল না, বলিল—'আপনার ডিঙা আছে?'

বরুণ দত্ত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—'ঐ যে ঘাটের ধারে দুটি হংসবক্ষী ডিঙা, ও দুটি আমার ডিঙা।'

বন্ধু আবার প্রশ্ন করিল—'কিন্তু ওদের সমুদ্রে যেতে বাধা কি?'

তখন বরুণ দত্ত তাহার দুঃখের কাহিনী বন্ধুকে শুনাইল।—বরুণ দত্ত পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী। পূর্বকালে তাহাদের অনেকগুলি বহিত্র ছিল, গৌড়বঙ্গের পণ্য লইয়া বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র যাত্রা করিত। দক্ষিণে সিংহল অতিক্রম করিয়া ভরুকচ্ছ যাইত, কখনও পারসীকদের দেশে যাইত। পূর্বদিকে মলয় যবদ্বীপ সুবর্ণভূমিতে যাইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে চলিয়াছে, গৌড়-বঙ্গ পুণ্ড্র-নগরের পণ্য সম্ভার দেশ দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে।

প্রায় বিশ বছর পূর্বে হঠাৎ এক নিদারুণ বাধা উপস্থিত হইল, সমুদ্রে হিংস্রিকা দেখা দিল। এতকাল সমুদ্রে জল-দস্যুর উৎপাত ছিল না, সকল দেশের বাণিজ্য-তরী স্বচ্ছন্দে সাগর বক্ষে বিচরণ করিত; এখন বনায়ু দেশের দস্যুরা সমুদ্রের পথ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিল। নিরীহ নিরস্ত্র পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া ডুবাইয়া ছারখার করিয়া দিতে লাগিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে গৌড়বঙ্গের সাগর-সম্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে ডুবিতে বসিলেন।

গত বিশ বছরে গৌড়ের নৌ-বাণিজ্য ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সিংহল ও পূর্বে সুবর্ণভূমি পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বুঝি আর থাকে না। আরব জলদস্যুদের দুর্নিবার অভিযান বঙ্গোপসাগরের জল তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে।

বরুণ দত্তের সপ্তদশ ডিঙা ছিল, এখন মাত্র দুইটি অবশিষ্ট আছে, বাকিগুলি ডুবাডুবি হইয়াছে। নাবিকেরা সমুদ্রে যাইতে চায় না; নৃশংস জলদস্যুর হাতে প্রাণ দিবার জন্য কে সমুদ্রে যাইবে? বণিকেরা বেতন দিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিতে চায়, কিন্তু বাঙ্গালী সৈন্য সমুদ্রে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত নয়,* উচ্চ বেতনের লোভেও তাহারা নৌ-যুদ্ধে যাইতে অসম্মত। রাজশক্তি নিশ্চেষ্ট উদাসীন, রাজা থাকিয়াও নাই। বাংলার বন্দরে বন্দরে বাঙালীর নৌ-বাহিনী পঙ্কবদ্ধ হস্তিযূথের ন্যায় নিশ্চল; নদীর মোহানা পার হইয়া সাগরের নীল জলে ভাসিবার সাহস কাহারও নাই।

বরুণ দত্ত গত দুই বৎসর তাহার তরণী দুটিকে সমুদ্রে পাঠাইতে পারে নাই। এবার কয়েকজন বণিক মিলিয়া কিছু নাবিক ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল, স্থির করিয়াছিল তাহাদের তরণীগুলিকে রণ সাজে সজ্জিত করিয়া এক সঙ্গে সমুদ্রে পাঠাইবে; তাহাতে জলদস্যুর হাত হইতে নিস্তার পাইবার সম্ভাবনা আছে। বরুণ দত্তও অতি কষ্টে কয়েকটি যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু কাল বৈশাখীর ঝড়ে তাহার তরণী দুটি আহত হইয়াছে, শোধন-সংস্কার করিতে সময় লাগিবে। এদিকে বর্ষা আসন্ন, অন্য তরণীগুলি অপেক্ষা করিতে পারিবে না। সুতরাং এবারও বরুণ দত্তের নৌকা সমুদ্রে যাইতে পারিবে না।

বরুণ দত্ত যখন তাহার কাহিনী শেষ করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে তারা ফুটিয়াছে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বরুণ দত্ত বলিল—'আমার মন্দ দশা যাচ্ছে। ধন সম্পত্তি প্রায় সবই গিয়েছে; শেষ পর্যন্ত বোধহয় কিছুই থাকবে না।'

বরুণদত্ত নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিল—তাহা যে সমগ্র দেশের পক্ষেও সত্য তাহা সে জানিত না।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'অন্য নৌকাগুলি কবে যাত্রা করবে?'

বরুণদত্ত বলিল—'পরশু উষাকালে। মঙ্গলের উষা বুধে পা—সেদিন ত্রয়োদশী তিথিও আছে।'

---

* নদীতে জলযুদ্ধ করিতে নৌ-সাধনোদ্যত বাঙ্গালী পটু ছিল, কালিদাসের রঘুবংশে (৪।৩৬) তাহার প্রমাণ আছে।

'এই সময়ের মধ্যে আপনার ভিঙা প্রস্তুত হবে না ?'

'হয়তো হতে পারে। কিন্তু আর এক বিপদ ঘটেছে। যে-সব যোদ্ধা নৌকায় যেতে সম্মত হয়েছিল তারা এখন পশ্চাৎপদ হয়েছে। তারা বলছে, ভাঙা নৌকা, বর্ষাকাল এসে পড়েছে—এখন তারা যাবে না। এ বিপদ কেবল আমার নয়, অন্য নৌকায় যে-সব যোদ্ধা যাচ্ছিল তারাও গণ্ডগোল করছে।'

অতঃপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি গাঢ় হইতেছে দেখিয়া বন্ধু উঠিল। হতাশ বন্ধুপদত্ত খাটেই বসিয়া রহিল।

রাত্রে কর্ণসুবর্ণের পথে আলোক নাই, কদাচিৎ কোনও গৃহস্থের মুক্ত দ্বার বা গবাক্ষপথে একটু আলোর প্রভা আসিয়া রাজপথে পড়িয়াছে। রাত্রে কোনও নাগরিককে কোথাও যাইতে হইলে উল্কা জ্বালিয়া পথ চলিতে হয়। বন্ধু নক্ষত্রের আলোকে অতি যত্নে পথ চিনিয়া বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল।

বটেশ্বরের মদিরাগৃহে অতিথির ভিড় কমিয়াছে, মাত্র দুই চারিজন ঝুনা খেলোয়াড় প্রদীপের মিটিমিটি আলোতে অক্ষবাট বিছিয়া বসিয়া খেলিতেছে এবং ভক্তিত সহযোগে মদ্যপান করিতেছে। আলো বেশী নয়, ঘরের কোণে কোণে ছায়া জমিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কাহারও অসুবিধা নাই ; এইরূপ আলোতেই তাহারা অভ্যস্ত।

ঘরের একটি কোণ হইতে নিম্নস্বর বাক্যালাপের গুঞ্জন আসিতেছিল, বন্ধু ঘরে প্রবেশ করিতেই তাহা বন্ধ হইল। বন্ধু নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে যাইতে যাইতে একবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল, কোণের ছায়ান্ধকারে তিনজন লোক বসিয়া আছে, যেন ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া কোনও গুপ্তকথার আলোচনা করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত, বাকি দুইজন বটেশ্বর ও বিম্বাধর। তিন জনেই বন্ধুকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহাদের নিষ্পলক দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যে বন্ধু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তিন জনের মধ্যে বিম্বাধরই প্রথম আত্মসংবরণ করিল ; ত্বরিতে উঠিয়া আসিয়া কৌতুকের ভঙ্গীতে বলিল—'কি বন্ধু মধুসূদন, তুমি যে দেখি নিশাচর হয়ে উঠ্‌লে ! কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

বন্ধু বলিল—'হাতীঘাটে বসেছিলাম।'

'ভাল ভাল। তা এস না, দু' পাত্র মধু পান করা যাক। বটেশ্বর অনুযোগ করছিল তুমি কিছুই পান কর না। এতে যে ওর মদিরা-ভবনের নিন্দা হবে।'

'আমার পক্ষে ভোজনই যথেষ্ট।'

'তা কি হয় ? মধুপান না করলে নাগর হওয়া যায় না। এস এস।'

'না, আজ নয়।'

বিম্বাধর একবার বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তির সহিত দৃষ্টি বিনিময় করিল, তারপর বলিল—'তবে থাক। কাল কিন্তু আমি আবার আসব। একটু আসব-সেবা করে একসঙ্গে ভ্রমণে বাহির হব। কেমন ?'

বন্ধু কিছু বলিল না। বিম্বাধর প্রস্থান করিলে সেও নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। বটেশ্বর ও অপরিচিত ব্যক্তি তখন আবার নিম্নস্বরে আলাপ আরম্ভ করিল। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহারা বন্ধু সম্বন্ধেই গূঢ় আলোচনা করিতেছে।

দুই দণ্ড মধ্যে বন্ধু আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিল। ক্রমে বটেশ্বরের মদিরাগৃহ নিঃশব্দ হইল, অতিথিরা প্রস্থান করিয়াছে। বন্ধুর একটু তন্দ্রাবেশ হইয়াছে এমন সময় দ্বারে খুটখুট শব্দ শুনিয়া তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ শব্দ নাই। বন্ধু উৎকর্ণ হইয়া রহিল। তারপর আবার বাহিরের দিকের দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল। যে দ্বার দিয়া একেবারে পথে পড়া যায় সেই দ্বারে কেহ টোকা দিতেছে।

ঘরের কোণে দীপ স্তিমিত হইয়াছিল। বন্ধু উঠিয়া দীপ উস্কাইয়া দিল, তারপর সন্তর্পণে দ্বারের হুড়ুক খুলিল।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে একটি যুবতী। রাত্রির মতই গাঢ় নীল তার বসন ; এক হস্তে প্রদীপ, অন্য হস্তে অঞ্চল দিয়া প্রদীপের শিখাটিকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। প্রদীপের নিরুদ্ধ প্রভা যুবতীর বক্ষে কণ্ঠে পড়িয়াছে, মুখের নিম্নার্ধ আলোকিত করিয়াছে। বাহিরে ছায়া, ভিতরে আলো।

বন্ধু কুহককে দেখিয়াই চিনিয়াছিল, সে ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া রহিল। সেই ফাঁকে কুহু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বন্ধু চমকিয়া বলিয়া উঠিল—'এ কি! কে আপনি?'

কুহু মাথার ওড়না সরাইয়া বিলোল চক্ষে বন্ধুর পানে চাহিল, ওষ্ঠাধর মুকুলিত করিয়া অধরে অঙ্গুলি রাখিল। তারপর ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—'আমাকে চিনতে পারছেন না।'

বন্ধু দৃঢ়ভাবে নিজেকে আত্মস্থ করিল, সাবধানে বলিল, —'বোধ হয় দু' একবার দেখেছি। আপনি কে তা জানি না।'

কুহু হাসিল। নিঃশব্দ হাসির তরল তরঙ্গে তাহার সমস্ত দেহ যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। সে কুহক-কলিত স্বরে বলিল—'আমার নাম কুহু। কিন্তু আমাকে অত সম্মান করে কথা বলবেন না। আমি সামান্যা নারী।'

কুহু প্রদীপটি মাটিতে নামাইয়া রাখিল, বন্ধুর কাছে আসিয়া প্রগল্‌ভ হাসিয়া বলিল—'আমার পরিচয় নিলেন, কৈ নিজের পরিচয় তো দিলেন না।'

বন্ধু এক পা পিছু হটিয়া বলিল—'আমার নাম—মধুসূদন। কর্ণসুবর্ণে নূতন এসেছি।'

কুহু ওষ্ঠাধর বিভক্ত করিয়া ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া রহিল, অর্ধস্ফুট স্বরে যেন নিজ মনেই বলিল—'মধুসূদন—কি মিষ্টি নাম। আপনি যে নগরে নূতন এসেছেন তা অনেক আগেই বুঝেছি। নগরে যারা নাগর আছে আপনি তাদের মত নয়।'

কুহু পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। এদিক ওদিক চাহিয়া ঘরের কোণে জলের কুম্ভ দেখিয়া সেইদিকে গেল, ঘটিতে জল ঢালিয়া জল পান করিল। তারপর বন্ধুর শয্যার এক পাশে গিয়া বসিল। কোনও সঙ্কোচ নাই, এ যেন তাহার নিজেরই ঘর।

বন্ধু নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিল। গভীর রাত্রে নিভৃত শয়নকক্ষে এই প্রগল্‌ভা অভিসারিকার আকস্মিক অভিযান, এরূপ সম্ভাবনা তাহার কল্পনাতীত। যুবতীর অভিপ্রায় সম্বন্ধেও বিশেষ সংশয়ের অবকাশ নাই। বন্ধুর কর্ণমূল উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, বুকের রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

সে সহসা বলিয়া উঠিল—'আমার কাছে কি চাও?' তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ ঘরের মধ্যে উচ্চ শুনাইল।

কুহু অমনি ঠোঁটের উপর অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিল, চাপা গলায় বলিল—ছি ছি, অত জোর গলায় কি রহস্যালাপ করতে আছে? এখনি কে শুনতে পাবে। অমন, কাছে এসে বসুন।' বলিয়া নিজের পাশে শয্যা নির্দেশ করিল।

বন্ধু একটু ইতস্তত করিয়া শয্যার অন্য প্রান্তে গিয়া বসিল। কুহু তাহা দেখিয়া মিষ্ট-দুষ্ট হাসিল, বন্ধুর দিকে সরিয়া আসিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিল—'আমি কী চাই তা কি এখনও বুঝতে পারেন নি?'

বন্ধু কিছুক্ষণ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া রহিল, তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—'নগরে নাগরের অভাব নেই।'

কুহু বন্ধুর আরও কাছে সরিয়া আসিল, চক্ষু দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া বলিল—'নগরে কুকুরেরও অভাব নেই, কিন্তু বনের বাঘ কটা আছে? আপনি আমার মধু-নাগর। আমার লজ্জা নেই। আপনি আমার প্রতি সদয় হোন।'

বন্ধু পূর্ববৎ বুকে ঘাড় গুঁজিয়া বলিল—'না।'

কুহুর মুখ একটু মলিন হইল। সে ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল—'আমাকে কি আপনার ভাল লাগেনা?'

বন্ধু চকিতে একবার চক্ষু তুলিয়া আবার চক্ষু নামাইল, কথা কহিল না। কুহুর মুখে তখন আবার হাসি ফুটিল। বন্ধুর পানে চাহিয়া চাহিয়া তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সে অঙ্গুলি দিয়া বন্ধুর বাহুর উপর মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইয়া স্নেহ-বিগলিত স্বরে বলিল—'বুঝেছি। তুমি বড় কাঁচা, এখনও মনে রঙ্ ধরেনি—তোমার বয়স কত?'

বন্ধুর মনের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, সে উৎফুল্ল মুখ তুলিল। নগরে আসিয়া অবধি সে যে বস্তুটির জন্য মনে মনে বুভুক্ষু হইয়া উঠিয়াছিল তাহা রমণীর স্নেহময় স্পর্শ; এতক্ষণে তাহাই সে কুহুর কণ্ঠে শুনিতে পাইল। সে এক মুখ হাসিয়া বলিল—'আমার বয়স কুড়ি।'

কুহু বলিল—'আমার উনিশ। কিন্তু তবু আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক কিছু শেখাতে পারি।'

হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিটি কিন্তু নৈরাশ্য-বিদ্ধ।

'আজ আমি ফিরে চললাম। কিন্তু আবার আসব।' বলিয়া কুহু সঙ্কেতে অঙ্গুলি তুলিল।

বন্ধুও উঠিল। কুহু দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি

মারিল, তারপর উদ্বিগ্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—'নগর নিশুতি, পথ বড় নির্জন। আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয় ?'

'দুষ্ট লোকের ভয়। তুমি আমাকে ঘরে পৌঁছে দেবে ?'

'কোথায় তোমার ঘর ?'

'অনেক দূরে, নগরের দক্ষিণে।'

বন্ধু বিপাকে পড়িল, ইতস্তত করিয়া বলিল—'তুমি—তোমার স্বামী—'

কুহু খিক্ খিক্ করিয়া হাসিল—'তোমার কি ভয় করছে নাকি ?'

'না। চল।'

কুহু সানন্দে বন্ধুর হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে লইয়া চলিল। বন্ধু বলিল,—'পিদিম নিলে না ?'

'না, আমি অন্ধকারে পথ চিনে যেতে পারব।'

দুইজনে বাহির হইল। মসীবর্ণ রাত্রি, কেবল স্পর্শানুভূতির দ্বারা সঙ্গ পাওয়া যায়। কুহু বন্ধুর হাত ধরিয়া রহিল; ক্রমে তাহার বাহু বন্ধুর বাহুর সহিত জড়াইয়া গেল। বন্ধু আপত্তি করিল না।

পথে চলিতে চলিতে দুই চারিটি কথা হইল॥

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'তুমি রাত্রে পথে পথে ঘুরে বেড়াও, তোমার স্বামী কিছু বলেনা ?'

কুহু বলিল,—'আমার স্বামী নেই।'

অনেকক্ষণ কথা হইল না। পথ দীর্ঘ, উপরন্তু কুহু যেন ইচ্ছা করিয়াই মন্থর পদে হাঁটিতেছে।

এক সময় কুহু সহসা প্রশ্ন করিল—'তোমার ঘরে কে কে আছে ?'

'মা আছেন।'

'আর—?'

বন্ধু উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কুহু মৃদুকণ্ঠে হাসিল। বলিল—থাক। ও সব জেনে আমার লাভ কি ?'

অবশেষে তাহারা নগরের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথে আসিয়া কুহু প্রাসাদ-প্রাকারের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। রুদ্ধ তোরণদ্বার পিছনে রাখিয়া আরও দক্ষিণে চলিল।

বন্ধু বলিল—'এ কি! এ যে রাজপ্রাসাদ!'

কুহু অন্ধকারে মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল—'চুপ!'

প্রাকারের গায়ে একটি ক্ষুদ্র গুপ্তদ্বার ছিল। কুহু তাহাতে মৃদু করাঘাত করিল, বন্ধুকে চুম্বকণ্ঠে বলিল—'তুমি ভিতরে আসবে না ?'

বন্ধু বলিল—'তুমি কে ?'

কুহু বলিল—'আমি রাজপুরীর দাসী, অবরোধেই থাকি। আমার আলাদা ঘর আছে। একবার আসবে আমার ঘরে ?'

বন্ধু শঙ্কিত হইয়া বলিল—'না।'

ইতিমধ্যে গুপ্তদ্বার খুলিয়াছিল। কুহু বন্ধুর হাত ছাড়িয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইল, কানে কানে বলিল—'তুমি কেমন মধুনাগর ? এত মিষ্টি আবার এত শক্ত!—বেশ, আজ থাক। কাল আমি আবার যাব—তুমি ঘরে থেকো।'

বন্ধুকে ছাড়িয়া দিয়া কুহু অন্ধকার গুপ্তদ্বার পথে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া গেল। গুপ্তদ্বার আবার বন্ধ হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অন্তঃপুর

গুপ্তদ্বার যে-রমণী ভিতর হইতে খুলিয়া দিয়াছিল সে কুহুর অনুচরী। বিপুল রাজসংসারে বহু পর্যায় ভেদ; রাণীর একদল দাসী আছে, সেই দাসীদের আবার দাসী আছে, তস্য দাসী আছে। কুহু পুরী হইতে বাহির হইবার সময় নিজ অনুচরীকে গুপ্তদ্বারে বসাইয়া গিয়াছে। কখন ফিরিবে তাহার স্থিরতা নাই, বেশী রাত হইলে তোরণদ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। অভি-সারিকার গতিবিধি অলক্ষ্যে হওয়াই বিধেয়। তাই সতর্কতা।

পুরভূমিতে প্রবেশ করিয়া কুহু অনুচরীকে বিদায় দিল; তারপর ক্ষণেক কান পাতিয়া শুনিল। রাজপুরী নিদ্রামগ্ন, কেবল একটি ভবন হইতে মৃদঙ্গ-মঞ্জীরার অস্ফুট নিক্কণ আসিতেছে—ঝুনি ঝমকি ঝুনি ঝমকি। বিনিদ্র রাজ-লম্পটের নৈশ নর্ম-বিলাস এখনও চলিতেছে।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া কুহু দ্রুতপদে চলিল। বিশাল অন্তঃপুরে কক্ষের পর কক্ষ, অলিন্দের পর অলিন্দ; কোথাও বা পুরীর এক অংশ হইতে অন্য অংশে যাইবার গোপন সুড়ঙ্গ। নিস্তব্ধ পুরী অন্ধকার, কদাচিৎ একটি দুটি

দীপ জ্বলিতেছে। এই গোলকধাঁধায় দিবাকালেও দিগ্‌ভ্রম হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু কুহু অভ্রান্তভাবে পথ চিনিয়া অভ্রান্ত ভাবে উদ্দিষ্ট স্থানের অভিমুখে চলিল।

একটি অন্ধকার কোণে লুক্কায়িত একশ্রেণী সোপান। কুহু সোপান বাহিয়া উপরে চলিল; দ্বিতল ছাড়াইয়া ত্রিতল, ত্রিতলের পর চতুস্তল। এই চতুস্তলে একটি বৃহৎ কক্ষ, চারিদিকে মুক্ত ছাদ। কক্ষ হইতে স্নিগ্ধ পুষ্পগন্ধ ও দীপপ্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। মনে হয় সমস্ত পুরীর মধ্যে এই কক্ষটি জাগিয়া আছে।

কুহু দ্বারের নিকট হইতে সন্তর্পণে উঁকি মারিল, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিল।

রাণী শিখরিণী পালঙ্কে জাগিয়া শুইয়া ছিলেন; দুই হাতে একটি যূথী-মালার ফুলগুলি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া চমতকে ছড়াইয়া দিতেছিলেন। নিদাঘ নিশীথে তাঁহার দেহে বস্ত্রাদি অধিক নাই, একটি স্বচ্ছ নীলউর্ণা তনুআবরণ অঙ্গে অঙ্কন রেখার ন্যায় লাগিয়া আছে। এক কিঙ্করী নিধানে দাঁড়াইয়া ফুলের পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

কুহু প্রবেশ করিলে রাণী সুপ্তোত্থিতা বাঘিনীর ন্যায় দুই চক্ষু মেলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কুহু কিঙ্করীকে চোখের ইসারা করিয়া বলিল—'তুই যা।'

কিঙ্করী পাখা রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। রাণী কুহুর পানে নির্নিমেষ চাহিয়া রহিলেন।

কুহু একটু বিকলভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আজও হল না।'

রাণী হাতের যূথীমালা খণ্ড খণ্ড করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কুহুর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর নত হইয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'কিন্তু দেখা হয়েছিল। কথা বলেছি।'

রাণী শয্যার উপর এক হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন—'কি কথা বলেছিস্?'

কুহু বলিল—'ঠারে ঠোরে যতদূর বলা যায় তা বলেছি। কিন্তু—তিনি নূতন নগরে এসেছেন, রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে রাজি নয়।'

তীক্ষ্ণ শিখর-দশন দিয়া রাণী অধর দংশন করিলেন; মনে হইল অধর কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িবে। ঠিক এই সময় দূর হইতে মৃদঙ্গ মঞ্জীরার মৃদু ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিল—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি—

রাণী শিখরিণীর বক্ষ বিমথিত করিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস বাহির হইল, সুন্দর মুখ হিংসার ক্রোধে বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি নিম্ন কণ্ঠে একবার অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন—'পানীয় দে।'

শয্যার পাশে ভৃঙ্গারে কপিত্থ-সুরভিত শীতল পানীয় ছিল, কুহু ত্বরিতে তাহা সোনার পাত্রে ঢালিয়া রাণীর হাতে দিল। রাণী একবার তাহা অধরে স্পর্শ করিলেন, তারপর ক্রুদ্ধ হস্তসঞ্চালনে পাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শয়ন করিলেন।

ভয়ে কুহুর বুক শুকাইয়া গেল। তবু সে মুখে সাহস আনিয়া রাণীর কানে কানে বলিল—'দেবি, আপনি অধীর হবেন না। ফুলে মধু আসতে সময় লাগে। আমি কাল আবার যাব।'

উপাধানে মুখ গুঁজিয়া রাণী বলিলেন—'তুই দূর হয়ে যা।'

কুহু বলিল—'আমি যাচ্ছি, আপনি ঘুমান। আমি শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিয়ে যাচ্ছি।'

কুহু প্রস্থানোদ্যতা হইলে রাণী চকিতে শয্যা হইতে মাথা তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সন্দেহে প্রখর। কুহু দ্বারের কাছে পৌঁছিলে তিনি ডাকিলেন—'কুহু শুনে যা।'

কুহু ফিরিয়া শয্যার পাশে আসিল। রাণী মর্মভেদী চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন—'তুই আজ আমার ঘরে শো।'

রাণীর মনের ভাব কুহু বুঝিল। সে মুখে হাসি আনিয়া বলিল—'এ ঘরে শোব আমার ভাগ্যি। শয্যা-কিঙ্করীকে ডেকে দিই সে বাতাস করুক।'

শয্যা-কিঙ্করী আসিয়া রাণীকে বীজন করিতে লাগিল। কুহু পদ্মের কারুকার্যখচিত মেঝের শয়ন করিল। রাণী থাকিয়া থাকিয়া সশব্দ উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। কুহু তাহা শুনিতে শুনিতে মনে মনে রাণীকে যমালয়ে পাঠাইতে পাঠাইতে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাজার প্রমোদ ভবনে তখনও মৃদঙ্গ-মঞ্জীরা বাজিতেছে—ঝনি ঝমনি—ঝনি ঝমনি।

এইখানে রাজ অবরোধের সংস্থা সংক্ষেপে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

সক্রিয় রাজশক্তি যখন স্বধর্ম বিসর্জন দিয়া আত্ম-পরায়ণতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে তখন বদ্ধ জলাশয়ের মত তাহাতে বিষাক্ত কীটাণু জন্মগ্রহণ করিয়া সমস্ত পরিমণ্ডল দূষিত করিয়া তোলে। গৌড়ের রাজ-পরিবারে তাহাই হইয়াছিল। ভাস্করবর্মা তেজস্বী বীরপুরুষ ছিলেন, নিজ বীর্যবলে সমস্ত দেশ করায়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাস্করবর্মার দেহান্তের পর তৎপুত্র অগ্নিবর্মা যখন রাজা হইলেন তখন তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না, সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরিলেন। যৌবনের অদম্য ভোগস্পৃহার স্রোতে রাজধর্ম বিবেকবুদ্ধি চিত্তবৃদ্ধি সব ভাসিয়া গেল; নবীন রাজার পৌরুষ মোহিৎ-মণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। লজ্জিতা রাজলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া তিনি অনঙ্গ পূজায় মত্ত হইলেন। অন্তঃপুর ভোগমন্দিরে পরিণত হইল।

রাণী শিখরিণীকে বিবাহ করিবার পর কিছুকাল অগ্নিবর্মা রাণীর রূপযৌবনের সম্মোহনে আকৃষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু ক্রমে নূতনত্বের মোহ অপগত হইলে রাজার মধুলুব্ধ চিত্ত উদ্যানসঞ্চারী চঞ্চরীকের ন্যায় অন্য পুষ্পে ধাবিত হইল। শিখরিণী অন্তঃপুরে পড়িয়া রহিলেন। রাজা অন্তঃপুরের মধু নিঃশেষ করিয়া প্রমোদ ভবনে গিয়া নূতন নবীনন্দিনীদের লইয়া কেলিকুঞ্জ রচনা করিলেন।

রাণী শিখরিণী অভিমানিনী রাজকন্যা, তিনি এই অবহেলা সহ্য করিবেন কেন? বিশেষত সম্ভোগস্পৃহা তাঁহার অন্তরেও কম ছিল না। রাজার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়া তিনি প্রতিহিংসার ছলে আপন যৌবন-লালসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইলেন। মন যাহা চায় বিবেক তাহাতে বাধা দিল না। গুপ্তান্তঃপুরে তার প্রবেশ করিল।

রাণীর প্রধানা দাসী ছিল কুহু, সে হইল দূতী। কুহু অতিশয় চতুরা, সে রাণীর জন্য নাগর সংগ্রহ করিয়া আনিত। নিজেকেও বঞ্চিত করিত না, ইচ্ছামত মনের মানুষ বাছিয়া লইত।

কদাচ রাণী মন্দিরে পূজা দিবার অছিলায় আন্দোলিকায় চড়িয়া পথে বাহির হইতেন; তখন কোনও সুদর্শন পুরুষ তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলে তিনি কুহুকে ইঙ্গিত করিতেন। কুহু ব্যবস্থা করিত।

এইভাবে পাঁচ বছর কাটিয়াছে। একথা বেশী দিন চাপা থাকে না; নগরের রসিক সমাজে কানাঘুষা চোখ-ঠারাঠারিতে আরম্ভ হইয়া কালক্রমে প্রকাশ্য শ্লেষ-বিদ্রূপে পর্যবসিত হইয়াছে। রাণী কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না। রাজ-স্বৈরিণীকে শাসন করিবারও কেহ নাই। নামমাত্র আবরণের অন্তরালে লজ্জাহীন ব্যভিচার চলিতেছিল।

বন্ধুকে দেখিয়া রাণীর লিপ্সা যেমন তাহার প্রতি ধাবিত হইয়াছিল, কুহুও তেমনি মজিয়াছিল। ফলে দুই সহকর্মিণী গোপনে গোপনে প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে প্রতিযোগিতা করিবার স্পর্ধা কুহুর নাই, সে অতি সূক্ষ্মভাবে নিজের খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সূক্ষ্ম খেলা খেলিতে কুহু বড় কুশলী।

কুহু ও শিখরিণী দুইজনেই সমান পাপিষ্ঠা, কিন্তু তাহাদের প্রকৃতি সমান নয়। রাণীর প্রকৃতি ধাত্রিনীর ন্যায় নিডুর ও আত্মসর্বস্ব, আপন ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু কুহুর প্রকৃতি অন্য রূপ; সে অজগর সাপের মত শিকারকে প্রথমে সম্মোহিত করিয়া আলিঙ্গনের পাকে পাকে জড়াইয়া ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিতে চায়।

প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও দুই নারীই সমান মারাত্মক। বোধ হয় কুহু একটু অধিক মারাত্মক।

* * * *

কুহু গুপ্তদ্বার পথে অন্তর্নিহিত হইলে বন্ধু কিছুক্ষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে ফিরিয়া চলিল। রাজপুরীর বিপুল ছায়াতল হইতে নির্গত হইয়া সে দেখিল পূর্বাকাশে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্র উদয় হইতেছে। আলোক অতি অস্পষ্ট হইলেও পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই।

ঘুমন্ত নগর, নির্জন পথ; গৃহগুলি ছায়ামূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয় এই নগর বাস্তব নগর নয়, কোনও মায়াবী মন্ত্রবলে এই অপ্রাকৃত দৃশ্য রচনা করিয়াছে; কোনও দিন ইহা জীবন্ত মানুষের কর্মকোলাহলে মুখরিত ছিল না, প্রভাত হইলে অলীক মায়া-কুহেলির ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বন্ধুর কিন্তু এই অবাস্তব পরিবেশের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। একাকী পথ চলিতে চলিতে সে আপন মনের বিচিত্র রহস্যজালে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিমিরাবৃত রাজপুরী; তাহার অভ্যন্তরে কুটিল দুর্গম অন্তঃপুর। কুণ্ডলিত সর্প যেন

আপন কুণ্ডলীর মধ্যে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে; সাপের মাথার মণি ঐ কুণ্ডলীর মধ্যে লুকানো আছে। কুহু এই অপূর্ব রহস্যলোকের দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়াছিল, ভিতরে আহ্বান করিয়াছিল—

কুহু!—একদিক হইতে কুহু যেমন বন্ধুকে আকর্ষণ করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি বিকর্ষণও করিয়াছিল। কুহুর রূপ-যৌবন তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে নাই, বরং কুহুর লোলুপ-প্রগল্‌ভতা তাহার অন্তরে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু অপর পক্ষে কুহুর স্নেহ-তরল মর্মজ নারীপ্রকৃতিকেও সে অবহেলা করিতে পারে নাই। কুহু যত দুষ্টই হোক তাহার প্রীতিসরস হৃদয়ের মূল্য বন্ধুর কাছে অল্প নয়। কুহুকে মনের কথা বলিলে সে বুঝিবে, কুহুর সাশ্রুচক্ষে তাহার প্রবাসের একাকীত্ব ঘুচিবে, মন শান্ত হইবে। কুহুকে অন্তরের দিক দিয়া তাহার প্রয়োজন।

বন্ধু যখন আপন কক্ষে ফিরিল তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর। দীপ নিভিয়া গিয়াছে। বন্ধু অন্ধকারে কলস হইতে জল ঢালিয়া পান করিল, তারপর শয্যায় শয়ন করিল।

কাল আবার কুহু আসিবে—। ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমশঃ

নাদনঘাটে পল্লী-সম্মেলন

শ্রীগোপেন্দুভূষণ সাংখ্যতীর্থ

[illegible] আসিতেছেন—আমাদের দেশ যখন পল্লীপ্রধান, তখন ঐ উৎসবোৎসুক পল্লীগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে না পারিলে, কোনদিনই দেশের উন্নতি হইবে না।

কথাগুলি শুনিতে তো খুবই মধুর। কিন্তু কাজের সময় তো বড় কেউ কাউকে পাওয়াই যায় না। সকলেই প্রায় সহরে বসিয়া পল্লীজননীর সর্বনাশে দাঁড়ি করিয়াই পালায়। আমি কাননা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পল্লীবাসীরই সম্পাদক, সুতরাং এ দুঃখ আমার আর জানিতে বাকি নাই।

ইংরাজের আমল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি—পল্লীগুলিকে বাঁচাইয়া তোলা তো দূরের কথা, কেমন করিয়া লোকগুলার ইহকাল পরকাল খুইয়ে, সেই পথেই ঠেলা চলিয়া আসিতেছে। আমাদের এ অঞ্চলে স্মরণাতীত সময় হইতে হিন্দু-মুসলমানে পরমসম্প্রীতিতে বাস করিয়া আসিতেছে—সীমা আমলে সেই প্রীতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্যেই কি কম হইয়াছে?

অথচ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার পথ নাই—পুকুরে জল নাই, পথ বাহুড়ের কষ্ট দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়। রোগে চিকিৎসা নাই, পথ্য নাই, আছে মানুষ মোকর্দমা বাধাইবার শিকিরখাসী—লোককে ঠক করিবার নমাপরায়ণ। কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। পরশ্রীকাতরতা যেন ভূতের মত পাইয়া বসিয়াছে। এ ভূত তাড়াইতে না পারিলে তো আর রোগী বাঁচিবে না।

তরুণ বয়স হইতে এই সব গ্রামেই 'স্কেচিং' করিতে গিয়াছি—গ্রামবাসীর সে কি আদর-যত্ন আত্মীয়তা, কত শ্রদ্ধা ভালবাসা পাইয়াছি। জাতীয়সংগ্রাম পাকিয়া উঠিবার সময়ও গিয়া দেখিয়াছি, লুকাইয়া লুকাইয়া ভালবাসিবার আকুলতাও কম নাই—প্রকাশ্যে ধরা পড়িতে পারিতেছে না বলিয়া কি গভীর অনুতাপ!! আমাদের সংগ্রাম সার্থক হইলেই তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, ভাত পাইবে, কাপড় পাইবে—কত কত আকাঙ্ক্ষা? নিরক্ষর বরনারীর চোখের জলে যেদিন ইংরাজের সাম্রাজ্যেই অভিসম্পাত বর্ষিত হইয়াছে? জাতির জন্ম আখাইয়া দিয়াছে।

সংগ্রামে জয় হইল; আমরাও যে যাহার মত এলাইয়া পড়িলাম। পল্লীতে পল্লীতে আর বড় কেহ আমাদের কিছি দেখিতে পাইল না। যারা ছিল নাড়ীবুনে, সবাই হল কীর্তনে। আর তলাচিয়ার খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যাহারা নেতাদের মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইত, একটি আদেশ পালন করিতে দল বার বাইল হাঁটিয়াও কত তৃপ্তিভরা মুখে কৃতজ্ঞতা জানাইত, আজ মাথা খুঁড়িয়াও তাহাদিগকে পল্লীতে পাঠাইতে পারি না। বিশ্ববিশ্রুত সুভাষচন্দ্রের মত নেতাজীকে পর্যন্ত কত গ্রামে গ্রামে পুরানো সম্ভবপর হইয়াছে, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা পাইবার পর গ্রামে যাওয়া আমরা যেন একরকম ছাড়িয়াই দিলাম।

তাই বলিয়া এক মাসে তো আর শীত পলায় না। দেখিতে দেখিতে নির্বাচনের বাজনা বাজিয়া উঠিল। সকলেরই টনক নড়িল। কিন্তু, কি সর্বনাশ—যে পল্লীর ক'ঘরের দ্বারা পর্যন্ত মাড়াই নাই, সে সব গাঁয়ে এখন ঢুকি কেমন করিয়া? অথচ যা কিছু ভোটের বখরা, তা তো এই সব গ্রামে গ্রামেই কুড়াইতে হইবে, নতুবা গণদেবতা গাঁকিয়া বসিলে, একেবারে যে ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন!!

দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া যাত্রাকরতঃ আমরা সর্বপ্রথমে সেখানে সেদিন সভা করিয়াছিলাম, আজ সেই বর্ধমান জেলার নাদনঘাটেই যে বিরাট পল্লী-

সম্মেলন হইয়া গেল, এতগুলির তাহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এতবড় ব্যাপার শুধু নাদনঘাট কেন, অনেক বড় বড় সহর মফঃস্বলেও সব সময় ঘটিয়া উঠে না।

নাদনঘাট শুধু কালনা মহকুমারই প্রাণকেন্দ্র নয়, পশ্চিমবঙ্গে চাউল ব্যবসায়ের এতবড় গঞ্জ খুব কমই আছে। বছরে লক্ষ লক্ষ মণ পাট এই নাদনঘাটের হাটেই কেনা বেচা চলিয়াছে। ইংরাজ আমলে যুদ্ধের সময় হইতে অনেকে এখানে চোরাচালানীর সহিত জড়াইয়া পড়েন, ইহাও যেমন সত্য, সরকারী কর্তৃপক্ষ ব্যবসার ফাঁকে ফাঁকে যে দুর্নীতি গাঁটি পাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহাও যে অপকর্মের তুলা মাণী, ইহাও তেমনি সত্য।

যাক, পরের সোচনা নাস্তি। এবার 'লেভি'প্রথা চালু হওয়ায় ছোট খাটো চাষীর মনে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিয়াছেন। বড় বড় জোত জমার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ঘোটের উপর বলিতে গেলে এই নাদনঘাটই আজও এ অঞ্চলের সমস্ত বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্রই হইয়া রহিয়াছে।

বিধানসভার যিনি প্রতিনিধি হইতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার পল্লীপ্রীতির কথা এ অঞ্চলের পল্লীবাসীদের অনেক আগে হইতেই জানা ছিল। কলিকাতায় কার্যক্ষেত্র হইলেও, উঁহারা যে পূর্বানুক্রমে পিতৃভূমি পূর্বস্থলী থানার উপকার করিয়া আসিতেছেন—কথাটা গ্রাম-বাসীদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেই জানিতেন তাই বিপুল ভোটাধিক্যে তিনি যেদিনই জয়যুক্ত হইলেন, সেইদিন হইতেই গ্রামবাসীদের মনে নূতন আশা ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। মরা গাঙে যেন বান ডাকিল। গ্রামে গ্রামে রাস্তাঘাট, স্কুল, চিকিৎসালয় খুলিবার বিপুল উদ্যমনা পরিলক্ষিত হইল। খুবই স্বলক্ষণ সন্দেহ নাই।

নির্বাচিত প্রতিনিধি কবিরাজ শ্রীমান্ নিমলানন্দ তর্কতীর্থ তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গ্রাম ও গ্রাম বলিয়া কথা নয়, সমগ্র থানাটিরই যাহাতে কল্যাণ হয়, সরকীপ্রাণ লইয়া তিনি তাহারই আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই অল্পদিনের মধ্যে কত গ্রামে যে পথকষ্ট জলকষ্ট চিকিৎসাকষ্ট প্রভৃতি দূরীকরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ সহায়তা পাওয়া গিয়াছে, গ্রামবাসীরা নিজেরাই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কাজে না নামিলে, কার্যক্ষেত্রে অসুবিধা বুঝা যায় না। বিভিন্ন ইউনিয়নবোর্ড সেই শতাব্দীপুরাতন ধারায় তথিং-চালক দ্বারা নিজ নিজ বোর্ডেরই সুবিধা আদায় উৎপর? আগে ইংরাজকে খুশী করিয়া, তারপর দীনকে ভিক্ষা দিয়া, নিজ নিজ বোর্ডে কে কতটা মনরঞ্জন আদায় করিতে পারিলেন—ইহারই উপর প্রেসিডেন্টবাবুদের কৃতিত্বের মান নির্ধারিত হইত? সমগ্র থানাকে লক্ষ্য করিয়া সামগ্রিক উন্নতি সাধনের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কবিরাজ তর্কতীর্থ এই অভ্যাসবোধ করিয়া অনেক দিন হইতেই থানা-সম্মেলন গঠনের আবশ্যকতা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার মত তৎপরতা ও আগ্রহ আমাদের মধ্যে এখনও তেমন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই বলিয়াই, অনেক সময় সংকল্পমত কাজ করিতে বিলম্ব পড়িয়া যায়। তবে, কথা কি, সাধু যাহার সংকল্প, ভগবান্ তাহার সহায়? আমরা সেদিন পূর্বস্থলী থানা সম্মেলনে গিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি।

থানার অন্তর্গত সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও প্রতিনিধিবৃন্দের এমন প্রীতি সম্মেলন যেখিয়া প্রাণে কত না আশা জাগে! অল্প লক্ষ মুষ্টি পল্লীবাসীর ইঁহারাই রক্ষাকর্তা। একযোগে কাজ করিলে ইঁহারা আজ সমাজের কতটা রূপ পরিবর্তনে যে কত সহায়তা করিতে পারেন, তাহা ভাবিলেও আনন্দ হয়। সম্মেলনে ইঁহারা আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা মন্ত্রীদের সম্মুখে মন খুলিয়াই বলিয়াছিলেন। একটী স্থায়ী সমিতিও গঠিত হইয়াছে; এখন ভগবৎকৃপায় শুভক্ষণভাবে কাজ আরম্ভ হইলেই এই বিরাট পল্লীসম্মেলন চূড়ান্তভাবে সার্থক হইয়াছে—কে না বলিবে?

পল্লী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে এতগুলি এক কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় পনের কুড়ি হাজার নর-নারী বালক-বৃদ্ধ শিক্ষা পাইয়াছে—আনন্দ পাইয়াছে। বর্ধমানের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর হইতে কয়মাইল পথে খুবই ঘরঘানি ভোগ করিয়াছেন, জানিয়া আশা জাগিল—পথটি হয়ত বা সত্বর পাকা হইয়া দীর্ঘদিনের দুঃখ ঘুচিবে। তবে জেলা বোর্ডের যেরূপ ব্যাপার শুনিতেছি, তাহাতে ভরসা হয় না। সরকারী কৃষিশিল্পবিভাগের সহায়তার কথাও এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি কয়দিন বহুবিধ সম্মেলনের আয়োজন করিয়া নিরীহ পল্লীবাসীদের প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ৮ই হইতে ১০ই মে পর্যন্ত রবি সোম—নাদনঘাটে যেন উৎসাহের বন্যা বহিয়াছিল। দূরদূরান্তর গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে আসিয়া বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শনিবার ইউ: বোর্ড সম্মেলন, রবিবার সকালে প্রদর্শনী উদ্বোধন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদিতে মাল্যদান, অপরাহ্নে বিরাট জন-সভা, পরে কংগ্রেসকর্মী সম্মেলন—একটানা উৎসবের যেন বিরামই নাই। শেষ দিন সোমবারে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান—কৃষক-মজুর সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। পল্লী অঞ্চলে এ জাতীয় অনুষ্ঠানে এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

শনিবার অপরাহ্নে সমুদ্রগড় ষ্টেশনে মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ রায়েদকে অভ্যর্থনা করিতে সমুদ্রগড় কংগ্রেস কমিটী বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। ডাঃ রায়েদ জনদরদী ব্যক্তি, দাম্ভিকতার কুহেলী কোনদিনই তাঁহার প্রসন্ন হৃদয়কে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই। সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণে যখন তাঁহার উদ্দেশে মানপত্র পাঠ করিতেছিলেন, আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বেই ছিলাম। আস্তে আস্তে বলিলাম, সাহেব আর কেন? আমাদের সংবিধানের কথা ছাড়িয়া দিই, কাজে কি দেখি, সংক্ষিপ্ত সমস্যা কি আর আছে? কথাটা রায়েদ সাহেবের প্রাণস্পর্শ করিয়াছিল। সম্বর্ধনার উত্তর দিবার সময় দেখি তিনি ঠিক ঐ কথাটাই বলিয়া ফেলিলেন। মুসলমানেরাও লজ্জিত হইল। কি সরল মানুষ!

ঐ রাত্রেই মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও মাননীয় মন্ত্রী শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় উপস্থিত হইলেন। এত সব মন্ত্রী ও নেতার সমাগম—গ্রামবাসীদের মনে কত না আশা উৎসাহ জাগিল। সব চাইতে

বুঝিল—যতীনবাবুরই। কারণ, তাঁহারই হাতে রাজ্যের রাজ্যপাট। পরাধীন অবস্থায় তো আর তাহাদের হৈচৈ করিবার উপায় ছিল না—লোকগুলা চুপ হইয়াই পড়িয়াছিল। আজ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একসঙ্গে সবাই হাঁপিয়া উঠিয়াছে। ছোটটা সম্পূর্ণরূপেই পড়িয়াছে এখন যতীনবাবুরই উপর। তিনি নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিয়া পড়িলেন বেকায়দায়। কত গ্রামের লোক যে তাঁহাকে রাস্তাঘাটের দুরবস্থার কত জানাইল! তিনি বীর, ধীর এবং কর্মী-পুরুষ। কিন্তু উপকার এ সকলের হইবেই? তবে যে ৪।৫ মাইল কাঁচা রাস্তার জন্য নবেন্দাই আর নতুন গঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে, সেটুকুর কিনারা দশ বছর পর দুইই মঙ্গল।

রবিবার অপরাহ্নে জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয়ের ভাষণ খুবই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। কংগ্রেসের আবালবৃদ্ধ রাজত্বে জনসাধারণের আজও যে কি বিপুল উৎসাহ, তাহার জনসভায় তাহা ভালভাবেই পরিব্যক্ত হইয়াছে। খাদ্য-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমান্ সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাতৃপ্রতীম সংক্ষিপ্ত ভাষণ মধ্যেই তাঁহার খাদ্যনীতি পরিষ্কার ভাবেই বুঝাইতে পারিয়াছেন। শ্রীমান্ নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমান্ আবদুলগোপাল মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, শ্রীমান্ জ্যোতিকণ মজুমদার এম-এল-এ প্রভৃতির বক্তৃতাও সেদিন জনসাধারণ সাগ্রহে শুনিয়াছে, তাহাতে বেশ মনে হইল লোকে এখনও কংগ্রেসের কথা শুনিতে চায়। কাজে কথায় মিলাইতে পারিলে তো আরও কথাই নাই।

বেশ ছিলাম বেড়াগোপে—টানিয়া লইয়া পড়িবার কথা! সুধানবজ্ঞ সম্পাদনের কাজ আরম্ভ হইল। বহুমান জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতির প্রস্তাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে আমি হইলাম উহার সভাপতি, আর প্রধান অতিথি হইলেন সুধানবজ্ঞের ইঞ্জিনিয়ার ভাণ্ডারী। ভাণ্ডারী মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দ খুবই মনোযোগী হইয়াছিল। আমিও সভাপতির অভিভাষণে হৃদয় পরিবর্তনে যথাসাধ্য বাগ্‌বৈখরী বিনিয়োগ করিলাম। কিন্তু করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। একমাত্র কবিরাজ তর্কতীর্থ মহাশয় ছাড়া কিনোবাজীকে নিজ বক্ষ চাড়িয়া প্রদান করিতে কেহই সাড়া যেন দেয় নাই। তবে আমি নিরাশ হই নাই, মানুষের বুদ্ধির অন্ধে একটা আলোড়ন সুরু হইয়া গিয়াছে। ইংরাজের লালানো সংধরা কায়েমো বহুলাইতে আর খুব বেশী দেরী হইবে না।

সুধানবিদ্যের কড় বাহিবার পরই সংস্কৃতির অমৃত বর্ষণের পালা সুরু হইল। "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। আমিও সুধানবজ্ঞশালা হইতে সদ্য বাহিরে আসিয়া প্রধান অতিথির আসনে বসিয়া ঐকি ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ফণীন্দ্রনাথ ভাগ্যবান্ পুরুষ—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। ভারতবর্ষের বিশ্ব ছায়ায় বসিয়া চিরদিন ভারতীয় সংস্কৃতির সাধনা করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গীয় কুলদা মল্লিক লাপার আশীর্বাদ, আর স্বর্গীয় জলধর সেন মহাশয়ের স্নেহেচ্ছা উহার শিশুর মত সরল মনে সংস্কৃতির যে সুরভিকানন সাজাইয়া দিয়াছে, অতিভাষণের ভিতর দিয়া তাহারই সুরভি তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে আমোদিত করিয়া আসিয়াছেন। সুধী শিল্পীবৃন্দ নানাবিধ নৃত্যগীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ ও তাঁহার সহযোগীবৃন্দ এই পল্লীসম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিয়া দেশবাসীর হৃদয় জয় করিয়া লইলেন, সন্দেহ নাই। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—

যা লোকরঞ্জনাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

নামৈব কেবলম্

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভক্ত কবি বিষ্ণুগুপ্ত মনসা-মঙ্গল রচনা করিয়া দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন :—

"যতক্ষণ চুড়িয়া তোমার গীতি গাহি।
অন্যস্থানে যাও যদি শিবের দোহাই।
বালক দেখিয়া যেন দুখী পিতা-মাতা।
হেন মতে প্রসন্ন হইয়া শুন মোর কথা।"

ভক্ত আবদার ধরিলেন—মা যখনই তোমার গান আমি গাইব, তখনই তোমার আমার নিকট উপস্থিত থাকিয়া আমার গান শুনিতে হইবে।

মা উত্তর করিলেন—

"যখন গীত শুনি আমি তোমার রচিত।
সত্য করি কহি তথা যাইব নিশ্চিত।"

মা কিন্তু তাঁর বর শুধু কবির প্রতিই অর্পণ করিলেন না। পরন্তু সমগ্র বিশ্ববাসী সন্তানগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রেষ্ঠতম আশীর্বাদ স্বরূপ বলিলেন—যেখানেই, যে কেহ, যে কোনও সময়ে, তোমার রচিত সঙ্গীত কীর্তন করিবে, আমি নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেখানেই আমি উপস্থিত হইব এবং গান শুনিব!

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণান্তর নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন। গৌর বিরহে নবদ্বীপবাসী ভক্তবৃন্দ বারিহীন মীনের ন্যায় ম্রিয়মান ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে তাঁহারা পুরীধামে গমন করিয়া প্রভুকে

দর্শন করেন এবং পথ্যুত্তে তদলোক জাতির নিজ নিজ ভ্রমবন্ধী দশার কথা জাতির ভাষে প্রকাশ করেন! প্রভু তাহাদের অবস্থানেই আদিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—

যথা— নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌর দেশে।
অনর্গল প্রেম-ভক্তি করিহ প্রকাশে॥
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকটে যাইব।
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন।
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁর মধুর বচন॥
তোমার গৃহে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব।

চৈতন্য চঃ অঃ

প্রভু বলিলেন—যেখানেই ভক্তগৃহে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হইবে, সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিবেন এবং কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া নৃত্য করিবেন!

ভূলোকে অবতরণের পরেও শ্রীপাট খেতুরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের মহামহোৎসবে শ্রীশ্রীগৌরপ্রভু কীর্ত্তনানন্দে সর্ব্বসমক্ষে প্রকট হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন! যথা নরোত্তম-বিলাসে—

"নরোত্তম মত্ত হইয়া গৌর গুণ গায়।
গণ সহ অদ্বৈত হইল গৌর রায়॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর।
মুরারী বক্রেশ্বর হরিদাস অক্রূর॥
ভগবান গৌরদাস আদি সবে নাচে।
হইল সর্ব্ব নয়ন গোচর হর্ষ হৃদয়ে॥
সবে আত্ম-বিস্মৃত হইল সেই কালে।
যেন নবদ্বীপে বিলসয়ে কুতূহলে॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অপ্রকটের পর এই তাঁহার প্রথম আবির্ভাব আখার—

অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

যেখানেই কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সেইখানেই বৃন্দাবন। আবার বৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম—প্রভুর নিত্য লীলাস্থল, প্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না। তাই—যেখানে নাম কীর্ত্তন সেখানে বৃন্দাবন ও প্রভুর আবির্ভাব ও স্থিতি।

যেখানে হয় হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।
সেখানে বৃন্দাবন॥

শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীমন্ত্রে দেবতাগণ কর্ত্তৃক নারায়ণী স্তোত্র কীর্ত্তনের পর ভগবতী বাক্য দ্বাদশ অধ্যায়ে দেবীর প্রতিজ্ঞা অনুধাবন করুন :—

"যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যগ্, নিত্যমায়তনে মম।
সদাহং তন্ন হিংসাম্যমি দাস্যামি বাঞ্ছিতং বরমেদ্বিতম্॥

অর্থাৎ—আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য যথোক্ত প্রকারে অর্থাবধারণ পূর্ব্বক পঠিত হয় সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ করি না! পরন্তু সেখানে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি।

(স্বামী জগদীশ্বরানন্দের অনুবাদ)

মায়ের নাম যেখানে সেখানে তাঁর ধাম। সেখানেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক,
জগজ্জনের শ্রবণ জুড়াক্।
সেথায় বিরাজে বেদ আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ।
ঘুচে অপমান, জেগে উঠে প্রাণ
বিমল প্রতিভা বিকাশে।"

রবীন্দ্রনাথ।

পূর্ণ ব্রহ্মচারী মহাবীর শ্রীহনুমানজি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন ধরাধামে রামনাম থাকিবে ততদিনই তিনি অমর এবং মেদিনীমণ্ডলে অবস্থান করিবেন—

যাবদ্যে কথা লোকে চরিষ্যতি পাবনী।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্।

(রামায়ণ উত্তরকাণ্ড।

যে পর্য্যন্ত তোমার পাবনী কথা লোকে প্রচারিত থাকিবে সেই পর্য্যন্ত তোমার আজ্ঞা পালন করিয়া এই পৃথিবীতে থাকিব।

ভগবান রামচন্দ্র প্রাকৃত দেহ ত্যাগ করিয়া কোন যুগে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভক্ত অদ্যাপি বিদ্যমান, কারণ অদ্যাপি জগতে সর্ব্বত্রই রামনাম গান হইতেছে। রামনামের জোরে ভক্ত হেলায় লঙ্কা গোষ্পদবৎ উল্লঙ্ঘন করিলেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবানের সেতু বন্ধন করিয়া পার হইতে হইল! যেখানেই রামনাম কীর্ত্তন সেখানেই ভক্ত মারুতি।

"যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র কৃত মস্তকাঞ্জলিম্।
বাষ্পবারি পরিপূর্ণ লোচনং
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥"

যেখানে যেখানে রঘুনাথের গুণগান করা হয় সেখানে সেখানেই যিনি মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্ব্বক সাশ্রু নয়নে অবস্থান করেন সেই রাক্ষস-বিনাশী মারুতিকে সকলে নমস্কার করুন।

তাই রামনাম আর হনুমান অবিচ্ছিন্ন। যেখানে নাম সেখানে ভগবানের ও অধিষ্ঠান—

"মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তে তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

সেখানেই—"ভক্তের হৃদয় পানে ছুটি বিতরিছে স্বর্গের সৌরভ।"

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র হরিনাম বিতরণচ্ছলে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক ভক্ত বিপ্র নিত্য গীতা

পাঠ করিতেন। তাহার পণ্ডিত্য কিছুই ছিল না। অশুদ্ধ পাঠ করিতেন এজন্য ছোকরাগণ তাহাকে উপহাস করিত। কিন্তু যীশু পাঠ করিলে, তাহার ভাবগুণ হইত। তিনি যে স্থানে যীশু শ্লোক কৃষ্ণকর্ণামৃতের কৃষ্ণার্জুনের বর্ণন থাকে করিতেন।

যথা— বিল্ব কহে মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি।
শুদ্ধাশুদ্ধ যীশু পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি।
অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হন রজ্জুধর।
বসিয়াছে হাতে হাতে জানেন ঈশ্বর।
অর্জুনে কহিতে আছেন চিত্ত উপদেশ।
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ।
সাধু পড়ে যাহে পাঠ তাঁর মরমজ্ঞান।
এই লাগি যীশু পাঠ না ছাড়ে মোর মন।
প্রভু কহে যীশু পাঠে তোমারি অধিকার।

বিল্ব যীশু পাঠ কালে কৃষ্ণবর্ণন করিতেন এবং ভগবৎসাহিত্য উপলব্ধি করিতেন।

স্মরন্ নিরন্তরং তোত্রপরিচিতঃ সংসারবারান্নিধিঃ
কৃষ্ণ যেষ্টিত দুস্তরোঽপি পরমঃ বিষ্ণোঃ পদং গাধতে

ই শ্রীশঙ্করাচার্য।

যাহার নাম স্মরণ করিলে দুস্তরও আশু অপার সংসার সাগর পার হইয়া বিষ্ণুর পরম পদলাভ করেন, অতএব কৃষ্ণনাম স্মরণ, স্মরণ, ও কীর্ত্তনই পরমপুরুষার্থ।

"কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দুইত সমান।
নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দ স্বরূপ।
দেহ দেহীর নাম নামীর কৃষ্ণ নাহি ভেদ।
জীবের ধর্মনাম দেহ স্বরূপ বিভেদ। চৈঃ চঃ অঃ
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তোঽভিন্নাত্মা নাম নামিনাম্।

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি স্বরূপ। উহা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রসের বিগ্রহ স্বরূপ, পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত।

তিনি নাম ও নামীর অভিন্নাত্মা।
নাম ও নামীর স্বরূপে কোনও ভেদ নাই।

অতএব—

"কের তাঁর নাম গান।
যতদিন দেহে রহে প্রাণ।

তবেই মিলিবে কীর্ত্তনানন্দে কৃষ্ণাবনধাম, আর উপলব্ধি হইবে তাঁর অধিষ্ঠান। ভাগ্যবান তাঁহাকে দেখিতেও পাইবেন। কিন্তু সে গান যেন হয় সত্য সত্যই বৈকুণ্ঠের তরে।

পরিবর্তন

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

হাজার অশ্বের খুরের ঘায়েতে ছুটেছে রথ :
বলতে পারো চল্‌বো কতো আর পুরানো পথ ?
ধূলায় ধূলায় দিগন্তে যে ঘনালো মেঘ—
ঝড়ের হাওয়ায় থাম্‌বে কি এ রথের বেগ !

পুরানো দিনের সব পথ আজ হায় অচল—
প্রবঞ্চনার আড়াল দিয়ে করো না ছল।
মনের গতিরে বাঁধা দিয়ে হায় বৃথাই রাখা,
দুর্বল হাতে মূর্খের ছটা যায় না ঢাকা !

পুরানো পথে বার বার মিছে পরিক্রমা,
মিথ্যে আশায় আঁধার কেবলি করেছ জমা।
পূর্বাচলের নতুন আলোক দিয়েছে সাড়া—
জীবনের পথে আঁধার ভেদিয়া চলেছে কারা !

অনেক আশায় ঘর করে তুমি মরেছ ঘুরে—
দেখেছ সূর্য লাল হ'য়ে ঐ রয়েছে দূরে ?
জীর্ণ বাঁধন, পুরানো স্মৃতির বোঝার ভারে
ক্লান্ত দেহ কঠোর ক্লান্ত পথের ধারে !

বন্যার চাপে অশ্বের গতি রেখোনা ধরে—
বন্ধ জীবনে ছুটাও অশ্ব নতুন করে।

জাপানে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

হনোলুলু ! হনোলুলু ! কী নাও ! মনে পড়ে বালাকালে প্রথম যখন ভূগোল পড়ি তখন খুব মজা লাগত দুটো নাম শুনে ! যদি কালাপাণির পারে যাই, কোথায় খেতে সাধ যায় আগে ? না, হনোলুলু ও মাণাপাকার। এমন দেশে যে মানুষ সত্যি সত্যি যেতে পারে এমন কথা কল্পনা করতে পারলেও বাস্তব ব'লে মনে হয় নি। সেই হনোলুলু ! আর কী হনোলুলু ! ফরাশি ভাষায় যাকে বলে und vie !

সত্যি কী দেখ ! গন্ধর্বলোকের কথা কানে শুনেছি চোখে দেখি নি। শুনেছি বড় বড় যোগী ধ্যানীরা না কি ধ্যানের পাখায় সে-রাজ্যে উধাও দিয়ে আসেন কখনো কখনো। একদা শ্রীঅরবিন্দের কাছে এও শুনেছি যে মা মা যের মত রাখো সৌন্দর্যে অনেক প্রেরণা আসে না কি গন্ধর্বলোক থেকে। ১৯২৭ সালে পণ্ডিচেরি আশ্রমে আমাকে বলেছিলেন : রবীন্দ্রনাথ গন্ধর্বলোক থেকে এসেছিলেন। তা নি না, এসব উক্তির মর্ম। একসময়ে হয়ত এসব অবিশ্বাস করতাম। কিন্তু গুরুদেবের দেহাবসানের পরে এই সুন্দরের ইন্দ্রিয়ার মাঝারে এত শত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেছে আমার জীবনে যে অবিশ্বাসকেই এখন বেশি অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। তাই যদি বলি হনোলুলু দেখে মনে হয়েছিল যে গন্ধর্বলোকের ছিটেফোঁটা এখানের গায়ে লেগেছে এ-হেন জনশ্রুতিকে অবিশ্বাস করার আর তেমন জোর পাই না, তাহ'লে হয়ত খানিকটা বোঝানো হবে আমার অনুভাব, যা উচ্ছ্বাসের পরিমাণ। অবশ্য এদেশবাসীরা যে রূপে গন্ধর্ব কিম্বর তা বলছি না, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য এদেশে এমন একটা সৌন্দর্যশিখরে পৌঁচেছে যে বলতে সাধ হয় :

গুরেকিকি চৌরবর্তী হাওয়াইআন হোটেল—হনোলুলু

শ্যামলকান্তি পরম-শান্তি—আনন্দ উল্লসিল রূপে অতুলন এ-হেন ভুবন কে কেমনে রচিল ! কত গাছ কত পাতা কত লতা কত ঘাস—আর সবার উপরে সবুজের সে কী অপরূপ ঝকমারি। ফুটপাথেও ঘাসের বাহার। একটি বড় রাস্তার মাঝে ফুটপাথ—নবীন তৃণাবৃত—দুধারে চলেছে মোটর—একদিকে মোটর সারি সারি তিনটি কলমে উধাও এমুখে, অন্যদিকে ছুটেছে—ওমুখে। একটি রাস্তায়, ভাবুন, ছটি কলমে মোটরের সার চলতে পারে বন্ধুকে, পাশাপাশি মাঝের ফুটপাথে দাঁড়ালে উদ্ভ্রান্ত হ'তে হয়। তবে অমুক পুলিশ দাঁড় করায় লাল আলোর তর্জনে, তখন পার হ'লে বিপদ কোথায় ? কিন্তু এ তো হ'ল ওদের ব্যস্ততার কথা, ধনবৈভব যানবাহনের কথা—কিন্তু আমি প্রাসঙ্গিকতার—হনোলুলুর নিসর্গশোভার কথা বলছিলাম না ? যদি ভুবন মনোমোহিনি ! সঙ্গে মিশেছে শৈলমালার সঙ্গে। যদি শুধু এইটুকু হ'ত তাহ'লে অবশ্য এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি বলা চলত না। পাহাড়ের শোভা—এও অন্যত্র দেখা যায়। সবুজ মাঠের অজস্রতা—এও দেখে

যদি জুড়ে দেওয়া যায় সোমবৎসর এখানে চিরবসন্ত—সাগর থেকে বরাবরে। কিন্তু তার সঙ্গে যদি জুড়ে দেওয়া যায় রাস্তাঘাটের একান্ত অসততা তথা পরিচ্ছন্নতাই, যদি জুড়ে দেওয়া যায় মশামাছি পতঙ্গের একান্ত বিরলতা (শুনলাম নাকি এখানে নির্বংশ ?), যদি জুড়ে দিই সমুদ্রের জলের নানারূপ একই সময়ে—এখানে নীল, ওখানে সবুজ, ওখানে পাটল, ওখানে নীল লোহিত ? যদি জুড়ে দেওয়া যায়—

> মণিমালা পরি কে সাজে গো মরি ! নিত্য-দীপালি রূপে
> আকাশের তারা চেয়ে রয় মেয়ে—দেখে কি মুখ সোহাগে ?

পাঁচালি তিথি এখানে উত্তাপ—মধ্যাহ্ন সূর্যেও এতটুকু উত্তাপ দেহকে উত্তপ্ত করে না। যদি ঘুড়ে বেড়ান যায়—রাস্তার দুধারে বিপণিশ্রেণীর মধ্যেও চোখকে আকর্ষণ করে এমন একটি দোকানও চোখে পড়ে না? যদি ঘুড়ে বেড়ান যায়—বন্দরে নব নব জাহাজেই এখানে ফলের মৌসুম থাকে? যদি নেই কোথাও? যদি ঘুড়ে বেড়ান যায়—কিন্তু না আর থাক। পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যচ্যুতি হ'লে আমার লাভ হবে যে। এক কথায় বলা যায় যে, ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্য থেকে যখন পুরাকালে নির্বাসিত হ'য়েছিলেন তখন বুঝি বা এই দ্বীপটিতে এসেই লুকিয়ে থাকতেন, আর ওঁর অনুগত অনুচরবৃন্দ হয়তো মাঝের পড়ন ক'রত এখানে—দেবরাজকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে তো! যাক্, এবার ইন্দ্রলোক ছেড়ে মানুষের কোঠায় ফিরে আসি—যদিও পদ্মের পরে পদ্ম—রসভঙ্গের দায়ে পড়ব হয়ত! নিরুপায়। পালা পদে সুরু করলে সারা না হ'লে থামা যায় কি?

বিমান থেকে ওয়েস্কিফি

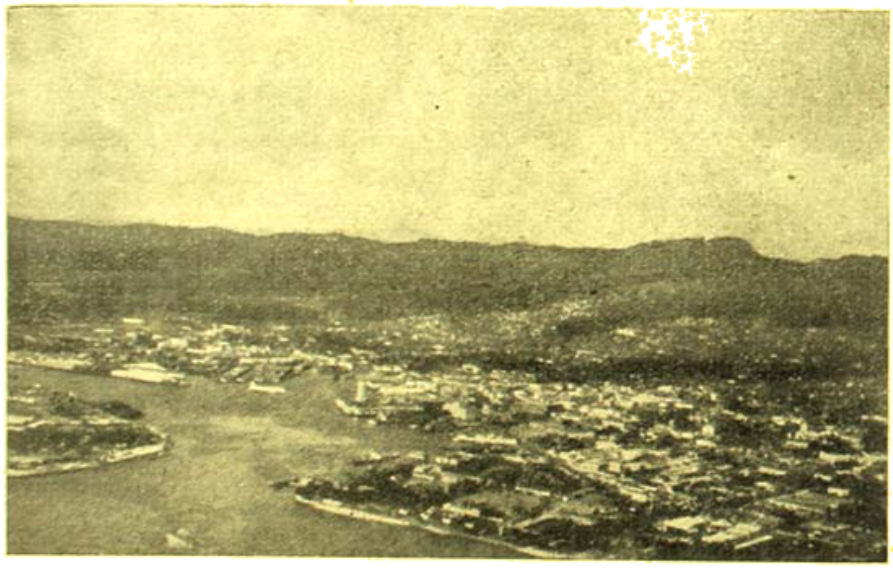

বিমান থেকে হনোলুলুর দৃশ্য

হনোলুলুতে পৌঁছতেই এক বণিক বন্ধু প্রকাণ্ড মোটর নিয়ে এসে হাজির। টোকিওতে থেকে আমার এক সিঙ্গাপুর-বাসী বণিক বন্ধু এঁকে তার ক'রে দিয়েছিলেন আমাদের নাম ক'রে।

ইনি ধনী। এখানে এঁদের তিনচারটি দোকান আছে। চমৎকার বাড়ি—প্রাসাদের স্টাইলে তৈরি ও সাজানো। ভাবছেন আমাদের স্বদেশীয় বণিক যে এভাবে থাকতে পারেন, ধনাগমে যে ওঁর রুচিরও বিকাশ হয়েছে—তাতেও আনন্দ। সিঙ্গাপুরীয় খাঁটকে এত ভালো স্টাইলে থাকতে দেখে নি। চমৎকার বাড়ি, চমৎকার বাগান, চমৎকার আসবাবপত্র। বারান্দার মাঝখানে মহাপাতার বিতান—সামনে সবুজ মাঠ—ওদিকে শুধু দীপকণ্ঠী শৈল বা লা ঝিমঝিক ঝিকঝিক করছে। ইনি আমাদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন নিয়ুয়ানু হোটেলে।

হোটেলটি ধনীদের জন্যে। কিন্তু অনেক ভারতীয় মধ্যবিত্তদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সস্তা আবাসে যেতে মন সরল না—মায়ে এই জন্যে ঘুড়ে বেড়ান যায় এখানে নিবাসগুলি প্রায় সর্বত্রই ছবির মতন দেখায়—প্রতি বৃক্ষে একটি ক'রে রঙিন কুটীর—যার এপাশে পাহাড়, ওপাশে সবুজ ঘাস—অথচ রাস্তার ঘাটে অজস্র ট্রাম বাস চলা সত্ত্বেও সহর প্রায় নিঃশব্দ! যদি ঘুড়ে বেড়ান যায়—প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথও এতটুকু ধুলোর চিহ্ন

যে ইন্দিরা ১৭ ঘণ্টা বিমানে চ'ড়ে এসে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। দিনে মাত্র সাত ডলার প্রত্যেকের জন্যে—শুধু ঘরভাড়া। এর সঙ্গে খাওয়া জুড়ে দিন। সবই আলা। একটা কোর্সের ডিনার বা লাঞ্চ অন্তত দুডলার কিনা দশটাকা। একদিন রাতে এ-হোটেলে নৃত্যাদিও ছিল, সে-রাতে তিন ডলার পড়ল প্রত্যেকের। তিন দিন ছিলাম এ হোটেলে দাম দিল মাট ডলার অর্থাৎ তিনশো টাকা—তাও অনেকগুলি ডিনার লাঞ্চ বাদ দিয়ে—মানে বন্ধুরা করেছিলেন নিমন্ত্রণ। কিন্তু জিনিস-পত্রের দরদামের কথা থাক। কলকাতায় কে না আলোচনা করে আজকাল : "ভাই আগে টাকায় মিলত চার সের দুধ, আজ আধ সের। চাল মিলত আট টাকা মণ আজ চল্লিশ টাকা—ইত্যাদি। এ-আক্ষেপের মধ্যে দুঃখের অনেক কিছু থাকলেও বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই, কেবল একটি জিনিসের দামের কথা বলি : একটি নকল পাটো বস্তুরের রেশমের লাট কিনতে হ'ল এখানে—দাম মিল পাঁচ ডলার কি ছ'য়া পঁচিশ টাকা। তা দেবরাজের দেশে থাকতে হ'লে তার টেক্স দেবার রেস্ত না থাকলে চলবে কেন ?

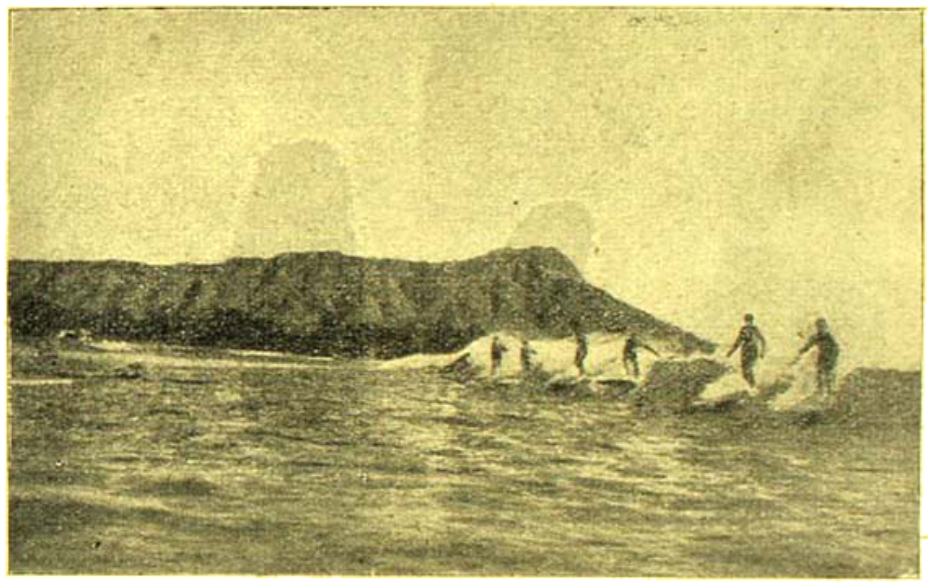

ওয়েকিকিতে জনস্রোত—হনোলুলু

দ্বিতীয় দিন এখানকার দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক চার্লস মুর এলেন দেখা করতে। দু'জনা গাড়ি ক'রে সেদিন আমরা বেরিয়েছিলাম ট্যাক্সি ক'রে শহর দেখতে—কাজেই দেখা হ'ল না। তিনি লিখলেন তার পর দিন আসবেন—তাঁর মোটরে ক'রে শহর দেখাবেন আমাদের। চমৎকার মানুষ ! মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম তাঁর স্নেহময় ব্যবহারে। তিনি বললেন ভারতীয় দেখলেই তাঁর মন খ'লে যায়। শুনে আনন্দ হ'ল বৈ কি। কিন্তু বলতে বাধ্য হলাম তাঁকে : "সে আপনার নিমন্ত্রণে।"

গুণ যাই হোক মানুষটি বড় চমৎকার। যেমন বিনয়ী, তেমনি তেজস্বী, যেমন পরোপকারী তেমনি স্পষ্টবক্তা, যেমন বিদ্বান্ তেমনি প্রভুল্ল। নানাগুণের এহেন সমাবেশ খুব বেশী দেখা যায় না। মুর দর্শনের নানা প্রবন্ধ লিখেছেন, বই লিখেছেন কিনা ঠিক জানি না তবে দুখানি দার্শনিক বই সম্পাদন করেছেন যাতে নানা জাতের লেখকের (জাপানী, চৈনিক, ভারতীয়) প্রবন্ধ আছে। ওখানে পৌঁছতেই আমার হাতে শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ দিলেন—আর্য থেকে উদ্ধৃত। আনন্দ না হ'য়ে পারে ! গুরুদেব সম্বন্ধে বহু কথা ব'লে কেললাম ঘরণী পেয়ে। ইন্দিরার নানান্ অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা প'ড়ে ইনি মোটেই অবিশ্বাস করেন নি। ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ইন্দিরাও কত যে সুন্দর কথা বলল গুরুদেব সম্বন্ধে !

মুর নিয়ে গেলেন হনোলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দিলেন আলাপ করিয়ে। তিনিও অতি চমৎকার লোক—ভারতের প্রতি ভক্তি অগাধ, শ্রীঅরবিন্দের লেখাও পড়েছেন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে, কতটা বুঝেছেন তা অবশ্য আলোচনা ক'রে যাচাই করার সময় ছিল না। মুর বললেন প্রেসিডেন্টের আন্তরিক ইচ্ছা আছে ভারতের ঐতিহ্য তথা সংস্কৃতির সম্বন্ধে।

তারপর দেখতে দেখতে এ-বিদেশী সহরের তামুক মানুষটির সঙ্গে হৃদ্যতার বন্ধন স্থাপিত হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন তিনি কতদিনের পরিচিত। যেখানে হৃদয়ের তাপ লাগে সেখানে যে এ-ধরণের অঘটন অতি সহজেই ঘটে একথা না জানে কে ? তবু প্রতি ক্ষেত্রেই যেন নতুন ক'রেই পাওয়া যায় এ পরম উপলব্ধি—যে হৃদয় যেখানে সাড়া দেয় সেখানে বাইরের বেড়াজাল তেমনি সহজেই ভেঙে চুরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, যেমন যায় সূর্যোদয়ে কুয়াশা। যেদিন আমরা সানফ্রান্সিস্কো রওনা হ'লাম আকাশপক্ষীর ডানায় আরূঢ় হ'য়ে সেদিন ইনি নিজে থেকে আমাদের নিয়ে এলেন হোটেল থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে বিমান ঘাঁটিতে। পথে দুটি ফুলের মালা কিনে পরিয়ে দিলেন আমাকে ও ইন্দিরাকে। একলাই থাকেন এ-দার্শনিক, পড়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, যখন বিমান ঘাঁটিতে বিদায় নিলাম তখন মন আমাদের আর্দ্র হ'য়ে উঠল। পরিণত বয়সে ভাবের উচ্ছ্বাস সহজে জমতে পায় না—সবাই জানি, কিন্তু যেখানে হৃদয়ে মনে হয় কত কী ! মনে হয় মানুষ এক মুহূর্তে মানুষের কত কাছেই না আসতে পারে যেন কাল রীতি নীতি আচার বিচারের গণ্ডী পেরিয়ে ! তবু মানুষ মানুষের সঙ্গে সহজ প্রীতির ঐক্যসূত্র ছেড়ে আপন-পর সংস্কারকেই একান্ত

ক'রে ঘরে যে বিদেশের রোদে কে বসবে? হয়ত ও সুন্দর চোখে বিদেশ ক'রে সৃষ্টি করেছেন বিধিদেব নিয়ামক সুন্দরের মহিমা বাড়াতে। তবু মনের কোণে আক্ষেপ একটু রয়েই যে সুন্দর দৃষ্টি আরো একটু সুলভ হ'ত, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেনাপাওনার যদি ঠকাঠকির অনুভূতিটি আরো একটু সহজে ভুলিয়ে দেওয়া যেত!

হারপারের ঘিরে সেই সিঙ্কুবেদীর বণিক বন্ধুটির বাড়িতে বৈকে হ'ল আমাদের নাম গানের। সেখানেও কেন ঐ একই সভাকে যেন নূতন ক'রে পেলাম—এবার সঙ্গীতের সূত্রে—যে বাইরের ব্যবধান সহজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে আসতে পারে বৃহত্তরীতের অবদানে। আমাদের সুর ও আর একটি মধ্যাপক ছিলেন, ছিলেন চাওড়াই আমেরিকা ইটালির মহিলারা। ছিল একটি হিন্দুস্থানি ছাত্রও। আরো কত অতিথি। যতদূর মনে হ'ল একটু—ই অরবিন্দ সম্বন্ধে, আমাদের গানের সম্বন্ধে, মীরাবাইয়ের বৈরাগ্য সম্বন্ধে, পিতৃদেবের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে, ইন্দিরার মীরা-ভজন শোনা সম্বন্ধে উত্যাদি। গাইলাম নানা ভাষায়: সংস্কৃত, ইংরাজি, হিন্দি, জর্মন, বাংলা। সবাই খুব উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন, পুনরুক্তি অনুরোধ করলেন আর একটি ইংরাজি গান গাইতে—বললেন, আমার ইংরাজি স্বরলিপি ও উচ্চারণ অনেকেরই হৃদয়কে বিশেষ স্পর্শ করেছে। খুশি হ'য়ে গাইলাম প্রথমে মীরাবাই রচিত চাকর রাখোজির ইন্দিরা-কৃত নব সংস্করণ হিন্দিতে উদ্দিষ্ট বৃত্য সঙ্গীতের সঙ্গে, পরে ইংরাজিতে একা। ইন্দিরা আরো একটি গানের সঙ্গে নাচল—"কাঁপি যমুনায় কুঞ্জবনমে"—তার স্বরচিত গান এটি। এ গানটিতে নানারকম হাবভাবের লীলায়িত ছিল তাই গানটি ফুটে উঠতে তেরি হ'ল না। গানের শেষে সবাই ইন্দিরার নৃত্যের সম্বন্ধে কী উৎসাহেই যে কথা বললেন! বললেন আরো কিছুদিন কেন থাকি না—এ বৃত্যটিও আরো অনেক দেখুক না। কিন্তু আমাদের থাকা সম্ভব হ'ল না নানা কারণে। দুঃখ হ'ল বৈ কি একটু। কিন্তু আনন্দও হ'ল ওদের আগ্রহ দেখে। আমাদের সঙ্গে এসেছিল সেই যে মার্কিন যুবকটি—সে তো নৃত্যটিও শুনে ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। ইউ-এন-ও-র সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত, নিত্য বক্তা। হয়ত ওর মধ্যে দিয়ে আমাদের গানের মহিমা সম্বন্ধে কিছু জানবে বাইরের শ্রোতা। এমনি ক'রেই তো সঙ্গীতের, কাব্যের, শিল্পের বীজ বোনা হ'য়ে থাকে—আর কার হৃদয়ে যে কোন্ ঋতুতে ফসল ফলে কেউ কি জানে? যুবকটি পরদিন আমাদের নিমন্ত্রণ করল ও বলল আমেরিকায় আমাদের সঙ্গে দেখা করবেই করবে। সানফ্রান্সিস্কো ও নিউইর্কে ওর সঙ্গে দেখা হবে তাহলে ভালো লাগল আরো। এই জন্যে যে ইন্দিরার সঙ্গে আলাপ ক'রে যুবকটি মুগ্ধ হ'য়ে গেল। মনে হ'ল যেন আমাদের ও ছোট ভাই। কত যে ভাই বরদাস ঘটত আমাদের সানন্দে!

* * * *

(ক্রমশঃ)

অপরাহ্ণে

কল্পনা দেবী

হৃদয়ে যখন জেগেছিল মধু মাস,
মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যালোকে
অন্তরের শাখা-প্রশাখা হয়েছিল আলোকিত,
নানা বিহঙ্গের কল কাকলিতে
মানসবন ছিল মুখর মধুর,
জীবন-ভরা-তরঙ্গ যখন উচ্ছল ধারায়
তটরেখা ছাপিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছিল
কত শ্যামল-প্রান্তর,
ভাবের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল,—
সীমা হ'তে সীমান্তরে—
কত অমূল্য মণিপ্রাণ,
তখন, হে সাধক, কোথায় মগ্ন ছিলে তুমি
সফল ক'রতে তোমার সাধনাকে?
কোথায় বা ছিল তোমার এই সাজি ভরা ফুলডালি,
আর ডালিভরা ষোড়শোপচার?
নৈবেদ্য নিবেদনের শুভলগ্ন হয়েছে গত
বহুক্ষণ আগে,
হৃদয়-মন্দিরের দ্বারও হয়েছে রুদ্ধ,
ঘনিয়ে এসেছে অপরাহ্ণ
গোধূলির রাঙারশ্মি-পাত হয়েছে
জীবনের আঙিনায়,
ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে সোপানের শ্রেণী,
প্রবেশ পথ আর ত নেই
বাধাহীন, সরল।
ফিরিয়ে নিয়ে যাও হে পূজারী
তোমার ওই পুষ্প সম্ভার।
বৃথা আঘাত হেনে
জর্জরিত কোরে তুল না তোমার ওই
প্রশস্ত, রক্তিম ললাট;
এ পাষাণ বেদীর বক্ষ বিদীর্ণ কোরে
কখনও জাগবে না সুধা নির্ঝরিণী,
তরুণ অরুণ-রাগের পরশ পেয়ে
কখনও ফুল ফুটবে না—
এই কঠিন শুষ্ক
মরুমন্দির-চত্বরের শিলায় শিলায়;
মগ্ন মুগ্ধ এ প্রতিমার সুপ্তিভঙ্গ
কখনও হবে না জেনো
তোমার ওই সোনার হাতের ছোঁওয়া লেগে;
নিঃশেষিত প্রায় প্রাণ ধারা আর কখনও
অন্তর্দগ্ধ হয়ে উৎসারিত হয়ে উঠবেনা;
তোমার তৃষিত, উত্তপ্ত বক্ষের অতৃপ্ত পিয়াসা
মিটিয়ে নিতে পারবে না
আর এই ক্ষীণ-বারি-রেখার
হিমস্পর্শ দিয়ে;
বেদনা তোমার রয়ে গেল অনিবেদিত,—
অক্ষত, অকম্পিত রয়ে গেল তোমার মানস-প্রার্থনা॥

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গোপাল দ্বিপ্রহরে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন—

বিল্বমূলে শরতের অপরাহ্ণরৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে, তাল ও শালবনের মাথায় নিস্তব্ধ আলোক রশ্মি। মণ্ডপের সম্মুখে কাষ্ঠের গুড়ি জ্বলিতেছে, তাহার কম্পমান ধূম ধীরে ধীরে বায়ুস্তরে মিশিয়া যাইতেছে। ধূপ ধূনা ও গুগ্‌গুলের গন্ধে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল সুরভিত। গোপাল উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না,—তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি যেন এক প্রলয় ভূকম্পনে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পূজান্তে তিনি যে দক্ষিণা বা দান গ্রহণ করেন তাহা কি তাঁহার প্রাপ্য নয়? ন্যায্য প্রাপ্য হউক আর নাই হউক, ভিক্ষার দান, অযাচিতের দানকে তিনি কেমন করিয়া গ্রহণ করিবেন? যে পূজায় তাঁহার মনঃসংযোগ হইতেছে না, তাহারই জন্যেই বা তিনি কিরূপে দান গ্রহণ করিবেন?

ভাবিতে ভাবিতে গোপাল থামিয়া গিয়াছিলেন। শশধর কখন যেন পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন— সম্ভবতঃ চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতেছিলেন। গোপাল মুখ তুলিতেই শশধর প্রশ্ন করিলেন—কি ঠাকুরমশায় কি?

গোপাল কহিলেন—ব'সো শশধর। কেন যেন পূজায় আমার মনঃসংযোগ হচ্ছে না। বৎসরান্তে মাকে ডাকবো কিন্তু তা'ত ঠিক পারছি না। তুমি অন্য পুরোহিত ব্যবস্থা কর, পূজা আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হবে না।

শশধর ম্লানমুখে কহিলেন—সে কি ঠাকুরমশায়, আমি ত আপনাকেই পুরোহিত জানি—আমি ত কোন অপরাধ করিনি—

গোপাল কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু কেন যেন তাঁহার অন্তর ফাটিয়া যাইতেছিল। কহিলেন—অপরাধ নয় শশধর, আমার ভয় হ'চ্ছে, একান্ত মনে পূজা আমি যেন করতে পারবো না। পূজার অঙ্গহানি হবে, আমার তোমার সকলেরই অপরাধ হবে—

চাঁদমোহন আসিয়া কহিল—কি, ঠাকুরমশায় কি?

শশধর কহিলেন—ঠাকুরমশায় ব'লছেন, অন্য পুরোহিত দেখতে, তাঁর দ্বারা পূজা যেন সুসম্পন্ন হবে না এমনি একটা ভাবনা হ'য়েছে ওঁর···

চাঁদমোহন কহিল—কেন? পূজা অঙ্গের জন্য ত আমি বিশেষ কিছু কাটি নি। কেবল দুখানা কাপড়, আর দুটি টাকা দক্ষিণা কেটেছি মাত্র—

গোপাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কথিক চাহিয়া রহিলেন—ফর্দ্দ কম হইতেছে বলিয়া, নেহাৎ স্বার্থের জন্যে তিনি পূজা করিবেন না একথা চাঁদমোহন ভাবিল কিরূপে? ধীরে ধীরে কহিলেন—সেজন্যে নয় চাঁদ। আমার মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না, পূজার অঙ্গহানি হবে শেষে—

—ওসব কিছু না, উৎসব এই মাত্র। পূজা তার অঙ্গ, মন্ত্র পড়লেও হয়, না পড়লেও পূজা হ'তে পারে। ও সব আপনি কিছু ভাববেন না।

গোপাল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদের কথাগুলি অত্যন্ত নূতন, কেমন যেন রুঢ়ের মত অন্তর বিদ্ধ হয়। গোপাল কহিলেন—তবে এই পূজায় লাভ কি? যদি ভক্তি, শ্রদ্ধাই না থাকে?

—পৈতৃক কাজ, তাই চ'লছে। অন্যথা অর্থব্যয়, তা হ'লেও উৎসব মানুষের জীবনে চাই ত! তাই পূজা-পার্ব্বণ ব্রত-প্রতিষ্ঠা।

গোপাল আরও কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন—সত্য কথা ব'লতে কি চাঁদ, তোমার কথায় আমার বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি যেন নড়ে উঠেছে। সত্যই কি ব্রাহ্মণ দান গ্রহণের পাত্র নয়, আমরা কি সমাজ সেবার বিনিময়ে এটা পেতে পারি না? মানুষকে ভাল কথা, তার মঙ্গলের জন্যে জীবনের শিক্ষা দীক্ষা দান করে এই দান পেতে পারি না? সেটা কি একান্তই মানুষের ধর্ম্মোন্মত্ততার সুযোগ গ্রহণ করা? এই চিন্তাটা মনের মাঝে এত প্রবল হ'য়ে উঠেছে যে চণ্ডীপাঠে মনঃসংযোগ হ'চ্ছে না। নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হ'চ্ছে, তাই বলছিলাম অন্য কেহ হয়ত সুষ্ঠুভাবে পূজা করতে পারতো—

চাঁদু মুরুব্বির মত হাসিয়া কহিল—যাক্‌গে, এখন ত পূজা করুন ওকথা পরে হবে।

গোপাল ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় চণ্ডী পাঠ করিতে লাগিলেন।

অষ্টমী পূজা—সকাল সাত দণ্ডের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে। অতি প্রত্যূষে পূজার আয়োজন হইয়াছিল এবং যথাসময়ে পূজা সমাপন হইয়াছে।

শশধর ও বনলতা মণ্ডপে অঞ্জলি দিবার জন্যে উপস্থিত হইলেন। পূজা গৃহে কেহ নাই, কেবলমাত্র গোপাল বসিয়া আছেন। উভয়ে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন গোপাল করজোড়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। গোপালকে এমনি একটা অবস্থায় দেখিয়া বনলতা ও শশধর নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন—ভাবিলেন ভক্তের ভক্তি-অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। এই সময়ে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করা সঙ্গত নয় মনে করিয়া দুইজনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোপাল হঠাৎ চক্ষু উন্মীলন করিয়া একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া কহিলেন—মা, করুণাময়ী অপরাধ নিও না মা। আমার পাপে আমাকে শাস্তি দিও, নিরপরাধকে শাস্তি দিও না।

গোপাল একান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া মাথা তুলিতেই দেখিলেন, বনলতা দাঁড়াইয়া, তিনি প্রশ্ন করিলেন—কতক্ষণ এসেছ মা? অঞ্জলি দেবে? এস—এস—

গোপাল অঞ্জলি মন্ত্র পাঠ করাইয়া দিলেন। শশধর প্রশ্ন করিল—আপনার এমন হ'য়েছে কেন ঠাকুরমশায়? আপনার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল—

গোপাল কহিলেন—হাঁ শশধর, সত্যই মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলছে, পূজা করতে পারছি না। তোমাদের কল্যাণার্থে সংকল্প বাক্য উচ্চারণ করে, আমি ত ঠিক পূজা করতে পারিনি, তাই সে অপরাধ আমার—তাই মাকে ব'লছিলাম—

শশধর কহিল,—চাঁদুর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত। আপনার আশীর্ব্বাদেই আমাদের মঙ্গল। সে কি শিক্ষা পেয়েছে জানি না, যুগেরও পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, কিন্তু আমরা যতদিন আছি আমরা মায়ের নামেই থাকবো, আমাদের যথা কর্ত্তব্য করবো—

গোপাল পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—কিন্তু—চাঁদুর এ বিদ্যাও ত মিথ্যা নয়। তা হ'লে ইংরেজ এত শক্তিমান হবে কেন? তাই মনে সন্দেহ জেগেছে, নিজে বড় হওয়াই কি সব? জগতের কল্যাণে সে ধন শক্তির ব্যয় কি অপচয়? কিন্তু আমাদের শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র ত এ কথার সায় দেয় না—

গোপাল থামিয়া থামিয়া কহিলেন—যে দান ছিল শ্রদ্ধার, সে দান আজ হ'য়েছে উপেক্ষার, করুণার। এ দান আমি কি করে গ্রহণ করি শশধর? চাঁদু কেমন করে ভাবলে, দুখানা কাপড় আর দক্ষিণার টাকা কম হওয়ায় আমি পূজা করবো না, মানুষ মানুষকে এত ক্ষুদ্র ভাবলে কি করে? পৃথিবীতে স্বার্থ ছাড়া কি কিছুই নেই? এ শিক্ষা আর এই সভ্যতা ত তা হ'লে দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে রক্তাক্ত করে দেবে—

গোপাল আত্মবিস্মৃত হইয়া কহিয়া উঠিলেন,—মা, জগজ্জননী করুণাময়ী মা, আমার অপরাধ ক্ষমা কর মা, ধরিত্রীকে রক্ষা কর মা।

অত্যন্ত আবেগ ভরে গোপাল মৃন্ময়ী চিন্ময়ীর পদতলে আপনাকে লুটাইয়া দিলেন। তাহার চক্ষুদ্বয়টিতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল শশধর ও বনলতা বিস্ময় বিমূঢ় নেত্রে চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কিছুই বুঝিলেন না।

বাগদী ও বাউরী পাড়ার কতকগুলি লোক অষ্টমীর প্রাতে চণ্ডীতলায় বসিয়াছিল—অদূরে তাহাদের গরুগুলি চরিয়া বেড়াইতেছে। শিবদাস নিতাই ও বলাই সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহাদের মুখে একটা বিষণ্ণতা দেখা দিয়াছে। একজন কহিল—পূজা দেখতে যাবেক নাই রে?

ভরত-পুত্র বলাই কহিল– কোথা আর যাবেক, ছোটবাবু ত নেমন্তন্ন বন্ধ করলেক—বাবা বলেছে, ঘর পুড়ে গেলে ছোটবাবুর বাপ্ ছ'মাস গোলা থেকে খাওয়া করালেক, বসন্ত সারুর করলেক—

নটবর পুত্র নিতাই বলিল—বড়কর্ত্তা কত বলা করলেক, ঠাকুর মশায় বলা করলেক কিন্তু ছোটবাবু ছাড়লেক নাই। কলকাতা বাড়ী করবেক—টাকা চাই—

নীলমণি পুত্র শিবদাস বলিল—তোরা খাওয়া করাবেক, মোদের খাওয়াবেক কেনে? মোরা যাবেক নাই। কেনে যাবে, না ডাকলে কেনে যাবেক?

সকলের মাঝেই একটা অভিমান মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল তাই সকলে কহিল,—কেনে যাবেক, ছোটবাবু ত মোদের চাইলেক না। পূজা ত মোদের না রে।

বলাই কহিল,—বড়কর্ত্তা ত বাপের বেটা বটেক—মোদের ত বহুৎ ক'রলেক—

শিবু কহিল—পূজা ত বড়কর্ত্তার একার লয় বটে—অভিমান ক্রমশঃ রাগে পরিণত হইল, এবং আজ অকস্মাৎ ছোটবাবু যে তাহাদিগের পুরুষানুক্রমিক মর্য্যাদাকে উপেক্ষা করিয়াছেন সেজন্য একটা বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিল এবং স্থির হইল তাহারা কেহ আর পূজা দেখিতে যাইবে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পরে বলাই চুপি চুপি গিয়া কহিল,—শিবু নিতাই চল, নেমন্ত মোরা করে লেবেক—

—সে কি বটে—

—চল্, বসন্ত সায়রে তোপী এড়া করবেক, জাল ফেলবেক, মাছ লিয়ে ভোজ দেবেক—চল—

—কর্ত্তার সায়র বটে, মোদের দিম্বা—মাছ ধ'রবেক।

—হাঁ হাঁ, চল্। পূজার নেমন্ত করে লেবেক চল—

কিছুক্ষণ বাদে তাহাই স্থির হইল এবং বলাই এর ওখান হইতে পচুঁই পান করিয়া তাহারা জাল লইয়া বসন্ত সায়রে উপস্থিত হইল। অষ্টমী পূজার রাত্রি কেহ কোথায়ও নাই। ক্ষীণ চন্দ্র নিষ্প্রভ, কিছুক্ষণ বাদেই তোপীতে একটা বড় মাছ আটকাইয়া লাফ দিল। তিনজনে সেটাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দ্রুত গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। বলাই স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল—আরে, সুমী লে কোটা কর। ভাল করে রাঁধা কর,—মোরা খাবেক—

স্ত্রী সুমীর উপর রন্ধনের ভার দিয়া তাহারা পচুঁই এর পাত্র ও মাদল লইয়া বসিল। নেশা করিতে করিতে বলাই কহিল,—আরে শিবুয়া, বৌ আনা করা, মোরা নাচবেক। বলাই মাদল বাহির করিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল।

গভীর রাত্রে নেশার ঘোরে শিবু কহিল—বেশ পূজা হলেক বটে, কোথা লাগে নেমন্ত—দুর তো ছোটবাবু—

বসন্ত সায়রের মাছ রক্ষা করাটা এতদিন তাহারা পবিত্র কর্ত্তব্য হিসাবে পালন করিয়াছে কিন্তু আজ প্রবল অভিমানে সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া, তাহা চুরি করিয়া নেশার ঘোরে মাতলামি করিতেছে—

নবমী পূজান্তে ছোটলোক পাড়ায় সকলে শুনিল—বসন্ত সায়রের মাছ দিয়া ছোটবাবু গ্রামের সম্ভ্রান্ত সকলকে কালিয়া কোর্ম্মা করিয়া খাওয়াইয়াছেন, লোকে ধন্য ধন্য করিতেছে। কি সব নূতন নূতন খাদ্য খাওয়াইয়াছেন এ দেশের লোক তাহা পূর্ব্বে খায় নাই। তাহা দেখেও নাই। কলিকাতার নূতন জিনিস, নূতন রন্ধন পদ্ধতি :—

ছোটলোক পাড়ায় সকলে সে গল্প শুনিল, কিন্তু কোন বিস্ময় অনুভব করিল না। তাহারা খাদ্যাদির বর্ণনা শুনিয়া মনে মনে একটু কৌতূহল অনুভব করিল মাত্র।

বিজয়ার দিনে সরকার তিনকড়ি সকলকে প্রতিমা বিসর্জ্জনে যাইবার জন্য ডাকিয়া গেল। পূর্ব্বে সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রার জন্য সহস্রাধিক লোক সমবেত হইত কিন্তু আজ কেহই নাই, গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সামান্য অন্যান্য জাতির লোক আছেন মাত্র কিন্তু প্রতিমা বহন করিবে কে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, শতাধিক মেড়ির তৈলের মশাল প্রস্তুত কিন্তু কেহই নাই। শশধর ও গোপাল মণ্ডলের বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। চাঁদমোহন আসিয়া কহিলেন—এখনও মালপাড়া বাগ্দীপাড়ার সব এল না কেন?

—তাই ভাবছি। শশধর ম্লানমুখে উত্তর দিলেন—

—তিনুকে ত ডাকতে পাঠিয়েছি সেও ত ফিরছে না—

কিছুক্ষণ বাদেই তিনকড়ি আসিয়া সংবাদ দিল—কেহই আসিবে না।

চাঁদমোহন প্রশ্ন করিল—কেন?

তা ত' জানি না।

গোপাল কহিলেন—এ পূজা তাদেরই পূজা, এ কথা ত তারা আজ ভাবছে না—তাই আসছে না বোধ হয়। তাদের ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি—

চাঁদমোহন উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—কেন? তারা আমার জমিদারীতে বসবাস করে না, ভিটে ছাড়া করে দেব। আচ্ছা দেখছি তাদের—যাও তিনু বল গিয়ে, যে

যে আসরে সব চার আনা করে পাবে, দেখি তাতেও আসে কিনা?

তিনি পুনরায় চুটিল এবং কিছুক্ষণ বাদে জন বারো লোক লইয়া ফিরিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে—প্রতিমা বরণ করিয়া পুরবধূগণ প্রস্থান করিয়াছেন। মশাল জ্বালা হইল—প্রতিমা স্কন্ধে বারজন বেতনভুক লোক পিছনে পিছনে চলিল—সামনে চলিল মশালধারী সরকার বরকন্দাজ প্রভৃতি। শতাধিক লোক প্রতিমা লইয়া শিবসায়রে বিসর্জন দিয়া ফিরিল—

শিবসায়রের ঘন তালবনের নীচে উচ্চ পাড়ের উপর দাড়াইয়া, নিতাইদের পাড়ার আবালবৃদ্ধ বনিতা দূর হইতে প্রতিমা বিসর্জন দেখিল। চিরদিনের প্রথা মত মণ্ডপে যাইয়া প্রণাম করিয়া পরস্পর কোলাকুলি না করিয়া আজ তাহারা মানমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

কোজাগরীর পরেই চাঁদমোহনকে কলিকাতা যাইতে হইবে। চাঁদমোহন কলিকাতায় বাড়ী করিবেন সেজন্য অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন, সেই জন্য তিনি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন, শশধরের সহিত কিছু কথাবার্ত্তা বলা প্রয়োজন—

গোপাল ও শশধর বৈঠকখানায় কোজাগরী পূজার হিসাবপত্র করিতেছিলেন। চাঁদু আসিয়া কহিল—কি করছেন ঠাকুরমশায়?

—লক্ষ্মী পূজার খরচটা দেখছিলাম—

চাঁদমোহন কোনরূপ ভূমিকা না করিয়া কহিল—খরচপত্র কমিয়ে ফেল দাদা, সমস্ত আয় যদি পূজা পার্ব্বণেই ব্যয় হয় তবে ভবিষ্যৎটা কি থাকবে?

কথাটার সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া উত্তরেই চুপ করিয়া রহিলেন। চাঁদমোহন পুনরায় কহিলেন—কলকাতা বাড়ীটা করাই দরকার, আমার কিছু টাকা চাই তাই খরচপত্র করে বাড়ী আসা, নইলে এ অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম পোষায় না—

গোপাল কহিলেন—কলকাতাতেই বসবাস করবে নাকি? তা হলে দেশে থাকবে কে?

—দাদা থাকবে। ক'লকাতা না থাকলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা হবে কি করে? সেখানে দুদিক থেকে দু'পয়সা রোজগার করবার পথ আছে—

—তোমরা শিক্ষিত হ'য়েছ, তোমরা গ্রামে থেকে গ্রামের মঙ্গল করলেই দেশের মঙ্গল, কিন্তু তোমরা সব যদি শহরে যাও দেশ ত কাণা হ'য়ে যাবে—

চাঁদমোহন একটু ব্যঙ্গ করিয়াই কহিল—আপনারা রইলেন,—আপনারাও ত শিক্ষিত—

—সে শিক্ষা কি আর এ যুগে চলবে—

—কিন্তু আমাদের শিক্ষাও ত এখানে চলবে না, এখানে আপনাদের শিক্ষাই চলবে—যাক্ সে সব কথা ঠাকুরমশায়। আমাকে খাজনা আদায় করে কিছু দিতে হবে দাদা—

শশধর অবাক হইয়া কহিলেন—এখন কি খাজনা আদায় হয়! প্রজাদের খাবার ধানই নেই।

কিন্তু আমার দরকার, টাকা তাদের দিতেই হবে। বেচে কিনে দেবে আবার ধান-পান হ'লে কিনে নেবে—

গোপাল শান্তকণ্ঠে কহিলেন—সেটা অত্যাচার হবে চাঁদমোহন—

—কিন্তু আমার প্রয়োজনটা আগে ভাবতে হবে ত?

—জমিদার হিসাবে তোমার কর্ত্তব্য তাদের প্রতিপালন করা, সে কর্ত্তব্যটা ত ক'রতে হবে। অসময়ে খাজনা আদায় করাটা কর্ত্তব্য হবে না—

—কিন্তু প্রজারও ত কর্ত্তব্য আছে, খাজনা দেওয়াটা তাদেরও কর্ত্তব্য। তারা কি তা ক'রছে? পূজার সময়ে প্রতিমা নিতেও ত তারা আসেনি—

—সেটা তাদের অভিমান, নিমন্ত্রণ হয়নি—

—নিমন্ত্রণ করাটা আমার ইচ্ছা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে তাদের উপর ত নির্ভর করে না। না পারলেও খাওয়াতে হবে এত বড় মজার আবার? আমি খাইয়ে ফতুর হই, আর তারা নেচে কুদে আমায় অপমান করুক—আসল কথা কি জানেন, আপনার টাকা আছে এই কথাটাই যথেষ্ট, তাতেই সংসারে সব হয়—টাকা থাকলেই সব—অঙ্ক সব দয়া, মায়া, স্নেহ কর্ত্তব্য সবই টাকার খেলা। টাকা দিলে ভাল, না দিলে খারাপ এই হচ্ছে জগৎ—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তোমাদের এই চিন্তার সঙ্গে আমাদের চিন্তা মিলেনা—আর আমরা ক'দিন? তোমাদের ইচ্ছা মতই চলবে। আমাদের মনে হয় স্নেহ মমতা ভালবাসা সততা এসব টাকার অনেক উর্দ্ধে, টাকার দ্বারা তা পাওয়া যায় না—সম্মানও নয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া উঠিলেন—হাসিতে একটা অবজ্ঞা ও বিজ্ঞতার ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। গোপাল কোন জবাব না দিয়া প্রস্থান করিলেন। চাঁদমোহন কহিল—আমাদের সমস্ত ঘরের কথার মধ্যে ঠাকুরমশাই কেন? তিনি পূজার্চ্চনা ক'রবেন, দক্ষিণা পাবেন, ব্যস্। এসব কথা ওর কাছে কেন?

শশধর সংক্ষেপে কহিলেন—বাবার আমল থেকে চ'লে আসছে।

—কিন্তু বাবার আমল ত নেই। দিনকাল পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। এখন খাজনা আদায়ের কি করবে—

—এখন খাজনার কথা বলাটা ত ধর্ম্ম নয়, তাই ভাবছি।

—ধর্ম্ম ধর্ম্ম করেই গেলে। নিজেকে রক্ষা করা, বড় হওয়াই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম। আত্মানং সততং রক্ষেৎ। তুমি কিছু ব'লো না, আমি টাকা আদায় করে নিচ্ছি। টাকা কি করে আদায় করতে হয় তা আমি জানি।

শশধর কোন জবাব দিলেন না। চাঁদমোহন কহিলেন—পেয়াদা লোকটার নাম কি?

—কালী বাগদী—

চাঁদমোহন কালী ও দরকার তিনুকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন,—যাও, সমস্ত প্রজাকে—না হয় সমস্ত পাড়ার মোড়লকে কাল সকালে কাছারীতে হাজির হ'তে বলে এসো। গ্রামছাড়া অন্যান্য মোড়াও ডাকবে—

কালী ও তিনু কহিল—আচ্ছা ছোটবাবু—

পরদিন সকালে কাছারী বাড়ীতে মাতব্বর প্রজা সকলে সমবেত হইল। চাঁদমোহন শশধরকে সঙ্গে লইয়া কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। সকলে উঠিয়া প্রণাম জানাইল।

পলাশডাঙ্গার গোষ্ঠ মাতব্বর কহিল—বড়কর্ত্তা, আমাদের গাঁয়ে কিছু ধান দাদন না দিলে সকলের বড়ই কষ্ট হ'চ্ছে। গত সন দক্ষিণ মাঠের ধান পোকায় মেরে দিয়েছিল—

চাঁদমোহন কহিলেন—বড়কর্ত্তা কি? বড়বাবু বলবে—সব—

—হ্যাঁ হুজুর, বড়বাবু। আমরা ছোটলোক, কথা বলতে জানি না—

চাঁদমোহন উদাত্ত কণ্ঠে কহিলেন—শোনো তোমাদের ডাকা হয়েছে কেন, তাই বলি। আমি আর চার পাঁচদিন থাকবো, তার মধ্যে তোমরা বকেয়া সমস্ত খাজনা মিটিয়ে দেবে, আর হাল ছমাস দেবে—বিশেষ প্রয়োজন আছে—

বলাই কহিল—হুজুর, ছোটবাবু, ঘরে খাবার ধান নাই, খাজনা দেবেক কেমনে? মনিব খাটা করাবেক—

—চুপ, ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। ঘরের ধান, বিয়ের টাকা সব ছোটে, কেবল জমিদারের খাজনাটা ছোটে না—যারা দেবে তারা বাধ্য প্রজা বলে ধ'রে নেব। যারা দেবে না তারা অবাধ্য বলে গণ্য হবে, এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ করে তাদের উচ্ছেদ ক'রে দেব। তাই বুঝে চলবে—ধান দাদন যারা চাও আমি আজ ন্যায্য টাকা চাইছি তাতে আপত্তি হবে কেন?

শিবু উঠিয়া কহিল—হুজুর মা বাপ্, খাজনা চৈত মাসে মোরা শোধ করবেক, এ কার্ত্তিক মাসে কোথা পাবেক সব?

—ইচ্ছে থাকলে হবে, কিন্তু অনিচ্ছা থাকলে ব্যাপারটা গুরুতর হবে জেনে রেখো—

সকলে পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল—এমন অপিরেচনার আদেশ তাহারা কখনও পায় নাই তাই সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

দাদ্‌রা

এমনি করেই আঘাত আমায় দিও
দিও বারে বারে—
যেন আপনারে মোর হারিয়ে যেতে পারি
ব্যথার সায়র পারে।

চলে চলার পথে ঝড়ের রাতি
যদি পথের ধারে আসন পাতি
তুমি চলবে কি গো সে পথ বেয়ে
দুঃখ অভিসারে।

তখন ছিন্ন বীণার তারে বাজবে ব্যথার গান
শেষ হবে মোর দেওয়া নেওয়ার দুঃখ অভিমান।
আমার সকল কাজের মাঝে
যেন তোমারি সুর বাজে—
তোমার ভোলার ছলে যেন
তোমায় আনি ধরে।
শেষ হ'লো মোর দেওয়া নেওয়া
হয়নি শুধু তোমায় চাওয়া
যেন তোমায় আমি পাইনি ভেবে
ভাসি নয়নধারে।

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী স্বরলিপি—শ্রীনীহারকণা মুখোপাধ্যায় এম-এ

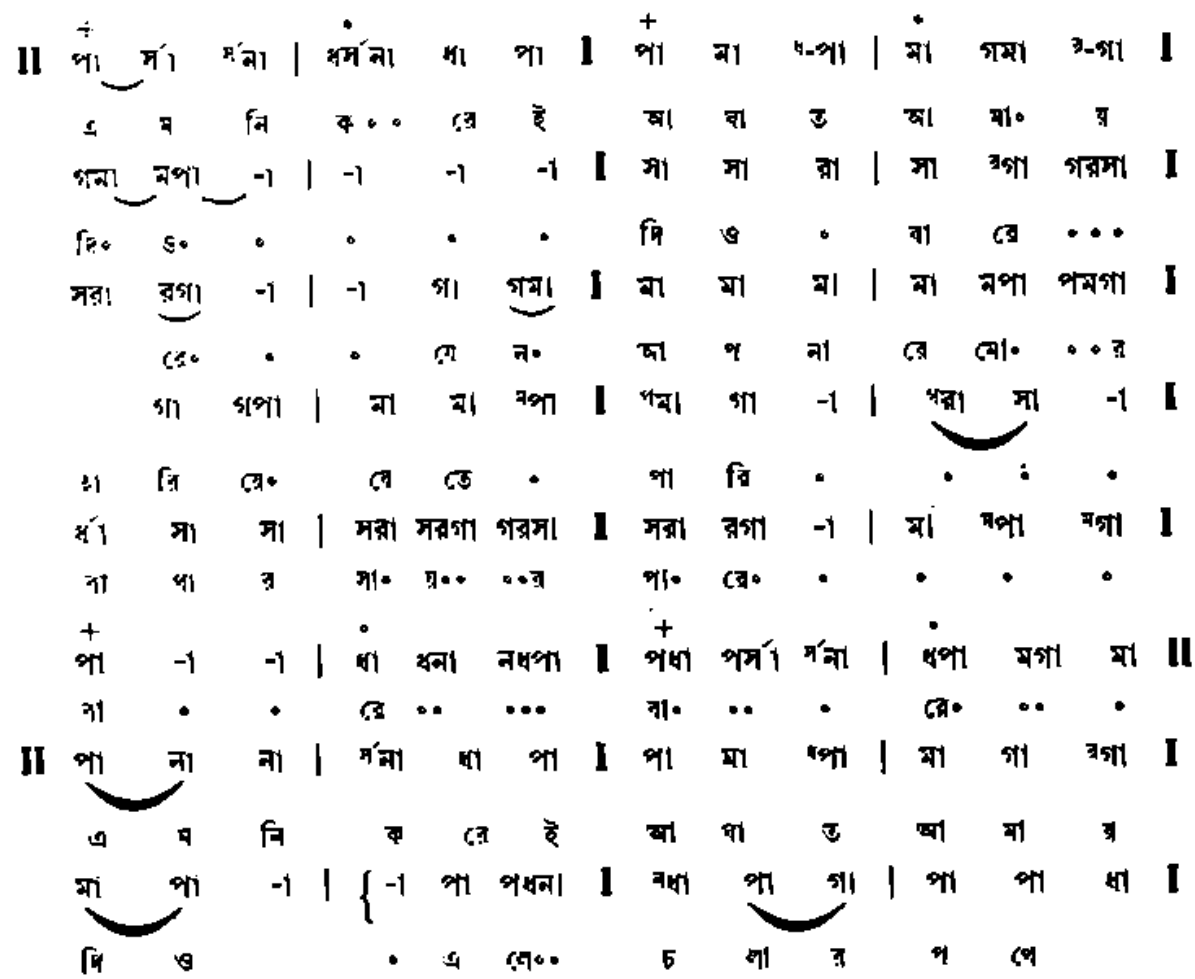

ধর্সা সা সা | সা ধা র্ধর্গা ‖ র্সা -া -া | -া পা পনা ‖
ঝ০ ড়ে র রা ০ তি য ঘি০

না না না | না না নর্সা ‖ ধা না না | ধা র্সা র্না ‖
প থে র ধা রে ০০ আ প ন পা ০ ০

ধপা -া -া | -া পা পা ‖ পা না না | ধা ধনা নধপা ‖
তি ০ তু মি চ ল বে কি গো০

পা পা ধপা | ধধা গা মা ‖ রগা পা -া | -া পা পা ‖
সে প ০০থ বে য়ে ০ ০ তু মি

পা না না | ধা না ধপা ‖ পা পা ধধা | পনা গা -া ‖
চ ল বে কি গো সে প থ বে য়ে

পা পা ধপা | মা গা গমা ‖ রা গা -া | মা রপা মগা ‖
দু ০ খ অ ভি ০০ সা রে ০ ০ ০ ০

পা -া -া | ধনা ধধা পা ‖ পধা পর্সা র্না | ধপা মগা মা ‖
বা ০ ০ রে ০ ০ বা০ ০০ ০ রে০ ০০ ০

‖ পা না না | র্না ধা পা ‖ পা মা ধপা | মা গা রগা ‖
এ ম নি ক রে ই আ ঘা ত আ মা

+ ০ + ০
মা পা -া | -া সা সসা ‖ সা রা রা | রা রা গা ‖
দি ও ত খন ছি ০ ন্ন বী ণা র

রা গা -া | রগা রগা রগা ‖ মা রা গা | মা পা পা ‖
তা রে বা জ লে বা ণা র

ক্ষা পা -া | -া -া -া ‖ পা না না | না না নর্সা ‖
গা ০ ০ ০ ন শে ষ হ বে মো ০র

ধনা ধনা র্সর্সা | র্না ধা পপা ‖ পা ধা ধপা | মা গা মা ‖
দেও য়া০ ০০ নে ও য়ার দু খ অ ভি

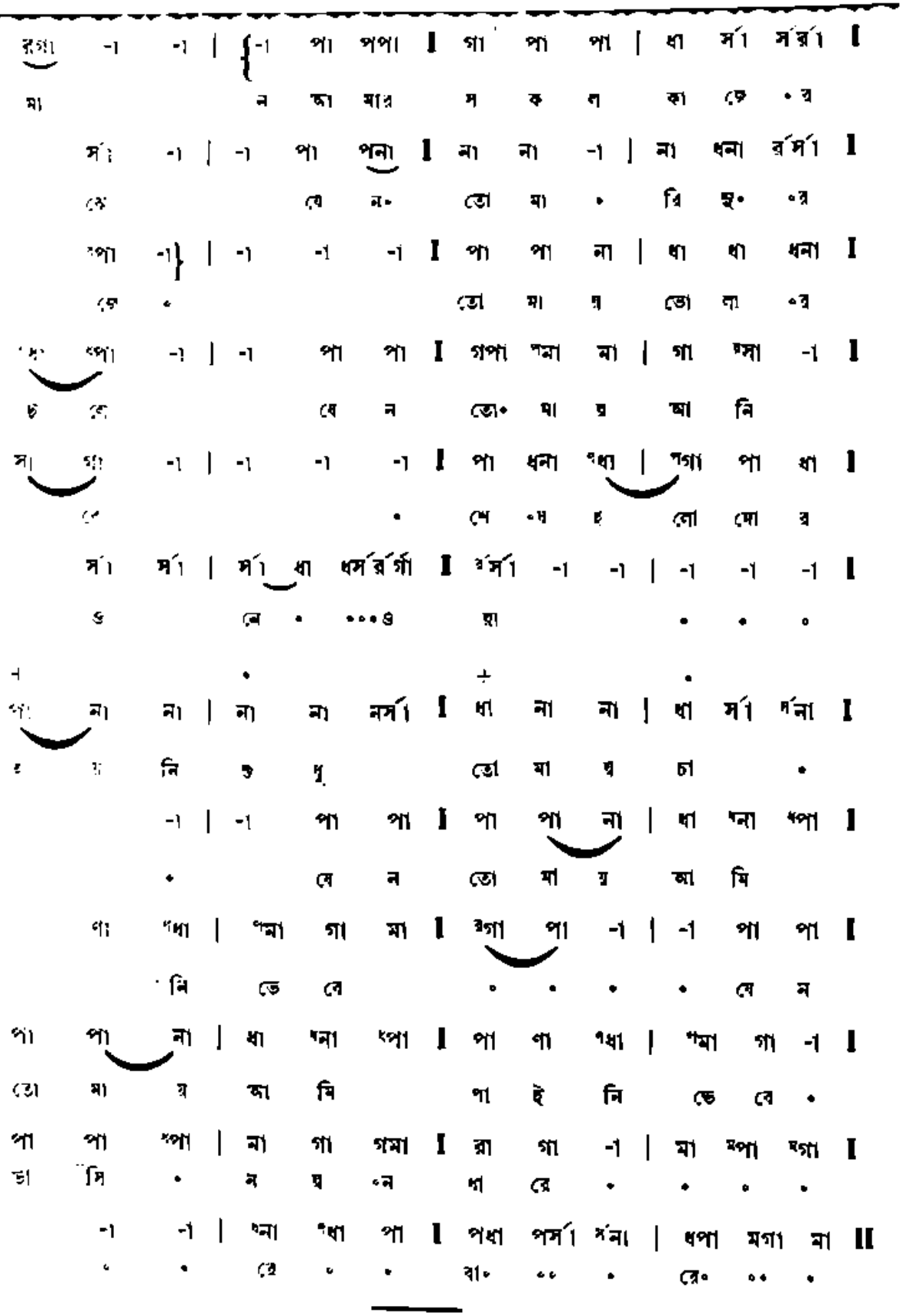
মা ন আ মার স ক ল কা জে ০ র
কে যে ন০ তো মা ০ রি হ০ ০র
কে ০ তো মা র ভো লা ০র
ছ কে যে ন তো০ মা র আ নি
সা গা | -া -া -া | পা ধনা ধা | গা পা ধা |
কে ০ শে ০র হ লো মো র
সা সা | সা ধা ধর্সর্গা | র্সা -া -া | -া -া -া |
ও রে ০ ০০০ও য়া ০ ০ ০
পা না না | না না নর্সা | ধা না না | ধা সা র্না |
হ য় নি ভু লে তো মা য় চা ০
-া | -া পা পা | পা পা না | ধা ধনা ধপা |
০ যে ন তো মা য় আ মি
ণা ধধা | পমা গা মা | গা পা -া | -া পা পা |
নি ভে রে ০ ০ ০ ০ যে ন
পা পা না | ধা ধনা ধপা | পা ণা ধধা | পমা গা -া |
তো মা য় আ মি পা ই নি ভে রে ০
পা পা ধপা | না গা গমা | রা গা -া | মা মপা ধগা |
ভা সি ০ ন য় ন ধা রে ০ ০ ০ ০
-া -া | ধনা ধধা পা | পধা পর্সা র্না | ধপা মগা মা ||
০ ০ রে ০ ০ বা০ ০০ ০ রে০ ০০ ০

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে তন্ত্রের প্রভাব ও মূর্ত্তিরহস্য

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় প্রত্নতত্ত্বার্ণব

উড়িষ্যায় তন্ত্র বা শৈবধর্ম্মে কেশরী রাজাদের প্রাধান্য ছিল এবং উড়িষ্যা প্রদেশে ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে কেশরী বংশের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহারা ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যা প্রদেশে রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকলাপ—যাজপুর, ভুবনেশ্বর ও পুরীক্ষেত্র—এই তিন স্থানে শিব ও শাক্ত মন্দির সমূহ অজস্র অর্থব্যয়ে এই কালে নির্ম্মিত হয়। কেশরী বংশের সর্ব্বপ্রথম রাজা যযাতি কেশরী যাজপুর নগর পত্তন করেন। মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দশ হাজার বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ভূমিদান ও সাতটী যজ্ঞ ব্রাহ্মণশাসন স্থাপিত করিয়া বৈদিক সৃষ্টি উড়িষ্যার চতুর্দ্দিকে বিস্তার করেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের পরে বিদ্যা ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল—যাজপুর ভুবনেশ্বর ও পুরী। মাদলা পাঁজীর বর্ণনায় ইহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তৎকালীন অগ্নিহোত্রী ও তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণই অদ্যাপি উড়িষ্যা সমাজে প্রাধান্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

পুরীর বর্ত্তমান শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির চোড় গঙ্গাদেব বা গঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক দশম শতাব্দীতে নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। চোড় গঙ্গাদেব ১০৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম দেবের মন্দির তাহার পূর্ব্বে ভগ্ন অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল এবং ইহার অস্তিত্ব যে অতি পুরাতন তাহা গঙ্গাবংশের তাম্রপট্টে উল্লেখ রহিয়াছে (ইহা চতুর্থ নরসিংহ দেবের সময় খোদিত হয়)—

"প্রাসাদঃ পুরুষোত্তমস্য নৃপতি কোনাম কর্ত্তুক্ষমঃ
ওড্রেষ্ঠ্যাস্ত নৃপৈরুপেক্ষিতময়ঃ চক্রেশ্বরো গঙ্গেশ্বর ॥"

—অর্থাৎ যে কার্য্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব নৃপতিবৃন্দ অবহেলা করিয়াছিলেন, তাহা গঙ্গেশ্বর দেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(গঙ্গেশ্বর বা চোড়গঙ্গা ১০৭৭ শকাব্দের নৃপতি)

জগন্নাথ দেবের মন্দির ও অন্যান্য অংশ আরও সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল অনঙ্গ ভীমদেবের সময় (গঙ্গাবংশের পঞ্চম রাজা) ১১৯২ খৃষ্টাব্দে। পটলেশ্বর (জগন্নাথ দেবের প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে) শিবমন্দিরের দ্বিতীয় প্রস্তরলিপি হইতে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায়। তবে জোগমণ্ডপের মন্দির এবং ভিতরের চারিদিকের প্রাচীর ১৫০০ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরুষোত্তম দেব দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া অদ্য আমরা পূর্ণভাবে এই মন্দির দেখিতে পাইতেছি। স্থাপত্য ও মূর্ত্তিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে বিভিন্ন কালের ও উপকরণের সমন্বয়ে শ্রীমন্দির পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রধান মন্দির (বিমান) ও তৎসংলগ্ন জগমোহন মন্দির পুরাতন তাহা পূর্ব্বকালীন কারুকার্য্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। এই দুইটী মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যাদি সমুদ্রের লবণাক্ত বায়ুতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তৎপরবর্ত্তী রাজারা চুণ বালি দ্বারা আবৃত (পলাস্তর) করিয়া মন্দিরের ভাস্কর্য্য ও আদিম নিদর্শনগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে চিরকালের মতন অদৃশ্য করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণব রাজাদিগের নির্দ্দেশ মতই এই প্রণালীতে সেই যুগের ভাস্কর্য্যমান নিদর্শনগুলি লুপ্ত হইয়াছে। জগন্নাথ মন্দিরের ৮′′ ১০′′ আবরণ (পলাস্তর) খুলিয়া ফেলিলে সেই কারুকার্য্যের নিদর্শনগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চিমদিকে বড় দেউলের উপরিভাগে যেখানে বৃহৎ নৃসিংহদেব পার্শ্বদেবতার কোটর মন্দির রহিয়াছে সেই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী ২।৪ স্থানের চুণ বালির পলস্তরার আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া দেখা গিয়াছে ভুবনেশ্বর মন্দিরের মতন লতাপাতা ও নানা কারুকার্য্যে সুশোভিত এবং নানা প্রকার মূর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়—যথা দশদিকপাল, অষ্টমাতৃকা প্রভৃতি।

উড়িষ্যার তন্ত্রধর্ম্মের আধিপত্য বিষয়ে আলোচনা করিলে তন্ত্রসারের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উল্লেখযোগ্য—"বিমলা ভৈরবী যত্র, জগন্নাথস্তু ভৈরব" —শ্লোকটী পীঠস্থান মাহাত্ম্যে রহিয়াছে। ভৈরব-ভৈরবী ভাবে পূজাপদ্ধতি, মহাপ্রসাদ নিবেদনাদির মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয়। উড়িষ্যা দেশে তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবের প্রমাণের অভাব নাই। সাহসের আভাগোর মধ্যে এই শ্লোকটী তাহার অন্যতম প্রমাণ—"হামেশ্বরী সেতুবন্ধে, বিমলা পুরুষোত্তমে, বিরজা ওড্রদেশে চ (যাজপুর), কামাখ্যা নীলপর্ব্বতে।" তান্ত্রিক মণ্ডলী ও মূর্ত্তিতত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিমলা দেবী বিরাজমান রহিয়াছেন। অষ্ট পদ্মদলে অষ্ট মাতৃকা অবস্থিত, অষ্ট শম্ভু বহির্ভাগ রক্ষা করিতেছে। একদিকে মহাকালী, মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী—তিন কোণে, পাতালে ঈশানেশ্বর, পাতালেশ্বর, অমৃতেশ্বর, ভৈরবত্রয়—একদিকে মঙ্গলা, অন্যদিকে উত্তরার্ণা, মধ্যে গণপতি। শ্রীনাথাদি গুরুত্রয় অভ্যন্তরে অবস্থিত—ইহাই তন্ত্র স্থাপত্য বিদ্যার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই স্থাপত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত বিমলা দেবী অদ্য অর্পিত হইয়া মহাপ্রসাদে পরিণত হয়। শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে অষ্টশক্তি দ্বারা আবৃত—

(১)	অগ্নিকোণে ঘটমূলে	মঙ্গলা দেবী
(২)	পশ্চিমে	বিমলা দেবী
(৩)	বায়ুকোণে	সর্ব্বমঙ্গলা দেবী
(৪)	উত্তর দিকে	অম্বাশিনী দেবী
(৫)	ঈশান দিকে	লম্বা দেবী
(৬)	দক্ষিণ দিকে	কালরাত্রি দেবী
(৭)	পূর্ব্ব দিকে	মরীচিকা দেবী
(৮)	নৈঋতে	চণ্ডমুণ্ডা দেবী

এই ভীমরূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্ব্বেদী সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইতেছে—

(উৎকল খণ্ড—চতুর্থ অধ্যায় ৬১:৬৭।৬৮।৬৯।৭০)

শ্রীমন্দিরের বহিঃপ্রাচীর অষ্টদিকে অষ্ট কক্ষের দ্বারা ক্ষেত্রভূমি আবৃত। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান্ অষ্টপ্রকার বিভক্ত রূপকে সকল দিকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং মধ্যে অবস্থিত হইলেন। (১) কপালমোচন শিব (২) রাম শিব (৩) ক্ষেত্রপাল শিব (৪) ঈশ্বর শিব (৫) মার্কণ্ডেশ্বর শিব (৬) বিমলের বা শিবের শিব (৭) নীলকণ্ঠ শিব (৮) বটেশ্বর শিব—মহাদেবের এই অষ্টলিঙ্গ বিধিপূর্বক স্পর্শন, দর্শন ও পূজা করিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে—উৎকল খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, ৫১-৫৯।

উড়িষ্যা ইতিহাস অনুযায়ী—জগন্নাথ—মহাকালী, সুভদ্রা—মহালক্ষ্মী, বলরাম—মহাসরস্বতী। এই ত্রিমহাশক্তির বর্ণ যথাক্রমে কৃষ্ণ, কাঞ্চন ও শুভ্র; সুতরাং মূর্ত্তিত্রয়ের রূপ কল্পনার সহিত ইহাও আংশিক রূপে মিলিয়া যায়। শ্রীজগন্নাথ দেবের ক্ষেত্রকে মহাবারিতীর্থে (মহাসাগর) পদ্মক্ষেত্র নামে কথিত হয়। পদ্মের প্রথম আবর্ত্তে—স্বর্গদ্বার শ্মশানের গুপ্তেশ্বর শিব। পদ্মের দ্বিতীয় আবর্ত্তে—পঞ্চকুণ্ডের এক কুণ্ড পতিত হয়—এই স্থানটী ব্রহ্মকপালমোচন শিবলিঙ্গ ভাবে পূজিত হয়—এই মন্দির অতি সুন্দর। শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সদর রাস্তার অপর পারে ১০ মিনিট লাগে ইহা অবস্থিত।

পদ্মের তৃতীয় আবর্ত্তে—শ্রীশ্রীজগন্নাথা বিমলা দেবীর মন্দির—যাহা ভারতবর্ষে দেবীর যাহার পীঠস্থানের এক প্রসিদ্ধ পীঠ, যেখানে দেবীর নাভি পতিত হইয়াছিল।

পদ্মের নাভিদেশে—রোহিণী কূপ, কল্পবট ও অর্দ্ধাঙ্গিনী দেবী বিরাজিত আছেন।

যেখানে সমুদ্র ও নদী (যে নদী শ্রীমন্দির বেষ্টন করিয়া গিয়াছে) মিলিত হইয়াছে সেখানে বালির পাহাড়ের উপর চরচণ্ডী দেবী অবস্থিত—ইহা পুরী মন্দির হইতে পশ্চিমদিকে ছয় মাইল দূরে স্থাপিত। ইনি বিশেষ চাঞ্চল্য চণ্ডীদেবী ভাবে পূজিত—রাত্রিকালে মন্দিরের নিকট কেহ অগ্রসর হয় না। পুরোহিতরা সন্ধ্যাকালে পূজা ও ভোগাদি দিয়া চলিয়া আসেন। এখানে দেবীর বাহনস্বরূপ অনেক বিড়াল রহিয়াছে। গভীর রাত্রিতে মন্দিরের প্রাঙ্গণে স্বয়ং অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সেই অগ্নি আলোর মত মধ্যে মধ্যে জ্বলিতে জ্বলিতে শ্রীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হয়—সেই স্থানের বালিগুলা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া চণ্ডীদেবীকে স্বতঃই ভয়াবহ চণ্ডী নামে আখ্যা দেয়।

প্রতিদিন জগন্নাথদেবের নিজস্ব নির্ম্মাল্য মালা চরচণ্ডী দেবীকে প্রাতঃকালে বহন করিয়া আনিয়া অর্পণ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। চরচণ্ডী দেবীকে বলি দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং পায়রার পূজার সময় বিশেষ উৎসব ও বলি হয়। ইঁহার খিঁচুড়ি ভোগ অতি প্রসিদ্ধ। এই মন্দির পুরীর রাজার নিজস্ব সম্পত্তি।

চণ্ডীদেবীর বাহন সিংহমূর্ত্তি শ্রীমন্দিরের সম্মুখে (পূর্ব্বদিকে) দ্বারপাল-অবস্থিত এবং এই প্রধান সিংহদ্বার নামে খ্যাত। মন্দিরের শৃঙ্গে শ্বেত ও লাল পতাকাদ্বয় উড্ডীয়মান হয়—শিব দুর্গার মিলনের প্রতীকস্বরূপ।

বলরাম রুদ্রমূর্ত্তি এবং চক্রেশ্বর—বাসুদেব, গৌরী বা কাদম্বরী মদ্যপানে তাঁহার চক্ষু রক্তিমাভ এবং চক্ষুর চিহ্নাকার—স্থান যথা "মধুপানে সদা মত্ত, সদা ঘূর্ণিত লোচনম্।" জগন্নাথ, বলরাম উভয় মূর্ত্তিই শক্তিসংযুক্ত শিব—যথা ধ্যানে "প্রণবং পক্ষিসংযুক্ত বামাখ্য চ মহাপ্রভং।"

জগন্নাথদেবের নিম্নস্থ সুদর্শন চক্র বামদিকের মতন লম্বা ও শক্তি চিহ্নযুক্ত (চক্রের ন্যায় গোলাকার না)। সুভদ্রা যে কৃষ্ণভগ্নী হইতে তাহার এক প্রমাণ স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম সুভদ্রাকে "জগন্মাতঃ প্রণীম পদ্মসম্ভবি।" "জলা তন্ত্রাস্বরূপা সাধারণে এমন কি বৈষ্ণবগণও বলরাম—সুভদ্রা-সুদর্শন সংযুক্ত জগন্নাথ মূর্ত্তি চতুষ্টয়কেই সংক্ষেপে "জগন্নাথ"ই বলিয়া থাকে এবং মন্দিরকে জগন্নাথ মন্দির বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধনায় বলরামই জগন্নাথ, আর জগন্মাতা—কালিকা দেবী। একদিকে শুভ্র শিবমূর্ত্তি—অন্যদিকে নীল কালীমূর্ত্তি—মধ্যে শিবশক্তির মিলন আধার বাহুশূন্য সোনালী রংয়ের পূর্ণ লিঙ্গ-জ্যোতি।—

"ওঁতৎ সত্যং পরব্রহ্ম পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গলম্
ঊর্দ্ধ রেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমঃ।"

পরম মহাশক্তি যুক্ত জগন্নাথই বিশ্বের মন্ত্রর যাহির পরব্রহ্মস্বরূপ—জগন্নাথের মন্দির চক্রেশ্বরের দ্বারা জগন্নাথ মূর্ত্তি আর কালীঘাটের কালী-মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দুই মূর্ত্তিতে বহুল অংশে সাদৃশ্য বর্ত্তমান। দেবী মাহাত্ম্য মন্দিরের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান—ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদের মন্দির নাই—এই সব কারণে জগন্নাথকে সর্ব্বাংশে বিষ্ণুবিগ্রহ বলা চলে না। জগন্নাথ দেবের ভোগ বিমলা দেবীকে অর্পিত করা প্রতিদিন বিধান রহিয়াছে বিমলা দেবী নিয়মিত পূজার দ্বারা ভোক্তা হইলে তবে মহাপ্রসাদ হয়।—বিমলা দেবীর পৃথক ভোগ রন্ধনের ব্যবস্থা নাই—জগন্নাথ দেবকে অর্পিত ভোগই অর্পণ করা প্রথা। রামানুজ সম্প্রদায়ের ব্যবস্থানুসারে লক্ষ্মীদেবীর ভোগ পৃথকভাবে রন্ধন করা হয় এবং লক্ষ্মীদেবীকে অর্পিত করা হয়—জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জগন্নাথ ও বিমলা দেবীর মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ পূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত। শ্রীমন্দিরে বিগ্রহের সন্নিকটে কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত ধর্ম্ম বা সারমের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়—ভৈরবের বাহন স্বরূপ—তাহা পুরাতন বাস্তিত্ব সাক্ষ্য দেয়। রামানুজ-পন্থীরা সেই সারমের মূর্ত্তিটী এখনে মূর্ত্তিসংঘের পার্শ্বে স্থাপিত করিয়াছে। সেই সারমেয়র পূজা হয় ও নিত্য মহাপ্রসাদ অর্পণ করা ব্যবস্থা রহিয়াছে। মাংস রন্ধনের বিকল্পে অন্য আমিষ দ্রব্যের দ্বারা জগন্নাথদেবের প্রত্যহ পূজা হয়। মাংসের বিকল্পে মাষকলাই ডালের আদা-হিং সংযুক্ত ও জায়ফল উপরং খিচুড়ি প্রধানতঃ রৌপ্য পাত্রে প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে অর্পিত হয়—পঞ্চগুড়ির দ্বারা তিনটী অঙ্কিত তন্ত্রের মন্ত্রের উপর তিনটী খিচুড়ী অন্নের থালা স্থাপিত হইয়া পূজাদির সময় রৌপ্য বা তাম্রপাত্রে নারিকেল উদক: ঢালিয়া মহাপ্রসাদের উপর ছিটানর ব্যবস্থা রহিয়াছে—ইহা অন্নের বিকল্পে ব্যবহৃত হয়। মাষ কলাইয়ের আদা হিং সংযুক্ত পিঠা প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। তন্ত্রের বীজ মন্ত্র দ্বারা ত্রিমূর্ত্তির পূজার বিধান রহিয়াছে—বলরাম—ঐং সুভদ্রা—হ্রীং জগন্নাথ—ক্রীং। জগন্নাথদেবকে প্রতিদিন বেশের সময় সর্ব্বপ্রথমে একখানি লালচেলীর সাড়ী শ্রীলোকের

মতন মুরাইয়া স্তূপের উপর দিয়া আবৃত করিয়া পরিধান করাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নাকে কানে, মাথায় ফুলের গহনা দেওয়া হয়।—পূজাদি তন্ত্র-শাস্ত্রানুযায়ী হয় এবং তন্ত্রাভিজ্ঞ পূজারী দ্বারা প্রতিদিন পূজা ও হোম করার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বিষ্ণুপ্রসাদকে "মহাপ্রসাদ" বলে না। এক কালিকা, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর প্রসাদী—মাংস সাধারণতঃ মহাপ্রসাদ আখ্যা পাইয়া থাকে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে পূজার সময় "মহাপ্রসাদ মানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ" দেখিতে পাই। ঐ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মার্পিত বস্তুকে মহা-প্রসাদ বলে। অন্য দেবতার প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা প্রথা নাই।

জগন্নাথের মহাপ্রসাদ গ্রহণান্তর হস্ত প্রক্ষালন নিষিদ্ধ। এটীও মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে আছে। যথা হস্ত প্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্য সেবনে।"—অন্য দেবতার প্রসাদ খাইয়া হস্ত ধৌত বিধি। পুরীতে নিরম্বু উপবাস বিধি নাই—ইহাও তান্ত্রিক ব্যাপার। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও এ প্রথা লক্ষিত হয়—"না ভুঞ্জে স্যাদ যদাহনঃ নোপবাসাদি নিয়মঃ।"—স্মার্ত্তমতে একাদশীর এইরূপ মহাত্ম্য যে অন্নভোজন করিলে মহাপাপ ও একাদশী সিদ্ধ হয় না।—জগন্নাথ মন্দিরে "একাদশী" শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন মন্দিরে "বন্ধন" অবস্থায় রহিয়াছে। তন্ত্রোক্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে "ব্যাসো নোপবাসশ্চ কাঙ্ক্ষেৎ ন বিদ্যতে, নৈবাচারাদি নিয়মানোপচারশ্চ-তুরিণঃ ন দিক্কাল বিচার স্থিতি ন মুক্তস্যাপি নাস্তি"—ইহা জগন্নাথক্ষেত্রেও ভুক্তেশ্বরে বিশেষভাবে প্রতিপালিত দেখা যায়। মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে পূর্ব্ব পশ্চিম বিচার নাই, দিনে বহুবার খাওয়াও নিষিদ্ধ নহে। জগন্নাথকে দারুব্রহ্ম বলা হয়—ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে ইহা তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপূজা, শালগ্রামের উপাসনা। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিকভাবে পূজা করিলে কাশীতে বিশ্বনাথও ব্রহ্ম, কালীঘাটে কালিকাও ব্রহ্ম—আপন আপন ইষ্ট দেবতাও ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন এবং সেই ভাবের পূজাই ব্রহ্ম উপাসনার মূল উদ্দেশ্য। বিগ্রহের উপাদান সম্বন্ধে জগন্নাথদেবেই শুধু ব্রহ্মশব্দ যোজিত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ ব্রহ্মই জগন্নাথদেব। বেদান্তের "আপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা।"—ব্রহ্মের প্রতীক। নবমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হস্তপদহীন বিগ্রহ স্থাপন করা ব্রহ্মের পূজাই অনুপ্রাণিত করিতেছে। "সুশোভ্য কর্ণ "জগন্নাথ মূর্ত্তির কর্ণ ত নাই, আছে কেবল বিরাট চক্ষুদ্বয়, এ বিরাট চক্ষুদ্বয় "শশিসূর্য্য নেত্রম" (গীতা) চক্ষুষি চন্দ্র সূর্য্য। (মুণ্ডক উপনিষদ) সেইজন্য সম্পূর্ণ গোলাকার—পদ্মপলাশ লোচন নহে বা পটলচেরা চক্ষু নহে। জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি একবার মনশ্চিত্রপূর্ব্বক দেখিয়া থামিয়া হইলে দেখা যায়—সেই বিরাট চক্ষুর্দ্বয় আমাদের আঁধার হৃদয় গুহা আলো করিয়া জ্বল জ্বল করিয়া চাহিয়া আছে। দারু ব্রহ্মের "পশ্যত্য চক্ষুঃ আমাদের অন্ত দৃষ্টি ফোটাইবার আধ্যাত্মিক যন্ত্র। প্রথমে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা—রবিচন্দ্র বিশিষ্ট দারুব্রহ্ম অবলম্বন। ক্রমে দারুনাম ঘুচিয়া যাইবে, চক্ষুরূপ যাইবে, থাকিবে শুধু পুরুষং দিব্যং—ক্ষর ও অক্ষরের অতীত পুরুষোত্তম। ক্ষর—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—তাঁহার লীলা দেশ, কাল ও পাত্রে নিবিদ্ধ। ক্ষর যতদিন নিজের লীলার কিতার থাকে, ততদিন অক্ষর শাশ্বতকে বুঝিতে পারে না। ক্ষরের জ্ঞানোদয়ে অক্ষরপরিস্ফুট হইলে ক্ষর অক্ষরকে উপলব্ধি করে: ক্ষর লীলার উর্দ্ধে সনাতন অক্ষর সত্তার পরিচয় পায়—অক্ষর আকাশের মত স্থির, নির্লিপ্ত—অথচ সর্ব্বত্র ব্যাপক। ক্ষর ও অক্ষরের সমন্বয় হইয়াছে পুরুষোত্তমে—তিনিই সনাতন, শাশ্বত, পরমসত্য, পরমাগতি। তাঁহার সত্তায় প্রকৃতি সৃষ্ট, জীবসৃষ্ট। পুরুষোত্তম মানুষের শুধু নিয়ন্তা, প্রভু বিভু নহেন—তিনি অন্তর্যামী সাক্ষী ও পরম সখা।

ক্ষর—বলবান, চক্ষু সূর্য্যবান সেই জন্য ক্রিয়াকৃতি অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার পরিবর্ত্তনশীল, বর্ণ শুভ্র—সাদা রং হইতে অন্য সাতটী রং প্রতিফলিত হইতেছে অর্থাৎ নব নব রূপ পরিগ্রহণ করিতেছে।

অক্ষর—মুক্তস্থ, চক্ষু সূর্য্যজ্ঞান কিন্তু হস্তবিহীন ও ছোট স্থির, নির্লিপ্ত—বর্ণ সুবর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপক—সৌর মণ্ডলে সর্ব্বত্র ব্যাপক।

পুরুষোত্তম—জগন্নাথ—চক্ষু গোলাকার—স্থির, সনাতন শাশ্বত, পরম সত্য, অন্তর্যামী—বর্ণ নীল—স্বচ্ছ, সুন্দর, মহোদধির মতন বিশাল ও গম্ভীর গতি। অনেক দেবদেবী দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন বিরাট মূর্ত্তি—হৃদয়ে উদার ভাব আনিতে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। মন্দিরে প্রবেশ করিলেই সেই মহাভাবের ভাব স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। "তব ভ্রুবং পঙ্কতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমীশং (কঠ ২।২০)—সেই হেতু আমরা জগন্নাথ মূর্ত্তিতে শিবশক্ত্যাত্মক ব্রহ্মমূর্ত্তি পাইলাম। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেবী পার্ব্বতীকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"তবারাধনাতো দেবী সর্ব্বেষাং শ্রীগণং ভবেৎ"—অতএব পাঠক যা সাধক বৈষ্ণব হউক, শাক্ত হউক, শৈব হউক, তাঁর ইষ্টকে ইহার ভিতর পাইবেন। জগন্নাথাদি ত্রিমূর্ত্তির ভাব কল্পনায় বিভিন্ন ধর্ম্ম ধারায় বিভিন্নরূপ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং ভক্ত তাহার আপন ভাবের দ্বারা ইহাকে ধারণা করিয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী এই ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে সুভদ্রা (মহামায়া) হইতেছেন একান্নাংশা এবং বলরাম ও জগন্নাথদেব হইতেছেন আবরণ দেবতা (দ্বার দেবতাদ্বয়)।

প্রতিবৎসর রথোৎসবের দুইদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের নব যৌবন বর্ণন হয়। এই নব যৌবন উৎসবটী অমাবস্যার দিন হয়—অমাবস্যার নব যৌবনের উৎসব তান্ত্রিক দেবী পূজার ধারাকেই নির্দ্দেশ করে। দীপাবলী অমাবস্যা রাত্রিতে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে দীপাবলী উৎসব হয়—শ্রীমন্দিরের উপর দীপ দেওয়া হয় ও; হোমাদি হয় এবং পিতৃপক্ষের তর্পণাদি হয়। প্রতি অমাবস্যা তিথিতে জগন্নাথের প্রতিনিধি শ্রীনারায়ণ সমুদ্রে বিজয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে ভগবান শঙ্করাচার্য্য শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাঙ্গণে গোবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন এবং তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।—এক্ষণেও পুরীর শঙ্করাচার্য্য মঠের সন্ন্যাসীগণ মুক্তি মণ্ডপ সভার সভাপতি ও বিধানকর্ত্তা হইয়া থাকেন। চন্দন যাত্রার সময় লোকনাথ, ধর্ম্মেশ্বর, কপাল মোচন, মার্কণ্ডেশ্বর, নীলকণ্ঠ—এই পঞ্চমহাদেবের বিগ্রহ মূর্ত্তিরা বিজয় করেন। স্নান যাত্রার পরে অমাবস্যা-কালে নব যৌবন উৎসবের পূর্ব্বে একপক্ষকাল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না—ইহা কি দেবী মূর্ত্তির ঋতুকালের স্মারক? এই সময়েই কামরূপ কামাখ্যায় দেবীর ঋতুকালের অনুযায়ী উৎসব হয়। পুরী রাজাদের

পুরাণান্তরে। পুরী রাজ্যে পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপের মধ্যে আষ্টধাতুনির্ম্মিত ও প্রাচীনকালে অতি প্রাচীনকালে হইতে পূজিত ও রাজগণের আরাধ্য নরসিংহদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন এবং এখনও ঘুরবাসে পূজা, হোম, বলি ও ভোগাদি হয়। ইহা হইতে জানা যায় তৎকালীন জনির রাজারা তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

প্রাচীন ব্যক্তিরা এখনও সাক্ষী দেন যে ইহাদের পিতৃপিতামহদের নিকট শুনিতে পাইয়াছেন যে শ্রীমন্দির হইতে বৈষ্ণব রাজারা ইহাদের রাজত্বকালে অনেক পুরাতন মূর্ত্তিসমূহ জলাশয়ে ও সমুদ্রতীরে বালুকাস্তূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস করেন। ১০৪০ বৎসর পূর্ব্বে মার্কণ্ডের সরোবর সংস্কারকালে মুখলীপাড়ের কৃষক কালুরাম শোভিত বৃহৎ অষ্টধাতুক মূর্ত্তিগুলি মার্কণ্ডের পাঁক হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া মার্কণ্ডের ঈশান কোণস্থিত চালা ঘরের মধ্যে রক্ষিত হয় এবং ঐ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ এখনে একটী পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তৈল, সিন্দুর ও চূড়া লেপন করিয়া উড়িষ্যার স্থাপত্যের ভেদ বিলুপ্তপ্রায় কিরূপে অধঃপতনে পরিণত করিয়াছে তাহা দেখিলে বেদনা অনুভব করিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির গাত্রে অঙ্কন বন্ধন—কাম কার্য্যের আতিশয্য ইত্যাদির যে নির্দ্দিষ্ট বিবরণ ১৬ প্রকার কারবন্ধন রীতি উড়িষ্যার চিত্রে, মূর্ত্তিতে ও স্থাপত্যে ইত্যাদির বর্ণনায়ের মূল। বৌদ্ধতান্ত্রিক, কাপালিক তান্ত্রিকদের সংঘাতে এবং তাহাদের দ্বারা সাধারণের মধ্যে বিকৃত প্রচারের দ্বারা তাহার ভগ্ন চৌহদি মধ্য যুগে ও শ্রী সম্প্রদায় ধর্ম্মের গোপনীয় অঙ্গ বলিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কারণে কটাজুটধারী সন্ন্যাসীকেই মিথুন চিত্রে বিকর্ষিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।

জগন্নাথের পূজার সময় ষোল দিন নানা প্রকার দেবী-মূর্ত্তিতে পীঠদেবীর বিরজা দেবীকে সুসজ্জিত করা হয়—সপ্তম, অষ্টম ও নবমী দিবসে তাহার বিশেষ ধূম ধামে দেবী-পূজার ব্যবস্থা অবশ্যমান চলিয়া আসিতেছে—ভাদ্র মাসে ও মাঘ ভোগ জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণের মধ্যেই রন্ধন হইয়া ভোগ দিবার রীতি রহিয়াছে এবং সেই ভোগ প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিলি হইয়া থাকে।

জগন্নাথের হস্ত অন্যত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার বিবরণ ও জানীঘাটে জানীমূর্ত্তির হস্ত অন্যত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার বিবরণ স্থানীয় ওপ্রাক অতিরিক্তি—উভয়েই গোপনীয় ও রহস্যপূর্ণ। জগন্নাথের নব কলেবর উৎসব উপলক্ষে বিধিপদ্ধতি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং হোম তন্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং কাকটপুরের চণ্ডী দেবীর আদেশ অনুযায়ী হয়। বিভিন্ন ধর্ম্মের সম্প্রদায়ের আধিপত্য জগন্নাথ মন্দিরে দৃষ্ট। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় হইতে পুরীর রাজারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আধিপত্যে আসে—বর্ত্তমানকালে ধনী রামানুজ সম্প্রদায়ের আধিপত্যে ও আয়ত্বে পুরীর রাজা ও মন্দিরের পাণ্ডারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে এবং এখন রামানুজ সম্প্রদায় তাঁহাদের বৈশিষ্ট্যের জগন্নাথদেবের মন্দিরে রাখিবার জন্য তৎপর হইয়াছেন।

যে পুরুষোত্তম মহোদধিতীর্থে বারত্রয়ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন, তিনি ত্রিসংখ্যক নিগুঢ় মাত্র এবং ইনি সর্ব্বধর্মসমন্বয়ে উজ্জ্বল ত্রিমূর্ত্তি—সর্ব্ব হিন্দু ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন এই ত্রিমূর্ত্তি—অনার্য্য, শবর, আর্য্য সভ্যতার স্তরে স্তরে বিকশিত বৈদিক, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত্য সৌর, শৈব, বৈষ্ণব সমস্ত ধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের নানারূপ অলঙ্কারে সুসজ্জিত রহিয়াছেন। মহোদধি তীর্থে যেমন সমস্ত নদ নদী ও সপ্ততীর্থের জল আসিয়া মিশিয়াছে সেইরূপ বারত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমে একধারে বিশাল মহিমারাশির মধ্যে অনন্ত জ্ঞানের তরঙ্গ নিত্য, অন্যদিকে আকাশচুম্বী উচ্চ মন্দিরের শৃঙ্গে ভক্তি ও বিশ্বাসের উজ্জীয়মান ধ্বজা—আর মধ্যে নীলাচলের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া মিশিয়াছে পঞ্চভূত এক বিশাল অন্তহীন অবস্থায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সমস্তই মহানের আকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিরাজমান—বায়ু ব্রহ্মের সীমা নাই, শব্দ ব্রহ্মের সীমা নাই, বারি ব্রহ্মের সীমা নাই, বালি ব্রহ্মের সীমা নাই, তেজোময় সৌরকরের সীমা নাই—সমস্তই অসীম, সমস্তই মহান—আর এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বিরাজিত ঐ বৃহৎ দারুব্রহ্ম ও অন্যব্রহ্ম—একটী অব্যক্ত, অন্যটী ব্যক্ত—একটী নাদীস্বরূপ, অন্যটী প্রাণ স্বরূপ—একটী জ্ঞান, অন্যটী ভক্তি একটী শক্তিমণিলাল বা কৃষ্ণশক্তি, অন্যটী কাইনেটিক বা বীজশক্তি!

নচিকেতা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

এ পৃথিবী শ্রেয় ভুলে প্রেয় নিয়ে আত্মহারা আজ,
হে কিশোর নচিকেতা, কোথা তুমি জ্ঞানের সাধক?
সর্ব্বপ্রলোভন-জয়ী তোমার ও অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা
এখানে জাগে না আর। নির্ব্বাপিত প্রাণসহিশিখা।
জীবন-রহস্য আজ মৃত্যুর আগেই ঘনীভূত,
পুঞ্জীভূত দেশে দেশে। কোথা তব শাণিত জিজ্ঞাসা?
মৃত্যুর অন্তরে পশে জেনেছিলে রহস্য মৃত্যুর,
জীবনের মাঝে এসে জীবন-রহস্য জেনে নাও।
নচিকেতা, অমৃতের মন্ত্র জ্বলে তব জ্ঞানালোকে,
বল তবে কোন্ প্রাণে জীবিত অমর ওই প্রাণ?
জীবনের বিনিময়ে অনির্ব্বাণ জ্ঞানের পিপাসা
এখানে কোথায় জাগে? দিকে দিকে মিথ্যার ছলনা।
নচিকেতা, জেগে ওঠো কোনোও প্রাণের গহ্বরে।
আঁধারের অন্তরালে কতদূরে দীপ্ত-সূর্য্য জ্বলে!

শ্যামাপ্রসাদ

নরেন্দ্র দেব

তুমিও চলিয়া গেলে ? দুর্ভাগা দেশের শেষ আশা—
শোষিত পীড়িত ক্লিষ্ট জনতার ছিলে মূর্ত-ভাষা।
তোমার মতের সাথে চলত' মিলিনি সব পথে,
তবুও দিয়েছি বন্ধু, বরমাল্য তব জয়-রথে।
মহান্ পিতার তুমি মহোত্তম মনস্বী সন্তান,
কৃতার্থ হইত দেশ শুনি তব উদাত্ত আহ্বান !
শিক্ষার মন্দির কক্ষে নিরক্ষর জাতিরে শিখাতে
অক্ষয় স্বাক্ষর যাহা রেখে গেছ' স্বর্ণাক্ষর পাতে,
তাহার তুলনা বন্ধু, ইতিহাসে বলো কোথা আছে ?
বংশপরম্পরা মোরা ঋণী তাই তোমাদের কাছে।

পূবের আকাশে মেঘ ঘনায়ে উঠেছে যতবার,
ব্যাকুল হয়েছ' বন্ধু, খুঁজিয়া ফিরেছ' প্রতিকার।
দুর্ভিক্ষে বন্যায় ঝড়ে বাঁচাইতে বুভুক্ষিত দেশ,
দেখেছি তোমার সেই শ্রান্তিহীন সেবকের বেশ।
আবার দুর্দিনে যবে ভ্রাতৃরক্তে ভিজিয়াছে মাটি,
করিয়াছি পরস্পরে নৃশংসের মতো কাটাকাটি ;
তোমারে দেখেছি বন্ধু, এসেছ' আত্মীয় সম সেথা,
বঙ্গের অঙ্গনে প্রিয়, অদ্বিতীয় তুমি হিন্দু-নেতা।
মনে-প্রাণে হিন্দু ছিলে, ভক্ত শাক্ত হে শ্যামাপ্রসাদ !
গড়িবারে হিন্দুস্থান ছিল তব দুর্নিবার সাধ।

সে সাধ মেটেনি বন্ধু, তবু কেন গেলে চলি' তুমি ?
তোমার অভাবে যে গো নিঃসন্তান হ'ল মাতৃভূমি !
সচিবের শিরস্ত্রাণ যতবার পরেছিলে মাথে,
সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছিল জনস্বার্থে শাসকের সাথে।
ছিন্ন-বস্ত্র-খণ্ড সম নিক্ষেপিয়া মন্ত্রিত্বের বেশ,
ফিরিয়া এসেছ' পুনঃ কাঁদে যেথা ধূলিম্লান দেশ।
ক্ষুধায় কাতর যেথা উপবাসী আপনার জন,
যেথা পল্লী-জননীরা বস্ত্রাভাবে অর্ধ-বিবসন ;
এক বিন্দু দুগ্ধ বিনা অগণিত শিশু যেথা মরে
তাদের বেদনা বন্ধু বক্ষে তব রক্ত হ'য়ে ঝরে !

একান্ত বাঙালী তুমি। বাঙালীই ছিলে দেহে মনে ;
তবু প্রসারিত প্রীতি ভারতের প্রতি কোণে কোণে।
ভাগীরথী কূল ছাপি' সুদূর সে কিলমের তীর,
প্লাবিত ক'রেছে বন্ধু প্রেম-বন্যা তব সুগভীর !
নির্মল চরিত্র তুমি ; স্থির-প্রাজ্ঞ, স্বভাব-সুন্দর
দুর্দিনে ছিলে যে মিত্র, এ জাতির পরম নির্ভর !
হারায়ে তোমারে আজ, সাগর যে হারালো কিনারা,
ডুবে গেল সপ্ত-ডিঙা—সপ্তগ্রাম হ'ল সর্বহারা !
জনসঙ্ঘ,—মহাসভা,—রামরাজ্য-রাজনীতি ছল,
তুমিই একাকী ছিলে যে বিরাট ! আপনার দল।

যে সত্য অপ্রিয়, তারা কে বলিতে চাহে স্পষ্টভাবে ?
প্রভুর বিরাগ যাহে, কহিতে তা' ভয়ত্রস্ত দাসে।
তাদের চিনিতে তুমি। করুণার পাত্র তারা তব—
আত্মস্বার্থ-সন্ধানীরা সুযোগ খুঁজেছে নিত্য নব !
কিন্তু, যারা ধনী-জন-সৌহার্দের প্রভাবে অবশ,
অন্যায় করিছে জেনে, প্রতিবাদে না-করে সাহস,
তারা বসে শিখাইতে সদাচার—রচে উপদেশ,
তুমি সেথা রুদ্ররূপে ছিঁড়েছো তাদের ছদ্মবেশ !
শাসক-সমাজে থাকি—অন্যায় যে সহে নির্বিচারে,
তব সিংহনাদ বন্ধু,—'কাপুরুষ' কহিয়াছে তারে।

তুমি ছিলে অসামান্য ! মহাভদ্র, কিন্তু ভীরু নহ,
তব তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ অপরাধী জানিত দুঃসহ।
কূট-নীতি-পরিষদে অসহায় হ'য়ে আজ ভাবি,—
কে শোনাবে বজ্রকণ্ঠে উপেক্ষিত বাঙালীর দাবি ?
রাষ্ট্র চক্রে শ্রেষ্ঠ যারা, তাদের দেখিলে ভ্রষ্টাচার—
কে চাহিবে কৈফিয়ৎ ? কে করিবে তীব্র তিরস্কার ?
তব দৃপ্ত দৃঢ় সত্য অগ্নিময় উজ্জ্বল ভাষণ
নিখিল ভারত চিত্তে পেতেছিল শ্রদ্ধার আসন !
তোমার দেশাত্মবোধে সংশয়ের কোথা অবকাশ ?
মৃত্যুর অমৃত-মর্ম্মে হ'ল তার আশ্চর্য প্রকাশ !

ভেবেছ কল্যাণ যাতে, সেথা সত্য জাতির মঙ্গল,
আশ্রয় করেছ তুমি বিধাহীন চিত্তে সেই বল !
হেরি এই চঞ্চলতা—অবোধে হেনেছে পরিহাস ;
তারা তো জানে না বন্ধু, কী প্রচণ্ড আবেগ উচ্ছ্বাস—
তোমারে উন্মাদ দম্ভ ছুটায়েছে যার হ'তে যারে ?
তব স্বপ্ন, স্বাধীনতা সুখ-শান্তি বিলাবে সবারে।
লোকে বলে—তুমি কভু বরণ করোনি কারাগার,
তাই কি গো বন্দী হ'য়ে অভিমানে শোধ নিলে তার ?
এ দুঃখ ভুলিব কিসে—সিংহ আজ মরিল পিঞ্জরে !
আসমুদ্র হিমাচলে বেদনার অশ্রু-ধারা ঝরে।

রক্ষিতে হিন্দুর স্বার্থ পার্থ সম নেমেছিলে রণে,
অভয় দিয়েছ তুমি ত্রাস্ত-হারা দুঃস্থ আর্তজনে ;
একা গিয়াছিলে ছুটি' বাঁচাইতে ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর !
রাষ্ট্রিয় ভীরুতা গ্লানি ঘুচাইতে,—দুঃসাহসী বীর।
নির্বীর্য রাজ্যের তুমি মানো নাই অন্যায় আদেশ,
মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়—প্রাণ দিলে শেষ।
যাহার সাধনা মুক্তি, বন্ধন-মোচন যার ব্রত,
কে পারে রাখিতে তারে বন্দী করি' নির্বোধের মতো !
সকল বন্ধন ছেদি' চলে গেলে চির-মুক্ত-প্রাণ,
হায় বন্ধু ! হারা দেশ অভিভূত—শোকে মুহ্যমান।

স্বধর্মে নিধন শ্রেয়ঃ—ধর্ম তব ছিল চিরদিন,
সাম্প্রদায়িকতা দোষে তোমারে ভেবেছে যারা হীন—
আমিও তাদেরই দলে, তবু বন্ধু শ্রদ্ধা পুষ্প তুলে,
অঞ্জলি দিয়েছি তব স্বধর্ম-নিষ্ঠার পাদমূলে।
স্বজন-বিয়োগ-ব্যথা চিত্ত করে বেদনা-বিধুর !
জানিতে না অহঙ্কার ; দৃপ্ত তবু বিনয়ে মধুর।
যখনি যে কাজে ভাই, ডাকিয়াছে তব দেশবাসী,
দুর্লভ সময়—তবু, এসেছো তখনি ভালবাসি।
নিজ স্বাস্থ্য, নিজ সুখ, দেশকর্তো করোনি বিচার।
হে তেজস্বী মহাবীর ! বাঙালীর লহ' নমস্কার !

পিতামহ

পুনরাবৃত্তি)

সেই রোডিও শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম রোজ। প্রায়ই রাত্রি দশটার পর ওই আমার একমাত্র কাজ ছিল। শিখরেরও বোধহয় একমাত্র কাজ ছিল, রাত্রি দশটার পর ওর ঘরে গিয়ে গল্প করা। গল্পটা যে নিছক প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছু নয় এই মনে করে আমি পুলকিত হতাম। আগেই বলেছি মেয়েটি অবন্ধনা জানলে পুলকের বদলে আমার মনে ঈর্ষাই জাগত। কিন্তু ওদের আলাপের সুর যে ঠিক কি ছিল তা আগে টের পাইনি, এখন পাচ্ছি শিখরের ডায়েরি থেকে।

শিখর লিখছে—"এতদিন পরে অবন্ধনাকে যে আবার ফিরে পাব কল্পনাতীত ছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই দিনই যাব গেলাম তার ঘরে। গিয়ে দেখি সে খুব ডায়মণ্ডে রঙের একটা নাইট গাউন পরে নিবিষ্টচিত্তে একটা বিলিতি সিনেমা-মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের টেবিলে একটা 'অ্যাশ ট্রে'তে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা। তাকে নার্সের বেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এই বেশে দেখে বিস্ময় সীমা অতিক্রম করল। খানিকক্ষণ আমি কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।

"খুব অবাক লাগছে, না? সত্যি আমি অনেক বদলে গেছি শিখরদা।"

"সত্যি বদলেছ। তুমি নিজের পরিচয় না দিলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না বোধহয়, এত বদলেছ"

"আমার মুখটাও খুব বদলেছে কি। দেখ তো ভাল করে'। আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। দেখতো—"

মুখটা উঁচু করে' স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখলাম মুখটা সত্যি বেশী বদলায় নি। অনেক দিন পরে চিবুকের পাশের ছোট কালো তিলটি চোখে পড়ল আবার। আর একটা কথাও মনে হল, মুখের গড়নটা বদলায় নি বটে কিন্তু রূপটা বদলেছে। তরলমতি কিশোরী সে আর নেই, পরিণতি লাভ করেছে আত্মসচেতন যুবতীতে।

"না, মুখটা বেশী বদলায় নি। মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলে চিনতে পারতাম"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন"

চেয়ারটা টেনে বসলাম। অ্যাশ ট্রেটা দেখিয়ে বললাম, "সিগারেট খায় কে। তোমার বন্ধুরা বুঝি"

"আমিই খাই। বন্ধুদের মধ্যেও খায় দু'একজন। খাবে তুমি?"

দামী কাচকরা একটা রূপোর সিগারেট কেস সে এগিয়ে ধরল আমার দিকে। সিগারেটটা টিপতেই ডালাটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল একটা সাপ ফণা তুলল যেন।

"তুমি সিগারেট খাও?" মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমার।

"আমি এখন অনেক কিছুই করি। ওই দেখ"

ঘরের যে অংশটি তার প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হত সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে সে। প্রকাণ্ড একটা দামী আয়নার আশে পাশে ছোট বড় কয়েকটা শেলফে নানা আকৃতির সুদৃশ্য শিশি আর কৌটো সাজানো রয়েছে দেখলাম। "কি ওগুলো"

"স্নো, পাউডার, লোশন, লিপ্‌স্টিক, কাজল, ডিপাইলেটরি, এসেন্স, আতর—কত কি। যে অবু আমগাছে উঠত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত, তোমার পড়ার ঘরে জানলার ধারে উঁকি দিত সে মরেছে। তার দেহটার ভিতর বাস

করছে এখন অন্য লোক। একে চিনতে তোমার দেরি হবে। হয় তো পারবেই না"

"ভিতরের আসল মানুষটা বদলায় না অত সহজে"

"বিজ্ঞান লোকেরা তাই বলেন শুনেছি। কিন্তু বাইরের পোশাক পরিচ্ছদে মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করে যে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না"

অবন্ধনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একজন পাকা দার্শনিকও বোধহয় এমন করে' গুছিয়ে মানুষের আপাত-পরিবর্তনের রহস্য বর্ণনা করতে পারত না। একথা অবশ্য বললাম না তাকে।

বললাম, "তোমাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করতে পারব। সে ভরসা আমার আছে—"

"আমার নেই"

অবন্ধনার চোখে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল সে। গম্ভীরভাবে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে' নিপুণভাবে ধরালে সেটা।

"নেই? কেন!"

"পিসেমশায়ের হাতে নির্যাতিত হয়ে যখন তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, যখন আমার বাইরের সব আবরণ ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারনি। তার মানে আমার আসল মানুষটাকে তুমি চিনতে পারনি, পারলে নিশ্চয়ই দিতে"

অবন্ধনার কথার বাঁধুনি দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

"চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার বাধা ছিল অনেক। তাই একটু ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার তর সইল না। নবীন দুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেলে। আচ্ছা, নবীন দুলের সঙ্গে গেলে কেন"

"কারণ ওই ঠিক আমাকে চিনেছিল"

নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললে, "নবীন দুলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে খুব কুৎসা রটিয়েছ বোধহয় তোমরা"

"কুৎসা তো রটবেই"

"তোমার কি মনে হয়েছিল?"

চুপ করে' রইলাম। বড় কঠিন প্রশ্ন। অবন্ধনার চোখের পাতা পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে আমার উত্তরটা শোনবার জন্য।

"আমার? নবীন দুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেছ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে হ'ল"

"বিশ্বাস করলে আমি নবীন দুলের প্রণয়িনী হয়েছি?"

চুপ করে' রইলাম। হঠাৎ খিল খিল করে' হেসে উঠল অবন্ধনা।

"আশ্চর্য্য তোমাদের বুদ্ধি। আমি বিপদে পড়ে' যদি একা একটা নৌকো করে' নদী পার হয়ে যেতাম, তাহলেও তোমরা বোধহয় ভাবতে যে নৌকোটার সঙ্গেই আমার নিশ্চয় কিছু ঘটেছে গোপনে গোপনে!"

আমি চুপ করেই রইলাম। অবন্ধনার হাসিটাও থেমে গেল হঠাৎ। তার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। সহসা অন্য কথা পাড়লে সে।

"একটু চা খাবে?"

"দোকানের চা?"

"না, আমি নিজে করে' দেব। সব ব্যবস্থা আছে আমার।"

ঘরের আর এক কোণে দেখলাম ছোট একটি টেবিলে সত্যিই সব ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি ছোট একটি ইলেকট্রিক স্টোভ পর্যন্ত।

অবন্ধনা চা করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর উঠে তার বিছানার ধারে যে বইয়ের শেলফটা ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ইংরেজি বইই বেশী।

"ইংরেজি পড়তে শিখেছ নাকি"

"আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি"

"ও। এত সব করলে কোথায়"

"বম্বেতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে বুঝলাম যে স্বাধীন-ভাবে নিজের ভরণপোষণ করবার যোগ্যতা না হলে আত্মসম্মান থাকে না, এমন কি বিয়ে করেও না। সেদিন ভাগ্যিস তুমি আমাকে আশ্রয় দাও নি শিখরদা। দিলে পরের মুখ-ঝামটা খেতে খেতেই সারা জীবনটা কাটত—"

আমি শেলফের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নাড়িয়ে নাড়িয়ে দেখছিলাম—কি ধরণের বই অবন্ধনা পড়ে। দেখলাম শস্তা

প্রেমের উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পই বেশী রয়েছে। নার্সিংয়ের বইও আছে দু' একখানা। বইগুলোর পিছন থেকে ছোট একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। লেবেলে লেখা রয়েছে দেখলাম—পোটেশিয়াম সায়ানাইড। ভীষণ বিষ! এ জিনিস এখানে কেন!

"পোটেশিয়াম সায়ানাইড রেখেছ কেন—"

"ওটা বার করলে কোথা থেকে"

"এই বইগুলোর পিছনে ছিল"

"একজন রোগীর জন্যে দরকার ওটা। বাজারে পায় নি সে, তাই আনিয়ে রেখেছি আমি"

"রোগীর জন্যে? এ তো ভয়ানক বিষ। কোন অসুখে লাগে সায়ানাইড"

"ডাক্তার হলে বুঝতে। ডকটর সেন প্রেসক্রাইব করেছেন একটা কানাদার রোগীর জন্যে। দাও—"

আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশিটা। রোগীর কথাটা যে মিথ্যে তা তার চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম শিশিটা নিয়ে আবার বইগুলোর পিছনেই রেখে দিলে সেটা। সায়ানাইড্ রেখেছে কেন? প্রশ্নটা কাঁটার মতো বিঁধে রইল মনে। কিন্তু তখন তা নিয়ে আর আলোচনা করা হল না, আলোচনা করবার অবসরই দিলে না অবন্ধনা।

"চা'টা খেয়ে দেখ দিকি কেমন হল। আমি কড়া চা পছন্দ করি। তুমি?"

"আমিও"

"তাহলে ভালই লাগবে বোধ হয়। চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না দেখ"

এক চুমুক খেয়ে বললাম, "চমৎকার হয়েছে—"

সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। অবন্ধনা নিজের জন্যও বানিয়েছিল এক পেয়ালা। একটা ছোট টুলে বসে' আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল সে। চোখ দুটি থেকে অদ্ভুত একটা হাসি উপচে পড়তে লাগল।

"শিখরদা, কোথায় কি চাকরি কর তুমি"

"আমি দালালি করি। ঠিক চাকরি নয়, সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম"

"কিসের দালালি?"

"নানারকম জিনিসের। বাড়ি গাড়ি থেকে আরম্ভ করে দেশলাই চুঁচ পর্যন্ত"

মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে বলে গেলাম। আমি যে পুলিশের গুপ্তচর এ কথাটা অবন্ধনার কাছে বলতে পারলাম না। মনে হল কথাটা শুনলে আমার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আসবে একটা। 'স্পাই'কে সবাই ঘৃণা করে এটা কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

"দালালিতে রোজকার হয় বেশ?"

"চলে' যাচ্ছে"

"বিয়ে করেছ?"

"না"

"করবে না?"

"এতদিন ঠিক করেছিলাম করব না। কিন্তু এখন ভাবছি করলেও হয়"

অবন্ধনার চোখ থেকে যে হাসির আলোটা উপচে পড়ছিল সেটা নিবে গেল হঠাৎ।

"মনে' ঠিক হয়ে আছে না কি"

"অনেক আগে থেকেই"

"কেমন মেয়েটি, কোথায় বাড়ি?"

"দেখতে ইচ্ছে করছে না কি"

"করবে না?"

"আয়নার সামনে দাঁড়াও গিয়ে তাহলে"

অবন্ধনার চোখের আলো নিবে গিয়েছিল, মুখটাও ফ্যাকাসে হয়ে গেল আবার। কিন্তু জোর করে' হেসে সে বললে—

"তা আর হয় না শিখরদা"

"কি হয় না"

"আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারি না"

"কেন"

"লগ্ন বয়ে গেছে"

"পাঞ্জিতে বিয়ের লগ্ন কি একটাই থাকে?"

"পাঞ্জিতে যত লগ্নই থাক, আমার বিয়ের লগ্ন একবারই এসেছিল—আর আসবে না"

"কবে এসেছিল—"

"মনে নেই? বহুদিন আগে রাত দুপুরে? তুমি তো তখন আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে"

"আমার সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই? তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন তোমার পিসেমশাই। এসব কারণেই আমি চট্ করে' মত দিতে পারি নি তখন—"

"আমি তা জানি। আমি রাগও করছি না, কিন্তু লগ্ন ব'য়ে গেছে। তখন যা হতে পারত এখন তা আর হয় না।"

"হয় না কেন। তুমি আমি দুজনেই এখন স্বাধীন, আমাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই তো"

"আছে বই কি"

"কে"

"আমার বিবেক"

কথাটা শুনে নির্বাক হয়ে গেলাম ক্ষণকালের জন্য। নবীন দুলের ঘটনাটা পরমুহূর্তে মনে পড়ল।

বললাম, "নবীন দুলের সঙ্গে তোমার কি ঘটেছিল জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস কর তার জন্যে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই—"

"তোমাকেও একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। করবে কি—"

সিংহিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে' সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"কি বল"

"আজ পর্যন্ত যত পুরুষের সংস্রবে এসেছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে নির্মল নিষ্পাপ চরিত্র মাত্র একটি লোককেই দেখেছি সে হচ্ছে ওই নবীন দুলে। সে ইচ্ছে করলে আমাকে নষ্ট করতে পারত কিন্তু করে নি। তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"বিশ্বাস করলাম। নবীন দুলে কোথা এখন"

"জাহাজের খালাসী হয়ে সে চলে' গেছে"

"কবে"

"আমরা যখন বম্বে পৌঁছলাম তার মাসখানেক পরে"

"তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে' গেল"

"আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে গেল"

"কোথায়"

"এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে"

"কি করতে সেখানে"

"দাসীবৃত্তি"

"তার পর?"

"তার পর ডাক্তারবাবুর সুনজরে পড়লাম। তিনি আবিষ্কার করলেন একদিন যে 'নষ্টি আমি সামান্যা রমণী'। তাঁরই অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলাম, নার্সগিরি শিখলাম"

অলক্ষনার চোখে মুখে অদ্ভুত একটা আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠল যেন।

"লেখাপড়া তিনিই শেখালেন?"

"একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে দিলেন। অনেক কিছু করেছিলেন ভদ্রলোক আমার জন্যে। আমাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হ'তে পারলুম না"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত ছিলেন না কি"

"স্ত্রী তাঁর আত্মহত্যা করেছিলেন"

"কেন"

"আমারই জন্য"

মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল যেন নিজের একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমার প্রশংসা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"তবু বিয়ে করলে না ভদ্রলোককে!"

"সেই জন্যেই করলাম না। আমাকে যত বোকা তোমরা ভেবেছ তত বোকা আমি নই। ততটা হৃদয়হীনও নই"

"আমি তোমাকে কোনদিনই বোকা ভাবি নি। তবে তুমি হৃদয়হীন কি না তা জানতে বাকী আছে এখনও আমার। তার পর কি হ'ল। তোমার জীবন-কাহিনী বেশ লাগছে—"

"বেশ লাগছে? যেন উপন্যাসের মতো?"

"ভাল উপন্যাসের মতো"

"আশ্চর্য্য তো"

"আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"উপন্যাসে যা তোমাদের ভাল লাগে, বাস্তব জীবনে তা কি তোমরা সইতে পার? কুন্দনন্দিনী, কিরণময়ীদের তোমরা তো দূর করে' দিয়েছ। তারা হয় মরেছে না হয় আশ্রয় নিয়েছে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। আজকাল অবশ্য সিনেমা-আকাশে তারকা হয়ে জ্বলছে অনেকে। আমিও হয়তো জ্বলতাম, কিন্তু ঠিক দামটা দিতে পারলাম না"

"কিসের দান"

"তারকা হতে হলে যে দান দিতে হয়"

আবার চুপ করে' গেল সে। মুচকি হেসে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে-ই কথা কইলে আবার।

"আচ্ছা, শিখরদা তুমি বরাবর সৎপথে চলে' ঠিক আগেকার মতো ভাল ছেলে আছ ?"

উত্তরে আমিও মুচকি হেসে চাইলাম তার দিকে। তারপর বললাম, "নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করতে নেই। আমার জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমি প্রতীক্ষা করছি"

"কার—"

"তোমার"

অবন্ধনা একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—"এই সিগারেটখোর মেয়েটার ? মিছে কথা বোলো না শিখরদা। তোমাকে সত্যবাদী বলে' শ্রদ্ধা করে' এসেছি বরাবর"

"সিগারেট খেয়ে বা রং মেখে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে এটা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে চেন নি তুমি।"

হঠাৎ অবন্ধনা খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সিগারেটটা পড়ে গেল তার ঠোঁট থেকে।

"চিনি নি ? পুরুষদের চিনতে বাকী থাকে না কি কোন মেয়ের !"

সিগারেটটা তুলে আবার টানতে লাগল।

ক্রমশঃ

জ্ঞানী

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

অতি সহজ মানুষও জ্ঞানে জ্ঞানী পণ্ডিত মাত্রই ভক্ত নয়। জ্ঞানের অধিকারী আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। কিন্তু ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীকে আমরা যে শ্রদ্ধা দান করি, সে শ্রদ্ধা পায় না জ্ঞানী। জ্ঞানীর প্রাপ্য শ্রদ্ধার অন্তরে একটু ভয় থাকে। কারণ যাদের ঘিরে আধিভৌতিক ভয় তাদের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান সাধারণ লোকের হতে পণ্ডিতের অধিক। বহু শাস্ত্র-জ্ঞানীরও আচরণে তাচ্ছিল্যের ভাব থাকে অল্প-মেধা ব্যক্তি সম্বন্ধে। বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে। কিন্তু সে বিদ্যার সংযোগে চরিত্রে যেথায় মাধুরী বা প্রেমের বিকাশ নাই, সেথায় প্রেম-পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় না।

বহুশ্রুত হ'লেই মানুষ জ্ঞানী হয় না। জ্ঞানীর পক্ষে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি চাই নিজ প্রজ্ঞার বলে। তাই বলা হয়েছে—যার নিজের প্রকৃষ্ট জ্ঞান নাই, যিনি মাত্র বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর যেমন সুমিষ্ট রসের আস্বাদন হ'তে বঞ্চিত কারণ সে জড় পদার্থ, তিনিও তেমনি শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ হ'তে বঞ্চিত।*

ভগবানে নিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান তিনিই জ্ঞানলাভ করেন।°

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যে জ্ঞানীর লক্ষণ বিবৃত করেছেন, তিনি ভক্ত। নিরস শাস্ত্রের চাপে সে পণ্ডিত চিত্তে-নিহিত প্রেমের উৎস-মুখ বন্ধ করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ চার প্রকার লোকের উল্লেখ করেছেন যাঁরা তাঁকে ভজনা করেন—"হে ভারতর্ষভ অর্জ্জুন চার প্রকার সুকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী।

শ্রীভগবানের এ বিবৃতি হতে কটা কথা বেশ বোঝা যায়। প্রথমতঃ তিনি যে চার শ্রেণীর উপাসকের উল্লেখ করেছেন তারা প্রত্যেকেই আস্তিক্য-বুদ্ধি সম্পন্ন। ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বাসী না হ'লে নিশ্চয়ই বিপদের সময় তাঁরা বিভুর ভজনা করেন না। মাত্র তর্কের জন্য ঈশ্বরের কি স্বরূপ, কেমন করে তাঁর তত্ত্ব বোঝা ও বোঝানো যায়, বিভিন্ন তত্ত্বানুসন্ধানীর মতে কোথায় ভ্রম আছে, তাদের বিশিষ্টতা কি, ইত্যাদি গবেষণাকে তিনি জিজ্ঞাসা বলেন নি—যদি সে জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য না হয় উপলব্ধির পথ খোঁজা

---

* যস্ত নাস্তি নিজা প্রজ্ঞা কেবলম্ভ বহ্বীশ্রুতঃ
ন স জানাতি শাস্ত্রার্থং দর্বীসূপ্তরসানিব।

° শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

এবং নিজের জীবনের পথ নির্বাচন করা। অর্থার্থী নিজের কামনা-সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ ভজেন। ভগবানের শক্তি এবং করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে অর্থার্থী তাঁর ভজনা করেন না।

জ্ঞানী সম্বন্ধেও তিনি উপাসক জ্ঞানীকে লক্ষ্য করেছেন। যাঁর শাস্ত্রে জ্ঞান প্রভৃত অথচ, যিনি অনন্ত-শক্তি অনন্ত-জ্ঞান-রূপ ভগবানের ভজনা করেন না, তেমন জ্ঞানীর কথা গীতায় উক্ত হয়নি। পাণ্ডিত্য হিসাবে চার্বাকের জ্ঞান ছিল বিশাল, কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল বিপরীত-বুদ্ধি-সাপেক্ষ। তাই বেদ-বেদান্ত নির্দিষ্ট সকল তত্ত্ব তিনি নিরস যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেছেন। সে অযুক্তি কথার মারপ্যাঁচ।

দ্বিতীয় কথা, যে চার শ্রেণীর উপাসকের কথা শ্রীভগবান বলেছেন তাদের কোনোটি অন্য হ'তে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। এ প্রত্যেক শ্রেণী অভেদ্য গণ্ডী ঘেরা নয়। বহু জ্ঞানী ভক্ত আর্ত হ'য়ে তাঁর করুণা ভিক্ষা করে। জিজ্ঞাসা জ্ঞানের ভিত্তি। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বেদান্তের আদি। সুতরাং জ্ঞানী-মাত্রেই জিজ্ঞাসু। প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের বিভূতির তথ্য জানা ভক্ত জ্ঞানীর জ্ঞানের পট-ভূমি। বিশাল ভক্তি-সাহিত্যে যে সব তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, সেগুলি নিশ্চয়ই জ্ঞানীর আলোচনার ফলে পরম্পরা-ক্রমে জগতে বিস্তৃতিলাভ করেছে। যে মহাভক্ত সঞ্জয় জগতকে কৃষ্ণার্জুন সংবাদ শুনিয়েছেন, তিনি মহা-জ্ঞানী, মহা-জিজ্ঞাসু। জীবনের মূল তাৎপর্য্য, ভগবানের অবতরণ প্রভৃতি বহু সমস্যার অর্থের অর্থী ছিলেন সঞ্জয় এবং ব্যাসদেব। দ্রৌপদী বস্ত্র-হরণের লজ্জায় আর্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিলেন। তিনিও তো ছিলেন মহা-জ্ঞানী।

তৃতীয় কথা এই চতুর্ব্বিধ উপাসক সুকৃত। কারণ প্রাণের মধ্যে সে ভগবদ্ভক্তি সুপ্ত থাকে, কেবল সুকৃতির ফলে তার জাগরণ। যে যেমন ভাবে ঈশ্বরকে ভজনা করে, তিনি সেই ভাবেই তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন।

সুকৃতি বহু আয়াস, প্রভূত সংযম, ভগবানে ভক্তির ফল। এ ফল জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা সাপেক্ষ। যোগ-ভ্রষ্ট যোগী সুকৃতির ফলে শ্রীমান এবং যোগীদের গৃহে জন্মলাভ করেন।

সুকৃতি না হ'লে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা সার্থক হয় না। যে আলো নিবিড় এবং এক বিষয়ে নিবদ্ধ তার উদ্ভাসন ও প্রতিফলন শক্তি প্রচুর। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নিবিড় ঐকান্তিকতা। সুকৃত জিজ্ঞাসু জ্ঞান-দীপ্ত, সে প্রকৃত রস-পিপাসু। তিনি সকল রসের অন্তরতম রসের সার, মাত্র সেই রসে জ্ঞানীর রস-পিপাসার নিবৃত্তি সম্ভবপর। সে অমৃত-রস সুকৃতির ফলেই লভ্য।

অর্থার্থী যদি সুকৃত হয় তবে তাঁর যাচিঞার অর্থ হবে পরম ধন—ঐশ্বরিক জ্ঞান। তেমন পুণ্যবানের অর্থ-কামনা সফল হ'লে পরমার্থ লাভ হয়। সাধারণ অর্থার্থী এবং সুকৃত অর্থার্থীর এই প্রভেদ। তুচ্ছ অর্থ সংগ্রহের দীনতা ও মলিনতায় ধীতস্পৃহ হয়ে যে পুণ্য সঞ্চয় হয় তার ফলে মানুষ চায় পরমার্থ—যার বিনাশ নাই, অপচয় বা অপব্যয় নাই।

এই চতুর্ব্বিধ ভজনা-রত পুণ্যবানদের মধ্যে জ্ঞানীই ভগবানের প্রিয়। কিন্তু সে প্রীতি অর্জ্জন করতে গেলে নিত্য-যুক্ত এবং এক-ভক্তি বিশিষ্ট হওয়া চাই।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—এই চতুর্ব্বিধ ভজনা-রত পুণ্যবানদের মধ্যে জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত, এক-ভক্তি বিশিষ্ট। আমি জ্ঞানীর অত্যর্থ প্রিয়। সে-ও আমার প্রিয়।* প্রকৃত জ্ঞানী তত্ত্ব-বিদ্। ভগবানের তত্ত্ব-অনুসন্ধানী জ্ঞানী পুণ্যবান। সুতরাং সে নিত্য-যুক্ত। তার নিষ্ঠা সদাই শ্রীভগবানে। প্রকৃত জ্ঞানালোকে সকল অন্ধকার বিনষ্ট হয় মনের। যার জ্ঞানের জ্যোতি প্রখর নয়, যার জ্ঞানের আলো একবার জ্বলে একবার নেভে, তার প্রাণের প্রদীপ নিত্য ভগবানের অনন্ত-রূপ প্রকাশ করে না। তার বাসনা আছে আলো জ্বালবার, কিন্তু সে তো একনিষ্ঠ নয়। তাকে কবির কথায় হতাশার সুরে গাহিতে হয়—

শতবার আলো জ্বালাতে যাই নিভে যায় বারে বারে।
অথচ সে বলে—আমার হৃদয়ে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে। কারণ সে আর্ত-রূপে অর্থার্থী হয়ে জিজ্ঞাসার ফলে এ সত্যের সন্ধান পেয়েছে যে পরব্রহ্ম সবার হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। কিন্তু সুকৃতির ফলে মাত্র সত্তা জানাই তো

---

* চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।
তেষাং জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত এক-ভক্তি বিশিষ্যতে
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ৭। ১৬-১৭

হয় না। তাই এক-ভক্তি, নিত্য-যোগ। লুকোচুরি খেলে গোপ-গোপিনী তাঁকে পেতো আবার হারাতো। কিন্তু সেই আরাধিতা নারী রাধিকা রাসলীলায় এক-ভক্তিতে নিত্য-যুক্ত হয়েছিল। জীবাত্মার মধ্যে পরমাত্মার যোগের সেই এক-ভক্তিই কৌশল।

শ্রীহরি তো সবার হৃদয়ে আসন পেতে বসে আছেন। সাধক জানেন না বিরাজে সর্বঘটে। কিন্তু ভক্তি-পূত জ্ঞানের আলো না জ্বালিয়ে রাখলে জ্ঞানের মূল হারিয়ে তাতে ভক্তির সেচ-জল দেওয়া যায় না। জ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন না হলে—জ্ঞানী এক-ভক্তি না হলে আবার প্রাণ-দোলে সেই নিরাশার ছন্দে—

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল
কুঁড়ি ধরে তাতে নাহি ফোটে ফুল।

ভাঙিয়া তোমারে এনেছি কাতরে ভাঙা মন্দির দ্বারে। বিক্ষিপ্ত জ্ঞান, টুকরো ভক্তি, অযুক্ত জ্ঞানীর হৃদয়, ভাঙা মন্দির মাত্র।

এক-ভক্তিপরায়ণ সে, মন ও আত্মা দিয়ে হরির ভজনা করেন। তাঁর প্রেমের ভাগিদার নাই। স্ত্রীপুত্র-পরিজন, বিশ্ব-বিভবের তরাশা, কুবেরের ধনরত্ন, তাঁর শ্রদ্ধার অংশীদার হতে পারে না। কারণ সে ভক্ত জ্ঞানী। সে জানে সকল ধন, সব সম্পদ সেই অনাদি অব্যক্ত আদি কারণের অতি স্বল্পাদপি ক্ষণ ভঙ্গুর অলীক বুদ্বুদ। সে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে আপনাকে সেই অনির্বচনীয়ের শ্রীচরণে সমর্পণ করে প্রেমের ফাঁসে বাঁধে। ভক্ত তখন সদাই সান্নিধ্য সুখের আনন্দ উপভোগ করে। তার আর স্মরণ করিয়ে দেবার বাহিরের স্মারক আবশ্যক হয় না। তীর্থ তার চিত্তে। সে জানে—মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া, গঙ্গা বারাণসী। সে শ্রীচরণের বেদী তার চিত্তে। সুখ দুঃখ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য আত্ম-প্রকাশ করে। সে অন্তরে উপলব্ধি করে—

দুঃখ হয় সে দুঃখের রূপ, মৃত্যু ধরে সে মৃত্যুর রূপ
তোমা হতে যবে চাইয়ে বিমুখ আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে যাহা কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয় সে শুধু আমারি নিশিদিন কাঁদি তাই।

তাই ভক্তি-ভরা প্রাণে জ্ঞানী তাঁর অসীমে প্রাণ মন ধরে যাত্রা করে। তাঁর আলোকের ঝরণা ধারায় স্নান-পূত হয়ে।

জ্ঞানীর অতি-প্রিয় শ্রীভগবান যদি সত্য-পথ দেখান, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতি যদি আমাদের মনকে প্রকৃতই উদ্ভাসিত করে তা'হলে তাঁর স্বরূপ ভিন্ন জানবার তো আর কিছু বাকী থাকে না। তাঁর প্রকৃত স্বরূপ যে জগতের আধার। মায়ার প্রকৃত স্বরূপ জেগে ওঠে জ্ঞানী সাধকের চিত্তে। মায়াকে এড়িয়ে গেলে যে তাঁকে পাওয়া যায়। জ্ঞানী স্পষ্ট দেখে ত্রিগুণের বুদবুদ। অলীক পৃথিবী মায়াময়। অনাদি অনন্ত চিরানন্দময় পরব্রহ্ম। সুতরাং যে প্রকৃত জ্ঞানী—তার পক্ষে জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা বিভেদবর্জিত। সে মায়া অতিক্রম ক'রে সত্যে পৌঁছায়।

তাই শ্রীভগবান বলেছেন—জ্ঞানী নিত্য-যুক্ত এক-ভক্তি-পরায়ণ। সে ঈশ্বরকে জানে, তার মন অন্য বিষয়ে যুক্ত হবে কেন?

প্রকৃত জ্ঞানী তাই নিত্য-যুক্ত। পরম পুরুষে যুক্ত হবার যে অবকাশ লাভ করেছে, তার পক্ষে অন্য বেদীতে ভক্তি নিবেদন তো অসম্ভব! কারণ যিনি একবার পূর্ণ জ্যোতির সন্ধান পেয়েছেন তাঁর পক্ষে একে ভিন্ন গ্রহতে ভক্তি অসম্ভব।

এক-ভক্তি পরায়ণ জ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্তের তিনি প্রিয়। তার প্রাণ ভগবানে পূর্ণ। সে হৃদয় সিংহাসনে তো অন্যের স্থান নাই। যে জ্ঞানের আলোয় অখণ্ড জ্যোতির আভাস পেয়েছে তার কাছে তো ক্ষণিক আলোর দীপ্তি নাই। সে সীমার মাঝে অসীমকে পায়। বলে—

তোমার আলোয় নাই তো ছায়া
আমার মাঝে পায় সে কায়া।

তার প্রাণে অন্য আলো নাই। ভগবানের প্রেমে সমুজ্জ্বল তার প্রাণ-শক্তি। তাঁর প্রেম সর্বব্যাপী। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ আমরা তাঁর প্রেমের স্পর্শ উপভোগ করতে পারি না। তাঁর প্রিয় সবাই। কিন্তু উপলব্ধি ভেদে সে প্রিয়তা হয় ম্লান বা পরিস্ফুট। অন্তরের প্রবেশ-পথ অন্য জ্ঞানে পূর্ণ রাখলে তিনি প্রবেশ করে প্রিয়তার পরিচয় দেবেন কেমনে? সুতরাং তাঁর কৃপা, তাঁর সান্নিধ্য এবং তাঁর আনন্দের ছায়া জ্ঞানী ভক্তেরই প্রাপ্য। যখন মন মায়ায় উপচিত চৈতন্য হতে মুক্ত হয়, প্রাণে ভক্তি ছাড়া আর কোনো ভাব থাকে না, তিনি দেখা দেন। তাই তিনি বলেছেন ভক্ত আমার প্রিয়। তিনি বলেছেন—আমি

বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগীদের হৃদয়ে থাকি না, আমার ভক্ত যেখানে গায়, আমি থাকি সেখায়। *

তাঁকে প্রিয় ভেবে নিখিলের মাঝে তাকালে উপলব্ধি হয়—

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে যখনি যেখানে লবে
চিরকালের পরিচিত ওহে তুমিই চিনাবে তবে।
তোমায় জানিলে নাহি কেহ পর, নাহি কোনো
মানা নাহি কোনো ডর।
সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ—দেখা যেন সদা পাই।

জ্ঞানী ভক্ত সম্বন্ধে ভগবান আরও বলেছেন—চারি প্রকার ভক্তই উৎকৃষ্ট। আমার স্বরূপ। যেহেতু যে মদ্গত-চিত্ত এবং সর্বোত্তম গতি, আমাতেই তার অবস্থিতি। *

যখন স্রষ্টার সঙ্গে সাধক নিজের অস্তিত্ব নিমজ্জিত করে, তখন ভেদাভেদ লোপ পায়। বিভেদের জন্ম অজ্ঞানে। জ্ঞানের জ্যোতি যখন অজ্ঞানের অন্ধকূপে প্রবেশ ক'রে তাকে জাগিয়ে তোলে তখন তো জ্ঞানী ভগবানে লীন হন—তাঁর স্বরূপ হন।

কিন্তু এ অবস্থা তো একদিনে এক জন্মে হয় না। বহু জন্ম জন্মান্তরের সাধনায় সর্বত্র, সকল পদার্থে, সকল ভাবই ভগবান—এমন উপলব্ধি সম্ভবপর। তাই ভগবান বলেন—বহু জন্ম অতিক্রম ক'রে জ্ঞানবান ভক্ত সমস্ত জগতই বাসুদেব-রূপ, আমাকে লাভ করেন। সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। *

কেমন করে ঈশ্বর দেখা যায়—জিজ্ঞাসা করেছিলেন লোকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি বলেছিলেন—যেমন ক'রে ধন মান অর্থ দেখা দেয় তেমনি ক'রে। নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চাই বহুদিনব্যাপী, বুদ্ধিনের সংসারের তত্ত্ব লাভের জন্য। সুতরাং বহু জন্মজন্মান্তর সাধনা না করলে কেমনে উপলব্ধি হবে—সর্বং খল্বিদম্ ব্রহ্ম ?

* ন হি ত্বিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তে তত্র তিষ্ঠামি নারদ।
* উদারা : সর্বে এবৈতে-জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম
আস্থিতঃ : স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম। ৭। ১৮।
* বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। ৭। ১৯।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীনরেন্দ্র দেবকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

নরেন, কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌঁছেছে, কাল রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েচি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির করে রেখেচি, যদিনা আজ যাঁরা উলুবেড়ের মামলা[১] করতে গেছেন তাঁরা এসে তাঁদের কৃতিত্বের বিস্তারিত বিবরণ দিতে বারোটা বাজান।

দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে। কারণ তোমার ওখানেই যাব। রাস্তাটা একটু শুধুক—পালকি যেন চলতে পারে।

(১) এই মামলার কথাই উল্লেখ ক'রে শরৎচন্দ্র ঐ সময় ১৩২৯ সালের ২৫শে কার্তিক ডাঃ সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"পল্লীগ্রামে বাস করতে আমার যথাযোগ্য কলম্বোপ আরম্ভ হয়েছে,

অর্থাৎ, মামলার জড়িয়ে civil এবং criminal,—যেন উভয়নায় ছুটোছুটি সুরু করেচি। এই তিন বছর নির্লিপ্ত নির্বিকারভাবে নিধি ছিলাম। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের দেবতার আর সইল না, ঘাড়ে চাপলেন। বড় জমিদারের কাছে পার আছে কিন্তু স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র পত্তনিদারের চাপ দুর্বিসহ। ২।৷ বিঘে ছিল স্বল্পকালের শিবোত্তর, জমিদারের দান—কিন্তু ২।৷ বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। 'গরীব প্রজারা কেঁদে এসে পড়লো—লেগে গেলাম। খবর দিলাম যে আমি হাতে নিলে তা ছাড়ি নে। তার পর কৌজদারী।"

এই মামলায় শরৎচন্দ্র নিজে আসামী না হলেও এই ব্যাপারে তাঁর সহযোগী তাঁর দিদির এক দেওর মূল আসামী হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্রের গ্রাম সামতাবেড়ের আদালত উলুবেড়িয়ায়।

এই বইটার সম্বন্ধে যা আমার সত্যিকার অভিমত তাই নিয়ে একটু আলোচনা করব ইচ্ছে আছে, তবে সে মতামতের মূল্য আজকাল দিনে তোমরা কি দিতে পারবে? আমি তো প্রায় সাহিত্যিক দরবারে বাতিল হয়ে যাবার মতো হয়ে পড়েছি, লিখতে তো পারিই নে, লেখাও খারাপ হয়ে গেছে নিজেও বুঝতে পারচি। তবে তোমরা এখনো ভালবাসো এই যা সম্বল। বুড়ো বয়সে সব শক্তিই ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। এ অস্বাভাবিকও নয়। পরিতাপের বস্তুও নয়। আমার বিজয়ার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। আজ রাধুকেও[১] একখানা চিঠি লিখলাম। সে আমার ওপর ভারি রাগ করে আছে, এবার যেদিন তোমাদের বাড়ী যাবো তার সঙ্গে দেখা করে আসবো। নইলে সে হয়ত রেগেই থাকবে, অভিমান পড়বে না। ইতি—২রা কার্ত্তিক ৩৬

বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
হাবড়া

কল্যাণীয়েষু,

নরেন, তোমার চিঠি এবং 'লালু'র[২] প্রুফ পেয়েছি। প্রুফের উপরে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বানানের নিয়ম অনুযায়ী সম্পাদক কর্ত্তৃক সংশোধিত।

কয়েকটা বানান সম্বন্ধে আমার আপত্তি আছে—সে বানান আমি নিতে পারবো না। যাই হোক সোমবারে যাচ্ছি। জন্মাষ্টমীর পরের দিন। সাক্ষাতে আলোচনা হবে।

একদিন একটা গল্প লিখেচি। লালুর নয়—নিজের,[৩] কিন্তু মোটেই ভাল হ'ল না। নইলে তোমার পাঠশালার জন্য দিতে পারতাম।

রাধু একটু ভালো আছে শুনে খুশি হলাম। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। ইতি ১১ই ভাদ্র ১৩৪১

শরৎদা

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

বাজে শিবপুর, হাবড়া
১৪. ৮. ২৫

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণী, আজ তোমার চিঠি নরেনের[৪] হাত থেকে পেলাম।...

আমার লেখা বেশি করে পড়ায় মেয়েদের অনেক সময়ে বিড়ম্বনা ভোগ করতেও হয়। এই যেমন আমার অভিমত প্রকারান্তরে সমর্থন করবার ফলে তোমাকে গালাগালি খেতে হ'ল। আমার নিজের ত সংস্কার বলে বড় বেশি বালাই নেই। তাই বহু সময়ে তোমাদের কথা এত খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করি যে, অনেকে সইতে পারে না। এই জন্যেই বোধ হয় কোনো দুজন লোকের ধারণা আমার সম্বন্ধে এক নয়। কত অদ্ভুত দুর্নামই যে আমাকে নিয়ে প্রচারিত আছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

পুরুষেরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস করে দিলাম; আবার মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো। কত মেয়ের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় আছে, তারা আমাকে আপনার লোকের চেয়েও আপনার ভাবে। তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে ত যায়ই না, বরঞ্চ সৎপথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে ত তারই খোঁজ পায়। আমাকে যদি তুমি দাদা বলেই ডাকো ত আমার লেখায় সত্যিকার দুর্নীতি কোথাও নেই এ বিশ্বাস যেন তোমার নিঃসন্দেহে থাকে।

তুমি ছেলেমানুষ, সাহিত্য নিয়েই যদি থাকো ত একটা বড় অবলম্বন পাবে। আমি মনীষী নই, কিন্তু তোমাকে সান্ত্বনা করতে পারবো। নরেন বলছিল, অসুখে তুমি খুব ভাল সেবাশুশ্রূষা করতে পারো।

---

(১) রাধারাণী দেবী। ইনি নরেন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠাদশাহের জ্ঞানক-কন্যা। পরে নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে এঁর বিয়ে হয়।

(২) "লালু" শরৎচন্দ্রের লেখা একটি গল্প। শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকে এই গল্পটি স্থান পেয়েছে। গল্পটি প্রথমে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'সোনার কাঠি' নামক ছোটদের একটি মাসিকীতে প্রকাশিত হয়।

(৩) এই গল্পটির নাম "কল্পনা পঞ্চাশ পূর্ব্বের একটা দিনের কাহিনী"। এই গল্পটিও শরৎচন্দ্রের "ছেলেবেলার গল্প" নামক পুস্তকের মধ্যে রয়েছে। গল্পটি নরেন্দ্র দেব সম্পাদিত "পাঠশালা" পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪) নরেন্দ্র দেব।

কলকাতায় এলে তুমি আমার কাছে এসো।···আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

শরৎদা

বাজে শিবপুর, হাবড়া
২৫. ৮. ২৫

রাধারাণী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার চোখ এবং দেহ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি পড়াশুনা বা কিছু লেখালিখি কোনটাই করিয়ো না। নরেনের কাছে শুনতে পেলাম তোমার চোখ নাকি বড় দুর্ব্বল।···

সাহিত্য ব্যাপারে তোমাকে কিম্বা তোমাদের সাহায্য করায় আমার আজও উৎসাহ আছে। একদিন ছেলেবেলায় নিরুপমা, সুরেন গঙ্গো, গিরীণ গঙ্গো প্রভৃতিকে নিয়ে আমি ছোট অখ্যাত অজ্ঞাত সাহিত্য-সভা করেছিলাম। তাই ত আজ বাঙলা সাহিত্য তাদের কাছে কত কি পাচ্চে।

তেমনি আবার একটা গোষ্ঠী তৈরি করে যেতে চাই, যদি কেউ ভবিষ্যতে ভাল হয়, যদিচ তাদের কাজ চোখে দেখে যাবার আমার আর সময় হবে না। তোমার সঙ্গে দেখা হলে এসব আলোচনা করব। সাবধানে থেকো, আমি ভাল আছি।

বড়দা

কল্যাণীয়া রাধারাণী,

তোমার এইমাত্র চিঠি পেলাম। কুড়ে মানুষ তাছাড়া না থাকে হাতের কাছে চিঠির কাগজ, না থাকে খাম, না পাই খুঁজে ডাক টিকিট—নানা কারণে চিঠির জবাব দেওয়া ঘটে ওঠে না। তুমি ছোট বোন, অভিমান করতে পারো, এ ক্ষেত্রে আমারই দোষ—তোমার রাগ হবারই কথা। কিন্তু কি করি ভাই, বুড়োমানুষ সব কাজেই ত্রুটি হয়ে পড়ে।

সরসীবালা বসু নামটি বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে শুনেছি। তবে তাঁর কোন লেখা পড়েছি বলে ঠিক মনে হচ্ছে না। বিশেষতঃ বোধ হয় তুমি জানো না যে, নির্ব্বিচারে গল্প উপন্যাস আমি একেবারেই প্রায় পড়ি নে। আমার পড়ার বই আলাদা।

তোমাদের উপন্যাসের কল্পনা[1] ভালই। বেশ, আয়োজন কর। শেষকালে আমি যা পারি কোরব। কিন্তু আগেকার লেখার শক্তি আর আমার নেই। সবই যেন খারাপ হয়ে যায়। একদিন হয়ত লিখতে পারতাম; কিন্তু সব জিনিষেরই ত একটা শেষ আছে। সাহিত্য জীবনের শেষ বোধ করি আমার এসেছে। নরেন আমার সম্বন্ধে তোমাকে যা লিখেচে সে আর সত্যি নয়। আমি তোমাদের লেখার শেষ হলে মৌখিক উপদেশ দিয়ে (অবশ্য যদি তা তোমরা নিতে রাজী হও) যা পারি করব। লিখতে আমি বাস্তবিকই আর পারি নে। নইলে শুধু শুধু কিছু একটা অজুহাত করে তোমাদের এত বড় একটা সঙ্কল্পের গোড়াতেই নিরুদ্যম করে দিতে পারি এরকম স্বভাব আমার নয়। তাছাড়া আগে তোমাদের আরম্ভই হোক। তখন যদি দেহ ও মন সুস্থ ও সবল থাকে ত আলাদা কথা। তবে আমার জন্য তোমরা পিছিয়ে যেয়ো না।

তুমি এবারে কলকাতায় এলে[2] নরেনকে সঙ্গে নিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি—২৬।১২।২৫ শিবপুর। হাবড়া

দাদা

বাজে শিবপুর। হাবড়া
২৬শে আশ্বিন ১৩৩২

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধারাণি, দিন ২।৩ হল দেশের বাড়ী থেকে ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম। অনেক দিন তোমাকে পত্রাদি দিতে পারিনি।···

রাধা তুমি আমার পথের দাবী কখনো পড়েচো? ধর্ম্ম-কর্ম্ম নিয়ে সুখির দিকে চেয়ে চেয়েই দিন কাটাবে, দেশের কাজ একটুও কখনো করবে না?

আমার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ জেনো।

বড়দা

(১) রাধারাণী দেবী প্রভৃতি কয়েকজন মিলে একটি যাযাবরী উপন্যাস লিখবেন ঠিক করেছিলেন। এই যাযাবরী উপন্যাসে লিখবার জন্য রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন।

(২) রাধারাণী দেবী এই সময় দিরিডিতে ছিলেন।

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধা, তোমার চিঠি পেলাম, এর আগের চিঠির জবাব দিইনি—হবেও বা। এ বয়সে সব কথা মনে রাখাই কি সম্ভব? তা ছাড়া জানোই ত আমার কুড়েমির সীমা নেই। দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপরে সমস্ত ভুলে যাই। কিছু মনে কোরো না ভাই। যে কটাদিন আরও বেঁচে আছি, জবাব পাও বা না পাও মাঝে মাঝে সময় পেলে নিজের খবরটা দিয়ো।

শ্রীকান্ত শেষ পর্বের 'রাজলক্ষ্মী' তোমার মনোমত হয়নি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে লিখে জানিয়েছ বলেই রাগ কোরব এমনি বদমেজাজি আমি?—আমার মত শান্ত-শিষ্ট নিরীহ ব্যক্তি সহজে পাবে না।

তুমি যা লিখেছিলে আমি তখনই চিন্তা করে দেখেছিলাম। তবুও নিজের ভুলটা ঠিক ধরতে পারিনি। মতভেদ ত থাকবেই।

'শেষপ্রশ্ন' শেষ পর্য্যন্ত হয়ত অনেককেই ব্যথা দেবো, তবুও যা ঠিক বলে মনে করি তা বলা দরকার। তার পরের কথা পরে।

বোড়শী বইটা একবার পোড়ো। বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুসি হবে। শিশির[১] কি শেখানোই শিখিয়েছে। আমি একটি দিন মাত্র দেখেছি, সেদিন আবার ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়ে শরীরটা পীড়িত হয়ে ছিল। তবু চমৎকার লেগেছিল।

কাশির বুড়ীমা[২] আমার মায়ের মত, দেখা করতে ভারি ইচ্ছে করে। কিন্তু এদিকে আমিও তাঁর চেয়ে কম বুড়ো নই। আর জলে জলে এ অঞ্চলের কাদার ভিতরের দুর্গম রাস্তাটি মনে হলে আর পা বাড়াবার ভরসা থাকে না। একটুখানি রাস্তাঘাট শুখলেই বোধ হয় যাবো। কিন্তু তোমাদের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ত সোজা নয়। যার বয়স কম তার সঙ্গেও যেমন, যার বয়স বেশি তাঁর সঙ্গেও তেমনি, এই কথাটা মনে হলেই মন যেন ছোট্ট হয়ে আসে। দুর্ভাগ্য। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি—২৩শে ভাদ্র ১৩৩৪

তোমাদের বড়দা

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধে, তোমার চিঠি এবং চিঠির মারফৎ তোমার বিজয়ার প্রণাম এসে যথাস্থানে পৌঁছেচে। বোড়শী দেখে খুসি হয়েছ শুনে আমিও খুসি হোলাম। বাস্তবিক কি চমৎকার অভিনয় করে শিশির। আরও চমৎকার তার শেখানোর পদ্ধতি।···অদ্ভুত ধৈর্য্যের সঙ্গে শিশির শেষের লক্ষ্যটায় লেগে থাকতে পারে।···তারই বাহাদুরি।

আমার লেখা "সাহিত্যের রীতিনীতি" পড়ে তুমি ক্ষুণ্ণ হয়েছো লিখেচো। তোমার মনে হয়েচে যে রবিবাবুকে আমি অযথা কটূক্তি করেছি। কিন্তু কোথায় যে শ্লেষ অথবা বিদ্রূপ আছে লেখাটা আরও একবার পড়েও ত আমি খুঁজে পেলাম না। তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করি—আমার গুরুস্থানীয় তিনি এত তুমি জানোই। তবে হয়ত লেখার দোষে বা বলতে চেয়েছি বলতে পারিনি—আর এক রকমের অর্থ হয়ে গেছে। দোষ যদি কিছু হয়েও থাকে সে আমার অক্ষমতার, আমার অন্তরের নয়।

তোমরা একটা কথা তেমন জানো না যে আমার ভাষার ওপরে অধিকার সত্যিই কম। বিনয়ের জন্যে বলছিনে, তোমার মত আত্মীয়ার কাছে মিছে বিনয় করে লাভ কি বলত? তবুও বলচি এ কথা আমার যথার্থই মনের কথা। ভাষার ওপরে দখল এতই অল্প যে দু ছত্র কবিতা পর্য্যন্ত মেলাতে পারিনে,—কথা খুঁজে পাইনে। তাই যে কেউ যেমন তেমন কবিতা লিখলেও বিস্মিত হয়ে যাই। এই কারণেই বলতে চাইলাম এক, আর হয়ে গেল অন্য। তোমরা দুঃখিত হয়ে ভেবে নিলে—দাদা বুড়ো মানুষ হয়েও আর এক বুড়োকে আক্রমণ করেছে।

সে যাই হোক, নবীন লেখকদের প্রতি আমার আন্তরিক

(১) শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী।

(২) এই বুড়ীমা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের কাশীর স্নেহভাজন বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রী এক জায়গায় লিখেছেন—"বুড়ীমা সম্বন্ধে দাদা (শরৎচন্দ্র) একবার লিখিয়েছিলেন—'বুড়ীমা দুঃখে পড়ে একদিন আমার ছেলে বলেছিলেন—এখন কাশীতে আছেন···ঠিকানায় খোঁজ নিও। বুড়ীমা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে ও বধূ ছিলেন, বালবিধবা। বেশ পড়াশুনা ছিল—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনেক গল্প করিতেন। খুব ভালো তৈরী করিতে পারিতেন ও খাওয়াইতেন।'"

শরৎচন্দ্র এই হরিদাস শাস্ত্রীর হাত দিয়ে তাঁর বুড়ীমার জন্য মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন।

বুড়ীমা ছিলেন আবার নরেন্দ্র দেবের মা'র বান্ধবী। নরেন্দ্র দেবের মা এঁর সঙ্গে পাটচারি পাতিয়েছিলেন। নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণি দেবী তাই বুড়ীমাকে পাটচারি-মা বলে ডাকতেন।

স্নেহ এবং টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই বলে তাদের লোকসমাজে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত ব্যথা লাগে। তা ছাড়া কত বড় অন্যায় অপবাদ তাদের দেওয়া হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয় এরা গরীব বলেই এই সব নোংরা ব্যাপার ঘাঁটাঘাঁটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি ভাল করেই জানি বিরুদ্ধ-দলের লোকেরা এই রকমই কথা বলে বেড়ায়।

কোনদিন যদি তোমার বড়দাকে ভাল করে জানতে পারো ত বুঝবে—বিদ্বেষ বলে জিনিসটা তার মধ্যে নেই বললেও অতিশয়োক্তি হবে না। একটা কথা তোমাকে জানাই, কাউকে বোলো না। পথের দাবী যখন বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল তখন রবিবাবুকে গিয়ে বলি যে আপনি যদি একটা প্রতিবাদ করেন ত একটা কাজ হয় যে পৃথিবীর লোকে জানতে পারে যে গভর্ণমেণ্ট কি রকম সাহিত্যের প্রতি অবিচার করেছে। অবশ্য বই আমার সঞ্জীবিত হবে না, ইংরাজ সে পাত্রই নয়। তবু সংসারের লোকে খবরটা পাবে। তাঁকে বই দিয়ে আসি। তিনি জবাবে আমাকে লেখেন—"পৃথিবী ঘুরে ঘুরে দেখলাম ইংরাজ রাজশক্তির মত সহিষ্ণু এবং ক্ষমাশীল রাজশক্তি আর নেই। তোমার বই পড়লে পাঠকের মন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। তোমার বই চাপা দিয়ে তোমাকে কিছু না বলা, তোমাকে প্রায় ক্ষমা করা। এই ক্ষমার উপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্টকে যা'তা' নিন্দাবাদ করা সাহসের বিড়ম্বনা।"[১]

ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পারে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার মতলবেই দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই ভয়ে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেট্‌সম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেদের বিনা-বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেচে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হয়ে যাবে। ঠিক বলতে পারিনে হয়ত এই কথা - আমার মনের মধ্যে অলক্ষ্যে ছিল যখন সাহিত্যের রীতিনীতি লিখি। তাতেই বোধ হয় কোথাও কোন বায়গায় একটু আধটু তীব্রতার ঝাঁক এসে গেছে। যাই হোক্ যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি ভাই? তুমি একটু সারলে কি? অর সারলো? ইতি—১০ই অক্টোবর ১৯২৭

বড়দাদা

---

(১) এখানে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিঠিটিই উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক। অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্যের হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজরাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে, সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজরাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজরাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েচে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গবর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজার সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে পায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজরাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোন শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হত না। আমরা ভালো হলে সে হতই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেচে সেখানে এমনিই ঘটেচে—রাজবিরুদ্ধতা আমাকে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই লেখে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখতে তাহলে তার প্রভাব বেশী ও স্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক যেজন্যে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চলতেই থাকবে। দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত তাহলে এই বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য,—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই নষ্ট করে দেওয়া হয়। ইতি—২৭ মা ১৩৩৩

(বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্ত্তিক—পৌষ, ১৩৫১) তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের এই চিঠিখানি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র এর একটি উত্তর লেখেন। শরৎচন্দ্রের উত্তর দেখা হলে তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে এই চিঠিখানি পাঠাতে শরৎচন্দ্রকে একান্তভাবে নিষেধ করেন। শরৎচন্দ্র বন্ধুদের নিষেধ মত চিঠিখানি আর রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন না। শরৎচন্দ্রের সেই চিঠির খসড়াটি আজও শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকটে রয়েছে।

যৌতুক

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(ফরাসী গল্প : গঁ দ্য মোপাঁসা)

মাদামোয়াজেল জাঁা কর্ণিয়ের সঙ্গে সাইমন নোক্রমেঁৎ-এর বিবাহ···খবর শুনে কেউ আশ্চর্য্য হলো না। সাইমন সস্তা এটর্ণিগিরি পাশ করে ব্যবসা খোঁজেছে! সহায়হীন। মস্ত এটর্ণি লাঁকিনিয়ো তার অফিস মায় প্র্যাকটিশ বিক্রী করে ব্যবসা থেকে অবসর নিচ্ছেন—এবং মাদামোয়াজেল জাঁা খুব বড় যে কের মেয়ে···বাপের এক সন্তান···আদরের মেয়ে! মেয়ের বিয়েতে তিনি যৌতুক যা দেবেন, তাতে ছোটখাট একটি ব্যবসা কেনা যায়!

সাইমন দেখতে বেশ সুপুরুষ। স্বাস্থ্য ভালো···চালাক ছোকরা···এটর্ণিগিরিতে দুদিনে সে নাম করেছে। সাকসেস অনিবার্য্য, চেহারার দিছাদে। মাদামোয়াজেলের বুদ্ধি তেমন ধারালো নয়—সহরে-সৌরীনতা তেমন রপ্ত হয়নি···তবে দেখতে ভালো। তাছাড়া বাপের অগাধ ঐশ্বর্য্য···এমন মেয়ের ভালো পাত্রে বিবাহ কেন না হবে?

বিবাহে কী সমারোহ! সারা পরগণা যেন টলমল করে উঠলো। বর আর কন্যাকে ঘিরে সকলের ধন্য-ধন্য রব! উপহারে উপহারে ঘরের কটা টেবিলে যেন পাহাড় জমেছে!···

উৎসবের পর বর এবং বধূ কদিনের জন্য কোথাও একটু ঘুরে আসবে···হনিমুন ট্রিপ!

ঘরের অমায়িক কথা-হাসি···বধূর আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি!···

গ্রামে জন্ম হলেও নোক্রমেঁৎ চাল-চলনে মোটেই গ্রাম্য নয়। চালাক-চতুর ছোকরা। সহরে হাবভাব এমন রপ্ত করেছে দেখলে কে বলবে, গ্রামে জন্ম! ছেলেবেলা থেকেই নোক্রমেঁৎ দৈর্ঘ্যশীল—কোনো বিষয়ে অধীর হতে জানে না! সে বলে, সবুর করতে হয় সব বিষয়ে! সবুরে মেওয়া ফলে! জীবনকে যদি সার্থক সফল করতে চাও, সবুর করো···ধীরে ধীরে চলো!··· তাহলে মনের সব বাসনা সফল করতে পারবে! ধৈর্য্য এবং অনলস সাধনা—ভগবানকে টেনে নামিয়ে আনে মানুষের হাতে··· ভাগ্য কোন্ ছার!

বিবাহ হয়েছে চারদিন···চার দিনেই স্বামীর উপর মাদামের অখণ্ড ভক্তি আর শ্রদ্ধা! শয়নে-স্বপনে শুধু স্বামী আর স্বামী! আদরে-সোহাগে নোক্রমেঁৎকে আচ্ছন্ন রাখতে চায়। স্বামী বসে আছে, মাদাম এসে তার হাঁটুর উপর চেপে বসলো···বসে স্বামীর দুটি কাণ ধরে আবদার—চোখ বোজো···চোখ বুজে মুখ খোলো! স্বামী মুখ খুললো···খুলে চোখ করলো আধ-নিমীলিত! একটা চকোলেট স্বামীর মুখের মধ্যে পুরে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে স্বামীর ঠোঁটে চুমুর পর চুমু! স্বামীকেও সোহাগ করতে হয়। সব সময়ে দুজনে মুখে মুখে বুকে বুকে···সারা দিন সারা রাত···একটি নিমেষ বিরাম নেই।

এক হপ্তা কাটলো। নোক্রমেঁৎ বললে মাদামকে—বলো যদি, চলো সামনের বন্ধলবারে দুজনে পারি যাই।··· কাজ নয়···কর্ম্ম নয়···বন্ধু নয়···বান্ধব নয়···আত্মীয়স্বজন নয়···দুনিয়ার বুকে শুধু তুমি আর আমি···কপোত-কপোতীর মত···প্রেমিক আর প্রেমিকা! ভালো হোটেলে থাকবো। ঘুরে ঘুরে কত কি দেখবো। থিয়েটারে যাবো—কনসার্ট-হলে যাবো, যেখানে খুশি!

শুনে মাদাম আনন্দে বিহ্বল! মাদাম বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চলো যত শিগগির হয়···

স্বামীর ভ্রূ চলো কুঞ্চিত! স্বামী বললে—তোমাকে পেয়ে

কত সাধ আমার মনে জাগে! যদি আমার অঢেল পয়সা থাকতো!

মাদাম তাকালো স্বামীর পানে—দুচোখে অধীর দৃষ্টি!

নিশ্বাস ফেলে নোক্রমেঁৎ বললে—তোমার বাবা যদি আমাদের এ বিয়ের যৌতুকের সব টাকাগুলো এখন দিতেন!

মাদাম বললে—বাবাকে আমি কাল সকালেই গিয়ে বলবো, বলে যৌতুকের সব টাকা চেয়ে নেবো।

নোক্রমেঁৎ জড়িয়ে ধরলো মাদামের কাঁধ। তারপর সোহাগ-চুম্বনের বন্যায় মাদামকে রাঙিয়ে তুলে সে বললে—এই তো আমোদ করবার সময়···না হলে একবার প্রাকটিশ সুরু করলে···

পরের দিন বাপকে বলে বাপের কাছ থেকে মাদাম নিয়ে এলো যৌতুকের টাকা! যৌতুকের উপর বাবা আরো অনেক টাকা দিলেন—বললেন—বাইরে যাচ্ছিস সঙ্গে রাখিস্।

তার পর মঙ্গলবার প্রেমিক-প্রেমিকার পারি-যাত্রা শ্বশুর-শাশুড়ী ষ্টেশনে এসে বিদায়-সম্ভাষণ জানালে ত।

শ্বশুর বললেন—কিন্তু ভালো করলে না নোক্রমেঁৎ··অত টাকা—সব পার্সে ভরে বুক-পকেটে রাখলে!

নোক্রমেঁৎ বললে—কিছু ভাববেন না···আমার অভ্যাস আছে। জানেন, আমার যা পেশা—কতবার লাখো-লাখো টাকা বয়ে নিয়ে গেছি···কত চাসপাতালের জন্য।···আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না।

ট্রেন ছাড়লো।···কামরায় আরো কজন যাত্রী···মেয়ে পুরুষ যাত্রী।

মাদামের কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে নোক্রমেঁৎ বললে—মুস্কিল হলো, কামরায় এই ভিড়···স্মোক করতে পারছি না।

মাদাম বললে—আমারো ভালো লাগছে না এ ভিড়! তবে তোমার স্মোকিংএর জন্য নয়! কেউ থাকতো না, শুধু আমরা দুজনে! কেমন হতো!

আধ ঘণ্টা পরে একটা ষ্টেশন। ট্রেন থামলো।··নোক্রমেঁৎ বললে—এখনো এক ঘণ্টার পথ! না স্মোক করতে পারছি না তোমার অধর-সুধা···

দু'চোখে হাসির ঝিলিক—মাদাম কাটলো নোক্রমেঁৎ-এর গালে একটা চিমটী, বললে—দুষ্টু!

তার পর সাঁতে নাভারে ষ্টেশন। ট্রেন এখানে অনেকক্ষণ দাঁড়ালো! নোক্রমেঁৎ বললে মাদামকে—চলো, বুফেতে গিয়ে কিছু খেয়ে আসি। তার পর···

মাদাম বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

দুজনে নামলো। বেডিং এবং ট্রাঙ্ক রইলো গাড়ীর কামরায়। ষ্টেশনের বাহিরে এসে নোক্রমেঁৎ বললে—খানিকটা ঘুরে···তা হোক! বাস আছে। বাসে চড়ে গেলে কতক্ষণ বা!

মাদাম বললে—একখানা গাড়ী নিলে কি হয়?

নোক্রমেঁৎ বললে—বাজে খরচ! এখন বিয়ে হয়েছে—সংসার। বাজে খরচ ঠিক চলে না, ডার্লিং। বাসে সামান্য খরচ। গাড়ী নিলে গাওয়া-আদায় দশ-দু খরচ!

মাদামের অপ্রতিভ ভাব! নিশ্বাস ফেলে মাদাম বললে—বেশ, বাসেই তা'হলে!

ঘোড়ায়-টানা মস্ত বাস চলেছে সামনে—তিন-ঘোড়ার যান। নোক্রমেঁৎ হাঁকলো—রোখো, রোখো···

বাস দাঁড়ালো! তরুণ এটর্নি স্ত্রীকে নিয়ে উঠলো বাসে। দোতলা বাস। স্ত্রীকে নীচের তলায় খালি-সীটে বসিয়ে বললে—তুমি এখানে বসো। আমি উপরে বসবো। ছাদ খোলা। একটু স্মোক করতে যাই—না হলে মরে যাবো।

মাদাম নিরুত্তর···কণ্ডাক্টর বললে—বসে পড়ুন, মাদাম, বাস কতক্ষণ দাঁড়াবে?

নিরুপায়! বুকের মধ্যে যা হচ্ছিল···দু চোখের পিছনে জল এসেছে ঠেলে! কিন্তু বাসে লোকজন···চোখে জল সাজে না। অভিমান করে স্বামীকে কিছু বলা—তাও হয় না। অত্যন্ত অসহায়ের মত টলতে টলতে কোনোমতে গিয়ে মাদাম বসলো নীচের তলার এক সীটে···সিঁড়ি বেয়ে নোক্রমেঁৎ টক্-টক্ করে উপরে চলে গেল। বাস চললো।

মাদামের চোখের সামনে কুয়াশার অন্ধকার···পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন কিছু নজরে পড়ে না! বুকের মধ্যে ফুলে ফুলে উঠছে অশ্রুর তরঙ্গ!

সামনের সীটে, পাশের সীটে লোক···মাঝে মাঝে বাস থামছে···আবার চলছে। এই থামা আর চলার ফাঁকে কত লোক নামছে উঠছে, মাদামের সেদিকে লক্ষ্য নাই! সে

যেন অজ্ঞান অচেতন! এক একবার চেতনা জাগছে··· তখন মনে ভাসছে একটি প্রশ্ন—এত দূর? এখনো··· এখনো···

এক-জায়গায় বাস থামলো। হুড়-হুড় করে লোক নামলো।—তার পর···

বাস আর চলে না! বাসে আর কোনো মানুষ নেই। মাদাম একা।···কেন?

কণ্ডাক্টর এলো···এসে বললে—আপনি নামবেন না?

যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া! মাদাম চমকে উঠলো। কণ্ডাকটরের পানে তাকালো।

কণ্ডাকটর বললে—টার্মিনাস। বাস আর যাবে না।

মাদাম বললে—বুলভার্দ—আমরা বুলভার্দে নামবো।

কণ্ডাকটরের দু চোখ এত-বড়! সে বললে—বুলভার্দ! সে তো অনেক আগে পাশ করে' এসেছি।

—পাশ করে' এসেছি?

—হাঁ।

মাদাম উঠে দাঁড়ালো, বললে—আমার স্বামীকে যদি দয়া করে ডেকে দাও···

—আপনার স্বামীকে! তিনি কোথায় আছেন?

—কেন, বাসের উপর-তলায়।

—উপর-তলায়! কণ্ডাক্টর বললে—বাসে কেউ নেই এক আপনি ছাড়া। সকলে নেমে গেছে।

—কেউ নেই!···মাদামের পায়ের নীচে বাসখানা দুলে উঠলো যেন! মাদাম বললে—হতে পারে না। আছেন। ···একসঙ্গে দুজনে বাসে উঠেছি, যাবো বুলভার্দ!··· তুমি স্থাখো একবার···

মাদামের বুক কাঁপছে! কণ্ডাক্টরের বিরক্তি হলো। সে বললে—আপনার সঙ্গে কথা-কাটাকাটির সময় নেই! আপনি দয়া করে' নেমে যান। আমাকে রিপোর্ট করতে হবে আমার ষ্টেশনে।

স্খলিত কণ্ঠে মাদাম বললে—কিন্তু আমার স্বামী?

কণ্ডাকটারের আপাদ-মস্তক জ্বলছে, এমন ব্যাপার সহরে এই নতুন নয়। এর আগে এমনি সাঙ্গোপাঙ্গ-করা কত সুন্দরী বাসে চেপেছে···কণ্ডাক্টর বললে—এত বড় সহরে একটা স্বামী হারিয়ে গিয়ে থাকে, আর একটা খুঁজে নিন —কথাটা বলে' কণ্ডাক্টর দাঁত বার করে হাসলো।

মাদামের দু চোখে বিগলিত ধারা। মাদাম বললে—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একবারটি স্থাখো উপর-তলায়। তাঁর হাতে এত বড় চামড়ার ব্যাগ···

কণ্ডাক্টর বললে—এত বড় ব্যাগ! ওহো···দাঁড়ান দাঁড়ান! বেশ সুন্দর চেহারা ভদ্রলোকের, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এত বড় ব্যাগ···তিনি নেমে গেছেন মান্দেলিনের মোড়ে··· ভুলে গেছেন, আপনি বাসে আছেন···হা-হা-হা-হা···

মাদামের দুনিয়া যেন উবে অদৃশ্য হয়ে গেল! বাসে কে আছে, না আছে এ চিন্তা মন থেকে বিলুপ্ত··· সীটে বসে পড়ে তাঁর কান্না, অশ্রুর বন্যা নামলো চোখে!···কণ্ডাকটর হতবাক, সে নেমে গিয়ে ইন্‌স্‌পেক্টরকে দিলে খবর। বললে—মহা বিপদ! এক কমবয়সী মেয়ে··ভদ্রঘরের মেয়ে! স্বামী হারিয়ে গেছে বাস থেকে···বাসে বসে কাঁদছে!

ইনস্‌পেক্টর এলো। এসে সব কথা শুনে উপদেশ দিলে—পুলিশে খবর দিন। এখানে বসে কাঁদলে তো স্বামীকে পাবেন না!

পথে চলেছে মাদাম···বিহ্বল উন্মাদের দৃষ্টি! কি হয়েছে, বুঝতে পারছে না! চলেছে···শুধু চলেছে···কোথায়, জানে না! কি এখন করবে? জানে না। স্বামী···কি হলো তাঁর? মাদাম বাসে আছে—ভুলে গেলেন?···এমন ভোলা-মন হঠাৎ কেন তাঁর?

কাছে আছে দুটি স্ত্রী।··সম্বল। কোথায় যাবে?

হঠাৎ মনে পড়লো, বারাল···পিসতুতো ভাই বারাল। সে থাকে এই সাঁতে লজার সহরে—মিনিষ্ট্রী আর্মী-নেভিতে কি কাজ করে যেন!

পথ থেকে একখানা গাড়ী নিয়ে সেই গাড়ীতে চড়ে মাদাম এলো বারালের গৃহে। বারাল তখন অফিসে বেরুচ্ছে ···তার হাতে মোটা ব্যাগ।

গাড়ী থেকে প্রায়-লাফিয়ে নেমে পড়লো মাদাম··· রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলো—আঁরি···

সে-আহ্বানে আঁরি থমকে দাঁড়ালো···বললে—আঁ্যা! তুমি হঠাৎ! একা!··কোথায় চলেছো?

দু-চোখে জল কণ্ঠ স্খলিত··মাদাম বললে—ওঁকে পাওয়া যাচ্ছে না! কোথায় হারিয়ে গেছেন!···আমার স্বামী।

—স্বামী হারিয়ে গেছে! কোথা থেকে হারালো?

—দোতলা বাস থেকে।

—বাস থেকে!

সাশ্রুলোচনে স্খলিত কণ্ঠে মাদাম জানালো বৃত্তান্ত।

আঁরি বললে—মনের কোনো এদিক ওদিক ভাবোনি তাঁর?

—না।

—হুঁ!···সঙ্গে টাকা-পয়সা ছিল?

—হ্যাঁ। সিয়ের যৌতুকের সব টাকা।

—যৌতুকের সব টাকা!

—হ্যাঁ। বলেছিলেন, পাসপোর্টের অফিস কেনবার জন্ম কিছু দরকার···

আঁরি কি ভাবলো! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—এখানে তাহলে কোথায় তাকে পাবে? সে তাহলে সরে পড়েছে বেলজিয়ামে।

—কি বলছো আঁরি! স্বামী···সবে বিয়ে হয়েছে।

আঁরি বললে—নিশ্চয়। তার দরকার টাকা···বৌ নয়। টাকা নিয়ে ভেগেছে।

মাদাম চমকে উঠলো···বললে—তাহলে তিনি···তিনি··· তুমি বলছো··

—স্কাউণ্ড্রেল! আঁরি দিলে জবাব।

পথে ভিড় জমেছিল—এমন কম-পয়সী মেয়ে···ভদ্রলোকের মেয়ে···পথে দাঁড়িয়ে···দু চোখে জল! মজা আছে বে!

আঁরি লক্ষ্য করলো, তার গা চিড়বিড়িয়ে উঠলো! মাদামের হাত ধরে সে ফিরলো। বাড়ীর দ্বারে করাঘাত!

চাকর দরজা খুলে দিলে।

আঁরি ঢুকলো মাদামকে নিয়ে বাড়ীতে···চাকরকে বললে—হোটেলে যা—এখনি। দুজনের মতো লাঞ্চ···এখনি নিয়ে আয়। আজ আমি অফিসে যাবো না।

শ্যামাপ্রসাদের মহাপ্রয়াণ

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

মাতৃভূমির ভাগ্যাকাশে আষাঢ় অশনিপাত হইয়া গেল। শ্যামাপ্রসাদ আর ইহজগতে নাই। ২৩শে জুন গভীর রাত্রে ৩-৪০ মিনিটের সময় শ্রীনগরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে সংকটকালে ভারত রক্ষা করিয়াছে। তাহার জন্ম জীবনপাত ও অর্থব্যয় করিয়াছে প্রচুর। অথচ অন্যান্য রাজ্যের মত কাশ্মীর রাজ্য এখনও ভারতভুক্ত নহে, স্বতন্ত্র মর্যাদা লইয়া জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের রক্ষণাধীনে থাকিয়াও স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে। ভারতের নাগরিক তথায় অবাধে প্রবেশ করিতে পারে না। সেখানে প্রবেশের জন্ম দেশরক্ষা-বিভাগ হইতে অনুমতি-পত্র গ্রহণ করিতে হয়। বিদ্রোহী শ্যামাপ্রসাদ চাহিয়াছিলেন, এই সামঞ্জস্যবিহীন ব্যবস্থার প্রতিকার। নীতিগত কারণে তিনি এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়া বিনা পারমিটে কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী গত ১১ই মে তারিখে তিনি উক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া দুই মাইল অগ্রসর হইয়া লখিমপুরে গিয়া উপনীত হন। তথায় কাশ্মীর রাজ্যের পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে এবং সেখান হইতে প্রথমে তাঁহাকে জম্মুতে ও পরদিন শ্রীনগরে লইয়া যায়। ইহার পর শ্রীনগর হইতে কয়েক মাইল দূরে ডাল হ্রদের তীরে নিশাতবাগের উপরে শীলাব ছিল নামক এক বাংলোকে সাব জেলে পরিণত করিয়া তথায় তাঁহাকে বিনা বিচারে অন্তরীণাবদ্ধ করা হয়।

গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন পর হইতেই নাকি শ্যামাপ্রসাদের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে—মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে থাকে। মৃত্যুর কয়েকদিবস পূর্বে তাঁহার শরীরে হৃদ্‌রিসির আক্রমণ প্রকাশ পায়। তাঁহার মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা এইভাবে গুরুতররূপে পীড়িত হওয়া সত্ত্বেও যে সংবাদ সাধারণে প্রকাশ করা হয় না। তাঁহার মৃত্যুর পর জম্মু-কাশ্মীর সরকারের প্রচারিত ইস্তাহার হইতে জানা যায় যে, ২২শে জুন প্রাতে শুষ্ক হৃদ্‌রিসির আক্রমণের জন্ম ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ লইয়া বক্ষঃস্থলে হৃদ্‌যন্ত্রের উপরিভাগে দুই মিনিটকাল যন্ত্রণা অনুভব করেন এবং উহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রক্তের চাপ হ্রাস পাইয়া সাধারণ দুর্বলতার ভাব বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসাদির পর তাঁহার অবস্থার নাকি খানিকটা উন্নতি হয়। বাংলো হইতে লইয়া সিভিল হোমে। সেখানে জনকয়েক চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করেন। পরীক্ষার পর জানা যায় তিনি করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন।

চিকিৎসাধির পর তাঁহাকে মানিকটা সুস্থ বলিয়া বোধ হয়। রাত্রি ৭-৩০ মিনিটে বেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের কৌসুলি শ্রীত্রিবেণী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কৌসুলিকে তিনি কতকগুলি বিষয় লিখাইয়া দেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করেন।

রাত্রি ৯টার পর হইতে পুনরায় তাঁহার অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। রাত্রি ১১টায় তাঁহার বমণ এতই বৃদ্ধি পায় যে তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকেন—হৃদ্‌যন্ত্রের চাপ ক্রমে হ্রাস পায়। রাত্রি ১টায় তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের চতুষ্পার্শ্বে বমণ হইতে থাকে। রাত্রি ২-৩০ মিনিট সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ির স্পন্দন অনুভব করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এইভাবে

অন্তিমশয়নে শ্যামাপ্রসাদ ফটো—পাত্রা সেন

চলিতে চলিতে রাত্রি ৩-৪০ মিনিটের সময় তাঁহার নাড়ির গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

২৩শে জুন, মঙ্গলবার সকাল ৪-৩৫ মিনিট সময়ে শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার সর্বপ্রথম এই মৃত্যুর সংবাদ অবগত হন। ইনসর হইতে ট্রাঙ্ক কলে তাঁহাকে শ্যামাপ্রসাদের পরলোকগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে সাধারণো সংবাদটি প্রচারিত হয় এবং জনসাধারণ তাহাদের প্রিয় নেতার এই আকস্মিক বিয়োগ-সংবাদে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সমস্ত কর্মচাঞ্চল্য স্তব্ধ হইয়া যায়। শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ সিমলাপোর্টে কলিকাতার আগমনের সংবাদ শুনিয়া অগণিত জনগণ ভগ্নপ্রায়াকুলতায় তাঁহার শেষ দর্শন লাভের আশায় অপেক্ষা করিতে থাকে।

কলিকাতার যে সকল পথ বাহিয়া ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ লইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা, অপরাহ্ণকাল হইতেই সেই সকল রাজপথ ও উহার পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ দর্শনার্থী নরনারীতে পূর্ণ হইয়া যায়। শবদেহ বিমানঘাটে পৌঁছিতে পূর্বনির্ধারিত সময় অপেক্ষা বহু বিলম্ব ঘটে। রাত্রি ৯টার সময় ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজের একখানি বিশেষ বিমান ডাঃ শ্যামা-প্রসাদের শবদেহ লইয়া দমদম বিমান-ঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছায়। এক বিরাট জনতা পুলিশ-বেষ্টনীর বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। "শঙ্খমাতরম্‌", "শ্যামাপ্রসাদ কী জয়" প্রভৃতি ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া যায়।

ললাটে চন্দনপঙ্ক অঙ্কিত করিয়া বিমানের ভিতর হইতে লাল রেশমি চাদরে আবৃত মৃতদেহটি ষ্ট্রেচারে করিয়া নামাইয়া আনা হয়। একটি খোলা ট্রাকে বহুজনপ্রদত্ত পুষ্পাধার শয্যায় দেহটি স্থাপন করিয়া রাত্রি ১-৩০ মিনিট সময়ে বিমান-ঘাঁটি হইতে এক বিরাট শোকযাত্রা অতঃপর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ভিড় এতই অধিক হয় যে শোকযাত্রাটি শ্যামবাজারের মোড়ে পৌঁছাইতেই রাত্রি ১টা বাজিয়া যায়। সেই গভীর রাত্রিতেও পথের দুই পার্শ্বে ও অট্টালিকাসমূহে সহস্র সহস্র নর-নারী শেষ দর্শনের আশায় অপেক্ষা করিতেছিল। বিস্তির পথ পরিভ্রমণ করিয়া শোকযাত্রাটি শেষ রাত্রে ৪-৩০ মিনিটে শ্যামাপ্রসাদের বাসভবনে গিয়া উপনীত হয় এবং বিশ্বতলার বরদালানে সাধারণের দর্শনের সুবিধার্থ শবদেহটি কয়েক ঘণ্টা রক্ষিত থাকে।

২৪শে জুন, বুধবার বেলা ১১টার সময় শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ একটি পালংকে স্থাপন করিয়া তাঁহার বাসভবন হইতে পুনরায় শোকযাত্রা বাহির হয়। নানা পথ অতিক্রমণের পর মধ্যাহ্ন ১-৩০ মিনিটে উহা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে গিয়া পৌঁছায়। বেলবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিসৌধের সম্মুখেই চিতাশয্যা রচিত ছিল। শ্যামাপ্রসাদের নশ্বর দেহটি তাহাতে স্থাপন করিয়া বেলা ২-১৫ মিনিটের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আনুষ্ঠানিকভাবে মুখাগ্নি সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ চিতায় অগ্নি নির্বাপিত হয়। এই সময় প্রকৃতিও প্রবল বর্ষণের দ্বারা চিতায় শান্তিবারি সিঞ্চন করে। নগরীর কর্মচাঞ্চল্য এই দিনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং সহযন্ত্রী শ্রীটেকচাঁদ শর্মা এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, সোমবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে জানান যে, তিনি তাঁহার মাতৃদেবীর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জননী আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পুত্রকে সম্ভবত আর দেখিতে পাইবেন না। ঐ দিনই রাত্রি ১টার সময় তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পাইবার পূর্ব তিনি মাত্র কয়েকবার 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। সংজ্ঞালোপের পূর্বেও মধ্য-রাত্রে সেবারতা নার্সকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"মা'র স্নেহ অতি গভীর, জগতে সে স্নেহের তুলনা হয় না। এই সময় মা আমার কাছে থাকলে ভাল হ'ত।" শ্যামাপ্রসাদের মাতৃদেবীর বর্তমান বয়স

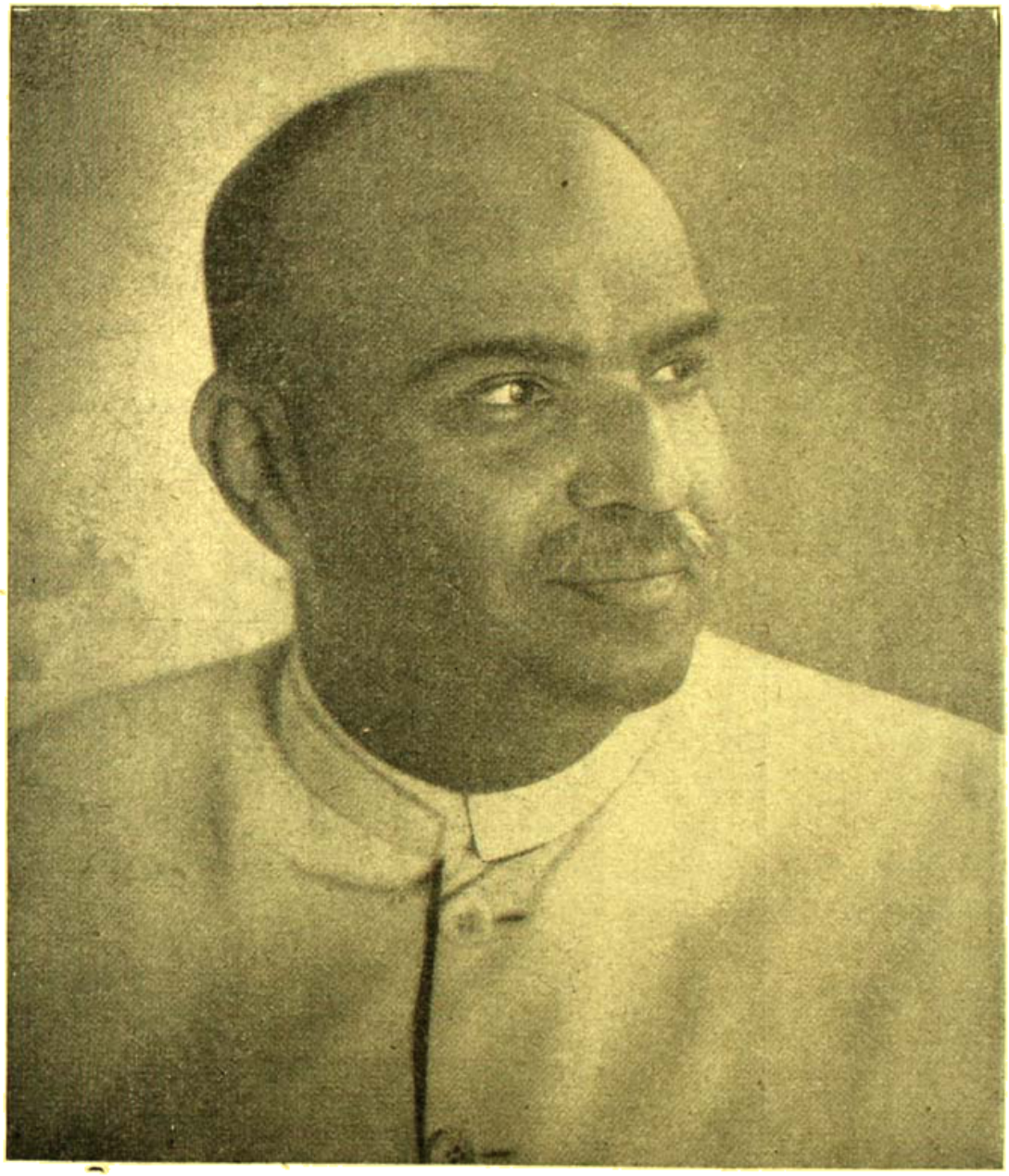

[illegible] ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

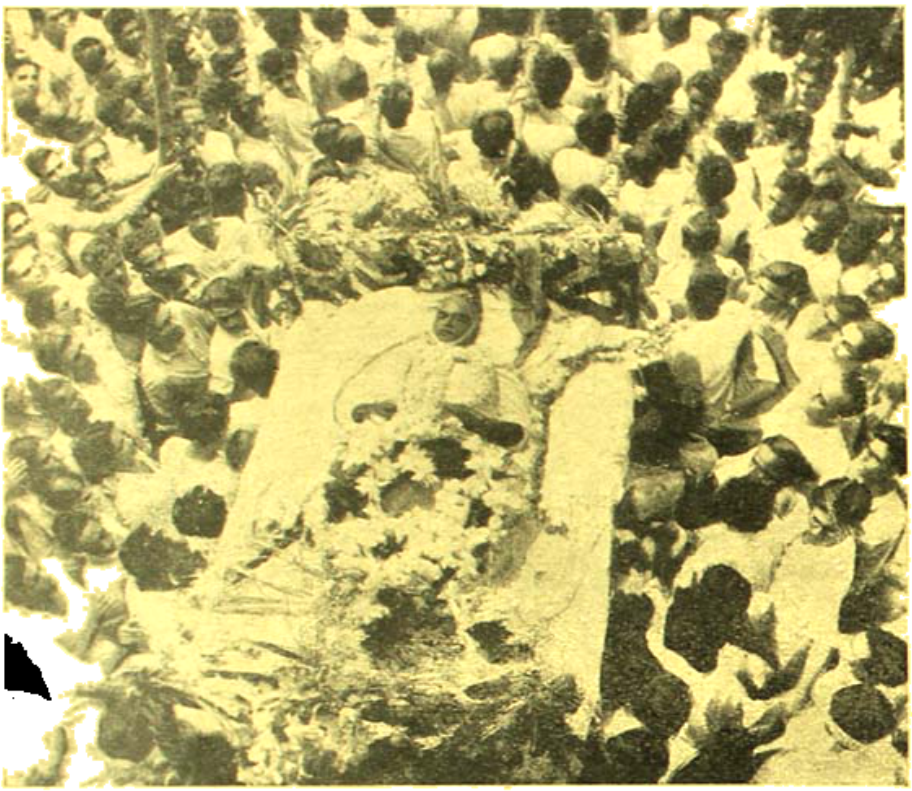

[চিত্রনিয়ন্ত্রক কর্তৃক ভারতরক্ষা আইনানুসারে পরীক্ষিত

আশুতোষ মুখার্জী রোডস্থ বাস-ভবন হইতে কেওড়াতলা শ্মশান অভিমুখে

ফটো—পাল্লা সেন

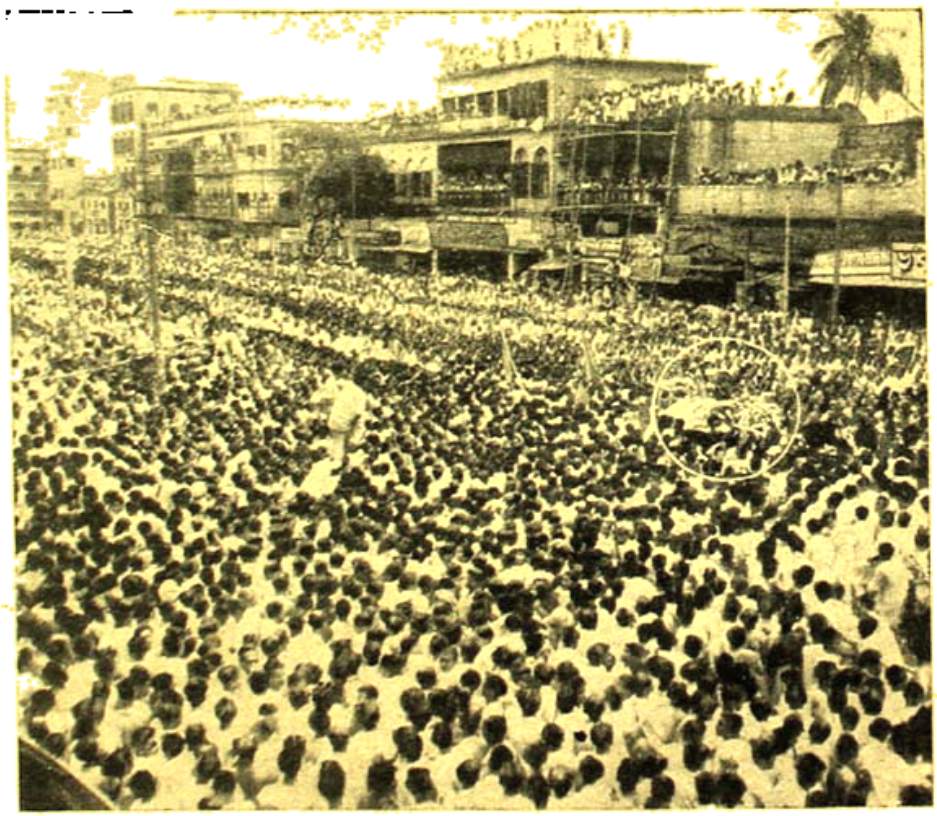

যাত্রার পূর্ব্ব

পূত চিতাগ্নি আনে শবাধার

পুষ্পমাল্য

ফটো—পাল্লা সেন

৮২ বৎসর। মঙ্গলবার শ্যামাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন বৃদ্ধা জননীকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করেন, তখন প্রথমে তিনি কথাটি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন,—"শ্যামাকে ছেড়ে দিয়েছে?" তখন সংবাদটি পুনরায় তাঁহাকে জানান হয় এবং শুনিয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বুধবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সাম্বলা জানাইতে গিয়া নিজেই কাঁদিয়া আকুল হইয়া পড়েন। শ্যামাপ্রসাদের শোকাতুরা জননী রাজ্যপালকে দেখিয়া বলিয়া উঠেন, "হরেন, তুমি কি কাঁদতে এসেছ? আমার ছেলেকে কি এনে দিতে পারবে? বিধান আমার ছেলের মত। ওর মত এতবড় ডাক্তার থাকতেও আমার ছেলে এইভাবে এক রকম বিনা চিকিৎসাতেই গেল। আমার ছেলের অসুখ, অথচ তা আমাকে একবার জানানও হ'ল না। আমি এর বিচার চাই।"

বাটী হইতে শেষ-যাত্রার পূর্বে এক মর্মন্তুদ দৃশ্যের অবতারণা হয়। শোকবিহ্বলা বৃদ্ধা জননী শ্যামাপ্রসাদের শবদেহ বাড়িতে চাহেন না। অবরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কেবলই বলিতে থাকেন, তাঁহার প্রাণপ্রিয় শ্যামাপ্রসাদকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারিবেন না। তাঁহার অন্যান্য পুত্রগণ তখন তাঁহাকে কোলে করিয়া অন্য কক্ষে লইয়া যান। তখন তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। এইভাবেই কয়েকদিন চলিতে থাকে। কয়েকদিন ধরিয়া কেহ তাঁহাকে এক ফোঁটা জলও খাওয়াইতে পারে নাই।

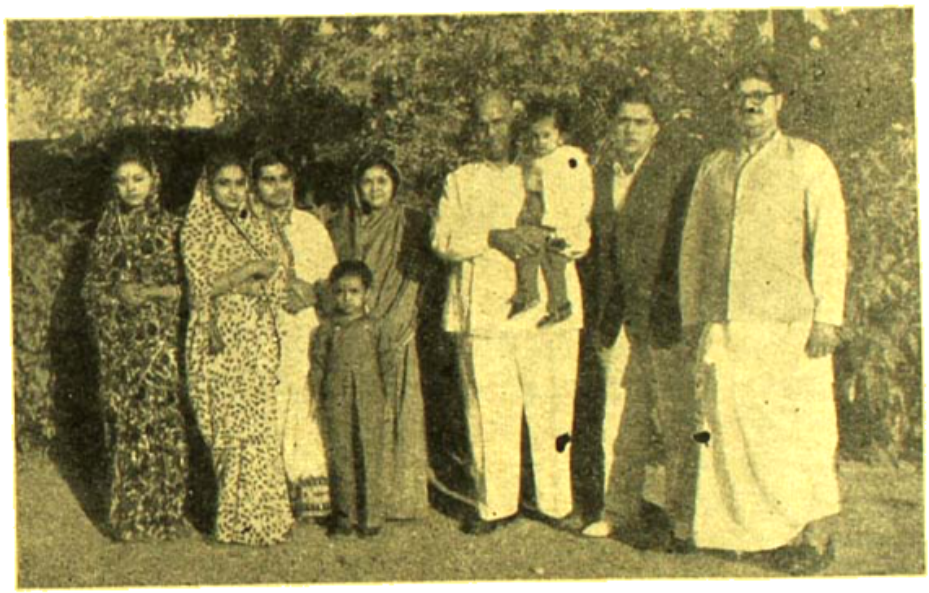

পরিবারবর্গের মধ্যে দণ্ডায়মান শ্যামাপ্রসাদ ফটো—পাল ব্রাদার্স

জীবন-কথা

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রাতঃস্মরণীয় মনীষী স্বর্গত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার জননীর নাম যোগমায়া দেবী। ১৯০১ সালের জুলাই মাসে শ্যামাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। আশুতোষের চার পুত্র,—রমাপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ, উমাপ্রসাদ ও মায়াপ্রসাদ—এবং তিন কন্যা। শ্যামাপ্রসাদ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গভাষার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তিনি এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে আইনের পরীক্ষায় বি-এল্ ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে যান এবং সেখান হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসেন। পরবর্তীকালে কলিকাতা ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ডি-লিট্ উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পৌত্রী ও মেডিকেল কলেজের লেকচারার ডাঃ বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুধা দেবীর সহিত তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে সুধা দেবী লোকান্তরিতা হন। শ্যামাপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম অমুতোষ ও বেলাতোষ এবং কন্যাদ্বয়ের নাম রমিতা দেবী ও অরুন্ধতি দেবী।

১৯২৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালে আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বান অনুযায়ী তিনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন। পরে পুনরায় আইন-সভায় প্রবেশ করিয়া তিনি আইন-সভার কাযে গঠনমূলক বিচার-বুদ্ধি, আইন-জ্ঞান ও বাগ্মিতার পরিচয় দেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার পদে বৃত হওয়ার সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বৎসর। আর কোনও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কোনও ব্যক্তি অত অল্প বয়সে ভাইস্ চ্যান্সেলারের পদ লাভ করেন নাই। ১৯৩৬ সালেও তিনি পুনর্বার উক্ত পদে নির্বাচিত হন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অধ্যক্ষের পদেও এই সময় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় এই সময় উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ নবগঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই তাঁহার পাণ্ডিত্য, বিচক্ষণতা, দেশপ্রেম ও বাগ্মিতা তাঁহার দেশবাসীকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে এবং স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি দেশের আশা ও ভরসার পাত্র হইয়া দাঁড়ান। মুসলিম লিগের উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলে হিন্দুদের স্বার্থসংরক্ষণার্থীও বিপন্ন হইতে দেখিয়া তাহাদের স্বার্থ-সংরক্ষণে তিনি যত্নবান হন এবং হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়া তিনি নির্বাচিত হন উহার ওয়ার্কিং

প্রেসিডেন্ট। এই সময় হইতেই ভারতের নানাস্থানে ব্যাপকভাবে তাঁহার বক্তৃতা সুরু হয়।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে মৌলবী ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাঙলায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে শ্যামাপ্রসাদ অর্থ-বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। বিহারের ভাগলপুরে এই সময় নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। বিহারে তখন ডক্টর সিংহের শাসন। বিহারে উক্ত অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ আদেশ অমান্য করিয়া অধিবেশনে যোগদানের জন্য গমন করেন। বিহারে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে আটক করা হয়।

১৯৪২ সালে আগষ্ট-বিপ্লবের সময় মেদিনীপুরের জনগণের উপর যে বর্বর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহার প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ অর্থ-মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ময়দানস্থ পার্কের এক সভায় তাঁহার মন্ত্রিত্ব ত্যাগের কারণ বর্ণন করিয়া যে আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি দেশপ্রেম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। ১৯৪৩ সালে যখন বঙ্গদেশ ইংরাজগণই ভাবের দুর্ভিক্ষে বিপন্ন হইয়াছিল, তখন শ্যামাপ্রসাদই অগ্রণী হইয়া সেই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়নের নিবারক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে সেবার তুলনা হয় না।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। যুদ্ধ শেষে ১৯৪৬ সালে আইন-সভাসমূহের নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে শ্যামাপ্রসাদ পুনঃ বাঙলার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। স্বাধীনতালাভের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভায় শ্যামাপ্রসাদ শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। গণ-পরিষদের সদস্য-রূপে নূতন ভারতীয় সংবিধান রচনায় তাঁহার অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দুগণের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ এবং তাহার প্রতি-বিধান কল্পে সম্পাদিত অন্যায়পূর্ণ নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তির প্রতিবাদে এপ্রিল মাসে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে ভারত-সরকারের 'দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত ও সারবত্তাহীন' মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পর কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের এক বিরাট জনসভায় নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। এই সময় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুত্যাগীদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৫১ সালে শ্যামাপ্রসাদ 'ন্যাশনাল পার্টি' নামে এক রাজনৈতিক দল সংগঠিত করিলে দেশের নানা স্থান হইতে উহা সমর্থন লাভ করে। অতঃপর বিভিন্ন দলের সমবায়ে ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে দিল্লীতে তাঁহার নেতৃত্বে "নিখিল ভারত জনসঙ্ঘ" নামে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।

বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি হন তিনি ১৯৪৯ সালে। ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে কলিকাতার গড়ের মাঠে এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানে ভারত-সরকারের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের হস্তে ভগবান বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যদ্বয় সারিপুত্ত ও মহামোগ্গলায়নের পূতাস্থি অর্পণ করেন। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি মহাবোধি সোসাইটির সভাপতিরূপে সাঁচীতে উক্ত শিষ্যদ্বয়ের পূতাস্থি স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

১৯৫২ সালে প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা দক্ষিণ-পূর্ব নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে জনসংঘের প্রার্থী হিসাবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। আইন-সভায় তিনি ছিলেন এক শক্তিশালী বিরোধী দলের নেতা। তাঁহার বক্তব্যের যুক্তিযত্তা কেহই অস্বীকার করিতে পারিত না—তাঁহার বাগ্মিতায় সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। সরকার পক্ষের উপরও তাঁহার বক্তৃতার প্রভাব বিস্তৃত হইত।

শ্যামাপ্রসাদের কর্মবহুল জীবনের পূর্ণ পরিচয় প্রদান প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। কত প্রতিষ্ঠানের সহিত যে তিনি সংযুক্ত ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। সংবাদপত্র পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়া-ছিলেন, সেগুলির নাম,—'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'A Phase of Indian Struggle', 'বঙ্কিম-পরিচয়' (সম্পাদিত) প্রভৃতি। 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' গ্রন্থখানির প্রচার ইংরাজ সরকার কিছু দিন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত ভারতভুক্ত করিবার দাবী করিয়া জম্মুর প্রজা পরিষদ যে আন্দোলন শুরু করেন, সেই আন্দোলনের সমর্থনে ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে সভা-শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। সরকার পক্ষ সভা-শোভাযাত্রাদি নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারি করেন। শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা সম্পর্কিত উক্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেন, ফলশ্রুতিস্বরূপ আইনে সেজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁহাকে কিন্তু মুক্তিদান করেন।

ইহার পর কাশ্মীর সমস্যা লইয়া লোকসভায় শ্যামাপ্রসাদের সহিত প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহরুর তীব্র বাক্‌যুদ্ধ হয় এবং উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে পত্রের আদান-প্রদানও চলে। কাশ্মীরকে রক্ষা করিতে বিপুল লোকক্ষয় ও অর্থব্যয় হওয়া সত্ত্বেও উহাকে ভারতভুক্ত না করিয়া কাশ্মীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনও সার্থকতা তিনি খুঁজিয়া পান নাই। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ যে কোনও ভারতীয় নাগরিক পূর্ব অনুমতি না লইয়া কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। তেজস্বী শ্যামাপ্রসাদ এই পারমিট ব্যবস্থা অমান্য করিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া ভারত ও কাশ্মীর রাজ্যের কৃত্রিম ব্যবধান বিলুপ্ত করিতে চান এবং তদনুযায়ী কার্য করেন। ইহারই ফলে গ্রেপ্তার হইয়া তাঁহাকে বিনা বিচারে আবদ্ধ থাকিতে হয় এবং তাঁহার বন্দী অবস্থাতেই এই মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া যায়।

পুরুষসিংহ শ্যামাপ্রসাদ কখনও অন্যায়ের নিকট মাথা নীচু করেন

নাই। মনুষ্যত্ব যেখানেই নির্যাতিত হইয়াছে, মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার হইয়াছে ক্ষুণ্ণ, উচিত হইয়াছে বিপর্যস্ত ও লাঞ্ছিত মানবাত্মার করুণ আর্তনাদ—সেইখানেই তিনি অনন্যমনীয় দৃঢ়তায় তাহার প্রতিকারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সেইখানেই ধ্বনিত হইয়াছে তাঁহার বজ্রকঠোর কণ্ঠস্বর। পদমর্যাদার মোহ তাঁহার বিবেকবুদ্ধিকে কখনও আচ্ছন্ন করে নাই। স্বর্গত পিতার মতই তিনি যুগপৎ কঠোরতা ও কোমলতার প্রতীক ছিলেন। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্রের মত কঠোর—আবার ভাগ্যবিপর্যয়ে পতিত মনুষ্যের প্রতি তিনি ছিলেন কুসুমেরই মত মৃদু। তাঁহার স্থান ছিল সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বহু উর্ধ্বে। তাঁহার উদার, অকপট, অমায়িক ব্যবহারে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। তাঁহার দেশসেবা জনচিত্তে তাঁহাকে অক্ষয় অমরত্বের অধিকারী করিয়াছে। তাঁহার সমগ্র জীবন কর্ম ও কর্তব্যের অনুশীলন ব্যতীত আর কিছুই নয়। কাশ্মীরে তাঁহার জীবনাবসান আদর্শের নিকট আত্মবলি। দধীচির মত অস্থিদান করিয়া কাশ্মীরের ভারত-মুক্তির আদর্শকে তিনি জনমনোলোকে শাশ্বত প্রতিষ্ঠা দিয়া গিয়াছেন।

আজ শ্যামাপ্রসাদ নাই। তাঁহার আকস্মিক অকাল বিয়োগে শুধু বাঙলাতেই নয়—সমগ্র ভারতে স্বতঃস্ফূর্ত শোকোচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতি আজ একান্তভাবেই নেতৃহীন হইল। সংকটের অমানিশায় আর কেহ তাঁহার আশাবর্তিকা তুলিতে পাইবে না। যে পরিস্থিতির মধ্যে শোচনীয়ভাবে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল—তাহারই আক্ষেপ আজ সর্বাপেক্ষা অধিক। তাঁহার সহিত কাহাকেও সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইত না, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পান নাই। তাঁহার কৌন্সুলিকে পর্যন্ত তাঁহার সহিত একাকী সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হইত না। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য সম্পর্কেও রহস্যময় গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থা উপযুক্ত হইয়াছিল কিনা, তাহা লইয়াও আজ যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ হইয়াছে। কাশ্মীরের মত একটি অনগ্রসর অঞ্চলে তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবস্থায় যে স্বাভাবিকভাবেই ত্রুটি হওয়া সম্ভব, ইহাও অনুমান করা কঠিন নয়। অশ্রুপ্লাবিত ঔদাসীন্য ও কঠোরতার মধ্যে তাঁহার মত একজন সর্বভারতীয় নেতার অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদের আত্মদানের পর আজ স্বাধীন ভারত-সরকারেরও ভাবিবার সময় আসিয়াছে, ভারতকে তাঁহারা কোথায় লইয়া যাইতেছেন।

। শ্যামাপ্রসাদের অমর আত্মা শান্তিলাভ করুন ।

মমতাময়ী হাসপাতাল

মন্মথ রায়

তৃতীয় দৃশ্য

হাসপাতালের অফিস ঘরে মেডিকেল কমিশন বসিয়াছে। মেডিকেল কমিশনে আছেন—ডাঃ বোস, ডাঃ পাকুড়ী এবং কমিশনের চেয়ারম্যান ডাঃ চক্রবর্তী। কমিশনের সামনে পরীক্ষার জন্য দীনদয়ালকে আনা হইয়াছে। তাঁহার হাতের হাতকড়া খোলা। জয়ন্ত, জয়া ও ভুজঙ্গ উৎসুকভাবে কমিশনের অভিমত জানিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছেন—হাসপাতালের ট্রাস্টিগণ, কয়েকজন নার্স এবং হলঘর প্রভৃতি কতিপয় রোগী। জয়া যেখানে বসিয়াছে তাহার পাশে একটি স্ট্রেচার রহিয়াছে। দীনদয়াল সাজাহানরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সমবেত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন।

দীনদয়াল ॥ মুঘল দরবারের সম্মানিত আমির ওমরাহ ও সভাসদগণ! বিদ্রোহী পুত্র ঔরংজীবের হস্তে—আমি ভারত সম্রাট সাজাহান—আজ বন্দী। দুনিয়ায় এত বড় অনাচার—এত বড় অবিচার তোমরা স্বচক্ষে দেখেও নীরবে সহ্য করছো? একটি কণ্ঠেও প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে না? এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলিত হচ্ছে না! খোদা—দীন দুনিয়ার মালেক—তুমিও চুপ ক'রে বসে আছ? কোথায় তোমার বজ্র, কোথায় তোমার ভূমিকম্প—কোথায় তোমার জলপ্লাবন? ধ্বংস কর—ধ্বংস কর—এই অভিশপ্ত পৃথিবীকে তুমি ধ্বংস কর।

জয়া ॥ বাবা! বাবা!

জয়ন্ত ॥ আপনি শান্ত হোন বাবা!

দীনদয়াল ॥ কে? জাহানারা! শান্ত হ'তে বলছিস! জীবনে এখনো তোদের লোভ! মিথ্যা আশা দারা—রূপা আশা জাহানারা! (ভুজঙ্গকে দেখাইয়া) ঐ ঔরংজীব—ও যে কত ভীষণ—কী নির্মম—কী নৃশংস—কত বড় শয়তান—তা তোরা আজও বুঝতে পারিস নি দারা, বুঝতে পারিস নি জাহানারা। নইলে পুত্র হয়ে স্নেহান্ধ পিতাকে বন্দী করে? ভ্রাতৃ রক্তের পিপাসায় উন্মাদ হয়? মাতার স্মৃতি—অক্ষয় প্রেমের পুণ্যপ্রতীক পবিত্র তাজমহল উৎসাদন করে? আজ কোথায় আমার তাজমহল?

বারান্দার দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে

যমুনার পরপারে কোথায় আমার তাজমহল? নাই—নাই—যতদূর দৃষ্টি চলে—কই? কোথায়? দেখি—(নিরীক্ষণ)

ডাঃ বোস॥ (চেয়ারম্যানকে) হি হ্যাজ কম্প্লিট্‌লি গন্ অফ্ হিজ হেড্—মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের আকাশ আছে কি?

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ যে পরিবেশে উনি থাকতেন, সেই পরিবেশটি পুরোপুরি সৃষ্টি করতে পারলে—একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা যেত।

ডাঃ চক্রবর্তী। সেই পরিবেশেই তো উনি রয়েছেন ডাঃ গাঙ্গুলী।

ডাঃ গাঙ্গুলী॥ হ্যাঁ, সবই রয়েছে—কিন্তু তাজমহলের সেই মডেলটা—সেটা কি কোন মতেই খুঁজে পাওয়া যায় না?

দুরন্ত। বলেছি তো স্যার—সেই গুর্খাটা সেটাকে ভেঙে চুরমার ক'রে ফেলেছে।

জয়া॥ কিন্তু—

দুরন্ত॥ হ্যাঁ জয়াদেবী—আমি কমিশনকে সব বলেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী। হ্যাঁ—আপনি বলেছেন। (জয়াকে) তবে আপনিও যদি কিছু বলতে চান বলুন।

জয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় দীনদয়াল বারান্দা হইতে পুনরায় প্রলাপ বকিতে বকিতে এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন

দীনদয়াল। নেই—নেই—কোথাও তাজমহল নেই। যমুনার পরপারে যতদূর দৃষ্টি চলে—শুধু পড়ে রয়েছে ধূসর বালুকারাশি। (চীৎকারে করিয়া উঠিলেন) কোথায় আমার তাজমহল? ওরে শয়তানের দল—ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—আমার তাজমহল আমায় ফিরিয়ে দে।

জয়া॥ (অভিনয়ের সুরে) বাবা—বাবা। কার সাধ্য তোমার তাজমহল ধ্বংস করে?

ফিল্‌প্রয়াস সঙ্গে সুটকেস হইতে তাজমহল বাহির করিয়া দীনদয়ালের সামনে ধরিল

এই নাও তোমার তাজমহল—তোমার অমর প্রেমের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল।

দীনদয়াল স্তব্ধ হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে তাজমহলটি দেখিতে লাগিলেন।

সকলে স্তব্ধ হইয়া এই দৃশ্যটি দেখিতে লাগিল

দীনদয়াল॥ তাই তো! সেই তাজমহল! কিন্তু তোমার হাতে কেন? (ক্রমশ প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। হঠাৎ মাথায় হাত দিয়া) আমি পড়ে গিয়েছিলাম?

জয়া॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা—একটা গুর্খা আপনাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

দীনদয়াল॥ মনে পড়েছে। দুরন্ত ওটা আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিতে হুকুম দিয়েছিল। আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। গুর্খাটা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কিন্তু তারপর? (চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন) এরা কে? এখানে কেন? এ যে দেখছি ডাঃ বোস! ও—(কি যেন মনে পড়িল) হ্যাঁ—আপনিও এসেছিলেন। কিন্তু ডাঃ চক্রবর্তী? আপনি কবে ফিরেছেন? ভালো আছেন?

ডাঃ চক্রবর্তী॥ হ্যাঁ—ডাক্তার চৌধুরী। বিলেত থেকে গত সেপ্টেম্বরে ফিরেছি। আপনার অসুখের খবর পেয়ে আমরা আপনাকে দেখতে এসেছি।

দীনদয়াল॥ হ্যাঁ—পড়ে গিয়েছিলাম—মাথায় বড্ড চোট লেগেছিল। হ্যাঁ মনে পড়ছে—আমার এখন সব মনে পড়ছে। কিন্তু আপনারা আমার হাসপাতালে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—এ আমার কী সৌভাগ্য! জয়া মা—দুরন্ত—ওঁদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করো।

জয়া ও দুরন্ত সানন্দে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

ডাঃ চক্রবর্তী॥ না—না—থাক্।

দীনদয়াল॥ না-না, ডাঃ চক্রবর্তী—আপনারা যখন দয়া করে এসেছেন—আমার হাসপাতাল না দেখে কিছুতেই যেতে পারবেন না। আমাকে আর দেখতে হবে না, আমি সেরে গেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী॥ সত্যিই আপনি সেরে গেছেন। স্পষ্ট বুঝছি—একটা ষড়যন্ত্রের ফলেই আপনার এত দুর্গতি হয়েছে। থাক সে কথা—সে আমরা রিপোর্টে লিখবো। সত্যি বড় আনন্দ হচ্ছে। চলুন—আপনার হাসপাতাল দেখবো।

সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন

দীনদয়াল ॥ কি আনন্দ! কি আনন্দ! ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গ—ভুজঙ্গ কোথায়?···ওই দেখো—হতভাগাটা কাজের সময় কোথায় সরে পড়েছে। আপনাকে বলিনি, ডাঃ ঘোষ! সত্যিই ওর মাথায় দোষ হয়েছে। আসুন—আপনারা—আমার সঙ্গে।

ডাঃ চক্রবর্তী ॥ All's well that ends well. চলুন।

এমন সময় নার্স আসিয়া দাঁড়াইল

দীনদয়াল ॥ এই যে নার্স—ভুজঙ্গ কোথায়?

নার্স ॥ তিনি সাইকেলে উঠে চলে গেলেন। আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বলেছেন।

নার্স একটি পত্র সামনে ধরিল

দীনদয়াল ॥ মাথা খারাপ। নইলে কেউ এমন সময় চলে যায়! (তিনি না পড়িয়া খামখানা পকেটে রাখিলেন) আসুন ডাঃ চক্রবর্তী—আসুন আপনারা।

দীনদয়ালের সহিত সকলে চলিয়া গেলেন

চতুর্থ দৃশ্য

দীনদয়ালের পূর্বতন শয়নকক্ষ। জয়া ও জয়ন্ত।

জয়া ॥ না জয়ন্তবাবু—তা হয় না। আপনি আজই এই ট্রেণেই কলকাতা চলে যান। ধরুন—আমার সঙ্গেই ঝগড়া করে কলকাতা চলে গেলেন। গিয়ে আজই পাঠিয়ে দিন—বিমানবাবুকে। আজ রাত্রেই আমি তার সঙ্গে চলে যেতে চাই কলকাতায়—যাতে আপনি কাল সকালেই বাবাকে টেলিগ্রামে জানাতে পারেন—আমি কলেরায় মারা গেছি।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু শুনুন জয়া দেবী—এর কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

জয়া ॥ আছে—আছে। এ-মিথ্যা আর চলতে পারে না, জয়ন্তবাবু।

জয়ন্ত ॥ কিন্তু ভেবে দেখুন—এ মিথ্যার আর কোন সাক্ষী নেই। কাজেই এ মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নিতে আর তো কোন বাধা নেই।

জয়া ॥ লোকে তাই ভাবে বটে। কিন্তু মিথ্যার সাক্ষী থাকে পদে পদে। সে সাক্ষী এখানেও আছে—ঐ ভুজঙ্গবাবু।

জয়ন্ত ॥ সেদিন রাত্রে ঐ আলমারির আড়ালে লুকিয়ে ভুজঙ্গ সব শুনেছে—আপনি বলেছেন জয়া দেবী। কিন্তু সে ভুজঙ্গও আজ নেই—হাসপাতালের কয়েক হাজার টাকা চুরি ক'রে মেডিকেল-কমিশন চলে যাবার আগেই সে পালিয়েছে। এখানে আর সে জীবনেও আসবে না, জয়া দেবী।

কিন্তু ॥ কিন্তু ভুজঙ্গই আমাদের মিথ্যার একমাত্র সাক্ষী নয়, জয়ন্তবাবু। সাক্ষী আমার অন্তরাত্মা। (মমতাময়ীর তৈলচিত্র দেখাইয়া) সাক্ষী আপনার সতী সাধ্বী মায়ের অমর আত্মা। না—না—জয়ন্তবাবু। এ ঘরে—এই বাড়ীতে বাপ মায়ের পুণ্য মন্দিরে—এই মিথ্যার বোঝা আমি বইতে পারবো না—এ পাপ আমি সইতে পারবো না।

জয়ন্ত ॥ বেশ। তবে আর কলকাতা যাব না। এক মিথ্যা ঢাকতে নতুন মিথ্যার জালে আর আমরা জড়িয়ে পড়বো না। আসুন—আমরা বাবাকে সব খুলে বলি।

জয়া ॥ (ভীতভাবে) না—না—তাও পারবো না। আমরা তাঁকে প্রতারণা করেছি—এ আঘাত তিনি সইতে পারবেন না। আপনিই একদিন বলেছিলেন—তিনি সব সইতে পারেন—সইতে পারেন না শুধু প্রবঞ্চনা—সইতে পারেন না শুধু প্রতারণা।

জয়ন্ত ॥ তবে তোমাকে আমি কলেরায়ও মারতে পারবো না জয়া। তোমাকে আমি চাই। জন্ম-জন্মান্তর ধরে বোধ হয় তোমাকেই আমি চেয়েছি। তাই বিধাতা সেদিন অমন করে ঘটিয়েছিলেন—এই অদ্ভুত যোগাযোগ। কলেরায় একবার তোমাকে মেরে ফেলে, আবার তোমাকে বাঁচাবো কি করে বাবার কাছে? অনেক বুদ্ধিই অনেকবার খাটিয়েছি—কিন্তু এ আমার বুদ্ধির বাইরে। কলেরায় মরতে চাইছো—সে কি আমার জীবনে আর তুমি আসবে না বলে জয়া?—বল—বল—

জয়া ॥ (নীরব রহিল)

জয়ন্ত ॥ চুপ ক'রে রইলে যে? ও! তবে এতদিন যা তুমি করেছো—সবই তোমার অভিনয়! শুধু অভিনয়! অভিনয় শেষ হয়েছে—থিয়েটার ভেঙে গেছে—অভিনেত্রী বাড়ী যাবে—সাজ-পোষাক খুলে ফেলছে—মুখের রঙ তুলে

চেয়েছে। সে বড় ভুলে গেল এ তো সোজা। মনে তো তার বড় লাগেনি।

[প্রস্থান

[ধীরে ধীরে দীনবন্ধুর প্রবেশ]

থাকো—থাকো। আমিই

না বাবা। আপনি একটু দাঁড়ান।

দীনবন্ধু। কেন, কি হয়েছে? কেমন একটা অন্ধকার দেখছি, মাথার ভেতরটা বড্ড ঝিম ঝিম করছে!

উনি আজই কলকাতায় চলে যেতে চাচ্ছেন।

দীনবন্ধু। কলকাতা! ছেলেটা পাগলের মত দাঁড়াল! তাড়াতাড়ি চলেছে কলকাতা! তখনও যুধিষ্ঠির কার সঙ্গে তাড়াতাড়ি করে কলকাতা ছুটেছে। আমার উপর রাগ করে কলকাতা ছুটলো। ওরে দুরন্ত কি একটা ঝড় দিয়ে গেছে—ওই দেখ ও কোটরই নয় গেছে—দেখা যাচ্ছে না।

না তাইটী আপনার কাছে

ভরত আমাকে যেতে দিতে হবে।

দীনবন্ধু। কিন্তু আমাকে ছাড়া মানিতে হইবে।

ভরত। আপনি পুত্র-পুত্রবধূসহ এখানে থাকিবেন। আমি বিয়ে করে আপনাদের দুজনকেই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। তাহাদের ওখানে টাকা কম দেখিয়া উতলা হইবেন না। দয়া করিয়া পুলিশ হাঙ্গামাও করিবেন না। আমাকে ধরিতে গেলে আপনার পারিবারিক কলঙ্ক আমি গোপন রাখিতে পারিব না।"

[প্রস্থান ভরত ও ভরতকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বাকি রাত্রি অন্ধকারে পায়চারি করিতে লাগিলেন

দীনবন্ধু। [ভরতকে] বিয়ে করোনি?

ভরত। না বাবা। [ভরত মুখ নত করিল

দীনবন্ধু। গাধা। একটা অনাথা মেয়েকে বই সাজিয়ে এনে তার সঙ্গে খেলা করছো? তার জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছো? এতদূর অধঃপাতে গেছ তুমি? আজই এই ট্রেণে চলো কলকাতায়। এর পরেই যে লগ্ন আছে—সেই লগ্নেই হবে তোমাদের বিয়ে। না দাঁড়াও—[ভরতকে] এমন একটা হতভাগার সঙ্গে বিয়েতে তোমার মত আছে তো মা?

[এই অন্তে দীনবন্ধুকে প্রণাম করিল। ভরতের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল

দীনবন্ধু। আছে—তবে আছে। যাক—হতভাগার একটা গতি হল। বিয়ে হোক। কিন্তু দুজনের এই লক্ষণগুলো ভাল নয়—গোপন করার প্রবৃত্তি—পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ—অকারণ ক্রন্দন—'ইগনেসিয়া'—দুজনেই আছে—বিয়ের আগে এবং বিয়ের পরে। কিন্তু আর দেরি নয়—তোমাদের বিয়ে হয়নি—এ আর আমি সইতে পারছি না। আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি বিয়ে ক'রে পাগল হয়েছি—এরা বিয়ে না ক'রে পাগলামি করছে। না—না—বিয়ে যদি আজ দিতে পারি তবে কাল নয়। এখনি ট্রেণ ধরতে হবে। [বিষম তাড়ায়] চলো—চলো—

[ভরত ও ভরথ নতমুখে ছুটিল। পশ্চাতে ছুটিলেন দীনবন্ধু

—যবনিকা পতন—

রচনাকাল: ১৮ই জুলাই—২৭শে জুলাই, ১৯২১

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সোভিয়েট রাজধানী প্রাচীন মস্কো সহরের সৃষ্টি-আরম্ভে তার বয়স অন্তত ১১০০ খৃষ্টাব্দে। কারও কারও মতে তার বয়স আরও বেশী। কারণ কিয়েভ 'রুশ' (Slav) জাতির আদি রাজধানী। আধুনিক সোভিয়েট প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র সংকলনের The Ukrainian Soviet Socialist Republic) প্রধান সহর 'কিয়েভ' (Kiev) ছিল রাজধানী। কল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রুরিক এবং 'রাশ' জাতির আদি রাজারা প্রথমে ছিলেন নৌবলিক দস্যুসর্দার—তারপর নৌবল বিকাশের প্রয়োজনে যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুশাসন ব্যবস্থা তো গড়ে প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন—তাদের সুদৃষ্টির দিকেও ছিল তাদের সজাগ দৃষ্টি। ক্রমে তাদের রাজ্যের প্রতিবেশী-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনৈতিক-সম্পর্ক এবং সভ্যতা সংস্কৃতির প্রসার বৃদ্ধি পাবার ফলে গ্রীসের কার্থলিক ধর্মমতাবলম্বী গ্রীসের সংস্পর্শে এসে, রুশ-রাজ্যের 'রাশ' রাজারা খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন—প্রজাদেরও দীক্ষিত করে তোলেন রাজার ধর্মে। এমনি করে ৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রথম ভ্লাদিমিরের রাজত্বের সময় সারা রুশে কার্থলিক খৃষ্ট-ধর্মের প্রবর্তন হলো।

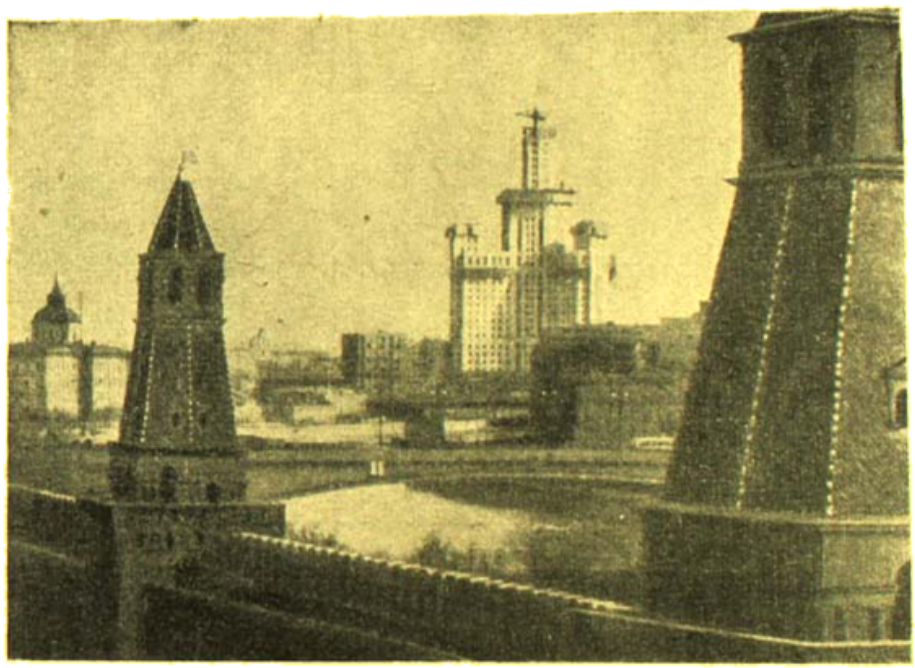

প্রাচীন ক্রেমলিন দুর্গ থেকে আধুনিক মস্কো সহরের দৃশ্য

রুশ-রাজ প্রথম ভ্লাদিমিরের পরেও রাজ্য সুশাসনে একেশ্বর সহর তাঁর বংশধরেরা সগৌরবে রাজত্ব করেন, রাজ্যের সুশাসন-ব্যবস্থায় প্রাচীন রুশ রাজধানী তৎকালীন 'কিয়েভ' সহরের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। পরবর্তী রুশ রাজাদের মধ্যে মহান্ত যারোস্লাভের (১০৩৬-১০৫৪) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজত্বকাল ছিল শান্তি-বিরাজিত, তিনি ছিলেন, যে যুগে—যারা রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক পাতিয়ে রাজ্যের এবং রাজধানী 'কিয়েভ' সহরের শ্রীবৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। মহান যারোস্লাভের আমলেই রুশের নিজস্ব ব্যবস্থায় রাজকীয় আইন কানুনের প্রথম প্রচলন হয়। রাজ্যের সম্প্রসারণের রাজনৈতিকের বিভিন্নতার প্রবর্তন হয় এবং অন্তরালে

কুতুবের শাসন সংরক্ষণ। এই বিরোধ আত্ম-কলহের ফলে 'গ্রাণ্ড্' রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীরা একে-একে নানা স্থানে উপনগরে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে রুশের প্রাচীন রাজধানী 'কিয়েভ্' ছেড়ে দূর-দূরান্তে গিয়ে কুদ্র-রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের নিজের রাজ্য, রাজধানী···নূতন-নূতন স্থানে।' সম্রাট ইয়ারোস্লাভের দুয়োরা পৌত্র ভ্লাদিমির মোনোমাকের (১১১৩-১১২৫) চেষ্টায় 'গ্রাণ্ড্' রাজ-বংশটির এই সর্বনাশা আত্মকলহের বেগ সাময়িকভাবে পথ হলেও, মোনোমাকের মৃত্যুর পর তাঁর দুই-পুত্র রাজ মস্তিস্লাভের (১১২৫-১১৩২) অকাল-প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে আবার কলহ শুরু হলো প্রধানতঃ হ'লো 'কিয়েভের' উত্তরাধিকার নিয়ে সেই অন্তর্বিরোধ। সে অন্তর্দ্বন্দ্বে রাশিয়ার রাজধানী ছেড়ে চুলোয় হয়ে গেল রাজধানী 'কিয়েভের' সমৃদ্ধি, গৌরব, প্রতিষ্ঠা···সব কিছু।

মস্কোর সেন্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল—আধুনিক যুগে

রাজ্যাধিকার নিয়ে এই কলহ-বিগ্রহের ফলে, 'গ্রাণ্ড্' রাজ-বংশের উত্তরাধিকারীদের একটি দল 'কিয়েভ্' ছেড়ে পালিয়ে রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ গভীর-অরণ্যের প্রান্তে নূতন বসতি স্থাপন করেন। এই নূতন বসতিকে কেন্দ্র করেই পরে সেখানে প্রতিষ্ঠিত হলো 'ভ্লাদিমির-সুজ্দাল্' বংশের নবীন-রাজ্য। সে-রাজ্যের রাজধানী নব-নির্মিত 'ভ্লাদিমির' সহর। রুশের প্রাচীন ইতিহাসে সেকালের এই উপনিবেশ-সহরটির বিশেষ উল্লেখ আছে এবং অতীতের এই 'ভ্লাদিমির' কি ভাবে আধুনিক মস্কো মহা-নগরীতে রূপান্তরিত হলো, সে কাহিনীও আমরা পাই! মস্কো সহরের আদি-বিবরণ সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক-তথ্য যা মেলে, তা থেকে জানা যায়,—১১৫৭ খৃষ্টাব্দে মস্কো নদীর উপকূলে সাতটি বাড়ি-ঘরের পাদরোটিলার উপর, রচিত এই 'ভ্লাদিমির' সহরেই তৎকালীন শাসক-সম্রাট 'ভ্লাদিমির-সুজ্দাল্' রাজ-বংশের এক রাজা তাঁর বিশিষ্ট গুপ্তাসুধ্যায়ীবন্ধুকে সাদরে রাজোচিত-সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন।

নব-প্রতিষ্ঠিত 'ভ্লাদিমির-সুজ্দাল্' রাজ্যের শক্তি দিন-দিন প্রবল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আত্মকলহের ফিরে চর্চারিত 'কিয়েভের' প্রাচীন 'গ্রাণ্ড্' শাসনের পতন ঘটে। রুশের পুরোনো রাজধানীর আওতার বাইরে, নূতন উপনিবেশ-রাজ্য-পত্তনের পর 'গ্রাণ্ড্'-সম্রাট ভ্লাদিমির মোনোমাকের পৌত্র বিজয়ী-বীর আন্দ্রেই বোগোলুব্স্কী ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী-স্বজন 'কিয়েভের' সে-রাজা দ্বিতীয় উপাসাক্ষ্কে যুদ্ধে পরাজিত করেন। যুদ্ধ-জয়ের পর, মনের আক্রোশ মেটাতে আন্দ্রেই বোগোলুব্স্কী নির্মমভাবে শুধু তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিশ্বাসঘাতকতা সাধন করলেন···'গ্রাণ্ড্' রাজ-বংশের সমৃদ্ধ রাজধানী 'কিয়েভ'-সহর ধ্বংস করে ধূলায় মিশিয়ে দিলেন। তারপর তিনি নদীর তীরে নব-নির্মিত 'ভ্লাদিমির' জন-পদে এসে গড়ে তোলেন নূতন রাজধানী।

নব-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ী-বীর আন্দ্রেই বোগোলুব্স্কীর ছাপা রাজ্য-ভোগ লেপেনমি বিলাসী! সুশাসক হলেও বোগোলুব্স্কী ছিলেন লক্ষণ খেয়ালচারী, ভেপী, এক রোখা···রাজ্য-পরিচালনার ব্যাপারে সব সময়েই গুপ্তাসুধ্যায়ী অনুচরদের মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের জিদ বজায় রেখে চলতেন। তার ফলে, বোগোলুব্স্কী অচিরে প্রজাদের বিরাগভাজন হন···অমাত্যেরা গোপনে চক্রান্ত করলেন রাজার বিরুদ্ধে। সে-চক্রান্তের ফলে ভক্তিরে ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে কিয়েভীদের হাতে অতর্কিতে প্রাণ হারালেন রাজা বোগোলুব্স্কী!

বোগোলুব্স্কীর হাতে নব-রাজধানী 'ভ্লাদিমির' সহরের উন্নতি হয়েছিল। তাঁর বাসনা ছিল—'গ্রাণ্ড্' রাজাদের পুরোনো রাজধানী 'কিয়েভের' চেয়েও সুন্দর, সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলবেন এই নূতন রাজধানী তাঁর আমলে 'ভ্লাদিমির' সহরে সে-যুগের স্থাপত্য-কলার যে বহু বিচিত্র কীর্তি-মন্দির, মঠ, গির্জা প্রভৃতি রচিত হয়েছিল—সে-সবের প্রতি-চিত্র নিদর্শন আজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে আধুনিক সোভিয়েট-রাজ্যের নানা জাদুঘরে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে, প্রাচীন পুঁথির পাতায়!

আন্দ্রেই বোগোলুব্স্কীর মৃত্যুর পর, দুর্মীর দু'শো বছর ধরে এখানে রাজত্ব করে গেছেন তাঁর বংশধর দুর্বল, হীনশক্তি একদল রাজা···ইতিহাসে তাঁদের তেমন উল্লেখ নেই। তবে এঁদেরই রাজত্বকালে ক্রমে রাজধানী 'ভ্লাদিমির' সহরের নামান্তর ঘটে। মস্কো নদীর উপকূলে অবস্থিত বলে রাজধানীর নূতন নাম হলো—মস্কো! এমনি ভাবেই ঘোড়া-পত্তন হয় রুশ-রাজ্যের ঐতিহাসিক জন-পদ মস্কো মহা-নগরীর!

তারপর, সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সাতশো বছর ধরে সুখ-দুঃখ উন্নতি-অবনতির ঘটনা-বৃত্তিতে-ভরা কত না স্রোত বয়ে গেছে মস্কোর উপর দিয়ে! সে-সবের চিহ্ন মুছে দিয়ে প্রাচীন এবং আধুনিক শিল্প-সভ্যতা, সংস্কৃতি-রাজনীতির অভিনব সমন্বয় ঘটে, প্রতীপ্ত-মহিমায় সগৌরবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরাতন এই রাজধানী!

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোঙ্গোলিয়ার দুর্ধর্ষ বীর চেঙ্গিস্ খানের নেতৃত্বে মধ্য-এশিয়ার পরাক্রান্ত তাতার সম্প্রদায়ের অতর্কিত আক্রমণ এবং নির্মম লুণ্ঠন-অত্যাচারের ফলে সারা রুশ-রাজ্য বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পরেও তাতার সম্রাটদের উৎপীড়নের অব্যাহত দাপটে রুশ-বাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। যুদ্ধে সম্রাটের সাহায্যে না গেয়ে মোস্কোযোদ্ধের রাজ প্রসিদ্ধ রুশ-বীর আলেকজান্দার নেভ্‌স্কীর পুত্র মস্কো-অধিপতি দানিয়েল অকালমৃত্যুর প্রচুর উৎকোচ-উপঢৌকন দিয়ে লুণ্ঠন-লোলুপ তাতার-সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করেন, সেই সন্ধির ফলে তৎকালীন মত মস্কোকে তিনি ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন।

দানিয়েলের মৃত্যুর পর তাঁরই কনিষ্ঠ মস্কোর অধিপতি প্রথম আইভান (১৩১৮-১৩৪০) বিদেশী-শত্রুর আক্রমণ-উপদ্রব থেকে রাজ্য-রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজধানী মস্কোতে সুদৃঢ় 'ক্রেমলিন' (Kremlin) দুর্গ-প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রথম আইভানের পর, ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে মস্কোর রাজা দ্বিতীয় দনস্কোইয়ের রাজা-কালে রুশ-রাজধানীর বহু উন্নতি এবং প্রতিপত্তি হয়। রাজ-অমাত্যদের সঙ্গবদ্ধ করে তাঁদের সাহায্যে বীর দ্বিতীয় দনস্কোই মস্কো-রাজ্যের তাতার-সেনাপতি মামাই খানকে যুদ্ধে হারিয়ে মস্কো-রাজধানীকে বিদেশী-শত্রুর উৎপাত থেকে বাঁচিয়ে তোলেন। তাতার-সেনার আক্রমণ থেকে রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য দ্বিতীয় দনস্কোই ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের চারিদিকে পাথরের যে সুদৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনী রচনা করেছিলেন আজও তা বজায় রয়েছে। এ উৎপীড়ন-অত্যাচার থেকে রেহাই পেয়ে পরবর্তীকালে রুশ-রাজ্যের বিস্তার হয় এবং মস্কো-রাজধানীরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এ সব উন্নতি সত্ত্বেও দেশের আর্থিক সম্পদ-বণ্টনী এবং রাজ-অমাত্যদের হিংসা-দ্বেষ কলহ বিগ্রহ দেখে থাকতো সব সময়ে। তার ফলে মস্কোর শান্তি ছিলনা। এ অশান্তি চরমে ওঠে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে—রুশ 'জার' (Czar) বংশের প্রতিষ্ঠাতা মস্কো-অধিপতি Ivan the Great বা তৃতীয় আইভানের রাজত্বের সময়—তাঁর আমল থেকেই রাজধানী মস্কোতে সিংহাসনে বসে 'জার'-দের রাজ্য-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হলো। মুসলমান-সম্রাট তৃতীয় আইভানের আমলেই রাজধানী মস্কোর পৌরুষ-প্রতিপত্তি বিদেশ প্রসার লাভ করে—ঐতিহাসিক-মর্যাদায় এই প্রাচীন মহা-নগরীকে তৎকালীন বিদেশ-বিদেশের লোকেরা সসম্ভ্রম সম্মানে জানিয়ে বলতো—'তৃতীয় রোম'!

তৃতীয় আইভানের পর রাজা হন তাঁর সুযোগ্য পুত্র তৃতীয় বেসিল। বেসিলের অকাল-মৃত্যুর পর মস্কোর সিংহাসনের অধিকারী হলেন চতুর্থ আইভান্ (১৫৩০-১৫৮৪)। রাজা-শাসনের ব্যাপারে চতুর্থ আইভান ছিলেন নির্মম অত্যাচারী—লোকে তাই তাঁর নাম দিয়েছিল—Ivan the Terrible। এঁর রাজত্বকালে ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে রাজধানী মস্কো ছিলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেকালে ওজনের প্রথানুযায়ী গ্রাম এবং সহরে সাধারণ প্রজাদের ঘর-বাড়ীগুলি বেশীর ভাগই তৈরী হতো কাঠের খুঁটি ও তক্তা সাজিয়ে। তাছাড়া সে আমলে গ্রামে গেঁয়োদেরি বাড়ী-ঘর বানিয়ে বাসের রীতি প্রচলিত ছিল। এর উপর, কাঁচ প্রধান দেশ বলে আগুন-পোড়ানোর বাতিক ছিল। কাজেই কাঠের ঘর বাস, নিত্য আগুন লাগতো। সে-আগুনে গ্রাম-সহর, বাড়ী-ঘর সব পুড়ে ছারখার হতো। এমনি বহু অগ্নিকাণ্ড হামেশা ঘটতো তখনকার দিনে, সেজন্য দেশের ও দশের অল্প-ক্ষতি হতো বিস্তর। কিন্তু উপায়ও ছিল না। দেশের সাধারণ লোকজন অধিকাংশই ছিল কুসংস্কারী···পরমুখাপেক্ষী···নিরক্ষর অশিক্ষিত। অবশ্যও তাদের তত

আধুনিক মস্কো শহরের একটি রাজপথ

দীন-হীন ছিল যে ইট-পাথরের পাকা ঘর-বাড়ী বানিয়ে বাস করার কথা ছিল স্বপ্নের অগোচর। রাজ-অমাত্য এবং বিত্তশালী ভূস্বামিকারীদের জন্যে কয়েকজন যারা বাস করতেন ইট-পাথরে তৈরী পাকা-অট্টালিকায়। তাছাড়া দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহের চিন্তায় দেশে থাকতো সর্বদা—সেজন্য রাজারাও কিভাবের বিলাস-ব্যসন, রং-সঙ্গ ও ধর্ম-সাধনা ছাড়া জন-গণের শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসঙ্গে একান্ত উদাসীন থাকতেন। তার ফলে, মস্কোর রাজ-দরবারের বাইরে জন-সাধারণের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়···শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, রুচি নেই—মন নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন।

ষোল বছর বয়সে সিংহাসনে বসেই চতুর্থ আইভান্ ঘোষণা করলেন তিনি শুধু মস্কো-রাজবংশের উত্তরাধিকারী রাজা নন···

বিরাট কশ-সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থ অধিপতি—রুশের সার্বভৌম 'জার' (Czar) ! সেই থেকে জার কশ-রাজ্যের উপর 'জার'দের আধিপত্য এবং শাসনাধিকারের সূত্রপাত !

'জার' আইভানের রাজত্বকালে রাজধানী মস্কোতে তৈরী হয় প্রসিদ্ধ সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল ! সুলতান এবং ধর্মোন্মাদ হলেও 'জার' আইভান্ এমন নির্মম ছিলেন, পাছে তাঁর অমর-কীর্ত্তি মস্কোর এই সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রালের চেয়ে সুন্দর কোনো গির্জ্জা ভবিষ্যতে নির্ম্মিত হয়—তাই তিনি ঐ ধর্ম-মন্দির গড়া শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে স্থপতিশিল্পীর দু'টি চোখ অন্ধ করে দিয়েছিলেন ! এছাড়া রুশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং পুস্তিকা-প্রকাশের ব্যবস্থ তিনিই করেন। পরে ইংলণ্ড, পোলাণ্ড, জার্ম্মানী, লিথুয়েনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক সোহার্দ্দি-

মস্কোর সেণ্ট বেসিল ক্যাথিড্রাল—প্রাচীন আমলের

বিনিময়ের ফলে তৎকালীন ইউরোপের সভ্য-সমাজের সংস্পর্শে এসে মস্কোর বহু উন্নতি এবং মর্য্যাদা ও আভিজাত্য বৃদ্ধি পায় অনেকখানি।

চতুর্থ আইভানের মৃত্যুর পর রাজ্যে দারুণ দুর্দ্দিন এলো, আবার ভাঙন ধরলো মস্কোর সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন 'রাজ' রাজবংশে… অরাজকতার দেশ ভরে উঠলো ! আইভানের অযোগ্য পুত্র 'জার' ফিয়োডর (১৫৮৪-১৫৯৮) অকর্মণ্যতার সুযোগে তাঁরই নিকট-আত্মীয় বোরিস্ গোডুনভ্ নামে এক সুদক্ষ অমাত্য প্রজা-সাধারণের সহানুভূতি অর্জ্জন করে রুশ-সম্রাটের পিছনে থেকে রাজকার্য্য পরিচালনা সুরু করলেন ! তারপর দুর্ব্বল-রাজা ফিয়োডরের মৃত্যু হলে বোরিস্ গোডুনভ্ দেশের প্রজা-সাধারণ এবং ধর্ম্ম-যাজকদের সম্মতি ও সহযোগিতায় মস্কোর সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে নিজেকে 'জার' বলে ঘোষণা করলেন !

বোরিস গোডুনভের রাজ্য-কালে (১৫৯৮-১৬০৫) দারুণ দুর্ভিক্ষ হলো রাজ্যে। অন্নাভাবের সঙ্গে ঘটক-মহামারীর আবির্ভাব। অরাজকতার মাত্রা বেড়ে উঠলো ব্যাপকভাবে…বিদ্রোহ, লুট-তরাজ, অত্যাচারের বিষে বিষাক্ত হয়ে উঠলো দেশের মানুষের মন ! অভাব-দুর্ব্বিপাকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে মস্কো সহর ছেড়ে সকলে দলে-দলে পালালো জনে-জঙ্গলে…দুর্দ্ধর্ষ 'কশাক্' (Cossack) দস্যুদের আশ্রয়ে। 'কশাক্'-দস্যুরা সে সময়ে সুযোগ বুঝে প্রায় অমানুষিক-পীড়ন-অত্যাচারের নির্ম্মম-অভিযান চালালো মস্কোর বুকে ! সে-যুগের রাজ-দরবারের বিধানে রুশ-দেশের মধ্যবিত্ত কৃষক-সম্প্রদায় ছিল রাজ্যের বিত্তশালী ভূম্যধিকারীদের ক্রীতদাসের সামিল…মানুষ বলে কেউ তাদের মনে করতো না। মাত্র এই একশো বিশ বছর আগে—১৮৬১ সালেও মস্কোতে ক্রীতদাস-বিক্রয়ের প্রকাশ্য-বাজার বসতো এবং সেখানে পণ্য-দ্রব্যের মত দাস-দাসী বেচা-কেনা চলতো। কৃষকদের এই শোচনীয় দুঃখ-দুর্দ্দশার সম্বন্ধে 'জার'-রা ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন দারুণ অত্যাচারী ! জনসাধারণের কাছ থেকে যথেচ্ছ রাজস্ব আদায় করে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকা, আর রাজ-দরবারের কুচক্রী-চাটুকার আমলাদের স্বার্থান্ধ তোষামোদে মজে শাসন করাই ছিল চরম লক্ষ্য ! রাজ্যের প্রজা-সাধারণের মঙ্গল বা হিত-সাধনার দিকে তাঁরা দৃষ্টিপাত করতেন না। দরবারে ছিল যত কুচক্রী, চাটুকার আর ব্যভিচারীদের আধিপত্য ! তাছাড়া যথেচ্ছ রাজস্ব-সংগ্রহের জন্য রাজ্যের বিত্তশালী জমীদারদের সঙ্গেও 'জার'দের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অন্ত ছিল না। কিন্তু সহ্যের একটা সীমা আছে ! বোরিস্ গোডুনভের রাজ্য-কালে দারুণ অন্নাভাব আর দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষকদের দুর্দ্দশা চরমে পৌঁচেছিল বলেই অবশেষে দেশ-ব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো ! সে-আগুনে জ্বলে উঠেছিল মস্কোর রাজ-দরবার…এবং সিংহাসন ! 'জার' বোরিস্ গোডুনভের প্রাণপাত-চেষ্টাতেও বিপ্লবের আগুন প্রশমিত হলো না…বেড়ে চললো ! এমনি সঙ্গীন মুহূর্ত্তে বোরিস্ গোডুনভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন রুশের পরম-প্রতিদ্বন্দ্বী পোলাণ্ডের রাজার সহায়তা এবং পক্ষপাতপুষ্ট ডিমিট্রি নামে মস্কোর সিংহাসনের দাবীদার এক জার-উত্তরাধিকারী ! ডিমিট্রির দাবী অস্বীকার করে বোরিস্ গোডুনভ্ যুদ্ধে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত এবং বিতাড়িত করলেন বটে, কিন্তু রাজ-ভোগ তাঁর ভাগ্যে ছিল না ! এ-যুদ্ধের কিছুকাল পরে অকস্মাৎ বোরিস্ গোডুনভের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

গোডুনভের মৃত্যুর পর কশাক্ এবং কৃষক প্রজাদের সমর্থনে মস্কোর সিংহাসনে রাজা হয়ে বসলেন সেই মকল-উত্তরাধিকারী ডিমিট্রি (১৬০৫-১৬০৬) ! ডিমিট্রির রাজত্বকাল মাত্র এক বছর…কিন্তু এই এক বছরে বিদেশী পোলাণ্ড-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় ধার্ম্মিক-স্বেচ্ছাচারী ডিমিট্রি সকলের অত্যন্ত বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিলেন ! শেষ বেসিল শুইস্কী নামে দরবারের এক বিশিষ্ট অমাত্য জার-সম্রাট ডিমিট্রিকে হত্যার অভিপ্রায়ে সদলে প্রবেশ

দেখুন, কেন ডালডা বনস্পতি সব রকম রান্না-বান্নার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

"এখন ডালডা দিয়ে রান্না করি ব'লে আমাদের পরিবারের সকলেই কেমন আনন্দ ক'রে খায়।"

ডালডার এই পাকপ্রণালীটি পরীক্ষা ক'রে দেখুন—চমৎকার রান্না—মুর্গী-মশালা!

বেশ বড় বড় টুক্‌রো কোরে মুর্গীটা কেটে নিন। পাত্রে তিন বড় চামচ ডালডা নিয়ে তাতে মুর্গীর টুক্‌রোগুলো, থেঁতো করা রসুন, আদা আর পিয়াজ, চার ফালি কোরে কাটা দুটি টোমাটো, দু চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, এক চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো ও দুকাপ জল দিন। নরম হওয়া পর্য্যন্ত রান্না করুন।

বাংলায় ডালডা রন্ধন পুস্তক বেরুলো! ডালডা কেন পুস্তক এখন বাংলা, হিন্দী, তামিল ও ইংরিজিতে পাবেন। ১০০ পাকপ্রণালী, ও' ছাড়া স্বাস্থ্য, রান্নাঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়। দাম মাত্র ১৲ টাকা অর্ডার ভ্যালুপেয়েবল বক্স ১০ আনা। আজই নিম্নে আবেদন করুন:
দি ডালডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস, পোঃ অঃ, বক্স নং ১২০, বোম্বাই ১

ডালডা

সকল রকম রান্নার পক্ষে অতুলনীয়

১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়

HVM 191-X52 BG

করলেন ক্রেমলিন্ দুর্গে। ফরাসীদের আগমন-সংবাদ পেয়েই ডিমিট্রি, ভয়ে প্রাসাদের চাতাল থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে মরল এবং বন্দী হল। বৃদ্ধ, বন্দী, ভগ্নোদ্যম পিতা আলেক্সাই ডিমিট্রির দেহ টুকরো-টুকরো করে কেটে ক্রেমলিন দুর্গের সামনে মস্কোর প্রসিদ্ধ 'লাল-সড়ক' বা Red Square-এর মুক্ত প্রাঙ্গণে ফেলে রাখা হল—দেশের লোকের চিত্তরঞ্জনের জন্য। কথিত আছে, মস্কোর বিজয়ী রাজপুরুষের আক্রোশ এমন প্রবল হয় যে, ডিমিট্রির খণ্ডিত-দেহ দাহ করার পর সেই ভিন্ন-ভিন্ন দিকে কাবাবের খোলে পুরে তোপ্ দাগা হয়েছিল!

ডিমিট্রির পর বেসিল শুইস্কী চতুর্থ বেসিল নাম নিয়ে রুশ-রাজ্যের সম্রাটের 'জার' হিসাবে মস্কোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন্। কিন্তু রাজধানী মস্কোর অবস্থা তখন খুব শোচনীয়—অরাজকতা-অত্যাচার বিষম-চক্রান্ত আর দুঃশাসনের বিষ-বাষ্পে সারা দেশ ছেয়ে গেছে। রাজ্যের আদি 'জার' রাজা রুরিকের বংশধর বেসিল শুইস্কী চার বছর মাত্র রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এই চার বছরেই তাঁর দুর্ভোগের সীমা ছিল না। তাঁর রাজত্বকালে রুশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার সুযোগে মস্কোর উপর দিয়ে ডিমিট্রি (নিজে তাতার, পোলার' নামক উপজাতির মুক্ত-বর্বর 'জাপোরোগ্' কসাক (Zaporog Cossacks) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী-পোলাণ্ডের রাজ-সৈন্যের অমানুষিক অত্যাচার এবং লুণ্ঠন অগ্নিদাহের ঝড় বয়ে গিয়েছিল! তাছাড়া রুশ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে 'ডিমিট্রি' নামে আরো একজন নকল-নবীনকে খাড়া করে পোলাণ্ডের রাজা 'জার' বেসিল শুইস্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করেছিলেন। সে-যুদ্ধে পোলাণ্ডের সৈন্যেরা জয়লাভ করে এবং রাজধানী মস্কো নগর আগুনে পুড়িয়ে ছারখার ও ধূম-মলিন ছিন্নিট চার্চ ধ্বংস করে ক্রেমলিন্ দুর্গ-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হয়।

যুদ্ধকালে 'জার' বেসিল শুইস্কীর আকস্মিক-মৃত্যুর পর, রুশ-রাজ্যের প্রধান ধর্ম-গুরু হার্মোজেন নামে অভিহিত পূর্ব-প্রেমিক নেতা বিদেশী শত্রুদের কবল থেকে রাজধানী পুনরুদ্ধারকল্পে দেশের বিক্ষুব্ধ জন-গণের মধ্যে মুক্তি-আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে তুললেন। সারা-রাজ্য জুড়ে এই তাঁর নৈরাশ্যিক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করার অপরাধে মস্কোস্থিত পোলাণ্ডের রাজ-প্রতিনিধি অকস্মাৎ পুণ্যাত্মা-হার্মোজেনকে ক্রেমলিন্-দুর্গের এক নির্জন অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখেন। ক্রেমলিনের কারা-কক্ষে নিয়ে যাবার সময় মস্কোর ঐতিহাসিক 'লাল-চত্বরে'র (Red Square) মুক্ত প্রাঙ্গণে সম্মিলিত জনতার সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভীক-দেশপ্রেমী হার্মোজেন দীপ্ত-কণ্ঠে সকলকে শেষ-আহ্বান জানিয়ে বলেন—দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য! অনাহারে, অযত্নে নির্মম অত্যাচারের ফলে নিজের অন্ধকার কারা-কক্ষে রুশের অন্যতম বীর-শহীদ কবি হার্মোজেনের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে! (ক্রমশঃ)

চিরন্তনী

শ্রীবিভূতিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

জীবনের সারা-রূপ কত ঠাঁই খুঁজি
কত কিছু করিলাম সযতনে পুঁজি;
কতটুকু এর আমি নিয়ে যাবো সাথে?
যে কেহ গিয়াছে চলি, গেছে রিক্ত হাতে।
শুধু সাধ, বিসম্বাদ, শুধু দ্বন্দ্ব, দ্বেষ,
হানাহানি পরস্পর ক'রে আনি ক্লেশ;
সুখের সন্ধে দিন করি কণ্টকিত,
দুঃখে চাই ম্রিয়মাণ, ভয়ে চাই ভীত।
এ ধরায় কতবারই হ'বে যাওয়া-আসা,
নিয়ে যাবো প্রীতি, প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা,
নিয়ে যাবো সকলের প্রিয় সম্ভাষণ,
সেইটুকু পাথেয়েরি করি আকিঞ্চন।
দক্ষিত যতই কিছু, যত কিছু বোঝা
সব ফেলে একদিন যেতে হ'বে সোজা।

পড়িছে ফাগুন প্রাতে

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কুসুমের মরসুমি মধুরাতে মনে জোলো আশ
স্মরণের সরোবরে অবগাহি' চাহিতে মরণ;
করিল দু'খানি চোখে পাঙনের অকোর করুণ,
আঁধারে ভরিল সারা হৃদয়ের বিরহী আকাশ।
বন্ধুদ্বারে কর হানি' সাধি' গেল বসন্ত-বাতাস,
শ্রবণে পশিল আসি' আঙিনার কুহু-কুহরণ;
কে যেন ডাকিল ভাবি' বাড়াইতে চপল চরণ
অলীক কল্পনা লাজে থমকিলে চমকি' নিরাশ।
তখন তোমার পাশে বসি' কোনো নূতন আত্মীয়
চিকন-চিকুর চুলে ভালোবেসে বুলাল অঙ্গুলি
মোহ-মুগ্ধ-অন্ধতায় প্রেম-কথা কহি' কমনীয়;
নিরুদ্ধ কান্নার ঢেউ বক্ষে তব উদ্ধলিল দুলি'।
ব্যথায় বেদনুমতী নিদ্রাহীন রাত্রি করি ভোর
প্রভাতে পড়িছ বসি' অশ্রু-লেখা চতুর্দশী মোর॥

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন

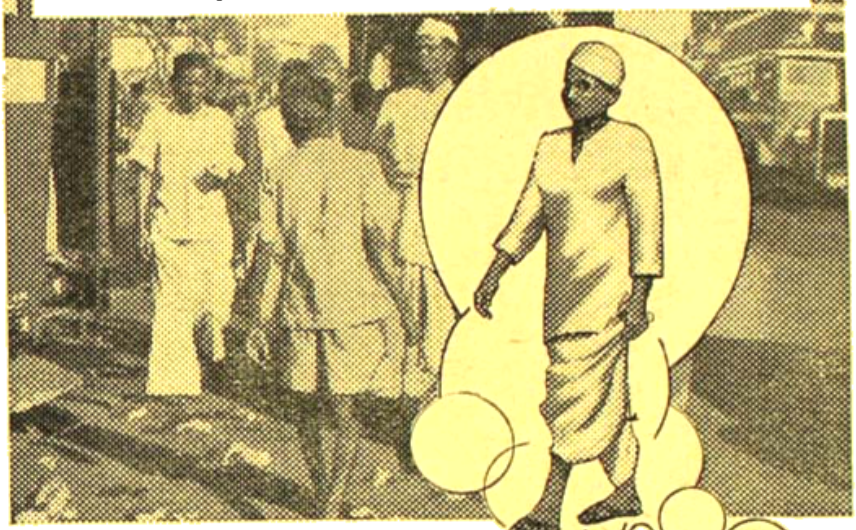

লাইফবয়ের

ফেনার আবরণে

ভাতাই কেন হাঁশিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনই আপনি ধুলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান মেখে নিত্য মনের অজান্তে কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফবয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও সুন্দরে রাখে।

Z. 230-50 BG

লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

আউ-

"E tutti posso cuno."

...কে কিছু অপমান করা কঠিন। সে ... বিদ্রূপের অভিব্যক্তি আছে বলে মনে হয় না। ... চোখের কোনায় ক্ষণিক ঝলক দেখা—একটা উত্তাপহীন ... ছাই। কথা বলবে বলে উথান আনকের মধ্যে ... তিনি [illegible] সুন্দরী নর্তকী এসেছে তাঁর ... [illegible] মাথার ভেতরে এখনো তাদের ... কানের মধ্যে এখনো বেজে ... তাদের পুতুলের আওয়াজ। বিষধর সাপের মতো ... ফণা [illegible] এখনো দুলে আছে বুকে। ...বন্ধ খাঁ দিশেহারা বোধ করছিলেন।

...গীজদের তাঁর পছন্দ হয় না। ওদের নিয়ে তিনি ... না—করাতেও না। যুদ্ধে আছে, যুদ্ধেই থাক। তাই ... ডি-মেলোর জাহাজ এসে তাঁর ঘাটে লাগল, তখন ... তিনি যথাসাধ্য ওদের বিদায় করতে চেয়েছিলেন। বিলাসী ... খোদাবক্স খাঁ—রাজনীতির চাইতে নারী-... তাই তিনি বেশি পছন্দ করেন। কিন্তু উজীর ... খাঁর ... এই বিপদে তিনি পড়েছেন।

... শত্রুর সঙ্গে বিরোধ চলছে—নিষ্পত্তি তিনি নিজেই ... তার নাকখানে এরা আবার কেন? চট্টগ্রামের ... হুট করে এখানে এসে পৌঁছেছে—বেশ তো, ... চট্টগ্রামের রাস্তা বাতলে দিলেই তো চুকে যায় সমস্ত। ... কি- প্রয়োজন ছিল তিনি না হয় দুচার পরিচয়ও ... দিতে রাজী ছিলেন চট্টগ্রামের সুলতানকে। কিন্তু যা ... কিছু গণ্ডগোল সৃষ্টি করে বসলেন জামান খাঁ।

—এসেই যখন পড়েছে গোলাবন্দ, তখন কাজে লাগানো যাক ওদের।

—কিন্তু উজীর সাহেব, ওদের ঘাঁটানো কি উচিত? শেষে আবার ফাঁসাদে না পড়ি।

—আপনি মিছেই ভয় পাচ্ছেন। ফ্রিস্টানেরা হল দানিয়ার ভাত। ওরা যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তা ছাড়া আপেরটাও বোঝে বিলক্ষণ। ব্যবসার সুবিধে যদি পায়, ঠিক রাজী হয়ে যাবে।

কিন্তু রাজী হলনি ডি-মেলো। ফলে, এই পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে।

খোদাবক্স খাঁ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন।

—যদি গোলমাল করে? যদি বহর নিয়ে আসে?

—মাঝ দরিয়ায় ভরাডুবি করে দেব—ভাববেন না।

—কিন্তু ওরা ভালো লড়ে—ভারী ভারী কামান আছে ওদের—

—আমাদের পেছনে আছেন চাটগাঁয়ের সুলতান, আছেন গৌড়ের বাদশাহ, আছে সারা হিন্দুস্তান। ভয় নেই জনাব, ওরা ঘাঁটাতে সাহস পাবে না।

ঠিকই বুঝেছিলেন জামান খাঁ। সাহস যে পাবে না, তারই প্রমাণ আজ কোয়েলহো আর ভাসকনসেলসের দৌত্য। তরুন নবাগত পর্তুগীজ সেনানী এসে দাঁড়িয়েছে ডি-মেলোর মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। মূর দোভাষীর মুখে তাদের নিবেদন শুনছিলেন খোদাবক্স খাঁ।

কিন্তু শুনতে শুনতে তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে। কাল রাতের রংমহলের স্মৃতি উন্মনা করে দিয়েছে তাঁকে। মাথার ভেতরে রেশমী পেশোয়াজের ঘূর্ণি; ঘুমোটানা চোখের অম্লিবাণ; বিষাক্ত সাপের মতো কামনাতপ্ত সুঠাম শরীর; ভাঙাচোরা আর কিস্মিসের সুধা-গরল।

কিন্তু স্বপ্ন ভাঙল জামান খাঁর আহ্বানে।

—খোদাবক্স, ওরা মুক্তিপণ দিতে চাইছে।

—কিসের মুক্তিপণ?—চটকা ভেঙে জানতে চাইলেন খোদাবক্স খাঁ।

—পর্তুগীজ সেনাপতির জন্যে।

মুক্তিপণ। মন্দ কী! খোদাবক্স খাঁ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিছু অর্থাগম হয়—সে তো ভালোই। এ বিড়ম্বনা যত তাড়াতাড়ি মিটে যায়, ততই নিশ্চিন্ত হতে পারেন তিনি।

একবার সম্পূর্ণ চোখের দৃষ্টি ফেলে তিনি তাকালেন পর্তুগীজদের দিকে। দুটি স্বচ্ছ দেহ মানুষ স্থির অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। কপালে সেই এক চোখ ঢাকা বাঁকা টুপি, গায়ে ডোরাকাটা বাঘের মতো আঙ্গিয়া—কোমরবন্ধে সরল দীর্ঘাকার তলোয়ার। বিনয়ের বশ্যতা নিয়ে এসেছে বটে, তবু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে স্বস্তি পেলেন না খোদাবক্স খাঁ। কঠিন পিঙ্গল চোখ, সে চোখে মর্মান্তিক ঘৃণা, সুস্পষ্ট জ্বালা। হঠাৎ মনে হল ডোরাদার বাঘের মতোই এ নতুন মানুষগুলো সম্পূর্ণ মানুষ নয়—ওদের অর্ধেকটা জান্তব। ওদের না খোঁচালেই ভালো। ওরা এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বী—যার সঙ্গে এর আগে কোনো পরিচয় তাঁর হয় নি—ভবিষ্যতেও না হলেই তিনি সুখী হবেন। কালিকটের পথ যে ভাবে রক্তে ওরা স্নান করিয়েছিল, যে কাহিনী বিভীষিকার মতো শুনেছেন খোদাবক্স খাঁ, এখানে তার পুনরাবৃত্তি না ঘটলেই তিনি খুশি হবেন।

কোয়েলহোর গম্ভীর কণ্ঠ বেজে উঠল গম গম করে: এক হাজার 'ক্রুজাডো'।*

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চোখের ইঙ্গিতে বাধা দিলেন জামান খাঁ। চাপা গলায় কী একটা জানালেন দোভাষীকে।

দোভাষী বললে, না—নবাব ওতে রাজী নন্।

পর্তুগীজেরা একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। তার পর আবার শোনা গেল কোয়েলহোর গম্ভীর স্বর: এক হাজার আর পাঁচশো ক্রুজাডো।

—না।—জামান খাঁর নির্দেশ এল।

খোদাবক্স খাঁ অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠলেন।

—অনর্থক আর গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই উজীর সাহেব। মিটিয়েই ফেলুন।

—আপনি বুঝতে পারছেন না নবাব। ওরা বানিয়ার জাত। আস্তে আস্তে দর চড়াবে।

ব্যক্তিত্বহীন খোদাবক্স খাঁ চুপ করে রইলেন। নিজের ওপর জোর নেই তাঁর, জোর করে কোনো কথা বলবার ক্ষমতাও নেই। নিরুপায়ভাবে আবার তলিয়ে যেতে চাইলেন দিবাস্বপ্নের মধ্যে।

—না, এতেও নবাব সন্তুষ্ট নন্।

দপ করে একবার জ্বলে উঠল ভাসকন্‌সেলসের চোখ, হাত চলে যেতে চাইল কোমরবন্ধের দিকে। কিন্তু পেছনেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে মূর সৈনিকের দল, তাদের তলোয়ার আর বন্দুক প্রস্তুত হয়েই আছে।

বথাসাধ্য আত্মসংযম করে কোয়েলহো বললেন, দু হাজার ক্রুজাডো।

খোদাবক্স খাঁ আর থাকতে পারলেন না। ডাকলেন, জামান খাঁ?

—আপনি ব্যস্ত হবেন না নবাব। দর আরো চড়বে।

দোভাষী বললে, না, দু হাজারেও হবে না।

তামাটে চাপদাড়ির আড়ালে এবার ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কোয়েলহো। শয়তানির স্বরূপটা একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে ক্রমশ; এ ভাবে হবে না, এ পথে নয়। লোভকে যতই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই বেড়ে চলবে সে—তার বিষাক্ত জাল থেকে কিছুতেই মুক্তি নেই। ত্রিশ হাজার ক্রুজাডো দিলেও না।

অন্য উপায় দেখতে হবে।

অসহ্য ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে—মাথার মধ্যে ফেটে পড়ছে রক্তের হিংস্র উল্লাস। অন্তত দুজনে মিলেই এই বর্বর মূরদের কাছে খ্রীস্টানের বাহুবলের পরিচয় দিতে পারেন—বুঝিয়ে দিতে পারেন আগুন নিয়ে খেলা করছে তারা।

* মোহরটি এক হাজার টাকার সমান। অবশ্য এ নিয়ে মতভেদ আছে।

কিন্তু আপাতত বৈঠকের ইতি হওয়া ভালো নেই, সেটা শেষ পর্যন্ত আস্তাবলের পথায়ে গিয়ে পৌঁছুবে। সময় আসুক—দেখা যাবে তখন।

দুর্বিনীত মাথাটাকে অতি কষ্টে নত করলেন কোয়েলহো।

—আপাতত এর বেশি দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। নবাব অনুগ্রহ করে প্রসন্ন হোন।

মৃদু দোভাষীর কণ্ঠে এবার বাক্যবাণী বেজে উঠল: নবাব খানখানান খোদাবক্স খাঁ বিশ্বাস করেন, পর্তুগিজ ক্যাপ্টিনদের জাহাজগুলো বাজেয়াপ্ত করলেই এর চাইতে লাভবান হবেন তিনি।

বজ্রাহত মেষের মতো দুজন পর্তুগিজই স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কোয়েলহো বললেন, নবাবের কত দাবী?

—পাঁচ হাজার ক্রুজাডো। এবং সেই সঙ্গে নবাবের সেনাবাহিনীতে পর্তুগিজদের সহায়তা।

কোয়েলহো আর একবার ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর উপস্থিত সকলকেই হঠাৎ একটা আকর্ষণ করে বললেন, আমরা ভেবে দেখতে চাই। আশা করি, নবাব আর একদিন আমাদের সময় দেবেন।

একদিন কেন, সাতদিন সময় দিতে রাজী আছেন নবাব। তাঁর তাড়া নেই।

—বেশ তাই হবে। অভিবাদন করে বেরিয়ে গেলেন পর্তুগিজেরা। দরবারশুদ্ধ সমস্ত লোক সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসু চোখে তাঁদের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইল।

খোদাবক্স খাঁ নড়ে উঠলেন একবার।

—উজীর সাহেব, আমার ভালো লাগছে না। ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

ঈষান খাঁ প্রাজ্ঞের হাসি হাসলেন: আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন খোদাবক্স্। যা চেয়েছেন, সবই পাবেন। বলা যায় না, আরো কিছু বেশিই পাবেন হয়তো।

দরবার ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন খোদাবক্স খাঁ। একবার তাকালেন বাইরের দিকে। দুপুরের স্থির রোদে উজ্জ্বল নীলিম আকাশ। রাত আসতে আর দেরী কত? আবার কখন জ্বলবে রংমহলে, আবার সারেঙ্গীতে পড়বে ছড়ের টান, নেশায় রঙীন হবে চোখের দৃষ্টি, ঘুঙুরের তালে তালে শুরু হবে যৌবনের আগুন বর্ষণ, বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হবে—এটা ফিরদৌস না জাহান্নাম? জাহান্নাম, না ফিরদৌস?

না, দিনের এই আলো, এই কোলাহল—এই সব বিরক্তিকর কাজ—এ খোদাবক্স খাঁর ভালো লাগে না। রাত্রিই তাঁর নিজস্ব—রংমহলই তাঁর দরবার।

কত দেরী তার? কখন আসবে সেই রাত?

সেই রাত এল।

রংমহলের উজ্জ্বল আলোয় নয়, গজলের সুরে নয়, সারেঙ্গীর ঝঙ্কারেও নয়। তপ্ত যৌবনের অগ্নিবৃষ্টিও নেই কোথাও। কারাগারের নিষ্ঠুর অন্ধকারের ভেতরে শীতের হিমানী স্পর্শ আরো হিমেল হয়ে উঠতে লাগল।

বন্দী পর্তুগিজেরা কেউ কেউ ওরই মধ্যে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়েছে—কেউ কেউ বা ছায়ার আড়ালে আরো এক এক পুঞ্জ ছায়ার মতো বসে আছে। কোথা থেকে সেই পচা মাংসের কটু গন্ধটা তেমনি ছড়িয়ে চলেছে—প্রথম প্রথম যা আটকে আসত, এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে অনেকখানি। অন্ধকারে গুটিকয়েক ক্ষুদ্রাকার সচল প্রাণী ইতস্তত ছুটোছুটি করছে—তারা ইঁদুর; বিকেলে তাঁদের যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল, তারই ধ্বংসাবশেষের সন্ধানে এসেছে ওরা।

এই অসহ্য অপমানিত বন্দীত্বের ভেতর ওদের মুক্ত জীবন মনে যেন হিংসার জ্বালা ধরায়। নিরুপায় ক্রোধে কে একজন একটা ইঁদুরকে সজোরে লাথি মারল, ধপ করে সেটা ছিটকে গিয়ে পড়ল দেওয়ালে, তারপর আহত-যন্ত্রণায় মানুষের মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ করে উঠল।

সেই শব্দে আত্মমগ্ন অ্যাকোন্সো ডি-মেলো একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বুকের কাছে ঘন হয়ে আছে গজালো—একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন তার মাথায়। সেই সঙ্গে চঠাৎ চমকে ওঠা ঘরের অন্যান্য সমস্ত জাগ্রত—অর্ধ জাগ্রত মানুষগুলোর মতো একই প্রশ্ন জাগল তাঁর মনে: এল? মুক্তির দূত কি এল? ভাস্কনসেলস্ আর কোয়েলহো কি তাঁদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছে?

কিন্তু প্রত্যাশায় ভরা দীর্ঘ দিন কেটে গেছে—তারপর এই ঘরের মধ্যে ঘনিয়ে এসেছে শীতক্লান্ত রাত্রির রাত্রি। এখনো কোনো খবর এল না। ওদেরই বা কী হয়েছে কে বলতে পারে? হয়তো তাঁদের মতো ওরাও এখন কোনো অন্ধকার কারাগারে প্রহর গুণছে। সিলভিরাই ঠিক বুঝেছিল। মুরদের বিশ্বাস নেই।

—A luz!—কে যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তাই বটে। আলো—একটুখানি আলো থাকলেও যেন আশার চিহ্ন থাকত। কী অদ্ভুত—অস্বাভাবিক অন্ধকার! চারদিকে যেন প্রেতাত্মাদের নিঃশব্দ কান্না বাতাসে!

পেড্রোই কি ঠিক বুঝেছে? আত্মসমর্পণ করবেন? রাজী হয়ে যাবেন নবাবের প্রস্তাবে? নিজের মনের মধ্যে কথাটা আবার নতুন করে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ডি-মেলো। যদি সোজাসুজি হত্যার আদেশ দিত, টেনে নিয়ে যেত বধ্যভূমিতে, ডি-মেলো তা সহ্য করতে পারতেন—বীর হিস্পানিয়ার সন্তান মৃত্যুবরণ করতেন বীরের মতো। কিন্তু এই কারাগার অসহ্য। এর অন্ধকার, এর শীতলতা, এর কোনো অলক্ষ্য অংশ থেকে পচা মড়ার গন্ধ—সব একসঙ্গে মিশে যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে তাঁর স্নায়ুকে।

এ যেন তিলে তিলে মানুষকে উন্মত্ততার মধ্যে ঠেলে দেবার ব্যবস্থা। না—মুরদের অনুষ্ঠানে ত্রুটি নেই কোথাও। তবু এর মধ্যেই কে গান গেয়ে উঠল। কার গলায় বেজে উঠল মাতা মেরীর নাম গান। যারা ঘুমুচ্ছিল অথবা ঘুমের ভান করছিল, নড়ে উঠল তারা—কেউ কেউ উঠেও বসল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর আশ্বাসে ভরে উঠল ডি-মেলোর মন। A luz! হ্যাঁ—আলোই পেয়েছেন তিনি। যে মাতা মেরীর নামে হিস্পানিয়ার বুক থেকে মুরদের শেষ দুর্গও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই শক্তিই এ সঙ্কটেও তাঁদের রক্ষা করবে। Conosco—Conosco—গায়ক গেয়ে চলেছে। ঠিক কথা, মেরী আমাদের সঙ্গেই আছেন—তিনিই আমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত শব্দ হল বাইরে। চাপা গোঙানির আওয়াজ—ঝন্ ঝন্ করে তলোয়ারের ধ্বনি। গান বন্ধ করে একসঙ্গে কারাগারের সমস্ত মানুষগুলো দরজার দিকে তাকালো। আর কয়েক মুহূর্ত অনন্ত সময়ের গণ্ডী পার হয়ে প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল—ইস্পাতের পাত দিয়ে গড়া বিরাট দরজা দুটো।

বন্দী পর্তুগীজেরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। বাইরে থেকে একফালি আলো এসে পড়েছে ঘরে। A luz! আর সেই আলোয় চারজন পর্তুগীজের ছায়ামূর্তি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলে। কোয়েলহো, ভ্যাসকন্সেলস্ আর সেই সঙ্গে আরো দুজন সৈনিক!

কেউ কিছু বলবার আগেই তীব্র চাপা-গর্জন এল ভ্যাস্কন্সেলসের গলা থেকে।

—চুপ! প্রহরীদের খুন করে আমরা দরজা খুলে দিয়েছি। এখনি পালাতে হবে। Pronto?

—Pronto!—সমবেত স্বরে তেমনি চাপা প্রতিধ্বনি উঠল: প্রস্তুত।

—তা হলে আর দেরি নয়। এখুনি—এই মুহূর্তেই। কিন্তু একটুও শব্দ না হয়।

নিঃশব্দ পায়ে নিজেদের বুকের স্পন্দন শুনতে শুনতে সদলবলে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। দরজার সামনেই পড়ে আছে মৃত প্রহরীরা—এ জীবনের মতো পাহারা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে ওদের। নিজেদের রক্তে স্নান করছে ওদের দেহ।

ভ্যান্কন্সেলস্ বললেন, এই পথে।

কারাগারের ঠিক পেছনেই উঁচু দেওয়াল। দেওয়ালের ওপারে একটা একাও বটগাছ পিশাচমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। সেই বটগাছের ডাল থেকে সারি সারি দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে নিচে। ওই পথ দিয়ে ওরা নেমেছে—ওই পথ দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে সকলকে!

নিঃশব্দে দড়ি বেয়ে এক একজন উঠতে লাগল ওপরে। কিন্তু বিলম্বলা দেখা দিল। এতগুলি মানুষের আকর্ষণে বার বার বিশ্রী শব্দ হতে লাগল গাছের ডালে—গাছের ওপর ঘুমন্ত কতগুলো কাক আচমকা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

আর ভীতি-বিহ্বল পর্তুগীজেরা দেখল, দূরে কাছের অন্ধকারে আচমকা কতগুলো মশাল দুলে উঠছে। শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড চিৎকার—পালায়—পালায়—

নবাবের রক্ষীরা টের পেয়েছে!

দড়ি ধরে যারা ঝুলছিল, তারা পাথর হয়ে রইল। কোয়েলহো ভ্যান্কন্সেলসের সঙ্গে যে দু একজন প্রাচীরের ওপর উঠতে পেরেছিল, তারা অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল!

ওদিক থেকে দুম্‌দাম্ করে কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ এল। আর্তনাদ তুলে প্রাচীরের ওপর থেকে একজন ডি-মেলোর পায়ের কাছে আছড়ে পড়েই স্থির হয়ে গেল। এগিয়ে আসা মশালের আলোয় ডি-মেলো তার রক্তাক্ত মৃতদেহটাকে চিনতে পারলেন: সে পেড্রো!

অসহায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে অবশিষ্ট পর্তুগীজদের সঙ্গে ডি-মেলোও হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালাবার পথ নেই আর—আর উপায় নেই। চারদিক থেকে খোদাবক্স খাঁর সৈন্যদল তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। আর মশালের আলোয় কোতোয়ালের হাতে ঝকমক করছে নগ্ন খরধার তলোয়ার।

A luz! সে আলো নিবে গেছে। তবু একটা সান্ত্বনা আছে এখনো। সকলের আগেই প্রাচীরের বাইরে চলে যেতে পেরেছে গঞ্জালো। সে অন্তত মুক্তি পেয়েছে এই অনন্ত কারাগারের অমানুষিক দুঃস্বপ্ন থেকে। এর পরে তাঁদের যা হওয়ার তাই হোক।

পায়ের কাছে নিজের রক্তের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পেড্রো। বিদ্রোহী হয়েছিল—এবার তার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু তারও মুক্তি হয়ে গেছে—আর দুঃখ করবার মতো কিছুই নেই!

* *

মুক্তি!

গঞ্জালোও তাই ভেবেছিল হয়তো। কিন্তু বাইরে নেমে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রাচীরের ভেতরে যে বন্দুকের আওয়াজ চলছে—বাইরেও সে বিভীষিকা থেকে মুক্তি নেই। প্রচণ্ড কোলাহল তুলে এখানেও ছুটে আসছে নবাবের সৈন্য!

অভ্যাস বসেই যেন একবার আশ্রয় আর আশ্বাসের আশায় তাকালো গঞ্জালো—খুঁজতে চাইল কাছাকাছি কোথাও ডি-মেলো আছেন কিনা! কিন্তু ডি-মেলো কেন—কোয়েলহো, ভ্যান্কন্সেলসকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পরক্ষণেই পেছনে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল সে। ঊর্ধ্বশ্বাসে গঞ্জালো ছুটে চলল।

হাতে একখানা তলোয়ার—একটি ছোট অস্ত্র, যা হোক

কিছু থাকলেও এমন করে ছুটে পালাত না গঙ্গালো, রুখে দাঁড়াত সিংহ-শাবকের মতো। কিন্তু কৈশোরের সমস্ত উত্তেজনা সত্ত্বেও এটা সে বুঝতে পেরেছে যে ওভাবে ফিরে পড়ানো মানেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করা। গঙ্গালো এগিয়ে চলল যথাশক্তি দ্রুত পায়ে।

অচেনা দেশ, অচেনা মাটি। কোথায় যাবে জানে না, কোথায় তার শত্রু মিত্র তাও বোঝবার ক্ষমতা নেই। কৃষ্ণপক্ষের কালো অন্ধকার চারদিকে। এলোমেলো হাওয়ায় হু হু করছে দীর্ঘকায় নারিকেল বন, প্রতি পায়ে পায়ে হোঁচট লাগছে, বিচ্ছিন্ন জঙ্গলে পথ আটকে যাচ্ছে বারবার। আর তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে নিচুর ঘোড়ার পায়ের শব্দ। এসে পড়ল—এসে পড়ল বুঝি!

কতক্ষণ ছুটেছে জানে না। প্রবল শীতের হাওয়াতেও কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে তার। পা ভেঙে আসছে—আর সে ছুটতে পারে না। ঘোড়ার খুরের শব্দ অন্যদিক দিয়ে চলে গেল—ওকে খুঁজে পায়নি। একবার থেমে দাঁড়ালো গঙ্গালো—বড় বড় শ্বাস ফেলতে ফেলতে তাকিয়ে দেখল চারদিকে।

এতক্ষণ চারপাশে ছিল নীরন্ধ্র অন্ধকার—এইবার আলো দেখা যাচ্ছে একটা। শত্রু, না মিত্র? কিন্তু আর বিচার করার উপায় নেই গঙ্গালোর। মিত্র হলে আশ্রয় চাইবে, শত্রু হলে আত্মসমর্পণ করে বলবে, এবার আমাকে নিয়ে তোমাদের যা খুশি করো।

আলোর রেখাটা লক্ষ্য করেই এগিয়ে চলল গঙ্গালো।

খানিকদূর যেতেই দেখা গেল আলো আসছে একটা টিলার ওপর থেকে। সেই টিলার গায়ে ডুবের মতো শাদা একটি বাড়ি—তার চূড়াগ্র ছুঁয়ে উঠেছে আকাশে। অনেকটা 'ইগ্রেজা'র মতোই দেখতে। গঙ্গালো বুঝতে পারল। এর আগেও সে কিছু কিছু ও-রকম বাড়ি দেখেছে, ও আর কিছু নয়—'জেন্টুয়'দের ধর্মমন্দির।

ওখানে অন্তত আশ্রয় পাওয়া যাবে। অন্তত ওখানে নবাবের সৈন্য তার ভেতে পাতা পেতে অপেক্ষা করছে না। আশ্বাস আর আশায় ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে চলতে লাগল গঙ্গালো।

আর রাজেশ্বর শ্রেঞ্জির নতুন মন্দিরের চাতালে শুরু সোমদেব বসে ছিলেন নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে। যে তীক্ষ্ণ অন্তর্জ্বালায় তাঁর রক্তাভ চোখ দুটো সব সময়ে জ্বলজ্বল করে, সে জ্বালা এখন নির্বাপিত। ভক্তের দৃষ্টিতে এখন ভক্তির আচ্ছন্নতা। সোমদেব যেন ধ্যানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলেন, মহাকালী সাক্ষাৎ তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর হাতে বরাভয়, তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

দেবী বললেন, তোমার স্বপ্ন সফল হবে বৎস, যা চেয়েছ, তাই পাবে।

—আর কত দেরি মা, আর কত দেরি?—সোমদেব জিজ্ঞাসা করলেন আকুল হয়ে।

—সময় এগিয়ে আসছে তার। কিন্তু তার জন্যে পুজো চাই, চাই বলি—

বলি।

হঠাৎ কাছেই কেমন একটা শব্দ হল। চমকে চোখ মেললেন সোমদেব। সামনে যে প্রদীপের শিখাটি জোরালো হাওয়ার নিচু নিচু হয়ে আবার দপ করে জ্বলে উঠছিল—একটা আকস্মিক দীপ্তিতে শিখান্বিত হয়ে উঠল সেটা। সেই আলোয় সোমদেব একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেন।

একটি কিশোর এসে দাঁড়িয়েছে। দুগ্ধশুভ্র তার গায়ের রঙ—মাথায় রুক্ষিম চুল। দুটি নীলাভ চোখে, সমস্ত মুখের চেহারায় ভয়ের কালো ছায়া জড়িয়ে রয়েছে। শ্রান্তিতে বড় বড় শ্বাস ফেলছে সে। সোমদেব চিনতে পারলেন: হার্মাদ!

—কী চাও তুমি এখানে?

অপরিচিত ভাষা গঙ্গালো বুঝতে পারলনা, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলে, সে তৃষ্ণার্ত, জল চায়; আর চায়, একটি রাতের মতো কোথাও নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সোমদেব। মনে পড়ে গেল, চাকারিয়ার নবাবের সঙ্গে কী একটা গোলমাল হয়েছে হার্মাদের। শুনেছিলেন, তাদের জাহাজ আটক করা হয়েছে, কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছে কয়েদখানায়। তা ছাড়া আর একটু আগেই যেন দূর থেকে বন্দুকের শব্দের মতো কী একটা শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি।

তবে তাই। বন্দী হার্মাদের একজন। পালিয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা বিচিত্র হাসিতে ভরে গেল সোমদেবের মুখ। কানের কাছে মহাকালীর আদেশ বেজে উঠছে তাঁর। চাই পুজো—চাই বলি!

চত্বর থেকে নেমে এলেন সোমদেব। প্রদীপের আলোয় তাঁর রক্তাক্ত চোখ আর সাপের মতো ফণাধরা চুলের দিকে তাকিয়ে একবার যেন পিছিয়ে যেতে চাইল গঙ্গালো। কিন্তু তার আগেই সোমদেব এগিয়ে এসে হাত ধরলেন তার।

কঠিন কর্কশ স্বরকে যথাসাধ্য কোমল করে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

ক্রমশঃ

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট্
সাবানের
গুণে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
S. 805-50 BG

শ্যামাপ্রসাদের অকাল-প্রয়াণ—

জন্মভূমি ছইতে বহু দূরে,—আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবহীন পরিস্থিতির মধ্যে, বন্দীশালায়, বাঙ্গালার প্রাণপ্রিয় ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটী সন্তান, দেশমাতৃকার আত্ম-নিবেদিত

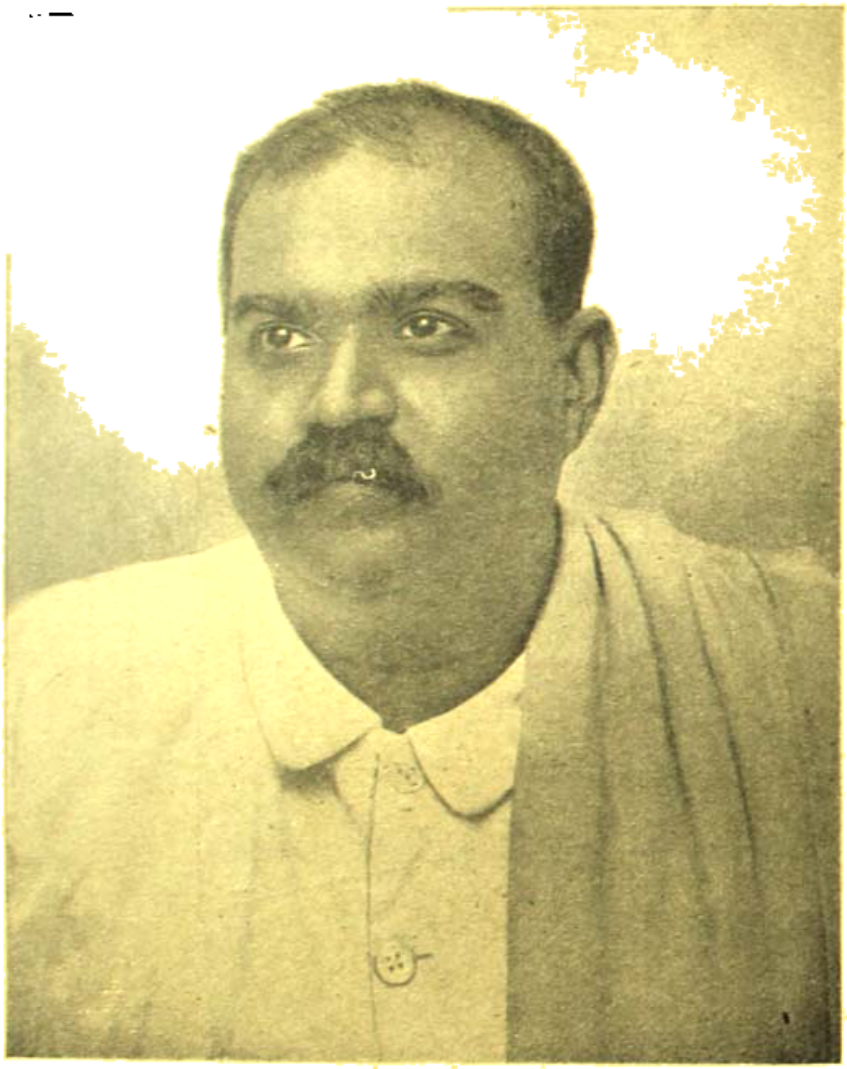

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ফটো—ইণ্ডিয়ান আর্ট গ্যালারী

প্রাণ পুরুষ সিংহ প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত পুত্র ডকটর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁর অকাল-বিয়োগে আজ বাঙ্গালীর শোকের সীমা নাই—সে শোক প্রকাশের ভাষা নাই, লেখনী তাহার প্রকাশে স্তম্ভিত হইয়া যায়। ৮২ বৎসরের বৃদ্ধা জননী আজ পুত্রহারা অবস্থায় কি ভাবে দিন-যাপন করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলেও অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। যে গৃহের পারিবারিক সম্বন্ধের মধুরতা যে কোন মানুষের ঈর্ষার বস্তু, যে গৃহে ভ্রাতৃ-প্রেমের আদর্শ যে কোন আগন্তুককে মুগ্ধ করিত—সেই গৃহে অনুজের পরলোক গমনে অগ্রজ বিচারপতি রমাপ্রসাদের কথা আমরা চিন্তা করিতেও বেদনা অনুভব করি। জাতির কথা ত বলিবার নহে—বাংলা দেশে এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি খুব কমই আছেন, যিনি কোন না কোন কার্য্য উপলক্ষে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না আসিয়াছেন এবং যাঁহারা আসিয়াছেন আজ তাঁহারা সকলেই স্বজন-বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান। শ্যামাপ্রসাদের গুণাবলীর কথা যতই মনে হয়, মন ততই অধিক পরিমাণে বিহ্বল হইয়া যায়। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থ-নীতি ও সমাজ কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা চিন্তার অতীত। মনে হয়, পরম দয়াল ভগবান তাঁহাকে সর্বগুণান্বিত করিয়া এবং অসীম কর্মশক্তি দিয়া আমাদের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন—

আমাদের দুর্ভাগ্য—আমরা অধিক দিন তাঁহার উপকার গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলাম না। শৈশবে মাতৃহীন পুত্রকন্যাগণকে এবং তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও অন্যান্য পরিজনদিগকে এই শোকে অশ্রুমৌন সমবেদনা জানাই। আর জানাই তাঁহার অগণিত দেশবাসীকে আজ যাহারা তাঁহাদেরই মত সুহৃদ-বিরহে কাতর। শ্রীভগবানের নির্দেশ বুঝিবার মত বুদ্ধি বা শক্তি মানুষের নাই—তিনি সকলকে উপযুক্ত সহন-শক্তি দান করুন—ইহাই প্রার্থনা। শ্যামাপ্রসাদ মরজগতে না থাকিয়াও অমর হইয়া থাকুন—তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

শ্যামাপ্রসাদের নামে পথ—

গত ৩রা জুলাই কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনা সম্বন্ধে তদন্তের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণের পর মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে স্থির হয়, আশুতোষ মুখার্জি রোড ও রমেশ মিত্র রোডের সংযোগ স্থল হইতে রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউর সংযোগ স্থলের মধ্যবর্তী রসা রোডের অংশটি শ্যামাপ্রসাদের নামে নামকরণ করা হইবে। শ্যামা-প্রসাদের কার্য্যই তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে—এ সকল স্মৃতিরক্ষা ব্যবস্থা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। তথাপি ইহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। আমরা শ্রীমুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার সময়োচিত প্রস্তাবের সমর্থন করি।

শ্রীনেহরু ও শ্যামাপ্রসাদ—

বিলাত হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সম্পর্কে গত ২রা জুলাই এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—"সম্পূর্ণ কল্পনাতীত বলিয়া ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদে বেশী আঘাত পাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে অনেক সময় তাঁহার সহিত আমার মতের মিল হয় নাই এবং সংসদে বহুবার আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ হইয়াছে। আমাদের মতের অমিল যতই থাকুক না কেন আমরা উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধা করিতাম ও প্রীতির চক্ষে দেখিতাম। তাঁহার মৃত্যুতে বিরাট ক্ষতি হইল। তবে সংসদই সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দেশের পক্ষে যখন অনন্যসাধারণ কর্মযোগীর প্রয়োজন তখন আমাদের এই অভাব আরও বড় হইয়া দেখা দিল। আটক থাকাকালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে—ইহা খুবই দুঃখ ও বেদনাদায়ক—তাঁহার সহিত যতই বিরোধ থাকুক না কেন, কাশ্মীর সরকার এই অবস্থায় যতদূর সম্ভব তাঁহার সুখ-সুবিধা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারাও ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে আঘাত পাইয়াছেন। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঘটনা ঘটিয়া গেলে তখন কি করা উচিত ছিল বা কি করা হয় নাই ইত্যাদি বলা সকলের পক্ষেই সহজ। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলাও কি ঘটিতে যাইতেছে, তাহা কেহ সন্দেহ মাত্র করে নাই এবং ডাঃ শ্যামাপ্রসাদও তাঁহার বন্ধু উকীলের সঙ্গে দেখা করেন ও কলিকাতায় আত্মীয়স্বজনকে উৎকণ্ঠিত না হইতে বলিয়া তার প্রেরণ করেন।

এভারেষ্ট বিজয়ী তেনজিং—

দার্জিলিং জেলার অধিবাসী, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক—তেনজিং হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর বা

তেনজিং ফটো—ভি রহমান

মাউণ্ট এভারেষ্টে আরোহণ করিয়া যে কীর্তি রক্ষা করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে জগতের ইতিহাসে অমরত্ব দান

করিবে। সাধনার দ্বারা যে সিদ্ধিলাভ করা যায় তেনজিংয়ের জীবন তাহার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বহুবার বহু দল অভিযাত্রীর সঙ্গে গিরিশৃঙ্গ আরোহণ করিয়া তেনজিং যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বর্তমান অভিযানে সাফল্য দান করিয়াছে। সাফল্যই মানুষকে নূতনতর জীবন দান করে—তিনি বহু সম্মান ও অর্থ লাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে স্থায়ী কার্য্য, বাসস্থান ও জীবিকার্জনের উপায় দান করিবার জন্য নূতন পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন—তাঁহাকে পর্বতারোহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা করা হইবে। তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও দুই কন্যাও জগতে সুপরিচিতা হইলেন। তেনজিং-এর জীবন অসাধারণ অধ্যবসায়, অসামান্য কর্মশক্তি, ত্যাগস্বীকার, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের আধার। পশ্চিমবঙ্গের তরুণগণের নিকট তাহা অনুকরণের বিষয়। আমরা তেনজিং-এর সাফল্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি এবং তাঁহার অধিকতর সাফল্য, দীর্ঘজীবন ও শান্তি কামনা করি।

পর্বতারোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—

শ্রীতেনজিং কর্তৃক গৌরীশৃঙ্গ বিজয় স্মরণীয় করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট দার্জিলিং এলাকায় একটি পর্বতারোহণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তথায় হিমালয় পর্বতের নানা বিষয়ে জ্ঞানচিত্র রক্ষা করা হইবে। পর্বতারোহণ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত যে সকল সরঞ্জাম ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা রাখা হইবে ও শ্রীতেনজিংকে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হইবে। যে স্থানে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে তাহার নিকট বাসগৃহ নির্মাণের জন্য তেনজিংকে একখণ্ড জমীও দান করা হইবে। সভ্যতার উন্নতির সহিত হিমালয় পর্বতের সকল রত্নাদির সহিত মানুষের পরিচয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। গৌরীশৃঙ্গ বিজয় তাহারই সূচনা মাত্র।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়—

গত ১লা জুলাই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের দ্বিসপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি ও জন্মদিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটী তাঁহাকে কংগ্রেস-ভবনে (কলিকাতা—৯বি, চৌরঙ্গী রোড) এক প্রীতি সম্মিলনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। ঐ উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়া উপহার দেন এবং ডাক্তার রায় ঐ তোড়া কংগ্রেসের কার্য্যে ব্যয়ের জন্য কংগ্রেস কমিটীকে দান করেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সমগ্র দেশবাসী একমাত্র বিধানচন্দ্রের অসামান্য বুদ্ধি, অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও অপরিসীম শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে। কাজেই তাঁহার জন্মদিবসে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক অধিবাসী তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন ও অটুট স্বাস্থ্য কামনা করিয়াছে। আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি ও ভগবানের নিকট তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে ডাক্তার রায় আবেগ পূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন। তিনি যখন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন, তখন তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া যায় ও দুই চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। তিনি শ্রদ্ধার সহিত বাংলার ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়া চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির দানের কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন ও সকলকে সেই পথে চলিতে উপদেশ দেন। সর্বশেষে দৃঢ়তার সহিত ডাক্তার রায় বলেন—"আমরা স্থির করিয়াছি, আমরা বাঁচিবই। কিরূপে বাঁচিব?—কেবল নিজের চিন্তায় বড় হওয়া যায় না। মানুষ যতক্ষণ না দলের সহিত মিলিত হইতে পারিতেছে, স্বার্থকে পরার্থের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারিতেছে, ততদিন সে পারিবে না—বাঁচা সার্থক হইবে না। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া বিসম্বাদ পরিহার করিয়া অগ্রসর হইতে আহ্বান জানান। তিনি নিজেকে গণ্ডীর বাহিরে বিস্তারিত করিয়া দিতে বলেন। তিনি বলেন—অহমিকা ত্যাগ না করিলে দলাদলির ভাব যাইবে না। তিনি বলেন—অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, কিন্তু একা নহে, অন্যদের লইয়া অগ্রসর হও।

বিধান সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্তমান নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা ২৩৮ এবং দিল্লী লোক সভায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি সংখ্যা ৩৪। অর্থাৎ প্রতি ৭টি বিধান সভা কেন্দ্র একত্র করিয়া একটি লোক সভা কেন্দ্র গঠিত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটী বিধান সভার সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ২৭২ করার জন্য এক স্মারকলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে

"সত্য সত্যই...

...লাক্স টয়লেট্ সাবান

মেখে আপনি আরও সুন্দর হ'তে পারেন"

রেণুকা রায়

বলেন।

এই হোলো আসল সৌন্দর্য্যের যত্ন! রেণুকা রায় বলেন "আমি লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সুগন্ধি, মাখনের মতো ফেনা বেশ ভাল করে ঘ'ষে নিই। ধুয়ে ফেলার পর যখন আমি নরম তোয়ালে দিয়ে জল মুছি, আমার ত্বক এক নতুন তাজা লাবণ্যে ভ'রে যায়।"

লাক্স টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 376-X30 BG

[illegible] সকল সভ্য দাঁড়াইবার
[illegible] কমিটি নূতন সভ্য কেন্দ্র
[illegible] সভ্য শ্রেণী গঠিত হইবে।
[illegible] সভ্যদের সময় কর্ম্মিসংঘের লোক সংখ্যা ধরা
[illegible] ১৯৩১ সালের হিসাবে দেখা
[illegible] সংখ্যা ৩৬০ জন। সংবিধানে আছে প্রতি ৭৫ হাজার
[illegible] একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু এখন
[illegible] একজন প্রতিনিধির ব্যবস্থা
[illegible] সকল সংখ্যা ১১১ করা হইলেও প্রতি কেন্দ্রের
[illegible] সংখ্যা হইবে ৩২৪ জনের। বর্ত্তমানে কেন্দ্র-
[illegible] প্রতিনিধিদের পক্ষে সমর
[illegible] সম্ভব হয় না। সকল দিক বিবেচনা
[illegible] করিলে কার্য্যকরী সকল সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী
[illegible] করি।

শ্রীযুক্তা ভক্তিসুধা দেবী—

[illegible] কলিকাতা আশুতোষ
কলিকাতার কলেজিক ও সাহিত্যানুরাগী
মহিলা স্বাস্থ্যনাম লেখিকা শ্রীযুক্তা
[illegible] সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।
[illegible] বর্ত্তমানে বয়স ৬ মাস। তিনি
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই-সি-এস
এর কন্যা। কন্যা ও স্বাস্থ্যনাম সাহিত্যিক জীবন—প্রবন্ধ
চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী। তিনি বাল্যজীবন হইতে সঙ্গীত
ও সাহিত্য আলোচনা করিতেছেন। ১৮৭৩ সালের ২৯শে
ডিসেম্বর তিনি কলিকাতা বিডনপুরে তাঁহার জন্ম হয়। ৬
বৎসর বয়সে তিনি প্রথম বিদ্যালয়ে যান—সিমলার অক্সফোর্ড
মিশন স্কুলে ও পরে মেট্রোপলিটান স্কুলে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি
বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পদ্মাবতী পদক
প্রাপ্ত হন। প্রথম তাঁহাকে হিন্দী গান ও সেতার শিক্ষা
করিয়া পরে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা গ্রহণ করেন।
কলেজে পড়ার সময় তিনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন।
পরবর্ত্তীকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভুবনমোহিনী
স্বর্ণপদক দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। ১৮৯৯ সালে প্রমথবাবুর
সহিত তাঁহার বিবাহ হয়—তিনি সাহিত্য চর্চায় প্রমথবাবুর
সহকর্মী ছিলেন—'সবুজপত্র' পরিচালনায় তিনি বিশেষ
অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সাল হইতে তিনি
শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন। আমরা এই অশীতিপর
বৃদ্ধার ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দানের কথা
শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক অভিবাদন
জ্ঞাপন করি ও প্রার্থনা করি, তাঁহার আদর্শ অনুসৃত হউক।

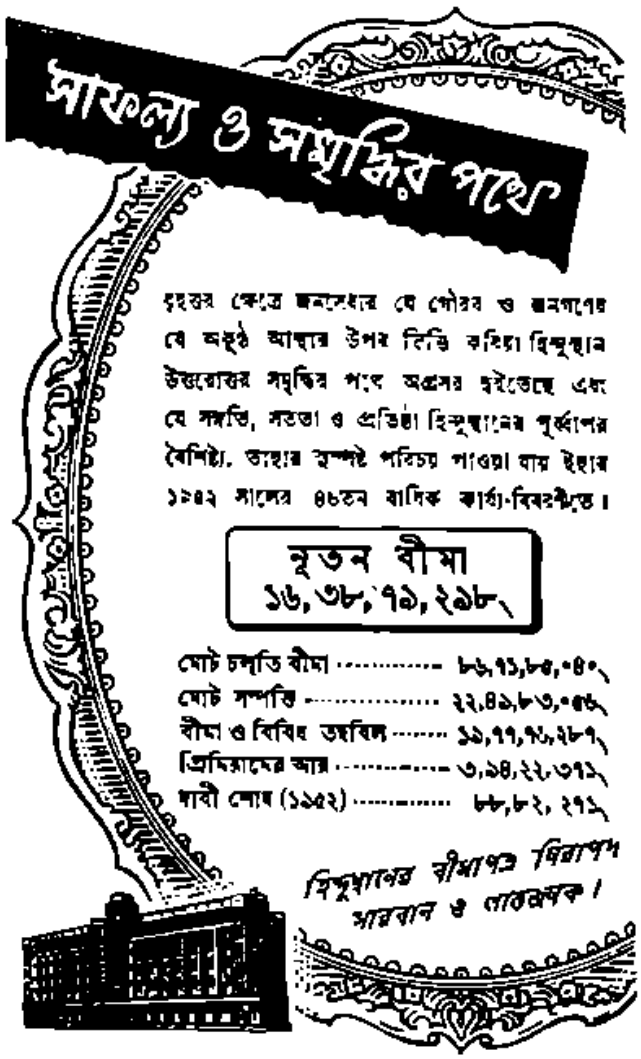

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও লাবণ্যময় ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত আপনার জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।

রোজ রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করুন। এর ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ের চামড়াকে দিনে দিনে আরও কোমল, আরও নির্ম্মল কোরে তুলবে।

রেক্সোনা

ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

০ শুভ্রতাদায়ক ও কোমলতাপ্রসূ কতকগুলি তেলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

RP. 109-50 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ক'লকাতায় জার্মান ফুটবলদলের সফর

পশ্চিম জার্মানীর অফেনবাচ কিকার্স ক্লাব তাদের সুদূরপ্রাচ্যের ফুটবল সফর শেষ ক'রে স্বদেশে ফেরার পথে ক'লকাতায় দুটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেছে। সুদূরপ্রাচ্যের খেলায় এই দলটি অপরাজেয় ছিল এবং ক'লকাতায় মোহনবাগানকে ১-০ গোলে এবং ইষ্টবেঙ্গলকে ১-০ গোলে হারিয়ে তাদের সেই অপরাজেয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে গেছে। খেলায় জার্মানদল কম গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়েছে এবং সেদিক থেকে ভারতীয়দলের হার খুব নিন্দনীয় হয়নি। কিন্তু এই গোল সংখ্যার ব্যবধান দিয়ে জার্মানদলের খেলার বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। জার্মানদলের ক্রীড়াপদ্ধতি ভারতীয়দলের থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং দর্শনীয়। জার্মানদলের ক্রীড়াপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—গা ঘেঁচিয়ে খেলা,

জার্মানির অফেনবাচ কিকার্স এবং মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়বৃন্দ ফটো : ভোলা বসু

জার্মানির অফেনবাচ কিকার্স দলের বিপক্ষে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ফটো : ডি রহমান

মাপা ছোট ছোট সর্টে নিখুঁতভাবে বল পাশ করা,আত্মরক্ষায় এবং আক্রমণ রচনায় মাপা দিয়ে বল খেলা, বল আদান-প্রদানে খেলোয়াড়দের মধ্যে নির্ভুল বোঝাপড়া,মাঠে নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁদের সৌষ্ঠবময় দৈহিক গঠন, খেলায় পর্য্যাপ্ত দম এবং তাঁদের স্থান বদল ক'রে নিখুঁত খেলা। খেলোয়াড়দের সর্টের দূরত্ব খুবই, কিন্তু অতি নিকটে গোল পেয়েও কদাচিৎ তাঁদের তীব্র সর্ট মারতে দেখা গেছে। এইখানেই তাঁদের খেলার যা দুর্বলতা ধরা পড়ে।

ফুটবল লীগ ঃ

ট্রামের ২য় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সহরে যে আন্দোলন চলছে তাতে সহরের যানবাহন ব্যবস্থায় এবং সাধারণ নাগরিক জীবনযাত্রায় এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাঠে নামকরা দলের ফুটবল খেলাগুলি নির্দ্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, পুলিসবাহিনী মাঠ তদারক করার কাজে হাজিরা দিতে পারছে না বলে। প্রথম বিভাগের লীগ তালিকায় প্রথম ৫টি দলের অবস্থান নিম্নে দেওয়া হ'ল—

	খেলা	জয়	ড্র	হার	প	বি	পয়েন্ট
ইস্টবেঙ্গল	১৬	১২	৩	১	২৮	৭	২৭
মোহনবাগান	১৬	১০	৪	১	২৪	৫	২৪
রাজস্থান	১৬	৯	৬	১	২১	১১	২৪
এরিয়ান্স	১৭	৭	৮	২	১৮	১৩	২২
ওয়াড়ী	১৮	৮	৬	৪	১৮	১১	২২

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৪৯ (হ্যাসেট ১১৫, মরিস ৬৭, মিলার ৫৫। বেডসার ৫৫ রানে ৭ উইকেট) ও ১২৩ (মরিস ৬০। বেডসার ৪৪ রানে ৭ এবং টাটারসল ২২ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ১৪৪ (হাটন ৪৩, ওয়ার্ডলে নট আউট ২৯। লিণ্ডওয়াল ৫৭ রানে ৫, মিলি ৩৫ রানে ৩, ডেভিডসন ২২ রানে ২ উইঃ) ও ১২০ (১ উইকেটে। হাটন নট আউট ৬০, সিম্পসন নট আউট ২৮)

নটিংহামের ট্রেণ্টব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৪১তম টেষ্ট ক্রিকেট পর্য্যায়ের প্রথম টেষ্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ইংলণ্ড জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ হাতে পেয়েও শেষ পর্য্যন্ত তার সদ্ব্যবহার করতে পারেনি, বরুণদেবের কোপদৃষ্টিতে খেলা ভণ্ডুল হয়ে যায়। বৃষ্টির দরুণ এবং উপযুক্ত আলো না থাকায় প্রথম দিনের খেলার অনেকটা সময় নষ্ট হয়। খেলার চতুর্থ দিন প্রবল বৃষ্টির দরুণ খেলা আরম্ভ করা সম্ভবই হয়নি। পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষদিনে দু'দলের অধিনায়কের মধ্যে খেলা আরম্ভ নিয়ে মতবিরোধ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত আম্পায়ারদের মধ্যস্থতায় বেলা ৪-৫০ মিনিটে খেলা সুরু হয়,—তাও দু'ঘণ্টার জন্যে।

একমাত্র বরুণদেবের হস্তক্ষেপেই প্রথম টেষ্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'ল না। ইংলণ্ডের দুর্ভাগ্য! ইংলণ্ড যে জয়ী হ'ত, এমন কথা ক্রিকেট খেলায় নিশ্চয় করে বলা যায় না। জয়লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ তাদের যে হাতছাড়া হ'ল একথা অনস্বীকার্য্য। ট্রেণ্টব্রীজের ক্রিকেট পীচ রান তোলার পক্ষে সহায়ক, ব্যাটসম্যানদের 'স্বর্গরাজ্য' বলা হয়। এখানে বোলাররা পীচ থেকে কোন সুবিধা পান্ না। কিন্তু আলোচ্য খেলায় ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত সুযোগ নিতে পারেননি; অপরদিকে নিষ্প্রাণ উইকেট থেকে কোন সহযোগিতা না পেয়েও বোলিং ব্যাটিংয়ের ওপর টেক্কা দিয়েছে! ইংলণ্ডের বেডসার এবং হাটন, অষ্ট্রেলিয়ার হ্যাসেট এবং মরিস—এই চারজন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্যের মধ্যেই প্রথম টেষ্ট খেলা সীমাবদ্ধ। দুই দলেরই ফিল্ডিং উচ্চস্তরের হয়েছে, বিশেষ ক'রে ক্যাচ ধরা। দুই দলই তিনটি শক্ত 'ক্যাচ' ধরে অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছে।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৪৬ (হ্যাসেট ১০৬, হার্ভে ৫৯, ডেভিডসন ৭৬। বেডসার ১০৫ রানে ৫ ও ওয়ার্ডলে ৭৭ রানে ৪ উইঃ) ও ৩৬৮ (মিলার ১০৯, মরিস ৮৯, লিণ্ডওয়াল ৫০। ব্রাউন ৮২ রানে ৪, বেডসার ৭৭ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ৩৭২ (হাটন ১৪৫, গ্রেভনী ৭৮, কম্পটন ৫৭। লিণ্ডওয়াল ৬৬ রানে ৫ উইঃ) ও ২৮২ (৭ উইকেটে। ওয়াটসন ১০৯, বেলী ৭১)

ঐতিহ্যমণ্ডিত লর্ডস মাঠে আলোচ্য ৪১তম টেষ্ট পর্য্যায়ের ২য় টেষ্ট খেলাও অমীমাংসিত থেকে গেছে।

প্রথম তিনদিনে দেখা গেল খেলার অবস্থাটা দোদুল্যমান—কোন এক পক্ষের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল না

প্রথম দিন অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ছিল, দ্বিতীয় দিনে ইংলণ্ডের দিকে আবার পুনরায় অষ্ট্রেলিয়ার দিকে ঝুঁকে তৃতীয় দিনে।

চতুর্থ দিনের খেলার শেষে অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থা খুব ভালই দাঁড়াল। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংসে ৩৬৮ রান; খেলায় জিততে হ'লে ইংলণ্ডের ৩৬৩ রান দরকার, হাতে সময় ৭ ঘণ্টার কিছু কম। সেই দিনেই ইংলণ্ডের ২য় ইনিংসের ৩টে উইকেট পড়ে যায় মাত্র ২০ রানে, ৪০ মিনিটের খেলায়। হাটন, কেনিয়ন এবং গ্রেভনী যথাক্রমে ৫২ এবং ২ রান ক'রে কট-আউট হলেন। অষ্ট্রেলিয়ার চৌকস খেলোয়াড় কিথ মিলার ২য় ইনিংসে ১০৯ রান করেন। ইংলণ্ডের বিপক্ষে মিলারের এটা ৩য় সেঞ্চুরী এবং তাঁর টেষ্ট খেলোয়াড় জীবনের ৪র্থ সেঞ্চুরী।

দুটা খেলোয়াড় মরিস তাঁর ৮৯ রানের মাথায় ষ্ট্যাথামের হাতে ধরা পড়ে আউট হ'ন। ষ্ট্যাথাম দৌড়ে গিয়ে চমৎকার ভাবে মরিসের ক্যাচটা ধরেন। এদিনের আর একটা উল্লেখযোগ্য ক্যাচ অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট-কিপার ব্যাংলির,—ঝাঁপিয়ে গ্রেভনীর তোলা বল লুফে নেওয়া।

ক্রিকেট খেলার ফলাফল কত অনিশ্চিত জেনেও খেলার শেষদিনে খেলা আরম্ভের সময় পাঁচ হাজারের মত দর্শকের খেলা দেখার উৎসাহ ছিল। পূর্ব্বদিন মাত্র ২০ রানে ইংলণ্ডের তিনটে উইকেট খোয়া গেছে—এ শোচনীয় অবস্থার পর দর্শকদের মধ্যে খেলা দেখার উৎসাহ বোধ হয় আর ছিল না। ইংলণ্ডকে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে টেনে তুলেন পঞ্চম উইকেটের জুটি ওয়াটসন এবং বেলী। ৪ ঘণ্টা ১০ মিনিটের খেলায় এঁদের জুটিতে ১৬৩ রান ওঠে, দলের ৭ উইকেটের ২৮২ রানের মধ্যে। ওয়াটসন ১০৯ রান করেন, টেষ্ট খেলায় এটা তাঁর ১ম সেঞ্চুরী। বেলী করেন ৭১ রান। ইংলণ্ড দলের ২৮২ রানে ৭টা উইকেট পড়ার পর ওয়ার্ডলে যখন খেলতে নামলেন তখন আর মাত্র ৪টে বল খেলার মত সময় ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইংলণ্ডের রান দাঁড়াল ২৮২, ৭ উইকেটে—অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ৬০ রান পিছনে, হাতে জমা ৩টে উইকেট।

বেডসার ২য় টেষ্টে মোট ৮টা উইকেট পান; তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০৬টা, ৪৪টা টেষ্ট খেলায়। অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮৬টা উইকেট—১৭টা টেষ্ট খেলায়। ১২।৭।৪৩

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীনরীশ্বর চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "দেবাবতার"—৪৲

শ্রীভোলা সেন প্রণীত উপন্যাস "উপন্যাসের উপকরণ"—২।০

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "পতঙ্গ" (২য় পর্ব্ব)—২।০

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "তরুণী-সঙ্ঘ" (৪র্থ সং)—২৲

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস

"কালের মন্দিরা" (২য় সং)—৸৹

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত "প্রাচীর ও প্রান্তর" (৩য় সং)—৩৲

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিন্দুর ছেলে" (২য় পর্ব—১৬শ সং)—৩৲,

"দেবদাস" (১৭শ সং)—২৲

শরৎচন্দ্রের কাহিনীর নাট্যরূপ "বিরাজ-বৌ" (২য় সং)—২৲,

"দেবদাস"—২৲

শ্রীতারাশঙ্কর রায় প্রণীত "পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস" (৩য় খণ্ড)—১০৲

শ্রীবসন্তকুমার প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "দুরাত্মার ছল"—১৲

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা-অনূদিত "চার্জ্জিন দি এপ্‌ম্যান"—১।০

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত বহুকোপন্যাস "মায়াবী ও কৃষ্ণা"—১৷০

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "কালগ্রাস"—১৲,

"মৃত্যুপরশ"—১৲, "মায়ণ-মন্ত্র"—১৷০, "করকমলেষু"—২৲

বিমল কর প্রণীত বহুকোপন্যাস "গ্যাস বার্ণার"—৩৲

শ্রীস্থানাপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "নূতন পৃথিবী"—১৷০

দুর্গাপদ সিংহ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "সৌরভ"—২৷০

শ্রীউমাপদ খাঁ প্রণীত নাটিকা "নেতাজির পদক্ষেপ"—১৲

প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "নির্ব্বাণ সঙ্গীত"—৸৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃষ্ণকলি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ভাদ্র—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রামায়ণ, মহাভারত যে পৃথিবীর যে-কোনো মহাকাব্যের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে তা' দার্শনিক কবি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা একবাক্যে বলে গেছেন। শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলতেন: "যে-দেশে এই দুই কাব্য মুখে মুখে আপামর-সাধারণ কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত সকলেই জানে, সে-দেশকে অশিক্ষিত দেশ বলা কিছুতেই সঙ্গত নয়।" এই দুই কাব্যে লোকহিতকর সকল তথ্যই নিহিত আছে। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা" পুস্তকের ভূমিকায় মহাকবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত', প্রাচীন গ্রীসে তেমনি 'ইলিয়ড্' ছিল। আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারিনা গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কিনা। কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে ভারতবর্ষ 'রামায়ণ', 'মহাভারতে' আপনাকে বলিতে আর কিছুই বাকী রাখে নাই।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেন:

"দেবতার অবতার-লীলা লইয়াই যে এ-কাব্য কেবল রচিত তাহাও নহে। কবি বাল্মীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই ছিলেন।... মানুষ বলিয়াই রাম-চরিত্র মহিমান্বিত।"

মূল রামায়ণে দেখা যায়, রাম নারায়ণের চারি অংশের এক অংশ হয়েও জন্মালেন মানুষরূপে। রাবণ একজন রাক্ষস। মানুষ রাম যেমন ধৈর্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, সাধু, শত্রুমিত্রে সমদর্শী আর—

গম্ভীর সাগর যেন
ধৈর্য্যে হিমাচল
বীর্য্যে বিষ্ণু
শশী যেন সৌম্য সুদর্শন;

ক্রোধে তিনি কালাগ্নির প্রায়
ক্ষমাতে ধরণী
দানেতে কুবের,
ধর্মতুল্য সত্যের নিষ্ঠায় ;—

(বালকাণ্ড, ১ সর্গ, ১৭-১৯ শ্লোক)

আর রাবণ তার বিপরীত অপগুণে আকীর্ণ। একমাত্র বাইবেলোক্ত শয়তানের সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে। শয়তানের সঙ্গে প্রভেদ এই যে, দশানন রাবণ, মহাপণ্ডিত হয়েও বিধাতাকে তপে তুষ্ট ক'রে এবং তাঁরই নিকট বরলাভ ক'রে বল-গর্বে স্ফীত হলেন।

সৃষ্টিকর্তা সর্বগুণাতীত ; তাঁতে পাপ বা অপাপ বর্তমান থেকেও বর্তায় না, তিনি তারও অতীত থাকেন। সেই অপাপবিদ্ধ সৃষ্টিকর্তা সকলকে যেমন সৃষ্টি করলেন, এই রাবণকেও সৃষ্টি করলেন। তা' ছাড়া সে আবার তাঁরই বরলাভ ক'রে দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ এবং রাক্ষসদের হাতে অবধ্য রইল। সে নিজে তাতে এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে উঠ্‌ল যে, মানুষকে আর সে গ্রাহ্যই করলে না ; আর তাই মানুষের হাতেও সে অবধ্য থাকবার জন্যে বিধাতাপুরুষের নিকট ইচ্ছা প্রকাশও করলে না। এই দুর্বৃত্ত ভাবলে যে, সে এত প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে গেছে যে ক্ষুদ্র মানুষ রামকে সে সহজেই আয়ত্ত করতে পারবে। কিন্তু প্রকারান্তরে ব্রহ্মা অল্পশক্তিবিশিষ্ট নশ্বর মানুষ রামের হাতে প্রবল প্রতাপ রাবণ-নিধনের ক্ষমতা অর্পণ ক'রে মানুষকেই বড় করলেন।

রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ডে, ৩৪ সর্গে, ১২-১৫ শ্লোকে) আছে : পিতামহ ব্রহ্মা সুর এবং অসুরের আশ্রয়ভূত ধর্ম ও অধর্মরূপ দুই পক্ষ সৃষ্টি করলেন। তার মধ্যে ধর্ম, মহাত্মা অমরগণের পক্ষ এবং অধর্ম, অসুর এবং রাক্ষসগণের পক্ষ।"—এখন রূপকভাবে বিষয়টি দেখলে দেখা যাবে মানুষকে রাবণরূপী ভীষণ ইন্দ্রিয়-বাসনার পাপ-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে বিধাতাপুরুষ দেখালেন যে মানুষই একমাত্র ধর্ম, তাই এই বিপুল শত্রুকে জয় করতে পারে এবং সেই কারণেই সে সকল প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাবণ পৃথিবীতে এসে দেব, ঋষি, যক্ষ, রক্ষকে প্রতিনিয়ত অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুল্‌লে। তার অত্যাচারে নিপীড়িত দেবগণের অনুরোধে সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু মানুষরূপে তাঁর চার অংশের এক অংশে জন্মালেন—রাবণ নিধনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনা করতে। (সুন্দরকাণ্ডের ২১ সর্গের ২৬-২৭ শ্লোক এবং লঙ্কাকাণ্ডের ৬০ সর্গের ৬-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

রাম যে বিষ্ণুর অবতার সে বিষয়ে উত্তরকাণ্ডে ১২৩ সর্গের ১০ শ্লোকে আছে রামের পুণ্যতোয়া সরযূতে দেহ-ত্যাগকালে পিতামহ ব্রহ্মা এসে তাঁকে বলছেন :

"যামিচ্ছসি মহাবাহো মাংতনু প্রবিশস্বিকাম্
বৈষ্ণবীং তাং মহাতেজো যদ্ধাকাশং সনাতনম্ ॥

—মহাবাহু ! আপনার সেই বৈষ্ণবী (ঔপেন্দ্রী) দেহ (matter) বা সনাতন আকাশ (শুদ্ধ ব্রহ্ম) বা space এই দুই-এর যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করুন।

রামায়ণ বৈদিকযুগের সমকালীন রচনা এবং বাল্মীকি বেদবেদান্তের সকল তথ্যই অবগত ছিলেন। তিনি ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জানতেন :

"নাহং মন্যে সুবিদেতি নোন বেদেতি চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নোন বেদেতি বেদ চ ॥

(কেনোপনিষৎ ২য় খণ্ড, ২ শ্লোক)

—আমি মনে করিনা যে আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানি ; আমি যে তাঁকে জানিনা এমন নহে ; জানি যে এমন নহে। 'আমি যে তাঁহাকে জানিনা এমন নহে, জানি যে এমনও নহে'— এই বাক্যের অর্থ আমাদের মধ্যে যিনি জানেন, তিনিই তাঁকে জানেন।"

তাই দেখতে পাই রামায়ণের পরবর্তী যুগের রচিত মহাভারতের মধ্যে গীতায় বর্ণিত ভগবানের বিশ্বরূপের সূচনা (লঙ্কাকাণ্ডে ১১৯ সর্গ, ১১-১৫ শ্লোকে) রামায়ণেও আছে। সীতা অগ্নি মধ্যে প্রবেশ করায় রামকে দুঃখিত এবং চিন্তিত দেখে স্বর্গের দেবতারা এসে বল্লেন : "দেব, আপনি বিরাট মূর্তি ধারণ করলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার কর্ণ, চন্দ্র সূর্য আপনার চক্ষু হন। আপনি ভূতগণের আদি ও অন্তে বিরাজিত সুতরাং সর্বজ্ঞ।" মানুষ সৃষ্টির কণা অংশমাত্র এবং নারায়ণ সৃষ্টির বাইরে ও অন্তরে, ওতপ্রোত-ভাবে বিরাজমান। তাঁর সকল সৎগুণই ঐশীগুণ এবং

বিশেষভাবে রামের মধ্যে এই ঐশী অংশই অধিক রইল। মানুষের মধ্যেই এই বহুগুণসম্পন্ন নারায়ণ জন্মান, মানুষকে যুগে যুগে ত্রাণ করার জন্যে—সেই কথাই তপোবনবাসী বৈদিক যুগের ঋষিতপস্বী বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে বিশদভাবে দেখিয়েছেন।

রামায়ণের গোড়াতেই আছে বাল্মীকি রামায়ণ-রচনার জন্যে ঐশী প্রেরণা পেলেন। কেলিরত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চকে ব্যাধ কর্তৃক নিহত দেখে করুণায় বিগলিত এবং শোকগ্রস্থ হয়ে তিনি দৈবসা সর্বপ্রথম শ্লোক রচনা করে বলে উঠ্‌লেন :

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমা।
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদেকমবধী কামমোহিতম্॥

—রে নিষাদ্!
ক্রৌঞ্চ-মিথুন মাঝে
কামাতুর ছিল যবে
যে হেতুরে তুই
একটিরে তার করেছিস বধ
রহিবি বঞ্চিত পেতে প্রতিষ্ঠা-সম্পদ।

এই শ্লোক বা ছন্দজ্ঞান ঐশীকৃপায় লাভ করেই সেই অবিদিত ব্রহ্মকে সাধারণের সামনে নর-নারায়ণ রূপে ধ'রে দিতে এই রামায়ণীগাথা বাল্মীকি রচনা করেছিলেন। প্রথম শ্লোকবদ্ধ কবিতা রচনা ভারতবর্ষে এই ভাবে দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই করুণাই ঐশী প্রেরণা এবং এর দ্বারাই মানুষের মধ্যে দেব-ভাব আনে। কি ইসাহি, কি মুসলিম, কি টোডা, কি গারো—সভ্য অসভ্য পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যেই এই ব্যথা-ভরা ভগবৎপ্রেরণা জাগতে পারে। যে মানুষের মধ্যে এই অপূর্ব ঐশীপ্রেরণা প্রবল সেই মানুষকেই ভগবানের অংশ বলা হয়; এবং বাল্মীকি সেই ভগবৎ-অংশকেই মানুষ রামের মধ্যে রামায়ণে দেখিয়েছেন। তাই মানুষের কাছে রামায়ণ এত সত্য এবং চিত্তকে অধিকার করেছে ঐতিহাসিক ঘটনার মত। এর মধ্যে প্রমাদগুণোদ্ভূত-সন্দিগ্ধস্থ কোনো ব্যক্তির স্থান নাই।

ইতিহাস

বাল্মীকিরচিত রামায়ণে বর্ণিত রামের ঘটনার ঐতিহাসিক সত্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হন। এ বিষয় দেশী এবং বিদেশী ঐতিহাসিকেরা বহু গবেষণা করেন। সম্প্রতি ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত মোহেনজোদাড়ো এবং হারাপ্পা প্রভৃতি প্রাগ্ বৈদিক দ্রাবিড়ী সভ্যতার বিষয় সিন্ধু সৈকতে আবিষ্কৃত চণ্ডরাস্থ রামায়ণের এখন অন্য প্রকার ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপিত হ'তে পারে। রামায়ণ রচনার বহু যুগ পূর্বে দ্রাবিড়ী সভ্যতা সিন্ধু সৈকত থেকে দক্ষিণে প্রসারিত হয়। পরবর্তী ভারতবর্ষে আর্য্য অভিযানের ফলে আর্য্য এবং অনার্য্যের (দ্রাবিড়ীয়) যে সংঘর্ষ ঘটে তারই উপাদান নিয়ে রামায়ণ রচিত হয়। এ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ—১২৭৯ সালে) 'উদ্ভাবনা' নামক প্রবন্ধে যা লিখেছেন তার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। তিনি বলেছেন :

"দক্ষিণ বিজয়ই রামায়ণ যুদ্ধ। তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আর রাজ্য লইয়া বিবাদ ছিল না; যখন সমুদায় আর্য্যাবর্তে আর্য্য সন্তানেরাই বাস করিতেছিল তখনই রামায়ণের ঘটনা সমস্ত ঘটে।"

তখন দাক্ষিণাত্য অনার্য্য ভূমি; রামচন্দ্র যে-উদ্দেশ্যেই হউক, অনার্য্য ভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইহার সীমান্তবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত বিজয় করেন। আর্য্যাবর্ত্তের সীমা ছাড়াইয়াই রাম এক জাতি দেখেন। এ-জাতি অতি প্রাচীন; আর্য্যেরা ইহাদিগকে জানিতেন। (সিন্ধু সৈকতের অধুনা-আবিষ্কৃত মোহেন-জো-দাড়ো এবং হারাপ্পার কথাই মনে আসে—লেখক) আর্য্যেরা ইহা-দিগকে মাংসলোভী জানিয়া ঘৃণা করিতেন। (প্রভূত রক্তঃ পিশিতাশদোষঃ সুন্দর কাণ্ড ৫।১:—লেখক) ও চণ্ডাল বলিয়া হেয় অভিধান দিয়াছিলেন। শ্রীরামকে স্বকার্য্য উদ্ধার জন্য এই জাতির সহিত বন্ধুত্বও করিতে হইয়াছিল। রামায়ণে এই ঘটনাই গুহক চণ্ডালের সহিত মৈত্র নিবন্ধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরে এক অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে যাইয়া, কোনো দলের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সেই দলকে পরাজয় এবং কোনো দলের সহিত বা সন্ধিবন্ধন করিয়া-ছিলেন ইহাই রামায়ণের বালি বানর বধ ও সুগ্রীবের সহ বন্ধুত্ব বলিয়া বর্ণিত। চণ্ডালেরা হিন্দু সমাজ বহিষ্কৃত বটে। কিন্তু বানরগণের ন্যায় অসভ্য নহে। কিন্তু বানরগণ চণ্ডালগণ অপেক্ষা বিশেষ সমৃদ্ধশালী। কেন না তাহারা

দাক্ষিণাত্যের আদিবাসী ; চণ্ডালগণের ন্যায় আর্য্য নির্ব্বাসিত জাতি নহে।

পরে রামচন্দ্র নরমাংসলোভী, নরমাংসভোজী, বিকৃতাকার এক জাতিকে প্রায় একেবারে লোপ করেন। ইহাই রাবণের সবংশে বধ। ইহারা (রাক্ষসেরা) অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। যেমন আমেরিকার নরকপালসংগ্রহকারী নরবলি প্রতিষ্ঠাকারী অজ্ঞেতক জাতির মধ্যে অনার্য্য সমৃদ্ধির বিশেষ পুষ্টি হইয়াছিল, রাক্ষসদিগেরও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আর্য্যগণের ন্যায় তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বিভাগ ছিল না। সকলেই যোদ্ধা ও ধনুর্দ্ধারী ; বেদাচারবহির্ভূত, অথচ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। রামায়ণ ঘটনার স্থূল মর্ম্ম এই ; কিন্তু এগুলি গুরুতর ঘটনা। বৈদিক এক গতির রোধকারী। ইহাতেই বৃহৎ চর উৎপন্ন হয়। রামকে (তিনি একজনই হউন, আর অনেক জনই হউন) একটি অসাধারণ বিপ্লব করিতে হইয়াছিল। যে চণ্ডালকে দর্শন করিতে নাই, তাহার সহিত বন্ধুত্ব। সামান্য বর্ণনে বুঝে, 'গুহক চণ্ডালের সহিত কোলাকুলি।' কন্দমূলফলাদি বানর সদৃশ জীবের জন্যে বীর রসের উদ্ভাবনা ; পৃথক পৃথক নানা অসভ্য দলের একপ্রকরণ, এই সামান্য অসভ্য জাতির সহিত নরমাংসলোভী অতি বিক্রমশালী জাতিকে একেবারে উচ্ছন্ন করা, শ্রীরামের কার্য্য। পরের চিত্তবৃত্তির উপর, পরের সাহায্যের উপর, লোকের শ্রদ্ধার উপর, তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। নিভৃত চিন্তা, নির্জ্জনে তার ঘরে বেদ পাঠ, আচার্য্যের নিকটে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, বর্ষে বর্ষে একবার নিজ পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যাসংলগ্ন শালতাল বনে মৃগয়া প্রভৃতি নিয়মিত কার্য্য করিয়াই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি স্বীয় অসীম ক্ষমতা প্রভাবে আর্য্য বৈরী প্রভূত বিক্রমশালী (যে বিক্রম বর্ণন চক্ষু আর্য্য মুনি আর্য্য দেবতাগণকে সেই জাতির দাসত্বে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন) সেই জাতিকে একবার ভারতবর্ষ সন্নিহিত দ্বীপ হইতেও নির্ম্মূল করিয়াছেন। আর্য্য সন্তানেরা তাঁহার সেই কীর্ত্তি মনে করিয়া থাকে, অদ্যাপি তাঁহার নাম মহান ঈশ্বর শব্দের প্রতিস্পর্দ্ধ, অদ্যাপি 'রামজী' হিন্দুস্থানে একমেবা দ্বিতীয়।

কিন্তু এই ত্রেতাবতার রামচন্দ্র মানবীয় উপায় অবলম্বন করিয়া পরের সাহায্য প্রাপ্ত হয় ; রামচন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। পরের সাহায্য না লইলে, কখনই মহৎকার্য্য সুসাধিত হয় না : এবং অন্যের কর্ত্তার মনোভাবে সমভাবী না হইলে, প্রাণপণে সাহায্য করে না। আন্তরিক সাহায্য নহিলে, সাহায্যই নহে।……রামায়ণ গ্রন্থ রামের সমকালিক। রামায়ণ কাব্য স্থানে স্থানে উদ্দীপনাপূর্ণ বাল্মীকি উদ্দীপনা লতা তাবৎ ভারত ব্যাপিয়াছিল, কবিগুরু বাল্মীকি তাহারই গুটিকতক অক্ষয় কুসুম তুলিয়া গাঁথিয়া রাখিয়া গেছেন।"

রামায়ণে ঐতিহাসিক তথ্য যাহাই থাকুক, বাল্মীকি তার মধ্যে লোক শিক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞান, কর্ত্তব্যপরায়ণতার যাবতীয় উপদেশ দিয়ে গেছেন গল্পের ছলে। মানুষই যে সত্ত্বগুণের স্বভাবত অধিকারী সেই কথা (লঙ্কা কাণ্ডে ৮৭ সর্গে ১৯ শ্লোকে) বিভীষণ ইন্দ্রজিৎকে বলছেন :

"কুলে বস্তপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রূরকর্ম্মণাম।
গুণো যঃ প্রথমো নৃণাং তমে স্থিতমরাক্ষসম্॥

—আমি ক্রূর কর্ম্মা রক্ষকুলে জন্মেছি বটে কিন্তু তোমার মত আমার মন কখনই নিদারুণ আভিচারিক অথবা অধর্ম্মে অনুরক্ত নয়।

রামায়ণ পাঠ করতে গিয়ে দেখি (অযোধ্যাকাণ্ডে রামের বনগমনকালের বর্ণনায়)……রাম তাঁর পূজ্যপাদ পিতা দশরথ সমীপে উপনীত হয়ে দূর থেকে তাঁকে দণ্ডবৎ হয়ে প্রথমে প্রণাম করলেন, পরে পিতার নিকটে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তখন পুত্রবৎসল দশরথ স্নেহভরে পুত্রের হাত ধরে তুলে নিয়ে শির ঘ্রাণ করে নিজের আসনের একপাশে বসালেন। এই বর্ণনার মধ্যে আমরা পেলাম, পিতা-পুত্রের মধুর সম্বন্ধ এবং শোভন অভ্যর্থনার একটি আদর্শ। পুনরায় অযোধ্যাকাণ্ডের একস্থলে দেখেছি,… রাম লক্ষ্মণকে উপদেশ দিচ্ছেন ; "আমরা জনপূর্ণ বা নির্জ্জন বনে যেরূপ স্থানেই থাকি না কেন, সর্ব্বাগ্রে তুমি থাকবে, সীতা মাঝখানে এবং আমি সবার পশ্চাতে যাব।" অযোধ্যাকাণ্ডের দ্বিপঞ্চাশ সর্গে আছে…গুহরাজের সঙ্গে মিলনের পর ভাগীরথী তীরে নৌকা * পার হবার কালে রাম লক্ষ্মণকে

* রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের ভাগীরথিসঙ্গমে দ্বীপবাসী এবং সাংযাত্রিক বণিকদের কথা এবং অন্ধ্রপোতের সমুদ্র যাত্রার কথা আছে—লেখক।

বলছেন ;—"ভাই লক্ষ্মণ ! আজ থেকে আলস্য ত্যাগ করতে হ'বে ; আলক্ষ সীতাকে দিতে হবে এবং লক্ষ রক্ষা করতে হবে।" উপরোক্ত ব্যাপারগুলি থেকে বেশ বোঝা যায় নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানোর প্রথা ইয়োরোপের সভ্যতার আমদানী (গত দেড় শত বৎসর) হওয়ার ফলে আমাদের দেশের লোকে শেখেনি—পুরাকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। নারীদের প্রতি রামের কর্তব্যজ্ঞানের দৃষ্টান্ত অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টপঞ্চাশ সর্গে আছে·····রাম বনে গিয়ে সুমন্ত্র সারথিকে অযোধ্যায় ফেরবারকালে বলেছিলেন, "অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পূজনীয় পিতা মহারাজ দশরথকে আমার প্রণাম দেবে, আর অন্তঃপুরবাসিনীদের নমস্কার ও কুশল মঙ্গল জানাবে। পরিশেষে বিশেষ ভাবে বলেছিলেন :

মাতারে আমার জানায়ে প্রণাম
শুভবার্ত্তা দিয়া কহিও তাঁহারে
ধর্ম্মপথে হেথা আমি রয়েছি অটল।
তুমি দেবি ! ধর্ম্মশীলা !
পিতার চরণ মানিবে দেবতা হেন।
অন্য মাতাদের প্রতি মান অভিমান যেন
রাখিও না মনে।
পিতা হ'তে কৈকেয়ী দেবীরে
কোনোমতে ভাবিও না ন্যূন বলি তুমি।
রাজধর্ম্ম মানি, নৃপ ভরতেরে সদা
রাজযোগ্য কোরো সমাদর।
নৃপগণ বয়ঃজ্যেষ্ঠ যদিও না হন
তবু তাঁরা মাননীয়।

এর মধ্যে রামের ঔদার্য্যের বিশেষ পরিচয় বাল্মীকি দিলেন। রাম তাঁর জননীকে নারীসুলভ দুর্বলতা বা চঞ্চলতাজনিত কার্য্যের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এরূপ উপদেশাত্মক কথা সুমন্ত্রকে দিয়ে তাঁর নিকট ব'লে পাঠালেন। ছেলে উপযুক্ত হলে মাকে সাদরে এরূপ উপদেশাত্মক কথা জানাতে পারে এবং সেটাকে প্রগলভতা (বা উচিতবাগ্বিশগিরি) বলা যায় না। এইরূপ বহু ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে নরনারীর কর্তব্যজ্ঞানের বিষয় বহু উপদেশ বাল্মীকির রামায়ণে আছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনো উপদেশই শুধু কর্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য শুষ্কভাবে দিলে জনসাধারণের গ্রহণীয় হয় না। উপকথা বা আখ্যান অবলম্বনে মনোজ্ঞভাবে উপদেশ পরিবেষণ করলে তবে সকলের কাছে উপাদেয় হয়ে ওঠে এবং মনের মধ্যে চিরস্থায়ী হ'তে পারে। মহামুনি বাল্মীকি এই প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করেই রামচরিতমানস রচনা ক'রে গেছেন ; রামের চরিত্র-চিত্রণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু আখ্যান যোগে,যা এখন ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জায় গ্রথিত হয়ে মানুষকে মনুষ্যত্ব দিচ্ছে। তাই আমাদের দেশে বুদ্ধ থেকে নিয়ে চৈতন্য,রামমোহন, রামকৃষ্ণ,বিবেকানন্দ, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি প্রভৃতি নরচন্দ্রমার অভাব নাই।

পূর্বেই বলেছি মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।" তার সঠিক পরিচয় দিতে গেলে একটি রামায়ণের মতই বিরাট গ্রন্থ লিখতে হয়। সুতরাং কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কথা এই ভূমিকায় বলা, যাতে পরবর্তী সত্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কিছু সাহায্য হয়।

যুদ্ধকৌশল এবং রাষ্ট্রনীতির বিষয় অনেক তথ্যই রামায়ণে আছে। লঙ্কাকাণ্ডে (৪র্থ সর্গ, ১০১-১০২ শ্লোকে) আছে·· ···

মহাবাহু রাম মহার্ণব সন্নিহিত হ'লে সুগ্রীবকে সৈন্য সন্নিবেশের আদেশ দিয়ে বলছেন ;—"বানরপুঙ্গব ! এই সমুদ্রের বেলাভূমিতেই সেনাশিবির স্থাপন কর, কেননা সমুদ্রপার হবার উপায় বিষয় মন্ত্রণার কাল এখন উপস্থিত হয়েছে। কোনো সেনাপতিই যেন তাঁর সেনাদের ছেড়ে অন্যত্র কোথাও না যান। কেননা অজ্ঞাত (গুপ্ত) রক্ষ-চরের ভয় আছে। এই কারণ মহাবল বীর বানরগণ সেনা-সন্নিবেশ বহির্ভাগে পর্য্যটন দ্বারা তাদের ভয়ের হাত থেকে রক্ষা করুক। লঙ্কাকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের গোড়াতে (১০—১২ শ্লোকে) আছে ;···· সীতা-অন্বেষণকালে রাম নীল বানর সেনাপতিকে বলছেন ; দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথিমধ্যে ফলমূল পানীয় বিষ দ্বারা দূষিত ক'রে রাখতে পারে। তুমি সেই সব থেকে সৈন্যদের সাবধান রাখবে। আর বানরেরা উল্লম্ফন দিয়ে বৃক্ষে আরোহণ ক'রে উঁচু থেকে সন্ধান নেবে—বনদুর্গ বা বনে কোথায় কোথায় শত্রুসেনা সন্নিবেশিত আছে। আমাদের সেনামধ্যে যারা বৃদ্ধ বা দুর্বল তাদের কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আর আনবে না।"

রামায়ণ বর্ণিত রাজনীতির মধ্যে, সাম (সাম্যতা), দান (উপহারাদি), দণ্ড (শাসন) এবং ভেদ (দলাদলি করিয়ে দেওয়া) * এই চার উপায় আছে রাজ্যশাসনের। সীতা অন্বেষণে বানর সৈন্যেরা সুগ্রীবের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে

* ইংরাজেরা যে ভাবে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি চিরকালের জন্য করে দিয়ে গেছে।

সীতাকে খুঁজে না পেয়ে যখন ফিরছে, তখন (কিষ্কিন্ধা-কাণ্ড ৫৫ সর্গের গোড়ায় আছে) ময়দানবের মায়ায় রচা একটি বিলের মধ্যে এক তপস্বিনীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। বালিপুত্র অঙ্গদ যৌবরাজ্যে সুগ্রীবের কার্যাপায়নে পরাঙ্মুখ হলেন। তিনি সেই বিলে নিবাসিত হয়ে থাকতে চাইলেন। হনুমান তখন বাকচাতুর্য্যের দ্বারা প্রথমে বানরদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করলেন। পরে বানরগণ অনৈক্য মত হয়েছে দেখে তিনি দণ্ডবিধান অনুযায়ী ভীতি-জনক নানা কথা ব'লে অঙ্গদকে স্বকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং বিপথ থেকে রক্ষা করলেন।

লঙ্কাকাণ্ডেতেই আছে, নাগদের তেজ বৃদ্ধির জন্য ক্রোধ অবলম্বন করার পরামর্শ দিচ্ছেন সুগ্রীব রামকে সীতা-অন্বেষণ কালে। রামকে হতাশ এবং মুহ্যমান দেখে তিনি বলছেন—"রাঘব, আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, ক্রোধ অবলম্বন করুন। ক্রোধবিহীন ব্যক্তিকে শত্রুরা বন্ধনাদি ক্লেশ দ্বারা নিশ্চেষ্ট করে। কিন্তু নিরতিশয় ক্রুদ্ধ স্বভাব হ'লে সকলেই তাকে ভয় পায়।

মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা-বিধি সম্বন্ধে (লঙ্কাকাণ্ডের ৭ম সর্গ, ৬-১৪ শ্লোকে) আছে ;—লঙ্কাপ্রাপ্ত রাবণ লঙ্কায় হনুমানের আগমন এবং তাঁর কীর্ত্তিকলাপ দেখে, বলছেন ;—"পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার পুরুষ বর্ত্তমান। আমি তাদের গুণ এবং দোষ বর্ণন করছি : যে পুরুষ, নির্ণয়-সক্ষম মন্ত্রিদের সঙ্গে কিম্বা সমদুঃখসুখভোগী মিত্র বা বান্ধবদের সঙ্গে মন্ত্রণা করে এবং দৈবসহায়ে কার্য্যারম্ভে সফল হয় তাকেই পণ্ডিতে 'উত্তমপুরুষ' বলেন। আর যে ব্যক্তি নিজেই ধর্ম এবং অর্থের বিচার দ্বারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তিনি মধ্যম, আর যিনি 'আমিই নিজে এ কাজ সাধন করিতে পারি', এই বোধে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং পরে তাহা উপেক্ষা করে, তাকে অধম পুরুষ বলে। এই ভাবে মন্ত্রীদেরও মধ্যে উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে যে তিনটি শ্রেণী আছে তারও উল্লেখ রাবণ করেছেন।

এইরূপে রাজনীতি এবং যুদ্ধনীতি বিষয় লঙ্কাকাণ্ডের ৯ম সর্গে (৭-১২ শ্লোকে) আছে—বিভীষণ বলছেন ; "সাম, দান, ভেদ তিন উপায় দ্বারা যে-কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তা' নীতিজ্ঞেরা বিক্রমের দ্বারা সমাধা করার বিধান দেন।" বিভীষণ (লঙ্কাকাণ্ড ১৬ সর্গ, ২২ শ্লোকে) বলছেন ;—"যে মন্ত্রী বিবেচনাপূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এবং নিজের বল, বীর্য্য, ক্ষয় এবং বৃদ্ধির বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হ'য়ে প্রভুর কল্যাণার্থ উপদেশ দেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী।" রাবণ বিভীষণ-বাক্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন ;—(লঙ্কাকাণ্ড, ১৬ সর্গ, ২-৩ শ্লোক) "বরং শত্রু কিম্বা ক্রুর সর্পের সঙ্গে একত্র বাস করা ভাল, তবু নাম-মাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী এইরূপ মিত্রের সঙ্গে বাস করা কদাচ সমীচীন নয়।" রাবণ আরো বলছেন :—বিভীষণ! আমি জ্ঞাতিদের চরিত্র জানি ; সর্ব্বত্রই জ্ঞাতিদের বিপদ উপস্থিত হ'লে অন্যান্য জ্ঞাতিদের আনন্দ হয়।" এবিষয় রাবণ আরো বিস্তারিতভাবে বলছেন :—"আমি শুনেছি বহুকাল গত হ'ল, কতকগুলি হাতী পদ্মবনে বিচরণ করতে করতে হাতীধরার জন্য পাশ হস্তে গজারোহণে আগত ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বনে 'আমরা আসুন, পাশ বা অন্যান্য শস্ত্রকে দেখে ভয় পাই না। কিন্তু স্বার্থপর জ্ঞাতিদের দেখে অত্যন্ত ভয় হয়, কেননা, এরাই হাতীধরাদের কাছে আমাদের বন্ধন করার উপায় ক'রে দেয়, এবিষয় কোনোই সন্দেহ নাই। (হাতী দিয়ে হাতী ধরার 'খেদা' যে রামায়ণী যুগেও ছিল, তা' এ থেকে প্রমাণ হয়)।

যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের লোক মিত্রভাবে উপস্থিত হ'লে তাকে সন্দেহের চক্ষে যে দেখতে হয় তার বিষয়ও লঙ্কাকাণ্ডের ১৭ সর্গে (২২-২৪ শ্লোকে) আছে। রাবণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হ'য়ে বিভীষণ রামের নিকট যখন উপস্থিত হলেন, তখন সুগ্রীব তাঁকে আসতে দেখে রামকে নীতিবাক্য বলছেন ;—"রাম, বোধহয় রাক্ষসরাজ চর পাঠিয়েছেন—ইনি বেশ বুদ্ধিমান রাক্ষস, আমাদের সৈন্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে পরস্পরের মধ্যে ভেদ জন্মাবার চেষ্টা করবে, কিম্বা কালক্রমে সবাইকার মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেবার পর সুযোগ বুঝে নিজেই আমাদের বিনষ্ট করবে।

মিত্রের জন্যে কাজ করার বিষয় হনুমান সুগ্রীবকে রামের কাছ থেকে বালিরাজ্য পাবার পর যা বলেছেন (কিষ্কিন্ধা-কাণ্ড, একোনত্রিংশ সর্গ, ১৫-১৬ শ্লোক) তা প্রণিধানযোগ্য।

"যে হি কালব্যতীতেষু মিত্রকার্য্যেষ্বসজ্জতে।
স কৃত্বা মহাতাঽপার্থান্ন মিত্রার্থেন যুজ্যতে॥
তদিদং মিত্রকার্য্যংনো কালাতীতমরিন্দম্।
ক্রিয়তাং রাঘবস্যৈতদ্বৈদেহ্যাঃ পরিমার্গণম্॥

– যিনি নিজের কাজ ত্যাগ করে উৎসাহের সহিত মিত্রের কার্য্য সম্পাদন না করেন, তাঁর বহুবিধ বিপদ হয় ; আর যিনি কার্য্যোচিত নির্দ্দিষ্ট কাল অতিক্রম ক'রে বন্ধুর কাজ করার চেষ্টা করেন তিনি বহুৎ কাজ করলেও মিত্রের কাজ করা হয় না।

ক্রমশঃ

কবি-শিল্পী শ্রীঅমিতকুমার হালদার বাল্মীকি রামায়ণের যে পদ্যানুবাদ করেছেন তারই ভূমিকা।—সম্পাদক

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বঙ্কুচরণ

কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিবার পূর্বে বঙ্কু সেই বা কয়েকবার জয়নাগের নাম শুনিয়াছিল, নগরে আসিয়া আর শুনিতে পায় নাই; তাহাদের গোপন তৎপরতার কোনও চিহ্নও তাহার চোখে পড়ে নাই। ষড়যন্ত্র যে ভিতরে ভিতরে ঘনীভূত হইতেছে, জয়নাগ বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে গৌড়রাজ্য করায়ত্ত করিবার কৌশল করিতেছেন বঙ্কু তাহার কিছুই জানিত না। এমন কি শৌণ্ডিক ঘটেশ্বর ও কবি বিশ্বাধর যে এই চক্রান্তে লিপ্ত আছে তাহাও সে সন্দেহ করে নাই।

মক্ষিকা যেমন দুষ্টব্রণের প্রতি আকৃষ্ট হয় ঘটেশ্বর ও বিশ্বাধর তেমনি অবৈধ কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত, তা সে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রই হোক, আর অসহায় ব্যক্তির ধনভার লাঘব করাই হোক। ইহাদের ন্যায় বিকৃতচরিত্র মানুষ কোনও দেশে কোনও কালে বিরল নয়; ইহারা সিধা পথে চলিতে পারে না, প্রকৃতির বক্রতা বশতঃ কর্কটের ন্যায় বক্রপথে চলে এবং আপন অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যের মারাত্মক অনিষ্ট করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। বঙ্কুর প্রতি ইহাদের আচরণ এই মনোবৃত্তির একটি দৃষ্টান্ত।

বঙ্কুর সোনার অঙ্গদটি দেখিয়া বিশ্বাধরের লোভ হইয়াছিল। কিন্তু একাকী বঙ্কুর অঙ্গ হইতে অঙ্গদ অপহরণ করিবার দুঃসাহস তাহার ছিল না, তাই সে ঘটেশ্বরকে এই কর্মে অংশদার লইয়াছিল। দুইজনে পরামর্শ করিয়াছিল অঙ্গদটি হস্তগত হইলে ভাগাভাগি করিয়া লইবে। বঙ্কু নগরে আগন্তুক, তাহাকে মাদক দ্বারা হতচেতন করিয়া অঙ্গদ অপহরণ করিলে অধিক গণ্ডগোলের ভয় নাই। কিন্তু সে অতিশয় বলবান, মাদক-প্রভাব হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে যে কী কাণ্ড করিবে কিছুই বলা যায় না। ব্যাপারটা জানাজানি হইলে শৌণ্ডিকের দুর্নাম হইবে, তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই ঘটেশ্বর ও বিশ্বাধর মন্ত্রণা করিয়া এমন কলি বাহির করিয়াছিল যাহাতে সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

ভাগ্যবশে বঙ্কুর প্রকৃত পরিচয় তাহারা জানিতে পারে নাই, জানিলে নিশ্চয় বঙ্কুর প্রাণসংশয় হইত। ঘটেশ্বর ও বিশ্বাধর জয়নাগ কিম্বা অগ্নিশর্মার নিকট যদি এই সংবাদ বিক্রয় করিত তাহলে বঙ্কুকে এতদিনও বাঁচিতে হইত না। কিন্তু বঙ্কুকে দেখিয়া কর্ণসুবর্ণে কেহই চিনিতে পারে নাই; তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে এমন মানুষ কর্ণসুবর্ণে অদ্যই ছিল। যে দুই তিনজন প্রৌঢ় বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়া মানবদেবের সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারা উহা আকস্মিক সাদৃশ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মানবদেবের যে পুত্র থাকিতে পারে একথা কেহ ভাবিতে পারে নাই।

সে রাত্রে কুঞ্জকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিবার পর বঙ্কু বিলম্বে নিদ্রা গিয়াছিল, পরদিন তাহার নিদ্র ভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল সূর্যদেব দ্বারের ছিদ্রপথে কিরণের তীর নিক্ষেপ করিতেছেন।

প্রত্যহ উষাকালে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাওয়া বঙ্কুর অভ্যাস হইয়াছিল; ঘাটে ভিড় হইবার পূর্বেই সে গিয়া স্নান করিত, শীতল জলে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিত, তারপর ফিরিয়া আসিত। কিন্তু আজ দেরী হইয়া গিয়াছে। বঙ্কু নিকটে মৌরীর ঘাটে স্নান করিয়া আসিল।

বঙ্কু যখন স্নান করিয়া ফিরিল তখন ঘটেশ্বর মদিরাগৃহের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া একটি লোকের সহিত নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল। বঙ্কু প্রবেশ করিলে লোকটির সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। বঙ্কু চিনিল, বাঙামাটির মঠের সম্মুখে সারসপক্ষীর মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া যাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়াছিল সেই জয়নাগ দলের লোক। লোকটিও তাহাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু যেন চিনিতে পারে নাই

এমনি ভাবে করিয়া বটেশ্বরের সহিত আরও দুই একটা কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

অতঃপর সারসপক্ষী ও ভয়নাগের চিন্তা বন্ধুর মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। বটেশ্বর তাহাকে প্রাতঃকালীন জলপান আনিয়া দিল। আহার করিতে করিতে বন্ধু উৎসুক মনে ভাবিতে লাগিল—আজ রাত্রে কুহু আসিবে—কুহুকে সে গুপ্তার কথা বলিবে—হয়তো নিজের সত্য পরিচয়ও দিবে—

সেদিন বেলা তৃতীয় প্রহরে বিম্বাধর আসিল। বন্ধু মধ্যাহ্নের খর তাপে শয্যায় শয়ন করিয়া একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, বিম্বাধর ও বটেশ্বর এক ভাণ্ড মদিরা লইয়া তাহার কক্ষে উপস্থিত হইল। বিম্বাধর বলিল—'বন্ধু, ওঠো, জাগো, জীবন মধুময় কর।'

বন্ধু উঠিয়া বসিল—'কী এ?'

বিম্বাধর বলিল—'সুধা—সুধা। জানসোনায় এমন বস্তু আর পাবে না। দু'পাত্র খেলেই উড়তে ইচ্ছে করবে।'

বন্ধু হাসিয়া বলিল—'আমার ওড়বার ইচ্ছে নেই।'

বিম্বাধর ও বটেশ্বর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইল। কবি বিম্বাধর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বিকশিত করিয়া বলিল—'ভ্রাতঃ মধুমথন, জীবন অনিত্য, সুখস্বপ্নের ন্যায় ভঙ্গুর; তাকে বুভুক্ষু-পিপাসিত করে রেখ না। এস, যৌবনের যজ্ঞাগ্নিতে সোমরসের আহুতি দাও—স্বাহা স্বাহা—' বলিয়া নিজেই একপাত্র ঢালিয়া এক চুমুকে পান করিয়া ফেলিল।

বন্ধু তথাপি ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বিম্বাধর গভীর ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিল—'ছি বন্ধু, তুমি একজন দিগ্বিজয়ী পিণ্ডারী, একা মদরার দোকান উজাড় করে দিতে পার, তুমি এই ক্ষুদ্র সুধাভাণ্ড দেখে ভয় পাচ্ছ!—কোথায় তোমার দেশ? সে দেশে কি কেউ খেজুরের রস খায় না? তোমরা কি মৎস্য, কেবল জল পেয়ে বেঁচে থাক?'

এই ভাবে ধিক্কৃত হইয়া বন্ধু একপাত্র ঢালিয়া পান করিল। মদিরা অতি সুস্বাদু, পাত্র শেষ করিয়া বন্ধু বটেশ্বরকে বলিল—'তুমি খাবে না?'

বটেশ্বর জিভ্ কাটিল। বিম্বাধর বলিল—'ময়রা কি মোদক খায়? স্বজাতি ভক্ষণ হবে যে! এস, আর এক পাত্র।'

উভয়ে আর এক পাত্র ঢালিয়া একসঙ্গে পান করিল। বন্ধু বলিল—'কৈ, ওড়ার ইচ্ছা হচ্ছে না তো?'

'হবে হবে। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কি উই পোকার পাখনা গজায়? এস, আর এক পাত্র হোক।'

আর এক পাত্র হইল। এই সময় বটেশ্বরের ভৃত্য ভক্ষিত মৎস্যাণ্ড আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। অবদংশ সংযোগে মদিরা আরও মুখরোচক হইয়া উঠিল।

বিম্বাধর তখন নানা কৌতুকোদ্দীপক কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে পঠদ্দশায় বিদ্যালাভের ব্যপদেশে কাশ্মীর গিয়াছিল; তথাকার যুবতীরা কিরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা ও অতিথিবৎসলা তাহারই সরস কাহিনী শুনাইতে লাগিল। কাহিনীগুলি পবিত্র নয়, কিন্তু প্রচুর হাস্যরসের সিঞ্চনে কিঞ্চিৎ শোধিত হইয়াছে।

এই ভাবে সুধাভাণ্ডটি দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিল। বন্ধু বেশ একটি লঘু উৎফুল্লতা অনুভব করিতেছে, প্রাণ খুলিয়া হাসিতেছে, কিন্তু নেশার ঘোরে অচিরাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিবার কোনও লক্ষণই তাহার নাই। বরং কবি বিম্বাধরের চক্ষু ঢুলুঢুলু হইয়া আসিয়াছে, কথা জড়াইয়া যাইতেছে। বটেশ্বর পাশে বসিয়া সব লক্ষ্য করিতেছিল, ব্যাপার দেখিয়া সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এই ভাবে আরও কিছুক্ষণ চলিলে বিম্বাধরই মাটি লইবে, বন্ধুর কিছু হইবে না। বটেশ্বরের দৃঢ় ধারণা ছিল বন্ধু পাকা মস্তপ, এতদিন ছলনা করিতেছিল।

এইখানে, বিম্বাধর ও বটেশ্বর যে ফন্দি আঁটিয়াছিল তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না, এই মহাবাক্য ছিল তাহাদের জীবনের মূলমন্ত্র। বন্ধুর অঙ্গদ চুরি করিতে হইবে। কিন্তু তারপর আত্ম-রক্ষার উপায় কি? এক, বন্ধুকে বিষ-প্রয়োগ করা; মরা মানুষ গণ্ডগোল করে না। কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না, মৃতদেহ লইয়া নূতন সমস্যার উদয় হয়। মদিরা গৃহে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইলে শ্রৌত্বিকের বধ-বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। মৃতদেহ চুপি চুপি স্থানান্তরিত করা বটেশ্বর ও বিম্বাধরের কর্ম নয়, আরও লোক চাই। তাহাতে জানাজানি হইবে, গুপ্ত থাকিবে না।

বটেশ্বর ও বিম্বাধর বড় চিন্তায় পড়িয়াছে এমন সময় পানশালায় এক শ্রেষ্ঠী আসিল। শ্রেষ্ঠীর নাম ভূরিবসু। সে ধনবান ব্যক্তি, এরূপ সাধারণ মদিরাগৃহে কখনও পদার্পণ

করে না ; নিতান্তই দায়ে পড়িয়া আসিয়াছে। বিষাধর তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে।

ভূরিবসুর কয়েকখানি বাণিজ্য তরী আছে। তাহারা সমুদ্রে যাইবে, তাহাদের আরব জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য জলযোদ্ধার প্রয়োজন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও ভূরিবসু জলসৈন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই, প্রচুর বেতনের লোভেও কেহ যাইতে চায় না।

সিধা পথে বিফল হইয়া ভূরিবসু বাঁকা পথ ধরিয়াছে। নগরের পানশালায় নানা জাতীয় লোকের যাতায়াত ; মদ্যপান করিয়া কেহ কেহ পানশালাতেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকে। অবৈধ উপায়ে লোক সংগ্রহের এমন স্থান আর নাই। ভূরিবসু আসিয়া বটেশ্বরের নিকট প্রস্তাব করিল—তুমি আমার নৌকায় জীবন্ত মানুষ পৌঁছাইয়া দাও, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এক নিষ্ক পুরস্কার দিব। কাণা খোঁড়া বিকলাঙ্গ লইব না। প্রয়োজন হইলে আমার নাবিকেরা তোমাকে সাহায্য করিবে।

বটেশ্বর দেখিল, এই সুযোগ। বন্ধুর অঙ্গদটিও হস্তগত হইবে, উপরন্তু এক নিষ্ক পুরস্কার! পরামর্শে স্থির হইল, ভূরিবসুর বহিত্র যেদিন সমুদ্রে যাইবে তাহার পূর্বদিন অপরাহ্নে বন্ধুকে সুরাপান করাইয়া অজ্ঞান করিবার চেষ্টা করা হইবে ; সে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে গভীর রাত্রে নাবিকদের সাহায্যে বটেশ্বর তাহাকে ভূরিবসুর তরণীতে আনিবে। কিন্তু বন্ধু সুরাপান করিতে সম্মত না হইতে পারে। তখন তাহাকে ছলচাতুরী ভুলাইয়া তরণীতে লইয়া যাইতে হইবে। একবার তরণীতে পদার্পণ করিলে তাহাকে বলপূর্বক ধরিয়া খোলের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা সহজ হইবে। পরদিন প্রাতে তরণী সমুদ্র যাত্রা করিবে, দুই দিন পরে অকূল সমুদ্রে পৌঁছিবে। তখন বন্ধুকে ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই, সে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না ; তখন প্রাণের দায়ে তাহাকে জলদস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে।

এই উপায়ে অন্যান্য পানশালা হইতে আরও কয়েকজন হতভাগ্যকে বহিত্রে লইয়া গিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। কাল প্রত্যূষে বহিত্র সমুদ্র যাত্রা করিবে। সুতরাং আজই বন্ধুকে হরণ করা চাই।

কিন্তু সুরা ভাণ্ড শেষ ; বন্ধু অটল হইয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে অট্টহাস্য করিতেছে। যেন তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিতেছে। বটেশ্বর প্রমাদ গণিল।

বিষাধর তখন মেঘদূত আবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে—'বিদ্যুদ্দাম্নঃ ললিত ললিতা—ললিত বণিতা—'

বটেশ্বর বাধা দিয়া বলিল—'ভাই বিষাধর, আমাকে এবার উঠিতে হবে। চাতীঘাটে কাজ আছে।'

চাতীঘাটে শব্দটা বটেশ্বর এমন তীক্ষ্ণভাবে উচ্চারণ করিল যে বিষাধরের কানে বিঁধিল। সে সচকিত হইয়া বন্ধুকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, বলিল—'আরে ভাই তো, বেলা যে পড়ে এসেছে। চল, আমাকেও চাতীঘাটে যেতে হবে। তা বন্ধু মধুসূদন, তুমি একা থাকবে? তুমিও চল না আমাদের সঙ্গে, আমোদ করা যাবে।'

বন্ধু প্রত্যহ সন্ধ্যায় চাতীঘাটে গিয়া থাকে, আজ না যাইবার কোনও কারণ নাই। একবার মনে হইল, রাত্রে কুহু আসিবে। কিন্তু কুহু আসিবে অনেক রাত্রে, তাহার জন্য এখন হইতে ঘরে বসিয়া থাকার প্রয়োজন নাই। সে উঠিয়া বলিল—'চল।'

চাতীঘাটে বিপুল জনসমাধ ; রথ-দোলের ভিড়। আগের দিন ঝড় বৃষ্টিতে কেহ আসিতে পারে নাই, আজ তাই ভিড় বেশী। বহু নাগরিক ছোট ছোট ডিঙিতে চড়িয়া নদী বক্ষে জলবিহার করিতেছে। ধীবরেরা জেলেডিঙিতে ইলীশ মৎস্য ধরিতেছে। সমুদ্রগামী বহিত্রগুলিতেও জন-সমাগম হইয়াছে ; যে বহিত্রগুলি কাল প্রত্যূষে যাত্রা করিবে তাহারা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মাল-বোঝাই নৌকা ঘাট হইতে গিয়া বহিত্রের গায়ে ভিড়িতেছে, নৌকা হইতে বহিত্রে মাল উঠিতেছে, শূন্য নৌকা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া আবার মাল লইতেছে।

বন্ধু, বিষাধর ও বটেশ্বর ভিড়ের মধ্যে না গিয়া ঘাটের এক কিনারায় উপস্থিত হইল। এখানে কয়েকটি ডিঙি রহিয়াছে, ডিঙিতে মাল বোঝাই হইতেছে। একজন সম্ভ্রান্ত-দর্শন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। বিষাধর তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল—'এই যে শ্রেষ্ঠী মহাশয়, কুশল তো?' চোখে চোখে ইঙ্গিত খেলিয়া গেল।

শ্রেষ্ঠী ভূরিবসুকে বন্ধু গত রাত্রে বটেশ্বর ও বিষাধরের সহিত মদিরাগৃহের অন্ধকার কোণে মন্ত্রণা করিতে

দেখিয়াছিল, কিন্তু এখন চিনিতে পারিল না। শ্রেষ্ঠী বলিল—'আপনাদের কুশল তো ?'

বিম্বাধর বলিল—'এ পর্যন্ত কুশল। নগরে এক নূতন বন্ধু এসেছেন, তাঁকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছি।'

ভূরিবসু সলাস্যমুখে বন্ধুকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'ভাল ভাল। তা চলুন না নদীবক্ষে বিচরণ করবেন। আমার ডিঙি রয়েছে।—'

বিম্বাধর বন্ধুকে বলিল—'কি বল বন্ধু ? গঙ্গাবক্ষ থেকে ঘাটের দৃশ্য তুমি বোধহয় দেখ নি। অপূর্ব দৃশ্য। দেখবে ?'

বন্ধুর কোনই আপত্তি নাই। চারিজনে একটি বৃহৎ ডিঙিতে চড়িয়া বসিল, মাঝি-কাণ্ডারী ডিঙি ছাড়িয়া দিল।

গঙ্গার বুক আবার ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে, স্বচ্ছ জল ঘোলা হইয়াছে। তরঙ্গগুলি বেশ বড় বড়, তাহাদের উত্থান পতনের একটা ছন্দ আছে। সেই ছন্দে নাচিতে নাচিতে ডিঙি গঙ্গার বুকে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

নদী হইতে ঘাটের দৃশ্য সত্যই মনোরম। তার উপর মন্দ মন্দ বাতাস দিতেছে; বহু ডিঙিগুলি আশেপাশে ঘুরিতেছে। নাগরিকদের ডিঙি হইতে উচ্চ হাস্যের কাকলি, সঙ্গীতের মূর্ছনা ভাসিয়া আসিতেছে। বন্ধু মনের মধ্যে মোক্ষ-মদির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বিম্বাধর বন্ধুর কানের কাছে বিড়্ বিড়্ করিয়া কিছু বলিতেছে, বন্ধু কতক শুনিতেছে কতক শুনিতেছে না। বটেশ্বর জেলে ডিঙি হইতে কয়েকটি সদ্যিস্ত ইলীশ মৎস্য ক্রয় করিল; মাছগুলি ডিঙির খোলের মধ্যে রাজপুত্রের মত শুইয়া আছে। সবই যেন একটা সুখ স্বপ্নের ছিন্নাংশ, আনন্দদায়ক কিন্তু অর্থহীন।

সূর্য নগরীর পরপারে অস্ত গেল, নিদাঘের দ্রুত সন্ধ্যা যেন ধূসর পাখা মেলিয়া ছুটিয়া আসিল। ঘাটের জনমর্দ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, নদীবক্ষের তরণীগুলিও ঘাটে ফিরিল। নগরীর মন্দিরগুলি হইতে দূরাগত মৃদুস্বনে সন্ধ্যারতির শঙ্খ-বাজিয়া উঠিল।

ষড়্যন্ত্রকারীরা এই ছায়াম্লান গোধূলি লগ্নের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। ভূরিবসুর সঙ্কেত পাইয়া কাণ্ডারী পুঞ্জীভূত বল্লিগুলির দিকে ডিঙির মুখ ফিরাইল। সেখানেও নাবিকদের কর্মতৎপরতা শান্ত হইয়াছে। ডিঙি আসিয়া একটি হাঙ্গর মুখ বহিত্রের পাশে ভিড়িল।

ডিঙি হইতে বহিত্রের পটপত্তন খানিকটা উচ্চ। প্রথমে ভূরিবসু বহিত্রে উঠিল। কয়েকজন নাবিক গুণবৃক্ষ ঘিরিয়া বসিয়া ছিল, তাহাদের হস্তসঙ্কেতে কাছে ডাকিয়া নিম্নস্বরে উপদেশ দিল, তারপর ডিঙির দিকে গলা বাড়াইয়া বলিল—'কি বন্ধু, তোমরাও ঘুমিয়ে উঠ্‌বে না কি ? এস না, আমার মণিভাণ্ডারে উৎকৃষ্ট আসব আছে, আস্বাদ করে যাও।'

ডিঙি হইতে বিম্বাধর সোৎসাহে বলিল,—'নিশ্চয় নিশ্চয়। কি বল মধুমথন ?'

মধুমথন মুণ্ডটি আন্দোলিত করিয়া হাস্যবিম্বিত মুখে বলিল—'নিশ্চয়।'

তিন জনে একে একে বহিত্রে উঠিল। ডিঙির কাণ্ডারী বহিত্রের গলবাহিকায় ডিঙি বাঁধিয়া ফেলিল।

তারপর চক্ষের পলকে নানাবিধ ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। একজন নাবিক পিছন হইতে বন্ধুর গলায় দড়ি জড়াইয়া টান দিল। অতর্কিত আকর্ষণে বন্ধু চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল, তাহার মাথা পাটাতনের কাঠের উপর সজোরে ঠুকিয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল।

অতঃপর যখন সে সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল তখন তাহার মন হইতে মাদকজনিত স্বপ্নাচ্ছন্নতা দূর হইয়াছে। সে অনুভব করিল একজন লোক তাহার মস্তকের উপর বসিয়া তাহার বাহু হইতে অঙ্গদ খুলিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতেছে এবং আরও কয়েকজন তাহার হাত-পা দড়ি দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

মস্তকের উপর বসিয়া যিনি অঙ্গদ উন্মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন তিনি কবি বিম্বাধর। বন্ধু বাহুর এক প্রবল আস্ফালনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু নাবিকেরা প্রস্তুত ছিল, এক সঙ্গে তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া আবার তাহাকে ধরাশায়ী করিল। বিম্বাধর দূরে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখান হইতে অশ্রাব্য গালিগালাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার একটা আঙুল ভাঙিয়া গিয়াছিল, মস্তকেও অক্ষত ছিল না।

বহিত্রের উপর এ এক বিচিত্র দৃশ্য। সন্ধ্যার ছায়া

রাত্রির অন্ধকারে পর্যবসিত হইতেছে, সেই ঘনায়মান প্রদোষে পটপত্তনের উপর যেন এক পাল তরঙ্গুর সহিত এক বন্য বৃষের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বহু হস্তপদবিশিষ্ট একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড উঠিতেছে পড়িতেছে, গড়াইয়া এদিক ওদিক যাইতেছে। কিন্তু শব্দ অধিক হইতেছে না। কেবল বন্যের অবরুদ্ধ গর্জনের ফাঁকে ফাঁকে কবি বিশ্বাধরের কাঁচা খেউড় শুনা যাইতেছে।

এতগুলা লোকের সঙ্গে একা যুদ্ধ করিতে করিতে বন্যের দেহের শক্তি ক্রমশ বাড়িতেছে; যে-সুরা তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাই যেন মত্তহস্তীর বল হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নাবিকেরা একে একে তাহার পদাঘাত মুষ্ট্যাঘাতের স্বাদ পাইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া ভূরিবসু ও বটেশ্বর সভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

তারপর বন্য প্রবল বেগে নিজ দেহ আবর্তিত করিয়া অবশিষ্ট নাবিকদের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইল, হিংস্র প্রজ্বলিত চক্ষে একবার চারিদিকে চাহিল। কিন্তু নিকটে কেহ নাই, বিশ্বাধর ভানুসাহায্যে পলায়ন করিয়াছে। বন্যের কণ্ঠ হইতে একটা উন্মত্ত হর্ষধ্বনি বাহির হইল। সে বহিত্রের কিনারায় গিয়া অন্ধকার জলে লাফাইয়া পড়িল।

সকলে ছুটিয়া গিয়া বহিত্রের কিনারায় দাঁড়াইল। কিন্তু বন্যকে আর দেখিতে পাইল না।

বিশ্বাধর তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল—'ধাঃ, অঙ্গদটা গেল। বেনের পো, এমন লড়াক এনে দিলাম, ধরে রাখতে পারলে না?'

ক্রুদ্ধ ভূরিবসু বলিল—'আমি মানুষ চেয়েছিলাম, দৈত্য চাইনি।'

বিশ্বাধর বলিল—'তুমি একটা মানুষ চেয়েছিলে, আমি দশটা মানুষ দিয়েছিলাম। এখন আমাদের পুরস্কার! কথা ছিল বুহিত্তে পৌঁছে দিলেই—'

ভূরিবসু কুটিল ভঙ্গীতে দন্ত বাহির করিয়া বলিল—'পুরস্কার নেবে—বটে? পুরস্কার!'

বটেশ্বর ধূর্ত লোক, সে দেখিল এ সময় শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদ করিলে বিপদ আছে। সে তাড়াতাড়ি বলিল—'না না, পুরস্কার কিসের? চল বিশ্বাধর, আমরা ফিরে যাই—'

ভূরিবসু অট্টহাস্য করিয়া বলিল—'ফিরে যাবে! এই যে ফেরাচ্ছি।—ওরে, এ দুটোকে ধর, খোলের মধ্যে বেঁধে রাখ। নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল। ওদেরই নিয়ে যাব।'

বিশ্বাধর আর্তনাদ করিয়া উঠিল; বটেশ্বর জলে লাফাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু তৎপূর্বেই নাবিকের দল তাহাদের ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল এবং দড়ি ধরিয়া খোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিল।

বিশ্বাধর বধ্যভূমিতে নীয়মান শূকরের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল—আমাকে ছেড়ে দাও—আমি যাব না—আমি লড়াই করতে পারব না—'

তাহারা আপন কুটিলতার ফাঁদে আপনি ধরা পড়িয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জলে স্থলে

জলে লাফাইয়া পড়িয়া বন্য ডুবিয়া গেল। তারপর অনেক দূর পর্যন্ত ডুব সাঁতার কাটিয়া সে মাথা ঝাড়া দিয়া ভাসিয়া উঠিল। চারিদিক অন্ধকার, তীর দেখা যায় না; কেবল গঙ্গার খরস্রোত দুর্বার বেগে তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

বন্যের দেহে সামান্য দুইচারিটা আঁচড় লাগিয়াছিল, মাথার আঘাতও গুরুতর নয়। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা বাক্যাতীত বিস্ময় জাগিয়া ছিল। কী হইল? উহারা হঠাৎ এমন ব্যবহার করিল কেন? উহারা কি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল? কিন্তু কেন? অঙ্গদের জন্য?

বন্য হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখিল—অঙ্গদ যথাস্থানে আছে, উহারা কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

গঙ্গার বুকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। পশ্চাতে তাহাকে ধরিবার জন্য ডিঙা আসিতেছে না, আসিলে দাঁড়ের শব্দ শুনা যাইত। বন্য ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, পিছন দিকে নগরের দুই চারিটা মিটিমিটি আলো দূর হইতে ক্রমশ আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে।

বন্য আর সাঁতার কাটিতেছিল না, কেবল জলের উপর গা ভাসাইয়া ছিল। তাহার মনে হইল স্রোতের টান আরও বাড়িতেছে; অজ্ঞাতসারে স্রোতের আকর্ষণ তাহাকে নদীর মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এ ভাবে ভাসিয়া চলিলে সে কোথায় ভাসিয়া চলিবে তাহার স্থিরতা নাই।

হয়তো সুন্দরীবনে গিয়া পৌঁছিবে, হয়তো সমুদ্রে গিয়া পড়িবে—সমুদ্র কতদূরে তাহা সে জানিত না।

বন্ধু আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল, ডান দিকের তীর রক্ষা করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। তীর কিন্তু অদৃশ্য, এমন কি তীরাহত জলের কলধ্বনি পর্যন্ত শুনা যায় না।

এইভাবে অন্ধের মত অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর স্রোতের বেগ ঈষৎ মন্দীভূত হইল। বন্ধু বুঝিল—সে স্রোত কাটাইয়া তির্যক ভাবে তীরের দিকে আসিতেছে। তারপরই অকস্মাৎ সে এক নূতন কল্লোলধ্বনি শুনিতে পাইল; তাহার চারিদিকে উত্তরোল তরঙ্গ সংঘাত যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু সে ভীত নয়। বন্ধু ভাল সাঁতার জানে, দেহে শক্তিও অসীম; সে তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মাথা জাগাইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ আবার স্রোতের মত্ততা শান্ত হইয়া গেল। বন্ধুর চিন্তা করিবার সামর্থ্য ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত সে গঙ্গা ও ময়ূরাক্ষীর সঙ্গমস্থল পার হইয়া আসিয়াছে।

আরও কিছুক্ষণ বন্ধু নিস্তরঙ্গ জলে ভাসিয়া চলিল। তারপর সহসা একটি আলোকের বিন্দু তাহার চোখে পড়িল। ডান দিকে, কিছু সম্মুখে—আলোকবিন্দুটি যেন ঊর্ধ্ব হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বন্ধু আর চিন্তা করিল না, শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া ঐ রক্তাভ বিন্দুটির দিকে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

ক্রমে সেই ক্ষীণ দীপালোকে তীরের একটি অংশ তাহার চোখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রশস্ত ঘাট নয়, ক্ষীর্ণ একশ্রেণী সোপান উচ্চ পাড় হইতে জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। একটি কিশোরী মেয়ে প্রদীপ হস্তে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে।

মেয়েটির বয়স দশ-এগারো বছর; গায়ের রঙ কোমল কালো। মুখে কৌতুক আগ্রহ ভীরুতা মেশা একটি ভাব। সে একাকিনী ঘাটে আসিয়াছে, জলে প্রদীপ ভাসাইয়া নিজের সৌভাগ্য গণনা করিবে।

মেয়েটি নিম্নতম পৈঠায় আসিয়া বসিল, প্রদীপ পাশে রাখিল, আঞ্জুল জলে ডুবাইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিল। তারপর সহসা জলে আলোড়নের শব্দ শুনিয়া ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বাক্-নিঃসরণের ক্ষমতা রহিল না, হস্তপদ সঞ্চালনের শক্তিও রহিত হইল।

প্রথমে একটা সাদা মানুষের মুখ, তারপর একটা প্রকাণ্ড শরীর আসিয়া ঘাটে ঠেকিল। বন্ধু জলে নিমজ্জিত পৈঠার উপর উঠিয়া বসিল। মেয়েটি অনড় অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিল।

বন্ধু তাহার অবস্থা বুঝিয়াছিল, সে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল—'ভয় পেও না।'

মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কিশোরীর মনের অসাড় ভাব বোধহয় একটু কাটিল। তাহার ঠোঁট দুটি হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল।

বন্ধু বলিল—'হাতীঘাটে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাসতে ভাসতে এসেছি।'

এবার কিশোরীর সাহস আর একটু বাড়িল, সে অধরের স্ফুরণ সংযত করিয়া কৌতূহলী চক্ষে বন্ধুকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বন্ধুর প্রগণ্ডে অঙ্গদটি তাহার চোখে পড়িল। অঙ্গদের বস্ত্রাবরণ সাঁতার কাটিবার সময় খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিশোরী মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল।

বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'এখান থেকে কানসোনায় ফিরে যাবার পথ আছে?'

কিশোরী মাথা নাড়িল—'না।'

'পথ নেই!'

কিশোরী বলিল—'ময়ূরাক্ষী পার হয়ে কানসোনায় যেতে হয়। এখন খেয়া বন্ধ হয়ে গেছে।'

বন্ধু চিন্তা করিল। কানসোনায় ফিরিয়া গিয়াই বা লাভ কি?—কুহু আসিবে, আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তা যাক্।

'এখানে কাছাকাছি বসতি আছে? তুমি এখানে থাকো?'

'হাঁ।'

'তোমার ঘরে কে কে আছে?'

'শুধু আমি আর আমি বুড়ী। আর কেউ না?'

'পুরুষ নেই?'

'না।'

'তোমাদের চলে কি করে?'

'কানসোনায় শাক-পাতা কলা-মূলো বিক্রি করি।'

'আমাকে আজ রাত্রে তোমাদের ঘরে থাকতে দেবে? কাল সকালেই আমি চলে যাব।'

'আমি জানিনা, আমি বুড়ি জানে।'

'বেশ, আমাকে আমি বুড়ির কাছে নিয়ে চল।'

'আচ্ছা।'

কিশোরী এতক্ষণ কথা কহিতে কহিতে অন্যদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিল, এখন আর কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার ডাগা কি সোনার?'

বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'হাঁ।'

কিশোরীর মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে একটা ভক্তিভাব ফুটিয়া উঠিল। সে সসম্ভ্রমে বন্ধুর মুখের পানে চাহিল; তারপর প্রদীপ তুলিয়া লইয়া বলিল—'এস।'

তাহার মনের সমস্ত তুচ্ছ শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে পরিণত হইয়াছে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া কিশোরী একদিকে চলিল; বন্ধু সিক্ত বস্ত্রে তাহার পশ্চাতে চলিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিতে লাগিল, আজ রাত্রিটা কোনও ক্রমে কাটাইয়া কালই সে গ্রামে ফিরিয়া যাইবে। কর্ণসুবর্ণে আর নয়, যথেষ্ট হইয়াছে। নাগরিক জীবন তাহার জন্য নয়, সে বেতসগ্রামে ফিরিয়া যাইবে। মা'র কাছে, গুরুর কাছে ফিরিয়া যাইবে।

আশ্চর্য এই যে বিষাধর বা বটেশ্বরের প্রতি সে বিশেষ ক্রোধ অনুভব করিল না। প্রথমে নাবিকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার মনে যেরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল তখন বিষাধর বা বটেশ্বরকে হাতের কাছে পাইলে বোধকরি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিত। কিন্তু এখন তাহার মনে সামান্য তিক্ততা ভিন্ন আর কিছু নাই। সর্প দংশন করে, বাঘ-ভালুক উদরের দায়ে জীবহিংসা করে; ইহা তাহাদের স্বভাব। ক্রোধ করিয়া লাভ কি? তাহাদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিলেই হইল।

অল্প কিছুদূর চলিবার পর কিশোরী বন্ধুকে লইয়া একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মাটির কুটির, খড়ের চাল। আশেপাশে আরও কয়েকটি কুটির রহিয়াছে তাহা আবছায়া-ভাবে অনুমান করা যায়।

দ্বারের পাশে প্রদীপ রাখিয়া কিশোরী বলিল—'তুমি বোসো, আমি আয়িকে ডাকছি।'

বন্ধু ভিজা কাপড়ে দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া রহিল, কিশোরী ভিতরে গেল। পরক্ষণেই এক বৃদ্ধার স্বর শুনা গেল—'ওলো গঙ্গা, তুই এলি! কোথায় গিছলি বল্ দেখি!'—

তারপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হইল। বুড়ি বাহিরে আসিল। বন্ধুকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—'ওমা, এ যে সোনার কার্তিক! এস, বাছা, এস। চাতীঘাটে জলে পড়ে গিছলে! খুব বেঁচে গেছ, বাছা, ভগবান রক্ষে করেছেন। তা আজ রাত্তিরটা আমার দাওয়ায় থাকো, কাঙ্গালের শাক-ভাত খাও।—ওরে গঙ্গা, শুকনো কাপড় এনে দে, পাটি পেতে দে।'

গঙ্গা শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, দাওয়ায় পাটি পাতিয়া দিল। বন্ধু বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া পাটিতে লম্বা হইল; ক্লান্তির সহিত একটি পরম নিশ্চিন্ততা তাহার চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অল্পকাল মধ্যে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

দণ্ড দুই তিন পরে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন গঙ্গা তাহার পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া নাড়া দিতে দিতে বলিতেছে—'ওঠো, ভাত হয়েছে, খাবে চল।'

বন্ধু ঘুমভরা চোখে উঠিয়া গিয়া খাইতে বসিল। কুটিরের একটিমাত্র ঘরে পিঁড়ি পাতিয়া আসন করা হইয়াছে; সম্মুখে কলাপাতায় স্তূপীকৃত ভাত। গরম ভাতে ঘিয়ের ছিটা; ব্যঞ্জনের মধ্যে ও-বেলার শাকচচ্চড়ি, কচু-ডাঁটার ঘণ্ট, সরিষা-বাটা দিয়া ইলীশ মাছের কাল ও কাসুন্দী। খাইতে খাইতে বন্ধুর বেতসগ্রাম ও মায়ের রান্না মনে পড়িয়া গেল।

আয়ি বুড়ি একটু বেশী কথা বলে, সে নানা অসংলগ্ন কথা বলিয়া চলিল। তারপর বন্ধুর আহার যখন শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন সে বলিল—'ঘরে অতিথ্ আসা তো গেরস্তর ভাগ্যি। তা বাছা, আমার এমন পোড়া কপাল, ঘরে কি ভাল বিছানা আছে! তুমি বড় ঘরের ছেলে, খাট-পালঙ্কে শোয়া অভ্যেস, তুমি কি আমার কাঁথা-কানিতে শুয়ে ঘুমতে পারবে?'

বন্ধু বলিল—'খুব পারব আয়ি। আমি তোমাদেরই মত গাঁয়ের মানুষ। আমার কোনও কষ্ট হবেনা।'

বুড়ি বলিল—'তা বলবে তুমন কেন বাছা। তোমার যে সোনার অঙ্গ। আহা, গায়ের রঙ্ যেন মল্‌মলে বাঁধা খাঁড়ি মদর! তাই ভাবছিলাম কি, কোদণ্ড ঠাকুরকে গিয়ে বলি, তিনিই নাওয় আজ রাত্তিরটা তোমার ঘরে ঠাঁই দিন।'

বন্ধু চমকিয়া মুখ তুলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর! তিনি কে?'

বুড়ি বলিল—'বাবুন গো। আগে মস্ত লোক ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে তাই আমাদের মত চাষী-মালীদের মধ্যে আছেন। তাঁকেই বলি গিয়ে, তিনি একলা মানুষ, তোমাকে ঘরে থাকতে দিতে পারবেন। আমার এখানে তো দাওয়ায় পড়ে থাকতে হবে।'

বন্ধু ভাবিতে লাগিল। ইনি কি সেই কোদণ্ড মিশ্র যাঁহার কথা শৈলভদ্র বলিয়াছিলেন? তাহার পিতামহ শশাঙ্কদেবের সচিব!.....কাল প্রাতে বন্ধু গ্রামে ফিরিয়া যাইবে, তৎপূর্বে পিতামহের সচিবকে একবার দেখিয়া যাইবে না?—

আহার সমাধা করিয়া বন্ধু বলিল—'বেশ, তিনি যদি আমাকে থাকতে দেন, তাঁর ঘরেই থাকব।' ক্রমশঃ

স্মৃতিরেখা—অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

আমি যখন কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করি। দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে আমি একনিষ্ঠ অধ্যাপক ছিলাম। ১৯০২ সালে যখন আমি কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করি ও তাহার এক বৎসর পরে, সুরেন্দ্রনাথ আমার ছাত্র হইলেন। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে অদ্ভুত প্রতিভার কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে সময়ে আমার ছাত্র ছিলেন, সে সময়ে সে প্রতিভার কোন পরিচয় পাই নাই। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে যখন তিনি বি-এ পরীক্ষা দিলেন, তখন তিনি ফেল হইবেন, এ কথা ভাবি নাই। ঐ সময়ে তাঁহার হস্তাক্ষর বড় খারাপ ছিল। হইতে পারে তাঁহার হাতের লেখার দোষে তিনি দর্শনে পাশ নম্বর রাখিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পর বৎসর তিনি মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং বি-এ পাশ করেন, অবশ্য Pass Course-এ।

এম-এ পরীক্ষা দিবার সময়েও তাঁহার প্রতিভা সম্যক্ স্ফুরিত হয় নাই। তবে অবশ্য আত্মবিশ্বাস চিরদিনই তাঁর মধ্যে দেখিয়াছি। সুতরাং তিনি সংস্কৃতে ও দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং উভয় পরীক্ষায় Second Class-এ পাশ করেন। এই দুই পরীক্ষায় তাঁহার ফলই কৃতিত্ব দাবিলেও, প্রতিভার বিকাশ তখনও হইয়াছিল বলা যায় না। তিনি সংস্কৃতে যেবার এম-এ পরীক্ষা দিলেন, সেবারে হরিনাথ দে ও পদনাথ সেন প্রথম বিভাগে পাশ করেন।

পরে তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই সময় তিনি কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গে পরিচিত হন। এই সময়ে বাংলার গভর্ণর লর্ড লিটন চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শন করিতে যান। তিনি দাশগুপ্তের সহিত আলাপ করিয়া এবং ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া মুগ্ধ হন। তিনিই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের আলাপ করাইয়া দেন। মহারাজের দানশীলতা সর্ব্বজনবিদিত। ইনি প্রতি মাসে ৩০০৲ টাকা দিয়া দাশগুপ্তের পুস্তক কিনিবার সাহায্য করেন। এই হইতে দাশগুপ্তের গাড়ি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। কাশিমবাজারের সাহায্য প্রায় ২৫ বৎসর, কি তারও অধিককাল পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল।

লর্ড লিটনের চেষ্টায় ও মহারাজ মণীন্দ্র নন্দীর অনুগ্রহে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রা করেন এবং কেম্ব্রিজে দুই বৎসর থাকিয়া পড়াশুনা করেন। সেখান হইতে ডক্টরেট লাভ করিয়া তিনি এদেশে আসেন এবং অল্পদিনেই তাঁহার প্রতিপত্তি ও খ্যাতি বাড়িয়া উঠে। এদেশে আসিয়াও তিনি Ph.D. উপাধি লাভ করেন। মাসে মাসে ৩০০৲ টাকা করিয়া পাইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে এদেশে যত লাইব্রেরী আছে তদপেক্ষা বৃহত্তর একটি গ্রন্থাগার গড়িয়া তোলেন। প্রচুর গ্রন্থের উপকরণ পাইয়া তাঁহার ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তিনি এই কাজে তাঁহার সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ এবং বাল্যকালে যে প্রতিভা দেখা গিয়াছিল, তাহা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনে বিকশিত হয়। তিনি অনর্থক সময় নষ্ট করিতেন না। তিনি অনেক দর্শনের পুস্তক লিখিয়াছেন। বাংলায়ও তিনি লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে একখানি উপন্যাস। উপন্যাস-খানি সুদীর্ঘ—"অধ্যাপক" এই গল্পটি তিনি আমার নিকট করিয়াছিলেন এবং গল্প লেখার আমার কিছু অভ্যাস আছে জানিয়া আমাকেই বলিয়াছিলেন এই গল্প লিখিতে। আর কাহাকেও বলিয়াছিলেন কিনা জানিনা। শেষে আমি যখন অসমর্থ হইলাম, তখন তিনি নিজেই লিখিলেন।

তাহার জীবন সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, এত দূরত আর কেহ জানেন না। আমি সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। একবার

বোম্বাইয়ে বিশ্বের ভারতের দর্শন সম্মেলন হয়। আমি ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের খরচে আমরা দুজন প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গেলাম। ঐ সময় আর একজন প্রফেসর ছিলেন, তাঁর নাম প্রমুদত্ত শাস্ত্রী। গভর্ণমেণ্টের নিকট হ'তে কোনরূপ প্রশ্রয় না পেয়ে তিনি বাড়ী যাইবার জন্য ছুটি লইলেন। কিন্তু লাহোর না গিয়া তিনি একেবারে সোজা বোম্বাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে আমরা দুজন যখন প্রতিনিধি হিসাবে গিয়াছি, তখন তিনি না গেলে খারাপ দেখায়। তিনি নিজে খরচ করিয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত ছুটিলেন। সে সময়ে আমি দর্শন বিভাগের Senior Professor অর্থাৎ Head of the Department. আর সুরেন্দ্রনাথ এবং ডাঃ শাস্ত্রী যদিও ইঁহারা দুজনেই I.E.S. তাহলেও তাঁহারা আমার সহকারী মাত্র। এটা কেবল প্রসঙ্গতঃ বলিলাম। আমি বোম্বাইয়ে যে দার্শনিক কংগ্রেস হয়, তাহার এক শাখার সভাপতি হইয়াছিলাম এবং সুরেন্দ্রনাথ অন্য শাখায়। মূল সভাপতি ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ। ইহা ১৯২৯ সালের কথা। মূল সভাপতির বক্তৃতা এবং আমাদের বক্তৃতা একই আসরে হইল। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ না লিখিয়া উপস্থিত বক্তৃতা করিলেন। যেমন তাঁহার ভাষা, তেমনি তাঁহার ওজস্বিতা। আমি বলিলাম যে, "এবার ব'লে মাত্রাজী হব"। সুরেন্দ্রনাথ চটিয়া গেলেন, "কি এমন বক্তৃতা যাহার জন্য আপনি জন্মান্তরে মাত্রাজী হইতে চাহিতেছেন?" ছাত্রের নিকট এরূপ তিরস্কার লাভ করিয়া আমি চুপ করিয়া গেলাম। পরদিন সংবাদপত্রে যখন রিপোর্ট বাহির হইল, তাহাতে রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা এক কলমের কম ছাপানো হইয়াছে। কিন্তু আমার বক্তৃতা দুখানি কাগজে সাড়ে তিন কলম জুড়িয়া ছাপানো হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এই দেখলেন ত', স্যার?" আমি বলিলাম, "ইহাতে গর্ব্বের কিছুই নাই। আমার বক্তৃতা লেখা এবং টাইপ করা; সুতরাং তাহা ত' বেশী হবেই।" সুরেন্দ্রনাথ আমার এ যুক্তি মানিলেন না। তাঁহার অন্তরে স্বদেশের গৌরব অনেকখানি স্থান জুড়িয়া ছিল।

আমরা সেবার বোম্বাই হইতে পুণায় গেলাম। সেখানে আমি ও সুরেন্দ্রনাথ Dr. Belvalkarএর গৃহে অতিথি হলাম। তিনি হলেন Women's Universityর সর্ব্বেসর্ব্বা। বোম্বাই হতে পুণার রাস্তাটি পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পুণায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পুণায় মহাত্মা গোখলে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Ferguson College দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। সে সাধ আমার সম্পূর্ণ হইল না। কিন্তু আরেকটি ব্যাপারে ঐ কলেজে গমন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। সেখানে ডাঃ দাশগুপ্ত Bergson & Intuition সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হলেন এবং আমি সেই সভায় সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে আহূত হলাম। ইহাতে অবশ্য আমার Ferguson College দেখা ঠিক হইল না, তথাপি ঐ কলেজের সহিত যেটুকু পরিচয় হইল, তাহাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। কলেজের হলে তিনটি গ্যালারি ছিল। তার প্রথমটিতে অর্থাৎ নীচের তলায় প্রায় একশত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এরূপ দৃশ্য কলিকাতায় বড় একটা খাটে না। বক্তা যত বড়ই হউন, শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা কোন সভাতেই খুব বেশী হয়ত ৩০।৪০টির অধিক দেখি নাই। এই সব মহিলা মনোযোগ সহকারে এক ঘণ্টাব্যাপী দার্শনিক বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতাও সুন্দর হইয়াছিল।

Dr. Belvelkarএর বাড়ীতে তাঁহার দুই কন্যা কর্ত্তৃক হারমোনিয়াম সহযোগে ভজনের পীতগোবিন্দ শুনিয়া আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম। কন্যা দুইটির বয়ঃক্রম একজনের ১১ এবং অপরজনের ৯। তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া সুস্বরস্বরে জয়দেবের গান করিলেন। প্রায় ষোড় মাথার মাইল ঘুরে গিয়া এরূপস্থানে বাঙালী কবি জয়দেবের গান শুনিতে পাইব এরূপ আশা করি নাই। স্বাবণ শতাব্দীর বাঙালী কবির গান শুনিয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম স্কাণ্ডিনেভিয়ান কংগ্রেসে বাঙালী দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার সমাদর দেখিয়া সেরূপ খুসী হইয়াছিলাম।

আমি বিলাতে গিয়া প্রথমে Imperial Hotelএ ছিলাম। সেখানে তখন ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় বিশ্বধর্ম্ম-মহাসম্মিলনে (Congress of world Faiths) আহূত হয়ে সুরেন্দ্রনাথও লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, আমি তার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছিলাম।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রতিভাবান দার্শনিক; উভয়েই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বেশে বিদেশে উভয়ের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়াছে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বধর্ম্ম সভায় (Congress of world Faiths) বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে একজন তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন (বোধ হয় Mr. Spalding) যে যদি শুধু রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতার জন্য ধর্ম্মসম্মিলন আহূত হইত তাহা হইলেও এ সম্মিলন ব্যর্থ হইয়াছে একথা বলা যাইত না। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতা ১৯২৯ সালে যে মহাসম্মিলন হয় তাকে সার্থক করে দিয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথও এই মহাসভায় একদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে লিখিত বক্তৃতা। আমিও সেদিন Botanical Theatreএ "ইসলাম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলাম। কিন্তু আমার বক্তৃতা মৌখিক ছিল এবং একজন মুসলমান সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমার বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ খুবই সুখ্যাতি করেছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় আমি সেরূপ সুখ্যাতি করিতে পারি নাই। তার কারণ আর কিছুই নয়। তিনি Mikeএর সামনে দাঁড়াইয়া বেশ উচ্চৈস্বরে বক্তৃতা করিলেন। আমি বস্তুতঃ তাঁর বক্তৃতার একবর্ণও বুঝিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথ যখন পুনঃ পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তখন শেষটায় আমি বলিলাম "সুরেন্দ্র, তুমি কি Mikeএর সামনে আর কখনও বক্তৃতা কর নাই?" তিনি বলিলেন "না প্রায়, কেন বলুন ত?" আমি বলিলাম "Mikeএর কাছে অত চীৎকার করিলে লোকের শুনিবার সুবিধা হয়।"

কিন্তু তাঁর বক্তৃতা বুঝিতে না পারিলেও আমার কোনও ক্ষতি হয় নাই; কারণ সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতাই "Creative Emergence" আমাকে পূর্ব্বেই দেখিতে দিয়াছিলেন। সেজন্য আমি বলিয়াছিলাম যে বক্তৃতাটি অতি সুন্দর হইয়াছে। বিষয়বস্তুও ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বক্তৃতার সময়ে উহা কেহ ভাল করিয়া শুনিতেই পায় নাই। পরে উহা "হারহরষ্টে দার্শনিক চিন্তাধারায়" মধ্যে ছাপান হইয়াছে। বিলাতে এই ৬টি দার্শনিক প্রবন্ধ উপস্থিত থাকাতে উহাদের তুলনামূলক সমালোচনা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। আমার মনে হয় বিলাতের দার্শনিক মহলে বিশেষতঃ Cambridgeএ সুরেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। রাধাকৃষ্ণণ হয়ত বড় হইলে সুরেন্দ্রনাথের স্থান পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

একদিন তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল, Londonএর mind clubএর একটি মিটিংএ। অনেকগুলি শ্রোতাই উপস্থিত ছিলেন। আমি সুরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে সেখানে যাইতে পারিয়াছিলাম। Lord Samuel (এখন Sir Herbert Samuel) সভাপতি এবং সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রকথার প্রণেতা Mr. Mianhead তার সম্পাদক। সুরেন্দ্রনাথকে পরিচিত করিবার জন্য তিনি বক্তৃতা করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, রাধাকৃষ্ণণ হয়ত বর্ত্তমান দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। He is the greatest living philosopher of India.

এইখানেই সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় শেষ হইতে আমার মনে আনন্দের অবধি ছিল না এবং আমি এই কথা কয়টি আজ প্রকাশ করিতে পারিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

তিনি Whiteheadএর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সে বক্তৃতাও অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। Oxford and Cambridgeএর মধ্যে চিরদিন একটু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। সুরেন্দ্রনাথ Cambridgeএর ঘায়ে। সেইজন্য বোধ হয় Cambridgeএর অধ্যাপকরা সুরেন্দ্রনাথকে বেশী প্রাধান্য দেন। রাধাকৃষ্ণণের পুস্তকগুলি অনেক সময় সরল ও সহজবোধ্য নয়। সেই জন্য Cambridgeএর লোকেরা তাঁকে বেশী পছন্দ করেন না।

যাহা হউক, আমি বিলাত থাকাকালে রাধাকৃষ্ণণ এবং সুরেন্দ্রনাথ উভয়ের নিকট হইতেই অত্যন্ত সমাদরপূর্ণ ও সদয় ব্যবহার পাইয়াছি। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্ব ধর্ম্ম সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা Sir Francie Young husbandএর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিয়েছেন। তাঁরই অনুরোধে আমি Islam সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সম্মত হইয়াছিলাম। Sir Abdul Quader ছিলেন প্রধান বক্তা এবং আমি ছিলাম তাঁর প্রধান সমালোচক। এই প্রবন্ধে Sir Abdulএর আতিথেয়তা সম্বন্ধেও আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমার বক্তৃতার পর তিনি তাঁহার বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন।

Sir Francieএর নিকট আমার আরও কৃতজ্ঞতা আছে। কারণ তিনি আমাকে Totterham Court church এ বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেখানে গিয়া দেখি Hallটি পরিপূর্ণ। আমাদের দেশের এবং আমার সুপরিচিত মিঃ ভূপেন সেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় বিলাতে ছিলেন শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞতার জন্য অর্জ্জন করিবার জন্য। আমার সে বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেন Dr. Belden ইনিও একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। পরে Beldenএর কাছে আমার বক্তৃতার সুখ্যাতি শুনে Sir Francis আমাকে পাবলিক লেকচার দেবার জন্যে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ আমাকে ৪।৫ দিন পরে কেম্ব্রিজ যাইতে হইয়াছিল। সেখানে যে British Empire Universities Conference হইয়াছিল আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাতে একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলাম। কাজেই যখন Sir Francie আমাকে পাবলিক লেকচার দেবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন সে অনুরোধ আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেই হইয়াছিল।

ইহার পূর্ব্বে আমি দিন কয়েকের জন্যে কেম্ব্রিজ গিয়াছিলাম। সেবার সুরেন্দ্রনাথ আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। একদিন আমাকে লইয়া সুরেন্দ্রনাথ সকালবেলায় Trinity Collegeএর রন্ধনশালায় (Kitchen) গিয়া খবর দিয়া আসিলেন যে আমরা সন্ধ্যাবেলায় কলেজ হলে আহার করিব। এই Kitchen জিনিসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রত্যেক ইউনিভারসিটি কলেজে এক একটি kitchen আছে। সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা একত্র ভোজন করেন। এই সমবেত ভোজন একটি দেখিবার জিনিস। আমাদের দেশের লোকেদের মত "সমাজভাবে জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা" উহাদের দেশে কোথাও দেখিলাম না। আমাদের দেশের মত Pice Hotel এ বা চিড়া-মুড়ি চর্ব্বণ করিয়া কাহাকেও লেখাপড়া করিতে হয় না। সেখানে যে ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়া ভোজন করেন উহা একটি বিরাট ব্যাপার। পাঁচ শত কি ছয় শত ছাত্র ও অধ্যাপক ভোজনের আগে ভগবানকে স্মরণ করে আহারে প্রবৃত্ত হন। Trinity College Hallটি বেশ বড়। সেখানে খানিকটা জায়গায় যে উঁচু Platform আছে, আমরা তাহার উপর বসিয়াছিলাম, আর ছাত্রেরা নীচে বসিয়া আহার করেন। তাহাদের জন্য লম্বা লম্বা সারিতে আসনের ব্যবস্থা আছে। আমি সুরেন্দ্রনাথের অতিথি হিসাবে এই collegeএর সমবেত ভোজনে স্থান পাইয়াছিলাম এবং অধ্যাপকদের সঙ্গেই উচ্চ platformএ বসিয়াছিলাম। ঐ সমবেত ভোজনে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা প্রায়ই গাউন পরিয়া আহার করিতে বসিয়াছিলেন, আমাদের কিন্তু গাউন পরিতে হয় নাই। তবে একত্র ভোজনের পূর্ব্বে যে ভগবানকে স্মরণ করা হয়, তাহাতে যোগদান করিতে ভুলি নাই।

ভোজনান্তে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন Senior professor ও আরও দু তিনজন আমাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। যে ঘরে আমরা বসিলাম, সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের Combination Room অর্থাৎ যে ঘরে মদ্যপান ও ধূমপান উভয়ই চলে। আমার যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে বিভিন্ন পাত্রে বিয়ার, শেরী ও ক্ল্যারেট রক্ষিত ছিল। অধ্যাপকেরা আমাদের মদ্যপান করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি ত ও জলে বঞ্চিত। মনে করিলাম সুরেন্দ্রনাথই হয়ত আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপকদের প্রতি সৌজন্য দেখাইবেন। কিন্তু আমি দেখিলাম তিনিও আমার মত এই সব স্পর্শ করিলেন না। বলা বাহুল্য যে ইহাতে

অধ্যাপকপ্রবরেরা খুশী হইতে পারিলেন না। যে যেমের যে রীতি অর্থাৎ মদ্যপান তাহা পালন না করিলে নিমন্ত্রণকারীর মনে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, অনেকজন আমাদের তৃপ্তির জন্য সিদ্ধার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু উহাতেও আমরা অক্ষমতা জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিলাম। তখন অধ্যাপকেরা কি করেন? অকস্মাৎ একজন অধ্যাপক পকেট হইতে একটি নস্যের কৌটা বাহির করিলেন। কিন্তু আমি সে বিষয়েও অচল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে তখন বোধ হয় কিছু নস্য অভ্যাস করিতেছিলেন। সেদিন তিনিই মান রক্ষা করিলেন দুই, তিন টিপ নস্য লইয়া। তার ফলে সেখানে যে হাঁচির মহারোহ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপভোগ করিবার মিলিল। শেষ পর্যন্ত হাঁচিতে হাঁচিতে সুরেন্দ্রনাথের influenza পর্যন্ত হইয়াছিল!

বিলাতে থাকাকালে সুরেন্দ্রনাথের যে সাহায্য পাইয়াছি তাহা কখনও ভুলিবার নয়। আমার কিঞ্চিৎ অসুবিধাও তিনি করিয়াছিলেন। Denmarkএ Copenhagen নগরীতে যে Linguistic congress হইয়াছিল তাহাতে আমার যোগদান করিবার কথা ছিল। এই congress ডেনমার্কের রাজা কর্তৃক উদ্বোধন হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া যোগদান করিতে যাইতে ছিলাম। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নির্বন্ধাতিশয্যে আমার যাওয়া ঘটিল না। তাহার অতিপূরণ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করিয়া। তাঁহার সেই সাহায্য আমার চিরদিন মনে থাকিবে। বিশেষতঃ cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচয় করিয়া দেওয়া এবং কলেজের সভাতে যোগদান করিবার সুযোগ পাওয়া এসবই সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

সুরেন্দ্রনাথ চিরদিনই অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু সেই অসুস্থ শরীরে কি করিয়া এত বই লিখিলেন তাহা ভাবিলে আমি বিস্মিত হই। তাঁহার Blood pressure প্রবল ছিল। তাহার উপর বোধ হয় বহুমূত্র রোগ প্রভৃতিও করিয়াছিল। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া তিনি কিরূপে এত পরিশ্রম করিতেন তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। কবিরাজের বংশে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার সর্বপ্রকার ঔষধের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আমি শুনিয়াছি তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত অনেক মূল্যবান ঔষধ ব্যবহার করিতেন।

বর্ত্তমান ইংলণ্ডে শিশুশিক্ষা

শ্রীপ্রতিমা ঘোষ

বিলাতের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা দেখে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। এতদিন এদের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে বইতে এবং অনেকের মুখে শুনেছিলাম। এবার বিলাতে গিয়ে এই বিষয়ে কয়েকটি জায়গায় খোঁজ-খবর নিয়ে আমি এদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছি।

বিলাতে পাঁচ বছর বয়স থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক এবং এই পনের বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা বিনা বেতনে সরকারি বিদ্যালয়ে পড়তে পায়। এমন কি যে সব শিশুদের অভিভাবকদের বইপত্র কিনে দেবার সঙ্গতি নেই, তারা স্কুল থেকে বইপত্রও পেয়ে থাকে। এছাড়া দুপুরের খাবারটি স্কুলেই দেওয়া হয়। এই খাবারটি যে পুষ্টিকর একথা বলাই বাহুল্য। এর মধ্যে থাকে, স্যাণ্ড, মাংসের জাতীয় কিছু, এবং খাদ্যোপযোগী এক রকম পুডিং, আর ছোট এক বোতল দুধ। তা'হলে দেখুন, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের খাদ্যের দিকেও কতটা নজর আছে। এই খাবারটির জন্য প্রত্যেক বাচ্চাকে প্রতিদিন প্রায় সাত আনা করে দিতে হয়, কিন্তু যে-খাবার তারা স্কুল থেকে পায়, তা' অবশ্য সাত আনার চেয়ে বেশী দাম ধরতে হবে। কিন্তু এর মধ্যেও অনেক সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধরুন, কোনও বাড়ী থেকে চারটি ভাই বোন একই বিদ্যালয়ে পড়তে আসে, তারা এই সুবিধাটা পায়, বড়টির জন্য সাত আনা, দ্বিতীয়টার জন্য ছয় আনা, তৃতীয়টার জন্য পাঁচ আনা এবং চতুর্থটির জন্য চার আনা দিলেই হয়। আবার যদি এমন হয়, কোন শিশুর মা বাবার প্রত্যহ এই খাবারের পয়সা দেবার মত সঙ্গতি না থাকে, তাহলে স্কুল থেকে তাকে বিনা পয়সে এই খাবারটী দেওয়া হয়, অবশ্য এই সম্বন্ধে সেই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ভালভাবে পরখ নিয়ে তবে এই ব্যবস্থা করে থাকেন। যদি কোন শিশুর বাড়ী থেকে বিদ্যালয় দূরে হয়, এবং তার জন্য তাকে বাসে কিংবা ট্রামে করে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে হয় এবং তার সে ছাড়া দেবার মত সামর্থ্য না থাকে, তবে এই যাতায়াত খরচও বিদ্যালয় থেকে দেওয়া হয়। অবশ্য এ ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দিয়ে থাকেন। তবে বিলাতে মেয়ে ও পুরুষ উভয়েই উপার্জন করে থাকেন, সুতরাং তাঁদের শিশুদের এই সকল খরচ দেবার মত অবস্থা থাকে।

বিলাতে প্রত্যেক এলাকায় এই রকম সরকারী বিদ্যালয় আছে। আমরা লণ্ডনের কাছাকাছি কয়েকটী গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই সব গ্রামেও ছোট ছোট বিদ্যালয় দেখে এসেছি। বড় ভাল লাগল এদের শিশুশিক্ষার ধারা দেখে। জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে তা এদের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখলে বেশ অনুভব করা যায়। তাই ছোট ছোট শিশুদের নানা রকম খেলার ভিতর দিয়ে এরা লেখাপড়া শেখাতে সুরু করেন। তার জন্য যে কত সুন্দর সুন্দর খেলা

হচ্ছে দেখে আমাদেরই লোভ হয়, তা' ছোট ছোট শিশুদের তো আরও হওয়াই স্বাভাবিক। তারা সেই সব খেলনার মধ্য দিয়ে অক্ষর চিনতে শেখে এবং সংখ্যা গুণতে শেখে বেশ খুশি হয়েই। এই জন্যই পড়া তাদের কাছে প্রথম থেকে বিভীষিকা হয়ে ওঠে না, আনন্দের মধ্য দিয়েই শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা এঁরা সব থেকে ভাল মনে করেন।

এ তো গেল খেলাধূলা শেখার ব্যাপার। এ ছাড়া স্কুলে তাদের নানা রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকে। প্রায় প্রতি স্কুলেই একটু করে খোলা জায়গায় এদের নানা রকম খেলা করার ব্যবস্থা আছে। কিছুক্ষণ পড়ার পর তারা মাঝে মাঝে ছুটি পায় খেলা করার জন্য, এতে তাদের মানসিক বিশ্রামও হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাদের নিয়ে বেড়াতে যান। এই সব ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য শিক্ষয়িত্রীরাই থাকেন অধিকাংশ স্কুলেই। কত জায়গায় দেখেছি, ট্রেণে বসে থেকে বাচ্চারা বেড়াতে চলেছে। বিলাতের চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি ঐ রকম একদল বাচ্চা, এক রকমের উর্দিপরিহিত পড়া, তারা ভারী ভাল লাগছিল দেখতে। একেই এদের স্বাস্থ্যের রং ফর্সা, তার উপর এত সুন্দর স্বাস্থ্য যে চেয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, শিশুগুলি যেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর। এর পাশেই নিজেদের দেশের দুর্বল রুগ্ন শিশুদের কথা মনে করে মন আপনি থেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। এরা অবাধে ছুটাছুটি করে, খেলা করে, দুষ্টুমি করে, সঙ্গের শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেকের উপর নজর রাখেন।

এই সব শিশুদের স্কুল থেকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলাদা চার্ট থাকে। সাধারণতঃ শিশুরা ধাত্রী নিয়ে নানারকমভাবে ভোগে, সেইজন্য প্রত্যেক স্কুলে ধাত্রীর ডাক্তার থাকেন এবং নিয়মিত বাচ্চাদের ধাত্রী পরীক্ষা ও চিকিৎসা করেন। এ ছাড়া সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার থাকেন। নিয়মিত শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যার যে বিষয়ে ত্রুটি থাকে, সেটা তার বাড়িতে অভিভাবকদের লিখিয়ে দেওয়া হয়। শুধু লিখিয়ে দিয়েই এঁরা চুপচাপ থাকেন না, তার সেই বিষয় চিকিৎসার জন্য কোথায় গেলে এবং কি ভাবে সুবিধা হবে তারও ব্যবস্থা অনেক সময়ে স্কুল কর্তৃপক্ষই করে থাকেন। এই সব দেখে বেশ বোঝা যায় যে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রীকে কতটা দায়িত্ব নিয়ে এই সকল শিশুদের শিক্ষা দিতে হয়।

আমাদের পরিচিত একটি বন্ধু তিনি এই লাইনে বেশ অনেক দিন কাজ করছেন শুনেছি। তাঁর মুখে শুনেছি যে, এই কাজে তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছে। যেমন, তিনি বলেন যে—শুধু বাচ্চাদের স্নান করিয়েই ছুটি হয় না তাঁদের, বাচ্চাদের দুপুরের খাবার সময়টিতেও তদারক করতে হয়। কোন বাচ্চা দুষ্টুমি করে খেলো না, কোন বাচ্চা টেবিলে বসে কথা বলছে কিন্তু খাচ্ছে না, এই সব দামলানো এবং কি ভাবে তারা পরিচ্ছন্নভাবে খাবে এও শিখিয়ে দিতে হয়। অবশ্য এই কাজটি প্রত্যেক শিক্ষয়িত্রীকে সপ্তাহে একদিন করে ভার নিতে হয়। এর জন্য তাঁদের বেশ সবর দিতে হয় এবং সতর্ক থাকতে হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এখানে শিক্ষয়িত্রীরা প্রতিটি শিশুর উপর আলাদা ভাবে নিজে থাকেন, তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য সব বিষয়েই। এই থেকে বোঝা যায় যে, শিশুদের স্থান ওদেশে সকলের উপরে কারণ—তারাই তো জাতির ভবিষ্যৎ। তাই জীবনের সব কিছুই যেন এদের শিক্ষাব্যবস্থার মারফতে পূর্ণ হতে চলেছে।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সানফ্রান্সিস্কো

সানফ্রান্সিস্কো পৌঁছলাম আমার জন্মদিনে ২২শে জানুয়ারি। বৈদেহী শীতার বর করল আশীর্বাদ : "যেন কৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছু না চাও।" তবে কোথায় কৃষ্ণ, আর কোথায় সানফ্রান্সিস্কো! মন প্রায় উধাও হ'তে আসে আর কি এমন সময়ে চোখে পড়ল বিমানঘাঁটিতে বেড়ার বাইরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে বন্ধুবর স্নেহভাজন শ্রীমান হরিদাস চৌধুরী, তন্ত্রজ্ঞা বীণা, ডাক্তার স্পীগেলবার্গ দম্পতি ও মিস টাইবার্গ। স্পীগেলবার্গ আমাদের আশ্রমে গিয়েছিলেন মাত্র দুদিনের জন্য, তাঁর সঙ্গে সেই থেকে পত্রালাপ চালিয়ে এসেছি ঘটে কিন্তু তাঁর মুখ আমার মনে ছিল না। যাই হোক হরিদাসের কাছে অনাস্কিকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়ে তাঁকে এমন ভাব দেখালাম যেন আমি তাঁকে ঠিক তেমনি সহজে চিনে নিয়েছি যেমন তিনি আমাকে। মিস টাইবার্গকে চিনতে বেশ দেরি হয় নি কেননা আশ্রমে ইনি কিছুদিন ছিলেন। আনন্দ-সম্ভাষণ সারা হ'লে আমি ও ইন্দিরা আরূঢ় হলাম স্পীগেলবার্গের মোটরে, হরিদাস ও বীণা—টাইবার্গের মোটরে। হ্যাঁ, একটা কথা বলি। এক নিগ্রো ভারবাহী আমাদের পাঁচ জনটি ভারি বাক্স এমন অবলীলাক্রমে তুলে নিল দুই হাতে—দুজনেরও বেশি ওজন—যে আশ্চর্য না হ'লে তার উপর অবিচার করা হ'ত।

বলাই এখন আশ্চর্য হওয়া সম্বন্ধে দুএকটি দার্শনিক কথা—যা থাকে কপালে।

জগতে মানুষ রকমারি—না জানে কে? কিন্তু যদি বলি—একটু বাড়িয়েই হয়ত—যে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়: একদল যারা আশ্চর্য হবার মতন কিছু দেখলেই আশ্চর্য হয় অনুভূতপ্ত ভাবে, আর একদল যারা কোনো কিছু দেখেই "আশ্চর্য হয়েছি" কবুল করতে চায় না।

এই দ্বিতীয় দলের মনোভাব এই যে "আশ্চর্য হয়েছি" বলা হ'ল "চাক খেয়েছি" বলার সামিল। আমার মনে হয় এরা জীবনের একটি প্রধান রস থেকে বঞ্চিত হয়। এডলার অ্যালেন পো বলতেন "It is a happiness to wonder." অকথায় আমার মন বাড়া মিথ্যে আশৈশব। তাই পাঠক-পাঠিকা দয়া ক'রে অন্তত ক্ষমা করবেন যখন আমার এ-ও-তা নানা কিছুতেই আশ্চর্য হওয়ার অকপটোক্তিতে তাঁরা সাড়া দিতে পারবেন না। হাসেন হাসুন—ইংরাজি সাম্বনা-পুরাণ বলেন : he wins who laughs last—কিন্তু রাগ যেন না করেন এই মিনতি। এই ধরুন না কেন, হনোলুলুতে দেখলাম ট্রাম চলছে কখনো বা নিচে লাইনে গড়িয়ে উপরে তার বিনা, কখনো বা উপরে তারের সঙ্গে আকর্ষির যোগসূত্র আছে কিন্তু নিচে ট্রামের লাইনের চিহ্নও নেই। দেখে তারি আশ্চর্য হ'লাম। সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছতে না পৌঁছতে আশ্চর্য হলাম আরো কত কিছুতে! কলব?

পয়লা নম্বর হলেন : ঐ নিগ্রো ভারবাহীর আশ্চর্য বলিষ্ঠতা, মাথা ব্যবহার না ক'রে দেহের নানা স্থানে নানা বিন্যাসে পাঁচ ছয়টি ভারি বাক্স বগলদাবায় ক'রে অবলীলাক্রমে মোটরে স্থাপন।

দোসরা : রোদ মাথায় শীগেলবাগীয় মোটরে ছহু ক'রে উধাও হ'তে হ'তে—ও মা! এ কী কাণ্ড! পথে চলেছে ব্যস্তবেগে অজস্র মোটর কিন্তু একটিও পথিকের দেখা নেই!! সত্যি বলছি সারা পথে প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখলাম মাত্র দুটি পথিক যারা চলমান ব্রহ্মবাবুর ছুড়ি ক'রে (টীকা—পরন্তরে)! পরে অবশ্য পথিক বেরোয় অনেক, কিন্তু তবুও ভোর সাতটা থেকে আটটার মধ্যে প্রায় বিশ মাইল পথে মোটর যদি দেখে থাকি কিম্বা ক'রে চার পাঁচ হাজার, পথিক দেখেছি বড় জোর চারটি কি পাঁচটি! হবেন না আশ্চর্য? না-ই হ'লেন। আমি হবই আশ্চর্য—তা আমাকে আপনারা যত ইচ্ছে না পাড়াগেঁয়ে ভাবুন।

তেসরা : অবাক্! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাস্তা এই উঁচু, এই নিচু—আর যে কী নিচু! জ্যামিতিতে পড়েছিলাম খাড়া হ'ল নব্বই ডিগ্রি। এ-চাল প্রায় বিশ পঁচিশ ডিগ্রিরও বেশি হবে, জায়গায় জায়গায় অন্ত শিহরিত হয় হু-হু ক'রে উঠেই সে কী দারুণ ভ-ভ্ ক'রে নামা! পাঠক বলবেন হেসে : "আঃ, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? বুঝলে না—সানফ্রান্সিস্কো রাজধানী শৈলচারিণী—পাহাড় কেটে পথ বানানো।" মানি। কিন্তু ভাবুন কী অজস্র ও বিশাল পথ কাটতে হয়েছে! আর শুধু কি পথ কাটা, দাদা? সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গ। ইংলণ্ডে সুড়ঙ্গ কেটে ট্রেনের পথ করা হয়েছে দেখে যথারীতি আশ্চর্য হয়েছিলাম ১৯১৯ সালে। এও সেখানে দেখেছি যে "উপরে জাহাজ চলে নিচে চলে রেল।" কিন্তু এখানে দেখলাম :

তেসরা অন্বয়ের বিস্ময় : বিরাট ও প্রলম্ব সুড়ঙ্গের মুখলবায়ার এপাশের সুড়ঙ্গে চলে মোটর একদিকে, ওপাশে অন্যদিকে। আর প্রতি সুড়ঙ্গেরই উপরে সে কী মরণ শীতাতপ ভোম—মাঝে লম্বা লাল আলো। সারা সুড়ঙ্গ যেন মনে হয় দিনের আলোয় ছাইছে। এত বড় সুড়ঙ্গে এত আলো দেখেছেন কি? যদি না দেখে থাকেন তবে জেনে রাখুন—দেখলে হয় আশ্চর্য হ'তেন আমার মতন, নয় আশ্চর্য না হ'য়ে ব্যাপ্যা করতেন যেমন বৈজ্ঞানিক রামধনু দেখে ব্যাপ্যা করে : ও আর আশ্চর্য কী—ডিফ্রাক্শন—বেগুনি, অতি নীল, নীল, সবুজ, পীত, কমলা, লাল ইত্যাদি।" সবই জানি দাদা, কিন্তু তবু তৎকৃতের কাছে এই চিরপরিচিত

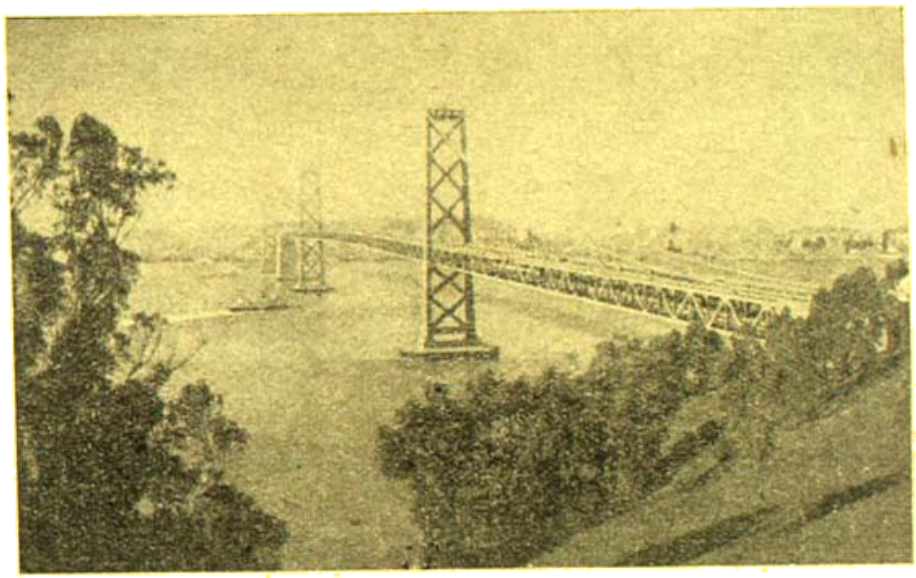

সানফ্রান্সিস্কো-অকল্যাণ্ড-উপসাগরের সেতু। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ৮॥ সাড়ে আট মাইলেরও বেশি

রামধনু দেখেও হয়েছিলাম ফের অবাক। কারণ সে সময়ে রামধনু শুধু যে মিছে ছিল তাই নয়—আমাদের আকাশ পক্ষী যেন, চেলেছিল তার বক্ষ ভেদ ক'রে। এহেন দৃশ্য প্রায়ই বিমানে আসো অনেকেই একাধিকবার দেখে থাকবেন। কিন্তু আমি দেখেছিলাম মাত্র একবার—৮ই জানুয়ারি। ভালোই হ'ল সম্প্রতি এ সব নানান্ আশ্চর্য হওয়ার কাহিনী লিপিবদ্ধ ক'রে রাখলাম। ভবিষ্যতে আমাদের উত্তরপুরুষ পাঠক-পাঠিকা যখন পড়বেন তখন বলবেন হেসে : "আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কী সরল, ওঁদের অজ্ঞ!" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমাদের অন্তরীক্ষ আত্মা তখন পোপের ভাষায় সান্ত্বনা আহরণ করবে :

We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser children will, too, think us so!

* * * *

"আমেরিকান আকাডেমি অব পলিটিক্যাল সায়েন্স" ঘুরে নিয়ে গেলেন শ্রীমৎ শ্টীগেলবার্গ দম্পতী। বলতে ভুলেছি শ্রীমৎ শ্টীগেলবার্গ মোটরে চালানের বয়স, শ্রীমতী—কেবল মোটর। আমেরিকায় মোটর চালানো যে কী বস্তু আমাদের দেশ থেকে কল্পনা করা শক্ত। যদিচ কোথাও পুলিসের চিহ্ন নেই, কিন্তু মোড়ে মোড়ে অটোমেটিক লাল নীল পীত বাতি জ্বলে উঠছে ঘড়ি ঘড়ি—একটার পর একটা। সেই অনুসারে গাড়ি চালাতে হয়। এ ছাড়া কতবার যে মোটর দাঁড় করাতে হয় সামনের গাড়ি দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে! ড্রাইভার শ্টীগেলবার্গ হঠাৎ গাড়ির ভেঁপু এক মাপ খুললেন। "কী ব্যাপার?" "দেখছি অটোকাটের ব্যাপার।" "কাটো" শব্দটা চলে বটে কিন্তু সময় লাগলে "লং"। কারণ আকাডেমিতে পৌঁছে সেখানে রাস্তায় এসে চরিত্রবান শ্টীগেলবার্গ আমাদের আগে পৌঁছে অপেক্ষা করছেন। যাক্।

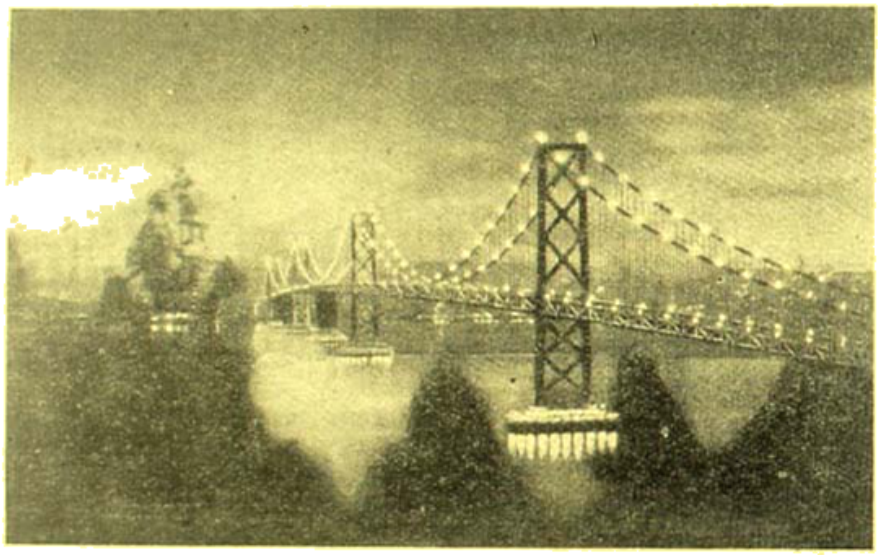

সান্‌ফ্রান্সিস্কো অকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু। রাতের দৃশ্য

ওখানে আকাডেমির সিনেটী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নাম বুঝি ম্যাসাচুসেটের। আর একটি অধ্যাপক বুঝি ক্যালিফোর্নিয়ার। আর একজন—কি যেন পড়ান: ব্রিটিশ, না কোরাণ, না জেন্দাবেস্তা, ভুলে গেছি।

* * * *

ভারতীয় কনসালের ওখান থেকে এলেন সেক্রেটারি "লাল": "কী করতে পারি আমরা? দেশ থেকে চিঠি এসেছে আপনাদের দেখাশুনো করা আমাদের কর্তব্য"—ইত্যাদি। "লাল" অতি সজ্জন, মধুভাষী। বললাম: "কনসালের সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন বলব।"—"চুটোর সময়?"—"সাদা কথা। মিস টাইবার্গের সঙ্গিনীর ওখানে ডিনার নিমন্ত্রণ ক'রেই রাজির হব।"

মিস টাইবার্গ থাকেন একটি সুন্দর ফ্ল্যাটে। তাঁর সঙ্গিনী মিসেস ডার্লিং-এর দুটি বড় বড় ছেলে। বিধবা হ'য়ে তিনি একাই থাকেন, রোজগার করেন। তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হ'তে হ'ল। খাওয়ার পরে এল এক চমৎকার বহুস্তরীয় প্রকাণ্ড কেক। তার উপরে চকোলেট-অক্ষরে লেখা Happy birth day to Dilip কেকটি আমার সামনে পেশ ক'রেই গান ধরলেন দুটি মহিলা: "Happy happy birth day to Dilip!" মনটা ভ'রে উঠল। শরৎচন্দ্রের কথা মনে পড়ল: মা যেন আমাদের কোথায় নেই? বিদেশে এই আন্তরিক স্নেহস্পর্শ—প্রায় সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে উঠি আর কি!

খাওয়া শেষ হ'লে মিসেস ডার্লিং বললেন: "আপনারা যদি চান তো আমার ফ্ল্যাটে থাকতে পারেন।" মিস টাইবার্গ তাঁর ঘর আমাদের ছেড়ে দিয়ে একটি ছোট ঘরে থাকবেন—ইত্যাদি। কিন্তু এ-ব্যবস্থায় আমরা রাজি হ'লাম না। কনসাল হুসেন সাহেবের ওখানে গিয়ে বললাম: "সব আগে চাই একটা মাথা গুঁজবার জায়গা—খুব বেশি আড়িভাঙা বরদাস্ত হবে না আমাদের। চলনসই গোছের আস্তানায় থাকতে পারলেই হবে।" হুসেন সাহেব অতি মিষ্টভাষী। বললেন: "স্যার সি সি রামস্বামীকে যে-হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছিলাম তাদের চার্জ খুব বেশি নয়।" ভাল দিয়ে গেলেন সেই হোটেলে—হোটেল স্ট্রাট। দুটি ঘর পাশাপাশি—মাঝে একটি স্নানের ঘর। চমৎকার ব্যবস্থা। ঘর ভাড়া মাথা পিছু সাড়ে তিন ডলার। দুটি ঘরে দিন সাত ডলার অর্থাৎ পঁচত্রিশ টাকা। খা ও য়া-দা ও য়া আলাদা। এই ব্যবস্থাই এখানে চালু হয়েছে।

এখানকার হোটেল বা সী দে র খা ও য়া-দা ও য়া র ব্যবস্থার কথা বলি—কা র ণ ব্যবস্থাটি খুবই ভালো লাগল। আমেরিকা যন্ত্রপ্রধান দেশ। মানুষের কর্মীর তথা সাধনীর কাজ যতটা পারে নাকচ করে এরা যন্ত্রের দৌলতে। ফলে গ'ড়ে উঠেছে কাফেটারিয়া। হোটেলে পরিচারক তথা পরিবেষকের জন্যে আলাদা চার্জ দিতে হয় ব'লে এই ব্যবস্থার উদ্ভাবনা। এতে পরিবেষক নেই আছে খাদ্যদাতা খুড়ি, খাদ্যী। কি রকম—বলি। কাফেটারিয়ার ভোজনালয়ে এসে প্রত্যেককে এক একটি সুন্দর ট্রে হাতিয়ে তার উপর দরকার মতন কাঁটা ছুরি চামচ ন্যাপকিন পাশ থেকে নিয়ে পরিবেষকদের সামনে দাঁড়াতে হয়। খাবার অবশ্য—সাজানো ধরে থরে। শুধু বলায় অপেক্ষা অমুক ডিস, মাছ মাংস, অমুক রুটি, অমুক সালাড, অমুক পাই, ফলের রস, কেক, স্যাণ্ডউইচ—পরিশেষে কফি কিম্বা চা। ওপাশে বওয়ারমান খাদ্যযাত্রী লক্ষ্যবেগে ট্রের উপর যাহিত খাদ্যভার সাজিয়ে দেন। ট্রে চলে রেলের উপর দা দা ক'রে—পরের কাউন্টারে ক্যাশিয়ার মহিলা—তিনি খাবার দেখেই বিল

দেশ—তৎক্ষণাৎ নগদ মিলবে। কী ক'রে এঁরা একটি চকিত কটাক্ষে খাদ্যসম্ভারের মূল্য নির্ধারণ করেন জানতে বাঁধা লাগত। কের সেই অঙ্কে হওয়া! থাক্। প্রাতরাশ আমাদের পড়ত এক টুলায় ক'রে। লাঞ্চ বা ডিনার বেড় টুলায় ক'রে।

এ ব্যবস্থায় সুবিধা এত যে মন ভারি আরাম বোধ করল। কী পাবার চাই খাদ্যতালিকা দেখে ঠাহর করতে হয় না চোখে দেখে নিতে হয়। ক'দের সাথ বা মাংস পরিচর ওলে বিধাই করা এক ও কদের ফলগুলোর পরিচয় পেয়ে আটটি বস্তু করা যায়। এতক্ষণে বুঝলেন কি "ক্যাফেটারিয়া" কী বস্তু?

কিন্তু সেটা সবচেয়ে অভিভূত করে সেটা হ'ল এদের দেশে খাদ্যের প্রাচুর্য। যে কোনো ছোটেল রেস্টরাঁতে খাদ্যসম্ভার বহুবিধ ও অফুরন্ত। রেশনিং কী বস্তু এরা শুধু খবরের কাগজেই পড়েছে ও সম্ভবত হেসেছে আত্মপ্রসাদের হাসি—যেমন আমরা হাসি যখন শুনি কোনো পাশ্চাত্য মহিলাকে বলতে (এ আমার স্বকর্ণে শোনা): "রোটে ফালতা না দিয়ে বেকনো আর নয় হ'য়ে বেকনো সমার্থক।" অত্যাসো নাতিরিচ্যতে।

* * * *

সন্ধ্যাবেলা গেলাম আকাডেমিতে। দেখলাম হরিদাস তার ক্লাসে পড়া দিচ্ছে। বলল: "যাং না দেখাচ্ছে" পরে স্পীগেলবার্গ নিয়ে গেলেন তাঁর সংস্কৃত ক্লাসে। আমাকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে ধ'রে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন আমার গুণপনা সম্বন্ধে। পরে বললেন আমাকে সংস্কৃত আবৃত্তি কিছু শোনাতে। ওদের হাতে ছিল গীতা। আমার মুখস্থ ছিল একাদশ অধ্যায় অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন। অনেকগুলি শ্লোক স্মৃতি থেকে আবৃত্তি ক'রে শোনালাম: "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে..." একটু গেয়ে শোনালাম: "স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা...সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ।" ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে গীতা খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে শুনতে লাগল। পরে আমি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে। বললাম: "অনেকে ভুল ক'রে বলে থাকেন সংস্কৃত আমাদের দেশে মৃত ভাষা। এ ধারণাকে ভুল বলছি এই জন্যে যে সংস্কৃত ভাষা এখনো ভারতের সংস্কৃতিকে শুধু বেঁচে থাকতে সাহায্য ক'রে আসছে তাই নয়—প্রদেশে প্রদেশে প্রাদেশিকতা নষ্টব মনোবৃত্তির একমাত্র জীবন্ত প্রতিষেধক এই অসাধারণ অতি-প্রাদেশিক দেবভাষা। ভারতের অন্তরাত্মার মণিকোঠায় প্রবেশ করতে হ'লে সংস্কৃত ভাষার চাবির দরকার। ভারতের পরমতম ঐতিহ্যের তথা আধ্যাত্মিকতার ধারয়িত্রী আগে সংস্কৃত ভাষা। তাই মা শ্রীঅরবিন্দকে যৌবনে বিলেত থেকে ফিরে এসে সব আগে শিখতে হয়েছিল সংস্কৃত ভাষা।"

ওরা প্রশ্ন করলে গীতা সম্বন্ধে। আমি বললাম: "গীতা আমাদের কাছে তেমনি আমরণীয় যেমন খৃষ্টানের কাছে বাইবেল্। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা আজো অনেক প্রেরণা পেয়ে থাকি গীতার বাণী থেকে। আমাদের জীবনে বিভীষিকার যে রকমারি আদর্শ রক্ষাত করেছে তার প্রত্যেক সমাধান আমরা পেয়ে থাকি গীতার বিধান থেকে। অর্জুন গীতার স্থান নিয়েছেন বিশ্বমানবের, শ্রীকৃষ্ণ বেদব্যাসের তথা জগদ্গুরুর। মানুষ যুগে যুগে যতবিধ প্রশ্ন পেশ করেছে বিশ্বাতার দরবারে। গীতা তার একটি জীবন্ত সাক্ষ্য। ভগবানের বাণী মানুষের কাছে নানা সময়েই মনে হয় অত্যাবিরোধী—যেমন অর্জুনের মনে হয়েছিল যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে মিনতির সুরে বলেছিলেন:

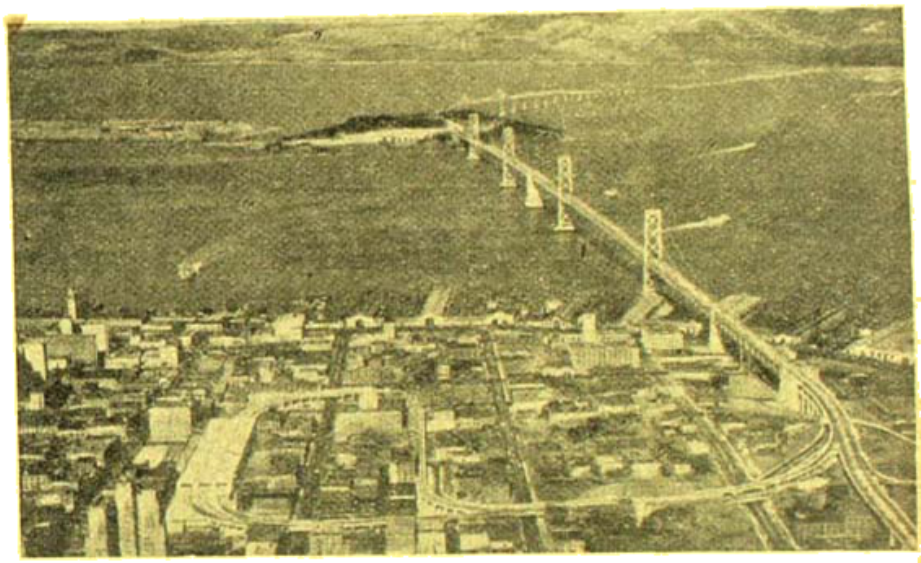

বিমান হতে সানফ্রান্সিস্কো অকল্যাণ্ড উপসাগরের সেতু ও বন্দর

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেক বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্।

অর্থাৎ প্রভু, আর উল্টো পাল্টা কথা ব'লে বিপাকে ফেলো না আমার বুদ্ধিকে। বলো সোজাসুজি কী করলে উত্তীর্ণ হব ভ্রান্তি থেকে শান্তি ভেয়োলোকে।" ব'লে শেষে বললাম: "একটু চোখ চেয়ে দেখলে বোঝা যাবে আজো এ-প্রশ্নের মিঠা নবরূপ হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক জিজ্ঞাসুর মনেও—তাকে ছুটতে হচ্ছে সমাধানের জন্যে কৃষ্ণের কাছে না হোক (তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর ছুটি মিলবে কোথায়?)—সদ্গুরুর কাছে, কবিবর জ্ঞানীর কাছে, নিরভিমান আত্মবিৎ-এর কাছে।"

আমার বক্তৃতা শেষে ছাত্রছাত্রীরা উদ্ভাসিত মুখে আমাকে নানা প্রশ্ন সুরু করল—আমি সাধ্যমত উত্তর দিতে লাগলাম। স্পীগেলবর্গের সংস্কৃত ক্লাসে দেখে উঠল এক বিচিত্র উৎসাহের সাড়া। ভালো লাগল দেখে যে, আমাদের দেশের আপ্তবাক্য সম্বন্ধে

বিদেশের ভারতীয়দের আন্তরিক শ্রদ্ধা। এ-বিদেশে আমি এসেছি চাই এই বিশ্বাসটির জন্যে কিছু প্রমাণ পেতে যে সহজ আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে মন সম্বন্ধে কিছু বলতে সবাই না হোক তেউ কেউ অন্তত রাজী হবে, শুক্তিবাদের অনুপ্রেরণায় গান করতে করতেই হৃদয় অমৃত হবে, সোরোজার ও রহস্যের ভেদ সম্বন্ধে আর্দ্র হ'য়ে ওঠে। এ নিয়ে মার তাদের অবহারণা করা যেতে পারে অবশ্য—। এমন কোন্ উক্তি আছে যা নিয়ে শুরু করা যায় না চলে?—কিন্তু সব উক্তাউক্তির অন্তরে একটি প্রশ্নের মানবহৃদয়ে বোধকরি আজও তেম্নি ভেঙে আছে: যে প্রশ্নের একটি পরীক্ষার অনুভব থেকে মানুষ ভেদবুদ্ধির বাধা ডিঙিয়ে অন্য মানুষের কাছাকাছি আসতে পারে।

এবারের বলাকে আর একটি প্রমাণ পেলাম গত দিন বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরির বাড়িতে ভজন গানে ও আলাপনে ক'রে। এখানে একটি ছোট দলের সঙ্গে আমার হ'ল—হরিদাসই তাদের নিয়ে এল—যারা চাইছে

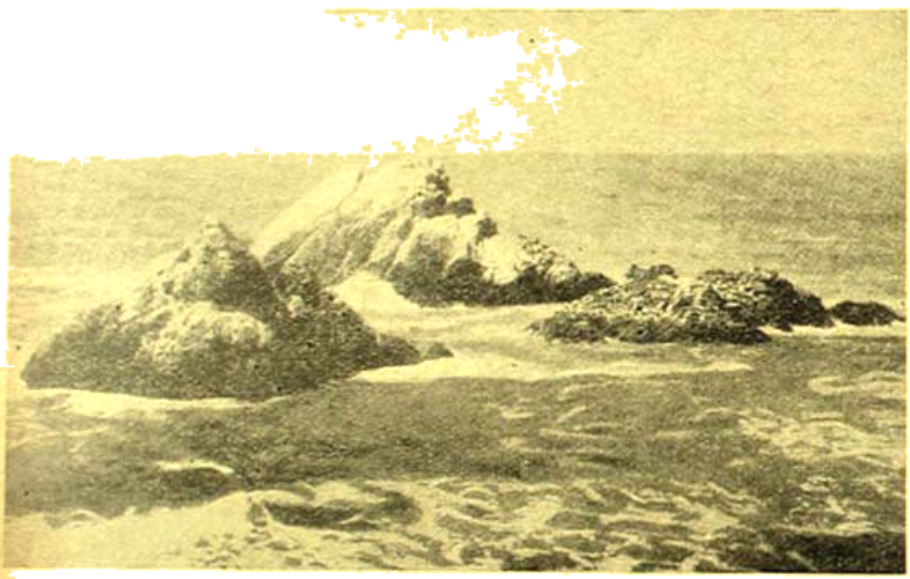

শিলঙ—সানরাজিয়ে

একটি শ্রীঅরবিন্দ ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে। এদের মধ্যে দুতিনটি ছেলের সঙ্গে পেলাম হরিদাসের ওখানে। হরিদাস থাকে কটকে, সেখানে মাসে চমৎকার শিল্পাধ্যক্ষের সঙ্গে। এখানে শিল্পকলা সম্বন্ধে নানারকম চর্চা হয়। বাড়িটি বড়, ক্লাসও হয় নানা ঘরে, ইতিমধ্যে ঘরে ঘরে অধ্যক্ষ ও হরিদাস দুজিপি বীণাকে নিয়ে। সেখানে মাঝে মাঝে শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দেয়, মাঝে মাঝে ধ্যানচক্র বসে। আমি এলাম ভজন শোনাতে। গাইলাম বীরা ভজন—ইন্দিরার প্রতিনিধি—"জাগো মা চণ্ডী চণ্ডী"—(প্রেমাঞ্জলি ১৮০ পৃঃ)। এর সংস্কৃত বাংলা ব্যাখ্যান ও সব শেষে ছত্রে ছত্রে কৃষ্ণ ছত্রে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছত্রে ছত্রে "নামকীর্তন"। অনেকদিন বাদে ছিমছাম নামকীর্তন করতে পেরে মন ভ'রে উঠল। অধ্যক্ষবর্গ সোফাসেটে সাড়া দিলেন। একটি মার্কিণ মহিলা, একটি ছিন্ন ভদ্রলোক ও শিল্পাধ্যক্ষ পেলার এবন কণ্ঠকণ্ঠে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন যে মনে হ'ল তাঁদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোথাও বা একটু কাঁপন জেগে থাকবে। পেলার বললেন: "যখন ইচ্ছা আমার এখানে আসবেন। আমার দুয়ার আপনার জন্যে খোলা রইল।" ঠিক হ'ল ইন্দিরার নাচের মহলা এখানেই হবে। ভাবনায় পড়েছিলাম এ বিদেশে মহলা দেওয়া যায় কোথায়? সংকটত্রাণ ক'রে ছিলেন দমাধান। মীরার কথা মনে পড়ল: "তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখো। বিপাকে ফেলবার জন্যে প্রভু তোমাকে এতদূরে টেনে আনেন নি—বলছি আমি।" জয়হোক মীরার দৈবজ্ঞবাণীর!

০ • •

হঠাৎ এলেন এক পিয়ানো-বাদক ও সুরকার—লস এঞ্জেলস্ থেকে। আমাদের কথা শুনেছিলেন। এসেই বললেন তিনি চান আমাদের শোনাতে তাঁর পিয়ানোতে-তোলা ভারতীয় রাগরাগিনী। লোকটি দেখতে বেশ ভারিক্কি, কথাবার্তাও খুব নরম। কিন্তু কোথায় একটা আত্মাভিমান আছে যার নাম দেওয়া না গেলেও নামের হদিশ পাওয়া যায়। তাই আমাদের রাগ ভালো ক'রে না আয়ত্ত ক'রেই শোনাতে এত আগ্রহ—বাহবার লোভ। তবে যখন বললেন: আমি মনে প্রাণে ভারতীয়, এদেশে জন্মেছি কেন, কে জানে?—তখন মনের কোণে একটা নরম বোধ করলাম। এখানে ভারতীয় কয়েকটি শিল্পী নিয়ে ইনি কলার্ট আদি দিয়ে থাকেন। ইচ্ছা—আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেই। ভাবটা—আমি তোমাদের গ'ড়ে পিটে নেব আমাদের সভার জন্যে। একলা চললে তোমরা নাগাল পাবে না সাফল্যের, কিন্তু আমায় সহযোগী হ'তে না হ'তে পারে যাহবা। আমি বললাম পাল্টাজবাবে: "আমরা আমেরিকায় জলসভার বাহবা পেতে আসি নি—তবে আমাদের যা আদর্শ তার সঙ্গে মিলালে একটা কলার্ট দিতে পারি।" তারপর অনেক কথা হ'ল। তিনি তাঁর প্রোগ্রাম দেখালেন। বোঝা গেল ভারত থেকে (যেমন এদেশে প্রায়ই হয়) যাদের কয়েকজন শিল্পী এসে বুকিয়েছে তারা ভারতীয় নৃত্যগীতের শিখরসঞ্চারী। বললাম তাঁকে: "বন্ধু! আপনার প্রচেষ্টা তথা অমায়িকতার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু ইন্দিরা ও আমি অজ্ঞাতকুলশীল মধ্যশিক্ষিতগণ: প্রাচীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাম কিনতে রাজি নই। যদি আমরা যেটুক যতদূর পর্যন্ত দিতে পারি আপনাদের আমেরিকান হাটে পুরোদামে না বিকোয় তবে সস্তা দরে বিকিয়ে চতুর বণিক উপাধি পেলে আমরা হব ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ। আদর্শের ক্ষেত্রে কানা মামার চেয়ে নেই মামাই

ভালো।" ভদ্রলোক শুনে একটু যেন হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে ইন্সিয়ার মৃত্যু মেপে সুর তাঁর আরো বদলে গেল। বললেন: "না না—যাতে শিল্পীর সঙ্গে আপনারা মিশবেন কেন? আমি বলি কি—আমি কয়েকটি মৃত্যুগীত দেব—আপনারা যে আসরে তারকাশিল্পীর নতুন ভাবের মৃত্যুগীত দিন।" বললাম মনে মনে: পথে এসো বাছা। প্রকাশ্যে: "আচ্ছা ভেবে জবাব দেব।" দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

* * *

একটি পার্টিতে গেলাম—খাস আমেরিকান পার্টি যাকে বলে। উঃ, সে কী কাণ্ড! কত যে নরনারী—আর প্রত্যেকেই এসে যে কী অদ্ভুত কথা উদ্গীরণ করেন! কত হোমরাও চোমরাও সংবাদ নিলেন আমাদের—করলেন কতই সমাদর! "আর শুনেছি—অমুক একদিন আমাদের ওখানে।"—ইত্যাদি।

কিন্তু যান কোথায়? এধরণের পার্টিতে? সবাই কথা কইছে সবার সঙ্গে, অথচ কারুর কথাই কারুর কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করছে না। হট্টগোলে এখানকার বাণী সুর। সর্বোপরি, যুবক যুবতী পান করছে রকমারি লোমহর্ষক। আর সে কি পান ব'লে পান! একজন এমন পান করলেন যে একটি গ্রামোফোন বাজছিল মাইক্রোফোন সমেত সেই মাইক্রোফোনটির উপর চ'লে পড়লেন, মাইক্রোফোন অচল! এহেন পার্টির সুরে মনমরা। পিতৃদেবের বাণী স্মরণ ক'রে "মুক্তিবা এমন ভেদঃ" মনে মনে পলায়নম্" বলতে বলতে পান না খেয়ে গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বন্ধুবর লেকোরের মোটরে চম্পট।

* * *

বালাই

শ্রীসমরেশচন্দ্র রুদ্র এম-এ

(নাটিকা)

আইনসভার সদস্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষের বৈঠকখানা। আসবাবপত্র প্রায় নতুন, কারণ শ্রীমতী এইবারই প্রথম নির্বাচিতা হয়েছেন। ভালভাবেই সাজান বৈঠকখানাটি। দেশনেতা তিনচারজনের বড় ছবি দেয়ালে। আর একটি বড় এনলার্জড্ ফটো শ্রীমতীর পিতার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেয়ালঘড়িতে ৭টা বেজে যাচ্ছে। ঈষৎ মরলা পাৎলুন ও ছেঁড়া হাফসার্টপরা এক ভদ্রলোক একটা কৌচে হেলান দিয়ে বসে আছেন। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রোগা, চুল উস্কোখুস্কো। এ ঘরে কেমন যেন বেমানান হলেও তিনি কোনকিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে পায়ের উপর পা দিয়ে বিড়ি টানছেন। এমন সময় বাইরের দরজা দিয়ে একজন সুবেশ ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়ীর চাকর প্রবেশ করল ও তাঁকে 'বসুন, আমি খবর দিচ্ছি' বলে ভিতরের দিকের দরজার সুদৃশ্য পর্দা ঠেলে অন্দরে গেল। উপবিষ্ট ভদ্রলোক, অর্থাৎ রতনবাবু, এ ব্যাপারটার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে বিড়ি টেনে চলতে লাগলেন। নবাগত ভদ্রলোক, অর্থাৎ গৌতমবাবু, বয়স প্রায় চল্লিশ, এঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন। বিড়ি টানা শেষ হলে সেটা ছাইদানীতে ফেলে রতনবাবু এঁর দিকে মুখ ফেরালেন।

রতন। (আর একটু সময় চেয়ে থেকে) আপনি কি অ্যাসেমব্লী মেম্বার, না অফিসার?

গৌতম। (প্রশ্নে কিছুটা অবস্তি বোধ করে) আমি শ্রীমতী ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

রতন। (সমান হেলাচ্ছলে) তা তো বুঝছি। আইন সভার এক মাথা উনি, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন না তো কি আর ওঁর চাকরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন! যা মেজাজ মশাই, কি বলে বসে দেখুন। আচমকা বড়লোক হওয়ার কাণ্ডই আলাদা।

গৌতম। (কিছুটা বিস্মিত) আপনি—আপনি কে?

রতন। (সামান্য হেসে) আমি? একজন নগণ্য লোক মশাই, আর খোঁজ নিয়ে লজ্জা দেন কেন! তবে এই ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে অনেক দিন থেকে জানাশোনা আর কি, বুঝছেন না?

গৌতম একদৃষ্টে চেয়ে রইল

মফস্বলী লোক মশাই, কথায় ত্রুটী নেবেন না—আপনারা মানী লোক।

গৌতম। না না, তা নয়। তাহলে আপনি কি ওঁর কোন আত্মীয়টাত্মীয় বা—

রতন। (অন্যমনস্ক ভাবে) আত্মীয়? হাসালে আপনি। (সামলে নিয়ে) ভবঘুরে, একটা বেকা

মশাই। বাড়ী ছিল কুষ্টিয়ায়; পাকিস্থানে পড়ে গিয়ে বড় বিপাকে পড়েছি।

গৌতম। আপনার ফ্যামিলি নেই? ফ্যামিলি কোথা?

রতন। সবই আছে, আবার কিছুই নেই। আর বলেন কেন দুঃখের কথা, সে এক ইতিহাস। কিন্তু আপনার কথা তো শোনা হচ্ছে না। আপনি কি অ্যাসেমব্লী মেম্বার নাকি? ডেমো না কেমো—কোন দলের?

গৌতম। (হাসিমুখে) কোন দলের হলে ভাল হয়?

রতন। যে দলেরই হন, নেতাটাকে ভাল করে চালান। মাতব্বরকে পেতে পরতে দেন, একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতে দেন।

এমন সময় ভিতর দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না, বয়স ত্রিশ বত্রিশ; সোনার চেয়ারা, অঙ্গ সজ্জা, মুখটি সুঠাম না হলেও ভাল, তবে মোটা। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছে, বিজলীর চন্দনের ইলেকট্রিক বাল্ব পড়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বলে শ্রীরতনের মুখখানি খুব বুদ্ধিদীপ্ত মনে হচ্ছে।

জ্যোৎস্না। এ সময় যে? কোথা থেকে ফিরছেন নাকি?

গৌতম। হাঁ, ডেপুটী মিনিস্টার চিত্রা ঘোষের বাড়ীতে গেছলুম।

জ্যোৎস্না। দেখা হল?

জ্যোৎস্না বসল

গৌতম। হাঁ।

জ্যোৎস্না। (রতনের প্রতি) যোগ, তুমি একটু বাইরে ঘুরে এসনা।

রতন। (এতক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে ছিল; কথা শুনে মুখ ফিরিয়ে) ও,—হ্যাঁ, এই যে যাই।

কিন্তু উঠবার লক্ষণ না দেখিয়ে একটা সিঁড়ি ধরাতে গেল

জ্যোৎস্না। সিঁড়ির গন্ধ মোটে সহ্য করতে পারিনা।

গৌতম সিগারেট কেস বার করে রতনের সামনে ধরতে সে একটা তুলে নিয়ে ধরালে

আশ্চর্য্য লাগে আমার বাবার কথা ভাবলে। কোন কিছুতেই নেশা ছিল না তাঁর, এমন কি পান শুদ্ধ খেতেন না।

রতন। (সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে ধোঁয়াটা উপরের দিকে ছেড়ে) হুঁ, কেবলমাত্র তামাক পাতা মুখে রাখতেন।

গৌতম সবিস্ময়ে রতনের দিকে চেয়ে জ্যোৎস্নার দিকে মুখ ফেরাতে জ্যোৎস্না নিজের মাথার একটা আঙুল ঠুকে জানান যে ওর মাথা খারাপ।

জ্যোৎস্না। তারপর চিত্রার সঙ্গে কি কথা হল বলুন।

গৌতম। খুব উপমন্ত্রী পেয়েছেন যাহোক! কোন একটা সাহায্যে আসেন না। আরে আমরা পাটির লোক, আমরা যদি কিছু সুযোগসুবিধে না পাই তো পার্টিতে থাকার মানে? বললুম, মিশরে যে কালচারাল ডেলিগেশনটা যাচ্ছে, তাতে আমাকে যাতে নেওয়া হয়, তার একটু চেষ্টা করবেন। বলে কিনা, চিফ মিনিস্টারকে বলুন গিয়ে।

জ্যোৎস্না। একেবারে একটা অপদার্থকে ডেপুটী মিনিস্টার করা হয়েছে। ব্যক্তিগত মতামত কিছু নেই, সাহস নেই, নেহাৎ মুখচোরা। তার চেয়ে গেরস্থালী করলি না কেন বাপু, অ্যাসেমব্লীতে এলি কেন?

রতন। পুত্রকন্যা নেই বলে।

জ্যোৎস্না। (রুক্ষস্বরে) তুমি একটু বাইরে যাবে?

রতন। এই যে যাই।

উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না

গৌতম। আপনাকে কিন্তু আমার অনুরোধ, আপনি একবার চিফ মিনিস্টারকে দিল্লীতে প্রাইমমিনিস্টারকে টেলিফোনে আমার কথাটা বলতে বলুন। মিশর সম্বন্ধে আমার কত লেখা কাগজে বেরিয়েছে, দেখেছেন তো? তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে আমার পড়াশোনা প্রচুর। ধরুন, সেখানকার কালচারাল মিটিংএ আমার বক্তৃতা দেশের সুনাম বাড়াবে তো?

জ্যোৎস্না। আচ্ছা দেখি, চিফ মিনিস্টারকে বলে যদি কিছু করতে পারি। তবে সেন্ট্রালের কর্ত্তারা যে আমাদের অনুরোধ রক্ষে করবেন, তা তো মনে হয় না। আমাদের চিত্রা যে নিজেকে ফরেন অ্যাফেয়ার্সে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ভাবে; বলে কি জানেন, এসব ঘরের রাজনীতি আর ভাল লাগে না, কোন এমব্যাসী টেমব্যাসী হলে ভাল হত।

গৌতম। বললেন না কেন যে আর এমব্যাসীতে কাজ নেই, গৃহবাসী হও,—যে যোগ্যতা তোমার! দেখুন,

সতীকার গুণের আদর নেই। না হলে আপনাকে না নিয়ে কি আর ঐ অপদার্থ টাকে নেয়!

জ্যোৎস্না। কত কষ্ট করেই যে জীবনে এগিয়েছি গৌতমবাবু! না হলে ধরুন, গ্রামের এক সাধারণ ব্যবসায়ীর মেয়ে আমি—

রতন। (কথার মাঝেই) কুষ্টিয়া থেকে তিন মাইল দূরে রঞ্জনপুর গ্রামের এক মুদীখানার মালিক—

জ্যোৎস্না। (অত্যন্ত কুপিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে) বাইরে যাবে কিনা তুমি? যত সব—যাও!

রতন। যাচ্ছি, যাচ্ছি।

বলে উঠে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

গৌতম। লোকটা কে বলুন তো।

জ্যোৎস্না। কিছু বলেছে নাকি আপনাকে?

গৌতম। এমনি জিজ্ঞেস করছিল, কি করি না করি। আপনার কেউ হয় নাকি?

জ্যোৎস্না। হাঁ, দূর সম্পর্কের এক ভগ্নীপতি। সম্প্রতি মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে।

গৌতম। স্ত্রী বেঁচে আছে তো?

জ্যোৎস্না। কে জানে? ওর ব্যাপার ভাল জানি না। এখানে এসে যখন তখন জ্বালাতন করে। কি আর করি বলুন। বসুন, একটু চায়ের কথা বলে আসি।

গৌতম। বলে আসতে হবে কেন? ডাক দেন না চাকরটাকে।

জ্যোৎস্না। রান্নাঘরে হয়তো সব কটাতে আড্ডা জমিয়েছে, ডাকলে কি শুনতে পাবে!

গৌতম। খুব পাবে। বলুন না কি নাম। আমি ডাকছি।

জ্যোৎস্না। (একটু জোরে) সুজিত!

গৌতম। বড় অভিজাত নাম তো। (একটু জোরে) কই হে সুজিত!

২০।২২ বৎসরের চাকর প্রবেশ করল

জ্যোৎস্না। দুকাপ চা নিয়ে এস, আর চারখানা কেক। কি কোথায়?

চাকর। ভেতরে আছে।

জ্যোৎস্না। আমাকে না বলে চলে যায় না যেন, বলে দিও।

চাকর। আচ্ছা।

গৌতম। বাবারে, ঝি, চাকর, ঠাকুর, বড় এসটাব্লিশমেণ্ট! ভাগ্য কি রকম দেখতে হবে তো। কিন্তু একা একা লাগে না আপনার?

জ্যোৎস্না। একা আর কোথায়! এক পিসীমা আছেন, আর মাঝে মাঝে দুচারজন আত্মীয় এসে উপস্থিত হচ্ছেই।

গৌতম। বড়দরের লোক হয়েছেন একটা, আর আত্মীয়স্বজন আসবে না! বড় হলেন এটা দেখাবেন তা হলে কাকে? তবু তো আসল আত্মীয়স্বজনের জ্বালাই নেই। আমরা তো তাদের ভয়েই সর্বদা পালাই পালাই করছি।

চাকর কেক চা দিয়ে গেল। জ্যোৎস্না গৌতমকে কেক চা এগিয়ে দিলে।

জ্যোৎস্না। দেখুন কেকটা আবার ভাল কিনা। সব সময় তো নিজে কিনতে বেরোবার সময় পাই না।

গৌতম। (একটু খেয়ে) ভালই তো দেখছি। রান্নাবান্না নিশ্চয় ভুলে গেছেন?

জ্যোৎস্না। না না, ভুলে যাব কেন! স্কুলে পড়াবার সময় আট বছর দুবেলা নিজে রেঁধে এসেছি, আর রান্না ভুলে যাব! কত কষ্ট যে জীবনে সহ্য করেছি, তা বলে শেষ করা যাবে না।

গৌতম। কিন্তু দেখুন, আপনার কাছে আপনার জীবনের অনেক গল্প শুনেছি কিন্তু আসল গল্পটাই শোনা হয়নি।

জ্যোৎস্না। আসল গল্প? সেটা আবার কি?

গৌতম। (হাসিমুখে) সেটা হচ্ছে এই যে আপনার নাম যা, তাই আকাশে দেখে আপনার মন খারাপ করার গল্প।

জ্যোৎস্না। (হেসে ফেলে) আমার প্রেমে-পড়ার গল্প বলছেন?

গৌতম। প্রেম ও বিবাহ—দুয়েরই বলছি।

জ্যোৎস্না। দেখুন, বরাবরই আমরা খেটে-খাওয়া বা

মেহনতী মানুষ, আমাদের আর প্রেমে পড়া বা চাঁদের আলো দেখার সময় কোথা বলুন। তাছাড়া (পিতার ফটোর দিকে চেয়ে) বাবার শাসন বড় কড়া ছিল, শুধু মানসিক ব্যাপারেই নয়, সাংসারিক ব্যাপারেও ছিল খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ; তাই স্কুলের পড়া শেষ করতে না করতেই দিলেন আমার বিয়ে।

গৌতম। হাঁা, কলেজে পড়তে গিয়ে কলিকাল না যা ঘটান, তারই ব্যবস্থা করলেন আর কি। তারপর তাঁর কথা বলুন।

জ্যোৎস্না। কার কথা।

গৌতম। নায়ক যিনি, তাঁর কথা।

জ্যোৎস্না। তাঁর কথা বিশেষ বলবার নেই ; বিয়ের একবছরের মধ্যেই অর্থাৎ কলেজে আমার ফার্স্ট ইয়ারেই, কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

গৌতম। (সবিস্ময়ে) সে কি ! কি অসুখে মারা পড়লেন ?

জ্যোৎস্না। মারা পড়েন নি। হাওয়া হয়ে গেলেন।

গৌতম। তার মানে ?

যেন সমস্ত ভিতরে কি একটা ঝন ঝন করে পড়ে যাওয়ার শব্দ হল ; সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুরের কলরব।

জ্যোৎস্না। (ব্যস্ত হয়ে উঠে) আসছি দাঁড়ান ; দেখে আসি কি হল। এসে বলছি।

ভিতরে গেল

গৌতম। (মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল) আশ্চর্য্য !

ঘাইরের দিকের দরজার পর্দা ঠেলে সন্তর্পণে প্রবেশ করল রতনবাবু।

রতন। (ঈষৎ চাপা স্বরে) কিছুই আশ্চর্য্য নয় মশাই, সব বলছি আপনাকে।

গৌতম। (আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে) আপনি ? আপনি সব জানেন ?

রতন। ঘরের লোক, জানব না আবার ? বলেন কি আপনি ! বার করুন তো একটা দেখি।

গৌতম সিগারেট কেস এগিয়ে দিলে। একটা সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে জোরে একটা টান দিলে।

বসি তাহলে মশাই ; ওঁর এখন ফিরতে দশমিনিট। ঠাকুর ঝির সঙ্গে গিন্নীর ঝগড়া এক মিনিটে মেটে না।

গৌতম। তারপর ?

রতন। তারপর মশাই, পূজনীয় পিতা বলতে তো অহির দেখছেন ; (আড়চোখে ফটোর দিকে তাকিয়ে) কিন্তু লোকটি অতি বিতিকিচ্ছিরি স্বভাবের ছিল মশাই, যেমনি খেঁকী, তেমনি হাড়কেপ্পন। স্কুলের পড়া শেষ হওয়ার আগেই তাঁর মা মারা যায় ; তারপর কয়েক মাসের মধ্যেই বুড়ো পাশের গ্রামের একটা আই-এ ফেল ছেলেকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে দেয়।

গৌতম। আই-এ ফেল ? আপনি চেনেন নাকি ?

রতন। চিনি না আবার ! শুধু তাকে নয়, তার জ্ঞাতিগোষ্ঠী, বন্ধুবান্ধব, সবাইকেই চিনি।

গৌতম। ভদ্রলোক এখন কোথায় ?

রতন। ওই যে আপনাকে বলছিলেন না, হাওয়া হয়ে গেলেন। আসলে ওঁর বাপবুড়োই তাকে হাওয়া করালে। গরীবের ছেলে, বাবা মা নেই, মামার বাড়ীতে থেকে কাজ-কর্মের চেষ্টা করছিল ; নিজের ব্যবসায়ে বসাবে বলে আশা দিয়ে বিয়ে দিলে, আর বাড়ীতেও রাখলে। তারপর মাস কতক যেতে না যেতেই এমন গঞ্জনা সুরু করল মশাই, যে বলব কি দুঃখের কথা, ছেলেটা কাউকে কিছু না জানিয়ে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল।

গৌতম। তারপর ?

রতন। (সিগারেটে জোরে একটান দিয়ে) তারপর পুরুষ মানুষ তো সে, সটান হাজির হয়ে গিয়ে বর্মায়।

গৌতম। বর্মায় ? বলেন কি !

রতন। আর বলি কি ! জোগাড়ও করলে একটা চাকরী, বছর কতক চুপচাপ কাটিয়ে দিলে।

গৌতম। তা ইনি একবার খোঁজ করলেন না, হাজার হোক স্বামী তো !

রতন। রেখে দেন স্বামী ! দরকার ছিল সিঁদুরে, স্বামীকে নয়, বুড়ো অমন বেহিসেবী কাজ করে না। তারপর ইনি আই.এ. বি.এ. পাশ করলেন, মাষ্টারী করে রীতিমত দুপয়সা করতে লাগলেন মশাই ; সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি। স্বামীচিন্তা করবার সময় কোথা ! বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে মশাই, তা তো এখন দেখতেই পাচ্ছেন।

গৌতম। তা বটে।

রতন। তারপর বছর আট কাটিয়ে কঠিন অসুখে

পড়ল ভদ্রলোক ; আট মাস শয্যাশায়ী। চাকরী গেল। অসহায় হয়ে ফিরে এল, আত্মীয়স্বজন পরিচিত কেউ এতটুক সাহায্য করলে না, অবশেষে ক্ষুধার্ত নাচার হয়ে স্ত্রীর দ্বারস্থ হল। চিনতে পারলেও অভাগা দেখে উনি স্বীকার করতে চাইলেন না তাকে ; এমন কি মাসিক যে কিছু অর্থসাহায্য করবেন, তাতেও রাজী হলেন না। কি করে চলে তার বলতে পারেন ? বয়েস পঞ্চাশ্লিশ ছাড়িয়ে গেছে, শরীর মন ভাঙ্গা, কি করে এখন সে বলুন দেখি।

গৌতম। (সমবেদনায়) সত্যি বড় দুঃখের কথা।

রতন। (গৌতমের কাছে এগিয়ে প্রায় তাঁর হাত ধরে) আপনি তো একজন অ্যাসেমব্লী মেম্বার, মহাশয় লোক, দয়া করে একটা চাকরী জুটিয়ে দেবেন আমাকে ?

গৌতম। (বিস্ময়ে) আপনাকে ?—চাকরী ?

রতন। (রুদ্ধস্বরে) হাঁ। বড় অভাবে পড়ে গেছি স্যার, ডেপুটী মিনিষ্টার চিত্রা বোসকে একটু বলবেন আমার হয়ে ? যে কোন জায়গায় একটা চাকরী, শুধু কলকাতায় নয়। ঐ যে মিসেস যাঁরা বলছিলেন, ওখানেও যেতে রাজী আছি আমি। জাপানে, আফ্রিকায়—যেখানে বলেন ; শুধু কলকাতায় নয়,—চোখের সামনে আর পড়তে চাই না আমি।

যবনিকা বাধা নীচু করল

গৌতম। (ব্যথিত হয়ে) ওঁকেই একটু ধরুন না—আপনি ওঁর কি রকম আত্মীয় বলছিলেন যেন ?

রতন। (মুখ তুলে) আত্মীয় বলছিলেন ? বললেন না, বেকার অভাগা একটা, চাকরী চাইছে ? জানেন, জীবন সুরু করেছিলুম এক মুদীর দোকানে, এখন শেষও করে আনছি আর এক মুদীর দোকানে ; সেই দোকানে পড়ে থাকি আর তার খাতা লিখি, দুবেলা জোটে না। দয়া করবেন আমাকে একটু ?

গৌতম। আপনি ওঁকেই বলুন, ভাল করে ধরুন।

রতন। ওঁকে বলে কিছু হবে না, ওঁর দুঃখের দিন আমি।

গৌতম। কেন, আপনি কি করেছেন ওঁর ?

রতন। সর্বনাশ করেছি, জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছি।

গৌতম। (বিস্মিত হয়ে) ওঁর জীবন নষ্ট করেছেন ? কি করে ?

রতন। (আবেগে গৌতমের দুহাত ধরে) ওঁর স্বামী হয়ে।

গৌতম। (যেন আকাশ থেকে পড়ে) ওঁর স্বামী আপনি ?

রতন। হাঁ।

গৌতম। সর্বনাশ।

যবনিকা

বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

সুস্মিত সৌরভ তুমি গৌরাঙ্গের প্রেম-কোকনদে
বিশ্ববন্দ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, প্রণতি জানাই তব পদে।
বৈষ্ণব কবির দল তব বল্লভের কত গান
শত ছন্দে গেয়ে গেল। তোমারে দিল না শুধু স্থান
তাহাদের কাব্য কুঞ্জে ! শুধুরিল বিরহ-ভ্রমর
গোপন গম্ভীরা-মাঝে ; করি গেল তাহারে অমর
চৈতন্য-চরিতামৃতে খ্যাতিমান কবিরাজ কবি।
রাধিকার অঙ্গ দিয়া আঁকিল সে গৌরাঙ্গের ছবি।

অপার-বিরহ-সিন্ধু-তটে বসি দূর নদীয়ায়
আমরণ কাঁদিল সে দেখিল না তারে শুধু হায় !
নবোদ্ভিন্ন যৌবনের আগমনে যার অকস্মাৎ
স্বপ্নে-গড়া প্রেম সৌধ একেবারে হল ধূলিসাৎ
এ জীবনে মিলাইল প্রিয় সঙ্গে মিলনের আশা
অকরুণ কবিকণ্ঠে তার লাগি ফুটিল না ভাষা !
বৃন্দাবন-বিলাসিনী-রাধা-ভাব করি অঙ্গীকার
বিস্মৃত তবে কি করি মহা প্রেম শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার ?

প্রেমের ভিখারী হয়ে তবে তার এ কি আচরণ ?
এ রহস্য-যবনিকা কে করিবে উন্মোচন ?

অরণ্য-স্মৃতি

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ

১

ঠুক্ ঠুকাঠুক্ চলেছে কাঠুরিয়াদের কুড়োল। পাশে বন এখন নিস্তব্ধ নয়। এ ছায়াঘন শালবনের সে গাম্ভীর্য্য নেই। নেই তার সেই রহস্যপূর্ণ সম্মোহনী সৌন্দর্য্য। এমন কি সভ্য মানুষের অত্যাচারে সে হারিয়ে ফেলেছে তার রোমাঞ্চকর ভাব, যা' সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেখলে গা ছম্‌ছমানি ভাবের উদয় হয়। মনে হয়—না জানি ঐশ্বরগতের কত রহস্য আছে গা ঢাকা দিয়ে ঐ আকাশচুম্বী শালবনের মধ্যে। এই সব না জানা রহস্য ছেলেবেলাকার সংস্কারের সঙ্গে মিলে একটা ভীতির ভাব জাগায় সহজে লোকের মনে। আর পুলক আনে তা'দের, যারা বনকে ভালবাসতে শিখেছে। বনের সৌন্দর্য্য তখনই ফুটে যখন মানুষের সভ্যতা তাকে সভ্যতার বন করে রাখে, তার মধ্যে যখন মানুষ অনধিকার প্রবেশ না করে। এমনি ধারা প্রকৃতির নিজস্ব যা', তা'কে বিকৃত করে চলেছে সভ্য মানুষের দল। শুধু আজ নয়, শতাব্দীকাল ধরে। বর্ত্তমান-কালের সভ্যতা মানুষকে করে তুলেছে একান্ত স্বার্থপর। তার আরামের জন্য সে প্রকৃতির বুকে ছুরি হান্‌তেও ত্রুটি করে না। সহস্র বৎসর আগে যখন মানুষ ছিল পর্ব্বত গুহাবাসী, যখন তারা খেত ফলমূল শাকপাতা তখন তাদের প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা ছিল কিনা জানি না, বোধহয় ছিল না, কিন্তু যখন তাদেরই একশ্রেণী প্রকৃতির উপাসনায় ব্যস্ত, তখন তাদের মধ্যের আর একদল নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সেই সৌন্দর্য্য নাশের চেষ্টায় ব্যস্ত হচ্ছে। অদ্ভুত আমরা—এই সভ্য মানুষ।

বনের মধ্যে চলেছে কাঠুরিয়া কুলিদের নিষ্ঠুর কুড়োল। ঠুক্ ঠুকা ঠুক্—ঠিকার ডিপোতে নির্দ্ধারিত দিনে ঠিকা মত কাঠ পৌঁছিয়ে দিতেই হবে ঠিকাদারকে। তার কি বিশ্রাম আছে?

এই রকম ঠিকাদারের কুলিদের কুড়োলে মুখরিত এক শাল জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের কোলে ছোট ঝরির মত একটী রেল ষ্টেশন। ষ্টেশনের আশেপাশে বস্তির মধ্যে কেবল দু' একটি দোকানঘর, আর আদিবাসী কুলিদের লম্বা লম্বা চালা। অল্প দূরে একটা মদ চোলাই করার ভাঁটি আছে। সন্ধ্যার পর ওদানকার ঐ সব আদিবাসী কুলিরা মেয়ে পুরুষে মিলে মহুয়ার মদ খায়। ষ্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে 'ফরেষ্ট রেঞ্জার' সাহেবের কোয়ার্টার। প্রায় তত্‌দূর পর্য্যন্ত এক মানুষ উঁচু পথের দুই পাশে শাল গাছের গুঁড়ি সারান রয়েছে থাকে থাকে।

সন্ধ্যার মুখে আমাদের ট্রেণটী গিয়ে ম্যাটকর্ম্মহীন ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের গন্তব্য 'পিহু-ঝরিয়া'। এই পিহু-ঝরিয়া নামে যেমন কাব্যের আমেজ পাওয়া যায়, তেমনি ঐ নামের উৎপত্তির মধ্যেও এক প্রেমিক প্রেমিকার করুণ কাহিনী আছে।

প্রায় পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর আগে পিহু নামে কর্কু জাতের যুবক তেইশ বছরের এক যুবক ঐ গাঁয়ে বাস করত। তাদের অভাব ছিল না কিছুর। বহু ক্ষেত খামারের জমি ছিল, আর গরু-মহিষ করেছিল চল্লিশ বেয়াল্লিশটী। সেই হিসেবে সে মুখে ঐ বয়সের মুনো গাঁয়ে রাজার হালে থাকতে পারা যেত। তার বাবা ছিল গাঁয়ের 'মোকদ্দম' অর্থাৎ মোড়ল। গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনতে হ'ত তা'কে। বিচারকের মতে ফলে গাঁয়ের ঝগড়াঝাটির বিচার করত সে। এদের সামাজিক বন্ধন কোন সভ্যজাতির সঙ্গে মেলে না। একেবারে লোহার বাঁধনে বাঁধা। একটু ত্রুটি হলেই কঠিন সাজা।

পিহু ছিল তার বাবার একমাত্র ছেলে। মাকে কিছুদিন সে দেখে ছিল না। নিজে রোজগার করবার জন্য সে বছর তিনেকের জন্যে এক চা বাগানে চলে গিয়েছিল। ফিরে দেখে তা'র দুঃখে তার বাবা অন্ধপ্রায় হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে তার বাবা মারা গেল। তখন বাবার সব দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়ল। ছোট ছোট দু'টী বোনকে পুষতে হ'ত। যাই হ'ক, খাওয়া পরার অভাব হ'ল না তাদের।

কিছুদিন বাদে গাঁয়ের 'গোঁড়' জাতির কুলিরা এসে 'ডেরা' করলে। পাশের বন সরকার থেকে কাটান হ'বে। 'গোঁড়' কুলিরা স্ত্রীপুরুষ একসঙ্গে মিলে কাজ করে ও তা'রা যখন জঙ্গলে যায় কাজ করতে তখন নিজেদের সংসার সব সময়েই সঙ্গে রাখে। সেই গোঁড় কুলিদের মধ্যে একজনের ষোল, সতের বৎসরের একটী মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার ঝরি বা ঝরিয়া।

সে সময়ে বনের সেই অংশে সরকারী বন-সংরক্ষণ বিভাগ বড় গাড়ী চলাচলের জন্যে পাকা রাস্তা তৈরী করছিলেন। ঝরিয়ার মা সেই রাস্তা তৈরীর কাজে থাকত, আর তার বাবা থাকত গাছ কাটার কাজে। ঝরিয়া প্রায় সব সময়েই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত গরু চরে খেয়ে বেড়ে। অবশ্য মাঝে মাঝে তার মায়ের কাজেও সাহায্য করত। পিহুর ছিল এক বাঁশের বাঁশী। সে অবসর কাটাত বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে। সকাল হ'লেই গরু মহিষগুলিকে চরতে দিয়ে পাহাড়ের পাশে একটা পাথরের উপর বসে বাঁশী বাজাত প্রায় সারাটা দিন।

এইভাবে দিন যায়, মাস যায়—একদিন বেণা গেল পিহুর সঙ্গে ঝরিয়ার বেশ ভাব হয়েছে। এই ভাব ক্রমে ভালবাসায় দাঁড়ায়। কিন্তু তাদের এই মিলনের মধ্যে যে বাধা ছিল না তা নয়। ঝরিয়ারা ছিল গোঁড় জাতির। তারা কর্কুদের হীন পর্য্যায়ের জ্ঞান করে। তাই এই মিলনের মধ্যে ঝরিয়ার মায়ের ও বাবার যথেষ্ট আপত্তি ছিল। তাই তাদের মিলন হ'ত গোপনে। পিহুর বাড়ীতে ঝরিয়াকে বাধা দেওয়ার মত কেউ ছিল না।

সকালের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ঝরিয়ার মা ও বাবা দুপুরবেলা খানিকক্ষণ জিরোতো। ঐ সময়টায় ছিল ঝরিয়ার একমাত্র শিহুর সঙ্গে খেলা করার সময়। শিহু করত কি; জঙ্গলে দেরা একটা ফাঁকা জায়গায় পাহাড়ী পাথরে বসে বাঁশী বাজাত। বাঁশীর শব্দ শুনলেই ঝরিয়া সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। দিন যায় দু'জনের কত কি মধুর আলাপ হয়। ভবিষ্যতের কত রঙিন ছবি তারা আঁকে দু'জনে। কিন্তু বিধি বাম যদি হয় মানুষে কি করতে পারে।

সেই জঙ্গলে কিছুদিন ধরে এক মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব সুরু হ'ল। দিনের পর দিন যায়, একের পর এক গ্রামবাসীরা বাঘের উপদ্রবে অতিব্যস্ত হ'ল। বহু লোক বাঘের পেটে গেল। বহু শিকারী সাহেব দিবারাত্রি চেষ্টা করতে ত্রুটি করলেন না। কিন্তু দু'তিন বছর সেই বাঘ সমানে মানুষ খেয়ে চলল!

এরই মধ্যে একদিনের ঘটনা। দুপুরবেলা ঝরিয়া রান্না-বান্না করে; মা ও বাবাকে খাইয়ে তারা যখন শুয়ে পড়ল, তখন ঝরিয়া কান খাড়া ক'রে বাঁশীর সুর শুনবার আশায় কুলিচালার অদূরে মাঠের মাঝে অপেক্ষা করছিল। ঠিক সময়েই বাঁশীর শব্দ তার কানে এসে বাজল। সেও আপন প্রিয়ের সঙ্গে মিলবার জন্যে পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি জঙ্গলের দিকে চলল। নির্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিবার যখন অল্প দূর আছে হঠাৎ বাঁশী থেমে গেল। তারপর সে শিহুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। শিহু বলছে "আঃ কর কি, পেছনে টান কেন? ঝরিয়া অবাক হল। শিহু কার সঙ্গে কথা কইছে। সে কিছু বুঝে উঠতে পারলে না। ছুটে এগিয়ে গিয়ে দেখলে শিহু সেখানে নেই। খানিক এদিক ওদিক দেখলে। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগল। উত্তর নেই। আবার ডাকলে। বন নিঝুম, কোন সাড়া পেলে না। ঝরিয়া পাগলের মত কুঁড়েতে ফিরে এল। সমবয়সের দু'একটী সখিকে সমস্ত বৃত্তান্ত বললে, তারা সবাই ঝরিয়ার সঙ্গে বনে দেখতে গেল—শিহু গেল কোথায়? সেখানে উপস্থিত হয়ে সবাই ভাল করে মাটির দিকে তাকিয়ে দেখলে মাটিতে একটা কিছু ভারি জিনিষ ঘষ্টিয়ে নিয়ে যাবার দাগ পড়ে রয়েছে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না কারও যে শিহু মানুষখেকোর মুখে প্রাণ দিয়েছে। তারা খানিক দূর সেই ঘষ্টানর দাগ দেখে দেখে বনের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগলো। শেষে এক স্থানে শিহুর রক্তমাখা কাপড় পড়ে থাকতে দেখলে সবাই। ঝরিয়া ঐ সখাদের সঙ্গেই ছিল, এখন সে হঠাৎ সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বনের মধ্যে পাগলের মত শিহুকে ডাকতে ডাকতে ছুটে অদৃশ্য হ'ল। অন্যেরা আর তার পিছনে যেতে সাহস পেলে না। কাজেই কোথাও মানুষখেকো রয়েছে ওৎপেতে। তারা সেইখানে দাঁড়িয়ে ঝরিয়াকে ডাকতে লাগল। যখন ঝরিয়া ফিরল না তখন তারাই ফিরে এল। সেই থেকে ঝরিয়াও আর ফেরে নি। শোনা যায়, গভীর রাতে এখনও বনের মধ্যে বাকি সেইখানে অশরীরী ঝরিয়ার কান্না, আর শোনা যায় শিহুর নাম ধরে তার সেই মর্মন্তুদ ডাক। থাক, এসব অশরীরী আলোচনা আমাদের নয়।

* *

রেল ষ্টেশন থেকে এই শিহু-ঝরিয়া প্রায় দশ মাইল। ষ্টেশন থেকে গন্তব্য স্থানে পঁহুছবার একমাত্র উপায় টিকারাবেরের ট্রাকে করে অথবা পো-শকটে। আমাদের উদ্দেশ্য ঐ শিহু-ঝরিয়ার আশে পাশে শিকার করা। বাঘের চৎপাত সে স্থানে যথেষ্ট আছে, তাই আমাদের আসও সেখায় যাবার জন্য প্রবুদ্ধ করছিল।

যখন ষ্টেশনে ট্রেন পঁহুছাল তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য্য ঢলে পড়লেও অস্ত যান নি। জনের মধ্যে কুলিদের একঘেয়ে কুড়োলের শব্দ ঠক্ ঠকাঠক্ শুনা যাচ্ছে, আর দু'পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর প্রকাণ্ড এক একটী শাল গাছ কান ফালাপালা করা মড়্ মড়্ শব্দে ধরাশায়ী হচ্ছে। ঐ সব গাছ যদি কথা কইতে পারত তবে কতদিনের ইতিহাস মানুষ তাদের কাছ থেকেই শুনত। এক একটী প্রায় তিনশ' চারশ' বছরের পুরনো।

ষ্টেশনে পঁহুছেই আমাদের কোন যান পাওয়া সম্ভব হ'ল না। নিজেদের গাড়ী ও পথে খারাপ হ'য়ে যাওয়াতে এই বিপদ। চালককে কল ঠিক করে পরে একেবারে শিহু-ঝরিয়ার বাংলোয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলা হ'য়েছে। ট্রেন থেকে আমরা সাতজন ষ্টেশনে নামলাম। আমরা ছাড়া এই ছোট ষ্টেশনটীতে মাত্র দু'টী তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী নামল। ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় একটী মারাঠী ভদ্রলোক। আমাদের পরদেশী দেখে যথেষ্ট ভদ্রতা ও সৌজন্য দেখালেন। নিজের আপিস ঘরটীতে আমাদের বসতে বলে বললেন, তিনি আমাদের গন্তব্য স্থানে পাঠাবার কোন ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা সেই চিন্তা করছেন। এই কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। অল্প একটু বাদেই ফিরে এসে সংবাদ দিলেন সেইদিন আমাদের আর যাওয়া সম্ভব হবে না, তবে শেষ রাতে প্রায় সাড়ে চারটের সময় একটা ট্রাক পালি যাবে, সেই ট্রাকে ইচ্ছা করলে আমরা যেতে পারি। তখান্ত বলে আমরা প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে লাগলাম।

সন্ধ্যের দিকে শীত বাড়তে লাগল। তখন ডিসেম্বর মাস। জঙ্গলের মধ্যে কুলিদের কুড়োলের শব্দ বন্ধ হল এবং সেই ঠক্ ঠকাঠক্ শব্দের পরিবর্ত্তে কুলিদের কুঁড়েতে ফিরতে ফিরতে মেয়েদের ও পুরুষের একসঙ্গে গান শুনা যেতে লাগলো। সূর্য্যের অস্ত যাওয়ার পরে তা'ও থেমে গেল। আশে পাশে সব নিশ্চুপ নিঝুম, কেবল একটা শান্টিং ইঞ্জিন কতকগুলো শালে কাঠের গুঁড়ি বোঝাই মালগাড়ীতে হস্ হস্ করে ধোঁয়াধোঁয়ি করছে তাই শুনতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর রাতের মধ্যে অনেক দুঃখ কপালে আছে, যদি না ভাল আশ্রয় পাই। ষ্টেশনটীতে যাত্রীদের কোন বিশ্রামাগার নেই বলাই বাহুল্য। ছোট ষ্টেশনের যাত্রী যা হয়? সেদিন জ্যোৎস্না প্রথম রাত্রি থেকেই ছিল। দিনের আলো নিবতে নিবতে চাঁদের মৃদু আলো ছায়া প্ল্যাটফর্মের গাছগুলির এবং অন্য যেখানে যা' কিছু ছিল তার উপর পড়েছে, এমন সময় ষ্টেশনের লৌহ ফটক পার হ'য়ে এক পঞ্জিকা ভদ্রলোক আমাদের দিকেই আসতে লাগলেন। এরই মধ্যে গায়ে গরম কাপড় চোপড় অনেক চড়িয়ে ফেলতে হয়েছে। তাতেও হাড়ে কাঁপুনি লাগছে। ক্রমে ভদ্রলোকটী আমাদের কাছে এসে

আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি সেখানে মুদির দোকান করেন ও স্ত্রাইই থাকেন ছাউনীতেই তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন প্রথমে শিকারীর দল কিনা, পরে আমাদের পড়ার অনেক অনুরোধ উপরোধ করে নিজেই ইয়াহি। তিনি সেই সময় আমাদের তাঁর দোকানে চা ও জলযোগের জন্য সাথে নিয়ে চলেন। ষ্টেশনের পাশেই তাঁর ছোট দোকান ঘর ও তার ভিতরে একটী ছুটরী আছে সেখানে ফরাস বিছিয়ে তাঁর উপর আমাদের চা ও তাঁর সঙ্গে কিছু ছাতাভূঁড়ি ও পুরী, সেই সময় পরম পরিতোষ করলেন। অবশ্য চোখের পলকে তাঁর সদ্ব্যবহার হয়ে গেল। সারাদিন ট্রেণে ঝাঁকি খেতে খেতে আসা হয়েছে, এছাড়া অন্য কিছু খাওয়ার সুবিধা হয়নি।

সেই ছুটরীটী এতই ছোট যে সেখানে আমাদের সকলকে শুতে গাত কাটাবার স্থান হবে না বুঝে শেষে ট্রাকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাত্রে কি ভাবে এবং কোথায় থাকার সুবিধা হবে। তিনি ষ্টেশনে মালপত্র রাখবার জন্য একটী উঁচের 'মেড্' ছিল তাহাই খানিকটা পর্দা দিয়ে ঘিরে দেবেন বললেন। অগত্যা তাই করা হ'ল। বাইরের চেয়ে ঐ 'মেডের' মধ্যে কিছু বেশীও ঠাণ্ডা বলে ত মনে হল না। বাইরে জ্যোৎস্নার ফুরণ ও শাওয়ের দৃশ্য কি চমৎকারই না দেখাচ্ছিল। শেষে স্থির করা হ'ল ঐ মেডের ভিতর অপেক্ষা উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে খুব করে ধুনি জ্বালাবার মত আগুন জ্বালিয়ে আশে পাশে শুয়ে রাত কাটান যাবে। সুতরাং দেখে শুকনো কাঠের অভাব নেই। আমাদের দু'জন চাকর দিয়ে সারারাত জ্বালাবার পক্ষে যথেষ্ট হ'বে যেটুকু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনলে। আমরা সবাই মিলে আগুন জ্বালিয়ে তার আশে পাশে বসে গল্প করতে আরম্ভ করলাম।

রাত বারোর সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থান আরও নির্জ্জন হয়ে গেল। রেল লাইনের ওপারের জঙ্গল থেকে দু'একটী বন্য নিশাচর পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। একবার একটু দূর থেকে "হ্যাক" "হ্যাক" বার দুই তিন একটী বাঘের হুঙ্কারের ডাকও শুনতে পেলাম। ওরা সাধারণতঃ বাঘ কি চিতাবাঘ দেখে ভয় পেলে ঐ রকম ডাকে। এছাড়া সেই পাকিং ইঞ্জিনটার একঘেয়ে 'পোঁ' 'পোঁ' শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। ওটা এখন আর চলাচলি করছে না, সাইডিংএর এক স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে একটানা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করছে।

রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ চাঁদের আলোয় দেখলাম একটী লোক কালো ওভারকোটে ও কাদায় রংএর একটী আলোয়ানে দেহটাকে যতটা সম্ভব আবৃত করে মোরাম ফটক পার হয়ে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। তার হাতে কি যেন একটা লম্বা মত জিনিষ ঝুলতে দেখলাম। আমাদের দিকেই আসছে। কাছে আসতে চিনতে পারলাম সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকই বটে। হাতে করে একটা টিফিন কেরিয়ারে আরও কিছু পুরী আর ভাজি নিয়ে এসেছেন। আমরা তার অল্পপূর্ব্বেই পেট পুরে পুরী আর ভাজির সদ্ব্যবহার করে এসেছিলাম। এখন আবার এই শীতের রাতে কষ্ট করে ওসব তাঁর না নিয়ে এলেও চলত। কিন্তু কি আর বলি, অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সেগুলি গ্রহণ করা হল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু কিছু মুখেও দিলাম সবাই। খাওয়ার পর্ব্ব মিটতেই তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, শেষ রাতে ট্রাক ছাড়বার পূর্ব্বে এসে আমাদের জাগিয়ে তুলবেন।

আমরা আমাদের চারদিকে চারটী বড় বড় ধুনি জ্বেলেছিলাম। সেই জায়গাটা ঠাই বেশ একটু গরমও হয়েছিল। মাঝে মোড় মুড়ি খুলে বিছানা বিছান যেন সকলের। শুয়েছি মাথায় মশারি টেকে, আর অমনি চোখ যেন বুজে এল ঘুমে। একটা মালগাড়ী ষ্টেশনে না থেমে চড়বড় করে চলে গেল। এ ছাড়া আর কোন কিছুই আমাদের বিরক্ত করে নি। আগুন জ্বালার চট্‌পট্ শব্দ, আর ঘুমে সেই ইঞ্জিনটার একটানা পোঁ পোঁ শব্দ শুনতে শুনতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম কিছু বুঝতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে যাঁদের ঘুমোবার মেয়াদ ছয়েরিণ তারা বলেন রাতে নাকি আরও একবার সাম্বর হরিণের ডাক শুনেছে। আর একবার একটা পেয়ালের ভয় পাওয়া সেই "কেউ" "কেউ" চীৎকারও নাকি তারা শুনেছে। এই দু'টো ডাকের মধ্যেই বাঘের সম্বন্ধ রয়েছে এই রকম প্রবাদ। অবশ্য সাম্বর হরিণের ডাকের সঙ্গে বাঘ বা চিতাবাঘের ধ্বনিই সম্বন্ধ আছে সেটা পূর্ব্বেই বলেছি। কিন্তু পেয়ালের এই "কেউ" "কেউ" ডাক ওরা যে কোন কারণে ভয় পেলেই ডাকে। সে ভয় পাবার কারণ বাঘ বা চিতাবাঘ হ'তেও পারে, আবার অন্য কোন কারণও হ'তে পারে।

জানিনে তখন ঘড়িতে কটা বেজেছে। ভীষণ শীত। আগুনও প্রায় নিবে এসেছে। হঠাৎ একজনের ডাকে ঘুম ভাঙলো। দেখলাম আপাদমস্তক কম্বলে মুড়ি দিয়ে সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটী ডাকছেন আমাদের। তিনি বললেন—ভোর হতে চলেছে, প্রায় সাড়ে চারটে বাজে, ট্রাকও ছাড়বার জন্যে তৈরী, শীঘ্র বেরিয়ে পড়তে হ'বে। তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে জিনিষপত্র গোছগাছ করে ষ্টেশনের বাইরে এসে কুলির খোঁজ করা গেল। এ ষ্টেশনে দু' তিনটীর বেশী কুলি নেই; তারাও আবার ট্রেণের সময় মত ষ্টেশনে আসে। সব সময় তাদের থাকবার দরকার করে না। সঙ্গে কিছু লটবহর ছিল তাই সেগুলোর গতি কি হ'বে ভিন্তা করছিলাম। এতেও সাহায্য পেলাম সেই পশ্চিমা বন্ধুটীর কাছ থেকে। তিনি তাঁর দোকান থেকে একটী লোক পাঠিয়ে দিলেন দু' তিনজন গাড়া-কাটা কুলিদের ধরে আনবার জন্যে। সে প্রায় মিনিট পনের পরে তিনজনকে নিয়ে ফিরে এল। এদিকে ট্রাক ড্রাইভার 'হর্ণ' দিচ্ছে। কুলিরা প্রত্যেকে দশ আনা করে নিলে ও জিনিষপত্র ট্রাকে তুলে দিলে।

তখন চাঁদ অস্ত গেছে, আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফুটে রয়েছে। শীতে ঘাড়ে গুরু কাঁপুনি ধরাচ্ছে। আমরা মুড়ি সুড়ি দিয়ে ট্রাকের মধ্যে বসলাম। ট্রাকও কান ঝালাপালা করা একঘেয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে আঁকা বাঁকা পথ ধরে ছুটে চলেছে। পথের দু'দিকে কেবল শাল বন। অস্পষ্ট আলোতে তা'ও ভাল করে বোঝা যায় না। এক স্থানে সামনে একটা নদী পড়ল। নদী অর্থাৎ সারাটাই বালি, মাঝে মাঝে কেবল পাঁচ সাত গজ চওড়া জলের স্রোত ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে। নদীর প্রস্থ প্রায় দু'শ গজ হবে।

ধ্রুপদ

তাল্রাজ—তেওরা

তেরো অন্ত কোঈ ন পাওএ
বোগী ঋষি মুনি মন
নিতহি নিরঞ্জন বৈরঠে ধ্যান লগাওএ।
বেদ বিধান তু আ গুণ গান
প্রগট কীয়ো সব শকতি-মান
ধন ধন তুঁহি অলখ নিরঞ্জন
তুমসে সব দুখ জাওএ॥
কোঈ কহত তুঁহি নর রূপ ধর
গোলক সে আয়ে ধরণী পর
তুঁহি অবতার হয়ে সবকো আচরজ দেখওএ,
গোপেশ চাহত তেরো শরণ
ক্যায়সে পাওএ হো জগজীবন
কৃপা কীজে অব তাকো বতাওএ॥

গীত-সম্রাট ডাঃ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—রচিত ঃ স্বরলিপি—শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
গা মা | পা ধা | সা -া পা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা | গা মা |
তে · · রো · অ - ন্ত কো · ঈ ন পা· ও এ · · রো

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
ধা পা | মা গা রা | সা -া | -া -া | সা মা গা | সা গা | মা পা |
ঋ ষি মু নি ঽ ন - - নি ত ঞ্জ নি র ঞ্জ ন

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
ধপা মা পা | সা না | রা সা | পা -া ধা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা ‖
বৈ· ন্ঠে ধ্যা · ন ল গা· ও এ কো · ঈ ন পা· ও এ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´
{গা মা মা | পা ধা | পা ধা | না না সা | না সা | -া সা | পা সা না |
বে · দ বি ধা · ন তু আ ন্ত গু ণ গা - ন প্র গ ট

২ ৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
সা না | সা রা | সা না সা | পা -া | ধা -া } | ধা পা ধা | পা মা | গা গা |
কী য়ো স ব শ ক তি মা - ন - ধ ন ধ ন তুঁ হি অ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
গা মা ধা | না র্সা | র্সা র্সা | প র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা | র্গা -া ধা |
ন খ নি র ০ ক ন তু ম সে স ব দু খ ভা ও এ

২ ৩ ১
ধা মা | পা ধা | পমা মা গা ‖
কো ০ ই ন পা০ ও এ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
পা র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা | র্সা র্সা ধা | র্সা ণা | ধা ধা | গা মা পা |
কো ই কা চ ত তু ঁ হি ন র ক্ত ০ প ধ র গো ণ ক

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ধা পা | র্সা ণা | ধা ধা পা | গা পা | মা গা } | সা সা -া | মা মা |
সে ম্য যে ধ র ণী ০ ০ প র তু ঁ হি - অ ব

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ধা মা | ণা পা ধা | না -া | র্সা -া | পা র্সা না | র্সা না | র্সা র্রা |
তা ০ র ০ ০ হো - য়ে - স ব কো ঐ চ র ক্ত

১ ২ ৩ ১ ২ ৩ ১
র্সা ণা র্সা | ণা -া | ধা -া | { গা মা মা | ণা ণা | পা ধা | না র্সা না |
দে খা ০ ও এ গো পে শ চা ০ ত ত হে ০ রো

২ ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্মা র্গা | র্রা -া | র্সা -া | র্সা না র্সা | ণা -া |
চ র ণ - কা ম সে পা - ও এ হো ক্ষ ণ ভী -

৩ ১ ২ ৩ ১ ২ ৩
ধা ধা } | ধা ণা ধা | পা মা | গা গা | মা ধা পা | ধা ণা | র্রা র্সা |
ব ন ক পা কী ০ ভে ক ব তা ০ ০ কো ০ ০ ব

১ ২ ৩ ১
ণা -া ধা | ধা মা | পা ধা | পমা মা গা ‖
তা ও এ কো ০ ই ন পা০ ও এ

একটু সিঁদুর

শ্রীসত্যেন সিংহ

কাল বাপের বাড়ী এসেছে নির্ম্মলা ওর তিন বছরের ছেলে আলোককে নিয়ে। আজ পাড়ায় পুরনো সইদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পরিপাটি করে চুল বেঁধে আয়নার সামনে সিঁদুর পরতে যাচ্ছিল। মাথার কাপড়টা টেনে রূপোর সিঁদুর কৌটাটা খুলে আঙুলের ডগায় একটু সিঁদুর তুলেছে সে, এমন সময়—

এমন সময় কি ?

কেন জানি ওর সারা শরীরটা কেঁপে উঠলো, সেই ঝাঁপুনিতে আঙুলের সিঁদুরটুকু মাটির নিকানো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়লো। ওর বুকটা ধড়াস করে উঠলো—কেন এমন হোল ? স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ? দ্বিতীয় বার সিঁদুর তোলবার কথা ভুলে সে অনেকক্ষণ অভিভূতের মত আয়নাটার দিকে চেয়ে রইল—আর চেয়ে রইল ওর সাদা সিঁথিটার দিকে। সত্যই সিঁথিটা একেবারে সাদা, লাল সিঁদুরের একটুও আভাষ নেই তাতে। আজ খুব ভাল করে মাথা ঘষেছিল নির্ম্মলা। কালো মসৃণ চুলের ফাঁকে ফাঁকে মাথাটা একেবারে ধব্‌ধব্ করছে, আর সিঁদুরের তেজে ক্ষয় পেয়ে পেয়ে সিঁথিটাও বেশ প্রশস্ত। ওর দিদি বিমলার সিঁথিটা এমনি সাদা—ওমা! সিঁদুর না থাকায় কেমন উদাস আর রুক্ষ দেখাচ্ছে তাকে। মুখের সমস্ত টলটলে কমনীয়তাটুকু এক মুহূর্ত্তে কোথায় উবে গেছে। বিমলা আজ চার বছর বিধবা হয়েছে। চার বছর হোল বিয়ে হয়েছে নির্ম্মলার। তার তো সবে বাইশ বছর বয়স, সে তো পূর্ণ যুবতী। তার কথা ছেড়ে দিলেও ওর বুড়ি মাকে সিঁদুর পরেন বলে ছাব্বিশ বছরের দিদি বিমলার চেয়েও সুন্দর দেখায়—কেমন জম্‌জমাট মনে হয়।

ভর দুপুরবেলা। বাড়ীর মধ্যে একেবারে চুপচাপ। মায়ের সঙ্গে আলোক ঘুমুচ্ছে, দিদি গিয়েছে অন্যত্যামের বাড়ী। হঠাৎ নির্ম্মলার মনে পড়ল সিঁদুর না পরে বসে বসে এমন করে ভাবা হয়তো অলুক্ষণে ব্যাপার—তাছাড়া কেনই বা ওর হাত থেকে এমন করে সিঁদুর পড়ে গেল ? সিঁদুর হাতে তুলেই ক্ষণিকের জন্য ও যেন দেখল ওর মুখের পাশে স্বামী অজয়ের মুখখানি ভেসে উঠেছে। কেমন ম্লান আর আর্ত্তবেদনায় ভরা সে মুখ। অথচ তার স্বামীর মুখখানি সর্ব্বদাই হাসি হাসি।

যত সব দুর্ব্বলতা। একদিন স্বামীর কাছ ছাড়া হয়েই অন্তরে কাতর হয়ে পড়েছে। বকুল ফুল, গঙ্গাজল শুনলে কি বলবে তাকে—এমনিতেই বা চিঠিতে লেখে। বিয়ের পর চার বছর স্বামীর কাছ ছাড়া হয়নি—সেই কেবল অষ্টমঙ্গলার দিন এসেছিল তাও ছোড়ে। সে সময় মা, দিদি অন্ততঃ একমাস থাকবার জন্যও বলেছিলেন কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। শেষে নিজে কিছু মুখ ফুটে বলতে না পেরে নির্ম্মলাকে দিয়েই নির্লজ্জার মত বলালেন—দূর দেশে চাকুরি নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে অনেক অসুবিধা আর হট্ করে ছুটিও পাওয়া যাবে না সে এসে নিয়ে যাবেন। মাকে অবশ্য নির্ম্মলা সে কথা বলতে পারেনি—দিদি বিমলাকেই বলেছিল। এবার মা বার বার জোর করে লিখলেন—কোনদিন হট্ করে মরে যাব,—নির্ম্মলাকে আর দেখতেও পাব না—তাছাড়া নাতী হয়েছে—আমার প্রথম নাতী, তিন বছরের হোল ; আমি কত সাধ করে বসে আছি তাকে দেখব বলে। বাবা পর্য্যন্ত লিখলেন—জামাইকে বলে একবার চলে আয় মা, তোর মা কান্নাকাটি সুরু করেছেন আজকাল। বিমলা দিদি তো কটু কথাই লিখে বসলো—হতভাগী স্বামী যেন আর কারুর হয় না। তবু কি আসা হোত—না ঐ অসহায় মানুষটিকে ছেড়ে তারই আসতে ইচ্ছে করতো—শেষে বাবা একদিন নিজেই গিয়ে হাজির হলেন। অজয় নিজে ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। চোখ দুটি তাঁর ছলছল কচ্ছিল। বার

তার নির্মলার মুখের দিকে চাইছিলেন আর আলোককে বুকে তুলে চুপ করে ছিলেন। ঠিক গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলার মনে হয়েছিল অতুলকে একা এই দূর দেশে ফেলে সে পালিয়ে যাচ্ছে। কেমন উদাস আর অসহায়ভাবে তখনো গাড়ীর জানালার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। শাড়ীর আঁচলে নিজের ভিজে ভিজে চোখ দুটো মুছে ফেলছিল সে, আর যতক্ষণ তাঁকে দেখা যায় জানালায় মুখ বুঁকে পড়ে তাঁর মূর্তিটা দেখবার চেষ্টা করছিল। ধীরে ধীরে সব অস্পষ্ট হয়ে গেল—গাড়ীটা বাঁক ফিরে দুপাশে গাছপালার মধ্যে ঢুকে গেল। বিদায় মুহূর্তের সেই ম্লান আর আর্ত-বেদনায়-ভরা মুখটাই যেন একটুখানি আশিতে উঁকি মেরে তার প্রসাধনে বাধা দিল।

আবার আশির দিকে চেয়ে দেখলো। বসে বসে সে কেবলি ভাবছে সিঁদুর পরা হয়নি—সিঁথিটা তেমনি সাদা। চোখের কোল বেয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। কোথায় তাড়াতাড়ি সিঁদুরটা পরে কাপড় বদলিয়ে পাড়ায় বেরুবে, তা না স্বামীর বিরহে কাঁদতে বসেছে। আপন মনেই মুখ টিপে একটু হাসলো সে। মনে পড়লো রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা—অতুল শুনিয়েছিলেন—কান্না-হাসির দোল-দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা। কিন্তু উঠে পড়বো বললেই তো উঠে পড়া যায় না—চিন্তার কেমন একটা মোহ আছে, বিশেষ করে অসংলগ্ন চিন্তার এবং তাতে যদি আবার প্রিয়জনের আমেজ মেশানো থাকে। বিয়ের আগে তার সিঁথিটা এমনি সাদা ছিল, তবে তখন সিঁথিটা ছিল সরু—আর উজ্জ্বল। নূতন কচি কালো ধানের শিষের মাঝখানের বৃন্তটির মত। বিয়ের রাতে সেই উজ্জ্বল কচি সিঁথিতে তিনি তাঁর লম্বা সরু আঙুলের ডগা দিয়ে প্রথম সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। তাঁর আঙুলটি বুঝি কাঁপছিল। সেই কম্পিত আঙুলের স্পর্শে পায়ের নখ থেকে তার মাথার প্রতিটি চুলে একটা শিহরণ বয়ে গেল! সেই হিল্লোলে চোখ দুটি তার বুজে এসেছিল—সবাই ভাবছিল লজ্জায়। বিয়ের মণ্ডপ থেকে উঠেই সে গোপনে আয়না নিয়ে দেখতে গিয়েছিল প্রথম সিঁদুর তাকে কেমন মানিয়েছে। বকুল ফুল তার পিছু ছাড়েনি—আড়াল থেকে দেখে বলে উঠেছিল—ওলো অত লুকিয়ে দেখতে হবে না, চমৎকার মানিয়েছে তোকে, ঠিক যেন মেঘলা কালো আকাশের গায়ে প্রথম সূর্যোদয়। হঠাৎ ধরা পড়ে সে চমকে উঠেছিল—হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল আশিটা ঝন্‌ঝন্ করে। শব্দ শুনে মা ছুটে এসেছিলেন, বলেছিলেন—আয়নাটা ভাঙলি এই শুভ দিনে—যত সব অলুক্ষুণে ব্যাপার করিস মা তোরা। এত রাতে আয়না নিয়ে ও কি কচ্ছিল রে ছেমলতা? বকুল ফুলকে মা প্রশ্ন করেছিলেন। হাসতে হাসতে বকুল ফুল, কাজিল আর দুষ্টু বকুল ফুল, বিশ্বাসঘাতকতা করে বলে দিয়েছিল—নূতন সিঁদুর পরে কেমন মানিয়েছে নির্মলা তাই দেখছিল মাসীমা। হাসবারই কথা, কিন্তু মা গালে হাত রেখে ভয় আর বিস্ময় মিশিয়ে তাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন—বিয়ের রাতেই নিজের সৌভাগ্যকে কি অমনি করে খুঁজতে আছে হতভাগী!

নিজের সৌভাগ্যকে নাকি নিজে চেয়ে দেখতে নেই, লোকে বলে উবে যায়। যত সব কুসংস্কার! নড়ে চড়ে পা দুটো মেলে বসলো নির্মলা। পশ্চিমের জানালা দিয়ে বৈকালের মিঠে রোদ এসে লুটিয়ে পড়লো ওর ধবধবে সাদা পায়ের পাতায়। এখনো আলতা পরা হয়নি। কেমন সাদা আর ন্যাকাশে দেখাচ্ছে পা দুটো। মাথা ঘষবার সময় পাও ঘষেছে সে আজ খানা পাথর দিয়ে। পায়ের দিকে চাইতে চাইতে চোখে ভেসে উঠলো কাপড়ের অতি সরু কালো পাড়টা। একি? তার পরণে ধুতি! নিজের ভয়ে নিজেই হেসে ফেললো। চুল বাঁধবার আগে তেল লাগবে বলে আলনায় রাখা বাবার ময়লা ধুতিটা পরেছে সে—ওখানে যেমন অতুলের ধুতিগুলোকে এইভাবে ময়লা করে দেওয়ায় অতুল একদিন রেগে তার একটা ভাল কোঁচানো শাড়ী পরে তেল মাখতে বসেছিল। সেই কথা মনে করে হাসির ঢেউ খেলে গেল তার মুখে চোখে।

না না বসে হাসলে চলবে না, সিঁদুরটা তাড়াতাড়ি পরে ফেলতে হবে। এখনো আলতা পরা, গামোছা, কাপড় পরা সব বাকি। বেশী দেরী হলে বকুলফুলরা রাগ করবে। পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে চিরুণি দিয়ে সিঁথিটা ঠিক করতে গেল আয়নার দিকে চেয়ে। অমনি দেখল তার দিদি বিমলার মুখ আয়নায়। কখন সে দোরের চৌকাঠের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে, আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। নির্মলা ভাবলো দিদি বিমলা তার সিঁদুর পরা দেখতে এসেছে। নিজে বিধবা তাই ছোট বোনের সিঁদুর

পরা দেখে ওর চোখ বুঝি টাটিয়ে যাচ্ছে। দোরের দিকে নির্ম্মলা ফিরেও চাইল না, সে যেন বিমলাকে দেখতেই পায় নি এমনি ভাবে ঠিক করলো ও যখন দেখতে এসেছে তখন ওকে দেখিয়ে দেখিয়েই সিঁদুরটা সে পরবে। কিন্তু ওকি? ওর দিদির সিঁথিটা লাল কেন, ডগ্‌মগে সিঁদুরে যেন ঢাকা। যত সব অনাছিষ্টি! ওর দিদির সিঁথিটা লাল, আর তার নিজের সিঁথিটা সাদা? এ কখনও হতে পারে। অনেকক্ষণ বসে বসে ভেবে মাথা তার গুলিয়ে গেছে। না আর দেরী নয়। মাথার কাপড়টা দেওয়াই ছিল, রূপোর কৌটটা খুলে আঙুলের ডগা দিয়ে সে তাড়াতাড়ি খানিকটা সিঁদুর তুলেছে, এমন সময়—

এমন সময় কি?

তার দিদি বিমলা চীৎকার করে উঠলো—ওমা! দেখে যাও, নির্ম্মলা আমার আমার সিঁদুর কৌটা নিয়ে সেই পাগলামী সুরু করেছে।

সিঁদুর কৌটাটা ঝন্‌ঝন্ করে নির্ম্মলার হাত থেকে পড়ে গেল—সমস্ত সিঁদুরে মেঝের অনেকখানি লাল হয়ে উঠলো। নির্ম্মলার মাথাটা ঘুরতে লাগলো—দিদির সিঁদুর কৌটা! তার পাগলামী! আজ দুপুরের নীরব নিস্তব্ধতায় ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিল সে?

বেশী দূরে নয়। মাত্র চার বছর আগে সে ফিরে গিয়েছিল।

চার বছর আগে বাপের বাড়ী এসেছিল নির্ম্মলা তার তিন বছরের ছেলে আলোককে নিয়ে। পরের দিন পুরনো সইদের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। পরিপাটি করে চুল বেঁধে আয়নার সামনে সিঁদুর পরতে যাচ্ছিল। মাথার কাপড়টা টেনে রূপোর সিঁদুর কৌটাটা খুলে আঙুলের ডগায় একটু সিঁদুর তুলেছে সে এমন সময়—

এমন সময় কি?

তার দিদি বিমলা চীৎকার করে ঘরের মধ্যে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। হাতে ছিল খোলা টেলিগ্রামটা—এদের চাপিয়ে ষ্টেশন থেকে ফিরবার পথেই অসুর একটা লরী চাপা পড়ে—।

চার বছর!

অনেক দিন!

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার মত নির্ম্মলা ওর দিদির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওর মা, দিদি, ছেলে আলোক সবাই কেমন ভয়ে আর বিস্ময়ে ওর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে ওরা বিশেষ করে নির্ম্মলার আঙুলের ডগায় ওই একটু সিঁদুরের দিকে।

তৎক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে নির্ম্মলা। ওদের ঐ অদ্ভুত চাউনি সে আর সহ্য করতে পারলো না। একটু হেসে বিমলাকে বোলল—রাগ করো না দিদি, ভুল হয়ে গিয়েছিল। এসো হাতের এই সিঁদুরটুকু তোমার সিঁথিতে পরিয়ে দি।

ডক্টর ৺গিরীন্দ্রশেখর বসু

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

আজ বঙ্গদেশের বড়ই দুর্দিন। দিকে দিকে যত দিকপাল ছিলেন, সকলে মৃত্যু-যবনিকার অন্তরালে হচ্ছেন অন্তর্হিত, অথচ তাঁদের স্থান-পূরণের জটিল সমস্যা পূরণের ভার দেশজননীর স্কন্ধেই ন্যস্ত করে যাচ্ছেন—সে ভারে ভয়মী হচ্ছেন মুহ্যমানা। দেশ হলো স্বাধীন; এ সম্বন্ধে যাঁদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী তাঁদের অপূরণীয় অভাবে আমরা হয়ে পড়ছি বিকল।

ডক্টর বসু মহাশয় অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মনস্তত্ত্ববিদ্ ছিলেন, মনোবিকলন বিজ্ঞানে ভারতে অগ্রণী ছিলেন—তা সুবিদিত। তাঁর মনস্তত্ত্ববিষয়ক গবেষণার আলোকে নিখিল বিশ্ব পরিক্রাণ্ড। কিন্তু সেখানে তিনি সম্পূর্ণ একক, অতুলনীয়, সেটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা, ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি গভীরতম অনুরাগ। এ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ তাঁর জীবনের প্রতি কাজে মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করতো। এক কথায়, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রতি ক্ষেত্রে থেকে জ্ঞান সংগ্রহে ছিলো তাঁর দৈন্য; কিন্তু তাকে নিজের বলে পরিগ্রহ করতে ছিল তাঁর অসাধারণ সাবধানতা। অশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার আধার হয়েও তাই সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি মনে প্রাণে আসক্ত ছিলেন। তিনি আমাকে ও আমার সহধর্ম্মিণীকে বেশীর ভাগ প্রায়ই বলতেন—"বাঁচবে ভারতবর্ষে যে একটী ভাষা, যা' দেবভাষা—যা' অমর। আর সব ভাষাই কালস্রোতে হয়ে হয়ে অচিরে অপরিচিত হয়ে উঠতে বাধ্য। তাই বৌদ্ধরা, জৈনেরাও সংস্কৃত ভাষার অবিনশ্বর আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।" আর একদিন তিনি আমাদের গভীর দুঃখসহকারে বলেছিলেন—"আমার বয়স, পুরাণপ্রবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ যদি সংস্কৃত ভাষায় লিখে যেতে পারতাম, তা হলে আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। ঐ ভাষায় লিখিত না হলে ভারতের জ্ঞান-সম্পদ স্থায়ী হয়না।"

এজন্য তিনি প্রাচ্যবিদ্যামন্দিরকে মনে প্রাণে ভালবাসতেন। অনেক

এ মন্দিরের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা নিয়ে। যতদিন পর্যন্ত তাঁর শারীরিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন তিনি আমাদের সভাসমিতিতে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন, সুপরামর্শ দিয়ে বহুবার কৃতার্থ করেছেন। তিনি সর্বদা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলনের ইতিহাসকে উৎসুক ছিলেন। তাঁর চরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দেখে আমাদের হতবাক হয়ে যেতে হয়েছে। অত বড় একজন বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতের গোপন কোণ থেকে সংগ্রহ করে সুধাংশুর পুচ্ছত্ব, তাঁহার মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণ প্রভৃতি তথ্যগুলিকে পরিবেশন করেছেন,

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু

তাতে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। সর্বদা মনে হয়েছে,—অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরাও যদি ভারত জননীর এ অবহেলিত প্রোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, অতীত-গৌরবের অবহেলিত সেতু নির্মাণে তাঁরাও যদি আমাদের ডাক্তারবাবুর মতো না হোক্, কথঞ্চিৎও ব্যাপৃত থাকতেন —কি আনন্দই না হতো।

সংস্কৃত বিদ্যাশৈলীর প্রতি ও অনুরাগের যেমন ডাক্তারবাবুর অন্ত ছিলনা, তেমনি "যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"—জীমূতবাহনের এই সাবধানবাক্যের প্রতিও তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর বিচার ছিল যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। কর্মবীর গৌড়ামি, অন্ধ বিশ্বাস—এগুলির তিনি ছিলেন বহু ঊর্ধ্বে। তজ্জন্য তাঁর সংস্কৃতবিষয়ক গবেষণা-প্রবন্ধাদিতে অপূর্ব এক বস্তুর রসাস্বাদন ঘটে, সেটা হচ্ছে শ্রদ্ধা মিশ্রিত যুক্তি। নির্ভীক চিত্তে তিনি সরল যুক্তিতর্কের অবতারণা করতেন। উদাহরণস্বরূপ বলি, তাঁর ঈতাগ্রন্থে তিনি বলেছেন যে—

"অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥ ৮-২৪
ধূমোরাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥ ৮-২৫"

অর্থাৎ "অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্ল ছয় মাস উত্তরায়ণ, তাতে মৃত ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি ও কৃষ্ণ ছয় মাস—দক্ষিণায়ন, তাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি প্রাপ্ত হয়ে পুনরাবর্তন করেন।" যোগীর এ শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি—তা শাস্ত্রের মত বলে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই অর্জুনকে বলছেন,

তৎসম্বন্ধেও তাঁহারবাবু তাঁর মত অকুণ্ঠচিত্তে বলেছেন। মহাত্মা তিলকের মতকে অবিশ্বাস ঘোষণা করে তিনি বলেছেন যে—মরোলিয়া থেকে আমাদের পিতৃপুরুষেরা এসেছিলেন, সেটা আমাদের পিতৃলোক এবং উত্তরের পথই পথ—পিতৃযান। মেরুপ্রদেশ আমাদের ব্রহ্মলোক, যেখানে দিবা ও রাত্রি সমান—ছয় মাস ছয় মাস—ততদূর পর্যন্ত পথ ব্রহ্মযান—ব্রহ্মযানের যাত্রী সেখানে পৌঁছিয়ে আর ফিরে আসে না। কালক্রমে লোক এসব তথ্য গেল ভুলে—শাস্ত্রে ঐ পথের স্মৃতিই হয়ে রইলো তথ্য বলে। এ শাস্ত্রত মনস্কতা—দেবযান, পিতৃযান বিষয়ক—সমাধানের অনুকূলে আমাদের উপনিষদ্ ও অন্যান্য গ্রন্থে অনুপম উক্তি আছে। কিন্তু ডাক্তারবাবুর মত, নিজস্ব মতও অবশ্য চিন্তনীয়, বিচারণীয়। তাঁর রচনার অন্য একটী বৈশিষ্ট্য—অপূর্ব সরল ভাষা, যে ভাষার পঙ্ক্তি-প্রবাহের মধ্যে কোনও কাপট্য নেই, জটিলতা নেই। সুন্দর দেহের অন্তর্নিহিত অতি সুন্দর প্রাণটী যেমন ডাক্তারবাবুর ছিল, তাঁর রচনাও ছিল তেমন—অনবদ্য সুন্দর ভাষার মধ্যে ভাববস্তু ছিল প্রাণারামে স্থির। তাঁর যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, গীতা ব্যাখ্যা, সুধাংশু কাহিনী এত সুখপাঠ্য, অথচ এত শিক্ষাপ্রদ—এ এক অতুলনীয় সৃষ্টি।

এই অগ্রগণ্য মনস্তত্ত্ববিদ্ ভারতীয় ইতিহাসমূলক গবেষণায়ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। তাঁর Reconstruction of the Andhra Chronology গ্রন্থ Asiatic Society পরম সমাদরে প্রকাশ করে ঐতিহাসিক গবেষণায় পরম সহায়তা সম্পাদন করেছেন। তাঁর রচিত "ন্যাল-কালো" ছেলেদের বই ও কেবল ছেলেদের নয়, রসজ্ঞদেরও পরম আদরের সামগ্রী। "স্বপ্ন" প্রবন্ধখানা বাঙালীপাঠকমাত্রেরই পরিচিত। তাঁর "Everyday Psycho-analysis", "The concept of Repression" প্রভৃতি গ্রন্থ বিশ্ব বিদ্বৎসমাজে ভারতের অবনত আসনকে দীর্ঘকাল সকলের সম্মান আহরণ করবে, সন্দেহ নাই। তাঁর সৃষ্ট সুঘিনীপার্ক মেণ্টাল হাসপাতাল (Mental Hospital) এবং ইণ্ডিয়ান-সাইকো এনালিটিক সোসাইটী দেশের স্থায়ী সম্পদরূপে চিরকাল পরিগণিত হবে এবং তাঁর স্মৃতি চির অম্লান রাখবে। কত দুঃখী পরিবারের দুঃখের বোঝা অপনোদিত করছে, এ দুই-প্রতিষ্ঠান—তা' ভাবতেই হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে। সর্বশেষ বলি তাঁর "সমীক্ষা" বৈজ্ঞানিক পত্র ও আমাদের পরম গৌরবের বস্তু। ১৯৫১-৫২ সালে পর্যন্ত প্রকাশিত প্রবন্ধ তিনি এ পত্রিকায় প্রকাশিত করে এর গৌরব বর্ধন করেছেন।

উপসংহারে তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশে ঋগ্বেদের অমর ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি—

"ততো মরীচীঃ প্রবতো মনো জগাম দূরকম্।
তত্র আ বভ্রিমনীহ ক্ষয়ায় জীবসে।
ততো বিদ্যুন্নিঃ জগৎ মনো জগাম দূরকম্।
তত্র আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে।
ততঃ ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্।
তত্র আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে"

(ঋগ্বেদ, ১০-৫৮-৬, ১০, ১২)

"তোমার যে আত্মা সুদূরে প্রসারিত কিরণমালার সঙ্গে চলে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাবাহন করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক, ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা সুদূরে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাবাহন করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা সুদূরে ভূত ও ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরাবাহন করি—সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

ঋগ্বেদ ১০-৫৮-৬, ১০, ১২।

শরৎসাহিত্যে বাংলার সমাজ চিত্র

শ্রীউমা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি

বাংলার অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলিতে তখনকার বাঙালী সমাজের একটি নিখুঁত ছবি দেখতে পাওয়া যায়। বিগত এক যুগকে সেই সমাজের উপর দিয়ে নিদারুণ ভাঙা বিপর্যয়ের এক তুমুল ঝড় বয়ে গিয়েছে। তার আগেও বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এই সমাজের বুকে এক প্রবল আলোড়ন জাগিয়েছিল, যাতে করে আমাদের রক্ষণশীল সমাজের অচলায়তনেও অল্প অল্প ভাঙন ধরতে সুরু হয়েছিল। যুগধর্মকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না। শরৎচন্দ্র যে সমাজের ছবি এঁকেছিলেন আজ তার চেহারা অনেকটা বদলে গিয়েছে। কিন্তু তবুও গরোয়া বাঙালী জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নায় ভরা যে কাহিনীগুলি তিনি তাঁর সহজ, সরল অনুপম ভাষায় পাঠক সমাজের কাছে পরিবেশন করেছিলেন, তার আবেদন বাঙালীমাত্রেরই মর্মে না পৌঁছে পারে না। কথাশিল্পীর লেখনীই যেন তাঁর তুলি। সেই তুলির অপরূপ মায়াস্পর্শে ফুটে উঠেছে তখনকার বাঙালী সমাজের দৈনন্দিন গরোয়া জীবনের ছবির পর ছবি। দরদী সাহিত্যিকের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন তাঁর সমাজের দোষ গুণ—ভালই। সামাজিক সমস্যাগুলি তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠক পাঠিকাদের চোখের সামনে। সেই সমস্যাগুলির কোনও সমাধান তিনি নির্দেশ ক'রে যান নি—শুধু তাঁর পাঠক সমাজকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন সেইগুলির সমাধান সম্বন্ধে। তিনি কদাচিৎ তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে কোনও সূক্ষ্ম ও জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবতারণা করেছেন। কোনও কঠিন মনস্তত্ত্বমূলক সমস্যা তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায় না। অনেক আধুনিক উপন্যাসিকের মতো তিনি তাঁর বইগুলিতে কোনও বিদেশীভাবের আমদানী করতেও চেষ্টা করেন নি। সেইদিনকার সেই অচল, অনড়, রক্ষণশীল সমাজের যে রূপটি তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন তারই একটি জীবন্ত ছবি তিনি বাংলার পাঠক সমাজকে উপহার দিতে চেয়েছিলেন। সেই সমাজ দোষে গুণে অপরূপ সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল তাঁর শিল্পীর তুলিতে। রসজ্ঞা তাঁর বইগুলিতে যে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছেন তাঁর মূল উৎসটি গরোয়া বাঙালীদের সামাজিক জীবনেই নিহিত আছে। তাঁর রচনা সম্পূর্ণ বাঙালীর নিজস্ব ভাবধারায় পুষ্ট। তাঁর বর্ণিত কাহিনীগুলিতে অতিনবত্ব কিছুই নেই—কিন্তু আছে এক অনাস্বাদিত বৈচিত্র্য ও অনাবিল মাধুর্য। তাঁর গল্পগুলি বাংলার গরোয়া জীবনের অতি সামান্য সাধারণ ঘটনা-সমাবেশে অপূর্ব মধুর হয়ে উঠেছে। সেগুলির মধ্যে নেই কোনও অসঙ্গতি ও অসাধারণ নাটকীয় বা চমকপ্রদ ঘটনা-বাহুল্যের কষ্টকর প্রচেষ্টা। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা-সংঘাতে ফুটে উঠেছে তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলি। তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে তিনি কাহিনী বিন্যাসের চেয়ে চরিত্র চিত্রণেই বেশী মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছুই নেই। সেগুলি যেন নিত্যই আমাদের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায় বলে মনে হয়। তাঁরাই তখনকার বাংলার সমাজকে ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের লেখার ভঙ্গীতে ও ভাষার আবে এক অদ্ভুত জাদু, যাতে করে পাঠক পাঠিকাদের চিত্ত অতি সহজেই বিমোহিত হয়ে যায়। রূপস্রষ্টা শিল্পীর তেমনি অপূর্ব নৈপুণ্য এক চরিত্রেও। তাঁর রচনা ভঙ্গী সহজ, সরল, অনাড়ম্বর এবং সর্বপ্রকার বাহুল্য বর্জিত। সেই রচনায় কোথাও অলঙ্কারের পরিচ্ছদের অর্থহীন বর্ণবিন্যাস বা কষ্টসাধ্য ভাব বিলাস নেই। তাঁর ভাব ও ভাষার সুমিত সংযমই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। তাঁর ভাব ও ভাষার গতিও তেমনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। সেইজন্যই তাঁর রচনার অনবদ্য লৌকিক, মাধুর্য, ও সৌন্দর্য অমন করে বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছে। সুনিপুণ শিল্পী অতি সাধারণ গল্প কথার মাধ্যমে যে অতি সাধারণ সামাজিক চিত্রগুলি আঁকতে প্রয়াস পেয়েছেন তাই তাঁর আবেদন এমন নিবিড়, গভীর ও মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে যে সামাজিক চিত্রগুলি পাঠক পাঠিকাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেগুলির মধ্যে তাঁর একান্ত দরদী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বাঙালী সমাজের দোষ গুণ চমৎকার অকুণ্ঠিত-চিত্তে দেখিয়েছেন। তাঁর দরদী মন বুঝেছিল সমাজের ত্রুটিগুলি কোথায়। নিষ্করুণ সমালোচকের কঠিন সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন সেই সমাজের সকল অসাম্য, অবিচারও অনুদারতাকে। তার জন্যে তিনি সমাজকে নিষ্করুণ কশাঘাত করতেও ছাড়েন নি। সমাজের খুঁতগুলির নিখুঁত, অনাবৃত স্বরূপ তিনি অতি নির্মমভাবে প্রকাশ করেছেন। তবুও সেই সমাজের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমত্ব। যে সমাজের দোষত্রুটিগুলি করুণ বিচারকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখেছিলেন তার প্রতি সীমাহীন মমতাও ফুটে উঠেছে তাঁর লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে। তিনি নিজেও যে সেই সমাজেরই একজন, সেকথাও তিনি মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি। সমাজের দোষগুলি তাঁর সংবেদনশীল একান্ত কোমল অন্তরকে অশেষ বেদনা দিয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি তাকে অবজ্ঞা ক'রে তার থেকে দূরে থাকতে চান নি। সমাজের বাইরে থেকে যে কেউ কোনও দিন তার দোষ ত্রুটিগুলি শোধরাতে পারে না একথা শরৎচন্দ্র মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। তাই তিনি "পল্লীসমাজে" "রাটোইদা" বিদেষবহ্নীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

"তাছাড়া আমি নি না, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভালো করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত—সে কাজ এমন কঠিন। আগে যে মিশতে হয়, সকলের

মন্দ ছাড়াতে মন্দকে এক চুল না পারলে কিছুতেই ভালো করা যায় না —সে কথা তাঁর মনেও আসে নি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার মন্দ দোষ, পাপ নিয়ে এসেই উঁচুতে এসে উঠেছে যে শেষ পর্যন্ত কেউ তার নাগালই পেল না।—এইবার তাকে ছোরা নামিয়ে এনে সকলের সঙ্গে সে মিলিয়ে দিলে তাতে অবশ্য বইটি বড় হ'ক, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক জায়গাটির দেখা পাবে এতখা আমি ঘাড়ে পা রেখেই বলে যাচ্ছি।" বাস্তবিকই রমেশের সম্বন্ধে বিশ্লেষণীর এই কথাগুলি সত্য খাটি।

যে সমাজের চিত্র শরৎচন্দ্র তাঁর বইগুলিতে এঁকেছেন তার সকল স্তরের মানুষগুলির সঙ্গেই তাঁর পরিচয় ছিল অতি নিবিড় ও গভীর। হয়তোর ভদ্র শিক্ষিত রক্ষণশীল হেন্দুসমাজের নিম্নস্তরের সঙ্গে যোগাযোগ অতি সামান্যই থাকে। সাধারণতঃ তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী তাঁর বই পড়েই জেনে থাকেন। তাঁরা কদাচিৎ এই সব তথাকথিত 'ছোটলোক'দের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাই তাঁরা এদের প্রকৃত অবস্থা বা চরিত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করবার সঙ্গেই যোগাযোগ পান না। এই স্বল্প পরিচয়ের ব্যবধান এই সব চরিত্র চিত্রে এঁদের এক বড় অন্তরায় হ'য়ে ওঠে। ফলে তাঁদের চিত্রিত চরিত্রগুলি জীবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে না। কিন্তু ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কোনও দিনও এই হেয় লোকদের ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে রাখতে চান নি। তাদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশবার এবং এদের প্রাত্যহিক জীবন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করবার ও এদের বৈচিত্র্যময় সুখদুঃখের সঙ্গে সমবেদনা প্রচুর অবকাশ পেয়েছিলেন। তাই তিনি এই মানুষগুলির অন্তরের মর্মার্থ রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন এবং এদের অন্তরে প্রবেশ করবার চাবিকাঠিটিও খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই জন্যই তিনি মানুষকে তার প্রকৃত মূল্য দিতে শিখেছিলেন এবং এতো গভীরভাবে ভালোবাসতেও পেরেছিলেন।

বাংলার সমাজ-পতিতাকূল নারীরাও শরৎচন্দ্রের উদার হৃদয়ের অপার সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি। তাঁর ভালোবাসার ডালা অন্তর তাঁদের দুঃখেও ঝৈরেছিল। তাদের মধ্যেও যে দেবত্ব আছে, তাঁর দরদী মন তা বুঝতে একটুও ভুল করে নি।

"দেবতাকে মোর কেহ তো চাহে নি,
নিয়ে গেল সবে মাটির ঠেলা।"

সমাজত্যক্তা পতিতা নারীদের সমাজের বিরুদ্ধে—সমগ্র পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে—এই চিরন্তন ও অতি সত্য অভিযোগটি শরৎচন্দ্র যেন তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেয়েছেন—তাদের সহজ মনুষ্যত্বকে, তাদের দেবত্বকে স্বীকার করে নিয়ে। তাই সতীধর্মের চেয়ে তাঁর কাছে অনেক সময়েই নারীধর্ম বড়ো হ'য়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর আদৌ নৈতিক গুচিবায়ু ছিল না। তাঁর সর্বসংস্কারমুক্ত উদার মন দুর্বল মানুষের সহজ বুদ্ধি দিয়েই মানুষকে বিচার করতে চেয়েছে। মানুষের মনুষ্যত্বকেই তিনি সব সময়ে বড়ো করে দেখেছেন—বুঝেছেন সেই মনুষ্যত্ব তার পশুত্বকেও ছাপিয়ে ওঠে। সেই জন্যেই তিনি সতীত্বের কষ্টিপাথরে ভাগ্যবিড়ম্বিতা ভ্রষ্টা নারীদের জীবনের মূল্য যাচাই করতে কখনও প্রয়াস পান নি। কঠিন নৈতিক ও সামাজিক মানদণ্ডে তিনি এই সব হতভাগিনীদের পাপ পুণ্য বিচার করতেও চান নি। তাঁর সৃষ্ট চন্দ্রমুখী পতিতা নারী হয়েও ত্যাগ ও সেবায় আদর্শ স্থান অধিকার করে আছে। উজ্জ্বলা অনাথার চরিত্র, মঙ্গল সেবাদাসের প্রতি তার অনুপম প্রেম—পার্থিবতার নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ ভালোবাসার চেয়ে কম পবিত্র নয়। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে "পিয়ারীবাইজীই বড়ো হ'য়ে ওঠে নি। তার সেই পরিচয় অতি গৌণ। তার মধ্যে আমরা কিসের ক'রে দেখতে পাই এক মহীয়সী নারীকেই—যে ত্যাগ, স্নেহ, মমতা, সেবা, পুণ্য, দয়া ও দাক্ষিণ্যে অতুলনীয়া। কোন্ সুদূর শৈশবের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলিতে যাকে সে একান্তভাবে ভালোবেসেছিল—কণ্ঠকমল বৈষ্ণীফলের মালা দিয়ে যাকে সে একদিন গোধূলিলগ্নে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছিল সেই প্রেমাস্পদের প্রতি কী অগাধ তার ভালোবাসা, তার জন্য, কী অপরিসীম তার ত্যাগ। এই পতিতা নারীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা স্বতঃই নত হয়ে আসে। সমাজত্যক্তা সাবিত্রী সতীশকে গভীরভাবে ভালোবেসেও তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারলো —সেই ভালোবাসার জোরেই। শরৎচন্দ্র লিখেছেন—"বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না। ইহা ঘুরেও ফেলিয়া দেয়।" তাই সাবিত্রী যেন ত্যাগ সেবা ও প্রেমের জলন্ত প্রতিমূর্তি। নিজের সুখকেই সে বড়ো করে দেখলো না। সে অনায়াসেই হাসি মুখে নিজ হাতে জলাঞ্জলি দিলো—সতীশের সুখের জন্যে। নিজের কলঙ্কিত জীবনের সংস্পর্শে সে কলুষিত করতে চাইলো না প্রেমাস্পদের জীবনকে।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট পতিতা নারীগুলি তাদের নিজ নারীত্বের এই বিপুল মহিমারই যেন অবদান পেয়েছে। বাস্তবিকই এই পতিতা সমাজচ্যুতা হতভাগিনীদের মধ্যে যে নারীসুলভ সহ্য মায়া স্নেহ প্রেম, সেবা ও দাক্ষিণ্য থাকতে পারে তা শরৎচন্দ্রের আগে আর কোনও বাঙালী কথা-সাহিত্যিক এমন করে সমস্ত অন্তরের দরদ দিয়ে দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। এটা যেমন সমাজে, তেমনি সাহিত্যেও যেন অপাংক্তেয় ছিল। উদার মানবতার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখেছিলেন এই সমাজবহির্ভূতা নারীদের বিড়ম্বিত জীবনের সমগ্রারূপটিকে—নিজ অন্তরে অনুভব করেছিলেন তাদের অন্তরের নির্বাক পুঞ্জীভূত দুঃখ ও বেদনাকে। যদি কখনও কোনও ভ্রান্ত রমণীর মুহূর্তের ভুলের জন্য ক্ষণিক দুর্বলতা-বশতঃ কিংবা অত্যাচারের তাড়নায় পদস্খলন হতো আমাদের তখনকার রক্ষণশীল সমাজে তার সেই অপরাধের আর মার্জনা ছিল না। তবু-সমাজের দ্বার তার কাছে চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে যেতো। অথচ পুরুষের ক্ষেত্রে সমাজের বিধান ছিল অন্যরূপ। সেই একই অপরাধে অপরাধী পুরুষের মান, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা সমাজে অক্ষুণ্ণ থেকে যেতো। অনুদার, রক্ষণশীল সমাজের এই সহজ মনুষ্যত্ব-বোধের অভাব, তার অকরুণ নির্মমতা ও নিষ্ঠুর অবিচার শরৎচন্দ্রের অন্তরকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিল। তিনি রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভালো হতে চাইলে তাকে তা' কেউ

বানা করে না ; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন ? অজ্ঞানে, অভাবে পোড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন ? কেন আমাদের তোমরা ভালো হতে দেবে না ?" পতিতা নারীদের প্রতি আমাদের তখনকার রক্ষণশীল সমাজের এই চরম অবিচার শরৎচন্দ্রের বুকে বড়োই বেজেছিল। রাজলক্ষ্মীর মুখ দিয়ে তিনি নিজেই যেন বলেছেন—"আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, নির্মম। একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে। ভগবান্ এর সাজা দেবেনই দেবেন।" তাই শরৎচন্দ্রের কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের মর্মব্যথা বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে—প্রকট হয়ে উঠেছে সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের নিষ্ঠুর বাস্তব রূপটি।

শরৎচন্দ্র বাংলার সমগ্র নারীসমাজকেই অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেছিলেন। বাংলার মেয়েদের মধ্যে মমতাময়ী নারীর এই কল্যাণী মূর্তিই তিনি যেন বিশেষ করে দেখেছিলেন। যে নারী অপরের সুখের জন্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়—নিজ অন্তরের সুধা সিঞ্চনে সংসারে ও সমাজে অপর পাঁচজনের জীবনকে মধুরতর করে সেই কল্যাণময়ী নারীর অসীম স্নেহ মমতায় ভরা অন্তরের রূপটিই তিনি চিত্রিত করতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি নারীচরিত্রে। "রামের সুমতি"তে সৌদামিনী নারায়ণীর পিতৃমাতৃহীন বৈমাত্রেয় দেবর সন্তানতুল্য রামের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা, "বিন্দুর ছেলে"তে জারজপুত্রের প্রতি বিন্দুর গভীর স্নেহ ও বাৎসল্য একমাত্র বোধহয় বাঙালী পরিবারেই সম্ভব। "দেবদাসে" পার্বতী আপন চরিত্র মাধুর্যে স্নেহ ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে তার বন্ধু সপত্নীপুত্র-কন্যাদের কেমন আপনার করে নিয়েছে। "নববিধান"তে অশিক্ষিতা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে "পোড়া কাঠে"র কল্প বহ্নিচেতনের অন্তরালে করে চলেছে বাঙালী মায়ের অন্তরের স্নেহমমতার স্নিগ্ধ ফল্গুধারা। "মেজ-দিদি"তে হেমাঙ্গিনী তার বুড়ো মা কাদম্বিনীর মাতৃপিতৃহীন বৈমাত্রেয় ভাই কেষ্টকে সন্তানাধিক স্নেহযত্ন করে কতই না নিগ্রহ ভোগ করেছে ! অবশ্য শরৎচন্দ্র যে নারীচরিত্রের খারাপ দিকটা একবারেই দেখান নি তা নয়। "বামুনের মেয়ে"র রাসমণি, "মেজদিদি"র কাদম্বিনী প্রভৃতি কয়েকটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির নারীচরিত্রও তিনি এঁকেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে তাঁর চিত্রিত নারীচরিত্রগুলিই যে অনেক পুরুষ চরিত্রের চেয়ে চের বেশী ফুটে উঠেছে একথা সর্ববাদীসম্মত। শ্রীকান্তের চেয়ে রাজলক্ষ্মী ও কমললতার চরিত্র, রোহিণীবাবুর চেয়ে অভয়ার চরিত্র, দেবদাসের চেয়ে পার্বতী ও চন্দ্রমুখীর চরিত্র, অতুলের চেয়ে জ্ঞানদার চরিত্র, সুরেনের চেয়ে বিজয়ার চরিত্র, জীবানন্দের চেয়ে ষোড়শীর চরিত্র, সতীশ ও দিবাকরের চেয়ে সাবিত্রী ও কিরণময়ীর চরিত্র, অপূর্বর চেয়ে ভারতীর চরিত্র বেশী করে পাঠক পাঠিকাদের মর্মস্পর্শ করে। "পল্লীসমাজে" রমাইমা বিশেষরীর চরিত্রটি বাস্তবিকই অতি অপূর্ব হয়েছে। এই প্রবল বুদ্ধিশালিনী পল্লীরমণীর দৃঢ় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের কাছে উচ্চ শিক্ষিত রমেশকেও মাথা নত করতে হয়েছে। বিশেষরী তার সহজ বুদ্ধি দিয়ে রমেশের অনেক প্রশ্নের, অনেক সমস্যার কেমন সহজ সমাধান করে দিয়েছেন। কী উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তিনি বিচার করেছেন সমাজের দোষগুণ—ক্ষমা করেছেন মানুষের মনের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে। এই উদারহৃদয়া নারীর চরিত্রে হিন্দু-বিধবার নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও সংযমের সঙ্গে সংসারবিজ্ঞের উদার ও মহতের অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছে। বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি গোপন আসক্তির কথা জেনেও তিনি তাকে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিতে চান নি—বরং তাকে আরও কাছে টেনে নিতে চেয়েছেন। রমার প্রতি গভীর সমবেদনায় তাঁর অন্তর ভরে উঠেছে। তিনি বলেছেন —"সারাজীবন ধ'রে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব কেন—ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়াল !" এ যেন শরৎচন্দ্রের নিজ অন্তরেরই ব্যাকুল প্রশ্ন। বাংলার মেয়েদের দুঃখ, দুর্দশা, তাদের প্রতি সমাজের অবিচার ও অত্যাচার তাঁর কাছে অসহনীয় ছিল। তাই তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে বাংলার নারীদের অন্তর বেদনাকে মথন করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বালবিধবা রমার রমেশের প্রতি নিষ্কল প্রেম এবং তার জন্যে তার মিথ্যা অপবাদ ও নামাঙ্কিত নিগ্রহ তার অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্ব ও নিদারুণ মর্মবেদনা সহানুভূতিহীনা বিধবা জননীর অরক্ষণীয়া কন্যা জানকীর হৃদয়ের দুঃসহ ব্যথা—তথাকথিত কুলীন বাবুদের মেয়ে সন্ধ্যার অকরুণ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে—বিরাজ বৌয়ের মর্মান্তিক দুঃখ ও দুর্ভাগ্য—পার্বতীর ব্যর্থ নারীজীবনের দুর্বহভার—জননীর শাপে কলঙ্কিতা নিরপরাধী সরযূর অশেষ দুঃখ ও লাঞ্ছনা তাই তিনি নিজ অন্তরে মথন করে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলার আধুনিক সমাজের নব্য শিক্ষিতা মেয়েদের চরিত্রচিত্রণে শরৎচন্দ্র বিশেষ সফলতা দেখাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বোধহয় এই আধুনিক বাঙালী সমাজের মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার এবং তাদের দেখবার তাঁর বিশেষ সুযোগ ঘটে নি। "বিপ্রদাসে" উচ্চশিক্ষিতা বন্দনার চরিত্রটি তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য নারীচরিত্রের মতো তিনি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।

বাংলার পল্লীসমাজের সঙ্গেও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও যোগাযোগ ছিল, যাতে করে তাঁর চিত্রিত বাংলার পল্লীসমাজের চিত্রগুলি অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার পল্লীক্রোড়েই কেটেছিল তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন। পল্লীপ্রকৃতি এবং পল্লীসমাজের সঙ্গে তাঁর অন্তর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছিল—আমরণ। তাঁর অধিকাংশ গল্পের কাহিনী ও চরিত্রগুলি পল্লীপরিবেশকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে। সাধারণতঃ শহরবাসী শিক্ষিত লেখকেরা পল্লীসমাজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাঁদের অনেকেরই ধারণা পল্লীবাসীরা অত্যন্ত সরল ও নিরহংকার মানুষ, যাদের মধ্যে কোনও জটিলতা ও কুটিলতা কদাচিৎ দেখা যায়। যাঁরা বাংলার পল্লীসমাজকে ভালো করে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন এ ধারণা কত ভ্রান্ত। শরৎচন্দ্র এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বাংলার পল্লীসমাজকে আঁকতে মোটেই চেষ্টা করেন নি। তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন এই সমাজের পাপ,

দুর্নীতি, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারকে। এই গ্রাম্য সমাজের পলাদলি, অনাদুবিধাদের ঘটিবাটি ও বুটিনাটি—মজ কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীবাসীদের চলচ্ছবি নিখুঁতভাবে, ব্যাখ্যাতীত ও সাবলীলভাবে তাঁর অন্তরকে অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকর্ষিত করেছিল। "পল্লীসমাজে" রমেশ, স্বার্থান্বেষী বেণী ঘোষালের কুটিলতার পরিচয় আসতে পারে শহরের মানুষ, উচ্চশিক্ষিত রমেশকে যে দুঃখ ও নিগ্রহভোগ করতে হয়েছিল তাতে তার পল্লীসংস্কারের মোহ প্রায় ছুটে যাবার উপক্রম হয়েছিল, যদি না তার ন্যায়নিষ্ঠা বিদেশবাসী তাঁর সরল মনে বুদ্ধি দিয়ে তাকে সমস্ত জিনিষটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতেন। এই বেণী ঘোষালের চক্রান্তে রমাকে কতো দুঃখই না পেতে হ'লো। 'মধ্যে কলঙ্কের ছবি দেখিয়ে সে রমাকে দিয়ে রমেশের কত অনিষ্টই না করতে চেষ্টা করলো। শরৎচন্দ্রের "পণ্ডিত মশাই" উপন্যাসখানিতেও আমরা বাংলার তখনকার গ্রাম্য সমাজের একটি সুন্দর চিত্র দেখতে পাই। গ্রামের লোক, অশিক্ষিত মানুষগুলি নিজেদের ভালো বুঝতে শেখে নি। গ্রামে দলাদলি লেগেই আছে। কলেরাই প্রায় প্রায় উজাড় করে দিচ্ছে। পুকুরের জল যাতে দূষিত না হয় সেদিকে কারুরই দৃষ্টি নেই। পুকুরে কলেরা রোগীর নরম কাপড়-চোপড় কাচতে নিষেধ করাতে গ্রামের লোক 'পণ্ডিত মশাই'—নৃসিংহ মোহনকে উচ্ছন্নের মানুষগুলির কাছে একঘরে না করে ছাড়লো না। ফলে তার একমাত্র পুত্র চরণ ঐ ভিটেমাটি ছেড়ে ওধুধ কলেরায় মারা গেল। "বিরাজ-বৌ"তে অশিক্ষিত, দলিলদস্তাবেজ গ্রামে ডাক্তারের লাম্পট্যের ও অত্যাচারের বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার পল্লীসমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয়ের গভীরতা এই সব চিত্র থেকেই বোঝা যায়। সেইজন্যে তাঁর এই গ্রাম্য সমাজের মানুষগুলির চরিত্র অমন জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হ'য়েছে। তাঁর বেণী ঘোষাল, ভৈরব আচার্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, রাধু ভট্টাচার্য ইত্যাদিকে রক্তমাংসের মানুষ বলেই মনে হয়।

অনেকেই শরৎচন্দ্রকে বিদ্রোহী লেখক শ্রেণীভুক্ত করতে চান। এর কারণ তিনি তাঁর কয়েকটি গল্প ও উপন্যাসে অনেক প্রচলিত চিত্র দেখিয়েছেন—বিধবা ও পতিতা নারীদের প্রেম ও তাঁর গল্পের কাহিনীগুলিতে স্থান পেয়েছে। সমাজচ্যুতা ভ্রষ্টা নারীচরিত্রও তিনি তাঁর কয়েকটি গল্পে এঁকেছেন এবং এই চরিত্রগুলি তাতে বিশিষ্ট স্থানই অধিকার করেছে। এই জন্যে একশ্রেণীর লোক তাঁকে তীব্র আক্রমণ করতেও ছাড়েন নি। শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ—তাঁর তুলিতে 'পাপীর চিত্র'গুলি 'মনোহর' হয়ে উঠেছে। কোনও সমাজই কোনও দিনও সমাজচ্যুতা পতিতা নারীদের প্রেমকে ভালো চোখে দেখে নি। আমাদের রক্ষণশীল সমাজের তো কথাই নেই। সমাজের চোখে সেই প্রেম ও ভালোবাসা অবৈধ এবং পাপ হ'লেও ঐ রকম প্রেম আদৌ অস্বাভাবিক বা বিরল নয়। এই সব ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারীদের অন্তরে প্রেমতৃষ্ণা—ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার দুর্নিবার বাসনা—আশা করি যে স্বাভাবিক একথা তো অস্বীকার করা যায় না। উপন্যাসিক শরৎচন্দ্রও এই সহজ সত্যকে অস্বীকার করেন নি। যদি তা করতেন তাহলে তাঁর সমাজ-চিত্রণ অসম্পূর্ণই থেকে যেতো। উপন্যাস যদি মানুষের সত্যিকার বাস্তব জীবনের আলেখ্যই হয় তবে ঔপন্যাসিকের কাজ—জীবনে যা নিত্যই ঘটছে তাই দেখানো—সমাজের প্রকৃত সুবিধাবাদী সকলের সামনে তুলে ধরা। এটা ঠিক শরৎচন্দ্র সকল সামাজিক অনুশাসনকেই নির্দ্বিধায়ে মেনে নিতে পারেন নি'। যেখানেই মানুষের মনুষ্যত্বকে অপমানিত হতে দেখেছেন সেখানেই তাঁর অন্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। তাই পতিতা নারীদের মনুষ্যত্বকেও তিনি অসম্মান করতে পারেন নি'। সমাজের অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়েছেন। কতগুলি অর্থহীন নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের প্রতিও তিনি তীব্র কটাক্ষপাত করেছেন। কিন্তু তিনি সমাজদ্রোহিতাকে কোথাও সমর্থন করেছেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজেই বলেছেন—"সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানি নে।" সামাজিক কলঙ্ককেও তিনি কেমনই নিয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর রচনায় যথেষ্ট সংযম ও নীতিবোধ দেখতে পাওয়া যায়। "পল্লীসমাজে" বালবিধবা রমার সঙ্গে রমেশের বিবাহ ঘটিয়ে অনায়াসেই তিনি গল্পটি অন্যরকম করে শেষ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি'। বরং ন্যায়নিষ্ঠ বিদেশবাসীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে সে বামুনের মেয়ে—তার মতোই তাকে আজীবন শুদ্ধ ও সংযতভাবে থাকতে হবে। নিষ্ফল প্রেমের ব্যর্থতায় রমার বেদনাহত চিত্তের উপর সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চেষ্টা করে বিদেশবাসী তাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন—বিধবাদের চরণে তার বাকী বৈধব্য-বিড়ম্বিত জীবনটাকে নিবেদন করে দিতে। এইখানেই শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। "দেবদাসে" ও তিনি পার্বতীর বিয়ের পর তার সঙ্গে দেবদাসের অবৈধ মিলন ঘটাতে পারতেন। কিন্তু তিনি পার্বতীর চরিত্রের মধ্যে সংযম ও নীতিবোধকেই যথেষ্ট বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। স্বামীকে ভালবাসতে না পারলেও সে আদর্শ স্ত্রী হতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে—অহরহ নিজের মনের সঙ্গেও যুঝেছে। "চরিত্রহীন" সতীশের সঙ্গে মেসের বি, কুলত্যাগিনী সাবিত্রীর বিবাহে এবং ডাক্তার ও সুরবালার মৃত্যুর পরে কিরণময়ীর সঙ্গে উপেনের বিবাহে কোনও দুস্তর সামাজিক বাধা ছিল না। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসখানি অন্যরকম করেই শেষ করেছেন। "গৃহদাহে" অচলা তার স্বামীর বন্ধু পাশ্চাত্যশিক্ষিত ধনীপুত্র সুরেশের সঙ্গে ঘোঁকের বশে গৃহত্যাগ করেছিল। পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপের তীব্র দহনে জ্বলছে—সে যেন রক্ষণশীল সমাজের সকল পাপ উপড়ে ফেলতে চায়। পুরোপো সব কিছুই তার কাছে বর্জনীয়—সে তার সমস্ত জীবন, সমস্ত সত্তা দিয়ে যেন নতুনেরই সন্ধান পেয়েছে। তাই কমল যেন একটি চরিত্র বিশেষ না হয়ে একটা 'আইডিয়া' (idea) হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর "শেষ প্রশ্নের" পাঠক পাঠিকাদের কাছে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই তুলে ধরতে চেয়েছেন ব'লে মনে হয়—সেই প্রশ্নের যা সমস্যার কোনও জবাব তিনি দিতে চেষ্টা করেন নি। সুতরাং "শেষ প্রশ্ন"কেও বিদ্রোহাত্মক উপন্যাস বলা যেতে পারে না। শরৎচন্দ্র পাওয়া যোঁওয়ার হাস্যকর ঘাড়াঘাড়িটাকে অপছন্দ করলেও বর্ণাশ্রমকে মেনেই নিয়েছেন বলে মনে হয়। "পল্লীসমাজে" বিদেশবাসী

করেছেন—"পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড় সেজন্যে এতটুকু মাথা ব্যথা নেই। ছোট ভাই যেমন ছোট বলে বড় ভাইকে হিংসে করে না, দু'এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকু ক্ষোভ নেই, পাড়া গাঁয়েও ঠিক তেমনি।" কিন্তু শরৎচন্দ্র মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণাকেও ক্ষমা করেন নি। তিনি বলেছেন—"ধর্মমত ভিন্ন হলেই কি মানুষ হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোনকালের বিচার!.....এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখ্খোনো ক্ষমা করবেন না।" তাঁর মতে শুদ্ধমাত্র পাওয়া ছোঁওয়া বাঁচিয়েই পাপের সমস্ত অন্যায় ও অধর্ম থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। জাত বোষ্টমের মেয়ে উমার নন্দ বিধবার সঙ্গে বিশ বছর ঘর করেও তাকে কোনও দিন হেঁসেলে ঢুকতে দেয় নি। তার এই অর্থহীন জাত্যাভিমান ও পাওয়া ছোঁওয়ার যান্ত্রিক বিচারটির বর্ণনা পাঠকপাঠিকাদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছে। শরৎচন্দ্র সর্বদা উদার সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই রক্ষণশীল সমাজের সকল সংকীর্ণতাকে ও অনুদারতাকে বিচার করেছেন। তাই সকলপ্রকার অসাম্য ও অবিচারই তাঁর অন্তরে সীমাহীন বেদনা জাগিয়েছে। তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের দাবী, ভালোবাসার দাবী সব চেয়ে বড়ো হলেও তিনি সামাজিক বন্ধনকেও অস্বীকার করেন নি। পতিব্রতার ভালোবাসাকেও যেমন তিনি বড়ো করে দেখিয়েছেন তেমনি নারীর সতীত্বকে কম শ্রদ্ধা করেন নি—তাকেও অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাঁর "অরক্ষণীয়া বিধি"—তিনি স্বামীর জন্যে কুলত্যাগিনী অপবাদ নিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিতা হন নি—সতীত্বের ধৃপ্ত তেজ ও মহিমায় চিরসমুজ্জ্বল। "গৃহদাহে" মৃণালের মধ্যেও তিনি একটি আদর্শ পতিব্রতা সতী নারীর চরিত্র এঁকেছেন। মৃণাল অচলাকে বলেছেন—"স্বামী জিনিষটি আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি সত্য, জীবনেও সত্য, মৃত্যুতেও মিথ্যা। তাকে আর আমরা বদলাতে পারি নে।" "বিরাজ-বৌ"তে বিরাজ বৌএর সতীত্বের তেজই কঠিন কর্মের মতো তাকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধানের পুরোপুরি পরিপোষক না হ'লেও তিনি কতকগুলি নিষ্ঠুর অর্থহীন সামাজিক প্রথা ও সংস্কারের ভয়াবহ পরিণামও তাঁর কয়েকখানি বইতে দেখিয়েছেন। "অরক্ষণীয়া"তে একটি সন্তানবৎসল মাতৃহৃদয়ের নিদারুণ অন্তর্দাহের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। একদিকে সমাজের দাবী—জাতিচ্যুতির ভয়, আর এক দিকে একমাত্র সন্তানের প্রতি সহায়-সম্বলহীনা বিধবা জননীর অতুল স্নেহ। কৌলীন্য প্রথার ফল যে কী বিষময় ও ভীষণ হতে পারে তা তিনি তাঁর "বামুনের মেয়ে"—উপন্যাসখানিতে দেখাতে চেয়েছেন। সেকালে কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে বিবাহও লোভনীয় ছিল না। ফলে বিবাহটাই হ'য়ে দাঁড়াতো তাদের একটি পেশা। তাতে স্বামীরা সব সময়ে সকল স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিতও হতে পারতেন না। এই অপরিচয়ের সুযোগ নিয়ে কোনও স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর কাছে নিজে না গিয়ে অন্য কাউকে পাঠানোও বিচিত্র ছিল না। অথচ এই ব্যাপারটি জানাজানি হ'য়ে গেলে সমাজে একজন নিরপরাধা স্ত্রীলোকের ও তার সন্তানদের নিগ্রহের সীমা থাকতো না। এই সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধেই শরৎচন্দ্র তাঁর "বামুনের মেয়ে" বইখানিতে লেখনী ধারণ করেছিলেন। "চন্দ্রনাথে" তিনি দেখিয়েছেন, মায়ের দোষে নিরপরাধা কন্যার শাস্তি। সরযূর মায়ের কলঙ্কের কথা প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে চন্দ্রনাথ যখন তাকে ত্যাগ করলেন তখন সমাজের কঠোর নির্মমতার পাঠক পাঠিকাদের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। পতিত্যক্তা নিরপরাধা সরযূর অকরুণ ভাষা সেন কতকটা নির্বাসিতা সীতার ভাষাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। "পণ্ডিতমশাই"তে বৃন্দাবন বোষ্টমের যে সেবোপম চরিত্রটি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন তার কাছে কোনও পরমশুদ্ধাচারী আচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণের চরিত্রও লাগতে পারে না। অথচ সেই বেলা বোষ্টমকেই গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ ছোট লোক—নীচ জাত বলে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করতে কুণ্ঠিত হয় নি। "দেবদাসে" পার্বতীর সঙ্গে দেবদাসের বিবাহ-প্রস্তাবে দেবদাসের মা ঘোরতর আপত্তি তুললেন—"কেন বেচা চক্রবর্তী বামুনের ঘরের মেয়েকে পুত্রবধূ করতে কিছুতেই তাঁর মন সরলো না—বিশেষ করে বাড়ীর পাশের দুটুকু ব'লে। এই অহেতুক আপত্তির ফলে দুটি তরুণ জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। দেবদাস ও পার্বতীর বেদনাবিদ্ধ অন্তরের অশ্রু-সজল করুণ কাহিনীই "দেবদাসে" বর্ণিত হয়েছে। দেবদাস ও পার্বতীর মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো এক নিতান্ত অর্থহীন সামাজিক সংস্কার। রক্ষণশীল সমাজের অনুদারতাই দেবদাসের নবীন জীবনের অমন শোকাবহ পরিণামের জন্য দায়ী। "পল্লীসমাজে"র রমা ও রমেশের ব্যর্থ প্রেমের কথা উল্লেখ ক'রে শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন—"রমার মতো নারী ও রমেশের মতো পুরুষ কোন কালে কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দুসমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হ'ল এই যে, এত বড় দুটি মহাপ্রাণ নরনারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু, হ'য়ে গেল।" ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র মানবের রুদ্ধ হৃদয় দ্বারে বেদনার এই "ব্যর্থাটুকুই পৌঁছে" দিতে চেয়েছেন তাঁর "পল্লীসমাজ" বইখানিতে। তিনি যে বাঙালী হিন্দু সমাজের ছবি এঁকেছেন তার যেমন দোষ আছে তেমনি গুণও আছে। তিনি এই সমাজের সংকীর্ণতা ও অনুদারতাও যেমন একদিকে দেখিয়েছেন, আর একদিকে তেমনি তার অশেষ মহত্ত্ব ও ঔদার্যকে দেখাতেও ভোলেন নি। তিনি "পল্লীসমাজে" মুচকুন্দ, কুঞ্জিল বেণী ঘোষালের চরিত্রও যেমন এঁকেছেন তেমনি বিশ্বেশ্বরীর মতো উদারহৃদয়া নারীর চরিত্রও চিত্রিত করেছেন। "চন্দ্রনাথে" একদিকে যেমন কতগুলি লোকের সংকীর্ণতা দেখিয়েছেন আবার অন্যদিকে তেমনি ঋষিপ্রতিম বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের হৃদয়ের বিশালতা ও দেখিয়েছেন—তিনি নিজে দরিদ্র নিঃসম্বল হয়েও নিরাশ্রয় সমাজত্যক্তা সরযূকে আশ্রয় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। "বৈকুণ্ঠের উইলে" গোকুলের চরিত্র ও "নিষ্কৃতির" গিরীশের চরিত্র সেকালের একান্নবর্তী বাঙালী হিন্দু পরিবারের ত্যাগ ও উদারতারই সাক্ষ্য দেয়।

ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক বাঙালী হিন্দু সমাজের যে রূপটি নিজের চোখে দেখেছিলেন তাকেই তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলিতে। কাল ধর্মের প্রভাবে সেই সমাজের চেহারা যতোই বদলে যাক, কথাশিল্পী তাঁর পাঠক পাঠিকাদের কাছে যে অপূর্ব রস পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন তার মূল্য চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে.....তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।" তাই বাঙালী শরৎচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসগুলির মধ্যে দিয়ে নিজেকেই—নিজের সমাজকেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সেই জন্যেই তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি চিরদিনই বাংলা সাহিত্যের অক্ষয়, অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে। যা সুন্দর যা শাশ্বত, তার মূল্য কখনই দেশকালের সীমা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না।

এমারেল্ড বুদ্ধের দেশ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

কালাপানি পাড়ি দিবার সৌভাগ্য ও আভিজাত্য অর্জন এপর্যন্ত ভাগ্যে ঘটে নি। কোনদিন যে ঘটবে তারও কোন আশু সম্ভাবনা দেখি নি। বন্ধুরা প্রায়ই বলতেন, "তোমার যে ক'রেই হোক একবার বিলেতটা ঘুরে এসো; দেখাতেই তো পাচ্ছ, যা সরকারী হালচাল তাতে গায়ে একটু বিলাতী রঙ না থাকলে চাকুরীর বাজারে কদর পাওয়া কঠিন।" কথাটি যে সত্যি তাতে ভুল নেই। ইংরেজি ইংরাজ প্রভুদের প্রভাবাধীনে থেকে বিলাতীর মোহই আমাদের বড় পেয়ে বসেছে। এমনকি স্বাধীনতা লাভের পরেও আমরা এই ঔপনিবেশিকতার হাত হতে অব্যাহতি লাভ করি নি। বিলেত ভ্রমণ ও ইহজগতের সঙ্গে পরিচয়—সে খুব বড় জিনিস। সভ্যিকার যে সভ্যিকারই হোক, মনের প্রসার ও দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা এ দুই হচ্ছে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগের ফল। ইতিহাসে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা নিয়ে এসে চাকুরীর বাজারে জাঁকিয়ে বসেন। বিলাতের সঙ্গ ডিগ্রীধারী বহুকেই দেখেছি। বেশীর ভাগই বিলেত থেকে ফিরে আসেন কতকগুলি খুঁটা আদব কায়দা এবং কায়দে মকায়েদ ক স্থানে 'অস্থানে সেইগুলি জাহির ক'রে ব-প্রাধান্য স্থাপন করবার একটা অশোভনীয় প্রয়াস করে' থাকেন। বিলাতী বা ইউরোপীয় সভ্যতার যে প্রকৃত উৎকর্ষ—ইউরোপীয় ভাবধারার যে নিগূঢ় তাৎপর্য তা কয়জন বিলাত-ফেরৎ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন! বিলাতী সভ্যতার আপাত চাকচিক্যেই আমরা বেশীর ভাগ এতটা অভিভূত হ'য়ে পড়ি যে আমরা বাইরের খোলসটাকেই আঁকড়ে ধরি, আর ভিতরের আসল বস্তুটা থেকে যাই শতহাতের বাইরে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীও বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের সরল ব্যক্তিত্ব বিলাতী সভ্যতার আচ্ছন্ন হ'তে পারে নি, বরঞ্চ তাঁদেরই প্রভাবে বিলাতী সভ্যতা নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হয়েছে।

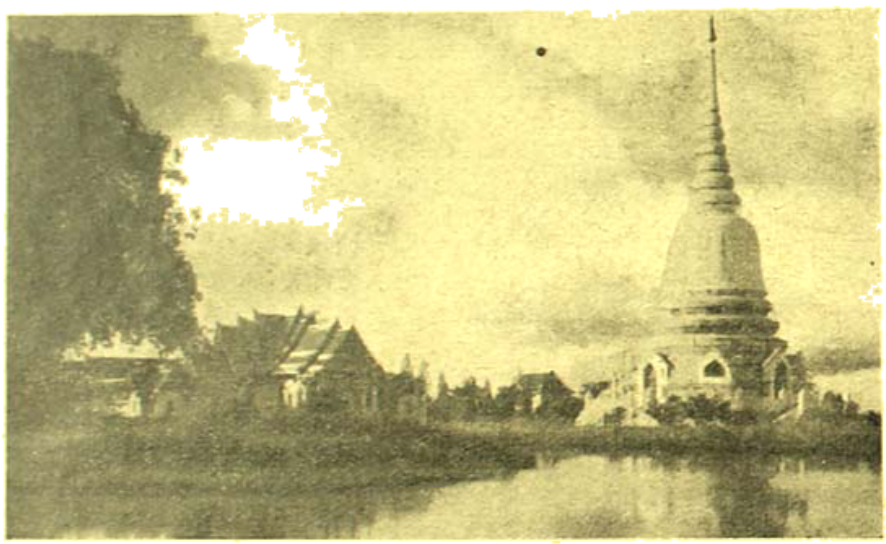

ব্যাংককের উপকণ্ঠে একটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির

প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবেই খবর পেলাম যে "কলম্বো পরিকল্পনার" সভ্যানুযায়ী ভারত থেকে চার জনকে অষ্ট্রেলিয়া পাঠান হচ্ছে—সেখানকার সমাজসেবা বিভাগের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবার জন্য এবং সেই চার জনের মধ্যে আমিও একজন। যেতে হবে প্রথমে মেলবোর্ণ শহরে এবং সেখানে দু'মাস থাকতে হবে। বিলাত না হোক, বিদেশ তো! মন্দভাগ্যে শুভং ভবন্তু। কালাপানি পার হ'তে হবে তো, আর ইংলণ্ডেরই লোসর-অষ্ট্রেলিয়া—এই ভেবেই খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করা গেল। বন্ধুবর্গ মহাখুশি! পরবর্তী প্রোগ্রাম পরে জানান হবে। কলকাতা থেকে বিমান যোগে যাত্রার দিন ধার্য হয়েছে ১১ই জানুয়ারী ১৯৫২। সংবাদটি আসি যখন পেলাম তখন থেকে মাত্র দু' সপ্তাহ সময় থাকল প্রস্তুত হবার জন্যে। তাড়াহুড়া লেগে গেল। পাশপোর্ট, হেলথ্-সার্টিফিকেট, পোষাক পরিচ্ছদ ও সর্বোপরি টাকাকড়ির ব্যবস্থা করতে কম হাঙ্গামা ভোগ করতে হয় নি! যা'হোক শেষটায় মোটামুটি সব কিছুই গুছিয়ে নেওয়া গেল।

১১ই জানুয়ারী শুক্রবার বেলা ১০টায় দমদম বিমানঘাঁটি হ'তে যাত্রা করতে হবে। দমদমে এসে হাজিরা দিতে হবে অন্ততঃ সাড়ে

আটটায়। আমাদের বেলঘরিয়ার বাসা হ'তে একটা বড় গাড়ীতে আমরা সবাই রওনা হলাম বেলা সাড়ে সাতটায়। মামা, মা, খুড়ী, বোন, ভেলেমেয়ে ও আরও অনেকে মিলে ছোটখাট বেশ একটি দল এলেন দমদম বিমানঘাঁটিতে আমায় বিদায় দিবার জন্য।

করাচী হ'তে K. L. M. (Royal Dutch Air Line) কোম্পানীর বিরাট Constellation বিমানপোত যথাসময়ে দমদমে এসে হাজির হ'ল। কাষ্টমসের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে বিমানপোতের দিকে রওনা হলাম। বাবা-মা প্রভৃতি সকলে নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, অশ্রুসজল দৃষ্টিতে বিমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বার বার পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে বিমানপোতের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে রাশি রাশি গোড়া আসন। তারো আমার আসনটি পড়েছিল একটি গবাক্ষের ধারে। যদিও পুরু কাচে ঢাকা, তা'হলেও সেই গবাক্ষ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে সবাইকেই দেখতে পেলাম, যদিও তারা আমাকে আর দেখতে পাননি। শুধু আমার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে সবাই বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগলেন। ঘুরে আমার মায়ের কোলে ছোট্ট গোপাল (ছেলে)—তাকেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল।

এ আমার দ্বিতীয় বার বিমান যাত্রা। ছাত্রজীবনে একবার আধ-ঘণ্টার জন্য সখের বিমান ভ্রমণ করেছিলাম। তারপর এতদিন পরে আবার এই আকাশ ভ্রমণের সুযোগ মিলল। দীর্ঘ যাত্রাপথ ও অনভ্যস্ততা এই দুইয়ে মিলে মনে মনে বেশ একটু উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল।

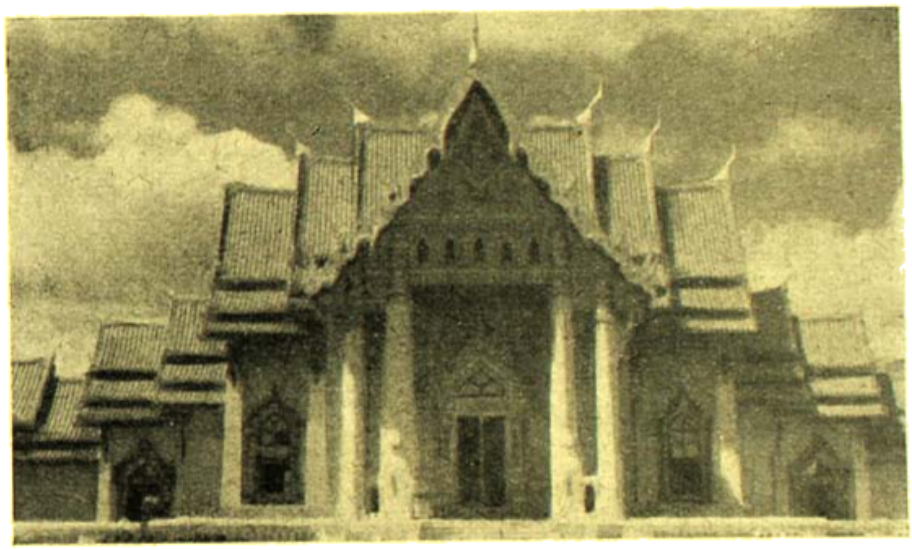

আংকরের বিখ্যাত মর্মর মন্দির

বিরাটকায় বিমানপোত। ভিতরে সত্তর জন আরোহীর বসবার ব্যবস্থা আছে। চারটি প্রবল শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাহায্যে এই বিরাট বপু-খানাকে দুই বিস্তৃত পক্ষ বিস্তার করে মহাশূন্যে উড়ার বেগে ছুটে যায়। এর স্বাভাবিক গতি ঘণ্টায় ৩০০ হ'তে ৪০০ মাইল। ইঞ্জিনের হুঙ্কার সুরু হতেই ভিতরে যাত্রীদের চোখের সামনে লাল আলোর সতর্ক-বার্তা জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলে উঠল :—Fasten your Seat-belt. No Smoking please. এরোপ্লেন উড়বার পূর্বে, আর নামিতে অবতরণ করবার সময় যাত্রীদলকে সাবধান হ'তে বলা হয়। বিমানঘাঁটির দীর্ঘ রানওয়ে (run way) বরাবর বিমানখানা প্রায় আধ মাইল ছুটে গিয়ে ধীরে ধীরে মাটির মায়া কাটিয়ে শূন্যে উঠে গেল। বিমানের অপরদিকের গবাক্ষ দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ক্রমে সমস্ত বিমানঘাঁটি, পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, কলিকাতা মহানগরী ও পুণ্যতোয়া গঙ্গা—সবই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হ'য়ে গেল। বিমান ক্রমশই উচ্চ হ'তে উচ্চে উঠে যেতে লাগল—মেঘপুঞ্জ নিবীর্য ক'রে নিম্নদেশে শূন্যপথে আরম্ভ হ'ল বিমানের অবাধ যাত্রা। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি নানা বর্ণবৈচিত্র্যে সুদর্শন। কখনো বা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে এক আধ খণ্ড মাটির পৃথিবীর আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু সে আভাষ মাত্রই। নদী-গিরি-প্রান্তর সবারই এক অবিচ্ছিন্ন বামন রূপ।

বিমানখানা কখনো কখনো ন'-দশ হাজার ফুট পর্যন্ত উচু দিয়ে যাচ্ছিল, আর সেই সময়ে ভিতরেও বেশ শীত বোধ হচ্ছিল। অতিরিক্ত হাতের কাছেই আছে গরম কম্বল, ইচ্ছে হলেই গায়ে জড়িয়ে নিবিড় হয়ে বসা যায়। বিমানের পরিচারক ও পরিচারিকা (Steward and Air Hostess) আরোহীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। এতক্ষণে যাত্রীদল যার যার আসনে স্থির হয়ে বসে কেউ বা ধূমপান করছেন, কেউ বা কোন ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছেন, আর কেউ বা উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আরোহীদের বেশীর ভাগই চাচ্ বা হল্যাণ্ডের অধিবাসী এবং চাচ্ নিউগিনির যাত্রী। ভারতীয় আমরা তিনজন এবং তিনজনই অষ্ট্রেলিয়াগামী। একজন ভারতের পশ্চিম উপকূলবাসী, একজন দক্ষিণী আর বাঙালী আমি। আমাদের তিনজনের আসন পড়েছিল পাশাপাশি, তাই আলাপ-পরিচয় কিছুই জমে উঠল। পশ্চিম উপকূলবাসী ভদ্রলোকের নাম বি. ডি. চন্দ্রা, আর দক্ষিণী ভদ্রলোকের নাম আনন্দ রাও। খানিকটা আলাপ করেই বুঝলাম যে দুজনেই বেশ একটু interesting ধরণের লোক। চন্দ্রা মশায় এর পূর্বে কিছুদিন ফিজিতে ছিলেন, খুব ফিজির গল্প করতে লাগলেন। তাঁর বাবার ফিজিতে আলু-কারবার। তাঁর মতো কেউ ভাল জানে না, কথায় কথায় তিনি আমাদের নানা বিষয়ে সাবধান করে দিতে লাগলেন। রাও মশায় আমার অনেকটা এর বিপরীত। সাধারণ ভদ্রতারও বড়

একটা ধার ধারেন না—প্রায়ই কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক ভাব—নিজের লিকে তাকিয়ে অপরের প্রতি লক্ষ্য দিবার বড় একটা অবসর পান না। তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন যে তিনি একজন বিখ্যাত আধুনিক কবি এবং তাঁর রচিত কাব্য পৃথিবীর বহু ভাষাতেই নাকি তর্জমা হয়েছে—অথচ দুঃখের বিষয়, এঁর কাব্য পড়া দূরে থাক, এমন কি এঁর নাম পর্যন্ত ইতঃপূর্বে আমার জানা ছিল না, সবিনয়ে এ কথাটা স্বীকার করতে হ'ল।

প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই চন্দ্রা ও সাহ মশায়ের মধ্যে কেমন একটা বিদ্বেষের ভাব দেখে উঠল। চন্দ্রা মশায় মহা-আড়ম্বরে stewardessএর কাছ থেকে কতকগুলি বিলাতী ম্যাগাজিন নিয়ে এসে পাতা উল্টাতে লাগলেন, আর সাহ মশায়কে এটা ওটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে লাগলেন। আমি ভাবগতিক দেখে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দেবে একটু আলগা থেকে এদের ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে লাগলাম। চন্দ্রা মশায়ের মাতব্বরি সাহ মশায় বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে না পেরে উল্টা মাতব্বরি সুরু ক'রে দিলেন। কেউই হটবার পাত্র নয়। একজন চল্লেন বিলাতী আবহ-কাহিনী নেবার অভিপ্রায়ে, আর অন্যজন চল্লেন ওরিয়ার্ণ্টালিস্ট—ব্যাঙ্কারী ইত্যাদি। সংঘর্ষ অনিবার্য। খানিকক্ষণ বাগ্‌যুদ্ধের পর চন্দ্রা মশায় সাহেবকে বল্লেন, "আপনার সাধারণ বুদ্ধি বড় কম—"you lack in common sense।" আশ্চর্যের বিষয় সাহ মশায় কোন একটা সদুত্তর না দিয়ে মুখভার ক'রে গুম হ'য়ে বসে থাকলেন। এর পরেও চন্দ্রা-সাহর মধ্যে অনেকবার কথা কাটাকাটি ধাক্কাধাক্কি হয়েছে এবং প্রায় সবই চন্দ্রামশায়ই শেষ কথা (last word) বলেছেন, তার কারণ চন্দ্রামশায় বাক্‌চাতুরীতে অদ্বিতীয়।

K. L. M প্লেনে যাত্রীদের পান-ভোজনের প্রচুর ব্যবস্থা। নানা প্রকারের মদ বিনা খরচে যাত্রীদের দেওয়া হয়। চন্দ্রামশায় আমাকে অনেক ক'রে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে অন্ততঃ বিয়ার (Beer) পান না করা ইউরোপীয় সমাজে অভদ্রতার সামিল। যদিও বিয়ার পান না করার দোষে ভবিষ্যতে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ড সমাজে আমাকে অভদ্র ব'লে কেউ মনে করেছে এমন প্রমাণ পাই নি, তবু একথা সত্যি যে মদ খাওয়াটা এসব দেশের সমাজে একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। মেয়েপুরুষ সবাই অবাধে মদ খেয়ে যাচ্ছে। মদ না খাওয়াটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক। ড্রিঙ্ক্ বলতে এরা মদ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। হোটেলে-রেস্তোরাঁয় না চাইলে পানীয় জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হুইস্কি, ব্রাণ্ডি, জিন, রাম, শেরি, পোর্ট, শ্যাম্পেন, লিকার, লিকার, লিকার। আর চাইলেও জল পাওয়া যাবে নিক্তির ওজনে যা নির্দিষ্ট পরিমাণে। দুপুরে বা বিকালে লাঞ্চ এবং ডিনারের পূর্বক্ষণে শহরের রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য পানাগারে (bar) যেন যাবে অর্থাৎ তৃষ্ণার্ত নরনারীর ভীড়। মদের দাম হাতে না দিয়ে এদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশাই ভাল ক'রে করা যায় না।

মদ না খেলেও যেন soft drink বা লেমনেড ও অরেঞ্জ স্কোয়াশ পাওয়া যায়—তাই দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করার বাধা নেই। ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ও বৈকালিক জলপান ডেকেই সমাপন করা যেন। যেন ছুটেছে সমুদ্রের দুর্নিবার বেগে। নীচে সমস্ত দিগন্ত আচ্ছন্ন ক'রে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি পৃথিবীকে আড়াল করে রেখেছে। কখনো চকিতে ছিন্ন মেঘের রন্ধ্র দিয়ে নীচে ঘন-সবুজের ফীণ, অস্পষ্ট ছায়াটুকু মাত্র দেখা যায়। বিমান ভ্রমণ এদিক দিয়ে বড়ই একঘেয়ে। খুলে রোদ অপরিমাণ—কিন্তু যাত্রীদের অবস্থা যেন অন্ধকারে রুদ্ধ করা খাঁচায়। মেঘ মুলুকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি। রাশি রাশি মেঘ—কোথাও নিবিড় কালো হুতো বা বজ্রগর্ভ—চালবে তুষিত ধরার বুকে অঝোর ধারা, কোথাও মেঘের রূপ শুচিস্নাত, আধার কখনো শারদীয় রামধনুর মতো আলো ঝলমল। মেঘরাজ্যের ভিতর দিয়ে বিমান চালনা বিপদসঙ্কুল—প্রবল বায়ুস্রোত ও ঝড়ঝাপটার এলাকা এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরাপদ ঊর্ধ্ব অন্তরীক্ষ পথেই বিমানের চলাচল পথ।

বেলা পড়িয়ে বৈকাল হ'য়ে এল। বিমান চালকের নির্দেশ মতো ঘড়ির কাঁটা ৩০ মিনিট এগিয়ে দিলাম। আমরা এখন গ্রীষ্ম রাজ্যের ব্যাংকক শহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। নীচে পিছনে পড়ে রইল বঙ্গোপসাগর ও বর্মা মুলুক।

বেলা চারিটার আমরা ব্যাংকক বিমানবাঁটিতে অবতরণ করলাম।

প্রবাদ আছে যে একবার ব্যাংককের বিখ্যাত এমারল্ড বুদ্ধ মূর্তি বর্মণ করলে আবার নাকি ভগবান বুদ্ধকে প্রতি জন্মান্তর জন্য ফিরে আসতে হয়। ভাল কথা। যদি ভগবান বুদ্ধের দয়ায় আবার ব্যাংকক আসতেই হয় তাতে দুঃখিত হব না। কারণ মাত্র যে তিনদিন ব্যাংককে ছিলাম তার মধ্যে ব্যাংককের সব কিছু ভাল করে দেখা সম্ভবপর হয়ে উঠে নি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি তাতে শহরটি ও শহরের মানুষগুলিকে বেশ ভালই লেগেছে।

শহর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে বিমানবাঁটি। K. L. Mএর মোটর বাসে প্রথমে মাইল তিনেক দূরবর্তী ডাচ্ পাড়াগাঁ দাঙ-উইকে (Phaswijck) যাত্রীদের নিয়ে আসা হ'ল। K. L. Mএর অতিথি হিসেবে এখানেই তিনদিন বাস করতে হবে।

চমৎকার ব্যবস্থা! দাঙ-উইকের বাড়ীটি নাকি পূর্বে থাইল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ও অধিনায়ক পিবুল সংগ্রামের পত্নীভবন ছিল, পরে K. L. M. কিনে নেয়। আন্তর্জাতিক বিমান পরিচালনা প্রতিষ্ঠানগুলির—বিশেষ ক'রে K. L. M (Royal Dutch Air Line) কর্তৃপক্ষের যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার তারিফ করবার যোগ্য। পয়সা এরা যথেষ্টই নেয় বটে, কিন্তু সুখসুবিধার ব্যবস্থাও ক'রে অকৃপণহাতে। কলকাতা থেকে ব্যাংকক-ব্যানিলা-রিটার্ণ সিডনি অবধি রিটার্ণ টিকিটের দাম দিতে হয়েছিল তিন হাজার টাকার কিছু বেশী। রিটার্ণ টিকিট না কিনে এক তরফা টিকিটের দাম পড়ে আরও কিছু বেশী—তাতাতাতে চার হাজার টাকা।

কিন্তু বিমানে আরোহণ করার পর থেকেই যাত্রীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য—আহার-পানীয়, থাকা, এমন কি ক্রটিস্নান পরিবর্তন সব কিছুর ব্যবস্থাই কোম্পানী করে থাকে। দাঙ-উইকের সুপরিসর ও সুসজ্জিত কক্ষে থাকার বন্দোবস্ত হ'ল। পৌঁছানোর অব্যবহিত পরেই stewardess

প্রত্যেক যাত্রীকে কুপন দিয়ে গেল, সে কুপন দিয়ে পাশ্বশালার পাশাপাশি বিনা পয়সায় মদ ও অন্য পানীয় পাওয়া যেতে পারে। আমরা কুপন কয়টি চেয়ারম্যান নিলেন।

প্রাতঃরাশ, লাঞ্চ, বৈকালিক চা ও ডিনারের উত্তম বন্দোবস্ত রয়েছে। K. L. M. বিমানের মোটরবাসে ক'রে যাত্রীদের প্রতিদিন শহরে নিয়ে যায় এবং দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাবার বন্দোবস্ত করে দেয়—এর জন্য কোন পয়সা খরচ করতে হয় না।

তিনদিন ঘুরে ঘুরে ব্যাংকক শহর দেখলাম। বোম্বাইয়ের গিট ইণ্ডিয়া ইন্‌দিওরেন্স কোম্পানীর স্থানীয় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নানাবতীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। ভদ্রলোক পীড়িত ক'রে একদিন তাঁর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ ক'রে আপ্যায়িত করলেন।

ব্যাংকক্ শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত—মাঝখান দিয়ে নদী প্রবাহিত, নদীর দুই তীর সুপ্রশস্ত সেতু দ্বারা সংযুক্ত। বিমানঘাঁটির দিক হ'তে শহরে প্রবেশ করতেই প্রথমে চোখে পড়বে বুদ্ধের মূর্তি। তারপর দীর্ঘ ও চওড়া রাজপথ দিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকলে ক্রমে রাজপ্রাসাদ, রাজা রামের অশ্বারূঢ় মর্মর মূর্তি, ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তরখানা, বড় বড় হোটেল, বাজার ও সারি সারি দোকান দেখতে দেখতে শহরের কেন্দ্রস্থলে আসা যাবে। যাত্রীদের পথপ্রদর্শক হয়েছিল K. L. M. কোম্পানীর কর্মচারী একটি সাই মেয়ে—নাম সুশীল, মেয়েটি সুশ্রী এবং সপ্রতিভ। বাসে যেতে যেতে রাজার দু'বারের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় দিয়ে যেতে লাগল।

থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ ও ভারতবর্ষ এই দু'য়ের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত বহু সাদৃশ্য ও সংযোগ বর্তমান রয়েছে। এদের নামগুলি যে সংস্কৃতজ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। বেশীর ভাগ লোকই হয় বৌদ্ধ, নয় খৃষ্টান। বৌদ্ধধর্ম এদেশে প্রচারিত হয়েছিল ভারতীয় তথা বাঙালী দ্বারা খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে।

বাঙালী উপনিবেশিকরা এক সময়ে দক্ষিণ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ায় হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাণী বহন ক'রে এনেছিল। দ্বীপময় ভারতের নানা বিক্ষিপ্ত অংশেই আজও পর্যন্ত ভারতের সেই অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে অসংখ্য মঠ-মন্দির, স্থানীয় লোকের ভাষা, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, অভিনয়, লোকনৃত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

"স্থপতি যামের রচনা করিল অরোবুদুরের ভিত্তি,
জ্ঞান-কম্বোজ-ওজার ধাম তাদেরই মহান্ কীর্তি।"

ব্যাংককের বৌদ্ধ মন্দিরগুলি কবির উক্তি সমর্থন করছে। বিখ্যাত পো মন্দিরের এমারেল্ড বুদ্ধমূর্তি দর্শন করতে গেলাম। অনেকটা স্থান জুড়ে মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বর। নানা ভাস্কর্যখচিত মন্দিরের অভ্যন্তরে দু-উচ্চ বেদীর উপরে সমাসীন ভগবান তথাগতের ধ্যানমূর্তি। নীচে কার্পেটাস্তীর্ণ মেঝেতে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পুণ্যলোভাতুর নরনারী ধূপিত নেত্রে উপাসনা করছেন। বুদ্ধের ধ্যানমূর্তির পাদদেশে দুই পার্শ্বে দুইটি সুদৃশ্য সিলভারে রক্ষিত তৈল-প্রদীপের আলোকে সেই বৃহৎ মন্দির-কক্ষের অন্ধকার বিদূরিত হচ্ছে। মন্দির অভ্যন্তরে যেন একটা শান্ত, গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিমণ্ডল।

প্রধান মন্দিরটিকে চত্বরাকারে পরিবেষ্টন ক'রে রয়েছে অনেকগুলি কক্ষ। এই কক্ষগুলির প্রাচীরে অঙ্কিত আছে সমগ্র রামায়ণের মূল্য আখ্যানগুলির চিত্রলিপি। ভারতের শাশ্বত মহাকাব্য রামায়ণ বৃহত্তর ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত!

শ্যামদেশীয় রামায়ণের ইংরাজী ভূমিকা প্রকাশ করেছেন ইণ্ডো-থাই-সংস্কৃতি পরিষদ। ইণ্ডো-থাই পরিষদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ও প্রীতি স্থাপন। থাই রামায়ণে মূল রামায়ণের

ব্যাংককের রাজকীয় মন্দিরে—প্রহরীর প্রতিমূর্তি

আখ্যানটি অপরিবর্তিত থাকলেও প্রধান কয়েকটি চরিত্রের আশ্চর্য রূপান্তর ঘটেছে। যেমন রামায়ণ-বর্ণিত মহাবীর হনুমানকে আমরা জানি, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পৌরুষ ও বীর্যবত্তার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হিসাবে। থাই রামায়ণের হনুমান সাহসী বীর বটেন, কিন্তু কামুক ও পরদারগামী! ব্যাংককে থাকাকালীন বাঙালী শিল্পী শ্রীগুরো ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল। তিনি সেই সময়ে ইণ্ডো-থাই পরিষদের উদ্যোগে ব্যাংককে তাঁর নিজস্ব চিত্রকলা ও ভারতীয় শিল্পের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করছিলেন। কয়েকজন পাঞ্জাবী ও কাথিয়াবাড়ী ভদ্রলোকের দেখাও

পেলাম। এঁরা প্রায় সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে অনেকদিন ধ'রেই এখানে আছেন। এঁদের মুখে গত মহাযুদ্ধের সময় এখানে জেপ্পালী সুইফটশেলের আগমন, ডারউইন জার্মান বাহিনীর সংগঠন ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনলাম। এঁদের ভারতীয়রা জেপ্পালীকে আদর ক'রে জেপ্পা বিশেষণে অভিহিত করে।

২৩শে জানুয়ারী রবিবার বেলা চারটার সময় ব্যাংকক ছেড়ে কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মানিলা অভিমুখে রওনা হলাম। আবার সেই দুরু দুরু পথে এরোপ্লেনের সংযোগ ও সঘর্ষণ পরিক্রমণ সুরু হ'ল! সহযাত্রীদের মুখ কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে লক্ষ্য করলাম। অনেকেই ব্যাংককে নেমে গেলেন—তাঁদের স্থান অধিকার করলেন নবাগতের দল। আমার ঠিক পিছনের আসনেই বসেছিলেন একজন বৃহৎবপু ওলন্দাজ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ছাড়ী মালাবী। পানিকটা যাবেই ঘাড়ে চোকা ফেরে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন "Having a nice trip?" অর্থাৎ এলো আলাপ করি। আমার পাশের শূন্য আসনে আসন গ্রহণ জানাতেই উনি এলেন। তারপর কথাবার্তা আরম্ভ হ'ল। ভদ্রলোক সুরা-রসিক। আমার মদ চলে না শুনে হাত নেড়ে হতাশার সুরে মন্তব্য করলেন "Ah! Half life's wasted?" আমি বল্লুম "I mean to waste the whole life." তিনি আমার দু'হাত প্রসারিত ক'রে হতাশার ভঙ্গী করলেন।

এদিকে ভদ্রলোকের দু' পা ফুলে গোদের মতো হয়েছে—জুতো জোড়া পায়ে না পরে হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওদিকে পেগের পর পেগ গিলছেন। মাঝখানে একবার Pantryর দিকে উঠে গেলেন! ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলাম "Interested in engine, are you?" হেসে বলেন "Oh no! Rather interested in gin!" পানিক বাদেই steward আমার মদ পরিবেশন ক'রে গেল।

এই চলার বেলা চারটা থেকে প্রায় সাড়ে আটটা অর্থাৎ ঘিনাইদের প্রধান পথ।

বেলিটুঙ দ্বীপ ছিল বৃক্ষশূন্যের দ্বিতীয়। ডেলেরিয়াম বেলেপাথরের ঢেউয়ে চন্দ্রালোকিত নভোমণ্ডলের কতই না সৌন্দর্য চোখে পড়ে। কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হ'ল। এরোপ্লেন-ভ্রমণ প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনের পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। ছোট কাচে ঢাকা গবাক্ষ দিয়ে সীমাহীন দিগ্বলয়ের সামান্য অংশটুকু আমরা চোখে পড়ে। কোথায় সেই চাঁদের হাসির বাঁধ—যা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে মুক্তাঝারা! চাঁদের কাছে এসে যেন চাঁদকে হারিয়ে ফেলা! হঠাৎ হয়তো এক ঝলক চাঁদকে দেখা গেল গগন কোণে—যেন শূন্যে শশাঙ্ক ঝাঁকা, আবার তার পরমুহূর্তেই সে কোথায় যেন হারিয়ে গেল তার হদিস নেই! অন্ধকারময় মহাশূন্যে মানুষের অমিত স্পর্ধার বিদ্রূপ এই ব্যোমযান যেন দুর্ধর্ষ সংগে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে এক বিষম আক্রোশে।

এখনো সম্মুখে রয়েছে সুচির শর্বরী
সূর্যার অরুণ সুদূর অস্ত অচলে,
বিশ্ব-জগত নিশ্বাস বায়ু সঞ্চরি'
শুব্ধ আসনে প্রহর পথিরে বিরলে।

যে যত-বিহঙ্গম অধ্যাহত থাকুক তোমার পরিবেশ—চলুক তোমার সঘর্ষণ পক্ষ-বিধুনন—

আছে যহা নভো অঙ্গন
উষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা
এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।

কিন্তু ক্রমেই বিমানের গতিবেগ মন্দীভূত হয়ে আসতে লাগল। ধীরে ধীরে বিমানপোত নীচের দিকে নামছে বোঝা গেল। বাতাস সহসা সামান্য একটু শীতল অনুভূত হয়। নচেৎ বিমান ভ্রমণে এক কাপে-তোলা-লাগা পঞ্চেন্দ্রিয়ের জন্য কোন রকমের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি হয় না। এক ঘণ্টা বাদে পশ্চিমগুলে কোন উপদ্রব থাকে বিমান-ভ্রমণ হয় তাহলে কষ্টদায়ক।

উপর থেকে সমাক্-পথে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি যেন সমগ্র ভূপৃষ্ঠে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-সাদা নানা আলোর মেলা। মিষ্টিথ নগরীর এক অপূর্ব অভিসারিকার বেশ। ম্যানিলার ঘাঁটিতে বিমানপোত অবতরণ করল রাত বারোটায়। বিমানঘাঁটি হ'তে শহর চার পাঁচ মাইল দূরে। অত রাতে শহর পরিভ্রমণের কোন সুবিধা হল না, তা ছাড়া ঘণ্টা দুই মাত্র বিশ্রামের পর আবার উড়তে হবে ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত বিয়াক দ্বীপের অভিমুখে। কাজেই কোনমতে বিমানঘাঁটির আফিসে বসেই দু'ঘণ্টা জাগিয়ে দিলাম। রাত দু'টোয় আবার সুরু হ'ল যাত্রা।

চলন্ত বিমানে ঘুম বড় একটা হ'ল না, যদিও শিরোয়ের আসন হেলিয়ে দিয়ে সারা দেহ কম্বলে আবৃত ক'রে অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকা যেতে পারে। তবে তন্দ্রার ভাব এসেছিল। তন্দ্রা ছোটে গেলে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জগৎ সংসার আলোময় হয়ে উঠেছে—নীচে বহুদূরে আবছা আবছা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের জলরাশি। ক্রমে দিনের আলো ফুটে উঠল—বুঝলাম আমরা এখন সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছি। অনন্ত বিস্তার নীল জলরাশির মাঝে মাঝে শাদা-রেখায় পরিবেষ্টিত ছোট বড় সবুজ দ্বীপ। এগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জেরই কোন না কোনটা। প্রথম দৃষ্টিতে এগুলি যে দ্বীপ তা বুঝা যায় না, মনে হয় যেন সমুদ্রেরই অংশ। কিন্তু ঐ শাদা রেখার পরিবেষ্টনটি হচ্ছে ঝরঝরে ফেনিল শুভ্র ফেণার রেখা। আর এই দ্বীপগুলি প্রায়ই ঘনসন্নিবিষ্ট নারিকেল ও অন্যান্য উষ্ণদেশীয় বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন, তাই সবুজ দেখায়। বিয়াকে অবতরণ করলাম সকাল ৮টায়—গ্রাম ও প্রাতরাশের জন্য যাত্রীদের সময় দেওয়া হ'ল ঘণ্টা দুই।

বিয়াক ডাচ্ নিউ-গিনির অন্তর্গত হ'লেও একটি বিচ্ছিন্ন ছোট দ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একখণ্ড সবুজ জমির কালি! সারা দ্বীপটি পাম-গাছালিতে ঢাকা—নারিকেলই অধিক, আর আছে অজস্র পেঁপে ও ডুমুর গাছ। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে আমেরিকানরা একটা বেশ বড় রকমের যুদ্ধের ঘাঁটি তৈরি করেছিল—তার চিহ্ন এখনও খোপ-ঘাড়ের আড়ালে প্রচুর দেখা যায়—পরিত্যক্ত ডায়নামো (dynamo), টায়রাইন (turbine), তাঁবু মোটর লরী ইত্যাদি। বিয়াকে এখন K. L. M-এর একটা বিমান ঘাঁটি হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াগামী বিমানগুলি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা অর্জন করার পর হ'তে K. L. M বিমানপোত জাকার্তা বিমানপোতে অবতরণ করার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হয়েছে। তাই K. L. M যা ডাচ্ বিমানগুলি বিয়াকের পথে চলাচল করে। কিন্তু B. O. A. C (British Overseas Air Company) যেন বৃটিশনীতি জাকার্তা হয়েই যাতায়াত করে। বিয়াকের লোকসংখ্যা অতি সামান্য। বিমান ঘাঁটি তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত হবেক কর্মচারী—প্রায় সবাই ডাচ্ আর কয়েকজন নিউগিনির পলিনেশীয় অধিবাসী।

চারদিকে সমুদ্রে ঘেরা এই ছোট দ্বীপের অধিবাসীরা যেন সেই স্বপ্নের রবিবাসর ভুলে!

* * * *

বিয়াক থেকে সিডনি দীর্ঘ পথ। বেলা আটটায় রওনা হয়ে রাত প্রায় দশটায় সিডনির ম্যাসকট বিমানঘাঁটিতে নামলাম। অষ্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্র বিভাগীয় কর্মচারী মিঃ থারম্যান বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন আমাদের স্বাগত জানাবার জন্য। সে রাত্রে সিডনির ওরিএন্টেল হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা হ'ল। পরদিন ভোরে আবার বিমানযোগে শেষ গন্তব্যস্থান মেলবোর্ণ যেতে হবে।

এ যাত্রায় সিডনি শহরের কিছুই দেখা হ'ল না। ১৫ই জানুয়ারী বিমানযোগে সিডনি হ'তে মেলবোর্ণ এসে পৌঁছলাম বেলা প্রায় এগারটায়।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শিবু পুনরায় সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বড় কর্ত্তা—

চাঁদমোহন ক্রুদ্ধস্বরে কহিল—বড় কর্ত্তা নয়, আমি যা ব'লবো তাই করতে হবে। দাদাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমরা মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে শিখেছ, কিন্তু চিরদিন তা চলবে না। তিন বছর, চার বছর সব খাজনা বাকী—এ কি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর না কি?

চাঁদমোহন কাজ ও অর্থ চিনেন, তাহার কাছে যুক্তিতর্ক, আব্দার যেমন নিষ্ফল, তেমনি স্নেহ-মমতা করুণা-সহানুভূতিও আশাতীত। প্রজাগণ তাই ম্লানমুখে একে একে ফিরিয়া আসিল।

গোপাল কাল রাত্রিতে একটা মানসিক ৺কালীপূজা করিয়াছেন। সারা দিনরাত্রি উপবাস গিয়াছে, পূজান্তেও তিনি বিশেষ কিছু গ্রহণ করেন নাই। তাহার বয়স হইয়াছে, উপবাস আর তেমন সহ্য হয় না—কাজেই সকালে যখন ঘুম হইতে উঠিলেন তখন সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা জড়তা ও আলস্য জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছে। গত রাত্রির অনাহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনটা একদিকে যেমন বিষণ্ণ, অন্যদিকে তেমনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—যজমানের মানসিক কালীপূজায় আহারাদি, গান বাজনা প্রভৃতির জন্য যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে কিন্তু পূজা করিতে বসিয়া তিনি দেখেন ৺মায়ের জন্য একখানা আট-হাতি শাড়ী আসিয়াছে। যজমান অধুনা শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অর্থবান। গোপাল তাই বলিয়াছিলেন—এত খরচ করলে বাবা, কিন্তু ৺মাকে আট হাতি কাপড় পরালে? আর বাবাকে দু'হাতি গামছা?

যজমান জবাব দিয়াছিল—কাপড় ত মা পরবেন না, আপনার ছেলে মেয়েরা পরবে—ওতেই হবে—

গোপাল উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন—৺মা ত খান না, তবে আর কেন নৈবেদ্য বলিদান প্রভৃতি দেওয়া? না দিলেই ত হয়, আর পূজা করবারই বা কি প্রয়োজন?

—এই একটু আমোদ করা, মেয়েরা ধর্ম্মান্ধ তাই—নইলে সবই ত অপব্যয় আর বাবুদের খাওয়ানো।

গোপাল বিরক্ত হইয়াছিলেন—চারিদিকে একই কথা, পূজা আর পূজা নয়, বিলাস ব্যসনের অঙ্গ মাত্র। এই উপেক্ষার দান গ্রহণ করিতে তাহার প্রাণ কাটিয়া যায়, পূজায় মনঃসংযোগ হয় না কিন্তু উপায় নাই, জমিতে ধান জন্মে না, জন্মিলেও চাষীতে ফাঁকি দেয়। পূজার্চ্চনা করিয়া গিয়াছে, পাওনা ততোধিক করিয়াছে। সংসার চলে না, দুইটি ছেলে ইংরাজি স্কুলে পড়ে তাহাদের খরচ যথেষ্ট—

গোপাল বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন—আনমনে চক্কা টানিতে টানিতে অনেক কথাই মনে পড়িতেছিল। মতিঠাকুর মহাশয় যখন মারা যান সে সময়ে হরি ইংরাজি স্কুলে পড়ে। মৃত্যুর সময়ে তিনি বলিয়া গিয়াছিলেন—হরি হইল নেক্সিস্ গোপাল—

গোপালের পিতার মৃত্যুর সময় তিনিও এমনি বলিয়াছিলেন, মতিঠাকুর সারাজীবন তাহা পালন করিয়াছেন। গোপালও নিজে না খাইয়া, জমি বন্ধক দিয়া হরিহরকে দুইটা পাশ করাইয়াছেন, জীবনে তাহার পড়ার খরচা জোগাইতে দুইখানির বেশী কাপড় তাহারা পরেন নাই—শেষ পরীক্ষার ফি দিবার সময় গোপালের স্ত্রীর হার বাঁধা দিয়াছিলেন তাহা সুদের দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—আজ হরি ভাল চাকুরী করিতেছে যদি মাসে দশটা টাকা সাহায্য করিত, তবে এই অবহেলা ও উপেক্ষার দান আর তিনি গ্রহণ করিতেন না।

যজমান একটা লোকের মাথায় একটা কুড়িতে পুরোহিতের প্রাপ্য জিনিষপত্র আনিয়া কহিলেন—কাল হঠাৎ চলে এলেন ঠাকুর মশায়, আপনার জিনিষপত্র সব তাই নিয়ে এলাম। পূজার পরে একটু কিছু খেলেন না—

লোকটির কথাটার ভঙ্গি দেখিয়া গোপাল বিরক্ত হইলেন। কহিলেন—তোমরা তখন গান বাজনায় ব্যস্ত ছিলে তাই আর বিরক্ত করিনি। পূজার পরে মণ্ডপেও

কেউ ছিলে না, তাই চলে এলাম—পূজার প্রয়োজন যখন নেই—তখন আর আমি থাকবো কেন?

লোকটি হাসিয়া কহিল—ও রাগ করে চলে এলেন, তা আমি এমন ত কিছু বলি নি। না খেয়ে চলে এলেন উপবাসের পরে—মা বলছিলেন।

গোপাল ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন—তোমরা ত ভাবো নি সেজন্যে—

—আমি একটু ব্যস্ত ছিলাম গান বাজনায় তাই। আপনার জিনিষপত্র রইল—

—ও তুমি কিরিয়ে নিয়ে যাও, ঐ অবহেলার পূজার কুণ্ঠিত দানকে আমি গ্রহণ ক'রবো না—নিয়ে যাও—

—তা কি হয়, ঠাকুরমশাই। আপনি রাগ ক'রছেন—আর আজ না ব'ললেন আমাদের ওপানে খাবেন—

—না, খেতে পারবো না—তোমার মাকে ব'লো—

লোকটি সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণের এই অভিমান ও অন্যায় ক্রোধ দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল—আচ্ছা আমি তাহ'লে ঠাকুরমশায়—

—ও দব নিয়ে যাও—

—তা কি হয় ঠাকুরমশায়। না হয় নিজগুণে অপরাধ ক্ষমা করে নেবেন।

বাঙ্গের হাসি হাসিয়া লোকটি চলিয়া গেল—

গোপাল স্তব্ধ হকা টানিতেছিলে—এমনি করিয়া অসম্মান বরণ করিয়া আর কতদিন জীবন ধারণ করা চলিবে। তাহার কর্ত্তব্য, চিন্তা সবই যেন বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিক্ষকও নাই, গুরুও নাই, তাহার চিন্তাকাঙ্ক্ষাও অনাকাঙ্ক্ষিত, তবে এ দান কেন গ্রহণ করিবেন।...হরিকে বলিলে যদি সে দশটা টাকাও দেয় তবে হয়ত এ অসম্মানকে আর বরণ করিতে হয় না। কিন্তু হরিকেই বা কেমন করিয়া বলেন যদি সে আজ স্বেচ্ছায় কিছু না দেয়। সে ত প্রচুর রোজগার করে কোনদিনই ত কিছু দেয় নাই—তবে কি করিয়া তিনি চাহিবেন?

হরির ছেলেমেয়েরা আধুনিক জামা গায়ে ঘুরিতেছে; সে ত পূজার সময়ও তাহার ছেলেদের জন্য কিছু আনে নাই, দিবার শক্তি থাকিলেও হয়ত ইচ্ছা নাই, কাজেই বলা চলে না। সংসারের এই অনটন দেখিয়াও সে ত দেখে না—তবে ছেলেমানুষ—মত বুঝিয়া সুঝিয়া চলিবার মত বুদ্ধি হয়ত তাহার হয় নাই—এই ত সেদিনের ছেলে—

গোপাল মনে মনে যখন হরিকে প্রায় ক্ষমা করিয়া ফেলিয়াছেন এমনি সময়ে হরি আসিয়া তাহার সামনে বসিল। গোপাল মুখ তুলিয়া কহিলেন—কি হরি?

—ছুটি কুরিয়ে এল; পরশু যেতে হবে—

—ও আচ্ছা দেখি, দিনটা ভাল ত? গাড়ী একখানা চাই কেমন? আচ্ছা—

—একটা কথা ব'লব ভাবছি—

—বল বাবা বল, আমিও ঘুরেই বেড়াচ্ছি। কথা ব'লব, দু'দণ্ড তোমাদের নিয়ে কাটাবো তার সময়ই নেই।

গোপাল মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, সংসারের অবস্থা বোধহয় হরি বুঝিয়াছে এবং কিছু সাহায্য করিবে বলিয়াই হয়ত বা কিছু বলিতে চায়। গোপাল মনে মনে আশান্বিত হইয়া কহিলেন—বল বাবা বল—তোমরা বড় হ'য়েছ বলবেই ত?

হরি মাথা নত করিয়া কহিল—চাকুরী যা করি তাতে ত সংসার চলে না। পড়াশুনো আছে, মেয়েও ত বড় হচ্ছে—বিয়ে দিতে হবে—

গোপাল বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—চলে না?

—এখানে হলে চলত কিন্তু শহরে থাকি, ভদ্রলোকদের সঙ্গে থাকতে হ'লে একটু কাপড় জামা গয়নাপত্র লাগে, একটু ষ্টাইলে থাকতে হয়—মানে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং সেখানে ত বেশী—

গোপাল শঙ্কিতভাবে কহিলেন—ও তাই—

—বলছিলুম, জমি জাতির—মানে—ধান-পানের হিসাবটা একটু দেখতাম, আমার অংশের ধান—

গোপাল বিস্মিত হইয়া অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, যেন কথাটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। তাহার পরে কহিলেন—হিসাব কিছু ত রাখিনি বাবা—কোনদিনই রাখা হয় না—

হরি মৃদুকণ্ঠে কহিল—কিন্তু রাখা ত দরকার।

—তোমার বাবাও কোনদিন হিসাব রাখেন নাই, আমিও রাখিনা—আমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমার বাবাকে বলে গিয়েছিলেন তিনি সারা জীবন পুত্রাধিক স্নেহে

আমাকে প্রতিপালন করেছেন। তোমার বাবা মৃত্যুর সময়ে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন—আমি যথাসাধ্য করেছি—কিন্তু ধানের হিসাব ত কোনদিন কেউ রাখেনি—

কথাগুলি শুনিয়া হরি লজ্জিত হইয়াছিল, কিন্তু কেন যেন তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিল। গোপাল বুঝিলেন সে যেন আরও কিছু বলিতে চায়; তাই কহিলেন—আমাদের ভাবনার সঙ্গে তোমাদের মত শিক্ষিত লোকের ভাবনা ঠিক মিলে না, তোমরা যা বল তা ঠিক বুঝতে পারি না, যা বলবে স্পষ্ট করে বল বাবা—তাতে দোষের কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই—

হরি ঢোক গিলিয়া কহিল—সংসার চলে না মানে—যেমন চলা উচিত তেমন চলে না, তাই আমার একটা অংশ ত আছে সম্পত্তির—

গোপাল কহিলেন—নিশ্চয়ই আছে, সে অংশ যদি তুমি নিতে চাও তবে এখন থেকে হিসাব রাখবো, ধান নিয়ে যেও—তা'তে তোমার লজ্জার কি আছে—

হরি এইবার সত্যই লজ্জিত হইয়াছিল—সে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল—

গোপাল পুনরায় তামাক সাজিয়া টানিতে লাগিলেন—বারবার তাহার কোটরগত চোখ দুইটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে ঠাকুর পূজার জন্য উঠিয়া পড়িলেন—স্নান, পুষ্পচয়ন ও পূজা ত করিতে হইবে। মধ্যপথ হইতে একবার কহিলেন—নারায়ণ, নারায়ণ—তাহার পর গামছা কাঁধে করিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন।

হরিহরের স্ত্রী আধুনিক শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের বাড়ী এবং শিক্ষিতাও বটে অর্থাৎ সামান্য ইংরাজিও পড়িয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হরিহর যতই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হউন ব্যক্তিত্ববতী বড়লোকের মেয়েটির নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার নিজস্ব মতামত বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট ছিল না—

রাত্রে স্বামী স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্ত্রী কহিলেন—কবে যাচ্ছো? এখানে কি থাকা যায়?

—শিগগিরই যাবো।

—এতগুলো টাকা খরচ করে এখানে এসে এই কষ্ট ভোগ করে কি লাভটা হ'ল তোমার? এ টাকায় ত মেয়েটার দু'টো ফলি হত!

—সকলের সঙ্গে দেখা হ'ল এই—

—তোমার কাকা কি ব'ললেন?

হরি একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া রহিলেন। স্ত্রী কহিলেন—সে জানি, মেয়ে মিউ মিউ করেছে—কেমন ত?

হরি কহিল—বাবা ম'রবার পর আমাকে কাকাই মানুষ ক'রেছেন, তাঁকে ভাগ বাটোয়ারার কথা বলি কি করে? বিয়ের সময় কাকীমা গলার হার খুলে তোমাকে দিলেন—সে সব ত জানো—

—তবেই তুমি সংসার করেছ। এ নিদঘুটে গাঁয়ের বাড়ীতে আমি থাকতে পারবো না। ওখানে বাড়ীটা তা হ'লে করবে না ত? তোমাকে মানুষ যেমন করেছেন তেমনি তোমার সম্পত্তির সবই খেয়েছেন, টাঁক থেকে ত কিছু করেন নি?

—তাতে কি সব হ'য়েছে—

—না হোক্, নিজের ন্যায্য অংশের ধান টাকা চাইতে তাতে লজ্জা বা সংকোচের কি আছে?

হরি অসহায়ের মত কহিল—হিসাব রাখবেন ত ব'ললেন—

—তা হ'লেই সব হল। হিসেবের কাগজ গুলোয় মাদুলী করে ঝুলিয়ে রাখো, তাতেই সব হবে। একটা কথা বোঝো না, তোমার যদি এমন তেমন হয় তবে আমি যাবো কোথায়, ঐ সামান্য লাইফ্ ইনসিওর ছাড়া কি আছে? একটা বাড়ীও ত নেই যে মাথা গুঁজবো—যা সোনা আছে মেয়ের বিয়েতে ত চলে যাবে—

হরি মৃদু প্রতিবাদ করিল—বাবা ত লাইফ্ ইনসিওর করেন নি, তাতে আমি ত ভেসে যাই নি—

স্ত্রী কহিলেন—হ্যাঁ সেরা বুক্ বুঝেছ, বুঝেছি আমার অদৃষ্টে অনেক আছে, তবে সে জন্য করতে পারবে না, গলায় দড়ি দেওয়া ত কেউ ঠেকাতে পারবে না—

তাহার পরে যাহা হইল সেটি সহজ বোধ্য—স্ত্রীর শেষ মারণাস্ত্র চোখের জল ছাড়িয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িলেন—যেন হরিহর সত্যই পরলোক যাত্রা করিয়াছেন এবং স্ত্রী নাবালক পুত্র কন্যা লইয়া একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াই-

যাছেন এবং অন্যান্য অসহায় অবলারা উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন।

হিজুল বনের ধারে শালবনের নতুন কচি সবুজ পাতা বর্ষাস্নে গাঢ় সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ ভূমি বর্ষার জলে ধৌত হইয়া চিক চিক করিতেছে। নতুন নতুন মসৃণ পরিষ্কৃত পাথর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—মাঠে নতুন ধানে সবে মঞ্জরী দেখা দিয়াছে। বর্ষাস্নাত শারদীয় পৃথিবী অপরাহ্নের রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে—

বলাই, নিতাই ও শিবদাস গরুগুলিকে শালবনে ছাড়িয়া দিয়া সবুজ ঢালায় তিনখানা পাথরে বসিয়া কথা কহিতেছিল। মসৃণ পাথরের গোড়াটা পাচনী দিয়া খুঁচিতে খুঁচিতে শিবদাস কহিল—খাজনা দেওয়ার কি করবেক রে নিতাই—

নিতাই কহিল—কোথা থেকে দেবেক, গরু বেচবেক না হয় দেবেক—না হয়—চোর্ কেনে—

শিবদাস ভীত হইল—ছোটবাবু জমি কেড়ে লেবেক, থাকেক কি? জমিদার—

বলাই কহিল—কি করবেক, দুবিঘা জমি কর্জা দেওয়া করবেক, খাজনা আড়াই টাকা—উ লেয় লেবেক, খাদকে চরে খাবেক—মেশাস্থরী হবেক—

নিতাই কহিল—এক কাজ কর কেনে—বসন্ত সায়রে মাছ ধরা কর, কেনে ভিনগাঁয় বেঁচে খাজনা দে কেনে—এ কার্ত্তিক মাসে কে টাকা দেবেক—

বলাই কহিল—চুরি করবেক কেনে? নেই ত দেবেক নাই—ছোটবাবু ত সব লয়, বড়বাবু ত রইছেন—

শিবদাস কহিল—বড়বাবু ত আর জমিদারী দেখা করবেক নাই—ছোটবাবুই ত দেখা ক'রবেক—

বলাই কথাটা অনুমোদন করিল না। সে কহিল—কি হবেক, কি করবেক শুনি? খাজনা মোরা দেবেক নাই—

—খাস জমি কেড়ে লেবেক।

—কে চাল দেবেক বল? তু দিবি? না চল্ মোরা দেবেক, বাবু ত জমি চষবেক নাই—সব মোরা খাজনা দেবেক নাই; কি করবেক?

শিবদাসের ভয় ছিল, যে খাজনা দিবে না তাহারই জমি ছাড়াইয়া লইবে, অতএব তাহার আর উপায় নাই। বলাই প্রস্তাব করিল যদি সকলেই খাজনা না দেয় তবে কাহার জমি ছাড়াইবে এবং কাহাকেই বা দিবে? জমি ত বাবু নিজে চাষ করিবে না! এ প্রস্তাব সাধু সন্দেহ নাই কিন্তু শিবদাস কহিল—খাজনা ত বাউরীপাড়ার কতক দেওয়া করবেক—ধান ছিল বেচা করলেক। মোদের বটু, ফকির, ভজি ত খাজনা দেওয়া করলেক বটে—

বলাই এবার বিপন্নমুখে কহিল—তবে ত বিপদ করলেক বটে!

নিতাই কহিল—তু মাছ ধর কেনে—দু'টো মাছ ধরা কর, খাজনা হবেক বটে!

বলাই রুক্ষস্বরে কহিল—মোরা খাজনা দেবেক নাই, জমি ছাড় হলে খাদকে যাবেক—

একটা গরু শালবনের সীমানা ছাড়িয়া ধানের মাঠে নামিতে যাইতেছিল, বলাই সেইটার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালাগালি দিয়া ছুটিল—এবং ছোটবাবুর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিল গরুটিকে নিদারুণ প্রহার করিয়া।

রাত্রি নিশীথ—

আকাশে কৃষ্ণপক্ষের অস্তায়মান ক্ষীণ চাঁদ—পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় পৃথিবী নিদ্রাতুর। নিতাই ধীরে ধীরে উঠিয়া বলাইকে ডাকিল—বলাই চল্, বসন্ত সায়রকে মাছ ধরা করি—

বলাই চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিয়া কহিল—তু যাবি?

—হ্যাঁ বটে, মাছ ধরা করবেক, খাজনা দেবেক—

বলাই কি যেন ক্ষণিক ভাবিল, তাহার পর কহিল—নাঃ যাবেক নাই—

নিতাই ধীরে ধীরে যাইয়া শিবদাসকে ডাকিল—শিবুদা, চল্—

শিবু উঠিল। গোটা দুই তোপী ও জাল লইয়া বসন্ত সায়রে উপস্থিত হইল। তোপী দুইটিকে সায়রের ঘাটে রাখিয়া তাহারা জাল লইয়া নামিল। বর্ষায় জল অনেক বাড়িয়াছে; সাধারণ জালে মাছ ধরিবার উপায় নাই। তবে টানা জালে ঘাট ঘিরিতে পারিলে বেটেল মাছ দুই একটি ধরা পড়িতে পারে। প্রথম ঘাটটা ঘিরিতেই একটা সের তিনেক

কাতলা মাছ ধরা পড়িল। ভোরের পূর্ব্বে তিনটি মাছ প্রায় বারসের মত ধরা পড়িয়া গেল। নিতাই কহিল—শিবু দা তু যা কামারডাঙ্গাকে, মু যাবে মামুদপুর—মাছ বেচা করে ফিরচি—

—ছা, তাই চ—

তাহারা জ্রুত মাছ লইয়া চলিয়া আসিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ভিন্নগ্রামে রওনা দিল। চারিটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপাততঃ ছ'মাসের খাজনা দিয়া রেহাই পাওয়া যায়।

গোপালপুর হইতে নিকটবর্ত্তী গঞ্জ প্রায় বার মাইল দূরে। গ্রামের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামের ব্যবসায়ীরা ঐ গঞ্জ হইতে আনে এবং গ্রামে বেচাকেনা করে। গোবিন্দ তিলির ছেলে বংশী মুদিখানার দোকান করে। তাঁতিদের মধ্যে নবীন তাঁতি মনোহারী দোকান করে এবং চারু তাঁতি হাটে হাটে কাপড়ের দোকান লইয়া বেড়ায়। গোপালপুরের বারোয়ারী তলার অদূরে সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। তাহাতে সব জিনিষই পাওয়া যায়, গ্রামেও সাধারণ প্রয়োজনীয় সব জিনিষই পাওয়া যায়। বংশীর দোকানই বড়—কুলুদের অনেকেই গাড়ী চালায় এবং চাষ আবাদ করে—এমনি করিয়াই এই তিরিশ বছর তাহারা বাঁচিয়া আছে। দুই চারখানা তাঁত চলে, তাহাতে গামছা ও মশারীর থান হয়।

কোজাগরীর পরে অকস্মাৎ একদিন মেঘ করিয়া প্রথমে ঝিম ঝিম করিয়া পরে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামিল এবং বর্ষার বর্ষণান্তে এই সামান্য বৃষ্টিতেই পথঘাট এবং মাঠ কর্দ্দমে পিচ্ছিল হইয়া গেল—চাঁদমোহনের যাইবার কথা ছিল কিন্তু তিনি রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখিয়া একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিলেন।

দুই-তিনদিন ধরিয়া ঝিম ঝিম বৃষ্টি হইতেছে—সারদা মল্লিকের ছেলে বিষ্ণু সরিষার তেল কিনিতে গিয়াছিল বোতলটা দরজার সামনে নামাইয়া, ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া পা মুছিয়া দোকানে প্রবেশ করিল। বংশী কহিল—

—কি বিষ্ণুদা, স'রষের তেল চাই নাকি?

—হাঁ হে বংশী। আরও জিরে চাই, নুন চাই—

—চাইত খুড়ো—কিন্তু মাল যে নেই। গাড়ীত গঞ্জে যায় না, সারা দিন ঘুরে ডবল ভাড়া দিয়েও গাড়ী পেলাম না—

—কিছুই নেই কি?

—নেই ঠিক তা নয়, তবে কি জানো—অমন্ত তোমাকে ফেরাই কি করে?

—তা ত' বটে, কিন্তু ব্যাপার কি?

—দরটা চড়ে গেছে—আমদানী নাই ত! সরষের তেল ছ' আনা হলে দিতে পারি, তাও এক পো—আর—

বিষ্ণু চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—বল কি বংশী, চার আনার বদলে ছ আনা—এ যে মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা আরম্ভ ক'রলে—

—তবে ঠাকুর, যেখানে পাও যাও, আমার তেলই নেই—তার দেব কি?

বিষ্ণু কহিল—এটা কি ধর্ম্ম হ'ল বংশী। কায়দায় পেয়ে এমনি টাকা আদায় করা—

বংশী কহিল—ঠাকুর টাকা রোজগারটাই ত ধর্ম্ম। তাছাড়া আর কি ধর্ম্ম আছে বল? গরীব বলে চোখ রাঙাচ্ছো ত, ছোটবাবু যে খাজনা আদায় ক'রছে তাতে ত কিছু বলছ না—

বিষ্ণু স্তব্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সোজা ভগবতী চাটুয্যেদের কাছারীতে আসিয়া উঠিল। চাঁদমোহন বসিয়া খাজনা আদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণু তাহার নিকট বংশীর ব্যাপারটা বর্ণনা করিয়া কহিল—আপনি ছোটবাবু, জমিদার, আপনি থাকতে এমন অনাচার হবে আপনি দেখবেন না!

চাঁদমোহন কহিলেন—অন্যায়, নিশ্চয়ই অন্যায়। লাভ সে পাবে কিন্তু একেবারে দেড়া দাম—কালী বংশী তিলিকে ডাকতো—

কাছারী হইতে আহ্বান পাইয়া বংশী আসিল এবং অত্যন্ত বিনয়ের সহিত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আলিসায় বসিল। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন—তেল ছ'আনা চেয়েছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, দর হ'য়েছে—

—তাই বলে দেড়া দাম চাইছ এটা কি হ'ল—

বংশী কহিল—ব্যবসায় লাভ ক্ষতি আছেই, সুবিধে পেলে লাভ হয়। আজ্ঞে তাই। আর ব্যবসাটা ত টাকার জন্যেই করি হুজুর—

—তা বটে, কিন্তু লাভের একটা সীমা আছে ত?

বংশী হাসিয়া কহিল—হুজুর একটিন তেল আনবার জন্যে দুই টাকা দিয়েও লোক পাইনি। গাড়ী ত বন্ধ—নিজে মাথায় ক'রে এনেছি তা আমি কি দু'টো টাকা পাবো না! আর টাকার জন্যে আনিনি হুজুর—গ্রামের লোক তেল পাবে না আমি থাকতে, এই জন্যেই আমি মাথায় করে এনেছি হুজুর। আপনি ধর্ম্মাবতার, বিচার করে দেখুন আমি দুটো টাকা মুনাফা পেতে পারি কি না?

বিষ্ণু কহিল—তুমি আবার কবে গেলে গঞ্জে বল?

বংশী হাসিয়া কহিল—ঠাকুর মশায় বৃষ্টিতে আপনি ঘর থেকে বেরোন নি আপনি জানবেন কি করে—এর নাম ব্যবসা—

উপস্থিত সকলেই বুঝিল এ সম্পূর্ণ মিথ্যা, কিন্তু বিরুদ্ধ যুক্তিও কিছু দিল না। চাঁদমোহন প্রশ্ন করিলেন—খাজনা আদায় ক'রছি বলে তুমি কি বলেছ?

—টাকার দরকার বলেই হুজুর খাজনা চাইছেন, তাই বলেছি। আমিও টাকার দরকার বলেই ব্যবসা করি, বৃষ্টিতে যখন সকলে ঘরে শুয়ে থাকে আমি তখন ভিজতে ভিজতে গঞ্জে যাই—আজ্ঞে এই বলেছি হুজুর।

চাঁদমোহন যুক্তিতে পরাস্ত হইয়া কিছু পুঁথিগত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বংশীকে বিদায় করিলেন। বংশী দোকানে ফিরিয়া আসিতেই বিষ্ণু আসিল। বংশী কহিল—তেল নেই ঠাকুর, ফুরিয়ে গেছে—এবং মুখ গোঁজ করিয়া বসিয়া রহিল। নিতাই একছটাক তেলের জন্য দোকানে আসিয়া তেলের বোতলটা দিল। বংশী কহিল—আট আনা সের, ইচ্ছে ক'রলে নিতে পার—

নিতাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বিষ্ণু কহিল—এই যে নেই ব'ললে!

—তুমি ত বড় বেয়াড়া লোক ঠাকুর, আট আনা ক'লে আছে, নইলে নেই—বুঝলে। ধর্ম্ম কর্ম্ম কে ক'রছে বল? সকলেই টাকার পূজো আরম্ভ করেছে আমরাও করেছি।

বিষ্ণু বোতল হাতে নির্ব্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রমশঃ

বন্দী

আশা দেবী

অরণ্যের স্বপ্ন দেখে
টবে রাখা ছাউ শিশুগুলি
প্রাণ নাই—স্নেহ নাই—
আছে শুধু সীমাহীন কঠিন বন্ধন
থেকে থেকে ভেসে আসে
আরণ্যক ঝড়ের ক্রন্দন।

আন্দোলিত শাখাগুলি—বাহুগুলি
ডাকে যেন আয়— :
দু-বাহু—পসারি ডাকে
রুদ্ধবাণী—মৌন ইশারায়।
তবু পারে নাকো যেতে
বন্দী কাঁদে রুদ্ধ বেদনায়

মরা পাতা ঝরে পড়ে
অশ্রু ঝরে কানায় কানায়।

বসন্ত আসে না হেথা
চাঁদ হেথা নিষ্প্রভ মলিন :
প্রাণের মাধুর্য্য রসে উদ্বেলিয়া
হয় না কেনিল।
যৌবনের পূর্ণতার গান—
মর্ম্মরিয়া—শিহরিয়া মনোবনে
আনে না তুফান।
শুধু আছে বেঁচে থাকা
আর আছে হাত তোলা স্নেহ
পূর্ণ হতে দেবে না তো

দেবে না তো তারে—
মুক্তি আর ঝড়ের আকাশে॥

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট

জেলা হাবড়া

১১।১১।২৯

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। এরমধ্যে তুমি যে বিন্ধ্যাচলে[১] গিয়েছো তা ভাবিনি। বরঞ্চ আমি ভাবছিলাম সেদিন নরেনের ওখান থেকে ফিরে আসতে হ'ল সে ছিল না বলে—আর একদিন এরই মধ্যে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে তোমার ওখানে যাবো।

বিন্ধ্যাচলে আমাকে যেতে বলচো এ খবরে মন খুসিতে ভরে উঠলো। কিন্তু এখন আমার কোথাও যাবার একতিল সময় নেই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে বাস করতে আসার যথাসাধ্য পুরস্কার পাওয়া গেছে। স্থানীয় অতি ক্ষুদ্র জমিদারের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। ঠিক আসামী হয়নি বটে, কিন্তু দিদির এক দেওরকে[২] মূল আসামী করার জন্যে আমার অশান্তিও কম হয়নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যো হয়েচে।

দ্বিতীয়তঃ আগামী কংগ্রেসের[৩] ভারী গোলযোগ বেধেছে। পরশু সুভাষ[৪] ধরেছিল যে দিনকতক কলকাতায় থেকে গণ্ডগোলটা যদি সম্ভব হয় মিটিয়ে দিতে। আমি মিটাতে না পারলে মিটবে না বলেই ওদের আশঙ্কা।

শরীরটার সম্বন্ধে ঠিক করেছি আর একটা কথাও বলব না। তুমি কেমন আছ? এইবারে পারো যদি ওটাকে আর একটু মজবুত করে ফিরে এসো।

মাঝে মাঝে ভাবি চোখ কান বুজে যদি একবার কোথাও নিরালায় পালাতে পারি তো বাঁচি। ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে—এ আচ্ছা হাঙ্গামায় নিজেকে জড়িয়ে তুলেচি। মনের শান্তি ও দেহের স্বস্তি দুই নষ্ট হতে বসেছে। শুধু একটা বাঁচোয়া যে নিজের কাজের কর্দ্দ এখনো খবরের কাগজে বার হতে পায় না। এটুকু কোনমতে সামলে যেতে পারচি এই সৌভাগ্য।

তুমি আমার সেবার ভার নিতে যে চেয়েচো সে কেবল তুমি আমাকে চেন না বলে। এ পৃথিবীতে কেউ পারে না। দিন দুই তিন এ কাজে নিযুক্ত হও যদি তো বলবে বড়দা গেলে বাঁচি। পরীক্ষা করে নিতে লোভ হয় বটে, কিন্তু যে স্নেহটুকু এখনও আছে, সে খাটুনিতে পড়লে তার লেশটুকুও আর থাকবে না। ৭।৮ বার চা'ই খাই—নিজে এতবার কি তৈরী করে দিতে পারবে? অন্য খাওয়া দাওয়ার বালাই বেশি নেই; কিন্তু এই বদ্ অভ্যাসটার জ্বালায় কারো বাড়ীতে কখনো থাকতে সাহস করি নে।

তোমরা কতদিন ও দেশে থাকবে? লাহোর[৫] থেকে ডিসেম্বরের শেষে ফিরে আসবার সময়ে কি ওখানে একবার তোমাকে দেখে আসবার সুবিধে পাবো?

ছেলেবয়সে একবার একজনের[৬] নিমন্ত্রণ পেয়ে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলাম—তোমার চিঠিটা পড়ার সময়ে বার বার সেই কথাই মনে হচ্ছিল। এক একটা কথা

১। এই সময় রাধারাণী দেবী তাঁর পিতার সহিত বিন্ধ্যাচলে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

২। শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলা দেবীর দেবর বেণী পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র এঁদের গ্রাম সামতাবেড়ে এসেই বসবাস করেছিলেন।

৩। এই সময়ে বাঙ্গলা কংগ্রেসে দু'টী দল দেখা দিয়েছিল। একদলের নেতা ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপর দলে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৪। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৫। লাহোরের প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে এক সাহিত্য-সভায় যোগদান করবার জন্য শরৎচন্দ্র এই সময় লাহোর গিয়েছিলেন।

৬। শরৎচন্দ্র যৌবন-প্রভাতে তাঁর অনেকো সাহিত্যানুরাগিণীর আমন্ত্রণে কিছুদিন তাঁর অতিথি হয়েছিলেন।

মানুষে কোনকালেই সম্পূর্ণ বুঝে নেতে পারে না—অন্ধ ভোলা ছাড়া আর কি?

থাক সে কথা। আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো।

তোমার—বড়দা

দামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু

রাধু, চিঠির জবাব না দেওয়ায় লজ্জায় তোমাদের কাছে মুখ দেখানো আমার ভার হয়ে উঠেছে। রোজ ভাবি আজই চিঠি লিখবো, অথচ রোজই পড়ে থাকে। আর কটা দিনইবা বাঁচবো, দাদার এই মজ্জাগত ত্রুটিটুকু ক্ষমা করে নিয়েই মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ দিও। তার থেকে মনে মনে যে কি আনন্দ পাই সে তোমরা বুঝবে না। আর বুঝলেই বা কি লাভ আছে? মানুষের মনতো। তবুখুনি ভেবে নেবে দাদা বড় বলেই আমাকে অবহেলা করলেন, যাক্, আমিও আর চিঠিপত্র কিছুই লিখব না। এমনি করে এ জীবনে কত পরমাত্মীয়ই না পর হয়ে গেল।

অর্থ নিয়ে প্রায়ই ভুগি, মাঝে মাঝে ভালও থাকি। তখন কে আবার কলকাতায় যায়। আর অসুখ বললেও সব সময়ে যেতেই পাইনে বলেও যেতে হয়। এমনি একটা দিনেই গিয়ে Presidency Collegeএ দু'চারটে কথা[১] বলেছিলাম। তুমি বোধকরি খুসি হ'তে পারোনি, না?

যে দিল্লি পথ, তাই কেউ আসবে বললে ভাবনা হয় এ বাড়ী পার হবে কি করে? তাছাড়া এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাঁটু পর্য্যন্ত না উঠলো তো আর পাড়াগাঁয়ের মর্য্যাদা রইলো কোথায়?

শীতের সময় একবার এসো। তখন কাদাও থাকবেনা, মাঠের পথ পড়বে। বেশি হাঁটতে হবেনা। পাঁচ ছ'দিন পরে ভাবচি নরেনদের ওখানে একবার যাবো, সেই সময়ে যদি সুযোগ মেলে তো তোমাকেও দেখে আসবো। কাল নরেনের খেয়ার পুতুল ডাকে এসে পৌঁছল। রাত্রেই ৭০।৮০ পাতা পড়েছি, আজ রাত্রেও পড়বো। সে বেশ লেখে। এমনি যদি কোথায় থামতে হয় এ কৌশলটাও জানতো। তোমার লেখা যেখানেই যার হোক আমার নজরে পড়ে। কারণ সব মাসিকপত্রগুলোই প্রায় বিনা পয়সায় পাই। সাধু স্বাধীন অভিমতটা যেন কুসংস্কারে গিয়ে না দাঁড়ায়। তারও সীমানা আছে এবং আছে বলেই তার মূল্য।

এখন কেমন আছো? আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২রা কার্ত্তিক ১৩৩৬

বড়দা

দামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু

রাধু, তোমার বইখানি[২] পাবার পর থেকে প্রায়ই ভাবতাম কবিতা নিয়ে কথা কইবার অধিকার ভগবান যদিবা নাই দিয়ে থাকেন, অন্ততঃ বইখানি পেয়েছি এবং আগাগোড়া পড়েছি এ খবরটাও তো দিতে পারি। তাই কেন না দিই? এমনি ভাবি আর দিন যায়। অবশেষে শিলঙ[৩] থেকে এলো চিঠি—এলো নিমন্ত্রণ। মনে মনে লজ্জার অবধি রইল না—স্থির হ'ল এবার আর দেরি নয়—জবাব একটা দেবই দেব। কিন্তু আবার ভাবি আর দিন যায়—এমনি করে ভাবতে ভাবতে আজ দুপুর রাত্রে আরাম-কেদারা ছেড়ে অকস্মাৎ উঠে বসেছি এবং কাগজ কলম খুঁজে বার করে নিয়ে নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করেচি ওপরে যাবার আগে এ চিঠি শেষ কোরবই কোরব। কাল সকালেই যেন ডাকে দিতে পারি।

কিন্তু জানোইত ভাই বিনয় নয়, সত্যিই কবিতার আমি কিছুই জানিনে। তাই কবিতা যে কেউ লেখে তার পানেই আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। নিজে না পারি দু'ছত্র মেলাতে, না পারি ভালো ভালো কথা খুঁজে বার করতে। একবার বহু চেষ্টায় 'হায়'-এর সঙ্গে 'অসীম' মিলিয়ে কবিতা লিখেছিলাম কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বললেন, ও হয়নি।

১। ১৯২১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে বঙ্কিম-শরৎ সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শরৎচন্দ্রের ৪৪তম জন্মবার্ষিকীতে অভিভাষণের উত্তর।

২। "লীলাকমল" নামক কাব্যগ্রন্থ।

৩। রাধারাণী দেবী এই সময় তাঁর পিতার সহিত শিলঙ বেড়াতে গিয়েছিলেন।

হয়নি ত বটেই, কিন্তু হয় যে কি কোরে সেও তো বুদ্ধির অতীত, সুতরাং আমার মত দুধীশক্তি যত্ন করে এ বই যদি পড়েও থাকেন তাতে তোমাদের মত কবিদের আনন্দ বুঝে থাক সাধনাটাই বা কি ?

বুড়ি[১০] ছেলেবেলায় কবিতা লিখতো, মন্দ নয়, সে এটা বোঝে ; তাকে যদি পাঠাতে বোধকরিবা—এমনতর অযোগ্যের হাতে তুলে দেওয়ার আক্ষেপ থেকে রক্ষা পেতে।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। ভূলধর দাদার[১১] 'অভাগী' বেরিয়েচে ; আমাদের বাড়ীর ইনি[১২] পড়েন আর কাঁদেন। চোখমুখ ফুলে উঠলো, আমাকে কাছে পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বললেন, কি যে ছাইপাশ তুমি লেখো,—এমনি একখানিও যদি লিখতে পারতে !

পারিনে তা মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যাপারটা কি ওতে ?

বললেন—ব্যাপার ! এই স্থাখো সতীত্বের তেজ !

দেখা গেল—অভাগী তখন কাশিতে। সেখানে দারোগা, কনেষ্টবল, বাড়ীওয়ালা, পাওা, সন্ন্যাসী সবাই একে একে ব্যর্থ চেষ্টা করে হার মেনেচে। অভাগী অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার পেয়ে গেছে। কেউ তার কিছুই করতে পারেনি !

কেউ যে কিছুই করতে পারবেনা সে আমিও জানতাম, তবু তর্কে হারবার ভয়ে বোললাম, বইতো এখনো শেষ হয়নি, এরি মধ্যে অমন নিশ্চিন্ত হোয়োনা। এখনো কাশির বাবা বিশ্বনাথ স্বয়ং বাকি। তিনি চেষ্টা করলে ঠেকানো শক্ত !

তখনকার মতো মান থাকলো বটে, কিন্তু পড়া সাঙ্গ হবার পরে যে তা আর থাকবেনা এও জানতাম। থাকেও নি !

সে যাক্, আমার মুখ থেকে 'লীলাকমলের' আলোচনা তোমার কাছেও হয়ত ঐ রকমই ঠেকবে। তাছাড়া বাইরে থেকে যে একটু শিখবো তারই কি যো আছে ? কেউ বললেন, এমন বই আর হয়নি। এর ভাষা ভাব ছন্দ ছাপা ছবি—অতুলনীয়। নবশক্তি কাগজে আর এক বিশেষজ্ঞ—কে এক লীলাময়[১৩] লিখলেন, এমন বিশ্রী বই আর হয়নি। এর সব খারাপ। এমন কি ঘতীনের[১৪] ছবিটা পর্য্যন্ত তার কলঙ্ক। এবং তিনি হলে এর নাম রাখতেন 'দুর্ভাগী' একটাও ছবি দিতেন না এবং বালির কাগজে ছেপে প্রকাশ করতেন।

এমনি সব সমালোচনার নমুনা ! আমার নিজের কিন্তু সত্যিই খুব ভালো লেগেছে। প্রথম যেদিন তোমার বই এলো, বইয়ের মোড়ক খুলতেই মনে হয়েছিল যেন কোন এক শিক্ষিত, ভদ্র বড়লোকের ঘরে নিমন্ত্রণে এসেছি। ভিতরে ভোজের ব্যবস্থাটি যে খাসা ও পরিপাটি হবে একথা মন যেন আপনি আন্দাজ করে নিলে। তাই বটে। যেমন ভাষা, তেমনি বাঁধুনি, তেমনি প্রকাশভঙ্গী। নিখুঁত বললেও অত্যুক্তি হয়না।

তবু একটা কথা যেন মাঝে মাঝে ছুঁচের মত বেঁধে—সে এই যে, ভাবুকতায় এই কাব্যগ্রন্থখানির এত শোভা এত বর্ণচ্ছটা শব্দবিন্যাসের এমন মাধুর্য্য—কিন্তু কোথাও তাদের বনিয়াদ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হৃদয়ের সম্পর্কে এদের নিবিড়তা নেই। ভালো ত তুমি কখনো কাউকে সত্যিই বাসোনি রাধু। তুমি বলবে—সবাই কি সত্যিই ভালবেসেছে, আর তারপরে কবিতা লিখেছে বড়না ? আমি তার জবাবে বোলবো—যদি না বেসে থাকে সে তার দুর্ভাগ্য ! তার হৃদয়ের ব্যাকুলতা বা কামনাকে দোষী করা যায়না। শুধু দুঃখ করে এইটুকুই বলা যায়—বেচারা সংসারে বঞ্চিত হয়েছে মানুষ পায় নি,—সে ওর দোষ নয়—ভাগ্য।

কিন্তু তোমার ত' তা নয়। সেই লীলাময় লোকটা একটা কথা সত্যি বলেছে যে রাধারাণীর যোগ্য মানুষ দুনিয়ায় নেই, মানুষের প্রতি তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই "জীবনদেবতা"কে উৎসর্গ।

কিন্তু, ও জিনিসটি কি ভাই ? সত্যিই কি কিছু ?

গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি কঠিন তিরস্কারের মত শুধু নিরুদ্দিষ্টকেই নয় পাঠককেও আঘাত করে। সমস্ত বইয়ের

১০। নিরুপমা দেবী।

১১। ভারতবর্ষ-সম্পাদক ভূলধর সেন।

১২। পরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীবিভাবতী দেবী।

১৩। লীলাময় রায় (অমরাবতীর রায়)।

১৪। চিত্রশিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন।

উপর যেন মুখ ভার করে তাকিয়ে আছে মনে হয়! তাই হয়ত লীলাদেবীর বোধ হয়েছে এ গ্রন্থে আনন্দ নেই, আছে শুধু অভিযোগ।

তুমি ভাবো এ জীবনে তোমার মানুষকে ভালোবাসা দুর্নীতি পাপ। তোমাকেও যে কেউ ভালোবাসবে সেও গর্হিত—অপরাধ। কেউ যদি তোমাকে বলে—বড়দা তোমাকে মনে মনে ভয়ানক ভালোবাসে। শুনলে তুমি রাগে ক্ষেপে যাবে। বলবে—কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! কারণ, মনে মনে তুমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে আছো—এ দুনিয়ায় কাউকে নয়! এ সম্বন্ধে মনটা তোমার একটা নিশ্চয়তায় পৌঁছে একেবারে কঠিন হয়ে গেছে। এইখানেই মস্ত তফাৎ। আর এই তফাৎটাই অতিশয়োক্তির আকারে মাঝে মাঝে ধরা দেয় তোমার কবিতায়।

রাধু, একটা কথা মনে পড়লো, যৌবনে এক কালে ফরাসি সাহিত্যের সখ ছিল! আজ প্রাচীন কালে তার কিছুই মনে নেই, সমস্তই ভুলে গেছি শুধু দুটো ছত্র মনে পড়ে—

Ah! l'affreaux esclavaga
Qui detre a soi.

তারটা এই যে একান্ত স্বাধীনতার মত এত বড় দাসত্ব আর নেই!

থাক এ সব কথা। আমার চেয়ে তুমি ঢের বেশি বুদ্ধি ধরো আমি মনে করি।

বইখানিতে না দেখার দোষে অনেকগুলি বানান ভুল হয়ে গেছে। শব্দের মাথায় বড় বেশি নিরর্থক কমার চিহ্ন পড়েছে—যথা বধূ'র, নূতনে'র মাধবী'র এই সব। কবিরা নিরঙ্কুশ বটে, কিন্তু এই দোষগুলো না করাই ভালো, যেমন 'আলোক অমিয় ক্ষরা'। আলোক শব্দটা তো স্ত্রীলিঙ্গ নয়। রবিবাবুর কবিতায় প্রায় কোথাও এসব ভুল পাওয়া যায় না।.....তবুও এসব অতি তুচ্ছ কথা বোন। আজ ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে তোমাকে মস্ত বড় দেখতে পাচ্চি। আমার এ দেখার ভুল হয়নি জেনো।

তুমি আমাকে শিলঙেও নিমন্ত্রণ করেছো বটে, কিন্তু যাই কি কোরে! আমার ত সাহিত্যচর্চ্চা একপ্রকার বন্ধই হয়েছে, কিন্তু আর একটা কাজ জুটেছে যে। দেশের এই অতি দাঙ্গাবাজির সময়ে পালাই কি বলে? চাবড়া জেলার আমি আমার কংগ্রেসের President: কিছুই করিনে তবু থাকতে তো হয়। অথচ যাবার লোভও প্রবল। সাহিত্য-চর্চ্চার অভ্যাসটা আমার প্রায় ছেড়েই গেছে! তোমাদের মত সাহিত্যিকের কাছে এলে আবার যদি তার কিছু অংশও ফিরে পাই তো অনেক লাভ। আমার মতো কুড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখন কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন'[১] ছিলেন। এঁর পরিচয় জানতে চেয়োনা। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সব চেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ণ তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু, এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মত নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয়—ঢের ত' লিখেচি—আর কেন? এ জীবনের ছুটিটা যদি এইদিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে তখন মিয়াদের বাকি দু-চারটে বছর ভোগ করেই নিইনা কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ৎ তলব করেন তো তখন আর একজনকে দেখিয়ে দিতে পারবো এই আমার সান্ত্বনা।

কিন্তু, আর না। রাত অনেক হল; তোমারও অনেক সময় নষ্ট করে দিলাম। এদিকে টের পাচ্চি যে ঘুম চোখে যা লিখে গেলাম তার ছত্রত অসঙ্গতির সীমা নেই। অথচ এ চিঠি ফিরে পড়বারও সাহস নেই—আশঙ্কা আছে তাহলে বোধকরিয়া ছিঁড়ে ফেলে দেবো; আর ছত্রত পাঠানোই হবে না। তাই খামের ভেতর বন্ধ করে দিচ্চি। যদি অন্যায় কোথাও কিছু লিখে ফেলে থাকি বড়দা বলে ক্ষমা কোরো। ইতি—২০শে বৈশাখ ১৩৩৭

তোমার বড়দা

১। জনৈকা মহিলা সাহিত্যিক।

পিতামহ

(পূর্বানুবৃত্তি)

অনেক রাত পর্যন্ত অবন্ধনার সঙ্গে গল্প করলাম। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিলে না সে। 'প্রহেলিকা' কথাটা দিয়েও ঠিক বর্ণনা করা যায় না তাকে। তাকে যে আমি বুঝতে পারছিলাম না একথা ঠিক নয়। সে যে ভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল আমি সে ভাবে বুঝতে চাইছিলাম না। সেদিন তার কাছ থেকে এসে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে হ'ল অস্থিরচিত্ত মন নিয়ে। কোনও অতি-পরিচিত লোকের নাম মনে না পড়লে যে ধরণের অস্বস্তি হয় এ অনেকটা সেই ধরণের অস্বস্তি। অবন্ধনাকে আমি চিনেও চিনতে পারছিলাম না। বুঝতে পারছিলাম সে বদলেছে, নীতিবিদরা যা 'অধঃপতন বলে' অভিহিত করেন তা-ও হয়তো তার ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তবু তার সম্বন্ধে আমি মোহ-মুক্ত হতে পারছি না কেন। তাকে কলঙ্কিতা বলে সন্দেহ হচ্ছে, তার আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা মোটেই ভদ্র নয় কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে সে সত্যিই মন্দ। মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারলে শুধু যে, সুখী হব তা নয় কৃতার্থ হয়ে যাব। এই অনুভূতি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার বিবাহের প্রস্তাব অবন্ধনা বারম্বার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু 'আমার অন্তরের অন্তস্তলে আমি উপলব্ধি করছি অবন্ধনা আমাকে চায়। তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক, নিগূঢ় অভিমানের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অনুভব করছি সে আমাকে চায় বলেই না-চাওয়ার ভান করছে। ওটা ভাণ মাত্র। কিন্তু এ ভাণ কেন? নারীর ছলনা? কিন্তু যে সত্য নির্ণয় করবার জন্যে নারীরা সাধারণত ছলনার আশ্রয় নেয় সে সত্য কি এখনও অজ্ঞাত আছে অবন্ধনার? সে কি জানে না যে আমি তাকেই সারাজীবন চেয়েছি, তাকেই সারাজীবন চাইব? না, কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে। অবন্ধনাকে চিনেও চিনতে পারছি না···"

শিখর সেনের ডায়েরির খানিকটা অংশ লিখিয়া কবি লেখনী-সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবার কি লিখিবেন। ছোট ছোট পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে উড়িয়া গেল। কিছুদূর উড়িয়া গিয়া তাহারা যুবক যুবতীতে রূপান্তরিত হইল; একেবারে আধুনিক যুগের যুবক যুবতী। যুবতীর দিকে চাহিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে রাণী! আমাকে?"

"বেশ, চমৎকার"

"চল একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক। একটা সমস্যা উদয় হয়েছে মনে—"

"চলুন। নদী এখান থেকে কতদূরে?"

"ঠিক জানিনা। খুঁজে দেখি চল। আছেই নিশ্চয় কাছে-পিঠে কোনও নদী···"

উভয়ে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। তাহাদের ঘিরিয়া নৈশ অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। ঘন কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নক্ষত্রকুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, সকরুণ শ্বাপদকুল গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে এই যুগলযাত্রীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ঝিল্লীকণ্ঠে নূতন রাগিনী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, পেচকদম্পতী বিশ্রম্ভালাপ স্থগিত রাখিয়া বিস্ফারিত-নয়নে এই সহসা-আবির্ভূত অপরূপ মানব-দম্পতীকে কি ভাষায় অভিনন্দিত করিবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকদূর হাঁটিয়াও কিন্তু নদীর সন্ধান পাওয়া গেল না। "কই নদীতো দেখতে পাচ্ছি না কোথাও"

"সামনে ওটা কি—"

"প্রকাণ্ড মাঠ একটা"

"মাঠ? ঠিক দেখতে পাচ্ছ তুমি? বড্ড অন্ধকার, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না"

যুবক ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিল। মধ্যগগনে বীণা-মণ্ডলে অভিজিৎ নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। পিতামহের দৃষ্টিপাতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অনন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত এক আলোক-রেখা অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই অন্তরাগত দিব্য নক্ষত্র-আলোকে দেখা গেল প্রান্তরের অপর-প্রান্তে এক খরস্রোতা কল্লোলিনী প্রবাহিত হইতেছে।

"ওই তো নদী! চল ওরই পাড়ে গিয়ে বসা যাক"

বাণী হাসিয়া বলিল, "এত কাছে যে নদী ছিল তা' তো বুঝতে পারি নি—"

"মনুষ্যের রূপ ধারণ করেছি কি না, বুদ্ধিটা তাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে আলো না এলে অধিকাংশ ব্যাপারই বোঝা যাবে না এখন"

"ওই নদীটা এখানে ছিল অথচ আমরা বুঝতে পারি নি?"

"ছিল কি ছিল না এ সবই আপেক্ষিক কাণ্ড। ওর মধ্যে ঢুকো না। যখন নদী পাওয়া গেছে, চল ওর পাড়ে গিয়ে বসা যাক, আর যে কথাটা মনে হয়েছে তাই নিয়ে একটু সময় কাটানো যাক। যারা অমর তাদের কাছে সময় কাটানোটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে কি না—"

পিতামহ ও বাণী নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল নদীতীরে একটি সুদৃশ্য মর্ম্মর-বেদীও রহিয়াছে। বেদীর উপর উভয়ে উপবেশন করিলেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নদীর তরঙ্গ মালায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাণী প্রশ্ন করিলেন—"কি আলোচনা করবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন"

"যে কাণ্ডটা করলাম সেটা তোমার ভাল লাগল কিনা"

"লাগল বই কি"

"এটা কিন্তু সেকেলে রূপকথার কাণ্ড। এর তুলনায় ভবিষ্যযুগের কবি যা লিখে যাচ্ছে সেটা খুব খেলো হচ্ছে না?

"আপনিই তো তাকে লেখাচ্ছেন—"

"তা লেখাচ্ছি কিন্তু লিখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি না। সত্যি সত্যি যা ঘটে সেইটেই ঘুনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কি? দুটো ছোঁড়া প্রেমে পড়ে ছটফট করে মরছে আর কাতরাচ্ছে এই ঘটনাটা হুবহু নকল করে' দেওয়াটা কি সৃষ্টির পর্য্যায়ে যাবে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আমি যখন কেঁচো কৃমি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলাম তখনও তাতে অনন্যতা ছিল, ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাতে। আমার কালকূটের কল্পনাটাও নিতান্ত খারাপ হয়নি। নিজের স্ত্রীর জিবের উপর দিয়ে হেটে যাচ্ছে লোকটা প্রণয়িনীর সন্ধানে—আঁ কি বল!

বাণী মৃদুকি হাসিয়া বলিলেন, "এরাও অনন্য। এদের ছোড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকায় দূরবীন কিনে আলেয়াকে দেখছে যে কমল-কিশোর সে-ও কম নয়"

পিতামহ সহসা খুশী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি ঝলমল করিতে লাগিল।

"তোমার ভাল লেগেছে কমল কিশোরকে?"

"লেগেছে। শিখর সেনকেও লেগেছে। তবে ওকে পুলিসের গুপ্তচর করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। ভবিষ্য যুগের চার্ব্বাক আঁকবার কথা ছিল—"

"আমার মনে হল সন্দিগ্ধচিত্ত চার্ব্বাকরাই ভবিষ্যৎ যুগে পুলিসের গুপ্তচর হবে"

"ও তাই বুঝি—"

"দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা। কিন্তু সে যাই হোক, গল্পটা তোমার ভাল লাগছে কি না বল। আমার নিজের কেমন পানসে পানসে ঠেকছে। এটার চেয়ে চার্ব্বাকের গল্পটা যেন বেশী জমাট হয়েছে"

"কেন ওতে বনজঙ্গল, সিংহ এই সব আছে বলে'? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি শিখর সেনের চার দিকেও বনজঙ্গল সিংহ আমদানী করেছেন। জঙ্গলটা অবশ্য মানুষের জঙ্গল আর সিংহটাও মনুষ্যরূপী সিংহ—"

"বাঃ ঠিক ধরে' ফেলেছ তো—"

সহসা যুবক-রূপী পিতামহ যুবতী বাণীকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। নদীর তরঙ্গকুলও নাচিতে লাগিল। বাণী লক্ষ্য করিলেন অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরী আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নয়নে মাণিক্য-দ্যুতি,

গ্রীবাদেশে লীলার সৌন্দর্য্য, পক্ষদ্বয়ে মুক্তা-মালা এবং প্রসারিত পুচ্ছমণ্ডলে অসংখ্য পান্না প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত পক্ষী বাণী আর কখনও দেখেন নাই।

"ময়ূর তো রাত্রে নাচে না! এমন ময়ূরও তো দেখিনি কখনও"

একটি ময়ূরই উত্তর দিল, "আমরা রাতের ময়ূর, রাতেই নাচি"

"কোথায় থাক তোমরা"

"কোথায় থাকি জানি না ঠিক। হয়তো তোমার মনেই আছি"

"কবিতার কথা কও না কি তোমরা"

ময়ূরের দল ইহার কোন উত্তর দিল না, মুচকি হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বাণীও নৃত্যপরা হইলেন। চরাচর নৃত্যময় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন—"চল এবার কবির কাছে যাওয়া যাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছে"

আবার দুইটি পতঙ্গ কবির বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত ইলেকট্রিক বাতির সুদৃশ্য ডোমের উপর উপবেশন করিল। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দুইটির আগমন বা নির্গমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। পতঙ্গ দুইটি আসিয়া বসিবার পর পুনরায় তাঁহার মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, পুনরায় তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এরকম লুকোচুরি কতদিন চলেছিল তা বলা শক্ত। কারণ শিখর সেনের ডায়েরিতে অবন্ধনার কথা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ নেই। আছে সেই কালো-বাজারীটার কথা যার খোঁজে এই বোর্ডিংএ এসে সে বাসা বেঁধেছিল। একদিনের ডায়েরিতে দেখছি এই বিশেষ বোর্ডিংটাতে কালোবাজারীটার আকর্ষণ কোথায় তা সে আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে' স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

শিখর লিখছে—'এমন একটা ঘটনা ঘটেছে আজ আমার জীবনে যা হয়তো আমার জীবনের গতিকেই পরিবর্ত্তিত করে' দেবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা আর কখনও এমনভাবে বিচলিত হয় নি। যে লোকটার জন্যে এই বোর্ডিংএ এসে বাসা বেঁধেছি সে লোকটাকে এই বোর্ডিংএ ঢুকতে এবং বেরুতে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কেন সে আসে এখানে তা নির্ণয় করতে পারি নি। এ বিষয়ে কাউকে প্রশ্ন করতেও ভরসা পাই নি, পাছে কেউ আমাকে পুলিশের লোক বলে' সন্দেহ করে। দোতলার একটা ঘরে গণেশবাবু নামে একজন দালাল আছেন, আমার সন্দেহ ছিল তার সঙ্গেই হয়তো কোন রকম যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু স্বচক্ষে কোনও দিন তার ঘর থেকে তাকে বেরুতে দেখি নি, তার ঘরে ঢুকতেও দেখি নি। এইটে স্বচক্ষে দেখবার জন্যে অনেক সময় আমি সমস্ত দিন কোথাও যাই নি, কিন্তু সেদিন সে আসেই নি বোর্ডিংএ। এই ভাবেই চলছিল। আশা ছিল একদিন না একদিন তাকে হাতে-নাতে ধরবই। আজ সন্ধ্যের একটু আগে সিঁড়ি দিয়ে নামছি এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সেই লোকটারই সঙ্গে। সে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া নিয়ে উপরে উঠছিল। আমি তাকে দেখিয়ে গট গট করে নেমে গেলাম বটে কিন্তু সে উঠে যেতেই তৎক্ষণাৎ ফিরলাম। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন ঘরে সে ঢুকছে। যা দেখলাম তাতে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। দেখলাম লোকটা অবন্ধনার ঘরে ঢুকল! ফুলের তোড়া নিয়ে অবন্ধনার ঘরে ঢোকার মানে? কি করব ভাবছি এমন সময় অবন্ধনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

"কোথা যাচ্ছ এমন অসময়ে"—জিজ্ঞাসা করতে হল।

"'ফলে' বেরুচ্ছি। আমাদের আবার সময়-অসময় আছে না কি—"

মুচকি হেসে সপ্রতিভ ভাবে নেমে গেল।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দামী একটা মোটরকারও দাঁড়িয়ে আছে নীচে। অবন্ধনাকে নিয়ে লোকটা মোটরে চড়ল। আমিও দ্রুতবেগে নেমে এলাম নীচে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিটাকে বললাম ওই মোটরটাকে অনুসরণ করতে।

...অবন্ধনা সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেছি তা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তা লিখতেও ভয় করছে। অবন্ধনা না হয়ে যদি অন্য কেউ হ'ত তাহলে আজই তাকে

এগারোটা করতাম। যে সব পদস্থ গভর্ণমেণ্ট অফিসার অর্থের বশীভূত নয় কামের বশীভূত, ওই কালোবাজারীটা অবন্ধনাকে কাছে লাগাচ্ছে তাদের ভোলাবার জন্যে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, অথচ আমি বেঁচে আছি—"

এইভাবে আরও কয়েক পাতা লিখেছে শিখর। অবান্তর বোধে সবটা আর উদ্ধৃত করলাম না। ঠিক এর পরের তারিখে কিন্তু আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে শিখর যে এ কাহিনীর পক্ষে মোটেই অবান্তর নয়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

শিখর লিখছে—'ছেলেবেলায় আমি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতাম। উঠে বেড়িয়ে বেড়াতাম বাড়ির সামনের বাগানটায়। রাতে কুঁড়ি কি করে' ফুল হয় তা জানবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার। আশ্চর্য্য লাগত সন্ধ্যেবেলার ছোট্ট কুঁড়ি কয়েক ঘণ্টায় কি করে' পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে যায়! ঘুমের ঘোরে উঠে দেখতে যেতাম তাই। আমার মা অনেকদিন আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায়। অনেক সময় খাটের সঙ্গে হাত-পা-ও বেঁধে দিতেন। ডাক্তাররা বলেন ওটা নাকি একপ্রকার অসুখ। অনেক দিন এরকম আর হয় নি। বোর্ডিংয়ের চাকরটা কিন্তু কাল রাত্রে সিঁড়ি থেকে আমাকে ধরে' এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল, আমি না কি ঘুমের ঘোরে সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাচ্ছিলাম। অন্তর-নিহিত প্রবল কৌতূহল ছেলেবেলায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত। কাল কোন কৌতূহলের টানে উঠেছিলাম? সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছিলাম? অবন্ধনার ঘরের দিকে না কি—!"

ডায়েরির এই অংশটা পড়ে মনে হচ্ছে আজ শিখরের মতো আমারও যদি ওই অসুখটা থাকত। স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে সত্যিই যদি যেতে পারতাম আলেয়ার কাছে। আজ বিকেলে আলেয়া জানলার গরাদে ধরে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। কি ভাবছিল? মনে করতে ইচ্ছে করে যে আমার কথাই ভাবছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সত্যটা কি করে' জানি না প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ও আমার কথা ভাবছিল না···

প্রথম পতঙ্গ চুপি চুপি দ্বিতীয় পতঙ্গকে বলিল, "চল, চার্ব্বাক-সুরভমার খবরটা নেওয়া যাক এবার। এদের ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগছে না আর—"

"চলুন—"

পুনরায় পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ধ্রুবতারা

শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ

নীলাকাশ ভেদি ঘোর রজনীতে
চেয়ে আছে ওগো ধ্রুবতারা!
তোমার নয়ন জেগে রয় চির
পাছে হই প্রিয় পথ হারা।
তোমার স্বপনে পেয়েছি যে ঠাঁই,
যখনি চেয়েছি তুমি ভুল নাই,
নিকট হয়েছে সীমাহীন দূর
অন্তরে ঝরে প্রীতি ধারা।

দেখেছি যে আমি তোমার নয়নে,
চির জনমের চেয়ে থাকা!
কোন ষোড়শীর নয়ন মণিতে
বিরহ ব্যাকুল ছবি আঁকা।
শুধু চেয়ে থাকা পলক বিহীন,
মিলন সে চির বিরহে বিলীন,
নয়নের দিঠি নয়নে হারিয়া
নীরব ভাষায় ডেকে সারা।

বাংলায় শান্তি-আন্দোলনের ধারা

নরেন্দ্র দেব

বাংলা দেশে আর একবার শান্তি সম্মেলন হয়ে গেল।

বলা বাহুল্য যে শান্তি-আন্দোলন আজ কেবল বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ আন্দোলন বিশ্বব্যাপী। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এই আন্দোলন ও আনুষঙ্গিক সম্মেলন পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলিকে যথার্থ শান্তির দিকে এগিয়ে নিতে পেরেছে কতটুকু?

বছর দুই তিন আগে আমার প্রতিবেশী কয়েকজন তরুণ সাম্যবাদী বন্ধু যেদিন এসে আমাকে অনুরোধ করলেন বালিগঞ্জ আঞ্চলিক শান্তি কমিটির সভাপতিপদ গ্রহণের জন্য; আমি কিন্তু দ্বিধায় তা' গ্রহণ করি। আমি খুশী হয়ে উঠি এই ভেবে যে—যাক্, এঁরা তাহলে এঁদের হিংসা ও তাণ্ডবের নীতি ভুলে এখন থেকে শান্তির স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে সৃষ্টির কাজে লেগে যাবেন।

কিন্তু, বেগা যাচ্ছে তা' এঁরা জানেন নি। এঁদের তাণ্ডবের কালই আজও শেষ হয় নি! গড়ার কাজ কবে শুরু করবেন জানি না। সংসারে দেখেছি ভাঙে একদল, কিন্তু গড়ে আর একদল। রাশিয়ায় কিন্তু যাঁরাই ভেঙেছিলেন জারের রাজ তাঁরাই গড়েছেন সোভিয়েট রাষ্ট্র। মধ্যপন্থীদের দ্বারা কিছু হয় না জানি। তাঁরা সবাই 'স্ট্যাটাস্‌কো'র ভক্ত। কোনও কিছুর শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনেও তাঁরা নারাজ! দীর্ঘ প্রচলিত অন্যায়ের সংশোধন করা প্রয়োজন বুঝেও তাঁরা সে কাজে অগ্রসর হতে ভয় পান। লোকে তাঁদের 'অতি সাবধানী' বলে বিদ্রূপ করে।

আমি কমিউনিস্ট মূল মতবাদের বিরোধী নই। ভারতবর্ষেই শ্রীভগবান গৌতম বুদ্ধ একদা সাম্যবাদ শুধু প্রচারই করেন নি, প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। আদর্শের দিক থেকে মানব সমাজে সাম্যবাদকে শ্রেষ্ঠ বলেই মনে করি। মহাত্মা গান্ধীও সাম্যবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যদি অবিলম্বে সোভিয়েট রাশিয়া বা নব্য-চীনের সমকক্ষ হ'তে উঠতে পারে, কে না স্বীকার করবে সেটা ভারতের সৌভাগ্যের কথা বলে? কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যে উপায়ে ও যে ধারায় সেদিকে অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করছেন সেটাকে কল্যাণের পথ বলে কেন নিতে পারা যায় না। What is sauce for the goose is not always the sauce for the gander. ভারতবর্ষের আত্মার সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাণপুরুষের মতি একই ছন্দানুবর্তী নয়।

যেদিন বালিগঞ্জ আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনের প্রথম সভা শেষ ক'রে ফিরি, আমার কমিউনিস্ট-বিরোধী বন্ধুরা, আমার বুকে শান্তির পায়রা আঁকা সুনীল একটি প্রতীক আঁটা দেখে চমকে উঠে বেশ উত্তেজিত হ'য়েই বললেন—"এঃ! শেষে কমিউনিস্টদের তাঁওতায় ভুলে শান্তির পল্লবে পড়ে কমরেডদের দলে ভীড়ে গেলেন দাদা?"

এঁদের অভিযোগের এই বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সেদিন সত্যিই মনে হয়েছিল। তবে কিনা, ঠিক যেমন যেশোদা কীর্তনে সাহেব আজ বলেছেন—"শান্তি আন্দোলনকে কেবলমাত্র কমিউনিস্ট আন্দোলন বলে মনে করলে ভুল করা হবে। শান্তি আন্দোলন সারা পৃথিবীর সকল মানুষের আন্দোলন" তেমনি করেই আমি সেদিন আমার কষ্ট বন্ধুদের প্রশ্নবাণের উত্তরে বলেছিলুম "বিভিন্ন রাজনৈতিক তাঁবুর কোনোটাতেই আমার ছায়াটুকুও পড়ে নি আজও। কারণ, আমার ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি নয়। দেশে যুদ্ধ চলতে থাকলে দেশবাসীর যে সর্বাঙ্গীন ক্ষতি হয়, তাতে সাহিত্যই আঘাত পায় সকলের চেয়ে বেশি! সাহিত্যের স্ফূর্তি শান্তির মধ্যেই। সভ্যতার প্রথম দিবালগ্ন থেকেই শান্তি মানুষের কাম্য। মানুষের সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে, ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে প্রথম অশান্তি নিয়ে আসে এই যুদ্ধ-বিগ্রহ। তার সাজানো সংসার ওলোট-পালট ক'রে দিয়ে যায়। অতএব, যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল কণ্ঠ নিয়ে দাঁড়ানো আমি প্রত্যেক সভ্য মানুষের অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি।

শান্তি আন্দোলন কারা পরিচালনা করছেন? তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদটা কি? এই আন্দোলনের পশ্চাতে তাঁদের আসল কি উদ্দেশ্য লুকানো আছে? এসব জানবার সেদিন কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনি। এঁরা শান্তি চান। আমিও শান্তি চাই। যথার্থই এঁরা মনে মনে শান্তি চান কিনা সে খবর আমি সেদিন জানবার কোনো চেষ্টাই করিনি। মনের খবর মনের মানুষই কি পায়? তবে, বুঝে তো এঁরা শান্তির আওয়াজ তুলছেন খুব জোর! দেখতেও পাচ্ছি বেশ একটা বিরাট বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন। সুতরাং আমাদের মতো যাঁরা নির্বলীয় এবং শান্তিকামী, তাঁরা এই বহু আকাঙ্ক্ষিত-শান্তির মাটিস্পর্শে উঠে এসে শান্তিবাদী ও শান্তিপ্রচারক সৈনিকদের সঙ্গে হাত মেলাবেন না কেন? এখানে তো কমিউনিস্টদের খপ্পরে পড়ে যাওয়া বা তাঁদের দলে ভিড়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না! হ'লই বা এ শান্তি-আন্দোলন কমিউনিস্টদের একটা আন্তরজাতিক সুচতুর প্রচেষ্টা যা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য আরও কিছুদিন সময় হরণের কৌশলমাত্র! তাতে ক্ষতি কি? শান্তির আন্দোলনটাকে তো আর কেউ যুক্তির দ্বারা আপত্তি-জনক বলে প্রমাণ করা যায় না! ঐ আন্দোলন আজ দেশের যে কোনও দল বা সম্প্রদায় শুরু করতেন পৃথিবীর শান্তিকামীরা বিনা দ্বিধায় তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন। কেন না, এই একটিমাত্র ক্ষেত্রেই এখনও অবশিষ্ট আছে যেখানে সকল দলেরই ভিন্ন মতাবলম্বী নরনারী আজও একত্রে মিলতে পারে। চলতে পারে একই পথে, বিশেষতঃ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যদি তাদের এক হয় এবং সে লক্ষ্য যদি মহৎ হয়।

কিন্তু, বেকনার সঙ্গেই স্বীকার করি, যে এঁদের শান্তি আন্দোলনের দ্বারা কোন কালেই হয়তো হয়ে পড়ছি। বিশ্ব-শান্তি-সম্মেলনে ভারতের নাম প্রেরণের প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে এক মহা অশান্তি ভোগ করতে হয় এঁদের। প্রথমতঃ প্রতিনিধিদের যাতায়াতের ভাড়ার টাকা সংগ্রহ নিয়ে অশান্তি। তারপর তাঁদের পাসপোর্ট ও ভিসা সংগ্রহ করায় অশান্তি। তারপর প্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে অশান্তি, এবং সবশেষে আর্থিক অশান্তি হ'ল শান্তি-সৈনিকেরা প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রচুর অশান্তির বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ ক'রেছেন যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন মহানায়ক ব্যক্তিদের বিশ্ব-শান্তি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি লণ্ডিত পাকড়াশী পাশে ও কল্পিত ডাঁকে দিয়ে বিমানে ডাকা ক'রে নেন, তাঁরা যখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তুচ্ছ কোনও ত্রুটির অনুহাতে অকুণ্ঠ স্বরে বিশ্বশান্তির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে বসেন!

বিস্ময়কর কথাটা শুনে কেউ যেন বিস্মিত হবেন না! মনে হতে পারে হয়তো—তাহলে আবার শান্তির বিপক্ষে কে? কিন্তু সংসারের পথে তেমন নয়, রাষ্ট্রের পক্ষে হয়ত যেটা সত্য না হ'তেও পারে। 'শান্তি' শব্দটার কোন্ কোন্ শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী আর কোন কোন শ্রেণীর বা স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল, আশা করি এটুকু বলবার আগে আর কোনও চতুরমুখ ব্যক্তির বাকি নেই। এ সংবাদ আর নতুন ক'রে দিতে হবে এই শান্তি আন্দোলনের স্রষ্টা ও পরিচালক রূপে যারা বিশ্বমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট বন্ধুরা এর প্রতিবাদে হয়তো সবসময়ে 'না-না' করবেন না কেন, সে অস্বীকার আগে আর কারুর কাছেই গ্রাহ্য হবে না।

কেন, তা বলছি।

এর অনেকগুলি কারণ এবং প্রমাণ আছে। কারণ হ'ল, শান্তির নামে সোভিয়েট মতবাদ যে ভাবে দেশে দেশে রাষ্ট্রিয়ের ছিদ্রপথে নিঃশব্দে প্রবেশ ক'রে, অভাব ও অসন্তুষ্টি জনসাধারণের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার ক'রে তাদের সহায়েই কমিউনিস্ট মতাবলম্বী ও গণবাহিনী ক'রে তোলে, একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধলে তাতে প্রবল বাধা উপস্থিত হয়। কারণ, সবাই তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনও না কোনও কাজ পায়। বেশ ভালই উপার্জন করে! বেকার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই, দল বৃদ্ধির আজগুবি বাধা পায়। শুধু তাই নয়, দেশে দেশে এঁরা যে অরাজক বিপ্লব, সামাজিক অসন্তোষ, ধনাগার লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টা বাধিয়ে 'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক' বলে আওয়াজ তোলেন, বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ও অশান্তি সৃষ্টিতে উৎসাহ যেন আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গ ক'রে লাঠি বা গুলি না-চলা পর্যন্ত নিরস্ত হন না, তৃতীয় মহাযুদ্ধ বাধলে এসব কাজ-কারবার তাঁদের বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় কারণের জন্য আমাদের একটু ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন চান যাঁরা, যাঁরা ধনসাম্য ও জনসাম্যের প্রচারক, সেই সব অধিকারবাদীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবাত্মক পন্থাতে রুশরাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন কোনো রকম 'মেক-আপ' বা ছদ্মবেশ না-করে। লাল ঝাণ্ডার ভেতর তাঁর ডাণ্ডাটাই ছিল তাঁদের কাছে সেদিন বেশি দামী। তাঁরা বুঝেছিলেন রাতারাতি একটা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ওলোট-পালোট করতে হলে সেনাবাহিনী হবে প্রধান অবিষ্যৎ। প্রয়োজন বোধে তাঁরা লোক বিপ্লবের মাথায় হাতুড়ি মারতে বা গলায় কাস্তে চালাতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। পাইকারি হত্যাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল অবাধে। অহিংসার ইউটোপিয়া তাঁদের মধ্যে ছিল না। দেশের পুঁজিপতি বড় বড় ধনী মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের প্রতিও আমাদের সদাশয় কংগ্রেস সরকারের মতো কোনো স্নেহ মমতা বা দুর্বলতা কখনো প্রকাশ করেন নি। 'কুলুক' সম্বন্ধে তাঁদের 'কোমল' শ্রেণির বুজরুকী ছিল না। ছুইশ্লিংসের প্রতি তাঁরা ছিলেন চূড়ান্ত নির্দয়! সেদিন আমরা সবিস্ময়ে দেখেছি, বিশ্বসংসারে 'একঘরে' হয়েও পৃথিবীর একজোটের বিরুদ্ধে তাঁরা বেপরোয়ার মতই বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেদিন লোকে বলশেভিকদের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতাকে ভয়ও করেছে, শ্রদ্ধাও করেছে।

তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। শেষ হ'ল হিটলারের পতনে ও স্ট্যালীনের জয় জয়কারে। কিন্তু শান্তি এলো না পৃথিবীতে। হিটলার-বধ অবশ্য সকলে একত্র হ'লেও মার্কিণ ও পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ছিল সোভিয়েট-রাশিয়ার আদর্শগত বিপুল বিরোধ। রুশের দাম্যবাদ আন্দোলন পাছে এঁদের ঘরে ঢুকে প'ড়ে নিয়ে আসে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অশান্তি, এই আশঙ্কায় এঁরা একজোট হ'য়ে রুশের বিরুদ্ধে আক্রমণের নাম করে রুশ কণ্টক নির্মূল করবার জন্য প্রস্তুত হ'তে শুরু করলেন। রাশিয়া সে আয়োজন দেখে প্রমাদ গণলেন। তাঁরাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ ক'রে আর হাঁফ ছাড়বার অবসর পেলেন না। চলতে লাগলো এঁদের আত্মরক্ষা। শুরু হল স্নায়ুযুদ্ধ। তারপর হঠাৎ দেখা গেল অন্যের রঙ্গমঞ্চে আচম্বিতে এক পট-পরিবর্তন। পোল্যাণ্ড, ইউক্রাইন, পূর্ব-জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, রুমানিয়া বুলোগারিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশগুলি নাজী ও ফ্যাসিষ্ট কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে ইতোপূর্বেই সোভিয়েট প্রেনাগিলনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। হঠাৎ মার্শাল টিটো দল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সোভিয়েট রাশিয়া প্রমাদ গণলেন। এবার তিনি দেখা দিলেন শান্তির পারাবত কোলে নিয়ে শান্তির অলিভশাখা মাথায় জড়িয়ে শান্তি-সৈনিকের বৈরিক বেশে! লোকে অকস্মাৎ তাঁদের এই ভোল ফেরাতে দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেল! এই সেদিনের সেই যুদ্ধবাজ বিরাটবক্ষ শক্তশালি সৈনিকের দল সহসা বিভীষণ-পুত্র তরণীসেনের মতো সর্বাঙ্গে হরিনাম লিখে এসে দাঁড়ালেন খাটে শান্তির খঞ্জনি হাতে, কিন্তু বৈরকী বিক্রম নিয়ে নয়, দাবীর দুর্বার দম্ভ নিয়ে।

আজ তাঁরা অস্ত্র সংবরণের জন্য দাবি জানাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা 'এ্যাটম বোম' ব্যবহার জীবাণু যুদ্ধের ন্যায় নিষিদ্ধ করতে চাইছেন। পশ্চিমী শক্তিবর্গের ভোট বাধার আপত্তি করেছেন। অন্যথায় আত্মরক্ষা-সংহতি ভেঙে দিতে বলেছেন। এ সব প্রচেষ্টা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মতে দুর্বলতা প্রসূত। সোভিয়েট রাশিয়া বোধ করি গত মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাত এখনও সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেন নি। তাই কেবলমাত্র পৃথিবীব্যাপী 'শান্তি-আন্দোলনের' উপরই নির্ভর ক'রে তাঁরা

নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না। বিশ্বের নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য এক বিশ্বব্যাপী নারী-আন্দোলনও গড়ে তুলেছেন। ছাত্রদের শিক্ষকদের কলাকৌশলের জন্যও পৃথিবী জুড়ে এক শিক্ষকরা আন্দোলন চালাচ্ছেন। বিশ্বের যুব সমাজের জন্যও বছর বছর বিরাট যুব উৎসবের বিপুল আয়োজন করছেন। আর, সেই সব সম্মেলনেই ঘুরে ফিরে এই একই প্রস্তাব কানে আসছে—"আমরা শান্তি চাই। আমরা যুদ্ধ চাই না।"

আমাদের বাংলার কমিউনিস্ট কমরেড তাঁরা মেসি মস্কোর ওস্তাদের হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুলের মতো নয়ন ও বক্ষোদেশের রঞ্জনকে নেবে বুড়া নাড়া করছেন। আমরা ভারতের কমিউনিস্ট হেড্ কোয়ার্টারের খবর জানি না। শুনতে পাই, মস্কোর নির্দেশ আসে তাঁদের উপর এবং তাঁদের কাছ থেকে আবার বাংলা বেশ পান তাঁদের কর্মসূচী। এমনি করেই দেশ-প্রদেশ, গেঁয়ো-গ্রাম ও বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে পৃথিবীর কমিউনিস্টদের মধ্যে মস্কোর মাকড়সার জাল। বাংলাদেশে একটু অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দেখলে তিন শ্রেণীর কমিউনিস্ট চোখে পড়বে। একদল খুব উচ্চ শিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী এবং মার্ক্স এঙ্গেলস্ প্রভৃতির সাম্যবাদ তত্ত্বের অথরিটি বা বিশেষজ্ঞ। এঁরা ঠীক বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল ব্যক্তি। এঁরা প্রায়ই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আর এক দল এঁদের সঙ্গে থাকেন যাঁরা—অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা। হয় বেকার, নয় কেরাণীগিরি প্রভৃতি সামান্য কিছু কাজ করেন। এঁরা মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ প্রভৃতির নাম শুনেছেন। পড়বারও চেষ্টা করেছেন কিন্তু হজম করতে পারেন নি। লেনিন ও স্ট্যালিনকে দেবতা বা 'পিতা' বলে জানেন, আর, 'দাদা'রা যা বলেন তাই বেদবাক্য বলে মেনে নেন। এঁরা দুই দলই বাংলার অভাবগ্রস্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় দল হলেন—যাঁরা দেহজীবি সম্প্রদায়। এঁরা চলেন ঘ ও কলকারখানা ও ক্ষেত খামারের চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের ইঙ্গিতে। এই চৌধুরী, সর্দার আর মোড়লদের আবার পরিচালিত করেন দ্বিতীয় দলের বিদ্যাভিমান যাদুরা, যাঁরা এঁদের বস্তিতে যান, এঁদের সঙ্গে বিড়ি খান, তাস খেলেন, আবার ক্লাশ খোলেন লোক শিক্ষার, সভা করেন বক্তৃতা শোনাবার। অভিনয় ও গানের আসর বসান চিত্তরঞ্জনের প্রচেষ্টায়। মিছিল করেন মাথা উঁচিয়ে, শ্লোগান দিয়ে এদের নিরানন্দ জীবনের মধ্যে একটু উত্তেজনার আবেগ সঞ্চার করেন। এ ছাড়া আরও অনেক কাজ এঁরা করেন সংবাদপত্রে আমরা প্রায়ই যার পরিচয় পাই। যেমন কলকারখানা, বাজে, অফিস, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে ধর্মঘট, টাইটার্স ডিগ্রিং ও পরিষদ গৃহ অবরোধ, মুখ্যমন্ত্রীর বাসস্থান ঘেরাও, ওয়েলিংটন স্কোয়ার ও ময়দানের তলায় বিরাট সভা, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দাবী। অল্পবিত্ত শিক্ষক-সম্প্রদায়ের প্রতি রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগের অবিচারের প্রতিবাদ। বাংলার উপবাসী কেরাণী ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের দাবীদাওয়া। ছাড়াটে ও বাড়িওয়ালার দ্বন্দ্ব, এবং সম্প্রতি ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র, কিছুই এঁরা বাদ দেন না। মোট কথা সরকারকে বিব্রত করবার কোনও সুযোগই এঁরা ছাড়েন না। এঁদের মধ্যে দায়িত্ব এঁদের কমেই অসংখ্য হয়ে উঠছে অথচ কর্মীর সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। যাঁরা নতুন এসে দলে ভিড়ছেন তাঁরা খাটতে রাজি নন নাম করেন, এলেই তা কৃতার্থ করছেন! তাইতেই দিন দিন নানা রাষ্ট্রের চাপে দিনদিন হেরে যাচ্ছে সেই আদি ও অকৃত্রিম পুরাতন কর্মীর দলকেই! ভাগ্যে এঁদের কোনও গঠনমূলক কর্মসূচী নেই, তাই রক্ষে! নইলে এঁরা মুস্কিলে পড়তেন!

প্রতি বছর শান্তি সম্মেলনের সভায় গিয়ে দেখি সেই একই সব চেনা মুখ, যাঁরা একদিন বীরদর্পে ঘোষণা করেছিলেন "চার্চিলকে রুখতে হবে।" সেই সব পরিচিত কণ্ঠেই আজ আবার ধ্বনিত হচ্ছে "আমিন যুদ্ধবাজকে রুখতে হবে। গত নির্বাচনে ভোটের বহর এঁদেরই রাজপথে ঘুরতে দেখেছি "কংগ্রেস মুর্দাবাদ" বলে। এঁরাই আওয়াজ তুলেছিলেন "চাচা যার চাষ তার।" রাষ্ট্রপরিষদের নিয়ে এঁরাই আবার দেখি এক নতুন ধ্বনি দিয়ে "জনতার পরিষদ মানতে হবে।" ইতিমধ্যে যেখানেই

গুলোকে কেন্দ্রিয়ে নিয়ে বেড়ান এই বলে "পুলিশ যুদ্ধ মানতে না।" আবার এঁরাই যখন আর এক সভায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেন "আমরা শান্তি চাই।" বলে—তখন, সে আওয়াজের মধ্যে আর যাই থাক, কোন আন্তরিকতার সুর খুঁজে পাওয়া যায় না! সে ধ্বনি চাঁদে ওঠে কলের গানের কৃত্রিম আওয়াজের মতো।

এঁরা বলেন "যুদ্ধ আমরা চাই না। কেননা, যুদ্ধে যে মূল্যবান জীবন অকালে ঝরে পড়ে। কত গৃহ শ্মশান হয়। কত ধনীর পুত্র হীন হয়। কত স্ত্রীলোক স্বামীকে হারায়, ভাইকে হারায়, বন্ধুকে হারায়! কত শিশু অনাথ হয়ে পড়ে! কত দেশ ধ্বংস হয়ে যায়! কত রাজা নিঃস্ব হয়ে পড়ে! ইত্যাদি। কিন্তু, এই 'হাম-লোগ' তো এঁদের মুখে শোনা যায় না, যখন এঁরা শ্রেণী-সংগ্রামের দুন্দুভির উদ্দামি দিয়ে দেশে দেশে ও রাষ্ট্রবিপ্লব সংগঠনে ব্রতী হন! তার পরিণামও তো একই! তেলেঙ্গানায় যা ঘটে গেল, মালয় বা ভিয়েৎনামে যা হচ্ছে, কোরিয়ায় তো তারই রূপান্তরিত প্রকাশ হয়েছে মাত্র!

সব দেশেই দেখা যাচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্তারাই এই শান্তি আন্দোলনের জন্য অর্থ ও ছলের সাহায্য থেকে শুরু ক'রে এর প্রস্তুতি, প্রস্তাব, অধিবেশন, আলোচনা, মাঠ, প্রচার, পাণ্ডেল, প্রতিনিধি, পরিচালক প্রভৃতি সব কিছু কঠিন ধাতাই নিঃশব্দে ও অকাতরে সামলাচ্ছেন। এঁদের প্রত্যেকটি কে শোভনীয় অর্থাভাব দেখা যায়, সেদেশে কিন্তু আশ্চর্যভাবে তা মিটে যাচ্ছে! যে যে দেশ সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত এবং এংলো-আমেরিকানদের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রেখে শান্তি আন্দোলন করতে গিয়ে একাধিকবার ব্যর্থ হ'তে হয়েছে। কিন্তু, যে সব দেশ সোভিয়েট আদর্শে অনুপ্রাণিত বা সোভিয়েট প্রভাবের মুক্ত সেখানে শান্তিসম্মেলন ক'রে সাফল্য ও সার্থকতার ছবিটি তুলবার কাজে আদর্শ পূর্বক আত্মপ্রসাদ লাভেরও সুযোগ পাওয়া গেছে।

ভারতে শান্তিস্থাপনের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আমার মতো নিরীহ ও অরাজনৈতিক কেউ কেউ এই শান্তি আন্দোলনে যোগ দিতে এসেছেন। তবে সাধারণ ভাবে মুষ্টিমেয়। নৈরাজ্যের চালায় সাজানো দু'একটি ডিনির ভেরা সম্মেলনের মতো! কিন্তু, মজা হচ্ছে এই, যে, প্রত্যেকেই এই কথাটাকে সর্বদাই খুব উঁচু করে ধ'রে রেখেছেন যে, এই দেশ, আমাদের এই শান্তি আন্দোলনে এমন সব লোকও রয়েছেন যাঁরা কিছুর রাজনৈতিক মতের ধার ধারেন অথবা একেবারেই বিরোধী! কমিউনিষ্ট শান্তি-আন্দোলনের সবচেয়ে লজ্জার ব্যাপার হ'ল এর বিরুদ্ধে জনমত এই সম্মেলনীয়ের ধারণার হয়েছেন! 'শো-বয়' যাকে ক'রে 'শো-বোট' বেরোনো যায় ঘাটে ঘাটে ভিড়িয়ে। সে বোট কিন্তু কোনও এলাকেই প্রয়োজনীয় মাল পৌঁছে দিতে পারে না। They can not deliver the goods! এই যে প্রায় গত পাঁচ বছর ধরে 'শান্তি' 'শান্তি' বলে এত আওয়াজ তোলা হ'ল, শান্তির স্বপক্ষে কত লক্ষ লক্ষ সই সংগ্রহ করা হ'ল, কত ছোটবড় আঞ্চলিক ও বৃহৎ শান্তিসম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল একি কেবল আলোর পিছনে ছুটে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থ, উদ্যম, সময় এবং দেশের মূল্যবান যুদ্ধ-প্রাণশক্তির অপব্যয় ও অপচয়ই করা হ'ল!

আমার শান্তিসৈনিক বন্ধুরা বেশ জোর গলায় বলেন "এই পিস্-ফ্রন্ট, খুলে দেওয়াতে খুবই কাজ হয়েছে। স্নায়ু-যুদ্ধের এমন প্রতিষেধক প্রলেপ আর নেই। অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধকে যদি কেউ ঠেকিয়ে রেখে থাকে এতদিন, তবে সে এই বিশ্বব্যাপী শান্তি-আন্দোলন। নইলে যে ভাবে আমেরিকা আজ বিশ্বজয়ে প্রস্তুত হ'য়ে 'ইট-এম-ও' কে মুঠোর মধ্যে পুরে পৃথিবীর চারিদিকে সামরিক ঘাঁটি খেড়ে, ডলারের চরির পুঁটি ছড়িয়ে চলেছে, তাতে, কবে এতদিন যুদ্ধোপুটি বেধে যেত! বিশ্বযুদ্ধের বোমার পলতের দেশলাই জ্বেলে তো ওরা দিয়েছিল কোরিয়ায়! এশিয়া ও ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশগুলোকে ওরা নিশ্চিহ্ন ক'রে দিত এতদিন। কিন্তু পূর্ব তোরণ দ্বারে শান্তির সতর্ক প্রহরী বিশ্রি ভেপেছিল বলেই, শুধু কোরিয়াই জ্বলে ছাই হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ হয়ে গেল আমেরিকার বিশ্বজয়ের দুঃস্বপ্ন। তাই তো আজ আমেরিকা হয়ে উঠেছে যেন! শান্তির সকল প্রস্তাবকেই সে নানা ছুতোয় উড়িয়ে দিচ্ছে।"

এসব উক্তি যুক্তিসহ বলে যদি মেনে নেওয়াও হয় তথাপি এ অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে যে 'এই শান্তি আন্দোলনটা কমিউনিষ্টদের একটা সুচিন্তিত 'ধাপ্পাবাজি' মাত্র!' এঁরাই তো একদিন বলশেভিক হয়ে সবাইকে যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন। পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটাকেই 'জনযুদ্ধ' রূপে চালাবার প্রাণান্ত চেষ্টা করেছিলেন। সেদিনও তাঁরা যেমন সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থে যুদ্ধটাকেই সমর্থন করেছিলেন, আজও ঠিকমি তাঁরা রাশিয়ার স্বার্থেই যে এই শান্তি-আন্দোলন পরিচালনা করছেন—এ সত্যটা একেবারে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। শান্তি সৈনিকদের বৈরিক কেশের তলায় যে কমিউনিষ্টদের লাল উর্দি ঢাকা রয়েছে, অতিরিক্ত সোভিয়েট-প্রীতি ও মার্কিণ-বিদ্বেষের গমকা বাতাসে তা মাঝে মাঝে উড়ে গিয়ে বেরিয়ে পড়ছে তাঁদের বিপ্লবী স্বরূপ! আইসেনহাওয়ার ও ডালেসের কুশপুত্তলিকা দাহ, 'ডালেস ফিরে যাও' বলে অহেতুক চিৎকার যেমন শান্তি আন্দোলনের সহায়ক নয়, তেমনি ভারতে পরে পরে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে কোরিয়া, চায়না, ভিয়েৎনাম ও মালয়ের শান্তি-কামনায় কুণ্ডীরাশ্রুপাতে তাঁরা কারুর সহানুভূতিই উদ্রেক করতে পারবেন না! আন্দোলনেরও একটা সিধে বিধি মেনে চলা উচিত।

আগে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে যদি চেষ্টা না করি, নিজেদের ঘর যদি নিজেরা না সামলাই, নিজেরা যদি সুস্থ সবল হ'তে না পারি, নিজেদের দুঃখ দারিদ্র যদি দূর করতে না পারি, নিজেদের অভাব অভিযোগ যদি মেটাতে না পারি, নিজের দেশে শান্তি, সুখ ও সম্পদ না আনতে পারি তবে অন্য দেশের ভূপতিত মানুষদের টেনে তোলবার জন্য হাত বাড়ানো কোন গুণে বা কোন জোরে? সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অবশ্য সাধনার নিজের দেশকে আগে সকল দিক দিয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কৃত ক'রে তুলে তবে না কমিউনিষ্ট জগতের 'পিজ' ও গুলজানীয় এস্টোনীয়ান সোভিয়েট রাশিয়া আগে 'পাপের মুখমুড়েপড়া, পরপদাশ্রিত, ছোট খাটো দুর্ভাগা দেশগুলোকে টেনে তোলবার জন্য হাত বাড়াতে সাহস করেছিল। বিশাল চারনাকে টেনে তোলবার মতো হাতীর বল সংগ্রহ ক'রে তবেই না সে আজ 'আও সে তুঁকে' দাঁড় করাতে পেরেছে?

আমাদের দেশের কমরেড, তাঁহারা আজ 'কোরিয়া দিবস' কালে 'মালয় দিবস' পরও "ভিয়েৎনাম দিবস" করেছেন। এসব দিবসের বিলাস কি এঁদের মুখে সাজে? এঁদের মুখে শুধু 'ফ্রিডম মার্চার্স', 'ফ্রেডম' প্রতিজ্ঞানিই শুনি! রুশ ও মার্কিণরা হস্তাধিক জঙ্গী বা মানোয়ারী যুদ্ধবাজ জাত। ওরা মানবিক পরিভাষা ছাড়া নিজেদের বক্তব্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করতে পারে না। শান্তি শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই 'যুদ্ধ' কথাটাও তাই তাদের মনে আসে। যুদ্ধ-নিরপেক্ষ শান্তির কথা ভারতবর্ষ ছাড়া আর কেউই করেনি। তাই, ভারতবর্ষ যখনই শান্তির কথা বলেছে তার বুদ্ধ, প্রেম ও অহিংসার বাণী উদ্বিগ্ন জগতের তাপে ছিন্ন ভিন্ন সন্তপ্ত

বীর গম্ভীর। তাই আমার 'শান্তি সৈনিক' বন্ধুদের আমি একাধিকবার বলেছি তোমরা শান্তিব্রতী হ'তে নিজেদের 'শান্তি সৈনিক' বলে পরিচয় দাও কেন? সৈনিকমাত্র যুদ্ধজীবী। নিজেদের 'শান্তিসেবক' বা 'শান্তিকর্মী'ও তো বলতে পারো। লড়াইয়ে-বুলি ছাড়া যুদ্ধবাজদের অভিধানে আর কোনও শব্দ না থাকতে পারে, কিন্তু তোমাদের শান্তি-সাধকের মেশে তো শান্তিবাণীর অভাব নেই! তা'ছাড়া, এই সব চড়া চড়া উগ্র কণ্ঠের জঙ্গীবাহিনী থেকে শান্তি-সৈনিকদের মধ্যে শান্তির চেয়ে যুদ্ধবাজী মানসিকতার পরিচয়টাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বেশি। তাঁদের এই উদ্ধত অবিনয়ী আচরণের দ্বারা আমরা যাই হোক, দেশে শান্তি কোনও দিনই আনতে না। এই সব তথাকথিত শান্তি-সৈনিক তাঁদের পূর্বোল্লিখিত আরও পাঁচরকম দাবির সঙ্গে শান্তির প্রস্তাবটাকেও একটা দাবি হিসাবেই উপস্থিত করেন। কিন্তু দাবি জানিয়ে আর যাই কেন পাওয়া যাক না 'শান্তি'র আশা—সৈব নৈষচ। দাবি করা মানেই তো অশান্তি সৃষ্টি করা। ওটা জন্মরহস্যের এলাকার মধ্যে—পায়ের জোরের কোনও খিয়ে পড়ে। 'Demand' কথাটার পিছনে বেশ একটা নজির্ উঁচানো ভাব রয়েছে। আমাদের প্রাপ্য অধিকার আদায়ের জন্য আমরা দাবি করতে পারি, কিন্তু শান্তির জন্য চাই একান্ত সাধনা। কমিউনিস্ট্ তাঁরা যদি তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ যে-সব রক্তমাখি উৎপাতজনক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, শান্তি আন্দোলনটাকেও তাঁরই একটা কৌশলবিশেষ মনে করে মাঝে মাঝে 'জলসা' বা কাগজে মুখের জোরে জলে ভাসিয়ে শান্তিবাণী ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন, তা'হলে তাঁদের 'শান্তি' 'অশান্তি' কোনও আন্দোলনই সফল হ'তে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। এঁদের ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসে সবগুলো ঘোড়াতেই বাজী ধরা! সেটা দেখে যায়! তাতে, কিন্তু লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হয়।

দু'চারজন যথার্থ শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী নিরীহ লোক যদি এঁদের ওড়ানো শান্তির পায়রার পিছনে ছুটে শান্তি আন্দোলনের পুণ্য প্রবাহে ভাসতে ভাসতে সোজা একেবারে কমিউনিস্ট সাম্যবাদের বাঁধাঘাটে এসে লাগেন এবং সেখান থেকে পিকিং হয়ে একেবারে মস্কোয় পৌঁছে 'স্ট্যালিন শান্তি পুরস্কার' গলায় ঝুলিয়ে দেশে ফিরে আসেন, তাতে সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় প্রচারবিভাগের বক্তৃতা ও তাঁদের সাপলিমেন্টারি প্রোপাগাণ্ডার জন্য অবশ্য হ'তে পারে, কিন্তু শান্তি যে অশান্তির মধ্যে চাপা পড়ে আছেন সেখানেই থেকে যান না কি?

দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণকে আমরা যত বোকা মনে করি তারা কিন্তু ততটা নিরেট নয়। প্রথমটা না বুঝতে পারলেও সিংহচর্মাবৃত গর্দভকে একদিন তারা ধরে ফেলেই। "You can fool some people for sometime, but not all people for all time." ও শান্তি।

অন্যপূর্বা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্ব আমারে দিয়ে
নিজেরে যে রেখেছ লুকিয়ে—
একথা কে করিবে বিশ্বাস?
আমার সমস্ত দেহে তোমার নিঃশ্বাস
এখনও তেমনি উষ্ণ শিহরণ জাগায় কৌতুকে,
যে কম্পন উঠেছিল রিক্তবাস তোমার ও বুকে
তুমি কি ভুলিয়া গেছ সে কম্পন থেমেছিল
কিসে?
আরক্ত অধর তব চুম্বনের বিষে
মৃত্যুনীল করেনি ত তব তনুদেহ,
নিজেরে নিঃশেষ করি প্রেম-অনুলেহ
ঢেলে দিয়েছিলে তুমি তৃষ্ণা মিটাইতে;
তোমারও যে তৃষ্ণা ছিল,—অয়ি অসম্বৃতে
আনন্দ পেয়েছ তাই সেই আত্মদানে।
আমার তৃষ্ণার জ্বালা একই পানপাত্রের সন্ধানে
চরম মুহূর্ত তরে ছিল কম্পমান,
আমার দারুণ তৃষ্ণা তোমার তৃষ্ণায় বহিমান
চেয়েছিল সর্বস্ব আহুতি।
কামনার উন্মত্ত আকুতি
শিরায় শিরায় তোল দ্রুত সঞ্চারিত,
তোমার দাক্ষিণ্য অবারিত
আমার সম্মুখে যদি কাঁদে সকরুণ বেদনায়
আমি কি ফিরিয়া যাব মূঢ়তার তুচ্ছ সান্ত্বনায়?

কি দিয়েছ তুমি জান, কি দিয়েছি আমি তাহা জানি,
নিরুদ্বেগ অবসরে আমারে নিয়েছ তুমি টানি
নিরালায় একান্ত নিকটে।
ভোগবতী তরঙ্গিণী তটে
মম লীলা-সঙ্গিনীরে সাথে লয়ে দাঁড়ালাম যবে
দেখিলাম যৌবনের অনন্ত বৈভবে
তুমি যেন অনুপূর্বা, পরমা সুন্দরী।
আমারে আচ্ছন্ন করি
তুমি হলে সর্বময়ী; আমার আমিরে ভুলিলাম
ইহকাল পরকাল এক সাথে তোমারে দিলাম।
আজ তুমি একাকিনী বৈরাগ্যের সঙ্গীতে মুখরা
আমি কবি, গেয়ে যাই চিরবসন্তের মধুক্ষরা
চিরন্তনী সেই গীতিমালা,—
এ দেহ নিশ্চিহ্ন হোক, মনে থাক সে তৃষ্ণার জ্বালা।

শ্যামাপ্রসাদ প্রসঙ্গ

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আর এক কলঙ্কময় অধ্যায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—নেহরুর নেতা দুষ্টু শ্যামাপ্রসাদের রহস্যজনক অকাল প্রয়াণে। একদা শ্যামাপ্রসাদই অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রীত্ব পাকিস্তানকে দান করিয়া তাহার জীবন কলঙ্কিত করিয়াছে, আর আজ পুনরায় কতিপয় স্বার্থান্বেষী কুটিল চক্রান্তে বাঙালীর নয়নমণি নেতা শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটাইয়া পাপের সঞ্চয় বৃদ্ধি করিল। ভারতের প্রাথমিক যুগে কাশ্মীর রাজ্যের সৌহার্দ্যবনিকা ভেদ করিয়া যেদিন এই দুঃসংবাদ অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিল—কাহারও বিশ্বাস হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম স্থান—বাঙালীর একান্ত নয়নী নেতা—ভারতের অন্যতম সন্তানকে সাধারণ দুর্ঘটনায় শ্যামাপ্রসাদ নাই। শেখ আবদুল্লা-শাসিত কাশ্মীর রাজ্যের অন্তঃপুরে বিনা বিচারে বন্দীদশায় তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে। অথচ এ মৃত্যু যেমনি আকস্মিক তেমনি অস্বাভাবিক। যে মুহূর্তে এই দুঃসংবাদ ঘোষিত হইল, স্তম্ভিত বাঙালী জনগণের চিত্তে ও অগণিত ভারতবাসীর চিত্তে যুগপৎ সন্দেহের অঙ্কুর উপ্ত হইল—ইহা প্রকৃত মৃত্যু না হত্যা। সাধারণ প্রশ্বাস—আকস্মিক জনমতের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তিনি নাকি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে হৃদ্‌রোগের নিদানমতে রাখা হইত। অন্তঃপুরে ঘোট একটি ঘর। ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেইখানেই তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুষ্টু শ্যামাপ্রসাদের মতো একজন সুবিখ্যাত হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ভারতীয়ের যোগ্য চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা কাশ্মীর সরকার করেন নাই এবং যাহা করিয়াছেন তাহাও ত্রুটিপূর্ণ। আর তাহাই তাঁহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু কেন? কেন এমন ভাবে চিকিৎসার দ্বারা শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় একটি বাঙালীর অমূল্য জীবন কাশ্মীর সরকার ধ্বংস করিলেন? কাশ্মীর কি ভারতের অংশ নয়? কেন তবে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানের কাশ্মীরে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না? কেন বিধি নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া তাঁহার গতিরোধ করার চেষ্টা হইয়াছিল? কাশ্মীরে কে-আটনী পরিকল্পনের সাম্রাজ্য অনুপ্রাণিত সৃষ্টি করিয়া কেন ও কি সাহসে শেখ আবদুল্লা সরকার তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন? এবং কেন মাসাধিককালের মধ্যেও তাঁহার অপরাধের কোনো বিচার হইল না? আর ভারত সরকারই বা কেন এই অন্যায় অবিচারের কোনো প্রতিবিধান করিলেন না? তবে কি আমরা ইহাই বুঝিব, যে, ইহার পশ্চাতে সুপরিকল্পিত কোনো চক্রান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে!

কাশ্মীর আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া সমগ্র ভারতবাসীর চিত্তবিক্ষোভের কারণ হইয়া আছে। কেরল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় একটি ভারতীয় রাজ্য হিসাবে গণ্য হইবার কথা, তাহার কতকাংশ পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে তুলিয়া দিয়া বাকী অংশটুকুর সার্বভৌম স্বীকারের কথা কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ নিহিত থাকিলেও তাহাতে ভারতবাসীর সমষ্টিগত ক্ষতি রহিয়াছে। তাই এ ব্যাপারে একটা বিরাট সংশয় ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মনে ঘনীভূত বিস্তার করিতেছে। বর্তমান ভারত সরকারের এই স্পষ্ট নীতি এবং ভারতীয় জনসাধারণের নিকট সমস্ত ব্যাপারটি কৌশলে গোপন রাখার অপপ্রচেষ্টার প্রতিবাদেই শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির এমনি দুর্ভাগ্য যে, কাশ্মীর-সমস্যা তেমনি রহস্যাবৃত রহিয়া গেল; অধিকন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে মহৎপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদ বলি হইলেন।

শ্যামাপ্রসাদের এই মৃত্যুকে দেশবাসী কিছুতেই স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া গণ্য করিতে পারিতেছে না। আর এই সন্দেহকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে আবদুল্লা সরকারের যুক্তিহীন ও পরস্পর-বিরোধী বিবৃতিগুলি এবং নেহরু সরকারের রহস্যহীন ব্যবহার। আরো আশ্চর্যের ও বেদনার বিষয়, শ্যামাপ্রসাদের পরলোকগমনের সংবাদে নেহরুর শুষ্ক ব্যবহার। ব্যক্তিগত জীবনে নেহরুর ঐশ্বর্যধান হৃদয়ের আবেগ ও উদারতার অজস্র প্রমাণ রহিয়াছে। একদা হিটলারের মৃত্যুতেও শোক সন্তাপ্লুতি, প্রশংসা প্রভৃতির প্রবল প্রবাহ তাঁহার হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, দেখিয়াছি। কিন্তু জাতির এতো বড় শোকের ব্যাপারে সে হৃদয়ের উৎস কোথায় কি কারণে অন্তর্হিত হইল? অথচ দুষ্টু শ্যামাপ্রসাদের সহিত একদা সহকর্মীরূপে ও পরে বিরোধীপক্ষের নেতারূপে তিনি দীর্ঘদিন বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। অবশ্য দুষ্টু শ্যামাপ্রসাদ তাঁর মুসলিম তোষণনীতির সমর্থন করিতেন না এবং হিন্দুর স্বার্থহানিকর যে কোনো কর্মের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত বহু বিষয়ে তিনি এক মত হইতে পারেন নাই। তাঁহার যুক্তিসহ প্রশ্নের বিতর্কের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী অন্যায় বিপন্ন ও ম্লান হইয়া পড়িতেন। বর্তমান রাজনীতিক্ষেত্রে দুষ্টু শ্যামা-প্রসাদই ছিলেন পণ্ডিত নেহরুর একমাত্র প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ও যোগ্যতমের কণ্টকস্বরূপ! এবং আগামী নির্বাচনে উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর স্থান বিপন্নীত হওয়াও বিচিত্র ছিল না। দেশবাসী আশাও করিয়াছিল তাই। তথাপি শ্যামাপ্রসাদের ন্যায় একজন যোগ্য বিরোধীর এই রহস্যময় মৃত্যুর ব্যাপারে নেহরুর এমন বিশুষ্ক নিস্পৃহ ব্যবহার আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে মনের মধ্যে বাস্তব সন্দেহের উদয় হয়। স্বতই মনে হয়, বুঝি বা শ্যামাপ্রসাদের অত্যাবশ্যক মৃত্যুর ব্যাপারে ভারত-সরকারও নির্দোষ নন। দেশের জনগণের চিত্তে তাই এ ব্যাপারের সংশয়হীন নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীতে ও অবহেলার অভিযোগের বজ্রবহ্নিতে গড়িয়া যাহারা দুষ্টু শ্যামাপ্রসাদের

অকাল মৃত্যু ঘটাইয়াছে তাহাদের বিচারের দাবীতে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকজন স্বার্থান্বেষী ব্যতীত আজ দেশের প্রত্যেকটি লোক এই বিচারের দাবী জানিয়াছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জনসাধারণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন শুভ ফল প্রসব করে না। ভারত সরকারের উচিত তদন্ত ও বিচারের দ্বারা ইহার আশু মীমাংসা করা।

সম্প্রতি শ্যামাপ্রসাদের শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীও এই তদন্ত ও বিচারের দাবী লইয়া পণ্ডিত নেহরুর নিকট যে পত্রাদি লিখিয়াছেন এবং নেহরু সেই পত্রের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা সেই পত্রগুলি এইখানে সংযোগ করিলাম।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের জননীর নিকট লিখিত শ্রীনেহরুর পত্র

নং ৪১১—পি, এম

নয়াদিল্লী

৩০শে জুন, ১৯৫৩

প্রিয় মিসেস্ মুখার্জী,

কয়েকদিন পূর্বে জেনেভা হইতে আমার কাশ্মীর যাত্রার সময় আপনার পুত্র ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া গভীর বেদনা বোধ করি। এই সংবাদে আমি মর্মবেদনা অনুভব করি; কারণ, রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম এবং ভালও বাসিতাম। আপনি তাঁহার মাতা, এই শোক আপনাকে নিশ্চয়ই গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে। আপনার দুঃখ অপনোদনের জন্য আমি কি-ই বা বলিতে পারি।

কাশ্মীর হইতে টেলিগ্রাম করিয়া আমি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে আমার গভীরতম সমবেদনা ও শোকের কথা আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলাম। আটক থাকায় শ্যামাপ্রসাদবাবুর মৃত্যুই আমার পক্ষে বিশেষ দুঃখের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচ সপ্তাহ পূর্বে আমি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলাম তখন তাঁহার আটকের স্থান ও স্বাস্থ্যের বিষয় খোঁজ লই। আমাকে জানান হয় যে, তাঁহাকে কোন জেলে না রাখিয়া শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল হ্রদের তীরে এক বেসরকারী বাংলোতে রাখা হইয়াছে। আমি দেখিলাম যে, কাশ্মীর সরকার তাঁহাকে যথাসাধ্য আরাম ও সুযোগ দিবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছেন এবং তিনিও ভাল আছেন। ইহা জানিয়া তখন আমি খুশি হই। কাশ্মীরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় শ্যামাবাবুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, বাস্তবিক আমি সেই আশাই করিয়াছিলাম।

কিন্তু তাহা হয় নাই। তাই শোক ও দুঃখের আঘাত অনেক বেশী বোধ হইতেছে। কিন্তু করা মানুষের সাধ্যাতীত ছিল বলিয়াই আমার মনে হয় এবং কর্মফলের বাহিরের অবস্থার কাছে নতি স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শেষে, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য ও দুঃখ নিবেদন করিতেছি। আমাকে দিয়া আপনার যদি কোন কাজ হয়, তবে আমাকে জানাইতে ইতস্ততঃ করিবেন না। একান্ত আপনার

(স্বাঃ) জহরলাল নেহরু

শ্রীনেহরুর নিকট লিখিত ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের জননীর পত্র

৭৭, আশুতোষ মুখার্জী রোড,

কলিকাতা

৯ই জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় শ্রীনেহরু,

আপনার ৩০শে জুনের পত্র ২রা জুলাই ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

আপনার সমবেদনা ও শোকবার্তার জন্য ধন্যবাদ।

আমার প্রিয়পুত্রের লোকান্তরে জাতি আজ শোকাভিভূত। সে শহীদের মৃত্যুবরণ করিয়াছে। আমি তাহার মাতা, আমার দুঃখ এত গভীর ও পুত্র যে ভাবাবেগ তাহা প্রকাশ করা যায় না। কোন সান্ত্বনা লাভের জন্য আপনাকে লিখিতেছি না। আমি আপনার শুধু বিচার চাই। আমার ছেলে মারা গিয়াছে আটক অবস্থায়। সে আটক বিনা-বিচারে আটক। আপনার পত্রে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন যে, কাশ্মীর সরকার কর্তব্যই সবই করিয়াছেন। আপনি যে আশ্বাস ও সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহাই আপনার ধারণার ভিত্তি। যে-সব লোকের বিরুদ্ধে বিচার হওয়া উচিত, আমি জিজ্ঞাসা করি তাহাদের দেওয়া সংবাদের কি মূল্য আছে? আপনি বলিয়াছেন, আমার ছেলের আটকাবস্থায় আপনি কাশ্মীর গিয়াছিলেন। তাহাকে আপনি ভালবাসিতেন বলিয়াও বলিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাহার সহিত দেখা করিতে এবং তাহার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে অবহিত হইতে কিসে যে আপনাকে বাধা দিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হই।

তাহার মৃত্যু রহস্যাবৃত। সেখানে তাহাকে আটক রাখার পর—তাহার যা আধি—আমাকে সর্বপ্রথম কাশ্মীর সরকার যে সংবাদ দিলেন তাহা হইল তাহার মৃত্যু সংবাদ, আর তাহাও অন্ততঃ দশ হইতে দুই ঘণ্টা পরে—ইহা কি একান্ত অদ্ভুত ও শোকাবহ নহে? আর কি নিষ্ঠুর গোপনীয়তার সঙ্গে সেই সংবাদ দেওয়া হইল। এমন কি তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে আমার ছেলের সেই টেলিগ্রামও আমাদের কাছে আসিল তাহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদের পর। কাশ্মীর আটকের সময় হইতে তাহার শরীর যে ভাল যাইতেছিলনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সে নিশ্চয়ই কয়েকবার ও তাহার পরবর্তী সময়ে অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমি জিজ্ঞাসা করি, কাশ্মীর সরকার বা আপনার সরকার আমাকে বা আমার পরিবারকে কোন রকম সংবাদই দেন নাই। এমন কি তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার সময়ও আমাদের বা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে অবিলম্বে সংবাদ দেওয়ারও তাঁহারা দরকার বোধ করিলেন না।

ইহাও স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে, শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যের পূর্ণ ইতিহাস জানিবার জন্য কাশ্মীর সরকার মোটেই মাথা-ব্যথা করেন নাই এবং শুশ্রূষার ও প্রয়োজনের সময় চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা তাঁহারা

করেন নাই। এমন কি তাহার পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণকে সতর্কতা জ্ঞাপন হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। তাহার মানসিক বলই হইয়াছে। আমার কাছে একথা প্রমাণ করিবার বিশিষ্ট তথ্য আছে যে, ২২শে জুন সকালে সে অবসন্ন বোধ করে—ইহা তাহার নিজেরই কথা। সরকার কি করিয়াছিলেন? কোনপ্রকার চিকিৎসা সাহায্য দেওয়ার অনিচ্ছায় কিংবা, নিতান্ত অনিবেচকের মত তাহাকে হাসপাতালে পাঠান, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে শ্রীনগরে তাঁহার কাছে যাইতে না দেওয়া—এগুলি সাধারণ কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন আচরণের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ। সে যে ভাল ছিল তাহা ডাক্তার প্রসাদের পত্র হইতে বাহির বাহির উদ্ধার করা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন উক্তি দিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলে কাশ্মীর সরকার ও তাঁহাদের নিজের ডাক্তারদের দায়িত্ব মোটেই এড়ান বা কমান যাইবে না। এইরূপ উক্তিগুলির মূল্য কি? কেহ কি আশা করে যে, প্রিয়জনদের নিকট হইতে বহুদূরে আটক অবস্থায় থাকিয়া সে তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিবে বা তাহার নিজের রোগ নিজেই নিরূপণ করিবে। সরকারের দায়িত্বের অন্ত নাই, আর সে দায়িত্ব গুরুতরও বটে। আমি তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছি যে, তাঁহারা এই অত্যাবশ্যক কর্তব্য পালন করেন নাই। আপনি আটকাবস্থায় ডাক্তার প্রসাদকে আরাম ও সুযোগ দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। ইহাও তথ্যের অপলাপ। কাশ্মীর সরকার এমন কি পারিবারিক পত্রাদিও অবাধে যেতেদেন করিতে দেন নাই। দীর্ঘকাল পত্রাদি আটক রাখিবার কোন যুক্তি নাই এবং তাহেরখানি পত্রেরও অন্তর্ধান রহস্যজনক! তাহার বাড়ীর সংবাদ, বিশেষভাবে তাহার পীড়িতা কন্যার ও আমার সংবাদের জন্য তাহার উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল না। আপনি একথা জানিয়া কি বিস্মিত হইবেন যে, ২০শে জুন আমরা তাহার ১৫ই জুনের পত্র পাইলাম? কাশ্মীর সরকার এক প্যাকেট করিয়া তাহা ২০শে জুন অর্থাৎ তাহার দুইদিন পাঠাইবার এক দিন পরে আমাদের কাছে পাঠাইয়াছেন। সেই প্যাকেটে ডাক্তার প্রসাদের কাছে লেখা আমার ও এখানকার অন্যান্যের লেখা পত্র ছিল। সেই সব পত্র ১১ই ও ১৩ই জুন শ্রীনগরে পৌঁছে। কিন্তু ডাক্তার প্রসাদকে তাহা দেওয়া হয় নাই। ইহা শুধু মানসিকভাবে পীড়ন করার ঘটনা মাত্র। সে পুনঃ পুনঃ যেড়াইবার মত কষ্টই পাইতেছে, তাহা না পাইয়া সে অসুস্থ বোধ করে। কিন্তু ধারাবাহিক-ভাবে তাহাকে উহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। ইহাও কি শারীরিক অত্যাচারের অন্যতম ব্যবস্থা নহে? তাহাকে কোন কারাগারে না রাখিয়া শ্রীনগরের বিখ্যাত ডাল হ্রদের তীরে এক বেসরকারী হিসাবে রাখা হইয়াছে—আপনি আমাকে এই কথা জানাতে আমি বিস্ময় ও লজ্জা বোধ করিতেছি। সামান্য প্রহরণ লইয়া গঠিত ছোট একটি বাংলোর চারিপাশে একদল সশস্ত্র প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকা—ইহাই ছিল বেনজির জীবনযাপনের চিত্র। সোনার খাঁচায় পাখী সুখী হয় একথা কি বিশ্বাস করা যায়? এইরূপ বেসরকারী প্রচারে আমি ভয় পাই। কি চিকিৎসা সাহায্য তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আমি জানি না। সরকারী রিপোর্টও অধিরোধী বলিয়া আমাকে জানান হইয়াছে। বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ এই অভিমত দিয়াছেন যে, ইহা ভীষণ অবহেলার ঘটনা ছাড়া আর কিছু নহে। এই বিষয়ে পূর্ণ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।

আমার প্রিয় সন্তানের মৃত্যুতে আমি বিলাপ করিতেছি না। স্বাধীন ভারতের এই নির্ভীক সন্তান বিনা বিচারে আটক অবস্থায় মর্মান্তিক ও রহস্যজনকভাবে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। সেই মহান্ সন্তানের জননী—আমি দাবী করিতেছি যে, অবিলম্বে যোগ্য ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক। আমি জানি, যে জীবন অনন্তে বিলীন হইয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। কিন্তু আমি চাই যে স্বাধীন ভারতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার প্রকৃত কারণ এবং গভর্ণমেণ্ট সে সম্পর্কে কি করিয়াছেন তাহা জনসাধারণ নিজেরাই বিচার করিবার সুযোগ পাক।

যদি কোন অন্যায় ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে সেই অন্যায়কারী যতবড় পদেই অধিষ্ঠিত থাকুক, ন্যায়বিচারের বিধান হইতে সে যেন অব্যাহতি না পায়। জনসাধারণ সতর্ক হউক, যেন ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতে কোন মাতাকে আমার মত দুঃখ বেদনায় অশ্রু না পাত করিতে হয়!

আপনি আমাকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তাহা বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন। আমি নিজের পক্ষ হইতে এবং ভারতের মাতাদের পক্ষ হইতে এই দাবী উত্থাপন করিতেছি। ঈশ্বর আপনাকে সত্যপ্রকাশের সংসাহস দিন।

চিঠি শেষ করিবার পূর্বে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা জানাইতেছি। শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও অন্যান্য লেখা কাগজপত্র কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট প্রেরণ করেন নাই। * * * * * * আপনি যদি সেগুলি আমাদের কাছে পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে কৃতজ্ঞ থাকিব। সেগুলি নিশ্চয়ই কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টের নিকট আছে।

আশীর্বাদ সহ শোকগ্রস্তা
যোগমায়া দেবী।

নেহরুর উত্তর

শ্রীনগর
৭ই জুলাই, ১৯৫৩

শ্রদ্ধেয়া মিসেস্ মুখার্জী—

আপনার ৩রা জুলাইয়ের পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

আমি বুঝি, মাতার নিকট প্রিয় সন্তানের মৃত্যু কি গভীর দুঃখ ও বেদনাদায়ক! আপনি যে আঘাত পাইয়াছেন, আমি দুঃখের কথায় সে আঘাতের বেদনা হ্রাস করিতে পারিব না।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের আটক ও মৃত্যু সম্পর্কে ভালভাবে তদন্ত না করা পর্যন্ত আমি আপনাকে পত্র লিখিতে সাহস পাই নাই। যে সমস্ত লোক এই ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহাদের নিকট আমি আরও তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি এবং আমি আপনাকে এইটুকুই বলিতে পারি যে,

আমি পরিষ্কার এই সুনিশ্চয়ে আসিয়াছি যে, ইহার মধ্যে কোন রহস্য নাই এবং ডাঃ মুখার্জী সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাই পাইয়াছিলেন।

আমি আপনাকে জানাইতে পারি যে, কাশ্মীরে চিঠিপত্র যায় বিমানে। আবহাওয়ার যোগাযোগের জন্য বিমান চলাচল অনিশ্চিত হয় এবং কখনও কখনও চিঠিপত্র এক সপ্তাহ পর্যন্ত আটক থাকে। প্রকৃতপক্ষে গত এক সপ্তাহ যাবৎ কাশ্মীরে কোন চিঠিপত্র যায় নাই। কাশ্মীরে প্রেরিত আমার বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্র বিলম্বে পৌঁছিয়াছে।

আমিও ১০ বৎসর জেলখানার কাটাইয়াছি এবং সারা ভারতের বহু জেলখানায় বাস করিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। কাজেই বন্দীদশায় মানুষের মনের অবস্থা কি হয়, তাহা আমি জানি এবং কি অবস্থায় তাহাকে কাটাইতে হয় তাহাও আমার জানা আছে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর দিন কাশ্মীরের একজন মন্ত্রী টেলিফোনে বিচারপতি মুখার্জীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি সরাসরি কথা বলিতে পারেন নাই। পথে দুইবার তাঁহার বক্তব্য অপারেটারেরা পুনরুক্তি করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে বক্তব্যটি পাশছাড়া ও অসমাপ্ত অবস্থায় আপনাদের নিকট পৌঁছায়।

ডাঃ মুখার্জীর ডায়েরী ও অন্যান্য কাগজপত্র সম্বন্ধে আপনি যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা বন্ধী গোপাল মহন্তের নিকট পাঠাইলাম। তাঁহার কাছে কাগজপত্র থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই আপনার নিকট প্রেরণ করিবেন, সে বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত। আন্তরিকতার সহিত আপনার

জওহরলাল নেহরু

যোগমায়া দেবীর পত্র

কলিকাতা

২রা জুলাই, ১৯৫৩

প্রিয় নেহরু—

আপনার ৭ই জুলাইয়ের পত্র ২রা জুলাই পাইয়াছি। পত্রটি সমগ্র পরিস্থিতির এক শোচনীয় ভাষ্য। আপনার অনোভাব রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরিবর্তে রহস্যকে আরও ঘনীভূত করে। আমি আপনার পরিষ্কার এবং সুনিশ্চিত জানিতে চাহি নাই। সমগ্র ঘটনাটিকে আপনি কি চোখে দেখেন তাহা এখন আর কাহারও নিকট অজ্ঞাত নাই। দাবি হিসাবে আমার এবং সমস্ত দেশবাসীর সন্দেহভঞ্জন করার প্রয়োজন আছে। বহু লোকের মনেই সন্দেহ দৃঢ়মূল। এখন প্রয়োজন অবিলম্বে প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা।

আমার পত্রের অনেক প্রশ্নেরই উত্তর পাই নাই। আমি আপনাকে পরিষ্কার বলিয়াছি যে, সংশ্লিষ্ট কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রমাণের মত যথেষ্ট তথ্য আমার নিকট আছে; আপনি সেগুলি দেখিবার অথবা জানিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আপনি লিখিয়াছেন যে, আপনি ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট অনুসন্ধান করিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা তাহার পরিচয়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও এ ব্যাপারে আলোকপাত করিবার জন্য আপনি আমাদের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও আপনি আপনার সিদ্ধান্তকে সুনিশ্চিত বলেন।

কাশ্মীরে বিমান ডাক চলাচলের অসুবিধা সম্পর্কে আপনি যে কথা বলিয়াছেন তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। উহার অর্থ চিঠিপত্র সম্পূর্ণভাবে উধাও হওয়ার এবং বিলম্ব হওয়ার যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার পত্র মন দিয়া পাঠ করিলে আপনি এমন কুযুক্তি উত্থাপন করিতেন না। চিঠির উপর ডাকঘরের যে ছাপ আছে তাহা আপনার যুক্তিকে অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে অসার প্রতিপন্ন করে।

জেলখানায় আপনার অভিজ্ঞতার কথা আমরা সকলেই জানি। এক সময় উহা ছিল আমাদের পরম জাতীয় গৌরব। কিন্তু আপনি বিদেশীর শাসনকালে জেল ভোগ করিয়াছেন, আর আমার পুত্র স্বাধীন গভর্নমেন্টের আমলে বিনা বিচারে আটক অবস্থায় জেলে মারা গিয়াছে। বৃটিশ আমলে জেলখানায় এইরূপ মর্মান্তিক ও রহস্যজনক ঘটনা ঘটিলে কি অবস্থা হইত?

আপনাকে আর পত্র লেখা অর্থহীন। আপনি ঘটনার সমুখীন হইতে আতঙ্কিত। আমি আমার পুত্রের মৃত্যুর জন্য কাশ্মীর গভর্নমেন্টকেই দায়ী করিতেছি। এ ব্যাপারে আপনার গভর্নমেন্ট যোগসাজস করিয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। আপনি আপনার বিরাট শক্তিসামর্থ্য লইয়া যতই এগার কদম সত্যকে চিরকাল ঢাকিয়া রাখা যাইবে না। ভারতবাসীর নিকট এবং সর্বশেষ ঈশ্বরের নিকট আপনাকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

আমি এই পত্রাবলী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছি। প্রধান মন্ত্রী যাহা পারেন নাই ভারতবাসী তাহা বিচার করিয়া দেখুক ও তদনুযায়ী যাহা করিবার করুক। আপনার শোকগ্রস্তা

যোগমায়া দেবী

৩

ইহার পরেও যদি পণ্ডিত নেহরু ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যুর গুরুত্ব ব্যাপারে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা হইলে সমগ্র বাংলা ও ভারতের জনগণ তাঁহার প্রতি নিশ্চয় আস্থা হারাইবে।

সম্প্রতি দিল্লীর 'হিন্দুস্থান সমাচারে' শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, "এক শ্রেণীর রাজনৈতিকদের বিশ্বাস—জনমতের চাপে পড়িয়া শেষ পর্যন্ত যদি ভারত সরকারকে ডক্টর মুখার্জীর মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তের দাবী মানিয়া লইতে হইত তাহা হইলে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে ভারত ও কাশ্মীর সরকারের অবস্থা বড়ই বিপজ্জনক হইত। কিন্তু ইতিমধ্যে কলিকাতার সাপ্তাহিক ঘটনাবলী এই দিক দিয়া ভারত সরকারের নিকট 'শাপে বর' প্রমাণিত হইয়াছে এবং তদন্তের দাবীর প্রধান উদ্যম স্থান কলিকাতাই যখন ঐ বিষয়ে শান্ত হইয়াছে তখন আর ওদিক দিয়া ভয়ের কারণ নাই।...

অনেকে আমার এই মনোভাবও প্রকাশ করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত রাষ্ট্রের সম্মান রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই নাকি কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহকে ভিন্নমুখী করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা

হয়। কিন্তু ইহার পরিশোধ যেন তাহারই হাতে বলিয়া বাকি আশা করা যায় নাই। এমন এই কলঙ্ক মোচনের চিন্তাই কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম সমস্যার পরিণত হইয়াছে।"

কিন্তু কোনো কারণেই যাহারা তাহার প্রিয় দেহার এই অযাচিত মৃত্যুর যেমন বিস্মৃত হইবে না। সহজের মৃত্যু নাই। যে রহস্যের যবনিকার শ্যামাপ্রসাদ বলি হইয়াছেন সে রহস্য যাহারা উদ্ঘাটন করিবে। কোনো প্রতিকূল অবস্থাই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। সম্প্রতি উহার শ্যামাপ্রসাদের ভ্রাতা ইউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন, যাহাতে শ্যামাপ্রসাদের গ্রেপ্তার, আটক ও রহস্যজনক মৃত্যুর বিষয় বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তিকাটি দেশের সম্পাদকের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়াছেন শ্যামাপ্রসাদের জননী। তিনি লিখিয়াছেন : "আমার বীর সন্তান সাম্প্রদায়িকতার সহিত যাঁহাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করিয়াছিল তাঁহাদেরই দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়া, দার্জিলিঙে অস্বাস্থ্যকর পার্শ্ব সংস্থ প্রহরীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আত্মীয়স্বজন হইতে দূরে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—আমার এই বীর সন্তানের জন্য অনেকেই হয়ত সামান্য বিলম্বের দিতে পারিবে। ... অন্তিম যবনীর কথা ভাবিলেই আমি শিহরিয়া উঠি। সরকারী কর্মচারীরা সমগ্র রহস্যের উপর যবনিকা টানিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বলিতেছেন, ভগবানের হুকুমে এইরূপ হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে আমাকে ভগবানের নাম শুনিতে হইল।

"আমি ই.ভগবানের নিকট সুবিচার চাহিয়াছিলাম। এই অস্বাভাবিক ঘটনার জন্য অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও প্রকাশ্য তদন্তের দাবীও জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই, তিনি চরম মার্মান্তিক পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে অত্যন্ত এইরূপ ভাব দেখাইয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছেন, তিনি "শুধু নয়ন ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত" আমাকে জানাইতে পারেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই পুস্তকে এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত যেসব ঘটনা ও তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কোনো তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং সরকারী ভাষ্যসমূহ সম্পূর্ণ বিকৃত-তথ্যে পরিপূর্ণ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ত মনে করেন, সরকারী-নীতির বেদীতে সত্যকে বলি দেওয়া যায়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্যেরও জয়তে।"

"এই পুস্তকে যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের মাতৃভূমির ভাগ্যের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এরূপ বহু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।"

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা দেশবাসী কোনোদিনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ভারত সরকারের নিকট সুবিচার দাবী জানাইতেছি যে, আমরা—সমগ্র দেশবাসীরা এই রহস্যময় মৃত্যুর আশু নিরপেক্ষ তদন্ত চাই—অপরাধীর বিচার চাই। বিশ্বকবির বাক্য যেন কোনো কারণেই আমরা বিস্মৃত না হই :

অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। (বাঃ৪৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ

সত্যবান

আকাশে মেঘের স্তূপ হারায়েছে পথের নিশানা,
কালো মেঘে ঢেকে গেল মানুষের অন্তর বাহির,
ক্ষোভাক্ষিত আলো জ্বলে নিভে যায় দুর্বল অস্থির,
আঁধার রাতের বুকে ভীড় করে সংশয় অজানা।
ধ্রুবের আশ্বাস নাই ; তর্জনী তুলিয়া করে মানা
ভেকের কর্কশ তান ; অরণ্যের হিংস্র প্রহরীর
আহ্বানে শিহরে কূল ; গতি ভ্রষ্ট ওর তরণীর ;
নির্জন পিচ্ছিল পথে শতাব্দীর শব বাহা নানা।
তোমার উদয়ে কি কেটে গেল মেঘের বাঁধন,
দিগন্ত রঙীণ হ'ল, অরণ্যের জাগিল উচ্ছ্বাস,
ভরা নদী হেসে ওঠে, কূল পায় দিকহারা মন,
রবির আলোকে দীপ্ত পথে পথে মিলিল আশ্বাস।
ঘর ছাড়া মানুষেরা ঘরে তুমি এলে দিলে, তাই
জীবন প্রভাতে আজ তোমারেই প্রণাম জানাই।

অতল

শিশিরকুমার দাশ

ধূ ধূ করে চর দুপাশে শুধুই মাঝেতে অথৈ জল
অবাক সূর্য্য দুরন্ত হাওয়া দিগন্তময় নীল
ছড়ালো অনেক—অনেক কিছুই সবুজের ঝিলমিল
রুদ্ধ আবেগে ডুব দিয়ে শুধু পেলাম না খুঁজে তল।
বেঁধে দিল মন এপারের মাঠ, ওপারের বন টান
দিল বারবার শিষ্ দিয়ে কোন ব্যাকুল পাখীর মত
নীরব প্রহরে চকিতে দাঁড়াই, ডাক শুনে অবিরত
এপারে ওপারে দুপারেই মন চঞ্চল আনচান।
সূর্য্যের কণা তবুও ছড়াই বনে বনে নির্জ্জন
দিশাহারা নদী ব্যাকুল বাতাসে অজানা মন্ত্র দিয়ে
ডেকে আনে পাখ্ হারা মুখে নিরুক্ত মন নিয়ে—
তল খুঁজে মরি শুনি ভেসে আসে জলধের গর্জ্জন।
সূর্য্য ছড়ায় অপরূপ আলো আকাশের পথ ভরে—
তলের পাইনা ধরা দুপারেই চর শুধু ধূ ধূ করে।

একটি প্রেমের কাহিনী

শ্রীতন্ময় বাগচী

(মোপাসাঁ অবলম্বনে)

তখনও সন্ধ্যা হয় নি। অস্ত-রবি তার রক্তিম রশ্মি-আভা গাছের মাথা আর সমুদ্রের তরঙ্গকে স্পর্শ করে ধীরে ধীরে পূবদিকে মিশে যাচ্ছে। সমুদ্রতীরের গাছের ডালে প্রকৃতির শিশুরা তারি বিদায় সঙ্গীত গাইতে ব্যস্ত! গোধূলির এই ম্লান সন্ধ্যায় আমরা কয়েক বন্ধু চা খেতে খেতে সেই পুরাতন প্রেমের চিরন্তন মামুলী গল্প জৈঁদেছি। চা-রস-বিভোর কোন বন্ধু প্রণয়িনীর অধর সুধা পান করার মত রক্তাক্ত চিত্র-বিচিত্র পেয়ালায় অধরের স্পর্শ লাগিয়ে প্রেমের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে চলেছে। সমুদ্রধারের আইভি-লতার ঝোপে-ঢাকা ঘরে বসে আমাদের গল্প চলেছে। ডানলা ভেদ করেও স্পষ্ট দেখা যায় সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলা! সমুদ্রের ঢেউ-ছোওয়া ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের শরীরে এসে লাগছে। ম্লান গোধূলি মানুষের সাথে কি নিবিড় বাঁধনে বেঁধেছে জানি না, তবে দিনের আলো যতই নিভু নিভু হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যেও কেমন যেন এক উদাস বিষণ্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। আমাদের চা-রসসিক্ত গলার স্বরও সঙ্গে সঙ্গে নরম হয়ে আসে।

'কারো প্রেম কি চিরস্থায়ী হয়?'

'নিশ্চয়ই।'

'না···না কখনই হয় না—একেবারে অসম্ভব! সেদিন···'—বন্ধু জোকার উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল।

তখনই সুরু হোল এক বিরাট তর্কযুদ্ধ। হেনরিন সাইমন যেন এক বুলেটিন! সহরের সব দেরা খবর তার কণ্ঠস্থ! মুখখানা গম্ভীর করে, অনেক উদাহরণের সাহায্যে বিশেষ বিশেষ প্রেমের ঘটনার উল্লেখ করে, নিজের বক্তব্যকে আমাদের মনে চিরদিনের মত গেঁথে দেবার আশায় হাত পা নেড়ে অনর্গল বকে চলল।

হেনরিন অত্যন্ত ধীর স্থির আর শান্ত প্রকৃতির। তর্কের দিকে মোটেই পা বাড়াতো না। তাই হেনরিন সাইমনের উত্তেজনায় কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে বলল—'হেনরিন! আজে তর্ক করে এমন একটি অ ছ্য মাটি করে লাভ আছে কিছু? তার চেয়ে সবাই নিজের প্রেমের কাহিনী শোনাও না কেন? তাহলেই তো বোঝা যাবে প্রেম চিরস্থায়ী হয় কি না?'

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে নেমে এলো অখণ্ড নিস্তব্ধতা। সবার মনই নিজের নিজের প্রেমের স্মৃতির দোলায় দুলতে সুরু করে দিয়েছে। স্ত্রী আর পুরুষের দুটি হৃদয়ের মিলন রহস্যের কথা গভীর উৎসাহে কণ্ঠ ভেদ করে ডিঙে এসে মিশে যাচ্ছে। তাই সবাই নীরব।

এদিকে বিকাল ক্রমেই গড়িয়ে চলেছে সন্ধ্যার দিকে। সান্ধ্য-আকাশে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে ছোট একটি তারা। সমুদ্রতীরের শুকনো ফুল-বাগানের ঘুম ভেঙেছে, ফুল মুকুলে লেগেছে হাসির আনন্দাভা!

'দেখ···দেখ··· ঐদিকে তাকাও দেখি!'—সন্ধ্যার নীরব গাম্ভীর্য ভেঙ্গে হঠাৎ ছয় বুলেটিন হাত তুলে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল—'দেখ দেখি ঐদিকে!'

সমুদ্রের ওপর এক বিরাটকায় ধূসর রঙের অপরিচ্ছন্ন জিনিস আমাদের চোখে পড়ল। সবাই নির্বাক বিস্ময়ে ঐ দৃশ্য দেখতে লাগলাম!

জোকার বলল—'এ যে কাপ্রিকা দ্বীপ! এর মত আশ্চর্য আর কিছু নেই। এই দ্বীপ বছরে দু'তিনবারের বেশী দেখা যায় না। প্রকৃতির কয়েকটি বিশেষ নিয়মে আর বায়ুর গুরুত্ব মত মাঝে মাঝে কুয়াশার আবরণ ভেদ

ওরে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে। চলেছি কার্সিকা দ্বীপের পাহাড়গুলো একটু বিভিন্ন রকমের।'

লোকটির কথায় অবাক্ হয়ে আমার সেই সমুদ্রের মাঝে কার্সিকা দ্বীপের দিকে তাকালাম।

আমাদের থেকে খানিকটা দূরে এক বৃদ্ধ এতক্ষণ নিশ্চুপে কানে আমাদের কথা শুনছিল। এবার সে তার সমস্ত শরীরে একটা নাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসতে আসতে বলে—'এই কার্সিকা দ্বীপের সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানি আমি। বলছি শোন—! প্রথমেই বলে রাখি যে-কথাগুলো তোমাদের শোনাব—সে-সব অনেকদিন আগের কথা। আমাকে ভেবে ভেবে বলতে হবে। এতক্ষণ যা নিয়ে তুমি করছিলে আমার এ কাহিনীও সেই প্রেমেরই। শুনে মনে হয়ে হয়ত এ গল্পের মানুষ দুটির প্রেম সত্যি চিরস্থায়ী হয়েছিল। আর এই যে দ্বীপটা ভেসে উঠেছে আমার মনে হয় তোমাদের তর্কযুদ্ধ মেটাবার জন্যেই বোধহয়।'

কথা বলার ফাঁকে একটুখানি থেমে বৃদ্ধ লোকটি আবার বলে চলে—'যৌবনে আমি নিজে একবার কার্সিকা দ্বীপে গিয়েছিলাম। তখন ঐ অর্ধসভ্য দ্বীপের কথা মাঝে মাঝে অল্প একটু শোনা যেত। আজ আমরা ফ্রান্সের তটপ্রান্ত থেকে কার্সিকাকে যত কাছে মনে করি, বাস্তবিক সেটা তত কাছে নয়—আমেরিকার চেয়েও অনেক দূরে। মনে মনে এমন একটা রহস্যময় জগতের কথা কল্পনা করে নাও যার অস্তিত্ব এখনও অনেকের কাছে অজানা রয়েছে। কতকগুলো পাহাড় আর চারিধারের প্রবল পূর্বস্রোতের কথা কল্পনা কর, কল্পনা করো এমন একটি দেশ যেখানে বাস করবার মত এতটুকু সমতল বায়গা নেই—চারিধারে শুধু লতাপাতা আর বাদাম গাছে ভরা। এই বায়গার মাটি অকর্ষিত, অবহেলিত আর অসুন্দর। মানুষের বসবাসের চিহ্নস্বরূপ দুর্গম বনে পাহাড়ে দু' একটা কুঁড়ে ঘরের দেখা পাওয়া যায়, আর দেখা যায় পাহাড়ের শিখরে স্তূপীকৃত শিলারাজি। এই অসভ্য দ্বীপবাসীদের শিল্প-নৈপুণ্যের কোন নিদর্শন পাবে না, মানুষের কল্পনা আর প্রতিভা যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করে এ খবর তাদের স্বপ্নেরও গোচরে। প্রথম মানুষের মতই তারা চিরদিন অর্ধসভ্য—যেন যুগযুগান্তর থেকে বাস্তব জগতে বংশানুক্রমে বাস করেও পারিপার্শ্বিক বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

'ইতালী···! কি সুন্দর আর সুসভ্য দেশ-ই না এই ইতালী! সভ্য জগতের মুকুটমণি এই ইতালীতে গেলে দীন-দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে রাজপ্রাসাদে পর্যন্ত প্রতিভাশালী শিল্পীর অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যের দর্শন পাবে। চারিধারে সভ্য জগতের প্রাণবন্ত রুচির নিদর্শন মাখানো। মনে হবে ইতালী-ই যেন শিল্পীর মানস-কল্পনা-প্রসূত শিল্প-সৃষ্টি! কলালক্ষ্মীর আনন্দভবন! তারি পাশে কার্সিকা···! স্বর্গ আর নরক যেন!'

বৃদ্ধ ঘৃণায় চোখমুখ কুঁচকে এক অদ্ভুত মুখভঙ্গী করল। তারপর এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলতে লাগল—'অতি প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এই দ্বীপবাসীরা সভ্য জগতের সামনে নিজেদের দাঁড় করাতে পারল না। সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের জীবিকা আর ঝগড়া ছাড়া অন্য সব বিষয়ে উদাসীন হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তারা যেমন হিংসাকলহপরায়ণ তেমনি রক্তপিপাসু। এত দোষ ছাড়াও তারা গুণে বঞ্চিত নয়। তাদের মত অতিথি-সেবাপরায়ণ, উদার ও সরলের দেখা পাওয়া ভার। তারা অপরিচিত আগন্তুক অতিথিকে অসংকোচে আতিথ্য দেয়। পরম আত্মীয়ের মতই সেবা যত্ন করে।

হ্যাঁ এবার আসল প্রসঙ্গে আসি। ঘটনাচক্রে এই চমৎকার দ্বীপে আমাকে একমাস কাটাতে হয়েছিল, যে-কদিন ছিলাম কেবলি মনে হোত আমি যেন জগতের এক অনাবিষ্কৃত প্রান্তে এসে পড়েছি। এখানে কোন হোটেল নেই, নেই কোন পান্থশালা। রাজপথও নিশ্চিহ্ন! ঘোড়ার পিঠে চড়ে এখানকার ছোট ছোট গ্রামে গেলে দেখতে পাবে গ্রামগুলো যেন পাহাড়ের গা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কি সকাল, কি দুপুর, কি সন্ধ্যা—সব সময়ই নির্ঝরমুক্ত জলরাশির সুগভীর পতনধ্বনিতে চারিদিক মুখর। দরজায় দরজায় আঘাত করে আশ্রয় চাইলে গৃহস্বামী সাদরে আর সানন্দে আশ্রয় দেবে। দীন পরিবারে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে বিদায় প্রার্থনা চাইবার সময় দেখবে বাড়ীশুদ্ধ সবাই তোমার পথের সঙ্গী হয়েছে কিছুটা। কার্সিকা দ্বীপবাসী অসভ্য বর্বর বটে, কিন্তু অতিথির সম্মান দিতে একটুও ইতস্ততঃ করে না।'

বৃদ্ধ কথার মাঝে জানলার বাইরে তাকিয়ে সেই কার্সিকা দ্বীপ তখনও দেখা যাচ্ছে কিনা দেখতে চেষ্টা করছিল। পল এই কাহিনী শুনছিল কিনা জানিনা, তবে বৃদ্ধের ঘৃণা আর হতাশা মাখানো বুগুভঙ্গী আর উৎসাহ—আনন্দোচ্ছ্বাসের কথাগুলো চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বার সময় বেশ লক্ষ্য করছিল। তার্কিক জোকার তার পাইপের জন্য ছুরী দিয়ে তামাক কাটছিল। বৃদ্ধ আমাদের সবাইকে ধূমপান করতে দেখে নিজের পকেট থেকে একটা নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে আবার বলতে সুরু করল—'একদিন ক্রমান্বয়ে দশ ঘণ্টা হেঁটে অত্যন্ত ক্লান্ত শরীরে সন্ধ্যার সময় উপত্যকার কাছে একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। এখান থেকে সমুদ্র খুব বেশী দূর নয়। লতা-পাতা ঢাকা দুটো পাহাড় আছে একপাশে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাহাড় দুটি এই নীরব উপত্যকাকে যেন মাতৃ-স্নেহাঞ্চলে ঢেকে রেখেছে। কুঁড়ের চারিদিকেই দ্রাক্ষা বন। আরো খানিকটা দূরে কয়েকটা বাদাম গাছ। ক্ষুদ্র সংসারের পক্ষে এই পর্যাপ্ত! সেই কুঁড়ের দরজায় ঘা দিতেই দরজা খুলে এক বৃদ্ধ মহিলা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বৃদ্ধা বেশ গম্ভীর, আর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে এক বৃদ্ধ মোড়ায় বসেছিল। আমাকে দেখা মাত্রই উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়ে আবার বসে পড়ল। বৃদ্ধের দিকে আমাকে তাকাতে দেখে বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—'ওঁকে মাপ করবেন। উনি সম্পূর্ণ বধির, আর বয়স বিরাশী বছরেরও বেশী।'

'তাঁর নির্ভুল ফরাসী ভাষায় উচ্চারণে আমি অবাক না হয়ে পারি না। ঘরগুলো বেশ সাজানো; চারিদিকে বিলাসিতার উপকরণে উজ্জ্বল—কিন্তু সুরুচি আর সৌন্দর্য-বোধ এমনভাবে মাখানো যা দেখলে চোখ পীড়িত হয় না মোটেই। দেওয়ালে নানা রঙের ছবি, সৌন্দর্যের আড়ালে ইঁট কাঠের কাঠিন্য একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। চারি-দিকে কেমন যেন কোমলতা-মাখা শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। বিস্ময়ের পালা ক্রমেই বেড়ে চলে। যতই দেখছি ততই বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যাই। তার ওপর বৃদ্ধার পরিষ্কার ফরাসী ভাষার কথা! প্রবল বিস্ময়ের সাথে একসময় বৃদ্ধাকে জিগ্‌গেস করে ফেললাম—'আপনি কি কার্সিকার লোক নন?'

'না মসিঁয়ে! আপনার মত মহাদেশের লোক আমরাও। এখানে আমাদের বাস পঞ্চাশ বছরেরও বেশী।'

আমি আরো অবাক হয়ে যাই। পঞ্চাশ বছর এই জনমানবহীন দুর্গম অরণ্যে কি করে বাস করছে তা ভেবে ঠিক করতে পারি না। বৃদ্ধার সাথে যতই কথা হয় আমার বিস্ময়ের পালা ততো বেড়ে যায়। খানিকবাদে এক কৃষক আসতেই আমরা আহারে বসলাম। আহার্যের উপকরণ সামান্য—মহাদেশবাসী আমাকে আহার্য দেবার সময় বৃদ্ধার চোখেমুখে সংকোচের ভাব ফুটে উঠেছে দেখে গভীর তৃপ্তির সাথে আহারে প্রবৃত্ত হলাম। বৃদ্ধারও আনন্দের সীমা নেই। নারীর অন্তরে কোমলতা আর মাধুর্য বৃদ্ধার জরাকে গ্রাস করে নিয়েছে। বহু যুগের ওপর থেকে আজ এক মহাদেশবাসী অতিথিকে পেয়ে অতিথি-সৎকারের আনন্দ বৃদ্ধার অন্তরে উপচে পড়তে লাগল।

'সামান্য আহার্য অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। আমি দরজার কাছে এসে বসলাম। নানা চিন্তা আমার মনে অনবরত ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এ কোথায় এলাম আমি···? এরা কারা···? মহাদেশ ছেড়ে এই অসভ্য বর্বর দ্বীপের দুর্গম অরণ্যে বাস করছে কেন···? রাত যত বেড়ে চলেছে অন্ধকার ততই গাঢ়ো হয়ে আসছে। জনহীন অরণ্যের নির্জন অন্ধকারের রাতে একা বসে মনের মধ্যে এক করুণ সুর যেন শুনছি। জেগে-জেগেই আমি যেন স্বপ্ন দেখছি!

গৃহকর্ম শেষ করে বৃদ্ধা আমার কাছে এসে বসলেন।

'আপনি বোধহয় ক্লান্ত থেকে আসছেন?'

'হ্যাঁ। সখের ভ্রমণে বেরিয়েছি আমি!'

'তাহলে কি বরাবর প্যারিস্ থেকেই আসছেন?'

'না ফ্লান্সি থেকে।'

ফ্লান্সির কথা শুনেই কেন জানি বৃদ্ধার চোখে মুখে এক উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল। ঘরের বাইরে দরজার কাছে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে জগতের অন্যান্য বধিরদের মতই সুখ-দুঃখ বোধশূন্য অসহায় লাগছিল আমার। বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বৃদ্ধা বলে উঠলেন—'ওঁর জন্য ভাববার প্রয়োজন নেই, আপনি বলে যান। আমাদের কথার একটি বর্ণও উনি বুঝছেন না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁত দিয়ে হাতের নখ কেটে বৃদ্ধা আবার বললেন—'ফ্লান্সির সবাইকে আপনি চেনেন বোধহয়?'

সম্মতির ঘাড় নাড়লাম শুধু।

'ফ্লাট এলিয়ট পরিবারকে চেনেন?'

'খুব ভালো করে। তারা আমার বাবার পরম বন্ধু।'

'আপনার নামটা জানতে পারি?'

পুরো নাম শুনে বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নিষ্পলক নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নীচু করে

লোকে যেমন কোন বিষয় চিন্তা করতে করতে আপন মনে বকে চলে তেমনি বিগত স্মৃতিকে ভাগিয়ে তুলে আপন মনে বলে চললেন—'হাঁ হাঁ···আমার বেশ মনে পড়ে। আচ্ছা ক্রিস্ মেয়েদের খবর জানেন ?'

'তাঁরা সবাই মারা গেছেন।'

দুঃখ-সূচক মুখভঙ্গী করলেন বৃদ্ধা !

'আপনি সাইরেমন্টকে চেনেন ?'

'হাঁ। তবে তাদের পুরুষ একজন সেনাদলে ঢুকেছে।'

আমার কথা শুনে বৃদ্ধা যেন চমকে উঠলেন ! তাঁর চোখ মুখের ভাব দেখে কেন জানি আমার মনে হয় এতদিন হৃদয়ের গোপন গহ্বরে যে কথাগুলো লুকানো ছিল সেগুলো শোনাতে ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

'এই হেনরী আর ডি সাইরেমন্ট-ই আমার ভাই।'

বৃদ্ধার কথা শুনে পরম বিস্ময়ে বৃদ্ধের দিকে তাকালাম আমি। ধীরে ধীরে আমার মনে পড়তে লাগল অনেকদিন আগে হোরেসের এই সম্ভ্রান্ত বংশে কি যেন এক গণ্ডগোল হয়েছিল। সব ঘটনা মনে নেই, তবু এইটুকু মনে পড়ল এ বংশের সুজেন ডিসগ্রামন্ট নামের এক কিশোরী এক সৈনিকের প্রেমে পড়ে। কিশোরীর পিতা সেই সেনাদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। আর ঐ সৈনিক এক কৃষক-পুত্র। কিন্তু দেখতে এত সুন্দর আর সুপুরুষ ছিল যে তাকে কৃষকের পুত্র বলে মনেই হোত না। তার উন্নত ললাট আর বিস্তৃত বক্ষের সাথে দিব্য কান্তি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। প্রত্যেকটি কথাবার্তা আর অঙ্গভঙ্গী যেন ধীরত্বব্যঞ্জক। সব সময় মূল্যবান পোষাক পরে থাকতো। ভগবান শুধু তাকে শারীরিক সৌন্দর্য-ই দেননি মানসিক সৌন্দর্যও দিয়েছিলেন প্রচুর। সৈনিকটি অবসর সময়ে নিপুণ হাতে ছবি আঁকতো।

'একদিন শোনা গেল সৈনিক অসুস্থ হয়েছে। সেই সৈন্যাধ্যক্ষের কন্যা সুজেনও নিরুদ্দেশ। অনেক অনুসন্ধান করেও তাদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। ক্রমে ক্রমে কাকাশে হতে হতে একদিন সবার মন থেকেই মুছে গেল তার রেশ !

কিছুদিন সবাই ভাবল—আমিও অবশ্য সে দলে ছিলাম—সুজেন হয়ত মৃত। কিন্তু এখন সেই সবার মধ্যের আমি একজন দেখছি সেই কিশোরী সুজেন এখন লোলচর্মা বৃদ্ধা। এই নির্জন প্রান্তের নিবিড় অরণ্যে প্রেমাস্পদকে নিয়ে সুখের সংসার পেতেছে। আর ঘটনাচক্রে আজ আমিই তাদের অতিথি·····'

গল্প বলতে বলতে হঠাৎ থেমে পড়ে এক টিপ নস্যি নিল বৃদ্ধ। আর পল দু' চোখ বুঁজে ভাবে বিভোর হয়ে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

'আমি বৃদ্ধাকে বললাম—আপনি তাহলে সেই সুজেন !'

বৃদ্ধা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তিনি-ই সুজেন, আর ইংগিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে বললেন—'ইনি সে-ই সৈনিক।'

আমি স্পষ্ট দেখলাম বৃদ্ধা সুজেন এখনও তাঁকে ভালোবাসেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে এখনও তাঁর দিকে তাকান !

'আপনারা বেশ সুখী হয়েছিলেন বোধ হয় ?'

'নিশ্চয়ই !'—অত্যন্ত গাঢ় স্বরে বৃদ্ধা জবাব দিলেন—'আমরা সত্যি সুখী হয়েছিলাম। আমাকে কখনও অনুতাপ করতে হয় নি।'

বৃদ্ধার চোখে মুখে যৌবনের মোহময় দীপ্তি অনুরাগ যেন আবার সগৌরবে ফুটে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমি মুগ্ধ নয়নে সেই মহিমাময় শক্তির আকর্ষণ দেখলাম।

'জীবনে যে সুখ ভোগ করেছি তা অতুলনীয়। এই জীবন-সায়াহ্নেও আমরা সুখী বেশ। এখন পরপারের খেয়ায় বসে কেবলি ভাবছি এক বৃন্তে দুটি ফুলের মত ফুটে ভগবানের অশেষ দয়ায় আমরা দু'জন মিলিত হয়েছিলাম আজও যেন তেমনিভাবে তাঁর চরণে দুটি হৃদয় উৎসর্গ করতে পারি।'

কি সুন্দর···! কি চমৎকার···! কোথায় এই পদস্থ সৈনাধ্যক্ষের কন্যার বিবাহ দেশের শ্রেষ্ঠ ধনীর সাথে হবে, মর্মর প্রাসাদের মাঝে কোথায় এরা কপোত-কপোতীর মত সব সময় প্রেমপূর্ণ নয়নে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে কত সুখ-স্বপ্ন দেখবে—না একজন কৃষক পুত্রের পত্নিত্ব বরণ করে নিয়েছে। বিলাসিতার সব রকম উপকরণ ত্যাগ করে এই দুর্গম অরণ্যে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। স্বামী ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা বা স্বপ্ন, সুন্দর মূল্যবান কারুকার্যপূর্ণ হীরে জহরতের অলংকার প্রভৃতি নারী জীবনের কাম্যের প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই। প্রস্ফুটিত যৌবনেই পার্থিব সমস্ত সুখ উপেক্ষা ! আমরণ তাঁর স্বামী-ই পার্থিব জগতের একমাত্র সুখ-কল্পনা-আশা-আকাংখা। এর চেয়ে সুখের কল্পনা বৃদ্ধার যেন আর কিছুই নেই।

বৃদ্ধের বিকট নাক-ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে আর বৃদ্ধার সাথে গল্প করতে সারা রাত কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল। পরদিন এই প্রেমিক-যুগলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলাম।

• • • •

দিগন্তরের নীচে কার্সিকা দ্বীপ সন্ধ্যার কুয়াশা আর অন্ধকারের মাঝে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। মনে হচ্ছে এই ছায়াচিত্র যেন রামধনুর মত আকাশের গায়ে মিশে যাচ্ছে। কেন জানি না, আমিও মনে করতে লাগলাম এই কার্সিকার ছায়াচিত্র দুটি আত্মহারা প্রেমিকের কাহিনী শোনাবার জন্যই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছিল।

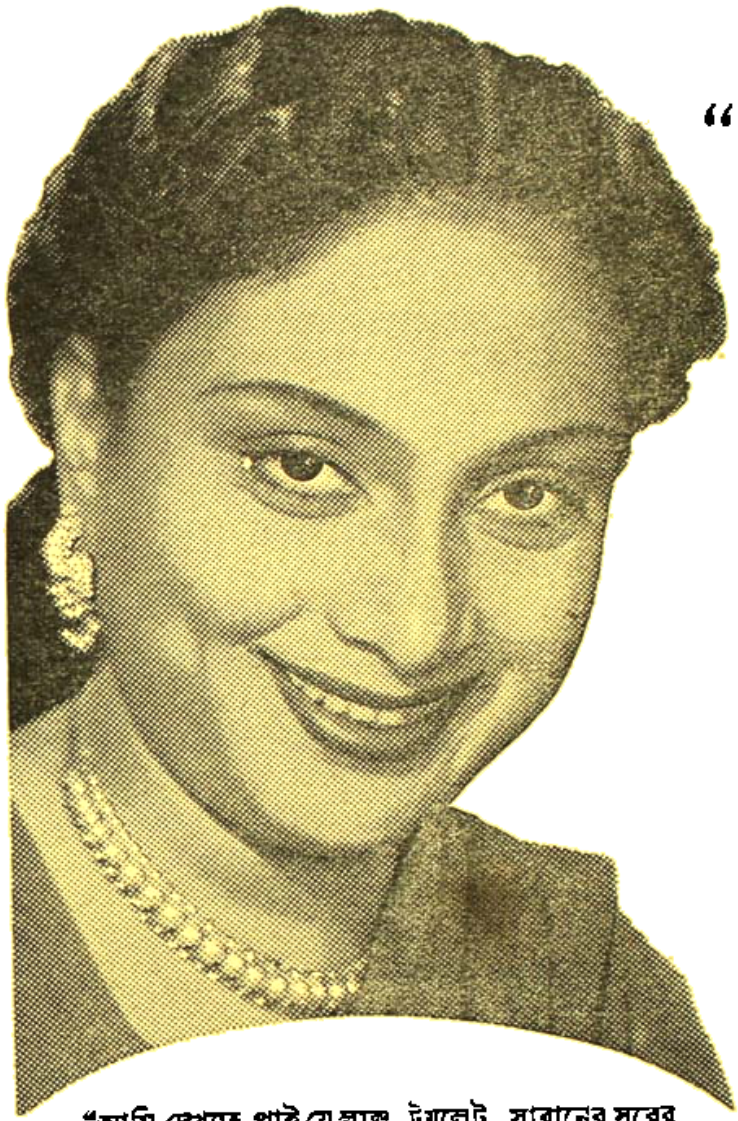

"আমার মতে...

...লাক্স টয়লেট্ সাবান ব্যবহার করলে আপনি আরও সুন্দর হতে পারেন"

মলেয়া সরকার বলেন

"আমি দেখতে পাই যে লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সরের মত ফেনা আমার মুখশ্রীকে আরও সুন্দর কোরে তোলে" মলয়া সরকার বলেন। "নিয়মিত ব্যবহার কোরলে এই বিশুদ্ধ, শুভ্র সাবানটি আমার গায়ের চামড়াকে রেশমের মত নরম রাখে।"

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 375-X52 BG

[illegible] ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিদেশী শাসকের শাসন-বন্ধন থেকে নিজেদের দেশকে আবার মুক্ত স্বাধীন করে তুলেছিলেন। সেই অপরূপ মুক্তি আন্দোলনে বিরাট কীর্তির অধিনায়ক প্রতীক হিসাবে সে-যুগের রণজনগণ ক্রেমলিন্ দুর্গ-প্রাসাদের সামনে সেই লেনিন কাথিড্রালের কাছে মস্কোর সুপ্রসিদ্ধ 'লাল-চত্বর' বা Red Square-এর উপর দেশপ্রেমী বিপ্লব-নেতা কজমা মিনিন্ ও ডিমিট্রি পোঝারস্কীর যে বিরাট মর্মর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন—আজও সোভিয়েট আমলে তা অক্ষয় অটুট রয়েছে। দেশের জনসাধারণ বিগত-কালের এই দুই নির্ভীক মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের মূর্তির পাদপীঠে দাঁড়িয়ে অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানায় আজও।

দেশ থেকে পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের তাড়িয়ে, বিজয়ী রুশবাসী তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন 'জার্'-শাসন-ব্যবস্থায়! তবে এবারে তারা তাঁর গ্রহণ করলেন রুষিক-প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন রাজবংশের সুতপুত্র

সম্রাট চতুর্থ আইভানের সম্পর্কীয় রোমানফ্ বংশের এক তরুণ বংশধর—মাইকেল রোমানফ্। সেই থেকে ১৯১৭ সালের প্রথমার্ধকাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ তিনশো-চার বছর ধরে রোমানফ্ বংশের 'জার্'গণ দেশের সার্বভৌম-অধিপতি হিসাবে একচ্ছত্র রাজত্ব করে গেছেন—বহু বিচিত্র উত্থান-পতনের প্রবাহে ভেসে। ভাগ্যচক্রে, মস্কোর রাজ-সিংহাসনে রোমানফ্ রাজাদের প্রতিষ্ঠা-লাভের ব্যাপার যেমন বিচিত্র নিয়তির মিথুন বিধানে সে আসন থেকে তাঁদের নির্বাসনের কাহিনীও তেমনি মর্মান্তিক করুণ!

'জার্' বোরিস গোডুনভের জীবিতকালে রুশ সিংহাসনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাবী করার দরুণ রোমানফ্-বংশীয় রাজ-অমাত্য ফিলারেটকে রাজরোষ থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেষে ধর্মযাজকের বৃত্তি নিয়ে দেশের ধর্মমন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়! সন্ন্যাসীরূপে এসে ফিলারেট রোমানফ্ নূতন নাম নিলেন—সাধু ফিলারেট। নব-প্রতিষ্ঠিত রোমানফ্ রাজ-বংশের প্রথম রাজা তরুণ-'জার্' মাইকেল রোমানফ্ হলেন এই সাধু ফিলারেটের পুত্র।

নিজের অমায়িকতাগুণে সাধু ফিলারেট কালে রুশরাজ্যের বিশিষ্ট ধর্মনেতা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। তাছাড়া পোলাণ্ডের বিদেশী-শাসকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম-পরিচালনার ব্যাপারে বিপ্লবী জনগণকে সহায়তা করার দরুণ বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে তিনি দেশের সকলের পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কাজেই ধর্মপ্রাণ দেশপ্রেমিক সাধু ফিলারেটের তরুণ পুত্রকে রাজ্যের অধীশ্বর হিসাবে গ্রহণ করতে রুশ প্রজাদের কোন আপত্তি ছিল না। উপরন্তু রুশ-স্বাধীনতার মন্ত্রগুরু পুণ্যাত্মা ঋষি হার্মোজেন প্রেরণা দিলেন সম্রান্ত রোমানফ্ বংশধর ফিলারেটের পুত্রকে যেন মস্কোর সিংহাসনে 'জার্'-রূপে অভিষিক্ত করা হয়। সুতরাং দেশ থেকে বিদেশী শত্রু অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর 'Zemisky Sobor' বা 'রাষ্ট্রীয় গণ-পরিষদের' এক অধিবেশনে দেশের জনসাধারণ সর্ববাদী-সম্মতিক্রমে সাধু ফিলারেটের তরুণ পুত্র মাইকেল রোমানফ্‌কে রাজ্যের সার্বভৌম সম্রাট নির্বাচিত করা হয়। সিংহাসনের আশেপাশে স্বার্থান্বেষী অমাত্যকুলের কুটিল-চক্রান্ত আর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর প্রিয়তম পুত্রের গায়ে প্রাণহানি ঘটে, এই আশঙ্কায় মাইকেল রোমানফের মাতা নার্থা প্রথমে প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এই 'জার্'-নির্বাচনের ব্যাপারে। কিন্তু দেশের রাজ-অমাত্যেরা এবং 'প্রজা-পরিষদের' সদস্যেরা যখন আন্তরিক আগ্রহে রাজার আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন, তখন পুত্রকে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে দিতে মায়ের আর আপত্তি রইলো না! তবে সর্ত হলো যে, পুত্র মাইকেল অপ্রাপ্তবয়স্ক বলে যতদিন না তিনি সাবালক হন, ফিলারেট তরুণ 'জারের' প্রতিভূ হিসাবে রাজকার্য পরিচালনা করবেন।

তারপর ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি ক্রেমলিন দুর্গপ্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্জনে মহা আড়ম্বরে নব-নির্বাচিত 'জার্' মাইকেল রোমানফের অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। সে উৎসবে দেশের রাজ-অমাত্যবৃন্দ, সম্রান্ত ভূমাধিকারীরা, ধর্মযাজকের দল এবং সাধারণ প্রজাবর্গ সবাই দলে দলে যোগদান করে নবীন 'জার্'কে বিপুল অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

নবীন-'জার্' মাইকেল রোমানফ্ কিন্তু ছিলেন নিতান্ত দুর্বল-চরিত্রের মানুষ···রাজ-কার্য পরিচালনার চেয়ে আরাম-বিলাস আর অলস আমোদ-প্রমোদ নিয়েই তিনি মেতে থাকতেন সারাক্ষণ। তাঁর এই উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে দেশের শাসন-ব্যবস্থা ও রাজ-কার্যাদির দেখাশোনা করতেন রাজ্যের অমাত্যবৃন্দ এবং প্রতিপত্তিশালী জমিদারের দল। তাছাড়া রোমানফ্-বংশীয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তা করার ফলে দেশের ধর্মযাজক-সম্প্রদায় রাজনৈতিক এবং সামাজিক-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। রাজ্যের রাজা এবং প্রজা-সাধারণের উপরে ক্যাথলিক ধর্ম-যাজকদের প্রতিপত্তির ফলে ধর্মের দোহাই আর নানা কুসংস্কারে

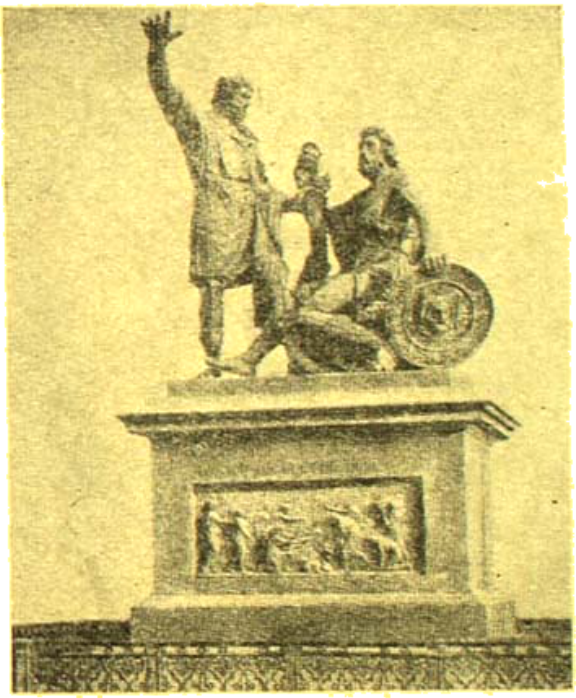

মস্কোর 'রেড্ স্কোয়ারে' প্রতিষ্ঠিত রুশ বীর কলম্বো মিনিন ও ডিমিট্রি পোঝারস্কীর মূর্তি

দেশ ছিল আচ্ছন্ন। দেশে খানিকটা শান্তি ছিল এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশারও কতক উপশম হয়েছিল! তবে দীন-দরিদ্র ভূমি-দাস কৃষক এদের অবস্থার উন্নতি ঘটেনি—নূতন-'জারে'র আমলে। বরং—রাজানুগৃহীত অমাত্য-ধর্মযাজক, প্রতিপত্তিশালী জমিদার আর মহাজনদের অবাধ-শোষণ এবং মিথুন-মিথ্যাচরণে তাদের দুর্ভোগ-দুর্দশা চরমে ওঠে! তাদের পানে কেউ ফিরে তাকাতো না—তাদের ভাগ্য নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না! নিজেদের বিলাস-বিভব-প্রতিষ্ঠা নিয়েই তাঁরা মশ্‌গুল থাকতেন। দেশের ধর্মযাজক-সম্প্রদায়ও এ সম্বন্ধে ছিলেন একান্ত উদাসীন!

তারপর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে 'জার' আলেক্সিস রোমানভের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেক্সিস্ মোল বছর বয়সে হলেন কশ-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে আলেক্সিস্ ছিলেন তাঁর পিতার অনুরূপ। তাঁর রাজ্য-চালনার ভার ছিল পার্শ্বচর-অমাত্য আর মন্ত্রী-মণ্ডলীর উপর। তিনি থাকতেন নিজের বেয়াল-খুশীমত ছবি-আঁকা, কবিতা লেখা কিংবা পাখ-পাখী উড়িয়ে শিকার নিয়ে। কর্তব্যে উদাসীন রাজার মন্ত্রীরা ছিলেন কিন্তু সুদক্ষ। তাঁদেরই শাসন-ব্যবস্থায় রাজ্যের বহু উন্নতি এ-সময়ে সম্ভব হয়েছিল। 'জার' আলেক্সিসের বিদেশ-মন্ত্রী আখানাসি ওস্তুইন্-লাশ্‌চোকিনের যাবস্থায় পারস্য এবং মাঞ্চুরিয়া-রাজ্যের উপকূলস্থ রাজ্য-গুলির সঙ্গে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বন্দোবস্ত এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি হয়ে ওঠে। বৈদেশিক-বাণিজ্যের প্রসার-কল্পে আখানাসির পরামর্শে কশ-সরকার বিভিন্ন-বিদ্যাই বাণিজ্য-তরী,

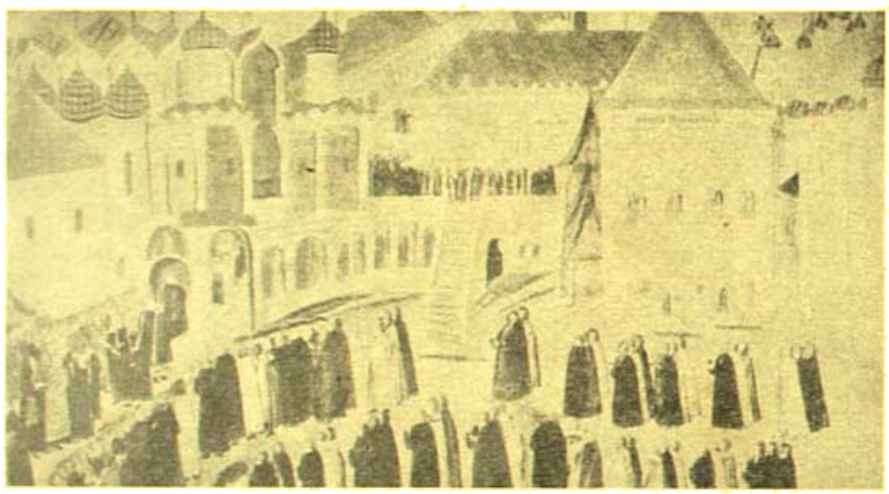

মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গ প্রাসাদের খৃষ্টীয় প্রথম রোমানভ্ 'জার' মাইকেলের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পুরাতন প্রতিচিত্র

বর্ণবান প্রভৃতি তৈরী হয়েছিল। তাছাড়া সে-যুগে রাজ্যের সর্বত্র পথ-ঘাটের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়···রীতিমত দুর্গম! সে-পথে দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া লোকজনের পক্ষে ছিল প্রাণান্তকর ব্যাপার···লাগতো প্রচুর। এ-দুরবস্থা মোচনের জন্য মন্ত্রী আথানাসির নির্দেশে দেশের যত পুরোনো পথ-ঘাটের আমূল সংস্কার হয় এবং বহু সুদীর্ঘ পাকা-সড়ক তৈরী হয়। সর্বত্র পথ-ঘাটের সুব্যবস্থা এবং চিঠিপত্র-সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধার জন্য ডাক-বিভাগের উন্নত-বন্দোবস্তে রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বহির্জগতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে বেশ সুযোগ মিলেছিল। তার ফলে, ইউরোপের তখনকার নানা প্রগতিশীল-রাষ্ট্রের উন্নত সামাজিক এবং রাজনৈতিক অনুষ্ঠান ও ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মন্ত্রী আথানাসি, প্রাচীন-পন্থী রাজ্যের নানা সংস্কারে 'জার' আলেক্সিসকে বিশেষ অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অমন সুব্যবস্থা সত্ত্বেও, 'জার' আলেক্সিসের আমলে রাজ্যে জেগে উঠলো অসন্তোষের তীব্র আগুন! বিলাস-মত্ত সম্রাট দেশের সাধারণ প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে একান্ত উদাসীন—তাঁর এই ঔদাসীন্যের সুযোগে পার্শ্বচর আথানাসি এবং বিত্তশালী জমিদারের দল রাজ্যের ধর্মযাজক-সম্প্রদায়ের সাহায্যে দৌর্দণ্ড-প্রতাপে সাধারণ দীন-দরিদ্র প্রজাদের উপর অবাধ অত্যাচার চালাবার নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করে। রাজা ছিলেন অতিমাত্র অমাত্য-জমিদার আর মহাজনদের হাতের মুঠোয়—কাজেই অসহায় প্রজাদের কাতর-অনুনয়-ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি! রাজ্যের মুষ্টিমেয় জমিদার, মহাজন আর রাজ-পরিবারের লোকেরাই ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের অধিকাংশ জমির মালিক। এঁদের শোষণ আর নিগ্রহের ফলে রাজ্যের দরিদ্র অসহায় কৃষক-শ্রেণীর দুর্দশা এমন হয়ে উঠেছিল যে জমি ছেড়ে দূর-দূরান্তে দুর্গম-অঞ্চলে পালিয়ে জীবন কাটাতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা রইলো না! এই সব মরিয়া কৃষি-শ্রমিকদের অন্তর্ধিত-অন্তর্ধানে জমির মালিকদের দারুণ অসুবিধা ঘটলো—তাঁরা রাজার শরণাপন্ন হলেন। 'জার' আলেক্সিসও অনুগৃহীত পার্শ্ব-চরদের প্রয়োচনায় ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এমন কড়া-আইন জারি করলেন যে তার ফলে দেশের দরিদ্র-অসহায় কৃষক-সম্প্রদায় হলো অতিমাত্র ভূমি-দা স কে র কে না-গোলামের সামিল!! চাষের দরুণ উচ্চহারে খাজনা দেওয়া ছাড়া বিনা-মজুরীতে নিজস্ব সরঞ্জাম দিয়ে জমিদারের খাস-জমিতে এমন কি বা ড়ী র কাজ-কর্মেও ভূমি-দাস কৃষকদের খাটতে খাটিয়ে অতিনব ধরণের 'খাটুনি-খাজনা' দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হলো। তাছাড়া রাজার এই আদেশ-ফরমানের বিধানে জমিদার-মালিকের অনুমতি ছাড়া ভূমি-দাস কৃষকদের জমি ছেড়ে অন্য কোথাও অপর কারো জমিতে কাজ-কর্ম করার অধিকার রইলো না।···এমন কি জমিদারের কাজের পর নিজেদের অবসর-সময়েও ভূমি-দাস কৃষকেরা অন্য কোথাও গিয়ে বাড়তি-খাটা খেটে কিছু রোজগার করবে বা অন্য কাজ-কর্ম, কি, ক্ষেতের টুকিটাকি কখন কেচে দু'চার পয়সা রোজগার করবে, সে স্বাধীনতাটুকুও কৃষকদের রইলো না! জমি-মালিকদের নির্মম-নির্যাতন এড়িয়ে পালিয়ে যারা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতো, তাদের ধরে এনে অতি কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। এমন কি, রাজ্যের কোথাও কেউ যদি দয়া-পরবশ হয়ে কোনো পলাতক কৃষি-শ্রমিককে আশ্রয় দেছেন বা কোনো রকম সাহায্য করেছেন বলে খবর পাওয়া যেতো, তো রাজার বিধানে, তাঁকেও বংশপরম্পরায় দণ্ড ভোগ করতে হতো! বিক্রী বা হস্তান্তরিত হয়ে কোনো জমির মালিকানা পাল্টালে, সে-জমিতে যে-সব ভূমি-দাস কৃষক থাকতো—ইট-কাঠ-পাথরের মত তারাও বিক্রীত-

দেখুন, ডালডা বনস্পতি কিনলে কত দিক দিয়ে আপনার লাভ হবে

সর্বত্রই গৃহিনীরা বলেনঃ

"ডালডা কিনুন- তাহোলে পয়সাও বাঁচবে ও আরও সুস্বাদু খাবারও রাঁধা হবে।"

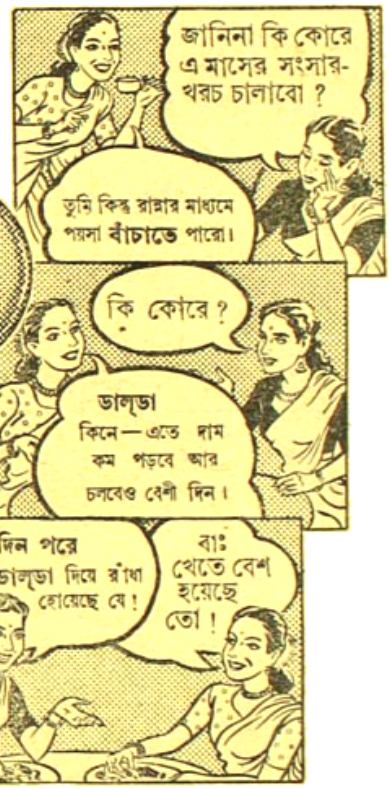

হিসেবী গৃহিনীরা প্রতিবারই ডালডা কিনে থাকেন। আমাদের দৈনিক খাবারে যে রকম স্নেহপদার্থ দরকার হয় বলে ডাক্তাররা বলেন ডালডায় ঠিক সেই জিনিসই আছে, আর ডালডার দামও কম। ব্যবহার কোরে দেখুন একটিন ডালডা কতদিন চলে আর কি চমৎকার খাবার এতে রান্না হয়! আজই একটিন ডালডা কিনুন।

রান্নার ব্যাপারে কি কোরে খরচ বাঁচানো যায়?
বিনামূল্যে উপদেশের জন্যে আজই বা যে কোনো দিন লিখুনঃ
দি ডালডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্ পোঃ অঃ, বক্স্ নং ৩৪৩, বোম্বাই ১

ডালডা

১০, ৫, ২, ও ১ পাউন্ড্ টিনে পাওয়া যায়

RVM. 192-X52 BG

সম্পত্তির অংশ-হিসাবে নূতন মালিকের সম্পত্তি হতো। সেখানে এমনি নিয়মের জোর জার্মাণ হতে কৃষি-শ্রমিকের দল অবশেষে দলে-দলে ভিড় করতে লাইবেরিয়ার এবং ভল্গা নদীর উপকূলে বন্ধুর কঠোর অঞ্চলে পালাতে সুরু করলে। তাদের সে-গতি বন্ধ করতে ১৯১৮ সালে শাসক এবং অভিজাত সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার আর উৎপীড়ন চালিয়েছিলেন—এই সব অব্যবস্থার ফলে দেশের সাধারণ জনগণের তখন না ছিল শিক্ষা···না ছিল শান্তি···না ছিল জোর হাঁ!

এছাড়া রাজ অবহেলা এবং স্বার্থান্বেষী অভিজাত-সম্প্রদায়ের অবাধ-স্বেচ্ছাচারিতায়—এ সময় যারা দেশ দুর্নীতি-অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার ভরে উঠেছিল। তাছাড়ে পোলাণ্ডের সঙ্গে বহুকাল ধরে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর চলিয়ার-বংশধরদের শেষের নির্যাতনে অতিষ্ঠ কৃষি-শ্রমিকের বেশীরভাগ হয়ে পালানোর হিড়িকে রাজ্যে চাষ-আবাদের অবস্থা সে-সময়ে নিতান্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। খাদ্য-শস্যের এই অভাব-অনটন আর রাষ্ট্রীয়-অব্যবস্থার দেশের মুদ্রা-মান হ্রাস পাবার দরুণ, রাশিয়ার বিত্তহীন শ্রমিক এবং সাধারণ-প্রজাদের এমন দারুণ অর্থনৈতিক-দুরবস্থা ঘটে যে তারা শেষে মরিয়া হয়ে দল বেঁধে প্রভু অভিজনে চালাই মঞ্চে, পেত্রোগ্রাড্ প্রভৃতি শহরের স্বেচ্ছাচারী অভিজাত-শাসকদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এত অনাচার-অব্যবস্থা ঘটেও, 'জার' আলেক্সিসের আমলের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা হলো—প্রবল যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী-রাষ্ট্র পোলাণ্ড আর সুইডেনকে হারিয়ে পশ্চাদ্বাপদ ইউরোপ দেশটিকে ক্রশ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা!

(ক্রমশঃ)

বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আমরা অতীত দিনের উদার জীবনই। অনাগত কালের মধ্যাহ্নেই আমাদের স্থান।

শ্বাসের জন্য নব নৈসর্গিক বায়ুর মুক্তগতি, মানুষের পক্ষে খোলা আছে আরও মুক্ত, আরও আনন্দময় জগত।

নিত্যপূর্ণ আত্মার আবরণ উন্মোচনেই মানবের পূর্ণতা।

অধ্যাত্মান্বেষার্থে সমাজই গড়তে পারে ছন্দ-মধুর ব্যক্তি এবং আনন্দ-মুখর গোষ্ঠী।

চলার পথের ভুল ভ্রান্তি, পথ ছাড়ার ভ্রম হতে শিক্ষাপ্রদ।

ব্যক্তি-মানব যা' করতে পারে জাতিও পারে সে কাজ করতে এবং পরিশেষে সকল হয় তেমন কর্ম-সম্পাদনে। কারণ বিশেষ মানুষই ভাবী-কালের নমুনা এবং অগ্রদূত।

আরও অন্তরঙ্গ ভ্রাতৃ ভাব; আজিও অনাবিষ্কৃত প্রেমের ধারা পূর্ণ সামাজিক অভিব্যক্তির দৃঢ় ভিত্তি।

একান্ত সহানুভূতি যেথায় নাই মানব তথায় নেতৃত্ব করতে পারে না।

আমাদের চলতেই হবে। যদি আমরা না করি অগ্রগমন, কাল আমাদের টেনে নিয়ে যাবেই সম্মুখে, যতই আমরা কল্পনা করি না কেন যে আমরা অচল।

মানুষের উন্নতির নাকেও সদাই থাকে কিছু অবাস্তব, কিছু অসমাপ্ত, কিছু বেদনা।

সকল দমন-নীতি এবং প্রতিরোধক ব্যবস্থা উপস্থিত বিপদের কবল এড়াবার কৌশল। প্রকৃত নীতি অন্তর হতে জাগবে। স্বাধীনতাকে খর্ব করে না সে নীতি, স্বাধীনতার পূর্তি এবং বিকাশই সেই নীতি।

সকল জ্ঞান অন্তরে নিহিত। শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানকে ফুটিয়ে তুলতে হবে, বাহির হতে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

মাত্র প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি হতেই আদর্শ উন্নত সমাজ গড়ে উঠ্‌তে পারে।

সকল আদর্শের পরীক্ষা শক্তির লাভে। কি ধর্মরাজ্যে কি সাংসারিক ব্যাপারে অদ্যাবধি কেহ শক্তি লাভের মোহ প্রতিরোধ করতে পারে নি। সবাই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আপনাকে কুঞ্চিত বা দোষ-বহুল করেছে।

নয় পরীক্ষার জন্য, না হয় আদর্শ-প্রতিষ্ঠার জন্যই মানুষ জীবন-সংগ্রামে ব্যাপৃত।

ব্যক্তি মানুষের সম্প্রসারণেই সমাজ।

ঐশ্বর্যবান ধনকুলীন, কর্ম-সফল প্রকাণ্ড ধনিক এবং শ্রম-শিল্পের প্রতিষ্ঠাতাই আজ ব্যবসায়ী যুগের মহামানব, আর প্রকৃত পক্ষে সমাজের শাসক।

সৌন্দর্য্য এবং আনন্দ অভেদ্য শক্তি।

সৌন্দর্য্য সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত কল্যাণের চিত্র নয়। বহু ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্য মুখোস-ঢাকা অমঙ্গল। তার অন্তরের বস্তু মঙ্গলময় নয়।

অতি প্রগাঢ় এবং সুনিশ্চিত রাজনৈতিক সংস্কৃতিও জ্ঞান নয়।

মানব চিত্তে এমন কোনই শক্ত-সমস্যা জন্মাতে পারে না যার সমাধান করতে অক্ষম মানব-মন।

পৃথিবী রাজনৈতিক (পোলিটিশিয়ান) মানুষে পূর্ণ, কিন্তু জগৎ প্রায় রাষ্ট্রনীতিবিশারদ (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান) শূন্য।

সকল ভাবের অন্তরে নিহিত থাকে অদম্য ইচ্ছা নিজের পূর্ণতার।

সংযম এবং প্রসার ব্যতীত মুক্তিলাভ অতি অল্পলোকের ভাগ্যে ঘটে।

মানব জাতির উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায় নিজের গতি উন্নতির পথে।

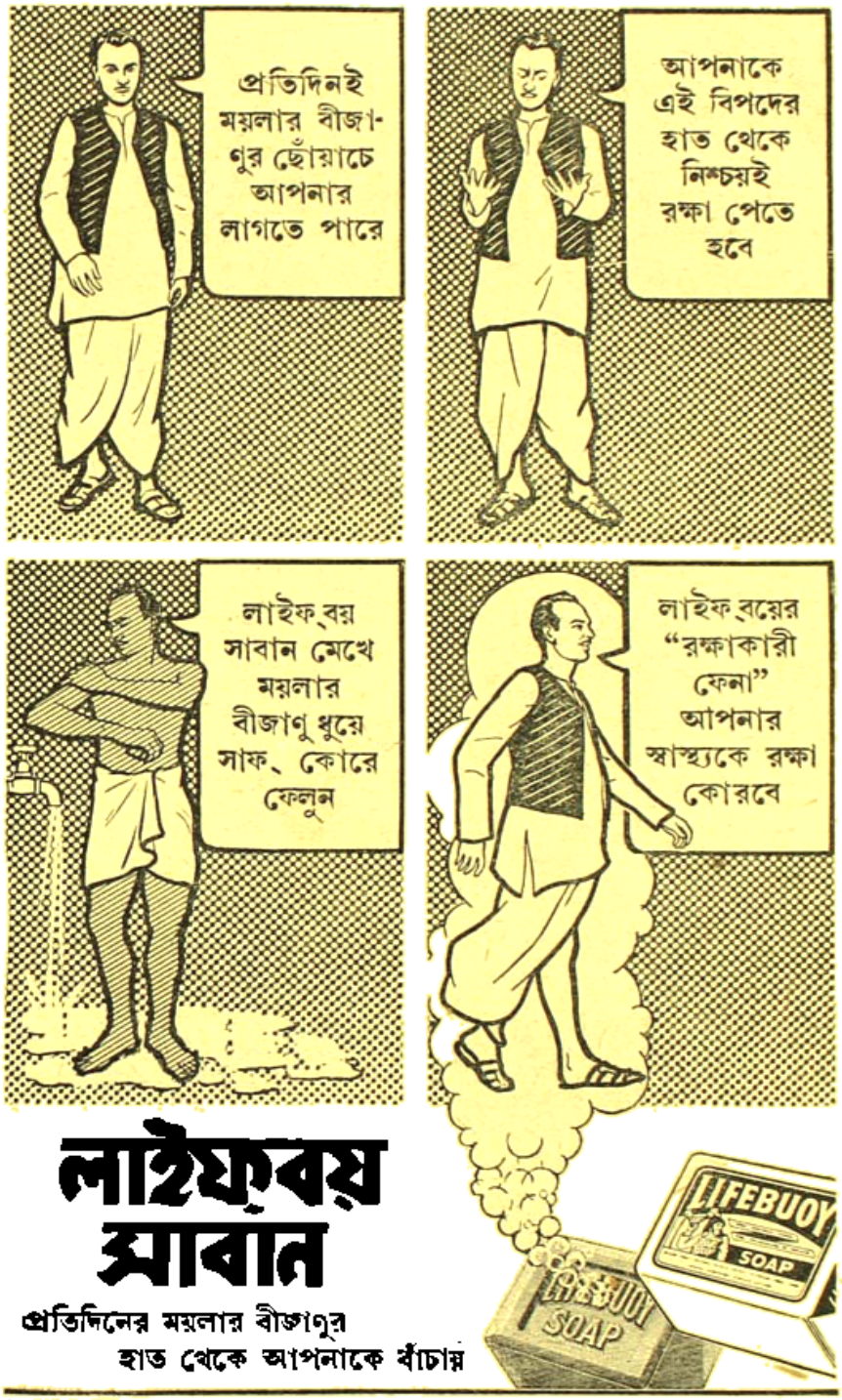
প্রতিদিনই ময়লার বীজাণুর ছোঁয়াচে আপনার লাগতে পারে
আপনাকে এই বিপদের হাত থেকে নিশ্চয়ই রক্ষা পেতে হবে
লাইফ্‌বয় সাবান মেখে ময়লার বীজাণু ধুয়ে সাফ্‌ কোরে ফেলুন
লাইফ্‌বয়ের "রক্ষাকারী ফেনা" আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা কোরবে
লাইফবয় সাবান
প্রতিদিনের ময়লার বীজাণুর হাত থেকে আপনাকে বাঁচায়
LIFEBUOY SOAP
L 231-50 BG

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—আট—

"Ella peinteia a cabelo"—

এটি সর্বনাশা আকর্ষণ ?

কে এ কী হয়ে গেল শঙ্খদত্তের ? দক্ষিণ-পূর্ব কোণের পথে দুঃস্বপ্নের মতো এসে এ কোন্ ভয়ঙ্কর ঝড় তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল মায়াপাশের মতো ? দেবতার মতো নিষ্পাপ—আকাশের তারার মতো সুন্দর—দেবদাসীর মূর্তি এ কোন্ মত্ততা তার রক্তের মধ্যে ছড়াচ্ছে তীব্র বিষক্রিয়া ?

কত ? কত সে তো অনেক দেখেছে। সপ্তগ্রাম বিদেশের ভাগ্যান্বেষী দুঃসাহসের ঘরে অসংখ্য রূপবতীর উজ্জ্বল মুখ ফুটে আছে ফুলের মতো। শ্রেষ্ঠী ধনদত্তের সে একমাত্র সন্তান—কত মদ আলো চোখ জানালার মধ্য দিয়ে তার দিকে অনিমেষ হয়ে তাকিয়ে থেকেছে সে তা জানে। শঙ্খদত্ত ফিরেও চায়নি। তার পৌরুষের উদ্দেশে সমর্পিত অর্ঘ্য সে গ্রহণ করেছে দেবতার মতো—নিয়েছে নিজের প্রাপ্য হিসেবে ; কোনো দিন কিছু যে ফিরে দিতে হবে এমন কথা কখনো মনেও জাগেনি তার। না—রূপ নয় ! সপ্তগ্রামের অনেক কুমারীই লাবণ্যে-সুষমায় শম্পার চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ।

তবে কি নয় নারী ? তাও নয়। কত উদ্দাম বসন্ত-উৎসবের দিন প্রত্যক্ষ করেছে সে। সারাদিন আবীর কুঙ্কুমের খেলায় কেটে গেছে, তারপর সন্ধ্যা হলে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল করেছে সরস্বতীর জলে। শ্রেষ্ঠীদের নৃত্যশালায় শুরু হয়েছে বাসন্তী-পূর্ণিমার উৎসব। হাজার ঝাড়-বাতি জ্বলে উঠেছে—মাধবীর গন্ধে মদির হয়েছে বাতাস, নেশায় রাঙানো চোখগুলো ভারী হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। আর সেই নেশা-জড়ানো রাত্রিতে বেজেছে নর্তকীর পায়ের নূপুর ; মন্দিরের গায়ে গায়ে খোদাই-করা মূর্তিগুলির মতো নগ্ন সুন্দরীরা লাস্যের বিভঙ্গ জাগিয়েছে প্রত্যেকটি দেহ-ভঙ্গিমায়। উৎসবের আসরের ওপর দিয়ে তাদের সেই দেহকান্তি এক একখানি ধারালো ঘুরন্ত তলোয়ারের মতো আবর্তিত হয়ে গেছে।

একটি শ্বেতপদ্ম। নাচের ভঙ্গি তো নয় ! প্রতিটি মুদ্রায় মুদ্রায়, প্রতিটি অঙ্গ-বিক্ষেপে কী আশ্চর্য করুণতা ! শরতের পদ্মের ওপর যেন শীতের শিশির ঝরছে। শঙ্খদত্তের মনে হয়েছে এ দেবতার প্রতি ভক্তির তন্ময়তা নয়—এ যেন আহত-প্রাণের বিষণ্ণ বিলাপ ! তার প্রতিটি দেহরেখা যেন নিঃশব্দ ভাষায় বলতে চাইছে : এ আমার কারাগার—এ আমার অভিশাপ ! এখান থেকে তুমি উদ্ধার করো আমাকে—এই অসহ্য বন্দিত্ব থেকে মুক্তি দাও !

কিন্তু কে শঙ্খদত্ত ? কেমন করেই বা সে মুক্তি দেবে ? একটি শ্বেতপদ্মকে জড়িয়ে রয়েছে উদ্যত-ফণা কালনাগ। রাজা স্বয়ং তাকে অনুগ্রহ করেন, তার দ্বারপ্রান্তে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে রয়েছেন রুদ্রপাণি কালভৈরবের মতো। রাঢ় দেশের একজন শ্রেষ্ঠী কেমন করে সেই সাপের মাথা থেকে মণি খুলে নেবে—কেমন করে অতিক্রম করবে সেই বজ্রবাহু ?

স্তব্ধ !

ওই শব্দটাকে তো কোনোমতেই সে ভুলতে পারছে না। মানুষের ঘর যে আলো করতে পারতো—মন্দিরের কঠিন পাথরে একটি একটি করে পাপড়ি তার ঝরে যাচ্ছে চূড়ান্ত অবহেলার মধ্যে ; মানুষের প্রেমে যে পরিপূর্ণ হতে পারত—নিষ্ঠুর হাত বাড়িয়ে দেবতা ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে।

—রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াও। এমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন পথ জুড়ে ?

একজন পথিক ধমকে উঠল। সংকুচিত হয়ে শঙ্খদত্ত সরে গেল একপাশে।

দাঁড়িয়েই সে আছে বটে। সামনে একটি বিরাট প্রাসাদ। তার সিংহদ্বারের ভেতর দিয়ে সেই শোভাযাত্রা ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে অদৃশ্য হয়েছে রাত্রির সেই শ্বেতপদ্ম, আর দিনের সেই নীলাকাশা অপরাজিতা। ভেতর থেকে আসছে মানুষের কোলাহল—উৎসবের মুখরতা ; মাঝে মাঝে সেই কোলাহল ছাপিয়ে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বাঁশির সুরে সুরে কানাড়া-সোহিনী, উঠছে মৃদঙ্গের গুরু গুরু ধ্বনি, তার সঙ্গে মিলিত নারীকণ্ঠের গানের গুঞ্জন। যেন এক ঝাঁক মধুমত্ত ভ্রমর।

ওখানে শঙ্খদত্তের প্রবেশ নিষেধ।

—সরো—সরো—সরে যাও—

আশা-পোঁটা ধারী একদল মানুষ আসছে এগিয়ে। স্পষ্টই বোঝা যায়—রাজার সৈন্য। শঙ্খদত্ত তাকিয়ে দেখল, একটি বিশাল হাতী আসছে তাদের পেছনে। পতাকা উড়ছে, হাতীর হাওদায় সোনা-রূপোর দীপ্তি ঝল্‌মল্ করছে সূর্যের আলোয়। তার ওপরে জরিদার এক বিরাট মখমলের ছাতা।

রাজা আসছেন।

বাড়িটার সামনে শুধু শঙ্খদত্তই নয়—একপাল ভিখারীও আশায় আশায় অপেক্ষা করছিল। তাদের লক্ষ্য রূপের দিকে নয়—প্রয়োজনটা অত্যন্ত স্থূল। ভাগ্যবানের উৎসব-বাড়িতে নিশ্চয় কিছু দান-ধ্যান হবে—কিছু খাদ্যও হয়তো বিতরণ করা হবে এই শুভ উপলক্ষে। লুব্ধ চোখ মেলে তাকিয়েছিল তারা।

রাজার সৈন্য আর হাতীর আবির্ভাবে দু দিকে সভয়ে ছিটকে গেল তারা। একজনের গায়ের ধাক্কা লেগে অপ্রস্তুত শঙ্খদত্ত হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার হাঁটুর কাছটায় ছড়ে গেছে অনেকখানি—দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ছে।

শম্পা !

কত দূরের সে—কত অধরা—এই রূঢ় আঘাতে যেন সে প্রথম উপলব্ধি করল সেই কঠিন সত্যটাকে। সামনের সিংহ-দ্বারটা শব্দ করে খুলে গেল। মাথা নত করে দু ধারে এসে দাঁড়ালেন অনেকগুলি সুসজ্জিত মানুষ—আজকের ভাগ্যবান গৃহস্বামী স্বয়ং রাজাকে অতিথিরূপে পেয়েছেন তাঁর বাড়িতে। গলায় সোনার ঘণ্টার ধ্বনি তুলে—দামী হাওদার ঝলকে চারদিক চকিত করে দিয়ে—বিরাট মখমলের ছাতার বিপুল গৌরব ঘোষণা করে রাজার হাতী প্রবেশ করল ভেতরে। ভদ্রাতুর ভিখারীদের সঙ্গে দুর্ভাগা শঙ্খদত্তও সেদিকে তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

এখন ওখানে হয়তো আবার নতুন করে নাচ শুরু হবে শম্পার। রাজ-অতিথির সম্মানে নতুন সুর বাজবে বাঁশিতে, নতুন তালে তালে গুরু গুরু করে উঠবে মৃদঙ্গ। নতুন মুদ্রায়, নতুন দেহছন্দে দেবদাসী দেবতার প্রতিনিধি রাজাকে জানাবে তার বন্দনা।

এর মাঝখানে সে কোথায় ?

মুখে একটা লবণাক্ত স্বাদ। দাঁতের গোড়া দিয়ে তার রক্ত পড়ছে। ছড়ে-যাওয়া হাঁটুটায় একটা তীক্ষ্ণ জ্বালার চমক। নিরুপায় ক্ষোভে একবার ঠোঁট কামড়ালো শঙ্খদত্ত—তারপর ফিরে চলল।

মহাদেব পাণ্ডা কিছু কি অনুমান করেছিল ? বোঝা গেল না।

—শ্রেষ্ঠী আর কতদিন থাকবেন পুরীধামে ?

শঙ্খদত্ত একবার চকিত চোখ তুলল। কিছু একটা অনুমান করতে চাইল মহাদেবের অভিব্যক্তিতে।

—আরো দিন কয়েক।

মহাদেব মৃদু হাসল : ভালোই তো। দেবস্থান—যে ক'দিন থাকবেন, সে ক'দিনই পুণ্যলাভ হবে। তা হলে কার ভোগ আনাব আজ ? জগন্নাথের, না বলভদ্রের ?

—যার খুশি।

মহাদেব একটু চুপ করে রইল : শ্রেষ্ঠীর কি এখানে কোনো বাণিজ্যের কাজ আছে ?

—হাঁ। কিছু পাথরের জিনিস, ঝিনুকের মালা আর

কড়ি নিতে হবে। তা ছাড়া হরিণের চামড়াও কিনতে হবে।

—ও।—মহাদেব সরে গেল।

ঠিক কথা। পাথরের জিনিস—কিন্নুকের মালা। শঙ্খদত্তের মনে পড়ে গেল। এ কোন্ পাগলের মতো একটা অর্থহীন মন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে? নিজের কাজকর্ম সব পড়ে আছে—সেগুলো এর মধ্যেই সেরে নেওয়া উচিত ছিল। তা ছাড়া সামনে দুস্তর দক্ষিণ পাটনের পথ—সিংহল এখনো কত দূরে! মাঝখানে নিতল্ কালো মৃত্যুর মতো সমুদ্র—বিশ্বাস নেই, কখনোই তাকে বিশ্বাস নেই। যদিও অনুকূল বাতাস বইছে—যদিও উত্তরের হাওয়ায় মেঘ-বর্ণ ফুল ঘুম-পাড়ানি গান শোনাচ্ছে এখনো—তবুও কখন যে তার বুকের ভেতর থেকে এক সঙ্গে হাজার রাক্ষসী গর্জন করে উঠবে সে কথা কেউ বলতে পারে না।

সারা শরীরে মনে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়াতে চাইল। ঠোঁটের কোনা এখনো একটুখানি ফুলে রয়েছে—হাটুতে বেদনার চমক দিচ্ছে থেকে থেকে। এই আঘাত—এই যাতনা—এ যেন তারই ভবিষ্যতের প্রতীক! আর নয়—আর নয়। দক্ষিণের অসংখ্য মন্দিরে এ রকম সংখ্যাতীত দেববাসী আছে, তাদের সকলের দুর্ভাবনার ভার বইতে পারে—এমন শক্তি তার নেই!

সে চলে যাবে—কালই। করম আলীর কথা মনে পড়ল। রক্ত-স্তম্ভিত আকাশ। সাম্রাজ্যের পাঠান শের খাঁ দাঁড়িয়েছে মাথা উঁচু করে—টান পড়েছে দিল্লীর মসনদে। স্বয়ং বাদ্‌শা হুমায়ুন এগিয়ে আসছেন শের খাঁকে দমন করার জন্যে। করম আলী বলে গেছেন, একটা প্রবল বন্যা আসছে! কী যে তার রূপ হবে এখন তা অনুমান করাও অসম্ভব! হয়তো তার একটা ঢেউ এসে সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীতেও ভেঙে পড়বে। অনেক সমুদ্রই সে পাড়ি দিয়েছে—সেই তুফানের মুখেও তাকে বহর সামলাতে হবে—সে কথা যেন সে ভুলে না যায়।

দক্ষিণ পাটন। করম আলী। আর—আর সোমদেব।

একটা আকস্মিক ভয়ের আঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে শঙ্খদত্ত উঠে দাঁড়ালো। এ দুঃস্বপ্ন তার দূর হোক—এই মোহ তার ছিন্ন হোক!

এক ঝলক হাওয়া এল তার ঘরে। শীতল, লবণাক্ত হাওয়া। সমুদ্রের ডাক। পাটনের হাতছানি। দূর-দুরান্ত যার জন্যে প্রসারিত হয়ে আছে—তাকে এ ভাবে এক জায়গায় নোঙর ফেলে থাকলে চলবে না। কাল—কালই যাত্রা শুরু করবে শঙ্খদত্ত।

কিন্তু!—

শঙ্খদত্ত কিন্নুকের মালা কিনছিল। সারাটা বেলা কেটে গেছে ব্যস্ততার মধ্যে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, এই ব্যস্ততার তাড়ায় আর একবারও শম্পার কথা তাকে পীড়া দেয়নি। আস্তে আস্তে তার ব্যাধিটা সেরে আসছে, সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে—এই-ই তার প্রমাণ।

কিন্তু!

—ওই যে বাড়িটা দেখছ না? ওই যে মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি? ওই বাড়িতে শম্পা থাকে।

শম্পা! যেন পিঠের ওপর একটা চাবুক পড়ল শঙ্খদত্তের। বিদ্যুৎগতিতে সে ফিরে তাকালো।

নিতান্তই সাধারণ মানুষ। রাজার হাতী আর মন্দিরের সেরা নর্তকী সম্বন্ধে যাদের কৌতূহলে কিছুমাত্রও তারতম্য ঘটে না কখনো। শঙ্খদত্ত জ্বলন্ত চোখ মেলে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

—হাঁ, ওইটেই শম্পার বাড়ি।—একটা সাধারণ মানুষ আর একজনকে বলে চলল।

—কে শম্পা?—মূঢ় দ্বিতীয় জনের জিজ্ঞাসা। অসীম হিংসায় শঙ্খদত্তের ইচ্ছে হল, লোকটাকে সে প্রবলভাবে একটা আঘাত করে বসে।

—শম্পাকে চেনো না? মন্দিরের প্রধান দেবদাসী। রূপে-যৌবনে তার তুলনা নেই।

দ্বিতীয় জন এবার নির্বোধের মতো একটা রসিকতা করে বসল: সে কি হে! তোমার নিজের স্ত্রীর চাইতেও?

বাড়িতে গিয়ে কথাটা যেন আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ কোরো না।

—কেন, ভয় কিসের?

দ্বিতীয় জন অল্প অল্প হাসল: একবার বলে দেখলেই বুঝতে পারবে।

অসহ্য মনে হচ্ছে। শঙ্খদত্ত আর দাঁড়ালো না। একটা অদৃশ্য চুম্বকের টান পড়েছে বাড়ীতে। সারা দিন যাকে

সে অবদমনের মধ্যে চেপে রেখেছিল—বিশুদ্ধ বেগে মুক্তি পেয়েছে সে।

—কী হল শ্রেষ্ঠী? নেবেন না জিনিসগুলো?—দোকানদার বিস্মিত প্রশ্ন করল।

—আসছি—

শঙ্খদত্ত দ্রুত পা চালালো। আর সে থাকতে পারছে না। যা চেয়েছে তা পেয়েছে! ওই বাড়িটা।—যার মাথার ওপরে কবুতরের ছোট ঘরটি! একটা ডাইনির দৃষ্টির মতো ওটা শঙ্খদত্তকে আকর্ষণ করছে!

বেলা পড়ে এসেছে। চারদিকে শীত সন্ধ্যার পাণ্ডুর ছায়া। নেশাগ্রস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল শঙ্খদত্ত। এই তো বাড়ি! এইখানেই শম্পা থাকে।

পিতলের মোটা মোটা কীলক-বসানো দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। রাজা আর প্রধান পুরোহিত ছাড়া আর কারো ঢোকবার অধিকার নেই এখানে।

শঙ্খদত্ত বাড়িটার চারদিকে ঘুরতে লাগলো আচ্ছন্নের মতো। তারপর পেছন দিকে—যেখানে দুটি উঁচু দেওয়ালের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকা জায়গা—সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়ালো। চোখ মেলে তাকালো ওপর দিকে! আশ্চর্য! এও কি সম্ভব! এতখানি আশা কি স্বপ্নেও করেছিল?

ওপরে জানালায় বসে যে মেয়েটি চুল বাঁধছিল—সে শম্পাই! না—আর কেউ হতেই পারে না! তার পরণে এখন বাসন্তী রঙের শাড়ী—দেহের কনকচাঁপা রঙের সঙ্গে সে শাড়ী যেন একাকার হয়ে মিশে গেছে। তার মুখের ওপর বেলা শেষের রক্ত-রৌদ্র পড়েছে—যেন নিশীথ মন্দিরের সেই আশ্চর্য প্রদীপের আলো। রাশি রাশি কালো সাপের মতো অপর্যাপ্ত অজস্র চুল তার চাঁপার কলির মতো আঙুলগুলির মধ্যে খেলা করছে।

শঙ্খদত্ত সম্মোহিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সেখানে।

মেয়েটি কি দেখতে পেল তাকে? একবারও কি তার মুখের ওপর দুটি অতল চোখের দৃষ্টি এসে পড়ল? শঙ্খদত্ত বুঝতে পারল না। একটা গভীর ঘুমের মধ্যে যেন সময় কেটে চলল—আলো নিভল, নামল অন্ধকার। শঙ্খদত্ত ভালো করে জানতেও পারল না—কখন চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেছে মেয়েটির—কখন বন্ধ হয়ে গেছে জানালাটা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যাবে, এমন সময় ঘটল পরমতম আশ্চর্য ব্যাপার!

সামনের প্রাচীরের গায়ে একটি ছোট দরজা নিঃশব্দে খুলে গেল। দেখা দিল একটি তরুণী। চাপা গলায় ডাকল: শ্রেষ্ঠী?

শঙ্খদত্তের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল দিলে: কোনো কথা বলবেন না। আপনি আমার সঙ্গে ভেতরে আসুন। দেবদাসী শম্পা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। ক্রমশঃ

গানের ঝরণা

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

গানেরই ঝরণা ধারায়
ভেসে যাই আপন মনে।
পুলকের দোলা লাগে
উতলা মোর-ভুবনে।

দখিনা পবন আসি'
কাননে বাজায় বাঁশী
কী কথা কানাকানি
মধুপের গুঞ্জরণে॥

সেতারের একখানি তার
বে-সুরে বাজে যে হায়
হিয়া মোর সে কার লাগি'
চকিতে দিশা হারায়।

রজনী আলোয় ভরা
তবু সে নেয়না ধরা
কেন সে ছন্দ হারা
হ'য়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে॥

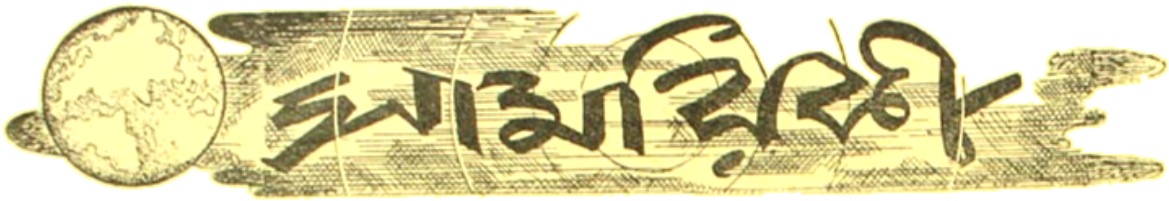

কলিকাতার মর্মন্তুদ ঘটনা।—

গত জুলাই মাসে কলিকাতা সহরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা এক দিক দিয়া যেমন অসাধারণ, অন্য দিকে তেমনই যে কোন শাসন-ব্যবস্থার পক্ষে লজ্জাজনক। কলিকাতা সহরে ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়—বর্ত্তমান অর্থ-নীতিক দুরবস্থার দিনে ট্রামের ভাড়াবৃদ্ধি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতার জনসাধারণ ঐ বর্দ্ধিত ভাড়া প্রদান করিতে অসম্মত হন। ১লা, ২রা ও ৩রা জুলাই দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা বর্দ্ধিত হারে ভাড়া দিতে অস্বীকার করিয়া বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করে। তৃতীয় দিন বিকালে ট্রাম চলাচলে বাধা দান করায় নানারূপ গণ্ডগোল ঘটিতে থাকে। ট্রাম কোম্পানী বিদেশী মূলধন লইয়া গঠিত এবং বিদেশে গঠিত পরিচালকগণ উহার ব্যবস্থাপক। কাজেই যে কোন কারণেই তাহার ভাড়া বাড়াইবার ব্যবস্থা হইয়া থাক না কেন, জনসাধারণ এই স্বাধীন দেশে বিদেশী কোম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমর্থন করিতে পারে নাই। ৩রা জুলাই কলিকাতায় সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া ঐ ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে হরতাল করা হয় ও সে হরতাল অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উহার দ্বারা জনগণের মনোভাব বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার পূর্বেই সচেতন হওয়া উচিত ছিল। ৩রা হরতালের দিন জোর করিয়া ট্রাম বা সরকারী বাস চালাইবার চেষ্টার ফলে নানা স্থানে দুর্ঘটনা ঘটে—পুলিস লাঠি ও গুলী চালায়—হাঙ্গামাকারীরাও স্থানে স্থানে বোমা, ইটপাটকেল প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে থাকে। সেদিন দমদমে ২খানা রেল গাড়ী পুড়াইয়া দেওয়া হয়—তথায় পুলিস ১১বার গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। ২০জন পুলিস ও ২০জন পথিক আহত হয় ও ঐ স্থানে পুলিস ৯০ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহা ছাড়া সহরে ৩২৭ জনকে হাঙ্গার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই জুলাই প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার শ্রীবিধানচন্দ্র রায় বিলাত যাত্রা করেন। ৭ই হাঙ্গা কম ছিল—৬ই আবার ট্রাম চলাচলে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিস ১৭০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ৭ই হ্যারিসন রোড ও আশুতোষ মুখার্জি রোডে হাঙ্গা খুব বেশী হয় এবং পুলিস বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে—সে দলে বিধান সভার সদস্য শ্রীঅমর বসু, শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগণেশ ঘোষ, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীরণেন সেন, শ্রীজ্যোতিষ জোয়ার্দার ও শ্রীহেমন্ত বসু ছাড়াও লোকসভার সদস্য শ্রীসত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিরোধকারী দলের নেতা ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমোহিত মৈত্র ছিলেন। ট্রাম চলিতে থাকে বটে, কিন্তু ট্রামে ইট বা বোমা নিক্ষেপের ফলে ট্রামে যাত্রী উঠা বন্ধ হইয়া যায় ও ফলে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। ১১ই জুলাই সহরের বহু গণ্যমান্য লোক এক আবেদন প্রকাশ করিয়া ভাড়াবৃদ্ধি স্থগিত রাখার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মন্ত্রিসভা বা ট্রাম কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কেহই তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রতিরোধকারীরা ১৫ই জুলাই সাধারণ হরতাল ঘোষণা করিলে কংগ্রেস-নেতারা মন্ত্রিসভার সমর্থনে সেই হরতাল বন্ধ করিতে অগ্রসর হন। ১৪ই সন্ধ্যায় কংগ্রেসের যে মিছিল বাহির হয়, তাহা জনসমর্থন লাভ না করায় প্রতিরোধকারীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ১৫ই জুলাই বেলা ৬টা পর্য্যন্ত সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালিত হয়, কংগ্রেস-নেতারা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন ফললাভ করিতে পারেন নাই। সে দিন সন্ধ্যার পর রাজপথের আলো বহু স্থানে নিবাইয়া দিয়া অন্ধকারের মধ্যে বহুলোক আহত হয়—সহরতলীতে ৮।১০ ঘণ্টা রেল বন্ধ থাকায় সর্বত্র হাঙ্গামা বাড়িয়া যায় ও সেদিন শুধু সহরেই ৭৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। পরদিন সহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং সহরের পথে সৈন্যদল বাহির করা হয়। ১৬ই তারিখে শুধু মধ্য কলিকাতায় ২২ স্থানে পুলিস গুলী চালায়। ট্রাম ও ষ্টেট বাস চলাচল বন্ধ থাকে—পুলিস বহু বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বোমা প্রভৃতি আবিষ্কার করে ও শত শত লোক গ্রেপ্তার

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট্
সাবানের
দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
S. 204-50 BG

হয়। বহুবাজারে জনতা একটি পুলিস গাড়ী হইতে বন্দী ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করায় পুলিসের গুলীতে একজন নিরীহ পথচারী নিহত হন। ১৭ই সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতায় পথ অন্ধকার করিয়া তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। ঐ স্থানে ৬০ জন লোক পুলিসের গুলীতে ও জনতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমায় আহত হয়। ১৮ই জুলাই মন্ত্রিসভা ঘোষণা করে যে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি সম্পর্কে কোম্পানী ট্রাইবিউনালের বিচারের রায় মানিয়া লইবে ও হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে লইয়া ট্রাইবিউনাল গঠিত হইবে। তাহাতেও অবস্থা শান্ত হয় নাই —প্রত্যহ সন্ধ্যায় প্রতিরোধকারীরা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া বিভিন্ন পার্কে সভা করিতে থাকে ও পুলিস তাহাতে বাধা দেওয়ায় প্রত্যহ দাঙ্গা হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন উদ্বাস্তু কলোনীতে বোমা সম্পর্কে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তারের জন্য দাঙ্গা সেদিকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়। ২০শে জুলাই কলিকাতায় আবার দাঙ্গা বাড়িয়া যায় ও পুলিস সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের আক্রমণ আরম্ভ করে। ২১শে জুলাই অবস্থা চরম আকার ধারণ করে। মন্ত্রিসভার অস্থায়ী সভাপতি শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের গৃহে সন্ধ্যায় যখন নেতারা অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, সে সময় মাঠে প্রতিরোধকারীদের এক সভায় উন্মত্ত পুলিস ও পুলিস কর্তৃক নিযুক্ত গুণ্ডার দল ঐ স্থানে সমবেত সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ফটোগ্রাফারগণকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ এবং সেই সঙ্গে নির্য্যাতন করে। এই ঘটনা সকলের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছে। সকল দেশেই সাংবাদিকগণ নিরপেক্ষ বলিয়া বিবেচিত হন এবং কেহই তাঁহাদের আক্রমণ করে না—বরং তাঁহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করে। কলিকাতা সহরের পুলিস যে দিন সকল নিয়ম শৃঙ্খলা অমান্য করিয়া দিনা উত্তেজনায় সাংবাদিকগণকে আক্রমণ করিল, সেদিন জনগণ পুলিসের ব্যবহারে নিজেদের 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' বলিয়া মনে করিল এবং সকলে সমবেত ভাবে তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। সে জন্য প্রধান মন্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অপসারণ দাবী করা হয় এবং পুলিস কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী ও তাহার সহকারী ডেপুটী কমিশনার শ্রীপ্রবকুমার সেনের পদচ্যুতি প্রার্থনা করা হয়। যাহা হউক, মন্ত্রিসভার—পরদিন অর্থাৎ ২৩শে জুলাই চৈতন্যোদয় হয় এবং তাঁহারা সেদিন সকালেই কলিকাতা হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করেন। প্রধান-মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ২৩শে রাত্রিতেই বিলাত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন—এবং আসিয়াই সকল ধৃত ব্যক্তিকে ও বিনাবিচারে আটক নেতাদিগকে মুক্তিদানের ব্যবস্থা করেন। সাংবাদিকগণের উপর অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থার ভার বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায়ের উপর ভার প্রদানও করেন। সাংবাদিকগণের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গত ২৮শে জুলাই কলিকাতার ২৩খানি দৈনিক সংবাদপত্র নিজেদের প্রকাশ বন্ধ রাখিয়াছিল—সেদিন কলিকাতা সহরে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায় ফিরিয়া আসিয়া সকলের সকল অভিযোগ প্রতীকারের ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার আগমনের পর কলিকাতায় পুনরায় ট্রাম চলাচল সুরু হইয়াছে। ২৭ দিন ধরিয়া সহরের অধিবাসীদের অবর্ণনীয় নানাপ্রকার দুঃখ, কষ্ট ও হায়রাণি সহ্য করিতে হইল। উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে দেশে যে কিরূপ অশান্তি সৃষ্টি হইতে পারে, কলিকাতাবাসী সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, বিচারে শুধু অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা হইবে না—ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটে, সে জন্য উপযুক্ত নির্দেশ প্রদত্ত হইবে।

কাশ্মীরে সমস্যার পরিণতি—

কাশ্মীরে প্রধানমন্ত্রী শেখ আবদুল্লার কার্য্য গত কয় মাস হইতে সন্দেহজনক হইয়াছিল। গত ৯ই আগষ্ট রবিবার সকালে সহসা সংবাদ আসিল—কাশ্মীরের মহারাজ-কুমার (নূতন উপাধি সর্দার-ই-রিয়াসৎ) শ্রীকরণ সিং প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। শেখ আবদুল্লা ও রাজস্ব মন্ত্রী মির্জা আফজল বেগকে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। শেখ আবদুল্লার সহিত তাঁহার সমর্থক আরও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৭ই আগষ্ট মন্ত্রিসভায় শেখ আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হইয়াছিল।

দিনে দিনে আরও মসৃণ, আরও লাবণ্যময় ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিলুক্ আপনার জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।

রোজ ক্যাডিলুক্ত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করুন। তা হোলে দিনে দিনে আপনার গায়ের চামড়া নতুন স্বাস্থ্যে ও লাবণ্যে ভ'রে উঠবে।

রেক্সোনা

ক্যাডিলুক্ত একমাত্র সাবান

* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

RP. 110-50 BO

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে এক দল লোক 'স্বাধীন কাশ্মীর' দেশ গঠনের আন্দোলন করিতেছিলেন। অথচ গত কয় বৎসরে ভারত-রাষ্ট্র কাশ্মীর তাহার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বহু কোটি টাকা কাশ্মীর রাজ্যের উন্নতি বিধানে ব্যয় করিয়াছেন। কাশ্মীরের যে অংশ গত কয় বৎসর ধরিয়া ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া শাসিত হইয়াছে, আজ নূতন করিয়া তাহার স্বাধীনতা ঘোষণার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। কাজেই শেখ আবদুল্লার পরিণতিতে সকল স্থানে সকল দলের লোক আশ্বস্ত হইয়াছে। ভারতরাষ্ট্রে শ্রীজহরলাল নেহরুও এই ব্যবস্থায় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

নূতন আইন অনুসারে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি বা সিনেটের সদস্য নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। সাধারণ আসনে যে ২৪ জন নির্বাচিত হইয়াছেন তন্মধ্যে ২ জন ডাক্তার ও ৫ জন এঞ্জিনিয়ারের স্থান সংরক্ষিত ছিল। মোট ১১৭ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া ডাঃ সুবোধ মিত্র প্রথম ও ডাঃ ললিতলোকান্ত ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন—২ জন ডাক্তার—(১) শ্রীসুবোধ মিত্র ২) শ্রীকনক সরকারী (৩) শ্রীশৈলেন সেন (৪) শ্রীবিবেকমোহন সেনগুপ্ত ও (৫) শ্রীহিমাংশুশেখর শেঠ। ৫ জন এঞ্জিনিয়ার—(১) শ্রীযে-দাশগুপ্ত (২) শ্রীভূপাল দত্ত (৩) শ্রীযে-গাঙ্গুলী (৪) শ্রীবি-ঘোষ ও (৫) শ্রীকালিদাস রায়। ১৫টি সাধারণ আসনে—(১) শ্রীললিতলোকান্ত ভট্টাচার্য্য (২) শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ (৩) শ্রীঅতীন বসু (৪) শ্রীকেশবেশ্বর বসু (৫) শ্রীনীরদ ভট্টাচার্য্য (৬) শ্রীক্ষীরোদ চৌধুরী (৭) শ্রীসরোজ দাস (৮) শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত (৯) শ্রীঅনিলা দেবী (১০) শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ (১১) শ্রীনন্দকিশোর ঘোষ (১২) শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ (১৩) শ্রীগোপাল হালদার (১৪) শ্রীনীহার মুন্সী ও (১৫) শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র। সাধারণ আসনেও কয়েকজন ডাক্তার নির্বাচিত হইয়াছেন। ১২ হাজার গ্র্যাজুয়েট এই নির্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন।

পরলোকে লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র—

খ্যাতনামা রাজনীতিক ও বক্তা, বহু বৎসর যাবৎ দিল্লীর ব্যবস্থাপক সভা তথা লোকসভার সদস্য পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র ২৫শে জুলাই রাত্রে কৃষ্ণনগরের বাসগৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া অসুস্থ লক্ষ্মীকান্তবাবু মুহ্যমান হইয়া পড়েন এবং এক মাসের মধ্যেই বাংলার জাতীয় জীবনকে অন্ধকার করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের কথা তাঁহাদের মত করিয়া বলিবার আর কেহ রহিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত নদীয়া শান্তিপুরের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া একই সঙ্গে ইংরাজি ও সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন—এম-এ, বি-এল পাশ করার সঙ্গে তিনি কাব্য-সাংখ্যতীর্থ উপাধিও লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে আইন ব্যবসা করিয়া তিনি যশ ও অর্থ অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন ও কংগ্রেস-জাতীয় দলের নেতা হন। তাঁহার ধীশক্তি, পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতা-শক্তি তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় নেতায় পরিণত করিয়াছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের সদস্য হইয়া তিনি নূতন সংবিধান প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মাত্র গত ২১শে জুলাই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার জীবনে যে স্থান শূন্য হইল তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

কলিকাতার সহরতলীর উন্নতি—

বীরভূম জেলায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় তিলপাড়া বাঁধ নির্মাণের ফলে ঐ অঞ্চলের ১ লক্ষ ২৫ হাজার একর পতিত জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার দক্ষিণে সোনারপুর-আরাপাচ এলাকায় জল নিকাশের একটি যন্ত্র দ্বারা ৩৭ বর্গ মাইল এলাকার ২৫ হাজার একর পতিত জমীতে চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে—তথায় ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫ মাইল জলনিকাশী খাল ও ১৯ মাইল ইলেকট্রিক লাইন নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ অঞ্চলে জল আটক থাকার ফলে ৩৭ বর্গ মাইল জমীতে চাষ বন্ধ থাকিত—এখন ঐ জল নিকাশ হইয়া এ বৎসরই ২২ বর্গ মাইল জমীতে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গার জলস্রোত বন্ধ হওয়ায় ঐ স্থানের জল আটকাইয়া থাকিত—ফরক্কায় গঙ্গার বাঁধ নির্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত গঙ্গার স্রোত বাড়িবে না—সে জন্য

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

উপমা রামকৃষ্ণের। শ্রীরামকৃষ্ণের যত রসাত্মক বাক্য ও গল্প আছে তার একটি সযত্ন চয়ন ও আলোচনা। কিংবা, যিনি একাধারে আলোক ও লোচন তাঁর বন্দনা। ব্যাখ্যা করতে করতে বন্দনা করেছেন

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষা তত্ত্বের দিক থেকে যেমন গভীর, কাব্যের দিক থেকে তেমনি সুন্দর।' ভূমিকায় বলেছেন অচিন্ত্যকুমার—'তত্ত্বের তাৎপর্য না বুঝি রসের আনন্দটুকু আহরণ করি। তত্ত্বের অর্থোপলব্ধিতে সমাহিত না হতে পারি কাব্যরসাস্বাদে বিমোহিত হই।' তুলসীর চোখ দিয়ে দেখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, আনন্দঘনের দৃষ্টা দিয়ে জেনেছেন, মীমাংসার সরণের ভাষায় বলেছেন মুখমাধুরী ধরে।

'তাঁকে পাঠশালায় পড়েছিলেন কিছুকাল, শুধু নাম সম্বল করতে পারতেন, একটুও বড়ো করেন নি নিজের হাতে, তাঁরই কাব্যরূপ উদ্ঘাটন করবার জন্য আহ্বান করলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫১ সালের শরৎভাষণ-বক্তৃতায় বিষয় হল "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ"। সংসারের অনেক অলৌকিক ঘটনার মধ্যে এ একটি। সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ। স্বাধীনভাবে একেই প্রকাশিত করবার অনুমতি দিয়েছেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিন্ত্যকুমার তিনদিন ধরে এই বক্তৃতা দিয়েছিলেন গত নভেম্বর মাসে, প্রথমে দ্বারভাঙ্গা হল ও পরে 'আশুতোষ হলে বিপুল জনমণ্ডলীর সম্মুখে' (আনন্দবাজার)। 'আশুতোষ হল্ চইঁ ওআজ প্যাকড্ টু সাফোকেশন' (হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড)। সেই বক্তৃতার বিষয় "কবি শ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থাকারে দিগারিই প্রকাশিত হচ্ছে, ইতিপূর্বে কোনো সাময়িক পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি।

সংসারাশ্রম, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, সত্যকথা, সরলতা, বিশ্বাস, ব্যাকুলতা, সন্ন্যাস, সাকার-নিরাকার ও সর্বধর্মসমন্বয়—নানাদিকে নানা কথাবার্তা। তা ছাড়া সেই সব আশ্চর্য গল্প—বুড়ি গয়লানির বরীপাত্র, কৌটিনকা ওয়ালে গৃহস্থালী, ঘটিল বালকের পাঠশালা, স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জল, ঝাঁকের উপর বহুকণি, বাইরের বেরোনের মতো খুকামো। শুধু আবিষ্কারের দিক থেকে নয়, উদ্ঘাটনের দিক থেকে অদ্বিতীয়। বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ।

মলাট গ্রন্থসজ্জা, কাপড়ে বাঁধাই, দাম চারটাকা।

'আমাকে যদি বলে যাবি না, আমাকে ছুতো দেখাবি কি?' এই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থনা। অচিন্ত্যকুমার বাধা করেছেন—এই হচ্ছে নিত্য কালের কবির প্রার্থনা। বস্তুটা সঙ্গে সঙ্গে বড়ো চাই আবেগ চাই সেই সঙ্গে চাই বন্ধন, সাধন, পূরণ ...এর যদি অন্য হয় তাহলে যা—সব মিলি বি বর হয় তাহলেও চাই। তবে কবি, কোনোদিনে কবিতা হয় না ...কবিতা কাকে বলে? এক কথায় কবির চাই কোটা প্রকাশ, প্রস্ফুটন। অন্তরের ভাবকে বাইরে ভাষা দিয়ে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা। ছন্দ বা মিল, যতি বা ঝঙ্কার যেন বহিরঙ্গ মাত্র, প্রাণবস্তু নয়...

শ্রীরামকৃষ্ণের কবিতার কারামোটি গদ্য। গদ্যে যে কবিতা হয় তাতে দ্বৈধ নেই। আর যে গদ্য বন্ধুর পথে ওই ছবির সন্ধানে যায় তাকে কবিতার চেয়েও দুরূহ-সাধ্য। দুরূহতর।

শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। তিনি নরকের ভেতে সর্বা ঈশ্বরের ভেতে সহজ করে দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সাহায্যে। কিন্তু রামকৃষ্ণ গোড়াতেই বলেছেন 'অরুচিস্থা চমৎকারা'। যতক্ষণ সেই তত্ত্বক্ষণ সংসারে রস নেই। আর যতক্ষণ রস সেই ততক্ষণ ঈশ্বরও নেই। যতক্ষণ তার পেটে কটি সেই ততক্ষণই চাঁদ কাঁসারের কটি যতক্ষণ মাথে ধান নেই, ততক্ষণই উনি বাপে। অবশ্য এ অভাবের সমস্যা চিরকালিক নয়। অভাবের শেষ আছে কিন্তু ভাবের শেষ নেই। কিন্তু ফুরোয় কিন্তু চাঁদ ফুরোয় না।

তাই 'অরুচিস্থা চমৎকারা'র পরেই 'অন্ত চিন্তা পরাবধা'। তখন, সেখানে, তাকে মনে হয় শিশুর হাসি, প্রিয়ার মুখ, মায়ের স্নেহধারা। শুধু কবি নয়, ঋষি চাই। শুধু প্রেমা নয়, চাই প্রেম। তখন রামকৃষ্ণের মতো দেখি 'তাঁর মানা সকলের মাঝ :'.....

সিগনেট প্রেসের বই

সিগনেট বুকশপে আপনার অর্ডার দিয়ে রাখুন। কলেজ স্কোয়ারে : ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট। বালিগঞ্জে : ১৩০ ১, রাসবিহারী এভিনিউ

নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ঐ অঞ্চলে চাষ হইলে কলিকাতা সহরে খাদ্যাভাব অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন—

খ্যাতনামা কোবিদ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন আই-সি-এস বোম্বাইয়ে কাজ করিতেন ও শেষ পর্যন্ত বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি হইয়াছিলেন। সম্প্রতি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদত্যাগ করায় শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনকে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত ক্ষিতীশচন্দ্রের গভীর যোগাযোগ ছিল—তিনি যৌবনে রবীন্দ্রনাথের বহু বাংলা কবিতা ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং কবিগুরু সে সকল অনুবাদ স্বীকার করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, ক্ষিতীশচন্দ্রের পরিচালনায় বিশ্বভারতীর গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ড—

নিখিল ভারত খাদি ও পল্লী শিল্প বোর্ডের গত বোম্বাই অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—ধানভানার জন্য হালার মিল ব্যবহার অবিলম্বে নিষিদ্ধ করা হউক। চাউল কলের সংখ্যা ও উহাদের ধান ভানিবার পরিমাণ আর বৃদ্ধি করিতে দেওয়া উচিত হইবে না। হালার মিলে ধানভানায় ফলে আতপ চাউল হয় না—সব চাউল ভাঙ্গিয়া যায়। এ বিষয়ে দেশের জনগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে এবং পুনরায় ঢেঁকীতে চাউল তৈয়ারীর ব্যবস্থা বাড়িলে দেশের বহু লোক উপকৃত হইবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

গত ১৬ই শ্রাবণ শনিবার কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৯তম বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল পুনরায় যথাক্রমে পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতির ভাষণে সজনীবাবু পরিষদের আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তিনি দেশবাসী সকল সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগকে পরিষদের সদস্য হইতে আবেদন জানান। অর্থের সংস্থান না হইলে গত ৬০ বৎসর ধরিয়া যে সকল মূল্যবান দ্রব্য তথায় সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আমরাও এ বিষয়ে বাঙ্গালী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি-উৎসব—

সম্প্রতি কবি নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের জন্মস্থান হাওড়া জেলার নারিট গ্রামে তাঁহার স্মৃতি-উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে নারিট নবকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার এবং নারিট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রেরও বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক

কবি নবকৃষ্ণ স্মৃতি উৎসবে সমবেত সুধীবৃন্দ

শ্রীহীরালাল রায়। ভারতবর্ষ সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, হাওড়া ও হুগলী জেলার সমাজ শিক্ষার প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায়, সাহিত্যিক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীতুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন।

নার্সদের উচ্চতর শিক্ষাদান—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল অধ্যাপক শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২ লক্ষ ১০ হাজার ৭ শত টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকার সুদে নার্সদিগকে উচ্চতর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সকল বঙ্গ-ভাষাভাষী মহিলা এই বৃত্তি লাভ করিতে পারিবেন। রাজ্যপাল অধ্যাপক হরেন্দ্রকুমার অত্যন্ত আড়ম্বরহীন জীবনযাপন করিয়া সারা জীবন যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন, তাহা এই ভাবে বহু জনকল্যাণজনক কার্যে দান করিয়া তাঁহার উদারতা ও

মহতের পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি প্রকৃত রাজর্ষি নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দাবী—

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, সরকারী আইনে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্য যে বেতনের হার স্থির করিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা অনুমোদন না করায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এক সপ্তাহ-ব্যাপী প্রতিবাদ-সভা হইয়া গিয়াছে। সর্বত্র জনগণ সমবেত হইয়া দরিদ্র মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির দাবী সমর্থন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষকগণের মহার্ঘ ভাতা বাড়াইয়া ৫ টাকা স্থলে মাত্র ১০ টাকা না করিয়া ৩৫ টাকা করারও দাবী জানানো হইয়াছে। এদেশে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে শিক্ষকগণকে যে জীবন ধারণোপযোগী বেতন দেওয়া প্রয়োজন; সে কথা কেহ অস্বীকার করেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহু বিষয়ে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন—শিক্ষা বিস্তারে তাঁহাদের এই কৃপণতার কারণ বোঝা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তাঁহারা অচিরে মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা—

সম্প্রতি দিল্লীর লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী জনাব রফি আমেদ কিদোয়াই ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের চাহিদা মত পশ্চিমবঙ্গকে অতিরিক্ত ৫০ হাজার টন চাউল দেওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়। রেশন এলাকায় ৭ আনা সেরের চাল ৯ আনায় বিক্রয়ের ব্যবস্থা হওয়ায় লোক অর্থাভাবে পুরা রেশন গ্রহণ করিতে পারে না ও সেজন্য তাহারা অর্দ্ধাহারে দিন কাটায়। যে স্থানে রেশন ব্যবস্থা নাই, সে স্থানে চাউলের সর্বাপেক্ষা কম দাম মণ প্রতি ৩০ টাকা—কোন কোন স্থানে চাউল ৪০ টাকা মণে বিক্রীত হইতেছে। সেখানেও মানুষের ক্রয় ক্ষমতা না থাকায় লোক উপযুক্ত পরিমাণ চাল ক্রয় করিতে পারে না। বর্তমান বৎসরের (১৯৫৩) গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী চাউল সম্বন্ধে যে সকল আশার কথা শুনাইয়াছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাহা ভুয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চালের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকল খাদ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পাইতেছে। সরিষার তৈলের দাম হঠাৎ মণকরা ২৫ টাকা বাড়িয়া গেল—কর্তৃপক্ষ তাহার প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা করিলেন না। গুড় বা চিনির দাম কমিবার কথা শুনা গিয়াছিল—কিন্তু কার্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। দেশ যে ক্রমে কোন পথে চলিতেছে, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা শঙ্কিত হই। খাদ্য না দিয়া শুধু পরিকল্পনার কথা শুনাইয়া আমরা দেশবাসীকে আর কতকাল ঠেকাইয়া রাখিব?

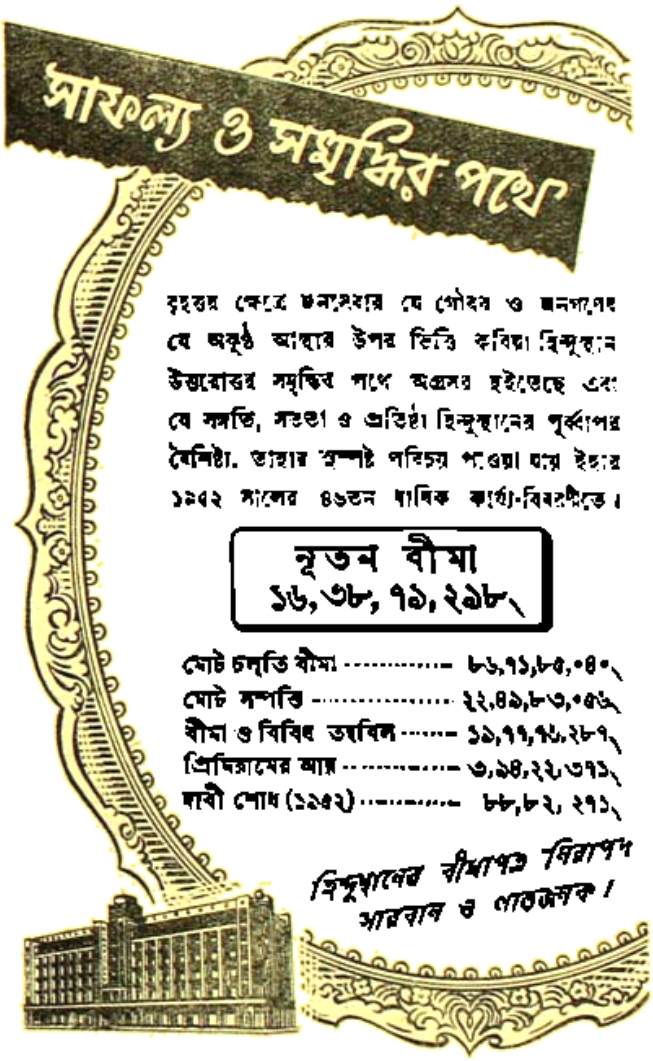

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ফুটবল লীগ ঃ

এ বছর ক'লকাতার ফুটবল লীগের চারটি বিভাগের শেষ হ'ল না ; আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে লীগ পরিত্যক্ত হয়েছে। জুলাই মাসের প্রথম থেকে ট্রামের ১ম শ্রেণির এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে সহরে যে আন্দোলন আরম্ভ হয় তার ফলে মাঠে পুলিশ প্রহরীদের সাহায্য না পাওয়াতে নামকরা দলগুলির খেলা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। কিন্তু সহরে ১৪৪ ধারা জারী হওয়াতে সমস্ত ফুটবল খেলাই বন্ধ রাখা হয়—অথচ ঘোড়-দৌড় মাঠের জনসমাবেশ ১৪৪ ধারার আওতায় পড়েনি। মাঠের অভাব এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩১শে জুলাই) লীগের বাকি খেলাগুলি শেষ করা সম্ভব নয় এই কারণে আই-এফ-এ-র সভায় আলোচ্য বছরের চারটি বিভাগের লীগ খেলা পরিত্যক্ত এবং সমাপ্তি হ'ল—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ক'লকাতার সাম্প্রতিক ঘটনা এই ঘোষণার পক্ষে একটা বড় অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েক বছর ধরে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতা পরিচালনা ব্যাপারে যে সব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তা তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় নয়। এই আইনগত কারণেই গতবার প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় কোন দলকে দ্বিতীয় বিভাগে নামানো সম্ভবপর হয়নি। ভাল ভাল খেলাগুলি চ্যারিটি ম্যাচ খেলিয়ে প্রতি বছর আই-এফ-এ মোটা টাকা রোজগার করে। জনসাধারণের পয়সায় আই-এফ-এ-র খরচার হার দিন দিন বেড়ে চলেছে—বহু বছরের রীতি পরিহার ক'রে মোটা টাকার মাহিনায় সেক্রেটারী সম্পাদক রাখা হয়েছে—কিন্তু আই-এফ-এ-র কাছ থেকে জন-সাধারণ কতটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন ? যে প্রতিষ্ঠানের কর্তারা সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনা করতেই অপারগ তাঁদের কাছ থেকে জনসাধারণ বড় আশা কি করতে পারেন !

৩য় টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ৩১৮ (হার্ভে ১২২, কোল ৬৩, ডিকুসি ৫১ ; বেডসার ১১৫ রানে ৪ এবং ওয়ার্ডলে ৭০ রানে ৩ উইঃ)

ও ৩৫ (৮ উইকেটে। ওয়ার্ডলে ৭ রানে ৬ ; বেডসার ১৬ রানে ২ : লেকার ১১ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড : ২৭৬ (হাটন ৬৩, কম্পটন ৪৫, ইভান্স নট আউট ৪৪। মিলার ৯৭ রানে ৩ উইঃ)।

মাঞ্চেষ্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের বিশেষতঃ এখানে অনুষ্ঠিত টেষ্ট খেলার বেশির ভাগই অমীমাংসিত থেকে গেছে। এর কারণ হ'ল মাঞ্চেষ্টারের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া —অতি বর্ষণ। আলোচ্য সিরিজের ৩য় টেষ্ট খেলা নিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে ১৬টি টেষ্ট খেলা হয়েছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে—ইংলণ্ডের পক্ষে জয় ৩, অষ্ট্রেলিয়ার ২, আর বাকি ১১টা খেলাই ড্র গেছে। অতি-বৃষ্টির দরুণ দু'বার ১৮৯০ এবং ১৯৩০ সালের টেষ্ট খেলা আরম্ভই হয়নি। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠ হ'ল ইংলণ্ডের পয়মন্ত।

অর্দ্ধ শতাব্দির অধিককালের মধ্যে ইংলণ্ড এ মাঠে কোন দেশের কাছে টেষ্টে হারেনি। শেষ হেরেছে ১৯০২ সালে অষ্ট্রেলিয়ার কাছে মাত্র ৩ রানে।

৮ই জুলাই আলোচ্য ৪১ টেষ্ট পর্য্যায়ের ৩য় খেলাতেও হ্যামেট টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং নেন্। সূচনা খুবই

খারাপ হ'ল, ৬৮ রানে ৩টে উইকেট খোয়া যায়। হার্ভে এবং হোল চতুর্থ উইকেটের জুটি বেঁধে দলের পতন রোধ করলেন। প্রথম দিনের খেলায় ৩ উইকেটে ১৭১ রান দাঁড়ায়।

২য় দিনে বৃষ্টির দরুণ মোট খেলার সময় থেকে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিটের খেলা নষ্ট হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অষ্ট্রেলিয়ার ২২১ রান হয়, ৩ উইকেটে। হার্ভে ১০৭ রান ক'রে নট আউট থাকেন। আলোচ্য টেষ্ট সিরিজে হার্ভের এই প্রথম সেঞ্চুরী—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ২য় এবং টেষ্ট খেলায় ১১। তৃতীয় দিনে ৩১৮ রানে, অষ্ট্রেলিয়ার ১ম ইনিংসে শেষ হয়। অর্থাৎ বাকি ৭টা উইকেটে ৯৭ রান উঠে, ২½ ঘণ্টায় খেলায়। হার্ভের আউট হওয়ার পর ডিকুশি ছাড়া আর কেউ খেলতে পারেন নি। হার্ভে-হোলের চতুর্থ উইকেটের জুটিতে ১৭৩ রান ওঠে, ২০৯ মিনিটের খেলায়। ইংলণ্ডের ১২৬ রানে ৫টে উইকেট পড়ে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য সুদৃঢ় হয়।

১২ই রবিবার অবিরাম বৃষ্টি পড়ে মাঠের অবস্থা খারাপ করে দেয়। ১৩ই সোমবার বৃষ্টির দরুণ চতুর্থদিনের খেলা আরম্ভ করা সম্ভবই হয়নি। শেষদিনে লাঞ্চের পর খেলা আরম্ভ হয়; ইংলণ্ডের ২৭৬ রানে ইনিংস শেষ হয়। খেলা ভাঙ্গার পূর্ব্বে, একঘণ্টার খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসে ৩৫ রান করে ৮ উইকেট হারিয়ে। খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। ঐতিহাসিক মাঠে অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ইংলণ্ড যে অনেক দক্ষ তার পরিচয় এ খেলাতে পাওয়া গেছে। খেলার নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ৩০ ঘণ্টার খেলার মধ্যে কিছুকম ১৪ ঘণ্টা খেলা সম্ভবপর হয়েছিল বাকি ৬ ঘণ্টা সময় বৃষ্টিতে ধোয়া যায়।

অষ্ট্রেলিয়া দলের অসন্তোষ ঃ

খেলোয়াড়োচিত রীতিনীতি সম্পর্কে ইংলণ্ডে বহু সারগর্ভ হিতোপদেশ দেওয়া হয় কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই হিতোপদেশকে ইংলণ্ডের জনসাধারণ খুব আমল দেয় না। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা উপলক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সম্পর্কে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অবজ্ঞা, অখেলোয়াড়োচিত মনোভাব বহুবার ঘটনা-পরম্পরায় নিজমূর্ত্তি ধারণ করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত 'সাণ্ডে সান' পত্রিকায় খেলোয়াড়দের সম্বন্ধেও ইংলণ্ডে নানা গুজব রটনা করা হচ্ছে। ফলে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অসন্তোষের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ইংলণ্ডের খবরের কাগজগুলিতে অষ্ট্রেলিয়া দলের খেলা সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ, আম্পায়ারের ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ সিদ্ধান্তে অষ্ট্রেলিয়া দলের ক্ষতি এবং দর্শকদের আসন থেকে পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের গায়ের রং কালো ব'লে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াতো তা বর্ত্তমানের বিশ্ব-রাজনৈতিক পটভূমিকায় প্রবাহিত ঘটনাসমূহ থেকে অনুমান করা কঠিন নয়।

৪র্থ টেষ্টম্যাচ ঃ

ইংলণ্ড ঃ ১৬৭ (গ্রেভনী ৫৫। লিণ্ডওয়াল ৫৬ রানে ৫ উইকেট) ও ২৭৫ (এডরিচ ৬৪ ; কম্পটন ৬১ ; বেকার ৬৮। মিলার ৬৩ রানে ৩ এবং লিণ্ডওয়াল ১০৬ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২৬৬ (হার্ভে ৭১ ; হোল ৫৩। বেডসার ৯৭ রানে ৬ এবং বেলী ৭১ রানে ৩ উইকেট) ও ১৪৭ (৪ উইকেটে। মরিস ৩৮ ; হার্ভে ৩৬, হোল ৩৩)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৫ম টেষ্ট পর্য্যায়ের ৪র্থ টেষ্টম্যাচও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আলোচ্য টেষ্ট পর্য্যায়ের ৫টি টেষ্ট খেলার মধ্যে চারটি টেষ্ট খেলাই ড্র গেল। অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হাসেট এই নিয়ে পর পর চারবার টসে জিতলেন কিন্তু মাঠের অবস্থা অনুকূল না থাকায় ইংলণ্ডকে ব্যাট করতে ছেড়ে দিলেন। বৃষ্টির দরুণ খেলা দেরীতে আরম্ভ হয় এবং খেলার মাঝে খেলা বন্ধ রাখতে হয়। প্রথম দিনের খেলায় ইংলণ্ড ৭ উইকেট হারিয়ে ১৯২ রান করে।

দ্বিতীয় দিনের খেলার প্রথম এক ঘণ্টায় মধ্যে ইংলণ্ডের বাকি ৩টে উইকেট পড়ে, মাত্র ২৭ রানে, ইনিংস শেষ হয় ১৬৭ রানে। চা-পানের সময় ৩ উইকেট পড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ১৪৭ রান দাঁড়ায়, ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানের থেকে ১০ রান কম। দলের ১৬৯ রানে হার্ভে-হোলের চতুর্থ উইকেটে জুটি ভেঙ্গে যায়। আরও পাঁচটা উইকেট পড়ে ১৯ রানে। এ অবস্থায় মনে হয়েছিল ইংলণ্ডের থেকে অষ্ট্রেলিয়া খুব অল্প রানের ব্যবধানে থাকবে কিন্তু শেষ উইকেটের জুটিতে ৪৮

যানে এগিয়ে যায়। বেডসার এই ইনিংসে ৬টা উইকেট পান। টেষ্ট ক্রিকেটে তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ২১৭—১৬ টেষ্ট খেলায়। অষ্ট্রেলিয়ার ক্লরি গ্রিমেট ৩৭ টি টেষ্ট খেলায় ২১৬ উইকেট পেয়ে টেষ্ট খেলায় সর্ব্বাধিক উইকেট পাওয়ার বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। বেডসার সে রেকর্ড ভেঙ্গে নতুন রেকর্ড করেছেন; বর্ত্তমানে তাঁর উইকেট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৮ (২৮শে জুলাই পর্য্যন্ত)। তৃতীয় দিনে খাকের কুড়ি মিনিট আগে বৃষ্টির দরুণ খেলা বন্ধ হয়ে যায়—খেলা আর হয়নি। ইংলণ্ডের রান ১ উইকেটে ৩২। চতুর্থ দিনে ইংলণ্ডের রান দাঁড়ায় ৫ উইকেটে ১৭৭। খেলার শেষ দিনে ৫১-পানের আগে ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ২৭৫ রানে শেষ হয়। ইংলণ্ডের শেষ পাঁচ উইকেটে ইংলণ্ডের মাত্র ৯৮ রান ওঠে। এই শেষ পাঁচটা উইকেট পেতে অষ্ট্রেলিয়াকে ৯ ঘণ্টা খাটুনি দিতে হয়। এই বহুতাপূর্ব খেলার ফলাফল ইংলণ্ড এ যাত্রা হার থেকে বেঁচে যায়।

জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৭৭ রান তুলতে অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে, হাতে সময় ১১৭ মিনিট।

অষ্ট্রেলিয়া পিটিয়ে খেলে দ্রুত রান তুলে ৯ উইকেটে ১৪৭ রান করে—মাত্র ৩০ রানের জন্যে অষ্ট্রেলিয়া জয়লাভে বঞ্চিত হয়। ঘড়ির কাঁটা অষ্ট্রেলিয়ার জয়লাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ

১৯১৩ সালের ইষ্টার সার্ভিস ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ইংলিশ কমাণ্ড ২-১ গোলে ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সদলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ীদল ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালেও চ্যাম্পিয়ানসীপ পায়।

* * * *

আগামী সেপ্টম্বর মাসে কোপেনহেগেনে মহিলাদের আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যোগদান করবে। ১৭জন মহিলা খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠন করা হয়েছে। দল গঠনের পূর্ব্বে বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় মেজর ধ্যানচাঁদের হাতে এই দলের খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ভার দেওয়া হয়। ভারতীয় দল এই প্রতিযোগিতার শেষে ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানের হকি খেলায় যোগদান করবে।

* * * *

চতুর্থ বিশ্বযুব ও ছাত্র সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাংলার ইণ্টবেঙ্গল ক্লাব, ভারতীয় সাইকেল, কুস্তি এবং ভলিবল (উত্তর প্রদেশের) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থান বুখারেষ্ট অভিমুখে যাত্রা করেছে। আমরা এই দল দলের সাফল্য কামনা করি।

হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় সন্তরণ ঃ

'ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি'র উদ্যোগে ঢাকুরিয়া হ্রদে গত ২৭শে এবং ২৮শে জুলাই এক মনোজ্ঞ জল-ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়। খ্যাতনামা ভারতীয় সাঁতারু শ্রীযুক্ত রবিন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী শান্তি চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের দুহিতা কুমারী মমতা চট্টোপাধ্যায় হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় প্রশস্তার সঙ্গে জলপথ অতিক্রম করেন।

অনুষ্ঠানের ফলাফল :

	দূরত্ব পথ	সময়
রবিন চট্টোপাধ্যায়	৫ মাইল	৬ ঘঃ ১ মিঃ ২৬ সেঃ
শান্তি চট্টোপাধ্যায়	১ মাইল	১ ঘঃ ২০ মিঃ ৩৫ সেঃ
মমতা চট্টোপাধ্যায়	১ মাইল	১ ঘঃ ৩৭ মিঃ ৫২ সেঃ
	১৯৫ গজ	

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, ১৯২৯ সালে রবিন চট্টোপাধ্যায় হেদুয়া পুষ্করণীতে (বর্ত্তমান নাম আজাদবাগ) ৫৪ ঘণ্টা কাল একটানা সাঁতার দিয়ে অবিরাম সন্তরণে প্রথম রেকর্ড স্থাপন করেন। ১৯৩৪ সালে এলাহাবাদে ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিঃ সাঁতার দিয়ে তিনি অবিরাম সন্তরণে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করেন।

সাহিত্য-সংবাদ

৺বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বৈকুণ্ঠের উইল" (১১শ সং)—১৷০,
"কাশীনাথ" (১১শ সং)—২৷০, "হরিলক্ষ্মী" (৭ম সং)—১৷০,
"বিজয়া" (৬ষ্ঠ সং) ২৲

শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার প্রণীত উপন্যাস "ঘরোনিক"
(১ম খণ্ড—৮ম সং)—৩৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "যৌতুক"—২৲

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী
"মহাজনবন্ধু ভক্ত বার্ণার্ড শ"—১৲

যোগাচার্য্য আত্মর প্রকাশিত "সহজ রাজযোগ সাধন প্রণালী"—১৷০

স্বামী ভবানন্দ গিরি প্রণীত "ভাবোন্নয় সোপান"—১৷০

শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "রক্তের পথের শেষে"—৷০

শ্রীদীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "প্রাণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়"—৷০

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "পরলোকে গীতা"—১৷০

বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "নাম রেখো" (পরিমার্জ্জিত সং)—২৲

অমলেন্দু দাশগুপ্ত-অনূদিত "রাশিয়া কি সমাজতন্ত্রী দেশ?"—৷০

শিশিরকুমার আচার্য্য চৌধুরী-সম্পাদিত "বাংলা
বর্ণলিপি" (১৩১০)—২৷০

শ্রীবলাই প্রামাণিক প্রণীত উপন্যাস "খেলাঘর"—২৲

শ্রীঅনুদা মুখোপাধ্যায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থ "ক্রিসেন্ট"—৸৲

শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ গিরি প্রণীত "বাসনালয়"—১৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

হর-পার্ব্বতী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আশ্বিন—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

একটি প্রাচীন তামিল কাব্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবগোষ্ঠীর ইতিহাসের প্রকাশ নানা দিকে নানা রূপের মধ্যে একথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। তারিখ সাল, অঙ্ক তারিখ শিলালেখ, মুদ্রা, পটোলি, শাসনাবলী, লিখিত কাহিনীই বুঝি সবটুকু মালমশলা। কিন্তু যিনি দৃষ্টবান্ তিনিই দেখিতে পান ইতিহাস সৃষ্টির কত উপকরণ ছড়ানো থাকে কাব্যে গাথায়, কত ছায়া আনত হইয়া পড়ে মানব মনের ওই প্রবহমান ভাবধারার আলোপ্যে। বিষয়মার স্পর্শ পড়ে সেখানে, ইতিহাস লক্ষ্মীর এক একটি কমলদল খোলে। রসিকের চিত্তে, জিজ্ঞাসুর মনে একটি সমগ্রতার রূপ ফুটিয়া ওঠে। হয়ত সেটা তারিখ মিলাইয়া অঙ্ক কষা বিশ্লেষণমুখী ইতিহাস নয়, তবু তার মধ্যে যদি সেই যুগের মানবমন মনটিকে কিছুটা ধরা যায় তাহ'লেই মন খুশীতে বলে এই যথেষ্ট। কারণ ইতিহাসকে আমরা সাধারণতঃ দেখি Quantitative কাহিনী হিসাবে, Qualitative বিবর্তনের চিত্র হিসাবে নয়। ভুলিয়া যাই, যে কোন দেশের যে কোন গোষ্ঠীর ইতিহাস একটা "Unfinished process" (Breasted) এবং তার রূপ Absolute নয়, Relative. অতীত তাতে সুপ্ত, বর্তমান্ তাতে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যতের বীজ তার মধ্যে উপ্ত। ভাবরাজ্যে সাংস্কৃতিক ধারা সমৃদ্ধ হয় আদানপ্রদানে। বহু গোষ্ঠীর মিলনে ও সহযোগে কৃষ্টির বিশাল ধারা "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" পরিণত হয়।

প্রাচীন তামিল সাহিত্যের কথা বাংলাদেশে অনেকেই জানেন না। প্রাচীন "চেন তামিজ" সাহিত্যের দুই যুগ একটি "সঙ্গম" যুগ ও আর একটি কয়েক শতাব্দী পরে শৈব ও বৈষ্ণব যুগ, সিদ্ধ ও ভক্তের যুগ।' দুই যুগই অপূর্ব রসসিক্ত। দুই হাজার বছর পূর্বেও সুদূর দাক্ষিণাত্যের একপ্রান্ত চের, চোল ও পাণ্ড্য-রাজ্যের সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা, মান ও গৌরব আকাশচুম্বী হইয়াছিল। কাব্যে গাথায় প্রশস্তিতে তাদের অতুল কীর্তি কবিরা অমর করিয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় মারফৎ ইহার একটু সামান্য পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। সেই কাহিনীগুলির কিছুটা পুনরাবৃত্তি করিলে দোষের হইবে না। কারণ বাংলাদেশে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। শুধু শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন শাস্ত্রী কবি তিরুবল্লুবরের "কুরল" বা "মুদ্রান" গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রাচীন তামিল সাহিত্যের এক রসঘন পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষিণে "কুরল" গ্রন্থ বেদের মতই সম্মানার্হ ও

প্রামাণিক। কুরলের রচনা খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের পরে হইলেও মাদুরা-ই-কাঞ্চী প্রভৃতি নাগর কাব্যগুলি আরো প্রাচীন বলিয়াই তামিল সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণ দাবী করেন। ইহার সমর্থনে শুধু এইটুকু বলা যায় যে ভাষার দিক হইতে এই সব পদাবলীগুলি সংস্কৃত ও আর্য্য সংস্কৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত। প্রাচীন তামিলকে বলা হইত "সেন তমিল" এবং আধুনিক তামিলকে কোটুন্তমিল (দ্রাবিড়, দ্রমিল, তমিল, তামিল, তামিল)। এই সব কবিদের বলা হইত "সঙ্গম" কবি। সঙ্গম্ বা সঙ্গম তামিল ভাষার অর্থ হইতেছে "পণ্ডিত ও কবিদের পরিষৎ"। কিম্বদন্তী যে স্বয়ং মহাদেব, কার্ত্তিকেয় এবং অগস্ত্য মুনি প্রথম কবিপরিষদের তিনজন প্রধান সদস্য ছিলেন। এই যুগের কয়েকটি বিখ্যাত কাব্য হইতেছে "মদুরা-ই-ক কাঞ্চী" "চিরু পত্তিরুপত্" "পত্তিনপলাই" "ইরু ইরাপত্তু" প্রভৃতি এবং ইহাদের রচয়িতা হইতেছেন "মঙ্গাদি মারুদনর" "ইলঙ্গো আদিকলর" "চীরলনই চ চাদনর" "পুথন ভেন্নর" প্রভৃতি কবিরা। নায়িকার নামে আর একজন কবি পাঁচটি শ্লোকে প্রেম কাব্যের মর্যাদায় একটি রূপক ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত ব্যাকরণ "তোল-কপ্পীয়মও এই যুগের। এইসব কাব্যগুলি খৃঃ পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে আনুমানিক দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে লিখিত হইলেও সেই যুগের প্রাচীন ভাষায় এগুলি বর্ত্তমানে আসে নাই। মনে হয় এই সব কাব্যগুলি মুখে মুখে চলিয়া আসিয়া কয়েক শতাব্দী পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতেই পাণ্ড্যরাজ্যের সমৃদ্ধি উচ্চশিখরে উঠিয়াছিল। তাঁহারা চের চোলদের পরাজিত করিয়াছিলেন, দুর্গম বন্য অঞ্চলের সংস্কার করিয়াছিলেন, বিরাট নগরীর পত্তন করিয়াছিলেন এবং প্রজারঞ্জক নানা জনহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন।

পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় নেডুন চেলিয়ানের উদ্দেশ্যে রচিত। "মানকুড়ি" নিবাস "মারুথানার" নামক রাজার সভা কবি ইহার রচয়িতা।

অনুবাদের দ্বারা দ্বিধা রসগ্রহণে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না এবং সেকালের চিত্র হিসাবে এগুলি অনবদ্য ও অপূর্ব্ব, যদিও কবিপ্রসস্তির মধ্যে রাজার মনোরঞ্জন ও নিজের দেশের গর্ব্বের জন্য অতিরঞ্জন থাকিতে বাধ্য।

এই সব কবিতাগুলিতে আর্য্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার এক বিচিত্র রসায়নের চিত্র পাওয়া যায়। সংস্কৃতপন্থ শতকরা দুইটিও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, যদিও নিশ্চিতরূপে আর্য্য সভ্যতার প্রবেশ বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতা প্রাক্ আর্য্য দ্রাবিড় সভ্যতাকে কখনই সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে নাই এ কথা ত সত্যই, বরং বহুলভাবে ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। এই সময়ে দ্রাবিড় ও আর্য্য সভ্যতার সমীকরণ চলিয়াছে। রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই সময়ের আর্য্য দ্রাবিড় সংস্কারকে নূতন প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়াছিল।

মদুর-ই-কাঞ্চী কাব্যটি মহানগরী মাদুরার অপূর্ব্ব রসসিক্ত বর্ণনা। মাদুরা নগরীর ঐতিহ্য শুধু নায়কদের মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য বা বিজয়-নগর রাজ্যের প্রসাদের বা তার শিল্পকলার জন্য বা আটশত বৎসর পূর্ব্বের "মধুরা থলপুরাণের" কাহিনীতেই নিবদ্ধ নয়। ইতিহাসে মনে প্রাচীনকালে মাদুরা নগরীর খ্যাতি দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত ছিল। শুধু সিংহল আরব যবদ্বীপের সঙ্গে নয়, সুদূর রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গেও নিকট যোগিতা সম্পর্ক ছিল। অনেকেই মনে করেন যে মাদুরা উত্তরাপথের মথুরার অপভ্রংশ। আর্য্য উপনিবেশের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত নগরীর নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন তামিল ভাষা খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্বে প্রায় সংস্কৃত অনুপ্রভাবিত ভাষাই ছিল।

এইবার মূল মদুরা-ই-কাঞ্চী কবিতার কথাই আলোচনা করা যাক্। কবি প্রথমেই গাহিলেন—

সমুদ্রমেখলা এই যে ধরিত্রী
কূলে কূলে যার ঢেউ পড়েছে
নীলাম্বু রাশির সঙ্গে তরঙ্গমালা
দূরে যায় দেখা যায় নীলাভ পাহাড়ের শ্রেণী গগনচুম্বী
যেখানে সবই হরিৎ ও শস্যশ্যামলা
যেখানে আকাশে বাতাসে সবই মধুময়
সবিতৃদেব যেখানে নিয়মিত তাপ দেন
দিনকে করেন আবাহন্
রাত্রে চন্দ্রের সোহাগ যার রূপ হয় মনোহর
কালে যেখানে পর্জ্জন্য বৃষ্টি দেয়
ধনসাধারণ যেখানে সবাই সুখী
বৃক্ষ দেয় ফল, মাটি দেয় শস্য শতগুণে
যে রাজন্, সেই পুণ্যদেশেই তোমার
পিতৃগণ রাজত্ব করেছেন
কেউ সেখানে কিন্তু অন্ন মরেনি
প্রচুর পর্য্যাপ্ত আহার
সুরম্য দুর্গে শোভিত বিরাট বর্ত্মগুলি
যেন নদী ঘিরেছে
রাজঅমাত্য ও মন্ত্রণা প্রবীণ মনীষিরা সেখানে থাকেন
যাঁরা কখনও মিথ্যা বলেন না, সবাই সত্যভাষী

কবি তাঁহাকে প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া পরোক্ষে উপদেশ দিতেছেন—তিনি যেন জয়মদমত্ত হয়ে রাজ্যশাসনের প্রধান কথা—প্রজারঞ্জন, সুবিচার ও সুশাসন—ভুলিয়া না যান। রাজা নেডুনচেলিয়ন্ থালাইলাঙ্গনমের যুদ্ধে চের ও চোল রাজাদের পরাজিত করেন। পরে তিনি বিখ্যাত নেলোর কদম্বরাট অধিকার করিয়া লন্ ও উত্তর পায়ম্বারাম্বর যুদ্ধীভূত করেন।

কবি তাই বলিলেন—

তুমি শৌর্য্যে বীর্য্যে অতুল
পরমের বেগে তুমি ধবল করো
শত্রুর আগুন ছড়াতে ছড়াতে

কিন্তু এই যে রাজা, তিনি যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ জয় করেন না। কালিদাসের

উপমায় বলিতে গেলে—বৃদ্ধোরস্ক বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশু মহাভুজ আর্যবর্ত্ম-ক্ষম এই যে বীর ইনি ছিলেন "আত্তবর্ম্ম ইবাত্রিতঃ" প্রকৃত ক্ষাত্র ধর্ম যেন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। জীবনের অনিত্যতাও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেন—

তুমি সত্য ও ব্রহ্মাকেই জানো
স্বর্গ ও অমৃতের বিনিময়েও তুমি ভোলোনা
ত্রিদিব হতে দেবতারা ও গর্জমান্ সিন্ধুও যদি
তোমার শত্রু হয়, তবু তুমি স্থির অচঞ্চল
ভয় ভাবনাহীন অতী:
সারা পৃথিবীর সম্পদের বিনিময়েও
তুমি অন্যায় করোনা।

একটী কথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই সময়ে পাশ আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ও দক্ষিণে সিংহল হইতে বৌদ্ধ সম্বন্ধের প্রভাব ও প্রচার চেরচোল পাণ্ড্যরাজ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে বঙ্গরাজ বংশীয় সীহবাহু ও সীহসীবলীর পুত্র বিজয়ের সিংহল যাত্রার কিম্বদন্তীর মধ্যে সত্য আছে এবং বহু বঙ্গদেশবাসী নাবিক তামিলনাদ ও অতি দক্ষিণে উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। আর রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের সাম্রাজ্য যে প্রায় পাণ্ড্যরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল একথা ইতিহাস সম্মত। "সব্ব মুনিষে পজা মমা" এখনও গিরিগাত্রে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয়" হইয়াও তিনি তপস্য ও অস্ত্রের দ্বারা জম্বুদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন "অদণ্ডেন অশস্ত্রেন বিজয়েন"। কিন্তু এই গাথায় যুদ্ধবিমুখতার কোন পরিচয় নাই। বরং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রভাব কিছুটা দেখা যায় যেখানে কবি রাজাকে বর্ণনা করিতেছেন যে তিনি নিষ্কাম হইয়াই যুদ্ধ করেন। একথা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে উত্তরাপথের মথুরা নগরীতেই দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। বিষ্ণুফুল যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত বংশ। "পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা" তাঁরা শিক্ষা করিতেন। এর প্রবর্ত্তন কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস, সূর্য্যোপাসক। কৃষ্ণপুত্র শাম্বও সূর্য্যোপাসনা করিতেন। প্রাচীন সুমেরীয় দ্রবিড় সভ্যতায় সূর্য্যপূজা বিশেষ প্রচলিত ছিল—মিশর দেশের সম্রাট ইখনাটোনের সৌরগাথা আজও অপূর্ব্ব বিস্ময় জাগায়। অবশ্য ঋগ্বেদে ও উপনিষদেও "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধীয়ো যোন প্রচোদয়াৎ" এর মধ্যে সূর্য্যপূজার আভাস পাওয়া যায়। অবশ্য ঋষিদের অনুভূতিতে সবিতা হইয়া গেলেন বিশ্বের প্রসবিতা, যিনি "আদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাৎ" পরম পুরুষ, সূর্য্য নন্। মনে হয় মথুরা ও দ্বারকার সঙ্গে উপনিবেশের মধ্য দিয়া সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

এইবার আবার কাব্যকথায় ফিরিয়া আসা যাক্। নগরীর বর্ণনার পূর্ব্বে কবি বর্ণনা করিলেন সমগ্র দেশের। কত পাহাড়, কত জঙ্গল, কত হরিৎক্ষেত্র, কত ধান্য নবান্ন, কত বাঁশ, কত রকমের শস্য, 'খোরাই' চাল, 'আইনা' 'তিনই' শস্য, কত আমুর, আমা, ভিন্তিড়ী, আম কাঁটাল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাংলার এক কবি (সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত) বাংলার পল্লী সমৃদ্ধির এক চমৎকার চিত্র আঁকিয়াছিলেন—শালিধান্য সমৃদ্ধ গ্রামিক গৃহা সংসৃষ্টনীবোৎপল···

স্নিগ্ধচ্ছায়তরু প্ররোহ নিবিড় রা দীর্ঘ সীমোদরা:
মোদন্তে পরিবৃত্ত দেয়পতুহজ্জন্তা: পলালৈ নরৈ:
সংসক্ত ঘন সিন্ধু সঙ্গ মুখরা গ্রামা গুড়ামোদিন:

চাষীদের গৃহে ধান্যস্তূপ ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপন করিতেছে, নীলোৎপলের সংযোগ নবপ্রফুল্ল শ্যামল ধানের ক্ষেত্রের সীমাকে দীর্ঘায়িত করিতেছে খোবলদড়াগ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নতুন খড় পাইয়া তৃপ্তি পাইতেছে। গ্রামগুলি আখমাড়াই কলের শব্দে আর নতুন গুড়ের গন্ধে আকুল।

—দক্ষিণের কবি রাজার প্রশস্তি উপলক্ষে বর্ণনা করিলেন যে সমুদ্র থেকে কত জিনিস আসে—মুক্তা, শঙ্খ প্রবাল। বন্দরে আসে দেশ-বিদেশের বড় বড় পোত, কত জিনিস তারা লইয়া আসে, কত জিনিস লইয়া যায়—কত তেজী ঘোড়া, নোনা মাছ, মিষ্ট তেঁতুল—কত সূক্ষ্ম বস্ত্র, আভরণ। মিশর ও পেরিপ্লাসেও এই দক্ষিণ রাজ্যগুলির বিরাট বাণিজ্য সম্পদের কথা পড়ি।

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী প্রান্তরের পর কবি আরম্ভ করিলেন মহানগরীর বর্ণনা। এই নগরীতে এত জিনিস যে তার ভারে সে যেন অবনমিত। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের কোন সীমা নাই। সহরের প্রাচীরগুলি গগনস্পর্শী, মাঝে মাঝে বিরাট সিংহদ্বার—বিজয়ের পথ। সিংহদ্বারগুলির উপরে মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি। মনে হয় কবিকবেহল এই নগরী লক্ষ্মীর উপাসনা প্রকৃষ্ট ভাবেই করিতেন। কদলী কলসী ঘৃত ঢালিয়া দ্বারগুলিকে মসৃণ ও কৃষ্ণবর্ণ করা হইত। নগররক্ষীর দল প্রাচীরের উপর বিরাট কক্ষগুলিতে বাস করিত। সেগুলি এত উচ্চে যেন মনে হইত বেলাভূমীন পর্ব্বতেরই এক অংশ। মহানগরীতে জন-স্রোতের বিরাম ছিল না। নদীপ্রবাহের মত দিকে দিকে কলগুঞ্জন। সহরের হর্ম্মাগুলি সুউচ্চ হইত, সাততলা পর্য্যন্ত। বড় বড় গবাক্ষ থাকিত যার মধ্য দিয়া দক্ষিণা বাতাসের মাদিকা পূর্ণভাবেই পাওয়া যাইত। পথের চারিপার্শ্বে কেবল বাজার ও বিপণী, ক্রয় ও বিক্রয় —নানা দ্রব্য ও পণ্যের বিপুল সম্ভার। দিকে দিকে নানা রংএর পতাকা—কোথাও যুদ্ধজয়ের, কোথাও জল স্থলাবাসের, কোথাও দেববন্দিরের উপর।

পথের ধারে ধারে খাদ্য ও পানশালা। উৎসবপ্রমত্ত নাগরিক নাগরিকারা ইচ্ছা করিলে "খাদ্য কিছু পেয়াদা হাতে" গুণগুণিয়ে দিনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন। মধুমিশ্রিত কাঁটালের কোয়া, নানা জাতীয় আম, নারিকেল ও পর্করা যোগে নানাবিধ পিষ্টক, বড় বড় মাংসের খণ্ড সহ সুসজ্জিত অন্ন ও নানারকম পানীয়ের কথা কবি বলিয়াছেন। উৎসবমুখরিত নগরীতে পানশালার প্রাচুর্য্যের কথাও তিনি জানাইয়াছেন —সেখানে থাকিত ফেনিল তরল তালের রস। তার উপর পান সুপারির কথাও দেখিতে পাই। আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে এই পানীয় ও পানসুপারির প্রচলন ও প্রথার দেখা যায়।

এই নগরীতে বৃত্যোপজীবীদের বিশেষ আদর ছিল। সমাজে গণিকাদের প্রতিষ্ঠা ছিল। রাজপ্রাসাদ হইতে তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার্য প্রেরিত হইত। তাহারা স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার উপহার পাইতেন। তাহাদের সুন্দর মণিবন্ধগুলি ঘিরিয়া উষ্ণীষ কেয়ূর-কঙ্কণ শোভনালো।

শুধু কি তরুণীরা, বৃদ্ধারাও সে যুগে নগরে শোভন করে কেশবিন্যাস করিতেন যেন শুকপক্ষ হইলেও। তাঁরা সুদৃশ্য পেটিকাতে পশরা সাজাইয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেন। তাঁদের বিশেষ আদরের ছিল তরুণী ও যুবতীরা।

সেই তরুণীরা কি রকম—কালিদাসের ভাষায় বলিতে গেলে—"কাঞ্চনকুম্ভা বিকচপদ্মনোদ্ভ্রান্ত নবযুবতির রূপরম্যা"

কবি বর্ণনা করিতেছেন—

ভাস্করে গড়া মূর্ত্তির মত
হাতের পাত্র চারুচিকনায়
যেন বালারুণ দীপ্ত
হাতের পোশন তাঁর সহস্র দৃষ্টি
পুরুষের করে উদ্ভ্রান্ত
নবীন গাত্রবিভা করে চঞ্চল
হাতের শঙ্খ শুভ্র রত্নরাজি
মুক্তার পর মুক্তার মত সজ্জিত
হাতের নবোদ্ভেদ যুগোল বাহুমূল
সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের কুঞ্চিতগুলির
ধারা রমণীর
যেন কোন শিল্পীর
কমনীয় অঙ্গের অধিক উন্মেষ

প্রতি পূর্ণিমার পর কৃষ্ণা সপ্তমীর সন্ধ্যায় উৎসবের দিন পড়িত। সেদিন সবাই স্নান করিয়া শুচি হইয়া আসিত। পথে বিপণীতে কোলাহল, নূপুর উৎসবের বেশ ধরিত। বহুমূল্য মহার্ঘ রক্তিম পরিচ্ছদে ধনী অভিজাতেরা রথারূঢ় হইয়া সদম্ভদর্পে গমনাগমন করিতেন। সন্ধ্যা যখন দূর্দ্ধকরোজ্জ্বল ধরণী ম্লান হইয়া আসিত, তখন তাঁহারা সঙ্গে লইতেন স্বর্ণখচিত কোষনিবদ্ধ তরবার, স্কন্ধে দুলিত অলাবরণ বহির্বাস। তারা নিজের মাথা পরিতেন শক্তিস্থানের জন্য, গলায় দুলিত মুক্তার মালার সাথে কুসুমকলাপের পরিমল।

দুইটি অট্টালিকাগুলির ছাদে অলিন্দে সুন্দরীরা দাঁড়াইয়া থাকিতেন, প্রোষিতা-ভর্তৃকা হইয়া। তাঁদের গায়ে থাকিত স্বর্ণের ও মণিমুক্তার অলঙ্করণ। তাঁদের সুনিপুণ অঙ্গরাগ ও চারু প্রসাধনের সৌরভ রাজপথ পর্য্যন্ত আমোদিত করিত। তাম্বুল কর্পূরচূর্ণের দীপ্তির আভায় প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত তাদের সুন্দর মুখগুলি। পতাকার অন্তরালে কখনো তাদের বেণী মিলিত, কখনো মিলিত না।

সন্ধ্যা যতই ঘনাইয়া যাইত, উৎসবের স্রোত ততই বর্দ্ধিত হইত। মন্দিরগামী পূজার্থী ও পূজার্থিনীরা ত্বরান্বিত হইয়া দ্রুত গমন করিত দেবতার নিকট পূজার জন্য, শুধু বিকট ভয়ঙ্কর সন্তাসোচন দেবতা নয়, তাঁকেও, যাঁর চোখের পলক পড়ে না, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোমের অধীশ্বর।

এইখানে শৈব আগমসিদ্ধান্তের কিছুটা বীজ পাওয়া যায়। ত্রিবর্ত্তীয় মহাযান্ বৌদ্ধধর্ম্মে "ওঁ মণিপদ্মহুম্" যেমন বীজমন্ত্র শৈবধর্ম্মে "ওঁ নমঃ শিবায়" এবং তিনিই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ব্যোমের অধিপতি। তাঁর পঞ্চ ক্রিয়া, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব, অনুগ্রহ। শৈবসাধনার এই সূত্র দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের অতি দক্ষিণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাব্য লেখার কয়েক শতাব্দী পরেই দক্ষিণে শিবের অষ্টাদশ লীলামূর্ত্তির কথা জানা যায়, যেমন—(১) গঙ্গাধর (২) চন্দ্রশেখর (৩) বৃষভবাহন (৪) ত্রিপুরান্তক (৫) কল্যাণসুন্দর (৬) ভিক্ষাটন্ (৭) কঙ্কালবাহন (৮) ভিক্ষাটন্ (৯) কালসংহার (১০) গজসংহার (১১) সোমস্কন্দ (১২) পাশুপত (১৩) হরিহর (১৪) চণ্ডেশ্বর (১৫) দক্ষিণামূর্ত্তি (১৬) ভৈরব (১৭) অর্দ্ধনারীশ্বর (১৮) নটেশ।

এই নটেশই হইল উৎসব মূর্ত্তির দেব ও চরম বিকাশ। দক্ষিণের ইতিহাসে কত ভাব ও ভঙ্গীতে নটরাজের প্রকাশ হইয়াছে অমর সাধক শিল্পীদের কল্পনায়, তার ইয়ত্তা নাই।

চন্দ্রদণ্ডশিখি প্রসারিতকরম্ উর্দ্ধং
পদং কুঞ্চিতম্.....

এই নগরীর প্রান্তে বৈদিক মন্ত্রপরায়ণ ঋষিরাও যে থাকিতেন তাহাও কবি জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা থাকিতেন পর্ব্বতের উপর কৃত্রিম গুহায়। পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসে চালুক্য যুগে আজীবক সন্ন্যাসীকে এইরূপ গুহায় বাস করিতে দেখা যায় রাজ সাহায্যে। এই ঋষিরা নিয়মিত যজ্ঞ করিতেন। কবি বলেন তাঁরা বিরাট্ বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম এবং এই জীবনেই স্বর্গভোগ করেন—সর্ব্বভূতে তাঁদের মৈত্রী, তাঁরা কখনও ধর্ম্মের পথ অতিক্রম করেন না, সদাসত্যে বিরাজ করেন। তাছাড়া নগরপ্রান্তে থাকিতেন শ্রমণরা—তাঁরা ভূতজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্রষ্টা। এঁরা হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন পন্থীর শ্রাবক বা পরিব্রাজক তার কোন উল্লেখ নাই। শুধু এইটুকু প্রতীয়মান হয় যে ধর্ম্মের দিক দিয়া মানব ক্ষেত্রে ও পথের এক বিরাট্ সমীকরণ চলিয়াছে। বৌদ্ধমত, শৈবধর্ম, প্রাচীন অষ্ট্রিক সুমেরীয় দ্রাবিড়ী রীতি সব মিলিয়া বিশ্বধর্ম্মের পতাকায় মিলিত হইতেছে। কবি বলিতেছেন যে যেন মন্দিরে ফলের পর ফল লোক আসিতেছে, প্রণাম করিতেছে, অর্ঘ্য দিতেছে। কবি বিশেষ করিয়া মধুক্ষর ফুলের কথা বলিয়াছেন, যাতে ভ্রমররা লুব্ধ হয়। প্রাচীন দ্রাবিড় দেবতা মুরুগা যা কুরুঞ্জেশের সঙ্গে যোগীশ্বর শিবের পূজা আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে দ্রাবিড় সংস্কৃতির রূপান্তরেরই পরিচয় দেয়। দ্রাবিড় মাতৃকা কোট্টাবী পরিণত হইয়াছিলেন দুর্গায়, শক্তিতত্ত্বে। অবশ্য ঋগ্বেদে উষা, বৈরোচনী, হৈমবতী, অথবা অম্বালিকার নাম পাওয়া যায়। দেবীসূক্তে "অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি" শক্তিবাদের মূলমন্ত্র। অদিতি বা

ভূমাতা বা magnum materএর পূজা দক্ষিণে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মাতৃতন্ত্রবাদী-সমাজ দক্ষিণে আজও কিছুটা প্রচলিত। প্রশস্ত খোদীশ্বর দাসাগ্রবন্ধ দৃষ্টি শিব আদলে আর্য্য কি অনার্য্য দেবতা সে বিষয়ে বহু মতভেদ আছে। মহেঞ্জদড়ুর শিলগুলির সম্যক্ পাঠোদ্ধার হইলে হয়ত তাহার অনেকটা সমাধান মিলিবে। তবে দক্ষিণে বহুদিন হইতেই শিবপূজার যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল একথা সর্ব্বসম্মত। রামায়ণে যে আগন্তুক অসভ্যজাহিত আর্য্য সভ্যতার সহিত দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শ পাওয়া যায় তাহাতেও দেখা যায় যে দুরধর্ষপ্রকৃতি শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রসঙ্কমের পূর্ব্বে সাগরসৈকতে বালুময় তটে শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন। ধনুষ্কোটী ও রামেশ্বরম আজও সেই ঐতিহ্যের ও কাহিনীর গুরুভার বহন করিতেছে। কেউ কেউ রুদ্রকে বলেন "Syncretic diety" ঋগ্বেদে তিনি পশুপ, তাঁর স্থান পশ্চাতে। হিরণ্যকেশিন্ গৃহ্য সূত্রের মতে তিনি পশুযূথের এবং সর্পগণের মধ্যে বাস করেন। Keith বলেন যে রুদ্রের শিবত্বপ্রাপ্তি তামিল "শিবম" বা রক্তবর্ণপুরুষ হইতে আসিয়াছে। আসলে বৈদিক রুদ্রের সঙ্গে শৈববাদ ও লিঙ্গপূজা মিশিয়া গিয়াছে। স্কন্দপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতিতে সুরতপ্রিয় শিবের নানা উপাখ্যানের সঙ্গে লিঙ্গপূজার নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। কিরাতমূর্ত্তি শিব, শবরী-বেশী শিবানী প্রাচীন অনার্য্য দেবতারই পরিচয়। দক্ষিণ দেশে শিবলাঞ্ছী ব্রাহ্মণরা সমাজে অচল। শিব নির্মাল্য খাইয়া পতিত ব্রাহ্মণদের কথাও ডক্টর ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে শৈববাদীদের সমাজে খুব উচ্চস্থান ছিলনা এবং তাঁহাদের উপাস্য শিব প্রাচীন প্রাক আর্য্যকুলের দেবতা। ঋগ্বেদে শিশ্নদেবের কথাও আমরা পাই। মহাভারতে তিনি দিগম্বর, নগ্ন, ক্ষিপ্ত যোগী, সিদ্ধযোগী, মহাযোগী, ব্রহ্মচারী, তপস্বী, মহাতপা, ঘোরতপা। মনে হয় শৈববাদ আর্য্য অনার্য্য দ্রাবিড় সংস্কৃতির রসায়ন হইয়া উত্তর ভারতে বিশেষ করিয়া বাংলা, আসাম, তিব্বত নেপালে বৌদ্ধপ্রভাবিত তন্ত্রোক্ত বজ্রযানে ও সর্ব্বাস্তিবাদে মিশিয়া গিয়াছে। বহুযুগ পরে মহাযান-সূত্রের কারণ্ডব্যূহে দেখি যে ভগবান অবলোকিতেশ্বর মহেশ্বর ও উমাকে "সমাক্ষরী" বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন এবং মন্ত্র দিলেন 'ওম্ শূলে শূলে শূণো স্বাহা'। মিথিলা গ্রন্থের মহাপণ্ডিত নাগার্জ্জুনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য আর্য্যদেব তৃতীয় শতাব্দীতে শূন্যবাদ প্রচার করেন।

উত্তর ভারতের এই পরিণতি দক্ষিণে প্রসার লাভ করিয়াছিল কিনা তা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে দক্ষিণে শৈববাদ বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল।

আবার কবি কথায় আসা যাক্।- এই নগরীতে যাঁরা বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিতেন তাঁরা সবাই ন্যায়জ্ঞ। অর্থী ও প্রত্যর্থী সকলেই তাঁদের প্রশংসা করেন। তাঁরা ভয় লোভ ও দ্বেষকে দূর করেন, সিক্ত হইয়া সম্যক্ বিচার করেন, তৌলে ওজন করা সিক্থির মত। এই ন্যায়াধীশরা মহারাজের কার্য্যের পর্য্যন্ত বিচার করেন। তাঁদের দৃষ্টি রাজা যেন প্রেম ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাঁরা নিজেদের সুবিচারক বলিয়া প্রমাণ করার জন্য কৃতসংকল্প।

বণিক ও শ্রেষ্ঠীরা এখানে লোকী দল—তাঁরা ন্যায্যদামে জিনিষ ক্রয় ও বিক্রয় করেন। তাঁদের উচ্চচূড় প্রাসাদগুলি নানা পণ্যে পূর্ণ। তাঁরা বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন দেশযাত্রা করেন। দেশ বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেন মণিমুক্তা বৈদূর্য্য স্বর্ণ নানা দ্রব্যসম্ভার।

রাজার মন্ত্রী সংসদে থাকেন অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা। তাঁরা তাঁকে সুপরামর্শই দেন। গ্রামের কার্য্য গ্রাম্য বৃদ্ধদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। রাজা নিত্য সভায় বসেন, প্রজাদের দর্শন দেন।

কবি সন্ধ্যার পর নারীর যা বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে তাঁর কবিত্বশক্তি, বর্ণন কৌশল ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এইরূপ—দিনের শেষ সন্ধ্যা নামিতেছে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচলখসা'। আস্তে আস্তে অস্তাচলে গেলেন ক্ষুব্ধ দিনমণি, হেলিয়া পড়িলেন পশ্চিমের গিরিপ্রান্তে, যেন রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছি—

পথরেখা লীন হলো অস্তগিরির শিখর আড়ালে
শুভ্র দীপ্তি দেয় ক্ষণে ক্ষণে
শেষ তীর্থ মন্দিরের চূড়া
সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন অবসানের রাগিণী।

ওদিকে পূর্ব্বাচলে জ্যোৎস্নাপুলকিত চন্দ্রোদয়, রাত্রি নামিয়া আসে। কিন্তু তরল আলোর সহস্র উদ্ভাসিত হয় দিনের মতই। হরিণ চকিতনয়না সুন্দরীরা ঘরে ঘরে সন্ধ্যাসংঘের প্রদীপ জ্বালে এবং নিজ নিজ প্রিয়তমদের সাথে হাস্যকৌতুক ও নৃত্যে মত্ত হয়। ক্ষণে ক্ষণে মেঘ আসিয়া তাদের আবরণ করিয়া যায়। কবি স্মরণ করাইয়া দেন কালিদাসের ভূধর-সম্ভবের একটি শ্লোককে

যত্রাংশুকাক্ষেপ বিলজ্জিতাভাঃ
বধূজ্জ্বা কিম্পুরুষাঙ্গনানাং
মধৌ গৃহদ্বার বিলম্বিবিধাশ্চি বলাহকাঃ
জলদা ভবন্তী।

নারীদের প্রসাধন ক্রিয়া চিরন্তনী। সব যুগে সব দেশেই তার প্রসিদ্ধি। কুসুম ও পদ্মের পাপড়ি, আর চন্দনচূর্ণে মাদুরাবাসিনীদের কেশপাশ সুরভি হইত, সুগন্ধি ধোঁয়ায় পরিধেয় বস্ত্র হইত সুরভিগন্ধবহ। মনে পড়ে হিন্দী কবির গান

মোতিন হারে বেশ বনালে
সিঁথি লাগালে ভালে
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর
তোর বাঁধহ চম্পকমালে

রাত্রি আগাইয়া যায়, নগরের কলরোল ধীরে ধীরে কমিয়া আসে। সপ্তস্বরা বীণা লইয়া প্রিয়সমাগমে নারীরা বসে। কেশপাশের পুষ্পস্তবকের সুরভি ঘরকে আমোদিত করে, তাদের হস্তসঞ্চালনে কনককিঙ্কিনী কিনি কিনি ঝঙ্কে চিক্ চিক্ করিয়া উঠে কেয়ূরকঙ্কণ। কবি জানেন এই নারীরা

মোহিনী, পুরুষকে ক্রীড়নক করিয়া শোষণে তাদের এক দানবীয় উল্লাস আছে। কবির মতে এই স্বাধীনা দুর্মুখরা সমাজ ও গোষ্ঠিকল্যাণের কিছুটা পরিপন্থী হইলেও তাহাদের অস্বীকার বা অমর্যাদা করা যায় না।

> চমৎকার ভাবে পুষ্প মালো সজ্জিত হয়ে তারা বসে থাকে
> দূর ও নিকট থেকে ধনী ও দরিদ্ররা আসে
> কলা কলায় শীঘ্র দুজো তারা তাদের মনোরঞ্জন করে
> ধনী করে আলিঙ্গনোদ্যত বাহুলতায়
> যতক্ষণ ধন থাকে ততক্ষণ তারা ভ্রমরের মত গুণ গুণ করে
> আদরণ করে শেষবিন্দু পর্যন্ত।

কিন্তু তাহই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে আর একটি চিত্র—সঙ্গমিলনের পরিচ্ছুরিত উৎসব। বাদক বাজাইতেছে, চারণ গীত গাহিতেছে, অপূর্ব রাগিণীতে নাচিয়া আসিতেছে সঙ্গীত, নিশিতেছে সুরে মন্ত্রের সঙ্গে। কেউ বীণা-বাদিনী। কেহ চমরী ব্যজনকরা, কেউ চিত্রাঙ্কণ নিপুণা। প্রিয়জনের জন্য কেহ ভোজ্য থালী সাজাইতেছেন, কেউ পড়িতেছেন কাব্য, কেহ বা প্রিয়তমের নিকট সুরতশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বলিয়াছেন যে মহাভারতের সভাপর্বে উল্লেখ আছে যে দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সহদেব মাহিষতী নগরীতে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে সেখানে যজ্ঞাগ্নি জ্বালাইবার ভার মেয়েদের উপর। চারুগুপ্তের দুঃশাসন ছাড়া হোমশিখা সেখানে প্রজ্বলিত হয় না। নারীরা সেখানে স্বাধীনা স্বেচ্ছাচারিণী। তখনকার দিনের কবিরা এই স্বৈরিণী নারীদের হয়ত বিশেষ অনুমোদন করিতেন না, কিন্তু সমাজ জীবনে তাঁদের সহজেই গ্রহণ করিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নারীকে বলা হইয়াছে—তড়িল্লেখা, তপনশীঃ, বৈদ্যুতবহ্নি, অর্থাৎ বিদ্যুতের শিখিক, সূর্যের তেজ চন্দ্রের স্নিগ্ধতা এবং অগ্নির দাহ লইয়া নারী! মৃচ্ছকটিকে যখন আমরা বসন্ত সেনাকে দেখি তখন মনে হয় না চারু দত্তের সহিত তাঁর মিলন কবি চোখের চক্ষে দেখিয়াছেন। মহারাজ শূদ্রকের মৃচ্ছতোৎসবে মদনোৎসবে তাঁদের আমন্ত্রণ হয়, গায়ক ছাকরেলিল তাঁদের গান শোনায় "সৎ সত্যং বিরহেঽপি পীড়নকরে পঞ্চাশি মৃদুনিব"। কবিদের ভাষায় এই সব রূপজীবের বলা হইত গোষ্ঠনিকা, বিপুনিকা। বুদ্ধঘোষ তাঁদের বলিয়াছেন 'সাধারণা'। একজন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছিলেন "They did not muster simply to lust. What they sold and gave in the bargain was much more than woman-hood." আমাদের স্বর্গ রাজ্যের কল্পনাতেও এদের স্থান অল্প নয়। তারা নয় মাতা, নয় কন্যা, নয় বধূ—স্বর্গের উদ্যানচলে মূর্তিমতী উর্বশী। গন্ধর্ব চিত্রসেনের কাছে অর্জুন "স্ত্রীণাং সপ্ত বিশারদ" কিরূপে হইতে হয় তাহার পাঠ লইতেন। কামন্দকীয় নীতিসারের পাশেই বাৎস্যায়নের কামসূত্র। পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী, বীরা, গরকীরা, কত রূপেই প্রাচীন কামশাস্ত্রবিদরা নারীকেও তার প্রতি "মুড়"কে চিত্রিত করিয়াছেন। কেউ মুগ্ধা, কেউ মধ্যা, কেউ প্রগলভা। তখনকার দিনে কবিরা কিন্তু ইহার মধ্যে নিন্দার কিছু দেখেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা এই রূপপ্রবণতাকে দেহাতীত করিয়া অতীন্দ্রিয় স্তরে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে যে তখনকার কবিরা দার্শনিকরা এই সহজ সরল প্রাণের অভিব্যক্তির মধ্যে ছলাকলা দেখিলেও এর প্রকাশকে মানবজীবনের সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং কালিদাস অতবড় মহাযোগী মহেশ্বরের চিত্র আঁকিতে গিয়াও তাঁহাকে "পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকানম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" উমার সামনে অনেক ক্ষিপ্রদান করিয়া ফেলিলেন। অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেই তাঁর আত্মদর্শন হইয়াছে। "আত্মানম্ আত্মনি বিলোকয়ন্" অন্যঃপরমাত্ম সংজ্ঞং পরং জ্যোতি দৃষ্টা"। সেই চক্ষীকৃত চারুগাপের পর এড়াইয়া যাওয়া সহজ, তাহাকে শোভন সুন্দর করাই কর্তব্য।

প্রাচীন গ্রীসেও তাই। ডিনাস পূজার উৎসবে বিবসনা ক্রাইন্ অভিনয় করিতেন। চিত্রশিল্পী অ্যাপেলস্ তাঁর ছবি আঁকতেন প্রস্তর শিল্পী প্রাক্সাইটেলস্ তার মোহিনী মূর্তি গড়িতেন। আলেকজান্দ্রিয়া দর্শনশাস্ত্রের বক্তৃতা দিতেন—পেরিক্লিস্ লস্ক্রেটিস্ তার সমজদার। লেইস্ ডেমস্থিনিস্ ও ডায়োজিনিসের আরাধ্যা। হিপারশিয়া বড় লেখিকা, ভাবুক ক্রোটসের প্রিয়তমা। রূপসী রেগিসের মৃত্যুতে গ্রীক সাহিত্যে যে শোকোচ্ছ্বাস আছে তা পৃথিবীর এক সম্পদ বিশেষ। থিয়োডস্ সক্রেটিসের, লিওনটিয়াম্ এপিকিউরাসের সঙ্গিনী।

বৈষ্ণব কবিরাও বহু নায়িকা, অধীরা, বিধুরা, মানিনী, উজ্জ্বল, মুগ্ধা, কোপনাদের চিত্র আঁকিয়াছেন—সেই রস সাহিত্যেরও পরিধি সঙ্কীর্ণ, আছে অভিসারিকাদের নানা বর্ণনা কিন্তু বঙ্কিমের কবির নায়িকাদের মাঝে বিষ্ণুমাধব আসে না, উজ্জ্বল নীলমণি নাই। পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ মিলন, অভিসারের জন্য আকুলতা আছে কিন্তু "সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী" সে আত্মবিলোপের ভাব নাই—প্রিয় দেবতা হইয়াছেন, কিন্তু দেবতা প্রিয় হন নাই। তুমি আমার (মধীরা রতি) সে ভাব আছে, কিন্তু আমি তোমার—"আমার মাঝে তোমার লীলা হবে" (তীব্রা রতি) সে ভাব নাই।

বঙ্কিমের কবি অবশ্য নারীদের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাহাদের কর্তব্যজ্ঞানপ্রবণতা বা নীতিপ্রবণতার প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করেন নাই। কিন্তু তিনি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিতই উল্লেখ করিয়াছেন পুত্রবতী মাতাদের। যাঁরা প্রদীপ ও পূজোপচার লইয়া দেবতাদের মন্দিরে যান। আর যাঁরা সদ্য গর্ভবতী তাঁহারা যান দেবতার কাছে বীরপুত্রের কামনায়। কবি বলিতেছেন তাঁরা বীণা লইয়া বসেন, সুরে তালে তন্ময় হইয়া দেবতাকে প্রণতি জানায়, স্তুতি করেন। বীরপুত্রের জন্য মুরুগা বা মুরুগেশের পূজা যুগে যুগে চলিয়া আসিতেছে। এই মুরুগেশই ক্রমে ক্রমে কার্ত্তিকেয়ে পরিণত হইয়াছেন। অনুরূপভাবে কার্ত্তিকেয়ের পূজা এখনও বাংলা দেশে প্রচলিত। হয়ত প্রাচীন দ্রাবিড় সংস্কৃতির একটি লুপ্ত ইঙ্গিত। দেবতার সম্মুখে নারী ও পূজারিণীদের নৃত্য ও বীণাবাদন আজও বঙ্গিমে সমাদৃত। কবি এখানে একটু বিশেষ ইঙ্গিত দিয়াছেন যে নারীর সহজাত বৃত্তিই হইতেছে জননী হওয়া। যিনি সহধর্মিণী হইবেন তিনি শুধু নায়িকা বা প্রিয়া নন্—

তার সামাজিক দায়িত্ব আছে, দায়ও আছে। নারীর বুকে আছে নীড় রচনার চিরন্তন বোধ, প্রিয় ও পরিজন লইয়া পুত্রকন্যা লইয়া সে নিজের একটি স্বরূপূর্ণ পৃথিবী তৈয়ারী করে—সেইখানেই সে সম্রাজ্ঞী। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'য় দেখি মহর্ষি কণ্ব পতিগৃহযাত্রার সময় কন্যাকে আশীর্বাদ করিতেছেন "যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্তুর্বহুমতা ভব, সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি" যযাতিও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন সামাজিক রীতি লঙ্ঘন করিয়া! এই নিয়ম বহির্ভূত প্রেমের কল্যাণ কামনা করিতেছেন কবি। পুত্রলাভের যে আশীর্বাদ তার অন্তর্নিহিত অর্থ হইতেছে যে সমাজের, গোষ্ঠির কল্যাণ হোক্—পুত্র সমাজ রীতি ও ঐতিহ্যের বাহক—নিরঙ্কুশ দায়িত্ববিহীন প্রেমের বাধা স্বরূপ। সেই কল্যাণের মধ্যেই প্রেম পূর্ণত্ব লাভ করে।

কবি বর্ণনা করিতেছেন—রাত্রির প্রথম যাম, শঙ্খধ্বনি স্তব্ধ হয়, বিপণি বন্ধ। ব্যবসায়ী, কর্মকার, সূপকার সবাই নিদ্রায় নিমগ্ন। এমন কি মৃত্যুশালায় নর্তক-নর্তকীরাও নিদ্রিত। কিন্তু ভূত-প্রেত পিশাচরা, রক্তপিপাসু দৈত্যেরা নরমূর্তি ধারণ করিয়া রাত্রির মধ্যযামে বিচরণ করে। দেবীরাও এই সময় মর্ত্যে নামেন। মনে হয় কবি তন্ত্রোক্ত যোগিনী ভৈরবীদের ইঙ্গিত করিতেছেন। কবি তস্করদের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। গভীর রাত্রেই তাদের কর্মকুশলতার পরিচয়। এই সব তস্করদের কাছে কি কি জিনিস থাকিত—কবি তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্যে তস্করবৃত্তি বেশ প্রচলিত ছিল। তাহাদের কাছে থাকিত পাথর ও কাঠ কাটার যন্ত্র, কটিদেশে তরবারি, পরিধানে সূক্ষ্ম পরিচ্ছদের ছিদ্র আচ্ছাদন নীচে লুকায়িত শাণিত ছুরিকা এবং নানা রকমের থলি ও কোমরবন্ধের নিম্নে রজ্জু নির্মিত মই। চুপি চুপি নিঃশব্দে লোকচক্ষু অন্তরালে তড়িৎগতিতে যাইতে তাহারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু তস্করদের প্রতিশোধের স্বরূপ ছিল প্রতিহারীর দল—নগরপাল ও রক্ষীবাহিনী—তাহাদেরও উল্লেখ করিয়াছেন কবি। এই রক্ষীবাহিনী নিদ্রাবিহীন রাত্রিনী কাটান্ ধনুর্বাণ হস্তে। তাহারা ন্যায় ও শৃঙ্খলার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর—তাঁদের নিক্ষিপ্ত তীর হইতে কাহারও রক্ষা নাই। এইরূপে রাত্রি শেষ হইয়া যায়।

অন্ধকার তরল
পূর্ব্ব দিগন্তের আলোর রেখা ক্রমস্ফুট
স্তিমিত নগরীর জীবনধারা আবার চঞ্চল
দূরে ব্রাহ্মণদের বেদধ্বনি
ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত আগত—
পাখীরা যেন সেই দিনের কল্পনা গানে

কিন্তু কবির বলিতে ভুল হয় না যে পানাসক্ত নাগরিকদের তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠ তখনও শোনা যায়, কারণ তালীরসের বিপণি সকাল হইতেই খোলা হইত। নাগরিক ও নাগরিকাদের এই পানীয়ের প্রতি বিশেষ আসক্তির কথা কবি ভোলেন নাই। কবি প্রাতঃকালের বর্ণনা করিয়া বলেন—নৃপতির নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তিনি মাল্যখচিত বরাসনে আসীন। সুন্দরীশ্রেষ্ঠা পরিচারিকা ও সখীরা তাঁকে ঘিরিয়া আছে। তাদের গায়ের রং কচি আম্রকুঞ্জের শ্যামল উদ্গমের মত। সুতারতা ময়ূরীর মত তাদের চঞ্চল দৃষ্টি পরাগমিশ্রিত পদ্মকোরকের মত সহাস বদন। অলঙ্কারের শিঞ্জনে তারা ব্যস্ত। এই সব বরবর্ণিনীদের মুখে সূর্য্যের প্রথম কিরণ পড়িয়া স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া দেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে—

পাণ্ডুবর্ণ ছবি আসে সূর্য্যোদয়
আকাশের ভালে লজ্জা মসীচিহ্ন হয়
দিগন্তিক অবগাহনায়
স্তব্ধ হয় পাখীদের গান।

সূর্যদেব অশোককুঞ্জের পাশ দিয়া আকাশের ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, রাজাও গাত্রোত্থান করিলেন—সেন প্রভৃতি মার্জ্জনসেব। তাঁর বক্ষস্থলে সখীরা চন্দনের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে সুরভির সঙ্গে তা মিশিয়া গেল। তারা তাঁকে সজ্জিত করিয়া দিলেন নানা ফুলের মালায়। অনুচরীরা পরিলেন তিনি, কেয়ূর বলয়, মণিমাণিক্যের নানা আভরণ। তার পর তিনি সভায় গিয়া বসিলেন বৃত্তা বীতের মধ্যে। গুণের আদর হয় সেখানে—গায়ক গায়িকা নর্ত্তকনর্ত্তকীরা সবাই যথাযোগ্য আদর পায়, বৃদ্ধাগত সৈনিকরা পায় পুরস্কার শৌর্য্য ও বীর্য্যের জন্য।

কবির প্রশস্তি শেষ হয়। পুনরায় রাজার পিতৃপুরুষদের উল্লেখেও গুণকীর্ত্তন করিয়া তিনি বলেন—জ্ঞানী ও গুণী তুমি, অদ্বিতীয়পরাক্রম, অমিত তেজ, বিপুল বিক্রম, তুমি তপঃবলে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া সুশাসনে সুখী হও, সুখী করো।

প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের পাণ্ড্যরাজ্যের তামিল সভাকবির কাব্যের যে কিছুটা পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতে তখনকার দিনের সাহিত্য, সাধনা, সংস্কৃতি ও সমাজ মনের একটা বলিষ্ঠ চিত্র পাওয়া যায়। নিছক কাব্য হিসাবে ইহা এক অপূর্ব্ব রসঘন বস্তু। সংস্কৃতির ইতিহাসেও ইহার অবদান কিছু কম নয়। দ্রাবিড় আর্য্য অনার্য্য সংস্কারের এক সমীকরণের দিনে এর উদ্ভব। এই কবিতাগুলি প্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে শুধু "ভাষা" পড়িতেছি না, একটা বাস্তব বলিষ্ঠ জীবনবেদের, সুষ্ঠু ভোগবাসের পরিচয় পাইতেছি। রুশ বীর ইগোর, গ্রীক বীর হিয়াক্লিস, ব্যাবিলেনিয়ান্ গুডিয়ের মত বীর কাহিনী এই কাব্যে রেখাপাত করে না সত্য, কিন্তু ইহার সঙ্গে মনে পড়ে সংস্কৃত কবিদের কাব্য লালিত্য, বৈষ্ণব কবিদের রসবিলাস, রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভাষা। বিখ্যাত সাহিত্যিক জোরের ভাষায় বলিতে গেলে এই সব কবিদের পৃথিবীর অনাবৃত নাই, জননীর স্নেহক্রোড়ের মত ঢাকিয়াছে। I belong to her, she belongs to me.

সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য টয়নবী বলেন—There is nothing new or startling in the proposition that every civilization creates.....a style of its own and if we are attempting to ascertain the limits of any given civilization in any dimension either spatial or temporal we find as a matter of fact that the aesthetic taste is the Surest as well as the subtlest.....It speaks in clearer accents than either politics or economics.

এই সব রসিক মহাজনদের প্রণাম জানাইয়া বিদায় নিই।

শতযুগাগ্র আগে যে মানুষ
যাত্রা করেছে সুরু
সেই যে প্রপিতামহ
জীবনে মরণে
পথের শরণে
দুনিয়ার যত সযাতিকদের
একটি প্রণাম লহ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়্‌যন্ত্র

আশ্বি বুড়ীর কুটিরের কয়েক ঘর অন্তরে কোদণ্ড মিশ্রের গৃহ। ইহাও মাটির কুটির, খড়ের ছাউনী। গত বিশ বৎসর কোদণ্ড মিশ্র এই কুটিরে বাস করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিজন নাই।

কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। বন্ধ দ্বারের অন্তরালে দুই জন বসিয়া মন্ত্রণা করিতেছিলেন; একজন স্বয়ং কোদণ্ড মিশ্র, অন্য ব্যক্তির নাম কোকবর্মা।

কোদণ্ড মিশ্রের সামান্য পরিচয় পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। তিনি শশাঙ্ক দেবের একজন মন্ত্রী ছিলেন। শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর পর মানব দেবের হ্রস্ব রাজত্বকালে মন্ত্রিদের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, কোদণ্ড মিশ্র তাহাতে জয়ী হইতে পারেন নাই; কুটিলতার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই নিভৃত দীন পল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

তারপর ভাস্করবর্মা আসিয়া রাজ্য গ্রাস করিলেন; বিজয়ী মহিমা নূতন রাজার কোপানলে ভস্মীভূত হইলেন। কেবল কোদণ্ড মিশ্র বাঁচিয়া গেলেন; ভাস্করবর্মা অবজ্ঞা ভরে এই স্বয়ং নির্বাসিত মন্ত্রীকে গ্রাহ্য করিলেন না।

তদবধি বিশ বৎসর ধরিয়া কোদণ্ড মিশ্র নূতন রাজ বংশের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন। চাণক্য যেমন নন্দ বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বর্ম বংশ শেষ না করিয়া ছাড়িবেন না। ভাস্করবর্মার রাজ্যকালে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই; কিন্তু এখন অগ্নিবর্মাকে পাইয়া আশা হইয়াছে শীঘ্রই তাঁহার চক্রান্ত ফলবান হইবে। সমস্তই প্রস্তুত, কেবল একটি বাধা: অগ্নিবর্মার পরিবর্তে সিংহাসনে বসিতে পারে এমন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে না।

কোদণ্ড মিশ্রের বয়স এখন সত্তর। অস্থিচর্মসার ব্রাহ্মণ; তাঁহার জীবনে আর কোনও কাম্য নাই, স্বনির্বাচিত রাজাকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া নিজে মন্ত্রিত্ব করিবেন এই সংকল্প লইয়া বাঁচিয়া আছেন।

আজ রাত্রে কোদণ্ড মিশ্র যাহার সহিত মন্ত্রণা করিতেছেন সেই কোকবর্মা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। কোকবর্মার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু আকৃতি দেখিয়া অধিক বয়স মনে হয়। মাংসল দেহ, কদাকার মুখে মসূরিকার চিহ্ন, চক্ষু দুটি কুঁচের মত রক্তবর্ণ। তাহার মুখ দেখিয়া ভেকের মুখ মনে পড়িয়া যায়।

কোকবর্মা গৌড়রাজের একজন সেনাপতি। সে জাতিতে উগ্র, বর্ধমান ভুক্তির এক মাণ্ডলিক। উগ্রগণ তৎকালে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, বাহুবল ও যুদ্ধে পরাক্রমের জন্য তাঁহাদের খ্যাতি ছিল। কোকবর্মা এই উগ্রগণের পরম্পরাগত অধিনায়ক। অগ্নিবর্মার যৌবরাজ্যকালে সে তাঁহার বয়স্য ছিল, গুপ্তব্যসনে সহযোগিতা করিত। তারপর অগ্নিবর্মা সিংহাসনে আরোহণ করিলে তাঁহার কৃপায় এবং উগ্রগণের অধিনায়কত্ব হেতু সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিল।

কিন্তু সেনাপতির গুরু দায়িত্বের প্রতি তাহার বিন্দু মাত্র নিষ্ঠা ছিলনা। সে ঘোর নীচকর্মা ও বিবেকহীন পাষণ্ড। চাটুবৃত্তি যেমন তাহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল তেমনি প্রয়োজন হইলে কৃতঘ্নতা করিতেও সে পশ্চাৎপদ ছিলনা।

রাণী শিখরিণীকে যেদিন সে প্রথম দেখিল সেদিন তাহার অন্তরে কদর্য লালসা উদ্রিক্ত হইয়াছিল। সেইদিন হইতে সে মনে মনে রাজার শত্রু হইয়াছিল।

রাণী শিখরিণী তখন গুপ্ত প্রণয়লীলা আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কোকবর্মার আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবে না, সে দূতীর হস্তে রাণীকে লিপি পাঠাইতে

আরম্ভ করিল। কিন্তু কোনও ফল হইল না; রাণী তাহার ন্যায় কুৎসিত পুরুষকে অনুগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন না। কোকবর্মা অনেক চেষ্টা করিয়াও লালসা চরিতার্থ করিতে পারিল না। উপরন্তু তাহার প্রণয়পত্রগুলি রাণীর হস্তে মারাত্মক অস্ত্র হইয়া রহিল।

ওই ভাবে ব্যর্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া কোকবর্মার লিপ্সা আরও তীব্র হইয়া উঠিল। ছলে বলে যেমন করিয়া হোক রাণীকে বশে আনিতে হইবে। কিন্তু শিখরিণী যতদিন রাণীর পক্ষে প্রতিহিংসা আছে ততদিন তাহাকে লাভের আশা নাই।- ধীরে ধীরে কোকবর্মা কোদণ্ড মিশ্রের ষড়যন্ত্র জালে জড়িত হইয়া পড়িল।

বর্তমানে কোকবর্মা ও কোদণ্ড মিশ্রের মধ্যে যে আলোচনা হইতেছে তাহা নূতন নয়, পূর্বে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন—'কোকবর্মা, তুমি রাজা হও। এমন সুযোগ আর পাবেনা।'

কোকবর্মা ভেকমুণ্ড নাড়িয়া বলিল—'রাজা হতে চাই না, আমি শুধু রাণীকে চাই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'মূর্খ! রাজা পেলে সেই সঙ্গে রাণীকেও পাবে।—দেখ, এখন কর্ণসুবর্ণে তোমার দু'হাজার উগ্র ছাড়া আর কোনও সৈন্য নেই, অন্য সব সেনাপতি সৈন্য নিয়ে দণ্ডভুক্তির সীমানা রক্ষা করছে, জয়নাগকে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই সুযোগে তুমি সিংহাসনে বসলে কেউ তোমাকে বাধা দিতে পারবে না।'

কোকবর্মা দংষ্ট্রাবহুল হাসিয়া বলিল—'ঠাকুর, আপনার কথা শুনতে ভাল। কিন্তু এখন গৌড়ের সিংহাসনে বসা আর শূলে বসা একই কথা। জয়নাগ অতি ধূর্ত এবং কূটিল, সে একদিন না একদিন গৌড়রাজ্য গ্রাস করবেই।'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—আমিও ধূর্ত এবং কূটিল, আমি কৌটিল্যের শিষ্য। আমি যতদিন মন্ত্রী আছি ততদিন জয়নাগ গৌড়ে দন্তস্ফুট করতে পারবে না।'

কোকবর্মা রূঢ়ভাবে বলিল—'কিন্তু আপনি আর কত দিন?—তারপর? আমার এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আছে, জীবন সম্ভোগ আমার পূর্ণ হয়নি।'

কোদণ্ড মিশ্র ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন—'তুমি অদূরদর্শীর মত কথা বলছ। রাজার মত জীবন সম্ভোগের সুযোগ আর কার আছে? আজ তুমি রাণী শিখরিণীর জন্য লালায়িত, কাল তার প্রতি তোমার অরুচি হবে; নূতন সম্ভোগতৃষ্ণা জাগবে। এ সুযোগ ছেড় না কোকবর্মা। মানুষের জীবনে এমন সুযোগ একবারই আসে। সমস্ত প্রস্তুত। অগ্নিবর্মার অন্তরঙ্গ অর্জুন সেন তাকে মদন-রস খাইয়ে উন্মত্ত করে রেখেছে, আমার সঙ্কেত পেলেই তাকে বিষ খাওয়াবে। তুমি ইচ্ছা করলে কালই গৌড়ের রাজা হতে পার।'

কোকবর্মা কিন্তু ভিজিবার পাত্র নয়, দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—'ঐটি হবে না। আমি অগ্নিবর্মাকে সিংহাসন থেকে নামাতে রাজি আছি, তার সিংহাসনে বসতে রাজি নই। আমার শেষ কথা শুনুন। অগ্নিবর্মার যদি হঠাৎ মৃত্যু হয়, আমি আমার সৈন্য নিয়ে রাজপুরী দখল করব; রাজপুরীতে যা ধনরত্ন আছে লুঠ করব, রাণীকে লুঠ করব, তারপর নিজের মণ্ডলে ফিরে যাব। ইতিমধ্যে আপনার যাকে ইচ্ছা রাজা করুন আমার আপত্তি নেই।'

কোদণ্ড মিশ্র হতাশভাবে বলিলেন—'কিন্তু রাজা পাব কোথায়? কে এমন আছে যাকে দেশের লোক রাজা বলে মেনে নেবে? সেনাপতিরা যাকে স্বীকার করবে? আজ যদি শশাঙ্ক দেবের একটা বংশধর থাকত—'

শশাঙ্ক দেবের বংশধর তখন ঠিক দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্ধ দ্বারে টোকা পড়িল। কোকবর্মা চমকিয়া তরবারির উপর হাত রাখিল: কোদণ্ড মিশ্রও শঙ্কিতভাবে দ্বারের পানে চাহিলেন। তখন দ্বারে আবার করাঘাত পড়িল এবং আয়ি বুড়ীর স্বর আসিল—'ঠাকুর, জেগে নাকি গো? একবার দোর খুলবে? আমি গঙ্গার আয়ি।'

কোদণ্ড মিশ্র অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার শঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল না। কোকবর্মাকে তিনি নীরব অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘরের একটি কোণ দেখাইয়া দিলেন। কোণে দড়ি হইতে একটি কাপড় শুকাইতেছিল, কোকবর্মা তাহার পিছনে গিয়া লুকাইল। কোদণ্ড মিশ্র তখন দীপ হস্তে উঠিলেন, দ্বার খুলিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বিরক্ত স্বরে বলিলেন—'এত রাত্রে তোমার আবার কী চাই গঙ্গার আয়ি?'

কিন্তু আয়ি বুড়ীকে উত্তর দিতে হইল না, তৎপূর্বেই

কোদণ্ড মিশ্রের দৃষ্টি বন্ধুর উপর পড়িল। তিনি দ্রুত দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কে? কে? কে তুমি?'

বন্ধু এতক্ষণ আলোক চক্রের কিনারায় দাঁড়াইয়াছিল, এখন কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে আসিয়া শান্তস্বরে বলিল—'আপনিই আর্য কোদণ্ড মিশ্র? শশাঙ্কদেবের মন্ত্রী ছিলেন?'

কোদণ্ড মিশ্র স্খলিত স্বরে বলিলেন—'হাঁ।—তুমি—?'

বন্ধু যুক্তকরে প্রণাম করিয়া বলিল—'আমার নাম বন্ধুদেব।'

'বন্ধুদেব! তুমি কি—! না না, এখন কিছু বোলো না। এস, আমার ঘরে এস।'

কোদণ্ড মিশ্র হাত ধরিয়া বন্ধুকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। আরি বুড়ী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে কোদণ্ড মিশ্র কম্পিত হস্তে দীপদণ্ডে প্রদীপ রাখিলেন, দীর্ঘকাল সম্মোহিতের ন্যায় বন্ধুর পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—'যদি বিশ বছর কেটে না যেত, বলতাম তুমি মানবদেব।'

বন্ধু বলিল—মানব দেব আমার পিতা।'

'বৎস, উপবিষ্ট হও। তুমি দৈব প্রেরিত হয়ে এসেছ। তোমার নাম বন্ধুদেব। বন্ধের মতই আমি তোমাকে ব্যবহার করব।'

উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে কোকবর্মা বন্ধের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিল। বন্ধুকে কুটিল নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'এ কে?'

কোদণ্ড মিশ্র উদ্দীপ্ত চক্ষে বলিলেন—'মানবদেবের পুত্র বন্ধুদেব! কোকবর্মা, এতদিনে রাজা পাওয়া গেছে।'

কোকবর্মা বন্ধের প্রতি তির্যক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'মানবদেবের পুত্র! মানবদেবের পুত্র ছিলনা। হতে পারে এ ব্যক্তি তার দাসীপুত্র।'

বন্ধু কোকবর্মার পানে চক্ষু তুলিল, স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ধীর স্বরে কহিল—'আমার পিতার সঙ্গে আমার মাতার বিবাহ হয়েছিল।'

কোকবর্মা আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কোদণ্ড মিশ্র বাধা দিয়া বলিলেন—'ও প্রসঙ্গ অবান্তর। তুমি নিঃসন্দেহে মানবদেবের পুত্র। শুধু তোমার আকৃতি নয়, তোমার বাহুর অঙ্গদ তার সাক্ষী। ও অঙ্গদ আমি চিনি। কর্ণসুবর্ণে এমন অনেক প্রাচীন লোক আছে যারা তোমাকে মানবদেবের পুত্র বলে চিনতে পারবে। আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। শশাঙ্কদেবের পৌত্রকে সিংহাসনে বসালে গৌড়দেশে কেউ আপত্তি করবে না।'

কোকবর্মা ঈষৎ মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিল—'থাক, রাষ্ট্রবিপ্লবের তাহলে আর কোনও বাধা নেই!'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'না, আর বাধা নেই। কোকবর্মা, তুমি আজ ফিরে যাও। তোমার সৈন্যদের প্রস্তুত রেখো। ঠিক সময়ে আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাব।'

'ভাল। আমার পণ মনে আছে?'

'আছে। তুমি যা চাও তাই পাবে। তোমার বাহুবলই নির্ভর।'

কোকবর্মা বিদায় লইল। খেয়াঘাটের অন্ধকারে তাহার ডিঙি বাঁধা ছিল। কোকবর্মা যাইবার সময় বন্ধের সুঠাম সুন্দর দেহের প্রতি একটা সামর্ষ ঈর্ষাবঙ্কিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেল। সুদর্শন পুরুষ সে সহ্য করিতে পারিত না।

* * *

সে রাত্রে বন্ধু ও কোদণ্ড মিশ্র শয্যা গ্রহণ করিলেন না; প্রদীপের দুই পাশে বসিয়া সমস্ত রাত্রি কথা হইল। কোদণ্ড মিশ্র মাঝে মাঝে উঠিয়া প্রদীপের তৈল পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বন্ধু আপন জীবন বৃত্তান্ত বলিল; গ্রামের জীবন, গ্রাম হইতে যাত্রা, স্থলভদ্রের সহিত সাক্ষাৎ, কর্ণসুবর্ণে বাস, রহিত্রে অপহরণের দুশ্চেষ্টা, সমস্তই বিবৃত করিল। অপরপক্ষে কোদণ্ড মিশ্র তাহার বিশবর্ষব্যাপী ষড়্‌যন্ত্রের কাহিনী ব্যক্ত করিলেন। অবজ্ঞা, দৈন্য, বিফলতা তাঁহার সংকল্প টলাইতে পারে নাই। এতদিনে নিয়তির চক্র ঘুরিয়াছে; বর্মবংশের উচ্ছেদ করিয়া শশাঙ্ক দেবের বংশধরকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইয়া তিনি ব্রত উদ্‌যাপন করিবেন।

বন্ধু বৃদ্ধের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিল, কোনও আপত্তি করিল না। কাল প্রাতে সে যে গ্রামে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিল তাহা আর তাহার মনে রহিল না।

বাহিরে কাক কোকিলের ডাক শুনিয়া তাঁহাদের চৈতন্য হইল, রাত্রি শেষ হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র বন্ধুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'বৎস, যতদিন না রাজপুরী অধিকৃত হয় তুমি এখানেই থাক, কর্ণসুবর্ণে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আমার অনেক কাজ, অনেক লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে, কর্ণসুবর্ণে যেতে হবে। আমি গঙ্গার আয়িকে বলে দেব, সে তোমার সেবা-যত্ন করবে।'

বন্ধু কুটিরের বাহিরে আসিয়া দেখিল, সম্মুখেই বিপুল-বিস্তার ভাগীরথী। পরপারের আকাশে সিন্দূরের রঙ ধরিয়াছে, এখনও সূর্যোদয় হয় নাই। স্রোতের মাঝখান দিয়া একটি চাঙ্গর-মুখ বহিত্র ভাসিয়া যাইতেছে, তাহার পিছনে আরও কয়েকটি বহিত্র। তাহারা সাগরে যাইতেছে।

বহিত্রগুলির পট্টপত্তনের উপর মানুষের চলাচল দেখা যাইতেছে। নাবিকেরা পাল তুলিতেছে; গুণবৃক্ষের শীর্ষে আড়কাঠের উপর বসিয়া দিশারু দিঙ্‌নির্ণয় করিতেছে।

বন্ধু চাঙ্গর-মুখ বহিত্রটিকে চিনিল। কিন্তু উহার খোলের মধ্যে যে বিদ্যাধর ও বটেশ্বর বন্দী আছে তাহা জানিতে পারিল না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

নরকের দ্বার

দিনটা আলস্য ও কর্মহীনতার মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল।

কোদণ্ড মিশ্র প্রভাতেই স্নানাদি সমাপন করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধের জীর্ণ শরীরে কর্মপ্রেরণা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বন্ধু শূন্য কুটিরে কিয়ৎকাল বসিয়া রহিল, তারপর আলস্য ভঞ্জন করিয়া বাহির হইল। তাহার মনের অবস্থা এখন স্তিমিত; সে যেন বিবাহের বর; তাহাকে ঘিরিয়া সকল তৎপরতা, অথচ সে নিজে নিষ্ক্রিয়।

বন্ধু বাহিরে আসিয়া কাল রাত্রে যেদিক হইতে আসিয়াছিল সেইদিকে চলিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কুটির, তাহার চারিপাশে শাক কন্দ ফল ফুলের উদ্যান। কুটিরগুলিতে মানুষ নাই, বোধহয় সকলেই কর্ণসুবর্ণে হাটে গিয়াছে। ইহাদের গৃহে চুরি করিবার মত তৈজস কিছু নাই, তাই তাহাদের মনেও কোনও দুশ্চিন্তা নাই।

এইরূপ কয়েকটি গৃহের পরে একটি কুটিরের সম্মুখীন হইয়া বন্ধু গঙ্গাকে দেখিতে পাইল। গঙ্গা দাওয়ায় বসিয়া পায়ের উপর সলিতা পাকাইতেছিল, হাসিমুখে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিল। বলিল—'এস। আয়ি এক কাঁদি কলা আর ইঁচড় নিয়ে কানসোনার বেচতে গেছে। এখুনি আসবে।'

গঙ্গা দাওয়ার পাটি বিছাইয়া দিল; ধামিতে করিয়া এক ধামি মুড়ি ও গুড় আনিয়া বন্ধুকে খাইতে দিল, উঠানের লতা হইতে ক্ষীরিকা পাড়িয়া দিল। বন্ধু পরম পরিতৃপ্তির সহিত মুড়ি চিবাইতে লাগিল।

গঙ্গার আজ আর শঙ্কা সংকোচ নাই, সে পলিতা পাকাইতে পাকাইতে গল্ গল্ করিয়া কথা বলিতে লাগিল; আর থাকিয়া থাকিয়া বন্ধুর অঙ্গদের পানে বিমুগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। বন্ধু তাহা দেখিয়া বলিল—'দেখবে?' বলিয়া অঙ্গদটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল।

গঙ্গা যেন স্বর্গ হাতে পাইল। দুই চক্ষে আনন্দ এবং সম্ভ্রম ভরিয়া সে অঙ্গদটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। অনেকক্ষণ দেখিবার পর গভীর পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অঙ্গদ বন্ধুকে ফিরাইয়া দিল। বন্ধু লক্ষ্য করিল, গঙ্গার মুখে ক্ষণেকের জন্যও লোভ বা গৃধ্নুতা প্রকাশ পাইল না। যাহাদের কিছুই নাই তাহারাই বোধকরি নির্লোভ হইতে পারে।

আয়ি বুড়ী ফিরিয়া আসিল। কলা ও ইঁচড় বিক্রি করিয়া সে কাঁকড়া কিনিয়াছে; ঘটা করিয়া অতিথির জন্য পঞ্চ ব্যঞ্জন রাঁধিতে বসিল। কাঁকড়া কুটিতে বসিয়া গঙ্গার আহ্লাদের সীমা নাই।

দ্বিপ্রহরে বন্ধু ভাগীরথীতে স্নান করিয়া আসিল। তারপর উদর পূর্ণ করিয়া বুড়ীর রান্না অতি মুখরোচক অন্নব্যঞ্জন গ্রহণ করিল।

আহারের পর হরীতকী চর্বণ করিতে করিতে বন্ধু কোদণ্ড মিশ্রের কুটিরে ফিরিয়া গেল, দেখিল তিনি এখনও আসেন নাই। সে নল-পাটি পাড়িয়া শয়ন করিল। কাল রাত্রে জাগরণ গিয়াছে, তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিল। ক্রমে সে অশান্ত অর্ধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন দিন প্রায় শেষ হইয়াছে। বন্ধু দেহের জড়িমা দূর করিয়া বাহিরে আসিল। কোদণ্ড মিশ্রের দেখা নাই। তিনি এখনও ফিরিয়া আসেন নাই,

কিন্তু তখনও ফিরিয়াছিলেন, আবার বাহির হইয়াছেন। বহু খুনাইয়া ছিল তাহা জানিতে পারে নাই।

সে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিল, তারপর ভাগীরথীর তীর ধরিয়া দ্রুতপদে বাহির হইল। নিশ্চেষ্টভাবে কুটীরে বসিয়া থাকিয়া লাভ নাই।

সে উত্তরমুখে চলিল। এখানে জন-বসতি অধিক নাই, স্থানে স্থানে দুই চারিটী বিচ্ছিন্ন কুটির। শূন্য তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে সে ক্রমে মধুরাক্ষী ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল। মধুরাক্ষীর ধারা ভাগীরথীর তুলনায় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যেখানে দুই স্রোত মিলিত হইয়াছে সেখানে তরঙ্গ সমাকুল। গত রাত্রে বহু এই স্রোত অন্ধকারে পার হইয়াছিল।

এই সঙ্গমস্থলের অপর পারে কোণের উপর বহু শিখরযুক্ত এক রাজপ্রাসাদ। একটা প্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগ। দুই দিক হইতে উচ্চ প্রাকার আসিয়া নদীর কিনারায় দুইটি বিপুল স্তম্ভে পরিণত হইয়াছে, মাঝের অবকাশ স্থলে অবরোধের স্নান-ঘাট। সারি সারি দীর্ঘ সমান্তরাল সোপান উচ্চ সৌধতল হইতে নামিয়া নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বহু দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। দুই তীরের মাঝখানে অনুমান তিন চারি রজ্জুর ব্যবধান। অস্তমান সূর্যের তির্যক আলোকে প্রাসাদ ও ঘাট স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রাসাদ যেন সুপ্ত, কোথাও কর্মচঞ্চলতা নাই; ঘাটে কয়েকটি পুরনারী জলে নামিয়া গা ধুইতেছে। আসন্ন দুর্যোগের কোনও পূর্বাভাস সেখানে নাই।

বহু মধুরাক্ষীর তীর ধরিয়া আবার চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি পরপারে প্রাসাদের উপর ন্যস্ত হইয়া রহিল। তাহার অন্তরে কোনও বিপুল হৃদয়াবেগ উত্থিত হইল না, কেবল নির্লিপ্ত রূঢ় চিন্তার ক্রিয়া চলিতে লাগিল; তাহার পিতামহের রচিত ঐ রাজপুরী কোদণ্ড মিশ্রের চেষ্টা সার্থক হইবে কি?—কপর্দকহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটা রাজ্য ওলট-পালট করিয়া দিবে!—ইহা কি সম্ভব? না ইহা স্বপ্ন?—

রাজপুরী পিছনে পড়িয়া রহিল, বহু খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। এখানে খেয়াঘাটের আশে পাশে জনবসতি অধিক। খেয়াতরী যাত্রিদের পারাপার করিতেছে; ওপারেও ক্ষুদ্র একটি খেয়াঘাট। বহু অদূরে উচ্চ পাড়ের উপর এক বৃক্ষতলে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দর্শনীয় কিছু নয়; তবু তৃপ্ত মনে বসিয়া দেখা যায়।

অল্পকাল পরে সূর্যাস্ত হইল। খেয়ার মাঝি নৌকা বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। ঘাট শূন্য হইয়া গেল।

বহু উঠিয়া আবার নদীতীর ধরিয়া ফিরিয়া চলিল। রাজপ্রাসাদের সমান্তরালে আসিয়া দেখিল যেখানে প্রাসাদ ছিল সেখানে পিণ্ডীভূত অন্ধকার। সেই অন্ধকারের জঠর হইতে দুই চারিটি বর্তিকার ক্ষীণ রশ্মি নদীবক্ষে প্রতিবিম্ব ফেলিয়া কাঁপিতেছে।

বহু যখন কোদণ্ডমিশ্রের কুটির সম্মুখে ফিরিয়া আসিল তখন দিবালোক সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। কোদণ্ড মিশ্র ফিরিয়াছেন, কুটির কক্ষেই আছেন; বন্ধ দ্বারের ফাঁকে আলো দেখা যাইতেছে।

বহু দাওয়ায় উঠিয়া ঘরের মধ্যে মৃদু জল্পনার শব্দ শুনিতে পাইল। সে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িল—বোধহয় কোনও গূঢ়-পুরুষ আসিয়াছে। বহু একটু দ্বিধা করিল, তারপর দ্বারের ফাঁক দিয়া তাহার দৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে যাহাকে বসিয়া থাকিতে দেখিল তাহাতে সে বিস্ময়ে পিছাইয়া আসিল।

কুহু! কোদণ্ড মিশ্রের সহিত মুখোমুখি বসিয়া কুহু কথা কহিতেছে! তাহার অঙ্গ ঘিরিয়া নীল রঙের উর্ণা, কিন্তু চিনিতে কষ্ট হয় না—সেই মিষ্ট-দুষ্ট হাসিভরা মুখ! কুহু কোথা হইতে আসিল? কোদণ্ড মিশ্রের সহিত তাহার কী সম্বন্ধ?

দ্বারের বাহিরে নির্বাক দাঁড়াইয়া বহু শুনিতে পাইল, কোদণ্ড মিশ্র বলিতেছেন—'এই লিপি নাও, অর্জুন সেনকে আজ রাত্রেই দিও। আর মুখে বোলো, সমস্ত প্রস্তুত; অমাবস্যার তিথি যেন ভ্রষ্ট না হয়।'

কুহু বলিল,—'বলব।—অমাবস্যা কবে?'

'পরশু। সেই রাত্রির মধ্যযামে—'

'যে আজ্ঞা। আজ তাহলে উঠি। ফিরতে দেরি করলে রাণী সন্দেহ করবে।'

'স্বস্তি।'

কুহু সন্তর্পণে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। তারপর বহুকে দেখিয়া সেও বজ্রাহতবৎ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনেই হতবাক।

এই সময় ঘরের ভিতর হইতে কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠস্বর আসিল—'কে? বাহিরে কে?'

বজ্র চমকিয়া বলিল—'আমি—বজ্র।'

'এস বৎস, ভিতরে এস।'

বজ্র দ্বিধাভরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে কুহু চকিতে হাত তুলিয়া কি যেন ইশারা করিল, তারপর বাহিরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বজ্র কোদণ্ড মিশ্রের সম্মুখে উপবিষ্ট হইল। বৃদ্ধের মুখে চোখে তীব্র উত্তেজনা, শুষ্ক দেহে তিলমাত্র অবসাদ নাই। তিনি নিম্নকণ্ঠে আজিকার সমস্ত দিনের কর্মতৎপরতা বজ্রকে শুনাইতে লাগিলেন। কর্ণসুবর্ণে এখনও অনেক ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আছে যাহারা বর্তমান রাজারাণীর কুক্রিয়া ও জঘন্য জীবনযাত্রায় উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্ক দেবের বংশধর সিংহাসনে বসিলে তাহারা আনন্দিত হইবে, সহায়তাও করিবে। ব্যবস্থা সমস্তই প্রস্তুত। অমাবস্যার রাত্রে অগ্নিবর্মার নারকীয় জীবন শেষ হইবে। পরদিন প্রাতে কোকবর্মার সৈন্যগণের সাহায্যে বজ্র রাজপুরী অধিকার করিবে। নগরে শাসন-ডিণ্ডিম প্রচারিত হইবে; অগ্নিবর্মার মৃত্যু এবং বজ্রদেবের অভিষেক ঘোষিত হইবে। কোকবর্মা যাহা চায় তাহা লইয়া নিজের দেশে চলিয়া যাইবে। দুই শত বাছাই করা খস্ যোদ্ধা সংগ্রহ হইয়াছে, তাহারা রাজপুরী রক্ষা করিবে। কোদণ্ড মিশ্র তখন নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করিবেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে।

বজ্র মনোযোগ দিয়া শুনিল, কিন্তু মনের মধ্যে কোনও প্রকার তীব্র আগ্রহ অনুভব করিল না। তাহাকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য এত উদ্যোগ আয়োজন, অথচ তাহার অন্তর যেন এই জটিলতা-কুটিলতায় সায় দিতেছে না। পিতৃ-পিতামহের সিংহাসন তাহার প্রাপ্য, সে তাহা চায়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির কূটচক্রান্ত, বিষপ্রয়োগে নরহত্যা, সে স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তস্রোত প্রবাহিত করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হইলে সে অধিক সুখী হইত।

কিন্তু মনের সূক্ষ্ম ভাবনা মুখে প্রকাশ করিতে সে অভ্যস্ত নয়। প্রকাশ করিয়াই বা লাভ কি। সে শুধু জিজ্ঞাসা করিল—'আমার কর্তব্য কিছু আছে কি?'

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'উপস্থিত কিছু না। তুমি কেবল অমাবস্যার রাত্রি পর্যন্ত নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিবে, আর কোনও কর্তব্য নেই। আমার ঘরে এমন অনেক লোকের যাতায়াত হবে, তোমার এখানে না থাকাই ভাল! তুমি আমি বুড়ির ঘরে থাকবে।'

আরও দুই চারি কথার পর বজ্র বাহিরে আসিল। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নিম্নে কুটিরগুলিতে মৃৎ-প্রদীপের ক্ষুদ্র শিখা। বজ্র অন্য মনে আম্রি বুড়ীর কুটিরের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় একজন আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

'মধুমথন!'

'কুহু!'

কুহু এতক্ষণ বাহিরের অন্ধকারে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল! বজ্র তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—'তুমি এখানে?'

কুহু প্রতিধ্বনি করিল—'তুমি এখানে?'

বজ্র সংক্ষেপে নিজের নদীসন্তরণ কাহিনী বলিল, তারপর প্রশ্ন করিল—'কিন্তু কোদণ্ড মিশ্রের কাছে তুমি এলে কি করে? তাঁর সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ?'

কুহু বলিল—'আছে, পরে বলব। কাল আমি মদিরাগৃহে গিয়েছিলাম। দেখলাম, দোর বন্ধ, কেউ নেই। কী দুঃখ যে হয়েছিল!'

বজ্র লক্ষ্য করিল কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে একদিকে লইয়া যাইতেছে। সে বলিল—'কোথায় যাচ্ছ?'

কুহু বলিল—'চল, আমাকে রাজপুরীতে পৌঁছে দেবে।'

'কিন্তু—খেয়া তো বন্ধ। নদী পার হবে কি করে?'

'আমার উপায় আছে। এস।'

কুহু তাহার বাহুর সহিত বাহু জড়াইয়া লইল। দুইজনে নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারের ভিতর দিয়া চলিল।

খেয়া ঘাটে খেয়া তরীর পাশে একটি মোষার খোলার মত ছোট ডিঙি বাঁধা আছে। এটি অবরোধের নারীদের ব্যবহার্য ডিঙি, ঘাটের এক কোণে স্তম্ভের গায়ে অর্ধ-নিমজ্জিত হইয়া বাঁধা থাকে; পুরীর দাসীরা প্রয়োজন হইলে ব্যবহার করে। কুহু ও বজ্র সেখানে উপস্থিত হইলে কুহু বলিল—'তুমি আগে ওঠ। বৈঠা ধর।'

বজ্র উঠিয়া বসিয়া বৈঠা ধরিল। কুহু পিছনের গলুইয়ে

উঠিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল। বল্ল জিজ্ঞাসা করিল—'রাজপুরী কোন দিকে। কিছুই যে দেখা যাচ্ছে না।'

কুহু বলিল—'ভাবনা নেই, দু'বার দাঁড় টেনে স্রোতের মুখে ডিঙি ছেড়ে দাও, আপনি রাজপুরীর ঘাটে গিয়ে লাগবে।'

বল্ল তাহাই করিল। আঁধারে ডিঙি ভাসিয়া চলিল।

এতক্ষণে বল্ল অন্তরের মধ্যে একটা সহজ উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিল। অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে সে যেন হঠাৎ একান্ত আপনার জনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মনের আনন্দে হাসিয়া উঠিয়া সে বলিল—'কুহু! তোমার সঙ্গে যে আবার দেখা হবে তা একবারও ভাবিনি।'

কুহু বলিল—'আমিও না।—কিন্তু ঘাট এসে পড়েছে।'

ঘাটের পাষাণে ডিঙি ঠেকিল। দুইজনে অবতরণ করিল। কুহু বল্লের গায়ে লোহার আংটায় ডিঙি বাঁধিল, তারপর আসিয়া বল্লের হাত ধরিল।

বল্ল বলিল—'এবার আমি ফিরে যাই?'

কুহু বল্লের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—'মহারাজ বল্লদেব, আজ আপনাকে ছাড়ব না। দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিতে হবে।'

মহারাজ বল্লদেব! এই সম্বোধন শুনিয়া বল্ল যেন ক্ষণেকের জন্য মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। কুহু হাত ধরিয়া তাহাকে রাজপুরীর মধ্যে লইয়া চলিল।

(ক্রমশঃ)

ভাষার বিবর্তন

অধ্যাপক শ্রীধীরানন্দ ঠাকুর

মানব, কবির ভাষা এই সূক্ষ্ম বিজ্ঞানী বুদ্ধি ও চরিত্র-বোধের সাহায্যে চলে ঘরে বসে, বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই বিশ্ব। কিন্তু অতি সহজ, স্থূল ও অচিন্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির সাহায্যে কয়েকটা বিশ্ব সৃষ্ট হয়ে রয়েছে; সেগুলি হচ্ছে, রূপ (বর্ণ ও রেখা), রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। কিন্তু এগুলি সংখ্যায় কম বলে মনে হলেও আসল তা নয়। এদের প্রতিটির প্রকাশ বিচিত্র। এক-একটিরই এত আকৃতি, প্রকৃতি ও স্তরের ভেদ আছে যে যে-কোন একটিকেই অসীম বলে মনে হয়, যদি তেমনভাবে দেখা যায়। এক-একটির শক্তি ও প্রভাব সহজে নিরূপণ নয়।

শব্দ বা ধ্বনি সারা সৃষ্টির একটা মৌলিক উপাদান বলে অনুমান করলে অসঙ্গত মনে হবার কারণ নেই। ধ্বনির কারণ যাই হোক, এ যে একটি বিরাট শক্তি তা বুঝতে খুব যে বেগ পেতে হয় তা নয়। তবে সাধারণত এর শক্তি সম্বন্ধে তত স্পষ্ট সচেতন উপলব্ধি ও স্বীকৃতি চোখে পড়ে না। আকাশে, বাতাসে, সাগরে, নদীতে, অরণ্যে কোথায় নেই ধ্বনি? কোন-না-কোন আকারে-প্রকারে সর্বত্রই সে আছে। বিশ্ব-সৃষ্টির অগণিত, সুপ্ত-গুপ্ত নিগূঢ় রহস্যের অনেকখানিই প্রকাশ পাচ্ছে এর মাধ্যমে; তার বিবর্তন ও পরিণতি হবার একটি বিশেষ উপায় হয়েছে এই ধ্বনির কল্যাণে।

প্রাণীর মধ্যে এই ধ্বনির বিকাশ হতে পেরেছে ইচ্ছা-প্রণোদিত; মানুষের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত ও সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ভাষার সঙ্গে-সঙ্গে ধ্বনির সুপরিকল্পিত প্রকাশ ঘটেছে মানুষে। মানুষ যে শুধু তার নিজের মধ্যেকার ধ্বনিযন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছে সুন্দর করে গড়ে তুলে তাই নয়, বাইরের পঞ্চশক্তিকেও নানা ভাবে ব্যবহার করে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আনন্দ পাবার কৌশল বাড়িয়েছে। এই বাইরের ধ্বনিপদার্থকে আপন বশে রাখবার জন্য কত যন্ত্র বানিয়েছে মানুষ; সঙ্গীত-যন্ত্রের কথা মনে করলেই তা বোঝা যাবে।

মানুষ বুদ্ধিমান ও বিবেকবান জীব হলেও সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-স্বাধীন ও পরিবেশ-নিরপেক্ষ নয়; সেও নিসর্গের অধীন। তার বুদ্ধি-বিবেকও একদিনে জাগে নি। বহুযুগের অভিজ্ঞতার পর আজ যে পরিণতি পেয়েছে তার মানস শক্তি, সেই অতি-আদিম কালে সে-অবস্থা ছিল না তার—এই অনুমানই যুক্তিযুক্ত। মানুষ-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই তার সব সম্ভাব্য শক্তির বিকাশ হতে পারে নি নিশ্চয়। আজও মানবিক মানস-শক্তির যে বিকাশ হ'য়েছে তাই যে চরম তা কে বলতে পারে? সে তো উত্তরোত্তর বাড়তির পথে চলেছে। তবে এ-কথা ঠিক যে মানুষ সেই আদিম কালেই পরিণমনীয়তা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই ছিল পরিণতির বীজ। প্রত্যেক জীবই কতকগুলো শক্তি নিয়ে জন্মায়। মানুষেরও কতকগুলো সহজাত শক্তি আছে; সে শক্তি দৈহিক ও মানসিক দুই-ই হয়ে থাকে। শৈশব থেকেই মানুষ কয়েকটি সহজ ভাষা বা ধ্বনির অধিকারী হয়, যেমন হয়

কয়েকটি ভাব বা প্রবৃত্তির। অনুভূতি ও বুদ্ধি তখন কম থাকে বলে তার প্রকাশ-রীতি ও উপায়ের সংখ্যাও থাকে কম। তাই কয়েকটি ধ্বনি বা আওয়াজের সাহায্যে শিশু তার মনোভাব ব্যক্ত করে। দুঃখ-কষ্টের অনুভূতি খুব গভীর ও তীব্র বলেই বোধ হয় তার প্রকাশই শিশুর মধ্যে আগে হয়; সুখ কি আনন্দের অনুভূতি হলেও তার প্রকাশ প্রথম থেকেই হতে দেখা যায় না। হাসির প্রকাশ হয় কান্নার বেশ-কিছুটা পরে; কান্না কিন্তু জন্মাবার সাথে-সাথেই প্রকাশ পায়। তার পর ক্রমশ মানুষ শুনে-শুনে, বুঝে-বুঝে অন্য উপায়ে মনের ভাব ব্যক্ত করতে শেখে এবং শেষ পর্যন্ত নানা ধ্বনি-মিলিত শব্দ পর ও বাক্য আয়ত্ত করে বলতে শেখে। তেমন প্রয়োজন হলে এবং শক্তি থাকলে মানুষ ভাষা ছাড়া অপর ভাষাও শিখে ফেলতে পারে।

এ থেকে বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত করা অসংগত হবে না যে মানুষ প্রথমে যে ধ্বনি বলতে পারে তা হচ্ছে স্বরধ্বনি; কারণ স্বরের উচ্চারণে সব চেয়ে কম আয়াস লাগে। সহজেই মনুষ্য-কণ্ঠে স্বর ধ্বনিত হবার ঝোঁক আছে। একেবারে কচি শিশুর কান্নার আওয়াজে স্বরধ্বনিই শোনা যায়: উঁ-ঞ্জ, ওঁ-ঞ্জ। এই কথাটিও এই সংগে মনে রাখতে হবে যে অতি প্রাথমিক ভাষা যেমন, স্বরধ্বনির ভাষা তেমনি একধ্বনি ভাষা। তার পর ক্রমে এক স্বর থেকে একাধিক স্বরান্বিত শব্দ, এক ব্যঞ্জনধ্বনিত শব্দ, একস্বর ও একব্যঞ্জন সমন্বিত শব্দ, একাধিক স্বর ও ব্যঞ্জনের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ অর্থাৎ একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, ত্র্যক্ষরী, চতুরক্ষরী, পঞ্চাক্ষরী প্রভৃতি পদ, তার পর দ্বিব্যঞ্জন, বহুব্যঞ্জনধ্বনিবিশিষ্ট পদ ও বহু পদের একপদীভাব হয়ে সমস্ত পদ, একই পদ হতে ব্যুৎপন্ন নানা পদ, নানা পদের অন্বয়ে গঠিত নানা রকমের বাক্য দেখা এবং বলা অভ্যাস হয়। অনুরূপ ভাবেই আদিম কাল হতে এক এক গোষ্ঠী তথা দলের মধ্যে এক-একটি ভাষা গড়ে উঠেছে। এটা মনে হওয়া খুবই সহজ ও স্বাভাবিক যে প্রথম যুগে এক-একটা ধ্বনি এক-একটা ভাব বা বস্তুরই প্রতীক ছিল। তারপর একই ধ্বনিকে একটু ইতর-বিশেষ করে একাধিক ভাব বা বস্তুর প্রতীক রূপে নেয়া হতে থাকল; তারপর বিভিন্ন ধ্বনিকে যুগ্ম ভাবে একই ভাব বা বস্তুর বাহন হিসেবে ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবিত হল। এরই বিবর্তনে দেখা যায়: একই পদ অনেক বস্তু বা ভাবের দ্যোতক হতে পারে, এক বস্তু বা ভাবের অনেক প্রতীক বা পদ হয়; অর্থাৎ, একই কথার অনেক অর্থ হতে পারে, আবার, অনেক কথার একই অর্থ হয়। আরো সোজা করে বলতে গেলে, এক কথা দিয়ে অনেক ভাব বা বস্তুকে বোঝানো যায়, আর একই ভাব বা বস্তুর নানা প্রতীক বা পদ থাকতে পারে। আধুনিক যে কোন ভাষায়, অন্তত সমৃদ্ধ ভাষায় এর উদাহরণ মিলবে।

ভাষা যখন দীন ছিল, তখন এক পদ দিয়েই অনেক ভাব বা বস্তুকে বোঝাবার কাজ চালিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তাতে অর্থবিভ্রাট ঘটার অর্থাৎ ভুল বোঝার সম্ভাবনা দেখা দিত। তাই, পৃথক-পৃথক ভাব বা বস্তুর পৃথক-পৃথক পদ-গঠনের দরকার হল। অপর ভাষার সংগে পরিচয়ের ফলেও একই বস্তু বা ভাবের নানা পদ বা সমনামী শব্দ পাওয়া গেল। এক পদ হতে বহু পদ নিষ্পন্ন হবার রীতিও নির্ধারিত হল প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগে। যেমন, বিশেষ্য হতে বিশেষণ ও বিশেষ্য হতে ক্রিয়া, বিশেষণ হতে বিশেষ্য ও বিশেষণ হতে ক্রিয়া, ক্রিয়া হতে বিশেষ্য ও ক্রিয়া হতে বিশেষণ প্রভৃতি পদের উদ্ভব হবার ব্যবস্থা ও উপায় হল। আবার একই পদকে বিভিন্ন শ্রেণীর পদরূপে ব্যবহার করার স্বাধীনতা না দিয়ে পারা যায় নি বলেও ভাষার শক্তি বাড়ল; যেমন, বিশেষ্যকে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদরূপে বিশেষণকে বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদরূপে এবং ক্রিয়াকে বিশেষ্য ও বিশেষণপদ রূপে। বস্তু বা ভাবের সংখ্যা-নির্দেশক বচন, স্ত্রীপুরুষ স্ত্রীবাচক-নির্দেশক লিঙ্গ, কার্যনিষ্পন্নক তদ্ধিত ও অন্বয়া-বোধক বিভক্তি প্রভৃতি উপায়েও ভাষার সম্পদ অর্থাৎ প্রকাশ ক্ষমতা বাড়তে লাগল। ক্রিয়াপদ গঠনের বিভিন্ন প্রণালী, ক্রিয়ার বিভিন্ন কালবাচক, পুরুষবাচক, সংখ্যা-বাচক রূপ ভাষাকে সমৃদ্ধ করল।

ভাষার বিবর্তনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে উচ্চারণ। মানুষের কণ্ঠে ও মুখে যে সব ধ্বনির সৃষ্টি হতে পারে সেগুলিকে কয়েকটি শ্রেণী ও পর্যায়ে ভাগ করে নেয়া যায়। মানব-সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ও কালে কয়েকটি ধ্বনির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকলেও অধিকাংশ ধ্বনি বিষয়ে সব মানব-সমাজের মধ্যে সাম্যই লক্ষ্য করা যায়। ভাষার মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তার বেশীর ভাগই হয় ধ্বনি পরিবর্তনের জন্য, আর যাদের বেশীর ভাগই হয় আর্থনিক কারণে, অর্থপরিবর্তনের জন্য, আলঙ্কারিক বাচনভঙ্গীর ফলে, বাক্যরীতির পরিবর্তন ও বিদেশী ভাষার ধ্বনি, শব্দ, ইডিয়ম, ছন্দ, অলংকার ও বাক্যরীতির নিমিত্ত। প্রধানত উচ্চারণের কারণে এক-একটি ভাষা আপন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। প্রত্যেক ভাষার কিছু না কিছু উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য থাকে। উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের ফলে একই ভাষার অনেক উপভাষার সৃষ্টি হয়। একই ভাষার মধ্যে একই পদের বিভিন্ন উচ্চারণ বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। এর ফলে এক পদ হতে ভিন্ন-রূপের অনেক পদ গড়ে ওঠে। উচ্চারণ-জনিত ধ্বনি পরিবর্তনহেতু ভিন্ন ভিন্ন পদ হতে একরূপ পদের উদ্ভব হয়। উচ্চারণের ফলে প্রাচীন শব্দকে যারে যারে রূপ বদলাতে দেখা যায়; অনেক সময় শব্দের এমন পরিবর্তন হয়ে যায় উচ্চারণ হেতু—যে তার নোতুন রূপ হয়েছে বলা যায়। ভাষার নতুন ছন্দের আবির্ভাব হতে পারে উচ্চারণের নতুনত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ফলাফলে। কোন ভাষার উচ্চারণ-রীতি বিশিষ্ট হয়ে ওঠার পর বিদেশী বা অপর ভাষা হতে আমদানী শব্দের বেশির ভাগই যায় বদলে। কতকগুলি এক জাতীয় উপভাষার মধ্যে একটি যে নিদর্শন standard হয়ে ওঠে তা যেমন রাজনীতিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হয়, তেমনি হতে পারে তার উচ্চারণের স্বাভাবিক ধ্বনিমাধুর্যের জন্যে।

ভাষার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায় এক ভাষা হতে অনেক উপভাষার উৎপত্তি হয়; পরে আবার সেই সব উপভাষা হতে কোন-কোনটি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভাষার মর্যাদা লাভ করে। একই ভাষা হতে উদ্ভূত উপভাষাগুলির পার্থক্য হয় কতকগুলি স্বতন্ত্র পদ ও উচ্চারণ-রীতির ব্যবহারে; এ থেকে ক্রমে ক্রমে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি, পদ-গঠনরীতি এবং ছন্দেরও স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয়। বহুতর স্বতন্ত্র পদাংশ,

প্রকৃতিপ্রত্যয়ের উচ্চারণের সঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে নতুন প্রকৃতি-প্রত্যয়রূপ ধরে ওঠে।

ছন্দ ব্যাপারে ধ্বনিসমষ্টি ছাড়া আর কি? সব ধ্বনির মধ্যেই সুর আর তাল বিরাজমান, তা সে যত অস্পষ্ট ও ক্ষুদ্র আকারেই হোক। এক-একটি নিজস্ব কালমান আছে, অন্য অপর ধ্বনির সহিত অন্বয় ও পরিসরে তার রূপান্তর ঘটে। কতকগুলি ধ্বনি একটা নির্দিষ্ট নিয়মিত কালের মাপের মধ্যে ধ্বনিত হলে যে ছাঁদটি রচিত হয় তাকেই ছন্দ বলা যায়। একই ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি ও উচ্চারণপদ্ধতির জন্য বিশিষ্ট ছন্দের উৎপত্তি হয়। ধ্বনিপরিবর্তন ও উচ্চারণভঙ্গীর রূপান্তরের ফলে নব নব ছন্দের সৃষ্টি হতে থাকে। ভাষার পরিবর্তনের সাথে ছন্দেরও বিবর্তন ঘটে: ছন্দের যে কতকগুলো বাঁধাধরা সংখ্যা ও রূপ থাকতেই হবে এমন নয়। ছন্দ ভাষার অনুচর, ভাষা-মাধুরী। ছন্দের সাহায্যেই ভাষার প্রাণের লীলানন্দ মূর্তিমান হয়ে উঠতে পায়। ভাষার জড়তা-আড়ষ্টতা কেটে যায় ছন্দের অনুপ্রাণনায়। ভাষার বৈচিত্র্য রোধবার অন্যতম প্রধান উপকরণ ছন্দ। ভাষার পদে পদে সর্বদাই অল্পবিস্তর ছন্দ থাকে, তবে কোথাও তা অস্পষ্ট, কোথাও স্পষ্ট হয়ে। একই ছাঁদমান যখন পর পর অনেকবার অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়কালিকতা রক্ষিত হয়, তখনই ছন্দের তরঙ্গ-হিল্লোল শ্রোতার কান-প্রাণ-মনকে দোলায়িত করে তোলে। এই নির্দিষ্ট সময়মানের ঘনবিন্যাসই পদ্যের বৈশিষ্ট্য-ধারক। বর্ণ-বিন্যাস-নিরপেক্ষ শব্দোচ্চারণের অনির্দিষ্টতা, সংখ্যা ও বিন্যাসের তারতম্য হেতু ছন্দের রূপবৈচিত্র্য ঘটে। গদ্যভাষা ও গদ্যকবিতার মধ্যে যতি-নিরপেক্ষতার কারণও, অর্থাৎ নিয়মিত ভাবে একই মাপের সময়ের মধ্যে ওঠা নামা, থাকে না; তাই তার ঊর্মিলতা তেমন সহজে অনুভূতি-গোচর হয়ে ওঠে না। পদ ও ধ্বনির বৈশিষ্ট্য যেমন ছন্দের বিন্যাসক হয়, ছন্দের অনুরোধে তেমনি শব্দের রূপান্তর ঘটে। তবে এই রকম রূপান্তরিত শব্দ গদ্য ও সাধারণ ভাষায় চালু হয়ে যায়। এই থেকে ভাষার শক্তিসঞ্চয় বাড়ে থাকে।

ভাষার পরিবর্তন নানা ভাবে হয়: তার মধ্যে শব্দের ধ্বনিগত ও প্রত্যয়গত যে পরিবর্তন তা প্রধান। কিন্তু এ হল ভাষার বাহ্যিক পরিবর্তন। ধ্বনি বা শব্দ অর্থ-সাপেক্ষ; অর্থবত্তাতেই তাদের সার্থকতা। অর্থ ই ভাষার প্রাণ, শব্দ ভাষার দেহমাত্র: যদিও প্রাণের প্রকাশের জন্য দেহের প্রয়োজনীয়তার মত ভাব বা অর্থপ্রকাশের জন্য ভাষার আবশ্যকতা। তবু ভাব বা অর্থ না থাকলে স্থায়ী প্রাণস্পন্দিতা থাকে না ভাষার। অর্থহীন, মানে, বিশেষ অর্থবাচ্য শব্দের যে কোন দাম নেই তা নয়: আছে, যেমন আছে ছবি বা ভাস্কর্যের, যার প্রাণ না থাকলেও সৃষ্টিপ্রসাদগুণ আছে। তেমনি অনেক ধ্বনি ও শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থবত্তা না থাকলেও শ্রবণাভিরাম মাধুর্য আছে। তথাপি সভাব, অর্থবান ভাষাই প্রাণ মনকে যথার্থ বিভাবিত করে। কিন্তু দেখবার বিষয় এই যে অর্থবান ভাষার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে চলে। শব্দের অর্থ বদলাতে বদলাতে একেবারে ঠিক উল্টো অর্থে ব্যবহার হতেও দেখা যায়। কোথাও অর্থের বিস্তার, কোথাও বা সংকোচ ঘটে থাকে। প্রজাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার পদেরই অর্থান্তর ঘটে। বিদেশী শব্দ প্রথম থেকেই ভুল বা উল্টো অর্থে গৃহীত হবার সম্ভাবনা থাকে। আলঙ্কারিক ভাবে প্রয়োগ হতে-হতেও পদের অর্থান্তরপ্রবণতা ভাষার মননীয়তা জ্ঞাপন করে, কিন্তু এর আধিক্য প্রমাদকর; তবে তা প্রায়ই হয় না। অর্থের যে পরিবর্তন ঘটে তা ধীরে ধীরে অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিতদের অপব্যবহারের দরুণও অর্থান্তর হয়। লোকব্যুৎপত্তি ও লাক্ষণিক অর্থ-পরিবর্তনে অনেক পোষকতা করে।

ভাষার আদিম অবস্থাতেই যে বহুপদী বাক্য ছিল এমন মনে করা অসংগত। বাক্যের, বাক্যরীতিরও বিবর্তন ঘটে এসেছে যুগে-যুগে! একধ্বনি শব্দ হতে যেমন বহুধ্বনি শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, একধ্বনি, পরে একপদী বাক্য হতে তেমনি বহুপদী বাক্যের উদ্ভবন হয়েছে। অপর ভাষা, বিশেষ করে উন্নত ভাষার বাক্যরীতির ছোঁয়াচ লেগে ভাষার বাক্যশৈলীর পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভাষার পরিণত অবস্থাতেও অল্পপদী, এমন কি, একপদী বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয়, মানুষের অন্তরে অনুভূতির বৈচিত্র্য বাড়ার সংগে-সংগে মগজে বুদ্ধিবৃত্তির ফলে প্রকাশ-তংপীর বৈচিত্র্যের উদ্ভাবন হয়েছে। পদবিন্যাসের বিভিন্ন ধরণ হতেও বাক্যরীতির পরিবর্তন ঘটেছে।

মনের ভাব স্পষ্ট করে প্রকাশ করার শক্তি ও যোগ্যতা ভাষার অর্জিত হবার পর চেষ্টা হল কেমন করে সেই সোজাসুজি-বলা ভাবকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দর করে, চমৎকার করে বলা যায়; সাধনা হতে থাকল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, টানিয়ে-বুনিয়ে নানা-ঢঙে বলবার। মানব সভ্যতার অন্যান্য বিষয়ে যেমন এখানেও তেমনি প্রয়োজন মেটার পর শিল্পসৌন্দর্যের সৃষ্টিতে মন চলল। এর ফলে বাক্যে অলংকার-যোজনার রেওয়াজ হল। ভাষার কল্যাণে বিচিত্র-সুন্দর অনুভূতি, চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় স্থায়ী রূপ পেয়ে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রথিত হবার উপায় হল; ব্যক্তিগত মানসিক সাধনা সর্বজনীনতার পথে এগোবার রথ পেলো।

ভাষার বিবর্তনে লিপির কথাটি এক হিসেবে সব চেয়ে বড়; কারণ, এই লিপির সাহায্যেই মানুষের ভাব, অভিজ্ঞতা, এবং এককথায় কৃষ্টির বেশীর ভাগ জিনিষই স্থায়ী হবার সুযোগ পেয়েছে, উত্তর-পুরুষের দত্তা হতে পেরেছে। নানান্ দেশে নানান্ ভাষার মত নানা লিপির প্রবর্তন হয়েছে। যুগে-যুগে লিপিরূপেরও পরিবর্তন না ঘটে পারে নি। মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ভাব-প্রকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে; দূর-দূরান্তরে, বহু মানুষের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে প্রকাশে-অপটু মানুষের বাচনশক্তিই যে বাড়বার পথ পেয়েছে শুধু তাই নয়, কবি-শিল্পী-দার্শনিকদের অনুভূতি ও চিন্তিত বিষয়ের সৌন্দর্য উপলব্ধি ও জ্ঞান সঞ্চয়ের সুযোগ বেড়েছে; মানুষের মহত্ত্ব ও মহিমা ফুটে ওঠবার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। এই সংগে যান্ত্রিক আবিষ্কারের ফলে পাওয়া গ্রামোফোন, লিংগুয়াফোন, টিকটাফোন, টেলিফিল্ম্‌টন, সিনেমা, রেডিওর কথাও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করা উচিত। ভাষার প্রচার তথা বিবর্তনকে কম সাহায্য করছে

না এগুলি। এর পর আরো কত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়ে ভাব-প্রকাশ এবং ভাষা ও আনন্দ লাভ সহজ ও সুলভ হবে তা তো আর অনুমানের নয়।

ভাব-ভাষা, অংগভংগী, ইংগিত-ইশারা, রঙ-রেখা, সুর-কথা কত বিচিত্রভাবেই না মানুষ অন্তরের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিকে রূপ দেবার সাধনা করেছে; এক-একটি উপায়েরই আবার কত অসংখ্য রূপান্তর ঘটেছে, আরও ঘটে চলেছে। ভাষার রূপ ও রূপান্তর মানব-ইতিহাসের একটি বড় কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। হাওয়ার মত সুলভ-হয়ে-থাকার জন্যে এর মর্যাদা ও অসাধারণত্ব সব সময় বুঝতে পারা যায় না। একবার মূকতা কিংবা প্রকাশশক্তিহীনতার কথা অনুমান করে দেখলে এর মূল্য নির্ধারণ করা যাবে।

মানুষের বুদ্ধির ক্রমবিকাশের ফলে আরো কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের সুখানুসুখ প্রকাশ হবে ভবিষ্যতে। নানা বেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে এসবে বিরোধ বিষাদের অবশেষ থাকা সত্ত্বেও যেমন বিশ্বরাষ্ট্র ও একপরিবার গড়ে ওঠার প্রয়াস ও সম্ভাবনা দেখা যায় মানুষ-সমাজের মধ্যে, নানা ভাষার সম্পদ নিয়ে বহু-বিচিত্র ভাষার মধ্যে তেমনি একটি ভাষার উদ্ভবের-কল্পনা কি শুধু ভাববিলাস মাত্র?

গান্ধীবাদ ও শ্রমনীতি

শ্রীনির্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম্-এ, ডি-এস্-ই, ডি-এস্-ডব্লু

১

গান্ধীজীর রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে তাঁর শ্রমনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি শুধু রাষ্ট্রের কর্ণধারই ছিলেন না—তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শ্রমিক-নেতাদের অন্যতম। উপেক্ষিত শ্রমিকশ্রেণী সমাজের কাঠামোর এক অপরিহার্য অঙ্গ। তাই, ভারতের পুনর্গঠনে শ্রমিকদের যে অনেকখানি অবদান আছে ও ইতিহাসে এদের একটা ভূমিকা আছে—সে কথা তিনি উপলব্ধি ক'রে শ্রমিক আন্দোলন সুরু করেন। মানব-দরদী গান্ধীজী শ্রমিকদরদী না হবেন কিরূপে? স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর উৎসর্গীকৃত প্রাণ শ্রমিকদের উন্নতিবিধানের জন্যও সমানভাবেই নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে শ্রমিকদের উন্নতি চেয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে তিনি কেবলমাত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস ছিলেন না—শ্রমিক আন্দোলনেরও তিনি আদিগুরু। তিনি খেটে-খাওয়া মানুষদের কল্যাণের নিমিত্ত যে বীজ বপন ক'রে গিয়েছেন—তা আজ শাখাপ্রশাখায়িত হ'য়ে বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।

শ্রমিক আন্দোলনে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটে ১৯১৮ সালে। যদিও ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় ট্রেড ইউনিয়ন তৈরী হয়েছিল যথাক্রমে ১৮৯০ ও ১৯১০ সালে—শ্রমিক আন্দোলনের গতি অতি মন্থর অবস্থাতেই চলেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী চাঞ্চল্যের ঢেউ ভারতেও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। আবার, তার পরের দিনের কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ, যেমন ভারতের স্বরাজ আন্দোলন, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দমননীতিমূলক কার্যকলাপ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, রাউলট আইন প্রভৃতি—এদেশের জনসাধারণকে চূড়ান্তভাবে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছিল। অপরিণত ক্ষমতাপ্রেমিকদের সঙ্গে সহরের শ্রমিকশ্রেণী ও পল্লীর কৃষককুল এতে তাদের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। কল-কারখানার শ্রমিকেরা নূতনভাবে দাবীদাওয়া পেশ ক'রে মালিকদের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টির সূচনা করেছিল। এই সন্ধিক্ষণে শ্রমিক নেতারূপে গান্ধীজীর আবির্ভাব হোলো। তাঁর অসহযোগ পন্থা, সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও অহিংসনীতি শ্রমিক আন্দোলনের মোড় দিল ফিরিয়ে। স্থিমিত ও ম্রিয়মান শ্রমিক আন্দোলন যেন ঐন্দ্রজালিকের হাতে প্রাণের পরশ্ পেয়ে সজীবতা লাভ ক'রে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্লো।

গান্ধীজী আমেদাবাদে কলকারখানার মজুরদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে, আমেদাবাদ সুতাকল মজুর সঙ্ঘের (Ahmedabad Textile Labour Association) সহায়তায় তাঁর ঐতিহাসিক শ্রম-আন্দোলন সুরু করেন। কিছু দিন যাবৎ ধর্মঘট চালিয়ে যখন তিনি মালিকদের অনমনীয় ও একগুঁয়েমিভাবকে অহিংস পন্থায় জয় করতে পারলেন না, তখন তিনি একদিন আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা ক'রে বসলেন। এর দ্বারা তিনি শুধু মালিকদিগকেই নিজের আওতার মধ্যে আনলেন না—তিনি শ্রমিকদের সংহতি বাড়িয়ে দিলেন অশেষ পরিমাণে। তিনি মজুরদেরও জানালেন যে তাঁর নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে যদি দুর্বলতার ঘোঁয়াচ লাগায় ও নেতার নেতৃত্বে যদি শেষ পর্যন্ত অটুট আস্থাবান না থাকে—তা হ'লে তাঁর অনশন ধর্মঘটে তাদেরই বিরুদ্ধে। সাধারণে এই সময় প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার সূচনার প্রথম পরিচয় পেলো। ভারতের শিল্পবিপ্লবের সুরু হ'তে এযাবৎ শ্রমিকদের চালিত করেছে বাইরের লোকেরাই। শ্রমিকনেতা শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য হ'তে আবির্ভূত হয় নাই। সমাজদরদী মানুষ—তিনি ডাক্তার হউন বা উকিল-ব্যারিষ্টার হউন—শ্রমিকদের সেবা ক'রে লোকসমাজে শ্রমিকনেতা ব'লে পরিচয় লাভ করেছেন। এদেশের শ্রমিক বলতে প্রধানতঃ নিরক্ষর শ্রমিকই বুঝায়। এখানে শতকরা মাত্র দু'তিনজনকে লেখাপড়ার গণ্ডীতে পা দিতে দেখা যায়। এইদিক দিয়ে বিদেশের শ্রম-আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিলেতে শ্রমিকনেতা শ্রমিকদের মধ্য হ'তেই

আসে। একজন সাধারণ শ্রমিকই সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের কাজ করে। মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের হয়ে হাতীয়ারও পেশ ক'রে দরকাষাকষি করতে পারে। যখন তার কাজের চাপ বেড়ে যায়, আর তার পক্ষে কারখানার কাজে মন দেওয়া সম্ভব হয় না—তখন কাজে ইস্তফা দিয়ে সেই শ্রমিক একজন পুরোদস্তুর শ্রমিকনেতা হয়ে দাঁড়ায়। এর জন্য ইউনিয়ন হ'তে তার মাসোহারার ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। ভারতের শ্রমিকশ্রেণী যতদিন পর্য্যন্ত না শিক্ষার আলো পাচ্ছে—ততদিন পর্য্যন্ত দেশের ইউনিয়নগুলির পক্ষে অনুরূপভাবে গ'ড়ে উঠা সম্ভব হচ্ছে না।

ভারতের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান শ্রমিক আন্দোলনের নানা ত্রুটীবিচ্যুতি সত্ত্বেও আজ হ'তেই অবহিত হিল ও গান্ধীজীর আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাই, ১৯২০ সালে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সংগ্রামে শ্রমিকদের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিমূলক ও তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য এক প্রস্তাব পাশ হয়। এই সময় গান্ধীজী আমেদাবাদে কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়নে গ'ড়ে তোলেন। ১৯২০ সালের শেষ নাগাদ দেখা গেল—আমেদাবাদে কলকারখানার মজুরদের প্রায় ৭০ ভাগ গান্ধীজীর কোন না কোন একটি ইউনিয়নে যোগদান করেছে। এই সময়ের ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা ও চাঁদা আদায়ের হার দেখলেই বুঝা যাবে—গান্ধীজীর নেতৃত্বে শ্রমিকেরা কিরূপ ভাবে সাড়া দিয়েছিল! ১৯২০ সালের হিসাবে দেখা যায় গান্ধীজী চালিত ইউনিয়নগুলির সভ্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল—১৩,৪০০ ও চাঁদাই চাঁদার পরিমাণ হয়েছিল ৫৫৭৯৲৲। আর ১৯২১ সালের নভেম্বর সভ্যসংখ্যা উঠেছিল ৪০,০০০ ও চাঁদা আদায় হয়েছিল—৭২০০০৲। সত্যের উপাসক গান্ধীজী তাঁর অভিজ্ঞতা হ'তে শ্রম আন্দোলনকে ন্যায় ও সত্যের পথে চালাবার জন্য কতকগুলি মূলনীতি নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়েছিলেন। এগুলি আজও তাঁর অন্তর্ধানের পর চিরন্তন সত্য :—

(১) শ্রমিকনেতা ও শ্রমিকদের পক্ষে তাঁদের দাবী অযথা বাড়ানো উচিত নয়। দাবী পেশ করার আগে দাবীদাওয়ার ন্যায়সঙ্গত দুর্বিকই বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা উচিত।

(২) যেহেতু আপোষ মীমাংসা ও শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেই শ্রমিক-মালিক স্বার্থের অবসান বাঞ্ছনীয়, সেইজন্য ধর্মঘটকে শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। ধর্মঘট চলা কালেও বিরোধের যথাযথ মীমাংসার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা দরকার। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত ধর্মঘটের আশ্রয় লওয়া কখনও উচিত নয়। তা ছাড়া, শ্রমিকদের ইউনিয়নের সমর্থন সাপেক্ষেই এ কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত।

(৩) শ্রমিকদের ধর্মঘট সত্যাগ্রহ ভিত্তিক। কাজেই সত্যাগ্রহীর মনোভাব নিয়েই সত্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে—কর্তব্যসাধনে অটল থাকতে হবে। ধর্মঘটের পন্থা হিসাবে অহিংসনীতিই শ্রেষ্ঠ পন্থা। ন্যায়সঙ্গত দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের অহিংসভাবেই ধর্মঘট করা উচিত।

গান্ধীজীর অহিংস ধর্মঘট পাশ্চাত্যের ধর্মঘট হ'তে কিছুটা স্বতন্ত্র। পশ্চিমের দেশগুলিতে ধর্মঘট বাস্তবতঃই অহিংস, কিন্তু আসলে এগুলি হিংসা ও দ্বেষ দ্বারা প্ররোচিত হওয়ার ফলে হিংসাত্মক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে—সে দেশের ধর্মঘট জবরদস্তমূলক, আর তাতে অনুরোধ অনুনয়ের দ্বারা রাজী করানোর স্থান বিশেষ নাই। সেখানে ধর্মঘট মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অস্ত্রতে পরিণত হয়েছে। গান্ধীজীর মতে সত্যাগ্রহীর ধর্মঘট হবে—অন্তরে ও বাইরে সম্পূর্ণভাবে অহিংসনীতির পরিপোষক। ধর্মঘটকে বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে ধর্মঘট হচ্ছে—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, এতে বাইরের প্রেরণা থাকলেও তার সৃষ্টি হয় অন্তরে। এর দ্বারা আত্মশক্তি চলা মালিককে শ্রমিকদের মতের বশীভূত করার প্রয়াস পাওয়াই-এর উদ্দেশ্য। এই জন্যই সত্যসন্ধানী গান্ধীজী সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য মনে করেন নাই। তাঁর মতে অত্যাচারীর হাতে নিষ্পীড়িত জনগণকে নিজেদের মুক্তির জন্য—তাহাদিগকেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে (অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নয়) বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। সে সংগ্রামে "লোকক্ষয়, রাজক্ষয়, মৃত্যুভয় আর" ব'লে কিছু থাকবে না। নিজেদের সবাকে অত্যাচারের পদতলে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করতে হবে; সত্যাগ্রহের দ্বারা মুক্তিসংগ্রামে বাইরের সাহায্যের আশা পোষণ করলে আত্মার দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া হবে। তাই তিনি অপরের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নিঃস্বার্থ সাহায্যের বিরুদ্ধেও সজাগ দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের মূলমন্ত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "আত্মশক্তির" বাণী। এই মহানীতিকে ভারতের শাশ্বত হিন্দুধর্মের ত্যাগের দ্বারা জন্ম-করা-পন্থার নামান্তর বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবিগুরুর ভাষায়—

"দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে
* * *
আমার ভার লাঘব করি নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।"

গান্ধীজী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধর্মঘট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। যেহেতু দেশের শ্রমিকশ্রেণী রাজনীতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হ'য়ে উঠে নাই, সেজন্য রাজনীতির দোহাই দিয়ে শ্রমিকদিগকে ধর্মঘট করানো যুক্তিসঙ্গত নয়। এর দ্বারা শুধু শ্রমিকদের রাজনীতির ক্রীড়নক করাই হয়। ধর্মঘটের প্রকৃতকল্পে ব্যবহার করতে হ'লে সুষ্ঠুভাবে গঠিত মোক্ষালো অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ও অরাজনৈতিক ট্রেড ইউনিয়ন দরকার।

গান্ধীজীর মতে শ্রমিক-মালিক স্বার্থের সমন্বয় সম্ভব। এই মতবাদকে গান্ধী-অর্থনীতির মোড়ার কথা বলা চলে। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক পক্ষকে সুসংগঠিত হ'তে হবে। পাশ্চাত্যের শ্রম-আন্দোলনের ফলে—যদি সে দেশে এরূপ স্বার্থের সমন্বয়ের চেষ্টা দেখা দিয়ে থাকে, তবে তার প্রধান

কারণ হচ্ছে—সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়ন অতীতের আন্দোলনের ফলে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে। আমেদাবাদ টেক্সটাইল্ লেবার এ্যাসোসিয়েশন্ গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে চলার ফলে অহিংসনীতির পরিপোষক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে। বর্ত্তমানে এই ইউনিয়নটী ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ইউনিয়ন। আর এ যাবৎ যথোচিতভাবেই মালিকদের সঙ্গে বুঝাপড়া ক'রে আসছে। ১৯৩৭ সালে আমেদাবাদ টেক্সটাইল্ লেবার এ্যাসোসিয়েশনের সভ্যসংখ্যা ছিল ৪৪,০০০ ও মাসে ২০০০৲ টাকা চাঁদা আদায় হোতো। ব্যক্তিগঠনের আগে জনসাধারণের বৈষয়িক জীবনের উন্নতিসাধনের চেষ্টা বিফল—এটা গান্ধীবাদের অন্যতম মূলসূত্র। সেইজন্য গান্ধীজী অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বে ব্যক্তির উৎকর্ষসাধনে প্রয়াসী হন। তাই, তিনি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন যে প্রত্যেকটী শ্রমিক হবে স্বাধীন ভারতের পুরুষসিংহ দায়িত্বশীল নাগরিক। তিনি যে শ্রেণীবিহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন—তা তাঁর নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবে পরিণত হতে পারে।

গান্ধীজীর শ্রমিক আন্দোলনে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে—সালিশী-নীতি মেনে নেওয়া। প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দ্বারা শক্তি পরীক্ষার আগে ঘরোয়াভাবে আলোপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থতার প্রয়োজন। তাঁর মতে মালিক-শ্রমিকের মাঝে যে পার্থক্য আবহমানকাল হ'তে বর্ত্তমান রয়েছে—তা ঘুচানো সম্ভব একমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সালিশী দ্বারা। গান্ধীজী নিজে আমেদাবাদে ১৯১৮ সাল হ'তে ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত সালিশীর মাধ্যমে বহু বিরোধের মীমাংসা ক'রে তাদের অবসান ঘটিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন যে এর দ্বারা শ্রমিক ও মালিক উভয় শ্রেণীই অশেষ কল্যাণ হয়েছেন। শিল্পজগতে স্থায়ী ও পূর্ণ সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত গান্ধীজীর নির্দেশিত পন্থাই প্রকৃষ্ট।

শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রাখার জন্য অধুনা ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গিরি যে মতবাদ প্রচার করছেন—তাতে গান্ধীদর্শনই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। শ্রীযুক্ত গিরির মতে সরকার, মালিক ও শ্রমিক—এই তিন পক্ষের মিলিত প্রয়াসকেই ঐতিহাসিক সূত্রে দেখা গিয়েছে যে শ্রমিক-মালিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব ঘুচাতে সর্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হয়েছে। শ্রমিক-মালিকের সহযোগিতার মনোভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে তিনি বলেছেন যে এই তিন পক্ষের একত্রিত আলাপ-আলোচনাই মীমাংসার যথাযথ উপায় নির্দ্ধারণ করতে পারে। শ্রমিক-মালিক বিরোধের অবসানকল্পে শ্রমবিরোধ আইনের মাধ্যমে যে সমস্ত আইনানুমোদিত প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে—তাদের অপেক্ষা তিনপক্ষের বুঝাপড়ার ভিত্তিতে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াসই অধিকতর কাম্য। তাঁর মতে শ্রম আইনের আওতায় শ্রম-বিরোধ মিটাবার যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রচলিত আছে—তাতে বিরোধের বিচার হয় মাত্র, কিন্তু আসল মীমাংসা হয় না।

গান্ধীজীর শ্রমনীতির সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে মালিক ও শ্রমিক আলাদা শ্রেণীর মানুষ নয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ এক অবিচ্ছেদ্য বাঁধনে বর্ত্তমান। এর ফলে তাঁর মতে এই উভয় শ্রেণীকে নিয়ে এক বিরাট পরিবার-বিশেষ মনে করতে হবে। শ্রেণী বিভাগের ধারণা (class consciousness) হতে কালক্রমে শ্রেণীসংগ্রাম (class struggle) দেখা দিতে পারে। আর শ্রেণীসংগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত সমাজের কাঠামোর ভাঙ্গন ধরিয়ে দেয়। তাই, গান্ধীজী শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে কলকারখানার মালিকের সঙ্গে তাঁদের একজন নগণ্য শ্রমিকের সম্বন্ধ হওয়া চাই—পিতাপুত্র স্বরূপ অথবা ভ্রাতৃতুল্য। মালিক ও শ্রমিকের এই মধুর সম্পর্কে তাঁর চোখে কোনদিন প্রভুভৃত্যের সম্পর্কে ধূলাপ্রতিহত হয় নাই। শ্রমিক মালিক দ্বন্দ্ব চিরতরে নির্বাসিত করতে হ'লে তিনি মালিকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছেন—তা মালিককুলকে কার্য্যকরী করতে হবে। প্রশ্ন হ'তে পারে—গান্ধীনীতি অবলম্বন করলেই কি শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব হ'তে একেবারে রেহাই পাওয়া যাবে? উত্তরে বলা যায়—গান্ধীপথের আশ্রয় না নিলেও দ্বন্দ্ব ও বিরোধ যেরূপ অবধারিত, এই নীতি অবলম্বন করলে তার সম্ভাবনা অনেক কমবে। যদি গান্ধীবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে মালিক-শ্রেণী দরদ দিয়ে হৃদয়ঙ্গম ক'রে ও অন্তরের সহিত গ্রহণ করে, তা'হলে ধরাতল হতে শিল্পবিরোধ একেবারে ঘুচে যাওয়া কেলাও সম্ভব হতে পারে। গান্ধীজীর মতে একজন কারখানাদার তাঁর শ্রমিকের শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি করলেই রেহাই পাবেন না—তাঁকে শ্রমিকের নৈতিক উন্নতির জন্যও দায়ী থাকতে হবে। মালিক শ্রমিকের মঙ্গল করার জন্য ট্রাষ্টী স্বরূপ। সেইজন্য শ্রমিকদের জীবনযাত্রায় ও তাদের কর্মক্ষেত্রে এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তাদের বুদ্ধির বিকাশ হয় ও তারা উদ্যম, বিশ্বাস ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নিজেদের নৈতিক পটুতা পূর্ণভাবে বিকাশ করতে পারে। গান্ধীজীর নিজের কথায়—"The only sanction that I can think of in this connection is of mutual love and regard as between father and son, not of law. If only you make it a rule to respect these mutual obligations of love, there would be an end to all labour disputes, the workers would no longer feel the need of organising themselves into unions." (Young India, 1927-28)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, আই-এ-এস, মহোদয়ের "Gandhian Approach in Industrial Relations" নামক ইংরাজী প্রবন্ধের দ্বারা অবলম্বনে রচিত।

নদীয়ার বাণী-সাধক

শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়

অতীতের নদীয়ার ভৌগলিক আয়তন করিতে করিতে বর্ত্তমানে বাংলা বিখণ্ডিত হওয়ায় ফলে নদীয়ার সীমানা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি, আর কৃষ্ণনগর নামের উৎপত্তি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম হইতে। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল রেউই। মহারাজ কৃষ্ণ রায় রেউই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে কৃষ্ণনগরের নামকরণ করেন। নবদ্বীপ ও কৃষ্ণনগরের ইতিহাস লইয়াই নদীয়ার ইতিহাস। এই নদীয়াতেই বল্লাল সেন কর্তৃক হিন্দু সমাজের সংস্কার হইয়াছে। বাংলার ইতিহাস এই নদীয়ার সহিত জড়িত। কিন্তু রাজনৈতিক, ভৌগলিক উত্থান পতনের কথা বাদ দিয়া এই প্রবন্ধে আমি নদীয়ার পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

তারপর দিয়া নদীয়া বাংলাকে কি দান করিয়াছে বিচার করিতে হইলে দেখিতে পাই, শেষের সেই প্রাচীন অন্ধকার যুগে বাংলা ভাষার সাহিত্যাকাশে প্রথম অরুণোদয় হইয়াছিল এই নদীয়ায়। এই নদীয়াতেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যের গঠন ও পুষ্টি। শ্রেষ্ঠিক পাশে শ্রীচৈতন্যদেবের নদীয়ায় আবির্ভাব হইতে বাংলা সাহিত্যকে তাঁহার মোহন স্পর্শে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জেন্দুবিল্বে জন্ম হইলেও নবদ্বীপে রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। বাংলার আদি কবি কৃত্তিবাস এই নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামে বসিয়াই রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। বাংলার দ্বিতীয় কবি কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রাজকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে বসিয়াই রচনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের উজ্জ্বলতম কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য-সাধনা ও কবিপ্রতিভা বঙ্গ সাহিত্যে চিরস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের উপরেও নদীয়ার দাবী কম নহে। কারণ তাঁহার অনেক কাব্য এই নদীয়ার একপ্রান্তে শিলাইদহে বসিয়া রচিত হইয়াছে। শিলাইদহেই কবি-সাধনার সূচনা। আমরা তাঁহার বহু রচনায় নদীয়ার পল্লীজীবনের আভাষ পাই।

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি এই নদীয়াতেই। নদীয়ার এই বাউল-সঙ্গীত ও অনেক সাধকের সাধন-সঙ্গীত বাংলাভাষাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। নদীয়া একদিন জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে বাংলার জন্যে ইতিহাস অধিকার করিয়াছিল, আজও তাহার প্রভাব একেবারে নষ্ট হয় নাই।

নদীয়ার পরলোকগত সাহিত্যসেবীদের স্মরণ করিয়া আমার অন্তরের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিতে চাই। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাঁহাদের সামান্য সামান্য পরিচয় এখানে বর্ণানুক্রমিক ভাবে দিলাম। ইহাছাড়া আরও কত বিখ্যাত ও অখ্যাত সাহিত্যসেবী তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা দ্বারা বঙ্গ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অতীতের সমস্ত খ্যাত অখ্যাত নদীয়ার সাহিত্যসেবীদের প্রতি এই বাণীতর্পণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আমার নমস্কার জানাইতেছি।

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্ম ১৮৬১ সালে ১লা মার্চ্চ শুক্রবার অপরাহ্নে নদীয়া জেলায় মাওরাপাড়া থানার অধীন সিমলা গ্রামে। মৃত্যু ১৯৩০ সাল, ১০ই ফেব্রুয়ারী। ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি একাধিক সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশই বিভিন্ন পত্রিকায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

২। অক্ষয়কুমার দত্ত—জন্ম ১৮২০ খৃঃ ১৫ই জুলাই, শুক্লপক্ষ পঞ্চমী তিথিতে রাত্রি অনুমান ৯ ঘণ্টার সময় পূর্ব্বে নদীয়—বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত চুপী গ্রামে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে রাত্রি অনুমান ৩.৩৫ মিনিটে ৬৮ বৎসর বয়সে দুরারোগ্যরোগে মৃত্যু হয়। বাংলা গদ্যের পরিপুষ্টি সাধনে "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার যে বিপুল সাধনা করিয়া গিয়াছেন তাহা চিরস্মরণীয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম দর্শন ও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন।

৩। অবনীকুমার বসু—বীরনগর, উলা, কবিতা লেখক

৪। অঘোরনাথ গুপ্ত—শান্তিপুর, শাক্যমুনি

৫। অমূল্যচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বিষগ্রাম, উপন্যিষদ নামক গ্রন্থ।

৬। অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—আমুলিয়া, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

৭। কবিকর্ণপুর—কাঁচড়াপাড়া, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

৮। কৃত্তিবাস ওঝা (মুখোপাধ্যায়)—১৪০২ খৃঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রিকালে ফুলিয়ায় জন্ম হয়। তাঁহার জন্মক্ষণ সম্বন্ধে রচিত কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।"

৯। কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহারাজা—কৃষ্ণনগর, শ্যামাসঙ্গীত।

১০। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী, রসসাগর—শান্তিপুর, পাদপূরণ কবিতা।

১১। কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—(মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভার রসসাগর) ঘাড়ে গাঁকা গ্রাম।

১২। কৃষ্ণকমল গোস্বামী—ভাজনঘাট, বিচিত্র বিলাস প্রভৃতি।

১৩। কৃষ্ণদাস মুখোপাধ্যায়—বাগআঁচড়, সুলেখা উপন্যাস।

১৪। কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিবনিবাস, বঙ্গবাসী সম্পাদক।

১৫। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—নবদ্বীপ, তন্ত্রসার।

১৬। কৃষ্ণচন্দ্র সরস্বতী—বর্ধমান, নাট্য-পরিশিষ্ট।

১৭। কৃষ্ণনাথ সিংহরায়—মাকালীপাড়া, মৃত্যু ১২৯৮ সালে ১৭ই চৈত্র, ভক্তি ও ভক্ত, ষট্চক্র প্রভৃতি।

১৮। কালীময় ঘটক—রাণাঘাট, ছিন্নমস্তা, চরিতাষ্টক প্রভৃতি।

১৯। কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী—নবদ্বীপ, নবদ্বীপ-মহিমা।

২০। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—কৃষ্ণনগর, শিক্ষাষ্টক প্রভৃতি রচয়িতা।

২১। কুসুমচন্দ্র দাস—মেহেরপুর, গল্পলেখক।

২২। কুমুদনাথ মল্লিক—রাণাঘাট, নদীয়া কাহিনী, লণ্ঠীঘাট।

২৩। কালীপ্রসন্ন প্রামাণিক—শান্তিপুর, রঙ্গাপ্যারিকা।

২৪। কালীনাথ মুখোপাধ্যায়—রাণাঘাট, মাণ্ডীমাহাত্ম্য।

২৫। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—লোকনাথপুর, হিতবাদী সম্পাদক।

২৬। কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ—গৌড়দর্পণ, বৈষ্ণবধর্ম, প্রেমপ্রদীপ, শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত প্রভৃতি।

২৭। কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—হরিপুর, চপলা কবিতা গ্রন্থ।

২৮। ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর, ঐতিহাসিক উপন্যাস।

২৯। গোপালচন্দ্র গোস্বামী—শান্তিপুর, অনুচিন্তু।

৩০। গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর, গল্পলেখক।

৩১। গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়—গরিবপুর, রাণাঘাট, অপর্ণা পরিমল।

৩২। গঙ্গারাম পণ্ডিত—আইসওলা কবির গান, পাচালী লেখক।

৩৩। চন্দ্রশেখর কর—কৃষ্ণনগর, অনাথ বালক প্রভৃতি।

৩৪। চন্দ্রশেখর বসু—(উলা) বীরনগর, অধিকারতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

৩৫। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—রাণাঘাটের, কুহুর লেখা, কমলাবেণু।

৩৬। চণ্ডীচরণ সে—শান্তিপুর, বীর আপানন্দ।

৩৭। জগদীশ গুপ্ত—(মেহেরপুর) মির্জাপুর, নীলাঙ্গুরীয়ক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

৩৮। জগন্নানন্দ রায়—কৃষ্ণনগর, লোকরাহস্য, বৈদ্যতিক।

৩৯। জগদীশচন্দ্র নাড়িয়ী—মামজিয়া, চিকিৎসাতত্ত্ব প্রভৃতি।

৪০। জগগোপাল মুখোপাধ্যায়—রাণাঘাট, কবির গীত।

৪১। জগগোপাল তর্কালঙ্কার—জন্ম, ১৭৭৪ খৃঃ ৭ই অক্টোবর, নদীয়া জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। ১৮৪৬ খৃঃ ১০ই এপ্রিল ৭২ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে পরলোক গমন করেন। শিক্ষাসার, চণ্ডী, বাল্মীকি কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পারমিক অভিধান, জ্যোতিষার প্রভৃতি।

৪২। জীবন সেন—১৮৩০ খৃঃ ১৬ই মার্চ নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে জন্ম হয়। ১৯০৬ খৃঃ ১৫ই মার্চ ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের সংখ্যা বড় কম নহে।

৪৩। জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—মুড়াগাছা, অন্যান্য অভিধন্ত।

৪৪। জগগোপাল গোস্বামী—শান্তিপুর—সীতাহরণ, শৈবলিনী প্রভৃতি।

৪৫। জীবানন্দ মল্লিক—রাণাঘাট, অভিষেক, ডিটেক্‌টিভ গল্প।

৪৬। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—কৃষ্ণনগর, পতাকা, নবপ্রভার সম্পাদক।

৪৭। তারাশঙ্কর তর্করত্ন—জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলার কাঁচকুলি গ্রামে। মৃত্যু ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বরে। তাঁহার গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নহে। সাবলি, কাদম্বরী, রাসেলাস প্রভৃতি গ্রন্থের নামই উল্লেখযোগ্য।

৪৮। তারাপদ রায়—কৃষ্ণনগর, তত্ত্বার্জুন নাটক।

৪৯। তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর, দার্জিলিং প্রবাসীপত্র।

৫০। তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়—নবদ্বীপ, ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৫১। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—জন্ম, ১৮৪৩ খৃঃ ১২শে অক্টোবর নদীয়া জেলার বাগআঁচড়া গ্রামে। ১৮৯১ খৃঃ ২২শে সেপ্টেম্বর পক্ষাঘাত রোগে উঁহার মৃত্যু হয়। বঙ্গসাহিত্যের বিখ্যাত রাজরেখা নাটে তাঁহার নশ্বর দেহ বিলীন হইয়াছিল। সাহিত্যিক ত' ছিলেনই, সর্বোপরি ছিলেন রহস্যপটু। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—স্বপ্নে ও সমাধি হইতে উপকরণ লইয়া সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার স্বর্ণলতাই বাংলাদেশের সামাজিক উপন্যাস—এই একটিমাত্র উপন্যাসের দ্বারাই তিনি যশস্বী হইয়াছিলেন।

৫২। দীনবন্ধু মিত্র—জন্ম, ১২৩৬ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া রেল-ষ্টেশনের নিকটবর্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে। মৃত্যু ১৮৭৩ খৃঃ ১লা নভেম্বর। তাঁহার নিমচাঁদ, সধবার, জলধরচাঁদ, মেহেরচাঁদ, নীলদর্পণী বাঙ্গালীর চৈরশ্চিন জীবনেও সজীব। তাঁহার সধবার একাদশী, জামাই-বারিক, বাংলাদেশের সে যুগকেও এযুগে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার নীলদর্পণ আজ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে।

৫৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ ১৯শে জুলাই নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে। ১৯১৩ খৃঃ ১৭ই মে অপরাহ্নে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার সংজ্ঞালোপ পায়। প্রধানতঃ তিনি নাট্যকার এবং হাসির গান ও স্বদেশী গানের রচয়িতা। সাহিত্যের অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শকের গৌরব দাবী করিতে পারেন। বহু পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন। নাটকে তাঁহার নিজস্ব একটা ভঙ্গী প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

৫৪। দীনেন্দ্রকুমার রায়—জন্ম মেহেরপুর: পল্লীচিত্র, বহু ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

৫৫। দীননাথ সান্যাল—১৮৫৪ খৃঃ কৃষ্ণনগরে জন্ম ও ১৯১১ খৃঃ মৃত্যু হয়। মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা, সীতা প্রভৃতি।

৫৬। দীনবন্ধু প্রামাণিক—শান্তিপুর, পল্লবালা।

৫৭। দামোদর মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর। মুখরা সোনার কমল, মা ও মেয়ে প্রভৃতি।

৫৮। দ্বারিকানাথ অধিকারী—গোস্বামী দুর্গাপুর, সুধীরঞ্জন।

৫৯। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(উলা) বীরনগর, গঙ্গাতরঙ্গিণী তরঙ্গিণী।

৬০। নরোত্তমদাস ঠাকুর—নবদ্বীপ, বৈষ্ণব পদাবলী।

৬১। নলিনীমোহন সান্যাল—শান্তিপুর, জন্ম ৩রা কার্ত্তিক ১২৮৮ সন ইং ১৯।১০।১৮৮১, মৃত্যু ১৯শে আষাঢ় ১৩৪৮ সন ইং ৩।৭।১৯৪১ বহু পুস্তক রচয়িতা।

৬২। নিরুপমা দেবী—হালুকা, দিদি, অন্নপূর্ণার মন্দির প্রভৃতি।

৬৩। প্রেমদাস বা পুরুষোত্তমদাস মিশ্র—কুলিয়া নবদ্বীপ, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় অনুবাদক।

৬৪। প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়—নারায়ণপুর, ব্রাহ্ম ও হিন্দু প্রভৃতি।

৬৫। প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—আমুলিয়া, নীলাম্বর, অহোম্ ইত্যাদি।

৬৬। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—চুয়াডাঙ্গা দাবদ্বিতিলাম, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

৬৭। বাসুদেব সার্বভৌম—নবদ্বীপ, ন্যায়শাস্ত্র কুসুমাঞ্জলী।
৬৮। বৃন্দাবন দাস—নবদ্বীপ, বিদ্যানিধি বাগীশ।
৬৯। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—বেলগ্রাম, কার্যধিনী প্রভৃতি
৭০। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—মাটিয়ারী, ভাবনীলামৃত গ্রন্থ।
৭১। বেণীরাম লাহিড়ী—শান্তিপুর, সংগ্রহ ও সম্পাদন।
৭২। বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত সরস্বতী—ঘাসপুর, বঙ্গে সামাজিকতা।
৭৩। বেণীমাধবলাল গোস্বামী—শান্তিপুর, বিচুড়ী পোলাও প্রভৃতি।
৭৪। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—শান্তিপুর, ধর্মগ্রন্থ লেখক।
৭৫। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর—১১১৯ সালে (১৭০৪ খৃঃ) জন্ম। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে নড়াজাহানের পুঁথি রচনাই তাঁহার প্রথম রচনা। তাঁহার অন্নপূর্ণামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, তাঁকে অমরত্ব দান করে। ১১৬৭ সালে (১৭৬১) ৪৮ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন।
৭৬। ভূদেব গোস্বামকর—হরিপুর, সঙ্গীত রচয়িতা।
৭৭। মদনমোহন তর্কালঙ্কার—জন্ম ১৮১৭ সালে নবীনার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ বিদ্যগ্রামে। ১৮৫৮ খৃঃ ৯ই মার্চ কলিকাতে মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে সাহিত্য ও সমাজ হইতে দূরে চলিয়া গেলেও প্রথম জীবনের কীর্তি তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। কিন্তু শিক্ষায় তাঁহার দান অস্বীকৃত হইবে না। সারস্বতকার কবিকে আমরা ভুলিতে পারি না। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন।
৭৮। মদনগোপাল গোস্বামী—শান্তিপুর, চৈতন্যচরিতামৃত।
৭৯। মীর মশার্রফ হোসেন—জন্ম ১৮৪৭ সালে ১৩ই নভেম্বর, নদীয়া জেলার গৌরীতটস্থ লাহিনীপাড়া গ্রামে। ১৯১৮ সালের শেষ ভাগে মৃত্যু হয়। গ্রন্থের মুসলমান সমাজে তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁহার বিষাদসিন্ধু যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল সাধনা সাহিত্যের সেবা করিয়া ৪৮ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।
৮০। মাধবনাথ ভট্টাচার্য—নবদ্বীপ, পদার্থদর্পণ, বহু মুদ্রণপাত্র।
৮১। মতিলাল রায়—নবদ্বীপ, রামবনবাস, রাবণবধ ইত্যাদি।
৮২। মণিমোহন ভট্টাচার্য—রাণাঘাট, প্রবাস, বেলা প্রভৃতি।
৮৩। মোহনচন্দ্র চক্র—শান্তিপুর। কেরোসীন চরিত, কার্তীক মঙ্গল প্রভৃতি।
৮৪। যোগেন্দ্রলাল রায়—কৃষ্ণনগর, পঞ্চানেন্দ্রক।
৮৫। যদুনাথ রায়—কৃষ্ণনগর পত্র লেখক।
৮৬। যদুসূদন তর্কপঞ্চানন—বহিরগাছি, বাঙ্গালোপাধ্যায়।
৮৭। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—১৮৪৪ সালে ২৯এ জুলাই রাণাঘাট সাবডিভিসনের অন্তর্গত শিমরাই গ্রামে মাতামহের আলয়ে জন্ম। ১৯ই জুন ১৯০৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। রচনাবলীর মধ্যে প্রধানতঃ অমরপ্রেম অভিব্যক্ত হইয়াছে।
৮৮। রামেন্দ্র বিদ্যানিধোন—কুমারখালি, হিতকথা, প্রকৃতিশিক্ষা, (কবিরাজ) নীতিস্বরক ইত্যাদি—
৮৯। রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—মাটিয়ারী, রামায়ণ অনুবাদক
৯০। রঘুনাথ শিরোমণি—নবদ্বীপ নবন্যায় ইত্যাদি
৯১। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য (স্মার্ত)—নবদ্বীপ, স্মৃতি গ্রন্থেতা।
৯২। রামপ্রসাদ সেন (সাধক)—কৃষ্ণনগর মহারাজার সভাকবি।
৯৩। রাধিকাপ্রসন্নমুখোপাধ্যায়—গোস্বামীদুর্গাপুর,ভূবিদ্যা,ধাত্রীরক্ষা।
৯৪। রামনাথ তর্করত্ন—শান্তিপুর, বাহ্যবস্তুবিজ্ঞান প্রভৃতি।
৯৫। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮১৩ খৃঃ ৩১শে অক্টোবর নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামীদুর্গাপুর গ্রামে। ১৮৮৯ সালে ১০ই অক্টোবর মৃত্যু হয়। তিনি বাংলা পদ্যে ও গদ্যে সমভাবাপন্ন ছিলেন।
৯৬। হরিদাস মুখোপাধ্যায়—বিদ্যগ্রাম, রূপের মোড়।
৯৭। লালনশাহী ফকির—ভাড়ারাকুষ্টিয়া, সাধন সঙ্গীত।
৯৮। লোকনাথ শিরোরত্ন—কৃষ্ণনগর মালতীমাধব, শিশুবোধ
৯৯। ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—কাঁচকুলি পাগলাডোরা কাষায়হরা প্রভৃতি।
১১০। ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগর সুধাস্মৃতি, সুধাকণা প্রভৃতি।
১০১। লালমোহন বিদ্যানিধি—জন্ম ১২৫১ সালের চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে। নদীয়ার বনগ্রাম সাবডিভিসনাম মহেশপুরে জন্ম। ১৩১৩ সালে ১২ই আশ্বিন রাত্রি ৪।০ ঘটিকায় শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ইহধাম ত্যাগ করেন। কাব্য নির্ণয়, সমস্ত নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ।
১০২। শরোজিনী রায়—১২৯২ সালে ৪র্থ কার্তিক রবিবার রাত্রি ৯টার সময় বহরমপুরে জন্ম হয়। কিন্তু শেষ জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত করেন। ৬২ বৎসর বয়সে অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় যান এবং তথায় ১৩৫৯ সালে ১২ই ফাল্গুন বুধবার বেলা ৭।০ সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। বহু গান, কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। অঞ্জলি।
১০৩। শিবচন্দ্র মহারাজা—কৃষ্ণনগর, সাধন সঙ্গীত।
১০৪। শ্রীশচন্দ্র মহারাজা—কৃষ্ণনগর, সাধন সঙ্গীত।
১০৫। শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—নবদ্বীপ, পদ্যানুবাদ।
১০৬। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী—নবদ্বীপ, শঙ্করাচার্য্য চরিত প্রভৃতি।
১০৭। শিবনারায়ণ শিরোমণি—নবদ্বীপ, সংস্কৃত কবিতা।
১০৮। শ্যামাধর রায়—কৃষ্ণনগর, কবি রসসাগরের জীবন চরিত।
১০৯। শিবনাথ শাস্ত্রী—নবদ্বীপ, মেজবৌ, নয়নতারা প্রভৃতি।
১১০। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—কুমারখালি, শৈবী গীতাবলী।
১১১। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—নবদ্বীপ, আয়সূত্র প্রকাশ
১১২। সুধীধর দাস—নদীয়ার রাজাপুর গ্রামে জন্ম হয়। বহু সাধন সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। হাতে লেখা নাকাশীপাড়া কাহিনী হইতে তাঁহার অবস্থান জানা যায়।

"কাল্লু কুলেতে জন্ম রাজপুরে বাস,
রামনারায়ণ পুত্র জগন্নাথ দাস।
বিপ্র দুর্গাচরণ মহারাজগুরুধাম,
তস্য পুত্র সুধীধর দাসচন্দ্র নাম।"

১১৩। শ্যামাচরণ সরকার—মাসকোলাবী গ্রাম, ব্যবস্থাপার সংগ্রহ
১১৪। শরৎশশী দেবী—কন্যা (কুষ্টিয়া), কবিতা রচয়িত্রী
১১৫। সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—অমরপুর (চুয়াডাঙ্গা মহকুমা), ভিষগাচিন্তী, হেমচন্দ্র, ভিষরত্না, শিক্ষা ও সাধনা প্রভৃতি।
১১৬। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—আইসমালি গ্রাম, সাহি ভিষরত্না প্রভৃতি।
১১৭। হরনাথ মিত্র—কৃষ্ণনগর, রহস্য সন্দর্ভ।
১১৮। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়—শান্তিপুর, টডের রাজস্থান।
১১৯। হরিনাথ মজুমদার—জন্ম ১৮৩৩ খৃঃ নদীয়ার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে। ১৮৯৬ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল পুণ্য অমর তৃতীয়ার ৬৩ বৎসর বয়সে কাঙ্গাল হরিনাথ সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। তিনি আমরণ লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। মেঘের কাজে তাঁহার আগ্রহ বেশী ছিল। যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে বিজয় বসন্ত, পল্লীপুরস্কার, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ, কবীরের গীতাবলী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছেঁপী

শ্রীমতী বীণা দে

এক

ঘাটের পথে একা চলেছি। খেয়ে উঠতে বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। দুপুরের সঙ্গী সে-ক'জন বৌ সকলেই চলে গেছে যে যার বাড়ীতে।

বাড়ীর পাশের পুকুরটি চৈতের আগেই শুকিয়ে উঠে—অন্তর্নিহিত বড় বড় পাথর ক'খানি চোখের সামনে জাগিয়ে দিয়ে সার্থক ক'রে তুলেছে তার 'পাথুরে' নামটি। একরত্তি জল চিক্‌চিক্ করছে তার বুকের মধ্যে, ঐ তপ্ত পাথরের নুড়ি ভরতি উঁচু পাড় ভেঙে আর নামতে ইচ্ছে হয় না।

উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এক-একবার তপ্ত-ঝলকে হাওয়া আসছে—সঙ্গে ব'য়ে আনছে তালগাছের খড়খড়ে শুকনো ঝাঁকড়া মাথা নাড়ার শব্দ, ঘুঘুর ডাক—আর গানের এক কলি—"আছে যমুনার জল সরে না ম-অ-অ-ন্"। 'আনতে যমুনার জল'—ঐ একটী লাইনই কেবল বারে-বারে ঘুরে-ঘুরে কানে আসছে। মন-এর উপর টানটা খুব জোর। গলাটি খুবই মোটা, তবুও বোঝা যায়—মেয়েরই গলা। সুরটা ভেসে আসছে 'নতুন পুকুর'-এর দিক থেকে।

চল্‌লুম 'নতুন-পুকুর'-এর দিকেই।—একটু হাঁটতে হবে, তা হোকগে, তবু তো বেশ জল পাব।—চারদিকে তালগাছ। বেশ ছায়া আছে।—মানুষও আছে।

গিয়ে দেখি, ডোমেদের মেয়ে 'ছেঁপী' গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে, মাছ না শুগ্‌লি কী তুলছে। পিছনে একটা হাঁড়ি ভাসছে, আর সে উচ্চৈস্বরে তার ভাঙা মোটা গলায় গান গাইছে—'আছে যমুনার জল সরেনা ম-অ-অ-ন্'। দ্বিতীয় প্রাণী কেউ কোথাও নেই···

"ও ছেঁপী কী করছিস ?"

"শুগ্‌লী তুলছি গো বোওমা, আপনি এত খরায় আইছ কেনে ?" জল থেকে গা তুলে ছেঁপী একমুখ হেসে সামনে দাঁড়ায়।

নিটোল স্বাস্থ্য। ভরাট যৌবন ছেঁপীর বেঁটে খাটো মোটা শরীরটায় যেন আর ধরছেনা। একখানা পাথরকে কুঁদে কেটে, পিটিয়ে ছোট করে কে যেন গড়েছে মেয়েটার এই দেহখানা। গোল চাকাপানা মুখে ছোট্ট একটু ধ্যাবড়া নাক, কুলো কুলো গাল, পুরু পুরু ঠোঁট আর কুঁৎকুতে কালো চোখ দুটিতে খুসীর হাসি যেন উপ্‌চে উঠছে। পরনে একখানি ছেঁড়া গামছা, কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হাঁড়ি, জল থেকে উঠে দাঁড়াতেই সে হাঁড়িটা তার পিছনে ঝুলতে লাগল।

তার প্রাচুর্য্য-ভরা দেহটার দিকে মুগ্ধচোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, "কী রে কত শুগ্‌লি পেলি ? কী দিয়ে রাঁধবি ?"

"তা' বেশ পেয়াছি গো বোওমা।—পুঁস্থ দিঁয়ে রাঁধব। আমাদের দু'মানুষের অনেক হবে। থালভরা পুঁস্থ শুগ্‌লী পেলো ঘা' ভাত খায় গো বোওমা ? একটা হোঁড়োলা ঠাসা ভাত খায়েক আজ।"

ছেঁপীর পরিপূর্ণ তৃপ্তিভরা মুখে তার সোহাগের থালভরা অর্থাৎ স্বামী হরিপদা মীরদ্দার অসামান্য পোক্ত-শুগ্‌লি প্রীতির গল্প শুনতে শুনতে ভাতখেগো কাপড় কেচে গা ধুয়ে ভরাকলসী কোমরে তুলে যখন বাড়ীর দিকে পা বাড়ালুম, ছেঁপীর ভাষায় তখন—দুকুরে-খরা মরো আনছে—

দুই

দিন দশেক পরের কথা। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বার দুয়োরে ছড়া দিয়ে—উঠোনে মাদুলি দিচ্ছি—হৈ হৈ করে সারা ডোমপাড়া একেবারে উঠোনে হাজির—

"টাঠিয়ামশাই, টাঠিয়ামশাই গো—আমরা আলছি—

বিচার করে স্থান—বিচার করেন ন্যায় বিচার"—বলতে বলতেই নিজেদের দুই দলের মধ্যে গালিগালাজ চেঁচামেচি সুরু করে দিল।

চাটুজ্যেমশাই—আমার শ্বশুর—গাঁয়ের মধ্যে মুরুব্বি মানুষ, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট, এক কথায় গাঁয়ের মাথা। এ গাঁয়ের লোক কথায় কথায় কেউ হুমকা দৌড়য়না। গাঁয়ের ঝগড়া গাঁয়েই মিটিয়ে নেয়। গ্রাম থেকে হুমকার পথ দূর ও দুর্গম, দুই-ই বটে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন বাস চলাচল সুরু হয়নি। নেহাৎ ভদ্রলোকের বাড়ী চলে যা খুব বড় কিছু ব্যাপার ঘটলে তবেই লোক থানা-আদালত করতে হুমকা ছোটে।

চাটুজ্যেমশায় এসে দাড়াতেই, আবার একবার দুইদলে হৈ-হৈ চেঁচামেচি করে উঠল। একদলে, চার পাঁচজন লোক হরিপদাকে চেপে ধরে আছে। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা, ছেঁড়া-কাপড়পরা, আলুথালু কাঁকড়াচুল, রক্তচক্ষু নিয়ে হরিপদ চেঁচাচ্ছে, আর মাঝে-মাঝে ছেপীর দিকে তেড়ে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে···

অন্যদলে চার পাঁচজন স্ত্রীপুরুষে ছেপীকে ধরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। ছেপী তার ভাঙা মোটাগলায় একটানা গালাগালি দিয়ে চলেছে—"নাবুনি নাদুক খালভরা —আমাকে বলে কিনা শাশুকেমুখী? একদিন এক দলান ভাত দিতে পারলেকনি মাথায়, আজ আসছে মাথায় লাদনা ভাঙতে? ভাত দেবার ভা—তন্ কীল মারবার গোসাই" ইত্যাদি।

তার কপালে শুকনো রক্তের দাগ, মাথায় ছেড়া ময়লা পটি বাঁধা। কালামাখা খোলাচুল, কোলা চোখে জলের চেয়ে ক্রোধেরই প্রকাশ বেশী। ছেপী রাগে মাটীতে পা ঠুকছে—দাঁতে দাঁত ঘষছে আর চেঁচাচ্ছে—

গাঁয়ের আরো পাঁচজন মুরুব্বিলোক জড়ো হয়ে বসার পর, দুইদলের বাদবিতণ্ডা ও নালিশের মধ্যে থেকে যা উদ্ধার হল, তার সারমর্ম ;—হরিপদার কথা হচ্ছে, ছেপী তার বিয়েলো বৌ বটে, কিন্তু এদানিকে তার ব্যাভার বড়ই খারাপ। সে ঘুমুরিদের মত ভোমরাপেড়ো কাপড় চায়, রূপিপাতা মাকুড়ি চায়। চুলে তার নিত্যিদিন তাল চাই। সবচেয়ে রাগের কথা—আলকাটার কাপ এর সেই বদ ছোড়া তার চাহনির মুখের দিকে ছেপী হাঁ করে তাকায়। এমন কি দু' একদিন তার সঙ্গে মস্করা করতেও যেন দেখেছে। আজ দু'দিন থেকে আবার ভাতও রাঁধছে না, সাঁঝ লাগলেই ঘুম···

আর ছেপীর কথা হচ্ছে—আগে যখন খালভরা চরণ-বাবুদের বাড়ী মাদিন্দারি করত—তখন বাবুদের দেওয়া ধানে তাদের ছ'মাসের খাবার বেশ পুয়োপেট চলত—হরিপদা বাবুদের বাড়ী দিনে ভাতমুড়ী খেত—রেতো একবেলা ঘরে খেত। ছেপী ধানভেনে ঘোসি বেচে শাক-শুগ্‌লি তুলে নিজেরটা বেশ করে নিত।—মাঝে মধ্যে পালপার্বণে মনিব-বাড়ী যেত—ভালমন্দ খেতে পেত দু' একখানা পুরনো শাড়ীও দিত বৌঠাকুরুণরা। সাঁঝ লাগলেই হরিপদা মাথায় তাল বয়তে বয়তে ঘরে ফিরত। যা রাঁধত ছেপী, তাই সোনামুখ করে খেত। আর, আজকাল—বাবুদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়ে দিনমজুরী করতে লেগেছে। ভিনগাঁয়ে 'দলান' এর কাজে সারাদিন খেটে ঘাট পয়সা পায়, সন্ধে হলেই গিয়ে পচুইএর দোকানে বসে। পয়সা পত্তর কোথায় যেছে ঠিক নেই—বাড়ী এসে বলে—ভাত দে। ভাত কোত্তি পাব? পয়সা চাইলেই রাগ মাথায়। সাতদিনে মাথায় একদলান তাল দিলেকনি, পরনে একখান কাপড় দিলেকনি—উ-মরদের ঘর কে করবেক? যে যাবেক যাক্—ছেপী কয়।

অনেকক্ষণ বকাবকি চেঁচামেচির পর, শেষে ঠিক হ'ল হরিপদার ধাড়ম্ অর্থাৎ জও দিতে হবে, পাঁচটাকা। তিন টাকায় ছেপীকে একখানা কাসিপাড় শাড়ী কিনে দেওয়া হবে, দু'টাকা খরচ করে ছেপীর বাপ মা আত্মীয়স্বজনদের জল খাওয়াতে হবে। সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হরিপদাকে বলতে হবে যে ছেপীকে আর মারধোর করবেনা। আর ছেপী হরিপদার ঘর করবে!

বেশ তাতেই রাজী। কিন্তু টাকা এখনি চাই, নইলে ছেপীর মন রাজী হয় না। হরিপদা মুখ শুঁজে বসে পড়ে। বলে টাকা কোথায় পাই? শুধু হাতে তো কেউ দাওলাত দেবে না?

আমি শ্বশুরমশায়ের কথামত পাঁচটি টাকা বার করে দি। হরিপদার হাতে দিয়ে তিনি বলেন—"এইনে ছেপীর হাতে দে।—আর মনে রাখিস, দুমাসের মধ্যে আমার টাকা ফেরৎ চাই, তা নয়তো কুড়ি দিন ব্যাগার দিতে হবে।"

হরিপদ এসে তাঁর পায়ের গোড়ায় ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বলে—'আজ্ঞে মশায় আমি তো আপনারই, আপনার হুকুম আমি মাথা পেতো নিব'।

ছেঁপীর হাতে টাকা দিতেই ছেঁপীদের দল থেকে একজন বলে উঠল—কুকুর করে ভেক্। অপর সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—যার মেয়্যা সে লেক্। হরিপদ গিয়ে ছেঁপীর হাত ধরে নিজের দলের দিকে নিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে হৈ হৈ করতে-করতে বেরিয়ে গেল।

প্রায় মাস পাঁচ ছয় পরের কথা। হরিপদা আমাদের বাড়ী মুনিষ খাটে, জমীতে কাজ করে। কারণ, সেই পাঁচ টাকা আর শোধ করতে পারেনি। হঠাৎ একদিন শুনলুম, ছেঁপী পালিয়ে গেছে—কোথায় গেছে কেউ জানে না। কেউ বলে, কুমরির দলে গেছে—কেউ বলে, আলকাটার কাপএর ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে; কেউ বলে, মল্লার-পুরের ইষ্টেশনে দেখে এসেছে প্যাজ ফুলুরি ভাজছে, ইত্যাদি আরো কত কী।

তিন

বছর তিনেক পর—পিত্রালয়ে চলেছি। ন'মাইল রাস্তা। গোঘাটে এসে, রামপুরহাট ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করছি। ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরী।

হঠাৎ পিছন থেকে—'পেন্নাম হই, কেমন আছেন গো বোওমা'—বলে, কে যেন পরিচিত সুরে ডাক দিল।

ছেঁপীর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম। হঠাৎ এই অভিনব বেশে তাকে দেখে অবাক। তার পরণে ঘন নীলরঙের শাড়ি, সামনে কুঁচি আর ঘুরিয়ে আঁচল দিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েদের মতন করে পরা। গায়ে পুরোহাতা গোলাপী রঙের জামা। দু'হাতে একগোছা করে কাঁচের রেশমি চুড়ি। মাথার চুলটি বাঁকা সিঁথি কেটে পরিপাটী করে আঁচড়ানো। আরো যেন মোটা হয়েছে। চোখের দৃষ্টি বদলে গেছে। গায়ে বিড়ির গন্ধ।

বললুম, কী রে ছেঁপী কেমন আছিস? কোথায় আছিস? গাঁয়ের কথা মনে হয় না?

সত্যি কথা বলতে কি বোওমা, গাঁয়ের লেগে আমার খুব মন ঘোরে। আবার গাঁয়ের লোক দেখলেই সানকাড়ি বুখ হকোই, পাছে চিন্তে ফেলে। পালিয়েঁ। আলছি তো?' বোলে একটু কুণ্ঠার হাসি হাসে।

'তা' আমায় দেখে যে সানকেড়ে পালালিনি—আমি বুঝি গাঁয়ের লোক নই?'

'ওমা তা কেনে—আপুনি আমাদের গাঁয়ের লোক লও তো কী? গাঁয়ের নরুকিবরের বৌ বট তুমি। তা লয়, তোমাকে দেখেই আলান যে, দুটো কথা বুলে গাঁয়ের খপর শুধোই যা। তুমি তো মা স্বাবতাতেন লোক। শরীলে কত দয়া। ছোটনোক আমাদেরকে ডেকে যা কাড়ো, ভালমন্দ শুধোও, আর কে তা করে বল? তোমার কথা বোওমা খুব মনে হয় আমার'। কথার শেষের দিকে তার গলাটা যেন কেঁপে যায়।

বলি, 'ভাল আছিস তো বেশ? কেমন লোক? কী করে? আদর যত্ন করে তো?'

বলে,—'হেঁ তা ভালই আছি—যার সাথে আলছিলাম তার কাছে তো নাই।—সে ঠগ—তার ঘরে তিন বেটা বিটি, বিয়েলো বৌ, সে বৌ আবার পোতি—বুড়ি না—ঘরে ভাতজল করার লোক নাইকো। ধান ভেন্তে পাত কুড়িয়ে। ভাতজল কর্য্যে মরি। খাবার বেলায় ভাত নাইকো, মাখার বেলায় তাল নাইকো—আর, দিনরাত কাজিয়া—'

একটু থেমে আবার বলে, 'এখন ভালই আছি, যার কাছে আছি, সে একটো বুদ্ধিমান লোক—ভাল চাকুরে। সায়েব সুবোর সাথে কথা কয়—ভদ্দরলোকের মত সক্কলা গায়ে পিরান—'ইত্যাদি। তার ভাষায় সে তার বর্ত্তমান পুরুষটির অনেক কিছু গুণ-গরিমার পরিচয় দিল।

মোদ্দাকথায় জানলাম যে, সে যার কাছে এখন আছে, সে ডাকবাংলোর চৌকীদার। ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই তাদের থাকবার ঘর, দুজন থাকে। লোকজন সায়েব সুবো এলে, চৌকীদারই মুর্গী কাটে, রাঁধে—বেশ ভাল রাঁধতে জানে। লোকজন এলে ছেঁপীও বেশ ভাল খুসবুইওলা মাংস, অর্থাৎ গরম মশলাযুক্ত মুর্গী খেতে পায়। নিজেরা মুর্গী পুষেছে, তার ডিম সায়েবদের কাছে বিক্রি করে। ছেঁপীরা দু'বেলা চা খায়—মাটীর ভাঁড়ে বা টিনের মগে নয়—কেঁচের বাটীতে অর্থাৎ পেয়ালা পিরিচে। ছেঁপীর ঘরে এলুমিনির বাসন আছে। রাতে ডিবি জ্বালতে হয় না, ঘরে হ্যারিকল আছে। চৌকীদার তার কানে সোনার

বেলেঘড়ি, নাকে চিঁড়িতন গড়িয়ে দিয়েছে। খাতির যত্নও করে। তবে—ছেপী সারাক্ষণ ঘরের কাজ নিয়ে ঘরের মধ্যে থাকতে পারে না—ছেলেপিলেও হয়নি, মন ছটফট করে। আজ দু'মাস হল ডিপুটি সাহেবের বাড়ী কাজ নিয়েছে—ছেলের কাজ। তারা ওকে ডাকে আয়া বলে। জামা কাপড় তারাই দিয়েছে, চৌকীদারের এতে মত নেই তেমন। বলে, 'তোর অভাব কিসের? কাজ করবি কেনে?' কিন্তু ছেপীর খুব ভাল লাগছে কাজ করতে। সে তাদের সবঘরে ঢুকতে পায়, তারা ছেপীর ছোঁয়া ভাত খুব সখ খায়। রবিবারে সেজেগুজে গির্জে যায়। ছেপীও ছেলের ঠেলাগাড়ি ঠেলে সঙ্গে যায়। ছেলেটাকে খুব ভালবাসে। সেখানে কাজ ক'রছে বলেই তো ইষ্টেশনে বেড়াতে আসতে পেল—তাতেই তো আমায় দেখতে পেল—ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করি, এ কাজ ছোগাড় করলি কী করে?

বলে, সাহেববাড়ীর বাবুর্চি আসছিল মুর্গী কিনতে। তাঁপর সে রোজই খরারবেলা আসত, বসত, ডিম কিনত। সেই ঠিক করে দিল কাজটা। লোকটি বেশ ভাল। আমাকে চা খেতে দেয়, কাজ বুঝে যায়। সেই তো ছিনছাম থাকতে শিখোলেক···

ছেপীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের গল্প শেষ হতে না হতেই ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল।

ট্রেনে ওঠবার সময় পর্যন্ত ছেপী প্রায় কাছে কাছেই রইল। আমি উঠে বসতে, সেও একবার কামরার মধ্যে ঢুকে আবার তাড়াতাড়ি নেমে গেল। বললে, কখনও কলগাড়ীতে চাপি নাই, ভাগ্যি আজ আলছিলাম তাই আপনার সাথেও দেকা হ'ল—কলগাড়ীতেও চাপা হ'ল—

ট্রেন ছাড়ার পর যতক্ষণ দৃষ্টি যায়—দেখলাম ছেপী একদৃষ্টে গাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।···

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই চৈতের দুপুরে নতুন পুকুরে গুগ্‌লি-চয়ন-রতা ছেপী···

চার

প্রায় আঠারো বছর পরে আমরা ওঁর কর্মস্থল থেকে দেশের বাড়ীতে ফিরেছি। এই আঠার বছরে আমাদের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। দেশের পরিবর্তন আরো ঢের বেশী। মধুরাক্ষীর পরিবর্তনও বড় ছোটখাটো নয়। আমরা সদলবলে সিউড়ী এসেছি, মধুরাক্ষীর বাঁধ দেখতে।

সারকিট হাউস-এর বারান্দায় বসে আছি। সামনে বেতের টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সিভিলসার্জাই অফিসারের স্ত্রী মিসেস বাগ্‌চী বসে গল্প করছেন।

তাঁরা সারকিট হাউস-এর একরকম স্থায়ী বাসিন্দা বললেই হয়। বীরভূমে প্রায় দশমাস বদলি হয়ে এসেছেন সিউড়ী সহরে, তবুও ভালবাড়ি খালি পাননি। কাজেই সারকিট হাউস-এর ঘরেই অস্থায়ী সংসার গুছিয়ে বসেছেন। আমরা তাঁদেরই নিমন্ত্রিত।···

চা ও মিসেস বাগচীর গল্প দুই-ই বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় তাঁর ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—মা, মা, দেখ কের সেই পাগলিটা এসেছে।

মিসেস বাগ্‌চীর কথায় জানা গেল—এই পাগলির দৌরাত্ম্যে তাঁরা নাকি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। পাগলির মজা হচ্ছে—সে নাকি হাটে বাজারে, সাধারণ লোকের বাড়ীতে, কোথাও যায় না—ডাকলেও যেতে চায় না। তার ঝোঁক পালি—সারকিটহাউস, ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো, সিভিলসার্জন-এর বাংলো অর্থাৎ এককথায় সরকারী কোয়ার্টারস্-এর আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো। বিশেষ করে' তার সারকিটহাউসটার উপরেই রোখটা যেন বেশী। এমন কি ফাঁক পেলে যখন তখন ডাইনিং হল, বাবুর্চিখানার মধ্যেও ঢুকে পড়ে। চীনেমাটির বাসন এর উপরে নাকি সাংঘাতিক রকমের লোভ। ভাঙা কাপ, ডিসের টুকরো পেলে তখনি কুড়িয়ে ঝুলিতে ভরে। ছুরির অভ্যাসও আছে। অন্য কিছু নয় শুধু কাঁচের বাসন, চামচ আর খাবার জিনিষ। আর পাগলি বললেই, লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে।···

কথা হতে-হতেই পাগলি এগিয়ে এল। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহ, চাকা-চাকা ঘা ও চুলকানিতে ভরা। পা খুলো। বাঁ পাটাতে কী হয়েছে—লাঠি ধরে' খুঁড়িয়ে হাঁটছে। মাথা প্রায় ন্যাড়া—এখানে ওখানে শনের মত দু একগাছা চুল। কোটরগত চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পরনে শতছিন্ন কাপড়। গায়ে অতোধিক ছেঁড়া একটা জামা। জামার ডানহাতটা একেবারেই নেই।—

আসতে আসতে হেঁট হয়ে কী যেন একটা কুড়িয়ে

বাঁ-কাঁধে ঝোলানো প্রকাণ্ড পুঁটলিটার মধ্যে ভরল। বিড়্ বিড়্ করে কী বলতে বলতে এসে বারান্দার সিঁড়ির উপর ধপাস করে বসে, চায়ের টেবিলের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—স্থান স্থান চা স্থান তো খানিক।

মিসেস বাগচী আমায় ইঙ্গিতে বললেন—দেখুন মজা।

উঠে ঘর থেকে একটি খালি সিগারেটের টীন এনে তাতে চা দিতেই, পাগ্‌লি মাথা নেড়ে বলে' উঠল, 'মগে লয়, মগে লয় কেঁচ্যের বাটিতে চা খাব।'

'দেব না বাটি, মগে খাবিতো খা। না-খাবি তো যা' —মিসেস বাগ্‌চী বলেন।

পাগ্‌লি মুখখিঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে 'এঁহ্, না খাব্বি তো যা, অম্‌নি গেল্যেই হ'লা? চা খাবনা? আমার কি বাটি নাইখো? ভাবচো কি আমার কিছুই নাই?—হেই স্থাখ্‌ন্তে।'

বলে, ঝুলির ভিতর থেকে হাত্‌ড়ে একটি ভাঁটভাঙা কাপ বার করে চা ঢেলে নিল।

চাপরাসী এসে তাড়া দিল, এই পাগ্‌লী ফের এসেছিস? যা উঠে যা।

রেগে লাঠি নিয়ে পাগ্‌লি তেড়ে যায়—খালভরা ফের পাগলী? কেনে আমার কি নাম নাই? আমি কেনে পাগলি হ'তে যাব? তোর মা-বুন পাগল হোক, তু পাগল হ আধামুখো।

আমার যেন কী রকম মনে হয়। ডেকে বলি বিস্কুট খাবি-চায়ের সঙ্গে?

পাগলি খুসীতে ভরে ওঠে—"হেঁ মা খাবো, আহা তুমার কথা কীবে মিষ্টি মা! কেউ একটা ভালকয়ো বা কাড়েনা গো বাছা। খালি বলে—পাগলী দূর দূর।"

বিস্কুট দিয়ে বলি—তোমার নাম কি? লোভী ছোট্ট-মেয়ের মত বিস্কুটে কামড় দিয়ে, দুলে দুলে নিজের নাকে হাত বুলিয়ে বলে—আমার নাম? ছোটতে আমার নাকটো খুব ছুটুই পারা ছিল তো, তাথেই মা বুলতো ছেঁপী। সেই হতে সব্বাই বল্‌ত ছেঁপী। গাঁয়ের মধ্যে এই ছেঁপী বুল্‌লে সব্বাই চিন্‌ত আমাকে। আমার জান্‌তো-না এমন লোক নাইখো। চৌকীদার আবার সগ করো, বুলত ছেঁপু। কুন দিকে সে গেল? তাথেই খুঁজতে আমার এই—'

আমার সন্দেহ সত্য হল। এই সেই ছেঁপী! চোখের সামনে ভেসে উঠল,রামপুরহাট ষ্টেশনের সেই ছেঁপীর ছবি।···

চোখের দিকে চেয়ে বলি—'হ্যাঁরে ছেঁপী তোদের গাঁয়ের সেই চাটুয্যেদের বড়বৌকে তোর মনে পড়ে? সেই নতুন পুকুরের ঘাটে থাকে গান শোনাতিস? গাঁয়ের কথা মনে আছে তোর?'

পাগলী খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে, কী যেন খোঁজে। তার দৃষ্টি ঘায় বদ্‌লে। হাউ হাউ করে কেঁদে পাগলি পায়ের কাছে এসে আছ্‌ড়ে পড়ে,—'মাগো তুমিই সেই—তুমি সেই বড়বোওমা? মাগো তাই তোমার এমন মধুর রা। আমি সেই ছেঁপী গো মা—আরো জোরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে·····

কেঁদে-কেঁদে সে যা বলে, তাতে জানতে পারি—চৌকীদার-এর সুখের ঘরও বেশীদিন সে করতে পারেনি। ডেপুটীবাবুরা বদ্‌লি হবার সময়ে তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। চৌকীদার তাকে অনেক করে বারণ করেছিল, কেঁদেছিল, কিরে দিয়েছিল—সে শোনেনি। বাবুচির বুদ্ধিতে পড়ে, আর রেলগাড়ী চেপে নতুন সহর দেখার লোভে—সে সায়েবদের সঙ্গে শহরে অর্থাৎ বহরমপুরে যায়। সেইখানেই তার ভারি খারাপ ব্যামো হয়। বাবুর্চিটা ছিল যত নষ্টের মূল। সায়েব কিছু টাকা ধরে দিয়ে দুজনকেই চাকরী থেকে বরখাস্ত করে। বাবুর্চি তখন তাকে হাঁসপাতালে রেখে তার সর্ব্বস্ব চুরি করে, চৌকীদারের দেওয়া সেই বেলকুঁড়ি আর চুড়িগুলি পর্য্যন্ত চুরি করে কোথায় যে পালায় কেউ জানে না। যখন হাঁসপাতাল থেকে ওকে বার করে দিল—ভাল করে ও পথ চলতে পারে না। হাঁস-পাতালের এক মেমসাহেব দুটী টাকা দিয়েছিল। তাই নিয়ে টিকিট কেটে রামপুরহাটে আসে, চৌকীদার-এর খোঁজে। এসে দেখে, অন্যলোক সেখানে বাস করছে। সে নেই—কোথায় চলে গেছে—সেই থেকে ও খুঁজে বেড়াচ্ছে চৌকীদারকে···

ওর মনে হয়, এই সব সরকারী সায়েবদের বাড়ীর কাছেই সে কোথাও আছে। লোকের বাড়ী কাজ করতে গেলে কেউ কাছে লাগায়না। খারাপ রোগ দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়,অথচ খেতেও দেয় না! ছেঁপী কীকরবে? চৌকীদারকেই খুঁজে বেড়ায়।—বলি—গাঁয়ে যাবি ছেঁপী?

খানিক গুম হয়ে থেকে, মাথানেড়ে বলে—না। তার চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বড় কান্নাই কাঁদে, কে বলবে ছেপী পাগল!

সহজ মানুষের মতই বলে—না মা যাব না—গাঁয়ে আর এ মুখ দেখাব না। লোকেই বা আমায় গাঁয়ে ঢুকতে দেবে কেন মা? আমি তো পতিত—বাবুটি মোচলমান—

বলি—পাড়ায় ঢুকতে যাবার তোর দরকার কী? তুই আমাদের খামারে থাকবি, গোয়ালের পাশে চালা তুলে দেব। গোয়াল কাড়বি, খানার কাঁট দিবি, আগুনা নিকোবি, খাবিদাবি থাকবি—ইন্‌জেক্‌শন দিয়ে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যাবে—যাবি?

দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়ে সে বলে—না—বলতে-বলতেই চোখের দৃষ্টি আবার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

ঘর থেকে একখানা সাড়ি বার করে এনে দি তার হাতে। বলি, পর ছেপী কাপড়খানা।

সাড়িখানা হাতে নিয়ে প্রথমটা খুব খুসী হয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাড়ের বাহার দেখে, তারপরেই সেটাকে জড়ো করে থুলির ভিতর ভরে ফেলে বলে—থাক্ কাপড়খানা বোওমা, চৌকীদার এলে পরব। এখন পরলে লোকে মেরো কেড়ো লিবেক্। আগে খালভরাকে খুঁজ্যে বার করি—

বলতে বলতেই লাঠিটি তুলে নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়ল—যাই খুঁজ্যে দেখি তাকে—

বাড়ী ফেরার পথে মোটরে সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ময়ূরাক্ষীর অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ও বিপুল সম্ভাবনার কথা আলোচনা করে। আমিই শুধু নীরব। আমার সমস্ত মনটা নিয়ে ছুড়ে থাকে ছেপী।

আফ্রিকার বিদ্যাসাগর 'কোয়েগীর আগ্রে'

শ্রীসুমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible] বিশ্ব, আর সকল দেশের পুনর্গঠনরতের মতই দেখি এক-একজন জ্ঞান-পাগল, যাঁরা বাধা তুচ্ছ করে নিজেকে শিক্ষিত ক'রেছেন, সঙ্গে সমাজের সবার মনে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেবার জন্য জ্ঞানের প্রদীপ হাতে ছুটে বেড়াচ্ছেন।

আফ্রিকার এলে সাক্ষাৎ জেমস্ কোয়েগীর আগ্রের কথা। তাঁর ১৮৫৪ সালে ইংরেজ উপনিবেশ গোল্ড-কোষ্টের আনাবাবু গুও গ্রামে। তাঁর বাবা ছিলেন একজন স্থানীয় প্রধান; গুঁড়ো সোনা যোগাই ক'রতেন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের জন্য, আর সোনারীর কাজ ক'রতেন।

কোয়েগীর পিতার সপ্তদশ সন্তান, তাঁর মার চতুর্থ। নিরক্ষরা স্ত্রীর সংসর্গে লেখাপড়ার অসীম উৎসাহে, কোয়েগীর প্রাণ ক'রে, কাপড় বেচে নিজের খরচ চালিয়ে ১১ বৎসর বয়সে মাইনরি শুরু করেন। তাঁর ভাই বোনেরা কেউই লেখাপড়ায় এগুতে পারেন নি—অলস, বহু বিবাহ-রত, গাঁজা ও পানাসক্ত জীবনেই তাঁরা শেষ হ'য়ে যান। কোয়েগীর ২৩ বৎসর বয়সে আমেরিকায় যান উচ্চ শিক্ষার জন্য। সুবক্তা, ধার্মিক ও সচ্চরিত্র হিসাবে কোয়েগীরের খ্যাতি ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় তিনি ডিগ্রীর পর ডিগ্রী, খ্যাতির পর খ্যাতি অর্জ্জন ক'রে আফ্রিকার মুখোজ্জ্বল করেন। দুর্ভাগ্যবশত ৪৯ বৎসর বয়সে জন্মস্থান গোল্ড-কোষ্টের নূতন নামের বিখ্যাত কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ফিরে আসার পর মাত্র আড়াই বছর বেঁচেছিলেন। শেষ বয়সেও মিউইঙ্কে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির জন্য গবেষণারত নিবন্ধ লিখতে ফিরে গিয়ে, কয়েক দিনের মধ্যেই হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে অকালে মারা যান ১৯২৭ সালে। "আফ্রিকাতা" কলেজ আজ গোল্ড-কোষ্টের গর্ব্ব; সেখানে আগ্রেকে দ্বিতীয় সহকারী অধ্যক্ষপদ দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু তিনিই ছিলেন তার প্রধান।

কোয়েগীর তাঁর দেশ বলতে গোটা আফ্রিকা মহাদেশকে বরণ করেছিলেন। আফ্রিকার স্থানীয় ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-কলা-বৃত্তা-দীক্ষা তাঁর শ্রদ্ধার বিষয় ছিল; অনুকরণে তাঁর ঘৃণা ছিল, কিন্তু আফ্রিকার উন্নতির পথে যে সব বাধা তিনি দেখতেন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তাঁর দ্বিধা কখনো হয়নি। আধুনিক ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার বিস্তার তাঁর কাছে আফ্রিকার নবজীবন লাভের জন্য অত্যন্ত দরকারী মনে হ'য়েছিল; আর আফ্রিকান্ যে শিক্ষায় সবার সমান হ'তে পারে এরই প্রমাণ দেবার জন্য তিনি আমেরিকার নিগ্রো কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নূতন বিদ্যার চর্চ্চায় ব্যস্ত থাকতেন।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের নানা অসুবিধা ছিল, আগ্রে হাসিমুখে তা মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবন ও আচরণ "প্রতিবাদ করবার জন্য নয়—কালোর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য"—এই ছিল তাঁর কর্ম্মফলের ভিত্তি। "নিগ্রোজাতীর কর্ম্মবীর" বুকার ওয়াশিংটন আমেরিকার নিগ্রোর জন্য যা ক'রেছেন, আগ্রে আফ্রিকানদের জন্য তাই ক'রতে চেয়েছিলেন। দুবার তিনি আফ্রিকায় এক শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। সে সময় তাঁর বক্তৃতায় বহু আফ্রিকান সভ্যতার

আধুনিক শিক্ষার, বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার, প্রয়োজনীয়তা, বহু বিবাহের কুফল ও কারিক শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়। আজকের আফ্রিকার জাগরণের মূলে আমেরিকায় ও ইয়োরোপে আফ্রিকান শিক্ষার্থীদের ভিড়ের কারণ—এই অক্লান্ত কর্ম্মী, নিরলস, বিনয়ী, সদাহাস্যময় ও রসিক পুরুষ। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণী আমেরিকা থেকে আফ্রিকার কয়েক জায়গায় এসেছিলেন। আফ্রিকানরা আগ্রেকে কি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, তা দেখলাম শ্রীমতী আগ্রেকে সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ থেকে। আফ্রিকার ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে জন্মে, প্রত্যক্ষ রাজনীতির ও ক্ষমতার ঊর্দ্ধে থেকে, এই শিক্ষাবিদ্ এক মহামানবের শিক্ষা, সমাজ ও জীবন-দর্শনে বিপ্লবের সূচনা ক'রেছেন;—বিদ্যাসাগরের জীবনের কথা পদে পদে মনে করিয়ে দেয় বাঙালীকে।

আফ্রিকানরা গল্প-উপকথা-রসিকতার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশ ক'রতে ভালবাসে। আগ্রেও আফ্রিকান্-সুলভ রসিকতার মধ্য দিয়ে বা গল্প ও উপকথার নিজেকে প্রকাশ করতেন। এজন্য দেশ-বিদেশে তাঁর বক্তৃতার শ্রোতার ভীড় হ'তো। দুটি গল্প আগ্রে প্রায়ই ব'লতেন। প্রথমটি "ঈগলের আকাশ বিচরণ" নিয়ে। একটা পাখী পোষবার খোঁজে বেরুল একজন, চোখে পড়লো এক ঈগল ছানা। তাকে এনে হাঁস-মুরগীর সঙ্গে রেখে একই খাবার দিয়ে বড় ক'রতে লাগলো—যদিও ঈগল হ'চ্ছে পাখীর রাজা।

পাঁচ বছর বাদে একদিন এক বিজ্ঞানবিদ্ এসে ব'ললেন, "ভাই, এ তো ঈগল, একে মুরগী বানাচ্ছ কেন? লোকটি বোঝালো ওর আর ঈগলত্ব নেই। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ঈগলটিকে ধরে সাগ্রহে চিৎকার ক'রে ব'ললেন, "পক্ষীরাজ তুমি ঈগল, তোমার স্থান আকাশে, মাটীতে নয়, ডানা মেলে উড়ে যাও। ঈগলটা এদিক ওদিক তাকাচ্ছে,—হঠাৎ দেখলো মাটিতে মুরগীরা কুদ-কুঁড়া নিয়ে ব্যস্ত—সে দলে ভিড়ে গেল।

পরের দিন বিজ্ঞানী তাকে এক বাড়ীর ছাদে তুলে ওড়াবার চেষ্টা করলেন,—কিন্তু ঈগলের দৃষ্টি আবার ঐ মাটীতে-ছড়ানো খাবারের দিকেই গেল।

তৃতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের আগে এসে, বিজ্ঞানী সহরের বাইরে এক পাহাড়ের নিচে ঈগলকে নিয়ে হাজির হ'লেন। সূর্য্য সোনালী-ছটা পাহাড়ের উপর সবে ছড়িয়েছেন, এমন সময় তিনি ঈগলকে আকাশে উড়ে যাবার আহ্বান শোনালেন। ঈগলের চোখে ও দেহে এক নূতন ঝাঁপন এলো, কিন্তু তবু সে নড়ে না। সূর্য্য দেখা দিলেন, ঈগলের দৃষ্টি আবার সূর্য্যের দিকে ফেরানো হ'লো—হঠাৎ দুই পাখা মেলে, আপন ক্ষমতায় ও পাখার ঝাপ্টানিতে স্থির পর্ব্বতকে মুখরিত ক'রে, উঁচুতে আরও উঁচুতে ঈগল উড়ে গেল। মোরগ ছানার মত পালিত হ'লেও সে যে জাত-ঈগল তা তার স্মরণে এসেছে।

এই আখ্যানের পর আগ্রে হয়তো ব'লে উঠতেন "আফ্রিকার লোক," ভুলো না ভগবানের ছায়ায় আমরা পড়ি, মানুষ মোরগ ছানার মত রেগে গিলেও, যখনই সূক্ষ্মের তোমরা ঈগলের জাত তখনই তোমরা ডানা মেলে আকাশে উড়তে সুরু ক'রবে,—মোরগের কুদ-কুড়া আর তোমাদের টেনে রাখতে পারবে না।" কার মন এরকম কথায় সাড়া না দেয়?

দ্বিতীয় উপাখ্যান নদ-নদী নিয়ে; নদীদের সম্মেলন হ'লো, সভা শেষে সভাপতি জিজ্ঞাসা ক'রলেন "তোমরা কে কোথায় যাচ্ছ, আর কি ক'রবে একে একে ব'লে যাও"। টেমস্ নদী জানালো সে লণ্ডন যাচ্ছে—সবাই তাকে জানবে একদিন নদ নদীর সেরা ব'লে। হাড্‌সন্ (যার উপর নিউইয়র্ক সহর) বললো "আমার দু'ধারে তলার পর তলা আকাশ-চুম্বী বাড়ী উঠবে, সব চেয়ে ধনী নদী হবো আমি।" গঙ্গার বাণী সব চেয়ে পুণ্যতোয়া নদী হবার। মিসিসিপি নদী বললো "কত জলপ্রবাহের যে আমি জনক হবো, তার হিসাব করা ভার—কিন্তু একটা নদী কিছু বলে না। সভাপতি বললেন "কে তুমি?" "আমি নীলনদী।" "তোমার লক্ষ্য ও বক্তব্য জানাও।" নীল ব'ললো "বহুকাল আগে পৃথিবীর ভাঙা গড়া যখন হ'চ্ছে—সাহারা ব'লে এক মরুভূমি হ'লো, যেখানে না মানুষ বাস ক'রতে পারে, না গাছপালা জন্মায়। আমি স্থির করলাম পাহাড় থেকে জল বয়ে মরুভূমিতে প্রাণ আনবার, আর ভূমধ্য সাগরে নিজেকে নিঃশেষ করবার।" সবাই হেসে উঠলো "আফ্রিকার, আর ছাড়া পেলে না?" নীল নদ ব'ললো "হ্যাঁ, সেখানেই যাচ্ছি।"

ভগবান নীলের কাজ দেখলেন, খুসী হ'য়ে ব'ললেন, "আমি নীলকে সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্র নদ ক'রবো, তাই তার তীরে মুসা (Moses) যীশুর লীলাক্ষেত্র ক'রলেন।

এর পরই আগ্রের আবেদন "আফ্রিকাকে ছোট চোখে দেখোনা ভাই। যীশুর কথা যদি স্মরণ করো, তবে বুঝবে তাঁর বাণী আজ-ত্যাগের। আফ্রিকার পাশে এসে দাঁড়াও। সাম্রাজ্যতিরা যদি তাদের পায়ের বুট ও জাতের অহঙ্কার ত্যাগ ক'রে যীশুর বাণী সার্থক ক'রতে ভাই এর মত আমাদের পাশে দাঁড়ান, তবে আফ্রিকায় ঈশ্বরের ইচ্ছা সফল হয়।"

আগ্রের জীবন ছিল এই সুরে বাঁধা। "পিয়ানোর কালো আর সাদা দুপাশ "চাবি" এক সঙ্গে না বাজালে সুরের সঙ্গতি হয় না, কালো আর সাদায় সহযোগেই আফ্রিকায় চাই কি পৃথিবীর-উন্নতি সম্ভব,"—কত ভাবে এই কথা তিনি জানাতেন। আচিমোটা কলেজে এই সুর-সঙ্গতির বাণী স্মরণে রাখবার জন্য পিয়ানোর কালো সাদা চাবির এক প্রতীক স্থাপিত হ'য়েছে, আগ্রের মৃত্যুর পর। কিন্তু আফ্রিকায় কালো সাদায় মিলনের সুরের উল্টোটাই যেন বেসুরো বাজছে—পঁড়াদায়ক ভাবে। আগ্রের স্বপ্ন কবে সার্থক হবে?

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

[illegible]

[illegible]

[illegible]

বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, পরবর্তী কালে রাজকার্য পরিচালনায় সে-সব তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

অবশেষে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী-পক্ষ চিরদিনের মতো পিটারকে চির তরে অপসৃত করার উদ্দেশ্যে সোফিয়া গোপনে এক চক্রান্ত করে। ভাগ্য-ক্রমে সে খবর আগেই জানতে পেরে পিটার সে-যাত্রা পত্নী-ভবন ছেড়ে দূরান্তরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। তারপর তাঁর বিশ্বাসী-অনুচর সৈন্যদলের সহায়তায় সোফিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে, নিভৃত এক ধর্মাশ্রমে বন্দী করে রেখে, মস্কোর রাজ-সিংহাসন অধিকারান্তে রুশ-রাজ্যের একচ্ছত্র-রাজা হয়ে বসেন। পিটারের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর!

সিংহাসন অধিকার করার পর রাজমাতা নাতালিয়ার হাতে শাসনের ভার দিয়ে বৈদেশিক অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ার্থে সুদীর্ঘ কয়েক বছর পিটার উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়ালেন। এই বিদেশ-পর্যটনকালে তরুণ-সম্রাট পিটার বিশিষ্ট-গুণী বিদেশী-পণ্ডিতদের শিক্ষাধীনে থেকে পরম-আগ্রহে অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যামিতি, নৌ-বিদ্যা, যুদ্ধ-রীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান-লাভ করেছিলেন।

১৬৯৯ সালে পিটার আজভ-সাগরের উপকূলে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-অভিযানে বেরুলেন। সে-যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে উপযুক্ত রণতরী এবং নৌ-সেনার অভাবে প্রবল-প্রতাপান্বিত তুর্কী ফৌজের বিরুদ্ধে পিটার জয়লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু পিটারের একনিষ্ঠ আগ্রহে এবং প্রাণপাত-প্রচেষ্টার ফলে সে অভাব অচিরে পূর্ণ হয় এবং তুর্কীদের হারিয়ে বিজয়-গৌরবে তরুণ 'জার' সর্বপ্রথম রুশ রণ-তরী-বাহিনী ও রুশীয় নৌ-সেনাদলের সৃষ্টি করেন।

১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে পিটার জ্ঞানাহরণের জন্য আবার বেরুলেন বিদেশ-পর্যটনে—পশ্চিম-ইউরোপে। হল্যাণ্ড, ফ্রান্স ঘুরে তিনি অবশেষে গেলেন ইংলণ্ডে। ছোট বেলা থেকেই সামুদ্রিক ও নৌ-বিদ্যার প্রতি ছিল তাঁর দারুণ ঝোঁক। তাই বড় হয়ে তিনি মেটাবেন দুস্তর সাগর পার হয়ে বিদেশের বন্দরে-বন্দরে ঘুরে সে-সাধ বিচিত্র-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। পিটারের বিদেশ-সফরকালে সম্রাজ্ঞী ভেলেৎসী-তুর্কীদল হঠাৎ আবার বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে···'জার্' পিটারকে সরিয়ে নিভৃত ধর্মাশ্রমে বন্দিনী সোফিয়াকে এনে রুশ-রাজ সিংহাসনে অভিসিক্ত করবে—এই তাদের অভিলাষ। খবর পেয়ে পিটার অবিলম্বে দেশে ফিরে এলেন এবং অতর্কিত আক্রমণে দুর্ধর্ষ ভেলেৎসী-বিদ্রোহীদের দমন করে ক্রেমলিন-প্রাসাদের সামনে সুপ্রসিদ্ধ 'লাল-চত্বর' বা Red square-এর মুক্ত-প্রাঙ্গণে শিরশ্ছেদী প্রাসাদ-রক্ষীদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে নিতান্ত নির্মমভাবে তাদের হত্যা সাধন করলেন। এমন কি বিদ্রোহীদের যথোচিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, মস্কোর 'লাল-চত্বরে' সমবেত বিপুল জনতার সম্মুখে, নিজের হাতে তলোয়ার ধরে 'জার' পিটার স্বয়ং অপরাধী ভেলেৎসী-নেতৃ-বৃন্দের মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন—নিতান্ত নৃশংসভাবে। ভেলেৎসী-রক্ষীদের নিশ্চিহ্ন করার পর পিটার তাঁর পরম-শত্রু সোফিয়াকে চির-নির্বাসনে পাঠিয়ে মস্কোর সিংহাসন নিষ্কণ্টক করে তোলেন।

অতঃপর নিজের হাতে রাজ্য-শাসনের ভার গ্রহণ করে প্রবল প্রতাপশালী পিটার দেশোন্নতি এবং সমাজ-সংস্কারের কাজে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। বিদেশ-পর্যটন এবং বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে ফলে বিগত কুড়ি বছরের যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তারই প্রত্যক্ষ-প্রয়োগ শুরু করলেন তিনি প্রাচীন পন্থী রুশ-দেশে আর দেশের অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ধর্মান্ধ, পশ্চাৎপদ জন-গণের আমূল সংস্কার এবং উন্নতিবিধানকল্পে! দেশের সনাতনী প্রথা আর

রুশ-রাজ্যের মহিমান্বিত সম্রাট 'জার' পিটার

রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারের অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল—প্রগতি-বাদী 'জার্'-পিটারের সুদীর্ঘ এবং সুযোগ্য শাসনকালে। তাঁর আমলে রুশ-রাজ্যে এত অজস্র রাজনৈতিক, সামাজিক এবং লৌকিক সংস্কার-সাধিত হয়েছিল যে অল্প দু'চার কথায় তার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

পিটারের প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত···এমন সদা-ব্যস্ত কর্মময় জীবনও বড় একটা চোখে পড়ে না জগতের ইতিহাসে কোথাও! অমে-

প্রাণে পিটার ছিলেন নূতনের উপাসক···প্রগতি-পূজারী ! তাঁর ধারণা ছিল যা-কিছু সনাতন, পুরাতন, মৃত-জরা—সে-সব হলো অকেজো··· বাজে···কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে হয় তার আমূল-পরিবর্তন, নয় ঐতিহ্য সংস্কার-সাধন প্রয়োজন ! না হলে গতি হয় রুদ্ধ··· অনড়তা ঘটে জীবন-ধারায়,···সভ্যতা, সংস্কৃতি সব কিছু লোপ পায় ! তাই বিলাস-আরামে বুদ ভাবলেশ না করে দেশের ও দশের হিতার্থে আজীবন আপ্রাণ-চেষ্টায় তাঁর বিভিন্ন-বিচিত্র সংস্কার-পরিকল্পনাগুলিকে তিনি প্রাণে-রসে-বর্ণে মূর্ত শাশ্বত করে তুলতে চেয়েছিলেন।

'জার' পিটারের তথিনী রাজকুমারী সোফিয়া

'জার' পিটারের ছিল বহুমুখী প্রতিভা ! তাঁর আমলে রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য সুবিশাল রুশ-রাজ্যকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। আগেকার কালে দেশের বিশিষ্ট প্রবল-প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত অভিজাত-রাজ-অমাত্যবর্গের নির্দেশ ও পরামর্শানুযায়ী জারেরা রাজ্য-বিধান করতেন ! রাজ-পরামর্শদাতা এই সব সম্ভ্রান্ত অভিজাত-অমাত্যেরা কেরলিন দুর্গ-প্রাসাদের সামনে, মস্কো-রাজধানীর সুপ্রসিদ্ধ 'লাল-চত্বরের' (Red Square) উপর অবস্থিত যে বিরাট-বিশাল মন্ত্রণা-গৃহে সভায় বসে রাজ্য-বিধানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধান্ত করতেন, সেইর নাম—'The State Duma' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় অভিজাত-পরিষদ'। একমাত্র অভিজাত-বংশীয় অমাত্যকুল ছাড়া দেশের সাধারণ-প্রজাদের কারো এই রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হবার অধিকার ছিল না ! দেশের জন-গণকে ঘুরে ফেলে, রাজা এবং রাজ্যের শাসন-বিনিময়ের আসন-বস্তুটিকে করায়ত্ত করে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কুচক্রী-রাজানুচরেরা এমনি অন্যায় পক্ষপাত-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন সেকালে। বিচক্ষণ নূতনপন্থী 'জার' পিটারের রাজ্যকালে কিন্তু প্রাচীন-আমলের এই অন্যায় ব্যবস্থার আমূল রদ-বদল ঘটে। রাজ-কার্যে স্বার্থান্ধ অভিজাত-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি খর্ব করার উদ্দেশ্যে, প্রগতিবাদী-সম্রাট পিটার রাষ্ট্রীয়-পরিষদ 'ডুমার' সভ্যত্ব-সভ্যদের হাত থেকে রাজ্যের শাসন-বিধি-বিনিময়ের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে, দেশের প্রবীণ-বিচক্ষণ যুবক-নেতা রাজ-কর্মচারীদের নির্বাচিত করে, রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-পরিষদকে সম্পূর্ণ নূতন-ছাঁদে গড়ে তুললেন। সে-পরিষদের নাম হলো—'Senate' বা 'প্রাজ্ঞ-সভা'। নব-প্রতিষ্ঠিত এই 'সেনেট-সভার' অভিজ্ঞ পারদর্শী রাজপুরুষ-সভ্যদলের সুচিন্তিত-মতামত এবং সুবন্দোবস্তানুসারে সম্রাট পিটার সুদীর্ঘকাল ধরে পরম-সুশৃঙ্খলভাবে দেশ শাসন করে গেছেন।

পিটারের সুশাসন-ব্যবস্থায় রুশ-রাজ্যের প্রভূত উন্নতি এবং শ্রী-বৃদ্ধি ঘটেছিল প্রচুর পরিমাণে। দেশের অশিক্ষিত-কুসংস্কারাচ্ছন্ন জন-গণকে শিক্ষা-দীক্ষায় সুসভ্য-মানুষ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পিটারের অক্লান্ত-প্রচেষ্টায়, ছোট-বড় অনেক বিদ্যালয় শিক্ষা-কেন্দ্রাদি স্থাপিত হয়েছিল। দেশের পদাপদ-প্রজাদের উন্নত করে তুলতে পিটার ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সুপ্রসিদ্ধ Academy of Sciences' বা 'বিজ্ঞান-সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর ফলে রাজ্যে বিজ্ঞান-চর্চা ব্যাপক প্রসার-লাভ করে তখন থেকে। এছাড়া পিটারের উৎসাহে রুশ-দেশে মুদ্রা-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবার ফলে বই-পত্রাদি ছাপার সুব্যবস্থা হয় এবং লোক-শিক্ষার প্রসার বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেকালে। উপরন্তু, দেশের সুযোগ্য-ছাত্রদের পিটার ইউরোপের বিভিন্ন সভ্য বৈদেশিক-রাষ্ট্রে পাঠিয়ে ছিলেন—নানা বিষয়ে উচ্চ-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা-লাভ করে এসে স্বদেশের সংস্কার-সাধন করবেন বলে।

পশ্চিম-ইউরোপের প্রগতিশীল বৈদেশিক-রাষ্ট্রের উন্নত-ভাবধারার আদর্শে অনুপ্রাণিত পিটারের এই স্বদেশ-সংস্কার পরিকল্পনা কিন্তু রুশ-রাজ্যের সনাতন-পন্থীদের কাছে নিতান্ত বেয়াড়া ঠেকেছিল···সুযোগ পেলেই তাঁরা যখন-তখন বিরুদ্ধাচরণ করতেন···তীব্র-প্রতিবাদ জানাতেন—সম্রাটের বিবিধ বিজাতীয় কার্যকলাপের জন্য।

পিটার কিন্তু এ-সবে কান দিতেন না মোটে। তিনি তাঁর বিচিত্র সংস্কার-উন্নতির কাজ নিয়েই মেতে থাকেন দারাক্ষণ। তবে দেশের কোথাও কোনো রকম বিদ্রোহ বা রাজদ্রোহিতার আভাস পেলে তিনি অবিলম্বে নির্মম-নৃশংসভাবে তার চূড়ান্ত-নিষ্পত্তি করেন।

১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের ধর্মগুরু-সমাতন-পন্থী ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় চক্রান্তে পিটারের নির্বোধ-পুত্র চরম-দুষ্কৃতকারী আলেক্সিস একদা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা করে। প্রবল-আক্রোশে সে-বিদ্রোহ-দমনের পর, 'জার' পিটার তাঁর অবাধ্য-পুত্রকে বন্দী-শিবিরেই হত্যার আদেশ দেন। অন্য বিদ্রোহীদের তিনি সুদূর সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে চির-নির্বাসিত করেন।

ধর্ম এবং সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও পিটারের কীর্তি রুশ-ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। যুগ-যুগ ধরে তার আর অভিজাত জমীদার-দের পোষণ, জুলুম আর একান্ত অবহেলার ফলে, দারুণ অশিক্ষা, কুসংস্কার আর দারিদ্র্য-দুরবস্থায় আচ্ছন্ন হয়ে ছিল সারা রুশ-দেশ। উপরন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরিক-বিশৃঙ্খলার সুযোগে ধর্মযাজকদের প্রাধান্য-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবার ফলে ধর্মের ধোঁয়াশিতে ভরে উঠেছিল রুশ-বাসীদের মন···সামাজিক রীতি-নীতি এবং দৈনন্দিন-জীবনের আচার-ব্যবহারের প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি-ব্যাপারেও এত রকমের বেয়াড়া সব সংস্কার আর ছুঁৎ মেনে চলতের যে-আমলের লোক-জন, তা বলে শেষ করা যায় না! রুশ-রাজ্যের সনাতন সামাজিক-বিধানে দেশের ধর্মযাজকদের আসন ছিল রাজার উর্ধ্বে। সেজন্য রাজা-পালনের ব্যাপারে তাঁরা রীতি-মত প্রভুত্ব ফলিয়ে বেড়াতেন। পিটারের আমলে এ রীতির পরিবর্তন ঘটে···ধর্মযাজক সম্প্র-দায়ের প্রভাব-প্রতিপত্তিও হ্রাস পায়। ১৭২১ খৃষ্টাব্দে দেশের ধর্মযাজকতন্ত্রকে বাতিরে 'জার' পিটার স্বয়ং রাষ্ট্রের একচ্ছত্র ধর্ম-নায়ক হয়ে বসেন।

মস্কোর ক্রেমলিন দুর্গ-প্রাসাদের গীর্জায় প্রথম রোমানভ্ 'জার' মাইকেলের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানের পুরাতন প্রতিচিত্র

ধর্ম-সংস্কার ছাড়াও পিটারের রাজত্বকালে রুশবাসীদের সামাজিক আচার-ব্যবহার আর লাজ-লজ্জা, আদব-কায়দারও বিশেষ সংস্কার-সাধন হয়েছিল। যেন-তেন-প্রকারেণ অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের ফলে সে-যুগের লোক-জন সবাই যেমন অসভ্য-বর্বর, তেমনি অপরিচ্ছন্ন আর রুচিহীন হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে রুশ-দেশের ধনী-দরিদ্র, ছেলে-বুড়ো সব পুরুষের জংলী-বুনোদের মত মুখে একরাশ ঘন-গোঁফদাড়ি আর মাথায় দুর্ঘীর্ঘ ঝাঁকড়া চুল রাখার রেওয়াজ ছিল! তাছাড়া তাঁদের লাজ-লজ্জাও ছিল নিতান্ত শ্রী-হীন···মাথায় পশু লোমের তথা টুপি, অঙ্গে আপাদ-লম্বিত 'কাফ্‌তান' বা ঢিলেঢালা ইজার-জামা ছাতা-ওয়ালা জোব্বা-আর গায় অল্পকলে পাঞ্জামা···পায়ে পশমের মোজা, আর হাঁটু পর্যন্ত উঁচু বুট জুতো···এই ছিল তাঁদের পোষাক! এমনি বিদ্‌ঘুটে-কদাকার লাজ-লজ্জায় ভূষিত হয়ে চট্‌পট্, নড়ে-চড়ে বেড়ানোর কিরূপ অসুবিধা ঘটতো। ইউরোপের সুসভ্য-উন্নত দেশের গুরুত্বপূর্ণ লাজ-সজ্জার ব্যবস্থা দেখে এসে 'জার' পিটার স্বয়ং নিজের হাতে কাঁচি ধরে তাঁর অনুগত অনুচরবর্গের জংলী দাড়ি খোঁপ আর 'কাফ্‌তানের' বেমানুম উচ্ছেদ সাধন করে রুশ-রাজ্যের লাজ-পোষাকের ঢোল্ সিরিয়ে দিয়ে-ছিলেন। দেশের প্রাচীন-পন্থী প্রজারা প্রথমে প্রবল আপত্তি জানিয়ে-ছিলেন—সম্রাটের এই আজব বৈদেশিক-অনুকরণ সম্বন্ধে। কিন্তু পিটারের দুর্দান্ত-দৃঢ়-প্রকৃতির কাছে তাঁদের সে আপত্তি মোটে টিঁকতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, পিটারের কড়া আদেশে রুশ-রাজন্যবর্গের অভিজাত সমাজের সবাইকেই তাঁদের পরম প্রিয় সনাতন দাড়ি আর 'কাফ্‌তান' জোব্বা ত্যাগ করে পশ্চিম-ইউরোপের সুসভ্য সাজ-পোষাক আর আদব-কায়দা গ্রহণ করতে হয়েছিল। অমাত্য-অভিজাতদের পুরোনো ঢাল-চাল বদলে দেশের পশ্চাৎপদ বাসিন্দাদের

দাড়ি না কামানোর ফলে রাজ্যের প্রত্যেক ব্যবসায়ী আর সাধারণ প্রজাদের বিশেষ একটি রাজস্ব-কর দিতে হবে। এই উদ্ভট আইন জারির ফলে, রুশ-প্রজাদের মধ্যে দাড়ি কামানোর মহা-হিড়িক পড়ে গেল! ব্যতিক্রম ঘটেছিল শুধু দেশের কৃষিজীবী কৃষকদের বেলায়। সেখানে দাড়ি-রাখার অনুমতি মিলেছিল শুধু তাদের।

পিটারের স্বদেশ-সংস্কারের নেশা খালি যে এ-সব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। রাষ্ট্র-পরিষদের সহায়তায় দেশে তিনি বহুবিধ সুশাসন আইন-কানুনের প্রবর্তন করেছিলেন। তাছাড়া রুশ-দেশের সনাতন-প্রাচীন 'বর্ষ-পঞ্জিকার'ও (Calender) সংস্কার সাধন করেছিলেন তিনি। আগে রুশদেশে সেকালের রীতি-অনুসারে বর্ষ-গণনা করা হতো সেপ্টেম্বর মাস থেকে। তার ফলে, ইউরোপের অন্যান্য বৈদেশিক-রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগসূত্র-স্থাপনে ভারী অসুবিধা ঘটতো। সে অসুবিধা দূর করার জন্য পিটারের আমলে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির

অনুকরণে চাষবাসি মাস থেকে বছর-গণনা করার রীতি-প্রচলন করেন রুশ-জেলে।

এছাড়া তিনি প্রধান রুশ-দেশের পশ্চাৎপদ-প্রজাদের অর্থ নৈতিক দুরবস্থার উন্নতি-সাধনকল্পে সংস্কার-ব্রতী পিটার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট বড় বহু বন্দর, ডকপত্তন এবং কল-কারখানাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেশের চাষ-আবাদের সুবিধা এবং দুরন্ত নদীর বন্যা-প্লাবনের নিত্য-নিয়ত হাত থেকে প্রজাদের ঘর-বাড়ী-সম্পত্তি রক্ষার জন্য রুশ-রাজ্যে বহু খাল পরিখাও খনিত হয়েছিল সে সময়ে। এই সব খাল-পরিখা খনন আর রাজ্যের সর্বত্র পথ-ঘাটের সুব্যবস্থা হবার ফলে, বাণিজ্য পণ্য এবং যান-বাহন চলাচলের বিশেষ সুবিধা ঘটে। পিটারের আমলে, রুশ-সেনাবাহিনীরও যথেষ্ট উন্নতি-সাধন হয়। তাঁর প্রাণপাত চেষ্টায় দেশের সৈন্যবল শুধু যে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, রুশ-সৈন্যরা সম্রাটের পরিচালনাধীনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে শৌর্য-বীর্য-মানসিক তেজে তাদের প্রত্যেকেই দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির হয়ে ওঠে! তাছাড়া রাষ্ট্রের অর্থ-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য, দেশের খনিগুলির সংস্কার-সাধন করে তাম, লোহা, সীসা প্রভৃতি খনিজ ধাতু সংগ্রহের দিকেও পিটার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে, যুদ্ধের সরঞ্জাম হিসাবে রুশ-রাজ্যে অনেক বড় বড় নব কামান, বন্দুক, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদি এবং রণতরী নির্মিত হয়েছিল…সে সবের কিছু কিছু নিদর্শন আজও সযত্নে রক্ষিত আছে লেনিনগ্রাডে রুশের নিজের ঐতিহাসিক-যাদুঘরে। যোদ্ধা হিসাবেও পিটার ছিলেন অসাধারণ! ১৭০০ সালে 'নার্ভার' যুদ্ধে সুইডেনের দুর্ধর্ষ রাজ-শক্তির কাছে পরাজিত হলেও সুশিক্ষিত রুশ-সৈন্যদের সহায়তায় ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে 'পোলটাভার' যুদ্ধে পিটার এ-অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্পূর্ণ বিলয় করে। পশ্চিম-ইউরোপের সুসভ্য-সমাজের আদর্শে এই সব অভিনব-বিচিত্র উন্নতি-সাধনের ব্যাপারে রুশ-দেশের সনাতন-পন্থী প্রজাদের ঘোরতর আপত্তির ফলে পিটারের মনে ধারণা জন্মেছিল, সুপ্রাচীন মস্কো-সহর থেকে দূরে অন্যত্র কোথাও সরে গিয়ে বিরোধী-দলের আওতার বাইরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তাঁর বিভিন্ন সংস্কার পরিকল্পনাগুলিকে তিনি কার্যতঃ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। সেই উদ্দেশ্যে, প্রাচীন রাজধানী সমৃদ্ধ মস্কো সহর ছেড়ে রুশ-রাজ্যের উত্তরাংশে বল্টিক সাগরের বিখ্যাত নেভা নদীর তীরে এক বিস্তৃত চরা-ভূমির উপর ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজধানী পত্তন করেন। নেভা-নদীর কূলে অবস্থিত সে-যুগের সুপ্রসিদ্ধ সেন্ট পিটার দুর্গের নামানুসারে নব-রাজধানীর নাম রাখা হলো সেন্টপিটার্সবুর্গ। তাছাড়া মহা-মহিম সম্রাট পিটারের নিজের হাতে-গড়া জন-পদ বলে পরবর্তীকালে নূতন রাজধানীর আরো একটি নাম হয়েছিল—পেট্রোগ্রাড। সোভিয়েট আমলে, এই পেট্রোগ্রাড্ বা সেন্টপিটার্সবুর্গেরই প্রাচীন নাম বদলে নূতন নাম হয়েছে—লেনিনগ্রাড্। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত স্থাপত্য-রীতি অনুকরণে, নানা সজ্জায় অপরূপ শিল্পী-মণ্ডিত করে, প্রগতি পরিকল্পক পিটার পরম-আগ্রহে সুদীর্ঘ ন' বছরের অক্লান্ত চেষ্টায়, তাঁর এই সমৃদ্ধ নূতন রাজধানীটি গড়ে তুলেছিলেন। অবশেষে ১৭১৩ সালে 'জার' পিটারের আদেশানুযায়ী নব-নির্মিত সেন্টপিটার্সবুর্গে রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত হবার ফলে ঐতিহ্য-পরিমায় সমৃদ্ধ প্রাচীন মস্কো সহরের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়…অবস্থারও অবনতি ঘটে। ওদিকে সংস্কার-পন্থী সদয়-সহানুভূতিতে এবং সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় রুশ-রাজ্যের নবীন-রাজধানী সেন্টপিটার্সবুর্গে দিনে দিনে এমন সমৃদ্ধ গরীয়ান হয়ে উঠেছিল যে ইউরোপের অপরাপর সভ্য উন্নত বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি তাতে রীতিমত বিচলিত এবং চমকিত হয়ে উঠেছিল। সুদীর্ঘকাল ধরে এমনি বিবিধ-বিচিত্র সংস্কার-সাধনের ফলে পশ্চাৎপদ রুশ-রাজ্যকে প্রতীচ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে রোগ-শয্যাতেই মহিমান্বিত 'জার' পিটারের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

ক্রমশঃ

উটজ প্রাঙ্গণের শাখী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ওটী কত শিশু-শাখী উটজ-প্রাঙ্গণে
সারা বেলা খেলা করে; মৃদু সমীরণে
পল্লবের বাহু তুলে জানায় উল্লাস;
আনন্দ-সঙ্গীত সঙ্গীতের কলভাষ
ছড়ায় সতত; আকাশের সূর্য্য-সুধা
কাণ্ড-মুখে টেনে লয় মিটাবারে ক্ষুধা।
চিক্কণ শ্যামল কান্তি কী যে শান্তি ভরা!
অবকাশ যদি পাই, শ্রান্তি-ক্লান্তি হরা
শাখী-শ্রেণী দেখে দেখে মেটে না তিয়াষ।
আমার জীবনে ওরা গভীর উল্লাস—
সুস্থ প্রশান্তির সুধা সঞ্চারিয়া যায়।
জড়বাদ-পিষ্ট ক্লিষ্ট যান্ত্রিক জীবন—
যন্ত্র-বিদ্ধ—রুদ্ধ—ক্লিন্ন; তবু পায় মন
যে মাধুরী, সে যে শুধু ওদেরই কৃপায়।

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা]

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি[১] লিখেছিলুম, তোমার কবিতার বইয়ের লম্বা সমালোচনা করে। সে চিঠিখানি তোমাকে পাঠিয়েচি না ছিঁড়ে ফেলেচি ঠিক মনে পড়চে না[২]। রাত্রিবেলায় বসে বসে তোমার 'লীলাকমলের দলগুলি' (তোমার ভাষায়) নাড়তে চাড়তে তার সৌরভে আত্মবিস্মৃত হয়ে অনেক কথাই লিখে ফেলেছিলুম। চিঠিখানা আদৌ পেয়েছ কিনা জানিয়ো। এখন দিনের বেলায় মনে হচ্চে, সে-চিঠি তোমাকে হয় তো দুঃখ দেবে বা! চিঠিখানি যদি না পেয়ে থাকো, তাতে যা' লিখেছিলুম তা' মোটামুটি জানাচ্চি। কারণ, তুমি হয় তো এখুনি সোজাসুজিই বলে বসবে—

'ও সমস্তই বড়দার চালাকি। দীর্ঘদিন বইখানা পেয়েও নিছক কুড়েমি করে নিরুত্তর থাকার বাজে কৈফিয়ৎ।' অথবা বলবে—'বুঝেচি ওটা আমার রাগের ভয়ে পরিপাটি একটি বানানো গল্প।'

সত্যি বলচি বোন্, এটা কিন্তু একটুও বানানো-গল্প নয়। তবে তোমাদের রাগের ভয়টা যে আমার আজও সত্যিই আছে সেটা কবুল করচি। সংসারে যে দু' চার জায়গায় সত্যিকারের অকৃত্রিম স্নেহ ও নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা পেয়েচি বোন্, আমি তার দাম জানি। তাই তাকে হারাতে আমার সত্যিই ভয়।'

তুমি হয়তো এখুনি হেসে উঠবে। বলবে—'অকৃত্রিম স্নেহ অত সহজে হারিয়ে যায় না বড়দা!' সে কথা সত্যি দিদি! তবুও কি-জানো—অতি অকৃত্রিম গভীর স্নেহও সংসারের অনেক রকম কারণ অকারণের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে বা আপনাকে আবৃত করে রাখতে বাধ্য হয়। এমন কি, অনেক সময়ে সে আপনাকে আপনারই কাছে স্বীকার করতে রাজী হয়না, যদিও বা নিজের কাছে নিজেকে মানেও—অন্যের কাছে প্রকাশ করতে চায়না, বিশ্বের কাছে তো নয়ই। তারপরে আছে ভুল-বোঝা। স্নেহ-ভালবাসা শ্রদ্ধা প্রীতি সম্পর্কের মধ্যে যত কিছু অঘটন ঘটে, তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সত্যকার অপরাধ বা ত্রুটির চেয়ে ভুল-বোঝাটাই শতকরা আশি ভাগেরও উপরে বর্ত্তমান। ঐ ভুল বোঝাটাকেই আমি বেজায় ভয় করি। আমার বেশির ভাগ বইয়েই তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেচ এটা।...

ঐ দেখ, কি-লিখতে বসে কি সব বকতে সুরু করেচি। বুড়ো হওয়ার পুরোপুরি লক্ষণই হচ্চে এই বকা। বাজে বকা। ধান ভানতে দিয়েচ কি, তান ধরবে সেই সময়ে শিবঠাকুরের গানের। দেখচ না তোমার গুরুদেবের[৩] কলমের কাণ্ড! একটা পয়েন্টে কথা সুরু করে কোথায় কোন্‌দিকে কোন পথে যে চলে যান্ তার আর হালহদিশ্ খুঁজে মেলা দায় হয়। এইটাই তো বুড়ো হওয়ার সবচেয়ে নিঃসন্দেহ-লক্ষণ। যদিও তোমরা (তার সঙ্গে উনিও[৪]) তা কিছুতেই মানতে চাওনা। আমারও আজকাল ঐ দোষটা পুরো মাত্রায় এসেচে যেন অনুভব করচি। বাজে বকতে পেলে আর যেন কিছুই চাইনে।

এই দেখ, তুমি যাতে রাগ না কর আর ভুল না বোঝো বলে চিঠি লিখতে বসে' তোমাকে রাগিয়েই দিলুম বুঝি বা! দোহাই, বুড়ো বড়দাকে ভুল বুঝোনা ভাই, লক্ষ্মীটি।

যে-চিঠিখানা লিখেও তোমাকে পাঠাইনি মনে হচ্চে,

(১) ভারতবর্ষের গত তাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীরাধারাণী দেবীকে লেখা শেষ চিঠিখানির কথাই শরৎচন্দ্র এখানে উল্লেখ করেছেন।

(২) শরৎচন্দ্রের আত্মভোলা স্বভাবের এও একটা নিদর্শন।

(৩) রবীন্দ্রনাথ

(৪) রবীন্দ্রনাথ

হাতে তোমার বইয়ের সমালোচনার যা লিখেছিলুম জানাচ্ছি। লিখেছিলুম—"রাধু, তোমার নীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তরঙ্গ, এতই emotional যে, পড়তে পড়তে বার বার ভুল হয়ে যায়, এ তোমার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝিবা! কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি। আর যাই হোক এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা নয়। কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়কে এমন গভীর সত্যিকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক্ হচ্ছি। যে-বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয়, কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই!

তোমরা—এই মেয়েরা—তোমাদের আজও ঠিক চিনে উঠতে পারলুম না। নিজের জীবনের অতি কঠিন ও গভীর বেদনায় এই অভিজ্ঞতাই মাত্র সঞ্চয় করতে পেরেছি রাধু! তোমাদের মত কবি-কল্পনা দিয়ে নয়, নিজের জীবনকে কৌটায় কৌটায় গলিয়ে নিঃশেষে নীরবে দগ্ধ করে যে-অভিজ্ঞতা বাস্তব থেকে আহরণ করেছি: এখন মনে হয়, আমার সাহিত্যেও হয় তো সেইটাই ফুটে উঠেছে বারংবার, আমার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারেও। আর এটা অত্যন্ত অকৃত্রিম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই বোধহয় এত সহজে ছোট বড় সবাইকার কাছে আবেদন পেয়েছে।

আমার কি মনে হয় জানো? আমরাই যে শুধু তোমাদের চিনে উঠতে পারলুম না তা' নয়, তোমরা নিজেরাও বোধহয় নিজেদের ঠিক চিনে উঠতে পারো না অথবা নিজেকে চিনতে ভয় পাও। হয়তো এমনও হতে পারে, চিনেও সহজে তাকে স্বীকার করে নিতে চাও না। এও কিন্তু আমার কাল্পনিক ধারণা নয়, সত্যিকারের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ধারণা, সুতরাং এর মূল্য উড়িয়ে দেবার নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। সাক্ষাতে এ বিষয়ে আলোচনার ইচ্ছা রইল। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ নিয়ো। ইতি ২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৭

তোমার বড়দা

পুনশ্চ—

তোমার বইখানির ছাপা বাঁধাই সাজসজ্জা অতি পরিপাটী চমৎকার হয়েছে। যারা ওর নিন্দে করেছে, তারা অমনটি পারে নি বা পারে না বলেই নিন্দে করেছে। তুমি ক্ষুণ্ণ হোয়ো না, বরং হেসো একটু বেশি করে।

দামতাবেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু,

রাধু, কুমিল্লায়[৫] হঠাৎ লোকে আমাকে চালান্ করে দিয়েছিলো। ফিরে এসে তোমার চিঠি পেলাম।

'শেষ প্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ বই ভালো লাগবার মানুষ বাঙ্‌লা দেশে হয়ত পাবোনা; শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখচি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে। কয়েকখানি চিঠি পড়লাম, একটি মেয়ে লিখচেন তাঁর যথেষ্ট টাকা থাকলে এই বইটা ছাপিয়ে বিনামূল্যে বাইবেলের মত বিতরণ করতেন। এ হোলো একটা দিক, অপর দিকটা এখনো চোখের আড়ালে আছে, ঝড় বইতে সুরু হ'লেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

অতি-আধুনিক-সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত; বুড়ো হয়ে এসেচি, শক্তি-সামর্থ্য

---

(৫) শরৎচন্দ্র এই সময় কুমিল্লায় এক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। এই সময় বাঙ্গলা কংগ্রেসে দুটী দল ছিল। দুটী দলের একদিকে ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, আর অপর দিকে ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের দলে ছিলেন। তাই সুভাষচন্দ্রই শরৎচন্দ্রকে কুমিল্লায় পাঠিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কুমিল্লার রাজনৈতিক সম্মেলন থেকে ফিরে এসে রসিকতা ক'রে সেই সময় শ্রীদিলীপকুমার রায়কে লিখেছিলেন—"মফঃ,—যেখোদার কৃপায় জেতে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্ব্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একজন শেষ শেষ বললে, গাড়ীর জানালায় ক'ষে দিয়ে কলসার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি-জ্ঞাপন করলে; আবার একজন বারো ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে কলসার গুঁড়োটা কিছুই নয়—ও মায়া। যাই হোক্ জল-নারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি।"

পশ্চিমের আড়ালে ডুব দেবার আভাস অহরহ নিজের মধ্যে অনুভব করি, এখন যাঁরা শক্তিমান নবীন সাহিত্যিক, তাঁদের কাছে ছোট হয়ে এইটুকু মাত্র বলে গেলাম। এখন তাঁদেরই কাজ—ভুলে ভরা শোভায় সন্দেহে বড় করে তোলার দায়িত্ব তাঁদেরই বাকি রইলো। ভারার ওপরে দখল আমার চিরদিনই কম; শব্দসম্পদ কত যে সামান্য এ সম্বাদ আর যার কাছেই লুকনো থাক, তোমাদের কাছে থাকবার কথা নয়। অথচ মনের মধ্যে বলবার জিনিস অনেক রয়ে গেলো—সময় হ'ল না দিয়ে যাবার—তারই একটুখানি প্রকাশের চেষ্টা শেষপ্রশ্নে করেচি।

তুমি চেয়েচো আমার কাছে সৎ-পরামর্শ।[১] কিন্তু চিঠির মধ্যে তো সৎ-অসৎ কোনো পরামর্শই পাঠাতে পারিনে ভাই; পারি শুধু পাঠাতে আমার অকুণ্ঠ কল্যাণ কামনা। যেদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে—সব কথা জেনে নেবো। আজ কেবল এইটুকুই জানাবো যে, দুঃখ সারা সইতে ভয় পায় না এ পথ তাদের জন্যেই।

ইতিমধ্যে যদি ধৈর্য্য থাকে 'শেষপ্রশ্ন'খানা আরও একবার পড়ে দেখো। তোমার অনেক প্রশ্নের জবাব পাবে। যে সব কথা হয়ত চোখ এড়িয়ে গেছে তাদেরও দেখা পাবে। কোনো বই বার দুই না পড়ে দেখলে তার সবটুকু চোখে পড়ে না।

অনেকদিন তোমাকে দেখিনি, একবার দেখবার ইচ্ছেও হয়। কবে দেখা হতে পারে যদি একটু জানাও ভাল হয়। আরও একটা কথা। বামুন মানুষ, বিশেষতঃ বুড়োমানুষ, যত্ন কোরে খাওয়ানোটা যে একটু বেশি রকম পছন্দ করি, আমার লেখার মধ্যে এ ইঙ্গিতটুকু অনেকেই আমার নিজের ব'লে অনুমান করে। ভাবে মনে হয় তোমারও আন্দাজ যেন ঐ রকম। ঠিক না?

আমার অন্তরের গভীর স্নেহাশীর্ব্বাদ রইলো। ইতি ৩০শে বৈশাখ' ৩৮

বড়দা

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্ব্বাদ চেয়েছিলে তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করি নি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠে নি ভাই। "এই কালই জবাব দেবো" এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও এ জ্ঞান আর জন্মালো না যে ভাবো—'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন—আর তাকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তার আশীর্ব্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্যে।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেচেন।[২] তোমরা পারো না?

একটা কথা লিখেচো দেখলাম যে—কমলের স্রষ্টা রমার স্রষ্টা তো নয় যে—ইত্যাদি। তার মানে যে রমার স্রষ্টাই তোমাদের বুঝতেন—তোমাকে আদর করতে পারতেন, কিন্তু কমলের কথা যিনি লিখতে আরম্ভ করেছেন তাঁর কাছে আর ভরসা করবার কি আছে? এই না কি?

কিন্তু একটা কথা ভুলে গেলে যে পল্লী-সমাজের রমা পল্লী-সমাজেরই মানুষ। যাদের অস্তিত্ব নিত্য নিয়ত আমরা অনুভব করি। সুখে দুঃখে ভালোতে মন্দতে যাদের আমরা কাছে পাই। কিন্তু শেষপ্রশ্নের কমলের কাছে সে প্রত্যাশা করা চলে কি কোরে?

আরও একটা কথা রাধু! লোকে লিখতে বলে—না লিখলেও দেখি চলে না—কিন্তু এই প্রাচীনকালে আগেকার দিনের অর্থাৎ যৌবনের সে শক্তি পাবো কোথায়? তাই এখন এই শেষ বয়সের জোর করে লেখার শতেক ত্রুটি

(১) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়ের মধ্যে শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধা ও স্নেহের গভীরতা লক্ষ্য করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের প্রায়ই বলতেন—তোমরা যদি বিবাহের মধ্য দিয়ে পরস্পরের দায়িত্ব গ্রহণের অধিকার নাও, তাহলে তোমাদের জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। রাধারাণী দেবী এই সম্পর্কেই শরৎচন্দ্রের কাছে সৎ-পরামর্শ চেয়েছিলেন।

(২) শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল। তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহুপত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাস পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাসই ব্যক্ত হয়েছে।

শতেক অভাব লোকের চোখে পড়ে। লেখার দৈন্য এখন নিজেই অনুভব করি। ভাষার সে শ্রীও নেই, যাদুনিও গেছে। সব যেন এলো-মেলো শিথিল হয়ে দেখা দিচ্ছে—না? দেবার কথাও। আসলে আমি ত সাহিত্যিক নই দিদি। এ যেন আমার এম-এস্-সি পাশ করে ওকালতি পেশা ধরা। সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনোদিন তেমন আনন্দও পাই নে, যেমন পাই বিজ্ঞানের মধ্যে।"

এর জন্যেই হয়ত আমি তৈরি হয়েছিলাম, কিন্তু গ্রহের ফেরে হয়ে গেল ঠিক উল্টো। ভাবি, আবার যদি কখনো জন্ম হয়, সেবার যেন না এত বড় ভুল আর ঘটে।

কেমন আছ? দেখা সাক্ষাৎ হবারও যো নেই—যখন ফিরবে আমাকে চিঠি লিখে জানিয়ো। ইতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ, '৩৮

বড়দা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

কল্যাণীয়াসু—

তোমাদের বিয়ের খবরটা এত দেরিতে এসে পৌঁছালো যে তখন আর যাবার কোন উপায়ই হাতে নেই। সেদিন শুধু এই কথাটাই ভেবে সান্ত্বনা পেলেম যে এ দিনের মূলেই ত' ছিলেম আমি।*

সেদিন তোমাদের নূতন গৃহস্থালী দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল খুবই, কিন্তু এদিকের জরুরি নানা কাজ সারতে সারতে স' আটটা বেজে গেল। তখন আর লিলুয়া** গিয়ে ফিরে এসে স' নটার ট্রেণ ধরা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া, তোমাদের কাছে রাতটার মতো যে আতিথ্য স্বীকার করবো—সে সাহসও হ'ল না, অভিসম্পাতের আশঙ্কা ছিল। তাই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারলাম না। যাই হোক সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও—জয়ী হও। ইতি ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়, পাণিত্রাস
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, কিছুদিন হোলো তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলে জবাব দিয়ে উঠতে পারি নি।

"সাহিত্যের মধ্যে আমি কোনদিন তেমন আনন্দও পাইনে—" একথা শরৎচন্দ্রের নিছক রসিকতা মাত্র। অবশ্য বিজ্ঞানেও যে তিনি তেমন আনন্দ পেতেন একথাও ঠিক। কারণ তিনি এক সময় বহু বিজ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। তাছাড়া সব সময়েই বহু বিজ্ঞান-গ্রন্থ তাঁর শেল্‌ফ সাজানো থাকতো। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র শরৎচন্দ্রের কথা স্মরণে রেখে এ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"হয়ত হয়তো তাঁহার অনেক এই যে কাহিনীর যাদুকর হঠাৎ এক ছদ্মপ্রভাতে সমস্ত মায়াদণ্ড ফেলিয়া চকিত, চমৎকৃত করিয়া দিলেন, তাঁহারই সেই চরিত্রগুলির সঙ্গেই অন্তরঙ্গ করিয়া বহু বাঙালী সেদিন তাঁহাকে চিনিবার চেষ্টা করিয়াছে। সতীশ, উপীনদা, হরেশ এমন কি বেহারাদের মধ্যেও আমরা সেদিন তাঁহাকে সন্ধান করিয়াছি, সেই সঙ্গেই তাঁহার ছোলা কুকুরের কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরের মধ্যে উপেন বন্ধুকের পাশে কদাক্ষের মালার কথা, তাঁহার শেল্‌ফে সাজানো অজস্র বিজ্ঞান-গ্রন্থের কথা।" (শরৎ-বন্দনা, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮)

শরৎচন্দ্র বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশি পড়াশুনা করেছিলেন যে, একবার তিনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভারতবর্ষে প্রকাশিত "জড় ও প্রাণ" নামক একটি প্রবন্ধের সমালোচনা করে তাঁর দিদির নাম দিয়ে (শরৎচন্দ্র তাঁর দিদি অনিলা দেবীর ছদ্মনামে সমালোচনা লিখতেন) একটা প্রতিবাদ লিখতে চেয়েছিলেন। তাই তখন তিনি ভারতবর্ষের অন্যতম সত্বাধিকারী, তাঁর বন্ধু শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে রেঙ্গুন থেকে ২৪. ১২. ১৪ তারিখের এক পত্রে লিখেছিলেন—"এবারকার ভারতবর্ষ চমৎকার হইয়াছে। আমি নিজে ত পড়িবার জিনিষ অনেক পাইলাম। আচ্ছা, একটা কথা—"জড় ও প্রাণ" সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু প্রতিবাদ করে, ধরুন আমার দিদিকে দিয়া যদি কিছু লিখাইয়া লই, আপনারা সে প্রতিবাদ কি ছাপিবেন? অবশ্য আপনারা নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি বিবেচনা করার পর। [Symbol অর্থাৎ কল্পনা প্রতিবাদ খাড়া করিয়াই কাজ চলিতেছে (একটা উদাহরণের মত উল্লেখ করিলাম) জার্মানির সকল পণ্ডিতই ত তা মানে নাই। তাদের মতামতটারও ত একটু মূল্য আছে। তাছাড়া হেলমহোল্‌জ কি শুধু standard সম্বন্ধে ঐ বলিয়াই শেষ করিয়াছেন? তখন সবাই মানিয়া লইয়াছেন কি! আপনিই বলুন না? আর এটা ত শুধু পদার্থ বিদ্যার Philosophy of science]

(৯) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেবের বিবাহে শরৎচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

(১০) লিলুয়ায় নরেন্দ্র দেবদের "দেবালয়" নামক উদ্যান বাটীতে এঁদের ফিরে হয়েছিল।

সেদিন কে যেন বললে—তোমাদের ওখানে গিয়েছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন দেখলে? সে যা বললে তাতে মনটা খুসি হয়ে উঠেছিল।

• • • তোমার আশঙ্কা অমূলক। পৃথিবী তা নয়। দুদিনের বেশি কেউ কারো কথা ভাববার অবকাশই পায় না। তাহ'লে এ দুনিয়ায় কারও বাস করাই চলতো না।··· তবে একটা কথা বলে রাখি। বয়েস অনেক হোলো, অনেক কিছুই দেখলাম। দুটি মাত্র মানুষের ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে কারও বেশিদিন চলে না। পুরুষের তো নয়ই। সুতরাং লিলুয়ার নিরালা[১১] ছেড়ে যত শীঘ্র পারো কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসো তোমরা। • • • আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৩৮

বড়দা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
হাবড়া

পরম কল্যাণীয়াসু—

রাধু, তোমার চিঠি পেলাম। চিঠিপত্রের জবাব না দিয়ে দিয়ে যে তোমাদের কাছে কত অপরাধ করি তার আর শেষ নেই। তা সে যাই হোক, মনে জেনো যে দাদার স্নেহ সে জন্যে একটুও কমে না।

তোমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী অসুখে ভুগচেন এ খবর আমি পূর্ব্বেই নরেনের কাছে পেয়েছিলাম। তাকে বলেছি—যেমন করে পারো মাকে তোমার সুস্থ করে তোলো। কেমন আছেন তিনি আজকাল? কোনো মতে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা চাই, নাহলে তোমাদের বড় মুস্কিল। স্নেহের এত দাবী কারও কাছে আর তোমরা খুঁজে পাবে না। নরেনের মাকে আমি যথার্থই শ্রদ্ধা করি।

আমি নিজে বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়েচি। ৭।৮ দিন থেকে অর্শ দিয়ে এত রক্তপাত হচ্চে যে প্রায় শয্যাগত করে ফেলেচে। কিছুতেই রক্ত থামচে না, কিম্বা কমও হচ্চে না। আজ লোক পাঠাচ্চি কলকাতায়, দেখি যদি হাসপাতালেই গিয়ে উঠতে হয় তো একটা যেন স্থান পাই।

ভেবে রেখেছিলাম এবার যেন লেখাটা না থামে, কিন্তু সে ইচ্ছে কাজে লাগবে বলে ভরসা পাই নে।

আশীর্ব্বাদ করি তোমাদের যেন সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয়। নরেনকে বোলো আমার আশীর্ব্বাদ পাঠিয়েছি।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৩৯ বড়দা

(১১) রাধারাণী দেবী ও নরেন্দ্র দেব উভয়েই কবি। শহরের কোলাহলের বাইরে লিলুয়ার "দেবালয়ের" নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশ এঁদের ভাল লাগায়, বিয়ের পর এঁরা এখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এঁদের লিলুয়ার নিরালা ছেড়ে কলকাতায় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে ফিরে আসবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

সনেট

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

যদি সখি, এ জীবনে আর একবার
মুকুলিতা তন্বী সেই কিশোরীর প্রায়
চকিত হরিণ-নেত্রে অসম্বৃত কেশে
একগাল হাসি নিয়ে দাঁড়াইতে এসে
সম্মুখে আমার! কোন্ ঐন্দ্রজালিকের
অপরূপ যাদুমন্ত্রে ভস্মস্তূপ হ'তে
মোহন মূরতি ধরি' উঠিত জাগিয়া
মৃত পুরাতন প্রেম! জরাহত ধরা
উচ্ছল যৌবনরাগে উঠিত উলসি'
কনকচম্পকপুঞ্জে, কাঞ্চন-কিংশুকে
পুনর্ব্বার! দেখিতাম সায়র-সোপানে,
মৃত্তিকায়, তৃণে তৃণে তব চরণের
ললিত অলক্তরাগ! শুধু একবার—
হ'তে যদি লোভনীয় সেই পঞ্চশরী!

পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

ভূতাত্ত্বিকেরা বলেন যে পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাদেশ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। আমার উপরীতের ধ্রুবীয় পুচ্ছ ও তার নিকটবর্তী পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নাকি এক সময়ে পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশ ছিল এক অবিচ্ছিন্ন মহাভূখণ্ডের অংশ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এই দুই মহাদেশের সংযোগ সেতু পরবর্তীকালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হ'য়ে যায়। যে অংশগুলি সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হ'য়ে যায় সেগুলি ছিল পর্বতসঙ্কুল ভূমি। এখন ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশে এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্বর্তী যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি সেই নিমজ্জিত পর্বতশ্রেণীর শৈলশৃঙ্গ। প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে এশিয়া ভূখণ্ডের সহিত অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত সংযোগ নষ্ট হয়ে যায়। অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক কাল হ'তে ঐতিহাসিক যুগের বহু দিন পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া বিস্তৃতির অন্তরালে আত্মগোপন ক'রেছিল। আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একদল মানুষের চাপে এশিয়ার পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলনিবাসী একদল কৃষ্ণকায় আদিম মানুষ সমুদ্র অতিক্রম করে আশ্রয়ের আশায় আরও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে। এই কৃষ্ণকায় মানুষই অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম বা আদিম অধিবাসী। সঠিক কোন সময়ে এবং কোন উপায়ে তাঁরা কি উপায়ে এই আদিম মানুষের দল সমুদ্রবেষ্টিত অজ্ঞাত মহাদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল সে কাহিনী চিরদিনের মতো অবগুণ্ঠিত থেকে গিয়েছে। বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় যে আদিম মানুষ বা আবোরিজিন (aborigines) দেখতে পাওয়া যায় তারা সেই আদিম পরম্পরারই বংশধর। এদের গায়ের রং নিকষ কালো, মাথায় চুল সোজা, নাক বেশ চাপা। কিন্তু এদের মাথার খুলি, চোয়ালের হাড় এবং চুল পরীক্ষা ক'রে নৃতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে এরা নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষ নয়। এরা হচ্ছে বর্তমান ককেশীয় ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর আদিম পূর্বপুরুষ। নৃতত্ত্ববিদের পরিভাষায় "A white stock gone black."

ইতিহাসের যে যুগে মানুষ প্রথম নৌকা গোপে ঘরিয়াং পাড়ি দিতে সুরু ক'রে, সে সময়ের কাহিনী ও কিংবদন্তীতে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এক একটা অনির্দিষ্ট বা কল্পনামূলক ইঙ্গিত কখনো কখনো পাওয়া যায়। সে সময়ে অনেকে বিশ্বাস করত যে পৃথিবীর। পূর্বগোলার্ধের। উত্তরাংশের- এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীর দক্ষিণভাগেও একটা বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আছে। ভারতবর্ষ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নাবিকগণের মুখে মুখে এই অজ্ঞাত ও কাল্পনিক মহাদেশের নানা কথা চারিদিকে প্রচারিত হ'ত। ১৪০ খৃষ্টাব্দে রোম সম্রাট পুসিয়ানের রাজসভায় মারত্থপিয়ান (Marsupini) নামক একজাতীয় অদ্ভুত জীবের কথা আলোচিত হ'তে দেখা যায়। বিবরণে প্রকাশ যে এই জীবের পেটে বাচ্চা রাখবার থলে ছিল। Marsupini যে ক্যাংগারু জাতীয় জীব সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্যাংগারুর বাসভূমি হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া।

ইউরোপীয় ইতিহাসে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতক হচ্ছে নৌ-অভিযান এবং আবিষ্কারের যুগ। কলম্বাসের ঐতিহাসিক অভিযানের বিস্ময়কর সাফল্য ইউরোপীয় নাবিক ও সাহসিকদিগকে এক নূতন নেশায় উন্মাদ ক'রে তুলেছিল। প্রথমে স্পেন, পর্তুগাল, ইতালীয়ান এবং পরে ইংরাজ ও ফরাসী জাতীয় দুঃসাহসিক নাবিকেরা এই বিশাল পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশগুলি খুঁজে বের করবার জন্য তৎপর হ'য়ে উঠেছিল। তাম্রো-চা-প্রাম্রা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ ক'রে ভারতে আগমন করবার পরবর্তী সময়ে ভারত সমুদ্র এবং সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ইউরোপীয় বণিক ও অভিযান-কারিগণের কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতক পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের প্রতি এই সকল অভিযানকর্তাদের নজর পড়েনি। ভারত সমুদ্রের মাঝামাঝি এসে এই নাবিকেরা tradewind বা বাণিজ্য-বায়ুর গতি অনুসরণ ক'রে সোজা পূর্বদিকে না গিয়ে, উত্তরদিকে মোড় ফিরে পূর্ব ভারতীয়দ্বীপপুঞ্জ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলির দিকে অগ্রসর হ'ত। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে টোরেস (Torres) নামক একজন স্পেন দেশীয় নাবিক খুব সম্ভবতঃ অষ্ট্রেলিয়ার অন্তর্গত কুইনস্‌ল্যাণ্ড প্রদেশের পূর্ব উপকূলের ত্রিশমাইলের মধ্যে এসেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার কথা তখন কেউ কড়ো একটা জানত না। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল আবাদ ভিড়বার পক্ষে অনুকূল ছিল বটে, কিন্তু একমাত্র মালয় উপদ্বীপবাসী দুর্ধর্ষ দ্বীবর সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ এদিকে নজর দিত না।

আর বালী দ্বীপের উপকূল সন্নিহিত সমুদ্রে মাছ ধরেই জীবন যাপন করত। কুয়াশের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল না। সমস্ত দেশটাকেই তারা 'মৃতের দেশ' ব'লে অভিহিত ক'রত।

কিন্তু পূর্বভারতীয় দ্বীপ এবং প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপ সমূহ হতে পর্তুগীজ নাবিকগণকে বিতাড়িত ক'রে ওলন্দাজ নাগরিকগণের প্রভুত্ব লাভের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটতে লাগল। সপ্তদশ শতকে ওলন্দাজ নাবিকেরা পাস অষ্ট্রেলিয়ার না এসেও এর আশে পাশে আনাগোনা সুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অনাবিষ্কৃত অন্ধকারময় মহাদেশ ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর গোচরে আসতে থাকে। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলবর্তী অনেক জায়গার নাম থেকে অনুমান করা যায় যে এই সকল স্থানে সম্ভবতঃ ওলন্দাজ বা অন্য ইউরোপীয় নাগরিকগণ এসেছিল। কিন্তু ভূমির অনুর্বরতা, পার্শ্বর্তী উপকূলভাগের বন্ধুর অনাতিথ্য তাদের

মনকে এই নূতন দেশের প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলতে সক্ষম হয় নি। অধিকাংশ আগন্তুকেরাই দেশটাকে অনুর্বর ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করেছেন।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন জেমস কুক নামক একজন ইংরাজ নাবিকের এদেশে আসার পর থেকেই প্রকৃত পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার নূতন ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। যদিও আরও পূর্বে ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম জেন্সিয়ার অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পশ্চিম উপকূলভাগে পদার্পণ করেছিলেন এবং সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে আবেল টাসম্যান নামক আর এক ব্যক্তি কর্তৃক ট্যাসম্যানিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল।

কিন্তু এই আবিষ্কারের পরবর্তী বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের কেউ এই নূতন দেশগুলির কথা জেনে ফেলবার অবসর পায় নি। এদিকে আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংলণ্ডের পরাজয়ে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। দ্বীপান্তর দণ্ডিত কয়েদীগণকে পূর্বে আমেরিকায় পাঠান হ'ত। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন হ'য়ে যাবার পর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কাপ্তেন কুক প্রথমে রাজকীয় পোত "এণ্ডিভার" (Endeavour) চালনা ক'রে প্রশান্তমহাসাগরীয় তাহিটি দ্বীপে উপস্থিত হন। তাঁর জাহাজের আরোহীগণের মধ্যে ছিল একজন জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিক। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল শুকতারা বা Venusএর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করা। সেই বৎসর Venusএর গতিপথ সূর্যের পরিক্রমণ-পথের উপর দিয়ে যাবার কথা ছিল। তাহিটি দ্বীপের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শেষ হওয়ার পর, কাপ্তেন কুক অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলভাগে অবতরণ করেন। এই নবাবিষ্কারের ফলে এই নূতন মহাদেশের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং কুকের আবিষ্কারের ঠিক সতের বৎসর পর কাপ্তেন ফিলিপ নামক এক নৌসেনাধ্যক্ষের কর্তৃত্বাধীনে একদল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদীকে এদেশে দ্বীপান্তরে পাঠান হন। কাপ্তেন ফিলিপ হচ্ছেন অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম শাসনকর্তা। বিনা বাধায় ও বিনাযুদ্ধে এত বড় একটা মহাদেশ ইংরাজের করতলগত হয়। ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ হচ্ছে নিউ-সাউথ-ওয়েলস—যার বর্তমান রাজধানী সিড্‌নি—অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর। ভিক্টোরিয়া প্রদেশের রাজধানী মেলবোর্ণ নগরের ফিট্‌জরয় গার্ডেনে কাপ্তেন কুকের কুটীর আজও (Capt Cooks cottage) মক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে।

কাপ্তেন কুকের ইয়র্কশায়ারস্থিত পৈতৃক বাসগৃহটি তুলে এনে অষ্ট্রেলিয়া-আবিষ্কারকের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আদিম মানুষের কাহিনী

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও নবীনতম মহাদেশ হচ্ছে অষ্ট্রেলিয়া। হাজার হাজার বৎসরের বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন অপসারিত ক'রে বিশাল মহাদেশকে সভ্য জগতের নিকট পরিচিত করল মুষ্টিমেয় ইংরাজ নাবিক। নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হ'তে চলল। মাত্র ১৭০ বৎসরের কথা। এরি মধ্যে একটা পোটা সভ্যতা অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে গড়ে উঠেছে। যদিও এ সভ্যতার একটা বৃহৎ দ্বিতীয় সংস্করণ হচ্ছে ইংলণ্ড-অধ্যুষিত অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র। ইংরাজ নাবিকের পদার্পণের পূর্বে এই অজ্ঞাত ও বিস্মৃত মহাদেশের অবস্থা কি ছিল—সেটা আধুনিক বৃত্তত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকগণের পরম কৌতূহলের বিষয়। যে কৃষ্ণবর্ণ মানুষ-গোষ্ঠী এদেশের আদিম অধিবাসী ও প্রকৃত মালিক, তাদের নিয়ে আজ পণ্ডিত সমাজে কিছু কিছু গবেষণা চলেছে। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন বৃত্তাত্ত্বিক অধ্যাপক—Prof. Elkin এবং Dr. Capell এর গবেষণা উল্লেখযোগ্য। অবসরপ্রাপ্ত Director of Nature Affairs and Advisor to the Commonwealth Govt. on Aborigines, মিঃ চিন্নেরী (Mr. Chinnery)

কোয়েলা—অষ্ট্রেলিয়ার নিরীহ পুষে জানুক

অষ্ট্রেলিয়ার ক্রমক্ষয়িষ্ণু আদিম অধিবাসীগণের কল্যাণ ও সংরক্ষণ নিয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আদিম অধিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে এঁদের সুচিন্তিত অভিমত ও পরিকল্পনা বিবেচনার যোগ্য।

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ আদিম অধিবাসী-গণের সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই নূতন নীতির নাম হচ্ছে Policy of Assimilation। ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা ও জীবিকার্জনের ব্যবস্থা—এই তিন উপায়ে আদিম অধিবাসীগণকে ক্রমে ক্রমে

শ্বেত অষ্ট্রেলিয়ার সমাজের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়াই—Policy of Assimilation-এর মূল কথা। আদিম অধিবাসীরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর —(১) অমিশ্রিত বা full-blooded aborigines (২) মিশ্রিত বা half-castes. Assimilition Policy বা একাকীকরণ নীতি প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণী বা half-castesএর উপরেই প্রযুক্ত। একদিক দিয়ে একাকীকরণ খুব কঠিন বলে মনে হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে যে এক, দুই বা বড় জোর তিন পুরুষের রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই কালা মানুষ তার কালোর সূচিকে একেবারে শ্বেতাঙ্গ-শ্রেণী ভুক্ত হয়ে পড়ে।

ক্যাঙ্গারুর সমগোত্র জাই—ওয়ালাবি

অষ্ট্রেলিয়ার আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় দ্বিগুণ, অথচ লোক সংখ্যা মাত্র ৮০ লক্ষ। জন-বিরলতা এদেশের একটা প্রধান সমস্যা। লোকসংখ্যা বাড়াবার জন্য এরা অনেক কিছু উপায় অবলম্বন করেছে। প্রত্যেক অষ্ট্রেলিয় নাগরিক অনূর্ধ্ব ষোল বৎসর বয়স সন্তানের জন্য সরকারী তহবিল হ'তে নির্দিষ্ট হারে ভাতা পেয়ে থাকে। সাদা চামড়া অর্থাৎ ইউরোপীয় যে কোন জাতীয় লোকের জন্যই অষ্ট্রেলিয়ার দ্বার অবারিত। কিন্তু সাদা চামড়ার আভিজাত্য এরা ছাড়তে নারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকার Apartheid নীতির মতো অতো উগ্র কালা-বিদ্বেষী না হ'লেও শ্বেত অষ্ট্রেলীয় (White Australian Policy) কালা আদমির প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত নয়। কালা আদিম অধিবাসীদিগকে শ্বেতাঙ্গ-রক্তে শোধন ক'রে লোক-বিরলতা সমস্যা সমাধানের একটা উৎকৃষ্ট Assimilation Policyর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আজ গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় নানা মিশনারী প্রতিষ্ঠান এই হাফ্-কাই, কোয়ার্টরুনদিগকে ক্রমশঃ অষ্ট্রেলিয় সমাজভুক্ত ক'রে নেবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। কিন্তু হাফ্-কাই কোয়ার্টরুন আর অমিমিশ্রিত (full blooded aborigines) আদিম অধিবাসী এ দুয়ের সমস্যা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের।

এক শত সত্তর বৎসর পূর্বে প্রথম যখন ইংরাজ ঔপনিবেশিক এদেশে আসে তখন সারা দেশে আদিম অধিবাসীর সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ। কমতে কমতে সেই সংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে মাত্র পঁচাত্তর হাজারে। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণস্থ টাসম্যানিয়া দ্বীপ হ'তে আদিম মানুষের দল সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছে। বাদ অষ্ট্রেলিয়ার পাঁচটি বিভাগ বা রাজ্য—কুইন্সল্যাণ্ড, নিউসাউথ ওয়েলস্, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অষ্ট্রেলিয়া এবং ওয়েষ্ট অষ্ট্রেলিয়া। পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভূমিই উর্বর, শস্যোৎপাদনোপযোগী এবং বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। মহাদেশের মধ্যভাগ এবং উত্তরভাগ মরুময়, পর্বতসঙ্কুল, অনুর্বর ও নির্জলা। দেশের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অংশ সবই শ্বেতাঙ্গ-অধ্যুষিত। সেখানে কালা আদমির প্রবেশ নিষেধ। মধ্য ও উত্তরাংশের উষর পার্বত্য ভূমিই কালা মানুষের একমাত্র বাসভূমি।

স্মরণাতীত কাল হ'তে এই কালা মানুষের দল এদেশকে আপনার ক'রে নিয়েছিল। জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে এরা নিজেদের অবস্থার উন্নতি বা পরিবর্তন সাধন করবার আদৌ কোন সুযোগ পায় নি। বনে, প্রান্তরে, মরুভূমি ও পাহাড়েপর্বতে প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আদিম মানুষের দল এক পরিবর্তনহীন আরণ্য যাযাবর জীবন যাপন ক'রে আসছিল। প্রকৃতির কোলে নির্বোধ শিশুর মতো এরা উলঙ্গ বিচরণ করত।

প্রথম যখন শ্বেতজাতির এদেশে আগমন হ'ল তখন এরা এই নূতন আগন্তুকদের না করল সাদর অভ্যর্থনা, না করল প্রতিরোধ। অভ্যর্থনা বা প্রতিরোধ দুই ছিল এদের পক্ষে অর্থহীন। অভ্যর্থনা করবার মতো এদের ছিল না কোন সম্পদ, আর প্রতিরোধ করবার মতো ছিল না এদের কোন কৌশল বা অস্ত্র শস্ত্র। ছোট ছোট দু'একটা মাছ ধরার ফাঁদ, কোথাও বা গাছের ছাল পালা দিয়ে তৈরী শাঁকো, গাছের বাকলে তৈরী এক চালা ডেরা (mia-mia), পাহাড়ের গায়ে গুহা আর আগুন-জাই —এই ছিল সারা দেশে মানুষ-বসতির একমাত্র নিদর্শন। শ্বেতাঙ্গ আগন্তুকেরা এদের এক রকমের আধব মানুষ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে নি, এরা বেড ইণ্ডিয়ান বা আফ্রিকার পিগমিদের মতো নূতন আগন্তুকদের সঙ্গে লড়াই করবার চেষ্টাও করেনি, কারণ লড়াই করবার উপযোগী কোন হাতিয়ারও এদের ছিল না। নূতন আগন্তুকের দল প্রায় বিনা বাধায় এদের জায়গা জমি, অবাধ বিচরণ স্থল, অরণ্য ভূমি দখল ক'রে নিল। এরা অনন্যোপায় হয়ে অপেক্ষাকৃত উত্তম উপকূলভাগ ছেড়ে মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ ক'রে আত্মরক্ষার প্রয়াস পেল। দেশের ভাল ভাল জায়গা সবই আগন্তুকদের করতলগত হ'ল—এদের ভাগে রইল অনুর্বর,

ফলহীন, পার্বত্য উষর ভূমি। জীবন ধারণের যে গুলি প্রধান প্রয়োজনীয় উপকরণ সে গুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে এরা জীবন সংগ্রামে প্রতি পদে পর্যুদস্ত হতে লাগল। আর তারই ফলে ১৭০ বৎসরের মধ্যে তিন লক্ষ সংখ্যা কমে আজ মাত্র ৭৩০০০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। এই ক্রম-ক্ষয়িষ্ণু জাতির কোন ভবিষ্যৎ নেই। ফল-এরা nesimilation policy'র প্রসাদে শ্বেতাঙ্গ সমাজের সঙ্গে বিলীন হয়ে যাবে, নতুবা ধীরে ধীরে ধরা পৃষ্ঠ থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আজ নৃতত্ত্ববিদেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরাই প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষের বংশধর। এদের বিলুপ্তিতে মানুষের সনাতন বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিজ্ঞানের পক্ষে সেটা হবে একটা শোচনীয় ক্ষতি। তাই বোধ করি আজকাল অষ্ট্রেলিয়ান গভর্ণমেণ্ট, তথা জনসাধারণ এই আদিম মনুষ্য-গোষ্ঠির অবশিষ্টাংশকে বাঁচিয়ে রাখবার কথা চিন্তা করছেন।

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও মানুষের ক্রম বিবর্তনের দিক দিয়ে আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রাপ্রণালী, আচার ব্যবহার, ভাষা, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি এক অতি চমৎকার এবং অনুধাবনীয় বিষয়।

মানুষ-সৃষ্টির আদিকাল হ'তে এরা প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে এক অকৃত্রিম আরণ্য-জীবন যাপন ক'রে আসছে। এদের জীবনেতিহাসে ক্রম-বিবর্তনের ইঙ্গিত বড়ই ক্ষীণ। প্রকৃতিকে এরা কোথাও লঙ্ঘন করে নি, প্রকৃতির নিয়মকেই এরা সর্বতোভাবে মেনে নিয়েছে। যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে নি সেখানে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা না করে বিনা প্রতিরোধে পরাজয় স্বীকার ক'রে নিয়ে বিলুপ্তি বরণ ক'রে নিয়েছে। এই আদিম মানুষের জীবনে "ক্রমবিকাশের" প্রলোভন কোন দিন দেখা দেয় নি। এরা নির্লিপ্ত, নিরুদ্বেগ, আরণ্য জীবন যাপন ক'রে আসছিল হাজার হাজার বৎসর ধরে। হয়তো আরো হাজার বৎসর এভিভাবেই কেটে যেত, যদি না ইউরোপীয় শ্বেত মানবের বিশ্বগ্রাসী লোভ দৃষ্টি এই মহাদেশের উপর পড়ত। বাইরের জগতের সঙ্গে কোন দিন এদের যোগাযোগ ছিল না। এদের জীবনে বাইরের কোন প্রভাব কোনদিন পড়ে নি এবং প্রতিযোগিতাহীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই মানুষের দল প্রায় একই অপরিবর্তিত অবস্থায় হাজার হাজার বৎসর কাটিয়ে দিয়েছে।

সর্ব প্রথম যে মানুষের দল এদেশে আসে, তারা ছিল খুব সম্ভবতঃ নিগ্রোবটু গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত—রং কালো, বেঁটে, ঠোঁট পুরু, নাক থ্যাবড়া, মাথায় চুল ভেড়ার লোমের মতো কোকড়ানো। এরা কিন্তু বেশীদিন এ মহাদেশে বাস করতে পারে নি, কারণ এদের পরে পরেই এল আর একদল, যারা নিগ্রোবটু গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত নয়। এই দ্বিতীয় দলের আকার প্রথম দল টিকে পড়ল আরও দূরে—দক্ষিণের ট্যাসম্যানিয়া দ্বীপে। এই দ্বীপে এরা প্রায় তিন হাজার বৎসর নিরুদ্বেগ জীবন যাপন ক'রে আসছিল। মাত্র একশত বৎসর আগেও ট্যাসম্যানিয়ার এই আদিম মানুষের কিছু চিহ্ন ছিল। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিকের অত্যাচারে অধিবাসীরা সম্পূর্ণ নির্বংশ হয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গের দল প্রথমে এসেই এদের ভাল ভাল জমি, বসতভূমি প্রভৃতি থেকে তাড়িয়ে সেই সব জায়গা নিজেরা দখল করে নিল। তারপর কখনো সামান্য কারণে, কখনো তাও অকারণে, প্রায় পশুর মত এই নগ্ন মানুষগুলিকে শিকার ক'রে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একবার একটা কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্রোহ পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু কাঠের বর্শা আর বুমেরাং নিয়ে এরা বন্দুকের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। সবাইকে হয় গুলির আঘাতে, নয় দূর নির্বাসনে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। ট্যাসম্যানিয়ার সর্বশেষ আদিম অধিবাসিনী এক কৃষ্ণাঙ্গী—নাম তার ট্রুকানিনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি শ্বেতাঙ্গদের দাসীবৃত্তি নিয়ে বেঁচেছিল। মারার আগে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিল যে তার মৃতদেহটি যেন তার জন্মস্থানে সমাহিত করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গীর এই শেষ অনুরোধ শ্বেতাঙ্গ প্রভু রক্ষা করে নি। ট্রুকানিনির কঙ্কাল ট্যাসম্যানিয়ার রাজধানী হোবার্ট শহরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।

ট্যাসম্যানিয়ার কালো নিগ্রোবটুর পরে যে দল এদেশে আসে তারাই হচ্ছে এদেশের আদিম অধিবাসী। লম্বা, দীর্ঘকায়, লোহা লম্বা চুল,

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীর বংশধর

গায়ের রং কালো—এই হচ্ছে এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য। এরা হল Black Caucasians অথবা Dravidians। অর্থাৎ বর্তমান ইউরোপীয় ও পৃথিবীর অন্যান্য জাতির পূর্বপুরুষ, পৃথিবীর প্রথম মানুষ। স্যার আর্থার কিথ্ বলেন "Of all the races of mankind now alive, the aboriginal race of Australia is the one which in my opinion, could serve best as common ancestor for all modern races."

এদের ব্যবহৃত ভাষায় এবং এদের অনেক আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অনেক প্রাচীন জাতির সঙ্গে এদের আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন মানুষকে এরা বলে ইল্জা (Ildja) তিব্বতীয়ের ভাষায় প্রতিশব্দ হচ্ছে ইল (ish); পিতাকে এরা বলে আবিয়া (abin) যার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে আব্বা (abbu)। এদের বুমেরাং এর

মতো অস্ত্র প্রাচীন মিশরীয়রাও ব্যবহার করত, যা প্রাচীন মিশরীয় প্রাচীরচিত্রে খোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায়। এদের একটা বিশিষ্ট ভাষা বা কতকগুলি সঙ্কেত চিহ্নও ছিল, যার অন্তর্নিহিত অর্থ আজ আর কেউ বুঝতে পারে না।

পণ্ডিতেরা এদের প্রস্তরযুগের মানুষের শ্রেণীভুক্ত করেছেন। অনাগতীত কাল হ'তে এদের জীবনধারণ প্রণালী একই অপরিবর্তিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসলেও কতকগুলি সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা এদের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করত।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে প্রকৃতি এদের প্রতি খুব বেশী অনুগ্রহ প্রকাশ করেনি। কি বনজ সম্পদ, কি জীবজন্তু, এমন কিছুই এদেশে ছিল না যা থেকে এরা প্রাণধারণের উপযোগী সামগ্রী খুব বেশী আহরণ করতে পারত। দেশের মাটি অধিকাংশেই অনুর্বর, বন্ধুর ও জলাভাবে উষর। ক্যাঙ্গারু, কোয়োলা (ভালুক) আর ম্যাপিপাল ছাড়া অপর উল্লেখযোগ্য বন্য জন্তু এত বড় মহাদেশের কোথাও দেখা যায় নি। খাদ্যোপযোগী ফল প্রায় নেই বল্লেও চলে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কাঙ্গারুর মাংস, নদী নালার মাছ, আর বুনো দুচার রকমের গুটি ফল—এই ছিল এদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু আদিম এবং অনুন্নত হ'লেও এই মানুষগুলি বুদ্ধিমান জীব। কেবল সুযোগের অভাবেই এরা হাজার হাজার বৎসর ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে নূতন ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবে এরা খুব সহজেই সাড়া দেয়।

বিগত বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন বিভাগে আদিম অধিবাসীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাধারণতঃই এরা বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছে। বিশেষ ক'রে কারিগরির কাজে এরা খুবই নিপুণ। সুযোগ সুবিধা পেলে এরাও যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সমান তালে তাল দিয়ে চলতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কতকগুলি আচার ও প্রথা উল্লেখযোগ্য।

এদের ধর্মবোধ সকল আদিম মানুষের মতোই ভীতি-সঞ্জাত। কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র ক'রেই এদের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন বিবর্তিত। এই সব অনুষ্ঠানের মূলে হয়তো কোন নিগূঢ় রহস্য বা অর্থ কোনদিন নিহিত ছিল, কিন্তু আজ সেই রহস্য উদ্ঘাটন করবার কোন উপায় নেই। ফলে এদের আচার অনুষ্ঠান কতকগুলি দৈহিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছু ব'লে ভাবা যায় না। পর্বতগাত্রে অঙ্কিত সঙ্কেতলিপি ও চিত্র, নাচ বা গান কোন কিছুর মধ্য দিয়েই আদিম মূলসূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না। কখনো-কখনো কোন ক্রিয়া বা লৌকিক আচারের মধ্যে একটু একটু প্রতীকতা বা symbolismএর প্রচ্ছন্ন আভাষ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে এদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির কোন বিশেষ উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্বপ্ন দেখাই এদের জীবনের সর্বোচ্চ আত্মিক উপলব্ধি। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে যেন এরা একটা অজ্ঞাত ও রহস্যময় শক্তির ভীতিপ্রদ আভাষ পায়। কিন্তু সেই শক্তির কোন আধ্যাত্মিক অনুধ্যান এদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। একটা অদৃষ্ট ও অজ্ঞাত ভীতিই হচ্ছে এদের আচার অনুষ্ঠান, উপকথা বা বিশ্বাসের মূল ভিত্তি। ভূত কাহিনে জ্ঞান, উক্তি বা উপলব্ধির উচ্চস্তরে এরা কোন দিনই উঠতে পারে নি। মানসিকতার দিক দিয়ে তাই এরা রয়ে গিয়েছে সেই আদিম অবস্থাতে।

ব্যবহারিক জীবনেও এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন বা ক্রমোন্নতি ঘটেনি। হাজার হাজার বৎসরের ব্যবধানেও এদের আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ প্রভৃতি সেই একই অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ, অপরিবর্তিত প্রাকৃতিক অবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ সংঘ্রমহীনতা—এই তিন কারণেই এদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আগুনের ব্যবহার এরা জানত। কাঠে কাঠে বা পাথরে পাথরে ঘষে এরা আগুন উৎপাদন করত—কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে অগ্নি-উৎপাদন বা অগ্নির তাপ-সংরক্ষণ এরা করতে শেখে নি। জমি চাষ এরা করতে জানত না—এই বিরাট মহাদেশে এমন কোন জন্তুও কোনদিন ছিল না, যা মানুষ পোষ মানিয়ে তার কাজে লাগাতে পারে। ক্যাংগারু-শিকার আর মাছ-ধরা এই ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। শিকারের অস্ত্র ছিল পাথর বা কাঠের কলাকিশিষ্ট বর্শা। তীর বনুকের ব্যবহার এরা করতে জানত না। বুমেরাং বা বাঁকা কাঠের হাতিয়ার অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষের এক বিশেষ অস্ত্র। মেয়েরা কখনো কখনো গাছের ছালে দেহ আবৃত করলেও উলঙ্গ বিচরণ করাই ছিল এদের রীতি। গৃহবিহীন অবাধ যাযাবর জীবনের একমাত্র তাগিদ ছিল আহারান্বেষণ ; গাছের ছালে তৈরী ডিঙ্গি বা canoe নিয়ে বহির্লুদ্রে মাছ ধরায় এরা ক্ষিপ্রতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিত। সিডনি, মেলবোর্ণ, হবার্টের যাদুঘরে আদিম জাতির হস্তশিল্পের যে সব নিদর্শন রক্ষিত আছে তা দেখলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বন্য বর্বর জীবনেও এরা একটা প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির ধারা অনুসরণ করে আসছিল। এদের তৈরী চাল, লাঠি, বড়ি প্রভৃতির গঠন-নৈপুণ্যে শিল্পীর একাগ্রতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

সামাজিক আচার ব্যবহারেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সারাদিনে শিকারে যা কিছু সংগৃহীত হ'ল সেটা শিকারীর একা ভোগের বস্তু নয়—দলের যে যোদ্ধার প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট হারে আহার্যের ভাগ পাবে।

মুসলমান এবং ইহুদীদের মতো এরাও ছুন্নত বা circumcision প্রথা পালন করে। স্ত্রীলোকের গর্ভধারণে পুরুষের সঙ্গ বা সহবাস যে প্রাকৃতিক নিয়ম—এই মৌলিক তথ্য এদের নিকটে অজ্ঞাত। ওদের বিশ্বাস সন্তান-প্রজনন কোন লৌকিক প্রক্রিয়ের ফল। কোন স্ত্রীলোক কতকগুলি বিশিষ্ট সময়ে কোন বিশিষ্ট জায়গায় গেলেই নাকি তার গর্ভসঞ্চার হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন ও শিক্ষা দিবার উপর মা ব'র্তে, তার মামুলের উপর বর্তায়।

ছুন্নৎ বা circumcision পর্বের পর একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন পুরুষই কোন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না। অন্যথায় একমাত্র শাস্তি—মৃত্যু।

ক্যাঙ্গারু-নাচ এদের আমোদ-প্রমোদের একটা বিশেষ অঙ্গ। খেলাধূলা বা অবসর বিনোদনের দিক দিয়ে এদের বৈশিষ্ট্য খুব বেশী নেই। লুকোচুরি খেলার মত এদের ছেলেরাও এক রকম খেলা ভালবাসে। নাম তার কলাটা পরমপদ। প্রকৃতপক্ষে কষ্টের জীবন সংগ্রামের বিরামহীন তাগিদে এদের অবসর বিনোদন ও খেলাধূলার অবকাশ ছিল খুবই কম।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

হরিহর আজ বাড়ী হইতে চাকুরীস্থলে যাইবে, যাত্রার শুভদিন, গোপাল ঠাকুর দেখিয়া দিয়াছেন। সদর দরজায় গরুর গাড়ী অপেক্ষমান, ভারবাহী বলদ দুইটি দুই আঁটি শুষ্ক খড় চিবাইতেছে। গাড়োয়ান ভিতর হইতে চাউল প্রভৃতি তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া লইয়া গাড়ীর মাঝে সাজাইয়া রাখিতেছে, পথে ফিরিবার কালে তাহাকে পথে রাঁধিয়া খাইতে হইবে। রেল ষ্টেশন হইতে ফিরিবার সময় গরুরও বিশ্রাম প্রয়োজন এবং চালককেও ভাত খাইয়া লইতে হয়। কুকুটিয়ার আমবাগানে সকলেই রাঁধিয়া খায়—

হরিহর সহপাঠী চাঁদমোহনের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, তাহার যাইতে এখনও দুই চারদিন দেরী হইবে। হরিহরের স্ত্রী বাক্স পেটরা প্রভৃতি দেখাইয়া দিতেছিলেন, গাড়োয়ান একে একে তুলিতেছিলেন। হরিহর ফিরিয়া আসিলে গোপাল প্রশ্ন করিলেন—কি বাবা, দেখা হ'ল, কথাবার্ত্তা সব হ'ল—

—হ্যাঁ—কি যেন একটা কথা বলিতে যাইয়া হরিহর থামিয়া গেল। গোপাল পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কি কথা সব হ'ল ?

হরিহর মাটির পানে চাহিয়া কহিল—চাঁদু বলছিল, ওখানে একটা বাড়ী করে ফেলার কথা, নইলে পরে ঠকতে হবে—গ্রাম আর বাঁচবে না, সহরে বাড়ী থাকলে—

গোপালের আর ধৈর্য্য ছিল না, তিনি কহিলেন—তা করো বাবা, যা সুবিধে হয়। আমরা গ্রামে থাকি, গ্রামের কথাই ভাবি, শহর বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তুমি ভেবো না—তোমার সমস্ত ধান ও হিসাব আমি ঠিক রাখবো—

হরিহর জবাব দিল না। হরিহরের স্ত্রী গোপালের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে গোপাল কহিলেন—সাবধানে থেকো মা, হরির সেবা-যত্ন করো—ঘরের দিকে চাহিয়া কহিলেন—লাউয়ের হাঁড়িটা গাড়ীতে দিয়েছ' ত ?

দরজার পাশে স্ত্রী দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি কহিলেন—এই ত সে হাঁড়িটা, এটা তুমি না হয় হরি তুলে নিক্। ও ছোঁবে কি করে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত বটে ! গোপাল হাঁড়িটা গাড়ীতে তুলিয়া দিতে যাইতেছিলেন—হরির স্ত্রী কহিল—গাড়ীতে ত অনেক জিনিষ হ'য়ে গেছে, ওটা থাক্, ওরা লাউ টাউ খায়ও না—

—তা হোক্, পথে একটু খাবে—মানুষ ত ছেলেমানুষ খিদে পাবেই—

হরি কহিল—শুধু শুধু নষ্ট হবে ত—

—হোক্—থাক্ আর নাই থাক্, যাবার সময় একটু কিছু দেওয়াই ত' আমাদের আনন্দ, হরি। দাদার দুঃখের পরে কত কষ্টে তোকে মানুষ করেছিলাম কিন্তু দু'দিন তোদের নিয়ে থাকতে পারি না।

হরি প্রণাম করিল। গোপাল বৌমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—বৌমা, যে ক'দিন আমি আছি, ওদের নিয়ে এসো—একটু দেখবো—

বৌমা কহিলেন—আসতে ত চায় কিন্তু আসা যে কষ্ট—অর্থাৎ হরি আসিতে চায় কিন্তু পথশ্রমের ভয়ে আসা চলে না।

গোপাল জবাব দিলেন না। হরিহর গাড়ীতে উঠিলেন—গোপাল উচ্চকণ্ঠে বেদমন্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিলেন। গাড়ী ধীরে ধীরে বাঁকের পরে অদৃশ্য হইয়া গেল—হরি ও বৌমা কেহই ফিরিয়া চাহিল না, দরজায় দাঁড়াইয়া গোপাল ও তাহার স্ত্রী সাশ্রু নেত্রে এই বিদায় দৃশ্য দেখিলেন—গোপাল একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া ফিরিয়া চাহিলেন—তাহার নির্বাক স্ত্রীর গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। গোপাল কহিলেন—যাও—আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে !

গোপালের মনে হইল—হরিহর আজ তাহার হৃদয় নিঃশেষে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিয়া গেল। একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় তিনি মৌনভাবে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন।

ঠকাটা সারিয়া লইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন—অনেক কথা—হরি তখন ছোট ছিল—তাহার বিবাহ দিলেন তখন তাহার স্ত্রী গলার হার খুলিয়া দিয়াছেন, সে হার তাহার বৌঠাকরুণ দিয়াছিলেন। এমনি কত কি—

গোপালের স্ত্রী অঙ্গ মার্জনা করিয়া কলসী লইয়া ঘাটে রওনা দিলেন। গোপাল দেখিলেন তাহার মুখ বিষণ্ণ—বিষাদ বেদনায় যেন কালির প্রলেপ পড়িয়াছে। এই নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও ওই স্ত্রীলোকটি একান্তে বসিয়া লাড়ুগুলি তৈয়ারী করিয়াছে কিন্তু উহারা লইতে চাহে নাই—এমনি অকুণ্ঠ স্নেহের দান তাহারা ফিরাইয়া দিতেছে। কি দিতেছে তাহাই শুধু দেখিল। কিন্তু কে দিল, কত স্নেহে, কত আগ্রহে, কত কষ্ট করিয়া দিল তাহা একবারও দেখিল না। এত কষ্ট করিয়া, এত সহ্য করিয়া তিনি কি হরিকে এই শিক্ষা পাইতে সহরে পাঠাইয়াছিলেন।

গোপাল মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাই তাড়াতাড়ি একবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন।

চাঁদমোহন সরকার তিনুকে লইয়া খাজনা আদায় করিতেছিলেন। প্রজারা কেহ বাহিরে কেহ ভিতরে বসিয়া ছিল। এক একজন ডাক হইতেছিল এবং তাহারা সাধ্যমত খাজনা দাখিল করিয়া চেক লইয়া যাইতেছিল। নিষ্প্রয়োজন বোধে শশধর আসেন নাই—এবং পাছে তিনি কোন দয়াদাক্ষিণ্য করিয়া বসেন এই ভয়ে চাঁদমোহন তাহাকে দূরেই থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

বলাইএর ভগ্নিপতি অর্থাৎ সরোজের সাঙ্গার স্বামী আসিয়াছিল। সেও ভিনগ্রামের প্রজা—সে পাঁচ বিঘা জমি রাখে, খাজনা সোয়া ছয় টাকা। বুদ্ধরী-আনা সেস্ প্রভৃতি লইয়া প্রায় সাত টাকা। মথুরের ডাক পড়িল—

মথুর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। তিনু কহিল—খাজনা কি এনেছ দাও—

মথুর একটু নিরীহ সৎপ্রকৃতির দীন লোক। সে কহিল—হুজুর—

চাঁদমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন—খাজনা টাজনা কিছু এনেছ না যে দেখতে এসেছ?

—দিতে লারছি হুজুর। ঘরে ত পেটভাত নেই—এক বেলা খাওয়া করছি হুজুর—

—সকলে পারছে' তুমি পারছ' না। ও সব শয়তানী আমি বুঝি—

—হুজুর মা বাপ্, কি করবেক হুজুর।

—কিস্তিতে কিস্তিতে নালিশ হবে। আর আমাদের কতটুকু জমি চাষ কর?

তিনু কহিল—পাঁচ বিঘে—

—এবার ছাড়িয়ে দেব—সব সিধে করে দেব—

মথুর কাতর কণ্ঠে কহিল—হুজুর—

—যা—যা—হুজুর হুজুর ক'রতে হবে না—

মথুর ম্লানমুখে ফিরিয়া আসিল। শিবুর ডাক পড়িল—শিবু দুই টাকা দিয়া কহিল—ধানচাল বেচা করলেক হুজুর, মুখের ভাত হুজুর বেচা করে দু'টাকা দিচ্ছেন হুজুর—

—তহরী দু'আনা। তিনু বলিল।

—লেবেক হুজুর, দুদিন বাদে—

চাঁদমোহন কহিলেন—আচ্ছা ওটা জমা করে দাও—তহরী দিয়ে যাবি—

—আজ্ঞে হুজুর—

নিতাইও দুই টাকা দিয়া নিষ্কৃতি পাইল। তাহার পর ডাক পড়িল বলাইএর—বলাই উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, মনে মনে একটা বিদ্রোহ তাহার মাঝে ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সে চুপ করিয়া রহিল। চাঁদমোহন কহিলেন—খাজনা এনেছিস্?

—আজ্ঞে হুজুর দিতে লারবেক। কোথায় পাবেক, ধরের ধান ত ভাদর মাসে ফুরালেক। মনিষ খাটাবেক কে এখন—

চাঁদমোহন কহিলেন—হুঁ—তোমার আর কিছু ছুটলো না—বেটা ধাড়ি বদমায়েস—

বলাই কহিল—কোথা পাবেক কর্তা—চুরি ডাকাতি করতে যুলারবেক—

—ও এরা বুঝি সব চুরি ডাকাতি করে টাকা আনছে—আর তুমি সতী লক্ষ্মী—ওর সব জমি ছাড়িয়ে দেবে তিনু—ভিটে থেকে উচ্ছেদ করে দেব—

বলাই কোন কথা কহিল না। দূরের পানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদমোহন এই অবাধ্য প্রজার বিনয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—দূর হ বেটা, জুতিয়ে তাড়িয়ে দেব—বদমাইস—

বলাই কহিল—মালেক তব বটেই হজুর—বলাই চলিয়া আসিল।

সে জানিত, যাইতে তাহাকে হইবেই—শুধু এই কাছারী হইতে নয় এ গ্রাম হইতেও। বলাই কাছারী হইতে বাহির হইয়া আপন মনে বাড়ীর দিকে চলিল—গ্রামের সর্বাঙ্গে একটা মমতার চাহনি বুলাইয়া একবার চকিত ভাবিল, এর গাছ-পালা পথ-ঘাট তাহার কত আপনার, কিন্তু তবুও তাহা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

পথে গোপাল ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। বলাই প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল—ঠাকুর মশায় মোরা চলে যাবেক—

—কোথায় যাবি ?

—ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক, কেমনে গাঁয়ে থাকবেক বাবাঠাকুর—

গোপালের মনটা ভাল ছিল না। চাঁদমোহনের খাজনা আদায়ের ব্যাপার সবই জানিতেন। এই কয়েকটি কথায় সবই তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি একটু বিচলিতভাবেই বলাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

বলাইএর অশ্রুপূর্ণ চোখ দুইটির দিকে চাহিয়া তাহার বেদনা কোথায় তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কহিলেন—তাই কি হয় রে বলাই, প্রজা না থাকলে জমিদারের জমিদারী কি ? আজ কাল অমনিই হয়েছে,—তাই বলে গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবি ? চৈত্র মাসে খাজনা দিস, তা হলেই সব মিটে যাবে—

কথা কয়েকটির মাঝে বলাই অনেকটা সান্ত্বনা পাইয়া যেন আপনার দুঃখকে অনেকখানি ভুলিয়া গেল। গোপালের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া পুনরায় প্রণাম করিল। গোপাল কহিল—বেঁচে থাকো, সুখে থাকো—

বলাই অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল কিন্তু গোপাল হাসিলেন—তাহার এ আশীর্বাদ একেবারেই মিথ্যা। কেহ বাঁচিয়াও আর থাকিবে না। কেহ আর সুখেও থাকিবে না। গ্রামের সে শান্ত নীরব শুচি পরিবেশ চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে।

বলাই ঘরে যাইয়া বিষণ্ণ মনে বসিয়াছিল। যদি চৈত্র মাসে বর্গা জমি সব বাহির হইয়া যায়, তবে থাকিবে মাত্র দুই বিঘা জমি, তাহাতে ভরণ-পোষণ চলিতে পারে না। বলাইএর স্ত্রী মালিনী প্রশ্ন করিল কি হলেক রে ?

বলাই কহিল—তু বুঝবি না, ছোটবাবু সব জমি ছাড় করাবেক।

—কেনে—

—খাজনা দিতে লারবেক।

মালিনী কথাটার অনেকখানি বুঝিয়াছিল। সে কহিল, জমি সব দিয়ে দিলে খাবেক কি ? বলনি না—

—এ ত কর্ত্তা নয় রে মালি, এ ছোটবাবু—কোন কথা শুনবেক নাই, তার কথাই শুনতে হবেক—সে কাল আর নাই রে মালি—

—কি করবি ?

—পেট ভাত না জুটে ত খাদে যাবেক, কয়লা কাটবেক—

মালিনী কহিল—গরু কি করবি ?

—বেচা করবেক—যা তু কাম কর—

বলাই বিরক্ত হইয়াছিল, সে আর কোন কথার জবাব দিল না। মালিনী অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল—প্রস্তুতঃ গৃহকর্ম্মে—

বলাই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ক্রমেই উত্তেজিত হইতেছিল—যাহা হইতেছে এবং যাহা হইতে যাইতেছে সবই যে অন্যায় ও অত্যাচার—এ বিষয়ে তাহার কোন সংশয় ছিল না, মনে মনে চাঁদমোহনের প্রতি একটা ক্রোধ ও অভিমানে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল—

নিতাই আসিয়া কহিল—বলাই, দে তামাক খাবেক—

বলাই ইঙ্গিতে হুকা কলিকা ও তামাকের সরঞ্জাম দেখাইয়া দিল। নিতাই তামাক সাজিয়া আনিয়া কহিল—তোর খাজনা ত আড়াই টাকা—হাঁরে বলাই—

—হ্যাঁ বটে—

নিতাই কহিল—চল্ আজ মাছ ধরা করি, কাল পাঁচ সিকে খাজনা দেওয়া করবেক। ছোটবাবু জমি ছাড়া করাবেক নাই। ওর মাছে ওর খাজনা দেওয়া কর কেনে—যেমন কাজ তেমনি ফল পাবেক—মোরা ত তাই করলেক—আরও একটা মাছ সেদিন ভাজা করে খাওয়া করলেক—

বলাই কিছু কহিল না। চুপ করিয়া রহিল—সে জানিত বসন্ত সায়রের মাছ বিক্রয় করিয়াই নিতাই ও শিবু খাজনা

পরিশোধ করিয়াছে। কিন্তু একটা অন্যায় দ্বারা আর একটা অন্যায়ের প্রতিকার হয় না বরং অন্যায়ের মাত্রা বাড়িয়া চলে, এই কথাই বোধ হয় বলাই তাহার মত করিয়া ভাবিতেছিল। নিতাই হুঁকা দিয়া কহিল—বলাই কি হবেক রে?

বলাই হুঁকা টানিতে টানিতে কহিল—ভগমান যা কপালে লিখ্‌লেক তাই হবেক।

—তু চল, মাছ ধরবেক—

—না, মু চুরি ক'রবেক নাই। জমি ছাড়া ক'রলে খাবেক কি? যাবেক—চুরি করবেক কেনে? মোর বাবা বল্‌লে, কত্তা যখন গঙ্গা যাত্রা করলেক, মা ঘরে কেঁদে আঁচল ভেজা করলেক। মোদের বাড়ী পুজলেক তাই বলম্ব সায়র বানা করলেক—তার মাছ চুরি মু করবেক না—

তবে জমি ছাড়বেক—

—মু ত ছাড়লেক নাই, ছোটবাবু ছাড়া করাবেক ত ছাড়বেক

—নপুর কি করবেক?

—কে জানছে—সব খাদকে যাবেক। তোরা বিশ বিঘা চাষ করবি—তোদের ক্ষেতকে আটকাবেক—

নিতাই এ সব যুক্তির কিছু বুঝিল না। একরাত্রি একটু পরিশ্রম করিলেই ত খাজনা পরিশোধ হয় তবে কেন এত কষ্ট করা। নিতাই কহিল—কি বুঝছিস্ তু?

বলাই জবাব দিল না, নিতাই চলিয়া গেল। বলাই হুঁকা টানিয়া যাইতে লাগিল। মালিনী আসিয়া কহিল—খুড়ি ত নাই রে—

বলাই একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দা লইয়া বাঁশ ঝাড়ের দিকে রওনা দিল। কঞ্চি কাটিয়া আনিয়া দুইটা খুড়ি তৈয়ারী করিতে হইবে।

গোপালের ইচ্ছা ছিল না তবুও অভ্যাস বশতঃ চাটুয্যেদের কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বেলা এক প্রহর হইয়াছে—বাহিরে শারদীয় দিগন্তরোদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবী—গোপাল ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

প্রজারা সকলে চলিয়া গিয়াছে, তিন্ন আদায়ী টাকার হিসাব করিতেছিল, চাঁদমোহন বসিয়াছিলেন, শশধর একপাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন।

গোপাল প্রবেশ করিতেই, শশধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—বসুন, ঠাকুর মশায় বসুন—হঠাৎ এমনি সময়?

(ক্রমশঃ)

বঙ্গসাহিত্যে হীরেন্দ্রনাথের দান

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

কয়েক বৎসর হইল দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যায় যে কার্য বঙ্কিমচন্দ্র আরম্ভ করিয়াছিলেন, হীরেন্দ্রনাথ চিরজীবন সেই কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সেজন্য সময়ে সময়ে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিক হিন্দুসমাজের অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। তাঁহার "রাস-লীলা" প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা অতিরঞ্জনের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার দানে বঙ্গভাষা যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে দান ত্রিবিধ।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ।

এই সূত্র অনুসারে বর্তমানকালে সাহিত্যে সাত্ত্বিক দান দুর্লভ। সৌভাগ্য-ক্রমে সাহিত্যসেবা দ্বারা বর্তমানে জীবিকার্জন (কঠিন হইলেও) পূর্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে এবং কয়েকজন স্বল্পসাহিত্যসেবী সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদের দানকে কিন্তু সাত্ত্বিক দান বলা যায় না। অর্থ কামনা না করিয়া কেবলমাত্র যশো-লাভের আকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাঁহাদিগের দানও সাত্ত্বিক নহে। কিন্তু ইহা হইতে যদি অনুমান করা যায় যে সাহিত্য দান কখনও সাত্ত্বিক হইতে পারে না—কেন না যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা সকল সাহিত্যিকেরই থাকে, (মহাকবি কালিদাসেরও ছিল) তাহা হইলে ভুল হইবে। কেননা প্রাচীনকালে অনেক কবি কেবল লোক-হিতার্থেই সাহিত্য-রচনা করিয়া, তাহা সুপ্রসিদ্ধ পূর্বগত সাহিত্যিক-দিগের গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, স্বনামধন্য হইয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই। হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার মূলে ছিল,

তাহার অকৃত্রিম ঈশ্বরপ্রীতি ও দেশপ্রীতি এবং তাহার চরিত্রের ভিন্ন বৈশিষ্ট্যও পাঠকের চোখে। কলাবিদ্‌বিবর্জিত মনে করিলে, তাহা সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক না হইলেও সাত্ত্বিক ভাবেরই সান্নিধ্যবর্তী।

হীরেন্দ্রনাথ ব্যবহারাজীবী ছিলেন, কিন্তু জীবিকার জন্য উক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার অধিকাংশ সময় সাধনালোকেতেই অতিবাহিত হইত। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং স্বীয়তী আনি বেসান্তের বিশ্বস্ত শিষ্য ছিলেন। অল্পবয়সে থিওসফির মত প্রচারের জন্য তিনি ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পারঙ্গমী এই মনীষী অর্ধশতাব্দীকাল বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদর্শনের ব্যাখ্যা করিয়া এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আধুনিকতম মতের সহিত তাহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দু যুবকদিগের মন হইতে হীনমন্যতা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা যে কতদূর পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময় ছিল যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শনের কিছুমাত্র কোনও স্থান ছিল না। আমরা যখন বি-এ পড়ি, তখন বি-এ অনার্সেও হিন্দুদর্শনের পাঠন হইত না। বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত। এখন আই-এ ছাত্রগণ হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে অল্পাধিক জ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হন। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে সাময়িক-পত্রিকাগুলিতেই কেবল হিন্দুদর্শনের আলোচনা হইত। হীরেন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনাই সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রহ্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব হিন্দুধর্মের দুইটি প্রধান স্তম্ভ। উহার তত্ত্বই উপনিষদে বিবৃত আছে। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভাষায় উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিতবর ৺কালীবর বেদান্তবাগীশের শঙ্করভাষ্য ও অনুবাদসহ বেদান্তদর্শন যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু অধ্যাপকের সাহায্য ব্যতীত তাহা বুঝিতে পারা সকলের পক্ষে সম্ভবপর হইত না। হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার "উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব" এবং "বাক্‌তত্ত্বের অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক প্রবন্ধ "প্রবুদ্ধিকা" ও অন্যান্য সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবিতকালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য সংশোধিত করিয়াছিলেন। এতদিন পরে সেই সকল প্রবন্ধ "উপনিষদে ব্রহ্ম ও জীবতত্ত্ব" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থে ব্রহ্মতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন বিদ্যার্থীর নিকট সাধারণতঃ দুর্গৃহীত হয়। পাতঞ্জলদর্শন ইহার সেবাহরণ। সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিপ্রস্তরের মূল যে উপনিষদে নিহিত, গ্রন্থকার বহিস্তরে তাহা দেখাইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মকে বিষয়রূপ ত্রিগুণ ত্রিবর্ণরূপ বলা হইয়াছে। আবার ঐ উপনিষদেই "অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ" বলিয়া প্রকৃতির বর্ণনা আছে। মৈত্রায়ণী উপনিষৎ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াও গ্রন্থকার সাংখ্যদর্শন যে উপনিষদ হইতে উদ্ভূত তাহা দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান-ভিক্ষু ১।৬৯ সাংখ্যসূত্রের ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ-রূপা বিদুষ্যা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

সাংখ্যদর্শনমতে অচেতন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে। এই বুদ্ধিও অচেতন, চেতন পুরুষের প্রতিবিম্ব উহার উপর পতিত হইলে উহা চেতনের মতো হয়। অনাদি পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগের ফলে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়; সে বুদ্ধি জীবের ব্যক্তিগত বুদ্ধি হইবার কথা। কিন্তু এই বুদ্ধিকে (মহত্তত্ত্বকে) কেহ কেহ সমষ্টি বুদ্ধি (Cosmic Intellect) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হীরেন্দ্রবাবু এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার বিস্তারিত আলোচনা করেন নাই। কিন্তু অনাদি পুরুষের সহিত সংযোগের ফলে প্রকৃতির যে বিকার হয়, তাহা জীবের বুদ্ধি হইতে পারে কি না, তাহা বিচার্য। আবার তাহা যদি ব্যক্তিগত বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই বুদ্ধি হইতে যে পঞ্চতন্মাত্র ও পরে স্থূলভূত-সমূহের উদ্ভব হয়; তাহাদিগের দ্বারা সমষ্টিবুদ্ধি সাধারণ বাস্তবজগতের উৎপত্তি হইতে পারে কি না, তাহাও বিচার্য। বেদের সাংখ্যদর্শনে এ সমস্যা নাই, কেননা উহার সাধারণ বুদ্ধির আধার এক চেতনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য-পাতঞ্জলে এই সমস্যার সমাধান কি? অবশ্য তত্ত্বের পূর্বে যে বুদ্ধির উদ্ভব হয়, তাহা অবশ্য জাতিজীবের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত নহে। কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিত্বের বীজ তো নিহিত। কিন্তু ভিন্ন ব্যক্তির বীজসম্বলিত বুদ্ধি হইতে এক সাধারণ জগতের উদ্ভব অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। উপনিষদে যে ব্রহ্মতত্ত্বের কথা আছে, তাহা যে সমষ্টিগত বুদ্ধি (Cosmic Intellect) তাহাতে সন্দেহ নাই।

৫৬১ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে গ্রন্থকার বহু বিষয়ের আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাদের সম্যক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। পরব্রহ্ম ও প্রজাপতি অধ্যায়ে—ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সম্বন্ধ, সৃষ্টি ও উৎক্রান্তি অধ্যায়ে জীবের পারলৌকিক অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় যে যে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার সকলই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

"কর্মবাদ ও জন্মান্তর" গ্রন্থে যেমন পাশ্চাত্য যুক্তি কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে যে ভ্রান্তি সমূহ অতি বিস্তারিতভাবে তাহা গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এবং পাশ্চাত্য মত খণ্ডন করিয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূপ আলোচনা পূর্বে কোনও গ্রন্থে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বর্তমানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার যতটা বিস্তার হইয়াছে, সেই পরিমাণে বিদ্যার্থীর আগ্রহের সৃষ্টি হয় নাই। সেইজন্য উপন্যাস গল্পের কদর যতটা চাহিদা থাকিলেও দর্শন-বিজ্ঞান-ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক গ্রন্থের পাঠক বেশী নাই। ইহা সত্ত্বেও হীরেন্দ্রনাথের কোনও কোনও গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ পর্যন্ত হইয়াছে। তাঁহার উপনিষদ ও জন্মান্তর গ্রন্থদ্বয়েরও যে অনুরূপ প্রসার হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সানফ্রান্সিস্কো

এক পরিবারে এখানে একটি ছোটখাটো ঘরে বক্তৃতা দিতে হ'ল। Metaphysical Hall—এখানে কত যে বই দেখলাম ধর্ম সম্বন্ধে! গুরুদেবের বই ও ছবিও দেখলাম। এমন কি রমণ মহর্ষির ছবিও এরা রেখেছে। আনন্দ হ'ল। মনও উঠল উঠিয়ে গুরুদেবের কথা বলতে গিয়ে, বলে ফেলেছিলাম বলিও বেশি বড় হো বড়—তাই সব জড়িয়ে ১০।৮০ জন শ্রোতা ও শ্রোত্রী শুনল আমার বক্তৃতা শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে। আমি বলেছিলাম প্রায় এক ঘণ্টা পনের মিনিট। বাংলায় তর্জমা ক'রে মর্মটুকু দিই সংক্ষেপে।

"আপনাদের কাছে আমি আসি নি আজ বক্তা হিসেবে—এসেছি আপনাদেরই একজন হ'য়ে, মানে জিজ্ঞাসু সত্যার্থী। যা বলতে যাচ্ছি তার কিছুই হয়ত আপনাদের অজানা নেই, তবু যদি কেউ কিছু অনুভব ক'রে থাকে হয়ে সেই অনুভবের তাগে ভাষা কথাও হয়তো প্রার্থী হয়। এইটুকুই যা আমার ভরসা।

"ভারতবর্ষে একটি কথা হয়ত অন্য দেশের চেয়ে বেশি স্পষ্ট ক'রে বার বার প্রাণ হয়েছে: যে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ-কথা আমরা বহুদিন থেকে শুনে ও প'ড়ে আসছি এবং এক সময় ছিল যখন এ-যোগের অবিশ্বাস করার কথা ভাবতেও পারতাম না। কিন্তু গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক দীক্ষার প্রভাবে আমরা ভাবতে সুরু করেছি: এও কি সম্ভব? এক তো প্রথমত ভগবান আছেন কি না এই সোড়া করেই টানাটানি। তার পর যদি বা ধ'রে নেওয়া যায় যে এ জগতের এক নিয়ন্তা আছেন। যিনি অনাদি অনন্ত 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'—তখনও বিস্তর সন্দেহ, প্রশ্ন ওঠে: অণোরণীয়ান্ যাঁর মহতো মহীয়ান্‌কে দেখে পারে? এ-প্রশ্নের উত্তরে কবীর বলেছেন যেমন যে সিন্ধুতে বিন্দু দেখতে পায় সবাই, কিন্তু বিন্দুতে যিনি সিন্ধু দেখেন সেই বিরল দ্রষ্টারই উপাধি—জ্ঞানী।

"কিন্তু এ-দর্শন যে আমাদের আয়ত্তাধীন একথা জানব কার কাছে? না, তাঁদের কাছে যাঁরা দেখেছেন, যাঁদের নাম জ্ঞানী বা ঋষি বা মহাপুরুষ। বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন এমন মহাপুরুষের দেখা, প্রশ্ন করেছিলেন তাঁকে: "আপনি কি দেখেছেন তাঁকে?' উত্তরে হেসে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব: 'শুধু যে দেখেছি তাই নয়, তোমাকে দেখাতে পারি যদি তুমি চাও সে পথের পথিক হ'য়ে—যে-পথে চললে তাঁর দেখা মেলে।' ঠিক এই কথাই ব'লে গেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর হাজারের লেখায়, বাণীতে, পত্রে। আমাকে তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে: 'মানুষ? কাকে বলব তুমি মানুষ? মধ্যাহ্ন সূর্যকে মানুষ বলব তো? যদি তাঁকে দেখতে পাও, যদি তাঁর শান্তি রসে আপ্লুত হ'তে পারো, যদি তাঁর আনন্দ হিল্লোলে তোমার দেহের প্রতি অণু হয় রসসিক্ত, সুধাসিক্ত, হিল্লোলিত তখনও এ-প্রশ্ন উঠতে পারে আসে যে তাঁর দর্শন তাঁর স্পর্শ বাস্তব কিনা? আমার জীবদ্দশায় কবিতায় আমি লিখেছি খানিকটা আভাস—কিন্তু শুধু কবিতা আভাস মাত্র—যে তিনি কি রকম প্রত্যক্ষ প্রেমাবেগে ভক্তকে ধারণ ক'রে থাকেন, কেমন তাঁর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গন।

"কিন্তু এজন্যে চাই তাঁর শক্তির সঞ্চারণায় হওয়া, বলেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে:

'O mortal, bear this great world's low of pain,
In thy hard passage through a suffering world
Lean for thy soul's support on Heaven's strength
Make of thy daily way a pilgrimage.
'হে মানব! এ-বিশ্বের অসীকারি' বেদন-বিষাদ
তিতি জগতের দুর্গম পথে আত্মারে তোমার
করো ন্যস্ত আজ সর্বধারয়িত্রী দৈবশক্তি 'পরে···
দৈনন্দিন পথ তব হোক তীর্থযাত্রি-পথ সম।'

"কিন্তু এ-সব পুরণ দূরের কথা নয়। তাই যেতে না তাঁর ধরিত্রিত্রী শক্তির স্পর্শ। পাবার মতন কিছু পেতে হ'লে শিখতে হবে চাওয়ার মতন চাওয়া। আমরা চাই না পরশ-মণি, তাকেন ছেড়ে থাকি কাচ নিয়ে ভুলে। ইংরিজির একটি রীতিমতন আছে 'যু পীপল্‌স ন যোল অব অবোল রতন জোড়কে'—বিমুখ নিয়ে মন কেন আর ছেড়ে অমূল মূলধনে?' (প্রভাতালি, ১১৩ পৃঃ)

"জগতে আজ দুঃখ কষ্ট নিষ্ঠুরতা অবিশ্বাস—এরাই সর্বেসর্বা। যেখানে চাই, দেখতে পাই মূলে ছেড়ে শুকিয়ে ভেতে কাড়াকাড়ি। এ-পথে কেলে না পাবে কেউনার পরশমণি। যদি সত্যি চাই এ-মণি—যেতে হবে তাঁদের কাছে যাঁদের করায়ত্ত হয়েছে এই মণির মণি। তাই গীতায় বলেছে:

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ'।

অর্থাৎ জ্ঞানের পথে চাই তিনটি জিনিস, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাঁকে করা চাই প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবা। তা'হলে তাঁরা দেবেন জ্ঞানের ঘর।

"এ-বাণী ভারতীয় সন্তানদের মনে ঢুকে গেছে প্রথম থেকেই। তাই বহুদিন থেকেই ভারতে শরণীয় ও বরণীয় ব'লে গণ্য হয়েছেন জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ভাবুক ভক্ত। কারণ সত্যিকার উপদেশ দিতে পারেন কেবল তাঁরাই

আর কেউ নয়। পাশ্চাত্য দেশে আজকের দিনে এ-উপদেষ্টার সিংহাসন অধিকার করেছেন তাঁরা যুনি জ্ঞানী যোদ্ধারা নন—এখানে পরমশরণ্য হ'লেন বৈজ্ঞানিক, অধ্যাপক, সাংবাদিক, রণধীর। অনেকে হয়ত আজো পুরো-পুরি টের পান নি একথা যে পাশ্চাত্য দেশে আজ খৃষ্টধর্মের পুরোহিতরা নামে-মাত্র উপদেষ্টা, আসল দীক্ষাদাতা আজ বুদ্ধিবাদী তথা বৈজ্ঞানিক —যাঁরা বলছেন যেঁকে যে চোখে দেখা যায় না, ছেবে-পাওয়া-যায়-না, একটু যদি বা ছুঁই ধরতে গেলেই যায় ক'মে—এমন সত্যকে ডিসমিশ ক'রে রাখে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া তাকে নিয়ে ঘর করাই সুবুদ্ধির কাজ। অন্য-ভাষায়, বুদ্ধি ও যুক্তি যার নাগাল পায় তার কাছেই হাত পাতো।

"কিন্তু চলতি বুদ্ধি হাজার ধারালো হ'লেও পায় না অতিস্থের দিশা করা—সে পরম মণি শুধু বিশ্বাসের কাছে প্রেমের কাছে নিরভিমানের কাছেই ধরা দেয়—আর কারুর কাছে নয়।

"তাই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শীরা ব'লে এসেছেন বরাবরই যে বুদ্ধির অভিমান ছেড়ে হাত পাততে শেখো এই বিশ্বাসের কাছে যে, ওঁকে পাওয়া যায় যদি চাওয়া যায়। বলেছেন: আধ্যাত্মিক পথের তীর্থযাত্রী এ-বিশ্বাসের পাথেয় বিনা দুস্তর অজ্ঞানাবুধি পার হবার চেষ্টা করলে মাঝ-দরিয়ায় তরাডুবি হবেই হবে। আগে চাই জানার আগে মানা—দীনতার সুরে চাই বলতে শেখা: আমি জানি না তুমি জানাও। আমি চিনি না, তুমি দাও চিনিয়ে।

"পাশ্চাত্য জগৎ রুখে উঠে বলল: 'না। আমরা কিছুই মেনে নেব না। আগে দেখব তবে মানব। একথা শুনতে মন্দ লাগে না হয়ত, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায় যে এ-দাবি করে আমাদের আন্তরতরী মন তার অজ্ঞানকে নিয়েই ঘর করতে চেয়ে। তাই শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন ১৯২৬ সালে (যখন আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম জগতে এত দুঃখ কষ্ট কেন?) যে মানুষের সব আধিব্যাধির মূলে আছে তার অজ্ঞানা-সক্তি। জানকে যে চাইবে তাকে ছাড়তেই হবে এই আত্মাভিমানের অজ্ঞানের ঘাসত্ব।

"এই যে পরম বাণী এ আমরা শুনে আসছি কবে থেকে! কিন্তু মুস্কিল এই যে, জগতে আমরা হাজার দুঃখ পেলেও চাই না জাগতিক দুঃখ থেকে অব্যাহতি। আমাদের মধ্যে আছে এক বিচিত্র দুঃখাসক্তি। আর এ-দুঃখাসক্তিই মেকলোহিতার জননী তথা ভগ্নী। আমরা চাই না নিজের চেতনার রূপান্তর। যাতে অজ্ঞাত তাকে নিয়ে ঘর করতে ভালো লাগে, অথচ অতৃপ্তি যখন ছেয়ে যায় মনে প্রাণে তখন হ'য়ে উঠি অতিষ্ঠ। আসে বৈরাগ্য—একদিন না একদিন আসবেই সবার মনে এই বৈরাগ্য—বিরক্ত ইন্দ্রিয় সুখে বিতৃষ্ণ। তখনই আসে ডাক—মন বলে 'বৈরাগ্য দেবাভয়ম্।' "এ-বৈরাগ্য দুরকম। এক, যে বলে এ জগৎ মায়া সুতরাং পরিত্যাজ্য। এ শ্রেণীর বৈরাগ্য সূচনায় কিছুদূর এগিয়ে দিলেও মঞ্জিলে আনে আংশিক অসাফল্য—কেন না এ-জগত ভগবান সৃষ্টি করেছেন শুধু দুঃখের ছায়াবাজি দেখাতে নয়—নব নব পরিবেশে তাঁর আনন্দের নব নব লীলা ছন্দ সুর তাল মূর্ত ক'রে ধরতে। তাই শ্রীঅরবিন্দ চান না বিশ্ববিমুখ বৈরাগ্য।

"কিন্তু আর এক ধরণের বৈরাগ্য আছে যার নাম সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। সে বলে: 'আমি চাই সেই অমৃত যা আমাকে করে অমৃত—যে-সুখে অমৃত স্বাদ নেই কী করব সে সুখ নিয়ে—সে তো সুখের ছদ্মবেশে দুঃখ শুধু যার ক্ষণিক অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগে কিন্তু সারা—অন্তরাত্মে অতৃপ্তিতে হাহাকারে।' বৃহদারণ্যকে তাই মৈত্রেয়ী বলেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে যে গ্রাম্য সুখে তাঁর না আছে রুচি, না সায়া—তিনি চান অমৃতকে:

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?—
যাতে অমৃত হব না, তাকে নিয়ে কী করব!'

'আজকের দিনে আমাদের সব আগে দরকার এই অমৃত বাণীতে পুনর্বিশ্বাস, গভীর শ্রদ্ধা, অনিত্য বস্তু ছেড়ে নিত্য বস্তুর কাছে হাত পাততে

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

শেখা আর এ-দীক্ষা দিতে পারেন কেবল তাঁরা যাঁরা শ্রীঅরবিন্দের মতন ঘোষণা করতে পারেন যে 'যেনাহংনামৃতং পুস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'—যাঁরা দেখেছেন যে মানুষ তার মানবত্বেই পূর্ণ সার্থকতা পেতে পারে না—উঠতে হবে তাকে মানবতা ছেড়ে ভাগবতী চেতনার কোটায়—উত্তীর্ণ হ'তে হবে অতিমানব-লীলায়। এ-উত্তরের ফলে কী হবে প্রচার করেছেন এ যুগের মহা ঋষি তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে:

Whon superman is born as Nature's King
His presence shall transfigure Matter's world:
He shall light up Truth's fire in Nature's night.
He shall lay upon the earth Truth's greater law;

Man too shall turn towards the spirit's call—
A divine force shall flow through tissue and cell
And take the charge of breath and speech and act
And all the thoughts shall be a glow of suns
And every feeling a celestial thrill—
Nature shall live to manifest secret God,
The spirit shall take up the human play,
This earthly life become the life divine.

যেদিন মর্ত্যমানব হবে প্রকৃতির কবিরাজ,
কলাকুশিল হবে বশ্যবিশ্ব অনিত্যতার তার।

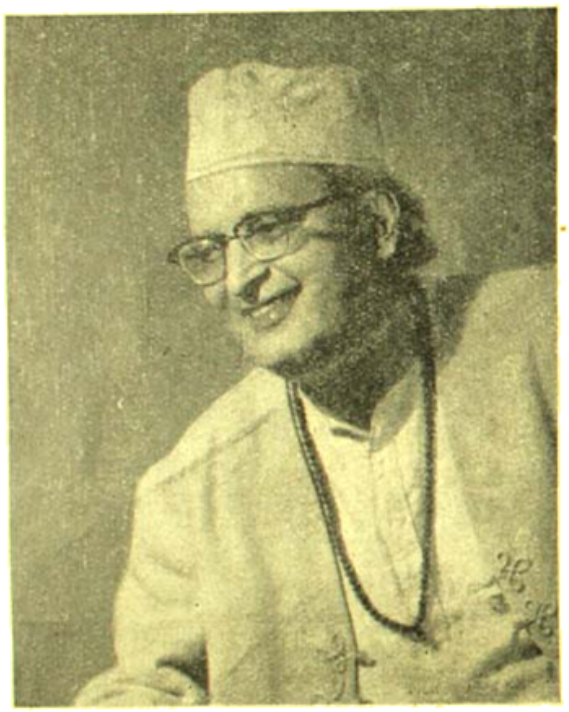

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সত্যের আলোয় অগ্নি যে জিহ্বে গভীর নিশীথে,
স্থাপিবে ধরার 'পরে ধর্মের বিধান মহত্তর :
সত্যের আহ্বানে মুখ ফিরিবে মানবও সেই দিনে—
প্রবাহিবে এক দিব্য শক্তি প্রতি অণু, প্রতি কোষে,
জিহ্বাসম হবে সে-ই প্রতি শ্বাস বাণী ও কর্মের,
প্রতি অনুভব হবে কর্মের পুলক শিহরণ,
প্রবৃত্তি প্রবেরমাত্র হবে প্রমূর্তিতে গূঢ় দেবে,
মনের লীলায় রশ্মি অন্তরাত্মা করিবে ধারণ,
এ-মর্ত্যের লীলা হবে ছন্দায়িত অমর্ত্য লোকের।

* * * *

কয়েকদিন বাদে হল ওর অন্যান্য আমাকে পাঠিয়ে দিলেন পাসে ক'রে পাঠিয়ে ডলার। বন্ধুবর হরিদাস চৌধুরীকে বললাম। হরিদাস বললে : "এখানে সব কিছুর জন্যেই এরা টাকা নেয়। এমন কি যদি আপনার সঙ্গে কেউ কথা বলতে চায়—যদি দরকারি কথা হয় তবে কথাবার্তার পরে দেবে দক্ষিণা।" ইন্দিরা হেসে বললে আমাকে : "আমাদের সত্তর হোটেলের কথা মনে পড়ল। একজন বলেছিল আমার পিতৃদেবকে : 'কাপ্তেন সাব্! আপনি যে-হোটেলের পাচ বসিয়েছেন সে অতি নিষ্ঠুর। এখানে একটিবার ঢুঁচলেও কয়েকটি চাকরি বেরিয়ে যায়।' কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কী আছে—যখন মার্কিন ভাই স্বভাবে সুপার-হোটেলবাসী!

এক দেশের দরদস্তুরের অন্যের কাছে বিচিত্র লাগে অনেক সময়েই। অনভ্যাসের কোঁটা কপাল চড় চড় করে—বলে না? যেমন, এখানে মোটর রাস্তায় খাড়া করিয়ে রাখা—যাকে সাহেবি ভাষায় বলে "পার্কিং"। এখানে যে কী মুস্কিল মোটর "পার্ক" করা। এখানে পার্কিং নৈব নৈব চ, ওখানে পাঁচ মিনিটের বেশি নয়, সেখানে আধ ঘণ্টা খাড়া করালেও পাঁচ ডলারের ধিল। একটি সুড়ঙ্গ দেখলাম আমাদের হোটেলের কাছে—একটি মনোরম ডলারের নিচে দুর্বাসুদ্ধ সুড়ঙ্গ! কী? না, মোটর "পার্ক" করা যেতে পারে—প্রতিদিন এখানে নাকি ৯৩০০ মোটর দাঁড়ায়। এক চিঠি লেখালেন এক বন্ধু—লস এঞ্জেলসে কোথায় গান্ধিজী লণ্ডনে বক্তৃতা—কার্ডে লেখা : "Cars can be parked" মিস টাইথার্গ আমাদের নিয়ে যান নানা জায়গায় তাঁর মোটরে—অনেক জায়গায় প্রায় পাঁচ মিনিট হেঁটে তবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হয়—যেহেতু অন্যত্র মোটর পার্ক করা যায় না। সব চেয়ে মজার খবরটা বলি রসিয়ে। কলনালের বাড়ি তাঁর আপিস থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে। রোজ তাঁকে আপিসে আসতে হয় কিন্তু মোটর নিয়ে যায় তাঁর বাড়িতে—কেন না আপিসের কাছাকাছি কোথাও মোটর পার্ক করতে হ'লে দিন পিছু পাঁচ ডলার খরচা। অন্য পক্ষে ২০ মাইল আসতে পেট্রোল খরচ এক ডলার। সুতরাং বুদ্ধিমানে কী করবে? উত্তরের কি প্রয়োজন আছে?

* * *

আতিথেয়তা ও বদান্যতারও চূড়ান্ত! মিসেস ডানিং ছাড়েন না; প্রায়ই ধ'রে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে—মধ্যাহ্ন ভোজন না ক'রে নিস্তার নেই। একজন ভদ্রলোক ইন্সিয়ার ঈপানি আছে শুনেই ওষুধ পাঠিয়ে দিলেন নানাবিধ—খরচ দিয়ে। আর একজন টেলিফোন করলেন : "সান-ফ্রান্সিস্কো দেখবার মতন দেশ—চলুন মোটরে ঘুরিয়ে দেখাই চার ঘণ্টা।" চার ঘণ্টা ট্যাক্সি ভাড়া দেওয়া মানে তো প্রায় দেউলে হওয়া। ধন্যবাদ দিয়ে বললাম : "আজ্ঞা"। আর একজন বললেন : "দিনের বেলা আমার কাজ। তবে যে-কোনো দিন সন্ধ্যায় টেলিফোন করলেই আমি আসব মোটর নিয়ে—নানা জায়গায় নিয়ে যাব, যদি চান।" এবার ধন্যবাদ দিয়ে বলতেই হ'ল "না"। কারুর কাছ থেকে ক্রমাগত সেবা নিয়ে যাওয়া—বিশেষ যখন দেশি প্রতিষ্ঠানে আমাদের কিছুই দেবার নেই। এরা

ঠাঁ ঠাঁ ক'রে আপত্তি করে: "দিচ্ছেন না? সে কি কথা? আপনার কাছে আমরা সে কী পাচ্ছি তার কতটুকু দাম রাখেন মহাপ্রভু?"

০ ০ ০

মোটর নিয়ে এলেন সজ্জন। সত্যিই অতি সজ্জন—নাম ওয়েস্টন ডেভিড হাটার, এখানে থিয়েটারের ডিরেক্টর। কোনো থিয়েটারে দুর্নীতির বাড়াবাড়ি দেখে ইনি সেখানে জীবিকা অর্জন ছেড়ে অন্যত্র যান। অর্থাগম ইনি চান কিন্তু সদুপায়ে। ধর্মভীরু মানুষ আজকের দিনে যে খুব বেশি দেখা যায় না একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। ধর্মভীরু—ওরফে God fearing—বিশেষণটি উচ্চারণ করতে না করতে মনে পড়ে তীক্ষ্ণ বিশেষণটি। অর্থাৎ অধর্ম করতে যারা ভয় পায় তারা কাপুরুষ। তাছাড়া নৈতিকতার নিয়মকানুনও বদলে যাচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু এই মানুষটি দেখলাম আধুনিক হ'য়েও অত্যাধুনিক নন। তাই বুঝি ধর্মভীরু? মোটরে ক'রে ঘোরালেন প্রায় চল্লিশ মাইল। সানফ্রান্সিস্কোর বিখ্যাত "স্বর্গদ্বার" Golden Gate যাপান দেখলাম। যাপান না ব'লে যোবহয় নন্দন কানন নাম দেওয়াই ভালো। কী সুন্দর সবুজ ঘাস, বীথিকা, উঁচু মিচু রাস্তায় বাহার! এদিকে ফুলের পাহাড় অন্যদিকে, ওদিকে বিশাল প্রশান্ত মহাসমুদ্র লক্ষ কেন বাহু তুলে অভিনন্দন করেছে ধরণীকে। এক এক জায়গায় খাড়াই উঠে গেছি ওমা!—সমুদ্র একেবারে আমাদের পাদমূলে মাথা কুটছে! তারপরেই ঢেউ হুশ ক'রে নেমে সমতল সৈকতে বিচরণ।

এই অল্প পরিবেশে কত গল্পই হ'ল যে! ইন্দিরা সহজে কারুর সঙ্গে এত মন খুলে কথা কইতে চায় না, কিন্তু এই সবলক বন্ধুটি পেয়ে সে যেন উজিয়ে উঠল। বলল তাঁকে অনেক কিছু—পাশ্চাত্যের আত্মাভিমান সম্বন্ধেও বেশ দুকথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ল না। বলল: এখানে ওখানে নানা শুভার্থীরই কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে প্রকট হ'য়ে ওঠে তাঁদের মার্কিণ সভ্যতার সম্বন্ধে গভীর অভিমান, আত্মপ্রসাদ—আমরা কী পরোপকারী পরমোন্মুখ কত যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে সর্বদাই প্রস্তুত! "কিন্তু"—বলল ইন্দিরা হেসে—"আমাদের গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি আমরা একটু অন্যধরণের দীক্ষা: সে, অপরকে তুলবার আগে একটু নিজেকে তুললে ভালো হয়।"

বন্ধুবর হেসে বললেন: "আপনি আমাদের আত্মাভিমানের ঘোড়ার গলদের কথাটি বলেছেন চমৎকার। এ আমি নিজেও অল্পস্বল্পেই অনুভব করেছি। তাই তো আমি শ্রীঅরবিন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছি···" ইত্যাদি।

আরো কত কথা চ'লল পাশ্চাত্য রহস্যক সম্বন্ধে। ইনি বললেন একদিন আমাদের নিয়ে যাবেন তাঁদের নবতম নাটকের মহলায়—লাশিস টমসনের বিখ্যাত কবিতা "হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন্‌স" নাট্যরূপ। ফেব্রুয়ারি মাসে এ নাটকটি এখানে প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে। লাশিস টমসনের "হাউণ্ড অফ হেভ্‌ন্‌স" কাব্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ উচ্চপ্রশংসা প্রকাশ করেছেন। আমি এ কবিতাটি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে পন্ডিচেরীতে। বন্ধুবর কিঞ্চিৎ সেন্ট্‌মেন্টে আমাকে বলেন—সে ভাবে—যে এই বইটির ছন্দ থেকেই রবীন্দ্রনাথ বলাকার ছন্দের প্রেরণা পেয়েছিলেন। যদিও এখানে ব'লে রাখি—অবান্তর হ'লেও—যে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে একথা সত্য নয় যে বলাকার ছন্দে বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ, এ ছন্দে প্রথম কবিতা লেখেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর আর্যগাথায়। কিন্তু সে থাক—বন্ধুবরের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

এ-বন্ধুটির মধ্যে ভাবুকতা দেখে বড় ভালো লাগল। ইনি একলাই থাকেন ও সারাদিনের কাজের পরে খুব হৈচৈ না ক'রে অন্তর্মুখীনতারই সাধনা করেন—ধ্যান ধারণা পাঠ এই সব নিয়ে আধ্যাত্মিকতার চর্চা তথা প্রবেশ এঁর সহজাত। আর একটি মার্কিণ যুবক একদিন টেলিফোন করলেন: সেদিন রাতে আমার বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছে—দেখা করতে চান। ইনি এলেন একটি তরুণী বান্ধবীর সঙ্গে। বুঝতে দেরি হ'ল না যে বান্ধবী বন্ধুর প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যা হয়—ইনি চান ধর্মজীবন যাপন তুফানে, উনি চান ধর্মজীবন এঁর সঙ্গে। বন্ধুর ধর্মতৃষ্ণার সাড়া যেন দরদী হ'তে চেয়ে থাকে মনে at one remove.

সে যাই হোক এই যুবকের কথাবার্তা শুনে চমৎকৃত হ'লাম। শ্রীঅরবিন্দের Life Divine গ্রন্থ চার বার প'ড়েছে ইনি আদ্যন্ত হন নি—তার সূচীপত্র তৈরি করেছেন। এঁর মধ্যে দেখলাম ধর্মীয় চিন্তার অভাব নেই। বললেন: "অনেকে মিলে ধ্যানধারণা—ওতে তাঁর বিশ্বাস নেই। ধ্যান হয় একান্তে।" ইনি আরো বললেন: "আমেরিকা আজব দেশ। যে-কোনো বুদ্ধিমান মানুষ ভারতবর্ষে ডুবদম কাটিয়ে এখানে এসে বক্তৃতা দিতে পারে ভারত সম্বন্ধে—বলতে পারে বড় বড় কথা—আর পাঁচজনে শোনে উৎসুক হ'য়ে। ধর্মবুদ্ধির কুফল হ'তে পারে না এই ধরণের পাঁচমিশেলি লেকচার বা প্রপাগাণ্ডার।" সাধু সাধু।

০ ০ ০

(ক্রমশঃ)

পিতামহ

২০

অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে চার্ব্বাক আশ্রয় লইয়াছিল। বিশাল বিস্তার বনস্পতি-বেষ্টিত যে নিভৃত স্থানটি সে নির্ব্বাচন করিয়াছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা-মুখ ছিল। চার্ব্বাক স্থির করিয়াছিল—যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। সুরঙ্গমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সমস্ত রাত্রি সে একটি বৃক্ষের উপরই যাপন করিয়াছিল। প্রত্যূষে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নূতন আশ্রয়টি সে আবিষ্কার করিয়াছে। কতদিন যে অরণ্যবাস করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুরঙ্গমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই, সুতরাং গুহার ভিতরটা নিরাপদ কিনা তাহা দিবালোকে স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য সে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া গুহার ভিতর সেগুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল কোন ভল্ল বা সর্প বাহির হইয়া আসে কি না। সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পরও যখন কোনও প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না; চার্ব্বাক তখন চিন্তা করিতে লাগিল এইবার গুহার ভিতরে প্রবেশ করা সমীচীন হইবে কি না। ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল, হইবে না। অগ্নি সংযোগ করিবার পরও যদি কোনও প্রাণী বাহির না হয় তাহা হইলেই ওই অন্ধকার অপরিচিত গুহায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু অগ্নি কোথায় পাওয়া যাইবে? অরণ্যের মধ্যে শবর-পল্লী থাকা সম্ভব, সেখানে গেলে শুধু অগ্নি নয়, হয় তো আশ্রয়ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শবর-পল্লীতে যাওয়াও কি সমীচীন? কুমার সুন্দরানন্দের সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তাহারা রাজভক্তির আতিশয্যবশত তাহাকে ধরাইয়াও দিতে পারে। সুতরাং শবর-পল্লীতে গমন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। সহসা মনে হইল এই অরণ্যে সন্ধান করিলে অরণি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। চার্ব্বাক উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, সে ঠিক করিয়া ফেলিল এই গভীর অরণ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইবে। আকাশ-চুম্বী বনস্পতি শ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে হাসিয়া ফেলিল। মনে হইল শুষ্কগম্ভীর ধর্ম্মগ্রন্থগুলির আপাত-পবিত্রতার মধ্যে সে যেমন ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই; স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইলে এই গম্ভীরা বনভূমিও তেমনি শেষে হাস্যকর নগণ্য কিছুতে পরিণত হইয়া যাইবে না তো! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল, না হইবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার দর্শন, সে দর্শন কখনই নগণ্য হইতে পারে না, তাহাই একমাত্র সত্য। চার্ব্বাক গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

২১

যজ্ঞের জন্য আজ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ত্রিবেদজ্ঞ মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্ম-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বয়ং সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কুমার সুন্দরানন্দ। মহর্ষি পর্ব্বত কুমারকে বলিলেন, "দেখুন, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার কেমন যেন মন খুঁতখুঁত করছে। মনে হচ্ছে সুরঙ্গমাকে বলি দেওয়া চলবে না"

"কেন—"

"প্রথমত, কোন নারী-পশুকে বলি দেওয়ার বিধি কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, বলির পশুটি যতদূর সম্ভব হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। নর্ত্তকী সুরঙ্গমা লেখন লতার মতো,

তন্বী। ওর শরীরে কিছু নেই। তৃতীয়ত, বলির মাংস খেতে হয়। সুরঙ্গমার মাংস কি খেতে পারবেন? সুতরাং যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে নির্বাচন করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে। সুরঙ্গমার মতো একজন রূপসী শিল্পীর এমনভাবে জীবনাবসান হবে, এটাও কি শোভন? সুরঙ্গমার মতো নর্তকী দুর্লভ। তাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে কেন চাইছেন?—"

"দুর্লভ বলেই চাইছি। আমি যতদূর বুঝেছি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করলেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুরঙ্গমাকে ভাল করে' পাব বলেই তাকে ত্যাগ করতে চাই। সে নিজেও তাতে রাজি আছে। সে যদি অসম্মত হত, তাহলে আমি এ যজ্ঞের আয়োজন করতাম না"

মহর্ষি পর্বত ক্ষণকাল কুমার সুন্দরানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ মিম্মির আপনাকে যা বুঝিয়েছে তাই আপনি বুঝেছেন। নর-বলির প্রথা একদা এদেশেও প্রচলিত ছিল। শুনঃশেফের গল্প নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই। বলি দেওয়ার কথা ছিল রোহিতকে, কিন্তু শুনঃশেফকে তার বদলে কিনে আনা হল। সেই শুনঃশেফকেও শেষকালে দেবতারা ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে যা ইঙ্গিত আছে তাতো স্পষ্ট।"

কুমার সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "মহর্ষি আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার অবাধ্য হওয়ারও কল্পনা আমি করতে পারি না। একটি বিষয়ে শুধু আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নর-বলির সঙ্কল্প নিয়েই আমি এই গভীর বনে যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমার এ সঙ্কল্প দেবতার অগোচর নেই। এখন যদি আমি প্রতিশ্রুত বলি অগ্নিমুখে সমর্পণ না করি, দেবতা কি অপ্রসন্ন হবেন না? আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, সমস্ত দায়িত্ব আপনারই—আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করব"

মহর্ষি পর্বত কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহলে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। সুরঙ্গমার বদলে আর কাউকে বলি দেওয়া হোক।"

"সুরঙ্গমা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল। আর কেউ কি রাজি হবে?—"

"চেষ্টা করলে হয় তো হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে নিষাদ-পল্লী বা শবর-পল্লী থেকে কোনও বালক পাওয়া অসম্ভব নয়—"

"কিন্তু সে বালক কি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজি হবে? কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই আমার মহর্ষি"

"সুরঙ্গমাও কি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে?"

"হয়েছে"

"আপনি তাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন কুমার। নারী-চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা, সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়"

"বেশ, আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব"

২১

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুমার সুন্দরানন্দ কিন্তু সুরঙ্গমার সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুরঙ্গমার দাস-দাসীরা বলিল, "কাল রাত্রে তিনি আহারাদির পর বললেন 'আমি কিছুক্ষণ একা একা বনে বনে ভ্রমণ করতে চাই, তোমরা সবাই শুয়ে পড়, আমার অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই।' এখনও পর্যন্ত তো তিনি ফেরেন নি"

কুমারের নয়ন যুগল হইতে ক্রোধ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। দাস-দাসীদের ভর্ৎসনা করিবার উপায় ছিল না; তিনি নিজেই তাহাদের আদেশ দিয়াছিলেন সুরঙ্গমার কোন আচরণে যেন তাহারা বাধা না দেয়।

মিম্মিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিম্মির একটি অভিনব ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ এক শুক-দম্পতীকে তিনি ফলাহার করাইতেছিলেন। সুন্দরানন্দ এরূপ অদ্ভুত শুক আর কখনও দেখেন নাই। তাহাদের পক্ষদ্বয়ে মরকত, বৈদূর্য্য, নীলা ও মুক্তার বর্ণ-দ্যুতি যে অপূর্ব সমন্বয়ে রূপায়িত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তাহাদের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত মাণিক্যের মতো জ্বলিতেছিল!

"এমন অদ্ভুত শুকপক্ষী আপনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন—"

"এরা নিজেই এসেছে। আজ সকালে উঠে দেখি আমার বাতায়নের ধারে পাশাপাশি বসে' আছে দু'জনে। ধরতে গেলাম, ধরা দিলে না। কিন্তু পালিয়েও গেল না। সরে' সরে' বসছে। যত দিনে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছি, আমার জন্যে প্রচুর ধন আপনি কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা দু'জন প্রায় তা নিঃশেষ করেছে। বাকী আছে এই আঙুরগুলি —"

মিশ্রিরের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি শুক ঘাড় নাড়িয়া সুমিষ্ট স্বরে কি যেন কহিল। পক্ষী-ভাষায় কি তাহার তাৎপর্য্য তাহা মিশ্রির সমাক বুঝিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অবশিষ্ট আঙুরগুলি শুকদম্পতীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারাও ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মিশ্রির কহিলেন, "সুরঙ্গমাকে ডেকে আনুন। এদের দেখলে তিনি খুশি হবেন।"

"তাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি এখানে এসেছিল?"

"আজ তো আসে নি। কাল রাত্রে এসেছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। এসেই চলে গেল"

"কোনদিকে গেল—"

"তা তো লক্ষ্য করি নি—"

"কোথায় গেল সে তাহলে। দেখি —"

শুকদম্পতীর দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমার সুন্দরানন্দ বাহির হইয়া গেলেন। সুরঙ্গমার অন্তর্ধানে তিনি কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়তো প্রাণভয়ে সুরঙ্গমা পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিয়াছে? মহর্ষি পর্ব্বতের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"নারী চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।—" কুমারের মুখ সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি বেত্রাপল্লীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া রাজরাণীর মর্য্যাদা দান করিয়াছেন সে তাঁহাকে এভাবে প্রতারণা করিবে? মিশ্রিরের নিকট হইতে বাহির হইয়া কুমার গেলেন কুলিশপাণির কাছে।

"কুলিশ সুরঙ্গমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে' খোঁজ। তাকে না পাওয়া গেলে গজই পণ্ড হয়ে যাবে—"

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া রাজাদেশ গ্রহণ করিলেন। (ক্রমশঃ)

আমার কবিতা

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

আমার কবিতা সে তো তোমারি প্রেমের অবদান
আঁখির পলক পাতে এলো তার ভাব ছন্দ সুর।
বাস্তবিক মরুমাঠে মানসীর লভিয়া সন্ধান,
প্রেমে ভুলিয়া নাচে অকস্মাৎ মনের ময়ূর।

তোমার নয়নে আছে অতলান্ত সমুদ্রের নীল,
দেহের দেহলি জুড়ে যৌবনের উঠে দীপান্বিতা।
হৃদয়-গহনে ডুবে খুঁজে পাই কবিতার মিল,
ভুলে গেছি প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ লাভ ক্ষতি।

তুমি আছ, ভালো লাগে তাইতো নদীর জলধারা,
সুদূর নীলার পটে রাত-জাগা ক্ষীণ শতভিষা;
বনের মর্ম্মরে নিত্য শুনিতেছি নূতন ইসারা—
পথভ্রান্ত সারথিক অতর্কিতে খুঁজে পেলো দিশা।

তোমারে সঙ্গিনী লভি তুচ্ছ করি জীবনের জ্বালা
হাসিমুখে সয়ে যাই সংসারের যতেক যন্ত্রণা।
সহসা ভরিলে কবে চুপি চুপি কবিতার ডালা,
নূতন নির্দ্দেশ দিলে, চলিবার নব সম্ভাবনা।

এলো স্বপ্ন, এলো সুর, অলক্ষিতে শূন্য মোর চিতে,
আমার কবিতা তাই মুখরিত তোমার সঙ্গীতে।

শীতের দেশের পথ

ফটো : প্রবীণ চট্টোপাধ্যায়

কালো ও আলো

ফটো : শ্যামল বসু

বাড়ীর মতন

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(রুশ গল্প : লেখক···আলেকজান্দার কুপরিন)

প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা···ত্রিশ বছরে জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল কত মেঘ, কত রৌদ্র! কত ঘটনা, জয়-পরাজয়ের কত আলো-ছায়া! হর্ষ-বেদনার কত দোলাই না লাগলো মনে!···কিন্তু এ-ঘটনাটুকু···এতদিনেও মনের পটে এখনো জল্-জ্বল্ করছে···মিলিয়ে যায় নি! মনে হয় যেন কালকের ঘটনা!

তখন আমি কিয়েভে থাকি পাদোলার কাছে—গাভানের বাড়ীতে। বোর্ডিং-হাউস। গাভান আগে কাজ করতো কোন্ জাহাজে···রাঁধুনির কাজ। ভয়ানক মদ খেতো। তার জন্য চাকরি গেল। চাকরি যেতে সে আর তার স্ত্রী আনা পেত্রোভনা···দুজনে মিলে এই বাড়ী ভাড়া নিয়ে এখানে খুলেছে বোর্ডিং-হাউস।

স্থায়ী-ভাড়াটিয়া বলতে আমরা আছি ছজন। ছজনেই নিঃসঙ্গ একা মানুষ। বাড়ীতে ন-খানা কামরা। এক নম্বর কামরায় যে থাকে—আমাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে পুরোনো। কাজ-কারবার ছিল···কসেটের বেশ বড় দোকান। হঠাৎ জুয়ার নেশায় তাকে পেয়ে বসলো—জুয়ার নেশায় সে দোকান গেল উঠে। তারপর কোথায় কেরাণীগিরি-চাকরি জুটিয়েছিল। সে-চাকরিও রাখতে পারলো না···তাসের জুয়ায় মত্ত-মাতোয়ারা থাকতো বলে। এখন কি করে তার চলে, ভগবান জানেন! দেখি, লোকটি সারাদিন ঘরে পড়ে' ঘুমোয়···কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নয়! সন্ধ্যার পর উঠে চোরের মতো নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়। যায় নদীর ধারে—গলি-ঘুঁজিতে ছোট-খাট জুয়ার আড্ডা, সেইখানে। জুয়াড়ীদের যেমন হয়ে থাকে—খেলায় লাভ-লোকসানের তোয়াক্কা রাখে না! খেলে অভ্যাসের বশে···নেশা!

তিন-নম্বর কামরায় ভাড়াটিয়ার নাম বুংকোভস্কি। মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের চর্চা করে···সেই সঙ্গে টেকনিকাল-স্কুলে সিভিল-এঞ্জিনীয়ারিং পড়া চালাচ্ছে ··তার উপর আরো কটা স্কুলে লেখাপড়া! সে-কথা আমরা বিশ্বাসও করি না। লোকটা যেন সর্বজ্ঞা···হেন বিষয় নেই, যা সে জানে না! নিজে থেকে এত কথা বলে যায়—কেউ শুনছি না, শুনবো না, তবু সে বকতে থাকবে! এভিয়েশন, বটানি, ষ্টাটিষ্টিক্স, পলিটিক্স, জ্যোতিষ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান···মায় সহর এবং পথ-ঘাট তৈরীর কলাকৌশল—সব জ্ঞান তার নখদর্পণে! মনে হতো, মানুষ নয়! চামড়ার সুটকেস! তার মধ্যে জামা-কাপড় থেকে চায়ের পেয়ালা পিরীচ মায়···হাবিজাবি সব জিনিস ঠেসে পুরে রাখা হয়েছে। চেপে চেপে ঠেসে রাখা এমন যে, তালা খোলবা-মাত্র জিনিসগুলো ছিটকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে··এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাবে। মাসে এমন একবার করে মদ খায় এবং তিন দিন তিন রাত্রি ধরে তার এ-খাওয়া চলে, ···যতক্ষণ পর্যন্ত না নেশায় বেহুঁস-কাবু হয়! তারপর আরো পাঁচদিন সময় লাগে তার প্রকৃতিস্থ হতে। তখন তার মুখে শুধু ফরাসী বুলির বুকনি ফুটতে থাকে—যেন খই ফুটছে! কাজের মধ্যে দেখি, সহরে যত খবরের কাগজ আছে, তার সবগুলোয় চিঠি লিখে পাঠায়—কি-কথাই না লেখে! গ্রামের কোথায় জলা আছে, বুজোনো প্রয়োজন ··কোথায় করে একটা নতুন নক্ষত্র দেখা যাবে বলে ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার—কোথায় জল-কষ্ট—নিরাকরণের জন্য নল-কূপের আশু প্রয়োজন···এমনি সব চিঠি! এ-সব চিঠির জবাব কখনো প্রত্যাশা করেছে বলে মনে হয় না! পয়সা-কড়ি মাঝে মাঝে পায়—আমাদের কাছ থেকে ধার-ধোরও

করে এবং সবচেয়ে জমা টাকাকড়ি পেলে···কুচো-নোটে তার ঘরের কানাচে বহু কেতাব পড়ে আছে—কোনো কেতাবের মধ্যে নোট রেখে দেয়! একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে—আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছিল—উপুড়-হস্ত করবে, সে-আশা আমি রাখিনি। হঠাৎ কি জন্ত তার ঘরে গেছি—কথায় কথায় আমাকে বললে—দয়া করে ঐ সেল্ফ্ থেকে কোর্থ ভলুম্ এলিশা ঘালদা বইখানা যদি পাড়েন। আমি বই পাড়লুম। পাড়বামাত্র আমাকে বললে বুংকোভস্কি—ওর মধ্যে পাঁচ রুবলের একখানা নোট আছে—নিন। আপনার কাছ থেকে একদিন ধার নিয়েছিলুম—শোধ! বুংকোভস্কির মাথায় টাক···গালে লম্বা দাড়ি এবং ইয়া নোটা গোঁফ!

আমি থাকি আট-নম্বর কামরায়। সাত-নম্বরে থাকে এক ছোকরা—কোন্ স্কুলে সে পড়ে। মাকুন্দো এবং একটু তোংলা। এখন সে কোন্ জেলায় পাবলিক-প্রসিকিউটর, ওকালতিতে বেশ পশার করেছে। যেমন খ্যাতি, তেমনি প্রতিপত্তি। ছ-নম্বরে থাকে কার্ল—জার্মান···পথ ঘাট তৈরী করে—কনট্রাক্টর।

ভদ্রলোক বীয়ার খাবার যম।—পাঁচ-নম্বর কামরায় থাকে এক যুবতী ভোয়া, বাড়ীউলির কাছে ভোয়ার খুব খাতির। আমাদের চেয়ে এঁকে একটু বেশী যত্ন-আত্তি করে! তার কারণ—আমরা যে-রেটে ভাড়া দিই, ভোয়া ভাড়া দেয় তার চেয়ে বেশী-রেটে এবং এ-ভাড়া মাস মাস আগাম দেয় চুকিয়ে। তার উপর ভোয়া চুপচাপ থাকে—বাড়ীতে আছে বলে জানা যায় না। না করে কোনো নালিশ, না এতটুকু তর্কি! মাঝে-মাঝে সে পার্টি দেয় নিজের কামরায় এবং সে-পার্টিতে যারা আসে, তাদের কেউ কম-বয়সী নয়···বেশী বয়সের স্ত্রী পুরুষ। পার্টিতে এতটুকু কলরব ওঠে না! রাত্রে ভোয়া বড় একটা বাসায় থাকে না··· নানা হোটেলে তার রাত কাটে।

আমরা পরস্পরকে চিনলেও অন্তরঙ্গতা নেই। পরস্পরে অসদ্ভাব নেই—প্রয়োজন হলে সকলেই এর-ওর কাছ থেকে চা ধার করে আনি—ক্রীম, তুলো, গরম জল, কালি, কলম, পেন্সিল···খবরের কাগজ চেয়ে আনি। এ-দানে কারো কার্পণ্য নেই যেমন—তেমনি চাইতেও সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা জাগে না!

সেবারে ঈস্টটা চট্ করে চলে গেল। বসন্তের বাতাস এলো বয়ে—নীপার নদীর বুকের বরফ গলে' দু-কূল জলময় হয়ে উঠলো। রাত্রে যেমন গরম, তেমনি অন্ধকার—মাঝে মাঝে দু-চার পশলা বৃষ্টি দেখা দেয়।···একদিন দেখি, গাছের পাতাগুলো শুকিয়ে ঝরে খসে গেছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখি, কচি কিশলয়-পল্লবে গাছপালা সবুজে সবুজ!

ঈষ্টারের পরব এলো···আলো-হাসি-আনন্দের পশরা নিয়ে। আমার যাবার জায়গা নেই। সহরে কেউ নেই জানা বা চেনা···আপন-জন তো নেইই! পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই একা-একা · নিঃসঙ্গ। কখনো যাই কোনো চার্চে। পথে দাঁড়িয়ে দেখি প্রোসেশন চলেছে—গান-বাজনার প্রোসেশন—আলোর প্রোসেশন! সাজ-পোষাক পরে ছেলেমেয়ের দল বেরিয়েছে পথে—তাদের মুখ-চোখ আনন্দে জল্‌জল্ করছে! কিশোরীরা দলে দলে বাতি ধরে প্রোসেশন করে পথে চলেছে···বাতির আলোর আভা পড়েছে কিশোরীদের মুখে···মুখগুলি মনে হচ্ছে, যেন সদ্য-ফোটা গোলাপ, না লাল পদ্ম! দেখতে দেখতে বুক আমার বেদনায় ভরে ওঠে—ছেলেবেলায় ইষ্টারের পরবে কি আনন্দই না করতুম! মনে ছিল সরল বিশ্বাস···ঠাকুর-দেবতার উপর কি গভীর ভক্তি আর ভালোবাসা! আজ···মন থেকে সে বিশ্বাস, শুচিতা, ভক্তি-ভালোবাসা···কোথায় গেছে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে!

সেদিন বাসায় ফিরতেই অফিসের বেয়ারা ভাস্কা··· বয়সে ছোকরা হলেও বেশ চালাক-চতুর—ভাসকা আমাকে জানালো ইষ্টারের অভিবাদন। আমিও তাকে অভিবাদন জানালুম। ভাসকা বললে—পাঁচ নম্বরের মেয়েলোক ভাড়াটে আপনাকে তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

শুনে অবাক হলুম! তাঁর সঙ্গে মোটে জানাশুনা নেই—পরিচয় নেই! তিনি হঠাৎ···

ভাসকা বললে—আপনার জন্ত চিঠি রেখেছেন···অফিস-কামরায় আছে।

অফিস কামরায় গিয়ে চিঠি নিলুম—পকেট-বুক থেকে রুলটানা ছেঁড়া একটুকরো কাগজ কাগজের উপর 'ক্যাশ-

মেয়ে, কথা ছাপা—সেই কাগজে লেখা দুটিমাত্র ছত্র! লেখা—

আট-নম্বরের বন্ধু,—আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে এবং কোনো আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার ঘরে এলে সুখী হবো। এক সঙ্গে ঈষ্টারের উপবাস-ভঙ্গ করতে চাই। আমাকে নিশ্চয় চিনতে পারবেন।
ইতি জোয়া ত্রামারেনকভ

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো!···এখন···? এঞ্জিনীয়ারের কামরার দোরে দিলুম টোকা···জিজ্ঞাসা করবো···তার পরামর্শ! দরজা ভেজানো ছিল। ভিতর থেকে সাড়া—কে? চলে এসো।

ঘরে ঢুকলুম। দেখি, বড়-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আঙুল দিয়ে চেপে-চেপে মাথার শোরের-কুঁচির মত খোঁচা চুলগুলোকে চোস্ত করছেন। চুলে বেশ পাক ধরেছে···এবং ও-চুল কিছুতে দুইতে চায় না! গায়ে ঝকঝকে পালিশ-করা ফ্রক-কোট···সে-কোটে যা মানিয়েছে, মনে হয়, রীতিমত মাতব্বর ব্যক্তি! গলায় চওড়া কলার—তার উপর সাদা নেকটাই বাঁধা। কথাটা আমি পাড়তেই তিনি বললেন—আমিও পেয়েছি মশায়, নিমন্ত্রণ-পত্র··· ওখানে যাবার জন্যই আমি···

দুজনে একসঙ্গে চললুম নিমন্ত্রণ রাখতে।

ঘরের দরজাতেই জোয়ার সঙ্গে দেখা···বিনম্র সলজ্জ ভঙ্গীতে মার্জ্জনা চেয়ে ধন্যবাদ এবং অভ্যর্থনা! সামনা-সামনি চেহারাখানা ভালো করে দেখলুম। মুখ··· রাশিয়ার সাধারণ বার-বনিতাদের মুখ যেমন হয়, অবিকল তাই! ঠোঁট নরম···রঙ-করা···মোটা নাক···ভ্রু নেই বললেই হয়! মুখে মৃদু হাসি—শান্ত, নম্র, কোমল···জোর করা বা ধার করা হাসি নয়! সে-হাসিতে রমণীর রমণীয়তা ফুটে আছে! সে-হাসির জন্য মুখখানি ভালোই লাগলো!

ঘরে ঢুকে দেখি, মেশের সকলেই হাজির। জুয়াড়ী এবং কার্ল···দিব্যি আসর জমিয়ে বসেছে। আসেনি শুধু সেই পড়ুয়া ছোকরা—সে-ছাড়া স্থায়ী ভাড়াটিয়ারা সকলেই এসেছে।

জোয়ার কামরা—যেমন দেখবো ভেবেছিলুম, তেমনি। চেষ্টার ড্রয়ারের মাথায় চকোলেটের কটা খালি বাক্স—কটা বাক্সে সেন্টের শিশি, গ্রীজ-ম্যাপটানো পাউডার, চুল কোঁকড়া করবার কটা কার্লার। ঘরের দেয়ালে সার-সার ছবি—হতভাগা কজন এ্যাক্টর-এ্যাকট্রেসের ফটো···খোলা-তলোয়ার-হাতে কজন মিলিটারী-ফৌজের ফটো। খাটে বিছানা—বিছানায় লেস-দেয়া চাদর এবং চাদরের উপর একগাদা বালিশ—বালিশের পাহাড় যেন! টেবিলের উপর কালরঙার পেপার-ক্লথ বিছানো···এবং বড় পাত্রে প্রকাণ্ড সাইজের একখানা ঈষ্টার কেক। তাছাড়া কতক-গুলো রোল, ডিম—শূয়রের লেগ-রোষ্ট, আর দু-বোতল মদ···বিচিত্র রকমের মদ।

জোয়ার সঙ্গে সকলের ঈষ্টারের প্রীতি-নিবেদন হলো—অত্যন্ত শুদ্ধাচারে তার দু-গালে চুম্বন···তার পর টেবলে বসা হলো খেতে। আমাদের দলটি···কেউ যদি তখন দেখতেন, মজা পেতেন! আমরা চারজন পুরুষ—ক্ষুধায় অন্ন মেলা দায়—চরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত··অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেতো-ঘোড়ার মত কোনোমতে বেঁচে আছি! আর টেবলের পঞ্চম ব্যক্তি···আমাদের হোষ্টেস···তিনি রাশিয়ার অতি-নিম্নশ্রেণীর বারবনিতা···পথ থেকে লোক সংগ্রহ করে আনা যার কাজ···বিগতযৌবনা অর্থাৎ আমাদের চেয়েও দুর্ভাগিনী, বেচারী···চরিত্র বা মন বলে কোনো বালাই নেই ···অতীত কি ছিল, অন্তর্যামী জানেন! বর্ত্তমান বীভৎস—ভবিষ্যৎ আমাদের চেয়েও অন্ধকারে ঢাকা! তবু এমন ছাতি! এমন করুণা মায়া-মমতা···আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে ডেকে এনে এমন ভোজ্য-পানীয়ে তৃপ্ত করা! দুনিয়ায় ধনী আছে অনেক···পরোপকারে খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দানে অকৃপণ—কৈ, ভুলেও তাঁরা কখনো আমাদের কথা মনে করেন না তো! ঈষ্টারের পরবে চার্চ্চে গিয়ে চোখ বুজে ভগবানকে ধ্যান · দান-খয়রাতী করেন লোক দেখিয়ে—যেন সে-দানে দুনিয়াকে কৃতার্থ করে দিচ্ছেন! ভাবে ভঙ্গীতে দানের অহঙ্কার! তাদের চেয়ে এই রূপব্যবসায়িনীকে কত উঁচু মনে হলো! জোয়ার কথায় আচরণে কি বিনয়—কুণ্ঠা! আমরা তার আতিথ্য গ্রহণ করেছি, এতে কতখানি সে খুশী হয়েছে! প্রত্যেককে নিজের হাতে প্লেট দেওয়া, দিতে-দিতে কত কথা—দু-নাম্বরের বন্ধু, আপনি বীয়ার ভালোবাসেন জানি···ভাসকা বলেছে! এ বীয়ার আপনার জন্য। এঁদের জন্য আছে ওয়াইন···খুব ভালো ওয়াইন—

তেনেবিলের সেরা ওয়াইন—একজন সেনলরকে জানি—এ ওয়াইন পেলে সে আর কোনো ওয়াইন চায় না।

জীবনে আমরা চারজনে অনেক-কিছু দেখেছি··· অনেক কিছু শুনেছি এবং জানি। ইষ্টারের এ-ভোজের আয়োজনে খরচ পড়েছে কত···ভোজ্যের উপর এত রকমের মদ···ব্যয়ের বহর মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝলুম।···

রাত্রে···আমাদের সঙ্গে খেতে খেতে মনে যে সব কথা জাগছে···জোয়া বলে—ব্রাৎসভায় গিয়েছিল রাতের উপাসনায়। কি ভিড়! ঢোকা দায়। তার ভাগ্য ভালো, সেখানে বেশ ভালো জায়গা মিলেছিল···এ্যাকাডেমি-ক্লায়ার-দল খাশা গান গাইলো, তার পর ছাত্রেরা পড়লো ইভাঞ্জেল ···শুধু কি আমাদের এই রুশ ভাষায়? উঁহু, ফরাসী, জার্ম্মান, গ্রীক—নয় আরবী ভাষাতেও! তারপর এলো ইষ্টার-ব্রেড আর কেক—তখন যাত্রীদের দলে কি চাঞ্চল্য! হুড়োহুড়ি—ধাক্কাধাক্কি—মারামারি পর্য্যন্ত!

বলতে বলতে জোয়ার কণ্ঠ হলো ভাবাবেগে জড়িত। একটা নিশ্বাস ফেলে জোয়া শোনাতে লাগলো, তার গ্রামে ইষ্টারের হপ্তাটা কি-আনন্দে কাটতো সকলের।

জোয়া বললে—আমরা ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট ফুল তুলে ভড়ো করতুম—সে-ফুলের কি নাম, জানিনা—আমরা বলতুম, ঘুমফুল এত-টুকুটুকু নীল রঙের ফুল। তার পাপড়ি থেকে চমৎকার রঙ তৈরী হয়।···সে রঙে ডিম রাঙানো হয়। অমন ঝকঝকে নীল রঙের ফুল আমি আর দেখিনি!···আমরা করতুম কি,ঘুম-ফুলের পাপড়ি ছেঁচে নিংড়ে তার সঙ্গে মিশোতুম পেঁয়াজ-বাটার রস···ছুটো মিশোলে কমলার রঙ হতো—সে রঙে আমরা ডিম রাঙাতুম···রুমাল ছোপাতুম! হপ্তাভোর আমরা ঐ ফুল এনে-এনে ডিম রাঙাতুম—কত ডিম! ওঃ! তারপর সেই রাঙানো ডিম যাকে পাই, তার গায়ে দিই ছুড়ে। কি মজাই হতো।··· একটা ছেলে করেছে কি···কোথা থেকে লোহার তৈরী ডিম কিনে এনেছিল···সেই ডিম ছুড়ে কত লোককে সে মেরেছিল!···শেষে কজন লোক তাকে ধরে তার কাছে সত্যিকারের যত ডিম ছিল, আর ঐ লোহার ডিম—তাকে মেরে কেড়ে নেয়! কি মারটাই না মারলো তাকে! কিল, চড়, লাথি···মারতে মারতে তাকে পাড়াছাড়া করে' তবে ছাড়ে!

জোয়া বলতে লাগলো—এ ছাড়া আমরা দোলনায় উঠে কী দোল্ না খেতুম! গাছের ডালে দড়ি খাটিয়ে দোলা ···সেই দোলায় বসে দোল হপ্তাভোর! দুলতে দুলতে সকলে মিলে একসঙ্গে গান—

এলো এলো এলো খুশী
এলো হে ঐ মোদের গ্রামে—
আঁধারছায়া সারা গ্রামে
আকাশভরা আলো নামে!

বলতে বলতে জোয়ার কণ্ঠ আবেশে উছল···দুচোখ ভাবে বাষ্পসজল! আমরা একাগ্রমনে শুনছি তার কথা। জীবনে শুধু দুঃখের আঘাত পেয়ে আসছি··নিষ্ঠুর নির্ম্মম আঘাত! সে আঘাতে আমাদের ছেলেবেলাটা···ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে! বাল্যের সব স্মৃতি···মায়ের কথা—বাপের কথা—আত্মজনের কথা···ইষ্টারের পরব···সব কথা সে-আঘাতে ছিঁড়ে ধূলোয় মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

ঘরে বাতি জ্বলছে···খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসছে ···বাতাসের দোলায় জানলার পর্দ্দা দুলছে···

জোয়া বললে—আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে জানলা থেকে পর্দ্দা সরিয়ে দি···আকাশ দেখতে পাবো।

আমরা প্রায় সমস্বরে বললুম—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

জোয়া উঠে জানলার ধারে গেল পর্দ্দা খুলে সরিয়ে নিতে —আমরাও উঠলুম—যন্ত্রচালিতের মত—গেলুম জোয়ার পিছু পিছু জানলার ধারে।

আকাশে চাঁদ···জ্যোৎস্নার আলোয় আকাশ থেকে পৃথিবীর মাটী···আলো মেখে ঝক্‌ঝক করছে! বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে···গাছের সবুজ কচি পাতাগুলো দুলছে···দুলছে! সামনে নদী নীপার···কূলে কূলে ভরা জল··· জলের বুকে পড়েছে চাঁদের ছায়া···ঢেউয়ে সে ছায়া দুলছে! মনে হলো, জ্যোৎস্নার হাসি যেন! চার্চ্চে-চার্চ্চে ঘণ্টা বাজছে···ধীর গম্ভীর উদাত্ত সুর—ডিং ডং ডিং ডং ডিং ডং···ডিং ডং···

হঠাৎ অস্ফুট একটা স্বর! চমকে ফিরে তাকালুম। এঞ্জিনীয়ার কাঁদছে—সরবে···জানলার রড ধরে ফ্রেমে মাথা রেখে। রীতিমত কান্না! বেচারী বৃদ্ধের মনে কি

হলো, ভগবান জানেন! ওর অতীত জীবনের কোনো কথা আমি জানিনা—তবে ওর নিজের মুখে নানা ভাবে কাটা-কাটা কথায় শুনেছি—বিবাহ, না বিপত্তি! কুচরিত্রা স্ত্রী··· সরকারী তহবিল-তছরূপ···স্ত্রীর প্রণয়ীকে ত্যাগ করে একদিন পিস্তলের গুলি···আর ছেলেমেয়েগুলো? তারা থাকে তাদের মায়ের সঙ্গে! সেই ছেলেমেয়েদের কাছে যাবার জন্ম ওদের মন কী যে করে।

জোয়া দেখলো—দেখে একটা নিশ্বাস ফেললো—নিশ্বাস ফেলে দুহাতে এঞ্জিনীয়ারের কণ্ঠ বেষ্টন করে তার টাকওয়ালা মাথা নিজের বুকে ধরলো চেপে; তারপর এঞ্জিনীয়ারের গালে এবং পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললে—বেচারী! ···আমি জানি, জানি···কি দুঃখ, কি দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমাদের দিন কাটছে! দুনিয়া যেন তোমাদের কাছে মরুভূমি!··· নিঃসঙ্গ···একা···মুখের পানে তাকাবে, এমন-জন কেউ নেই তোমাদের! ··কিন্তু দুঃখ করো না, বন্ধু, সয়ে থাকো—আরো সহ্য করো!·· ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না। তিনি নিষ্ঠুর নন। একদিন তোমাদের দুঃখ তাঁকে চঞ্চল করবেই —তখন···সব ঠিক হয়ে যাবে! ··বেচারী সব···বেচারী!···

এঞ্জিনীয়ার নিজেকে মুক্ত করলো জোয়ার বাহুবন্ধন থেকে। তার দুচোখ রাঙা··নাকটা লাল টক্‌টক্ করছে। তার পর এঞ্জিনীয়ার বলে উঠলো—ধেৎ তোর নিকুচি করেছে! হুঁ:···কিছু না কিছু না সব বাজে!

বুঝলুন, নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন এঞ্জিনীয়ার।

পাঁচ মিনিট পরে আমরা বিদায় নিয়ে এলুম—জোয়ার হাতে শ্রদ্ধা-ভরা চুম্বন দিয়ে। এঞ্জিনীয়ার আর আমি—আমরা এলুম সকলের পরে। আমাদের কামরার সামনে দেখা অন্য কামরার ছোকরার সঙ্গে···সে কোথায় পার্টি সেরে ফিরছে।

চোখে শ্লেষের হাসি, সে বললে—ও! বটে—বুঝেছি, কোথায় যাওয়া হয়েছিল দুজনের! হুঁ···বৃষ্টি চচ্ছিল! কিন্তু! কাল এর···

তার চোখের দৃষ্টিতে কি কদর্যতা। তার মাথায় রাঙা-কাগজের তৈরী মুকুট···সেটা তার মাথা থেকে খুলে নিয়ে মেঝেয় ফেলে মুকুটটা জুতায় চেপে ভেঙ্গে এঞ্জিনীয়ার তাকালো ছোকরার পানে—দৃষ্টিতে আগুনের হলকা যেন! দাঁতে দাঁত চেপে এঞ্জিনীয়ার বললে তাকে—তুমি···তুমি··· ছুঁচো···তুমি একটা স্কাউন্ড্রেল!

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

রামায়ণীযুগে বিজ্ঞান

রামায়ণী যুগের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যন্ত্র বা অস্ত্রশস্ত্র বিষয়ের কথা যা রামায়ণে পাওয়া যায়, তা' যদি কেবলমাত্র কল্পনাপ্রসূতও হয় তথাপি তার বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। কেননা মানুষের সব কাজ ভাব বা ভাবনা-সম্ভূত। এখন যে চিন্তা মানুষের মনে আদিকালে জাগে, তা' পরবর্ত্তীকালে সে পূর্ণ করে। রাবণের পুষ্পকরথ তপঃসাধ্য বিক্রমে অর্জিত—মনের সম্বন্ধে রথ যার যথা-তথা, তেমনি এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের সেই কল্পনা Radio-activo বিমান-যানে বা Raddar যোগে সফল হচ্ছে। তেমনি আধুনিক Robot-এর আদি-কল্পনার কথা পাই সুন্দরকাণ্ডের দশম সর্গে (১০ শ্লোকে)···হনুমান রাবণের শয়নগৃহে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, স্বর্ণকমল বেদী, হস্তীদন্ত, কাঞ্চন, বৈদূর্য্যমণিভূষিত পর্য্যঙ্ক (পালঙ্ক), আর তার একপ্রান্তে শশাঙ্ক-শুভ্র রাজছত্র; তার চারিধারে বেষ্টন ক'রে চামর হস্তে কৃত্রিম নারীমূর্ত্তি (পুতুল) রাবণকে চামর বীজন করছে।

এই ভাবের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পড়া যন্ত্রপ্রয়োগের কথা রামায়ণে (লঙ্কাকাণ্ডের ২২ সর্গ, ৪৯ শ্লোকে) আছে,.....লঙ্কা পার হবার কালে সাগরের উপর সেতুবন্ধনের জন্য হাতীর মত প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড এবং পর্ব্বত সকল উৎপাটন করে যন্ত্রের সাহায্যে বহন করে আনা হয়েছিল। এইরূপভাবে যন্ত্রপ্রয়োগের বিষয় (লঙ্কাকাণ্ডের ৩ সর্গে, ১৭ শ্লোকে) আছে, হনুমান লঙ্কার বর্ণনা করে রামকে বলছেন:—লঙ্কাপুরীর চার তোরণদ্বারে পরিখা পার হবার জন্য চারটি সেতু আছে এবং তার নিকট বহু প্রাকার, যন্ত্র এবং বৃহদাকার পৃথাজ্ঞী সজ্জিত আছে। শত্রুসৈন্য সেই সেতুর উপর উপস্থিত হলেই যন্ত্রের দ্বারা নিবারিত হয়।

আধুনিককালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে (Atom Bomb) আণবিক বোমার প্রয়োগ হয়েছিল, তার পরিকল্পনা রামায়ণের উল্লেখিত যন্ত্র অস্ত্র-

শব্দের মধ্যে আছে। সম্প্রতি ভবিষ্যৎ আমেরিকার কোনো একটি বীপের উপর যে আণবিক চক্র (disk) নিক্ষিপ্ত হবার কথা জানা গেছে, ঠিক সেইরূপ (লঙ্কাকাণ্ডের ১০১ সর্গে, ৭৮ শ্লোকে) পাই সৌর অস্ত্রের কথা। তা' থেকে চক্র সূর্য্যের মত সহস্রদল চক্র সকল নির্গত হয়ে শত্রুকে গ্রহণ করে।

তাছাড়া যন্ত্রের বিষয় (লঙ্কাকাণ্ডের ৯১ সর্গে, ৩১ শ্লোকে) আছে,—বিরাট আকার কুম্ভকর্ণকে রণক্ষেত্রে আসতে দেখে বানর সৈন্যেরা যখন ভীত হয়ে পালাতে লাগল, তখন বিভীষণ তাদের ভয় ভাঙাবার জন্যে এবং সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললেন :—"যুদ্ধে রাক্ষস কেহই আসেনি—যেটা আসছে, সেটা একটা রাক্ষসের তৈরী রথমাত্র। তাছাড়া রাম যে বলের সৈন্যদের নিয়ে বিরাট সেতু বেঁধে লঙ্কা পার হলেন সেটাও কম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নয়। (লঙ্কাকাণ্ড ২২ সর্গ, ২২ শ্লোকে) লঙ্কার দায়ার জন্য মকরালয় সমুদ্রের উপর মন সংযোগে যে সেতু নির্মাণ করলেন তার বর্ণনা ক'রে বাল্মীকি বলছেন, সেটি 'খাতীপথ-ইবাম্বরম্'—অর্থাৎ অম্বরের খাতীপথের মত হয়ে থেকে প্রতিভাত হচ্ছে। এই তুলনাটির মধ্যেও বিজ্ঞানের পরিচয় নিহিত আছে।

ইরোপে রামায়ণের ২৫ যুগ পরে জ্যোতিষ্কচক্রের ঘূর্ণন বিষয় 'কোপার্নিকাস' জেনেছেন। কিন্তু লঙ্কাকাণ্ডে (১১০ সর্গে, ৭০ শ্লোকে) আছে,—যতদিন এই জ্যোতিষ্কচক্র আবর্তিত হবে ততদিন রাম জগতের অধীশ্বর থাকবেন।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের—(psychology) অন্তর্গত মনস্তত্ত্বের ইঙ্গিতও রামায়ণে বহুস্থানে আছে। তার দু'একটি নমুনা দেব। অযোধ্যাকাণ্ডে (নবনবতিতম সর্গে, ৬৮ শ্লোকে) আছে,—ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখেন পৃথিবীপতি রাম সীতার সঙ্গে তৃণাস্তরণ মাটির উপর বসে আছেন। সেই দুঃখে জ্ঞানশূন্য হয়ে ভরত তাঁর নিকটস্থ হয়ে শুধু 'আর্য্য' এই কথাটি বলেই মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতলে পতিত হলেন। দুঃখের মনোতত্ত্বের এই একটি সুন্দর উদাহরণ। লঙ্কাকাণ্ডে (১১৭ সর্গ, ১১-১৮ শ্লোকে) আছে—রাম ভরতের কাছে গিয়ে তার—

"শ্রোত্রা সক্তে চ বৃত্তান্তা ভরতস্তোত্তিরানি
তাম্রেন নয়নেনৈব, দৃষ্ট্যা বা ভাষিতে চ॥

—বুদ্ধিতত্ত্বী, দৃষ্টি বা কথার দ্বারা তার মনোগত অভিপ্রায় জানতে বললেন। কেননা ভাল ঔষধোপযোগের দ্বারা মনের গতি কার না পরিবর্তন হয়? তাছাড়া, লঙ্কাকাণ্ডেতে (১১৬ সর্গে) আছে—রক্ষঃপুরবাসিনী সীতার উপস্থিতি জানালেন বিভীষণ রামের নিকট: রামের মনে তৎক্ষণাৎ সুখদঃ হর্ষ, সৈন্য এবং রোষের উদয় হ'ল সীতাকে দেখে। এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ফ্রয়েডের যৌন-বিজ্ঞানের (Sex psychology'র) ইঙ্গিত রয়েছে। নারীদের স্বভাব বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (১৩ সর্গ, ৪ শ্লোকে) আছে,—

এবাহি প্রকৃতিঃ স্ত্রীণামাত্মদোষে রঘূত্তম।
সর্বত্রমসুরক্তানাং বিরক্তাশ্চাতিচণ্ডতা॥
শত্রুত্বমানাং লোলত্বমস্থিরাণাং ভীরুতাঃ তথা।
পরুষত্বমবিনয়ঃ শৈত্যমনুগচ্ছন্তি যোষিতঃ॥

—রঘুনন্দন, সৃষ্টির আদি হ'তে স্ত্রী-স্বভাব এই যে, তারা সম্পন্ন ব্যক্তির অনুরক্ত এবং বিপন্নকে ত্যাগ করে। তাদের চপলতা বিদ্যুতের মত, তীক্ষ্ণতা অস্ত্রের মত এবং স্নিগ্ধতা পরুষের বা বায়ুর মত।

অরণ্যকাণ্ডের ৪৫ সর্গে দেখা যায় মায়ামৃগের পশ্চাতে ধাবার কালে রাম সীতাকে লক্ষ্মণের কাছে রেখে যাওয়ার পর রামের কৃত্রিম আর্তনাদ শুনে সীতার মতিভ্রম হয়। লক্ষ্মণ সীতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, "এ—যা শুনলেন তা' রামের স্বর নয়, রাক্ষসী মায়ামাত্র।" সীতা ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ্মণের চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হয়ে ভৎর্সনা করলেন অযথাভাবে: তখন লক্ষ্মণ তাঁকে বলেন:

স্বভাবেনৈব নারীণামেষু লোকেষু দৃশ্যতে
বিমুক্তধর্মাচ্চপলাস্তীক্ষ্ণা ভেদকরাঃ ক্লিয়ঃ॥

—স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ হীন, চপল, নির্দয়, তারা আত্মীয়দের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে থাকে।

যৌনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৩৩ সর্গ, ৪৪ শ্লোকে) আছে,—

ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি
স্বং বৈ যথা মন্যুবলঃ প্রধর্ষঃ।
ন বেদশাস্ত্রেষু হি যত্নকার্যতা
অবেক্ষতে কামরতির্নরস্তুম॥

—লক্ষ্মণ, তুমি কামশাস্ত্রজ্ঞ অবশ্যই নহ। মানুষ কামাসক্ত হ'লে যেমন কাল, ধর্ম, অর্থ কিছুই বুঝিতে পারে না। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৫৮ সর্গে, ৩১-৩৩ শ্লোকে আছে, সম্পাতি পক্ষীরাজ বলছেন: সুতীক্ষ্ণ চিহ্নিত দিব্য দৃষ্টিতে বহুযোজন দূরের সব দেখতে পাই। এমন কি—লঙ্কায় সীতা রাবণকেও দেখতে পাই। আধুনিক জন্তুতত্ত্ববিদেরা বলেন—পা দিয়ে কুকুর মুখ করে তারা আকাশে যেমন উঁচুতে উড়তে পারে না। যে সব পাখী অতি উচ্চে বিচরণ করে তারা আকাশ থেকে দূরের জিনিষকে নিকট দেখে—ঠিক দুরবিণযন্ত্রে দেখার মত।

আলেখ্য

আলেখ্য বা চিত্রকলার বিষয় রামায়ণে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। উত্তর কাণ্ডে (৫২ সর্গ, ৭ শ্লোকে) আছে……রামের রমণীয় অশোক* উদ্যানটি যেখানে রাম রাবণবধের পর লঙ্কা থেকে সীতাকে ফিরিয়ে এনে বিহার করতেন তার বর্ণনায় বাল্মীকি বলেছেন সেটি "শিল্পিভি পরিকল্পিতে"—অর্থাৎ শিল্পীর পরিকল্পনার মত যৌলিক রচনা। এ থেকে বেশ বোঝা যায় শিল্পীর রচনা পরিকল্পনাপ্রধান ছিল। ভারতবর্ষে আধুনিক কালে ইরোপের অনুকরণে যে Landscape বা portrait 'যদৃষ্টম্ তলিখিতম্' চলছে তা' তখন চলত না। মন থেকে ছেঁকে আঁকতে হ'ত ছবি। (প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। ভারত শিল্পের নব জাগরণের প্রারম্ভে (১৯০৪-৫ খৃঃ) শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর ভারতীয় চিত্রকলাবিদ্যালয়টির নাম (গভর্মেণ্ট আর্ট স্কুলে) রেখেছিলেন Advanced design class—অর্থাৎ সেটি ছিল সাধারণ বস্তাকারী পরিকল্পনার উর্দ্ধে চিত্রপরিকল্পনার একটি বিশেষ বিভাগ। যৌলিক চিত্র আঁকা শেখা ছিল তার উদ্দেশ্য।)

চিত্রশালার বিষয় রামায়ণে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। হনুমান রাবণ ভবনে (সুন্দরকাণ্ড ৭৪ সর্গ, ৩৩ শ্লোকে) দেখলেন—লতাগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, প্রমোদগৃহ, দিবাবিহারগৃহ এবং চিত্রশালাগৃহ। উত্তর কাণ্ডে (৮য় সর্গে) রাক্ষসের পুষ্পক বিমানের মধ্যে মণিরত্নের চিত্রণের উল্লেখ আছে। তাতে

* অশোক উদ্যান রাক্ষসের লঙ্কাতে ছিল এবং রামের অযোধ্যায় ছিল। শোকনাশক উদ্যান অর্থেই 'অশোকবন'।

যে ইহরণ (নেকড়ে বাঘের) প্রতিকৃতি নক্সা করা আছে তা' আজও মক্ষিণ এবং উত্তর ভারতের বহু হৈজবপত্রের নক্সাকারীতে ব্যবহার হয়। রাবণের বিমানের শিল্পকার্যের পরাকাষ্ঠা এবং অনেক প্রতিকৃতি যে রচিত ছিল, তার কথা সুন্দরকাণ্ডের (৩য় সর্গ) ৩-৫ শ্লোকে আছে। এগুলিকে যদি বিলেও আধিকবির কাব্যে বর্ণিত চিত্র, কটু বর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে যে আলেখ্য চিত্রণের অপূর্ব আভাস পাওয়া যায় তার কথাও বলা প্রয়োজন। এই আদি কাব্য পাঠে চলচ্চিত্রের মত ঘটনা চিত্রগুলি চোখের উপর ভাসে।

উপদেশ

রামায়ণে উপদেশাত্মক বহু শ্লোক আছে। সেগুলি সবই প্রণিধান-যোগ্য এবং জীবনে উপলব্ধি করার বিষয়। উত্তর কাণ্ডে (৫২ সর্গ, ১১ শ্লোকে) আছে……জনকনন্দিনীকে রাম-আজ্ঞায় লক্ষ্মণ বাল্মীকি আশ্রমে পরিত্যাগ ক'রে এসে জ্যেষ্ঠভাইকে সমাশ্বস্ত করবার জন্যে বলছেন :

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তাঃ তু জীবিতম্ ॥

সকল সঞ্চয়ই শেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উন্নতির অন্তে পতন এবং মিলনের অন্তে বিপদ হয়; জীবনের অন্তে হয় মরণ।

প্রবীণের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবার বিষয় আদি কবি উক্তকাণ্ডে (৩ সর্গ, ৩৩ শ্লোকে) লিখেছেন :

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥

—যে সভায় বৃদ্ধ নেই, তা' সভাই নয়,—যারা ধর্ম সংগত কথা বলে না, তারা বৃদ্ধই নয়। যাতে সত্য নেই, তা' ধর্ম নয়, যাতে ছল আছে তা' সত্য নয়।

উপকারী মিত্রের সঙ্গে ব্যবহারের বিষয় (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে, ৩৪ সর্গ ৭-১২ শ্লোকে) উপদেশ আছে :

সম্বাহিজন সম্পন্নঃ সামুক্রোশো জিতেন্দ্রিয়ঃ
কৃতজ্ঞঃ সত্যবাদী চ রাজা লোকে মহীয়তে ॥
যস্ত-রাজা দ্বিতোঽধর্মে মিত্রাণামুপকারিণাম্।
মিথ্যা প্রতিজ্ঞাং কুরুতে কো নৃশংসতরস্ততঃ ॥
আত্মানাং যজনাং বৃত্তি পুরুষঃ পুরুষাকৃতে।
পূর্বং কৃতার্থো মিত্রাণাং ন তৎ প্রতিকরোতি যঃ।
গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥
—যে রাজন উপকারী মিত্রের আপন
উপকার করিয়া স্মরণ,
দিয়া অঙ্গিকার
ক'রে থাকে তার সাথে মিথ্যা আচরণ
অধার্মিক নৃশংস সে জন।
যে পুরুষ উপকার করিবার তরে
করে প্রতিজ্ঞাত
করে যদি সত্য ভঙ্গ,—
আত্মহত্যা, ব্রহ্মন বধের পাপ
বর্ত্তায় তাহার।
গো-ঘাতক, চোর মদ্যপায়ী
ব্রত ভঙ্গ পেছে ভাহি
নিষ্কৃতি তাদের যেন সজ্জনেরা লভে ;
কৃতঘ্ন পুরুষ তরে
নাহি কোনো নিষ্কৃতি বিধান।

করুণ স্বভাব ব্যক্তিকে সাধারণতঃ লোকে দুর্বল স্বভাব বোধে অবজ্ঞা ক'রে থাকে। তার বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (৮৯ সর্গে ৪৪ শ্লোকে) আছে,—রাম লক্ষ্মণকে নিজের বিষয় বলছেন :

সাং প্রাপ্যহি গুণো লোকঃ সংবৃত্তঃ পঞ্চ লক্ষ্মণ
অহঞ্চৈব সর্বভূতানাং রক্ষসামবতায় চ ॥

—লক্ষ্মণ, যিনি সর্বলোকের রক্ষক কর্তা এবং বীর, তিনিও যদি করুণ স্বভাব হন তবে অজ্ঞান বলত লোকে তাঁকে অবলা করতে পারে।

দুষ্ট লোক দুষ্ট লোককে চিনে পারে, তার বিষয় সুন্দর কাণ্ডে (৪১ সর্গ, ৯ শ্লোকে) আছে :

অহিরেব অহেঃ পাদান্ বিজানাতি ন সংশয়ঃ।

—সাপেই সাপের পা চিনতে পারে এ বিষয় কোনো সংশয় নেই।

আদি কবি রামায়ণে বলেছেন (অরণ্যকাণ্ড, ৩৭ সর্গ ২ শ্লোকে)

সুলভাঃ সুকৃষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য চ বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ ॥

—রাজা, সতত প্রিয়বাক্য বলে এরূপ লোক সুলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা দুই দুর্লভ।

সীতা বন যাত্রাকালে পতির দান সম্বন্ধে বলেছেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৯ সর্গ, ৩০ শ্লোক) :

মিতং দদাতি হি পিতা মিতং ভ্রাতা মিতং সুতঃ।
অমিতস্য তু দাতারং ভর্তারং কান পূজয়েৎ ॥

—পিতা, ভ্রাতা এবং পুত্রের দান—পরিমিত ; কিন্তু ভর্তার দান অপরিমিত, অতএব তাঁকে কে না পূজা করবে ?

উত্তরকাণ্ডে (২৯ সর্গে ২০ শ্লোকে) আছে।

লোকস্থিত্যাকরং কর্মন কর্তব্যং বিচক্ষণে
বালানাস্ত শুভবাক্যং সাধু গৃহ্যং মহাবল ॥

—মহাবল, লোক স্থিতিকর কর্ম বিচক্ষণ ব্যক্তির যোগ্য নয় ; বালকেও যদি শুভবাক্য বলে তবে তা' গ্রহণ করা উচিৎ।

মানুষের পক্ষে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা শক্ত ব্যাপার,—যদিও সকল মানুষেই তাই চায়। এ বিষয় কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৩২ সর্গ, ৭ শ্লোকে) আছে :—

সর্বথা সুকরঃ মিত্রং দুষ্করঃ প্রতিপালনম্
অনিত্যত্বাত্ চিত্তানাং প্রীতিরল্পেঽপি ভিদ্যতে ॥

—মিত্রতা সুলভ, প্রতিপালন করাই দুষ্কর ; চিত্ত চঞ্চল, অল্পকারণেই প্রায় ভেদ হয়।

মানুষের বিপদের বিষয় উপদেশ আছে (অরণ্যকাণ্ড, ১৬ সর্গ, ৩ শ্লোক) :

আপদ্বিহি নর শ্রেষ্ঠ প্রণিনঃ কস্য না পদঃ।
সংস্পৃশত্যগ্নিবত্তাজ্ঞানক্ষণেন ব্যপয়ন্তি চ ॥

—নরবর, আপদ বিপদ, বিপদ অগ্নির মত সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে কিন্তু অল্পকালেই উহা দূরীভূত হয়।

কর্মের উদ্যম এবং উৎসাহ বিষয় অরণ্যকাণ্ডে (৭৩ সর্গে) আছে :

উৎসাহবন্তো হি নরাঃ লোকে
সীদন্তে কর্মসতি দুষ্করেষু ॥

—উৎসাহী মানুষ অতি দুষ্কর কার্যেও অবসন্ন হন না।

আদি কবি বাল্মীকির কাব্যে এই প্রকার বহু উপদেশাত্মক বাণী পাওয়া যায়।

পূর্বানুবৃত্ত

শঙ্খদত্ত অবশ্য চোখেমুখে চোখ মেরে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রয়। তার হয়ে গেছে কতকটা অসাড় নিস্তেজন দশা। সমস্ত ব্যাপারটা কি স্বপ্নের মধ্যে ঘটে চলেছে? অথবা সেও স্বপ্নে কি সত্য? স্বপ্নেরও একটা সীমা আছে

সেই সীমা ছাড়িয়ে সেখানে পৌঁছানো যায়—একমাত্র পাগলেরা যেখানে।

এ ঘর তবে পাগলের বাড়ি নয়। সমুদ্র রক্তের নেশায় সে অভ্যস্ত নয়—তৈরীও নয়। এই বেলাভূমের আলোড়ন এর রক্ত-মাংসে নয়, পাওয়ার একটা অতিকায় পুরুষের কাছে সে সুদূরে ঘোরে পথ হেঁটে আসেনি! প্রায় নিঃশব্দে সামনের যে ছোট দরজাটি খুলে গেছে আর একটি তরুণ মেয়ে যেন শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে—এও তো মরীচিকা বলে বোধ হচ্ছে না!

মেয়েটি আবার কথা বলছে। মৃদু হাওয়ায় ফুলের পাপড়ি যেমন নড়ে—তেমনি স্নিগ্ধভাবে অল্প একটু নড়ছে ঠোঁট দুটি।

—শুনতে পাচ্ছেন না? বেদরদী শব্দ আপনার কর্ণকুহরে চাইছে।

রুদ্ধ কণ্ঠনালীর ভেতরে এতক্ষণে কথার আবেগ স্ফুরিত হয়ে আসতে চাইল। একটা অস্ফুট শব্দ করল শঙ্খদত্ত।

মেয়েটি সতর্কতার একটা আঙুল তুলল ঠোঁটের ওপরে।

—কোনো শব্দ করবেন না। ভেতরে চলে আসুন।

পুতুল নাচের খেলোয়ার সুতোর টান পড়ল। শরীরে নয়—বুকের শিরা-গ্রন্থিতে। চোরাবালির ওপরে পা পড়লে যেমন হয়—তেমনি ভাবে তরল হয়ে গেল মাটিটা। যেন জলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল শঙ্খদত্ত—প্রত্যেকটি পদক্ষেপ এক একটা ঢেউ যেন উলে উলে যেতে লাগল তার।

যেমন নিঃশব্দে খুলেছিল, তেমনি নীরবেই বন্ধ হয়ে গেল পেছনের দরজাটি। একটা পাথর বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গন পার হয়ে—একটি ঊর্ধ্বগামী সিঁড়ি আশ্রয় করে মন্থরপায়ে উঠতে উঠতে অবশেষে একটি দীর্ঘ বারান্দায় পৌঁছে যেন খানিকটা স্বাভাবিক হল শঙ্খদত্ত। মনের অসাড় অবস্থাটা পার হয়ে গেছে—বুকের ভেতরে শুরু হয়েছে ঝড়ের পালা। রক্তে সমুদ্র দুলছে এখন। যে মেয়েটি পথ দেখিয়ে এনেছিল, আর একটি বড় দরজার সামনে এসে সে থেমে দাঁড়ালো। সমুদ্র-নীল রেশমী পর্দাটি মৃদু হাতে সরিয়ে দিয়ে বললে, যান, ভেতরে যান।

—ভেতরে?—রক্তে যে সমুদ্র দুলছিল এবার সে মাথার মধ্যে ভেঙে পড়ল। সংশয়গ্রস্ত ক্ষীণ গলায় শঙ্খদত্ত বললে, না, থাক।

ফুলের পাপড়ির মতো পাতলা ঠোঁট দুটি অল্প একটু বিকসিত হল মেয়েটির। কৌতুকে চকচক করে উঠল চোখ।

—বাইরের দরজায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাওয়ার সময় যখন হল—তখনই ভয়?

—না, ভয় নয়!—শঙ্খদত্ত উদ্‌ভ্রান্ত গলায় বললে, আমি বরং ফিরেই যাই।

—তা হলে আগেই যাওয়া উচিত ছিল।—মেয়েটি হাসল: বাড়ির ভেতরে যখন ঢুকেছেন, তখন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চলে যাওয়ার আর পথ নেই। ভেতরে

যান শ্রেষ্ঠী, ভয় নেই। দেবদাসী শম্পাকে লোকে আর যা খুশি ভাবতে পারে, কিন্তু তাকে কখনো কারুর বাঘ-ভালুক বলে মনে হয়নি।

বাঘ-ভালুক নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। দেবতার ভুল। তার দিকে মানুষের চোখ পড়লে দেবতার ক্রোধ আকাশ ভেঙে বজ্রের মতো নেমে আসবে।

সমুদ্র-সুনীল রেশমী পর্দাটিকে আরো একটু ফাঁক করে ধরল মেয়েটি।

যা হওয়ার হোক। শঙ্খদত্ত যেন পাহাড়ের চূড়ো থেকে নিচের শূন্যতায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কিছুই চোখে পড়ল না তার। একরাশ সুগন্ধির ঘূর্ণির ভেতরে যেন তলিয়ে গেল সে। ধূপের গন্ধ—ফুলের গন্ধ। নিশীথ রাত্রিতে রহস্যময় মন্দিরের সেই আশ্চর্য পরিবেশ যেন আবার ফিরে এসেছে তার কাছে। একটি শব্দও যেখানে উচ্চারণ করা যায় না—একটি নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলা যায় না—শুধু বিমূঢ় বিস্ময় বয়ে কোনো অভাবনীয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়!

—নমস্কার, আসুন।

স্বর নয়—সুর। সুগন্ধি ধূপের আড়ালটা সরে গেছে একটু একটু করে। রূপো দিয়ে গড়া একটি সাপের প্রসারিত ফণার ওপরে মণির মতো প্রদীপ জ্বলছে। জালিকাটা শ্বেতপাথরের একটি ধূপাধার থেকে ঝলকে ঝলকে উঠে আসছে সুরভিত কুয়াশা। দারুব্রহ্মের একখানি পট-চিত্রের ওপরে শুভ্র একছড়া মালা দুলছে। রক্তরঙের শাড়ী আর নীল কাঁচুলির আবরণে, বুকের ওপর দুটি নিবিড় কালো বেণী দুলিয়ে দেবদাসী শম্পা দাঁড়িয়ে আছে।

—বসুন, শ্রেষ্ঠী।

পাশেই চন্দন কাঠের চিত্রকরা একটি চৌকি। যন্ত্রের মতো শঙ্খদত্ত তার ওপরে বসে পড়ল। বসতে না পারলে মাথা ঘুরেই পড়ে যেত হয়তো।

কিন্তু লাল শাড়ী, নীল কাঁচুলি, আর দুটি কালো বেণীর দিকে শঙ্খদত্ত আর চোখ তুলে চাইতে পারল না। এ সে করেছে কী! এ কোথায় এসে সে দাঁড়ালো। হীরার বিষের মতো যে জ্বালা এতক্ষণ তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বলছিল—যে নেশার তীব্রতা কীটের মতো কেটে কেটে খাচ্ছিল তার মস্তিষ্ক—এই মুহূর্তে তাদের এতটুকু অস্তিত্বও আর অনুভব করছে না শঙ্খদত্ত। চক্ষের পলকে যেন মুক্তিস্নান হয়ে গেছে তার। আত্মহত্যা করার ঝোঁকে একটা মানুষ যেমন একটু একটু করে তার ছুরিতে শান দেয়, তারপর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ফলাটাকে নিজের বুকে বসিয়ে দেবার আগে যেমন হঠাৎ জীবনের মূল্যটা ধরা পড়ে তার কাছে—ঠিক তেমনি একটা চমক বিদ্যুতের মতো খেলে গেল শঙ্খদত্তের শরীরে। রাজার হাতীর সামনে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল সে—অনুভব করেছিল দেবদাসী শম্পা কত দূরের তারা—কোন্ অধরা দিগন্তের ইন্দ্রধনু। কাছে এসে মনে হল—সামনে সে এক ছায়ামূর্তিকে দেখতে পাচ্ছে। ইন্দ্রধনু নয়—ইন্দ্রজাল। হয়তো চোখ তুলে চাইলেই শঙ্খদত্ত দেখবে শম্পা নেই—এই প্রাসাদ নেই, কোথাও কিছুই নেই। শুধু একটা ঘন-অন্ধকার নিবিড় অরণ্যের ভেতরে অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

অবিশ্বাস্য কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। সুরভিত কুহেলিকার মতো। ধূপের গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়। দুধরাঙ সাপের ফণার ওপর মণির মতো রূপালি আধারে দীপ জ্বলছে। মায়ামূর্তিটা স্থির দাঁড়িয়ে আছে—কখন ধূপের ধোঁয়ার ভেতরে নিঃশেষ হয়ে মিলিয়ে যাবে কে জানে।

—শ্রেষ্ঠী কোন্ দেশের?

মায়াময়ীর গলায় বাস্তব প্রশ্ন।

এবারে শঙ্খদত্ত চোখ তুলল। অপরূপ রূপবতী দেবদাসীর দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখে। শ্বেত পদ্ম? অপরাজিতা? না, রক্তজবা?

আর একটি চৌকি টেনে আসন নিলে শম্পা। স্বপ্নসম্ভবা ক্রমশ ধরা দিচ্ছে বাস্তবের বৃত্তরেখায়। লাল শাড়ীর সীমান্তে যেখানে দুটি নৃত্য-চঞ্চল পায়ের পাতা আপাতত স্তব্ধ হয়ে আছে, তারই দিকে দৃষ্টি নামিয়ে এই প্রথম সহজ গলায় সে উত্তর দিতে পারল।

—আমি গৌড় দেশের বণিক। আমার বাড়ি সপ্তগ্রাম।

—আপনার চেহারা দেখেই তা বুঝতে পেরেছিলাম। তা ছাড়া বেশ-বাস, কানের বীরবৌলি।—শম্পার স্বরে তেমনি সুর ঝরে পড়তে লাগল: এখন তো বাণিজ্য বায়ু বইছে। আপনি কি তীর্থদর্শনে এসেছেন, না বাণিজ্যের জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন?

—আমি বাণিজ্যে চলেছি। যাব সিংহলে।

—কী আনতে যাচ্ছেন শ্রেষ্ঠী ?

আশ্চর্য, এই কি আলোচনার ধারা ? এই ধরণের বৈষয়িক আলাপ শোনবার জন্যেই কি তাকে ডেকে এনেছে শম্পা ? স্নায়ুর ওপরে অসহ্য চাপ পড়া কতগুলো ভয়ঙ্কর অদ্ভুত মুহূর্ত কি সে কাটিয়েছে এরই জন্যে ? এ কোন্ কৌতুক ? এর উদ্দেশ্যই বা কী ?

শঙ্খদত্ত বললে—মুক্তা আনতে যাব সিংহলে। আর আনব কর্পূর। চাতীর দাঁত।

চৌকির ওপরে শম্পা নড়ে বসল একবার। বাম দিক থেকে সরে গেল শাড়ীর আঁচল—নীল পর্বতচূড়া দেখা দিল রক্তমেঘের আড়াল থেকে। পর্বতের পাশে সোনালি কর্ণার মতো ঝলকে উঠল মণিহার।

একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল শম্পার ঠোঁটে। স্বপ্ন-কল্পনার অতলে হারিয়ে গিয়ে যে-হাসিকে রূপায়িত করে তুলতে চায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠশিল্পী ; যে সুতনুকার হাসির ধ্যানে কল্পনায় তন্ময় হয়ে থাকে রূপদক্ষ দেবদত্তের দল।

—পটবস্ত্রের বিনিময়ে শ্রেষ্ঠী সিংহল থেকে নিয়ে আসবেন চাঁদের টুকরোর মতো এক একটি অতুলনীয় মুক্তা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টি কেন ফুটো মুক্তার ওপর ? আর যে ফুটো মুক্তার চারদিকে তিমি আর হাঙর পাহারা দিচ্ছে—শ্রেষ্ঠীকে যা আয়ত্ত করতে হবে জীবনের বিনিময়ে ?

নীল পাহাড়ের কোলে যে সোনালি কর্ণার শঙ্খদত্তের মন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, তড়িৎগতিতে তা ফিরে এল সেখান থেকে। পাহাড়ের চূড়োয় একটি ঘন কালো বেণী কর্ণা দুলল কাল-অজগরের মতো।

—আমি—

শঙ্খদত্ত কথাটা শুরু করল মাত্র, শেষ করতে পারল না। জানালা দিয়ে হাওয়া এল খানিকটা। মণির নিষ্কম্প শিখাটা দুলে উঠল—জলের ওপর কাঁপতে থাকা জ্যোৎস্নার মতো একটা অলৌকিক আভা দুলল শম্পার চোখে-মুখে।

—অনেক সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন আপনি। অনেক বাণিজ্য করেছেন। আজ আপনার এ-ভুল করা উচিত ছিল না।

—কিসের ভুল ?—যে নিবিড় অন্ধকার অরণ্য থেকে কাল অজগর নেমে এসেছে, যার প্রান্তরেখায় জ্বলছে সন্ধ্যা-তারার মতো কুঙ্কুম-কণা, তারি ভেতরে যেন নিরুপায় ভাবে হারিয়ে যেতে লাগল শঙ্খদত্ত, প্রশ্ন করলে নিতান্ত অবাচীনের মতো : কিসের ভুল ?

আবার সেই হাসি ফুটল শম্পার মুখে। সেই আশ্চর্য হাসি—যার কল্পনার তুলিতে স্বপ্নের রঙ মিলিয়ে প্রলেপ টেনেছে ধীমান—যাকে প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে অন্ধকার পাহাড়ে পাহাড়ে প্রেতাত্মার মতো রাত্রি জাগরণ করে বেড়িয়েছে শিল্পী বীতপাল !

শম্পা বললে, তা হলে আর একটু স্পষ্ট ভাষায় জানাতে হল। আজ যে প্রাচীরের পাশে এসে আপনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আসলে ওটা একটা মৃত্যুর ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

—মৃত্যুর ফাঁদ ?—শঙ্খদত্তের চোখ চকিত হয়ে উঠল। শম্পার মুখের আর কোনো অংশই যেন সে দেখতে পাচ্ছে না এখন। শুধু নিশীথ অরণ্যের প্রান্ত থেকে সন্ধ্যাতারাটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে ; যেন তারই একটি আলোক-রেখাকে আশ্রয় করে নেমে আসছে শম্পার স্বর আকাশ থেকে। অপরিচিত অজ্ঞেয় অরণ্য থেকে। মৃত্যুর ওপার থেকে। শম্পার স্বরে যেন কোথাও কোনো ধ্বনি নেই ; একটা সূচিমুখ আলোক রেখা হয়ে তা তার মস্তিষ্কের কোষগুলোকে বিদ্ধ করে চলেছে !

—শ্রেষ্ঠী কি জানেন না—এই নগরে প্রাচীরের পাশের ওই নির্জন জায়গাটিই সব চাইতে ভয়ঙ্কর ? ওখানে একটি দুটি নয়—শত শত মৃত-আত্মার দীর্ঘশ্বাস আর অভিসম্পাত মিশে রয়েছে। আপনি প্রেতপুরীতে পা দিয়েছেন শ্রেষ্ঠী—তারা আপনার হাত ধরে মৃত্যুর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যাতারাও আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু কালো অরণ্য। শুধু মৃত্যুলোকের ইঙ্গিত। আর একবার প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল—ডান দিকের বেণীটা দুলে উঠল এইবার—ঘুম ভেঙে জাগল আর একটা কাল-অজগর।

শম্পার স্বর তেমনি সূচিমুখ আলোকের মতো এসে বিঁধছে মস্তিষ্কের কোষে কোষে। কিন্তু সূচি নয়—সূচিকাভরণ। বিন্দু বিন্দু সাপের বিষ ক্ষরিত হচ্ছে তা থেকে—একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে রক্তের ভেতরে।

শম্পা বলে চলল, শুধু আজই নয়। এক বছর, দু বছর, দশ বছরও নয়। কতকাল থেকে কে জানে—মন্দিরের

প্রধান দেবদাসী দিন কাটিয়ে গেছে এই প্রাসাদে। এই জানালায় বসে সে চুল বেঁধেছে, এই নাগ-প্রদীপে আলো হয়েছে তার ঘর—এরই মর্মর-বিস্তারের ওপর মৃদঙ্গের গুরু গুরু তালের সঙ্গে আর বীণার ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সে নাচের পা ফেলেছে। তাকে দেখে কত মানুষ লোভে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আলেয়ার ডাক শুনে ছুটে এসেছে এখানে—দাঁড়িয়েছে এই প্রাচীরের পাশে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। তারপর যথাসময়ে রাজার প্রহরী এসে শিকলে বেঁধেছে তাকে। দেবতার দাসীর প্রতি পাপ দৃষ্টি ফেলবার অপরাধে বিচার হয়েছে তার—কুঠারের ঘায়ে তার ছিন্নমুণ্ড গড়িয়ে গেছে মাটিতে। শ্রেষ্ঠী, আপনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, ওটা সেই শ্মশান। ওখানে সেই সব অতৃপ্ত প্রেতের আনাগোনা। তাদের সেই বিভীষিকার আতঙ্কে এই নগরের সাধারণ মানুষ দিনের আলোয় পর্যন্ত কখনো ওখানে আসে না।

শঙ্খদত্ত তাকিয়ে রইল। পাহাড়ের পাশে রক্তমেঘে যেন অগ্নিঝড়ের পূর্বাভাস। কাল-অজগরের ফণা দুলছে সোনালি স্বর্ণার ওপরে। কিন্তু ওই পর্বতচূড়োটা কি একটা নিশ্চল সমাধি? মৃত্যুর ঘন নীল অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে আছে?

কিন্তু—কিন্তু—মন্দিরের সেই রাত। সেদিন এ-দেহে কোথাও মৃত্যু ছিল না। সুরে-বাঁধা সোনার বীণার মতো প্রতিটি অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীত জাগছিল তখন। সেই রাত!

শম্পা বললে, এই কথাটা জানিয়ে দেবার জন্যেই শ্রেষ্ঠীকে ডেকেছিলাম। গোপনেই ডাকতে হয়েছে। প্রধান পুরোহিত যদি জানতে পারেন তা হলে এর জন্যে কঠিন শাস্তি নিতে হবে আমাকে। কিন্তু তার চাইতেও বড় দায়িত্ব শ্রেষ্ঠীকে সাবধান করে দেওয়া। সে কর্তব্যই আমি করলাম।

রাত্রির শ্বেত পদ্ম—সকালের অপরাজিতা। সন্ধ্যায় সে রক্ত জবা। শোণিতভরা খর্পরের মধ্যেই সে শোভা পায়। কত ছিন্ন মুণ্ড লুটিয়ে গেছে তার পায়ের তলায়! আজ নয়—কাল নয়—কত বৎসর—কত শতাব্দী! সেই সব আত্মার শ্মশান ওই প্রাচীরের পাশে নয়—সে শ্মশান ছড়িয়ে রয়েছে এই শম্পার সর্বদেহে। দেবদাসী-পরম্পরায় সেই সব অভিশপ্ত বৎসর আর নিরর্থ কামনাকে নিজের মধ্যে আহরণ করে নিয়েছে শম্পা। তার কালো চুলে তাদের মৃত্যুময় হতাশা তিমির-স্তব্ধ; সন্ধ্যাতারা কুঙ্কুম-বিন্দু তাদেরই রক্ত দিয়ে রাঙানো; তার হৃদয়ে তাদেরই উত্তুঙ্গ বাসনার বিকাশ; তার সমস্ত শরীরের ছন্দোময় রেখায় রেখায় তারাই ছড়িয়ে আছে নরীসুপ ভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ সেই শ্মশানকে প্রত্যক্ষ করল শঙ্খদত্ত। তবু সেই মন্দির। সেই আলো। সেই বীণা। সুকুমার তন্তুতে সদ্য-ফোটা পদ্মের প্রথম বিস্ময়। নির্মল। নিষ্পাপ। সেই রাত্রি।

কোন্‌টা সত্য? কোন্‌টা মিথ্যা?

শঙ্খদত্ত হঠাৎ মাথা তুলল। চুলে নয়—কপালে নয়—কালো বুক্কোর মতো চোখের দিকে নয়—রক্ত মেঘের দিকেও নয়। সেই রাত্রি। সব কিছু ছাড়িয়ে সেই চন্দন-মূর্তি।

শ্মশান নয়—মন্দিরই বটে। অনেক বলির পরে একজনের নিষ্কৃতিলাভ।

নিজের স্তব্ধ বিমূঢ় ভাবটা আচমকা কাটিয়ে উঠল শঙ্খদত্ত।

—তারা ভীরু। তাদের সাহস ছিল না।

—কিসের সাহস?—এবার বিস্ময়ের পালা শম্পার। সূক্ষ্ম ভ্রূরেখা দুটি জিজ্ঞাসায় সংকীর্ণ হয়ে এল।

—তারা শুধু প্রার্থনাই করেছে। কেড়ে নিতে পারেনি।

—কেড়ে নেবে কাকে? দেবদাসীকে?

—দেবতার দাসী নেমে আসুক স্বর্গ থেকে। কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার কী অধিকার দেবতার? মানুষ তার ন্যায্য পাওনায় দেবতাকে ভাগ বসাতে দেবেনা। প্রতিবাদ জানাবে সে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় হেসে উঠল শম্পা। সেই হাসির শব্দে ধূপের গন্ধটা পর্যন্ত চমকে উঠল, দুধরাজ নাগের মাথার মণির মতো প্রদীপের শিখাটা দুলে উঠল চকিত হয়ে; নীল পাহাড়ের চূড়ো থেকে রক্ত মেঘের আবরণটা আবার স্খলিত হয়ে পড়ল—চিক চিক করে উঠল গলার সোনার হার।

শম্পা বললে, শ্রেষ্ঠী, অত সহজ নয়। দারুবদ্ধ নিজের হাত দুটিকে বিসর্জন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর চারদিকে সশস্ত্র বাহুর অভাব নেই। পেছনের দরজা একবারই খুলেছে—বারে বারে তা আর খুলবে না। সামনে দাঁড়িয়ে

সাক্ষাৎ মৃত্যু। অন্ধের মতো সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার একটি মাত্র পরিণামই ঘটতে পারে।

শঙ্খদত্ত এইবার—এই প্রথম তাকালো শম্পার চোখের দিকে। দুর্লভ দামী কালো রক্তের মতো সেই চোখ। সুভদ্রকার চোখের কথা ভাবতে গিয়ে এই চোখেরই তো ধ্যান করেছে অপলক মেনদত্ত: এই চোখের আলোটিকে ফোটাবার জন্যই তো বার্ধ ফোস্তে রক্তের পরে রক্ত মিশিয়েছে বীমান: এই চোখের চাহনিটিতেই তো নিশি-পাওয়ার মতো অন্ধকার পাগাড়ে পাগাড়ে অভিশপ্ত আত্মার মতো ঘুরে বেড়িয়েছে বীতপাল!

শঙ্খদত্ত বললে, কিছুই বলা যায় না।

শম্পা আবার তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠল: গৌড়ের শ্রেষ্ঠী কি আমাকে এখান থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন?—কিন্তু মাঝ পথেই একটা গভীর বেদনায় তার হাসির স্বর থেমে গেল: শ্রেষ্ঠী হয়তো আজও কুমার। তাই একটা রোমাঞ্চকর কিছু করবার কল্পনা তাঁকে উত্তেজিত করে তুলছে। কিন্তু এসব ভাবতে যাওয়াও আত্মহত্যার সমান। শ্রেষ্ঠী রূপবান—দেখে মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যেরও তাঁর অভাব নেই। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একটি সুন্দরী মেয়ের পাণিগ্রহণ করুন তিনি এসব বিকার দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। তা ছাড়া গৌড়দেশ তো সুন্দরী মেয়েদের জন্যে বিখ্যাত।

শঙ্খদত্ত বললে, যাদের সহজে পাওয়া যাবে তারা তো বইলই। কিন্তু যাকে পাওয়া সবচেয়ে দুষ্কর—তারই জন্যে আমি চেষ্টা করে দেখব।

—কিন্তু বাণিজ্য?

—লক্ষ্মীর আশাতেই লোকে বাণিজ্য করে। তাকে পেলে আর কিছুরই দরকার নেই। না মুক্তা—না কর্পূর—না হাতীর দাঁত।

শম্পা তেম্‌নি গম্ভীর গলায় বললে, লক্ষ্মী নয়—আপনার ভুল হচ্ছে। এ অলক্ষ্মী—এ ছুটা মুক্তা।

—আমি বণিক। কোন্‌টা সাঁচ্চা আর কোন্‌টা মেকি সে আমি চিনতে পারি।

শম্পা হঠাৎ আর্তস্বরে বললে, শ্রেষ্ঠী, আর নয়। আপনি ফিরে যান। এখনো সময় আছে। মৃত্যুকে নিয়ে খেলা করবারও সীমা আছে একটা।

—সেই সীমাটা আমি দেখতে চাই।

—কিন্তু দোতলের ওই দরজাটা আর খুলবে না।

—দেওয়াল পার হয়েই আমি আসব।

মুহূর্তে রক্ত সরে গিয়ে সাদা হয়ে গেল শম্পার মুখ। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দাঁতে নিজের ঠোঁটটাকে সে কামড়ে ধরল একবার। তারপর কঠিন গলায় বললে, সর্বনাশ এম্‌নি করেই মানুষকে টানে। আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু আর নয়। চিত্রা—

দরজার সমুদ্র-নীল পর্দা সরিয়ে সেই মেয়েটি এসে দাঁড়ালো।

—মৃত্যু শিকারের আসবার সময় হয়েছে। তুমি শ্রেষ্ঠীকে বাড়ির বাইরে রেখে এসো। না—আর এক মুহূর্তও নয় এখানে।

ক্রমশঃ

সংকেত

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত

জীবনের বৃন্ত হতে
মৃত্যু আজ করে করাঘাত,
ক্লান্ত মন আনে ছায়া
মরণের কঠিন সংঘাত!
কিসের প্রত্যাশা
কাল গোনো প্রহরে প্রহরে—
ঘুমন্ত দিগন্তে আর
কি কথা যাদুকা প্রান্তরে?

তোমার সোনার দিন
আঁধারে যে করিয়াছে ম্লান—
নীলাকাশ নিভে গেছে,
আকাশেতে ঝড়ের আভাস।
দুরন্ত রাঙানো দিন,
কল্পনার জাল বোনা মিছে—
তোমার প্রাসাদে আজ
মরণ ঘনিছে!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আমদানি ও রপ্তানি—

দেশ বিভক্ত হইবার পর হইতে আজ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা অন্নের ও বস্ত্রের অভাব হইতে মুক্তি পায় নাই ; ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ অন্ন-বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না ; কিন্তু অন্ন পরিবহনের অক্ষিপ্রতার দোষ যেমন বিস্তার হইতেছে, তেমনই বস্ত্র পরিবহনের ব্যাপারে পরিবহনকারীদিগের আন্তরিকতার ও যোগাযোগ আরও ব্যাপক হইবার প্রয়োজনের অনুভূতির মৌলিকতার প্রমাণের সন্ধানই প্রবল হইতেছে। অনেক সময় বলা হয়, স্বাধীনতালাভের সময় ভারত রাষ্ট্র খাদ্যসম্পূর্ণ হইতে আর কিছু বাকী নাই। কিন্তু তাহার পরে কত বছর হিসাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধরা হয় নাই ; যেন দেশে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প এ সকল ঘটিবে না মনে করিয়াই সরকারের বিশেষজ্ঞগণ পরিকল্পনা রচনা করেন এবং তাহাই সঙ্গত। আমার পরিকল্পনাকারীরা যে আনুমানিক ব্যয় দেখাইয়া কাজ আরম্ভ করিতে প্ররোচিত করেন, কার্যকালে ব্যয় তাহা অতিক্রম করিয়া যায়। ইহা অত্যাচারের পরিচায়ক কি ইচ্ছাকৃত ভুল তাহাও বলা যায় না।

এ বার আমরা বুঝিতেছি, খাদ্যোপকরণে ভারতরাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রকাশ, ভারতের খাদ্য মন্ত্রী মিষ্টার সিলোজাই মন্ত্রীদিগকে—চাউল বিদেশের জন্য কোন অতিরিক্ত দেশের সহিত ব্যবস্থা করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কেবল নিশ্চিত জাতি প্রতিযোগিতার উপলক্ষ সৃজন করিবার জন্যই মন্ত্রী মিষ্টার পাকিস্তান ঐ কথার উপযুক্ত উত্তর দেন নাই। এক বৎসর পূর্বে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু অবিমৃষ্যকারিতাবশতঃ বলিয়াছিলেন, পর-বৎসরের পর ভারত রাষ্ট্র আর বিদেশ হইতে চাউল আমদানী করিবে না এবং সেই কথার বিশ্বাস করিয়া ব্রহ্ম তাহার অতিরিক্ত চাউল অন্যান্য দেশে বিক্রয় করায় দেখে ভারতকে অনেক অধিক অর্থ দিয়া চাউল কিনিতে হইয়াছিল। প্রাকৃতিক দুর্যোগ নাকি পণ্ডিত জবাহরলালের হিসাব বানচাল করিয়া দিয়াছিল।

এ বার সিলোন, ভারত যদি খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে কাহার বা কাহাদিগের স্বার্থরক্ষার জন্য "রেশনিং" ও "লেভী" বজায় রাখা হইতেছে, কেনই বা খাদ্য বিভাগ নৈরাজ্যের মত দেশের অন্নে ধনিয়া আছে এবং কেনই বা পশ্চিমবঙ্গে দেশের তুলনায় চাউলের মূল্য অধিক হইল ? এ সকল যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রমাণ নহে, তাহা বলা বাহুল্য। আর কেনই বা ব্যবসায়ীদিগকে ব্রহ্ম বা সেলাম বা থাইল্যাণ্ড হইতে চাউল আমদানী করিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে না ? পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে যে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা তাহার সরকার ১৯৫৯ সালে স্বীকার করিয়াছেন যে সরকার বীজ ও বৎসরের কৃষিঋণ দেওয়া বাড়াইয়া আবশ্যক করিতে পারিল না, সে সরকারের অক্ষমতার অধিকতর পরিচয়ের দাবী কি যুক্তিসহ বলা যাইতে পারে ?

প্রতি বৎসরের মত এ বারও, যখন বর্ষাকালে ওলায় চিনি পলিয়া যায় এবং সেই জন্য ব্যবসায়ীরা "গাদাই" চিনি বাজারে ছাড়িতে আরম্ভ করে, তখন সরকার দেশের লোকের জন্য চিনি সুলভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছেন। এমন কি এ বার বিদেশ হইতেও চিনি আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের জন্যই কি চিনির মূল্য হ্রাসে সরকারের অসম্মতি দেখা যাইতেছে না ? সরকার কেন চিনির মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিতেছেন এবং ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে মূল্য হ্রাসের বাধা দিতেছেন ? ইহা জনসাধারণের সুবিধার জন্য, না সুবিধের ব্যবসায়ীর লাভের জন্য ?

অন্যান্য বৎসরের মত এ বারও দুর্গোৎসবের সময়ে কাপড়ের মূল্য কমাইবার জন্য সরকারের ব্যাকুলতার লোকের মনে হইতেছে—"আগের দেশে ভিক্ষার কাঁকে, পাছু করয় ডাকে।" বস্ত্র মাসের জন্য রপ্তানী বন্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কলের কাপড়ের মূল্য শতকরা ৫ টাকা বা ঐরূপ হ্রাসের ব্যবস্থা হইতেছে। অবশ্য কাপড়ের কল-মালিকদিগের সহায়তার্থেই তাহা হইতেছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ ও পুনর্নিয়ন্ত্রণ—এই নীতি-পরিবর্তন—অবশ্যই বর্ধ-পরিবর্তনের মতই হইয়া আসিতেছে এবং ফলে লোক কি পাইবে, বুঝিতে পারিতেছে না। কাপড়ের কলে ও হাতের তাঁতে দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান যে অসম্ভব, এমন বিশ্বাসের ভিত্তি নাই—তুলা বিদেশ হইতেও আমদানী হইতেছে এবং পাকিস্তানের আছে বিদেশ। পশ্চিমবঙ্গে হাতের তাঁতে সুতার অভাব অনুভূত হইয়াছে। অথচ প্রয়োজনে সুতার কল কোথায় ? যে সকল কাপড়ের কল আছে সে সকলের সুতা তাহারাই বস্ত্র বয়নে ব্যবহার করে এবং কেনাই পুঁজিতে পারিলে যায়, কাপড় পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না—আর সেইজন্য

চাহিল ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মে কলের কাপড়ের মূল্য হ্রাস হইতেছে না। হাতাবার কলের কাপড় বিক্রয় করিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কল-মালিকেরা লাভবান হইতে পারিতেছিল। আর বিভিন্ন দেশে বোম্বাই, আমেদাবাদ, নাগপুর, কাণপুর, কলিকাতা, মাদ্রাজ এই সকল স্থানের কলে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপাদন সম্ভব সেই পরিমাণ উৎপাদন হইলেও দেশের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান হয় না, এ কথা বলাবাহুল্য। কিন্তু যে স্থানে সরকার নীতির দোষে সমস্যার সৃষ্টি করেন, তথায় অবস্থা—"না-রহিল, না-উকীল, না-আদীল।" কেবল বড় বড় কথায় যেমন লোকের উদরপূর্ত্তি হয় না, তেমনই আস্ফালনের অভাবও দূর হয় না। বস্ত্র সম্বন্ধে ভারত সরকারের নীতি কাহার ও কাহাদিগের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত ও পরিবর্ত্তিত হয়—তাহা দেবতারা জানেন কি না বলা যায় না—মানুষ জানে না, তাঁহারা মানুষকে জানিতে দেনও না।

যে রাষ্ট্রে অন্ন-বস্ত্রের অভাব দূর হয় না, সে রাষ্ট্রে লোকের সুখ-সমৃদ্ধির পরিমাণ কিরূপে পরিমাপ করা যায়

বেকার-সমস্যা—

সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশন রাষ্ট্রে শিক্ষিত বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে সরকারের নিকট আপনাদিগের অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সমস্যা বিভিন্ন ভাবের আকার ধারণ করিতেছে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে স্থানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে চাষের ও চাষীর আর্থিক দুরবস্থা মিলিত হয়, সেই স্থানেই অগ্নি-জ্বলিয়া উঠে। ইংলণ্ডে যেমন ফ্রান্সেও তেমনই ইহা দেখা গিয়াছে এবং আয়ার্লণ্ডেও এ বিষয়ে ইহাই হইয়াছে। বেকার-সমস্যা পশ্চিমবঙ্গে ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও প্রবল। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের সংখ্যাধিক্য দুই প্রকার বেকার-সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে—শিক্ষিতগণ চাকরী বা জীবিকার্জ্জনের অন্য কোন উপায় পাইতেছে না; অশিক্ষিতরা জমীর অভাবে কৃষিকার্য্যে ও শিল্পের অভাবে শ্রমিকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছে না।

সম্প্রতি য়ুরোপে কয়দিন যাপন করিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব প্রস্তাব করিয়াছেন, বুনিয়াদী শিক্ষার বিস্তারজন্য আগামী ৩ বৎসরে ৮।১০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করিলে শিক্ষিত বেকারের সমস্যার কিছু সমাধান হইবে। কিন্তু ৩ বৎসরে ৮।১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ কি সমুদ্রে শিশির-বিন্দুর মতই হইবে না? তাহাতে কেবল সরকারের এই সুবিধা হইতে পারিবে যে, ৩ বৎসর পরে যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে বিনাব্যয়ে সরকারী দলের নির্ব্বাচনজন্য ৮।১০ হাজার কর্ম্মী বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু শিক্ষক-সমস্যার এখনই পারিপ্রেক্ষিকের পরিচয় যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্য করিতেছেন না?

আর ১০ হাজার লোক নিয়োগে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কতটুকু হ্রাস পাইবে?

তাহার পরে অশিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যার কি হইবে? কৃষক-দিগের সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে লক্ষ লক্ষ কৃষক পশ্চিম-বঙ্গে আসিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহাদিগকে বহু বিলম্বে ও কাহা হিসাবে বাসের জমী দিলে কি হইবে? চাষের জমী ব্যতীত তাহারা কিরূপে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিবে? সে জন্য আরও জমী প্রয়োজন। পরলোক-গত সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল যখন পূর্ব্ব পাকিস্তানের নিকট তাহাদিগের জন্য জমী দাবীর কথা বলিয়াছিলেন, তখন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল সে প্রস্তাবে, যেন ভয় পাইয়া, তাহা চাপা দিয়াছিলেন—পাছে পাকিস্তান ক্ষুণ্ণ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিহার হইতে জমীদারীভাঙ্গা অংশ পাইবার দাবী করিয়া সে দিকে আর অগ্রসর হ'ন নাই।

শ্রমিক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের পাটকলে, কাপড়ের কলে, অন্যান্য কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। পাটের কলে এই অবাঙ্গালী শ্রমিকের আধিক্য কেন ঘটিয়াছে, তাহা শিল্প কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালীর শ্রমবিমুখতাই তাহার কারণ নহে। যে সকল কারণে তাহা ঘটিয়াছে, সে সকল দূর করিবার চেষ্টাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেছেন না। টাটানগরে যদি বিহারী নিয়োগের জন্য বিহার সরকার নির্দ্দেশ দান করিতে পারেন, তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানায় অবাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োগের বিরোধিতা করিতে পারেন না? অশিক্ষিত-দিগকে শিক্ষিত করিয়া বেকারদিগের সমস্যা প্রবলতর করিলে কি ফল লাভ হইবে? আর প্রদেশের শ্রমশিল্প কি অবাঙ্গালীরাই করিতে থাকিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিবের পরিকল্পনা যে রাষ্ট্রোপযোগী তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

দ্রুত শিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় ও সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক বল অবিচলিত রাখিয়া সমর্থন লাভ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সচিবের সংখ্যাবৃদ্ধি ও উপসচিব নিয়োগ করিয়াছেন—এমন কি উপসচিবদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া ২ জনকে পদোন্নতি করিয়া বিভাগ অপরগুলিকে নিকৃষ্টতার ছাপ দিলেও তাঁহারা আপসে পদত্যাগ করেন নাই। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? বহু দিন পূর্ব্বে ইংরেজ ঐতিহাসিক হ্যাটার—এ দেশে ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির ফল বিবেচনা করিয়া এই বেকার-সমস্যার ভয়ই দেখাইয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুলোৎপাদিকা কৃষির ও ইউজ শিল্প প্রতিষ্ঠার আবশ্যক ব্যবস্থা উপেক্ষা করিয়া যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য করিতেছেন, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। সে ফল অতি তিক্ত—বিষময়।

চীন কিরূপে বেকার-সমস্যা বিলুপ্ত করিয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া কাজ করা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবশ্যক মনে করেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহের ব্যর্থ ব্যবস্থায়, কলিকাতায় যানচালনার আধিক্য ঘটিতে, বহু উপসচিবের বেতনাদি বাবদে, কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের দুরাশায় যে অর্থের অপব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাতে প্রত্যেক ইউজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং যে সকল শিল্প এখনও আছে সে সকলের উন্নতি সাধিত হইলে প্রকৃত উপকার হইত।

ভারতের তাঁত শিল্পে যদি উন্নতি সাধিত হইত—সুতা যোগান হইত ও বস্ত্র বিক্রয়ের সুব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে যে বেকার-সমস্যার তীব্রতার উপশম হইতে পারিত, তাহাও কি সরকারের সর্বজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করিতে পারেন না?

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও সৃষ্টি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ভার যে সচিব পাইয়াছেন, তিনি পার্লামেণ্টে সদস্য ছিলেন এবং তথায় "হিন্দু কোড বিল" সমর্থন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এ বার তিনি পার্লামেণ্টে নির্বাচনে বিপুল ভোটে পরাভূত হইয়াছিলেন। নির্বাচন যদি লোকের আস্থার পরিমাপক হয়, তবে তিনি সে আস্থা লাভ করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহাকে সান্ত্বনা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে সচিবত্ব দিয়া পরে উপ-নির্বাচনের পথে ব্যবস্থা পরিবর্তে লবণাম্বুধিকূলে দেওয়া হইয়াছে। তিনি সম্প্রতি দিল্লীতে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া আসিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

(১) উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কার্য্য সন্তোষজনক হয় নাই।

(২) প্রকৃত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই।

অথচ এই কার্য্যে এক কোটিরও অধিক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে! তাহার কত অংশ চোরাবালুতে গিয়াছে, কে বলিবে? তাঁহার প্রবল বিদ্যাবে প্রকাশ—

গত জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১১ হাজার পরিবার আশ্রয় শিবিরে স্থান পাইয়াছিল—তাহার মধ্যে ১০ হাজার পরিবার কৃষক। ২১ হাজার পরিবার যে জমী দেখিয়াছে, তাহাতে বাস করিতেছে। ১০ হাজার পরিবার মুসলমানদিগের ত্যক্ত গৃহে অনধিকার বাস করিতেছে। ২৩ হাজার পরিবার বাসযোগ্য জমী চাহিয়া আবেদন জানাইয়াছে।

এই স্বীকারোক্তি হইতেই অবস্থার ভয়াবহত্ব সপ্রকাশ। ইহার জন্য দায়ী কে? কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি পল্লীর কথা আমরা জানি—সে বিজয়গড় পল্লী। উহার অধিবাসীরা বহুবার চাহিয়াও জমীর অধিকার লাভ করেন নাই; সুতরাং অনিশ্চয়তাহেতু স্থায়ী বাসের ব্যবস্থাও করিতে পারিতেছেন না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অবস্থা।

যে সকল কৃষক পরিবার আশ্রয় শিবিরে স্থান পাইয়াছে, তাহারা কেবল স্থান পাইলে কি হইবে? কৃষির জন্য জমী কোথায়?

সচিব আশা দিয়াছেন—২ বৎসরে তিনি সুব্যবস্থার আশা করেন। ততদিনে যাহারা অনাহারে না হইলেও অপুষ্টাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে বা অকর্মণ্য হইয়া যাইবে, তাহাদিগের অবস্থার জন্য দায়ী কে? এ যেন মরণাহত রোগীকে আশ্বাস—

"থাক দেখি তুই সঙ্গে,—
ভাত যদে ভাত দেব তোরে
বিকের কোল দিয়ে।"

সরকার গত ৫ বৎসরে যাহা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া যদি ভবিষ্যতে কি করিবেন, তাহা মনে করিতে হয়, তবে আশার কতটুকু অবকাশ থাকিতে পারে?

আজ পুনর্বাসন সচিব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন—কাজ সন্তোষজনক, এমন কি আশানুরূপও হয় নাই। অথচ গত জানুয়ারী মাস হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ৬ মাসে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়াছে:—

কৃষি ঋণ—	১১,৫৫,৭০০ টাকা
ব্যবসার জন্য ঋণ—	৫২,২৮,২৫৭ টাকা
গৃহনির্মাণ জন্য ঋণ—	১,৮২,৩৯,২৪৩ টাকা

এই অর্থের সম্যক সদ্ব্যবহার হইয়াছে কি? যে সকল পদস্থ কর্ম্মচারীর উপর ঋণ দানের ভার ছিল, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ যে দুর্নীতির জন্য অভিযুক্ত হন নাই, এমনও নহে। অযোগ্য প্রার্থী ঋণ পাইয়াছে, যোগ্য বঞ্চিত হইয়াছে, এমনও অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে। সর্ব্বত্রই কি সরকার কেবল রাজনীতিক দল-বিশেষভুক্ত লোকের সহযোগ গ্রহণ করেন নাই? সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরা কি ক্ষমতাগর্ব্বে অসঙ্গত আচরণের জন্য অভিযুক্তও হন নাই?

এক দিকে এই অবস্থা, আর এ দিকে পাকিস্তানের সহিত জওহরলাল যে ব্যবস্থায় সম্মত হইয়াছেন, তাহাতে আরও উদ্বাস্তু সৃষ্টি করা হইবে। তিনি কতকগুলি "ছিটা মহল" পূর্ব্ব পাকিস্তানকে বিনিময়ে যে প্রস্তাব করিয়াছেন—তাহাতে সেই সকল স্থান হইতে যে বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে আসিতে বাধ্য হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং যে সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান সরকার গত ৫ বৎসরে করিতে পারেন নাই, সেই সমস্যা আরও প্রবল ও জটিল হইবে।

পাকিস্তান বিনিময়ে কি দিবে? যদি বিনিময়ে অর্থ দেয়, তবে তাহা কি "পেয়েজল হোয়েন এবল"—অর্থাৎ যখন পারিবে তখন শোধ করা হইবে, এই সর্ত্তে—পাকিস্তান ঋণের করিবার জন্য গান্ধীজীর নির্দ্দেশে যেমন টাকা দেওয়া হইয়াছিল তেমনই ভাবে হইবে? না—জমীর বিনিময়ে জমী দেওয়া হইবে? যদি জমী দেওয়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গে যে জমী পাওয়া যাইবে, তাহাতে মুসলমানরা নিশ্চিন্ত ভাবে নির্ভয়ে বাস করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু যে জমী পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে যাইবে তাহাতে হিন্দুরা বাস করিতে পারিবেন না। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু-সমস্যা আরও প্রবল হইবে। ইহাই কি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অভিপ্রেত? তিনি কি এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন? আর ঐ সকল "ছিটা মহলের" অধিবাসীদিগের গণভোট গ্রহণ করিবার কথা কি তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান ত্রুটি তাঁহারা মনে করেন—সকল সমস্যা সমাধানের উপায় কেবল তাঁহারাই করিতে পারেন—সে জন্য বাহিরের কাহারও পরামর্শের কোন মূল্য তাঁহারা স্বীকার করেন না। কেবল হয়ত প্রধান সচিব আবার সরকারী ব্যয়ে—য়ুরোপে বা আমেরিকায় যাইয়া এমেশের অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে বিশেষ অজ্ঞ কোন কোন লোককে

বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিবেন।

উদ্বাস্তুদিগকে কলিকাতার উপকণ্ঠে—কাশীপুরে পাটগুদামে কি অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অভিযোগ পাইয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন এবং প্রতীকারোপায়ও হইয়াছিল; কিন্তু প্রধান সচিব বা পুনর্ব্বাসন সচিব কি কোন দিন পরিদর্শনে যাওয়া প্রয়োজন বা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন?

এই কার্য্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি রাজনীতিক দলনির্ব্বিশেষে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহযোগ চাহিয়াছেন? তাঁহারা কি মানুষের জীবন লইয়া যে খেলা হইতেছে, তাহা একান্ত লজ্জার বিষয় নহে?

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের মনোভাবের পরিচয় আমরা একাধিকবার পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন?

পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা সমাধানে যে চেষ্টা হইয়াছে বাঙ্গলার সমস্যা সমাধানে কি সে চেষ্টাও করা হইয়াছে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন বিষয়ে অকর্ম্মণ্যতা ও কার্পণ্য যে কোন সভ্য সরকারের পক্ষে কলঙ্কজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরকারকে কাজ করিতে হইবে—২ বৎসরের কথায় লোক নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। কারণ, বিপদ দূরত্ব নহে এবং বিপদে লোকের মৃত্যুই অনিবার্য্য। মানুষকে মানুষ হিসাবে রক্ষা করাই সরকারের কাজ।

বাঙ্গালা ও বিহার—

বাঙ্গালার পোর্টব্লেয়ার হইতে আন্দামানের যে পাকী ধারা নির্গত হইতেছিল—জগদ্বৈধ যেমন শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহাই গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত পথ করিয়া লইয়া গেল পূত করিয়াছিলেন বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই সেই ভাগীরথীর ধারা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি বাঙ্গালী। বাঙ্গালী তরুণ প্রথম দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়াছিল। কিন্তু, বোধ হয়, স্বভাবদোষে, আজ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজনীতিক নেতারা বাঙ্গালাকে সহ্য করিতে পারেন না। মহম্মদ আলী জিন্ন যখন সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র দেশ বিভক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র কলিকাতা বন্দর পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা পাকিস্তানভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। যে জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের মর্য্যাদা বুঝিবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করেন নাই তিনি যে রাজাগোপালাচারীকে স্বাধীন-শাসনকাল বিভক্ত ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খরচপত্র করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেই রাজাগোপাল অনায়াসে পঞ্জাব ও বাঙ্গালা বর্জ্জন করিয়া ভারতের অবশিষ্ট অংশে প্রভুত্ব সম্প্রসারের কথা বলিয়াছিলেন। কাজেই আজ যখন জওহরলালের বন্ধু মহম্মদ আলী পাকিস্তানের পক্ষ হইতে কাশ্মীর রাজ্য উপহার চাহিতে সাহস করিয়াছেন, তখন যে পশ্চিমবঙ্গের নবীন খাইয়া যাইয়া ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজু বলিবেন—তাঁহার প্রস্তাব, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিহারভুক্ত করা হউক, তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? অবশ্য প্রদেশ গঠন সম্বন্ধীয় আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডক্টর কাটজু এই কথা বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল ছিলেন, তখন কি কেবল নির্দ্দিষ্ট বেতন লইয়াই তুষ্ট ছিলেন? না—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজ্যপাল রাজাগোপালের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অতিথি সৎকারের জন্য নির্দ্দিষ্ট "সামচুয়ারী এলাওয়েন্সে"ও হাত দিয়াছিলেন?

আমাদিগের মনে হয়, বাঙ্গালার লবণ বিদেশী গ্রহণ করিলে তাহার ফল—"নিমকহারামী" হইতে পারে। যে ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহ "বিহারে বিহারীরই অধিকার" রব তুলিয়া বিহারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনায়াসে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী করিতে বলিয়াছিলেন, তিনিও বাঙ্গালায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিহারে নানা উন্নতির কারণ বাঙ্গালী। বিহারী নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, যে সব বঙ্গভাষাভাষী স্থান ইংরেজ অন্যায় করিয়া বিহার-ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাকে দেওয়া হইবে। কিন্তু আজ ক্ষমতা পাইয়া বর্ত্তমান বিহারী নেতারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বিধানুভব করেন নাই। আর আজ ডক্টর কাটজু বলিতেছেন, তাঁহার প্রস্তাব—কলিকাতা সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ বিহারভুক্ত করা হউক!

কোন্ সাহসে তিনি এরূপ প্রস্তাব করিতে পারেন, তাহা বিবেচ্য বিষয়। কাশ্মীরে প্রাণপ্রসাদের মৃত্যু কি তাঁহাদিগের সাহস বাড়াইবার অন্যতম কারণ?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও সেই সরকারের তাঁবেদার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির ব্যবহারও কি সেজন্য দায়ী নহে? পশ্চিমবঙ্গে যখন বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের দাবী প্রবল হইয়া উঠিল, তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব রাজ্যের ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাব করাইলেন—ধানবাদ ও টাটানগর—সমৃদ্ধ স্থানদ্বয় বাদ দিয়া বিহারের অবশিষ্ট বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হউক—অধিকার স্বীকার করিয়া নহে, উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য স্থানাভাব বলিয়া অর্থাৎ অনুগ্রহ করিয়া। সে প্রস্তাবে বিহারী নেতারা যখন যুক্তির পরিবর্ত্তে অশ্লিষ্ট গালি দিতেছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা "বুদ্বুদ উড়ার হাসে" বলিয়া নির্ব্বাক রহিলেন। আর পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতির কর্ত্তা বলিয়াছিলেন, বিহার যদি ঐ অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গকে দিতে অসম্মত হয়, তবে তিনি তাঁহার কংগ্রেসী বাহিনী লইয়া সমস্তে তথায় অভিযান করিবেন। তিনি বিহারের দ্বন্দ্ব মূর্ত্তি দেখিয়া আর বাক্যব্যয় করিতে না পারিয়া মনে করিলেন—

> যে জন করিয়া যুদ্ধ ত্যজে এ জীবন—
> সে কভু না পারে আর করিবারে রণ;
> যে করে সমর ক্ষেত্র হ'তে পলায়ন—
> সে তবু কিরিতে পারে করিবারে রণ।

সেই দৌর্ব্বল্য বিহারের সাহস বিবর্দ্ধিত করিয়াছে। আজ পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা প্রবল হইলেও পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা কর্পোরেশন

প্রভৃতিতে বিহারীর অন্তর্জনে কোন বাধা নাই। বিচার মনে করে—বাঙ্গালী জলসীর কাণায় আহত হইলেও প্রেম দিতে আগ্রহশীল; সে সুযোগ বিহার কেন গ্রহণ করিবে না?

ডক্টর কাটজু ঐ দুই প্রস্তাব করিবার সময় আবার নির্লজ্জভাবে বলিয়াছিলেন—তাহাতে বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিনিধি শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কি মনে করিবেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। আমরা কিন্তু বলিতে পারি—কৃতজ্ঞতার নয় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিমলচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়াছেন।

বাঙ্গালীকে এই সকল লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে হইবে, তাহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা তাহাকেই করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশ হইতে সে যে সাহায্য পাইবে, সে আশা হয়ত দুরাশা। যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত, তাহাতেও বাঙ্গালী পঞ্জাবী ও মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত অন্য কাহারও সহযোগ লাভ করে নাই! পরন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্ত-প্রদেশ তাহার বিরোধিতাই করিয়াছিল।

শ্যামাপ্রসাদ—

বিনাবিচারে বন্দিদশায় কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ২ মাসের অধিককাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু এতদিন চিতোরের প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে যেমন অশরীরী ধাত্রী শ্রুত হইয়াছিল—"মেঁ ভুখা হোঁ" —তেমনই আজও ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে—এই মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পরে বিদেশ হইয়া ফিরিবারও কয়দিন পরে এবং কাশ্মীরের আবদুল্লা সরকারের এক জন সচিবের বিবৃতি প্রকাশের পরদিন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিবৃতি দেন ও তাহার পরেই শেখ আবদুল্লা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবকে কাশ্মীরে যাইয়া সমস্ত বিষয় জানিতে আমন্ত্রণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব উত্তরে জানান, তিনি বিদেশে যাইতেছেন; ফিরিয়া আসিয়া কাশ্মীরে যাইবেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রধানসচিব শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু-সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের সন্দেহ জওহরলালকে জানাইয়া—বিদেশ যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে তাঁহার নিকট কবুল জবাব দিয়া গিয়াছিলেন—কাশ্মীরের সচিবের বিবৃতিতে তাঁহার মনের সন্দেহের অন্ধকার ঘুচিয়া গিয়াছে। এই বিষয় তিনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বলিতে সাহস করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটোৎকচের বীরত্বে সন্ত্রাসিত কৌরবদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, কর্ণ যেমন অর্জ্জুনের প্রতি প্রয়োগ জন্য রক্ষিত একাঘ্নী বাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনই স্বয়ং নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াসে জওহরলালই ঐ পত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু বিধানচন্দ্র কবি পোলস্কিথের গ্রাম্য শিক্ষকের মত—পরাভূত হইলেও তর্ক করিতে পারেন, তাই বলিয়াছেন, তিনি জওহরলালকে লিখিয়াছিলেন বটে, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রথম সংবাদে তাঁহার মনে যে সন্দেহের উদ্ভব হইয়াছিল, কাশ্মীর সরকারের সচিবের বিবৃতিতে তাহা দূর হইয়াছিল; কিন্তু তিনি ত এমন কথা বলেন নাই যে, তদন্তের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

ইহা লোক কি কৈফিয়ৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে?

শ্যামাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উমাপ্রসাদ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায়—জওহরলাল কেন তদন্তে অসম্মত এবং কি জন্য বলিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট ও সাধু নির্দ্দেশ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন রহস্য নাই। অবশ্য সাধু (honest) মন এ ক্ষেত্রে তাঁহার মুখে শোভা পায় কি না, তাহা বিবেচ্য। আরও বুঝা যায়, তাঁহার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ —কপট বিলাপ। কারণ, তিনি কাশ্মীরে যাইয়াও শ্যামাপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই এবং বন্ধু শেখ আবদুল্লার বা তাঁহার কোন সহসচিবের কথায় বিশ্বাস করিয়া যে বলিয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদ সুস্থ ছিলেন এবং তিনি আশা করিয়াছিলেন, কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে, তাহা মিথ্যা,—তখন শ্যামাপ্রসাদ অসুস্থ।

এ অবস্থায় জওহরলাল মিথ্যা কথনের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।

আমরা জানি, যদি জওহরলালের বন্ধু শেখ আবদুল্লা দেশদ্রোহিতার জন্য বন্দী না হইতেন, তাহা হইলেও তিনি ভারত সরকারের তরফে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেন এবং সেই কারণে তদন্ত অসম্পূর্ণ বলিবার সুযোগ ভারত সরকারও পাইতেন। আর এখন ভারত সরকার বলিলেন—বর্ত্তমান অবস্থায় তদন্ত করা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু তথাপি—সত্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন।

এ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদের জননী যোগমায়া দেবী উমাপ্রসাদসঙ্কলিত পুস্তকের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

পুস্তকে যে সকল তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে—তাহা হইতে আমাদিগের মাতৃভূমির ভাগ্য সম্বন্ধে বহুমুখ-প্রসারী কতকগুলি প্রশ্নের উদ্ভব হয়—

আমার পুত্র (শ্যামাপ্রসাদ) ভারতের নাগরিক, পার্লামেণ্টের সদস্য ও বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। কোন দিক হইতে বিনা বাধায় তাঁহার কাশ্মীরে প্রবেশের মৌলিক অধিকার ছিল কি না?

কাশ্মীর সরকার কর্ত্তৃক বিনা বিচারে তাঁহাকে বন্দী রাখা আইনসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য কি না?

আমার পুত্র স্বয়ং কাশ্মীর সরকারের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ উত্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রামাণ্য কি না?

কাশ্মীর সরকার ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্য দায়ী কি না? তাঁহাদিগের পক্ষে যাহা করা সঙ্গত ও সম্ভব ছিল তাঁহারা শ্যামাপ্রসাদের জীবন রক্ষার জন্য সে সব করিয়াছিলেন কি না?

শ্যামাপ্রসাদের এই শোচনীয় মৃত্যু ব্যাপারে ভারতসরকার কোনরূপে জড়িত ছিলেন কি না?

শ্যামাপ্রসাদের জননীর সঙ্গে আমরাও বলি—এই সকল প্রশ্নের উত্তর দাবী করা হইতেছে—উত্তর দিতে হইবে।

শ্যামাপ্রসাদের জীবনাবসান সম্বন্ধে তাঁহার একমাত্র শুশ্রূষাকারিণী রাজকুমারী কিছু বলিয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদ যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় চিকিৎসককে

ডাকিতে বলিয়াছিলেন, তখন তথায় আর কেহই ছিল না। রাজপ্রাসাদী ব্যাপ্ত দুইটি মূক আততায়ী নায়ক আবদুল পরিচারককে ডাকিয়া দুইটি দুরবীন ডাকিতে পাঠান। দুইটি দুরবীন আসিলে দেখেন, অবস্থা ভীতিজনক। তিনি দুইটি আর্মীর নিকট কর্ত্তব্য সম্বন্ধে টেলিফোন করেন। এদিকে রাত্রি ২টা ১৫ মিনিটের সময় শ্যামাপ্রসাদ শেষ শ্বাস ত্যাগ করেন। তাহার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তার আসেন। রাত্রি ৩টা ৫৫ মিনিটে মৃত্যুর কথা মিথ্যা। ২টা ১৫ মিনিট হইতে ৩টা ৫০ মিনিট পর্য্যন্ত সরকারী বিবৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষার্থ নথিপত্র প্রস্তুত করা হয়।

এই সময়ের মধ্যেই কি শ্যামাপ্রসাদের হৈমবতীলিপি পুস্তক ও অন্যান্য কাগজপত্র অপসৃত হওয়া সম্ভব নহে?

যোগমায়া দেবী লিখিয়াছেন :—

আমি বহুদিন হইতেই আমার পুত্রকে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলাম। সে দেশমাতৃকার কাজে জীবন দিয়াছে। যাঁহারা স্বরাজের আসনে সমাসীন তাঁহাদিগের দলের (অক্ষয়ের) বিরোধিতা করিবার সাহস তাহার ছিল। স্বাধীন ভারতে বিরোধীদলের নেতৃত্ব করা অপরাধ—ইহাই কি বুঝিতে হইবে? কিন্তু আমার পুত্র অপরাধী গুরুতর-কাহার মত শক্তিমদমত্ত থাকিতে যাহা হইয়াছিল—অপরাধীও বিচার পায়, আমার পুত্রের ক্ষেত্রে বিচারের অভিনয়ও হয় নাই। মনে হয়, দেশের লোক যাঁহাদিগকে অধিকার দিয়া অসীম ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাঁহাদিগের হিংসা ও ঈর্ষা তাহার অনুসরণ করিয়াছিল এবং সেজন্যই অবিচারের বহ্নি তাহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার পুত্রের সাহস তাঁহাদিগের ঈর্ষাকে ধ্বনিত করিয়াছিল—তাঁহাদিগের অত্যাচার তাহার শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। সে মৃত্যুতেও অমর হইয়া বিরাজিত থাকিবে। যাঁহারা ভগবানের বা কোন মহান কাজের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—যাঁহারা অত্যাচারীর রথচক্রে পিষ্ট বা অগ্নিতে ভস্ম হইয়াছেন অথবা তরবারে বা শরে বিদ্ধ হইয়াছেন—হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন—শ্যামাপ্রসাদের কথায় তাঁহাদিগের কথাই মনে পড়ে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে যেন দুষ্কৃতকারী-দিগের চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাহারা অনুতপ্ত হয়। আর ভারতের জনগণ আপনারা বিচার করিয়া দেখুন এবং যাহাতে দেশমাতৃকার এইরূপ বেদনার কারণ আর ঘটিতে না পারে তাহাই করুন।

ভগবান আমার দেশকে রক্ষা করুন।

শ্যামাপ্রসাদের জননীর এই আর্ত্তনাদ দেশমাতৃকার আর্ত্তনাদ। তাঁহার এই আহ্বান—বিচারের জন্য—সত্যের জন্য আহ্বান—দেশমাতৃকার আহ্বান। মৃত্যুকালে—রথীচির মত মৃত্যুবরণ কালে—তিনি যে মা'র নামোচ্চারণ করিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই মা'র—সেই সর্ব্বধারিণী মা'র ও দেশমাতৃকার কামনা পূর্ণ হউক। রথীচির অস্থিতে যেমন বৈতাবিনাশের জন্য বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, তেমনই শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে দেশবাসীর যে সঙ্কল্পের উদ্ভব হইবে তাহা সর্ব্ববিধ অত্যাচারের ও অনাচারের—অসত্যের ও অমঙ্গলের বিনাশ করুক।

কাশ্মীর—

কাশ্মীর-সমস্যার সৃষ্টি, পুষ্টি ও জটিলতাবৃদ্ধি—তিনের জন্যই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অজ্ঞতা নীতি দায়ী বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহার শেখ আবদুল্লা-প্রীতি সেই নীতিরই অঙ্গ। যখন লর্ড মাউন্ট-ব্যাটেনের কূটনীতির নিকট গান্ধীজীও আত্মসমর্পণ করেন তখন প্রস্তাব ছিল, সামন্ত রাজ্যগুলি যে যাহার অবস্থা বুঝিয়া ভারতে বা পাকিস্থানে যোগ দিতে পারিবেন। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহ ইংলণ্ডে গোল-টেবল সম্মিলনে—ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত-শাসন প্রবর্ত্তনের নীতি গ্রহণই ভাল বলায় যখন ইংরেজের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, তখন ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা যে শেখ আবদুল্লাকে পুরোভাগে রাখিয়া কাশ্মীরে হিন্দু-মুসলমান বাধাইয়া মহারাজাকে বিতাড়িত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই আবদুল্লাই কোন অজ্ঞাত কারণে জওহরলালের আস্থার কেন্দ্র হইয়াছিলেন। কাশ্মীর যেচ্ছায় পাকিস্তানে যোগ না দেওয়ায় পাকিস্তান যখন কাশ্মীর আক্রমণ করে তখন মহারাজা হরিসিংহ ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে পত্র লিখিয়া জানাইয়া দেন—তাঁহার রাজ্য তিনি ভারতভুক্ত করিলেন; ভারত সরকার তাঁহার প্রজাদিগকে আক্রমণকারীদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করুন। মহারাজা হরি সিংহ—শ্যামাপ্রসাদেরই মত—আবদুল্লার স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। আবদুল্লা তখন কারাগারে। জওহর-লাল সর্ত্ত করিলেন—আবদুল্লাকে মুক্তি দিয়া তাঁহাকেই শাসনক্ষমতা দিতে হইবে। মহারাজা তাহাই করিতে বাধ্য হইলেন। ভারতীয় সেনাবল কাশ্মীর রাজ্য হইতে আক্রমণকারীদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল।

এই সময়—শত্রু-বিতাড়ন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জওহরলাল কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানজন্য সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হইলেন—যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করিলেন। কাশ্মীর সম্বন্ধে কোন সমস্যা ছিল না—তাহার সৃষ্টি হইল। ফলে জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক মাত্র ভারত সরকারের নামমাত্র অধিকারে থাকিল এবং আবদুল্লা তথায় প্রধান হইয়া স্বাধীন কাশ্মীরের গ্রন্থ রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; আর গুধিকে বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজফ্ফরাবাদ নামে "আজাদ কাশ্মীর" প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকিয়া প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানভুক্ত হইল। ভারত সরকারের অর্থ ও সৈনিক-দিগের জীবন-ব্যয় অপব্যয়ে পরিণত হইল। জওহরলাল আবদুল্লা-শাসিত হিন্দুপ্রধান জম্মু, মুসলমানপ্রধান কাশ্মীর ও বৌদ্ধপ্রধান লাডকের জন্য ভারত সরকার কোটি কোটি টাকা অযাচে ব্যয় করিতে লাগিলেন।

বিদেশী প্রতিনিধিরা আসিয়া শীমাংসার পথ সন্ধান করিয়া কেবল সৃষ্ট সমস্যার পুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন।

জম্মু ও লাডক ভারতভুক্তির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিল—লাডক বলিল, ভারতভুক্ত হইতে না পারিলে সে তিব্বতের সহিত যোগ দিবে—পূর্ব্বে লাডক তিব্বতেরই ছিল। আবদুল্লার সরকার সে সব

আন্দোলন সাম্প্রদায়িক ও রাষ্ট্রদ্রোহকর বলিয়া আন্দোলনকারীদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

আবদুল্লার ব্যবস্থা দেখিয়া শ্যামাপ্রসাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাশ্মীর যদি ভারতের অংশ হয় তবে তিনি কিরূপে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার রাজ্যপ্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলেন? এক রাষ্ট্রে ত কখন একাধিক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি থাকিতে পারে না। তবে কি ইহা যে ভারতবাসীদিগকে ২ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান; তিনি ৩ ভাগে বিভক্ত করিতে চাহেন—হিন্দু, মুসলমান ও কাশ্মীরী? আবদুল্লা কোন উত্তর দিলেন না—কেন না, উত্তর ছিল না। জওহরলাল শ্যামাপ্রসাদকে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট ও জম্মুর প্রজাপরিষদকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলিয়া আবদুল্লাকে পক্ষপুটে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। শ্যামাপ্রসাদ চাহিলেন, ভারতরাষ্ট্র যদি কাশ্মীরের রক্ষার জন্য সৈন্যবল ও উন্নতিসাধন জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে, তবে হইবে—

এক বিধান
এক প্রধান
এক বিধান।

জওহরলাল বলিলেন, কাশ্মীর ব্যয় ও বিষয়ে ভারতভুক্ত—

রাজ্যরক্ষা
বিদেশের সহিত ব্যবহার
যানবাহন।

আবদুল্লা যখন য়ুরোপে যাইয়া বলিলেন, কাশ্মীর হয়ত ভারত বা পাকিস্তান কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে না—অর্থাৎ স্বাধীন থাকিবে, তখন জওহরলাল একবার কশাঘাতে চমকিত অশ্বের মত ভাব দেখাইলেন বটে, কিন্তু প্রতীকারের কোন পন্থা গ্রহণ করিলেন না।

জওহরলাল বিনা বাধায় শ্যামাপ্রসাদের কাশ্মীর প্রবেশে কোন বাধা দিলেন না এবং কাশ্মীরে শ্যামাপ্রসাদ বন্দী হইলে ইংলণ্ডের রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগ দিতে গমন করিলেন। আবদুল্লা বলিয়াছিলেন, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল—জওহরলাল য়ুরোপে ফিরিলে বন্দী শ্যামাপ্রসাদকে ভারতে পাঠাইয়া দিবেন। তবে কি তিনি জওহরলালের ক্রীতদাসরূপেই শ্যামাপ্রসাদকে রাখিয়াছিলেন? আর সেই জন্যই কি তিনি শ্যামাপ্রসাদকে খালাস জন্য ভারত সরকারের কাছে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়া ভারত সরকারকে অপমানিত করিতে সাহসী হইয়াছিলেন?

তাহার পরে—আবদুল্লা বোধহয় মনে করিয়াছিলেন, তিনি যে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, তাহাতে অনায়াসে রাজ্যপাল করণ সিংকে বন্দী করিয়া জম্মু-কাশ্মীর-লাডক রাজ্যে আবদুল্লা-রাজ্য ঘোষণা করিতে পারেন। এই আগষ্ট তিনি তাঁহার সচিবসঙ্ঘে তাঁহার সহিত মতান্তরহেতু স্বাস্থ্য-সচিব ডি্ডামলাল শাস্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলিলেন। শ্যামলাল পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন। আবদুল্লার সচিবসঙ্ঘে মতভেদ প্রকাশ হইল। নানারূপ অবাঞ্ছনীয় সংবাদ আসিতে লাগিল। ৮ই আগষ্ট রাজ্যপাল করণ সিং আবদুল্লাকে পদচ্যুত ও তাঁহার সচিবসঙ্ঘ বাতিল করিলেন এবং আবদুল্লা, তাঁহার রাজস্ব-সচিব মীর্জ্জা আফজল বেগ সহ আরও ১০ জনকে ঐই আগষ্ট গ্রেপ্তার ও বন্দী করিলেন। আবদুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি অন্যান্য অবাঞ্ছিত কার্য্যেরই মত—জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিপজ্জনক কাজ করিয়াছেন। প্রকাশ, আবদুল্লা ও তাঁহার অনুচরবর্গ ভারতের সহিত কাশ্মীরের সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার ব্যবস্থাই করিতেছিলেন—তাঁহারা সে জন্য পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন।

আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অতি মাত্রায় বিচলিত হইয়া দিল্লীতে আসিয়া জওহরলালের সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলি আবদুল্লার গ্রেপ্তারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া ভারতসরকারকে আক্রমণ করিয়াছেন এবং ক্ষিপ্রের তপিনী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে "ধর্ম্ম যুদ্ধ" ঘোষণা করিতে বলিয়াছেন। পাকিস্তানে আস্ফালন চলিতেছে।

শেখ আবদুল্লা আজ বন্দী। আর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক জওহরলাল? তিনি পার্লামেণ্টে বলিয়াছেন—আবদুল্লা-ঘটিত ব্যাপার কাশ্মীরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ভারতসরকার তাহাতে যত কম হস্তক্ষেপ করেন, ততই ভাল।

শ্যামাপ্রসাদ চাহিয়াছিলেন, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধানের জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করা হউক। ভারত সরকার কি তাহা করিবেন? আর আবদুল্লার পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, তবে কি ভারত সরকার মহারাজা হরি সিংএর প্রস্তাবানুসারে সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের অর্থাৎ—জম্মু, কাশ্মীর, লাডক, বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজঃফরাবাদ—এই সকলের ভারতভুক্তি চাহিবেন? বালতিস্তান, গিলগিট, মীরপুর, পুঞ্চ, মজঃফরাবাদ—এ সকলে পাকিস্তানের অধিকারের ভিত্তি কি?

মহারাজা হরি সিংএর প্রস্তাবের পরে, কাশ্মীরে গণভোটের কি কারণ থাকিতে পারে? যখন সুদূরবঙ্গ ও পশ্চিম পঞ্জাব পাকিস্তানকে প্রদান করা হইয়াছিল, তখন কি জওহরলাল গণভোটের কথা উত্থাপিত করিয়াছিলেন? যখন হায়দ্রাবাদ, বরদা প্রভৃতি ভারতভুক্ত করা হয় তখন কি সে কথা উঠিয়াছিল? হায়দ্রাবাদে ত বাহুবলও প্রযুক্ত হইয়াছিল।

তবে—বিশেষ শেখ আবদুল্লার ব্যবহারের ও ষড়যন্ত্রের পরে—কি হইবে? আর যদি গণভোট গৃহীত হয়, তবে জম্মু, লাডক প্রভৃতি অংশকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে মত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। তাহা করা হইবে কি?

সে বিষয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি কোনরূপ মত প্রকাশ করিবেন?

নেহরু, মহম্মদ আলী—ভারত, পাকিস্তান—

কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার রাজদ্রোহজনক কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার, সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর হুড় দিল্লীতে আগমন

ও পাকিস্থানে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষবাষ্পের উপেক্ষাই করা যায় না। জওহরলালের সহিত মহম্মদ আলীর আলোচনার পরে মহম্মদ আলী বলিয়াছেন, ভারত যদি পাকিস্থানকে কাশ্মীর উপহার দেয়, তবে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইবেন। হইবারই কথা।

পার্লামেণ্টে সরকারী সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ৩ মাস পর্য্যন্ত পাকিস্থানী পুলিস ৩ শত ৬২ বার ভারত সীমান্তে গোল বাধাইয়াছে। নেহরু-মহম্মদ আলী আলোচনায় এই বিষয়টি সম্বন্ধে কোন কথা হইয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা যে ভারতবাসীর পক্ষে অসম্মানজনক ও বিপজ্জনক তাহা, আশা করি, জওহরলালও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে তিনি স্বীকার করিবেন কি না, তিনিই জানেন।

পাকিস্থানে সংবাদপত্রসমূহ দুই রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীতে আলোচনায় তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা যেরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়—আলোচনায় যদি কোন সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে তাহা বাতিল হইবার সম্ভাবনাই অধিক। তবে যদি মন পাইবার জন্য অধিক দাবী হিসাবে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা।

পাকিস্থান কাশ্মীরে গণভোটের জন্য আগামী এপ্রিল মাসের পর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসম্মতি জানাইতেছে। ফলু-কাশ্মীর রাজ্যের যে অংশ "আজাদ কাশ্মীর" নামে পাকিস্থানভুক্ত রহিয়াছে, তথায় আন্দোলন প্রবল হইয়াছে।

করিয়াটে শান্তি স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য যে বৈঠক বসিবে, পাকিস্থান তাহাতে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণের বিরোধিতা করিয়াছে। পাকিস্থান কাশ্মীরের ব্যাপারে, ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ (ধর্ম্ম যুদ্ধ) ঘোষণা করিবার প্রস্তাবও করিয়াছে ও করিতেছে। যদি শক্তি-পরীক্ষা করাই পাকিস্থানের অভিপ্রেত হয়, তবে ভারত রাষ্ট্রের তাহাতে কি বলিবার থাকিতে পারে?

পাকিস্থানীরা কতবার পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার করিয়া গিয়াছে ও তাহার প্রতীকার হয় নাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি তাহার তালিকা প্রকাশ করিতে সম্মত আছেন? তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রত্যেক ঘটনা ভারত সরকারকে ও পাকিস্থান সরকারকে জানাইয়াছেন। সুতরাং সহজেই তালিকা প্রকাশ করিতে পারেন—সে জন্য কোন অতিরিক্ত উপসচিব নিয়োগের প্রয়োজন হইবে না। আর যদি প্রয়োজন হয়, তবে যে সকল উপ-সচিবের পদ পদোন্নতি না হওয়ায় রিক্ত হইয়াছে তাহাদিগের এক জনকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব করিয়া সে কাজের ভার দেওয়া যাইতে পারে।

বেশী যাইতেছে, কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান যাতীত ভারতরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থানের "মনের মিল" হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত এবং পাকিস্থান কাশ্মীর উপহার না পাইলে সমস্যার সমাধান সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করিবে না।

ভারতের জনমতকে সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভারত সরকারের নীতি নির্দ্ধারিত করিতে হইবে—জওহরলালকে লোকমতানুসারে চালিত হইতে বাধ্য করিতে হইবে।

যে আপনাকে দুর্ব্বল মনে করে, আর যে তোষণ নীতির ফল—তাহাদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা কে দূর করিতে পারে?

অশান্ত কলিকাতা—পুলিস ও সাংবাদিক—

আয়েরগিরির অতর্কিত অগ্ন্যুৎপাতের মত প্রায় একমাস কাল কলিকাতায় যে অশান্তি গিয়াছে, তাহাতে পুলিসের কোন কর্ম্মচারীর জীবনাশ হয় নাই বটে, কিন্তু পুলিসের আক্রমণে নিরীহ পথচারীরও মৃত্যু ঘটিয়াছে। কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী বিদেশী প্রতিষ্ঠান—তাহার আনুকূল্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বর্দ্ধিত করিয়া তাহা জাতীয়করণ বিলম্বিত করিয়াছেন। ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ান হইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল এবং কোম্পানীর লাভও হইতেছিল। এই অবস্থায়—দেশের এই আর্থিক দুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া, যখন কোম্পানী দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভাড়া এক পয়সা করিয়া বাড়াইতে চাহিলেন, তখন জনগণের পক্ষ হইতে আপত্তি হইল। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি দিলেন। তাঁহাদিগের বাসে লাভ না হইয়া ক্ষতি হইতেছে—বাসের ভাড়া বাড়াইবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ট্রামে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়ান হইল, এমন কথাও কেহ কেহ বলিলেন। ভাড়া বৃদ্ধিতে সম্মতি দিয়া প্রধান-সচিব বিদেশ-যাত্রা করিলেন।

ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ১৩ই জুলাই ভাড়া বৃদ্ধির ও আন্দোলনকারীদিগের প্রতি পুলিসের ব্যবহারের প্রতিবাদে হরতাল ঘোষিত হইল। হরতাল সফল হইল বটে, কিন্তু সরকারের প্রচার বিভাগ বিবৃতি দিলেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে!

পুলিস কাঁদুনেগ্যাস ব্যবহার করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিল ও লাঠি চালনা করিল—গুলীও চলিল। সে চিত্র একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

এই অবস্থায় ২৩শে জুলাই তারিখে ডক্টর রাধাবিনোদ পালের সুরে কলিকাতার নাগরিকদিগের এক সম্মিলনে স্থির হয়—ডক্টর পাল, শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোকনাথ বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু ও শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধিদিগের ও সচিবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিবেন। তদনুসারে তাঁহারা পরদিন প্রবলে প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলে স্থির হয়, অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের ও ধৃতব্যক্তিদিগকে মুক্তিদানের দাবী উপস্থাপিত করা হইবে। তাঁহারা তখন সচিব—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে সচিবদ্বয় বলেন, অপরাহ্ণ ৩টায় সভা ঐ ৩ জন ও প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধি ৩ জনের সহিত সকল বিষয় আলোচনা করিবেন। সে ব্যবস্থা বহাল থাকিলে সেদিন অপরাহ্ণ ৩টার সময় যে সভা প্রতিরোধ সমিতির দ্বারা আহূত

হইয়াছিল, সে সভায় কাহে বন্ধ রাখা হইত। কিন্তু প্রতিনিধিরা দূরে ফিরিবার এক ঘণ্টার মধ্যে সচিবরা জানাইয়া দেন—সেদিন সাক্ষাৎ হইবে না !!

অপরাহ্নে যে সভা হয়, তাহা অবশ্য ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়া। তাহাতে পুলিস লাঠিচালনা করে এবং সাংবাদিকগণকে প্রহার করা ও গ্রেপ্তার করাও হয়। সাংবাদিকরা বর্ণনায় ও চিত্রে ঘটনা সম্বন্ধে লোককে অবহিত করিতেছিলেন—এই "অপরাধ" অর্থাৎ কর্ত্তব্যপালনের জন্য তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করা পরিকল্পনানুযায়ী হইয়াছিল কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। ঘটনার পরে কয় জন সাংবাদিক কলিকাতার পুলিস কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—কর্ত্তব্য-পালনকালে সাংবাদিকরা যদি ১৪৪ ধারা অমান্যকারীদিগের সহিত মিশিয়া যান তবে পুলিস কিরূপে তাঁহাদিগকে বাছিয়া লইবে? অর্থাৎ—"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই—

(১) যে সকল সাংবাদিক ক্যামেরা লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই।

(২) জনতামাত্রই (১৪৪ ধারা থাকিলেই) বে-আইনী হয় না। কারণ ঐ অবস্থায় ট্রাম, বাস, ট্রেণ—এ সকলে ৫ জনের অধিক লোক থাকিতে পারেন না। জনতার উদ্দেশ্য (common object) আইন বিগর্হিত থাকা প্রয়োজন।

ইহার পরেই ভারত সরকারের মন্ত্রী আবদুল কালাম আজাদের আদেশে পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা নত হইয়া ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হ'ন এবং তাহার পরে ক্রমে গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদিগের মুক্তিদান আরম্ভ হয়।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতির বিবৃতি ও শোভাযাত্রা এই ব্যাপারে "এজেণ্ট প্রোভোকেটিয়রের" মত হইয়াছিল কি না, তাহাও বিবেচ্য। প্রথমে ঘোষিত হয়, অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের বিচারক শ্রীপরৎচন্দ্র ঘোষ সাংবাদিক লাঞ্ছনার তদন্ত করিবেন। প্রধান-সচিব ফিরিয়া আসিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন, হাইকোর্টের বিচারক শ্রীপ্রমথবিহারী মুখোপাধ্যায় যেমন সে বিষয়ে—তেমনই তাঁহা বৃদ্ধি সঙ্গত কি না, সে বিষয়েরও বিচার করিবেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রমথবিহারীর নিয়োগে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু নূতন বিধানে হাইকোর্ট রাজ্য-সরকারের অংশ, সুতরাং কোন কার্য্যকরী বিচারকের বিচারে আপত্তি হইতেও পারে।

প্রধান-সচিব অতিরিক্ত পুলিস কর্ম্মচারীদিগকে স্ব স পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সাংবাদিক-সঙ্ঘের দাবী রক্ষা করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

ঘটনাগুলি এখন ঐ ব্যবস্থায় বিবেচনাধীন।

পারস্য বা ইরাণ—

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছিলেন, সমগ্র প্রাচীর উপর দিয়া যে নবভাবতরঙ্গ আঘাত-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে পুরাতন মতাদি নিমজ্জিত হইয়া যাইতেছে। তিনি প্রধানতঃ জাপানের ও ভারতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই উক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্তি যে কত সত্য তাহা সমগ্র প্রাচীর অবস্থা-পরিবর্ত্তনে প্রতীয়মান হইতেছে। পুরাতন রাজ্য পারস্য এখনও রাজ-তন্ত্রশাসিত; কিন্তু তথায় গণতন্ত্র রাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। পারস্যের তৈল আজ সমগ্র দুনিয়ার প্রয়োজন। আবাদান নামক স্থান হইতে তৈল নলে আধারে আনিয়া শোধন করা হয় এবং তথা হইতে পারস্যোপসাগরের পথে নানা দেশে প্রেরিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার এই তৈল সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে অনেক টাকা দিয়া অংশ ক্রয় করেন এবং প্রতিষ্ঠানটি ইংরেজের দ্বারাই পরিচালিত হইত। কিন্তু দেশের এই সম্পদের লাভ প্রায় সবই বিদেশীরা লইয়া যায়, পারস্যবাসীরা এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার সমর্থক থাকিতে পারে না। তাহারা প্রতিষ্ঠানের বিষয় অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং মনে করে যে, ইংরেজ-পরিচালকগণ মিথ্যা হিসাব দিয়া লাভের অঙ্ক বাড়াইতেছে।

পারস্য ইংরেজ-পরিচালকদিগকে বিতাড়িত করিয়া প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ভার গ্রহণ করে।

কিন্তু এই সম্পদই পারস্যের বিপদের কারণ হয়। কারণ, বিদেশীরা পারস্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। বিদেশীদিগের প্রভাব পারস্যের এক দল লোকের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে এবং রাজনীতিক দলাদলিতে দেশের শাসনকার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে বিঘ্নিত হয়।

রাজার (শাহ) নিরঙ্কুশ স্বৈরক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং শাসনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক প্রভাব প্রবেশ করে।

ডক্টর মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী হইয়া নিয়মতান্ত্রিক শাসন পরিচালিত করিতেছিলেন—রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান নাই।

অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ক্ষমতা হস্তগত করিতেছেন বলিয়া রাজা পারস্য হইতে বিদেশে গমন করেন। পারস্যে রাজনীতিক দলগুলি—রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দুই দিকে বিভক্ত হইয়া যায়।

রাজা যেমন নাটকোচিত অতর্কিত ভাবে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য বা উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—কয়দিন পরে তেমনই ভাবে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ডক্টর মোসাদ্দেক ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা বন্দী হইয়া বিচার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

রাজা লাঞ্ছনে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। মনে হইতেছে, সেনাবল তাঁহার অনুগত। কিন্তু যে স্থানে ষড়যন্ত্রের প্রাবল্য থাকে, তথায় অবস্থার অনিশ্চয়তা যে কোন সময়ে বিপদ ঘটাইতে পারে।

পারস্যের অবস্থার পশ্চাতে বিদেশীদিগের ষড়যন্ত্র রহিয়াছে, এমন সন্দেহ করা অসঙ্গত নহে। কারণ, তৈল লইয়া ইংলণ্ডের সহিত বিবাদের পর হইতেই পারস্যে নানা অবস্থা-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে এবং ডক্টর মোসাদ্দেকের মন্ত্রিমণ্ডল সম্প্রতি শেষ অবধি রুশিয়াকে তৈল বিক্রয়ের চুক্তি করিতেন।

অবস্থা এখনও অনিশ্চিত এবং পারস্যে পরিবর্ত্তনের প্রভাব কতদূর বিস্তারলাভ করিবে, বলা যায় না।

মরক্কো—

মরক্কোর সুলতান সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন। অবশ্য সিংহাসন শূন্য থাকে না। নূতন সুলতান তাহাতে উপবেশন করিয়াছেন। ইহার পশ্চাতে ফরাসী প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। মিশরের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় আল-আজহারের অধ্যাপকগণ কতোয়া দিয়াছেন, কেহ যেন নূতন সুলতানের আনুগত্য স্বীকার না করেন। যদি মুসলমান এখনও ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের মতই অভ্রান্ত বলে করেন। সেই জন্যই মরক্কোর নারী তাহার মৌলবী ও মোল্লাদিগের দ্বারা সাম্রাজ্যবাদিকতার আন্দোলন পরিচালিত করিয়াছিলেন। মিশরের ধর্ম্মাধ্যাপকদিগের কতোয়ার ফল কি হয়, দেখিবার বিষয়। ভারতেও আমরা দেখিতেছি, চলনবাজ তাহা করিতে বাধ্য হইলেও ফরাসীরা পণ্ডিচেরীতে অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য যেরূপ তাহাতে এক দেশে অধিকৃত নিরূপায়ে নামা ফেলে আর এক দেশে আসিতে পারে। সেই জন্যই আজ অনেকের দৃষ্টি মরক্কোর নিবদ্ধ।

কোরিয়া ও ভারত—

কোরিয়ার আত্মরক্ষার যুদ্ধে বিরতি আসিয়াছে। উভয় পক্ষ যখন রণক্লান্ত তখন সন্ধির প্রস্তাব হইলে ভারত সরকার সেই প্রস্তাবে যোগ দেন এবং প্রস্তাব গৃহীত হইলে ঘোষণা করা হয়—ভারত সরকারের অনুমোদিত প্রস্তাব অনুসারে সন্ধি হইয়াছে—অর্থাৎ কৃতিত্ব ভারত সরকারের। যদিও অস্ত্রবিরতি, বন্দীবিনিময় ও কাশ্মীর-সমস্যা যাহাই কেন থাকুক না, কোরিয়ার এই ব্যাপারে ভারত সরকারের ভক্তমল হিসেব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। কিন্তু শান্তির ব্যবস্থা করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারত সরকারের স্থানলাভ ঘটে নাই। পাকিস্তানও ভারতকে স্থানদানে আপত্তিতে আপনার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৫ই জুন, ১৯৫০

জ্ঞানের অনুশীলন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ইহা মোক্ষ-শাস্ত্র, লোকক্ষয়ের মূল-তত্ত্বের পটভূমিতে অর্জ্জুনকে মুক্তি-পথের নির্দ্দেশ। আমরা জীবন-রণের সৈনিক। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জ্জুনও ছিলেন সংসারের জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। যে অর্জ্জুন গুরুতর্ণী হলেন তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁর মোহ দূর হয়েছিল। আমাদের প্রকৃত পরিচয় মায়ার আবরণে আবদ্ধ-চক্ষু আমরা, তবু মোক্ষপথের যাত্রী। সে পথ কোথায়, কেমন গতি প্রয়োজন সেথায় পৌঁছবার। সে সাধনার পথে মায়ার আবরণ উন্মোচন একান্ত প্রয়োজন। মায়া—অজ্ঞান। সুতরাং আবশ্যক জ্ঞান-চক্ষুর উন্মেষণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ তিনটি জীবনস্রোত যে ওতপ্রোতভাবে এক স্রোতে মিলে রয়েছে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর মতো আমাদের জীবনের অন্তরে, এ কথা আমাদের মনে হয় না। শ্রীভগবান জ্ঞান এবং জ্ঞানীর যে উপাধি নির্দ্দেশ করেছেন, সেগুলি কি প্রকৃতপক্ষে ভক্তের উপাধি নয়? নিরুদ্দিষ্ট কর্ম্ম বা রসহীন জ্ঞান সাধন পথে ব্যর্থ প্রয়াস এবং নিরর্থক জ্ঞান। অনন্ত জীবনের পথে যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করাই প্রকৃত কর্ম্ম। সে পথের পরিচায়ক জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ভক্তি এদের পবিত্র করে, সরল করে, সার্থক করে। আলোচনার ফলে নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মে যে কর্ম্মী এবং জ্ঞানী উভয়েই ভক্ত এবং ভক্ত স্বয়ং কর্ম্মী এবং জ্ঞানী। এ তিন জীবনধারার পরস্পর বিশ্লিষ্ট আলোচনায়, বুদ্ধি আদর্শ গন্তব্য-পথের সন্ধান লাভ করতে সমর্থ হয় সংশ্লেষণে। সে আলোচনার সংশ্লেষণ দেখিয়ে দেয় সাধন-পথের মোহানা, যেথায় তিন স্রোতের মিলন।

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেছেন। সংসারীর জীবনে তাদের অনুশীলন অনন্ত জীবন নদীতে যাত্রা করবার তরণী। বলা বাহুল্য যে গুণগুলি শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞাভুক্ত করেছেন, মাত্র তাদের শব্দার্থ জলবৎতরঙ্গম করা জ্ঞান নয়। তাদের অনুশীলন এবং চরিত্রে প্রতিষ্ঠাই জ্ঞান উপার্জ্জনের উপায়। সে অনুশীলনে কর্ম্মের আবশ্যক, বুদ্ধির নিয়োগ প্রয়োজন এবং তাদের পটভূমিতে অনন্য-যোগে অব্যভিচারিণী ভক্তিকে জাগিয়ে না রাখলে, অনুশীলনের পথ সরল ও আনন্দময় হ'তে পারে না। ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধিকে সত্য-পথে সুনিয়ন্ত্রিত না করলে প্রকৃত নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর নয়। কুবুদ্ধিই ভ্রান্ত পথ দেখায় দুষ্ট মনকে, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়ের প্ররোচনায়।

"সত্য সত্যই...

...লাক্স টয়লেট সাবান মেখে

আপনি আরও সুন্দর হ'তে পারেন"

যশোধরা কাটজু

বলেন।

"আমি দেখতে পাই যে লাক্স টয়লেট সাবানের ফেনা মতো কোমল আমার গায়ের চামড়াকে আরও সুন্দর কোরে তোলে," যশোধরা কাটজু বলেন। "রোজ ব্যবহার কোরলে এই সুগন্ধি, স্নিগ্ধ, শুভ্র টয়লেট সাবান আমার গায়ের চামড়াকে রেশম-কোমল আর লাবণ্যময় কোরে রাখে।"

লাক্স্
টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

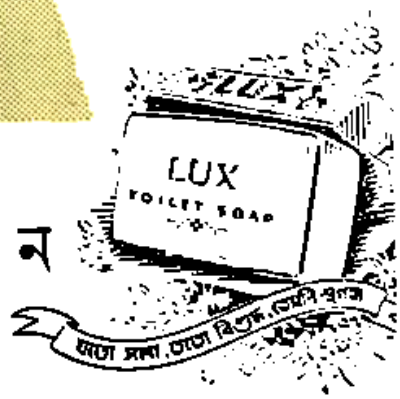

LTS 3-10-X30 BG

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন—ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি এই তিনটি কামের আশ্রয়ভূমি বলে কথিত হয়। এই ইন্দ্রিয়াদি আশ্রয়ের দ্বারা কাম জ্ঞানকে আবৃত ক'রে দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে। অতএব হে ভরতর্ষভ, তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত কর। পাপ-স্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গুলি। এরাই জ্ঞান এবং বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিজ্ঞানকে ধ্বংস করে। সুতরাং কামকে পরিত্যাগ কর।

তিনি বলেন—স্থূল বাহ্যিক পরিচ্ছদ দেহ অপেক্ষা শ্রোত্রাদি পঞ্চ-ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হতে মন এবং মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা। হে মহাবাহো—এইরূপে তুমি আত্মাকে বিদিত হ'য়ে, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির ক'রে এই দুরাসদ দুর্জয় মহাশত্রু কামকে বিনাশ কর।*

মন এবং বুদ্ধিকে শাসিত করলে, নিয়ন্ত্রিত করলে মানুষের অন্তর হতে প্রকৃত জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হয়। তখন মানুষ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু সে পথের প্রধান অন্তরায় দুর্জয় মহাশত্রু কাম। কামনাকে দমন করাই জ্ঞানযোগের প্রথম এবং প্রধান কৌশল। কিন্তু তার নির্দ্দেশে অস্ত্র কি?

গীতা এর নির্দ্দেশ করেছেন জীবনের গভীর রহস্যের। তার অস্ত্রাগারে বিদ্যমান অমোঘ অস্ত্র। গীতা মাত্র দার্শনিক পণ্ডিতের মনস্তুষ্টির সূত্র নয়। যে জগতে মানুষ অনন্ত জীবনের একটি অংশ মাত্র যাপন করে, তার বিশ্ব বিচিত্র। মানুষের সকল অভিজ্ঞতা, সব কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান এই বিশ্বের ঘাতপ্রতিঘাতের পরিণাম, এই কথাই মনে হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে বাছাই ক'রে, ইন্দ্রিয়ের কর্ম নির্বাচন ক'রে মানুষ পর-জগতের সন্ধান লাভ করতে পারে। তাই সকল সমাজের প্রধানেরা আবহমানকাল নিজ নিজ সমাজের গতি নির্ণয় করবার জন্য মানবগোষ্ঠীর কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয় করবার প্রয়োজন বোধ করছেন। সঙ্গে আস্তিকা-বুদ্ধিকে মেনে ধর্ম-পথের পথচারীর পাথেয়র সন্ধানরত তাঁরা যাঁরা পরলোক মানেন এবং ঈশ্বরের প্রাধান্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কর্ম ও ভাবনার আদর্শের তালিকা দিয়েছেন বহুস্থলে।

জ্ঞান কি? এ প্রশ্ন তিনি যেমন তত্ত্বরূপে আলোচনা করেছেন তেমনি দৈনিক জীবনের সাধ্যরূপে তালিকাভুক্ত ক'রে বিবৃত করেছেন। নিম্নলিখিত ভাবগুলিকে তিনি জ্ঞান সংজ্ঞা দিয়েছেন।

১। অমানিত্ব—নিজের প্রশংসায় মোহাবিষ্ট না হওয়া।

২। অদম্ভিত্ব—দম্ভ বর্জন।

৩। অহিংসা—প্রাণীপীড়ন বর্জন—কায়, মন এবং বাক্যে।

৪। ক্ষান্তি—অন্যে অপকার করলে তাকে ক্ষমা করা।

৫। আর্জব—সরল ব্যবহার।

৬। আচার্যোপাসনা—মোক্ষসাধন উপদেষ্টার শুশ্রূষাদির দ্বারা সেবা।

৭। শৌচ—শরীরের এবং মনের শুচিতা। রাগাদি বর্জন। ভাবশুদ্ধি।

৮। স্থৈর্য—স্থির ভাব। দেহের, মনের এবং বুদ্ধির অস্থায় গতিকে শুদ্ধ করা।

৯। আত্মবিনিগ্রহ—নিজের উন্মার্গ ভাবকে ধরে রাখা।

১০। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সমূহে বৈরাগ্য—ইন্দ্রিয়ের আপাতঃ মধুর দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি কর্মে বিরতি।

১১। অনহংকার—নিরহঙ্কার।

১২। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শন—জন্মমৃত্যু প্রভৃতির কবল হতে রক্ষা পাবার কারণ ও দোষ আলোচনা।

১৩। ইষ্টানিষ্টোপত্তিতে আসক্তিহীনতা, পুত্রদার গৃহাদিতে সাংসারিক ভাবে আবদ্ধ হবার ভাব ও কর্ম হ'তে বিরতি।

১৪। অনভিষ্ণ—তাদের জন্য সুখী বা দুঃখী না হওয়া।

১৫। নিত্যসমচিত্ত—অন্তঃকরণের সাম্যভাব।

---

* ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্। ৩।৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান বিজ্ঞাননাশনম্। ৩।৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ। ৩।৪২
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্। ৩।৪৩

সৌন্দর্যের
সার্থক প্রতিনিধি...

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্মলোকে।
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃপ্ত

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

আজো সৌন্দর্যের
সার্থক প্রতিনিধি।

এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
'লক্ষ্মীবিলাস হাউস' :: কলিকাতা-৯

১৬। ঈশ্বরে অনন্যযোগে অব্যভিচারিণী ভক্তি।

১৭। বিবিক্ত দেশসেবিত্ব—নির্জন, শুচি, দর্ভ, চোর, ব্যাঘ্র প্রভৃতি রহিত নদীর কূল, উপবন, দেবমন্দির প্রভৃতি স্থানে বাস।

১৮। জনসংসদে অরতি—বৃথা জনতার মেলামেশার আসক্তি বর্জন।

১৯। অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্ব—আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা।

২০। তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন—তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আলোচনা।*

জ্ঞানদীপ নিষ্কাম কর্ম নয়। চিত্তকে শূন্য করবার বিধান নয়। নির্দিষ্ট কর্মস্রোতে স্ব-চালিত জীবন-তরণীর যাত্রা, নিষ্কর্মের যাত্রাপথে ভ্রমণ নয়, মন প্রাণ শূন্য করবার ব্যবস্থা নয়, বুদ্ধিনিয়ত কর্মের অনুষ্ঠান। এমন কর্মের অনুষ্ঠানে লেখা থাকে ব্রহ্মে, তাই কর্মফল নিবেদন করতে হয় অনাদি কর্ম-নিয়ন্তার অনন্ত সাগরে। কিন্তু সেখানেও কামনা হয় যাত্রাপথের প্রতিবন্ধক। ঈশ্বর হৃদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্ব-প্রকাশ। তাঁর জ্যোতি জ্বলবে, আলোকে নিজের চিত্ত-উজ্জ্বলতার প্রভাবে—বাহির ও অন্তর। সে জ্যোতির সন্ধান দেয় জ্ঞানের সাধনা।

নাস্তিক-বুদ্ধি নিয়ে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করলে, তার অনিবার্য ফল—আপনার অন্তর দেবতার প্রকাশ। অজ্ঞান তাঁকে ঢেকে রাখে। জ্ঞান তুলে দেয় যবনিকা। পদ্মপত্রে জলের বিন্দুর মত নিষ্কাম কর্ম। সে কর্ম ব্রহ্মে সমর্পিত হলে—পদ্মপত্রে যেমন জল লেগেনা—চিত্তের গভীরে তেমনি ব্রহ্মে সমর্পিত কর্ম লেগে না। তেমন কর্মী পাপে লিপ্ত হয় না।†

যে বিংশতি মনোবৃত্তির জ্ঞানসাধনা দিলেন গীতা, সেগুলির অনুশীলনের কি পরিণাম? নিশ্চয়ই শূন্যতা লাভ নয়। কারণ শ্রদ্ধা থাকলে তবে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। শ্রদ্ধা কার প্রতি শ্রদ্ধা?

চিত্তে তৎপদের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার দোসর ইন্দ্রিয় নিগ্রহী-ভাব। শ্রদ্ধা তো মাত্র নিরস সম্মান নিবেদন নয় মহতে। শ্রদ্ধার মূলে রস থাকে। রস আপনার সত্তার সঙ্গে মিশে—চরিত্রের উপাদান হয়। সে শ্রদ্ধা নিজের চলার-পথের পাথেয়-রূপে নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকে। সেই শ্রদ্ধাই জ্ঞানলাভের সহায়ক। সে চেতনা নিষ্ফল-সঞ্চয় নয়। যে ইন্দ্রিয়-বিজয়ীর শ্রদ্ধা আছে, জ্ঞান তারই লভ্য। শ্রদ্ধা যাঁর আছে তৎপরে—তিনি ঐ বিংশতি ভাবের অনুশীলনের সুফললাভ করতে পারেন। তাই শ্রীভগবান বলেছেন—

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

জ্ঞানের অনুশীলনের পথে তাই প্রয়োজন ভক্তির। যাদের জ্ঞান আখ্যা দিলেন বাসুদেব, তাদের প্রত্যেকটি ভাবের বিশ্লেষণ ও বিচারে সিদ্ধান্ত অবশ্যম্ভাবী যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত জ্ঞান ভক্তিপথের সহায়ক। অপরদিকে মনের পটভূমিতে ভক্তি না থাকলে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবান না হলে, ইন্দ্রিয় সংযত না হলে জ্ঞানের অনুশীলন পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

তাই জ্ঞানযোগের পরিণাম সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে—জ্ঞানের অভ্যুদয়ে যাদের পাপ নিবৃত্ত হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারা যাদের বুদ্ধি ব্রহ্মে অন্বিত, তাঁর প্রতি যাদের নিষ্ঠা তারা ব্রহ্ম-পরায়ণ। পৃথিবীতে তাদের পুনরাবর্তন নাই।‡

একটু বিচার করলেই প্রতীতি জন্মাবে যে মনুষ্য চরিত্রের এই অবস্থা তিনের উপর নির্ভর করে—কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি। অথচ তিনটির পৃথক অসংলগ্ন অনুশীলনে পূর্ণতা সম্ভবপর নয়—কোনো একটিকে উপেক্ষা করলে শেষ পথের সহায়তা লাভ হয় না। উপেক্ষিত হয় প্রতিরোধী শত্রু।

অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব প্রভৃতির মূলে কি আছে? দম্ভ, দর্প অভিমান কার? নিশ্চয় মায়ায়-ঘেরা ক্ষুদ্র আমিত্বের আমি বড়, তাই আমি মানী। আমার মূল্য অধিক। সেই মূল্যের পরিমাণ আমার কাছে আমার মান। আমি রাজা, আমি ধনী, আমি পণ্ডিত, আমি জ্ঞানী—এ ধারণার মাত্রা যার যত বেশী তার মানিতা তত পুষ্ট। কর্তৃত্বের অভিমানী আপনার স্ফীতরূপ দেখে দম্ভ করে, নিজের কৃতকর্মের মানিত্ব দম্ভিত্বের লোপে ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ। সে অহমিকা এবং অহঙ্কার লোপ পেলে অন্তরের লুকানো

* গীতা ১৩।৮ হতে ১২।১১

† গীতা ৫।১০

‡ তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ। ৫।১৭

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট
সাবানের দৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
B. 207-50 BG

দেবতা আত্ম-প্রকাশ করেন। কারণ অন্তরের গভীরে প্রতিষ্ঠিত আত্মা। ঈশ্বর অন্তরে সবার বিরাজিত।

এ দোষ তো বর্জন নয় পূরণ। আমিত্বের দোষের ত্যাগ তো নিজেকে ক্ষুদ্র করা নয় পূর্ণ করা—আবরণের উন্মোচনে হয় পূর্ণ প্রকাশ। জীবের সংযোগ জীবের সাথে যে সূত্রে হয় সে যে পরমাত্মার যোগসূত্র। অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া ক্ষুদ্র করে জীবকে সে সূত্রের বিস্মরণে। অমানিত্ব আমিত্বের লোপ। অদম্ভিত্ব—ব্যক্তিত্বের বিলোপ, পরিপূর্ণতার প্রকাশ। অনহংকার অহমিকার অতি ক্ষুদ্র শিখার অনন্তের চির-জ্যোতিতে আহুতি-দান। তাই এদের অনুশীলনে জ্ঞানের শিখা জ্বলে। এদের বিপরীত স্বভাব—মান, দম্ভ, অহঙ্কার—অজ্ঞান।

আচার্যের উপাসনা জ্ঞান কারণ আচার্য জ্ঞানভাণ্ডার। শৌচ জ্ঞান। দেহের শুচিতা হ'তে মন শান্তি পায়—অবকাশ পায় আধ্যাত্মিক চেতনার। মনের শৌচ ধুয়ে দেয় আবর্জনা, অযথা তুচ্ছ ভাবনার ও ভাবের প্রেরণা। হিংসা, দ্বেষ, জিঘাংসার স্রোত হয় ক্রমবর্দ্ধমান। জ্ঞানী অহিংসাব্রতী। হিংসার কলুষ লুকিয়ে রাখে প্রেমকে। হিংসার কলুষিত তথা-কথিত জ্ঞানীকে প্রাণের মৈত্রী ও করুণার ভাণ্ডারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বাধা দেয়। ভারতের ঋষি চিরদিন তারস্বরে প্রচার করেছে—মা মা হিংসী। ভক্তির পথ, দেখিয়েছে বেদ। পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করে যেন উদাত্ত-সুরে বলেছেন—পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা। তুমি রক্ষা কর—জীব পিতা যেমন সন্তানকে আশ্রয় দেয়, রক্ষা করে, স্নেহে ঢেকে রাখে, তুমি তেমনি করে আমাদের বাঁচাও। এই হিংসার প্রবল স্রোত মনুষ্যত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে সদাই সচেষ্ট। বৈদিক ঋষি বলেছেন—চিত্তানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বের পাপ দূর কর।

ক্ষান্তি তার পক্ষে সুলভ যে আপনাকে প্রসার করেছে, নিজের ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডী হতে তুলে। ক্ষমা—সহজ সরল বৃত্তি তার যে পরকে ভাবে আপন। নিজে কি কেহ নিজের ক্ষতি করতে পারে? ভুল করে মানুষ যখন নিজের অনিষ্ট করে সে তো শাস্তি দেয় না আপনাকে। পরিতাপ করে, প্রার্থনা করে, সলজ্জ হয়। তাই তো যার ক্ষান্তি আছে তার প্রসার আছে—সে প্রতিশোধ নেয় না প্রতিহিংসায়—সে শত্রুর ভদ্র প্রার্থনা করে। বৈরিতাকে স্থান দেয় না চিত্তে।

বক্রতা জীবে জীবে পার্থক্যের সৃষ্টি করে। কুটিলতা সত্য গোপন। স্বচ্ছতা সত্যের আবরণ উন্মোচন। সত্যই তো জ্ঞান। জ্ঞানই তো সত্য। তার পথে সর্পিল কুটীল-গতি সহায়ক হ'তে পারে না অগ্রগমনের।

চিত্ত-বৃত্তি নিরোধে মনের একাগ্রতা, স্থৈর্য্য, যোগ ও ধ্যানের পথ। নিজের উন্মার্গ দিক্-ভ্রমী বিক্ষিপ্ত মনন-শক্তিকে রুদ্ধ করলেই আত্মার স্বরূপ পড়ে দৃষ্টি পথে। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের আপাতঃ মনোহর রূপ অজ্ঞানের পোষক ও আশ্রয়-ভূমি। বাহিরের রমণীয় দৃশ্য যদি না স্মরণ করিয়ে দেয়—সর্বাঙ্গ সুন্দরের সৌন্দর্য। সীমার মাঝে অসীমের জ্ঞান সম্ভব হৈর্যে।

মনুষ্য জন্ম না হ'লে জ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু সে সত্যকে ঢেকে রাখে এই জন্য এ জীবন অশাশ্বত দুঃখালয়। এ দোষের মূল অনুসন্ধান করলে জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধি কেমনে দুঃখের নিগড়ে না বাঁধতে পারে আমাদের, এ অনুসন্ধান জ্ঞান।

এইরূপে বিংশতি জ্ঞানের পর্য্যায় আলোচনা করলে বোঝা যায় গীতার শিক্ষার মহিমা। ঘোড়াকে লাগাম দিয়ে শাসন না করলে যেমন বিপদ, আত্ম-বিনিগ্রহ বা নিজের লম্ফনশীল মনোবেগকে ধরে না রাখতে পারলে, কোথায় শান্তি, কোথায় নিরাময়তা?

সম্যক আলোচনা করলে আর সন্দেহ থাকে না যে প্রকৃত জ্ঞান ও পরাভক্তি একত্র সংশ্লিষ্ট হ'য়ে—মানুষের জীবনকে সত্যের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে দেয়। গীতা যে গুণাবলীকে জ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন, তারা ভক্তি পথের পাথেয়, নির্ঝর শান্ত জীবন-পথের-নিয়ামক। কিন্তু চাই আমরণ অনুশীলন।

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল, আরও লাবন্যময় ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিলক্ আপনার জন্যে এই যাদুটি কোরতে দিন।

রোজ রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করুন। এর ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ের চামড়াকে দিনে দিনে আরও কোমল, আরও নিশ্মল কোরে তুলবে।

রেক্সোনা

ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

০ ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তেলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক মালিকানী নাম।

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত।

উড়িষ্যায় জমীদারী প্রথা লোপ—

উড়িষ্যা রাজ্যে জমীদারীপ্রথা বিলুপ্ত করিয়া সকল জমী রাষ্ট্রের অধীনস্থ করা হইতেছে। গত ২৪শে আগষ্ট পুরী জেলার ১৭টি ছোট ছোট জমীদারীর পরিচালনভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছেন। একমাত্র কনিকার রাজা এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করায় তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পুরী, কটক ও বালেশ্বর—৩টি জেলায় ২৫ হাজার ছোট জমীদারী ছিল—সেগুলি ক্রমে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হইলে রাষ্ট্রের সকল ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারিবে। জমীদারীপ্রথা বিলোপের ফলে একদিকে যেমন কৃষির উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্ভব হইবে, অন্যদিকে তেমনই জমীদারগণ অতিপুরুষের অর্থ দ্বারা নানাপ্রকার কুটীর শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবেন। দেশের পুরাতন আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—নূতন অবস্থায় নূতন ভাবে তাহা গড়িয়া তোলার প্রয়োজন হইয়াছে। কি ভাবে তাহা করা যাইবে, সে বিষয়ে সকল চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক আলোচনা করিয়াছেন। সকলের সমবেত সুচিন্তিত প্রথায় দেশের অর্থনীতিক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনই জমীদারীপ্রথা লোপের উদ্দেশ্য। মহাত্মা গান্ধী—যে জনগণের রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন—যাহাতে দেশের সর্বনিম্ন স্তরের লোকও স্বাধীনতার মর্ম বুঝিতে পারে—তাহার ব্যবস্থার জন্য আজ সকলের চিন্তাধারাই এক পথে প্রবাহিত হইতেছে। কবে গান্ধীজির সেই স্বপ্নের ভারত গঠিত হইবে, তাহার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

শিশু-রক্ষার দায়িত্ব—

দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীকে-ডি-মালব্য এক 'অনাথাশ্রম' বিল উপস্থিত করিয়া সরকার পক্ষ হইতে দেশের শিশু-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। গত দুর্ভিক্ষ ও দেশ বিভাগের পর দেশে অনাথ শিশুর সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু পিতৃমাতৃহীন ও অভিভাবকহীন শিশু নহে—অনাথ ও অসহায় পিতামাতার সন্তানও অনাথ পর্যায়-ভুক্ত। অনাথ শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকবালিকাদের উপযুক্তভাবে লালন পালনের ব্যবস্থা হইলে তাহারা যে পরে প্রয়োজনীয় নাগরিকে পরিণত হয়, তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। ২৪পরগণা জেলায় হরড়া গ্রামে রামচন্দ্রপ্রীতিস্মৃতিতে স্থাপিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বালকাশ্রমের গত ৮ বৎসরের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, সরকার সত্বর এ বিষয়ে অধিকতর অবহিত হইয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য উপযুক্তভাবে পালনের ব্যবস্থা করিবেন।

সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি—

গত মহাযুদ্ধের সময় টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়ায় অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তাহার ফল আজও দেশ হইতে দূর করা যায় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর গত ৩ বৎসরের প্রথম দিকে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবল ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সেজন্য ভারতের সর্বত্র পুলিশের স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সম্বন্ধে তদন্ত আরম্ভ হয় ও তদন্তের ফলে বহু বড় ও ছোট সরকারী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা হয়। ইহার ফলে যত শীঘ্র দুর্নীতি বন্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। তাহার কারণ জনসাধারণ এ বিষয়ে সরকার পক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন নাই। সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কাজ করিতে যাইলে তাহাদের রোষে পতিত হইতে হয় ও সেজন্য নানারূপ অসুবিধা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় বলিয়া জনগণের মধ্যে এ কাজে উৎসাহ দেখা যায় নাই। গত ২ বৎসরের হিসাবে দেখা যায়, সরকারের নূতন পুলিশ বিভাগ বহু কর্মচারীর সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে—কিন্তু জনগণের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে সে সকল অভিযোগ আদালতে প্রমাণিত হয় নাই। সম্প্রতি সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ-সমূহ গোপনে শুনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও সে সকল অভিযোগ প্রমাণিত হইয়া বহু অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন

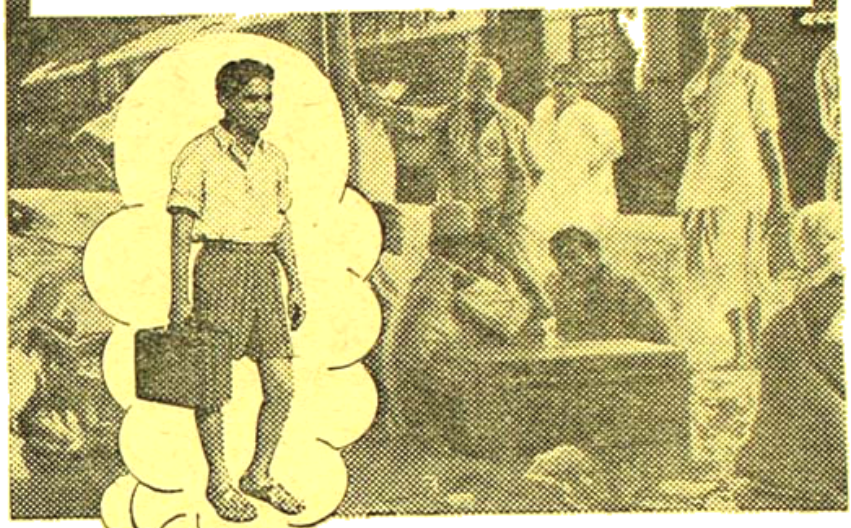

ফেলার আবরণে

কতোই কেন ঢ'সিনার হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধুলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফবয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধুলোময়লার বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।

লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

L 229-50 DG

হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, জনগণ এ বিষয়ে অধিকতর তৎপরতা দেখাইলে দেশ হইতে ক্রমে সকল দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হইবে।

তিস্তার উৎসমুখ সন্ধানে—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় অপর ৩ জন সঙ্গী লইয়া কাঞ্চনজঙ্ঘার ২৩ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত শৃঙ্গে উত্তর বঙ্গের প্রধান নদী তিস্তার উৎসমুখ সন্ধানে যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গী হইবেন—(১) ইনকাম-ট্যাক্স অফিসার শ্রী এ-কে মুখোপাধ্যায় (২) কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলের জেলার শ্রী এস-পি ঘোষ ও (৩) জলপাইগুড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপার্থ রায়। অন্নপূর্ণা শৃঙ্গের অভিযানকারী দলের সঙ্গী আসামি ১১ জন সের্পা সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। ১১ হাজার ফিট উচ্চে চোলামোতে যাইয়া তাঁহারা কেন্দ্র স্থাপন করিবেন। ইহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী দল এ ভাবে পর্বত-অভিযানে যান নাই। শ্রীযুত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিণত বয়সেও যে উৎসাহের সহিত এই কার্যে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা বাঙ্গালী যুবকগণের অনুকরণযোগ্য। আমরা এই অভিযাত্রী দলের সাফল্য কামনা করি।

কলিকাতা অঞ্চলের উন্নয়ন—

কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ২০ কোটি টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা তৈয়ার করিয়া সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে তাহা লইয়া কলিকাতা পৌরসভার সংযুক্ত নাগরিক পরিষদের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। টালীগঞ্জের এলাকায় পলতা ট্যাঙ্কের অনুকরণে জলাধার নির্মাণ ও টালী নালা সংস্কার করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের পরিস্রুত জল সরবরাহ অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য। ইহা দ্বারা লবণ হ্রদ এলাকার পুনরুদ্ধার হইবে এবং সার হইতে গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হইবে। পৌরসভা ও রাজ্যসরকার উভয়ে এই পরিকল্পনার জন্য সমপরিমাণ অর্থ দিবেন। পৌরসভা ঋণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন। মাণিকতলা ও কালীপুর অঞ্চলের জল নিষ্কাসন ব্যবস্থাও উহার মধ্যে থাকিবে। কলিকাতা সহরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে—এ অবস্থায় কলিকাতার উন্নয়ন ব্যবস্থা যত শীঘ্র আরম্ভ করা যাইবে, ততই তাহা জনগণের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস—

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য একটি সর্বভারতীয় কমিটী গঠিত হইয়াছে ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ উক্ত কমিটীর অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। সকল রাষ্ট্রের লেখকগণকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য ১২টি রাজ্যে মোট ৯১০০ টাকার ১২টি পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবদান সম্পর্কে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লেখককে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। ইহার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক হইতে তাহা আলোচিত হইবে ও দেশের সকল সুধী, ঐতিহাসিক ও লেখক এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনার সুযোগ লাভ করিবেন।

দৈনন্দিন জীবনে শোচনীয় অবস্থা—

পশ্চিমবঙ্গে সাত আনা সেরের চাউলের দাম বাড়িয়া ৯ আনা হওয়ার পর হইতে ক্রমে সরিষার তৈল, লঙ্কা, ডিম হইতে আরম্ভ করিয়া মাছ, তরকারী, সব্জী প্রভৃতির দাম অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে ও তাহার ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থের দুরবস্থার সীমা নাই। হঠাৎ বাঙ্গালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সরিষার তৈল ও লঙ্কার দাম কেন এত বাড়িয়া গেল, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সেরের শুকনা লঙ্কা তিন টাকা সের হইয়াছে। আলু ও সব্জীর দাম এ বৎসর গত বৎসরের তুলনায় দেড়গুণ বা দ্বিগুণ হইয়াছে। মাছের ত কথাই নাই—বাংলা দেশে কোনদিন মাছ দুষ্প্রাপ্য হইবে, এ কথা কেহ কল্পনাও করে নাই। বর্ষার সময় বাঙ্গালীর ভাগ্যে এবার ইলিস মাছও হইল না—কাজেই বাঙ্গালী মৎস্য হইতে বঞ্চিত রহিয়া গেল। মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য হ্রাস সম্বন্ধে অনেক পরিকল্পনার কথাই শুনা গেল—কিন্তু বাজারে যাইয়া মাছের সের ৩ টাকা, সাড়ে ৩ টাকা, ৪ টাকার কম কোন দিনই দেখা গেল না। ইহার কোন প্রতীকার ব্যবস্থাও হইল না।

ছাত্রকে সামরিক শিক্ষা দান —

দেশের উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের ছাত্রগণকে অবিলম্বে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থার জন্য গত ১২শে আগষ্ট দিল্লীতে লোকসভায় আলোচনা হইয়াছিল। সহকারী প্রতিরক্ষা-সচিব শ্রীসত্যনারায়ণ জানাইয়াছেন—যুবকগণকে সামরিক শিক্ষা দানের জন্য 'অক্সিলারী ক্যাডেট কোর' 'ন্যাশানাল ক্যাডেট কোর' 'টেরিটোরিয়াল আর্মি' প্রভৃতি গঠন ও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে—তাহাতে যুব-সমাজ সামরিক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ পাইবে। কাজেই বর্তমানে স্কুল কলেজে তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রেণ —

দিল্লীতে লোকসভায় প্রশ্নোত্তরকালে জানা গিয়াছে—কলিকাতার সংলগ্নীগুলিতে বৈদ্যুতিক ট্রেণ চলার ব্যবস্থার জন্য আয়োজন বড় পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছে এবং শীঘ্রই যে সম্বন্ধে তদন্ত শেষ হইবে। কলিকাতার যানবাহন সমস্যা চরম হইয়াছে—ট্রাম বন্ধ থাকিলে লোকজনকে কি কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে বুঝিবে না। কাজেই যত শীঘ্র এ সমস্যার সমাধান হয়, ততই সকলের সুবিধা হইবে।

কৃষ্ণনগর বাণী পরিষদের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অভিথিগণ

ফটো - সমর চৌধুরী

লাডাক ও জম্মুর অবস্থা—

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদের আমন্ত্রণে লাডাকের ৩৭ বৎসর বয়স্ক প্রধান লামা বুশক বাকুলা গত ২০শে আগষ্ট শ্রীনগরে গিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—লাডাক ভারতে কি কাশ্মীরে যোগদান করিবে, এই বিষয় লাডাকবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের দ্বারাই চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। জম্মু বা লাডাকের ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক হইবার কোন আশঙ্কা নাই। জম্মুর ব্যাপারটিও ঠিক লাডাকের অনুরূপ। প্রধান লামাই লাডাক জাতীয় সম্মিলনের সভাপতি: তিনি বলেন—লাডাকের জনগণ বক্সী সরকার সমর্থন করে এবং শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতি সমর্থন করিয়াছে। এই উক্তি হইতে লাডাক ও জম্মুর অবস্থা সম্যক অবগত হওয়া যায়।

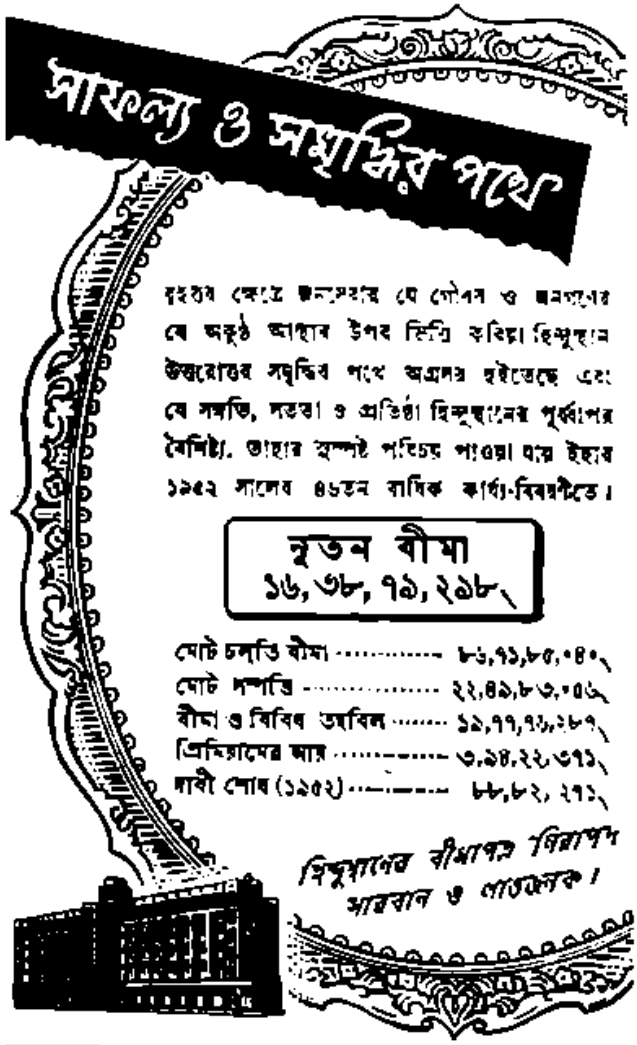

শ্রীরামপুরে কবি-সম্বর্ধনা—

গত ৩০শে আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীরামপুর (হুগলী) বনফুল সাহিত্য সমিতির উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে প্রবীণ কবি শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা করা হইয়াছে। কবির সহীর্থ শ্রীতারকচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কবিকে অভিনন্দন দান করা হয় ও বহু সাহিত্যিক সমবেত হইয়া কবি করুণা-নিধানের কবিতা সম্পর্কে বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করেন। শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সমাগত সকলকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর সহিত ভারত রাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষে কলিকাতা রাজভবনে রাষ্ট্রপাল শ্রীযুত কাইলাস নাথ কাটজু মহাশয় ইহাদের সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। ছবিতে দেখা যাইতেছে—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি, রাষ্ট্রপালী শ্রীযুত কাটজু, বেগম মহম্মদ আলি, মহম্মদ ইস্পাহানী এবং মিঃ গজনফর আলিখান এবং ডাঃ এম-এস-মেটা প্রভৃতি

খড়্গপুরে নূতন যন্ত্র প্রতিষ্ঠা—

ইংলণ্ডের যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসংঘের দানে খড়্গপুরে গত ৭ই সেপ্টেম্বর নূতন বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্দিরে ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের নূতনতম যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘ ১ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি যন্ত্র দিয়াছেন। বৃটেনের ১২টি বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মালিকগণ বিভিন্ন যন্ত্র সরবরাহ করিয়াছেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ খড়্গপুর শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক। তাঁহার বিশ্বাস, এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষার্থীরা বহু নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া দেশের শিল্প বৃদ্ধির সাহায্য করিতে পারিবেন। ২ বৎসর পূর্বে যখন খড়্গপুরে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়, তখন তথায় ঘর বাড়ী ছিল না—এখন তথায় জগতের সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্র স্থাপিত হইল—তথায় বহু শিক্ষার্থীর শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

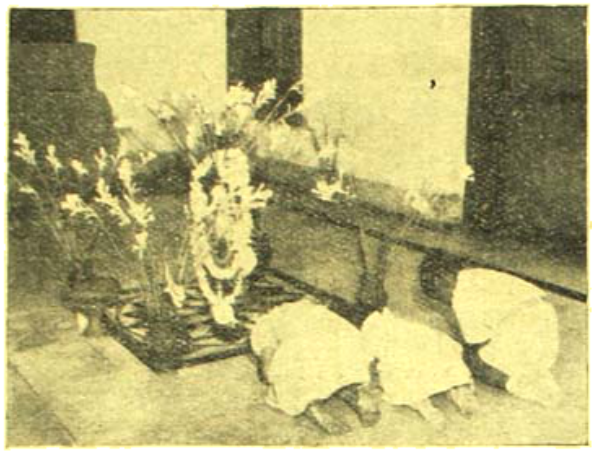

জোড়াসাঁকো ঠাকুর ভবন—রবীন্দ্র-বাস-পূত বিশ্বকবির স্মৃতি-পূত

ফটো—শ্রীপ্রমথনাথ বসু

চোরাকারবারীসহ মাল ধৃত—

পূর্ব-পাঞ্জাব ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে এক দল চোরাকারবারী পাকিস্তান হইতে সোনা রূপো ভারতে আনিয়া ভারত হইতে রেশম, লঙ্কা, ডালচিনি প্রভৃতি পাকিস্তানে লইয়া যাইত। সম্প্রতি সেই দলের ৯২ জন লোক ও ৬ লক্ষ টাকার মাল ধরা পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবে একদল চোরাকারবারী কাজ করিতেছে। এই সকল কারবার বন্ধ হইলে উভয় রাষ্ট্রই লাভবান হইবে। যাহাতে চোরা-কারবারীরা ধরা পড়ে, সেজন্য সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির চেষ্টা ও সাহায্য করা উচিত। জনগণের মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রত না হইলে এই সকল চোরাকারবার বন্ধ হওয়া সম্ভব হইবে না।

সকলকে কাজ দেওয়ার ব্যবস্থা—

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর মুখপত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া জানাইয়াছেন—ভারতরাষ্ট্র বেকারদিগকে বসাইয়া রাখিয়া ভাতা প্রদান করার নীতির পক্ষপাতী নহে—তাহারা সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থার আয়োজন করিতেছে। শুধু বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া কি ভাবে বেকারদিগকে কাজ দিবার ব্যবস্থা করা যায়, সকলের সে জন্য চিন্তা করা প্রয়োজন।

দেখুন,কেন ডালডা বনস্পতি সব রকম রান্না-বান্নার পক্ষে সবচেয়ে ভাল।

"এখন ডালডা দিয়ে রান্না করি ব'লে আমাদের পরিবারের সকলেই কেমন আনন্দ ক'রে খায়।"

ডালডার এই পাকপ্রণালীটি পরীক্ষা ক'রে দেখুন—চমৎকার রান্না — মুর্গী-মশালা!

বেশ বড় বড় টুক্‌রো কোরে মুর্গীটা কেটে নিন। পাত্রে তিন বড় চামচ ডালডা নিয়ে তাতে মুর্গীর টুক্‌রোগুলো, বেঁতো করা রসুন, আদা আর পিঁয়াজ, চার কাপ কোরে কাটা দুটি টোমাটো, দু চা-চামচ ধনে গুঁড়ো, এক চা-চামচ হলুদ গুঁড়ো ও দুকাপ জল দিন। নরম হওয়া পর্য্যন্ত রান্না করুন।

বাংলায় ডালডা রন্ধন পুস্তক বেরুলো! ডালডা রন্ধন পুস্তক এখন বাংলা, হিন্দী, তামিল ও ইংরিজিতে পাবেন। ২০০ পাকপ্রণালী, ৪০ রঙীন ছবি, রান্নাঘর ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়। দাম মাত্র ১৲ টাকা আর ডাকমাশুল লাগবে ১০ আনা। আজই নিম্নে আমিয়ে নিন:
দি ডালডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস, বোম্বাই ১

ডালডা

সকল রকম রান্নার পক্ষে অতুলনীয়

১০, ৫, ২ ও ১ পাউণ্ড টিনে পাওয়া যায়

HVM. 191-X52 BG

বেকারদিগকে ভাতা দিয়া বসাইয়া রাখিলে তাহারা আরও অলস হইয়া যাইবে। শ্রীনেহরু দেশবাসী সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন—সকলে নিজ নিজ চেষ্টানুসারে কাজের ব্যবস্থা করিয়া যেন বেকার-সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করেন।

রামপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা সমিতি—

২৪পরগণা জেলার হালিসহর গ্রামে সাধক রামপ্রসাদ সেনের সাধন ভূমিতে তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ঐ স্থানে আহূত রবিবাসরের এক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবিবাসরের অন্যতম সদস্য শ্রীঅনিলনাথ মুখোপাধ্যায় অগ্রণী হইয়া নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত 'গানে রামপ্রসাদ' গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ উক্ত সমিতির কার্যে দান করিবেন। রবিবাসরের সম্পাদক শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসুই সমিতির সম্পাদক হইয়া এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল কার্য সম্পাদন করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, স্মৃতিরক্ষার জন্য উপযুক্ত অর্থের অভাব হইবে না।

হালিসহরে রবিবাসরের সদস্যগণ

জম্মু ও কাশ্মীরের সুশাসন—

কাশ্মীরে নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের পর নানাভাবে দেশের জনগণকে উপকৃত করার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। তথায় চাউলের মূল্য ছিল ২৭ টাকা মণ। জম্মু ও কাশ্মীরে ৮ টাকা মণ দরে চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সরদার দরও ২৭ টাকা মণ হইতে কমাইয়া ২০ টাকা করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হইতে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। খালের জলের জন্য কৃষকদিগকে যে কর দিতে হয়, তাহাও কমাইয়া অর্ধেক করা হইয়াছে। নাড়াকের গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার জন্যও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। কাশ্মীর রাজ্য যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, নূতন মন্ত্রিসভা সে বিষয়ে সকল চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। দিল্লী চুক্তি অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় গভর্নমেণ্ট শীঘ্রই কাশ্মীরে ডাক, তার, দেশরক্ষা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন। তাহার ফলে ঐ সকল বিভাগের উন্নতি হইবে বলিয়াই আশা করা যায়।

ভারত সরকার শিল্প অন্ন বিতরণে কয়েকটি ভারতীয় রীতি-যন্ত্র উপহার প্রদান করেন। ওই উপহার শ্রীসি-সি-দেশাই মারফৎ প্রদত্ত হয়

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫৩ সালের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনের ফাইনাল খেলায় বাংলা দল ৩-১ গোলে গত বছরের বিজয়ী মহীশূর দলকে পরাজিত ক'রে সন্তোষ ট্রফি লাভ করেছে। জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা, ১৯৪১ সাল থেকে বাংলা দল প্রতিবারই ফাইনাল খেলেছে এবং অনুষ্ঠিত ১৩ বারের খেলায় বাংলা দল ৭বার সন্তোষ ট্রফি পেয়েছে। বাকি তিনবার পেয়েছে, দিল্লী (১৯৫০) এবং মহীশূর (১৯৪৬ ও ১৯৫২)। বাংলা দল ছাড়া অন্য কোন দল এত অধিকবার ফাইনাল খেলেনি এবং এতবার সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়নি।

আলোচ্য বছরের প্রতিযোগিতায় গতবারের বিজয়ী মহীশূর দল ৩-০ গোলে দিল্লীকে এবং সেমি-ফাইনালে ভাগ্যক্রমে ১-০ গোলে শক্তিশালী হায়দ্রাবাদ দলকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। মহীশূর দল এই খেলায় যে ভাবে গোল দেয়—তাতে বলা যেতে পারে হায়দ্রাবাদ দল দান স্বরূপই এই গোলটি মহীশূর দলকে করতে দিয়েছিল।

প্রতিযোগিতায় বাংলা দলকে বিশেষ বেগ পেয়ে খেলতে হয়েছে, একমাত্র প্রথম খেলায় বাংলা ৪-০ গোলে পাঞ্জাব দলকে সহজেই হারিয়েছে।

বিহারের বিপক্ষে দ্বিতীয় খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। দ্বিতীয় দিনে বাংলা ১-০ গোলে অগ্রগামী থাকে কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার একেবারে শেষ মিনিটে বিহারের রাইট-আউট পি .কে ব্যানার্জি গোল দিলে খেলাটি ড্র যায়। গোলটি দর্শনীয় এবং এরকম গোল কদাচিৎ দেখা গেছে।

ঐ দিনে অতিরিক্ত সময়ের খেলাতেও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। তৃতীয় দিনের খেলায় বাংলা ২-১ গোলে বিহারকে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে ওঠে। এ পরাজয় বিহার দলের অগৌরবের হয়নি। বাংলা দলের বিপক্ষে বিহার দলের চমৎকার খেলা মাঠের দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। সময়ে সময়ে বাংলা দলের খেলা চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায় ফলে মাঠের দর্শকরা বিহার দলকে সমর্থন করতে থাকেন। সেমি-ফাইনালে বাংলা-বোম্বাইয়ের প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়রা একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট করেন। দ্বিতীয় দিন বাংলা ১-০ গোলে জয়ী হয়। বাংলার লেফ্‌ট-হাফ নারায়ণ গোলটি করেন। বাংলা দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের খেলায় কোন বোঝাপড়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ ধারা ছিল না। বোম্বাই দল দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ দশ মিনিট জয়লাভের জিদ নিয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে খেলে—এ সময়ে বাংলা দল আত্মরক্ষায় নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ে। বাংলার গোলরক্ষক ভরদ্বাজ একাধিকবার অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দলকে রক্ষা করেন। বোম্বাই দল পরাজিত হ'লেও সেদিনের খেলায় গৌরব তাদেরই প্রাপ্য।

ফাইনাল খেলাটি প্রথম দিন গোলশূন্য ড্র যায়। বাংলা দলের সেণ্টার-ফরওয়ার্ড কে পালের চরম ব্যর্থতায় বাংলা দল গোল দেওয়ার একাধিক সুযোগ নষ্ট করে। দ্বিতীয় দিনের খেলায় মহীশূর প্রথম গোল দেয় খেলার ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৪ মিনিটে বাংলার লেফ্‌ট-আউট এস দত্ত গোলটি শোধ করেন। এর পর বাংলা দল নব উদ্যমে খেলতে থাকে এবং দলের খেলা প্রভূত উন্নত হয়। কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষেই আর গোল

না হওয়াতে অতিরিক্ত সময় খেলতে হয়। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্দ্ধে কোন পক্ষেই গোল হয় না, খেলার ফলাফল ১-১। দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম দিকেই ফাঁকা গোল থেকে রবিদাস মাত্র কয়েক গজ দূরে বল পেয়েও গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। এর কিছু পরই রবিদাসই দলের জয়সূচক গোলটি করেন, ফল দাঁড়ায় ২-১। এই গোলের চার মিনিট পর মেওয়ালাল দলের ৩য় গোলটি দিয়ে বাংলা দলের জয়লাভ পাকা করেন। মহীশূর দল পরাজিত হ'লেও তাদের খেলা দর্শকসাধারণকে পরিতৃপ্ত করে। খেলার শেষে উভয় দলকেই দর্শকসাধারণ অভিনন্দন জানান। বাংলার এ জয়লাভ খুবই গৌরবের, কারণ তারা দুর্বল দল নিয়ে জয়ী হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইউরোপ সফরে যাওয়াতে বাংলা দল তাদের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড়ের সহযোগিতা পায়নি। ফলে বাংলার দল গঠন করা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিযোগিতার ৮টি খেলাতে বাংলা দলে মোট ১৫জন খেলোয়াড় খেলেছেন। এই থেকেই দলের দুর্বলতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতবর্ষের পক্ষে চরম ব্যর্থতার অন্যতম কারণই হ'ল খালি পায়ে ফুটবল খেলা; একাধিক খেলার ফলাফল থেকে আমরা অনেক দিন আগেই এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। কিন্তু সময়মত এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। কর্তৃপক্ষদের ধন্যবাদ, এতদিন পর তাঁরা সজাগ হয়েছেন। এ বারের জাতীয় প্রতিযোগিতায় বাধ্যতামূলক-ভাবে খেলোয়াড়রা বুট পায়ে খেলেছেন। ফল ভালই পাওয়া গেছে।

ইউরোপ সফরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঃ

বুখারেষ্টে বিশ্ব যুব সম্মেলনে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতার বিখ্যাত ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ৪র্থ স্থান লাভ করে।

প্রথম খেলায় অষ্ট্রিয়ার গ্রাজেট ক্লাবকে ২-০ গোলে এবং ২য় খেলায় লেবাননকে ৬-১ গোলে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে ০-৪ গোলে রুমানিয়ার কাছে পরাজিত হয়।

রাশিয়া সফরে চারটি খেলার মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টর্পেডো ডায়নামোর সঙ্গে ৩-৩ গোলে প্রথম খেলা ড্র করে। টিবিলিসি ডায়নামোর কাছে ১-৯ গোলে, মস্কো ডায়নামোর কাছে ০-৬ গোলে এবং কিয়েভ ডায়নামোর কাছে ১-১০ গোলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পরাজিত হয়।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ২৭৫ (লিণ্ডওয়াল ৫২, হাসেট ৫৩; টুম্যান ৮৬ রানে ৪ এবং বেডসার ৮৮ রানে ৩ উইঃ) ও ১৬২ (আর্চার ৬৯; লক ৪৫ রানে ৫ এবং লেকার ৭৫ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড : ৩০৬ (হাটন ৮২, বেলী ৬৪; লিণ্ডওয়াল ৭০ রানে ৪, জনষ্টোন ৯৪ রানে ৩ উইঃ) ও ১৩২ (২ উইকেটে এডরিচ নট আউট ৫৫)

ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৪১ টেষ্ট পর্য্যায়ের পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সুদীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষার পর অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে টেষ্ট পর্য্যায়ে জয়লাভের পুরস্কারস্বরূপ কাল্পনিক 'এসেস' পুনরুদ্ধার করেছে। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইংলণ্ডের এই প্রথম 'এসেস' জয়। ১৯৩২-৩৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ে ৪-১ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু পরবর্ত্তী টেষ্ট পর্য্যায়ে ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডকে 'এসেস' হারাতে হয়। সেই ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪০-৪১ সালের মধ্যে ৬টি টেষ্ট পর্য্যায়ের খেলা হয় এবং অষ্ট্রেলিয়ার হাতেই 'এসেস' থেকে যায়। দু'দেশের মধ্যে উপর্য্যুপরি অধিকবার 'এসেস' লাভের রেকর্ড করেছে ইংলণ্ড—৭ বার, ১৮৮৪ থেকে ১৮৯০ পর্য্যন্ত। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে রেকর্ড ৬ বার, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪০-৪১। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার করতে পাঁচটির বেশী টেষ্ট পর্য্যায় অপেক্ষা করতে হয়নি। ইংলণ্ডের পক্ষে ওভাল মাঠ সত্যই শুভ। ১৯২৬ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ের ফলাফলের পুনরাবৃত্তিই ওভাল মাঠে এবার আমরা দেখলাম—প্রথম চারটি টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত হওয়ার পর ওভাল মাঠের শেষ টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের জয়—অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'এসেস' পুনরুদ্ধার। দীর্ঘকাল পর ইংলণ্ড তার জাতীয় ক্রিকেট খেলায় পুনরায় প্রাধান্য অর্জ্জন করেছে—ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে আজ পরম আনন্দ এবং আশা। আরও সে, দ্বিতীয় রাণী এলিজাবেথের রাজ্যাভিষেক বৎসরে স্বদেশের মাটিতে ইংলণ্ডের এ সাফল্য জয়লাভের

গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে। ১৯১৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায় নিয়ে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট পর্য্যায়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৪১। ফলাফল দাঁড়িয়েছে সমান সমান—ইংলণ্ডের 'এসেস' লাভ ১৯ বার, অষ্ট্রেলিয়ারও ১৯। অমীমাংসিত ৩ বার—১৮৭৬-৭৭, ১৮৮২ এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে। ৪১টি টেষ্ট পর্য্যায়ে মোট টেষ্ট খেলা ১৬৩। ইংলণ্ডের জয় ৫৭, অষ্ট্রেলিয়ার ৬৮, খেলা অমীমাংসিত ৩৮। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালের ৪টি টেষ্ট পর্য্যায়ের ২০টি খেলায় ইংলণ্ডের হার ১১ এবং অষ্ট্রেলিয়ার মাত্র ২—১৯৪৬-৪৭ সালে অষ্ট্রেলিয়াতে এবং ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ডে। খেলা ড্র ৭। যুদ্ধপরবর্ত্তীকালে, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ক্রিকেট ক্রীড়ারত দেশগুলির ওপর সুদীর্ঘকাল একটানা একাধিপত্য বজায় রেখেছিল বলে অষ্ট্রেলিয়াকে বলা হ'ত ক্রিকেট খেলার বিশ্বচ্যাম্পিয়ান। ১৯৫২-৫৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়, খেলার ফলাফল সমান হওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' লাভে অক্ষমতা এবং পরবর্ত্তীকালে ইংলণ্ডের কাছে অষ্ট্রেলিয়ার 'এসেস' হাতছাড়া—এই দু'টি সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে বেশীর ভাগ ক্রিকেট সমালোচক মনে করেন, যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালের টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়ার একটানা একাধিপত্যের যে সমাপ্তি হ'ল তারপর অষ্ট্রেলিয়া পুনরায় সে আধিপত্য লাভ করতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। যুদ্ধ-পরবর্ত্তীকালে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৬টি টেষ্ট পর্য্যায়ে খেলেছে—ইংলণ্ডের বিপক্ষে ৩টি, ভারতবর্ষ, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একটি ক'রে। এই ছ'টি টেষ্ট পর্য্যায়ের সবগুলিতেই অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছে। খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার হার মাত্র ২টি, খেলা ড্র ৫টি। এই একটানা জয়লাভের পথে প্রথম বাধা পায়, ১৯৫২-৫৩ সালের টেষ্ট পর্য্যায়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ২টি টেষ্ট খেলায় হেরে—যার ফলে টেষ্ট পর্য্যায়ের ফলাফল সমান দাঁড়ায়। এখানে মনে রাখতে হবে, অষ্ট্রেলিয়া-দঃআফ্রিকার মধ্যে অনুষ্ঠিত ৮টি টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' পেয়েছে উপর্য্যুপরি ৭ বার, অমীমাংসিত ১ বার। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে দ্বিতীয় বাধা ইংলণ্ডের হাতে 'এসেস' হারিয়ে। তবে এ দুটি বাধাতেই যে অষ্ট্রেলিয়া সহজে কাবু হয়ে যাবে—এমন ক্রিকেট খেলা অষ্ট্রেলিয়া খেলে না।

১৫ই আগষ্ট, ওভাল মাঠের ৫ম টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হাসেট টসে জয়ী হলেন। আলোচ্য টেষ্ট পর্য্যায়ের পাঁচটি খেলাতেই হাসেট জয়ী হয়েছেন। টেষ্ট পর্য্যায়ের পাঁচটি খেলাতেই টসে জয়ী হয়েছেন—এ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচজন ভাগ্যবান অধিনায়ক। সুতরাং এ গৌরব কম নয়! হাসেটের পক্ষে এ গৌরব আরও যে, তিনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে দশটি টেষ্ট খেলায় অধিনায়কত্ব ক'রে ৯বার টসে জয়ী হয়েছেন—১৯৫০-৫১ সালে ফ্রেডী ব্রাউনের বিপক্ষে ৩বার এবং ১৯৫৩ সালে লেন হাটনের বিপক্ষে ৫বার। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভের অর্থ, খেলায় অর্দ্ধেক জয়লাভের সমান মনে করা হয়। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ জয়লাভ এক্ষেত্রে কাজের হয়নি। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট ক'রে প্রথম ইনিংসে ২৭৫ রান ক'রে ৫৯ ঘণ্টায় খেলায়। ট্রুম্যান ৮৬ রানে ৪টে উইকেট পান, ব্যাটসম্যানদের কাছে তাঁর 'ভূত' আখ্যা কিছুটা প্রমাণিত হয়। নির্দ্ধারিত সময়ে ইংলণ্ডের কোন উইকেট না পড়ে ১ রান ওঠে, ১৮ মিনিটের খেলায়। ১৩ই আগষ্ট, রবিবার খেলা বন্ধ থাকে। ১৭ই আগষ্ট, খেলার দ্বিতীয় দিনে ৭ উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ২৩৫ রান দাঁড়ায়; অষ্ট্রেলিয়ার থেকে ৪০ রান কম, হাতে ৩টে উইকেট জমা। মাঠে এইদিনে ৩০,০০০ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। অধিনায়ক হাটন ৮২ রান করেন; হাটন-মেএর ২য় উইকেটের জুটিতে শত রান ওঠে। এবং এই জুটির দু'জনকেই আউট ক'রে ভনষ্টোন বোলিংয়ে কৃতিত্ব লাভ করেন।

১৮ই আগষ্ট, ছয়দিনের টেষ্ট খেলার ৩য় দিনে ৩০৬ রানে ইংলণ্ডের ১ম ইনিংস শেষ হ'লে ইংলণ্ড ৩১ রানে এগিয়ে যায়। ইংলণ্ডের চৌকস খেলোয়াড় বেলী ৩½ ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৬৬ রান করেন। বেলী-বেডসারের শেষ উইকেটের জুটিতে ৬৪ রান ওঠে, ৭০ মিনিটের খেলায়।

লাঞ্চের পর অষ্ট্রেলিয়া ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ইংলণ্ডের লক এবং লেকার মারাত্মক বল দিয়ে অষ্ট্রেলিয়াকে কাবু ক'রে দেন। ৬১ রানে ৫টে উইকেট পড়ে যায়। মাত্র ৩০ রানে অষ্ট্রেলিয়া এগিয়ে থাকে।

লক ও লেকারের ১৬টা বলে ৪টে উইকেট পড়ে—হোল, হার্ভে, মিলার এবং মরিস, রান ওঠে মাত্র ২। এ বিপর্য্যয়ে অষ্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তবুও অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা যে সত্যিকারের ক্রিকেট খেলোয়াড়

তার পরিচয় দিতে ভুলেন না। বিপক্ষদলের মুখে তখন খেলোয়াড় আচার এবং ভেরিটির নিভীকভাবে আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকেন। এত সময়ে লেকারের পর পর দুই ভেরিটির বাউণ্ডারী এবং 'ষ্টাম্পে' বাড়ি মারেন।

১৯৩৩ সালের ১৮ই আগষ্ট ওভালের মাঠে ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার দৃশ্য

ফটো : ডি. রতন

ইংলণ্ডের সমস্ত আউট-ভেরিটিসনের ফুটিতে ৮৬ রান ওঠে, আর ঘণ্টার খেলায়—এই সময় অষ্ট্রেলিয়া ১০০ রানে অগ্রগামী থাকে। ৮১ রানের পরই এ ফুটি ভেঙ্গে যায়। ৯ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়ার ২৬১ রান, তখন লিণ্ডওয়ালের সঙ্গে জনষ্টোন শেষ উইকেটের ফুটিতে খেলতে নামেন। লিণ্ডওয়ালও পিটিয়ে খেলেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার ২য় ইনিংস ১৬২ রানে শেষ হ'লে জয়লাভের প্রয়োজনীয় ১৩২ রান তুলতে ইংলণ্ড ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। তখন খেলার মাত্র সময় ছিল ২২ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের একটা উইকেট পড়ে ৬৮ রান ওঠে; আর ৯৯ রান তুলতে পারলেই ইংলণ্ডের জয়—হাতে ৯টা উইকেট এবং পুরো তিনদিন সময়।

১৯১৩ সালের ১৯শে আগষ্ট, ইংলণ্ডের জাতীয় ক্রীড়াজীবনে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিনটির জন্যে ইংলণ্ডকে দীর্ঘ ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ইংলণ্ডের ২টো উইকেট পড়ে ১৩, রান উঠেছে, উইকেটে খেলছেন এডরিচ এবং কম্পটন, বল দিচ্ছেন মরিস। ইংলণ্ডের জয়লাভের আর ১ রান বাকি। ইংলণ্ডের সর্বজন-প্রিয় খেলোয়াড় কম্পটন সেই রানটি করলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আনন্দ ধ্বনিতে সমস্ত মাঠ মুখরিত হয়ে উঠলো—জয় ইংলণ্ডের! দীর্ঘ ২০ বছরের ধৈর্য্য নিয়মানুবর্ত্তিতার ক্রোমে আর ধরে রাখা গেল না। পুলিশবেষ্টনী ভেঙ্গে ফেলে ওভাল মাঠের ওপর দিয়ে জনসমুদ্র প্যাভিলিয়নের দিকে উদ্দাম গতিতে প্রবাহিত হ'ল—খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানাতে।

সাহিত্য-সংবাদ

দ্বিজেন্দ্রলালের রায় প্রণীত নাটক "সোরাব রুস্তম" (২য় সং)—১৷০,
"চন্দ্রগুপ্ত" (১৩শ সং)—১৷৷০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "চন্দ্রনাথ" (২৩শ সং)—১৷০,
"বিন্দুর ছেলে" (২৫শ সং)—১৷০, "পল্লীসমাজ" (৫ম সং)—৸৷০

মন্মথ রায় প্রণীত নাটক "কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া"—২৲

এমিলি ব্রণ্টে প্রণীত উপন্যাসের বাঙ্গলা অনুবাদ "প্রেমের জয়"—১৷০

ভারত সরকারের মিনিষ্ট্রী অব ইনফরমেশন এণ্ড ব্রডকাষ্টিং বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত "India—1933"—৷৷০

সতীশ ঘোষ প্রণীত ধর্ম্ম গ্রন্থ "উদ্ধারপথ"—২৲

ইন্দুর কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "ভগবানের আমাপ্রসাদের মূল্য ও ফল"—৷০

ডাঃ প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "কালাজ্বর চিকিৎসা"—৷৷০

ডাঃ বিপিনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "হিংসার অন্ধকার"—১৷০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষ আশ্বিনের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে; সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যত শীঘ্র সম্ভব কার্ত্তিক সংখ্যার বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

[illegible]

নামসংকীর্তন

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

কার্ত্তিক—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

ভাগবত-ধর্ম্ম

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। উভয়পক্ষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিহত হইয়াছে। কৌরব পক্ষে সুর-সমর-বিজয়ী ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সম্মুখযুদ্ধে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। মহারাজ দুর্য্যোধনের উনশত ভ্রাতা, পুত্র এবং ভ্রাতৃপুত্রগণ, জয়দ্রথাদি স্বজন সকলেই পরলোক-গত। পাণ্ডব পক্ষে দ্রুপদাদি যোদ্ধৃগণ এমন কি অর্জ্জুনের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যু পর্য্যন্ত হত হইয়াছেন। কৌরব পাণ্ডব উভয় শিবিরেই হাহাকার উঠিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমগ্র ভারতের রাজন্যগণ, যোদ্ধগণ কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনও জীবিত নাই। সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শোকের কৃষ্ণ ছায়া—ভারতবর্ষ অন্ধকার।

যুদ্ধশেষে কুরুপতি দুর্য্যোধন শোকে দুঃখে অভিমানে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সহায় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ দ্বৈপায়ন তীরে উপস্থিত হইয়া আহ্বান করিলে গদামাত্র সহায় মহারাজ দুর্য্যোধন হ্রদ-নীর ভেদ করিয়া তীরে আসিয়া দেখা দিলেন। একাকী—তথাপি ক্ষত্রিয় সন্তান যুদ্ধের আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি সমযোদ্ধা ভীমের সঙ্গে গদা-যুদ্ধে সম্মত হইলেন।

বলদেব নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলে ঋষিগণ সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন। পুরাণ-পাঠক রোমহর্ষণ ব্যাসাসনে বসিয়াছিলেন বলিয়া দণ্ডায়মান হন নাই। এই অপরাধে বলদেব তখনই তাঁহাকে বধ করেন। মুনিগণ শোকসন্তপ্ত চিত্তে বলদেবকে মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন—রোমহর্ষণকে হত্যা করায় তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইয়াছে। বলদেব অনুতপ্ত হইয়া রোমহর্ষণ-পুত্রকে ব্যাসাসনে অভিষিক্ত করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ ক্ষালনের জন্য ত্রয়োদশ বৎসর তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। ত্রয়োদশ

বৎসরান্তে যেদিন দ্বৈপায়নে আসিয়া উপস্থিত হন, সেইদিন ভীম-দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ হয়। দুর্যোধন বলদেবের প্রিয়-শিষ্য, তিনি বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গুরুদেবকে দেখিয়া হয়তো কুরুরাজের মনে কথঞ্চিৎ ভরসা লাগিয়াছিল।

কৃষ্ণ-বলরামের সমক্ষে উভয়ের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে, সহসা ভীমসেন দুর্যোধনের উরুদেশে আঘাত করিলেন। উরুভঙ্গে কুরুপতি ইন্দ্র বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূপতিত হইলেন। উদরের নীচে গদাঘাত নিষিদ্ধ, বলদেব বড় ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন, কৃষ্ণ বহু অনুনয়ে তাঁহাকে শান্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে পুরানো কথা শুনাইলেন। একদিন কৌরব-জননী শিবপূজান্তে দুর্যোধনকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন উলঙ্গ হইয়া আইস, দুর্যোধন লজ্জায় উরুদ্বয় আবৃত করিয়া আসেন। দুর্যোধনের যে যে অংশ গান্ধারীর দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছিল, সেই সেই অংশ পাষাণের মত সুদৃঢ় হইয়াছিল, মাত্র উরুদ্বয় তাহার ব্যতিক্রম। কৃষ্ণ শুনাইলেন কৌরব সভায় দ্রৌপদীর অবমাননার কথা। শুনাইলেন—দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের উরুদেশ দেখাইয়া ক্রোড়ে বসিতে নির্লজ্জ ইঙ্গিতের কথা। দুর্যোধনের উরুভঙ্গের জন্য ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা। সমস্ত শুনিয়া বলদেব স্থান ত্যাগ করিলেন। শুধু গদাঘাত নয়, ভীমসেন মহামানী দুর্যোধনের মস্তকে পদাঘাতও করিয়াছিলেন।

বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব, ভারতীয় মনীষা ও মনস্বিতার মূর্তবিগ্রহ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস—সমগ্র ভারতবর্ষ যাঁহার উদ্দেশে বন্দনামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিল—

অচতুর্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ
অভাল লোচন শম্ভুর্ভগবান বাদরায়ণি।

সেই অ-চতুর্বদন ব্রহ্মা, দ্বিবাহু দ্বিতীয় হরি, ত্রিনয়নহীন মহাদেব, ভগবান বাদরায়ণি কৃষ্ণকথার অধিষ্ঠান ভূমিরূপে—ঐ দ্বৈপায়ন হ্রদতীরের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ দেখ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তী সম্রাট মহারাজ দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে ভূমিশয়নে শয়ান।

গদামৃধে কৌরব সৃঞ্জয়ানাং
বীরেষ্বথ বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে
ভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরব সৃঞ্জয়গণ বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে ভগ্নোরুদণ্ড ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে ভূপতিত রহিয়াছেন। প্রাসাদাভ্যন্তরে স্বর্ণ-পালঙ্কে কুসুমাস্তৃত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন, দিব্যস্ত্রী-কর-চারু-চামর বীজনে যাহার ক্লান্তি অপনোদিত হইত, আজ কঙ্করাকীর্ণ কঠিন ভূমিতল তাহার শয্যা। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য যাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন, একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত, আজ তিনি—অসহায়—একক। কুক্কুর, শৃগাল তাঁহাকে জীবন্ত ভক্ষণ করিবার জন্য চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইয়াছে, তিনি অঙ্গুলী উত্তোলনেও অসমর্থ। কোথায় রাজ্য, কোথায় রাজভাণ্ডার, কোথায় রাজভোগ, কোথায় রাজমহিষী, রাজপুত্র, স্বজনবান্ধব। কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে মহারাজ দুর্যোধনকে দেখিয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে—"ততঃ কিম"? পার্থিব ঐশ্বর্য্যের, দম্ভ, লোভ মাৎসর্য্যের তো এই পরিণাম। পাণ্ডব পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনায় পাঁচখানি গ্রাম ভিক্ষা চাহিলে শ্রীকৃষ্ণের অবমাননা পূর্ব্বক যিনি বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" সে দাম্ভিকের যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছে, কিন্তু সূচীবিদ্ধ মৃত্তিকা মাত্রও আজি আর তাঁহার আয়ত্তে নাই। এই তো মানুষের জীবন? তাহা হইলে মানুষ কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, কেমন করিয়া শান্তিলাভ করিবে।

পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সেনাপতি অর্জ্জুন যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে তিনি অনেক যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—যাঁহাদের জন্য রাজ্য চাই, রাজ্যলোভে সেই স্বজনবান্ধবগণকে হত্যা করিয়া কি ফল হইবে? এই স্বজন গুরুজনের রুধিরপ্রদিগ্ধ রাজ্যে আমার প্রয়োজন কি? যুদ্ধে জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম ধ্বংস হয়। রমণীগণ বৈরিণী হয়, ফলে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব ঘটে। কুলঘ্ন সান্ধর্য্য নরকের হেতু। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কোন কথা শোনেন নাই। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান, যুদ্ধই তোমার কুলধর্ম্ম।

যুদ্ধ তুমি আমন্ত্রণ করিয়া আন নাই। সুতরাং এই যদৃচ্ছয়া উপপন্ন স্বর্গদ্বারকে কেন স্বেচ্ছায় অর্গলবদ্ধ করিবে।

হয় যুদ্ধে হত হইয়া স্বর্গে গমন কর, নয়তো যুদ্ধে জয়ী হইয়া এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরার অধীশ্বর হও। অন্যায়পূর্ব্বক যাহারা তোমাকে স্বাধিকারে বঞ্চিত করিয়াছে। তোমাকে, তোমার সহোদরদিগকে, তোমাদের ধর্ম্মপত্নী রাজনন্দিনী দ্রৌপদীকে অযথা অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহারা ক্ষমার অযোগ্য। তাহারা তোমার ক্ষমাকে দুর্ব্বলতার নামান্তর বলিয়াই মনে করিবে যাহারা দুষ্কৃতকারী, যাহারা অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে সহায়তা করিয়াছে, তাহাদের বিনাশের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে? আপনার কর্ম্মদোষে, ইহারা জীবন্মৃত, আপনা আপনি হত হইয়া আছে? কালরূপে আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়া রাখিয়াছি। আমি যেমন বাহিরে, তেমনই অন্তর্যামীরূপে তোমার হৃদয়াভ্যন্তরেও রহিয়াছি। তুমি লাভ অলাভ, জয় পরাজয়, সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিয়া, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম আমাকে সমর্পণ পূর্ব্বক অবিচারিত চিত্তে আমার নির্দ্দেশ পালন কর। অহঙ্কারবিমূঢ় চিত্তে নিজেকে কর্ত্তা মনে করিও না। তোমার মনে যদি হিংসা দ্বেষ না থাকে, কোন কামনা না থাকে, তবে ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে কেন? এইরূপে বহু উপদেশ দান করিয়া সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনকে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

অর্জ্জুন উপদেশ গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ হইল, যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণামও আসিয়া দেখা দিল। এই পরিণাম নিরোধের উপায় কি? শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রশ্নের উত্তর আছে।

দুইটী মহাযুদ্ধ আমরা প্রত্যক্ষ করিলাম। অশন-বসনের অকথ্য অভাবে ক্লিষ্ট হইলাম। মুদ্রাস্ফীতির জন্য সমাজের ভার-সাম্য নষ্ট হইয়া গেল। অর্থের জন্য মানুষ পিশাচে পরিণত হইল। ব্যভিচার কালোবাজারে দেশ ছাইয়া গেল। বোমার আঘাতে দেব মন্দির, পাঠশালা, আরোগ্য-নিকেতন পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত হইল। অপরাধী নিরপরাধী নির্ব্বিচারে শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী বৃদ্ধা কেহ পরিত্রাণ পাইল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাইলসের চতুর্দ্দশ বিধান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সৃষ্টি হইল, কিন্তু জনসাধারণ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই ডুবিয়া রহিলাম। শান্তি অথবা সান্ত্বনা কোনটাই আমাদের লভ্য হইল না। সম্মুখ-সমর বরং ছিল ভাল, বর্ত্তমানের স্নায়ু-যুদ্ধের তাড়নায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকি—কখন কি হয়! কখন কি হয়?

সে কালের যুদ্ধ এত ব্যাপক ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, প্রজাদের তেমন দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন, নারী, শরণাগত, রণ-বিমুখ—ইহারা অবধ্য ছিল। নির্দ্দিষ্ট প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধ হইত। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে সকলেই নিরাপদে থাকিত। তথাপি যুদ্ধের কুফল যাইবে কোথায়? বহু সহস্রাব্দের ইতিহাসে দেশে একজন অর্জ্জুনেরই আবির্ভাব ঘটে। সমাজের বাকী সকলেই তো সাধারণ মানুষ। এই জনসাধারণই সমাজের ভিত্তি, দেশের সর্ব্বস্ব। ইহারা যাহাতে অধর্ম্মচারী না হয়, বিপথগামী না হয়, আপৎকালে বিহ্বল এবং কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হয়, তাহারই জন্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সূচনায় শ্রীমৎভগবদ্ গীতা এবং অন্তে শ্রীমদ্ভাগবতের মহাবাণী উদ্গীত হইয়াছিল। গীতায় যাহা বলা হইয়াছে—, ভাগবতে তাহাই আদর্শে আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। কেমন করিয়া ভগবৎ বাক্যকে নিজের জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে হয়—নিজের আচরণে রূপ দিতে হয়—ভাগবতে তাহার জীবন্ত উদাহরণ আছে। কেমন করিয়া সর্ব্ব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে হয়, কেমন করিয়া সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিশ্বের শরণ পুরুষোত্তমের শরণ গ্রহণ করিতে হয়—শ্রীমদ্ভাগবতই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীভগবান কত আপনার, কত সুন্দর, কত মধুর কত কৃপাময়, কেমন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, ভাগবতেই আমাদিগকে প্রথম সে কথা শুনাইয়াছেন, তাঁহাকে ভালবাসিবার রহস্য বলিয়া দিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেই ভক্তগণ ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হইয়াছেন।

আমি গীতা এবং ভাগবতের ধর্ম্মকেই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়াছি। ভাগবত-ধর্ম্মের মর্ম্ম কথা হইল—শ্রীভগবানই একমাত্র সত্য বস্তু এবং তিনি নিত্য বিরাজমান। তিনি তোমার ভালবাসার কাঙ্গাল। তিনি তোমার অন্তরেই রহিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই তুমি তাঁহাকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে পার। অপরের কথা না শুনিয়া আমার কথাটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। কোন ভয়েই তুমি আর ভীত হইবে না। কোন দুঃখই তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। কোন আঘাত, কোন প্রলোভনই তোমাকে পতিত করিবে না। আনন্দ কাহাকে বলে জান না, অথচ আনন্দের লালসাতেই ঘুরিয়া মরিতেছে। সেই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের দর্শন লাভে প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাইবে, পরমা শান্তি লাভ করিবে।

তীর্থ-পথে

নরেন্দ্র দেব

খুলনা না-হ'তে পার—
ট্রেনে আমাদের উঠে এল যত
ছেলে বুড়ো ছড়িদার।
সাড়ে-সাত ভাই পাণ্ডার দল,
যাত্রী শিকারে করে কোলাহল,
একটি কিশোর বালক চপল
শুধাইল—তুমি কার?
প্রশ্ন শুনিয়া উঠিনু শিহরি,
রোমাঞ্চ দেহে! কি বলি—কি করি?
—কথা খুঁজে নাহি পাই।
আমি কার? এতো ভাবিনি কখনো;
কহিলাম তারে, কাছে এসো, শোনো—
নাম কি তোমার ভাই?
সে বলে, তোমার পাণ্ডার নাম
জানো যদি, বলো তাই;
বলো বাড়ি কোথা, কি নাম পিতার?
সময় যে বেশি নাই।

• • •

চমকি উঠিনু শুনি তার কথা।
কিশোর কণ্ঠে এ কোন বারতা?
পুলকে বালকে কহিনু ডাকিয়া
সত্য বলেছো ভাই,
বৃথা ইহকাল কাটে ইহলোকে,
সময় তো আর নাই!
ভুলে গেছি আছে দাঁড়ায়ে মরণ
দিবা নিশি পিছে। করালে স্মরণ—
তুমি তো বালক নও!
মনে হয় তুমি মহাপ্রভুই,
শিশু-রূপে কথা কও!

• •

দিব্য ছেলেটি, ভাষা তার খাসা,
শুচিচা-ঘরে তাহাদের বাসা;—
হ'লো আরও কথা ঢের;
নামটি 'কৃষ্ণ-বলরাম ঘুঁটে'
মোর পরিচয় জানি ল'য়ে খুঁটে
বলে,—তুমি আমাদের!
শিহরিয়া উঠিলাম!
আপনার যারা গৃহে ফেলে সবে
এসেছি চলিয়া, কবে দেখা হবে?
হবে কি হবে না! কেবা তাহা কবে?
ভাবনা এ অবিরাম।
চলেছি সুদূর বিভূঁই-বিদেশ—
অজানা, অচেনা সেথা পরিবেশ,
অপরিচিত সে ধাম।
পথমাঝে আসি এ কোন কিশোর—
হৃদয়ের তার ছুঁয়ে দিল মোর?
স্নেহের বাঁধনে বাঁধিল যে জোর,
বলে—তুমি আমাদের!
প্রতিবাদ করি শুধালাম হেসে—
প্রমাণ কি বলো এর?

• • •

খুলিয়া খেরুয়া-মোড়া মোটা খাতা
উলটি পালটি দু' চারটি পাতা
দেখালো আমারে উৎকল-শিশু,
দেড়শো বছর আগে—
বিগত সে কোন বিক্রমাব্দে
তারিখ পঁচিশে মাঘে,
আমার প্রপিতামহের জনক
সঙ্গে পত্নী—শ্রীমতী কনক,
এসেছিল মোর আপনার জন;
—হরফে হেরি সে ছায়া!

খাগের কলমে বাংলা কালিতে
তুলোট কাগজে ছুপিয়া বালিতে
লিখিয়া গেছেন স্মরণ-ডালিতে—
এতটুকু বিবরণ !
পড়িতে পড়িতে অঙ্গে আমার
বেজে ওঠে শিহরণ !

• • •

সই করেছেন, নাম—বনমালী,
কালের প্রভাবে বিবর্ণ কালি ;
তবু সুন্দর !·· বড় সুন্দর
লিপনের সেই ছাঁদ
মনে হয়, হাসে খাতার পাতায়
বংশের যেন চাঁদ !
আমার পিতার হাতের লিখার
হুবহু কি এ নকল !
'এ' কার, 'ঊ' কার ঠিক মিলে যায়
দাঁড়িটিও অবিকল !
এ যে ভারি পরিচিত !
পরিচিত এর প্রতিটি আখর ;
উল্লাসে প্রাণ কাঁপে থর্-থর্,
না-দেখা জনেরা হ'ল ভাস্বর ;
অন্তর পুলকিত !
উছলিয়া ওঠে মন !
কণ্ঠ আমার স্নেহে গদ-গদ—
কহিনু,—কৃষ্ণধন !
তুমি হবে মোর জগন্নাথের
শ্রীক্ষেত্রে কাণ্ডারী ;
দেড়শো বছর আগে পরিচয়,
সে কথা যে আজও ভুলিবার নয়—
প্রমাণ দিলে গো তারই !

■ • •

খাতা খুলে আছি চেয়ে !
মেটেনা পিপাসা, আশা অক্ষয় ;
ব্যস্ত ছেলেটি ঘোরে গাড়ীময়,
জনে জনে ধরি পুছে পরিচয়—
দমে না সে তাড়া খেয়ে !
কেহ দেয় গাল, কেহ ওঠে রেগে,
যাত্রীর পিছু তবু আছে লেগে,
কি পুরুষ, কি বা মেয়ে !
রূঢ় ভাষে যারা তাড়াইল তারে,
দুর্ভাগা তারা এই সংসারে ;
পূর্ব পুরুষে এনেছে সে দ্বারে—
ইহাতে নাহিক ভুল।

সেই আখরি সাক্ষর চিনে
দিল না শ্রদ্ধা-ফুল !

• • •

ডাকিয়া বালকে স্নেহে কহিলাম—
কে রেখেছে তব সুন্দর নাম ?
তুমিই কৃষ্ণ, তুমি বলরাম,—!
আমার প্রণাম নাও।
একাধারে দু'টি যুগ-অবতার !
পদরজ দোঁহে দাও।
কি জানি ছেলেটি মিনতি আমার
শুনেছিল কি না কানে ;
গাড়ি দিল ছাড়ি, যাত্রীকণ্ঠ
মুখরিল' স্তব গানে !
ছোঁয়ানু ললাটে দুটি জোড়হাত
কহিলাম—জয়, হে জগন্নাথ !
দেখা যেন পাই, আমি গো অনাথ—
আশ্রয় তব চাই ;
তোমার অধিক আপনার মোর
এ জীবনে কেহ নাই !

• • •

সেই প্রণতির কোনও এক ফাঁকে
ব্যস্ত বালক ঠেলে মোরে ডাকে,
বলে, দিদি ! দেখ বাঁয়ে—
ওই আকাশের পূব-সীমানায়
মন্দির-চূড়া দূরে দেখা যায়,
তোমায় নে' যাবো রত্ন-বেদির
দর্শনে ধূলো-পায়ে !
চলন্ত-ট্রেন গেল যেন থামি !
গবাক্ষ হ'তে চেয়ে দেখি আমি—
নীলাচল-নভোমূল—
চক্রবালের দিগন্ত শেষে,
ত্রি-মূর্ত্তি ওই উঠিয়াছে ভেসে !
আঁখিতে কি এল চুল ?
মুছি দুই চোখ চেয়ে দেখি ফিরে—
নহে ত' দেখার ভুল !
আকাশের বুকে উজ্জ্বল ত্রয়ী
সূর্যের সমতুল !
দেউল-শিখরে শোভে আমলকী !
ত্রিলোকের গতি হোথা থাম্‌ল কি ?
অকূল সাগরে জীবন-তরণী—
হোথা কি লভিবে কূল ?

দৈন্য

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

দশবছর আগেকার তুলনায় আজকের সংসারে পরিবর্তন ঘটেছে। সংসারে তখন এত পারিপাটা ছিল না। ঘরে কৌচ সেফা, ড্রেসিং টেবিল, মাথার 'পর ঘূর্ণায়মান পাখার তীর্যক গতি, দেওয়ালের গায়ে ডিস্টেম্পারের রঙ, চকচকে পালিশকরা মেঝে—তখনকার ঐশ্বর্যের মধ্যে এগুলির কোনটিই স্থান লাভ করে নি। এখন সমস্ত বাড়িখানি ভরে একটা প্রতিপত্তির জোয়ার যেন কলকল্ ক'রছে।

দশবছর আগে এ বাড়িটার রূপ ছিল অন্যরকম। বৃহৎ আত্মীয়-অনাত্মীয় পরিবেষ্টিত সংসার বহুজনের কলকোলাহলে সরগরম ছিল সর্বক্ষণ। বিশেষ কোন একজনের প্রতিপত্তি তখন লক্ষ্য করা যেত না। একটি সুখী পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-ধারা একটানা গতিতে ছিল প্রবহমান। দৈন্যের লক্ষণ নেই; কিন্তু তা ব'লে আজকের মত সমৃদ্ধির ঐশ্বর্যও এত বেশি আত্মপ্রকাশ করে নি।

এ বাড়ির কর্তা এখন সমৃদ্ধিশালী—আজকের বাজারেও বেশ দু'হাতে রোজগার করেন। তা না ক'রলে সংসারটাকে এত ঝকঝকে রাখা যায় না—বাড়ির ফারনিচারের শোভাও বাড়ানো যায় না।

এই বাড়িতেই অনেকগুলি দিন আমার কেটে গেছে। সেদিনগুলির কথা ভাবছিলাম, আর ভাবছিলাম আজকের এই বাস্তব পরিবেশকে।

নির্জন ঘরখানিতে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম—গৃহস্বামিনী এখন ব্যস্ত। ছেলেমেয়েরা স্কুল যাবে, স্বামীরও অফিস যাবার সময় উপস্থিত হ'য়েছে—বাইরে সোফার মোটর নিয়ে অপেক্ষমান।

জাপানি ওয়াল-ক্লকটা একটা ছন্দের গুঞ্জনধ্বনি তুলে সময়ের গতিতে এগিয়ে চ'লেছে। বাইরেও বিপুল গতির জোয়ার। আমার এখন অখণ্ড অবকাশ। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছি—দীর্ঘদিন পরে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

ঘরের পর্দা সরিয়ে জীবনদা প্রবেশ ক'রলেন। প্যান্ট কোটে পুরাদস্তর সাহেব। মুখে হাভানা সিগার!

—কী হে, সমীর যে! হঠাৎ কী মনে ক'রে?

আসন থেকে উঠে জীবনদা'কে প্রণাম করলাম।

—ছ'দিনের ছুটিতে কলকাতায় এসেছি। তাই এলাম আপনাদের সঙ্গে দেখাশুনা ক'রতে।

আমার কথা শুনে জীবনদা' অভিমত প্রকাশ ক'রলেন, তা বেশ! তুমি ব'সো—আমার আবার একটা জরুরি কাজ আছে; এক্ষুণি অফিস যাওয়া দরকার।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। হাভানার ধোঁওয়া ছড়াতে ছড়াতে জীবনদা চ'লে গেলেন।

নির্জন ঘরখানির মধ্যে আবার একলা আমি। সঙ্গতিপন্ন আত্মীয় পরিবারের ফারনিচারগুলি ব'সে ব'সে দেখছিলাম। নাঃ, অভাবের কোন লক্ষণই নেই, বরঞ্চ উপচে পড়া আভিজাত্যই যেন সব দিক থেকে আত্মপ্রকাশ ক'রছে।

বাড়ির কর্তার পর ছেলেমেয়েরাও স্কুলে গেল। তারা কেউই আমার পরিচিত নয়। দশবছর আগে তাদের জন্মগ্রহণ হয় নি। তারাও আমাকে চেনে না। তবুও ফ্রকপরা একটি মেয়ে পিঠে বেণী দুলিয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হ'লো।

—ম্যামি ব'লছেন, আপনি একটু ব'সুন!

মেয়েটির কথায় হঠাৎ যেন ধাক্কা খাই—ম্যামি? ম্যামি কী? আমার প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলে—ম্যামি কাকে বলে জানেন না। ম্যামি মানে মা!

উচ্চারণটা আমি শুদ্ধ ক'রে জানিয়ে দিই। মেয়েটির তাতে কোন আগ্রহ নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি?

মেয়েটি উত্তর দিলে, ডাক নাম হ'চ্ছে রোজি—আর ভালো নাম শিপ্রা।

রোজির কথায় আনন্দপ্রকাশ করি—শিপ্রা নামটি বেশ। এ নাম তোমায় কে দিয়েছেন?

—আমার মামা। মামা আবার কবি কিনা তাই।

—আর রোজি?

আমার কথার প্রত্যুত্তরে রোজি বললে, আমার আন্টি। ছেলেবেলায় আমি রোজের মতন দেখতে ছিলাম কিনা তাই!

—রোজ?

—বা, তা বুঝি জানেন না। রোজ হ'চ্ছে গোলাপ ফুল।

রোজির কথায় আমি হেসে উঠলাম।

—যাই এইবার, এক্ষুণি স্কুলের গাড়ি এসে প'ড়বে।

—কোন স্কুলে পড়ো?

আমার কথার উত্তরে রোজি ব'ললে, সেণ্ট মরেটো!

—কোন ক্লাস?

রোজি ব'ললে, ক্লাশ ফোর!

রোজি চ'লে গেলে ভাবছিলাম এই পরিবারটির কথা। দশবছর আগে এ পরিবারে এদিন ছিল না।

আজকের সমৃদ্ধির মাঝখান থেকে হঠাৎ যেন একটা কুশ্রী দৈন্যের সুস্পষ্ট চেহারা দেখতে পাই ঘরের আনাচে-কানাচে দশবছর আগে যার কোন আভাসই ছিল না।

পিসিমা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছেন, দিনরাতই পূজা-অর্চনা আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন ইদানিং। ভ্রাতুষ্পুত্রের আগমন এখনও হয়ত লক্ষ্য করেন নি। তা না করুন! দীর্ঘদিন পরে এ বাড়িতে এলেও তাঁর জন্যে আগ্রহ আমার ততখানি নয়। এ বাড়িতে বিশেষ ক'রে এসেছি রাঙা বৌদিকে স্মরণ ক'রেই। রাঙা বৌদি যখন প্রথম এ বাড়ির বধূ হ'য়ে আসেন তখন খাতিরটা জ'মেছিল তাঁর আমার সঙ্গেই বেশি ক'রে। তাঁর মিষ্টি স্বভাব, সুশ্রী চেহারা, আর বর্ণ-ঔজ্জ্বল্যই সকলকে মুগ্ধ ক'রেছিল—বিশেষ ক'রে আমাকে। আমি তাঁর নামকরণ ক'রেছিলাম—রাঙা বৌদি!

মিষ্টি হেসে নববধূ তাতে সায় দিয়েছিলেন; আর ব'লেছিলেন, বিয়ের আগে যখন শুনেছিলাম তোমার দাদা বাপ-মায়ের এক ছেলে তখন বড্ড দুঃখ পেয়েছিলাম।

—কেন? পিসিমার মেয়েও তো আছে।

আমার কথায় রাঙা বৌদি ব'লেছিলেন, ননদের চেয়ে দেওরই বেশি আপন হয়—তা বুঝি জানো না?

রাঙা-বৌদির কথায় নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমারও অপর কোন বৌদি না থাকায় বস্তু একটা অভাব ছিল।

রাঙা-বৌদি খুসি মনে আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রেছিলেন, তোমাকে পেয়ে তাই দুঃখ আমার মিটলো। তুমি আমার মিষ্টি ঠাকুরপো!

—সত্যি বলছো তো?

—হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে।

রাঙাবৌদির কথায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর বিয়ের পরও কিছুদিন আমি তাঁদের বাড়ি থেকে পড়াশুনা করেছিলাম, তখন তাঁর সদয় ব্যবহারকে আজও আমি ভুলতে পারি নি।

পিসেমশাই ছিলেন, দাবেক কালের মনোভাবাপন্ন মানুষ। আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে থাকতে ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে বিলাতি মাটির অফিসের বড়বাবু, মনটা ছিল তাঁর দরাজ। অভাবের তাপ কখনও সহ্য করেন নি। আর পিসিমা হচ্ছেন ধর্ম-বাতিকগ্রস্ত নিতান্ত সাধাসিধে স্ত্রীলোক, অন্তরভরা তাঁর সদয়-দাক্ষিণ্য এবং স্বজন-প্রীতি। স্বামী-স্ত্রীতে তাই সংসার-জীবনযাত্রায় অকৃপণ ছিলেন। ভাঁড়ারের চাবি ছিল খোলা, হৃদয়ে ছিল উদারতা। নিকট থেকে দূরের জন পর্যন্ত কেউই পর নয় তাঁদের। তাই সব সময়েই লোক-জনে ভরা ছিল তাঁদের সংসার। বহু পোষ্য প্রতিপালিত হ'ত তাঁদের কল্যাণে। আমাদের অবস্থা তখন বিশেষ ভালো নয়। বাবা দেশে জমিদার সেরেস্তার কাজ ক'রতেন। স্বল্প আয়ে কোন রকমে সংসার-যাত্রা নির্বাহ হ'ত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে পিসিমার বাড়িতে বছর চারেক থেকে আমি পড়াশুনা ক'রেছিলাম। দৈন্যের সংসার থেকে স্বচ্ছলতার মধ্যে এসে মন বেশ প্রসারিত হ'য়েছিল—বিশেষ ক'রে রাঙাবৌদির সস্নেহ ব্যবহার অন্তরকে পরিপ্লাবিত করে রেখেছিল। বি-এ পাশ ক'রে বাঙলার বাইরে চাকরি পাওয়ায় রাঙাবৌদির চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠেছিল,

আমাদের ছেড়ে থাকলে কেমন ক'রে ভাই ঠাকুরপো! তাঁর পরিহাসের সুরটা আজও কানে বাজে, রাঙা বৌ পেয়ে কিন্তু রাঙাবৌদিকে ভুলো না যেন!

অনেকক্ষণ পরে এলেন রাঙাবৌদি।

দশ বছর পরে এ বাড়ির চেহারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাঙাবৌদিরও পরিবর্তন ঘটেছে। সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে গড়নের বধূর দেহেই এখন স্থূল মাংসের ভার। সংসারের কর্ত্রীত্বের সাথে ভারিক্কী চাল-চলন। আমাকে আহ্বান অবশ্যই জানালেন, এসো ঠাকুরপো! বাড়ির খবর সব ভালো তো?

—হ্যাঁ। রাঙাবৌদির কথায় সংক্ষিপ্ত জবাব দিই।

—তারপর, কলকাতায় কবে আসা হ'ল?

—আজ এসেছি, এইমাত্র!

আমার কথা শুনে হয়ত তত খুসি হ'লেন না তিনি। কেন না, চোখে মুখে তাঁর কোন স্বজন-প্রীতির উল্লাসের চিহ্ন দেখা গেল না।

পুরাতন দিনের মধুর সম্পর্কের জের টেনে বলি, মিষ্টি ঠাকুরপোকে মনে আছে তো?

—মিষ্টি ঠাকুরপো! সে আবার কে?

রাঙাবৌদির কথায় আহত হ'য়ে বলি, ছিল একজন। দশ বছর আগে, এই বাড়িতেই।

রাঙাবৌদি সহজভাবে বললেন, ও তাই বল। তা, তাকে আবার মনে থাকবে না কেন? এই তো চোখের সামনেই জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ভারী মাংসল চেহারার মধ্যেও হৃদ্য রসানুভূতি একেবারে নিঃস্বান্ত হ'য়ে যায় নি তা'হলে! রাঙাবৌদির কথায় আশ্বস্ত হই।

—এত মোটা হলে কেমন ক'রে এই দুর্দিনের বাজারে?

আমার কথায় যেন মনের সুর ধরা প'ড়েছে। রাঙা-বৌদি আক্ষেপ ক'রে বললেন, দুর্দিনের কথা আর ব'লো না ভাই। যা দিনকাল প'ড়েছে, ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না।

—তোমাদের আবার দুর্দিন কিসের? দাদা তো ভালো মাইনেই পান।

—কিন্তু পুষ্টি তো কম নয়। একলার রোজগারে কত আর চলে বলো?

রাঙাবৌদির কথায় বিস্মিত হ'লাম—তোমার আবার পুষ্টি কোথায়? দু'টি ছেলে আর তিনটে মেয়ে—তোমরা দুই কর্তা গিন্নী আর পিসিমা।

রাঙাবৌদি বললেন, তা হ'লে আর ভাবনা কী ছিল! তোমার পিসেমশাই তো দাতাকর্ণ ছিলেন। যা রোজগার ক'রেছেন দু'হাতে দান-খয়রাত ক'রে গেছেন। ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনীদের কথা ছেড়ে দাও—নিজের স্ত্রীর জন্যে পর্যন্ত কোন সঞ্চয় করে যান নি। না একটা ইনসিওর, না কিছু নগদ টাকা। তার ওপোর বড়দির সমস্ত সংসারটা পর্যন্ত এখন আমাদের ঘাড়ে—তোমার দাদা তো ভেবে ভেবেই আধখানা হয়ে গেছেন।

রাঙাবৌদির কথাগুলি বজ্রাহতের ন্যায় শুনি। বড়দি অর্থাৎ পিসেমশাইয়ের একমাত্র আদরের কন্যার কয়েক বছর পূর্বে স্বামী বিয়োগ ঘ'টেছে—সে খবর অবশ্য আমি শুনেছিলাম। কিন্তু সপরিবারে তিনি রাঙা-বৌদির স্বামীর অন্নদাসী হ'য়েছেন এমন মর্মান্তিক ঘটনার কথা আমি শুনি নি।

রাঙাবৌদি সবিস্তারে ব'লে চ'ললেন—এই দুর্দিনের বাজারে বড়দির সংসার চালাতে কত ক্ষতিগ্রস্তই না হ'চ্ছেন তিনি।

কথার মাঝে পিসিমা এসে হাজির হ'লেন। তাঁর সেই সৌম্য প্রশান্ত মূর্তি আর নেই, বিষাদের কালিমা সর্বাঙ্গে। আর কথাও বলেন অত্যন্ত কম।

তাঁকে প্রণাম ক'রতে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন। সাংসারিক কুশলাদির প্রশ্ন করে তিনি তাঁর ঠাকুর সেবা নিয়েই ব্যস্ত হ'তে চ'ললেন। খাবার সময় আমাকে বললেন, যে কদিন কলকাতায় থাকো, এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করো।

পিসিমার কথায় আমি বললাম, বেশিদিন কেন একদিনও থাকবার উপায় নেই—অফিসের খুব একটা জরুরি কাজ নিয়ে এসেছি। আজকের রাত্রের ট্রেনেই আমাকে যেতে হবে।

পিসিমা আর কিছু মন্তব্য প্রকাশ করলেন না—নীরবে তিনি ঘর ছেড়ে আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রাঙাবৌদি টিপ্পনি কাটলেন, রাতদিন শুধু ঠাকুর আর ঠাকুর। সংসারের কোনদিকেই আর দেখেন শোনেন না।

রাঙাবৌদির এ অভিযোগের প্রত্যুত্তরে রহস্য ক'রে বলি, এতদিন দেখে এসেছেন তো। এখন যোগ্যকর্ত্রীর হাতে সংসারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন।

স্থূল দেহে মানসিক বৃত্তিও স্থূল হয়ে এসেছে রাঙাবৌদির। আমার এ শ্লেষের তাৎপর্য তাই তিনি অনুভব ক'রতে পারেন না। কখনও আত্ম-প্রশংসায় স্ফীত হ'য়েই বলেন, আমি ভাই একলা মানুষ, কতদিক আর সামলাই বলো?

—তুমি একাই একশো; তা না হ'লে কী আর পিসিমা এমন নির্লিপ্ত আর উদাসীন হ'তে পারেন?

—এই দেখো না ভাই, কথায় কথায় মস্ত থেকে তোমার খাবারের ব্যবস্থাই করা হয়ে ওঠে নি এখনও। তুমি একটু বসো, আগে একটু চা আর জলখাবার এনে দিই। মায়ের তো এগুলোও দেখাশোনা করা উচিত। তুমি তাঁর আপন ভাইয়ের ছেলে—কতদিন বাদে এলে!

রাঙাবৌদি প্রস্থান করতে উদ্যত হ'লে আমি বাধা দিই, এখন আর কিচ্ছু খেতে পারবো না বৌদি। সত্যি বলছি এইমাত্র খেয়ে আসছি।

আমার কথায় কান দিলেন না রাঙাবৌদি। খুসি মনে তিনি আমার আহারের তদ্বিরে প্রস্থান ক'রলেন।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো অনুজ্জ্বল ছবি। ছাচ্ছন্যমান সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী পিসিমা; কিন্তু কোথাও তার জন্যে এতটুকুও ব্যক্তিত্বের গরীমা কিংবা গর্বের অভিপ্রকাশ নেই।

দু'হাতে রোজগার করেন পিসেমশাই—তখনকার দিনের মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু! কিন্তু কতটুকু সঞ্চয় হয় তা থেকে নিজস্ব বিলাস কিংবা ব্যসনে! স্বার্থবুদ্ধি এতটুকুও মাথা চাড়া দেবার অবকাশ পায় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়। কোন দুঃস্থ পরিবার কন্যাদায়গ্রস্ত—পিসেমশাইএর সঙ্গে পিসিমার তার জন্যে নিভৃত আলোচনা। ডান হাতের দান বাঁ হাত জানতে পারে না। পয়সা অভাবে কার ছেলে প'ড়তে পারছে না—সে চিন্তা পিসেমশাই, পিসিমাই ক'রে থাকেন।

তাঁদেরই পুত্র এবং পুত্রবধূ কেমন ক'রে এমন অমানুষ হয়? বিধবা পিসিমাকে আজ তাই ঠাকুরঘরেই সংসার-নির্লিপ্ত হ'য়ে আত্মনিমগ্ন থাকতে হয়। ইহকাল অপেক্ষা পরকালেরই চিন্তা ক'রতে হয়। আর তাঁর বিধবা কন্যাকে শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ভিক্ষার ঝুলি পাততে হয় এই হৃদয়হীন অমানুষদের দরবারে।

—এটুকু খেয়ে ফেল ঠাকুরপো! রাঙা বৌদির কথায় চমক ভাঙে। একটি রেকাবীতে দুটি মিষ্টান্ন, আর এক গ্লাস জল।

সে দিনকাল তো আর নেই ভাই। কত সাধ জাগে তোমাদের সকলকে নিয়ে আদর যত্ন করি। এ বাড়ীতে কত ধুমধাম লোকজন—সর্বদাই ছিল উৎসব আর আনন্দ।

রাঙা বৌদির একথায় আগ্রহের সুরে প্রশ্ন করি, সে সব দিনের কথা তোমার মনে আছে বৌদি?

—তা আর থাকবে না? এই তো মাত্র বছর কয়েক আগের কথা। তখন দিনকালই ছিল অন্য রকম। সস্তা-গণ্ডার বাজার—এক হাতে ভর্তি ক'রে এনে আর এক হাতে ব্যয় করতে লোকের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগতো না। আজকের মতন দুর্দিন তো তখন আর আসে নি। রাঙা বৌদি চ'লে গেলেন চা আনতে।

সুসজ্জিত ঘরখানির মধ্যে হঠাৎ যেন দুর্দিনের কালো মেঘের ঘন সঞ্চার দেখতে পাই—এখনি হয়ত ঝড় উঠবে।

সবার অলক্ষ্যে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে সদর রাস্তায়। রাঙা বৌদির মন এতক্ষণে হয়ত মিষ্টি দু'টির অপচয়ের বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।

তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দির

নির্মল দত্ত

তাঞ্জোর নামের সঙ্গে ইতিহাসের একটা সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধ যে কতখানি ওতপ্রোতভাবে জড়িত তা বোঝা যায় তাঞ্জোরের মন্দির দেখতে গেলে। মাদ্রাজ সহর থেকে ২১৮ মাইল ট্রেণে দক্ষিণ দিকে গেলে তাঞ্জোরে পৌঁছানো যাবে। তাঞ্জোরের মন্দির দুর্গের মত প্রাচীর দিয়ে ঘেরা এবং বাইরের দিকে নীচেই প্রাচীরের ধারে ধারে একটী পড় বা পরিখা তাকে চক্রাকারে ঘিরে আছে। দেখলে মনে হয়, মন্দিরকে বিধর্মীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যেই হয়ত এমনি দুর্গাকারে নির্মাণ করতে হয়েছিল। অবশ্য তাঞ্জোর সহরটী ভাল ক'রে ঘুরলে এই কথাই মনে হয় যে, পূর্বে সমস্ত সহরটাই প্রায় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ছিল। তার দুয়ারের চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে। দুর্গ ভেঙ্গে তাইই ওপর গড়ে উঠেছে ভবপর। তবে মন্দির আর প্রাসাদের কয়েক অংশ এখনও বিদ্যমান। দুয়েতে আর ভাবিয়ে মন্দিরটী অপূর্ব।

পাথরের তৈরী এই মন্দিরের কারুকার্য দেখে বিস্ময় জাগে। মন্দির গাত্রে বিভিন্ন মূর্তির গায়ে খোদাই দেখলে প্রাচীন শিল্পী ও তার শিল্পচাতুর্যের প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ভারতের সর্বপ্রথম পাথরের তৈরী সুবৃহৎ মন্দির নির্মিত হয়েছিল কাঞ্চিপুরম-এ—পল্লব রাজাগণ কর্তৃক ব'লে ধরা হয়। তাঞ্জোরের মন্দির ঠিক এই মন্দিরের পরেই। প্রধান মন্দিরের চারিপার্শ্বে আরও কয়েকটী মন্দির আছে। তার মধ্যে সুব্রহ্মণ্য মন্দির, আয়ন মন্দির, কার্ত্তিকেয়র মন্দির, আরুমুখম্ মন্দির প্রভৃতি প্রধান। এমন কি, বিরাটাকার নন্দী অর্থাৎ বলদও দ্রষ্টব্য। পাথরের তৈরী এই নন্দীর ওজন প্রায় ২৪ টন, উচ্চতায় ১২ ফিট, দৈর্ঘ্যে ১৯½ ফিট ও প্রস্থে ৮½ ফিট। মন্দিরগুলি পাথরের তৈরী এবং পাথর কুঁদে মন্দির গাত্রে যে সকল মূর্তি ও কারুকার্যাদি করা হয়েছে তা সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। মন্দির গাত্রের নিম্নভাগ বরাবর

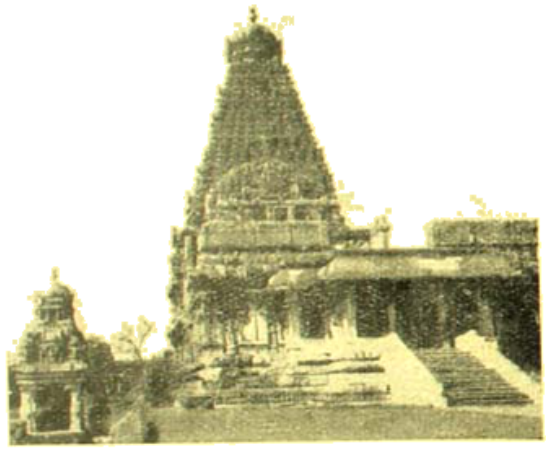

বৃহদীশ্বর মন্দির

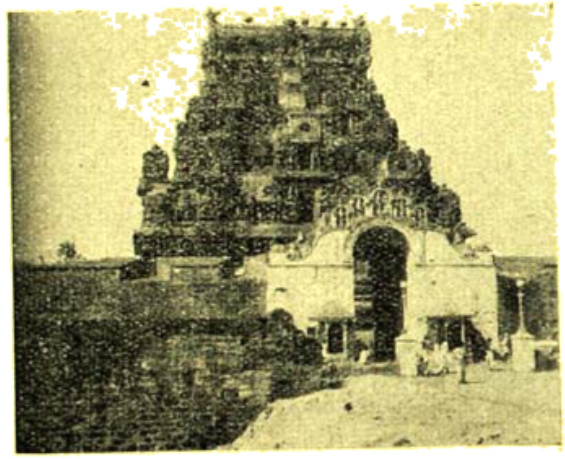

বৃহদীশ্বর মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ

মারাঠা ভাষায় শিলালিপি লিখিত আছে। এই শিলালিপি মারাঠারাজ শাহজীর রাজত্বকালেই লিখিত হয়েছে ব'লে জানা যায়। এই শিলালিপিতে মারাঠী রাজাদের ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এই লেখাগুলি একত্রিত ক'রে ছাপিয়ে বইয়ের আকারের ১১০ পাতা হয়েছে এবং তামিল ও অন্যান্য ভাষায় অনুবাদও করা হয়েছে। মন্দিরটী সরকারী প্রাচীন মনুমেন্ট আইনানুযায়ী (Archaeological Department) সংরক্ষিত করা হয়েছে এবং হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ সমিতি (Hindu Religious Endowments Board) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

মন্দিরের প্রবেশ পথেই চোখে পড়বে প্রস্তরনির্মিত একটী ফটক—যার একদিকে বিনায়ক ও অন্যদিকে কার্ত্তিকেয় মূর্তি আছে। এর পরে আর

একটী ফটক আছে যা কারুকার্যে প্রথমটার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। দু'টো প্রবেশ-পথই এক একটা মন্দিরের আকারের বললেই চলে। আর দ্বিতীয়টী কারুকার্যে প্রথম প্রবেশ পথের চেয়েও উন্নততর। দ্বিতীয় ফটকই মন্দিরে প্রবেশের সদর ও এইখানে রক্ষীও আছে। এর পূর্ব ও দক্ষিণে উঠানের দিকে এক পার্শ্বে যজ্ঞশালা, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর ও খাবার ঘর প্রভৃতি ছিল দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রবেশ-পথের পরেই বিরাটাকার সেই নন্দী—একটী সম্পূর্ণ পাথর থেকে কেটে তৈরী। তারই পাশ দিয়ে একটু বেঁকে গেলেই ও পাশে প্রধান মন্দিরে ওঠা যাবে। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে উঠতে প্রথমেই চোখে পড়বে দরজার দু'পাশে মন্দির গাত্রে দ্বারপালের মূর্তি। স্থানীয় রক্ষকের নিকট থেকে জানা যায় যে মন্দিরের আয়তন—৭৪২ ফিট বৈর্ঘে ও ৪০০ ফিট প্রস্থে এবং রাজারাজ চোলের ১৯ থেকে ২৪ বৎসর বয়সের মধ্যে নির্মিত।

দ্বিতীয় ফটকের গাত্রে পাথরের তৈরি একটি দ্বারপাল

মন্দিরের উচ্চতার দিকে তাকালে ইচ্ছে হবে লম্বতে কত ফিট এর উচ্চতা। খোঁজ নিলে জানা যাবে ২১৬ ফিট অর্থাৎ বাড়ী তৈরী হিসাবে ১৪ তলা। প্রাচীর—বেষ্টনীর বাইরে গিয়ে যে কোনও দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, সব দিক থেকেই এমন কি, অনেক দূর থেকেও মন্দিরকে দেখা যাবে। মন্দিরের মেঝে ৯৬ বর্গ ফিট। এ ছাড়া মন্দিরের পূর্ব-দেশের বর্গাকার ভাগ যার ওপর অবস্থিত সেটা ৮০ টন ওজনের একটা স্ফটিক পাথর এবং এই পাথরটী তাঞ্জোরের চার মাইল উত্তরের একটী গ্রাম—'সারুপারম্' থেকে আনা হয়েছিল ব'লে জানা যায়। পাথরটী "আলাণ্ডী" নামে একজন বৃদ্ধা মহিলার ছিল এবং পাথরের বদলে রাজার কাছ থেকে বৃদ্ধা 'আলাণ্ডী পুকুর' ও 'আলাণ্ডী বাগান' লাভ করে। এই পাথরের ওপর ১২½ ফিট উচ্চের একটী তামকলস আছে। এর চারদিকে যে নন্দী আছে তা নীচের নন্দীর চেয়ে ছোট।

মন্দির গাত্রের দক্ষিণ দিকে বিনায়ক মহাবিষ্ণু, ভিক্ষাটন, দুর্গাদেবী, অর্দ্ধনারীশ্বর, ব্রহ্মা, মার্কণ্ডেয়, নটরাজ প্রভৃতির মূর্তি,—পশ্চিমদিকে অর্দ্ধনারীশ্বর, উত্তরদিকে গঙ্গাধর, কল্যাণসুন্দর, মহিষাসুরমর্দ্দিনী প্রভৃতি মূর্তি এবং এর একটু উঁচুতে চারটী মনুষ্য মূর্তি আছে। এই চারটী মনুষ্য মূর্তির মধ্যে একজন ইউরোপীয়ানের ন্যায় মূর্তিও আছে। মনে হয়, মন্দির নির্মাণের পরবর্তী যুগে হয়ত এই মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। অনেকে চোল রাজত্বের পরে নায়কদের রাজত্বকালে নির্মিত ব'লে অনুমান করেন। কেউ কেউ একে মার্কোপোলোর মূর্তিও ব'লে থাকেন।

মন্দিরের ভেতরে শিবলিঙ্গ হচ্ছে প্রধান দেবতা। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরা প্রধানতঃ শৈবধর্মাবলম্বী। প্রায় সব মন্দিরেই তাই শিবলিঙ্গ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক মন্দিরে অবশ্য বিষ্ণুমূর্তিও দেখা যায়।

তাঞ্জোরের এই মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ আছে তার গৌরীপাটের পরিধি ৫৪ ফিট ও উচ্চতা ৯ ফিট এবং লিঙ্গ ৯ ফিট উচ্চ ও পরিধি ২৩½ ফিট। শিবলিঙ্গের একদিকে সূর্য ও অন্যদিকে চন্দ্র এবং দরজার কাছাকাছি

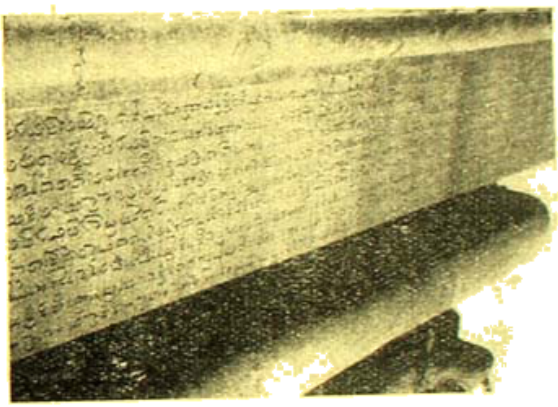

মন্দির গাত্রে মারাঠা ভাষায় লিখিত মারাঠা ইতিহাসের কিয়দংশ

আছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই শিবলিঙ্গ বা শঙ্কর মূর্তিকে আরও বহু নামে অভিহিত করা হয়। এর একটী নাম 'রাজরাজেশ্বরম্'—এ ছাড়াও একটী নাম 'দক্ষিণমেরুবিটঙ্গম্'। এখন অবশ্য শঙ্কর বা মহাদেবকে বৃহদীশ্বর ও পার্বতীকে বৃহন্নায়কী নামে অভিহিত করা হয় এবং মন্দির 'বৃহদীশ্বর' মন্দির নামেই পরিচিত।

তাঞ্জোরের এই বৃহদীশ্বর মন্দির নির্মিত হওয়ার পূর্বে চোল রাজারা 'থিয়াগরাজ' নামে দেবতাকে পূজা করতেন এবং এজন্য প্রতিদিন 'থিরুভারুর' নামক স্থানে যেতে হ'ত। তারপর প্রথম রাজারাজচোল নিজেই এই মন্দির নির্মাণ ক'রে দিলেন। এর মধ্যে অবশ্য তাঁর দু'টো উদ্দেশ্য ছিল—একটী দেবতার প্রতি ভক্তি এবং অন্যটী পূর্বপুরুষ মুত্তুকুমনের বীরত্বের স্মৃতি-রক্ষা। এ দু'টীর নিদর্শন স্বরূপ নির্মিত হ'ল এই মন্দির। তারপর মন্দিরে থিয়াগরাজের মূর্তিও হ'ল তৈরী।

প্রধান মন্দিরের দক্ষিণদিকে অবস্থিত শিবলিঙ্গ বিশিষ্টও মন্দির প্রাকারের ভেতর দিকের স্থানে ছোট বড় আরও ১০৮টী শিবলিঙ্গ আছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ইতিহাসজ্ঞদের আবিষ্কারে পূর্বে চোল, নায়েক ও মারাঠা রাজাগণ যখন এখানে রাজত্ব করেছিলেন, তখন প্রত্যেকের আমলেই মন্দিরের কিছু না কিছু সংস্কার বা পরিবর্তন হয়েছে। মন্দিরের স্থাপত্যবিদ্‌ মাত্রই দেখে মনে হয় যে, যে রাজত্ব যখনই আসুক না কেন, তাঁহাদের মন্দিরকে কোন রাজাই অবহেলার চোখে দেখেন নি। অথচ শ্রীরঙ্গমের বেশী মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বে এক ভক্ত কর্তৃক নির্মিত হয়েছে। শ্রীরঙ্গমের ব্রাহ্মণ হ'য়েও কামারের কাজ করতেন এবং বিয়াটাঙ্গায় একটী মূর্ত্তিশিল্প তৈরী ক'রে যেখানে কঠোর তপস্যায় বসেছিলেন সেখানেই এই দেবীটী নির্মিত হয়েছে। প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গণপতির যে মূর্ত্তি আছে তা দ্বিতীয় পারকল্পী কর্তৃক নির্মিত। উনবিংশ শতাব্দী ... নায়েক রাজাগণও মন্দিরের অনেক অংশ নূতন নির্মাণ বা পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধিত করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আয়ন' মন্দিরে। স্বামী 'অলগুম' মন্দির ছোট হ'লেও এর কারুকার্য উপেক্ষণীয় নয়। এমন কি, মন্দিরে ঘোড়ার মূর্ত্তিও অতি সুন্দর। পঞ্চধাতুর নির্মিত নটরাজের যে মূর্ত্তি আছে তা দর্শকমাত্রেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। গ্রীষ্মকালে মন্দিরে বিশেষ বিশেষ উৎসব হ'ত এবং এই উৎসবের সময় নৃত্যপটীয়সীদের নাচও হত।

প্রধান মন্দিরের ভিতর সকল সময় এমন একটী আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে যে, দর্শনাকাঙ্ক্ষীর মনে পবিত্র ভাব ও ভক্তির উদ্রেক করে। ন'শো বছরের অধিককাল পূর্বেও যে মন্দির একদিন ভারতবাসীর কাছে পুণ্য ও পবিত্র স্থানরূপে পরিচিতি পেয়েছিল, আজ সেদিনের সেই সমারোহ নেই—নেই কোন নব নব প্রেরণার আয়োজন। কিন্তু আজও সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীর সমাগমে সে স্থানের সকল মহিমা সার্থক হ'য়ে আছে।

শিশুমনোবিদ্যা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

প্রবাদ আছে "শিশু মানুষের পিতা"; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে শিশুদের স্বাভাবিক প্রতিভার প্রতিপালন করতে হয়না; উপরন্তু তাদের মনোবিকাশের দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়না। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ, দেশবাসীর অজ্ঞতা, অবহেলা ও অসাবধানিতা। শুধু ইহাই নয়—কেহ এই বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তাহাকে নানা বিদ্রূপবাক্য দ্বারা বধির, লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছে। শুনিয়াছি—"মহাশয় আমি তিন ছেলের বাপ, হরিবাবুর দুই ছেলে আছে; আপনার কিন্তু জানিনি শিশু পালন সম্বন্ধে! আর আপনি কোন সন্তানের পিতা না হয়েই শিশু মনোবিদ্যা সম্বন্ধে বলছেন; আশ্চর্য্য।"

আবার কেহ বলিয়াছেন—"কি করলে আমার সন্তানের ভাল হবে সেটা আমি ভাল বুঝি; আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। কথাগুলি অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে যে, সকলেই যদি শিশু পালনে অভিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে দেশের (শিশুদের) এতখানি অধঃপতন হইত না। আমার মন্তব্য শুনিয়া অনেকে রুষ্ট হইবেন, হয়ত অভিশাপ দিবেন। কিন্তু কি করিব, আমি যেটুকু শিখিয়াছি, তাহা হইতে জানি যে প্রত্যেক ব্যক্তির, প্রত্যেক যুবকের ও প্রত্যেক শিশুর হাবভাব, কথাবার্ত্তা, চালচলন ও আচারব্যবহারের জন্য দায়ী তাহার পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন ও গুরুজনবৃন্দ। বিশ্বাস করি—কোন পিতামাতাই চাহেন না যে তাঁহার সন্তান খারাপ হয়;—প্রত্যেকেই আশা করেন, কৃতী সন্তানের "জনক-জননী" হইতে! কিন্তু লালন-পালনের অনভিজ্ঞতার জন্য, তাঁহারা নিজের সন্তানকে—সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীকে নিরন্তর নিয়া যাইতেছেন। এই অবনতির গ্রাস হইতে বাঁচাইতে পারে কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই।

ম্যালেরিয়া বা কোন রোগের নিবারণ কল্পে যখন কোন সমিতি (কমিটি) গঠিত হয়, তখন সেই রোগের অভিজ্ঞ ডাক্তারদের লইয়াই সমিতি গঠিত হয়, অনভিজ্ঞ রোগাক্রান্ত রোগীদের নিয়া নহে। অথবা রোগ নিবারণের উপদেশ ডাক্তারদের নিকটই লয়েন—রোগীদের নিকট নহে। সেইরূপ আপনারা বহু সন্তানের পিতামাতা হইতে পারেন, কিন্তু শিশু পালনে অভিজ্ঞ নাও হইতে পারেন, এমনকি শিশুর মনোবিকাশ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা নাই এখনও হইতে পারে। ইহার জন্য বলিতেছি—লজ্জা দূর করিয়া দেশকে বড় করিতে সচেষ্ট হন, সহযোগিতা করুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অনেককে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে, শিশুদের উন্নতি করিতে গিয়া; তথাপি, কেন শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে লিখিতেছি? প্রশ্ন হইতে পারে। উত্তরে বলিব—প্রথমতঃ দেশকে বড় করিতে হইলে, পৃথিবীর সম্মুখে দেশকে ধরিতে হইলে, আমাদের সকলের প্রধান কর্ত্তব্য ভাবী ভারতবাসীদের উন্নতি করা। আমার মনে হইয়াছে—দেশবাসী এখন স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, কোন বিষয়ই তাহারা হাল্কাভাবে গ্রহণ করিবে না। অধিকন্তু কোন মতামত দিবার পূর্ব্বে তাহারা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া লইবে। দ্বিতীয়তঃ "শিশু মনোবিদ্যা"র উপর বিদেশী ভাষায় বহু পুস্তকও রহিয়াছে, কিন্তু বাংলা-ভাষায় ইহার অভাব, যদি আমার অল্প বিদ্যার সাহায্যে এই অভাব কিছুটা পূরণ করিতে পারি, এই বিশ্বাস নিয়া সাহস করিয়া লিখিতে বসিয়াছি।

কোঠাবাড়ী তৈয়ারীর প্রারম্ভে ভিত পোতা হয়। ভিত প্রস্তুতের

কালে প্রথর দৃষ্টি রাখা হয়, কারণ বাড়ীর সৌন্দর্য্য, আয়ু ভিতের মজবুতির উপরই নির্ভর করে। সেইরূপ জাতির ভিত হইতেছে "শিশু", এই কারণে তাহাদের প্রতিপালনের সময়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকের ধারণা, শিশুদের পালন করা সোজা, বয়স্কদের বেলায় কঠিন। এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ অসত্য। বাড়ীর ভিত তৈয়ারীর সময়ই অতি পরিশ্রম করিতে হয়, আর—একটির উপর একটি ইট বসাইয়া দিলেই বাড়ী তৈয়ারী হয়। ভিত প্রস্তুতের মত, মাটি কাটিতে কিংবা ছুরমুশ পিটিতে হয় না। সেইরূপ শিশুদের পালন করা কঠিন, বয়স্কদের উপদেশ দেওয়া সোজা। মনে রাখা কর্ত্তব্য, শিশু বয়সের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার প্রভৃতিই সারা জীবনে প্রতিফলিত হয়। বয়ঃবৃদ্ধির সহিত মানসিক আবেগের দমন ও প্রকাশের পদ্ধতি কেবল পরিবর্ত্তিত হয় শিক্ষানুপাতে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া পৃথিবীতে আসে। সহজাত সকল প্রবৃত্তি ভূমিষ্ঠ হইবার পরই বিকশিত হয় না। নাড়িকোষ, স্নায়ুসংযোগ, পেশী ও ইন্দ্রিয় যন্ত্রের পরিপুষ্টির উপর সহজাত প্রবৃত্তির বিকাশ নির্ভর করে। পরিপুষ্টি স্বাভাবিক হইলে বয়োবৃদ্ধির সহিত শিশুর বিভিন্ন প্রবৃত্তি ক্রমে পূর্ণ বিকশিত হয়। এখানে বলা প্রয়োজন যে সহজাত প্রবৃত্তি তাহারই নাম—যে প্রবৃত্তি জন্মগত। শিশুদের বিষয়ে জানিবার প্রবৃত্তি আমাদের অত্যধিক। সেই কারণে নানা বিচিত্র প্রশ্ন আমরা নিজেদের করিয়া থাকি। কখন ভাবি—কত বয়স পর্য্যন্ত শিশু বলা হয়? আবার কখন মনে হয়—কি কি প্রবৃত্তি নিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করে? কু-প্রবৃত্তি কি উপায়ে সংযত করা সম্ভব? সদভ্যাস কি উপায়ে গঠিত হয়? কি প্রকারে স্মৃতি-শক্তি (শিশুর) বৃদ্ধি করা যায়? কখন হইতে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত?—প্রভৃতি নানা প্রশ্ন মনে আসে। একে একে সকল প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রকারেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা সবই ভুল নহে; আবার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহা বলিয়াছেন অথবা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন নহে। আমার এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ আপনারা নিজেরাই চেষ্টা করিয়া বাহির করিতে পারেন। অথবা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আপনাদের সময় নষ্ট করিতে চাহিনা। এই উক্তির উদ্দেশ্য—যে কথা আমরা বর্ত্তমান মনোবিদদের নিকট শুনি, যথা—জন্মের দিন হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত শিশু; তাহার পরই প্রাপ্তবয়স্ক। সেই কথা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই চাণক্য শ্লোকে আছে, "প্রাপ্তেতু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবৎ আচরেৎ"। এমনি ধারা নানা উদাহরণ দিয়া দেখিতে পারেন যে বহু জিনিষ, বহু পূর্ব্বে মণীষীরা বলিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা ব্যাখ্যা বা কারণ দিয়া যান নাই, অথবা তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। আর বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সমস্ত বিষয়েই বিষদভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের সামনে ধরিতেছেন, তাই সেই সকল নূতন বলিয়া ভ্রম হইতেছে। পুরাতন—"সব কুসংস্কার" বলিয়া উড়াইয়া দিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ষোলবৎসর পর্য্যন্ত শিশু বলা হয়। বর্ত্তমানে শিশুর মনোবিকাশ প্রভৃতি নিয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে ভালভাবে শিশু পালন করিতে হইলে মাতাপিতা, আত্মীয়স্বজন, এমনকি শিক্ষাগুরুকেও নানা বিধিনিষেধ পালন করিতে হইবে। সংযমী হইতে হইবে এবং নিজেদের দোষত্রুটি সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ অনুকরণ প্রবৃত্তি শিশুদের প্রধান প্রবৃত্তির অন্যতম। আমরা জানি যে প্রায় সকলেই প্রিয়জনের আচার ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিবার চেষ্টা করি। শিশুদের বেলায় এর ব্যতিক্রম হইবার কোন সংগত কারণই থাকিতে পারে না। উপরন্তু শিশুরা সহজ অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। বয়স্করা বিচার বিবেচনা করিয়া, কিছুটা ব্যবধান নিয়া গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হন। এই কারণেই প্রধানতঃ পিতামাতা অত্যন্ত সংযমী, সন্ত্রাষী প্রভৃতি হওয়া উচিত। সেই কারণে সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই নিজেদের শিক্ষিত করা উচিত; ইহার সহিত শিশুপালন ও তাহাদের মনোবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুর অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার পূর্ব্বে তাহাদের প্রবৃত্তিগুলি ব্যক্ত করা উচিত মনে করি। সেই কারণে তাহাদের প্রধান প্রবৃত্তিগুলি নিম্নে উল্লেখ করিলাম। সাধারণতঃ প্রধান প্রবৃত্তির সংখ্যা ১৩টি বলা হইয়াছে। যথা:—

১। অঙ্গ সঞ্চালন ২। হস্তগ্রাহ ৩। ক্রন্দন ও বিলপন ৪। আহার ৫। শোধন ৬। দ্রব্যসংগ্রহ। ৭। ক্রীড়া ৮। কৌতূহল ৯। অনুকরণ ১০। সঙ্ঘবদ্ধতা ১১। প্রতিযোগিতা ১২। প্রশংসালাভ ১৩। সমবেদনা ১৪। যৌন প্রবৃত্তি।

এই সকল প্রবৃত্তি দেহের পরিপুষ্টির সহিত ক্রমশঃ বিকশিত হয়; কোন বিশেষ প্রবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট বয়সে হঠাৎ আবির্ভূত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রবৃত্তি পুষ্ট হইয়া পরিস্ফুট হয় এবং বয়ঃবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ শিশুকাল হইতেই ক্রীড়া-প্রবৃত্তি আভাস দেখিতে পাই; এই প্রবৃত্তির পূর্ণবিকাশ দেখি যখন শিশুর বয়স দশ এগার বৎসর। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার প্রভাব হ্রাস পায়।

প্রবৃত্তিগুলির বিকাশে শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয় সত্য, কিন্তু প্রয়োজনবোধে অনেক প্রবৃত্তিকে কতকাংশে দমন করা উচিত। কারণ অনেক প্রবৃত্তি আছে যাহাদের অতিপুষ্টিতে অন্য প্রবৃত্তির বিকাশে বিঘ্ন ঘটে। শুধু ইহাই নহে, কোন কোন প্রবৃত্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর। এই সকল প্রবৃত্তিকে কতকাংশে নিয়ন্ত্রিত করা বাঞ্ছনীয়। আবার কোন প্রবৃত্তিই সম্পূর্ণরূপে দমন করা উচিত নহে। মনোবিদরা দেখিয়াছেন যে ভবিষ্যৎ জীবনের বহু মানসিক বিকার ও দুঃখের উৎপত্তির মূল এই দমিত প্রবৃত্তি। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

অনেকেরই বিশ্বাস—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে কেবলমাত্র সুপ্রবৃত্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে; কুপ্রবৃত্তির 'ছিটেফোঁটা' চিহ্নও তাহাদের মনে থাকে না। এমনকি পাশ্চাত্য দার্শনিক Rousseau শিশুদিগকে "দেবদূত" আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"Child is an angel"। এই ধারণা, এই বিশ্বাস বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরূপ সম্পূর্ণ অসত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আবার অনেকে "হিংসাপ্রবৃত্তি" মানুষের জন্মগত বলিয়া দাবী করিয়াছেন; এমনকি Hobbs লিখিয়াছেন "Man is an wolf to another man"; এ দাবীও সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ শিশুজন্মের সময়ে কেবলমাত্র সুপ্রবৃত্তি কিংবা কেবল কুপ্রবৃত্তি লইয়াই আসে না। ভূমিষ্ঠকাল হইতেই এই দুইপ্রবৃত্তি তাহাদের মনে সমন্বিত।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নরক

রাজপুরীতে প্রবেশ করিবার সময় বজ্রের পা কাঁপিয়া গেল, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্সা হইল, কণ্ঠের নিকট একটা বাষ্পপিণ্ড উঠিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল। পিতৃপুরুষের ভবনে এই তাহার প্রথম পদার্পণ।

রাজপুরীতে দীপ জ্বলিয়াছে, কিন্তু পুরীর পিছন দিকে বেশি আলো নাই। কুহু আলো-আঁধারির ভিতর দিয়া এক সঙ্কীর্ণ সোপানের সম্মুখীন হইল। রাজ অবরোধের দাসী-কিঙ্করীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ সোপান অনেক আছে। কুহু বজ্রের হাত ধরিয়া উপরে চলিল।

দ্বিতলের এক কোণে কুহুর কক্ষ। দূরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। কুহু নিজ দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিল তাহার দাসী মালতী দ্বারের পাশে দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। বজ্রকে পিছনে রাখিয়া কুহু আগাইয়া গেল।

মালতী উঠিয়া কুহুর পিছনে চোখ বাঁকাইয়া চাহিল। অবরোধে পুরুষের আবির্ভাব মালতীর চোখে নূতন নয়, তবে এ মানুষটা নূতন বটে; আবছায়া আলোতে দেখিয়াও চাহিয়া থাকিতে হয়। কুহু বজ্রকে যথাসম্ভব আড়াল করিয়া বলিল—'মালতী, তোকে আর দরকার নেই। তুই যা।'

মালতী চোখ ঘুরাইল, অঙ্গভঙ্গী করিল, তারপর দুষ্টামি-ভরা সুরে বলিল—'এত রাত্তিরে কোথায় যাব গো ঠাকরুণ?'

কুহু ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'তোর মনের মানুষ নেই? তার কাছে যা। আজ আর ফিরতে হবে না, একেবারে কাল সকালে ফিরিস।'

মালতী একগাল হাসিল। তাহাকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, অঞ্চলপ্রান্ত উড়াইয়া সে নিমেষ মধ্যে অদৃশ্য হইল।

কুহু বজ্রকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, ভিতর হইতে দ্বারের খিল আঁটিয়া দিল।

ঘরটি খুব বড় নয়, ছোটও নয়। চারি কোণে দীপদণ্ডে চারিটি প্রদীপ, মসৃণ মণিচর্মতলে আলোক প্রতিফলিত হইতেছে। বাতায়নের পাশে খট্‌টার উপর শুভ্র শয্যা। উপাধানের উপর মল্লিকা ফুলের বড় মালা শোভা পাইতেছে। ঘরের বাতাস কস্তূরী ও পুষ্পগন্ধে আমোদিত।

কুহু হাত ধরিয়া বজ্রকে খট্‌টার উপর বসাইয়া দিল; মুগ্ধবিধুর চক্ষে চাহিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া ধরা-ধরা গলায় বলিল—'ধূলোর মাণিক কুড়িয়ে পেয়েছি তা কি আগে জানতাম! মহারাজ বজ্রদেব, যখন মাথায় রাজমুকুট ধারণ করবেন তখন এই পাপিষ্ঠা দাসীর কথা কি মনে থাকবে?'

বজ্র কুহুকে টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইল, বলিল—'কুহু, তুমি জানো না, তোমাকে পেয়ে আমি কী পেয়েছি। এই জনারণ্যে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু!'

কুহু আদরে গলিয়া গেল, বজ্রের কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল—'মনে থাকবে?'

'থাকবে। তোমাকে চিরদিন মনে থাকবে।'

কুহু পরিপূর্ণ তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর উঠিয়া মল্লিকা ফুলের মালাটি লইয়া বজ্রের গলায় পরাইয়া দিল। মালাটি সে আজ বৈকালে রাণীর আদেশে গাঁথিয়াছিল; সেই মালা আর একজনের গলায় উঠিবে তখন কে জানিত! তৃপ্তির মধ্যেও রাণীর কথা কুহুর মনে পড়িয়া গেল। রাক্ষসীটার কাছে যাইতে হইবে; ছলে ছুতায় আরও দুইটা দিন তাহাকে ভুলাইয়া রাখা দরকার—

ঈষৎ অন্যমনা হইয়া কুহু একটা কুলঙ্গীর কাছে গেল। কুলঙ্গীতে নানাবিধ মিষ্টান্ন ছিল, একটি থালীতে তাহা লইয়া বজ্রের কাছে ফিরিয়া গেল।

বজ্র বলিল—'এ কী?'

কুহু বলিল—'একটু খাও।'

কুহু দুই হাতে থালি ধরিয়া রহিল, বজ্র মিষ্টান্ন তুলিয়া খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে বলিল—কোদণ্ড মিশ্রের সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ তা তো বললে না।

কুহু বলিল—'আমার মা এই রাজপুরীর দাসী ছিল। কোদণ্ড ঠাকুর মাকে চিনতেন। মা মরবার সময় ঠাকুরকে বলে যায় তিনি যেন আমার দেখাশুনা করেন। তা ঠাকুর আর আমার কী দেখাশুনা করবেন, আমিই তাঁর দেখাশুনা করি।—ও কি, আর একটু খাও।'

'আর না, অনেক খেয়েছি।'

'এই ক্ষীরের পুলি খেতেই হবে'—বলিয়া কুহু ক্ষীরের পুলি বজ্রের মুখে তুলিয়া দিল।

আহার শেষ হইলে বজ্র বলিল—'তুমি আর আমাকে মধুমথন বলবে না?'

'বলতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার সত্যি নাম পরম-ভট্টারক শ্রীমন্ মহারাজ বজ্রদেব। মধুমথন তোমার মিথ্যে নাম।'

বজ্র একটু অন্যমনস্ক হইল; ওঙ্কার মুখখানি তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। সে বলিল—'মিথ্যে নয়, দুটো নামই সত্যি। তুমি আমাকে মধুমথন বলেই ডেকো।'

কুহু জিভ্ কাটিল—'রাজাকে কি অন্য নামে ডাকতে আছে!'

'রাজা তো এখনও হই নি। হব কি না তারই বা ঠিক কি?'

কুহুর মুখ দৃঢ় হইল; সে বলিল—'তুমি রাজা হবে।'

'বেশ। যতদিন রাজা না হই ততদিন মধুমথন বলে ডেকো।'

'সে ভাল। তিন রাত্রির জন্য তুমি আমার মধুমথন।' কুহু বজ্রের খুব কাছে সরিয়া আসিল।

বজ্র উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল—'এবার কিন্তু আমি ফিরে যাব। কোদণ্ড মিশ্র বলেছেন—'

কুহু তাহার দুই কাঁধে হাত রাখিয়া তাহাকে উঠিতে দিল না। বলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর কি বলেছেন আমি শুনেছি। কিন্তু এখন তোমার যাওয়া হবে না। ভোর হবার আগেই আমি তোমাকে ডিঙিতে করে পৌঁছে দেব।'

'কিন্তু—এখন রাত কত?'

'এখনও প্রথম প্রহর শেষ হয় নি।'

বজ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'না, আমি ফিরে যাই। তুমি যেতে না পারো। আমি সাঁতরে ময়ূরাক্ষী পার হতে পারব।'

কুহু কিছুক্ষণ তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার অধরে একটি গুপ্ত হাসি খেলিয়া গেল। সে বজ্রের বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, আমার একটা কাজ আছে সেটা সেরে এসে আমি তোমাকে পৌঁছে দেব।'

'কি কাজ?'

রাণীর কাছে যাইতে হইবে একথা কুহু বলিল না, বজ্রের কাছে রাণীর নাম উচ্চারণ করিল না। বলিল—'কোদণ্ড ঠাকুর চিঠি দিয়েছেন, রাজার অন্তরঙ্গ অর্জুন সেনকে দিতে হবে।'

'কতক্ষণ সময় লাগবে?'

'দু' দণ্ড—বেশী নয়।'

'দু' দণ্ড বসে থাকব?'

কুহু কুহকভরা হাসিল—'বসে থাকবে কেন? আমার বিছানায় শুয়ে থাকো।'

বজ্র-কোমল শয্যার প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টি করিয়া বলিল—'যদি ঘুমিয়ে পড়ি?'

অধরের একটি ভঙ্গুর ভঙ্গী করিয়া কুহু বলিল—'যদি ঘুমিয়ে পড়, আমি এসে তোমাকে জাগিয়ে দেব।'

বজ্র শয়ন করিল। কুহু তাহার প্রতি ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে ঘর হইতে বাহির হইল।

ঘরের বাহিরে আসিয়া কুহু সতর্কভাবে চারিদিকে চাহিল। কেহ কোথাও নাই, পুরীর এ অংশ নিভৃত হইয়া গিয়াছে। কুহু নিঃশব্দে দ্বারের শিকল তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ির দিকে চলিল।

চতুস্তলে রাণী শিখরিণীর শয়নকক্ষ। কুহু প্রবেশ করিলে রাণী অর্ধোত্থিতা হইয়া প্রশ্নবিস্ফারিত চক্ষে চাহিলেন। ব্যজনরতা দাসী কুহুর ইঙ্গিতে সরিয়া গেল।

কুহু মনে মনে যে-কাহিনী গড়িয়া রাখিয়াছিল ম্রিয়মান কণ্ঠে তাহা বলিল।—আজও পানশালা বন্ধ, শৌণ্ডিক কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সম্ভবত আগন্তুক যুবকও নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বিষয়ে নিঃসংশয়ে কিছু

জানবার উপায় নাই, পানশালা শূন্য। এদিকে কুহর অবস্থা শোচনীয়: হাঁটিয়া হাঁটিয়া তাহার পা দুটার আর কিছু নাই। এখন দেবী আজ্ঞা করুন—সে কী করিবে।

দেবী প্রজ্বলিত চক্ষে বলিলেন—'তুই দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা—দূর হয়ে যা, তোর মুখ দেখতে চাই না।'

কুহ কয়েক মুহূর্ত নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া ক্লান্তমন্থর পদে দ্বারের দিকে চলিল। দ্বারের বাহিরে গিয়া সে একবার চকিত-বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া চাহিল। তাহার চক্ষে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ নিমেষে দেখা দিয়া নিমেষ মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তারপর সে দ্রুতপদে রাজার প্রমোদ ভবনের দিকে চলিল। অন্তরঙ্গ অর্জুনসেন রাজার কাছেই আছে, তাহাকে কোনও মিশ্রের লিপি দিয়া রাণী শিখরিণীর সংবাদের ব্যবস্থা পাকা করিয়া তবে সে নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইবে।

রাণী শিখরিণী কিন্তু কুহর ঐ চকিত কটাক্ষ দেখিয়াছিলেন। তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। ব্যর্থতার ক্রোধ অপগত হইয়া তাঁহার ললাটে সংশয়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল।

রাত্রিচারিণী দাসী ফিরিয়া আসিয়া আবার রাণীকে বাতাস করিবার উদ্যোগ করিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন—'বল্লী, কুহ কোন্‌দিকে গেল দেখলি?'

বল্লী চমকিয়া বলিল—'তা তো দেখিনি দেবি। নিজের ঘরে ফিরেছে বোধহয়। দেখবো?'

'না—থাক।'

রাণী শিখরিণী আরও কিছুক্ষণ অধর দংশন করিতে করিতে চিন্তা করিলেন। তারপর সহসা শয্যা হইতে নামিয়া বস্ত্রাঞ্চল সংবরণ করিতে করিতে বলিলেন—'বল্লী, আয় আমার সঙ্গে, কুহর ঘরে আমাকে নিয়ে চল্।'

বল্লী ভীতচক্ষে রাণীর পানে চাহিল। রাণীর মুখ দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গেল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। সে নীরবে অগ্রবর্তিনী হইয়া রাণীকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

• • •

কুহর শয্যায় শয়ন করিয়া বস্ত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাতায়ন দিয়া নদীর জল-ছোঁয়া বাতাস প্রবেশ করিয়া তাহার কপালে বুকে স্নিগ্ধ করাঙ্গুলি বুলাইয়া দিতেছিল। আজ দ্বিপ্রহরে বস্ত্র ঘুমাইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার দেহের গ্লানি দূর হয় নাই। কুহর কোমল শয্যায় শুইয়া মৃগমদ ও পুষ্পগন্ধে আচ্ছন্ন হইয়া সে গুঞ্জাকে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

গুঞ্জা যেন তাহার পাশে বসিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিতেছে, বুকে কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছে। বলিতেছে—তোমার মাথায় ও কি? সোনার মুকুট! ছি ছি খুলে ফেল, আমি তোমাকে পলাশ ফুলের মালা পরিয়ে দেব—

গুঞ্জা! কুঁচবরণ কন্যা!···কিন্তু এ কে? এ তো গুঞ্জা নয়! এ কি কুহ!···না, কুহর মুখ এত সুন্দর নয়, গুঞ্জার মুখও এত সুন্দর নয়। মুখখানা যেন চেনা চেনা···কী তপ্ত নিশ্বাস, বুকের উপর পড়িয়া বুক যেন পুড়াইয়া দিতেছে—

গুঞ্জা কোথায় গেল?···এই নারীর চোখের দৃষ্টি এত তীব্র কেন? না—না!···মনে পড়িয়াছে—রাণী শিখরিণী! কিন্তু—না—না! গুঞ্জা কোথায়?

রাণী শিখরিণী সরিয়া গেল···দ্বার খুলিয়া বাহিরে কাহার সহিত কথা কহিল, আবার দ্বার বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিল—তাহার হাতে একগুচ্ছ ধূমনিঃসৃতী ধূপশলাকা··· কিসের ধূপ! রাণী শলাকাগুলি তাহার মুখের কাছে নাড়িতেছে···

ধূপের গন্ধে মাদকতা আছে। বস্ত্রের শরীর যেন বিবশ হইয়া আসিতেছে, শরীরে অনুভূতি আছে, চেষ্টা নাই··· মন কিন্তু সজাগ; সে জাগিয়া আছে, তবু যেন ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে···

তাহার চোখে রাণী নিদালীর মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে চোখের পাতা খুলিতে পারিতেছে না···অথচ সে জাগিয়া আছে, সমস্তই অনুভব করিতেছে—

গুঞ্জা, তুমি কোথায়? সোনার মুকুট ভাল নয়, তুমি আমাকে পলাশ ফুলের মালা পরাইয়া দাও—

গুঞ্জা! তুমি কি রাণীর ছদ্মবেশে আমার কাছে আসিয়াছ! তাই কি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না! কুঁচবরণ কন্যা—!

• • •

রাজার প্রমোদভবন অবরোধ হইতে অনেকখানি দূরে, প্রাসাদের অন্ত প্রান্তে। কুহ অলিন্দ দিয়া সেই দিকে চলিল। কখনও এক প্রস্থ সোপান অবরোহণ করিয়া কখনও এক প্রস্থ আরোহণ করিয়া খদ্যোতের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে

চলিল। যতই প্রমোদভবনের কাছে আসিতে লাগিল ততই বাদ্যযন্ত্রের শব্দ স্পষ্টতর হইতে লাগিল—ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি!

অবশেষে কুহু প্রমোদ কক্ষের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল।

প্রমোদ কক্ষটি আয়তনে বৃহৎ, কিন্তু সর্বত্র সমভাবে আলোকিত নয়। মধ্যস্থলে অনেকগুলি উচ্চ দীপদণ্ড চক্রাকারে সাজানো রহিয়াছে, ছাদ হইতেও শৃঙ্খল-লম্বিত দীপাধার ঝুলিতেছে। কিন্তু এই চক্রের বাহিরে অধিক আলো নাই, কোণে কোণে ছায়ান্ধকার; কক্ষে অনেকগুলি মানুষ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাহা সহসা ধরা যায় না।

মানুষগুলি কিন্তু সকলেই স্ত্রীজাতীয়। এমন কেহ নাই যে রূপসী ও নবীনা নয়। তাহাদের বেশভূষা সংক্ষিপ্ত, বুকে কাহারও কাঁচুলি আছে কাহারও নাই। তাহারা গুচ্ছে গুচ্ছে হর্ম্যতলে বসিয়া আছে, কেহ বা আস্তরণের উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে। যাহারা আলোকচক্র হইতে দূরে আছে তাহাদের অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। আলোকচক্রের মাঝখানে এক বিরলবসনা সভানন্দিনী নৃত্য করিতেছে; আলোকবিভ্রান্ত প্রজাপতির ন্যায় তাহার নৃত্যের ভঙ্গী। তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তিনটি যুবতী বীণা, মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে। ঝনি ঝমকি ঝনি ঝমকি।

রাজা অগ্নিবর্মা যে এই কক্ষে আছেন তাহা সহসা লক্ষ্যগোচর হয় না। কেন্দ্রীয় দীপচক্র হইতে অল্প দূরে একটি স্তম্ভে পৃষ্ঠ অর্পণ করিয়া তিনি বসিয়া আছেন। অগ্নিবর্মার অস্থিসার মুখে শ্মশ্রু গুম্ফ নাই, বক্ষও কেশহীন; মাথার চুল নারীর মত দীর্ঘ। তিনি স্তিমিতচক্ষে নর্তকীর পানে চাহিয়া আছেন। ছাগ-চক্ষুর ন্যায় ভাবলেশহীন চক্ষুর্দ্বয়, কিন্তু তাহাদের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন উন্মাদনা।

কুহু উঁকি দিয়া দেখিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিল না। অর্জুনসেন রাজার অন্তরঙ্গ, নিজস্ব বৈদ্য, সর্বদা রাজার সন্নিধানে থাকা তাহার কর্তব্য। কিন্তু কুহু প্রমোদ কক্ষের ছায়াচ্ছন্ন কোণে কোণে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াও তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ভিতরে নৃত্যের তাল ক্রমে দ্রুত হইতেছে। দ্বারের কাছে এক বিপুলকায়া প্রৌঢ়া রমণী হাতে খোলা তলোয়ার লইয়া আছে, সে এই প্রমোদকক্ষের দৌবারিকা। কিন্তু দ্বার রক্ষার দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, নৃত্যলীলার দিকেও নাই। সে বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

কুহু দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দ্বিধায় পড়িল। অন্তরঙ্গ অর্জুন সেনকে সে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইবে? খুঁজিলেই কি পাওয়া যাইবে? কুহু ভাবিল, আজ থাক, কাল পত্র দিলেই হইবে। নিজের ঘরের দিকে কুহুর মন টানিতেছিল।

কুহু ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, দেখিল অলিন্দ দিয়া অর্জুনসেন আসিতেছে। তাহার পিছনে এক কিঙ্করী, কিঙ্করীর হস্তে পূর্ণ পানপাত্র।

অন্তরঙ্গ অর্জুনসেনের বয়স পঁয়ত্রিশ, নধর মসৃণ আকৃতি, মাথায় তৈলসিক্ত কুঞ্চিত কেশ, কুঞ্চিত গুম্ফ, চক্ষু দুটি উজ্জ্বল, যেন সর্বদাই বাষ্পোৎকুল্ল। আকৃতি দেখিয়া তাহার প্রকৃতি অনুমান করা অসাধ্য। কুহুকে দেখিয়া সে গতি শ্লথ করিল, কিঙ্করীকে বলিল—'তুমি মহারাজকে পানীয় দাও গিয়ে, আমি যাচ্ছি।'

কিঙ্করী প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। কুহু মৃদুস্বরে অর্জুনসেনকে কোদণ্ড মিশ্রের বার্তা জানাইল ও সঙ্কেত-লিপি দিল।

অর্জুনসেনের বাষ্পোৎকুল্ল চোখে একটু কৌতুক দেখা দিল, সে স্মিতস্বরে বলিল—'অমাবস্যার রাত্রি? ভাল। নিবন্ত প্রদীপে ফুঁ দেওয়া বৈ তো নয়, তা দেব। আর্য কোদণ্ড মিশ্রকে আমার প্রণাম দিয়ে বোলো, শ্রীনমহারাজ একদিন আমাকে অষ্ঠ বৈদ্য বলেছিলেন সে কথা আমার মনে আছে।'

কুহু একবার অর্জুনসেনের স্মিত মুখের পানে চাহিল, একবার দ্বারের ভিতর দিয়া পানপাত্র হস্তে উপবিষ্ট মহারাজের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিল, তারপর নিঃশব্দ ক্ষিপ্রচরণে ফিরিয়া চলিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিষ-মন্থন

কুহুর ঘরের বাহিরে অলিন্দের প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল, তাহার অস্থির প্রতিচ্ছায়া ভৌতিক আকার গ্রহণ করিয়া প্রাচীরগাত্রে নৃত্য করিতেছিল।

কুহু কোনও দিকে না চাহিয়া নিজের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, হাত তুলিয়া শিকল খুলিতে গিয়া থমকিয়া

গেল। খিল খোলা! কুহর বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল, সে দ্বারে হাত রাখিয়া চাপ দিল। দ্বার খুলিল না, ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ। কুহর দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল, সে বুকিভষ্টের মত দ্বারের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় পিছন হইতে কেহ তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল। কুহ ভীতচক্ষে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—রাণী! রাণী হাত ধরিয়া তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল, ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—'কুহু, আজ তুমি মরেছ।'

কুহ চাপা গলায় বলিল—'আমার ঘরে কে ঢোর দিয়েছে?'

'ত এখনও জোকো নি? রাণী!—তোমার ঘরে কি কেউ ছিল?'

'ছিল কেউ।'

'বুঝেছি। কিন্তু তাকে আর পাবে না, রাণী তাকে বশ করেছে। তোমার নাগর শক্ত মানুষ বলতে হবে, বশীকরণ-ধূপ দিয়ে তাকে বশ করতে হয়েছে।'

রাণী আরও নিম্ন করিয়া যাহা দেখিয়াছিল এবং যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কুহ হাত কামড়াইল।

রাণী বলিল—'হাত কামড়ালে কি হবে? এখন পালাও, রাণী যদি তোমাকে পায় তোমার ধড়ে মাথা থাকবে না।'

কুহ তাহা বুঝিয়াছিল। রাণীর ইঙ্গিত বস্তু সে নিজের ভস্ম লুকাইয়া রাখিয়া রাণীকে মিথ্যা-কথায় ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, রাণী তাহা জানিতে পারিয়াছে। ধরা পড়িলে কুহর আর রক্ষা নাই, রাণী তাহাকে হুতাশনে পুড়াইয়া মারিবে। কুহ আর কাল ব্যয় না করিয়া রাজপুরীর কুটিল চক্রব্যূহের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুহ শৈশব হইতে রাজ অবরোধে পালিত, অবরোধের অলি-সন্ধি তাহার নখদর্পণে। সে একটি অতি নিভৃত গুপ্ত কক্ষে গিয়া লুকাইয়া রহিল। এখানে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

ধূলিমলিন অন্ধকার কোটরে একাকিনী বসিয়া উত্তপ্ত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কুহ তীব্র প্রতিহিংসা-চিন্তায় মনের বল্গা ছাড়িয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইল রাজাকে গিয়া সংবাদ দিবে, অগ্নিবর্মার হাত ধরিয়া আনিয়া ব্যভিচার-ব্রতা রাণীকে ধরাইয়া দিবে। কিন্তু তাহাতে বন্ধুর প্রাণনাশ অনিবার্য্য। কুহ রুদ্ধবীর্য সর্পিণীর মত সারা রাত্রি তর্জন করিতে লাগিল।

তৃতীয় প্রহরের ভেরী বাজিয়া গেলে কুহ নিঃশব্দে উঠিয়া গুপ্ত-কক্ষের বাহিরে আসিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে; রাজপুরীর অলিন্দপথে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে গাঢ় তমিস্রা, একটি দীপও জ্বলিয়া নাই।

নিজের দ্বারের কাছে আসিয়া কুহ সন্তর্পণে হাত দিয়া অনুভব করিল, দ্বার খোলা। সে কক্ষে প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ নিস্পন্দভাবে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া শুনিল, শয্যা হইতে একজনের নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসিতেছে।

কুহ দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, ঘরের কোণে গিয়া কম্পিত হস্তে প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ছুটিয়া গিয়া শয্যার পাশে দাঁড়াইল।

বন্ধু চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছে, ধীরে ধীরে তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে। কুহ তাহার বাহু ধরিয়া নাড়িল, কানে কানে নাম ধরিয়া ডাকিল—মধুমথন! বন্ধু কিন্তু জাগিল না। ইহা কি নিদ্রা? না মাদকজাত মোহাচ্ছন্নতা!

বন্ধুর সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া কুহুর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাণী না দেখিয়াও যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা সত্য। কুহ দন্তে অধর কাটিয়া রক্তাক্ত করিল।

এদিকে রাত্রি ফুরাইয়া আসিতেছে। রাণী চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার কখন তাহার কি মতি হইবে কে জানে! কুহ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধুর পরিচর্যা আরম্ভ করিল। মারণ উচাটন বশীকরণের যেমন ঔষধ ও প্রক্রিয়া আছে তাহার প্রতিষেধক ঔষধ প্রক্রিয়াও আছে। কুহ বন্ধুর মাথায় শীতল জল দিল, সিক্ত বস্ত্র দিয়া বক্ষস্থল মুছিয়া দিল, আরও নানা প্রক্রিয়া করিল। অবশেষে বন্ধু রক্তাভ চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

তাহার দেহমনের জড়তা কাটিতে আরও কিছুক্ষণ গেল। সে উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল—'আমি এখানে কেন?'

কুহ তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে বলিল—'তুমি রাজপুরীতে এসেছিলে মনে নেই? আমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে!'

বন্ধু স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু—'

কুহু বলিল—'তারপর বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলে। ও কথা ভুলে যাও। রাত আর নেই। চল তোমাকে কোদণ্ড ঠাকুরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কোদণ্ড ঠাকুর!—চল।'

কুহু হাত ধরিয়া বল্লু ঘাটে আসিল। পূর্বাকাশে তখনও উষার উদয় হয় নাই, শুকতারা প্রদীপ্ত মণিখণ্ডবৎ দপ্‌দপ্‌ করিতেছে।

কুহু বল্লুকে ডিঙিতে বসাইল, হাতে বৈঠা ধরাইয়া দিল। বল্লু যন্ত্রবৎ বৈঠা টানিতে লাগিল।

তাহারা যখন কোদণ্ড মিশ্রের কুটীরে পৌঁছিল তখনও তাঁহার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তিনি উষ্ণ মস্তিষ্কে কুটীর মধ্যে পাদচারণা করিতেছেন। এই এক অহোরাত্রের মধ্যে বৃদ্ধের দেহ আরও শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চক্ষু ও গণ্ডদ্বয় কোটরপ্রবিষ্ট; চক্ষে অনাক্রান্ত দৃষ্টি। বল্লুকে দেখিয়া তিনি দুই হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'বল্লু! তুমি কোথায় গিয়েছিলে বৎস? তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমি ভেবেছিলাম আমার সমস্ত আয়োজন বুঝি পণ্ড হল! কোথায় ছিলে তুমি?'

বল্লু নিরুত্তর রহিল। কোদণ্ড মিশ্র কুহুর পানে চাহিলেন। কুহু তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে ব্যাপার বুঝাইয়া দিল, নিজের অভিসন্ধিটুকু গোপন রাখিয়া বাকি সব সত্য কথা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র বিস্ফারিত নেত্রে বল্লুর পানে চাহিলেন, বলিলেন—'কি বিপত্তি! যদি ধরা পড়ত! যদি প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ত!—কিন্তু যাক, বাঘিনীর কবল থেকে ফিরে এসেছে এই যথেষ্ট। বল্লু, এখন থেকে তুমি আর কোথাও যাবে না, সমস্ত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা এখানে থাকবে। কুহু, তুমিও আর অবরোধে ফিরে যেও না, বাঘিনী তোমাকে পেলে নিশ্চয় হত্যা করবে।'

কুহু প্রজ্বলিত চক্ষে বলিল—'আমি ফিরে যাব, এমন ভাবে লুকিয়ে থাকব যে, রাণীর সাধ্য নেই আমাকে খুঁজে বার করে। কোকবর্মা রাণীকে চুলে ধরে টেনে নিয়ে যাবে—নিজের চোখে দেখব তবে আমার বুক ঠাণ্ডা হবে।' বল্লুর কাছে গিয়া বলিল—'অমাবস্যার পরদিন রাজপুরীতে আবার দেখা হবে।'

কুহু চলিয়া গেল। বল্লু বাহিরে আসিয়া ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইল। নদীর ওপারে চক্রবাক-পক্ষের ন্যায় ঈষৎ রক্তিমা দেখা দিয়াছে, আর একটি নূতন দিনের সূচনা হইতেছে। সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া বল্লুর মস্তিষ্কের কুজ্‌ঝটিকা কাটিয়া গেল। তাহার মনে হইল, সেই যে নটেশ্বর ও বিম্বাধরের সঙ্গে সে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল তাহার পর এক যুগ কাটিয়া গিয়াছে।—

সূর্যোদয় হইলে বল্লু স্নান করিতে জলে নামিল। গঙ্গার স্নিগ্ধ-শীতল জলে অবগাহন করিয়া তাহার দেহমন সুস্থ হইল।

এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নাই, দুই হাতে সবেগে গাত্র-মার্জন করিতে করিতে তাহার চোখে পড়িল, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরীয়! সোনার অঙ্গুরীয়, মাঝখানে গাঢ় নীল একটি মণি। বল্লু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনেকক্ষণ অঙ্গুরীয়টি নিরীক্ষণ করিল। কোথা হইতে আসিল এই অঙ্গুরীয়? কে পরাইয়া দিল? গত রাত্রে তাহার স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের এমন অবিচ্ছেদ্য হুড়াহুড়ি হইয়া গিয়াছিল যে কিছুই সে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছিল না। কিন্তু এই আংটি নিশ্চয় স্বপ্ন নয়। আংটির দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল ইহার সহিত যেন কোন অজ্ঞাত অশুচিতার স্পর্শ লাগিয়া আছে। সে আংটি খুলিয়া জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।

কিন্তু ফেলিতে গিয়া সে থামিয়া গেল। আংটি এত সুন্দর, তাহার নীলবর্ণ মণি হইতে এমন অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে যে সে তাহা জলে ফেলিয়া দিতে পারিল না। বিশেষত মূল্যবান কোনও বস্তু নষ্ট করা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে একটু চিন্তা করিয়া আবার উহা অঙ্গুলিতে পরিধান করিল।

স্নান সেরে সে সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া উপরে আসিল এবং সিক্তবস্ত্রে গঙ্গার কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আজও বুড়ি কানসোনার হাটে গিয়াছে। গঙ্গা পা ছড়াইয়া বসিয়া সলিতার পাক কাটিতেছিল, হাস্যমুখে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া দিল, থামিতে মুড়ি শসা কলা গুড় নারিকেল আনিয়া সম্মুখে রাখিল।

অর্ধমুদিত চক্ষে খাইতে খাইতে বল্লু বলিল—'গঙ্গা, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি।'

'কী জিনিস?' গঙ্গা উৎসুক আনন্দে চাহিল।

বল্লু আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিল। আংটি হাতে লইয়া গঙ্গার মুখে অপূর্ব ভাবব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিল; ভয় সম্ভ্রম আনন্দ সঙ্কোচ ক্ষণকালের জন্য তাহাকে নির্বাক করিয়া দিল। তারপর সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'এ আমার জন্যে এনেছ! এত সুন্দর আংটি! এ নিয়ে আমি কি করব?'

বল্লু বলিল—'এখন রেখে দেখে। যখন তোমার বিয়ে হবে তখন এই আংটি বিক্রি করে অনেক টাকা পাবে। সেই টাকা নিয়ে তুমি আর তোমার বর সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করবে।'

লজ্জায় আহ্লাদে গঙ্গার মুখখানি সিন্দূরবর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

সোভিয়েট দেশে

শ্রীসৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

Peter the Great

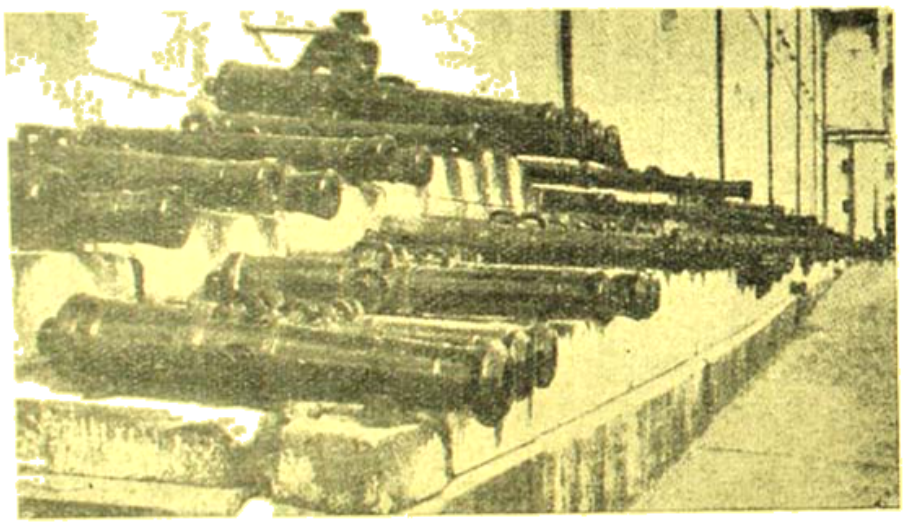

পিটারের Peter the Great) মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীর হাতে সিংহাসন যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পিটারের দ্বিতীয় পৌত্র রাজা হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন 'প্রিওব্রাজেন্স্কি' সেনাদের হাতে সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন মোকোভ্রিচ-কাপ্। পিটারের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কাথেরিন। রাণী কাথেরিন ছিলেন অত্যন্ত বিলাসিনী—রাজকার্যে তাঁর তেমন মন ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি

ছবিতে দেখা যাচ্ছে পিটার তাঁর হাতে তৈরী জাহাজ নিয়ে খেলা করছেন। তাঁর ছোট্ট ছেলেও তাঁর সঙ্গে আছে।

মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর নাতি দ্বিতীয় পিটার। তিনি মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজমুকুট পরেন তাঁর ভাগ্নী আনা। আনা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তাঁর রাজত্বকালে রাশিয়ার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। তুর্কীর সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে রাশিয়ার প্রচুর ক্ষতি হয়। তাঁর সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে পোলাণ্ডের যে যুদ্ধ হয় তাতে রাশিয়ার কোন লাভ হয় নি। তাঁর সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে সুইডেনের যে যুদ্ধ হয় তাতে রাশিয়ার কোন লাভ হয় নি। তাঁর সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে সুইডেনের যে যুদ্ধ হয় তাতে রাশিয়ার কোন লাভ হয় নি।

উচ্ছৃঙ্খলভাবে বছর দুয়েক রাজ্য করার পর রাণী কাথ্রিনের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে।

তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিরোহণের স্বাদশ-বর্ষীয় পুত্র দ্বিতীয় পিটার বসলেন সিংহাসনে। পিতামহের সেণ্টপিটার্সবুর্গ-অনুপ্রাণিত, প্রগতি-পন্থী বিচক্ষণ-মন্ত্রী মেন্‌শিকভের উদ্দেশ্য ছিল—কন্যার সঙ্গে নব-নির্ব্বাচিত 'জার'-এর বিবাহ দিয়ে আত্মীয়তা পাতিয়ে, রুশ-রাজশক্তিকে সুসংবদ্ধ এবং শক্তিশালী করে তুলবেন, কিন্তু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোর-সম্রাট দ্বিতীয় পিটার দেশের কুচক্রী-প্রাচীনপন্থী বোল্‌গোরুকী বংশের রাজ-অমাত্যদের প্ররোচনায় পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী শ্বশুর-মন্ত্রী মেন্‌শি-কভ্‌কে রাজ্য থেকে দূরের সাইবেরিয়ায় চির-নির্ব্বাসিত করে সে-বিবাহের প্রস্তাব ভেঙ্গে দিলেন। নির্জ্জন সাইবেরিয়ার হিম-শীতল প্রান্তরে, জীর্ণ কুটীরে দারুণ দুর্ভোগাঘাতে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে মেন্‌শি-কভের মৃত্যু হয়। মেন্‌শিকভের নির্ব্বাসনের পর রাজদরবারে বোল্‌গোরুকী-অমাত্যদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের মন্ত্রণায় সম্রাট নব-প্রতিষ্ঠিত সেণ্টপিটার্সবুর্গ সহর থেকে আবার মস্কোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অপরিণত-বয়স্ক দ্বিতীয় পিটারের অভিভাবক-হিসাবে বোল্‌গোরুকী-অমাত্যকুলই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের কর্ত্তা-কর্ত্তা-ভাগ্যবিধাতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের দারুণ স্বেচ্ছাচারের ফলে দেশের অবস্থা রীতিমত শোচনীয় হয়ে ওঠে। মাত্র তিন বছর এভাবে রাজ্য করার পর সপ্তদশবর্ষে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পিটারের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পিটারের জীবনাবসানের পর সিংহাসন অধিকার নিয়ে রাজ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। শাসন-ক্ষমতা বিদেশের হাতে যাবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পরিষদের সভ্যরা এক গোপন-বৈঠকে সমবেত হয়ে, সম্রাট পিটারের (Peter the Great) নিকট-আত্মীয়া এবং জার্ম্মানির অন্তর্গত কুরলাণ্ডের (Courland) ডিউকের বিধবা-পত্নী চীন-চরিত্রা এন্‌কে (Anne) Czarina বা সম্রাজ্ঞী হিসাবে সিংহাসনে বসাবার মতলব করেন। সে-খবর জানতে পেরে 'প্রিয়োব্রাজেন্‌স্কো' সেনাদল বিদ্রোহ-ঘোষণা করে এবং রাষ্ট্র-পরিষদের সভ্যদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ ছিনিয়ে নিয়ে এন্‌কেই সিংহাসনে বসায়। এদের দৌলতে নির্ব্বাচিত হবার ফলে এন্ শুধু নামেই 'সম্রাজ্ঞী' ছিলেন···রাজ-কার্য্য পরিচালনা করতো এই

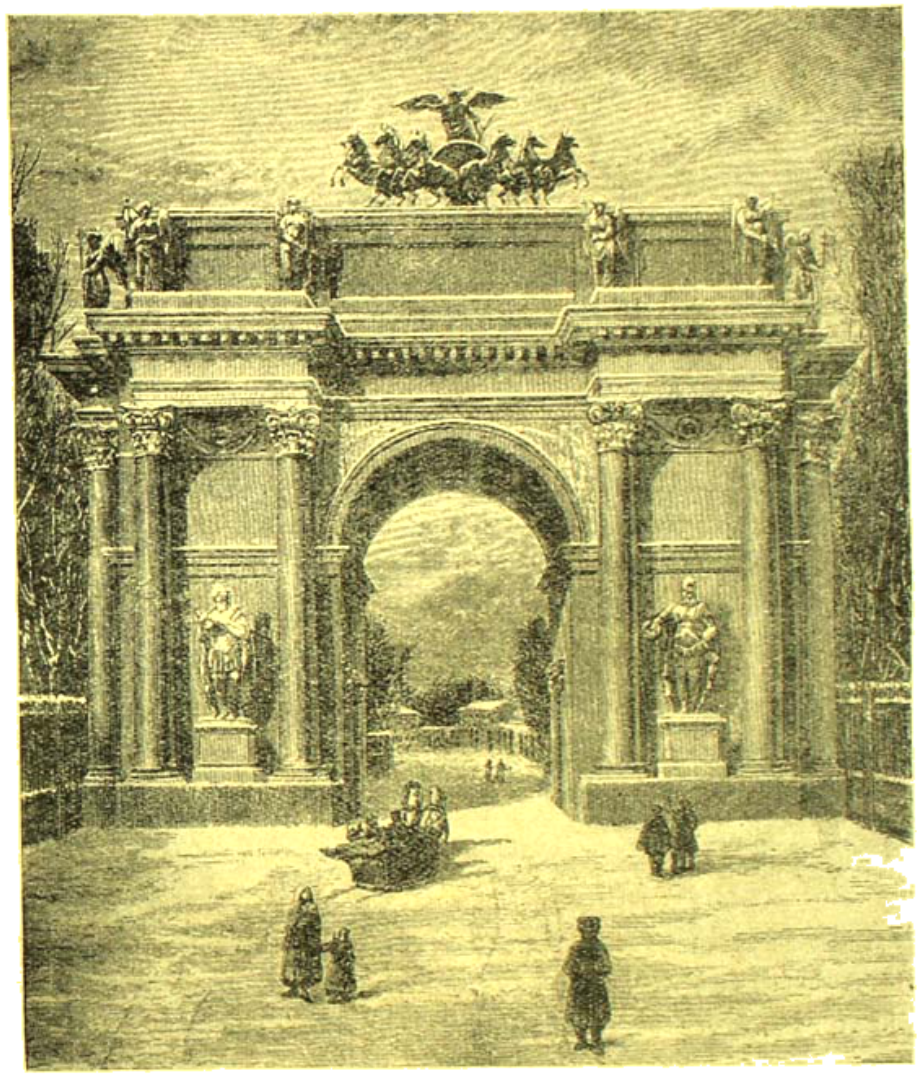

পেণ্ট পিটার্সবুর্গ সহরে রুশ-সম্রাট আলেকজাণ্ডারের গড়া বিজয় তোরণ—প্রাচীন রুশচিত্রের প্রতিলিপি

'প্রিয়োব্রাজেন্‌স্কো' রক্ষীরা। তাছাড়া এনের স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল না···রাজ-কার্য্য অবহেলা করে, সারাক্ষণ তিনি তাঁর জার্ম্মাণ-প্রণয়ী কাউণ্ট আর্ণষ্ট জোহান্ বিরোঁ, আর একদল চাটুকার-অনুচরের সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-চর্চ্চায় মেতে থাকতেন। এই অনাচারের ফলে দেশের আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুর্দ্দশা ক্রমে চরমে ওঠে! অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অরাজকতার ফলে যায় দেশ···রাজ-দরবার হয়ে ওঠে অনাচারের লীলা-ক্ষেত্র! তাছাড়া

সম্রাজ্ঞী-প্রেমের পক্ষপাত পৃষ্ঠপোষকতায় রুশ-দরবারে সিনেটরের প্রস্তাব-প্রতিপত্তি এমন চরম প্রসারলাভ করেছিল যে, শুধু সোল্‌ডেস্কী এবং গোলিৎসিন বংশের অনাত্মীয় ছাড়া দেশের আর-কোনো অভিজাত-রাজপুরুষ, সম্রাট চমিবার যা ধর্মমাতৃক—কারো এতটুকু আধিপত্য-বিস্তারের উপায় ছিল না। বিচক্ষণ-মন্ত্রী মেন্‌শিকভের মত প্রিন্স ডিমিট্রি গোলিৎসিন্‌ও ছিলেন রাজ্যের পরম-হিতাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্ট-সুরক্ষ-রাজনীতিবিদ···রাজ-দরবারের দুর্নীতি-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর ফলে, রাণী এন্ এবং তাঁর বিদেশী-অনুচরদের প্ররোচনায় গোলিৎসিন্‌কে কারা কক্ষে বন্দী করে রাখেন। বন্দী-দশাতেই গোলিৎসিনের মৃত্যু ঘটে।

রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথারিন্—রাজাভিষেকের চিত্র

এমনি উদ্যম-উৎসাহের চালিয়ে রাণী এন্ দশ বছর (১৭৩০-১৭৪০) রাজ্য-শাসন করেন। এই ক'বছর ছিল দেশে দারুণ দুঃসময়। অন্তর্ঘাতী বিশৃঙ্খলা ছাড়া, দেশে সে-সময়ে প্রাকৃতিক-দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর অগ্নিকাণ্ডের প্রকোপ এত বেড়েছিল যে, বিরাট রুশ-সাম্রাজ্য প্রায় ধ্বংসের হবার মুখে! তার উপর বিলাসিনী-সম্রাজ্ঞীর অসুপ্রহপুষ্ট স্বার্থান্বেষী আত্মীয়-অমাত্যদের অবাধ-শোষণ, নির্মম-নির্যাতন আর অযথেচ্ছ রাজস্ব আদায়ের ফলে, দেশের সাধারণ-প্রজাদের দুরবস্থা দিন-দিন একান্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। রাণী এনের অন্তরঙ্গ-প্রসঙ্গে যে সব বিদেশী তখন দরবারে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন—দু'জন বিশিষ্ট জার্মান অমাত্য—অষ্টারমান্ আর মুনিক্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে ঐরোগাচারিণী-এনের জীবনান্তের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যাভিলাষী এই দুই কুচক্রী বিদেশী-অমাত্য মিলে রাণীর প্রণয়ী বিরোঁকে সুদূর সাইবেরিয়ায় চির-নির্বাসনে পাঠিয়ে, দরবারের দুর্নীতিপরায়ণ-অনুচরদের সাহায্যে সিংহাসন অধিকারের ফন্দী আঁটেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের সে দুরভিসন্ধি সফল হয়নি। দুর্ধর্ষ 'প্রিয়োব্রাজেনস্কি-গার্ডস্' ঘটনাচক্রে বিদেশীদের এই হীন-ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে মুনিক্ আর অষ্টারম্যান্‌কে অবিলম্বে কারাকক্ষে বন্দী করে। দরবারের একদল কুচক্রী-স্বার্থান্বেষী রাজ-অমাত্যের মতলব ছিল—পরলোক-গতা রাণীর এক চরিত্রহীনা আত্মীয়ার শিশুপুত্র আইভান্‌কে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরা করবেন রাজ্য-শাসন। 'প্রিয়োব্রাজেনস্কো' সেনাদল কিন্তু তাঁদের সে-সাধেও বাদ সাধলেন। লোকান্তরিত-সম্রাট পিটারের (Peter the Great) কন্যা এলিজাবেথকে সম্রাজ্ঞী নির্বাচিত করে রাজ-ভক্ত 'প্রিয়োব্রাজেনস্কো' সে-যাত্রা রাজ্যলোভী-বিদেশীদের লোলুপ গ্রাস থেকে রুশ সিংহাসনের মর্যাদা এবং স্বদেশীয়ানা বাঁচিয়ে-ছিলেন।

রাণী এলিজাবেথও ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল···বিলাস, ব্যভিচার আর মদের পেয়ালা নিয়েই মেতে থাকতেন সারাক্ষণ! তাঁর কামাসক্তি এমন ছিল যে, মৃত্যুকালেও চেরী-ব্রাণ্ডির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন! এলিজাবেথের বিলাসিতা এবং অপব্যয়িতাও ছিল দুরন্ত-রকম। নিজের মদ, বিলাস আর উদ্ভট খেয়াল পরিতৃপ্তি করতে রাণী এলিজাবেথ দু'হাতে রাজ-কোষের অর্থ ওড়াতেন। তাঁর এই অপব্যয়িতার ফলে রাজ্যের আর্থিক-দুরবস্থা এমন হয় যে, বিচক্ষণ-কোষাধ্যক্ষ কাউন্ট পিটার শুভালভ্‌কে শেষে দেশের মুদ্রা-মান পর্যন্ত হ্রাস করতে হয়েছিল রাণীর বিলাসব্যয়ের যোগা মিটোতে। এলিজাবেথ কিন্তু এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না···রাজ-কার্য্য-পরিচালনার ভার দেশের সুরক্ষ-মন্ত্রী শুভালভ্ ভ্রাতাদের উপর ছেড়ে, রাণী নিজের উচ্ছৃঙ্খল-সঙ্গীদের নিয়ে মেতে থাকতেন। দেশে-বিদেশে এত দেনা করে ফেলেন এঁর জন্য যে, সে দেনা মেটাতে রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীদের বিব্রত হতে হয়। রাণীর সে দেনা শোধ করতে, রাজ-কোষের অর্থ-নিঃশেষিত হবার উপক্রম ঘটলে মন্ত্রীরা প্রজাদের উপর নিত্য-নূতন খাজনা চাপাতেন। তার ফলে জন-সাধারণের দুরবস্থা সঙ্গীণ হয়ে ওঠে। দেশের এমনি দুর্গতির সময়, বিলাসিনী-এলিজাবেথের একদা খেয়াল হলো এক বিরাট প্রাসাদ তৈরী করবেন। সে বাসনা মেটাতে তিনি অকাতরে রাজ-কোষের এক-কোটি মুদ্রা ব্যয় করে নেভা-নদীর উপকূলে সেণ্টপিটার্সবুর্গ সহরের বুকে 'Winter Palace' নামে অপরূপ সুন্দর এক বিরাট প্রাসাদ-ভবন গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন-সেণ্টপিটার্সবুর্গের (আধুনিক লেনিনগ্রাড্ সহর) সেই অভিনব প্রাসাদটি অতীত ইতিহাসের অক্ষয়-প্রতীক হিসাবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া অযথেচ্ছ উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে, রাণীর সেনার যাত্রা ক্রমে অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েছিল সৌখিনতার পীঠস্থান—মস্কুর প্যারিসের দর্জীরা থেকে এলিজাবেথের পোষাকের দাম বাকী-পড়ায়, সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে ধারে কারবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে, রাণী এলিজাবেথ বিশ বছর (১৭৪১ ১৭৬১) রাজত্ব করে ফেলেন। তাঁর আমলে, রাজ্যের সেনাদল প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সুদীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে প্রবল-শত্রু প্রুশিয়ার

অধিপতি ফ্রেডরিককে (Frederick the Great) হারিয়ে বিজয় করে রাজ্যের এই বিদেশী সেনাদল দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে।

এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে রুশরাজের এক বিদেশী লুথেরান্ অমাত্যের সুচতুরা-কন্যা সোফিয়া অগস্টা দ্বিতীয়া ক্যাথরিন্ নাম নিয়ে রুশের মহারাণী হয়ে বসেন। তাঁর সিংহাসন-লাভের কাহিনী বেশ বৈচিত্র্যময়।

লোকান্তরিত-মহাট পিটার দি গ্রেটের আর এক কন্যা রাজকুমারী এ্যানের-বিবাহ হয়েছিল হল্‌ষ্টেনের বিদেশী ডিউকের সঙ্গে। এলিজাবেথের বরাবর বাসনা ছিল—তরুণ বয়সের তরুণ-পুত্র তৃতীয় পিটারকে, রোমানফ্ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী-হিসাবে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা। সে-উদ্দেশ্য তিনি তাঁর মনুপ্রহীতা-অনুচরী সোফিয়া অগস্টার সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় পিটারের বিবাহ দিয়ে, তাঁকে নিজের পাশে রেখে দরবারের আদব-কায়দা শিখিয়ে দুরস্ত করে তুলেছিলেন। সোফিয়া অগস্টা ছিলেন যেমন প্রখর-বুদ্ধিমতী, কূটনীতিতে তেমনি নিপুণ। তৃতীয় পিটারের চরিত্র পত্নীর বিপরীত। তিনি যেমন নির্বোধ-অকর্মণ্য, তেমনি বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল। রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে রাজ কার্য-পরিচালনার কিছু না শিখে, তৃতীয় পিটার অষ্টপ্রহর ভোগ বিলাস-আনন্দ নিয়ে মেতে থাকতেন। তাছাড়া সোফিয়ার সঙ্গে তাঁর মনের মিল ছিল না। অপরার্থ-নির্বোধ স্বামীকে সোফিয়াও মনে-প্রাণে অপছন্দ করতেন···স্বামী-সেবার বদলে দরবারের প্রতিপত্তিশালী অমাত্যদের উপর প্রভাব-বিস্তার করে তাঁদের চিত্ত-জয় এবং সহানুভূতি-অর্জনের দিকেই ছিল সোফিয়ার লক্ষ্য। ছলে-বলে-কৌশলে সিংহাসন অধিকার করা ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। এ-কামনা চরিতার্থ করার জন্য ক্ষমতালিপ্সিণী সোফিয়া দরবারের দুর্নীতি-পরায়ণ অমাত্যদের যে প্রথম-উপায়ে বশীভূত রেখেছিলেন, তা শুনলে শিউরে উঠতে হয়! সিংহাসন অধিকার করতে হলে যে-সব ক্ষমতাশালী অমাত্যের সহযোগিতা একান্ত-প্রয়োজন বলে বুঝতেন, উৎকোচ-উপহার এমন কি অন্তরে প্রেম-নিবেদন এবং নিজের দেহ-দানে তৃপ্ত করে, সোফিয়া তাঁদের বশে রাখতেন। এই সব গর্হিত-অনাচারের ফলে, দেশের লোকের বিরাগভাজন হওয়া দূরের কথা, দুর্নীতির দিকে রাজা তখন এমন বিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে, রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুর অব্যবহিত-পরে সোফিয়া যখন অনুরাগী-অনুচরদের সাহায্যে স্বামী তৃতীয় পিটারকে ষড়যন্ত্রের কৌশলে রাজ-সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিলেন, তখন প্রজারা সে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ জানালো না! তা ছাড়া, দরবারের নৈতিক-আবহাওয়াও সে-সময় এমন কলুষিত হয়ে উঠেছিল যে, দেশের রাজভক্ত 'প্রিয়োব্রাজেন্‌স্কো' সেনাদলও দেশে লোকান্তরিত পিটার দি গ্রেটের একমাত্র-পৌত্র রোমানফ্-বংশধর তৃতীয় পিটারের উত্তরাধিকারিত্বের ন্যায্য-দাবী অগ্রাহ্য করে বিদেশিনী সোফিয়াকে মহারাণী-হিসাবে সিংহাসনে বসাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। শুধু সিংহাসনচ্যুত নয়, তৃতীয় পিটারকে তারা নির্জন আবাসে বন্দী করে রেখেছিল! বন্দী-দশায় পিটারের সঙ্গী ছিল শুধু তাঁর উপ-পত্নী, এক কাফ্রী-ক্রীতদাস, একটি পোষা কুকুর, আর একটি বেহালা! সেই বন্দী-শালাতেই সোফিয়ার অন্যতম-প্রণয়ী গ্রেগরী ওর্লফ্ নামে এক অভিজাত-

নেপোলিয়নের অগ্নি-প্রজ্বলিত মস্কো রাজধানীতে প্রবেশ—প্রাচীন রুশ চিত্রের প্রতিলিপি

যুবক তৃতীয় পিটারের সঙ্গে বন্দী-জীবন যাপন করতে থাকেন। সোফিয়ার সঙ্গে তৃতীয় পিটারের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, গ্রেগরী ওর্লফ্ তৃতীয় পিটারের বন্দী-জীবনের সঙ্গিনী হয়েছিলেন। তৃতীয় পিটারের বন্দী-জীবনের সঙ্গিনী গ্রেগরী ওর্লফ্ ছিলেন সুন্দরী, সুরসিকা এবং সুগায়িকা। তাঁর সঙ্গ-সুখে তৃতীয় পিটার বন্দী-জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকতেন। তৃতীয় পিটারের বন্দী-জীবনের সঙ্গিনী গ্রেগরী ওর্লফ্ ছিলেন তৃতীয় পিটারের প্রণয়িনী

মারাঠা রাজ সভায় রাজা ও মন্ত্রিবর্গের বসে থাকার রীতি—প্রাচীন এক চিত্রের প্রতিলিপি

অপ্সরা

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী

আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে
তান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে।
• • • •
কূলপ্লাবী নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা
তুমি অনিন্দিতা।

রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর প্রশস্তির মধ্য দিয়া অপ্সরার জন্ম-কাহিনীর সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আদিম যুগ, বসন্তকাল, ক্ষীরোদসাগর মন্থিত। দেবাসুর অমৃতের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত। এমন সময় সাগর হইতে উত্থিতা হইলেন—অপরূপ লাবণ্যময়ী, পূর্ণযৌবনা, নগ্নকান্তি উর্বশী; তাঁহার একহাতে সুধাপাত্র, একহাতে বিষভাণ্ড। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে সমুদ্র মন্থনকালে সমুদ্রগর্ভ হইতে অসংখ্য অপরূপ সুন্দরী নারী উত্থিতা হইয়াছিলেন। এই সমস্ত নারীদিগকে দেবাসুর কেহই গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই, কারণ তাঁহাদের বংশ কিংবা গোত্রের কোন পরিচয় ছিল না; সুতরাং তাঁহারা "সাধারণী" নামে পরিচিতা হইলেন। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্র এই সলিলোত্থিতা রূপলাবণ্যময়ী অনন্তযৌবনা নারীদিগকে বন্দনা করিয়া সুর সভায় আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহারা সুরসভাতলে নর্তকীপদ লাভ করিলেন। অপঃ (জল) হইতে উত্থিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা অপ্সরা নামে পরিচিতা হইলেন (অন্তঃ সরতি ইতি অপ্সরা)। এই হইল অপ্সরার জন্মকাহিনীর পৌরাণিক ইতিহাস। এই কাহিনী রামায়ণের আদিকাণ্ডে এইরূপই বর্ণিত আছে :—

অপ্সু নির্মথনাদেব রসাতস্মাদ্বর স্ত্রিয়ঃ
উপেতুমমুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্সরসোঽভবন্।
• • • •
ন তাঃ স্ম প্রতিগৃহ্ণন্তি সর্বে তে দেবদানবাঃ
অপ্রতিগ্রহণাদেব তা বৈ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ।

১।৪৩।৩৩,১৫

অপঃ বা সলিল মন্থন হেতু উত্থিত রস হইতে উত্থিত হওয়ায় উহার নাম অপ্সরা। দেবদানব কেহ গ্রহণ না করায় তাঁহারা 'সাধারণী' নামে পরিচিতা হইলেন।

হরিবংশে উল্লিখিত আছে যে অপ্সরা ব্রহ্মার 'সঙ্কল্পজাতা কন্যা' (হরিবংশ ১২৪৭৩)—অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটি। অন্যস্থানে উল্লেখ আছে যে অপ্সরাগণ দক্ষকন্যার সন্তান। ব্রহ্মার সঙ্কল্পজাতা অপ্সরাদের মধ্যে মেনকাদি এগারজন বিখ্যাত অপ্সরার নাম উল্লেখ আছে। তাঁহাদের অন্য নাম 'বৈদিকী'। তাঁহারা বৈদভাষাপন্না এবং বেদেও তাঁহাদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ আছে—যথা—মেনকা, সহজন্যা, পদ্মিনী, পুঞ্জিকস্থলা, ঘৃতস্থলা, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, উর্বশী, অলম্বুষা, প্রম্লোচা ও মনোবতী। বায়ুপুরাণে উল্লেখ আছে যে নারায়ণের উরু হইতে এক পরমাসুন্দরী অপ্সরা প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন; উরু হইতে উদ্ভূত বলিয়া উহার নাম উর্বশী (বায়ুপুরাণ ৭২, ৬৯, ৯০)। ইহা ছাড়া অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে আরও আঠার জন বিখ্যাত অপ্সরার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা দক্ষের অন্যতমা কন্যা কাশ্যপ ঋষির ত্রয়োদশী পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আঠার জনের মধ্যে তিলোত্তমা, রম্ভা, অলম্বুষা, মিশ্রকেশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যা। তাঁহারা 'মৌনেয়' অপ্সরা নামে পরিচিতা। হরিবংশের উল্লেখ অনুসারে প্রধা অপ্সরাদিগের জননী (হরিবংশ ১১৫৭৪) এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১০৪ অনুসারে মুনি গন্ধর্বদিগের জননী। বিষ্ণুপুরাণে (১,২১,২৪) উল্লেখ আছে যে সমস্ত অপ্সরাই মুনির গর্ভসম্ভূতা। দক্ষকন্যা মুনির গর্ভে সুপর্ণ, বরুণ, চিত্ররথ, নারদ প্রভৃতি কয়েকটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ইঁহাদের কেহ দেবতা, কেহ বা গন্ধর্ব (মহাভারত আদিপর্ব্ব ৬৫ শ্লোক)।

রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত অপ্সরাদের মধ্যে মেনকা উর্বশী, ঘৃতাচী, মিশ্রকেশী এবং রম্ভার অনেকবার উল্লেখ আছে। অন্যদিকে গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্রাঙ্গদা, চিত্রসেনা এবং সুগন্ধার নামই বেশী পাওয়া যায়। যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় অপ্সরা ছিলেন শুচী।

মেরুপর্ব্বতে সাধারণতঃ অপ্সরাদের আবাস। মহেন্দ্র

পর্ব্বত এবং মলয় পর্ব্বতও অপ্সরাদের প্রিয় ছিল। তাঁহারা সরস্বতী, কাবেরী, যমুনা এবং গঙ্গার তটভূমিতে বাস করিতেন। নন্দন, মন্দার, মুঞ্জবৎ প্রভৃতি অঞ্চলেও অপ্সরার সন্ধান পাওয়া যায়। অপ্সরা ছিলেন নৃত্যগীতবিলাসিনী। দেবতাদের সভায় অপ্সরাদের গতি ছিল অবারিত। মানুষের সভাতেও অপ্সরাদের গমনাগমন ছিল। রাজা দিলীপের যজ্ঞভূমিতে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন (মহাভারত ৭।৬২।৭)। বিশ্বাবসু এই নৃত্য সভায় সঙ্গীত সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

অপ্সরাগণ দেববালা, দেবপত্নী এবং দেব-সঙ্গিনী নামে পরিচিতা ছিলেন। তাঁহারা রত্ন, মাল্যচন্দন এবং সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার করিতেন; কণ্ঠে হার, কটিতে মেখলা এবং চরণে নূপুর পরিধান করিতেন। নন্দনকাননের দ্বারে অপ্সরাগণ মালা হস্তে পুণ্যাত্মাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেন। বীণা, বল্লকী, মুরজ এবং ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা অভ্যাগত জনের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদের কেশভার পৃষ্ঠ বেণীতে বিভক্ত ছিল। সেই বেণী চূড়াকারে শিরের শোভাবর্দ্ধন করিত। সুতরাং অপ্সরার অন্য নাম পৃষ্ঠবেণী। অপ্সরাগণ কখন কখন নগ্ন হইয়া মন্দাকিনীতে অবগাহন ও লীলা করিতেন। ব্যাসদেব মন্দাকিনীতে অপ্সরাগণকে তাক্ত-বসনা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন। শুকদেব কিন্তু তাক্ত-বসনা লীলা-বিলাসিনী অপ্সরাদিগকে দেখিয়া কুণ্ঠিত হন নাই, কারণ শুকদেব ছিলেন নিষ্পাপ, আত্মস্থ এবং বিদেহ। নৃত্য অপ্সরাদের জীবনের অঙ্গ। মুনিঋষিদের আশ্রমে শুভকর্ম্মে এবং তাঁহাদের প্রীত্যর্থে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেন। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে ইন্দ্র, কুবের এবং ব্রহ্মার সভা হইতে বহু অপ্সরা নৃত্য করিতে আসিয়াছিলেন (রামায়ণ ২।৯১।১৬)। দৈত্যের সভায়ও অপ্সরা নৃত্য করিতেন। পদ্মপুরাণে আছে জালন্ধর দৈত্যের সভায় অপ্সরাগণ নৃত্য গীতের জন্য নিযুক্ত ছিলেন (পদ্ম, উত্তর ৮)। মেনকা কুবেরের সভায় নৃত্য করিয়াছেন, (মহা-সভা ১০)। পুঞ্জিকস্থলা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর রাজসভায় নৃত্য করিতেন (মৎস, ১৬১)।

অপ্সরাগণ অত্যধিক দেহ-বিলাসিনী ছিলেন। এইজন্য অপ্সরার অন্য নাম রতি এবং বিশেষ করিয়া একজন বিশিষ্ট অপ্সরা রতি নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। হতাশ প্রেমিকা নারী রতি নাম্নী অপ্সরাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতেন এবং প্রেমের দেবতার উৎসব করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

সরস্বতী নদীর তীরে সুভূমিক নামে একটি তীর্থ ছিল। সেখানে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং মুনিঋষিগণ অন্ততঃ মাসান্তে একবার করিয়া দীব্যক্রীড়া উপভোগ করিতেন। পুরাণে দেখা যায় যে অপ্সরাগণ দেবতার মনস্তুষ্টির জন্য মুনিগণের ধ্যান এবং তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেন। অলঙ্কার-বিভূষিতা, নৃত্যপটিয়সী সঙ্গীত-বিলাসিনী অপ্সরাগণ বক্ষস্থানে চটুল নয়নাঘাতে কিংবা লীলায়িত দেহভঙ্গীর দ্বারা মুনি ঋষিদের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছেন।

অপ্সরাগণের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল। অপ্সরাগণের মধ্যে পুরুষ ছিল না। সুতরাং অপ্সরাগণ অন্য জাতীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিতেন। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আছে যে, কুবেরের পুত্র নলকুবের রম্ভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অপ্সরাদের বিবাহ চিরন্তন ছিল না। তাঁহারা সধবা-ভর্তৃকা ছিলেন না অর্থাৎ তাঁহাদের একমাত্র স্বামী থাকিতেন না। রাবণ একদা রম্ভাকে দিব্যবসনে বিভূষিতা হইয়া পথে গমন করিতে দেখিলেন। রাবণ রম্ভার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন। রম্ভা বলিলেন—আমার পথরোধ করিয়া আমার অপমান করিবেন না। আমি আপনার ভ্রাতা কুবেরের পুত্রবধূ, সুতরাং আপনারও পুত্রবধূ। রাবণ বলিলেন—

ন ত্বামস্মি মদেবো চত্বমেব পত্নীত্বয়ং ক্রমঃ।
দেবলোকস্থিতিরিয়ং সুরানাং স্বাগতীমতা॥
পতিরপ্সরাং সাধ্বি চৈক, স্ত্রী পরিগ্রহঃ।

রামা—১।৫।৩৩

অর্থাৎ তুমি যদি কোন পুরুষের একমাত্র স্ত্রী হইতে, তোমার কথার মূল্য প্রয়োগ করা যাইত। তুমি অপ্সরা। অপ্সরা জাতির সর্ব্বদা এক স্বামী থাকে না।

মেনকা ঊর্ণায়ুর পত্নী ছিলেন। তিনিই প্রমদ্বরার মাতা, অথচ এই প্রমদ্বরার পিতা ছিলেন গন্ধর্ব্ব বিশ্বাবসু। প্রতিষ্ঠানপুরের অধিপতি পুরুরাজের ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ুর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র নহুষ। কথিত আছে এই নিষ্করুণা মেনকা জন্মের পরমুহূর্ত্তেই সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রমদ্বরা যৌবনে ঘৃতাচী অপ্সরার পুত্রকে

বিবাহ করিয়াছিলেন। মেনকা তাঁহার অন্যতমা কন্যা শকুন্তলাকেও জন্মের পরেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য ইন্দ্রের প্ররোচনায় বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের ফলেই শকুন্তলার জন্ম হইয়াছিল।

ইন্দ্র অপ্সরা দ্বারা অনেক অপকর্ম্ম করাইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে তপস্যার দ্বারা ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারিত। সুতরাং ইন্দ্র অপরকে কঠোর তপস্যা অথবা যজ্ঞে নিয়োজিত দেখিলে আতঙ্কিত হইতেন। অপরের যজ্ঞ ও তপস্যা নষ্ট করিবার জন্য ইন্দ্র অপ্সরাদের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। পুঞ্জিকস্থলা নামক অপ্সরাকে মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য প্রেরণ করেন (ভাগ ১২ স্কো) রম্ভা ইন্দ্রের আদেশে জাবালীর তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন (স্কন্দ-নাগ, ১৪৩); মরীচিকে আকর্ষণ করিবার জন্য অলম্বুষাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। অলম্বুষার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ঘৃতাচী ভরদ্বাজের তপোভঙ্গ করিয়াছিলেন ফলে দ্রোণের জন্ম হইয়াছিল। বিভাণ্ডক মুনির তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরা উর্ব্বশীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিভাণ্ডক-উর্ব্বশীর পুত্র হইলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। উর্ব্বশী ও পুরূরবার কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশী ছয়টী পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা রাক্ষসদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছিলেন। কিংবদন্তি অনুসারে তিলোত্তমার রূপ দর্শনের জন্য ইন্দ্র সহস্র চক্ষু হইয়াছিলেন এবং শিব চতুরানন হইয়াছিলেন। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই দৈত্যকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যকে তিল তিল সংগ্রহ ও সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী একটি অপ্সরা সৃষ্টি করিলেন। ইঁহারই নাম তিলোত্তমা। বৃত্রের পিতা ত্রিশিরা নামক রাক্ষসের তপোভঙ্গ করিবার জন্য ইন্দ্র "শৃঙ্গারবেশা" চারুস্যমন্বী তিনটী অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অপ্সরাদের অপাঙ্গ-দৃষ্টি এবং লাস্যময়ী হাস্য ত্রিশিরাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন মেনকা (দেবী ভাগবৎ ৯ম স্কন্দ)।

এই অপ্সরাগণ স্বর্গের নর্ত্তকী বলিয়া সাধারণতঃ পরিচিতা। ইন্দ্রের অমরাবতীতে অপ্সরাগণ সতত নৃত্য করিতেন। অপরাধ করিলে অভিশাপগ্রস্ত অপ্সরাগণ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতেন। ইন্দ্রের নৃত্য সভায় তাল নষ্ট হওয়ার অপরাধে ইন্দ্রের অভিশাপে রম্ভা বিকলাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে অপ্সরা আদ্রকা ব্রহ্মার অভিশাপে বমুনায় মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে রাজা বসুর ঔরসে আদ্রকার সত্যবতীনামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। সত্যবতীর পুত্র ছিলেন ব্যাসদেব (মহা-আদি, ১৫), ব্যাসদেবের ঔরসে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেবের জন্মকালে অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। হাহা এবং হুহু নামে গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত এবং বাদ্য দ্বারা শুকদেবের শুভ জন্মক্ষণকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের জন্মকালেও অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। ভীষ্ম যেদিন কৌমার্য্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেদিন অপ্সরাগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপ্সরারাও অভিশাপ দিতে পারিতেন। ঘৃতাচী বিশ্বামিত্রকে শাপ দিয়াছিলেন, ফলে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এক গোপবালাকে বিবাহ করেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত—ব্রহ্ম-১০)।

কখনও কখনও দেখা যায় যে অপ্সরাগণ স্বেচ্ছায় মুনিঋষিগণের ব্রত ভঙ্গের চেষ্টা করিয়াছেন। ভগ্নী, সৌরভী, সমীচী, বুদবুদা এবং লতা নাম্নী পাঁচ জন অপ্সরা এক ব্রাহ্মণের তপোভঙ্গের চেষ্টা করার অপরাধে এক বৎসরের জন্য কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইলেন। রামায়ণে এই পাঁচ জন অপ্সরার অধ্যুষিত একটি সরোবরের উল্লেখ আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্সরা অন্তরীক্ষে উপস্থিত থাকিয়া বীরদিগকে সাধু সাধু বলিয়া উৎসাহিত করেন। মৃতবীরকে দিব্যরথে আরোহণ করাইয়া গীতবাদ্য সহযোগে স্বর্গে লইয়া যান। যুদ্ধজয়ী বীরদিগকে মৃত্যুর পরে অপ্সরাগণ সঙ্গীত বাদ্য ও সঙ্গ দ্বারা তৃপ্ত করেন (মহা ৫-২১ ; ১৩-১০৭-১৮)।

অপ্সরার সঙ্গে মানুষ, দেবতা, যক্ষ, রক্ষের বিবাহ হইত। ভরতবংশীয় বিদ্যাধের ঔরসে মেনকার গর্ভে দিবোদাস ও অহল্যার জন্ম হয় (মৎস—৫০), মেনকার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। পুঞ্জিকস্থলার গর্ভে মহর্ষি পারের ঔরসে কলাবতীর জন্ম হয় (মার্ক—৬৪)। ঘৃতাচী অপ্সরার সঙ্গে রাজা কুশের পুত্র কুশনাভের বিবাহ হয়। ঘৃতাচী শত কন্যার জননী (রামা, ১।৩)। ঘৃতাচীর গর্ভে ঋষির পুত্র প্রমদ্বরের ঔরসে রুরু নামে এক পুত্র জন্মে (মহা, আদি-৫)। রাজর্ষি ভদ্রেশ্বরের ঔরসে ঘৃতাচী কন্যা জন্মে। উহারা সকলেই অত্রির স্ত্রী ছিলেন (লিঙ্গ—৬৩)।

বশিষ্ঠের ঔরসে ঘৃতাচীর কপিঞ্জল নামে এক পুত্র জন্মে (লিঙ্গ—৬৩)। ধনে কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রা নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই চিত্রাকে চন্দ্রের পুত্র বুধ বিবাহ করিয়াছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-ব্রহ্ম ১০)। পর্জ্জন্য নামক গন্ধর্ব্বের ঔরসে ঘৃতাচীর গর্ভে বেদবতীর জন্ম হয়। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ভ্রাতা ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত বেদবতীর বিবাহ হয় (বামন-পুরাণ ৩২, ৩৪)। এই সমস্ত কাহিনী হইতে মনে হয় যে ঘৃতাচী মানব, ঋষি, রাজর্ষি দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নানা জাতির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্য সমাজের পুরুষ জাতির সংস্পর্শে আসিতেন। হেমা নাম্নী অপ্সরা ময়দানবকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারই কন্যা মন্দোদরী রাবণকে বিবাহ করিয়াছিলেন (রামা ৪-৪-৩৯)। পুঞ্জিকস্থলা অভিশাপগ্রস্ত হইয়া অঞ্জনা নামে বানররাজ কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কেশরীর বিবাহ হয় (রামা ৪-৬৬-৮); অঞ্জনার গর্ভে পবনের ঔরসে হনুমানের জন্ম।

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, নাগ, পন্নগ প্রভৃতি জাতির ইতিহাস আংশিক রচনা করা যাইতে পারে। ঐ ইতিহাস বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

অরণ্য-স্মৃতি

শ্রীদেবপ্রসাদ গর্গ

২

ড্রাইভার বলল—বরাইকে ট্রাক থেকে নামতে হ'বে। অবশ্য অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই নির্দ্দেশ পালন করতে বাধ্য হলাম। শুধু নামা এবং—মোট মুটে পুলে সেই নদী শুধু পায়ে পার হতে হল। পায়ে সেই ঠাণ্ডা জল লাগতেই মনে হচ্ছিল যে মরা মনে হল, তারপর অবশ্য সব অসাড় হয়ে যাবার মত হ'য়েছিল। ঘণ্টা খানেক পরিশ্রমে ট্রাক সেই নদী পার হ'ল। আমিও আবার চড়ে বসলাম।

এখানে নদী থেকে আমাদের অনেকে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করতে গিয়েছিলেন বলে একটু অপেক্ষা করতে হল। এইখানে অপেক্ষা করতে করতে পূর্ব-আকাশে একটু ফর্সা হ'ল। আকাশের নক্ষত্ররাশিও একে একে মিলাতে সুরু করলে। নদীর দু'পাশের বন আমাদের দেখা যেতে লাগল। নদীর পরেই একটা "ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড" ছিল, গরুর গাড়ীগুলির রাত কাটাবার জন্য। যে সব গরুর গাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বে ডিপোতে বা ষ্টেশনে পৌঁছাতে পারবে না, তারা ঐ ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডগুলিতে আগুন জ্বালিয়ে রাত কাটাবে—এই হ'ল সংরক্ষিত বনের আইন। জঙ্গলের অন্য কোনও অংশে আগুন জ্বালাবার নিয়ম নেই—পাছে জঙ্গলের শুকনো গাছ পাতায় আগুন লেগে যায়। আবার আগুন না জ্বালালেও উপায় নেই, বাঘে গরু বা মহিষ নিয়ে যাবে। তাই এই "ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ড"-গুলির প্রয়োজন। এই ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে প্রায় ষোল, পনেরটী গাড়ী আর তত ঘোড়া বলদ এবং প্রায় জন ত্রিশেক লোক রাত কাটাচ্ছিল। তারাও সেই মাত্র ঘুম থেকে উঠে মুখে চোখে জল দিচ্ছে। আমাদের মধ্যে যেকে যাঁরা মুখে চোখে জল দিতে এলেন তাঁরা হিতে খুবই কাতর হ'লেন। হাতে দাঁত কন্ কন্ করতে করতে কোন রকমে ট্রাকে এসে উঠলেন। এই নদীটীর নাম "সিলা"। এই নদীটী আমাদের শিকারের ব্লকের মধ্যে। এখানে প্রায় কুড়ি মিনিটকাল বিশ্রামের পর পুনরায় আমাদের ট্রাক ছাড়ল। এবার বাইরের বৃক্ষ বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তার বাঁদিকে একটা বেশ উঁচু জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় পড়ল। খুব লম্বা, প্রায় তিন চার মাইল হ'বে। এই পাহাড়ও আমাদের রাস্তার মাঝে যে জায়গা আছে সেটাতে ছোট ছোট ঝাঁটি বন। এক এক স্থানে আবার ছোট ছোট দল পরেরটী করে খোলার-ছাওয়া কর্দ্দু অধিবাসীদের ঘর। এ গুলো এক একটা গ্রাম। অধিবাসীর সংখ্যা এক একটিতে বিশ, বাইশ জনের বেশী নয়। তাদের কিছু কিছু ক্ষেত আছে, আর আছে গরু মহিষ।

কিছুদূর আরও এগিয়ে গেলে পর কতকগুলি উট, প্রায় দশ বারটী হবে—কিছু কিছু মাল পাথাই করে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছে, দেখতে পাওয়া গেল। এই ভাবে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ঘুরে একটা ছোট টিলার উপর আমাদের ব্যাংলো দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে একটা মোড় ঘুরে ব্যাংলোর গেট পার হ'য়ে ব্যাংলোর সামনে এসে পৌঁছালাম। বেশ সুন্দর আসবাবপত্রে সাজান এই ব্যাংলো। ঘরগুলায় ঘরগুলায় পর্দ্দা টাঙান। দুটী শোবার কামরা। মাঝে আর একটী বড় কামরা। সেটী খাবার বা ডাইনিং হল্। আর্শি ও বেতের ইজি চেয়ারেরও অভাব নেই। মেঝেতে জাজিম ঘাসে বোনা এক প্রকারের "ম্যাটিং" পাতা। বেয়ারার ঘরে 'খাবার মেস' বা চিমনি করা আছে প্রতি ঘরে—ঘর গরম রাখার জন্য।

দেখানে পৌঁছবার প্রথমে হাঁড়ীতে জল গরম করে সকলে স্নানের পালা শেষ করা গেল। স্নান করার পরই আলস্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। চাকরেরা এই সময়টাতে গান করে কেললে। কিছুক্ষণ বাদে একজন চাকর এসে ঘুম ভাঙালে ও সামনে এক কাপ গরম চা রাখলে। ঘুম ভাঙাতে মেজাজটা একটু যে খিঁচড়ে যায় নি তা নয়, কিন্তু সামনে গরম চা পেয়ে কোন রকমে লেপটা গা থেকে সরিয়ে উঠে পড়লাম। চাকরের মুখে শুনলাম বেলা সাড়ে ন'টা বেজে গিয়েছে। সকালে মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে আর কিছু খাওয়ার অবকাশ হয়নি, তাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ খালি করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি শিখ ফরিদার রেঞ্জার সাহেব এসে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা কইছেন। আমার সঙ্গে আলাপ হ'ল। ভদ্রলোকটী মারাঠী ব্রাহ্মণ, খুব পোঁড়া। তিনি তাঁর ওপরেই অফিসারের কাছ থেকে আদেশ পেয়েছেন—সর্ব্ব বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে। আমরা গোটা তিনেক মো'ষ শিকারে বলালাম। এ গ্রামে মোষ পাওয়া যাবে না, সুতরাং দু'চার জায়গা খোঁজ করতে হ'বে। ঐ মোষগুলি বাঘ শিকারে একান্ত প্রয়োজন। ওগুলিকে রোজ বিকালে যেখানে রাত্রে বাঘ চলাচল করা সম্ভাবনা আছে সেই রকম স্থানে বেঁধে আসতে হবে। রাত্রে বাঘের দৃষ্টিগোচর যদি হয়, আর যদি তখন তারা ক্ষুধার্ত্ত থাকে তাহলে ঐ মোষগুলির একটীকে মেরে টেনে নিয়ে যাবে ও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে উপর থেকে শকুন বা কাকের দৃষ্টি যাবে না এইরকম স্থানে নিয়ে গিয়ে ভূরিভোজ করবে। কিন্তু একটা বাঘ গোটা মো'ষটাকে এক রাতে খেয়ে শেষ করতে পারে না, তাই দিনের আলোতে তা'রা কাছেই কোথাও শুয়ে ঘুমাবে ও আবার সন্ধ্যের পর এসে বাকি অংশ খাবে। এটা প্রায় স্থির নিশ্চয় যে যদি কাছাকাছি কোন জলাশয় থাকে তা'হলে বাঘ তারই আশে পাশে কোথাও নিশ্চয় দিবা নিদ্রা যাবে। এই রকম জঙ্গল যেখেই ঐ মোষগুলো বাঁধা হয়। পরদিন দুপুর বেলা সেই জঙ্গল 'বিট' করালে বাঘ মরা গুরু পালাবে ও তার পালাবার রাস্তার উপর শিকারি কোন গাছে মাচান করে বসবেন এবং বাঘ সুবিধামত জায়গায় এলেই গুলি করবেন। কিংবা শিকারী ঠিক যেখানে বাঘে মরাটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রেখেছে, তারই উপর কোন গাছে মাচান বেঁধে বসবেন ও দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর বা সন্ধ্যে বেলায় যখন সেই মরা মো'ষ বা "বড়ি" খেতে আসবে তখন তা'কে গুলি করবে। তা'ই বাঘ মারার জন্যে এই মো'ষগুলি অপরিহার্য্য।

আমাদের তিনটী মো'ষ যোগাড় করার ভার শিকারী চমক্ সিংকে দেওয়া হ'ল। চমক্ সিংএর এ জঙ্গলের কোথায় বাঘ চলাফেরা করে তা' জানা ছিল। কোনও বাইরের শিকারী সেখানে গিয়ে বন্ জঙ্গল ভেঙে বাঘের খাবার দাগ খুঁজে খুঁজে তা'র চলাচলের পথ বার করতেই মাসখানেক কেটে যাবে, তা'ই এই ব্যবস্থা। চমক সিংই এই মো'ষ তিনটী প্রায় তিন মাইল দূরবর্তী মিঞাগঞ্জ গাঁ থেকে কিনে এনেছে। চৌদ্দ টাকা প্রত্যেকটীর দাম দিয়েছে। সে'কালে ঐ দামই ছিল যথেষ্ট ঐ জঙ্গলীদেশে।

দুপুর বেলা ঘণ্টাখানেক দিবানিদ্রা দেবার পর তিন দিন তিন রাত্রি রেঞ্জারীতে জঙ্গলের গল্পে অনেকটা গেল। বৈকাল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ উঠে প্রথম দিন মো'ষ বাঁধার স্থানগুলি নিজেই দেখতে যাব স্থির করে চমক্ সিংএর সঙ্গে যা'র হবার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। সাথে চলল মথুরা সিং, গনেশ গয়লা ও নরহর পিঠারী। ওরা প্রত্যেকে এক একটী মোষের দড়ি ধরে নিয়ে চলল। আমাদের বাংলো থেকে প্রায় আধ মাইলের মধ্যে একটী মো'ষ বাঁধা হল। সেখানে ঘাস খুব কম। একটী ছোট শুকনো নদী প্রায় হাত পঞ্চাশেক চওড়া, তা'র দু'দিকেই জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড় ছিল। ঠিক নদীর মাঝখানটীতে আমাদের প্রথম মো'ষটীকে বাঁধা হ'ল। রাতের আঁধারেও যাতে দু'পাশের জঙ্গল থেকে দেখা যায়—এই ভাবে বাঁধা হ'ল। সেখান থেকে আরও প্রায় আধমাইল অগ্রসর হ'য়ে একটা ঝরায় লাইম ও একটী পাহাড়ী নালার সংযোগস্থলে বাঁধা হ'ল। তৃতীয়টী পুনরায় বাংলোর অপর পাশে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটী পাথর ও নুড়ীবহুল শুকনো নদীর মাঝে বেঁধে আসা হ'ল। এই শেষোক্ত স্থানেও দু'দিকে গাঁয়ের জঙ্গল ছিল। মোষগুলি যে সব স্থানে বেঁধে আসা হ'ল তা'র প্রত্যেক জায়গাতেই বাঘের চলাফেরার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। বিশেষতঃ প্রথম স্থানটীতে বাঘে ঐ প্রথম 'বেট'টী মারবে এটা আমরা খুবই আশা করেছিলাম।

যখন বাংলোয় ফিরলাম তখন প্রায় বেলা পাঁচটা। শীতের বেলা তা'ই সূর্য্য পাহাড়ের আড়ালে প্রায়ই গা ঢাকা দিয়েছেন। আমরা বাংলো থেকে ইজিচেয়ারগুলি সামনের আঙিনায় বা'র করে দু'তিনজন সঙ্গী মিলে আগামী দিন কি করা হ'বে ও যদি বাঘে আমাদের মেষগুলির একটীকেও মা'রে তা' হলেই বা কি ভাবে কি কি করা যেতে পারে তা'রই আলোচনা হচ্ছিল। আর যদি আমাদের বাঁধা মোষগুলির একটীও বাঘের দৃষ্টিগোচর না হয় এবং বাঘ যদি একটীও মো'ষ না মারে তা'হলেই বা কি করা যাবে। স্থির হ'ল সে যদি একটীও মো'ষ বাঘের পেটে না যায় তা' হলে একটা জঙ্গল হাঁকিয়ে হরিণ, শূয়র প্রভৃতি যা হোক কিছু শিকার করে আনা যাবে।

ক্রমে শীত বাড়তে লাগল। আর বাইরে বসা সম্ভব হল না, আমরা বাংলোর বারান্দায় উঠে এলাম। এখান থেকে সামনে চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। সামনে ঢেউএর মত চলে গেছে পাহাড়ের পর পাহাড়। প্রত্যেক পাহাড়ের গায়ে লোমের মত দেখা যায় পালের বন। ঐ সব বনের মধ্যে বিচরণ করছে কত সিরীহ হরিণকুল ও ছোট ছোট জীবজন্তু —যেমন নানা জাতের ছোট ছোট বিড়াল-জাতীয় জানোয়ার, সজারু, র‍্যাটেল, প্যাঙ্গোলিন, খরগোস ইত্যাদি। আর হিংস্র জানোয়ারদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত বাঘ, ভালুক, বাইসন, বন্যবরাহ ইত্যাদি।

সঙ্গীদের মধ্যে অনেকের জঙ্গল সম্বন্ধে এইটী ছিল প্রথম অভিজ্ঞতা। তাই তারা যা' কিছু দেখছিল তা'তেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। যারা শিকারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে তা'রা অবশ্য সব সময়েই বাস্তবের মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছিল। ওদের মধ্যে বাঘের আবার একটু সাহস বেশী, তারা ওভারকোটে আবৃত হ'য়ে জ্যোৎস্না রাতে

খানিক পাড়া বেড়িয়ে আসবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে অবশ্য বিষ-বিষাক্ত-সংযুক্ত রাইফেল নিতে ভুল করল না কেউই। আমিও তাদের সঙ্গী হ'লাম।

প্রথমে বেরিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে শিহ-কিরির রেঞ্জার সাহেবের কোয়ার্টার পড়ল। জানালার ভেতর দিয়ে দেখি ভেতরে তেলের আলো একটী জেলে স্বয়ং রেঞ্জার সাহেব বোধকরি কাজে ব্যস্ত আছেন। ঐ দিতে সন্ধ্যের পর তাঁর বাসার সামনে দিয়ে সাধুরে সড়কে অতগুলি ছুতোর শব্দে একটু আশ্চর্য্য বোধ করে তাঁর সেই আলোর দিকে হাত আড়াল দিয়ে জানালা দিয়ে ব্যাপার কি তাই দেখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে আমিই বলে উঠলাম "কি রেঞ্জার সাহেব, কাকে ব্যস্ত আছেন নাকি?"

"আপনারা এই নিতে এমন সময় কোথায় চললেন?" এই বলে হাসতে হাসতে গায়ে ওভারকোট ও মাথায় বালাক্লাভা ক্যাপ চড়িয়ে আমাদের সঙ্গে যাবার জন্যে বেরিয়ে এলেন। আমরাও তাঁকে পেয়ে খুশী হ'লাম। তিনি আশপাশের রাস্তাঘাট ও বনজঙ্গল সবই চেনেন, সেই জন্যে তিনি আমাদের সঙ্গে আসাতে সুবিধাই হল। এই দিনের ঘটনা লিখছি এই জন্যে যে ঐ যাত্রায় এক কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। আমরা চারু পথ ধরে চললাম। চারিদিকে বেড়া দেওয়া রবি শস্যের ছোট ছোট ক্ষেত জ্যোৎস্নার আলোতে চমৎকার দেখাচ্ছিল। এক একটী ক্ষেতের মধ্যে খুঁটে খুঁটে প্রায় হাত চারেক উঁচু করে ছোট ছোট মঞ্চ তৈরী করা রয়েছে। ঐ সব মাচার উপরটী শুকনো উপুখান দিয়ে ছাওয়া। রাতে বন্যজন্তুরা যে ফসল নষ্ট করতে না পারে সেই জন্যে রাতে ক্ষেতের মালিকের পরিবারের একজন করে ঐ মঞ্চগুলিতে শুয়ে থাকে ও প্রহরে প্রহরে যেমন পেয়াল চাকে তেমনি ঘাড় করে থেকে থেকে ওরা চেঁচিয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য যদি ক্ষেতের কাছাকাছি হরিণ বা বন-মুরোর এসে থাকে তবে ঐ চিৎকার শুনে পালিয়ে যাবে।

খানিকদূর যাবার পর একটী ছোট পাহাড়িয়া নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। নদীর উপর চওড়া করে কাঠের পুল তৈরী আছে। ঐ পুলের উপর দিয়ে মাল বোঝাই করা ট্রাক পার হ'য়ে যেতে পারে। এখন পর্য্যন্ত এদের বনতির মাঝখান দিয়ে, পুল পার হয়ে দেখা গেল খানিকদূর পর্য্যন্ত লালমাটির ডাঙ্গা পড়ে আছে। তার উপর আছে এদিক ওদিক ছড়িয়ে মহুয়া গাছ, গাম্ভার গাছ, পলাশগাছ ও আরও ৫।৭ রকমের বুনো গাছ। আর আছে থেকে থেকে একরকম কাঁটাওয়ালা কাঁটি বন। ঐ ডাঙ্গার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে চওড়া পথ একেবারে বনের মধ্যে। ঐ ডাঙ্গার দুপাশে দু'চারটী করে গাছ গাছ জমে বন হ'তে হ'তে জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। যেদিক থেকে এলাম সেইদিকে দূরে দু'চারটী গ্রামবাসীর গৃহের মধ্যে তাদের কথাবার্ত্তা শুনা যাচ্ছে। গ্রামের মধ্যে কখনও কখনও দু'একটা কুকুরের ডাকও কানে আসছিল। গ্রামবাসীরা নিতের দৌরাত্ম্যে সন্ধ্যা পার হ'বার পরই যে যা'র নিজের কুঁড়েতে ঢুকেছে। অনেকদূরে একটী ঘরের মধ্যে থেকে একটানা ঢোলের শব্দ কানে আসছিল। জ্যোৎস্নায় এই জায়গাটী চমৎকার লাগছিল। যদি নিত কিছু কম হ'ত ত ঐ জ্যোৎস্না রাতে সেই মনোহর দৃশ্য আরও খানিক বেশী করে উপভোগ করা যেত।

রেঞ্জার সাহেব বলে উঠলেন, রাতের বেলা পায়ে হেঁটে আর বেশী দূর এগোন উচিত হবে না। কারণ সামনে যে মহুয়া গাছগুলি দেখা যাচ্ছিল তার তলায় ঝরে-পড়া মহুয়া খেতে অনেক সময় ভালুক এসে থাকে। আর মানুষকে এড়িয়ে চলতেই চায় বহুক্ষণ না সে মানুষ-খেকো হচ্ছে, কিন্তু ভালুকের বেলায় সে কথা খাটে না। ওরা মানুষ দেখলেই তেড়ে আসে ও নখরাঘাতে মানুষের মাথা, মুখ-চোখের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলে এবং মানুষ অতীব যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়। রেঞ্জার সাহেবের মুখে এই কথা শুনে আমাদের মধ্যে যারা নূতন, তাদের অনেকেরই মুখ শুকিয়ে গেল। কেউ কেউ বলাবলি করল, "যাবা চলুন না এখানে এই ছাড় জমি করা নিতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।" বলতে কি, স্বয়ং রেঞ্জার সাহেবও সে স্থান ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়—এই রকমের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাঁরা সাহসী, তাঁরা ঘুরে ভালুক দেখা যায় কিনা তাই লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছিল।

আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে এতগুলি লোকের মাঝে কখনও কোন বুনো জানোয়ার আসবে না—এক বুনো হাতী বা বুনো মোষ ছাড়া। তা' ও-দুটোর একটাও এ অঞ্চলে নেই। তাই সকলের মতব্যের মাঝে নিজের মত ব্যক্ত করা অপেক্ষা চুপচাপ চাঁদনি রাতে বন্য সৌন্দর্য্য উপভোগ করা অনেকাংশে শ্রেয় বিবেচনা করে একটু দূরে সরে গিয়ে চুপ্‌চাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপর স্থির হল বাংলোর দিকে ফেরা যাক। সবাইের একমত হওয়াতে আবার বাংলোর দিকে যে পথে এসেছিলাম সেই পথ দিয়েই ফেরা হল।

এক সর্ষের ক্ষেতের ধার দিয়ে যাচ্ছি। সারি বেঁধে চলা হচ্ছে। প্রথম চলেছে ব—, তারপরে বন্দুক নিয়ে রেঞ্জার সাহেব, তারপর চলেছে স—, তারপর হ—, হ-এর পিছনে আছি আমি ও আমার পিছনে আছে আমার একটী চাকর। সকলেই সর্ষে ক্ষেতের ধার দিয়ে চলেছি। হঠাৎ ব— সামনে থেকে একটু জোর গলায় বললে—"এই—", বলার সঙ্গে সঙ্গে রেঞ্জার সাহেব, "জা-লু" অর্থাৎ ভালুক বলে এক আকাট চিৎকার করে পিছনে লাফ মেরে এসে পড়লেন স-এর উপর। তাঁর মাথা দিয়ে খুব জোরসে ঢুকে গেল স-এর পাঁজরের হসুতে। স—ও গাল চেপে ধরে উপু হয়ে বসে পড়ল। আমরা ত' অবাক। কই ভালুক-টালুক কোথাও কিছু নেই। বেচারা স-এর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল, আর ডানদিকের গালের হসুতে রক্ত জমে নীলচে পড়ে গিয়েছিল। সে ত' উঠেই রেগে রেঞ্জার সাহেবকে বলে উঠল "এ কি রকম রসিকতা?" রেঞ্জার সাহেব কেমন এক রকম বোকার মত দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিলেন। যাই হোক স— আর স্বল্পপরিচিত রেঞ্জার সাহেবকে কিছু বললে না। সে ক্যাঁসাল গলায় ব-কে প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি? কেনই বা সে "এই" বলে উঠল। ব-ও একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে—না, সে যা'তে পেছনের লোকটীও শুনতে পায় সেই উদ্দেশ্যে একটু জোরে

ফলতে যাচ্ছিল যে এই দর্শের ক্ষেত যাবার সময় সে লক্ষ্য করে নি, আমাদের আর কেউ সে ক্ষেতটা যাবার সময় দেখেছিল কিনা। কিন্তু "এই" বলার সঙ্গে সঙ্গেই রেল্লার সাহেব যে আকাট্ চেঁচিয়ে উঠিয়ে দিয়ে স-এর হদুতে চু মারবেন সেই বা তা জানবে কি করে। রেল্লার সাহেব মিহি গলায় একটু প্রতিবাদের সুরে বললেন—"আমরা ত' নদীর ধারে তালুকের কথাই বলছিলাম—তারপর সবাই নিঃসন্দেহই ফিরছিলাম, সামনে একটা দর্শের ক্ষেত দেখে এত বড় গলায় কেউ "এই" বলে আর্ত্তনাদ করতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে।"

আমরা আর যা'রা যা'রা ছিলাম তাদের কথা কাটাকাটি থামিয়ে সকলকে এগিয়ে চলতে অনুরোধ করতে লাগলাম। যদিও এগিয়ে চলছিলাম এবং আর সবাই চুপচাপই ছিলাম কিন্তু স— বিড় বিড় করে নিজের মনে কি বকতে বকতে চলছিল। সে সর্ষের ক্ষেতের বদলে সর্ষে ফুল চোখে দেখছিল, সন্দেহ নেই। রেল্লার সাহেব পাছে বেশী অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন সেইজন্যে আমরা জোর করে হাসি চাপবার চেষ্টা করছিলাম, ফলে আমাদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল।

যেতে যেতে রেল্লার সাহেবের বাসার সামনে আসতে তিনি আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে বাসায় ঢুকলেন। আমরাও প্রাণ খুলে হেসে গাঁচলাম। কিন্তু স— হাসল না। বাংলোর ফিরে ল্যাম্পে দেখি স-এর গাল ফুলে উঠেছে, আর চশমার কাছে রক্ত জমে কাল্‌সিটে পড়ে গেছে। বেশ যন্ত্রণাও হচ্ছিল, তা'ই তার ভদ্রতার বাঁধ দিয়ে আর্ত্তনাদকে রুখতে পারল না।

যাঁরা জঙ্গলে কর্ত্তব্যপালনে বাস করেন তাঁরা যে সব সময় সামাজী হ'ন তা নয়। তাঁদের জঙ্গল সম্বন্ধে ধারণা যা'ই থাক জঙ্গলের জানোয়ার সম্বন্ধে ধারণা কিছুই থাকে না। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ভীতু হ'ন। দিনের বেলা গাছ "মার্কিং" করেন ভূলিয়ের সঙ্গে। যদি দিনের বেলাতেও একা তাঁদের জঙ্গলের মধ্যে কেউ বলা হয় তা'হলে তাঁরা যেতে পারবেন বলে মনে হয় না। এঁদের সাহস মোটেই নেই।

অভিসার

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজ তুমি ফিরে এলে কার বাহু বন্ধে
মেদুর বাদল রাতে কেতকীর গন্ধে ?
ঝরা নীপ-কেশরের
শেষ মধু বাসরের
গাও কোন্ গানখানি নূপুরের ছন্দে ?
কালো তমালের ছায়ে শঙ্কা কি জাগল ?
ঘন-বন-বল্লরী অঙ্গে কি লাগল ?
কাঁকনের কণিতে
নূপুরের ধ্বনিতে
পথে ভুঁই-চম্পার স্বপ্ন কি ভাঙ্গল ?
বিদ্যুৎ-আঁখি কেন ওষ্ঠনে ঢাকলে ?
বলাকার মালা আজ কেন খুলে রাখলে ?
শ্বাউধন-বীথিকায়
শন্-শন্ গীতিকায়
কোন্ সুর-তুলিকায় কা'র ছবি আঁকলে ?
কামনার অঞ্জন লেগেছে কি চক্ষে ?
তাই কি এ অভিসার দুরু-দুরু-বক্ষে ?
সাজি' নিশিগন্ধায়
আধো-জাগা তন্দ্রায়
রূপলোক বন্দিনী, এলে কি অলক্ষ্যে ?

সুন্দরি, ছিলে কোন্ হিমানীর মর্ম্মে ?
অশ্রু-সায়রে কোন্ মৃদুতার চর্ম্মে ?
অথবা কি ছিলে সাথী
মেঘলোকে সারারাতি
বিহ্বল বরুণের বিলসিত নর্ম্মে ?
গাথি নীপমঞ্জরী কুন্তলমালে
গাঢ় মেঘকজ্জলে কি কুহক আনলে ?
দিঙ্‌নাগ-বৃংহন
তাল মেঘ সারা'ঘন,
তাই বুঝি মল্লারে বীণাখানি বাঁধলে ?
দোলে ছায়া-অঞ্চল কদম্বের পর্ণে,
আলতার দাগ ফোটে করবীর বর্ণে,
বক্ষের আবরণ
বনফুল-আভরণ,
অঙ্গ সাজে নি উষা-গোধূলির স্বর্ণে ?
আজ তুমি এলে নামি' বল কোন্ মর্ত্তে ?
চন্দন ছাড়ি' এলে পঙ্কিল বর্ত্মে ?
রূপকথা-ছন্দে কি,
যূথিকার গন্ধে কি
শুনাবে তোমারি গীতি তৃষাতুরা মর্ত্ত্যে ?

স্বপ্নপুরী সিডনি

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

Vedi Napoli, e poi muori.

ইতালীয় প্রবাদ—"নেপল্‌স্ দেখে মর।" এ পর্যন্ত নেপলস (Naples) দেখবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার শহরগুলি দেখে সেই কথাটাই মনে পড়ে। অষ্ট্রেলিয়ার শহরগুলির অবস্থান ভারী চমৎকার! কোথাও সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের সানুদেশে জনপদ স্থাপন করা হয়েছে। একদিকে অনন্ত নীল সমুদ্র, আর অন্য দিকে অরণ্যসমাকীর্ণ সমুন্নত পাহাড় শ্রেণী—তারই মাঝে মানুষের তৈরী সুন্দর সুন্দর শহরগুলি। এমি পাহাড় ঘেরা একটি উপসাগরের তীরে নিউ সাউথ ওয়েলসের রাজধানী সিডনি শহর।

উপসাগরের এক পারে খাস সিডনি শহর—অন্য দিকে শহরের উপকণ্ঠ—নেভোর্ণ-মোসমান। প্রণালীর দুই তীরকে সংযুক্ত করেছে বিখ্যাত সিডনি ব্রীজ, যার তুলনা নাকি জগতে নেই। ইঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। একটি মাত্র স্প্যানের (span) উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই বিরাট ইস্পাতনির্মিত সেতু। মৈথো প্রায় দেড় মাইল, আর প্রস্থে আমাদের নূতন হাওড়া ব্রীজেরও দেড়। উপর দিয়ে মানুষ, মোটর যান, ট্রামগাড়ী ও রেল যাবার তিন তিন পথ রয়েছে। দিন রাত যানবাহন চলাচলের বিরাম নেই। তীরের দুই প্রান্তে দুটি উচ্চ গুম্ব, যার ভিতরে উঠবার জন্য আছে ইলেকট্রিক লিফ্‌ট। খুশি মত মাত্র ৯ পেনি দিয়ে উপরে উঠে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সারা সিডনি শহর এবং সুদূর সমুদ্রের দৃশ্য একটিবার দেখে নিতে পারা যায়।

দূরাগত অসংখ্য সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে ভীড় ক'রে রয়েছে। ষ্টীম ও মোটর লঞ্চ অবিরাম যাত্রী পারাপার করছে। পারানির কড়ি হচ্ছে এক শিলিং। প্রমোদ বিহারের জন্য সুসজ্জিত জাহাজও রয়েছে। চার শিলিং দিয়ে ৯ ঘণ্টার জন্য ঘুরবার সুরে আসা যায়। হারবারের দুই তীরেই পাহাড়ের সানুদেশে সুন্দর সুন্দর বাগানেরা বাড়ী—ওরে ওরে লাল।

রাত্রিতে যখন নগরীর অসংখ্য আলোকমালা জ্বলে উঠে, তখন এই হারবারের দৃশ্য হয় অপরূপ। বাহির দরিয়ার কতো বিদেশী জাহাজ যাত্রী বা পণ্য বহন ক'রে দূরের পানে ভেসে চলেছে, আবার কতো জাহাজ বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে। যেগুলি বন্দরে নোঙর করে রয়েছে সে গুলি আলোয় আলোময়! নাবিকের দল জাহাজ ছেড়ে ডাঙায় নেমে ফুর্তির মৌজে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন ষ্ট্রীটে একদল ভারতীয় নাবিকের সঙ্গে দেখা। এঁরা দলে ছিল ৭।৮ জন, একজন মাদ্রাজী, আর বাকী সকলেই উড়িষ্যাবাসী। বাংলা কথা বেশ বোঝে ও বলতে পারে। নানা কথাই এরা বলল। গত তিন বছরে এরা দেশে যায়। অষ্ট্রেলিয়া থেকে জাপান হয়ে আমেরিকায় নানা বন্দরে এদের যাতায়াত। সম্প্রতি এরা কোরিয়া থেকে এখানে এসেছে। এদের জাহাজের নাম ডিভনসায়ার (Devonshire), ডিভনসায়ার হচ্ছে বৃটিশ জাহাজ, বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড থেকে কোরিয়া রণাঙ্গনে সৈন্য-পারাপারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

সিডনি হারবারে সেদিন একটি সাবমেরিণের দেখা মিলল। সাব্‌-মেরিণের ছবি দেখেছি বটে, কিন্তু আসল সাবমেরিণ জিনিসটা কিরূপ তা এই প্রথম দেখলাম। খুব লম্বা সরু—যেন একটা হাঙরের বাচ্চা, মাঝখানে খানিকটা জায়গা উঁচু—সেইখানে পেরিস্কোপ ঘর বসান। মানুষের যন্ত্র-পাতির পরিকল্পনা অনেক সময়ে জীব জন্তুর চালচলনের অনুকরণে রচিত হয়। সাবমেরিণ দেখে কচ্ছপের কথা মনে পড়ে। পুকুরে বা খালে যেখা যায় কচ্ছপ জলের উপরে মাথা তুলে নিশ্বাস নেয়, আর চারদিকটা একবার দেখে নিয়ে আবার জলের নীচে আত্মগোপন করে। গঠন ও গতিকৌশলে কচ্ছপের সঙ্গে সাবমেরিণের একটা নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। সাবমেরিণ জলের নীচে শুশুকের মত চলা ফেরা করে, আবার সুবিধা মতো জলের উপরে ভেসে উঠতে পারে। জলের নীচে থাকাকালীন সখা চোখের মতো পেরিস্কোপের সাহায্যে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বিপদ দেখলে একেবারে জলের নীচে ডুব মারে। সাবমেরিণের কাজ হচ্ছে টর্পেডো মেরে শত্রুর জাহাজ খায়েল করা। গত-যুদ্ধে হিটলারের বিখ্যাত U-boat শত্রুপক্ষীয় নৌ-বহরের অপরিসীম ক্ষতি সাধন করেছিল।

সিডনি শহর অষ্ট্রেলিয়ার সব চাইতে বড় শহর, বৃটিশ সাম্রাজ্যের তৃতীয় সর্বপ্রথম নগর ব'লে এর খ্যাতি আছে। এর জনসংখ্যা ১৪।১৫ লক্ষ। আমাদের কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক ছোট।

মেলবোর্ণে প্রায় দুই মাস কাটিয়ে এলাম। মেলবোর্ণ শহরের সৌন্দর্য, পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত, ঋজু এবং সযত্ন রক্ষিত। বড় বড় আফিস, হোটেল বা দোকান, বাড়ী আর ছোট ছোট বাংলো বা বাসগৃহ সবই সুন্দর ও সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক বাড়ীর সম্মুখেই ছোট একটু বাগান—এটা হচ্ছে মেলবোর্ণের একটা বিশেষত্ব। সেণ্ট্ কিল্‌ডা পীঠ্—মেলবোর্ণের বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত দেখবার মতো জায়গা। সামনে অনন্ত-বিস্তারী নীল সমুদ্র। অর্ধচন্দ্রাকৃতি উপসাগরের দুই দিকে অনুচ্চ পর্বতমালা—সমুদ্র গাত্রপায়ায় ঢাকা—ঢ'কে ঢ'কে সুরক্ষিত ঘর বাড়ী। সমুদ্রের তীরে তীরে সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজপথ মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে গিয়েছে, সেদিকে ইচ্ছা একশত মাইল অবলীলা-ক্রমে মোটর হাঁকিয়ে যাওয়া যায়।

ছুটির দিনে, বিশেষতঃ যেদিন গরম পড়ে হাজার হাজার নরনারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র তীরে রৌদ্রতপ্ত বালুকা-শয্যায় এরা যা এলিয়ে দেবার দিয়ে সূর্যাতপ উপভোগ করে। স্নান-বেশিং বা রৌদ্র

স্নানের উপযোগী পোষাক—বিশেষ ক'রে মেয়েদের পোষাক—আমাদের অভ্যস্ত চোখে একটু বিসদৃশ ঠেকলেও, এদের কাছে এতে বোধহয় কিছু নেই। তরুণী ও যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত অপরিসর বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ ও স্তন-যুগল কোন মতে আবৃত ক'রে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে, লজ্জা সঙ্কোচের বালাই নেই। অথচ পুরুষদের বেলায় কড়াকড়ির অন্ত নেই। যে সব হোটেলে থেকেছি সে সব জায়গাতেই আপাদলম্বিত ড্রেসিং গাউন না প'রে ঘরের বাইরে যাবার জো ছিল না, অন্যথায় কেবল পায়জামা স্যুট পরিহিত পুরুষ দেখলে লজ্জাশীলা মহিলাকুলের নাকি মূর্চ্ছা যাবার সম্ভাবনা।

কোন এক ভারতীয় মহিলাকে নাকি অষ্ট্রেলিয়ার মেয়েরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিলম্বিত দীর্ঘ শাড়ীকে হাঁটু অবধি তুলে এই ঘন্ত সংকটের দিনে ব্যয় ও বস্ত্রসংকোচ করায় কি আপত্তি থাকতে পারে? মহিলা কি উত্তর দিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু উত্তর হচ্ছে এই যে, যে কারণে পুরুষের বেলায় হাফ্‌প্যাণ্ট পরিধান অসামাজিক ও অশোভনীয়—অনেকটা সেই কারণেই ভারতীয় মেয়েদের বেলায় হাঁটু অবধি শাড়ীর হ্রস্বতা বিধান অনভিপ্রেত।

সিডনি নগরীর কেন্দ্রস্থল

সাধারণ ভারতবাসীর ধারণা যে অষ্ট্রেলিয়ানরা ইংরাজেরই জাতি ভাই। ভাষায়, চালচলনে ও আচার ব্যবহারে তাই বটে। কোন কোন বিষয়ে এরা আবার ইংরাজের চাইতেও খোঁড়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবধি এরা বহির্জগত বিশেষতঃ এশিয়া ভূখণ্ড ও ভারত-বর্ষ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ ও উদাসীন ছিল বললেই চলে। লণ্ডনগামী জাহাজের যাত্রীর কাছে ভারতবর্ষ বলতে বোম্বাই শহর সম্বন্ধে একটু অস্পষ্ট ধারণাই ছিল অধিক। ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে এদের এতটুকু ধারণাও ছিল না। এখনও পর্যন্ত বহু শিক্ষিত অষ্ট্রেলিয়ান ভারতবর্ষ বলতে গান্ধী নেহেরু জাতিভেদ (Caste System) ও কাশ্মীর এই এই কয়েকটি কথা মাত্রই বোঝে। আবার তাও, পাকিস্থানী অপপ্রচারের কল্যাণে বিকৃত অর্থে। ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানী পররাষ্ট্র বিভাগের কুৎসা প্রচারের বিরাম নাই।

সম্প্রতি কলম্বো পরিকল্পনার কল্যাণে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক ভারতীয় নানা বিষয়ে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ উদ্দেশ্যে এদেশে আসছে এবং ঘনিষ্ঠভাবে এদেশের নানাস্তরের নরনারীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ লাভ করছে। এই পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষ ও অষ্ট্রেলিয়া এই দুই মহাদেশের মধ্যে অধিকতর প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠবে—আশা করা যেতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ানদের জাতিগত কতকগুলি গুণ তুচ্ছ হ'লেও লক্ষণীয়। জাতি হিসাবে এদের এখনও শৈশবাবস্থা। ইংরাজ ঔপনিবেশিকদের বংশধর হিসাবে এদের মনোভাব যে ইংরাজ-ঘেঁষা হবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে এরা ইংরাজের অনুগামী। সম্প্রতি এদের সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে "অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় বৈশিষ্ট্য" প্রচারের ধুম লেগেছে। অষ্ট্রেলিয়ার সাহিত্য ব'লে যে জিনিসটাকে এরা জোর গলায় প্রচার করতে চাইছে সেটা আসলে ইংরাজী সাহিত্য বই অন্য কিছু নয়—বিশেষত্ব এইটুকু মাত্র যে যে ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক পরিবেশের বদলে আমরা পাই অষ্ট্রেলিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ। পাইনগাছের বদলে গাম্‌বীট্‌ (ইউক্যালিপটাস), আর লেক ডিষ্ট্রিক্টের বদলে বুশ (Bush) এবং নর্দার্ণ ডেজার্ট (Northern desert)। এছাড়া এই সাহিত্যের কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এখনও পর্যন্ত প্রকট হয়ে উঠে নাই। আসল কথা হচ্ছে জাতি হিসাবে এরা এখনও পর্যন্ত কোন Crisis বা সংকটের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও একদিন ইংরাজদের উপনিবেশ মাত্রই ছিল। প্রধানতঃ যে দুই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্য রূপ পরিগ্রহ করেছে তা' হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার রাষ্ট্রীয় সম্পর্কচ্ছেদ, আর দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সংমিশ্রণ।

অধুনা অষ্ট্রেলিয়ায় ইউরোপ হ'তে দলে দলে immigrant বসবাস করবার জন্য আসছে। এদের মধ্যে আছে ইংরাজ, জার্মাণ, ইতালীয়, ফরাসী, রাশিয়ান, গ্রীক্ প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক। ভিন্ন ভাষাভাষী ও ভিন্ন সংস্কৃতির লোকের সংমিশ্রণে হয়তো কালে এই মহাদেশেও একটা নূতন জাতি-সত্তার সৃষ্টি হ'তে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া নীতি (White Australian Policy) সম্বন্ধে দু' একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আয়তনে ভারত-

বর্ণের বিরুদ্ধে, অথচ লোকসংখ্যা মাত্র বত্রিশ লক্ষ। এই বিরাট ভূখণ্ডের অপরিমেয় সম্ভাবনা পরোক্ষভাবে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণের পক্ষে উপযোগী। যদিও এই মহাদেশের উত্তরাংশ মরুভূমি সদৃশ এবং জলের অভাবে কৃষিকার্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অকেজো। এদের নিষেধের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ-নৈতিক। অর্থাৎ এরা চায় না যে এশিয়া ভূখণ্ডের শ্রমজীবীরা এসে এদের জীবন-যাত্রার মান নিম্নগামী করে দেয়। ইউরোপাগত আগন্তুকদের দিক হতে এই আশঙ্কার কোন হেতু নেই। যদিও এরা অর্থ-নৈতিক নীতি বলে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় পরিকল্পনার সমর্থনে একটা যুক্তি খাড়া করেছে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই এই যুক্তির অসারত্ব ধরা যায়। শ্বেতকায় জাতির বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব-বোধই হচ্ছে শ্বেত অষ্ট্রেলিয় নীতির পরিপোষক—অর্থনীতির দোহাই হচ্ছে মুখোশ মাত্র। মুখে যা বলেনও এরাও মনেপ্রাণে দক্ষিণ আফ্রিকার ডাঃ ভারোয়ার্ডের ডাঃ মালানেরই সমধর্মী।

সিড্‌নির বিখ্যাত সৌধসেতু

জাতিত্বের হৈরিয়ে পুরোপুরি অর্জন না করলেও একজন সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানকে ইংরাজের প্রতিচ্ছবি বলে মনে করা ভুল। ইংলিশের সাম্রাজ্যমদগর্বে স্ফীত "জনবুলের", চেহারা ও প্রকৃতির মধ্যে যে অহংকার, ঔদ্ধত্য ও উন্নাসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানের মধ্যে সে সব দোষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এরা সাধারণতঃই সামাজিক, বিনত ও সোজন্যের স্বভাবের। রাস্তায় ঘাটে চলাফেরা করবার সময় অনেক সময় ইচ্ছা ক'রেও পথচারী পুরুষ বা মহিলাকে এটা ওটা জিজ্ঞেস ক'রে সহযত্ন ও সৌজন্যপূর্ণ উত্তর পেয়েছি—বিদেশীদের প্রতি এদের ব্যবহার স্বভাবতঃই আন্তরিকতা-পূর্ণ ও মিষ্ট। অবশ্য এখনও পর্যন্ত এদের কোন বৈদেশিক আক্রমণ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই প্রথম এদের মনে জাপানী বিভীষিকার সঞ্চার হয়েছে। সানফ্রান্সিস্কো সন্ধির (Japanese Peace Treaty at San-francisco) আলোচনার জন্যেরা ক্যানবেরা পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের নেতা ডাঃ ইভ্যাটের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মধ্যে সেই জাপানী ভূতের ভয় আত্মপ্রকাশ করেছে। সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ান বৈদেশিক রাজনীতি নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না, কিন্তু শিক্ষিত সমাজে কম্যুনিজম্ সম্বন্ধে বেশীর ভাগই আতঙ্কগ্রস্ত। বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব সাধারণ অষ্ট্রেলিয়ানের আমায়িকতার একটা বড় কারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান জাতিবৈষম্য ও বিদ্বেষের দিনে অষ্ট্রেলিয়ানদের আমায়িক ও উদার মনোভাব অকুণ্ঠভাবে প্রশংসনীয়।

ছোটখাট আরও অনেক ব্যাপারে অষ্ট্রেলিয়ানদের ব্যবহার প্রশ্ন আকর্ষণ করে। সিডনি, মেলবোর্ণ ও অ্যাডিলেড প্রভৃতি শহরে যেখানেই গিয়েছি, চোখে পড়েছে সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। রাস্তাঘাট, আবাসগৃহ, অফিস-আদালত ও বিপণিশ্রেণী সর্বত্রই একটা সুবিন্যাস, সংযম এবং সুনিয়ন্ত্রণ। শহরের বড় বড় রাস্তায় গাড়ী চলাচলের বিরাম নাই—কলকাতা বা বোম্বাইয়ের তুলনায় এ সব শহরে জনপ্রতি মোটরগাড়ী সংখ্যা অনেক বেশী—অথচ শহরের কোথাও, কি বড় রাস্তায় কি ফুটপাথে কোন হৈ চৈ বা হট্টগোল এতটুকু নেই। রাস্তায় পুলিশ বড় একটা দেখতেই পাওয়া যায় না, অথচ সর্বত্রই সুশৃঙ্খলভাবে অসংখ্য যানবাহন ও জনস্রোত পথ অতিবাহন ক'রে চলেছে।

রাস্তায় মোড়ে মোড়ে নিউজ ষ্টল—প্রাতে ও সন্ধ্যায় যথাসময়ে ও যথাস্থানে যেখা যাবে সংবাদপত্র ও জর্নাল প্রভৃতি সাজান রয়েছে, কিন্তু প্রায় স্থানেই কোন হকার বা বিক্রেতা নেই। পথচারীর দল যথারীতি মূল্য—তিন পেনি বা চার পেনি দিয়ে কাগজ কিনছে। পয়সাগুলি ট্রেতে একধারে স্তূপাকারে জমছে—যথাসময়ে মালিক এসে এগুলি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাবে। রাস্তার ধারে এভাবে রক্ষকবিহীন পয়সার স্তূপ আমাদের দেশের শহরে পড়ে থাকতে পারে কি?

ওধেণে চুরি, ডাকাতি, জুচ্চোরি বা জালিয়াতি নেই একথা বলব না। কিন্তু শিক্ষা সভ্যতাসংস্কৃতির ফলে জাতির নৈতিক চরিত্র যে অনেক-খানি উন্নত হয়েছে তার বহু প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনে সত্যবাদিতা ও সরল ব্যবহার অষ্ট্রেলিয়ান চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ।

সরকারী অফিস-আদালতেও এদের কর্মতৎপরতা ও সময় নিষ্ঠা প্রশংসার যোগ্য। ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, ইন্সিওরেন্স অফিস যেখানেই কর্ম-ব্যপদেশে যেতে হয়েছে—কোথাও অকারণে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট

করতে হয় নি। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই অপরিহার্যভাবে সংযুক্ত রয়েছে একটি অনুসন্ধান বিভাগ। সেই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে কোন সংবাদ অনুসন্ধান বিভাগে মিলবে। কোন আগন্তুককেই অযথা হয়রানি হতে হয় না। আমাদের বড় বড় সরকারী আফিসেও কোন অনুসন্ধান বিভাগের বালাই নেই। কোন কাজ নিয়ে কোন আফিসে গেলে অনেক সময়ই এ টেবিল থেকে সে টেবিল, এ কেরানীবাবু থেকে সে কেরানীবাবু—ঘুরে ঘুরে হয়রান হ'তে হয়।

একদিন সিডনির জেনারেল পোষ্ট আফিসে এক ভারতীয় ভদ্রলোক ভুলে ডাকটিকিট না লাগিয়েই তাঁর একখানা চিঠি ডাক বাক্সে ফেলে দেন। কয়েক ঘণ্টা বাদে—বাসায় ফিরে এসে সে কথা তাঁর মনে পড়ে। তখন উপায় কি? অথচ চিঠিখানা তার বিনা টিকিটে বেয়ারিং হয়ে যাওয়া বিশেষ কারণে অবাঞ্ছিত। পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে ফোন করা হল। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ভদ্রলোককে সহৃদয়তার সঙ্গে বললেন যে ঘণ্টাখানেক বাদে তিনি অনুসন্ধান ক'রে চিঠিখানা পাওয়া গেল কি না জানাবেন। একঘণ্টা বাদে টেলিফোন বেজে উঠল। পোষ্টমাষ্টার জানালেন যে চিঠিখানা পাওয়া গিয়েছে এবং যদি পত্রপ্রেরক ইচ্ছা করেন তবে তিনি (P. M.) এক শিলিং টিকিট লাগিয়ে চিঠিখানা যথাস্থানে সেই দিনই পাঠাবার ব্যবস্থা করতে রাজী আছেন। ভদ্রলোক পত্রপ্রেরক তাঁর পরদিন বহু বন্ধুবান্ধবে পোষ্টমাষ্টারকে টিকিটের দাম এক শিলিং দিয়ে এসেছিলেন।

এডিলেড পার্লামেন্ট ভবন

আর একদিনের ঘটনা। ভারতযাত্রী জাহাজে এডিলেড বন্দরে ভিড়লে পর, বারো ঘাইল দূরবর্তী পার্শ্ব শহরটি দেখবার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। জাহাজ ঘাটা হ'তে ট্রেণে বন্দরের এডিলেড যাওয়া যায়। প্রায় সারাটা দিনই এডিলেডে ঘুরে বেড়ালাম। বিকালের ট্রেণে ফিরবার পথে গ্রাউণ্ডিল ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতে হ'ল। গাড়ী বদল করবার সময় মাথার উপরের থাকে রক্ষিত কেটব্যাগের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হাল্কামনে অবস্থায় জাহাজে ফিরে এলাম। ব্যাগের কথা মনে পড়ল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে। ওটাকে যে ফিরে পাব সে আশা ছেড়েই দিলাম, তবুও একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ছুটে গেলাম ষ্টেশন মাষ্টারদের কাছে। বেশ বুঝিলাম, তিনি হয়তো এবিষয়ে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে একটা সাফ জবাব দিবেন। কিন্তু তা না ক'রে তিনি আমার কথা শুনে তখুনি টেলিফোনে গ্রাউণ্ডিল ষ্টেশনের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন। সেখান থেকে কোন সদুত্তর না পেয়ে এডিলেড ষ্টেশনের সহিত যোগ স্থাপন করলেন এবং আমার নাম ও জাহাজের কেবিন নম্বর ইত্যাদি টুকে নিয়ে বললেন যে ঘণ্টা দুই বাদে ব্যাগের কোন হদিস্ মিলল কিনা জানাবেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। জাহাজ ছাড়বে রাত বারোটায়। খুব বেশী আশা করতে ভরসা হয়নি, রাত্রের সিনারের পর কেবিনে ফিরে এসে দেখি ব্যাগ সমেত একখানা ছোট্ট লিপি টেবিলে কেউ রেখে গিয়েছে। ষ্টেশন মাষ্টার ব্যাগটা ফেরৎ পাঠিয়ে শুভ যাত্রা কামনা করেছেন। বিদেশী ও অপরিচিত ভদ্রলোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম, আমার দেশের কোন ষ্টেশন মাষ্টার ওঁর মতোটির কোন যাত্রীর জন্য এতটা করতেন কিনা জানিনা! জাহাজের টেলিফোনে ভদ্রলোককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা ছাড়া আর বেশী কিছু করবার আমার অবকাশ ছিল না। এমনিতর ছোট খাট অনেক ঘটনার ভিতর দিয়ে কোন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য বা আদর্শ গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস নেই। একদিকে নেই কোন প্রাচীন ও ইতিহাস-সমর্থিত ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপট ও অপরদিকে নেই কোন নূতন সৃজনাত্মক প্রচেষ্টা? আদর্শবিহীন শিক্ষাধারা শতকরা নিরানব্বই জন লোককে সাক্ষর (literate) করে তুলতে পারে কিন্তু প্রকৃত জাতীয় ব্যাপারেই এদের জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাতীয় বলিষ্ঠতার দিক দিয়ে বিচার করলে অষ্ট্রেলিয়ানদের মাঝারি-গোছের বা mediocre ছাড়া বেশী কিছু বলা যায় না। শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৯।৯৯ এবং সে লেখাপড়া নানা ভাবেই এরা ফলাও করে বলে, আর একথাও সত্যি যে ছয় বছরের শিশু থেকে আরম্ভ করে ১৪।১৫ বছর বয়স অবধি প্রতিটি বালক-বালিকার বিনা খরচে শিক্ষার সার্বজনীন ব্যবস্থা অতি সুচারুভাবেই করা হয়। কিন্তু এ শিক্ষা যারা দেয় তারা গতানুগতিক ইংরাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার হুবহু অনুকরণ—এর ভিতর দিয়ে কোন একটা জাতীয়

[illegible] দৈনিক দুবিয়ে [illegible] [illegible] [illegible]

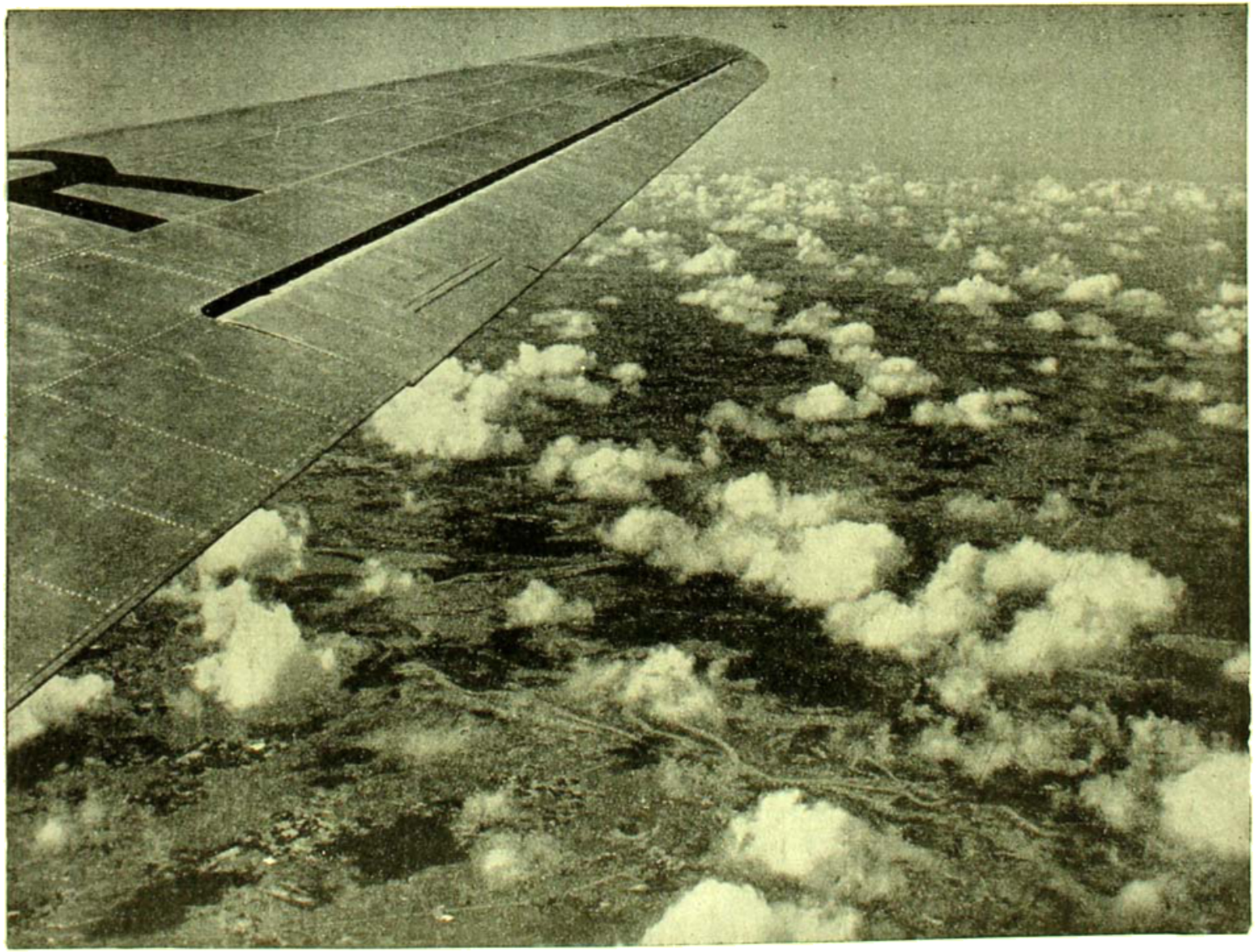

মেঘলোক থেকে
শরতের মেঘ

ফটো : প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

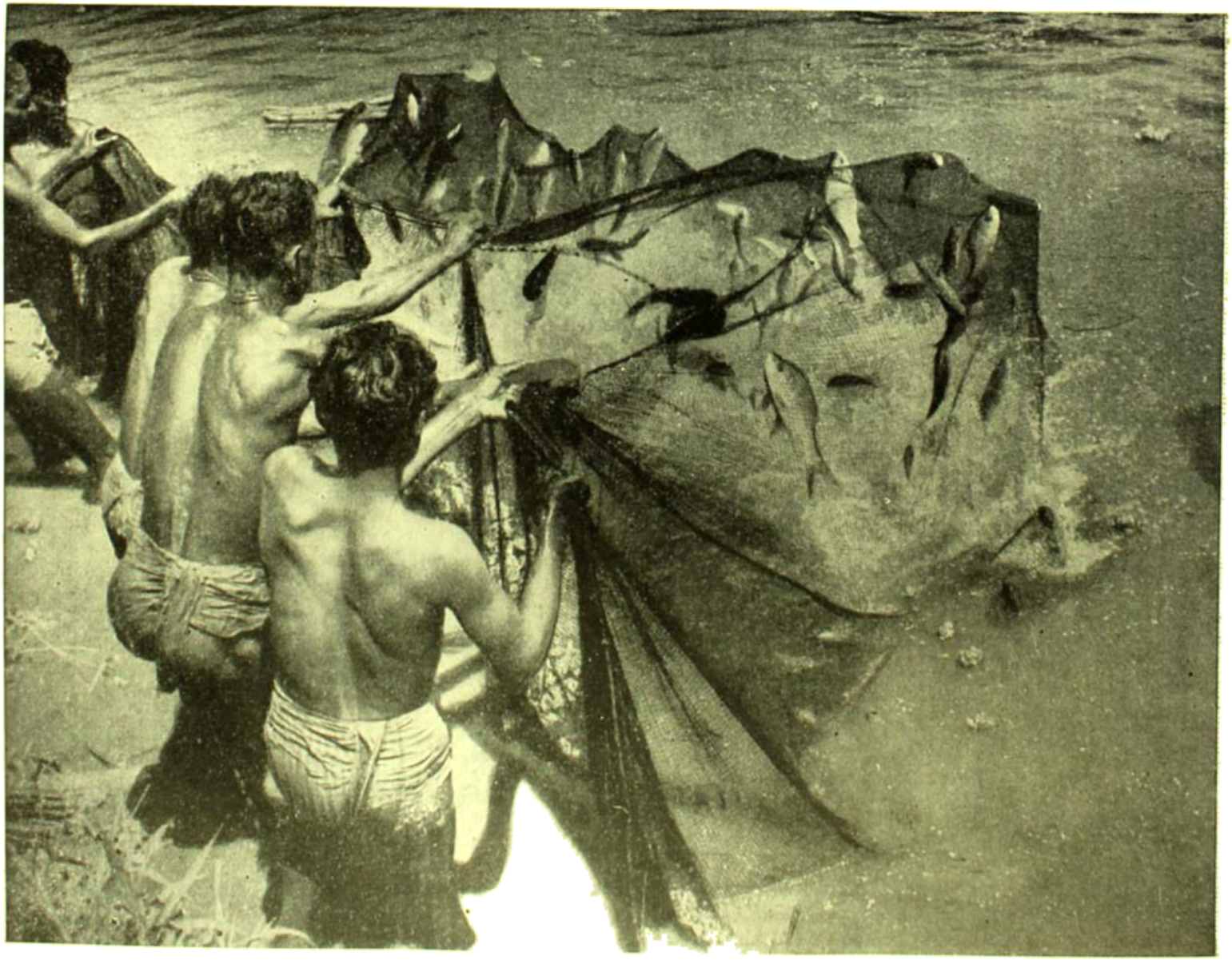

শিকার

ফটো : ভ্রমণ বন্ধু

— নয় —

"O sol da nesta janela de manha"

সূর্যের আলো পড়ল ঘরের জানালা দিয়ে।

ক্লান্ত অবসাদে তখনো ঘুমের মধ্যে তলিয়ে আছে গঙ্কালো। সোমদেবের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রথমটা একটা গভীর আশঙ্কায় ভরে উঠেছিল মন। মাথায় ঝাঁকড়া জটা, আরক্তিম চোখ, কপালে মস্ত বড় রক্তচন্দনের তিলক—সব কিছু একসঙ্গে মিলে একটা অদ্ভুত চেতনায় তাকে চকিত করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল, এখানেও সে খুব নিরাপদ নয়—এই মানুষটির দৃষ্টিতেও যা আছে, তাকেও প্রীতির নিমন্ত্রণ বলা চলে না!

তবু!

তবু আর উপায় নেই। পা আর তার চলছে না—পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় যেন কেটে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। একটু আশ্রয় চাই—একটু জল। দিউ্যিকার মতো সেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না বটে—কিন্তু বুকের ভেতরে এখনো তাদের নিয়মিত প্রতিধ্বনি বেজে চলেছে। বন্দুকের আওয়াজ—মানুষের আর্ত চিৎকার আর ক্রুদ্ধ অভিশাপ এখনো ঘুরপাক খাচ্ছে তার চারপাশে।

কাকা? আফনসো ডি মেলো? কোথায় তিনি? এখনো কি বেঁচে আছেন? বুকের ভেতর থেকে একটা করুণ কান্নার উচ্ছ্বাস ঠেলে উঠতে চাইল তার। কিন্তু কাঁদতে পারল না গঙ্কালো। যাঁর পদচুম্বনের সম্মান চোখের জল ফেলতে পারে না অপরিচিত বিদেশীর সামনে।

—এসো আমার সঙ্গে—আবার ডাকলেন সোমদেব।

ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা তিনি নিবিয়ে দিয়েছেন—অন্ধকারে একটা বিরাট সমাধিভূমির মতো এখন মনে হচ্ছে মন্দিরটাকে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ধারাবাহিক একটা ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের মতো আওয়াজ আসছে—জোয়ার আসছে সমুদ্রের। একটা রহস্যঘন ভবিষ্যতের পূর্বাভাস যেন!

গঙ্কালোর কিশোর বাহুর ওপরে বাঘের থাবার মতো একখানা কঠিন হাত—সোমদেবের। গঙ্কালো এগিয়ে চলল। পার হল একরাশ অন্ধকার আর শিশিরে ভেজা পথ। তারপর সামনে ভেসে উঠল মস্ত একখানা বাড়ি—একটা প্রকাণ্ড মন্দির।

নবাবের প্রাসাদ?

একবার থমকে গেল গঙ্কালো—একবার কেঁপে উঠল শরীর। না—নবাবের প্রাসাদ নয়। আগে কয়েকটি বিদেশী মানুষ এসে ঘিরে দাঁড়ালো তাকে। তাদের কেউ সৈনিক নয়—কোনো অস্ত্র নেই তাদের সঙ্গে। দুই চোখে তাদের পুঞ্জিত বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা।

কিছুক্ষণ কী আলোচনা চল তাদের মধ্যে। গঙ্কালো তার একটি শব্দও বুঝতে পারল না। শুধু লোকগুলো বার বার তাকিয়ে দেখতে লাগল তার দিকে—বিস্ময় কেটে গিয়ে ভয়ের ছিন্ন ছটা উঠল তাদের চোখে মুখে।

ভয়াল-দর্শন মানুষটি কী যেন বললেন করুণ কণ্ঠে। একসঙ্গে চুপ করে গেল সবাই। একটা আদেশ।

আর একজন গঙ্কালোর দিকে এগিয়ে এল। প্রৌঢ়, শান্ত চেহারার মানুষ। স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। কোনো কথা বলল না, গঙ্কালোকে তার সঙ্গে যাওয়ার ইঙ্গিত করল শুধু।

মনের মধ্যে খানিকটা স্বস্তিই অনুভব করলে গঙ্গালো। ওই ভয়াল-দর্শন মানুষটির চাইতে এ আলাদা। একে যেন বিশ্বাস করা চলে—অন্তত অনেকখানিই করা চলে। অনুসরণ করে চলল গঙ্গালো।

ধড়লোকের বাড়ি। প্রশস্ত পাথরের অঙ্গন। দু দিকে সারি সারি আলোকিত ঘর। সামনে যারা পড়ল—তারা অভিবাদন করে সরে সরে যেতে লাগল। মনে হল—এই মানুষটি এ বাড়ির কোনো বিশিষ্ট জন—হয়তো বা গৃহস্বামী নিজেই।

তাই বটে। রাজশেখর।

গঙ্গালোকে নিয়ে রাজশেখর অগ্রসর হলেন। অস্বস্তি আর আশঙ্কায় তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অতিথিকে আশ্রয় দিতে তাঁর কার্পণ্য নেই—দৈনিক তাঁর অতিথিশালায় অনেক ক্ষুধার্তই অন্ন পায়। আসলে, গঙ্গালো নবাবের কারাগার থেকে পলাতক। খানিকক্ষণ আগে সে ঘটনাটা ঘটে গেছে—এর মধ্যেই তা কানে এসেছে তাঁর। তাই গঙ্গালোকে আশ্রয় দিতে সংকোচটা তাঁর স্বাভাবিক।

কিন্তু না দিয়েই বা কী উপায় ছিল? একটি সুকুমার কিশোর মুখ। সে মুখে কোনো অপরাধের চিহ্নই কোথাও নেই। তা ছাড়া নবাব খুদাবক্স খাঁর প্রীতি-নীতিও তাঁর অজানা নেই; বিলাসী এবং অকর্মণ্য—চারদিকে ঘিরে আছে স্বার্থপর পারিষদের দল। তাঁর হাতে পড়লে এর আর নিষ্কৃতি নেই। হয় কঠিন কারাবাস, নইলে মৃত্যু।

অস্বস্তি সেখানে নয়। গুরু সোমদেবের ভাবে-ভঙ্গিতে কেমন একটা সন্দেহ হয়েছে তাঁর মনে। বলেছেন, আর কদিন পরেই অমাবস্যা। একটা মস্ত শুভ-সুযোগ এসে গেছে। এই ছেলেটিকে তাঁর দরকার।

কিসের দরকার? কী সেই শুভ-সুযোগ?

একটা চকিত ভয় শীতল সরীসৃপের মতো নড়ে বেড়াচ্ছে তাঁর বুকের ভেতরে। কী উদ্দেশ্য সোমদেবের? ঠিক কথা—তাঁকে নিয়ে আসবার পর থেকেই এক ধরণের অনুতাপ বোধ করছেন রাজশেখর। কী একটা বিশৃঙ্খলার অশুভ সম্ভাবনা বয়ে এনেছেন সোমদেব—সঙ্গে করে এনেছেন কোনো একটা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত। শিবের প্রতিষ্ঠা নয়—শক্তির বোধন।

—শিব আজ শব হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর বুকে লীলা চলছে চামুণ্ডার—

সোমদেব বলেছিলেন। কথাটা ভালো লাগেনি। আজো ভালো লাগছে না তাঁর চাল-চলন। এই পর্তুগিজ কিশোরটিকে আশ্রয় দেওয়া কি নিরাপদ হল? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

রাজশেখর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একজন ভৃত্যকে ইঙ্গিত করে ডাকলেন তিনি।

—পুরোণো মহলের একেবারে কোণার দিকের ঘরটা খুলে দে। আলো জেলে দে ওখানে। শোবার ব্যবস্থা কর! দৌড়ে যা।

প্রকাণ্ড বাড়ির অঙ্গনের পর অঙ্গন পার হয়ে—বাইরের মহল থেকে অন্দরমহলের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে থামলেন রাজশেখর। একটা ধোলা আর খাড়া পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। দুজন লোক দুটি আলো হাতে অপেক্ষা করছে সেখানে।

রাজশেখর সিঁড়িতে পা দিলেন। গঙ্গালো অনুসরণ করে চলল।

সিঁড়ি যেন আর ফুরোয় না। ভাঙাধরা—অসমতল। বেশ বোঝা যায়—বহুদিন ধরে এ সিঁড়ি কেউ ব্যবহার করে না। জায়গায় জায়গায় তার ফাটল ধরেছে—ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে তাদের ভেতরে, ভবিষ্যতে একদা হয়তো একটি বিশাল বনস্পতি উঠে সব কিছুকে গ্রাস করে বসবে। বোঝা যায়—বহুদিন এ সিঁড়ি ব্যবহার হয়নি। আর যদিও বা হয়ে থাকে, তা হলে কালে-ভদ্রে।

কিন্তু ক্লান্ত পা নিয়ে আর উঠতে পারছে না গঙ্গালো। ঝিম ঝিম করছে মাথা। চোখ বুজে আসছে থেকে থেকে। যেন নেশার ঘোরে উঠছে সে। যে কোনো সময় পা টলে সে নিচে গড়িয়ে পড়তে পারে।

তবু এক সময় শেষ হল এই দীর্ঘ সিঁড়ির পালা। ফাটধরা একটা দীর্ঘ বারান্দার পরে দেখা দিল সারবাঁধা কয়েকখানা ঘর। তাদের খান দুই খসে পড়েছে—সঙ্গী লোকগুলির মশালের আলোয় ইট-পাথর কড়ি-বরগার ভীতিকর ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল গঙ্গালোর।

কোথায় চলছে এরা তাকে নিয়ে? এবং কী প্রয়োজনে?

সামনে একটি ছোট ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। রাজশেখর তারই ভেতরে প্রবেশ করার জন্যে ইঙ্গিত করলেন গঞ্জালোকে। কিন্তু গঞ্জালো তবু নিঃসংশয় হতে পারল না। তাকিয়ে রইল বিমূঢ় পশুর চোখে।

রাজশেখর অভয়ের হাসি হাসলেন। আবার ইঙ্গিত করে বললেন, যাও।

গঞ্জালো ভেতরে পা দিলে। একটা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি অবশেষে। প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে ছোট একটি শয্যা বিছানো হয়ে গেছে এর মধ্যেই—একটি গায়ের আবরণ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে তেমনি বিহ্বল ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপরে অনুভব করলে, এ আয়োজন নিশ্চয় তারই জন্যে। কিন্তু তারই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো অতিথির জন্যেই হোক—আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না কণামাত্র। সমস্ত শিথিল দেহ-মন নিয়ে সে বিছানাটার ওপরেই লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ সে এলিয়ে রইল চোখ বুজে। মৃত্যু যেখানেই থাক—অন্তত এই রাত্রিতে সে কাছাকাছি আসবেনা এ প্রায় নিশ্চিত। আর যদি আসেই—তাতেই বা কী করা যাবে। নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।

কিন্তু কাকা? অ্যাকন্‌সো ডি-মেলো?

সেই বন্দুকের শব্দ। সেই আর্তনাদ। সেই ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত। এখনো একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে। গঞ্জালো উঠে বসল।

তারপরে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসল সে। বুকে এঁকে নিলে ক্রুশচিহ্ন—প্রার্থনা করে চলল ভার্জিন মেরীর কাছে—মানবপুত্রের কাছে। সমস্ত বিপদ দূর করুন তাঁরা—ঘুচে দিন সমস্ত সংকট—

প্রার্থনা করতে করতে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। একটা আকস্মিক শব্দে চমক ভাঙল।

দু'জন মানুষ এসেছে ঘরের ভিতরে। হাতে খাদ্যের থালা। জলের পাত্র।

খাদ্য—জল!

ক'দিন ধরে সে পেট ভরে খেতে পায়নি—কতদিনের পিপাসা মরুভূমির মতো জমে উঠেছে বুকের ভেতর! গঞ্জালো আর ভাবতে পারলনা। ভার্জিন মেরীর দান। লোভীর মতো থালাটা টেনে নিলে নিজের কাছে।

সুস্বাদু ফল—সুন্দর মিষ্টান্ন। এদের অনেকগুলির স্বাদই তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবুও মনে হল যেন অমৃত। কিছুক্ষণের মধ্যেই থালা নিঃশেষ হয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল জলের পাত্র।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ছিল লোক দুটি। খাওয়া শেষ হতে উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিলে তারা। তারপর তাকে শুয়ে পড়বার জন্যে ইঙ্গিত করলে।

কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছিলনা তার। ক্লান্ত, উত্তেজিত, কয়েক দিনের বিনিদ্র শরীর মন খাবার পেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। মাথার ভেতরে ঝিঁঝিঁর ডাকের মতো শব্দ উঠছে—চোখে কুয়াশা ঘনাচ্ছে—ঘরটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। গায়ের আবরণটা টেনে নিয়ে সে এলিয়ে পড়ল। বন্ধ দৃষ্টির সামনে কিছুক্ষণ ধরে একটা সমুদ্র দুলতে লাগল—কালো ঢেউয়ের ওপরে ফেটে পড়তে লাগল ফেনার অঞ্জলি—একটা বাতাসের হু হু শ্বাস বাজতে লাগল বার বার। সেই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝাপসা ছবির মতো থেকে থেকে ভাসতে লাগল অ্যাকন্‌সো ডি-মেলোর মুখ। তার পর কোথা থেকে প্রকাণ্ড পাল তুলে একখানা জাহাজ এল; হাওয়ায় কাঁপছে—হাওয়ায় নড়ছে—বিরাট একটা শবাচ্ছাদনের বস্ত্রের মতো ধীরে ধীরে সেটা যেন গঞ্জালোর মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

তেল পুড়ে পুড়ে কখন নিবে গেল ঘরের প্রদীপটা। কখন পেছনের ঘন-অন্ধকার জঙ্গলটার ভেতরে আকাশে মুখ তুলে বার তিনেক আর্তকণ্ঠে ডেকে উঠল শেয়াল; কখন পুরোনো মহলের অজস্র ফাটলের আড়াল থেকে যেন ঘুমের ঘোরে ঠক্-ঠক্ করে কথা কইল বনেদী তক্ষক; কখন কোপের আড়ে একটা শীর্ণ বোড়া সাপকে মুখ তুলতে দেখে ঝম্ ঝম্ শব্দে কাঁটা তুলে থেমে দাঁড়াল একটা সজারু; কখন তার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান লোক এসে চৌকাঠে চেপে বসল পুরোনো মহলের কোনো প্রেতাত্মার মতো; আর কখন নিজের বসে বসে প্রদীপের সল্‌তেটা আরো উজ্জ্বল করে দিয়ে একখানা তত্ত্বগ্রন্থের ভুলোট পাতা ওলটালেন সোমদেব—গঞ্জালো এসবের কিছুই জানতে পারলনা।

আর সেই সময় সাদা পালটা ক্রমশ দূরে সরে গেল। একটা নয়—পর পর কয়েকখানা। রাত্রির অন্ধকারে প্রায়লগ্নে দূরের সমুদ্রে পালিয়ে গেল সিসিলিরা আর ভ্যাসকনসেলসের জাহাজ!

তার পর—

তার পর রাত বাড়ল—রাত শেষ হল। শেষ ডাক দিয়ে গর্তের মধ্যে ঘুমুতে গেল শেয়াল; গায়ের কাঁটা মুড়ে একটা পুরোনো গাছের শেকড়ের তলায় ঢুকল সজারু। শীতক্লান্ত বোড়া সাপটা এক ঝলক ভোরের হাওয়ায় কী একটা টাট্‌কা ফোটা ফুলের গন্ধ পেলো—আস্তে আস্তে আঙ্কুরের মতো এগিয়ে চলল সেই দিকে। ফাটলের ভেতর গাছের এক টুকরো শুকনো বাকলের মতো নিশ্চুপ ভাবে লেপ্‌টে রইল তক্ষকটা। দরজার গোড়ায় গোড়ায় বসে সমস্ত রাত যে লোকটা রাত্রি আর অরণ্যের শব্দ শুনছিল—পুরোনো মহুলের আনাচে আনাচে প্রেতের মতো চোখ মেলে রেখে দেখছিল প্রেতাত্মাদের ছায়া—সে একটা হাই তুলে উঠে গেল তার পাহারা ছেড়ে। নিজের ঘরে সোমদেব উঠে দাঁড়ালেন—গুন্তার গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন স্নানের উদ্দেশে। চঞ্চলে সাড়া দিলে পাখিরা—গঞ্জালোর ঘরের খোলা জানালার ওপরে একটা বুলবুল্ এসে বসল—শিস্ দিয়ে জাগাতে চাইল এই বিদেশী মানুষটিকে।

গঞ্জালো জাগল আরো কিছুক্ষণ পরে।

পাতায় পাতায় জমাট শিশিরে টুকরো টুকরো রামধনু সৃষ্টি করে সূর্যের আলো পড়ল ঘরে। যে জানালাটার এসে বুলবুল্ এতক্ষণ গঞ্জালোকে ডাকাডাকি করছিল, সেই জানালার মধ্য দিয়েই খানিকটা মধুতপ্ত হলদে অভিবাদন ছড়িয়ে দিলে তার মুখের ওপরে।

গঞ্জালো একবার এপাশ-ওপাশ ফিরল। আস্তে আস্তে উঠে বসল তার পরে।

এখনো সব অস্পষ্ট—সব ধোঁয়া ধোঁয়া। গত রাত্রির সমস্ত গ্লানি আর উত্তেজনা কেটে গিয়ে একটা নিঃসাড় শান্তি জমে আছে স্নায়ুতে। মস্তিষ্ক অনুভূতিহীন। সদ্যোজাত শিশুর মতো নির্মল মানসিকতা।

ধোঁয়াটা কেটে যেতে লাগল ক্রমশ। নিরন্তর শূন্যতার বোধটা ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল চারটি দেওয়ালের নির্ভুল সীমারেখার ভেতরে। শ্যাওলা পড়া দেওয়ালের কতগুলো অসংলগ্ন রেখা যেন চোখে এসে আঘাত করল। মনে পড়ে গেল সব—মনে পড়ল গত রাত্রের সমস্ত দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়ল। এসে দাঁড়ালো রৌদ্র ঝরা জানালাটার সামনে। বাইরে যতদূর চোখ যায় একটা অসংলগ্ন জঙ্গল চলেছে—মাঝে মাঝে ভাঙা ইটের স্তূপ। গঞ্জালো জানত না—এ দেশের লোকে জানে, ওর নাম 'যখের জঙ্গল'। রাজশেখরের বাড়ির পেছনে এই ঘন বনের ভেতরে যখের ঐশ্বর্য লুকোনো রয়েছে এমনি প্রবাদ আছে এ অঞ্চলে। ওই ঐশ্বর্যের সন্ধানে নিশি রাত্রে কত লোক ওখানে এসে কেউটের বিষে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

গঞ্জালো কিছুক্ষণ চেয়ে রইল জঙ্গলটার দিকে। একটা শিমুল গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের টুকরো এসে পড়েছে তার চোখে মুখে। এখান থেকে কত দূরে নবাবের বাড়ি? কোথায় এখন বন্দীত্ব যাপন করছেন ডি-মেলো?

চিন্তাটা মনে জাগতেই ওখান থেকে সরে এল সে। এল দরজার কাছে। কবাট দুটো ভেজানো ছিল, একটু আকর্ষণ করতেই খুলে গেল। গঞ্জালো বেরিয়ে এল বাইরে।

সামনে একটা লম্বা বারান্দা। এখানে ওখানে ভেঙে গেছে—কোথাও কোথাও বিপজ্জনকভাবে ঝুলে পড়েছে শূন্যে। সারি বাঁধা কতগুলো ঘর ছিল পাশাপাশি—অধিকাংশই ধ্বংস স্তূপ। একটু দূরেই সেই কাটধরা পাথরের খোলা সিঁড়িটা। বোঝা যায়—এ অঞ্চলটা এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। অর্ধচন্দ্রাকারে এই ভাঙা বাড়িটার মাঝখানে এলোমেলো ঘাস আর কোপ-গজানো একটা বিরাট চত্বর—সেইটে পার হলেই একটি নতুন প্রাসাদ মাথা তুলেছে। রাজশেখরের তৈরি নতুন মহল।

তারই ছাতের দিকে চোখ পড়তে দৃষ্টিটা খুশি হয়ে উঠল গঞ্জালোর। আকাশ থেকে মুঠো মুঠো সোনার মতো শীতের রোদ ঝরছে। আর সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সোনা দিয়ে গড়া একটি মেয়ে। বয়েস তারই মতো হবে—নিবিড় কালো তার চুল—মুগ্ধ উদাসভাবে বনের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গঞ্জালোর ঠিক পেছনে—ঘরের কার্নিশের ওপরে এসে সেই বুলবুলটা শিস্ দিয়ে উঠল। অত দূরে কি শিসের সেই শব্দটা গিয়ে পৌঁছুল? কে জানে! মেয়েটি চঞ্চল চোখ নামাল। গঞ্জালোকে দেখতে পেল সে।

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা চেয়ে রইল। এই পুরোনো পড়ো মহলে কে এমন অপরিচিত মানুষ? প্রেতাত্মা? কিন্তু এর তো পরিষ্কার একটা ছায়া উজ্জ্বল রোদে পায়ের তলায় এসে এলিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া বিদেশী। অদ্ভুত বেশবাস। সুন্দর কিশোর কান্তি। মাথার চুল নয়—যেন একগুচ্ছ সোনা। চাঁদের আলোর মতো গায়ের রঙ। বপ্রের জঙ্গল থেকেই কি উঠে এল কেউ?

—O-LA!

চমকে উঠল সুপর্ণা! ওই নতুন মানুষটি যেন তাকেই ডাকছে।

—O-La! Boz dias!

আবার সেই ডাক। একটা আকস্মিক ভয়ে সুপর্ণা বিবর্ণ হয়ে গেল। পরক্ষণেই গঞ্জালো দেখতে পেলো ছাতের ওপরে কোথাও কেউ নেই। যাকে সে সম্ভাষণ করে Boz dias—সুপ্রভাত জানাচ্ছিল—সে কোথায় নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে।

—Bonito!

আর একবার মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল গঞ্জালো।

সকালের আলোয় বাড়ির সামনে পায়চারী করছিলেন রাজশেখর। রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। এলোমেলো ভাবনার তাড়নায় মনটা অত্যন্ত চঞ্চল। এই বিদেশী ছেলেটা—

খট্—খট্—খটা খট্—

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। রাজশেখর উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন—মুখ শুকিয়ে গেল আশঙ্কায়। একটু দূরেই ধুলোর ছোট একটা ঝড় দেখা যাচ্ছে।

ওই তো—এদিকেই আসছে! তাঁরই বাড়ির দিকে। আসছে দুজন দীর্ঘদেহ ঘোড়সোয়ার—সকালের রোদে তাদের তলোয়ারের বাঁট আর বেশ-বাসের সমস্ত ধাতব জিনিসগুলো চকচক করে উঠছে।

নবাবের সৈন্যই বটে!

কী বলবেন? ধরিয়ে দেবেন ছেলেটাকে? বুকের ভেতর হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল রাজশেখরের। বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেন আশ্রিতকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে? ওই একান্ত একটি কিশোর—অম্লান-সুন্দর মুখ—

কিন্তু বাড়ির চাকর-বাকরদের মুখে মুখে যদি জানাজানি হয়ে যায়? নবাব যদি একবার শুনতে পান যে তাঁর কারাগার থেকে পলাতক খ্রীষ্টানকে লুকিয়ে রেখেছেন তাঁরই একান্ত অনুগত শ্রেষ্ঠী রাজশেখর? তা হলে?

বেশিক্ষণ ভাববার সময় পেলেন না তিনি। তার আগেই দ্রুতগামী ছুটি ঘোড়া এসে থামল তাঁর সামনে। তলোয়ারের ঝঙ্কার তুলে নেমে পড়ল নবাবের দুজন সৈনিক।

—সেলাম শেঠজী!

—সেলাম।

—আপনি বুঝি কিছুদিন এখানে ছিলেন না?

ভয়ার্ত মুখে, নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ শুনতে শুনতে রাজশেখর বললেন, না। দিন কয়েকের জন্যে চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম আমার গুরুদেবকে আনতে। আমার নতুন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা।

—ও।

সৈনিকেরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল—বোধ হয় তৈরি করে নিলে প্রশ্নের ভূমিকা। তারপর একজন বললে, কাল নবাবের কয়েদখানা থেকে জনকয়েক শয়তান খ্রীষ্টান পালিয়ে গেছে। শ্রেষ্ঠী কি কিছু জানেন?

প্রায় নিঃশব্দ গলায় রাজশেখর বললেন, শুনেছি।

—তাদের দু একটা আপনার এদিকে এসেছে নাকি?

মুহূর্তের জন্যেই হয়তো একবার দ্বিধা করলেন রাজশেখর। শুকনো ঠোঁট লেহন করে নিলেন জিভ দিয়ে।

—না। সেরকম কিছুই জানি না।

—কেউ আসে নি আপনার বাড়িতে?

ওরা কি খবরটা জানে? জেনে-শুনেই কি একটা নিষ্ঠুর কৌতুকের সাহায্যে এই ভাবে নির্যাতন করতে চাইছে তাঁকে?

রাজশেখর আবার কান পেতে নিজের হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগলেন কিছুক্ষণ। বললেন, না, কেউ নয়।

—আপনার বাড়ির পেছনে আশ্রয় নিতে পারে তো? ওই বপ্রের জঙ্গলে?

রাজশেখর জোর করে শুকনো হাসি হাসলেন : তা হয়তো পারে। কিন্তু সে দুর্বুদ্ধি যদি কারোর হয়, তা হলে স্বেচ্ছায় নিজের মৃত্যুই ডেকে আনবে সে। গোখরো আর চিতি বোড়া কিলবিল্ করছে ওখানে। নবাবের সৈন্যের কাছ থেকে যদি বা নিস্তার মেলে, তাদের কাছ থেকে পরিত্রাণ নেই।

—তা বটে!—সৈন্য দুজনও এবার হাসল : তা হলে কেউ আসেনি বলছেন আপনি?

—না।

—আচ্ছা, চলি তা হলে। কিছু মনে করবেন না—সেলাম!

খেপরের তলোয়ারে আর বেকাবে ঝঙ্কার তুলে আবার দুজনে লাফিয়ে উঠল ঘোড়ায়। যেমন দ্রুতবেগে এসেছিল, তেমনি দ্রুতগতিতেই ফিরে চলল ঘোড়া। অন্যদিকে কোথাও খুঁজতে চলল নিশ্চয়। আবার দুটো ধুলোর ঘূর্ণি উঠল—তলোয়ারের ঝাঁট আর পোষাকের অন্যান্য ধাতব অংশগুলো শেষবার ঝিকমিক করে উঠে মিলিয়ে গেল দিগন্তে।

রাজশেখর তখনো সেইভাবেই দাঁড়িয়ে। বুকের আলোড়নটা বন্ধ হয়নি—হৃৎপিণ্ডের উচ্চকিত ধক্‌ধকানি শোনা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। বহুক্ষণ ধরে চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাসটাকে এবারে সশব্দে মুক্তি দিলেন রাজশেখর। আপাতত একটা ভয়াবহ সংকটের হাত থেকে পরিত্রাণ মিলল তাঁর।

কিন্তু এতো সবে আরম্ভ—শেষ নয়। এত বড় ব্যাপারটা কখনো চাপা থাকবে না। যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবে এবং করতে হবে অবিলম্বেই। গঞ্জালোকে নবাবের হাতে তুলে দেওয়া হোক বা না হোক, অন্তত এখান থেকে সরিয়ে দিতেই হবে। এমন একটা বিপজ্জনক দায়িত্ব মাথায় নিয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না তিনি। অপদার্থ খুদাবক্সদার কাছে মান-সম্মানের প্রশ্ন নেই কারো।

অতএব, অবিলম্বে একবার সোমদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

রাজশেখর অন্দর-মহলে এলেন। কিন্তু সোমদেবের সঙ্গে দেখা হল না সেই মুহূর্তে। শুরু পুজোয় বসেছেন। তাঁর গম্ভীর গলার মন্ত্রস্বর বাড়ির ভেতরে ভেসে বেড়াচ্ছে মেঘমন্দ্র ধ্বনিতে। আপাতত তাঁকে বিরক্ত করবার উপায় নেই।

চিন্তিত পায়ে রাজশেখর আবার বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেছন থেকে কে এসে তাঁকে স্পর্শ করল। ফিরে দাঁড়ালেন। সুপর্ণা।

—কিরে?

—পুরোনো মহলে ওটা কী বাবা? অদ্ভুত চেহারা—অদ্ভুত কথা বলে?

রাজশেখর সভয়ে বললেন, তুই দেখেছিস বুঝি? কেমন করে?

—ছাত থেকে। ওটা কী বাবা?

—বিদেশী মানুষ। খ্রীষ্টান। কিন্তু এ সম্পর্কে কাউকে কোনো কথা বলিসনি মা। ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়।

—কেন? কী হয়েছে?

—সে অনেক কথা। তোর শুনে কাজ নেই।

সুপর্ণা চুপ করল, রাজশেখর ভাবলেন মিটে গেল সমস্ত।

কিন্তু সেইখানেই শুরু হল নতুন একটা অধ্যায়।

সকাল শেষ হয়ে যখন দুপুর এল, কাঁচা সোনার মতো রোদ যখন গিলটির সোনার মতো রঙ ধরল; যখের জঙ্গলে যখন সজারুটা হঠাৎ উঠে বসল গায়ের কাঁটাগুলোয় ঝাঁকুনি দিয়ে; একটা কাক যখন লম্বা শিমুল গাছটার ডালে বসে বিশ্রী গলায় ডেকে উঠল, তখন—

তখন, একটা মৃদু শব্দে হঠাৎ পেছন ফিরে তাকালো গঞ্জালো।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সুপর্ণা। কৌতূহলের পীড়নে এই নির্জন দুপুরে চুপি চুপি দেখতে এসেছে অভিনব চেহারার এই বিদেশী মানুষটিকে। ক্রমশঃ

গান

আমার দু' চোখ ভরে দাও গো তুমি
দাও গো আলো দাও
অমন ক'রে বাধা দিয়ে
জানি না কি সুখ পাও।
মুক্তা সম চোখের কোণে,
অশ্রু আমার মালা বোনে,
ঝরে যে ঐ মালার কুসুম
দেখ নাকি তাও।

আঁধার পথে একলা আমি
চলতে ভয় পাই
সুদূর থেকে জ্বলে দেখি
তোমার আলোয়াই।
অন্ধ আমি এগিয়ে চলি'
বিপদ বাধা পায়ে দলি
তুমি দেখি সুদূর থেকে
সুরেই শুধু গাও।

কথা : গোপাল ভৌমিক

সুর ও স্বরলিপি : বুদ্ধদেব রায়

সা সা রা ‖ ণ্া ণ্া সা | সা সা রা | ণ্া ণ্া সা | সা -া রা |
আ মা র দু চো খ ভো রে • দা ও গো তু মি •

ণ্া ণ্া সা | সা জ্ঞা -া | রা -া -া | রা -া -া |
দা ও গো আ লো • দা • • ও • •

রা রা পা | পা পা -া | মা মা -া | জ্ঞা রা রা |
অ ম ন কো রে • বা ধা • দি য়ে •

ণ্া ণ্া সা | জ্ঞা রা রা | সা -া -া | সা -া ‖
জা নি না কি সু খ পা • • ও •

‖ গা গা মা | মা মা মা | গা গা মা | মা মা মা |
মু • ক্তা স ম • চো খে র কো ণে •

গা গা মা | মা -া -া | গা মা গা | রা সা -া |
অ • শ্রু আ মা র মা লা • বো নে •

জ্ঞা -া -া | জ্ঞা -া -া | রা রা জ্ঞা | রা সা সা |
ঝ রে • যে ঐ • মা লা র কু সু ম

পা পা পা | পা পা পা | রা -া -া | রা -া -া |
দে খ • না কি • তা • • ও • •

মা জ্ঞা মা | জ্ঞা রা রা | সা -া -া | সা -া -া ||
দে খ • না কি • তা • • ও • •

|| পা পা পা | সা -া -া | দা দা দা | পা পা পা |
ধাঁ ধা র প থে • এ ক লা আ মি •

মা মা পা | দা দা পা | সা -া -া | -া -া -া |
চ লে ভ • ব পা • ই • • •

সা সা রা | রা -া -া | রা -া মা | রা জ্ঞা জ্ঞা |
দু র থে কে • এ লে • দে খি •

মা মা মা | রা -া -া | সা -া -া | -া -া -া ||
তো মা র আ লে • য়া • • ই • •

|| গা গা মা | মা মা মা | গা গা মা | মা -া -া |
অ ন্ধ আ মি • এ গি য়ে চ লি •

গা গা মা | মা -া -া | গা মা গা | রা সা -া |
বি প দ বা ধা • পা য়ে • দ লি •

জ্ঞা -া -া | জ্ঞা -া -া | রা রা জ্ঞা | রা সা সা |
তু মি • দে খি • দু র থে কে •

পা পা পা | পা পা পা | রা -া -া | রা -া -া |
দু রে ই ও ধু • বা • • ও • •

মা জ্ঞা মা | জ্ঞা রা রা | সা -া -া | সা -া -া ||
দু রে ই ও ধু • বা • • ও • •

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

আদিকাব্য এবং তার প্রভাব

রামায়ণে যে কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উপদেশই আছে তাও নয় ; তা ছাড়াও কাব্য রচনা সম্পদের দিকে যে সর্বাংশে এই আদিকাব্য এযাবের পরবর্তী সকল যুগের সাহিত্যের আদর্শস্থল অধীকার করে আছে, সে বিষয়ও কোনো সন্দেহ নেই। সকল কার্য্যেই উৎকর্ষ থাকা চাই : মাধুর্য্য গুণ এবং প্রসাদ গুণেরও থাকার দরকার। কাব্যের যে গুণ থাকলে শ্রবণ মাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তার নাম 'মাধুর্য্য' (বা Elegance) কাব্যের যে গুণ দ্বারা চিত্ত উদ্দীপিত হয় তার নাম 'ওজ' (Incitement) ; এবং যে গুণ থাকলে শ্রবণ মাত্র অর্থ গ্রহণ করা যায়, তার নাম প্রসাদ গুণ (Perspicuity)। এই সকল গুণই আদি কবির রামায়ণ মহাকাব্যের ভূষণ। ভারতবর্ষের এই আদি শ্লোকবদ্ধ মহাকাব্যের মধ্যে পরবর্তীকালের কবিরা যে কি কি রস উপলব্ধি করবেন তার ইঙ্গিতও আদিকবি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণের গোড়াতে (আদিকাণ্ড, ৮-৯ শ্লোকে) দিয়েছেন :

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্।
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভিঃ রসৈ যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্।

—পাঠে, গানে মধুর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন মান এবং ষড়জ, ঋষভ প্রকৃতি সপ্তস্বরে বীণাদি তন্ত্রীযন্ত্রে সমলয়ে গানে যোগ্য এবং শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ও ভয়ানক প্রভৃতি রস সমন্বিত এই কাব্য তাঁরা গাইলেন। আদি কবির এই কাব্য তৎকালীন প্রচলিত সহজ সংস্কৃত ভাষায় সাধারণের পাঠ্যোপযোগী করেই লেখা হয়েছিল।

এ বিষয় এখন নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এই অপূর্ব্ব মহাকাব্য তাঁর পরবর্তীকালেরও সকল কবিরাই পাঠ করেছেন এবং ভাস, ভবভূতি, কালিদাস এই রামায়ণ থেকে প্রচুর রসগ্রহণ এবং অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আমরা—এখন কেবলমাত্র মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও ঋতুসংহার দুটি কাব্যের মধ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের প্রভাবের বিষয় যা অনুধাবন অনুভব করেছি তারই কথা বলব।

কালিদাসের ঋতুসংহার রচনার বহু যুগ পূর্ব্বে বাল্মীকি রামায়ণে ঋতু-বর্ণন করেছেন, যার সুস্পষ্ট আদর্শ থেকে মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার রচনায় অনুপ্রেরণা লাভ অসম্ভব ব্যাপার নয়। অরণ্যকাণ্ডের ষোড়শ সর্গে হেমন্ত ঋতু বর্ণনা,—কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের অষ্টাবিংশ সর্গে বর্ষা-বর্ণনা—ত্রিংশ সর্গে শরৎ ঋতু এবং উত্তরকাণ্ডে ষট্‌ত্রিংশ সর্গে গ্রীষ্ম বর্ণনা যেরূপ দেওয়া আছে, তা' কালিদাসের ঋতুসংহারের চেয়ে প্রাচীনকালে লেখা হ'লেও, কম সরস নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল।

অরণ্যকাণ্ডে (৪-২২ শ্লোক) আছে :.....পরৎকাল অতীত হয়ে হেমন্ত আগত। সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে রাম তখন পঞ্চবটীতে বাস করছেন। একদিন প্রভাতে ; রাম গোদাবরীতে স্নান করতে গেলেন ; তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন সীতা দেবী—এবং কনক দণ্ড লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ হেমন্তের বৃক্ষ-সৌন্দর্য্য দেখে এবং উপভোগ করে রামকে বলেন :

অয়ং সকালঃ সংপ্রাপ্তঃ প্রিয়ো প্রিয়তরব।
অলংকৃতইবাভাতি যেন সংবৎসরঃ শুভঃ।
প্রকৃত্যা শীতলস্পর্শো হিমবিদ্ধশ্চ সাম্প্রতম্।
প্রবাতি পশ্চিমো বায়ুঃকালে দ্বিগুণ শীতলঃ।
যাস্যাঙ্কুর অরণ্যানি যবগোধূমবন্তি চ।
শোভন্তেঽভ্যধিকং সূর্য্যনকরাভিস্তৌক্ষ্যরশ্মিভিঃ।
শঙ্কুরি পুষ্পাকৃতিভিঃ শিরোভিঃ পূর্ণতণ্ডুলৈঃ।
শোভন্তে কিঞ্চিদানম্রাঃ শালয়ঃ কনকপ্রভা।
অবশ্যায়নিপাতেন কিঞ্চিৎ প্রস্রুতশর্ব্বরী।
বনানাং শোভতে ভূমির্নিবিষ্টতরুপাদপা।
এতেহি সমুপাসীন বিহস্য হলচারিণঃ।
নবপাহন্তি সলিলমগ্রপল্লভা ইবাহবম্।

—প্রিয়তর, যে ঋতু আপনার প্রিয় তা' সমাগত। ইহার আগমনে সংবৎসর যেন মঙ্গলময় এবং অলংকৃত হয়। পশ্চিম বায়ু শীতলস্পর্শ, এখন হিমের জন্য দ্বিগুণ শীতল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অরণ্য সকল বাষ্পে আচ্ছন্ন, যব ও গোধূম উৎপন্ন হয়েছে। তণ্ডুলপূর্ণ কনকবর্ণ ধান্যের শীষ পঙ্কুরি পুষ্পের মত কিঞ্চিৎ নত হয়ে শোভা পাচ্ছে। নীহার পাতে ঈষৎ আর্দ্র হরিদ্বর্ণ তৃণময় স্থান তরুণ সূর্য্যকিরণ সম্পাতে বনভূমি শোভিত হয়েছে। স্ত্রীর জন যেমন যুদ্ধে নামে না, সেইরূপ এই সকল হলচর বিহঙ্গ জলের নিকটে থেকেও জলে অবগাহন করছে না।

কালিদাসের ঋতুসংহারের হেমন্তকাল বর্ণনায় আছে :—

নব প্রবালোদ্গম রক্তরম্যঃ
প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্কশালিঃ।
বিলীন পদ্মঃ প্রপতত্তুষারো
হেমন্তকালঃ সমুপাগতোঽয়ম্।

—হেমন্তকাল সমাগত। রম্য শস্য এবং নবপ্রবালোদ্গমে (কচি কিশলয়

উল্লসে। কুশ, লোধ্র এবং পরিপক্ব শালিধান্যে এবং তুলারাশিতে মিলীন পক্ক, রমণীয় মূর্তি ধারণ করে।

বাল্মীকির আরণ্যকাণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের (১৮ সর্গ, ১৭—এবং ২০ ২১ শ্লোকে) বর্ষাকালে বর্ষণ ও জল অনুপম নয়। রাম মাল্যবান পর্বতে—বসে লক্ষ্মণকে বলছেন :

কচিৎ প্রকাশং কচিদপ্রকাশং
নভঃ প্রকীর্ণাম্বুধরং বিভাতি।
কচিৎ কচিৎ পর্বত সন্নিরুদ্ধ:
রূপং যথা শান্ত মহার্ণবস্য।
বিদ্যুৎপতাকা: সবলাকমালা:
শৈলেন্দ্রকূটাকৃতি সন্নিকাশা:।
গর্জন্তি মেঘা: সমুদীর্ণ নাদা
নদন্ত নাগেন্দ্রাইব সংযুগাগ্রে।
ধারোল্লকাপাতিত শব্দবন্তি
প্রবৃত্ত নৃত্যোৎসব বর্হিণানি।
বনানি নিষ্কুটবনোপকাণ্ডি
সংসেব্য সিদ্ধৈরধিকং বিভাতি।

—মেঘ বিক্ষিপ্ত থাকায় গগন কোথাও প্রতিভাত হচ্ছে আবার কোথাও বা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোথাও কূল পর্যন্তাকীর্ণ বিস্তৃত সাগরের মত বোধ হচ্ছে। বিদ্যুৎ পতাকা ও বলাকার মালায় শোভিত গিরিশৃঙ্গাকার মেঘ তরঙ্গায়িত মত্ত গজেন্দ্রের মত গর্জন করছে। বেগ, অপরাহ্নে যেন যেন অধিকতর শোভান্বিত হচ্ছে। মেঘ থেকে প্রচুর বারিপাতে শ্যামল ভূমি তৃণাকীর্ণ হয়েছে, তাতে বন্যের বন মৃত্যোৎসবে মেতে আছে।

কালিদাস এই বর্ষাঋতু বর্ণনায় বলেছেন :

নদীকরাম্বোধরবন্ধুরস্য
স্ফুরিৎ পতাকোপনিবদ্ধ শোভা।
সমাপতে রাজবদুদ্ধ তদ্ভূতি
ঘনাগম: কামিজনপ্রিয়: প্রিয়ে।

—প্রিয়ে, কামিজন প্রিয় নিবিড়কান্তি উচ্চতরাজ প্রাবৃট সমাগত। জলকণ-বাহী মত্ত বারিদ ইহার মত্ত মাতঙ্গ : তড়িৎ ইহার জলপতাকা এবং অশনি পণব ইহার মাদল (মৃদঙ্গ)।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (২৮ সর্গে, ২৪ শ্লোকে) বাল্মীকি বর্ষাবর্ণনায় বলেছেন :

বালেন্দ্র গোপাম্বরচিত্রিতেন
বিভাতি ভূমি নবশাদ্বলেন।
গাম্ভীর্যমুদ্ধর্ষকেন শুষ্ক প্রবেগ
নারীব লক্ষ্যোক্ষিত কথনেন।

—নবতৃণাবৃত ভূমিতে স্থানে স্থানে নবজাত ইন্দ্রগোপকীট* আরে,—যেন মনে হচ্ছে কোকে নারী লাক্ষার বিলুপ্ত শুষ্ক (চর্চ) বর্ণ কখন পায়ে ফিরেছে।

কালিদাসের বর্ণনায় (ঋতুসংহার বর্ষা, ৪ শ্লোকে) আছে :—

প্রভিন্নইন্দ্রায়ুধনিষ্ঠুরাম্বুভি:
সমাচিতা শ্রেণিতরুস্থলীতলৈ:।
বিভাতি শুক্লেতরপুষ্পভূষিতা
বসুন্ধরেব স্থিতিরিন্দ্রগোপকৈ:।

—ধরণী বিদারিত নীলমণিবৎ প্রভাসম্পন্ন তৃণাঙ্কুর, সমুদ্গত কদম্বনী দল এবং ইন্দ্রগোপকীট সমূহে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে কৃষ্ণাদি বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট মণি সমূহে সজ্জিত বসুন্ধরার ন্যায় বিরাজিত।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এরূপ যথাযথনা বহু আছে যা' কালিদাসের কাব্যচতুর্বর্ণনার তুলনাযোগ্য। সীতাকে স্মরণ ক'রে শরৎকাল উপনীত দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলছেন (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ২০ সর্গ, ১৮, ১৯ শ্লোক)

সুস্নিগ্ধপত্রৈ: কুমুদৈরুপেত:
মহাহ্রদস্থ: সলিলং বিভাতি।
দলৈর্বিমুক্ত: নিশিপূর্ণচন্দ্র:
তারাগণাকীর্ণমিবাম্বরীক্ষম্।
জলপ্রসন্নং কুমুদৈ: প্রহাসৈ:
শ্রৌক্ষমং শালিবনং বিপক্কম্।
মৃদুশ্চবায়ু বিমলশ্চচন্দ্র:
শংসন্তি বর্ষাপগমাগতানি।

—ওই বিশাল হ্রদের জলে অনেক কুমুদ ফুটে আছে। তার-মধ্যে একটি হংস সুপ্ত আছে : যেন রাত্রিতে মেঘমুক্ত তারকা। নভাকীর্ণ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়েছে। নদীর তীর নববিকশিত কাশপুষ্প মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত হ'য়ে ধৌত নির্মল ক্ষৌমবস্ত্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। স্বচ্ছ জল, প্রস্ফুটিত কুমুদ, শ্রৌক্ষের বন, পরিপক্ব ধান্যের ক্ষেত্র। মৃদু-বায়ু ও নির্মল চন্দ্র বর্ষা-অন্ত সূচনা করছে।

কালিদাসের ঋতুসংহারে শরৎ-বর্ণনায় আছে :

কাশাংশুকাবিষ্কৃতশারদশ্রীরুদ্ধ্রবন্ত্র
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
অপক্কশালিরুচিরাতনুগাত্রযষ্টি :
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিবরূপরম্যা।

—রম্যা শরৎকাল, নববধূর ন্যায় সমাগত। কাশবস্ত্র ধারণ ক'রে বিকচ-কমল-রূপোজ্জ্বল মুখ নিয়ে পক্ষধান্যের চারুতনুরুচি ধারণ ক'রে মত্তহংসের নিনাদনূপুর বাজিয়ে অতি রমণীয় রূপ ধারণ করেছে।

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতেও আদিকবি বাল্মীকির অনুসরণ বা অনুকরণ যা করলেও কিরূপে রামায়ণ কাব্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন তার কিছু এবার কিছু আলোচনা করব।

মেঘদূতের পরিকল্পনার সূত্র হ'ল :.....যক্ষিকায়-প্রমত্ত একজন

* বর্ষাকালীন ঋতুস্নায়ী একপ্রকার লাল 'কেঁচোটে' পোকা।

সম্বন্ধে তাঁর প্রভু (কুবের) এক বৎসরের জন্যে অলকা থেকে রামগিরি পর্বতাশ্রমে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে (৯ম সর্গে, ১১ শ্লোকে) আছে বিরাধকে বধ করার কালে, বিরাধ রামকে তার পরিচয় দিয়ে বলছে : "হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মোহবশে তোমাকে চিনতে পারিনি। আমি তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব ; ধনের প্রতি আসক্তি বশত: আমি অনুপস্থিত ছিলাম, সেই কারণে কুবেরের শাপে রাক্ষস হয়েছি। মেঘদূতের যক্ষের অভিশাপ ইঙ্গিত এতে রয়েছে। আবার উত্তরকাণ্ডের চতুর্দশ সর্গে রাবণের কুবের ভবনের প্রসঙ্গে আছে,—যক্ষগণ সসৈন্য রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হ'ল, কিন্তু পরাজিত ও ভীত হয়ে নদী-গিরিগুহায় তারা পালিয়ে রইল। তখন কুবের যক্ষদের ভীত দেখে সেনাপতি 'মণিভদ্রকে আহ্বান করলেন। তখন মহাবীর মণিভদ্র চার সহস্র যক্ষ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। মহাকবি কালিদাস মেঘদূতের শ্লোকাংশে যে "অধিকার প্রবর" যক্ষকে কুবেরের শাপে একবৎসরের জন্য নির্বাসন দিলেন। সে এই কুবের সেনাপতি নিজক্ষমতায় প্রবর মণিভদ্রও হ'তে পারে। অবশ্য পৌরাণিক পণ্ডিতেরা 'অধিকার প্রবর' কথার অর্থ করেন—'কর্মে অসমাপোপিত'। কিন্তু "প্রবর" শব্দের দ্বারা পরিচিত সেনাপতির ভাবই প্রকাশ পায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে কালিদাসের সমসাময়িক কালের অব্যবহিত পূর্বে যক্ষের বিরাট প্রস্তরের যে মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার গায়ে প্রস্তর লিপিতে 'মণিভদ্র' নাম পাওয়া গেছে। এবিষয়টি গবেষণার যোগ্য। এছাড়াও কালিদাসের মেঘদূতে বর্ণিত অনেক বিষয় আছে যা তিনি আদি কবি বাল্মীকির রামায়ণ থেকে পেয়েছেন।

আনন্দমঙ্গল

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর

বন্ধুর কণ্টকপথে সংকটের সহ করি' রণ,
যষ্টিভরে যষ্টি পার হইয়াছে এ পঙ্গু জীবন।
সহিয়াছি দুঃখশোক, বহিয়াছি বক্ষে বহু রোগ,
শূলরূপে বিদ্ধ ভুলে করিয়াছি কত দণ্ডভোগ।
ভিক্ষার ঝুলিতে নিত্য লভিয়াছি ধিক্কার, লাঞ্ছনা,
নিতান্ত বাঞ্ছিত ধনও করেছে বঞ্চনা।
মোহবশে ভাবিয়াছি বিধাতার বুঝি অবিচার।
তারা শুধু আনন্দেরে স্বাদুতর করেছে আমার,
বেদনার ফাঁকে ফাঁকে তবু বার বার
যে আনন্দ পাইয়াছি এ জীবনে মম
ভাদ্রের মেঘের ছিদ্রে হেম রৌদ্রসম,
সেই আনন্দের কথা মুক্তকণ্ঠে না করি স্বীকার
নিঃশব্দে বিদায় নিলে ক্ষমা নাই তার।

আনন্দ দিয়াছে মোরে দয়িতার প্রেম শুভ্র শুচি,
নবশিশু নন্দনের কুসুমদন্ত রুচি।
আনন্দ দিয়াছে মোরে সৌহার্দ্যের হৃদ্য আলাপন,
রসজ্ঞের শ্রদ্ধানিবেদন।
স্বজনের স্নেহ ভালবাসা,
জনকের শুভাশিস্, জননীর চন্দনাক্ত ভাষা।
আনন্দ দিয়াছে সে-ও যার কাছে করিনি প্রত্যাশা।

মধুচক্রে মকরন্দ তুলায়েছে মক্ষীর দংশন,
তুলালো কণ্টকক্ষত গোলাপের গন্ধবিনোদন।
কূজন, গুঞ্জন, মন্দ্র, জলকলতান
আনন্দ অঞ্জলি মোরে সন্ধ্যাপ্রাতে করিয়াছে দান,
কর্ণ-পুটে করিয়াছি পান।
আনন্দ দিয়াছে এই সৃষ্টিমঞ্চে ভোজের সম্ভার
ঋতুতে ঋতুতে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য-বিস্তার,
অফুরন্ত মাধুরীভাণ্ডার।
রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে পরিতৃপ্ত করেছে বসুধা
হরি' ইন্দ্রিয়ের তৃষা, অন্তরের ক্ষুধা,
বস্তু পাই নাই বটে, বসুধার পাইয়াছি সুধা।
আনন্দ বিছাল' দেহে রৌদ্রদাহে বটতরুচ্ছায়া,
জুড়াল' জাহ্নবীজল জীর্ণ শ্রান্ত কায়া।
আনন্দের দানসত্র খুলিয়াছে মেঘ, চন্দ্র, রবি,
কত জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, কবি।
পুষ্পে ভৃঙ্গসম তৃপ্ত, তাঁহাদের শুভসঙ্গ লভি'।
আনন্দ দিয়াছে মোরে সারস্বত ব্রতের সাধনা,
রস-ব্রহ্ম সুন্দরের ছন্দে আরাধনা।
আত্মাও আনন্দ দানে করিয়াছে মোরে আত্মহারা,
আমারি অন্তর উৎসে উৎসারিল যেই রসধারা,
যে আনন্দ মিল তাহা, ব্রহ্মস্বাদ-সহোদর-সম।
স্মরণে রোমাঞ্চ জাগে সর্ব অঙ্গে মম।
খেয়া ঘাট পথে সেই আনন্দের স্মৃতি
দূর করে সর্ব তাপ, দুঃখ, পাপ, ভাবনা ও ভীতি,
তাই মোর এ পথে পাথেয়,
আনন্দময়ের পদে অর্ঘ্য তাই, তাই সত্য শ্রেয়ঃ।
মনে হয় যত দুঃখ পাইয়াছি সবি মিথ্যা মায়া,
এ চিত্তের ভিত্তিগাত্রে আনন্দেরই ছায়া।

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আর একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। পরম সুন্দর। ডেট্রয়িটের থেকে এসেছে। আমার বক্তৃতা শুনে এসে বলল : "বলুন আমাকে আমার। আমি চাই ধর্মজীবন। উপায় কি? আমার আশা খুব ভালো নয়—শুনেছি ধর্মজীবনের একটা ছাপ আছে—কেবল বলিষ্ঠ মেয়ে সে-ছাপ সইতে পারে।"

চমৎকৃত হলাম। এ নিয়ে খ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার আলোচনা

আকাশ ছোঁয়া বিশাল 'রেড্‌উড' বৃক্ষের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটি শিশু

হয়েছিল বছর কয়েক আগে। তিনি লিখেছিলেন আমাকে যে যাঁটি মানুষ যখন খাঁটি ধর্মজীবন চায় তখন ভগবান্ তাকে রক্ষা করেনই করেন—এর অন্যথা হ'তেই পারে না।"

ইন্দিরার মৃত্যু দেখে এ ঘুচে গেল। অতঃপর যে আমাদের সেবা করত সে কী বলব? ইন্দিরার গাপানির ওষুধ চাই—পাওয়া যেত না—আমার চাকচিক্যি চাই অমুক অমুক—দিল কিনে দিয়ে থেকে। একটি টাইপরাইটার—বলল আমারটা নিন। তার সুন্দর মুখ ও নয় তাদের মধ্যে কিন্তু একটা কেমন বিরক্তি ছিল। বলত প্রায়ই : "বলুন কী ভাবে যাপন করব আমার জীবন।" বললাম : "এসো একলা যা জানি বলব বৈ কি।" দেখতে দেখতে খুব ভাব হ'য়ে গেল। সেই মানুষি অনুভূতি—স্নেহের আধারের পর কত সহজেই আপন হয়!"

* * *

অ্যাকাডেমিতে সুরু হ'ল আমার বক্তৃতা ২৬শে জানুয়ারি—গুডউইল, ভারতের স্বাধীনতা দিবসে। পর পর তিন দিন বক্তৃতা দিয়েছি। কী ভাবে একটু বলি। বলবার ম'ত।

ক্লাসে গিয়ে দেখি বশ-বার জন ছাত্রছাত্রী—বলাই বেশি, মানুষ আমেরিকান। কী ভাবে সুরু করি? ক্লাসে বক্তৃতা আমার দাতপুরুষে কখনো দেয় নি। তার উপর নির্জলা বিদেশী—তার উপর আমেরিকান। মনকে শুধালাম : "ভোলা মন! এবার নমস্য হ'তে হবে যে! কী করা যায়?" ভোলা মন হঠাৎ বাহি হ'ল মান বাঁচাতে, বলল : "প্রভু! দিওয়ির কয়েকটি ছেড়ে আগে প্রাণ্ডি উক্যান কিছুর অবতারণা করুন—চাই আগে ওদের উৎসুক্য জাগানো। নৈলে দেখবেন ঘুমিয়ে সবাই ভাগবে—আপনার ছাতাও মাড়াবে না।"

তথাস্তু। প্রথম চিলাকল ঠাট—অর্থাৎ শুদ্ধ ঠাটের—একটি গান গেয়েই বললাম আমার সঙ্গে তাল দিতে ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক। ওরা দিল—ইশিয়ার পাশে ব'সে তাল দিচ্ছিল ওদের দেখাতে কোথায় কোথায় কোঁক পড়ছে। তারপর, ওদের একটু স্তম্ভিত করাও তো চাই—নৈলে ভাববে : "এ! এ তো জলের মতন সাফ!" যে কথা সেই কাজ, ধরলাম বিষমপন্থী ভেওরা। খানিকক্ষণ তাল দিয়ে দেখাতে দেখাতে ওরা ধরল তালের ঘুল কোঁক তিনটি। আর সঙ্গে সঙ্গে কী পুলক ওদের! কী আশ্চর্য তাল! কী চমৎকার করব!—ইত্যাদি। তখন বললাম জলদমন্দ্রে : "বন্ধু! বোঝো কী ভাবে আমাদের সঙ্গীত বিকশিত হয়েছে!" তারপর ইমন রাগের ঠাট বুঝিয়ে বললাম তাল। এবার পুলক শিহরে ওদের প্রায় বশা হয় আর কি!

তারপর বললাম : "এবার যেওক যাক্ একটি পরম সুন্দর রাগ যার ঠাট তোমাদের সঙ্গীতে নেই আদৌ—কিন্তু তৈরবী। গ্রীস ঘেঁসে এলে বলত Phrygian mode—কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নেই এর ঘোঁসর"……ইত্যাদি। ব'লেই ধ'রে দিলাম শ্রীঅরবিন্দের অপূর্ব রচনা (অমিলবরণের মহালক্ষ্মী গানের অনুবাদ) :

In lotus groves thy spirit roves
Where shall I find a sent for thee ?

খানটি আবৃত্তি করলাম ওরা স্কুলের ছাত্রমাত্রীর মতন প্রত্যেকে খাতায় টুকে নিল। তারপর বললাম : "গাও আমার সঙ্গে। প্রথমটা হয় মানবে অবশ্য, কিন্তু সাঁতার দেওয়া শিখতে হ'লে প্রথম প্রথম ঝুপ্ ক'রে জলে নামা। এই ইংরাজি গানটি বিশুদ্ধ ভৈরবী সুরে বসানো। তাই না পারো গাও সঙ্গে সঙ্গে।"

মিনিট পনের গাইতে গাইতে ওরা উচ্ছ্বসিত ! কী সুন্দর সুর ! কী সুন্দর চং এর ওপের—ভঙ্গির ! .....ইত্যাদি

যখন অল্পবয়সি আমেরিকান নরনারী গাইতে লাগল একতালে আমাদের ভৈরবী সুরে ইংরাজি গানে —তখন গায়ে আমার যাকে বলে কাঁটা দিয়ে উঠল সত্যিই। মনে হ'ল "আহা রে ! যদি কলকাতার কোনো আসরে এই কোরাস শোনাতে পারতাম !"

সত্যি, তা বুঝি আমার মনের অবস্থাটা। এসেছি কোন্ বিদুঁরে যেখানে না জানে কেউ আমাদের ভাষা, না জানে আমাদের সুর, না জানে আমাদের রীতি নীতি চালচলন। এহেন পরিবেশে ধ্রুপদী ক'রে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে ইংরাজিতে আমাদের ভারতীয় রাগ রাগিণী সম্বন্ধে, গাইতে হচ্ছে ভারতীয় সুর—তা আবার ওদের ইংরাজি ভাষায় বসিয়ে—আর গাইতে না গাইতে কিনা গান যাচ্ছে ছ'য়ে—শিক্ষা ও ছড়োছড়ি সমান আনন্দে আত্মহারা ! ভগবান দুঃখ যেন বড় কিন্তু আমার এমন আনন্দও তো দেন !—কেবল (মামুলি) দুঃখ এই যে এমন শিহরণের আবির্ভাব হয় কদাচিৎ—কানে গুঞ্জে : Rarely rarely comest thou, spirit of delight ! বলেছিলেন কে ? শেলি না ?

* * * *

পরের দিন বালকোল পাইলাম গান বাংলায় "সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গাওয়া গান—ক'পিঠালে :

"রাঙা কমল রাঙা করে রাঙা কমল রাঙা পায় !

চঁপিয়া দুতালেতে তাল দেখাল। ওরা আরো উচ্ছ্বসিত ! হাতে তাল দিতে লাগাল ওর পায়ের নূপুরের সঙ্গে মিলিয়ে। তাবুন অকরুণ পাঠক

রেড্‌উড্‌ বনের বৃক্ষ

শ্বেতপুষ্প শোভিত 'ব্রাউন হিল'

পাঠিকা ! একটু করুণ হ'য়ে ভাবুন কী অঘটনটা ঘটছে অঘটন ঘটন পটীয়সীর ইন্দ্রিতে !

কান যার কের দেখায় পিতৃদেবের মিষ্টি গান :

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই

আলোর মতন হাসির মতন কুসুমগন্ধ বাঁশির মতন
হাওয়ার মতন খেলার মতন
ঢেউয়ের মতন এসে যাই।

কিন্তু ওরা গাইবে এই অবিকল ঐ সুরে—ইংরাজিতে :

We come and float past homing···
Even as light and even as laughter···
Even as the heart-ache's questioning after···
Even as the breeze's mystic thrill
And even as the shimmer of gloaming

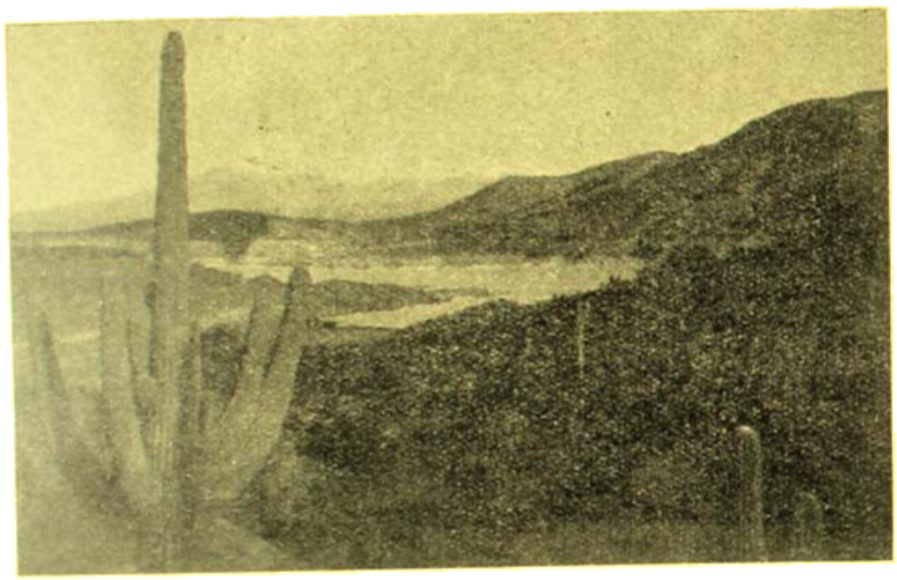

এপারে ক্যালিফর্নিয়া, ওপারে সাউথওয়েষ্ট, মাঝে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ

সুর এই যে পাহাড়ের সমুদ্র দেখতে পেলাম না—কুয়াশা লাগল বাধ। যাহোক ওপারে গিয়ে ধ ড় ক'রে চলছি তো চলছিই—আর সেই প্রথম দিনের দৃশ্য—ছুটেছে মোটর অথচ পথে পথিক নেই একটিও!

হঠাৎ, ও মা! পাহাড়ে ওরা সুরু হ'ল। একেবারে জলজ্যান্ত পাহাড়—আঁকা বাঁকা, উঁচুনিচু—দেখতে দেখতে হৃদয়ে গভীর গর্ব ও উপত্যকা জেগে উঠল। কী সুন্দর! সুইজর্লণ্ডের কথা মনে করিয়ে দিল। সমুদ্র পাহাড়ের ঢেউ খেলছে বাঁদিকে, ডানদিকে প্রতিবেশী—বৃদ্ধ পাহাড়ের অচলায়তন! চোখ জুড়িয়ে গেল!

তারপর, ওমা! আচম্বিতে ধ ড় ক'রে মোটর থামতে সুরু করল! দেখতে দেখতে Muir wood বা Red-wood forest!

এখানে কী অপরূপ যে বিটপি-বৃন্দ তথা বীথিকা! আর সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ বেঢপ গাছ গুলির অজস্রতা ও বৃহত্তা। এর চেয়ে চওড়া গাছের গুঁড়ি দেখেছি, বলা বাহুল্য। কিন্তু এত লম্বা গাছ কখনো দেখিনি। সত্যি মিথ্যা জানি না তবে জনশ্রুতি এত লম্বা গাছ আর নাকি নেই দুনিয়ায়। সবচেয়ে লম্বা গাছটির উচ্চতা ২৬০ ফিট, বেড় ১৭ ফিট।

কিন্তু শুধু দৈর্ঘ্যে অদ্বিতীয়তাই নয়, কী সুন্দর! ঠিক হরিৎ এই গাছগুলি শীত গ্রীষ্মে বোধহয় সমভাবে—সমপ্রচুর—অচল-প্রতিষ্ঠ। গাছমূলে সাথী চলেছে কলকলিনাদী প্রান্তিহীনা নির্ঝরিণী। অমল সমুজ্জ্বল পাতার মধ্যে সোনার রোদ—মনে পড়ল শেলির লাইন: "The emerald green of leaf-enchanted beams!"

বন্ধুবর সুনীতি আচার্য্য দিয়ে দিয়েছিলেন—ইন্দিরা বেশি কিছু খেল না, কিন্তু আমরা দুজন লাঞ্চেই পিকনিক করলাম।

* * * *

আর একটি ফলে বিস্তর মিলন। এপাশে আধঘণ্টা ব'সে বললাম শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের কথা ও জেলে ভগবদ্দর্শনের কথা। তার-পরে শিক্ষদেবের অমেয় গানের কথা ব'লে গাইলাম প্রথম "ভারত আমার ভারত আমার" ও শ্রীঅরবিন্দ প্রণীত ইংরাজি অনুবাদ। তারপর গাইলাম ইন্দিরার রচিত গান "ইকদিন জাগা ইকদিন জাগা হৈ পীকি নগরিয়া জাগ" —অবশ্য আগে এগানটির অনুবাদ ক'রে গানটির ভাব বুঝিয়ে দিয়ে তবে।

গানান্তে ওরা সোজ্জ্বাসে ধন্যবাদ দিয়ে হাতে গুঁজে দিল দক্ষিণা—গানে লেখা "with-appreciation" বাড়ি এসে খুলে দেখলাম পঁয়ত্রিশটি ডলার—একশো পঁচাত্তর টাকা। ঘুরিয়ে ব্রাহ্মণ বিদায় হ'ল দস্তুর ডলার। মন্দ কি—বিদেশ বলম না-চাইতে পাওয়া—যাকে বলেছি ভাগ্যের ফল windfall!

বলব ওদের: "প্রথম গানটি হ'ল বিষ্ণুর স্তুতির গান, এটি হ'ল প্রাণের গান খানিকটা রহস্যময় ওকে মিস্টিক।"

তারপর···কিন্তু পরের কথা পরে।

* * * *

ভেরবী শেখানোর পরদিন আমার ডিরেক্টর বন্ধু ঈষৎ হাসীর তাঁর মোটরে ক'রে আমাদের নিয়ে গেলেন ফের সমুদ্রে, প্রায় ত্রিশ মাইল। সেলাম হ ড় ক'রে "স্বর্ণদ্বার সেতু"-র (Golden Gate Bridge) উপর দিয়ে। সানফ্রান্সিস্কোর সবচেয়ে লম্বা সেতুর নাম বুঝি ওকল্যাণ্ড ব্রিজ—সাড়ে আট মাইল লম্বা সমুদ্রের উপর দিয়ে। "স্বর্ণদ্বার সেতু"-ও প্রকাণ্ড ও দীর্ঘতায় বোধ করি মাইল দুই তিন। বন্ধু বললেন এর পরের দিন নিয়ে যাবেন দীর্ঘতম সেতুর উপর দিয়ে।

কিন্তু উন দীর্ঘতম সেতু দেখেই যাত্রা অন্বিম, দীর্ঘতম সেতু দেখলে না জানি কী তাদের অবস্থা হবে! তাদুর, সমুদ্রের উপর দিয়েই চলেছে ত চলেছেই প্রশস্ত সেতু—এত প্রশস্ত যে পাশাপাশি দুটি মোটর ছুটতে পারে এবং প্রায়ই ছুটে থাকে—একদল এদিক থেকে ওদিকে, আর একদল ওদিক থেকে এদিকে—যাকে বাংলা ভাষায় বলে লাগ খাওয়া, চাকা।

আশাবরী

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্য নেমে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদে একা আনমনা পাইচারী করছিল সুমনা। এটা তার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাস। দিনশেষের একটা গৈরিক ছোপ তার মনকে এই তারাবিভাসিত নিভৃতে ঠেলে দিতো। নিরাবরণ চন্দ্রাতপের নীচে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। মেসের ফাঁকে ফাঁকে দুচার কোটা ইলশেগুঁড়ি তখনও পড়ছে। নকল বৈশাখীর নিকষ কালো মালমশলা আকাশের কোণে কোণে ছিন্ন ভিন্ন। সারাদিনের অসহ তিক্ততার পর ভারী আরাম পেলে সে। মনে হলো অনেক দিনের পুরানো আকাশ তাকে নতুন করে হাতছানি দিচ্ছে। সেতারে নতুন তার লাগিয়ে দিয়ে গেছে এক অজানা সেতারী, গলাতেও গান গুণগুণিয়ে ওঠে—তোমার এ ধূপ না পোড়ালে।

কিন্তু তাল কেটে গেলো, চাইবিল ছুতোর খট্ খট্ শব্দ করে উপরে উঠে এলো রাজেন্দ্রানীর মত স্বাতী। গ্রীষ্মের ছুটীতে হোষ্টেল খালি—ওদেরি মত দু'একজন ছাড়া সবাই চলে গেছে।

তাচ্ছিল্যভরে একটা বই ছুঁড়ে দিয়ে স্বাতী গম্ভীর স্বরে বললে—তোমার বই, এস্ ডি ওর স্ত্রীকে বুঝি পড়তে দিয়েছিলে, তাঁর চাকর ফেরত দিয়ে গেলো। বইটি দেখছি বেশ কিছুদিন আগের লেখা, এককালে লেখকের নামডাক ছিল, তাই উল্টেপাল্টে দেখছিলাম, বাংলা বইএর বেশীরভাগই থার্ড ক্লাস ট্র্যাশ্—পড়ি না—

ও তাই নাকি—

হ্যাঁ তা দেখলাম বইটা লেখক স্বহস্তে তোমায় উপহার দিয়েছেন—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে—তাই ভাবলাম এত আদরের বইটা নিজের হাতেই ফেরত দিয়ে যাই—

পরিহাস তরল কণ্ঠে হাসতে হাসতে সুমনা বলে—

এত কষ্ট না করলেও পারতে, স্বাতীদি—

আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্বাতীর প্রায় ফেটে পড়া মুখ চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেল সে। বিদ্যুৎগর্ভা নারী বৈশ্বানরমন্ত্রী চরে বজ্র নিক্ষেপ করছে—

সেই স্কাউণ্ড্রেল লাম্পটটা দেখছি তোমাকেও মজিয়েছে, চালকাতে হয় ঐ সব আদর্শবাদী-ভণ্ডদের, কথার আড়ালে যারা নিজেদের লোলুপ মনকে লুকিয়ে রাখে, ভোগ করবার সাহস নেই ত্যাগের বুলি আওড়ায়। পৌরুষহীন ভীরু ভেড়ার দল।

থর থর করে কেঁপে উঠলো সুমনা—

কি বলছো, কাকে বলছো, কিছুই বুঝতে পারছি না—

হ্যাঁ, ভক্তি করো, শ্রদ্ধা করো, গদগদ হও, কতো বড়, কত ভালো, মহান্, ধীমান, ছেলেরা ছোটে বক্তৃতা শুনতে, মেয়েরা ছোটে বই পড়তে—

অবাক হয়ে থাকে সুমনা, কিন্তু আশ্চর্য্য, রাগ হয় না স্বাতীর প্রতি। বরং একটা সমগোত্রীয়া মমতায় মন ভরে ওঠে।

যেমন গট্ গট্ করে এসেছিল স্বাতী তেমনি খট্ খট্ করে চলে গেলো, শুধু রেখে গেলো বিদগ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো লুণ্ঠিত চেতনার এক ভগ্ন চূর্ণ, আর টয়লেট পাউডারের সুগন্ধের সঙ্গে মেশানো ইভনিং ইন প্যারিসের একটু পালিশ করা আমেজ—

মেজাজী মেয়ে বলে স্বাতীর খ্যাতি বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল সত্যি, কিন্তু তাই বলে সে যে অকারণে এমন রূঢ় হয়ে উঠবে তা সুমনা ভাবতেই পারেনি। হাজার হোক্, কোনদিন ঘনিষ্ঠ না হলেও তারা একই জায়গায় দুজনে পড়াচ্ছে, বয়সে কাছাকাছি না হলেও খুব বেশী ছাড়াছাড়ি নয়, আর ভদ্রতারও একটা সহজ সংযম ও সীমা আছে। মফঃস্বলের না সহর না গাঁয়ের এই ছোট্ট ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে যখন উগ্রগন্ধী সান্ধ্যকমলের স্বাতী মিত্র, কেম্ব্রিজে পড়া ব্যারিষ্টার কন্যা চাকরী করতে এলো, তখন শুধু মৃদু

নয় বেশ সরব হয়েই উঠেছিল। কুলশী ও শিকাদীক্ষার কথা চেপে গেলেও ভরা যৌবনের সায়রে পালতোলা বঙ্কিম তনুর চাপা পড়েনি। সর্পগুলা রাজহংসীর মত দরাজগ্রীবা বেঁকিয়ে যখন সে ধমক্ দিতো, তখন মনে হতো যেন কোন নর্ডিক পুরাণ থেকে ওডিনপ্রিয়া নেমে এসেছে যৌবনদৃপ্তা রাজকন্যার রূপ নিয়ে।

এরই উল্টো ছিল সুমনা—অত্যন্ত সাদামাটা শান্ত। রোগা কালো ছিপছিপে এই বাঙালীর মেয়েটিকে বড় জোর টেনেটুনে শ্যামলা বলা চলে। বহ্নিশিখা যৌবনের কোন উদ্ধত দলোচ্ছ্বাসই তার তনতনে আছাড় খেতো না। বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দেখা যেতো একটা ঘুমের আবছা আমেজ তার পথচাওয়া চোখ দুটোকে ঘিরে এক তন্দ্রালস গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে। যখন সে সন্ধ্যাবেলায় বৈকালী স্নান সেরে বিল্ব প্রসাধনে এলো-চুলে ছাদে এসে দাঁড়াতো তখন মনে হোত কালিদাসের কাল থেকে খসে পড়েছে এক সদ্যস্নানস্নিগ্ধা সহচারী। মহাকালের মন্দিরে প্রণাম সেরে বহুদিনের অদেখা প্রিয়জনকে বলছে—আছো ত ভালো।

গরীব বাপ অতি যত্নেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ভালোই ছিল সে, স্কলারশিপও পেয়েছিল। তারই দৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজাগুলো সসম্মানে খুলে গেলো, গৌরবের তালিকায় নাম উঠলো। ছেলেবেলা থেকে গান তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সেটা ভাল করে শেখবার একটা সুযোগও জুটেছিল। গত বছর দশেক ধরে এখানে ওখানে স্কুলে আফিসে চাকরী করে সে কেমন করে এই প্রায় নাম না জানা অখ্যাততীরে তরী ভিড়িয়েছিল তার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা আজ অর্থহীন মনে হয়। আরো অর্থহীন মনে হয় অতো কষ্ট করে শেখা কণ্ঠে নেওয়া গান। বিশ পেরিয়ে পঁচিশ পেরিয়ে ত্রিশ পেরিয়ে এক একটি মাণিকজ্বলা বছর ব্যর্থ ব্যথায় সার্থক করে গীতশ্রী আজ পাণ্ডুতামাননে শ্রী।

মনে পড়ে যেদিন তার গানের প্রথম সাফল্য নিয়ে বাড়ী ফিরলো সেদিন বৈঠকখানায় বসেছিলেন শ্রীপতিবাবু, তার বাপের বন্ধু, স্কুলের গরীব মাষ্টার, বল্লেন—এসো মা, মনে রেখো, গানটা শুধু সখের খেয়াল নয়, রসের ও সাধনার জিনিস, এটাকে কখনো লোক দেখানো বিলাস করে তুলো না। দুঃখ হয় যখন দেখি মহাকবির এই সাধনাকে তাগাড়ে পড়া মরা গরুর মত শকুনি মামার দল কৃষ্টির নামে ছিঁড়ছে, তার গান বন্ধ হচ্ছে না, হচ্ছে পণ্য।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সুমনা। শান্ত হয়ে আসছে দিগন্তের অবগুণ্ঠন—মেয়ের দল মাদল ছেড়ে পালালো। অনেক দাপাদাপি করে পরম প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে দামাল ছেলেরা। ঝকঝকে তকতকে অন্তহীন আকাশের দিকে দিকে তারায় হাটে ফুটে উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের কাকজ্যোৎস্নার গলিত গৌরব। উঁকিঝুঁকি মারছেন রোহিণীকান্ত অভিসারের আশায়। নিজের অজ্ঞাতসারে সে বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে। তার হাসি আসে, কল্যাণ কিসে, কল্যাণ কি শুধু গতানুগতিকতায়, ভালো ঘরবর ছেলেপুলে নিয়ে তথাকথিত নিরুপদ্রব জীবন যাত্রায়। হাজার তারার বাতি জ্বালানো এই পরমোৎসব রাত্রি কি সর্বনাশের সন্ধান দেয় না সর্বশেষের।

তারার ইঙ্গিত ত ভুল হবার নয়। কতক্ষণ সে বসেছিল তা জানি না, হঠাৎ মোক্ষদার কাংস্যকণ্ঠে সচকিত হয়ে ওঠে সে—

কী কাণ্ড বল দিকিন ছোট-দিদিমণি, ভরসন্ধ্যেয় কোন সোমত্ত মেয়ে বুঝি এমন এলোচুলে খোলা ছাদে বসে থাকে? বড়দিদিমণি ত কার না কার সঙ্গে হাওয়া খেতে গেলো—যত সব আদিখ্যেতা—তা তোমরা মুনিব—কত লেখাপড়া জানো, দশটা পাঁচটা পাশ করেছো, আমার কী কথা বলা সাজে।

হেসে ফেলে সুমনা কথার দাপটে, বলে—তা হলে কথা কস্ কেন?

কপাল, বয়সের দোষ ত—

গম্ভীরভাবে সুমনা বলে—তাতো ঠিকই, আমরাই ত কয়েক বছর পরে চল্লিশে পড়বো—

মোক্ষদাসুন্দরীকে রাগাবার এই এক মোক্ষম অস্ত্র।

ওমা, সেদিনকার মেয়ে চল্লিশ তোমার শত্তুর হোক্, চোখে তার চালশে লাগুক, ঐ সাজগোজানী ঠোঁটে আলতা বড়দিদিমণির হোক্, মা গো মা, কি সব কাণ্ড, সাধ করে বলি, ঘরসংসার নেই, বিয়ে থা নেই, এ কী সমাজের ছিষ্টিছাড়া ছিরি, বুঝতে পারিনা বাবা, ভগবান জানেন—

আস্তে আস্তে সুমনা বলে—হ্যাঁ, একবার যদি কাছে পাই, ধরতে পারি, ভাবছি বেশ একটা গুছিয়ে কড়া চিঠি

লিখলো তাকে,চিত্রগুপ্তটা ভারী পাজী, সব কিছু লিখে রাখে তার খাতায়। কয়েকটা পাতা যদি ছিঁড়ে ফেলা যেতো—

তোমার মনের মানুষটির নাম বুঝি ভগবান, তা চিঠি দিয়ো না আমি ডাকবরে ফেলে দিয়ে আসবো—

ঠিক বলেছিস ত, ভারী চালাক তুই মোক্ষদা।

খুশীতে উপছে ওঠে সে, বলে—দিদিমণি, মুকী এই হোষ্টেলে চাকরী করছে বিশ বছর,কত মেয়ে এলো, কত মেয়ে গেলো, কতো চিঠি দিয়ে এলুম, কতো চিঠি নিয়ে এলুম—

সিঁড়িতে আবার হাইহিল জুতোর খট্ খট্ শব্দ, আর হলো কি। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্ পড়লো—মোক্ষদা—এত তাড়াতাড়ি ত ফেরেন না বড়দিদিমণি, হোষ্টেলের কর্ত্রী। কিন্তু যেতে হলো না তাকে। স্বয়ং স্বাতীই উঠে এলো। মোক্ষদাকে ডেকে বল্লে—যা তুই, খাবারগুলো গরম করে রাখ্, আমরা আসছি আধ ঘণ্টার মধ্যে।

এরকম ভাবে পায়ে পড়ে সুমনার সঙ্গে আলাপ জমানো স্বাতীর কুষ্ঠীতে লেখেনি। বায়ুমণ্ডলে যেন একটা বিস্ফোরণের আভাস। আকাশে অস্থির নক্ষত্রদল কাঁপছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাতী বললে—সুমনা, তুমি আমার ছোট বোনের মত—আজ সন্ধ্যের ভারী চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম, মেঁাকের মাথায় কতকগুলো কড়া কথা বলেছি, কিছু মনে করো না, বুঝতে পারছি, শান্তনুকে তুমিও চেনো, হয়ত খুব ভালো করেই চেনো,

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুমনা বল্লে—হ্যাঁ, কয়েক বছর আগে আমি যখন দার্জিলিংএ এক পরিবারে গান শেখাতাম, সেই সময়েই ওর সঙ্গে আলাপ।

অনেকটা স্বগতই স্বাতী জবাব দিলে—বারো বছরকে লোকে একযুগ বলে, নিরুদ্দেশ হলে কুশপুত্তলিকা দাহ করে—তা প্রায় এক যুগই হোল, বিলেত থেকে সবে ফিরেছি, ছাব্বিশ সাতাশ বয়স তখন, কচি মুকী নই। আমার সে যুগের ভক্ত অনুগতরা ইলাটিউটে এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করলে। সভাপতি শান্তনু, ও তখন এক বেসরকারী কলেজের নামকরা অপেক্ষাকৃত তরুণ অধ্যাপক। ছেলেমেয়েদের মহলে ভীষণ খাতির, সাহিত্য করে, প্রগতি করে, সাম্য ও সংস্কৃতির কথা বলে। শুনলাম চমৎকার বক্তৃতা করে, আরো চমৎকার লেখে। সাধারণভাবে সুপুরুষ না হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কিছুটা বৈশিষ্ট্য ছিল। মিটিংএ এলো, বক্তৃতা ত দিলে না; যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্বা অলৌকিকা উর্ব্বশীর অন্তর্ধান করে গেলো। বলে নারী হচ্ছে বহুর প্রতীক, সে শুধু কি মা, সে শুধু কি বধূ, সে শুধু কি কন্যা! সে মনের মাধুরী দিয়ে মেশানো মায়া, সে ছায়ার মত সরে যায়, আবার কায়ার রূপ নিয়ে ধরা দেয়। আসলে সে অধরা, সে অবন্ধনা। পুরুষ এই বহুকেই খোঁজে একের মধ্যে। প্রিয় চায় প্রিয়া, সখা চায় সখী, গুরু চায় শিষ্যা, মন চায় মিতা, মা চায় ছেলে।' সব মিলিয়েই নারী, সব কিছু স্ফূর্লিঙ্গিনী মিলেছে এক জ্বালাময়ীতে। তাই শুধু প্রেয়সীকে নিয়ে চিরকালের কারবার চলে না,নিবিড় আশ্লেষও শিথিল হয়ে আসে,চাই প্রেয়সীকে।

সত্যি কথা গোপন করব না—আগুন লাগিয়ে গেল মনে। প্রথম দিনেই চমকে উঠেছিলাম। যেচে গিয়ে আলাপটা আরো জমিয়ে এলাম তার মেসে। হেসে বল্লে—এই যে, ভেবেছিলাম আপনার মত মেয়ের অন্ততঃ এ দুর্ব্বলতাটুকু হবে না—

কিসের দুর্ব্বলতা—

আমার সঙ্গে দেখা করবার লোভটা, আমার বক্তৃতার পর ভিজিটারের সংখ্যা বাড়ে, রাগ হলো, লোকটা ভাবছে কি, বল্লুম—অন্যায় হয়েছে, বলেন ত চলে যাই—জবাব দিলে—চলে যে যাবে তাকে ধরে রাখা যায় না, এটা অতি সহজ সত্য। কবিরা নাকি বলে ছাড়লে তবে পাওয়া যায়! তবে একটা কথা জানিয়ে রাখি—মেয়েদের কাছে প্রশ্রয় পেলে ভারী ভয় হয়—

তারপর কতো কথা হলো। বাইরে রূপবান্ নন্ সত্যি, কিন্তু চিত্তবান্ সত্যবান্ লোক, কিন্তু কোথায় যেন গ্রহণ লেগেছে, ঘুণ ধরেছে দেহে। মনে হলো, সত্যিকার সাবিত্রী চাই তাকে বাঁচিয়ে রাখতে।

একদিন বললেন—আপনি যে এখানে আসেন যান, কতো লোকে কত কথা বলে জানেন—

পাঁচকথায় কান দিলে চলে?—জবাব দিই।

এক একদিন মনে হতো এই কি সেই যাকে সমস্ত যৌবন দিয়ে কামনা করেছি, সমস্ত মনন্ দিয়ে লালন করেছি। আজ একযুগ পরে তোমায় এ সব কথা বলতে একটুও সঙ্কোচ নেই। সারাদিন রাত্রি এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতুম, এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী

উন্মাদনা শিরায় শিরায় ঝঙ্কার দিতো যে, মনে হতো যেন ও যা চাইবে, ও যা বলবে সব কিছু দিতে পারি, সব কিছু করতে পারি। শিখরিনী ছিল আমার সখীও বটে, সাথীও বটে—চন্দ্র মিঃ চৌধুরীর মেয়ে, বলে—স্বাতী, তুই কি পাগল হলি, ওর কি আছে বলতো, না আছে রূপ, না আছে যৌবন, করে ত সামান্য মাষ্টারী, শুধু কথার প্যাঁচেই ভুললি?

দূর, ভুলেছি কে বলে, পেয়েছি—

মরেছিস, তোকে তমালের ডালেই টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে, কতো কাডিলাক্ বুইক্ তোর দোরগোড়ায় বাঁধা, কতো অদ্ভুত নিদ্ভুত পতি, আই সি এস্, ব্যারিষ্টার ব্যবসাদার তোকে পেলে বর্তে যায়, আর তুই—

শিখরিনীর মুখটা চেপে ধরি।

আচ্ছা শান্তনু কি তোকে চায়—সে বলে।

কথাটা বুকে বাজলো, কিন্তু লজ্জা মান ভয় এ তিন থাকতে নয়।

সুযোগ এসে গেলো। আমাদের সাউথ অফ্ পার্ক ষ্ট্রীট সমাজের পাশে চলার দলের পথিক সভার বার্ষিকী উৎসব হবে বোটানিকসে। অবশ্য আমাদের পায়ে চলার দলের শতকরা নিরেনব্বইজন সদস্য ও সদস্যারা মোটরেই আসেন যান বেড়ান। শান্তনুকে অনেকদিন থেকেই বলেছি—এবারে ছাড়ছিনা, যেতে হবে কিন্তু।

শান্তনু জবাব দিয়েছিল—বাপ্‌রে, আমরা হচ্ছি উটুরে লোক, সব সময়েই ঠক্‌ঠক করে কাঁপি, কিধেয়, তেষ্টায়, লজ্জায়, আশ্রয়ের অভাবে। বড়জোর কাব্য করবার জন্য চেয়ে থাকি উত্তুঙ্গ হিমালয়ের দিকে—ওই আমাদের আদর্শ, কিন্তু কাঁপুনি থামেনা, হাড় হয় হিম। আপনারা দক্ষিণের লোক, দাক্ষিণ্যে ভরপুর, শুধু বালীগঞ্জী লেক্ নয়, তালতমালী বনরাজী নীলা সাউথ সি পর্য্যন্ত আপনাদের গতি। আমরা মেকী টাকা, কাব্যকরা চলে, কিন্তু বাজার করা চলে না।

সব শুনছি না, এবারে কিন্তু যেতেই হবে—আপনি হবেন প্রধান অতিথি আমাদের সাংস্কৃতিক বৈঠকের—তিনশো বছরের বটগাছের নীচে হবে—

দি আইডিয়া, বটবল্কিনী নিতে নামবেন দেখছি—বলতে হবে রসবন্ধঃ মদমত্তমে—আচ্ছা, আপনাদের ড্রইংরুমে মস্কিণী নটরাজ ও হিরণ্ময়ী শাক্যমুনি অক্ষয় হয়ে বসে থাকুন, শোভন সংস্করণ অপঠিত রবীন্দ্র রচনাবলী শোকেসে বক্‌বক্ করুক, টিশিয়ানের মাডোনা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকুক শিশু যীশুর দিকে, আমরা হাততালি দিই অন্ন কুষ্টির জন্য, নিউ এম্পায়ারে নাচ লাগুক তারই উৎসবে, বুড়ো বটগাছকে নিয়ে টানাটানি কেন—

শিখরিনী শুনে বলে—একটা অমার্জ্জিত মন।

তবু ওকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম বোটানিকসে নিজের গরজে। কিন্তু সেই যে পালালো লাঞ্চের পর, পাত্তাই পাই না, খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি, গঙ্গার দিকে মুখ করে শান্তনু বসে আছে বেশ এক নিরিবিলি ছায়াবহুল কোণের নীচে—আশে পাশে আরো পাঁচটা গাছ স্থানটাকে প্রায় প্রণয়ীর কুঞ্জেই পরিণত করে তুলেছিলো, কিন্তু একেবারে গুঞ্জরণহীন। পড়ন্ত সূর্য্যের পীড়িত আলোর একটা বাঁকা রেখা শান্তনুর মুখে পড়েছে কিন্তু উজ্জ্বল করে তোলেনি। পথিক সভার একমাত্র ধাষাবর, যেন খুঁজছে একটা পথের আশ্রয়, চলার নিশানা। আর সবাই ও স্থাণু, শাড়ী ফুড়ী-গাড়ীর নকল আভিজাত্যে বাঁধা, শিকলকে বিকল করা দায়।

আমি থাকতে পারলাম না, আমার সাতাশ বছরের দেহমন বেদনায় মুচড়ে উঠলো। ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম, নতবৃন্ত পদ্মের মত আরো এগিয়ে গেলুম তার বুকের কাছে। আমার সমস্ত সত্তা, অণুপরমাণু এক অনির্ব্বচনীয় রহস্যের অনুভূতিতে গলে গিয়ে দ্রবীভূতা গঙ্গার মত ছুটেছে মহাসাগরের পানে। জীবনে সেই এক আশ্চর্য্য মুহূর্ত্তকে অনুভবে পেয়েছিলাম।

কখন সে যে নিজেকে মুক্ত করে চলে গেছে জানতে পারিনি। অনুরাগের সমাধি হলো রাগে। ক্ষোভ, দুঃখ, নৈরাশ্য, অহংকার সব মিলে একটা প্রচণ্ড জ্বালায় ভেতরটা যেন পুড়ে ক্ষার হয়ে গেলো। আমার রূপ যৌবন অর্থ বৈভব মান সব কিছু এতই তুচ্ছ হলো সেই কাপুরুষের কাছে যে আমায় ফেলে উধাও হলো।

রেখা আর শিখরিনী সেদিন আমায় অপদস্ত করতে শুধু বাকী রেখেছিল, বলেছিল—তুই একটা আস্ত ইডিয়ট্, আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। আমার নিজের উপর ধিক্কার এসেছিল, অথচ জানি আমার সঙ্গলাভের জন্য, আমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার জন্য কত বিত্তবান রূপবান বিদ্বান ঘুর ঘুর করেছে, আমাকে কেন্দ্র করে মধুমত্ত ভ্রমরের মত। মিষ্টি সাঁতারে একটু আলগোছে আমার দেহস্পর্শের

লোভ কত চোখে প্রস্ফুট দেখেছি, পার্টিতে পিকচারে পিকনিকে আমার অনাবৃত শুভ্রদেহের তির্যক্ রেখা কত লোকের দৃষ্টিকে উন্মনা করেছে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছি আর এই মানুষটা ভরে পালালো না এই নিরাবরণ যৌবনশ্রী আর মনের ব্যাকুলতাকে তুচ্ছ করলে। আমি যে সর্ব্বস্ব দিতে রাজী ছিলাম।

হিংস্র হয়ে উঠলাম আমি, গুলি খাওয়া বাঘিনীর মত। সেইদিন থেকে এই পুরুষজাতটার প্রতি খড়্গহস্ত হয়েছি। স্বেচ্ছায় হাতে নাতে ছলায় কলায় এদের যুদ্ধ করেছি, লুব্ধ করেছি, ক্ষুব্ধ করেছি। এই দেখুন হাসি পেলায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হার হলো আমারি। শান্তি পাইনি, তাইতো পালিয়ে এসেছি এই দূরে। আজ আমার মন শান্ত কেননা জেনেছি শান্তনুটা আসলে ভণ্ড, অপ্রাসঙ্গ, চরিত্রহীন। কিছুটা প্রমাণ পেয়েছি যে তার লোভী মন নেমে গেছে ভুটিয়া বস্তী পর্য্যন্ত—

সুমনা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল, একটু উত্তেজিত হয়ে বললে—সে কী, ওর খবর আর পাওনি নাকি ?

বলছি, মাঝে মাঝে কাগজে কলমে শান্তনুর নামটা বেরিয়েছে বটে, ওর একটা বইএর কথাও শুনেছিলাম, আজ দেখলাম তোমার কল্যাণে। আমিও তখন ব্যস্ত, বাবা মারা গেলেন—অতো প্র্যাকটিশ, কিন্তু দেনাও কম ছিল না। লাউডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীটা বিক্রী হয়ে গেলো। অবশ্য কলকাতায় ভক্ত স্তাবকদের অভাব ছিল না, রূপ যৌবনেও ভাঁটা পড়েনি, ইচ্ছে করলেই একটা জবরদস্ত বিয়ে করে সুখে না হয় স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে যে পারতুম না তা নয়, পারলাম না, কোথায় যেন বাধলো। পালিয়ে এলাম এইখানে।

সুমনা চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ তার পর বল্লে—স্বাতীদি, ঐ যে বল্লে হাতেনাতে প্রমাণ পেলে—

অত্যন্ত ক্লান্ত সুরে সে উত্তর দিলে—হাঁ, আমি তখন দার্জ্জিলিংএ, এসেছি বুকের আলা জুড়ুতে, বুকের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। একদিন সন্ধের সময় জলাপাহাড় দিয়ে আসছি, দেখতে দেখতে আকাশ কালো করে মেঘের মাদলের সঙ্গে পাহাড়িয়া বাদল এলো ঝমঝমিয়ে। শরতের মেঘ লঘু হলে কি হয় তার আক্রমণ ছিল আকস্মিক ও তীব্র। তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মত বর্ষাতী ও ছাতা ভেদ করে জানান্ দিতে লাগলো। আশ্রয়ের আশায় একটা সেরা বাংলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। চকিতে দেখি সন্ধ্যার স্তিমিত আলোয় কাচের উপর 'সিলহুটেড' হয়েছে একটি ছবি, সেই চিরকেলে পুরুষ ও নারী। মেয়েটি নমস্কার করে উঠছে মুখটা দেখা গেলোনা, অনেকটা তোমার ধরণের সাধারণ চেহারা, রূপসী কিছু নয়। এমন বাদল দিনে কাজলঘেরা পরিবেশে দুয়ের মাঝে তিনের আবির্ভাব অত্যন্ত বেখাপ্পা হবে ভেবে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে। হঠাৎ গলার স্বরে চমকে উঠলুম—এ গলা যে অতি চেনা—এ যে শান্তনুর। হারিয়ে যাওয়া পেছনে ফেলে আসা মনের মাইলপোষ্টটা যেন সামনে ছুটে এলো। সে মেয়েটিকে বলছে—অনেক পেলাম, এই প্রণাম মন ভরে নিলাম, এই দুফোঁটা চোখের জল অক্ষয় অব্যয় হয়ে রইলো আমার জীবনে। জমা রইলো আমার মনের ক্যাশবাক্সে, কৃপণের মত রেখে দিলাম খরচা করবোনা।

মেয়েটি ধরা গলায় কি যেন বললে শুনতে পেলাম না। খানিক পরে শান্তনুর গলা আবার শুনলাম, বলছে—আমি ত কর্ত্তব্যের যুগে নেই, রক্তের যুগে, মৃত্যু ফিরিয়ে দিলে কিন্তু পেয়ে গেলাম অমৃতকে। আজ আমি রিক্ত হলেও পূর্ণ, আমায় স্বপ্ন দেউলে হলো না।

দাঁড়াতে পারলাম না, টলতে টলতে ফিরে এলাম স্যানিটোরিয়ামে, এদেই পড়েছিলাম অসুখে। ঘোরে ভেবেছি কে সে, আমি রূপসী উর্ব্বশী তাকে ধরতে পারিনি আর কে এ তপঃক্লিষ্টা তাপসী তাকে জয় করলে।

স্বাতীর চোখে জল, সুমনার চোখে জল—চেয়ে রইলো দুজনে দুজনের দিকে।

মোক্ষদা খাবার দেওয়া হয়েছে বলতে এসে ওদের চোখে জল দেখে অবাক হয়ে গেল।

সুমনা ইশারায় বল্লে—এখন যা।

খানিক পরে সুমনাই কথা পাড়লে—কথাটা যখন তুললেই স্বাতিদি, তখন আমার কথাটাও বলেনি, তোমার ভুলটা ভেঙে দি। যেদিনের কথাটা বল্লে তার আগের কয়েকদিনের কথা। চমকে উঠলো স্বাতী—সেদিনের সন্ধ্যায় তাহলে সুমনাই……

সুমনা আস্তে আস্তে ধরা গলায় আরম্ভ করলে—আমি তখন কলকাতায় ছোট ছোট মেয়েদের গান শেখাই।

তাদেরই অভিভাবকত্বের একদল ঠিক করলেন যাওয়া হবে দার্জিলিং-এ—শুধু গ্রীষ্মের কয়েক মাস নয়, বর্ষা কাটিয়ে নভেম্বরের গোড়ায় ফেরা হবে—আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। গরীব মাষ্টারণীর পক্ষে এটা একটা পরম সুযোগ। সেখানে গিয়ে তাঁরা রাখলেন ঐ দেশী আয়াকে। বুড়ীর এক সোমত্ত মেয়ে ছিল, নাম নিমি। ভারী হাসি-খুশী মেয়েটি—প্রায় আমারই বয়সী, দুএক বছরের ছোট যদি হয়। বেশ গড়ন্ পেটন, চকচকে ঝকঝকে. মিশনরীদের স্কুলে পড়েছে, খাসা ইংরাজী শিখেছে। নার্সিং কিছুটা জানে। চমৎকার বাংলা বলতে পারে। আমার সঙ্গে বেশ বনে গেলো। আমার গলা জড়িয়ে বলতো—দিদি, বাংলা গান শিখবো তোমার কাছে—রবীন্দ্রনাথের গান—

আমি বলুম—সে কী রে—

বলে—হাঁ, এখানে এসেছিলেন যে, দেখেছি তাঁকে, ছেলেবেলায়, কি রূপ দিদি, যেন পাহাড়ের দেবতা নেমে এলেন কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে।

আমরা ছিলাম স্বাস্থ্যনিবাসে—তখনকার দিনে ওরই নীচে ছিল বন্ধ্যারোগীর ওয়ার্ড—প্রায় ভর্তি ভরা। নির্জন কারাবাসেরই সামিল। সুস্থরা কেউ উঁকি দিতো না। রোগও বিশেষ হতো না। সেখানে তখন ছিল একটিমাত্র রোগী—এক বাঙালী ভদ্রলোক। ওধার দিয়ে যাওয়া আসার পথে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কখনো কখনো বারান্দায় দেখেছি, বিশেষ খবর কিছু নিইনি, আগ্রহও হয়নি। নিমির ঐ রাস্তাটাই ছিল সোজা নেমে যাবার পথ। যাবার সময় এক একদিন উঁকি মেরে দেখতো।

একদিন এসে বল্লো—জানো দিদিমণি, ভদ্রলোকের ঘরে একটা রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে, তাতে ফুলের মালা দিলে বাবুটি আর ধূপটা জ্বালিয়ে দিলে। কৌতূহল হলো, চকিতে মনে পড়লো—সত্যিই ত আজই পঁচিশে বৈশাখ।

একদিন নিমি এসে বল্লে ম্লান মুখে—দিদি, রোগটা বেড়েছে বাবুর, কেবলই কাশছে—

চকিতনয়নার চোখে পড়লো তার পরের দিন যে রুগ্ন লোকটি যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, এক কলক রক্তে ভেসে গেছে বালিশ বিছানা, কাছে কেউ নেই, ওয়ার্ড এ্যাসিসটেন্ট উধাও।

নিমি প্রকৃতির কোলে মানুষ, শীলতা শালীনতার চেয়ে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিকেই মানে—সোজা গিয়ে বসলো বিছানার ধারে, অর্দ্ধ অচৈতন্য মানুষটাকে তুলে নিলে নিজের কোলে, ঠোঁটের লাল রেখা মুছিয়ে দিলে সযত্নে। আর সেইদিন থেকেই নিজেকে কায়েমী করে ফেল্লে সেখানে। মা মাসী হাঁ হাঁ করে উঠলো, আমরা সবাই কতো বোঝালুম বকলুম কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ডাক্তার হোক্ কিছুটা সেবা শুশ্রূষা জানে। কর্তৃপক্ষও বিশেষ আপত্তি করলেন না। একটা পরম সুযোগ পেয়ে গেলো নিমি। পাহাড়ী মেয়ে, প্রকৃতির বন্য জীবনের কিছুটা নেশা পেয়েছে সে উত্তরাধিকার সূত্রে, রক্তে এসেছে জোয়ার—সে কী কোন কথা শোনে।

আমায় বলে—তুমিও একথা বলবে দিদি, কতো অসহায় লোকটা বলো ত—

সত্যিই ত, ঐ অপরিচিত যুবকের জন্য আমার মনেও কোথায় যেন একটু রসের টান। বাঁধা ছিলো।

ভদ্রলোকের কপাল ভালো, শুধু নার্স পেলে না, পেলে আরো কিছু। কী অক্লান্ত সেবাটাই করলে নিমি—আমি পারতাম না একথাটা বলতে পারি। ফল ফললো, এতদিন বলতে গেলে ডাক্তারী দুঃশাসনই চলছিলো। তার রক্তপাত বন্ধ হলো। আস্তে আস্তে জোর পায় মানুষটা—বিছানায় উঠে বসে—নিমির হাত ধরে বাইরের কাচঘেরা বারান্দায় আবার আসে—চেয়ে থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘার দিকে। নিমি তার পাদুটো ঢেকে দেয় চমৎকার পুরু ইটালিয়ান দামী রাগে, অনেক সখ করে অতি কষ্টে টাকা জমিয়ে নিমি যেটা কিনেছিলো এক ম্যাণ্টার মেমসাহেবের কাছ থেকে। তার পর দেখি রবীন্দ্রনাথের ছবিটা সাজাচ্ছে ফুল দিয়ে—লাল টুকটুকে রডোডেনড্রন দিয়ে। একদিন দেখি ঠিক তার পায়ের নীচেটিতে মেঝেয় বসে পশমের ব্লাউজ বুনছে একমনে। ভারী লোভ হতো ওদের দলে যোগ দিতে।

একদিন যাচ্ছি ঐ দিক দিয়ে, দেখি নিমি ঘনিষ্ঠ হয়ে টেনে নিয়েছে তাকে, গলায় হাত জড়িয়ে মুখটা এগিয়ে দিয়ে কানের কাছে কি বলছে। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো—ওর ঘর ছাড়া চোখে যে দেখলাম ঘর বাঁধার স্বপ্ন না লোভ। যুক্তবেণী যুক্তবেণী হতে চাচ্ছে নাকি? আমায় দিদি বলতো নিমি—ভদ্রলোকের অসহায় দৃষ্টি দেখে তাকে ডেকে বল্লুম—বেশী বাড়াবাড়ি করছিস্ তুই—চুপ করে রইলো, খানিক

পরে বল্লে—দিদি, ও ত চলে যাবেই, ডাক্তারবাবু বলেছে, ওকে আর এখানে রাখা হবে না, কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকবো, একটা চিহ্ন রেখে যাবে না এইখানে·· বলে নিজেকে দেখিয়ে দেয়।

আমি হিন্দুঘরের মেয়ে, শিউরে উঠি মনে মনে—এ দুর্দ্দান্ত প্রেমকে বাধা দেবে কে—দেহের আগুন অনুকূল পবনে যে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। কিন্তু কোথায় যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, জোর করে ধমকাতে পারি না, বুঝতে পারছি ওর ছোঁয়াচ লাগছে মনে। তবু এগিয়ে গেলাম ছেলেটির কাছে। বাতপড়া গাছ হলে কি হয়, প্রাণশক্তি তখনও ম্লান নয়। বসে রয়েছে ইজিচেয়ারে, সামনে খোলা একটা খাতা, বোধ হয় কি যেন লিখছিল, বল্লে—আসুন, আসুন, আপনার কথা কতো শুনেছি নিমির কাছে—কি চমৎকার গান করেন আপনি,

বল্লাম—সে খবরও পৌঁছেচে—

জবাব দিলে—তা আর পৌঁছবে না, গান আমি ভয়ঙ্কর ভালবাসি, নিমি আপনার নাম দিয়েছে কি জানেন—তানপুরো দিদি, আমি একদিন সাহস সঞ্চয় করে বলেছিলাম—তোমার তানপুরো দিদির একটা গান শুনিয়ে দাও না, কথাটায় আমলই দিলে না, ভাবটা যেন তার একছত্র সাম্রাজ্যে অন্য কোন মনবনবিহারিণী হরিণী যেন না ঢোকে—লজ্জায় কান দুটো লাল হয়ে উঠলো, কথাটা প্রায় ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনিও ত চমৎকার লেখেন, বক্তৃতা করেন।

হেসে বল্লে—যমরাজের নিমন্ত্রণে ঐ দুটোই সম্বল—

আমি বল্লাম—নিমির হাতযশ আছে। কী সেবাটাই করছে আপনার! দশটা যমরাজ পালিয়ে যাবে—

বেশ ধরা গলায় শান্তনু বল্লে—তা আর জানি না; যদি বেঁচে উঠি, ওরই সেবার জন্য, মায়ের বাড়া। আপনারা প্রিয়াই হোন জায়াই হোন্ শেষ পর্য্যন্ত মা।

কিন্তু—

হাঁ, জানি, ডাক্তার বাবুও সেদিন আভাস দিয়ে গেলেন। যদি অন্য কোথাও যাবার অর্থ ও সামর্থ্য থাকতো, আমি এখনি চলে যেতাম। পৈতৃক ভিটেটা বাঁধা দিয়ে যে কটা টাকা পেয়েছিলাম তার বেশীর ভাগই গেছে কলকাতায় ভূয়ো চিকিৎসায়। আত্মীয়েরা দেখলেন ক্রমশঃ গলগ্রহ হয়ে পড়ছি, দয়া করে বাকী টাকাটা এখানে জমা দিয়ে রেখে গেলেন এইখানেই, যে কদিন চলে চলুক। যেদিন টাকাটা ফুরুবে তার আগেই আমার দিন তাঁদের হিসাব মত ফুরিয়ে যাবার কথা, কিন্তু নিমিই আটকেছে, তা, না হয়···

চোখে জল এসে গেলো, বল্লাম—না হয় কি?

রাজার রাজপথ ত খোলা আছে—

বাপ মা, ভাই, স্ত্রী—

কেউ নেই বোন্—

এমন মধুর করে দাদার গৌরব দিয়ে কেউ বুঝি ডাকেনি। শিউরে উঠলাম আমি। সমস্ত শিরদাঁড়া বেয়ে কিসের যেন শিহরণ বয়ে গেলো। আমাদের কর্ত্রী এ রকম মেলামেশা পছন্দ করতেন না। বিশেষ করে তাঁর ছেলে-পুলের ঘর, সত্যিই ত ছোঁয়াচে রোগ। কিন্তু পারলাম না, নিষেধ সত্ত্বেও লুকিয়ে ওদের দলে আড্ডা জমাতাম। নিমি প্রথমে যাওয়া আসাটা বেশ সুনজরে দেখতো না। তপস্বিনী উমার চোখে কখনো কখনো বন্য পার্ব্বতীর হিংস্র ছায়া ফুটে উঠতো—হঠাৎ দেখে ভয় হতো। কিন্তু ক্রমশঃ সে সহজ হয়ে এলো। একদিন শান্তনু বল্লে—ডাক্তারবাবু তাগাদা দিচ্ছেন, টাকা ফুরিয়ে এসেছে, এবার ত অন্য আশ্রয় খুঁজতে হয়, অনেক জায়গায় ফ্রি বেডের জন্য লিখেছি—

তার পর কি ভেবে বল্লে—কই, একদিনও ত গান শোনালেন না।

গাইবো না গাইবো না করে শেষ পর্য্যন্ত দুখানা গান গাইলাম—আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে—তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও। সে শুনলে চোখ বুজে, যেন সমস্তটুকু আকণ্ঠ পান করে একেবারে নিংড়ে নিলে, তার পর আচ্ছন্নের মত বল্লে—অনেক পেলাম, কিন্তু আশা যে হারিয়ে গেছে, আজ আর আশাবরী কেন, আবার অবরোহণেও কোমল রে লাগিয়েছেন, সত্যি আপনারা কি কোমল—

লজ্জায় লাল হয়ে উঠি, লক্ষ্য করে—

কথাটা ঘুরিয়ে বল্লে—দেখুন, নিমি তিনদিন উপোস করে তিব্বতী লামার কাছ থেকে এই বড় মাদুলীটা নিয়ে এসেছে। ওদের দেবতাদের যা বিকট চেহারা, যমরাজ পর্য্যন্ত ভয়ে পালিয়ে যাবেন।

স্বাস্থ্য-নিবাসের কর্তৃপক্ষরা নিমির ব্যাপার নিয়ে বেশ

একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। প্রথমে বিনা পয়সায় একটা নার্স পাওয়ায় আপত্তি তোলেননি। কিন্তু ক্রমশই বেশ বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন তাঁরা, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। শেষ পর্যন্ত নিমিকে সরিয়ে দিলেন তাঁরা নির্মমভাবে এবং রোগীকে দিলেন স্থানত্যাগের নোটিশ।

সে কদিন আমরা ছিলাম না, কালিম্পংএ গেছি বেড়াতে। ফিরতেই নিমি দৌড়ে এসে কেঁদে পড়লো। শান্তনুকে সরিয়ে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষরা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায়। নিমি ওকে নিয়ে তুলেছিল নিজেদের ঘরে। নিমির মার ঘোরতর আপত্তি। শান্তনুকে অপমান করে বার করে দিয়েছে, নিমি নিরুপায় হয়ে পাশের এক ভাঙা ঘরে ওকে রেখেছে। ভদ্রলোকের জোর জ্বর এসেছে। হাতে ছিল দুগাছা সোনার কয়ে যাওয়া চুড়ি, গলায় একটা সরু হার, একটা রিষ্টওয়াচ আর যে কটা টাকা ছিল সব এনে ওর কাছে উজোড় করে দিয়ে বল্লাম—কলকাতায় যাবার ব্যবস্থা কর, হাসপাতালে যদি ভর্তি করা যায়।

পরের দিন অতিকষ্টে টিকিট জোগাড় করে কলকাতার ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম ওকে। ট্রেনে ওঠবার সময় আমার হাত দুটো টেনে নিলে শান্তনু, হঠাৎ স্পর্শে মনে হলো কি ঠাণ্ডা হাত, জীবনের সব উত্তাপ বুকি নিতে আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো অভিমান হলো পাণিগ্রহণের সঙ্গে। কাঁপতে কাঁপতে একখানা বই তুলে নিয়ে নিজের হাতে নাম লিখে দিলে সে—পরম কল্যাণীয়া সুমনাকে, বল্লে—হয়ত যেদিন রবো না আমি, সেদিনের অলস দুপুরে বা রাতের নিভৃতে এই বইখানা আমার কথা মনে করিয়ে দেবে।

ছোট্ট ট্রেন ছেড়ে দিলে, তার সর্পিল গতির দিকে চেয়ে রইলাম অনিমেষে।

নিমি সঙ্গে গেছলো পৌঁছে দিতে, কদিন পরেই শুনি ফিরে এসেছে। এক বন্ধুর সাহায্যে শান্তনুর নাকি গতি হয়েছে মদনপল্লীতে। নিমি কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না। ঘানটান করছি, ওর মা-ই কাঁদতে কাঁদতে খবরটা দিলে—নিমি নাকি আর সে নিমি নেই, এই কদিনেই তার চোখমুখ বসে গেছে, অনেক দিন থেকেই শরীরটা খারাপ হচ্ছিল, নেশার ঘোরে কাজ করে গেছে। এখন একেবারে ভেঙে পড়েছে, শরীরে সামর্থ্য নেই, চোখেও কি হয়েছে। ঐ বাঙালী বাবুই সর্ব্বনাশের গোড়া। তা না হলে ওদের সমাজে অমন মেয়ে পড়ে থাকে।

সব খবর নিয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেলাম ডাক্তারের কাছে। নানা রকম পরীক্ষা করে রায় দিলেন তাঁরা—টিবির বিষ ওর চোখে বাসা নিয়েছে—চিরকালের জন্য অন্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তা ছাড়া ওর সাধারণ স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছে। ভাবনার কথা, ওকে বা ওর মাকে কিছু বললাম না।

ভারী চিন্তায় পড়লাম। আমার ফিরে যাবার দিনও এগিয়ে আসছে। একদিন আমার কাছে এলো সে অতি কষ্টে, শান্তনুর কোন খবর পেয়েছি কিনা জানতে। শুইয়ে দিলাম আমার বিছানায়, মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে একটু ঠাণ্ডা হলো। খানিক পরে আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে নেতিয়ে রইলো অনেকক্ষণ, তারপর অতি কষ্টে চোখ খুলে বল্লে—দিদি, জানলাটা খুলে দাও ত,ভাল দেখতে পাচ্চি না।

বুঝলাম ওর জীবনের ভর দুপুরেই সন্ধ্যা নেমে এলো। যে চিহ্ন সে বাইরে থেকে জোর করে দেহের মধ্যে ধরতে চেয়েছিলো সে চিহ্ন পায়নি বটে, আরো বড়ো পদ্মাবলীর পদচিহ্ন ওর চোখে অক্ষয় হয়ে রইলো। বাইরের কপাট বন্ধ হলো বটে কিন্তু ভিতরের কপাট যে খুলেছে। কত করে বোঝালাম—চল্ আমার সঙ্গে, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—

না, না,—

শেষ পর্যন্ত গিন্নীমার কাছ থেকে টাকা ধার করে ঐখানেই হাসপাতালে রেখে আসবার ব্যবস্থা করলাম। ডাক্তার বল্লেন—শুধু চোখ নয়, বুকেও বাসা বেঁধেছে, বেশীদিন মেয়াদ নয়—

ফিরে এসে চিঠি দিলাম দুতিনখানা, কিন্তু জবাব দেবে কে। ডাক্তারবাবু শেষ খবরটা দিলেন দয়া করে—নিয়মিত টাকা পাঠাতাম বলে। সেদিন সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য্য তখন ডুবছে—তার শেষ রক্তিম আভাটি যখন মিলিয়ে গেলো তখন নেমে গিয়ে এক গণ্ডুষ জল দিয়ে এলাম অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশ্যে।

শান্তনুর সম্পর্কে আমার মন ততদিনে শান্ত হয়ে গেছে। ইচ্ছে করেই চিঠি দিতাম না, তবে খবর রাখতাম—কয়েক বছর পরে শুনলাম সে সুস্থ হয়ে ফিরে রেল শিখতে বিলেতে গেছে। তারপর ঐ দার্জ্জিলিংএ ভুটিয়া বস্তীতে এক অন্ধ ছেলেমেয়েদের পড়াবার স্কুল খুলেছে, থাকেও তাদের সঙ্গে। দুবছর আগে দার্জ্জিলিংএ গেছলাম, জানি না শান্তনু কোথা থেকে খবর পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, সে কথা ত সবই জানো স্বাতীদি। আসবার দিন দূর থেকে তাকে প্রণাম জানিয়ে এসেছি, আশাবরীতে গান শুনিয়েছি সেই আকাশকে, নমস্কার করেছি সেই কাঞ্চন জঙ্ঘাকে যার রং বদলায় ক্ষণে ক্ষণে, নিয়ে এসেছি এক ঝলক কোড়ো কান্না সেই মহাপাষাণের থলি থেকে, আর রেখে এসেছি দুফোঁটা চোখের জল।

চুপ করে বসে রইলো স্বাতী আর সুমনা। হঠাৎ চুপি চুপি তাদের পাশে এসে বসলো যেন এক অশরীরি আত্মা, বল্লে—দিদি, এবার আমি একেবারে ভালো হয়ে গেছি, চমৎকার দেখতে পাচ্ছি।

শারদীয় দেহি

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বাঞ্ছাকল্পতরু মা আমার। সবই তো তাঁর দান—শারদ উষার কিরণছটা, পূর্ণিমার ভুবন-প্লাবিনী জ্যোৎস্না প্রাণ-মাতানো বিশ্ব-সঙ্গীত, নটরাজের বিপ্লবী নাচের ছন্দ। বরষার প্লাবনের পর শারদোৎসবে আকাশে বাতাসে আভাস পায় ধরণী মেঘ-মুক্ত নবীন প্রাণের। মহালয়ার মহানিশার পর উদয় হয় নবীন শশী, দিনে দিনে, কালের স্পন্দনের তালে তালে, বাড়ে চন্দ্র—পূর্ণ হয় কোজাগরী পূর্ণিমায়। তাই জাগে সবার প্রাণে জয়ের আশা, পরিবর্ত্তনের সূচনা, মঙ্গলের চেতনা।

এই দিনে বাড়ে ভিক্ষা। ভিক্ষাই বা বলি কেমন ক'রে? মার কাছে চাওয়া সে তো আনন্দের দাবী। সাধু চাহে মোক্ষ। ভক্ত-সংসারী চাহে সংসার যেন হয় মধুর। বলে রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে পূজা-মণ্ডপে পূজার্থী বলে—ওঁ হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাণ্ডভম্। হর রোগং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে। ওঁ আয়ুর্দ্দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভবতি দেহি মে। পুত্রান দেহি ধনং দেহি সর্ব্বান কামাংশ্চ দেহি মে।

সোভিয়েট রাশিয়া মানে না দুর্গার অস্তিত্ব—কিন্তু মানে শক্তি, নিজের শক্তি, আদর্শের শক্তি। সে বলে—বিধেহি অন্ততঃ আমেরিকার ধ্বংস। আমেরিকা সে শক্তিকে মানে তাকে ডেকে বলে—সর্ব্বনাশ কর কমিউনিষ্টের আর সে শুভকার্য্যে সাফল্যের জন্য তোমার পূজার বেদীতে মা বলি দ'ব দু'পাঁচটা নগণ্য ছোট ছোট রাষ্ট্র। আমাদের ভারতের আশে পাশে কে কি প্রার্থনা করে সে কথা বিশ্ব-জননীও জানেন, আমরাও বুঝি।

তাই এই মধুর শরতের নীল নভোতলে সদাই শুনি—দেহি দেহি। ট্রামওয়ালা বলে—যাত্রী প্রতি একটা পয়সা দাও মা তারা। লোকে বলে—এমন কাজ ক'র না মা দরিদ্রার্ত্তিনাশিনী। বেকার ছেলে বলে—মা গো পেট্রোল দাও, দিয়াশলাই দাও, ট্রামে লাগিয়ে দিই আগুন।

আভ্যন্তরীণ দেহির চাপে দরিদ্র গৃহস্থ হয় বলিদানের অর্ঘ্য। গৃহিণী চায় আত্মীয়-ধরায় বস্ত্রবৃষ্টি, উপহারের বরষা, অবশ্য নিজের চাহিদাকে রাখে সে দেহি-সমষ্টির অন্তরালে। পুত্রকন্যা সবারই মনের ভাণ্ডারে জমা থাকে জামা, কাপড়, জুতা বা কিতার ফর্দ্দ। সেগুলা শারদের শুভ্রালোকে আত্ম-প্রকাশ করে। দাস দাসী পাচক চায় উপহার তার পিছনে থাকে ইঙ্গিত—পূজার উপহার মনোমত না হ'লে মনের মত নতুন গৃহস্থের ঘরে চাকরীর অভাব নাই। তার ওপর রেলগাড়ি চায় যাত্রী—আর যাত্র বিলাসী ধনীর প্রতি কৃপা-পরবশ হয়ে ভাড়ার হার সুবিধা করে দিয়েছে যদি মানুষ যায় পাহাড়ে। কাতর প্রাণী বলে মাগো পাহাড় চাহি না—যে মা পগারেও স্থান দিস্ যে মা শান্তি—শান্তিময়ি শিবজায়া একমুঠা নির্ম্মল অন্ন আর এক গণ্ডুষ জল-না-মেশানো দুধ।

পথে যাই কর্ম্মস্থলে। দেখি দলে দলে লোক, হাতে লাল ঝাণ্ডা, বলে—পূজার সময় দাও বোনাস্, সারা বৎসর তো বোন্ চুর্ণ ক'রে নিজের তহবিল বাড়িয়েছ কর্ত্তামশায়। এবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এই চুর্ণিত হাড়ে ভেল্কী দেখাব। প্রভু বলে—মাগো অস্ত্র-শাস্ত্রে এমন বুদ্ধি দাও অক্ষমালা-বিভূষিতা মা, যাতে প্যাচ দিয়ে শ্রমিককে দেখাই অ-লাভ এবং আত্ম-করের বে-আব্রুর দেখাই অষ্টরম্ভা। একদল শ্রমিক নেতা বলে—দেহি কিঞ্চিৎ অর্থ, আমি কুলী-মজুরের মাঝে লাগিয়ে দিই ভেদাভেদ—যা ছিল বেদমন্ত্র ইংরাজ শাসনের।

শারদীয় দেহির হট্টগোলে গরীব গৃহস্থ মাকে বলে—ওদের গণ্ডগোল থেকে রক্ষা কর মা, যে চায় তার মুখ রুখে দাও যেন আমার জর্জ্জরিত দেহে লাগে পূজার বাতাস। কিন্তু হাওয়ার ধর্ম্ম শব্দ-বহা। সে বহে আনে—দেহির গান।

সে গান নিয়ে পূর্ব্বদিনে আসতো দু'মুঠো চাল কি একটা পয়সার আশায় গায়ক। প্রাণ মাতিয়ে দিত গানে—

হের গিরিরাণী তোমার নন্দিনী রাজরাণী রূপে সেজেছে—

কিম্বা—

চল চল গিরি আনিগে গৌরী—

আজ আসে একদল ছেলে—খালি পা, পরণে হাফ্ প্যাণ্ট

তার উপর ষোলো হাত-কাটা সাট। বলে—দিন মশায় সার্বজনীন পূজার চাঁদা।

—বিরিঞ্চিবাবু বলে দিয়েছেন এবার দশ টাকা দিতে হবে।

—হ্যাঁ এবার সভ্ হ'বে—কংগ্রেসের রাইগ্রাস।

গৃহস্থ বলে—দেখি। দশ টাকা কোথা পাব?

ছেলে বলে—তার জবাব দিতে আসিনি।

অন্যটি বলে—ওপাড়ার গোষ্ঠ মাষ্টার প্রকাণ্ড কাণ্ড করেছে—আমরা ··বাবুকে আনব উদ্বোধনে।

—আর···আসবেন চিপ্ গেষ্ট হ'য়ে।

গৃহস্থ বলে—ওঃ তা' আমার চিপ্ চাঁদাটা দেখি কত দিতে পারি। আর একদিন এসো।

দলের নেতা বলে—আমাদের কি আর কাজ নেই। দশটা টাকার জন্য—

দশটা টাকা? পাব কোথা?

অন্যটি বলে—মশায় এক কথা বার-বার বোলে সময় নষ্ট করেন কেন?

গৃহস্থ চোখ মেলে। আশে পাশে তাকায়। জানালার একখানা কাঁচ ভাঙ্গা। সেদিন সে পথে একটা বেড়াল এসে খোকার সেরে-তিন-পো দুধ মেশানো দুধের কতকটা পান করে গিয়েছিল। তার মস্তিষ্কে স্পন্দন এলো।

সে বলে—বাবা একটু দয়া কর। অত টাকা কোথা পাব? তবে দয়া করে আর কাঁচ ভেঙ্গোনা তোমাদের মনের মতো চাঁদা না দিলে।

দলের নেতা তিন বছর ফিফথ স্টাণ্ডার্ডে পড়ে। গত বৎসর চেষ্টা ক'রেও ক্লাশ উঠ্তে পারেনি। সে ওঠ্বার চেষ্টার প্রথাটা স্মরণ করলে। বলে—ওসব হেড্ মাষ্টারের মিথ্যে কথা। আমি তার পায়ের গোছ তাক করে ইট মেরেছি, কোনো প্রমাণ আছে?

গৃহস্থ বলে—সে কথা বুঝবে হেড্ মাষ্টার। তাঁর পায়ের গোছে লাগুক কি শিরদাঁড়ার উপর লাগুক, সে কথা বিচার করবেন তিনি। আমার গরীবের কাঁচগুলা গেলে আর হবে না। এক একটি ফাঁকে এক একটি বিড়াল ঢুকলে বাড়িটি হবে বিড়ালপটি।

উকীল প্রতীক্ষায় বসে বলে—মাগো ঘরে ঘরে ঝগড়া বাধিয়ে দে মা। এই দুর্দিনে ব্ল্যাক-মার্কেটওয়ালার ব্ল্যাক আটের মোহ-কালিমা ভেদ করি। কালাপাহাড়ী সে সময় ভালে—দেহি মা পুলিসের পায়ে ব্যথা, চোখে ধূলা, যেন আমার লাভের চিনিতে পিঁপড়ে না বসে।

কাজের ভিড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক বলে—মাগো মেশে স্বাস্থ্য দেহি। আর পারি না একটু কীর্তন শুনি। অভুক্ত চিকিৎসক যখন চায় রোগের প্রাদুর্ভাব, হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করে আগন্তুক। বলে—আমি নেবার।

চিকিৎসক বলে—যা নেবার লোকের তো অভাব নাই, দেবার লোক পাঠাও মা।

নেবার বলে—আমি প্রতিবেশি কিছু চাঁদা চাই, পল্লীর গরিবদের কাপড় দেওয়া হবে।

বৈদ্য বুঝলেন লোকটি ইংরাজী বাঙ্গালা উভয় অর্থেই—নেবার।

সাহিত্য-সেবী কামনা করে মনের ভাব লেখনীর মারফত পাঠকের মনের পটে প্রতিফলিত করতে। কিন্তু পূজার সংখ্যাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করবার জন্য সম্পাদক মহাশয় চান ছয়মাসি প্রবন্ধ।

—কি বিশ্বনাথ?—কাজের ফাঁকে জিজ্ঞাসা করেন লেখক।

বিশ্বনাথ বলেন—আজ্ঞে পূজার জন্য চাই গল্প।

—সে ব্যবস্থা ছেড়েছি। কারণ এখন পাঠক যা চায়, সে লেখা কলমের ডগায় আসে না। নাতি-নাতিনী বড় হয়েছে।

বিশ্বনাথ মাথা চুলকে বলে—তবে যা হয় দেবেন। মোট কথা এই দেহির চাপে লেখকদের এক এক সময় ইচ্ছা হয়—দুত্তোর বলতে।

বলা বাহুল্য পাওনাদারের তাগাদায় এ একটা ঘরসুম। যে হিন্দু নয় সেও বলে—আজ্ঞে পূজার দিন আমার পাওনাটা—ওর নাম কি।

কে না বলে দেহি এই মা মহামায়ার মহা-আগমনের প্রাক্কালে?

আমি এই চাওয়ার নিন্দা করি না যদি চাওয়ার অন্তরে থাকে একবিন্দু ঘায়ের উপস্থিতি-বোধ। পূজামণ্ডপ দেখি ভোটের ভোজবাজির একটা আসর। মার মূর্ত্তি কেবল মানুষ ধরবার টোপ। এ পাড়ার যে সার্ব্বজনীন পূজা তার প্রধান ব্যবস্থা এবং লক্ষ্য যদি হয় ওপাড়ার বারোয়ারী পূজার

অনুষ্ঠানকে ম্লান করা, সে অভিনয় করে যারা তাদের কি চিন্তা করা উচিত নয় দেশের কথা, দশের কথা, বিশেষ সেই অতীত দিনের ঐতিহ্যের কথা যখন ঋষিরা এই বাৎসরিক সমারোহের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে অজ্ঞতার মনের ভাব ধর্ম্ম-পথে নিয়ন্ত্রণের আয়োজন এ শারদোৎসব। যাঁরা নেতৃত্বের দাবী করেন, এ সব অনুষ্ঠান করেন, আমি তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে বলি—দেহি কল্যাণের সু-বাতাস জাতীয় এই মহোৎসবে। রাজনীতি ও পূজার বিধি মিলিয়ে জগা-খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করবেন না। বরং পূজার মন বিশুদ্ধ ক'রে, সব লোককে মায়ের আদরের সন্তান ভেবে রাজনীতি ক্ষেত্রে সেবক রূপে অবতরণ করুন।

মা জননী পরস্পর-বিরোধী ফর্দ্দ পান আর হাসেন। কারণ এ-দেহি মন্ত্রও তো তাঁর শিক্ষা। মোক্ষ-ভিক্ষা, সংসারী উচ্চাভিলাষীর প্রকাণ্ড চাওয়া আর অতি-দীনের দিন-চলার দীন ভিক্ষা সকলগুলি অবাধে পৌঁছে তাঁর শ্রীচরণে। তবু মহামায়ার বিরক্তি নাই। কেন?

বিজ্ঞ লজ্জা পায়। বলে—মা হ'লে এই বিভিন্ন দেহির দোর্দ্দণ্ড উৎপীড়নে পাগল হ'য়ে যেতাম। আবার মা হাসেন। এক একবার তাঁর ভক্তের কথা কানে প্রবেশ করে—এ জগৎ মায়ের গড়া, পোড়া মন কি তাও জাননা?

জগত সে নানা পরস্পর বিরোধী ভাবের মিলন ক্ষেত্র।

সত্যই তো দস্যু চায় গৃহস্থের গাঢ় নিদ্রা, যাতে সে অবাধে তার ভাণ্ডার লুটতে পারে, ধনীর বন্দুকধারী রক্ষীও তো তেমনি মায়ের গড়া দস্যুকে হত্যা করবার যন্ত্রী। বাঘও তাঁর সৃষ্টি আবার তাঁরই সৃষ্টি ত্রস্তা, ভীতা কুরঙ্গিণী। ঋষি বাক্য, দেবতাদের স্তব মনে পড়ে—তিনি সৃষ্টির ব্যাপারে সৃজনকারিণী, পালনে পালয়িত্রী এবং অন্তে গ্রাস করেন তিনি।

তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই অলক্ষ্মী, তিনি মহা-অস্মৃতি আবার মহামেধাও তিনি—সুখ দুঃখের বিধাত্রী তো-তিনিই। তিনি মহাবিদ্যা রূপে দিব্য-জ্ঞান দান করেন আবার মহা-মোহা।

মন ভরে ওঠে তাঁর লীলার প্রাচুর্য্যে। দুঃখ না পেলে ত সুখের খোঁজে মন মাতে না। ক্ষণিক সুখে মগ্ন হলে তো চিরানন্দময়ীর আনন্দধামের অমোঘ বাতাস লাগে না প্রাণে—হৃদয় নাচে না আনন্দ স্পন্দনের তালে তালে ছন্দে ছন্দে। যখন পারি না সহিতে ক্লেশ তখনই তো চিত্ত ধায় সেই ভূমির সন্ধানে—মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে যার সঙ্গীত ভেসে আসে।

মায়ের মুখের হাসি মনের পটে পড়ে। মন নিজেকে বলে তুমি কতটুকু জান? না চাও মা তা তো দেবেন—কিন্তু দেহীর দেহি যদি সঙ্গত ভিক্ষা না হয়—ভিক্ষালব্ধ কর্ম্ম যে সরিয়ে নিয়ে যাবে—বহুদূরে মায়ের চরণ নখর জ্যোতির আলোক হতে। তাই শিক্ষা কর কোন্ কর্ম্মে, কোন্ ভাবে এগোবে তাঁর চরণের দিকে—বর্জ্জন কর সে ভিক্ষা যার অনিবার্য্য ফল যার সেই মূর্ত্তিতে প্রকাশ যাতে তিনি অলক্ষ্মী। মহাবিদ্যার আশ্রয় চাওয়া অভ্যাস করলে, তাঁর ঘনশ্যামা মূর্ত্তি বিলীন হয় মহাবিদ্যা রূপে।

তাই সাধক গায়ক রামপ্রসাদ আনন্দে গেয়েছিলেন—

এ-দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি।
দেহের মধ্যে সুজন যে-জন তার-ঘরেতে ঘর করেছি।

এই বেছে নেওয়াই জীবনের মঙ্গলময় স্রোতের অনুসরণ। মনের মাঝে যে অসুর আছে সেই অসুরকে বধ করেন মা দুর্গা যাঁর সিংহাসনও মনের মাঝে।

তোরা দেখিস নি মোর মাকে
হৃদয় পুরের মা যে আমার জগৎ জুড়ে থাকে।
চেয়ে দেখ মার দুটী চরণ মিলনে যেথা জীবন মরণ
যেথা শবের মাঝে শিব জেগে মা'র চরণ ধূলি মাগে।

আমাদের দেহি দেহি রব উচ্চারণ করি যদি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে, তাহলে কামাদি ছয় কুম্ভীরের হাত এড়াবার প্রার্থনাই পৌঁছবে দেবীর পাদপীঠে আর এই শুভ শারদ প্রাতে।

চেতনার অভিযান

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলারাজ)

দেবাসুরে বাধিল সংগ্রাম—
সাগর মন্থন করি'
অমৃতের পাত্র যারা নিয়েছিল হরি'—
দেবতা তাদের নাম—
লক্ষ্মীলাভ তাদের ললাটে—
দানবের ভাগ্যে রহে বিষের দহন—
ঈর্ষার দারুণ বিষ !

এ তো গেল পুরাণের কথা—
দেবতা তারাই যারা অমৃত লভিয়া
অমৃতে মিশিয়া গেল !
মনের মন্দিরে
জ্বালিল প্রদীপ ভাতি প্রাণের পূজায়—।
বরিল লক্ষ্মীরে—
জ্ঞানরূপা শ্রীময়ীরে হৃদয় আসনে
পূজিল কর্ম্মের মাঝে,
অর্ঘ রচি' কামনার ফুলে,
ভকতি চন্দনে মাখি প্রাণের বিলাস !
দানবেরা শৃঙ্খলা বিহীন—
অজ্ঞানের বর্ম্মে ঢাকা—;
কোলাহল করে অন্ধ তমসার তীরে।
দেবের জীবন আর দানবের মাঝে
ব্যবধান হ'ল সুরু—
দেব রহে দেবের ভূমিতে,
দানবের কর্ম্মশালা ভরিল অবনী
অজ্ঞানতা-রিপু-তাড়নায়।

প্রাবৃটের অন্ধকারে গুম্ভিতা ধরণী,
বাতাস নিশ্চল।
মুহূর্ত্তের তরে
নাহি বুঝি প্রাণের স্পন্দন !
সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গিত ঊর্ম্মিমেলায়
নেমে আসে প্রাণহীন ঘুমের জড়িমা—
নাহি আলো—নাহি আশা—
বেদনার মেঘে ঢাকা আকাশের হিয়া
হ'ল মূর্চ্ছাহত ! দেবত্ব বিদায় নিল'—
দানবের শক্তি যেন ওঠে উদ্বেলিয়া
দুরন্ত দুর্ম্মদ সেই তিমির-সাগরে !

দেহের মন্দিরে—
নিত্য সেই দেবাসুর সংগ্রাম চলেছে
অবিশ্রান্ত নির্ম্মম আক্রোশে।
বিন্দু বিন্দু রক্তের কণিকা,—
শ্বেত আর লোহিতের ধারা
শিরায় শিরায় তোলে উত্তাল তাণ্ডব।
জড়াগত প্রাণ আর মানসের লীলা
নিত্য দোলে সংশয় সন্দেহে—
খুঁজে ফেরে সন্ধানের সীমা
মুক্তির রঙিন উষা !
জড়াগত বুদ্ধি জাগে জড়ের সীমারে লয়ে।
সীমাবদ্ধ দৃষ্টি তাই
মূর্চ্ছাপন্ন আপন বিস্মৃতি মাঝে !
অজ্ঞানতা মায়াবী বুদ্ধির মাঝে
খণ্ডিত চৈতন্য তাই
রচিয়াছে অসীমের ছবি
অসীমের পরিচয় গানে।
চেতনার স্তরে স্তরে
আবরণ সৃষ্টি করি'
রূপান্তর করেছে সম্ভব।

এই সুপ্ত প্রচ্ছন্ন চেতনা
আছে প্রতীক্ষিয়া
রহস্যের মায়াজাল উদ্ভিন্ন করিয়া
অজানার অভিযান করিবে সূচনা।
মানব সত্তায় জাগে
চেতনার লীলাময় অতীন্দ্রিয় গতি
অনন্তের পূর্ণ রসাগারে।
নিরন্তর জাগে সমারোহে
সূক্ষ্মরূপে পার্থিব সত্তায়
অখণ্ডের অক্ষয় বিকাশ।
পার্থিব এ রজঃ মাঝে সৃষ্টি হয় প্রাণ,
জাগে সেথা মানসের খেলা ;
ঊর্দ্ধপানে উঠিবারে চায়
রূপাতীত অলোকের দেশে।
চৈতন্যের খণ্ডিত স্বরূপ
ছুটে যায় আলোর সাগরে,
অনন্ত প্রবাহে—
আপন সত্তায় জাগে চেতনার দীপ্ত অভিযান।

বাংলা সাহিত্যে প্যারডি ও সতীশচন্দ্র ঘটক

শ্রীজয়দেব রায় এম-এ, বি-কম্

বাংলাদেশে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের যেমন আদর নাই, বিশুদ্ধ হাস্যরসেরও তেমনি সমাদর কোন দিনই হয় নাই। বাঙ্গালী কাঁদিতে ভালোবাসে, সাহিত্যেই হোক্ আর সঙ্গীতের আসরেই হোক্—অশ্রুবিগলিত করুণাই তাহার প্রিয়তর। কথকতায়, কীর্ত্তনে, দেহতত্ত্বের গানে বৈরাগ্যের বাণীই বাঙ্গালী কবিরা শুনাইয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে বাঙ্গালী জীবনের দুঃখের ইতিহাসই উপজীব্য। বারো মাসই ত দুঃখভোগ করিতে হয়, তাই বারো মাসির দুঃখ 'বারো মাস্যার রূপ ধরিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর মূল সুরও করুণাবিগলিত। বাঙ্গলা দেশের জল বায়ু, তাহার মাটি আকাশ, তাহার সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীই অধিবাসীদের সংসার বিমুখ ও দুঃখবিলাসী করিয়া রাখিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই বিশ্ববিধুর আর্ত্তিকেই সরল করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া কবিরা পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন। করুণ রস ছাড়া অন্য রসকে যতদূর সম্ভব বর্জন করা হইয়াছিল।

অবশ্য সাহিত্যে হাস্যরস যে একবারেই ছিল না তাহা নয়। হাস্যরস সর্বত্রই অবীনস্থার নামান্তর হইয়াই উঠিত। আধিরসবর্জিত সুরুচি-সঙ্গত হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে নাই বলিলেই হয়। যাত্রার সং, কবির গানের খেউড় প্রভৃতিতে যে ভাবে হাস্যরস পরিবেশিত হইত—তাহা ভদ্রসমাজে রীতিমতো অ-চল।

সাহিত্যে হাস্যরসের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র প্রতিষ্ঠালাভ করেন। ভারতচন্দ্রকে রঙ্গব্যঙ্গের কবি বলা হয়। বস্তুতঃ সে সময়ে নবীনার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজসভা হাস্যপরিহাসে মশ্‌গুল থাকিত। সুবিখ্যাত গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন তাঁহার সভাসদ্‌বিশেষ। ভারতচন্দ্রের উচ্চশ্রেণীর ভাষা, ছন্দোবৈচিত্র্য ও আলঙ্কারিক সমাবেশ দেখিয়াও বিদূষকরূপটিই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের সময়ে বিদ্যাসুন্দরের লীলা-বর্ণিত অংশগুলির রস বাঙ্গালী পাঠক সাগ্রহে উপভোগ করিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুস্থানীয় এবং ভারতচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয়। তাঁহারই কাছে পরবর্তী সাহিত্যিকদের হাতেখড়ি হইয়াছে। তিনিও ছিলেন প্রধানতঃ রঙ্গপ্রিয় কবি। বিদ্রূপাত্মক হাস্যরস অর্থাৎ অসঙ্গতির মধ্যে কৌতুকের সন্ধান তিনিই প্রথম দেন; অবশ্য তিনিও সর্বত্র তাহার গণ্ডী রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত-কবির শিষ্য। গুপ্ত-কবি ইংরাজী জানিতেন না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় কৃতবিদ্য বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসের রুচিকে মার্জিত করিয়া তুলিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—

"নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্য রসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিয়াসনে বসিয়া প্রায়ই অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন করিত। আদি রসেরই সহিত যেন তাহার কোথে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর বিষের কুটুম্বিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্বপ্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিজ্রূপ প্রকাশ পাইত।"

ইংরাজী সাহিত্য হইতে প্যারডিকে প্রথম তিনিই বাংলা সাহিত্যে আনিলেন। প্যারডির ব্যাখ্যায় একজন ইংরাজ কোষকারের উক্তি এই—

"A literary composition in which the form and expression of serious writings are closely imitated and adapted to a ridiculous subject or a humorous method of treatment."

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল Parodyর নামকরণ করিয়াছিলেন 'নালিকা'। তিনি 'আনন্দ বিদায়ে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজী ভাষাতে বলে 'প্যারডি'—জানেন ত পাঠক ও পাঠিকা।
প্যারডিতে গ্রহসনে পিরিয়ে গুলে নিয়ে অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে (পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ক'াটিকা।

যাই যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চ'াটিকা।
কে রসিক বেরসিক জানিনা, কিম্বা বিদ্বান মানিনা,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশী অধিকার
—বেশী তাঁর পাইবার দিয়ে দিয় খাটিকা।

প্রসিদ্ধ প্যারডিকার সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয়ও তাঁহার প্যারডি রচনার ভূমিকায় এ বিষয়ে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—"প্রসিদ্ধ ভাল কবিতার ব্যঙ্গ অনুকরণই নালিকা। এটা ইংরাজী 'প্যারডি' কথার প্রতিশব্দ। শরীরটাকে যতদূর সম্ভব বজায় রেখে আত্মাটিকে বদলে দেওয়াই নালিকা-লেখকের কাজ। গুরুগাম্ভীর্য্যের ভিতর দিয়ে যখন লঘুতার অন্তঃসলিল স্রোত বইতে থাকে, তখন আপনা হইতেই হাস্যের তরঙ্গ নেচে ওঠে।"

সাধারণের ধারণা ছিল প্যারডি করিলে আসল কবির রচনাকে বুঝি অপমান করা হয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়—প্যারডি কবিতায় এক ধরণের appreciation; অবশ্য ব্যঙ্গ করার ইচ্ছা যে কোথাও থাকেনা তাহা নয়।

রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীতগুলির মূলভাবকে রূপান্তরিত করিয়া-

ছিলেন 'মাস্টার গোঁসাই'। তিনি এ ধরণের গানের নামকরণ করেন—'পালটা গান'। এগুলি ঠিক প্যারডি নয়। ইহা কবিগানের 'উত্তোরের' রামপ্রসাদের 'মনের আমার এই মিনতি' গানের তিনি উত্তর দিলেন—

হৈও না মন পড়া পাখী।	ওরে বশী হলে হয় না সুখী।
পাখী হলে তত্ত্ব ভুলে,	দিন যাবে পিঞ্জরে থাকি।
ভুলি মুখ বলবে পরের বুলি,	পরম তত্ত্ব জানিবে কি।
ভক্তি গাছে মুক্তি ফলে,	সে ফল উড়ে খাও সে দেখি,
পেলে, মায়ার ফাঁদে পড়বে না আর	শমন ব্যাধে দিবে ফাঁকি।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গানের নায়ক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় 'মেঘনাদ বধে'র প্যারডি করেন 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' নামে। ইহাই বোধ হয় আমাদের প্রথম প্যারডি। ইহাতে মূল কবিতার প্রতি কিছু কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপ সবই ছিল—মধুসূদনের বিচিত্র শব্দ-সম্ভার এবং ভাবরীতির অনুকরণও করা হইয়াছিল ব্যঙ্গ করিবার জন্যই। যেমন—

ভরিণবাসন সাধু অনুগ্রহণিত
প্রলন ছুছুন্দ মোরে—নাও চিত্রিধারে
কিণিব কৌশল বলে.....

ঃ ঃ ঃ ঃ

অর্দ্ধআকাশের তলে বিস্তৃত গগনে—
। অসংখ্য-অঙ্কে যথা কনক লাঞ্ছিত,
ছু-আকুল ইন্দ্রের গনে সঘনে।)
চতুর্দ্দার ছুছুন্দরী নর্ত্তরিণা পাতা,.....ইত্যাদি

ইহাতে ভদ্র মহাশয় অভদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যখন চণ্ডীস্তবের প্যারডি লিখিলেন তখন তাঁহাকে সে অপরাধে দোষী করিলে ত চলিবে না। তাঁহার মত চণ্ডীর ভক্ত কেহই ত নহেন! বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রচেষ্টা কেবলমাত্র রসসৃষ্টির জন্য, তাঁহার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—

যা দেবী বরষারেণু রূপেণ সংস্থিতা।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। প্রভৃতি (বিবৃক্ষ)

ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি ছিলেন Wordsworth. কারণ তাঁহার কবিতার যত প্যারডি হইয়াছে আর কাহারও ভাগ্যে তত জোটে নাই। J. K. Stephen কবির প্যারডি রচনা করিতে গিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সামান্য দোষ ত্রুটী, মুদ্রাদোষগুলিকে বিদ্রূপ করিয়াছেন।

প্যারডির মূল কবিতা সর্ব্বজনপ্রিয় এবং সুপরিচিত না হইলে তাহার বোধ সহজ হয় না। যে কবিতা যা আধা লোকের মুখস্থ রহিয়াছে অথবা প্যারডি পাশাপাশি যাহার মূলের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে তাহারই প্যারডি সম্ভব। তাহা না হইলে রসগ্রহণ ঠিক মতো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

প্যারডি রচনায় মৌলিকতা বিশেষ কিছু লাগে না; মূল কবিতার ভাষা, ছন্দ প্রভৃতি তো বলায় থাকেই—কেবল শব্দগুলির অল্প অল্প পরিবর্ত্তন করিলে কিরূপ রসান্তরের সৃষ্টি হয় তাহারই কৃতিত্ব প্রদর্শন। ইহা একটি খাঁটি আর্ট; হাস্যরসের পোষ্টেতেই ইহার স্থান।

বঙ্কিমের পর প্যারডি রচনা করিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কবি অবশ্য খুব বেশি প্যারডি লেখেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দচন্দ্রের বর্ষেশী গানের প্যারডি করিলেন—

কতকাল পরে বল ভারত রে, শুধু ভাল ভাত জল পথ্য ক'রে।
লেপে অন্ন জলের দুল খোঁয়া অম্বলে—ঘর হাইব্রিড-পোড়া আর মুর্গি-মটন।
খাও ঠাকুর, চৈতন-চুটকি বিক্রি—এল গাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী বহু কবির হাতে এ দুর্ভোগ (?) ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম প্যারডিকার হইলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ; কবির 'কড়ি ও কোমল'কে ব্যঙ্গ করিয়া তিনি রচনা করিলেন 'মিঠে ও কড়া'। এইগুলি রঙ্গরসের কবিতা নয়, ব্যঙ্গরসের ছড়া মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গানের প্যারডি করিয়াছিলেন। জীবিতকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার কড়ায় সমালোচনা করিতেন বলিয়া অনেকে তাঁহার এ সব গানে দ্বিজেন্দ্রের গন্ধ পান।

আধুনিক কালে সতীশচন্দ্র ঘটক মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বতন কবিদের যে ভাবে প্যারডি রচনা করিয়াছেন সেগুলিতে ব্যঙ্গের নামগন্ধ নাই: ইহা পুরাদস্তুর রঙ্গরচনা।

সতীশ বাবু সুপণ্ডিত, সুকবি এবং রসবেত্তা ছিলেন। 'লালিকা গুচ্ছ' এবং 'রঙ্গ' ও ব্যঙ্গ' ছাড়া তাঁহার অন্য কোনো বইয়ের নাম নাই। তিনি প্রথমশ্রেণীর লেখক ছিলেন, কিন্তু রচনার সংখ্যাল্পতার জন্য হয়ত সুপ্রসিদ্ধ হইতে পারেন নাই। প্যারডি ছাড়া তাঁহার অন্যান্য রচনায়ও হাস্যরস ফাটিয়া পড়িয়াছে।

হাসি সম্বন্ধে কবিগুরুর নিজের উক্তি "অতএব স্থির হইল যে, মানুষের পক্ষে দিবারাত্র হাস্য করা কর্ত্তব্য—তখন যে জাতি হাসিতে জানে না, তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যেহেতু আর যাহাই অনসমাজকে শিক্ষা দিবার আমার কোনও উপায় নাই। সে কারণ বঙ্গভাষায় হাস্যরস রচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে।"

সতীশচন্দ্রের মৌলিক হাস্যরসাত্মক কবিতাগুলিও সুপাঠ্য; ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চটিজুতো চুরি লইয়া রচিত শোকগাথার অশ্রুধারা হাস্যোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছে।

হে আমার চটি!
কিনিয়া ছিলাম তোমারে যে আমি বাঁধা দিয়ে ঘটি।
মনে নাই কি হে ভালতলা গিয়া কিনিনু তোমারে একটাকা দিয়া।
এবে তুমি কোথা যাইলে চলিয়া মোর পরে চ'টি?
কোন্ অপরাধে হইলে নিদয় হে আমার চটি!

কেন সদয়ার বিরহে কবি যে ভাবে কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন—এবং শেষে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একরূপ অপূর্ব্ব—

সৌন্দর্য্যের
সার্থক প্রতিনিধি...

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের
সার্থক প্রতিনিধি তার শিল্প-সৃষ্টি।
শিল্পের ভাষা সর্বজনীন, সহজ ও সুন্দর।
তার আবেদন তাই স্থান ও কালের সীমা
অতিক্রম করে নিখিল-মানবের মর্ম্মলোকে।
তেমনি রূপ-সৃষ্টিতে শতাব্দীর গৌরব-দৃপ্ত

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

আজো সৌন্দর্য্যের
সার্থক প্রতিনিধি।

এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
'লক্ষ্মীবিলাস হাউস' :: কলিকাতা-৯

অপরাহ্ণ বেলাতে আমি করিলাম ঠিক
লজ্জাবনা বুকে আর ভেবে চারিদিক :
নূতন প্রকারে চুল রাখাই বিহিত
পিছন দিকে বড় আর সামনে বিপরীত।

এ সব কবিতা অপেক্ষা তাঁহার প্যারডিগুলিই অধিকতর উপভোগ্য। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 'মেঘনাদবধ' কাব্য সতীশচন্দ্রের পাঁচ সর্গের 'মশকবধ কাব্যে' অপূর্ব রূপ লাভ করিয়াছে—

কহে যথা নক্তমুখে তারাদল সাথে
পশাঙ্ক, নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া একেলা
বেষ্টিত মশককুলে আমিও তেমতি
হে দেবি ভারতি! তব উপাসনা ব্রত
নির্ব্বাহ নিশ্চল :.....

এই ভাবে কাব্যের হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুলের বহু প্রসিদ্ধ গানের সর্বাঙ্গসুন্দর প্যারডি তিনি রচনা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাস ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং প্রমথ রায় চৌধুরী ও কুমুদ মল্লিকের কয়েকটি কবিতা অবলম্বনেও তিনি রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিনয়ী কবি উৎসর্গপত্রে তাঁহাদের কাছে প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন—"আপনাদের কবিতার ছবি লালিকার খেলা ঘাঁকা আয়নায় ফেলে আপনাদেরই হাতে দিচ্ছি, কেমন দেখাচ্ছে বলুন তো? খুসি না হোন—চটবেন না।"

রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী', 'হৃদয় যমুনা', 'দুই পাখী'—'সোনার ঘড়ি', 'যাবনা বমুনা' এবং 'দুই লাট' প্যারডিতে কি অপূর্ব রঙ্গরস লাভ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এই—

গগনে উঠিল উষা হল ফরসা,
ঘরে একা বসে আমি নাহি ভরসা ;
রাশি রাশি তারা তারা বই পড়া হল সারা
ঠীক নাই পড়ি যারা আঁখি সরসা :
পড়িতে পড়িতে বই হল ফরসা। (সোনার ঘড়ি)

ঘটি ধরিয়া লইবে যখন এস গুগো এস মোর পুকুর ঘাটে ;
খলবল খলখল নাড়িছে মাছেরা জল
কাত্‌লাটি যাবে তল ফেলিলে চারে। (যমুনা বমুনা)

মাচার লাউ ছিল ঝাঁপের মাচাটিতে
কমের লাউ ছিল কমে,
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল রাঁধুনীর মনে।
কমের লাউ বলে মাচার লাউ ভাই
মাচাতে কি করেই ছিলে,
মাচার লাউ বলে কমের লাউ, হায়
কমেতে কেন গড়াইলে! (দুই লাউ)

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গানগুলির সুর, ছন্দ, রীতি সমস্ত ভঙ্গ বজায় রাখিয়া যতটুকু মহাশয় যে প্যারডিগুলি রচনা করিয়াছেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে গাওয়া যাইতে পারে। সুরের পর প্যারডিটি শুনিলে অপূর্ব রসের পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে। কথায় সামান্য রূপান্তর করিয়া গানের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিপরীত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন—ঢাকার বেচারারা কষ্টে সৃষ্টে পাশ করিয়া বেশী না পাইয়া হা-হুতাশ করিতেছে রবীন্দ্রনাথের 'বল যাও মোরে বল যাও'-এর সুরে—

বল (call) যাও মোরে বল যাও, হাতে যাও মোর চাকরি,
কবিগণ লও লুটায়ে, তোমারে করি এ মিনতি।

পরীক্ষকরা ফেলকরা ছাত্রদের প্রেম্ দিয়া পরীক্ষা সমুদ্র পার হইতে আহ্বান জানাইতেছেন—'ওগো কে যাবি পারে'র সুরে—

ওগো, তোরা কে যাবি পারে?
আমি 'প্রেম' দিয়ে বসে আছি দু'টি পেপারে।
ওপারেতে যাবনকে ডুবে পড় এ সুলগনে
এ পারেতে নয় শুধু খড় চিবা রে।

উকীল 'সোনার বাংলা' গানের সুরে 'সোনার মামলা'ই চাহিয়াছে—

আমার সোনার মামলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশে তোমার বাতাস
আমার গায়ে লাগায় ফাঁসি।
ওমা আখিনে তোর দুটির দিনে ত্রাসে পাগল করে (মরি হায়)
ওমা বৈশাখে তোর পড়া ফেলে ফেলে 'কমিশনার' আসি।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে কবি নিজেই স্বয়ং ওকালতী করিতেন। ওকালতী শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-প্রেম-মূলক গানগুলিকে সতীশচন্দ্র কৌতুক-রসে সরকলেবর দান করিয়াছেন—

বঙ্গ মাঝে কলে গাঁথা আমাদের এই কলিকাতা,
তার মাঝে এক আপিস আছে সব আপিসের সেরা ;—
ও সে ইটপাথরে তৈরী আপিস, রেলিং দিয়ে ঘেরা।
এমন আপিস কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল তেলের বাসি সে যে আমার কর্মভূমি।

তাঁহার ভক্তিরসাত্মক 'সঙ্গীতোত্র' সতীশচন্দ্রের হাতে 'টঙ্গীতোত্রে' পরিণত হইয়াছে—

পতিতোদ্ধারিণি টঙ্গে!
পাপ-নিয়ত-জন-ভয়-বিদারিণি, ভুবন কলঙ্ক-পঙ্কে!
কত পদ পরশী সিক্ত হইল তব চুক্তি-করণ-গুণ পাই ;
কত বড় বাড়ী পক্ক হইল যা তব বলিলে অবগাহি।

অতুলপ্রসাদের ওস্তাদী গানের সুর 'বাদল রুমু রুমু বোলে' শুনিয়া তাঁহার পশ্চিমাঞ্চলের মাদলের আওয়াজ মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি লিখিলেন—

মাদল গচা গচা বোলে না জানি কি ছলে,
বুঝিতে পারি না, ব্যথা প্রবল দুপলে।
সারাটা দুপুর ধরি শুনাইয়ে গান তোরি
বিজলী-সমান তালে নাচে
পাখা কুকুরগুলি পুচ্ছ তুলি গাছে
হানিব পরাণপাখি কার বিকট পলে?

তাঁহার হাতে 'কাঙ্গাল বলিয়া করিও না হেলা'র সুর পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে পূর্ববঙ্গবাসীদের করুণ মিনতিতে পরিণত হইয়াছে—

বাঙ্গাল বলিয়া করিওনা হেলা, (আমি) আমার ব্যাপারী নহি গো ;
শুধু মনের আতকে মিষ্ট করিয়া 'পরের বাত'টি কহি গো।

রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে'র সুরে কবি গাহিয়াছেন ম্যালেরিয়া-প্রশস্তি—

"তুমি নির্মূল কর মঙ্গল করে শোণিত চর শুষিয়ে :
তব কল্প ভীষণ ছিন্ন যায় ঘোর ঘোষ নিশ্বাসে লুকায়ে।

নজরুল ইস্‌লামের গজল সুরের 'কে বিদেশী মন উদাসী' কবির লেখনীতে অপূর্ব রূপ ধরিল—

কে সুকেশী নলদাসী ক'নের ক'সি লাগাও মনে?
ঘুঙুরো তাগে শঙ্খ জাগে, কুসুম রাগের ঘুম বনে।
ঝিমিয়ে আছে হোমরা কাকা, খুড়ীর চোখে আবেশ মাখা
কাতর সুরে ঢাক না বাকা মোর কঙ্কনের ঝঙ্কারেনে।

সতীশচন্দ্রের এই প্যারডিগুলি আমর পায় নাই। আজ সেগুলিকে বাঙ্গালী একরকম বিস্মৃতই হইয়াছে। ইহাতে বাঙালীর হাস্যবিমুখ চরিত্রেরই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এ ধরণের আর্টের আদর করি না, ইহা যে কত বড় আর্ট তাহা বুঝিনা, তাহার জন্য আক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নাই।

সতীশচন্দ্রের প্যারডি সম্বন্ধে তাঁহার পরম বন্ধু কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি—

"প্যারডির হাস্যরস wit শ্রেণীর বোধাবলম্বনাত্মক হাস্যরস। সেজন্য এই রসের সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক এবং রসস্রষ্টা হইতে হয়—বিবিধ শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—অজস্র উপকরণের জন্য বহু রঙ্গরসের রচনার পাঠক হইতে হয়, সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর versifierও হইতে হয়। সতীশচন্দ্রে এই সমস্তেরই শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল……"।

শারদ প্রতিমা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দেখেছি দেখেছি শারদ রাতের রহস্যময় রূপ,
মাধুর্য্যে অপরূপ।
অনন্তে জাগে আলোক-বরণী,
নিম্নে শ্যামলা শ্রান্ত ধরণী
দিগন্ত-পানে চেয়ে আছে শুধু
বিস্ময়ভরে চুপ।
দেখেছ? দেখেছি শারদ রাতের সেই রহস্য-রূপ।

নাই কলরব, নভোনীলিমায় কোন্ সঙ্গীত বাজে?
সুদূরের চাঁদ নিকটে এসেছে ভুবন-ভুলানো সাজে।
অজস্র সেই জ্যোৎস্না-ধারায়
বিশ্ব-মানব চিত্ত হারায়,
বিলুপ্ত সব ভাবনা-অভাব
আলোর প্লাবন-মাঝে,
শুদ্ধ অবাক জগৎ জুড়িয়া সুর-সঙ্গীত বাজে।

সেই সীমাহীন চন্দ্রালোকের সাগরে করিয়া স্নান
পবিত্র হ'ল প্রাণ।
দিবসে কেবল বাধার যোজনা,
রাত্রি করে না গণ্ডী-রচনা,
সারা দিন ধরি' যারে খুঁজি তার
পাই বুঝি সন্ধান।
অসীম চন্দ্রালোকের সাগরে আনন্দে করি স্নান।

দিগ্‌দিগন্তে জ্যোৎস্না-জড়িত নীলিমা সুবিস্তার,
পূর্ণিমা রাতে জানা-অজানার সীমানা হয়েছি পার।
দূরে স'রে যায় সব আবরণ,
কে করে আরতি, কে করে বরণ?
সমুখে তোমার—প্রতিমা ; শোননি
মন্ত্র বন্দনার?
পূর্ণিমা রাতি—জ্যোৎস্না-জড়িত নীলিমা সুবিস্তার।

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শশধর বসিবার জন্য একটা স্থান পরিষ্কার করিয়া দিলেন। গোপাল বলিলেন—হরি আজ বাড়ী থেকে চলে গেল। বাড়ী একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে, তাই একটু বেরিয়ে পড়লাম—

শশধর কালিকে তামাক সাজিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিল—ও এই। কিন্তু ঠাকুরমশায়, হরি চাকুরী করে সে ত যাবেই, আবার আসবে—তাতে দুঃখ করবেন না—

গোপাল হাসিয়া কহিলেন—দুঃখটা সমস্ত যুক্তিতর্কের বাইরে শশধর। কান্না পায় বলেই মানুষ কাঁদে, কেঁদে কিছু হবে বলে কাঁদে না।

চাঁদমোহন এতক্ষণ মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। তিনি কহিল—দুই শত, পঁচাত্তর সাত আনা—

চাঁদমোহন স্থির হাস্যে মুখ তুলিয়া কহিলেন—বেশ বেশ—নাও—চাঁদমোহন টাকার থলেটা হাতে করিয়া প্রশ্ন মুখে একবার চাহিলেন। শশধরের উদ্দেশ্যে কহিলেন—কি দাদা, টাকা আদায় হয় না? দেখলে ত, ক'রতে পারলেই টাকা আদায় হয়—

শশধর কহিলেন—তা জানি চাঁদু, কিন্তু প্রজাদের উপর এতে পীড়ন হ'ল খুবই—লাভ কিছুই হ'ল না। এ টাকা ত চৈত্র মাসে এমনিই পেতে পারতে—

চাঁদু কহিলেন—বাড়ীটা যে আরম্ভ ক'রে দিয়েছি, তখন কি আসা চলে?

গোপাল কহিলেন—বাড়ীটা বৈশাখে ক'রলে কি অসুবিধে হত?

—সে কথা আপনাকে কি ক'রে বোঝাবো? কলকাতা যদি থাকতেন, জগতটা দেখতেন তবে বুঝতেন। চাঁদমোহন গোপালের কথা শুনিলেই যেন অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন, তাহাদের জমিদারীর কথায় এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণটি মুরুব্বিআনা করিয়া উপদেশ দেয় এটা তাহার অসহ্য।

গোপাল কহিলেন—বুঝিয়ে বললেও কি বুঝতে পারবো না—

—হয়ত পারবেন, কিন্তু তার প্রয়োজন কি আপনার? আমাদের সংসারের ভিতরের কথায় আপনার প্রয়োজন না থাকাই বাঞ্ছনীয়—

—কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় হ'য়ে ছিল, আজ হঠাৎ নেই একথাটা ত জানি না চাঁদমোহন। আমরা তোমাদের পুরোহিত, শুভাকাঙ্ক্ষী বলেই কথা বলি—প্রজাগুলি পীড়নে শোষণে অবাধ্য ও অসৎ হয়ে উঠবে এটা কি ক'রে দেখবো—

—অসৎ তারা চিরদিনই, আর অবাধ্য যদি হয় তার অষুধ আমি জানি—

গোপাল ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; তিনি কহিলেন—ভগবতী চাটুয্যের প্রতিমা টাং টাং করে বিসর্জ্জন কোনদিন হয়নি। স্বেচ্ছায় হাজার লোক হ'য়েছে, আর আজ পয়সা দিয়ে লোক আনতে হয়—

চাঁদমোহন হাসিয়া কহিলেন—ওদের খাওয়াতে খরচ হত তিনশ' টাকা, আর লোক আনতে খরচ হ'য়েছে তিন টাকা। লাভ দুই শত সাতানব্বই টাকা—বুঝেছেন—

—তাহ'লে ত পূজা উঠিয়ে দিলেই সবচেয়ে ভাল হয়—

—আমার আপত্তি নেই, যদি দাদা আপত্তি না করে। চাঁদমোহন ভরোল্লাসে হাসিয়া উঠিলেন এবং একটা বিজ্ঞজনোচিত হাসিতে সকলকে পরাভূত করিয়া দিয়া, টাকার থলি হস্তে প্রস্থান করিলেন।

গোপাল চুপ করিয়া হুকা টানিতেছিলেন—মুখখানা তাহার বিরক্তি ও অপ্রসন্নতায় মলিন। শশধর কহিলেন—আমাদের চিন্তাধারার সঙ্গে ওদের চিন্তা একেবারেই যেন মেলে না। ওদের নতুন বিদ্যা যে কি তা বুঝতে পারি না—

গোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—যে শিক্ষা মানুষকে এমন স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, তার প্রশংসা করতে পারি না শশধর, ছেলেদের এ শিক্ষার আর প্রয়োজন নেই। অন্যের কথা যদি ভাবতে না শেখায় তবে সে শিক্ষা নয় শশধর, সে পাশবিক প্রবৃত্তির সেবা—

শশধর কহিলেন—কিন্তু এত শক্তি কেমন ক'রে হল তাহ'লে—

—পশুর শক্তি ত বৃহৎ। অসুরই শক্তির দ্বারা স্বর্গজয় করেছে, আর দেবতারা পালিয়েছে ভয়ে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা হ'য়েছে পরাজিত, মা চণ্ডী, ভগবান স্বয়ং তাদের সংহার করেছেন—আত্মঘাতী হ'য়ে মরেছে অসুর—

শশধর কি যেন ভাবিয়া কহিলেন—সবই ভগবানের ইচ্ছা! কিন্তু আশ্চর্য্য হই ভেবে চারিদিকে হাহাকারই বেড়ে যাচ্ছে—

গোপাল কহিলেন—প্রয়োজন বেড়েছে তাই হাহাকার, —কত নতুন জিনিষ আজ উঠছে, উঠেছে, সবই ত চাই—

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর গোপাল বাড়ীর দিকে ফিরিলেন, কিন্তু হরির বিদায়, চাঁদুর উপেক্ষা, সব একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। মনটার মাঝে একটা অস্বস্তি ও অজ্ঞাত বেদনা যেন বিষের মত ধীরে ধীরে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। গোপাল যখন বাড়ীতে আসিয়া পৌছলেন তখন বেদনা ও অস্বস্তির দহনে অন্তর উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আনমনে তামাক সাজিতে সাজিতে ভাবিতেছিলেন—এই ছড়শিক্ষার কি প্রয়োজন ছিল—যে শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যা দিল কিন্তু জ্ঞান দিল না। কেবল আত্ম-সুখ-স্বার্থকে চিনাইল—কিন্তু মানুষকে, সমাজকে ভালবাসিতে শিখাইল না, কেবল নিতে শিখিল, কিন্তু দিতে শিখিল না; ভোগ করিতে শিখাইল, ত্যাগ করিতে শিখাইল না।

আপনার ভাইকে বঞ্চিত করিতে শিখাইল, ভালবাসিয়া আপনার করিতে শিখাইল না···

গোপাল আবার ভাবিতে লাগিলেন—এমন শিক্ষা ত ছিল না, পূর্ব্বে হরির বাবা যাহা শিখাইয়াছেন তাহা ত অন্যরূপ। ভগবতী যে কাজ করিয়াছেন, যেভাবে জমিদারী পরিচালনা করিয়াছেন তাহা ত এমনি নয়—তবে এখন একটা উলট পালট হইল কি করিয়া?

পিতার বিষণ্ণ মুখশ্রী দেখিয়া গোপালের পুত্রদ্বয় নীরবে পাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়াছিল—পিতার হুঁকার শব্দ কিছুটা মন্দীভূত হইলে তাহারা ক্ষীণকণ্ঠে পড়িতেছিল—বি, এল, এ, রে, সি, এল, এ ক্লে—

গোপাল অকস্মাৎ হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—তোদের ওসব ছাই-পাঁশ পড়তে হবে না, আর ইস্কুলেও যেতে হবে না। কাল থেকে আমার কাছে সংস্কৃত পড়বি—মুগ্ধবোধ।

ওই ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উহারা ত পরস্পর হানাহানি করিবে, ভাইকে মারিয়া না করিয়া তাহার অংশ উদরসাৎ করিবে। অর্থকরী না হয় নাই হইল, তবুও দারিদ্র্যের মাঝে প্রীতি ও স্নেহ লইয়া বসবাস করিতে পারিবে ত! গোপাল এমনি ভাবিতে ভাবিতে কহিলেন—যা খেলা কর গিয়ে, ওসব আর পড়তে হবে না—

পুত্রদ্বয় পড়িতে হইবে না ও ইস্কুলে যাইতে হইবে না জানিয়া হৃষ্টমনে পাঠ্যপুস্তকের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া গেল। গোপাল বসিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে কেবল উত্তেজিত মনে ভাবিয়াই যাইতে লাগিলেন—তাহার মনে হইতেছিল—মানুষ যেন মানবাচার ত্যাগ করিয়া পশ্বাচার গ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরের দেহ কামড়াইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে—ইহাই ত ঘোর কলি—এখানে কেহ কাহাকেও স্নেহ করিয়া সান্ত্বনা দিবে না।

চাঁদমোহন খাজনাপত্র আদায় করিয়া কলিকাতায় বাড়ী নির্ম্মাণ জন্য কয়েক হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামের সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছে। যাহা হউক কিছুদিনের জন্য আর কেহ পীড়ন করিবে না।

চাঁদমোহনের গো-শকট যখন চণ্ডীতলা দিয়া গ্রামের বাহিরে যাইতেছিল সেই সময়ে নিতাই ও বলাই গরুগুলি চরিতে দিয়া চণ্ডীতলায়ই বসিয়াছিল। গাড়ীখানি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, সঙ্গে যাইতেছে পেয়াদা কালী বাগদী, ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। নিতাই অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অপসৃয়মান গাড়ীখানি দেখিল—

শালবনের পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে সেটা অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ছোটবাবু যে বড়কর্ত্তার বেটা, এটা মনে নিতে লারছি—

বলাই কহিল—কেনে রে?

—বড়কর্ত্তা থাকতে ভয় ডর ছিল নাই। জানছি বড়কর্ত্তা রইছেন, না খেয়ে গাঁয়ের লোক মরবেক নাই। আর বুকের পাটা এত বড় রইছেন—আর ছোটবাবুকে দেখলেই ত ডর লাগে—

—ডর কেনে লাগবেক—মানুষ ত বটেন—

—মানুষ নাই রে, মানুষ নাই—ও মোদের থাবেক।

বলাই সান্ত্বনা দিয়া কহিল—বড়বাবু ত রইছেন—

নিতাই মনে কোন সান্ত্বনাই পাইল না। তাহার মনে যেন কেমন একটা শঙ্কা হইয়াছিল, ছোটবাবুই তাহাকে গৃহহীন করিবে। চিরপরিচিত এই গ্রাম, এই গৃহ, পিতৃপুরুষের এই ভিটা ত্যাগ করিয়া তাহাকে চলিয়া যাইতেই হইবে। অনাগত একটা দুর্দ্দিনের কল্পিত বেদনায় নিতাই ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে চণ্ডীতলার উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া কহিল—যা মা করবেক তাই হবেক—

শরতের নির্ম্মল আকাশের নীচে ধানের মঞ্জরীগুলি ধীরে ধীরে হেমন্তের হাওয়ায় অবনতশীর্ষ হইল। হিজলবনের ধারে শালবনের নতুন পাতা গভীর শ্যামলতায় ভরিয়া গেল—তারপর দিনের পশ্চিম বায়ুতে তাহা ধীরে ধীরে পিঙ্গল হইয়া উঠিল—মাঠের সবুজ ধান ও ঘাসগুলি পাণ্ডুর মৃত্তিকার উপরে পিঙ্গলবর্ণের আবরণের মত পড়িয়া রহিল। সকালের নিষ্প্রভ সূর্য্যালোক সোনালী ধানের শিষে সঞ্চিত শিশির-বিন্দুর মাঝে প্রতিবিম্বিত হইয়া বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করিল। গাড়ী গাড়ী ধান—সারা বৎসরের পরিশ্রম-লব্ধ ধান সকলের খামারে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল—দিগন্তবিস্তৃত পাণ্ডুর মাঠ পড়িয়া রহিল নিঃশব্দ নীরব। ফাল্গুনের আগুন হাওয়ায় মাঠের মৃত্তিকা ফাটিয়া চৌচির হইল—শুষ্ক ঘাসের মাঝে পাথরগুলি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

চৈত্রের মাঝামাঝি একদিন ধূলিঝড়ায় আকাশ ভৈরবিক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বর্ষণ হয় নাই। বর্ষের শেষপ্রান্তে একদিন বায়ুকোণে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া প্রবল বর্ষণ হইয়াছে—শুষ্ক ঘাসে আবার সবুজ আভা দিয়াছে—

গোপালপুরের একটানা ইতিহাস চলিয়াছে একই উপায়ে—বাগ্দী বাউরী পাড়ায় গাজন চলিতেছে, কিন্তু তাহাতে আতিশয্য নাই—সকলেরই অবস্থা খারাপ, তাই কোনমতে পার্ব্বণ রক্ষা হইতেছে।

চাঁদমোহন একাকী আসিয়াছিলেন, গাজনা আদায় করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতায় তাহার বাড়ীর একতলা সম্পূর্ণ হইয়া এখন দ্বিতলের গাঁথনি চলিতেছে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে চাষীরা গাড়ীতে করিয়া জমিতে সার দিয়াছে, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে বীজতলার ধান বুনিয়াছে। ধানের আঙ্কুরগুলি বড় হইয়াছে—উপযুক্ত বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পোতা হইবে—

অকস্মাৎ একদিন চাঁদমোহন একাকী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইতেই সকলে শঙ্কিত হইল—এখন যদি পুনরায় খাজনা চাহেন তবে বিপদ—চাষের সময়, তাহারই খরচ সকলের ঘরে নাই।

চাঁদমোহনের কলিকাতার বাড়ীর দ্বিতলের ছাদ দিতে হইবে, অতএব টাকার তাহার প্রয়োজন ছিল—সকলেই জানিত বিনা প্রয়োজনে তিনি আসেন নাই। শশধরের নিকট টাকার কথা বলিতে তিনি এই আষাঢ় মাসে আদায় করিতে অনিচ্ছুক তাহা জানাইয়াছেন—চাঁদমোহন প্রস্তাব করিলেন গোলার ধান বিক্রয় করিতে হইবে, শশধর তাহাতে জানাইয়াছেন চাষ-আবাদ শেষ না হইলে ধান বিক্রয় করা সম্ভব নয়। ইহা লইয়া দুই ভাইতে মন কষাকষি চলিয়াছে, কাজেই চাঁদমোহন এখনও কোন নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারি করেন নাই। দুই ভাইএর মাঝে মাঝে একটু কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেটাকে বচসাও বলা যাইতে পারে।

আষাঢ় যাইয়া শ্রাবণে পড়িল কিন্তু আকাশে মেঘ নাই, একবিন্দু জলের সম্ভাবনা নাই। আঙ্কুরগুলি শুকাইয়া যাইতেছে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বৃষ্টি না হইলে এবারের মত চাষ একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। বাগ্দী বাউরী পাড়ায়, নিতাই শিবদাস সকলে মিলিয়া নানারূপ যুক্তি করিয়াছে কিন্তু জলের উপায় কি? বৃদ্ধ শশী বাউরী একদিন কহিল—ঠাকুরমশায়ের কাছে যা, ভগবানকে ডাক, তবেই বৃষ্টি হবে, নইলে সব মাটি—

নবীন বহু পুরাতন দিনের একটা গল্প করিল—মতি ঠাকুর কেমন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিয়া বৃষ্টি নামাইয়াছিলেন। অবশেষে কহিল—গোপাল ঠাকুর ত তারই বংশের, তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত বা বৃষ্টি হইতে পারে—

গল্পটা কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ করিল না—কেহ কহিল, ব্রাহ্মণের সেই তেজ কি আর আছে। তথাপি যখন গত্যন্তর নাই তখন সকলে গোপালঠাকুরের নিকট যাওয়াই স্থির করিল—

সন্ধ্যার পরে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ উঠিয়াছে। চণ্ডীতলার

অদূরে জ্যোৎস্নালোকিত অস্পষ্ট মাঠের মৃত্তিকা দেখা যায়। ওই পাড়ার মাতব্বর কয়েকজন গোপালঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইল। গোপালের পুত্রদ্বয় ইংরাজি পড়া ছাড়িয়া সংস্কৃত পড়িতেছিল—গোপাল তাহাদিগকে মুগ্ধবোধ পড়াইতেছিলেন। সকলকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—এস এস বাবা-সকল, বস—তা হঠাৎ এত রাত্রে কি মনে করে?

শিবদাস নিতাই বলাই কালী নবীন সকলে একটা খেজুরের পাটিতে বসিয়া কহিল—শাওন ত এল ঠাকুরমশাই, জল নেই—মাঠের জমি ত খা খা করতে লাগলেক। আপনি বৃষ্টি নামা করান ঠাকুরমশাই। শশীদা বললেক—মতি ঠাকুর আর আপুনি বৃষ্টি নামা করালেক—উই সেই কোন সালে।

গোপাল ধীরে ধীরে কহিলেন—সেদিন ত আর নেই, তখন ভগবানকে লোকে ভক্তি করতো, তাহাদের কথায় তিনি কান দিতেন। এখন দায়ে পড়ে ডাকলে কি তিনি শুনবেন? দেশে ধর্ম্ম নাই, চুরি, ডাকাতি, ফাঁকি, মিথ্যা, অধর্ম্মের আবাস হয়েছি আমরা। আমাদের কথা তিনি শুনবেন কেন?

নিতাই কহিল—তবে ভগবান কি মোদের সব মারবেক? ছিষ্টি লয় হবেক?

শিবদাস কহিল—কি করা লাগবেক ঠাকুরমশাই?

গোপাল কহিলেন—তোমরা নগর কীর্ত্তন কর, তারপর দেখা যাক্ কি হয়। অন্ততঃ সাতদিন ত তাঁকে প্রাণ দিয়ে ডাকো—

নবীন কহিল—এটা কথা বটেক—হাঁ আজ থেকেই নাম-কীর্ত্তন লাগা করাবেক চল্—সব—চল্—

সেই দিন হইতে নাম-সংকীর্ত্তন চলিল। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গ্রামের পথে পথে বাগ্দী বাউরী ডোমেরা কীর্ত্তন করিতে লাগিল—

কিন্তু বৃষ্টি হইল না—বীজতলায় আঙ্কুরগুলি প্রায় শুকাইয়া লাল হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন মাঠ ঘুরিয়া আসিয়া সকলের মুখ শুকাইয়া গেল—এই আঙ্কুর মরিয়া গেলে পুনরায় আঙ্কুর করিয়া চাষ শেষ করিতে আশ্বিন মাস—তাহাতে কি ধান জন্মিতে পারে?

গ্রামের যুবক প্রৌঢ় সকলে নতমুখে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। একপাশে শশী বসিয়া তামাক টানিতেছিল—সহসা লাঠির উপর ভর দিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—চল্, ছোঁড়ারা সব চল—মোরা ঠাকুরকে ধরা করবেক। গোপাল ঠাকুর খলিশের বাচ্চা বটে—উ পারবেক চল্—মা চণ্ডীর থানে উ মন্তর বলবেক—চল্—

শশী লাঠিতে ভর দিয়া ও কোমরে হাত দিয়া কোন মতে চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী দুই চার জন গেল। যুবকদের অনেকেরই এই ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল না তাহারা প্রায়ই গেল না। একজন কহিল—মোরা ত কীর্ত্তন ক'রবেক—কি হল বটে—

আর একজন কহিল—পুণ্যির শরীর বট—ভগবানকে ডাকা করলে শুনবেক কেনে? তু ত—নদ মারছিস্ হরবোজ—

গোপালের উঠানে গ্রামস্থ ছোটলোকগণ সমবেত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্য হইতে শশী লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া কহিল—ঠাকুর মশাই, তু ত বামুন বটেক, তু যদি লাগিস্ ত কোন বেটা পারবেক—মতি ঠাকুর আর তু ত বৃষ্টি নামা করালেক, মু দেখলেক সেই সন। তু পুঁথি ধরা কর, দেশ রক্ষা কর—

আরও অনেকেই গোপালের শরণাপন্ন হইল। গোপাল কহিলেন—ভগবানকে আমি ডাকতে পারি, তবে তার ইচ্ছাই সব।

শশী কহিল—তু ডাক্ কেনে, দেখনা ভগবান কি ক'রবেক—

গোপাল কহিলেন—বেশ তাই হবে—চণ্ডীতলা পরিষ্কার কর গিয়ে। উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠ করবো, ভগবান যদি দয়া করেন।

শশী সবলবলে আশ্বাদিত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

(ক্রমশ)

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

খাদ্য-অভাব—

গত ১৭ই ভাদ্র কলিকাতার রোটারী ক্লাবের লোহলস্থিলনে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সমস্যার সমাধানের যে সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে একটি গল্প মনে পড়ে—এক দল সৈনিক প্রদেরের পথ দিয়া যাইবার সময় তাহাদিগের একজন এক মিষ্টান্ন-বিক্রেতার দোকান হইতে কিছু মিষ্টান্ন তুলিয়া লইলে দোকানদার দাম চাহিলে সে বলিয়াছিল—"প্রমদের পর পাইবে"—তখন দোকানদার তিক্তস্বরে বলিয়াছিল—"সে যে অনেক দিন!" প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগকে বলিয়াছেন—১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৫ বৎসর পরে পশ্চিমবঙ্গের চাউল সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হইবে। গত নির্বাচনে তিনি যাহাদিগের ভোট লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অধিকাংশই ৫ বৎসর পরে তিনি জীবিত থাকিবেন কি না সন্দেহ করিবে। সুতরাং তাহারা তাঁহার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করিবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং তাঁহার পক্ষে এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজসাধ্য।

মন্ত্রিসভার একখানি পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিপাদ্য—পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব নাই। অর্থাৎ চাউলের অভাব সরকারের সৃষ্টি বা সরকারের অযথার্থ উক্তি। প্রফুল্লচন্দ্র সে কথা অস্বীকার করিয়া বলেন—অভাব আছে। অর্থাৎ সরকারের সুব্যবস্থায় চাউলের অভাব ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দূর হইতে পারে না। আর পশ্চিমবঙ্গের লোক—বর্দ্ধমান সরকারকে বিব্রত করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাত খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেবল কি তাহাই? তাহারা কাজ করে না—সরকার তাহাদিগের খাদ্যের ব্যবস্থা করিবেন, এমন কথা বলে! দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি বলেন—

(১) প্রতি বৎসর প্রায় ৪০ হাজার ইমারতী মিস্ত্রী অন্যান্য প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া ৫ মাসে ২ কোটিরও অধিক টাকা উপার্জ্জন করে।

(২) কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে ৫০ হাজার (প্রায় নহে—পূরা ৫০ হাজার) অবাঙ্গালী মুটেমজুরী ব্যবসায়ী আছে।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের পাট-কলে শতকরা প্রায় ৭০ জন শ্রমিক অবাঙ্গালী।

এ জিলায় অবশ্য সচিবের ব্যবহারার্থ সরকারী মন্তরখানায় প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহা নির্ভরযোগ্য কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু যদি ইহা নির্ভরযোগ্য হয়, তবে ইহার কারণ কি এবং কিরূপে অবস্থার প্রতীকার করা যায়, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার—কলিকাতার ভূপৃষ্ঠে—অন্ততঃ আকাশে ট্রেন চালাইবার পরিকল্পনা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করিয়াছেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যেশের অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ও উপেক্ষার একটি উদাহরণ দিতেছি। প্রধান-সচিব ঘোষণা করিয়াছেন, বাঙ্গালীদিগকে ইমারতী কাজ শিক্ষা দিবার জন্য (অবশ্য বহু অর্থ ব্যয়ে) বড় বড় কোম্পানীর সহিত ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা কি জানেন, কলিকাতা বেলেঘেড়িয়ার একটি অবৈতনিক কারীগরী বিদ্যালয়ে ঐ শিক্ষা দেওয়া হয়—এমন কি ছাত্ররা বৃত্তিও পায়? সে কাজে উৎসাহ দান জন্য সরকার কি করিয়াছেন? সে বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব সরকারের অবিদিত নাই।

পশ্চিমবঙ্গের পাটকলে কেন অবাঙ্গালী শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে, তাহার কারণ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বজ্ঞ সচিবরা শিল্প কমিশনের রিপোর্ট ও ডক্টর ব্রোউটনের (নেড়ী চট্টোপাধ্যায়ের) ভারতীয় শ্রমশিল্প শ্রমিক সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। তাঁহারা সে সব কারণ দূর করিবার কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন, তবে কি তাঁহারা কর্ত্তব্যপালন না করিয়া বাঙ্গালীকে অকারণ দোষ দিতেছেন না?

প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে কেবল চাউলেরই অভাব নহে—খাদ্যোপকরণ মাত্রেরই অভাব—

খাদ্যোপকরণ	প্রয়োজন (লক্ষ টন)	পাওয়া যায় (লক্ষ টন)
গোল আলু	১০	৪
দাইল	৭	৫½
চিনি ও গুড়	৪½	৩
স্নেহপদার্থ (ঘৃত, তৈল প্রভৃতি)	৪	২
দুগ্ধ	২২	৪
মাংস ও মৎস্য	৭	½
ডিম	৭৩ কোটি	১৪ কোটি

বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলাদ্বয়ে গোল আলুর ফলন অধিক। তথাপি কেন তাহার অভাব ঘুচে না, তাহা কে বলিবে? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগের কৈফিয়ৎ কি? মাংস ও মৎস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য—মৎস্য

সন্ধানের মরীচিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমুদ্রে কত টাকা নষ্ট করিয়াছেন? আজ যিনি প্রধান-সচিব তিনি কার্য্যভার পাইয়াই বলিয়াছিলেন, আমেরিকায় নাকি লোক কেবল পাঁউরুটি খায় না—তাহা গবাদি পশুখাদ্যে পরিণত করিয়া দুগ্ধ বৃদ্ধি করে এবং সারেও পরিণত করে। গত ৭ বৎসরে তাঁহার সরকার সে পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? দুগ্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য—হরিণঘাটায় উন্নত শিক্ষার তাঁবে যে "টোনড্" (খাঁটি নহে) দুগ্ধের উৎপাদন-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয়ে কি ফল লব্ধ হইয়াছে? রোগপুত্রকে যেমন সিটুনীগোলা জল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে দেওয়া হইয়াছিল, কলিকাতার লোককে কি তেমনই "টোনড্" দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে না?

দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর জল নিয়ন্ত্রণের স্বপ্ন দেখাইয়া কত দিন পশ্চিম বঙ্গের নরনারীকে অপূর্ণাহারে রাখা এবং সরকারের খাদ্যবিভাগ বহাল রাখা চলিবে? বড় বড় পরিকল্পনা সম্বন্ধে বক্তৃতায় ও বর্ণনায় কি লোকের উদর-পূর্ত্তি হইবে? না—

"Reams of hiccoughing platitudes···cannot mend this."

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডেনমার্কের নাবিক আনিয়া সমুদ্রে মৎস্য আহরণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছেন, এ বার জাপানীপ্রথায় ধানের চাষ প্রবর্ত্তন-চেষ্টায় সমস্যা সমাধান করিবেন, বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা বিস্তৃত ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করেন নাই কেন! পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য বিদেশের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশে ধানের যে মূল্য দিতেছেন, বিদেশ হইতে তদপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া তাহা আমদানী করিতেছেন—অথচ বলিতেছেন, দেশের লোক স্বেচ্ছায় ধান সরকারকে বিক্রয় করে না! তাহার কারণ, তাহারা কিছুতেই ধানের তুলনায় উপযুক্ত মূল্য পায় না। আজ যদি তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ-নীতি বর্জ্জন করেন, তবে চাহিদাও প্রয়োজনের সাধারণ মিলনে প্রয়োগে চাউল পাওয়া যায়, ইহাই লোকের বিশ্বাস। সে বিশ্বাস যে ভ্রান্ত এমন মনে করিবার কারণও নাই। কিন্তু সরকার তাহা না করিয়া যে অস্বাভাবিক কৃত্রিম অবস্থা সৃষ্টি করিয়া তাহাই রক্ষা করিতেছেন, তাহা সঙ্গত কি না তাহা কে বলিবে? একটা বিরাট ব্যয়বহুল বিভাগ রাখার বহু লোক "হাতে রাখা" যায় এবং বহু অর্থ ব্যয়ের সুযোগ ঘটে, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা দেশের লোকের উপকারের জন্য, কি তাহাতে দেশের লোকের উপকার হয় না, তাহাই প্রকৃত বিবেচ্য। সে বিবেচনা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার করিতেছেন? ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার কথায় লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ, ততদিনে মানুষের অখাদ্য চাউলে বহু লোকের অকালমৃত্যু অনিবার্য্য। সেজন্য কে দায়ী হইবে? আর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ—সে ত "যানোজ দিল্লী দূরস্ত"।

খাদ্য—আশা ও আশ্বাস—

খাদ্যসচিব বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের বৎসরে খাদ্যের প্রয়োজন প্রায় ৪২ লক্ষ টন—তার গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল ৪০ লক্ষ টন। তাহাতেও কেন "চাহাকার" মিটে না, তাহার উত্তর—সরকারের পুলিস প্রভৃতিও সব ধান বাজারে বাহির করিতে পারে নাই।

এই কৈফিয়তে লোক সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তাহার পরে—১০ দিনের মধ্যেই—আশ্বাস দিয়া লোককে তুষ্ট করিবার চেষ্টা হইয়াছে—এ বার ধানের ফসল কেমন ফলন হইয়াছে, গত ১০ বৎসরে তেমন হয় নাই। হিসাব দিতে সরকারের কার্পণ্য নাই। বলা হইয়াছে—

(১) এবার পূর্ব্বাপেক্ষা এক লক্ষ একর অধিক জমীতে চাষ হইয়াছে।

(২) এ বার প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) ২৪পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর এই জিলাত্রয়ে ধানে যে পোকা লাগিয়াছিল, সরকার তাহা নিবারণ করিতে পারিয়াছেন।

(৪) পোকার উপদ্রবে ও বন্যায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য। ইত্যাদি।

যদি ইহাই বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে কি আগামী জানুয়ারী মাস হইতে নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জ্জিত হইবে? এই অসুবিধাজনক প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—তাহা হইবে না; কারণ, অন্ততঃ ৩ মাসের ব্যবহারের মত উপকরণ মজুত না রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ-নীতি রদ করা যায় না!

সরকারের মতে ৩ মাসের জন্য আবশ্যক সঞ্চয় কখন হইবে কি না তাহা সরকারই বলিতে পারেন। সুতরাং লোক আশ্বাস পাইলেও আশা করিতে পারে না।

বর্ত্তমান মূল্যের হিসাবে বর্দ্ধিত মূল্য কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। আজ কি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা হিসাব করিতে পারেন না—সেই ধানের চাষ বাড়ান হইয়াছে কি এবং তাহার ফল কি হইয়াছে?

খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, অভাব রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতার পরে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে—গত বৎসর আউ ধানের ও আমন ধানের ফলন মোট প্রায় ৩,৯০১,৮০০ টন অর্থাৎ পূর্ব্ববৎসরাপেক্ষা প্রায় ৪ লক্ষ টন অধিক হইয়াছিল! ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের ইহাই হিসাব। এই হিসাবে বৃদ্ধির পরিমাণ ৪ লক্ষ টন ধরা হইয়াছে। এ বার অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে যদি অনুরূপ ফলন হয়, তবে ত আর অভাব থাকিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সে অবস্থায় কেন নিয়ন্ত্রণ নীতি বর্জ্জিত হইবে না?

কিন্তু সরকারের বন্ধনমুক্ত হইলে ব্যবসায়ী সাধারণ নিয়মে প্রয়োজনে যে ব্যবসায়ীরাই অন্যান্য স্থান হইতে চাউল আমদানী করিতে পারিবেন ও করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মসলেম লীগের আমলে বাঙ্গালায় যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে যে পাঞ্জাব হইতে গম আনাইয়া ভারত সরকার ও বাঙ্গালা সরকার—প্রকৃত পরিমাণ লাভ করিতে বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই, তাহার প্রমাণ আছে। এ বারও কেহ লাভবান হইতেছেন না ত?

পরিকল্পনার প্লাবন—

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র; রাষ্ট্রে অধিবাসিগণের খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্নেহের অভাব। কিন্তু এক বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বোধ হয়, আর

সকল রাইকে পরাভূত করিয়াছে—কাহে বহে, পরিকল্পনায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব পরিকল্পনার উৎস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আর তিনি বিরাট, সুতরাং বাহুবহুল পরিকল্পনাই করিয়া থাকেন। তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে যে কয়টিকে রূপ প্রদানের চেষ্টা হইয়াছে, সে কয়টিতে আর্থিক ক্ষতি যাহাই লাভ হয় নাই। গভীর জলে মৎস্য সংগ্রহের পরিকল্পনায় যে লাভ হয় নাই, তাহাতে বলা হইয়াছে—উহা পরীক্ষামূলক, সুতরাং আর্থিক ক্ষতির কথা বলিতে নাই; কলিকাতার রাজপথে সরকারী যান-ব্যবস্থায় আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহার কৈফিয়ৎ তাহাতে লোকের যে সুবিধা হইয়াছে তাহার তুলনায় ক্ষতি উপেক্ষনীয়। কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টায় অনেক টাকার অপব্যয় হইয়াছে; এখন আকাশে রেলপথ স্থাপনের কথা বলা হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে যাগার চলা চাষের ও বাসের উপযুক্ত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ আমদানী করা হইতেছে।

এ বার কলিকাতায় ট্রামের দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধির জন্য যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তবুও তিনি অনেকগুলি পরিকল্পনা সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সরকার নানা পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। প্রথম পরিকল্পনা—অবাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালীদিগকে শিক্ষা দানের ও সমাজ-সেবার জন্য লোক নিয়োগ। হিসাব অনুসারে আগামী ১ বৎসরে অর্থাৎ পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় পর্য্যন্ত এই সকল কাজে ১০ হাজার লোক নিযুক্ত হইবেন। তাঁহারা ও তাঁহাদিগের স্বজনবর্গ ভোটার হইবেন—ভোটের ক্যানভাসারও হইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনায় মাত্র এক কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং ১ হাজার ৫ শত লোক কাজ পাইবে। কুদ্র কুদ্র শিল্পের জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেই বহু লোক কাজ পাইবে। মাত্র ৯ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া আলুবোখারা করা হইতে লোক, আলুকাবেরা, এপ্রোকিয়াস ন্যাসপাতি ও বেদানার চাষ উৎপন্ন হইবেই অধিকন্তু সে প্রচুর উৎপন্ন হইবে তাহা পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে দেখা যাইবে।

এ সকল ব্যতীত কলিকাতার আবর্জ্জনাবাহী জল সম্বন্ধে, কলিকাতার নিকটে চর্ম্মী উজন প্রভৃতি কত পরিকল্পনাই আছে।

এই সকল পরিকল্পনাকে রূপ দিতে যে অর্থ-ব্যয় হইবে, তাহা কোথা হইতে আসিবে এবং সেজন্য কিসের নিকট ঋণ করিতে হইবে কি না, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। অথচ ফরাক্কার গঙ্গার উপর বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রী সরকারের দ্বারে ধর্ণা দিয়া বসিয়া আছেন—সে বিষয়ে ব্যবস্থাও হইতেছেন না।

এই সকল পরিকল্পনার উৎসের উপযুক্ত অর্থ ও অর্থপালের কথা মনে পড়ে। অর্থপাল অর্থকে যথেষ্ট খাদ্য দিত না, কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্দ্দন ও মার্জ্জন করিত। সেই জন্য অর্থ তাহাকে বলিয়াছিল—আমাকে অধিক খাদ্য দাও—অত মর্দ্দন ও মার্জ্জনের কোন প্রয়োজন নাই। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলিতেছে—অধিক অর্থও, পরিকল্পনার বহর কমাও!

শ্রমিক বিক্ষোভ—

কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক-বিক্ষোভ চলিয়া আসিতেছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব ও আর কোন কোন রাজনীতিক বলিয়াছেন, অবস্থা যেরূপ হইতেছে তাহাতে বহু কলকারখানা পশ্চিমবঙ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইবার সম্ভাবনা। একথা More in anger than in sorrow বলা হইয়াছে, কি শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতৃগণকে ভয় দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে সময় এই রাজ্যে আরও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন—সুতরাং বাঞ্ছনীয়, সেই সময় সে সকল স্থানান্তরিত হওয়া যে দুঃখের ও দুর্দ্দিনের বিষয় হইবে, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই, কলকারখানা স্থানান্তরিত করাও তেমনই দুঃসাধ্য। সুতরাং ভয় না দেখাইয়া শ্রমিক-বিক্ষোভের নিদান নির্ণয় করিয়া প্রতীকারের বিধান করাই সুবুদ্ধির কাজ।

পশ্চিমবঙ্গে গাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব—কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য প্রদেশ হইতে শ্রমিক আমদানী অত্যন্ত অধিক হওয়ায় বেকার-সমস্যা প্রবল। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বেকার অবস্থা যে সমাজবাদেরও উদ্ভব করে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে—"The dread of unemployment predisposes the minds of our young men to the morbid and fanatical outlook which the leaders of this (terrorist) movement seek to induce."

পশ্চিমবঙ্গে এখনও বহু কলকারখানা বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত। সে সকলে বহু য়ুরোপীয় মোটা বড় নানা চাকরীতে বহু অর্থ দেশ হইতে শোষণ করিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও কলিকাতা ট্রাম প্রতিষ্ঠান—বিদেশী প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এ সকল কারণ বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ধর্ম্মঘটে শ্রমিকদিগের সহিত সরকার পক্ষের—বিশেষ সচিবদিগের যে সহানুভূতি সহজে সীমাংসার পথ সুগম করিতে পারে, সে সহানুভূতি উৎসারিত হয় না—ইহাই শ্রমিকদিগের অভিযোগ।

বহু শ্রমিক নেতা যে দুর্নীতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সরকার পক্ষের আবশ্যক কার্য্যই তাঁহাদিগের অসঙ্গত ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকার করিয়া শ্রমিকদিগকে শান্ত করিতে পারে। তাহারা নির্ব্বোধ নহে—আপনাদিগের প্রকৃত স্বার্থও তাহারা বুঝে। তাহাদিগকে বুঝান প্রয়োজন। তাহা করা হয় না। আর এ কথাও সত্য যে, তাহারা সরকারের সততে সন্দেহ পোষণ করে। কেন করে, তাহা সকলেই জানেন। শ্রমিক-সমস্যা জটিল হইয়াছে। কলকারখানা স্থানান্তরিত করার ভয় দেখান সে সমস্যা সমাধানের উপায় নহে। বিশেষ সরকারকে মনে রাখিতে হইবে, সরকার একক এই সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম; সেজন্য জনমতের সমর্থন প্রয়োজন—সে সমর্থন লাভ করিবার জন্য যে সহযোগ অবলম্বন করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে তাহা দেখা যাইতেছে কি?

নূতন প্রদেশ গঠন—

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বিনাভুলা উপদেশ দিয়াছেন—সরকার (অবশ্য সরকার ও কংগ্রেস এখন অভিন্ন) যখন নূতন প্রদেশ গঠন সম্বন্ধে কমিশন নিয়োগের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে যেন আর কোনরূপ আন্দোলন করা না হয়। কারণ, কমিশন যেন পাপ পরিক্ষেপণে কাজ করিতে পারেন। অন্ধ্রবাসীদিগের প্রবল আন্দোলনে নেহরু সরকার বাধ্য হইয়া অন্ধ্র প্রদেশ গঠন করার পরে যে সরকার ও কংগ্রেস ভয় পাইবেন তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আন্দোলন ব্যতীত লোকমত কিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে? আর যে কমিশন আন্দোলনে অধীর হ'ন, সে কমিশনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কি সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

এই সঙ্গে তাহার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবী বিবেচনা করিতে হয়। সে বিষয়ে কি হইবে? কংগ্রেসীদিগের কথা—সরকারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হও ও নির্ব্বাক থাক। কিন্তু লোক যদি কংগ্রেসের ও কংগ্রেসী সরকারের উপর আস্থাবান্ থাকিতে পারিত—তাহারা যদি বিশ্বাস করিতে পারিত, কংগ্রেস ও সরকার লোকমতের মর্য্যাদা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন—স্থায়িত্ব হইবেন, তবেই এইরূপ উপদেশ শোভা পাইত। পশ্চিমবঙ্গের বিহারভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের দাবী সম্বন্ধে বলা যায়, যদি রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলগুলি হিন্দীভাষাভাষীতে পরিণত করিবার হীন চেষ্টার সমর্থক না হইতেন; যদি প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি পদদলিত করিয়া ঐ সকল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্ত করা এখন অসঙ্গত এইরূপ অযথা উক্তি না করিতেন; যদি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ধামবাম ও টাটানগর ত্যাগ করিতে সম্মত না হইতেন এবং যদি কেন্দ্রী সরকার সে প্রস্তাবও ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান না করিতেন; পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সমিতি যদি পদক্ষেপে ঐ সকল অঞ্চলে যাইয়া অধিকার-বিস্তারের কথা বলিয়া প্রকৃত বীরের চীৎকার-বিরতি স্মরণ করাইয়া না দিতেন, তবে দেশের লোক কংগ্রেসের উপদেশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইতে পারিত। কিন্তু আজ আর তাহার উপায় নাই—সম্ভাবনাও নাই।

সুতরাং লোকজন যত প্রকারের একমাত্র নিরাপদ উপায়—আন্দোলন বর্জ্জন করিতে পারে না। অভাব ও অভিযোগ জ্ঞাপন করিয়া তাহার প্রতীকারের গণতন্ত্রসম্মত উপায়—আন্দোলন। সুতরাং যে কংগ্রেসের সহিত গণ-সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে, সেই কংগ্রেসের কথায় লোক আন্দোলনে বিরত হইতে পারে না।

কংগ্রেসের অধিবেশন—

দুর্ভিক্ষ-দাবানল-দগ্ধ সুন্দরবনের সান্নিধ্যে, অভাবে জর্জ্জরিত পশ্চিম-বঙ্গে এ বার কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। ইহাকে যদি স্মশানে বিলাসব্যসন—a pompous pageant of a perishing people বলা হয়, তবে তাহা কি অসঙ্গত হইবে? অধিবেশন-স্থান—কলিকাতা হইতে অদূরে বহু লোককে উদ্বাস্তু করিয়া যে "কল্যাণী" সহর রচনার পরিকল্পনা হইয়াছে তথায়। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল সে সকল বলিতে বলিতে "পুলিস মনের দ্বার না লাগে কপাট" হইয়াছিলেন—সাধ্যমের বিষাদ নাই। কিন্তু এ বার ও অর্থাভাবের কোন সম্ভাবনা নাই। কল ঘুরাইলে যেমন জল পাওয়া যায়, তেমনই যাঁহারা ডক্টর রায়ের জন্মদিনে তাঁহাকে লক্ষ টাকা উপহার দিলেন ও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রদেশ কংগ্রেসকে দিয়াছেন—তাঁহাদিগকে ঘুরাইলেই টাকা পাওয়া যাইবে। কেবল কি তাহাই? বারাসতে কংগ্রেস সম্মিলনের সময় যেমন কোন কোন উপসচিব অকংগ্রেসী সংবাদপত্রের নিকট হইতেও অর্থ ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই যদি সব উপসচিব, সহকারী সচিব ও সকল পূরাসচিব চেষ্টা করেন, তবে টাকা আসিবে। তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে; "কল্যাণী"র গঠনকার্য্য অগ্রসর হইবে, পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত দুরবস্থাও কেহ লক্ষ্য করিবে পারিবে না। অবশ্য যে জওহরলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তে অসম্মত ও যে কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার উত্তরসাধক—পশ্চিমবঙ্গ তাঁহাদিগকে কিরূপে অভ্যর্থিত করে, তাহা দেখিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। পরিকল্পনায় প্রদর্শনীরও স্থান আছে। কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে যে প্রদর্শনীর হিসাব পাওয়া গত হয় নাই, তাহাতে কে উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন এবং কাহার মুখ হইতে প্রদর্শনীর সূচনা হইয়াছিল?

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু—

পার্লামেণ্টে শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের দাবী জানাইয়া শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, যে জওহরলাল নেহরু একাধারে ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ও সরকারের সঙ্গে অভিন্ন কংগ্রেসের চালক তিনি প্রথমেই বলিয়াছিলেন, যখন তাঁহার বিশ্বাস, শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুতে কারণ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই, তখন আবার তদন্ত কেন? পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং প্রধান মন্ত্রীর আদেশ ব্যতীত সে দলের কোন সদস্য সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া ত পরের কথা—কথা বলিতে পারেন না। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে প্রস্তাব পরাভূত হইয়াছে। এ বার জওহরলাল নেহরু স্বয়ং কোন কথা বলেন নাই; তবে প্রস্তাবে তাঁহার আপত্তি তিনি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এবার সরকার পক্ষের কথা বলিয়াছিলেন—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কৈলাসনাথ কাটজু। তাঁহার বক্তৃতায় যুক্তির অভাব উচ্চতায় পূর্ণ করা হইয়াছিল। তিনি যে কেবল লোককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—তিনি

"The brave demagogue of the party who seeks to make up in sound and fury what he lacks in argument."

তাহাই নহে, তাঁহার ব্যবহারে প্রাচীনের উক্তি মনে পড়ে—কোন কোন লোক সম্বন্ধে বলা যায়—

"So obnoxious is he to the very party he wishes

to espouse that he is only supportable by doing those dirty acts the less vile refuse to do."

কৈলাসনাথ বলিয়াছেন, প্রস্তাবটি ভাবাবেগপ্রসূতক। কিন্তু আমরা তাঁহাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। এ কথা কি সত্য যে, তিনি শ্রামাপ্রসাদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে যখন শ্রামাপ্রসাদের ভ্রাতা রমাপ্রসাদকে সহানুভূতি জানাইবার জন্য লিখিত পত্রে জানাইয়াছিলেন—শ্রামাপ্রসাদের জীবনরক্ষার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা হইয়াছিল, তখন রমাপ্রসাদ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—তিনি যে মৃত্যুর ৩।৪ ঘণ্টা পরেই ঐ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিতে হয়—

(১) কাশ্মীর সরকার কি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? না—

(২) ঘটনার পর ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সকল বিষয়ে এমন ওয়াকিবহাল হইয়াছেন যে, ঐকথা বলিতে পারেন?

সঙ্গে সঙ্গে কি রমাপ্রসাদ তাঁহার মিথ্যা উক্তি তাঁহার মুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—তিনি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন শ্রামাপ্রসাদ রোগ-যন্ত্রণায় কাতর। তিনি (অর্থাৎ কৈলাসনাথ) যদি একবার তাঁহাকে (অর্থাৎ শ্রামাপ্রসাদকে) দেখিতে যাইতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই চিকিৎসার ও শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেন এবং তাহা হইলে হয়ত শ্রামাপ্রসাদের অকালমৃত্যু হইত না।

রমাপ্রসাদের সেই পত্রের উত্তর কৈলাসনাথ দেন নাই। কেন?

এ কথাও কি সত্য যে, য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব জওহরলালকে লিখিয়াছেন, তিনি কিরূপ যাত্রার পূর্বে যে সকল উপকরণ নিষ্ঠুর করিয়া লিখিয়াছিলেন, কাশ্মীরের সচিবের বিবৃতিতে তাঁহার মনের সব সন্দেহ দূর হইয়াছে, উমাপ্রসাদের দ্বারা সঙ্কলিত পুস্তক পাঠ করিয়া (শ্রামাপ্রসাদের জননীর আহ্বানে তিনি যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই, তখন শোকার্ত জননী তাঁহাকে ঐ পুস্তক পাঠ জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন) তিনি বুঝিয়াছেন, সে সকল উপকরণে অনেক ত্রুটি আছে?

নির্মলচন্দ্রের একটি প্রশ্নের কোন উত্তর কৈলাসনাথ দিতে পারেন নাই—দিবে ছাড়ে কাশ্মীরে প্রবেশ যদি শ্রামাপ্রসাদের অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে জিজ্ঞাস্য, ভারত সরকার সেজন্য তাঁহাকে ভারত রাষ্ট্রের সীমান্তে গ্রেপ্তার করেন নাই কেন?

কৈলাসনাথের এই প্রশ্নে উত্তর প্রদানে অক্ষমতাই কি ভারত সরকারের কার্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে?

রবীন্দ্র ভারতী—

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে কলিকাতার শোক-সভায় কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে বিশ্ব-ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেই সমিতির চেষ্টায় ১২ হাজার ৩ টাকা ৬ আনা ৩ পাই সংগৃহীত হয়। কয়টি প্রতিষ্ঠান ও স্বতন্ত্রভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। বিশ্বভারতী সে সকলের অন্যতম। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া রবীন্দ্র ভারতী নামকরণ করা হয়। তেজ বাহাদুর সপ্রু তাহার সভাপতি ও সুরেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদক মনোনীত হ'ন। বিভিন্ন সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ রবীন্দ্র ভারতীর ভাণ্ডার পুষ্ট করে। রবীন্দ্র ভারতী মোট ১৫ লক্ষ ১০ হাজার ৪ শত ৩৮ টাকা ১০ আনা ৭ পাই সংগ্রহ করেন। তদ্ভিন্ন কয়জন মহিলা কতকগুলি অলঙ্কার প্রদান করেন এবং ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভারতীকে লক্ষ টাকা দেন।

রবীন্দ্র ভারতী রবীন্দ্রনাথের গৃহ না পাইলেও রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পরিবারের এক অংশের একটি গৃহ ক্রয় করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প করেন। সে গৃহের সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের ও পরে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি জড়িত ছিল। উহা হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যে রবীন্দ্র ভারতী ঐ গৃহ ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ২ শত ১০ টাকায় ক্রয় করেন।

এই সময় ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর রবীন্দ্র ভারতী অ্যাইনানুসারে রেজেষ্টারী করা হয়।

এদিকে বিশেষজ্ঞরা নাকি মত প্রকাশ করেন যে, ঐ গৃহের একাংশ এত জীর্ণ যে রক্ষা করা যাইবে না। আবার যে ব্যক্তি গৃহটি পূর্বাধিকারীদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি প্রদত্ত মূল্যে সন্তুষ্ট না হইয়া আদালতে মামলা রুজু করেন। গৃহের একাংশ ভাঙ্গিয়া তথায় নূতন গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়। আর আদালতের রায় অনুসারে যাঁহার নিকট হইতে গৃহটি ক্রয় করা হইয়াছিল, তিনি পাইবেন—

(১) আরও ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৮ শত ৩৮ টাকা

(২) মামলার ব্যয় হিসাবে ২ হাজার একশত ৯ টাকা ৯ পাই

(৩) যেদিন হইতে গৃহ রবীন্দ্র-ভারতী লইয়াছেন সেইদিন হইতে শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা হারে সুদ।

এই রায়ের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র ভারতী যে আপীল দায়ের করিয়াছেন, তাহাতে পরাজয় হইলে—আর যে টাকা দিতে হইবে তাহা অল্প নহে। অথচ এখন মজুদ তহবিল (ব্যাঙ্কে) কেবল এক লক্ষ ১৭ হাজার একশত ২ টাকা ৩ আনা ৭ পাই।

কাজেই যদি আরও টাকা সংগৃহীত না হয়, তবে কি হইবে বলা যায় না।

সংগৃহীত অর্থের জন্য ৪ লক্ষ টাকা বিশ্বভারতীতে দেওয়া হইয়াছে এবং প্রায় ২ লক্ষ টাকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রাদি ক্রয় করা হইয়াছে। বিশ্বভারতী সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ ৪ লক্ষ টাকা ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া মনে হয় না। গৃহ নির্মাণের পূর্বেই চিত্রাদি সংগ্রহের প্রয়োজন সম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। গৃহনির্মিত না হইলে সে সকলের কি হইবে?

যে গৃহ (রবীন্দ্রনাথের না হইলেও) ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার স্থানে কতকটা জমীতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' পাড়ী রাখিয়া ভাড়া

দেওয়া হইতেছে। রবীন্দ্র ভারতীর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র মজুমদার ঐ পদের স্বরাধিকারী। মধ্যে কিছুদিন কোন কোন লোক রবীন্দ্র ভারতীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মিথ্যা অপবাদে যে স্থানে রবীন্দ্রনাথের শব দাহ করা হইয়াছিল, তথায় কোন স্মারক গৃহ নির্ম্মিত হয় নাই, যে গৃহ রবীন্দ্রনাথের ছিল না তাহা ক্রয় করিয়া তাহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—প্রভৃতি নানা কথা বলিয়া বিবৃতিতে ও চিত্রে প্রচার-কার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র ভারতীর হিসাব প্রকাশ করা হয় নাই, এমন অভিযোগও করা হয়।

যাহা হউক, হিসাব ও বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অবস্থা যাহা দেখা যাইতেছে, তাহাতে স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণেরও অর্থ—এমন কি যদি বাড়ীর মূল্য বাবদে আরও টাকা দিতে হয়, তবে সে টাকা কোথা হইতে আসিবে, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

রবীন্দ্র ভারতীর সম্পাদক যদি পরিকল্পিত কার্য্যের জন্য মোট কত টাকা প্রয়োজন, তাহা জানাইয়া দিতেন, তবে, বোধ হয়, ভাল হইত। কারণ, ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার সংগ্রহের পরে আর টাকা সংগ্রহ করা—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায়—সহজসাধ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহা না হইলে মধ্যপথে আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবে। রবীন্দ্র ভারতীর কর্ণধারগণ সে বিষয়ে কি স্থির করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল ও আগ্রহ স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি উপযুক্তরূপে রক্ষিত হউক, ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই কাম্য।

খাদ্য ও অখাদ্য—

ভারত সরকার বিদেশ হইতে নানারূপ খাদ্যশস্য আমদানী করিয়া রেশনে লোককে গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। আষ্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী মাইলো সে সকলের অন্যতম। সংবাদে প্রকাশ—উহা খাইয়া কতকগুলি লোক পাগল হইয়া গিয়াছে, একটি ১০ বৎসরের বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে—মাইলোর সহিত কোন প্রকার বিষাক্ত বীজ মিশ্রিত ছিল। কোনরূপ পরীক্ষা না করিয়া এই শস্য বিক্রয়ের জন্য কি সরকার দায়ী নহেন?

পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব স্থায়ী হইয়া আছে এবং দুঃস্থজন অঞ্চলের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর বহু লোক খাদ্যের দাবীতে বসিরহাটে মহকুমা হাকিমের আদালতের সম্মুখে সমবেত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ২২শে সেপ্টেম্বর মহিলারা মিছিল করিয়া খাদ্যভবনের সম্মুখে গিয়াছিলেন। পরদিন খাদ্যসচিব তাঁহাদিগের প্রতিনিধিদিগের সহিত তাঁহাদিগের বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মহিলারা তাঁহাকে কিছু রেশনে বিক্রীত চাউলও উপহার দিয়া, তাহা মানুষের খাদ্য কি না, তাহা দেখিতে বলেন। মহিলাদিগকে খাদ্যসচিব বলেন :—

(১) আগামী ১০ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে রেশনে যে চাউল দেওয়া হয়, তাহার মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হইবে না। উহার বিশ্বাস, ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত নূতন চাউল (যাহাতে যানাস্রূপ ঔষধিক পাঁড়া জন্মে) পাওয়া যাইবে। তখন হয়ত মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

(২) রেশনে চাউলের পরিমাণ বর্দ্ধিত করা যাইবে না।

(৩) যাহাতে চাউল হইতে ধূলা ও কাঁকর পৃথক করা যায়, সরকার শীঘ্রই তেমন চালনী সংগ্রহ করিবেন।

চালনী পাইলেও যে তাহা যথাযথরূপে ব্যবহার করিয়া লোককে কাঁকর ও ধূলা বর্জ্জিত চাউল দেওয়া হইবে, এমন কথা অবশ্য খাদ্য-সচিব বলেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার সতর্কতা অসাধারণ। ধূলা বর্জ্জন করিবার চালনী কিরূপ, তাহা জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

মনে পড়িতেছে, প্রধান-সচিবের লাভের দুই দিনের মধ্যেই ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়কে এক মহিলা মিছিলের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। সে মিছিলে প্রধান-সচিবের ভ্রাতুষ্পুত্রীও ছিলেন। প্রধান-সচিব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, রেশনে যে খাদ্যোপকরণ প্রদান করা হয়, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে না—যাহাতে পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তিনি সে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সে কথা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

খাদ্য-সচিব প্রফুল্লচন্দ্র আশা দেন নাই; বলিয়াছেন, দাম কমিবে না, পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে না। তিনি কেবল এক প্রকার চালনী আবিষ্কারের সংবাদ দিয়াছেন। অর্থাৎ he feasted them on smooth words and dismissed them with fasting stomachs.

মহিলারা যে—অবশ্য অসহনীয় হওয়ায়—প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। খাদ্য-সচিব যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহারা কি করিবেন, তাহা এখন দেখিবার বিষয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যে আবশ্যক পরিমাণ চাউলের অভাব নাই, ইহা যে সব হিসাব অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে সে সকল বিষয় সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

অপব্যয়—

দেশের যে অবস্থা তাহাতে সর্ব্ববিধ অপব্যয় অবশ্যপরিহার্য্য এবং যে ব্যয় না করিলেও চলে সে ব্যয় বিলাস ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

সম্প্রতি দিল্লীতে পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে উপ-মন্ত্রিবর শ্রীঅরুণকুমার গুহ—সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—

১৯৫২-৫৩ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে ভারতবর্ষের লোক ৩১ কোটি ৫০ লাখ টাকা ধূমপানে—সিগারেটে ব্যয় করিয়াছে। ইহার সঙ্গে শুল্ক ধরা হইয়াছে।

সিগারেট-ধূমপানের প্রাবল্য নিবারণ জন্য সরকারকে লজ্জাগৃহে, হাসপাতালে, চলচ্চিত্র গৃহে ও শেষে সাধারণ যাত্রিবাহী যানে ধূমপান নিষিদ্ধ অর্থাৎ আইনতঃ দণ্ডনীয় করিতে হইয়াছে।

যে দেশের লোকের পেটে অন্ন ও পরিধানে কাপড় নাই, সে দেশে বৎসরে ধূমপানে সাড়ে ৩১ কোটি টাকা অপব্যয় জাতির বিষম দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক।

দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষা—

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হইতে ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দার্জিলিংএ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্মৃতিরক্ষার্থ যে গৃহে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা ক্রয় করিয়া জন-কল্যাণকর কার্য্যে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সে জন্য মোট প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। তাঁহার অক্লান্ত আন্তরিক চেষ্টায় ইতোমধ্যে ৪ লক্ষ ২০ হাজার ২ শত ৩১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

ইতোমধ্যে (গত ২৩শে সেপ্টেম্বর) যে গৃহে দাশ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, সেই 'টেম্প এ লাইড' ক্রয় করা হইয়াছে। দেশবন্ধু মেমোরিয়াল সোসাইটী (দার্জিলিং) রেজেষ্টারী করাও হইয়াছে। রাজ্যপাল মহাশয় স্বয়ং দার্জিলিংএ গৃহটির আবশ্যক সংস্কার সাধন—পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন দেখিবেন। রাজ্যপাল মহাশয়ের এই কার্য্যের জন্য সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে দান করিয়াছেন, তাহা স্মরণীয়।

ইহার পরে—সম্ভ্রান্তবংশীয় ইংরাজ বা অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বসবাস হইতে আরোগ্য লাভের পর লোক যাহাতে সবল হইতে পারে সে জন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও ডক্টর হরেন্দ্রকুমার করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অভাব যেমন তীব্র—প্রয়োজন তেমনই অত্যন্ত অধিক। আমরা আশা করি, তাঁহার এই পরিকল্পনা রূপায়িত করিয়া বাঙ্গালার লোকের অশেষ উপকার সাধন করিবে।

সুরেন্দ্রনাথের বাড়াকপুরস্থ গৃহ রক্ষার ইচ্ছাও ডক্টর হরেন্দ্রকুমারের আছে।

উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন—

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা কিছুতেই সন্তোষজনক হইতেছে না। এই সময় পূর্ব্ব-পাঞ্জাবে দুধিয়ানায় একটি পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার প্রতি আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতেছি। দুধিয়ানা মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি উৎপাদনের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। এই স্থানে উদ্বাস্তুদিগকে ঐ শিল্প শিক্ষাদানের জন্য কেন্দ্রী সরকার ৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর দিয়াছিলেন। ঐ টাকায় প্রায় দেড়শত শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং ৩ বৎসরে তাহাদিগের দ্বারা উৎপন্ন মোজা গেঞ্জী প্রভৃতি প্রায় ৯ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতে মোট দেড়লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। মূলধন হ্রাস, সরঞ্জাম তহবিল ও প্রদত্ত ৫ লক্ষ টাকার সুদ দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে যে সকল শিক্ষাকেন্দ্র—উদ্বাস্তুদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলে মোট কত টাকা প্রযুক্ত হইয়া কিরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্ব্বাসন বিভাগ জানাইয়া দিবেন? ঐ সকল কেন্দ্রে কোন্ কোন্ শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যাহারা শিক্ষালাভ করে, তাহারা কিরূপে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল ও আগ্রহ অত্যন্তস্বাভাবী। কারণ, যে টাকা ব্যয়িত হইতেছে, তাহা তাহাদিগের এবং যাহাতে তাহা অপব্যয়িত না হয়, তাহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। অনিকাংশে সাধারণ রাজনৈতিক যেরূপে উদ্বাস্তু অনাথাদিগকে আবশ্যক চাঁদা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিতেছেন, তাহা প্রশংসনীয়। সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে সেরূপ সাফল্য লাভ না হইবার কারণ কি? এই বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কাশ্মীর—

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা যেমন সফল হয় না, কাশ্মীর সম্বন্ধে প্রকৃত অবস্থার গুরুত্ব ও তাহার ভুল ঢাকিবার যে চেষ্টা জওহরলাল নেহরু করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা তেমনই ব্যর্থ হইয়াছে। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি পার্লামেণ্টে নানা কথার মধ্যে কাশ্মীরের কথাও বলিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়াছেন, গত যে মাসে বিশেষে যাইবার পূর্ব্বে তিনি যখন কাশ্মীরে গিয়াছিলেন, তখন তথায় অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছিলেন। তাহার মনে হইয়াছিল, সে অবস্থায় কাশ্মীর সরকার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন না। কিন্তু তথাপি তিনি সেই অবস্থায় পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের দলপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বিনা বিচারে বন্দিদশায় রাখিয়া সম্পূর্ণ অবস্থায় বিদেশে গিয়াছিলেন এবং শেখ আবদুল্লা স্বীকার করিয়াছিলেন—নেহরুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি শ্যামাপ্রসাদকে দিল্লীতে পাঠাইতেন, মনে করিয়া রোখিয়াছিলেন। এ কথা কি সত্য যে, শ্যামাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করায় তিনি শেখ আবদুল্লাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন? তবুও—শেখ আবদুল্লার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাইয়াও, জওহরলাল বলিয়াছেন—কাশ্মীরের ব্যাপার তাহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার—ভারতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এ কথা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন যে, তাঁহার মোহে ভারতের কোটি কোটি টাকা কাশ্মীরে ব্যয়িত হইবার পরেও তাঁহার দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত শেখ আবদুল্লা ভারতের সহিত কাশ্মীর সংযুক্ত করা ত পরের কথা—ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং তাহার প্রমাণ এখন অকাট্য যে তিনিও আবদুল্লার গ্রেপ্তারে বাধা দিতে পারেন নাই? তিনি কি কাশ্মীরের ব্যাপারে পদে পদে ভুল করেন নাই এবং সেই ভুলের জন্যই শেখ আবদুল্লা বুক ফুলাইয়াছিল?

কিন্তু কাশ্মীরের কি হইবে? এখন কাশ্মীর বলিতে যাহা বুঝাইতেছে, তাহা সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য নহে—তাহার একাংশ মাত্র অর্থাৎ জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক। জম্মু প্রজাপরিষদ সম্পূর্ণরূপে ভারত-ভুক্তি চাহিয়া আসিয়াছেন এবং সেই জন্য পরিষদের সদস্যরা আবদুল্লা কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইয়াছেন। বিস্ময়ের বিষয় এখনও জওহরলাল প্রজাপরিষদের আন্দোলনের নিন্দা করিয়া নিরপেক্ষতার পরিচয় দিতেছেন।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখেও প্রজাপরিষদের নেতা শ্রীপ্রেমনাথ ডগরা বলিয়াছেন—"ডগরাদিগের পূর্ব্বপুরুষরা বহু কষ্ট সহ্য করিয়া জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের বিভিন্ন অংশ সম্মিলিত রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন—আজ আমরা কিছুতেই সেই সকল অংশের ঐক্য রক্ষা করিতে বিরত হইব না।" অথচ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুসৃত নীতির ফলে

"আমি জানি...
লাক্স টয়লেট্ সাবান আপনার
ত্বক্‌কে আরও মনোরম ক'রে তুলবে"

সুরাইয়া
বলেন

"এই বিশুদ্ধ শুভ্র সাবানটি আমার গায়ে যে সুগন্ধ রেখে যায় তা আমি ভালবাসি।" সুরাইয়া বলেন। "মনোরম গায়ের রং পেতে হোলে আমি যা করি আপনিও তাই করুন—লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে রোজ আপনার ত্বকের যত্ন নিন।"

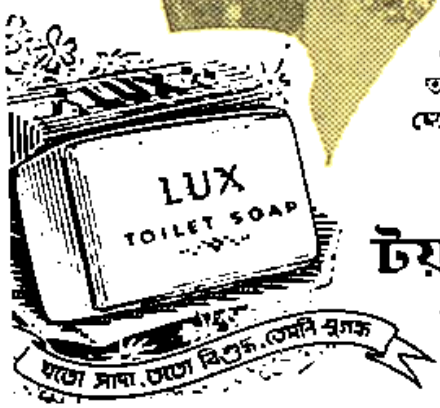

লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের
সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 356-X50 BO

আজ জম্মু, কাশ্মীর ও লাডক যাহাতে রাজ্যের আর সকল অংশ পাকিস্তানের সহিত সম্মিলিত—"আজাদ কাশ্মীর" সরকার পাকিস্তানের পুতুল।

শ্রীপ্রেমনাথ ডগরা অনুচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা আমেরিকার বা রুশিয়ার অনুরক্ত নহেন—তাঁহারা চাহেন সমগ্র জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতভুক্ত হইবে?

যে প্রতিষ্ঠান শেখ আবদুল্লার অধীন ছিল এবং যাহা জাতীয় সম্মিলন নামে অভিহিত—সেই প্রতিষ্ঠান, শেখ আবদুল্লার গ্রেপ্তারের পরেও বলিতেছেন, কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কেবল কয়টি বিষয়ে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য ভারতে যোগ দিবে। সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব (১৫ই সেপ্টেম্বর)—

"We will resist with all the forces the idea of merger."

যদি তাহাই হয়, তবে ভারত সরকার কাশ্মীরের জন্য ভারতীয় নাগরিকদিগের অর্থ ব্যয় করিবেন কেন? এখনও গণভোটের কথাই বলা হইতেছে—কেবল বলা হইতেছে, গণভোট গ্রহণের পূর্ব্বে পাকিস্তানকে রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। গণভোটের কথা উত্থাপিত হয় কেন? মহারাজা হরি সিংহ যখন তাঁহার সমগ্র রাজ্য ভারতভুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তখন সেই আবেদনানুসারে কাজ হয় না কেন? সেজন্য পণ্ডিত জওহরলালই দায়ী।

এ দিকে—অবস্থার মীমাংসা না হইলেও—ভারতসরকার কাশ্মীর রাজ্যে ডাক ও তার প্রভৃতির সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্য যদি ভারতভুক্ত হয়, তবেই তাহার জন্য ভারত সরকারের অর্থব্যয় সমর্থিত হইতে পারে; নহিলে নহে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একদিকে মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ, আর এক দিকে বলিতেছেন, বিদেশীদিগের হস্তক্ষেপ ভারত সরকার সমর্থন করিবেন না। তাঁহার এই দুই প্রকার উক্তিতে সামঞ্জস্য সাধনের উপায় কি?

যতদিন কাশ্মীর-সমস্যা ভারতের পার্লামেণ্টে দলীয় ব্যাপারের বাহিরে স্থাপিত না হইতেছে, অর্থাৎ যতদিন সংখ্যালঘিষ্ঠ দলকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার প্রদান করা না হইতেছে, ততদিন ভারতবাসীর প্রকৃত মনোভাব অর্থাৎ গণমত অনুযায়ী কাজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর নীতি ব্যর্থ হইয়াছে—এখনও কি তিনি গণমত জানিয়া তদনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইবেন?

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী—

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সমিতির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মহিলা এই পদে বৃত হন নাই। কিন্তু শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বলিয়াছেন, তাঁহার মনোনয়ন নারী জাতির প্রতি সম্মান বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন না—মনে করেন, এই নির্ব্বাচন ভারতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন বটে, কিন্তু কোরিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতিদান পাওয়া যায় নাই।

মিশর ও পারস্য—

মিশরের ঘটনার স্রোত: যেন আর বেগে প্রবাহিত হইতেছে না। তথায় নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে আপনাকে দৃঢ় করিবার চেষ্টাই করিতেছেন। সুয়েজ খালের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে, তাহা এখনও অনিশ্চিত। সুদান এখন যাহাই হউক, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে মিশরের অংশই হইবে। কারণ, বর্ত্তমানকালে ঐক্যই বলের উৎস হয়।

পারস্যে রাজচ্যুত ও বন্দী মন্ত্রীর বিচার চলিতেছে। বিচার—বিচার হইবে, কি বিচারের প্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা বলিবার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই। তবে, মনে হয়, পারস্য এখনও—ইংলণ্ডের মত—রাজতন্ত্র-শাসন বর্জ্জন করিবার উপযোগী হয় নাই বা হইতে মনে করিতেছে না। তবে ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ যে তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই বলা যায়। পারস্যে কি হইবে, বুঝা যাইতেছে না।

১০ই আশ্বিন ১৩৬০

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমায় আজি পড়ছে মনে এই ক্ষণে,
চাঁদের আলোয় শিউলি বনে নির্জ্জনে;
নীল আকাশে ছাতছানি দেয় ঘুমপরী;
ধীর বাতাসে জাগ্‌ছে তরু মর্ম্মরি',
দূর-বিহগী একলা ডাকে কোন বনে।

এই যামিনী ছন্দহারা নিঃস্ব,
রিক্ত আজি তোমায় ছাড়া বিশ্ব;
কোথায় তুমি—কোন সুদূরে,
পাই যে তোমায় গানের সুরে,
তোমার সাথে আমার মিলন মনে মনে।

ডালডা

পূজার উৎসবকে আরও মধুময় করে

আর ডালডায় খরচও কত কম!

এবার পূজায় ডালডা বনস্পতি দিয়ে আপনাদের সব খাবার ও মিষ্টান্ন তৈরী করে উৎসবের আনন্দকে আরও মধুময় করুন। ডালডা বনস্পতিতে রান্না প্রত্যেকটি খাবার খেতে চমৎকার! ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো আর এতে খরচও কম। ডালডা বনস্পতিতে রান্না খাবার নিজেরা খেয়ে ও প্রিয়জনকে খাইয়ে এবার পূজার উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করুন। আপনারা আমাদের পূজার প্রীতিসম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

এবার পূজায় নতুন ধরণের মিষ্টান্ন কি করে করা যায়?
জানতে চান তো আজই লিখুন:-
দি ডালডা এ্যাড্‌ভাইসারি সার্ভিস্
পো:, আ:, বক্স নং ৩১১, বোম্বাই ১

ডালডা বনস্পতি

HVM. 193-X52 BG

পিতামহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুরঙ্গমা পলায়ন করে নাই। শাখা-পত্র-বহুল এক বিরাট নরীক্ষহে আরোহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সে আত্ম-বিশ্লেষণে নিরত ছিল। একটি কথাই বিশেষভাবে সে চিন্তা করিতেছিল। এই বয়সে সে আত্মহত্যা দিতে সম্মত হইল কেন? মিশ্রির কথায় সত্যই কি সে বিশ্বাস করিয়াছিল কুমার তাহাকে মুক্তি দিবেন বলিয়া তাহারই ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি সত্যই কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবেন বলিয়াই এমনভাবে ত্যাগ করিতেছেন? মিশ্রির তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন কি না পাইয়া নারী-লোভ-মুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে মিশ্রিদেবকে সহিত রসিকতা করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু এই ভণ্ড পণ্ডিত অতিশয় ধূর্ত, কৌশলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মিশ্রির তাহাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াই সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন কুমারও কি তদ্রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইবেন? কুমারের রহিয়াছে যৌবন, প্রবুদ্ধ কল্পনা, অগাধ ঐশ্বর্য্য, কি ভাবে তাহার স্মৃতিমাত্রে অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবে? সহসা তাহার নিরালার কথা মনে পড়িল। সুরঙ্গমা আসিবার পূর্ব্বে নিরালাই ছিল রাজনর্ত্তকী। সে উদ্যানে আত্মহত্যা করিয়াছিল! কুমার তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নিরালার অপরূপ নৃত্য-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব কণ্ঠ সঙ্গীত কুমারকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কুমার তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন 'ছন্দ-কিন্নরী'। পুরাতন পরিচারিকা শারী তাহাকে বলিয়াছিল নিরালা তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার যেদিন বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন সেই দিনই সে মরিল। সুরঙ্গমার মনে হইল সে-ও যদি মরে কুমার কি তাহাকে মনে রাখিবেন? ছন্দ-কিন্নরীকে কি তিনি মনে রাখিয়াছেন! কই তাহার কথা একদিনও তো সে কুমারের মুখে শোনে নাই। কুমারের আচরণে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণয়ের কথা একবারও তো আভাসিত হয় নাই। পুরুষ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সুরঙ্গমার কি আজও ভ্রান্তি আছে? সে কি জানে না যে পুরুষ মাত্রেই শিশু প্রকৃতির নূতন ক্রীড়নক পাইলেই পুরাতনের কথা বিস্মৃত হয়? তবে সে এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কেন! সত্যই কি মনে তাহার আস্থা আছে? সত্যই কি সে বিশ্বাস করে যে দেবীর যূপকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বিদেহী আত্মা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে? যদি করেই, তাহাতেই বা কি! যে দেহটা লইয়া তাহার কারবার সেই দেহই যদি না থাকে স্বর্গের প্রয়োজন কি! চার্ব্বাকের কথা সহসা মনে হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্ম-প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন চার্ব্বাক যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল। চার্ব্বাকের প্রফুল্ল প্রদীপ্ত নয়ন-যুগল তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফুটিয়া উঠিল যেন। চার্ব্বাকের কথাগুলি আবার যেন সে শুনিতে পাইল—"তুমি যদি সাধারণ কোন নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে মনে হচ্ছে তা নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছ এই ধারণাটা।..." সেদিন সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে বলিয়াছিল, "আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি।" সত্যই কি সে করে? সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে সেও ইহলোক ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না, কখনও করে

নাই। তবে সে চার্ব্বাকের কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল কেন! করিয়াছিল চার্ব্বাককে নিরস্ত করিয়া আরও উতলা করিবার জন্ত। ইশারায় ইঙ্গিতে এই কথাই সে বলিতে চাহিয়াছিল—'তুমি ভাবিয়াছ তোমার বুদ্ধির দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসাইয়া দিবে? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে যুক্তির জাল দিয়া ধরা যায় না। প্রেম-ডোর ছাড়া অন্ত কোনও ডোরে আমাকে বাঁধা সম্ভব নয়। কুমারের প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়াই তাহার কাছে আছি, তাহার চতুরানন বিগ্রহকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। তোমার প্রেমে যদি পড়িতাম তাহা হইলে তোমার নাস্তিক্য-বাদকেও মানিয়া লইতাম। আমার কাছে যুক্তি আস্ফালন বৃথা। আমি জলের মতো। যখন যে পাত্রে থাকি সেই পাত্রের আকার ধারণ করি।' সহসা তাহার নজরে পড়িল ধূপকাষ্ঠটা পোঁতা হইতেছে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ যেন বহিয়া গেল! ওই ধূপকাষ্ঠমূলে সুরঙ্গমা শেষ হইয়া যাইবে? হায়, হায় কেন সে এই সর্ব্বনাশা যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে রাজি হইয়াছিল? কেন? নিগূঢ় কারণটা হঠাৎ সে বুঝিতে পারিল। সে আশা করিয়াছিল কুমার প্রতিবাদ করিবে, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কুমার কিছুতেই এ নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দিবে না। কিন্তু কুমার তো কিছুই করিল না। যজ্ঞের আয়োজন তো মহাসমারোহে চলিতেছে। ওই সিংহটা যেমন কামের প্ররোচনায় বন্দী হইয়াছে সে-ও তেমনি অহঙ্কারের প্ররোচনায় নিজের মৃত্যুকে নিজেই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের কি কোনও ভিত্তি নাই? কুমার কি সত্যই তাহাকে বলিদান দিবেন? মনে হইল পুরুষদের চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈরাগ্য সে লক্ষ্য করিয়াছে যাহা দুর্ভেদ্য, যাহা দুর্ব্বোধ্য, যাহা রহস্যময়,আতঙ্কজনক। অন্যমনস্ক সুন্দরানন্দকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য করিয়াছে। যেন কোন সীমাহীন সাগরে তাহার মন ছিন্ন-বন্ধন তরীর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে তাহার দেহটা, সে নাই। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুরঙ্গমা সকলকে পিছনে ফেলিয়া তাহার মন পাড়ি দিয়াছে অজানার উদ্দেশে। আর একটা কথাও তাহার মনে হইল, পুরুষদের অহঙ্কারও কম নয়। নিজেদের কথার মর্য্যাদা রাখিবার জন্ত তাহারা অপরের সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করে না। মনে পড়িল রামের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা। রাম কি সীতাকে কম ভালবাসিত? তবু বিসর্জ্জন দিয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র কি শৈব্যাকে কম ভালবাসিত? তবু তাহাকে ভিখারিণী করিতে ইতস্তত করে নাই। পুরুষরা সব পারে। শিবি নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, দধীচি অস্থিদান করিয়াছিল। পুরুষদের অসাধ্য কিছু নাই। সহসা চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া বন্দী সিংহটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। পৌরুষের দম্ভ সিংহগর্জ্জনে যেন আত্মপ্রকাশ করিয়া বলিল, ঠিকই বলিয়াছ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও পৌরুষ নিজের মহিমা ঘোষণা করে। জাগ্রত পৌরুষকে কোন মায়া অভিভূত করে না, কোন বন্ধনই বাঁধে না। কোনও বাধা তাহার কাছে দুস্তর নয়, কোনও বিপদ ভয়ঙ্কর নয়। যে পৌরুষ নিজেকে জানিয়াছে সে নির্ভীক, সে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে, পিছন ফিরিয়া চায় না। সুন্দরানন্দের কি এই পৌরুষ জাগ্রত হইয়াছে? সহসা একটা কথা মনে হওয়াতে সুরঙ্গমার চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথ ধরিল। সুন্দরানন্দের এই পৌরুষকেই তো সে ভালবাসিয়াছে। হঠাৎ সেই পৌরুষের আর একটা রূপ দেখিয়া ভয় পাইতেছে কেন! কিন্তু ভয় তাহার করিতেছিল। প্রোথিত ধূপকাষ্ঠটার দিকে আবার সে চাহিয়া দেখিল। নির্ব্বিকার, শুষ্ক প্রাণ-হীন কাষ্ঠ—মানুষ, মহিষ, ছাগ-শিশু তাহার কাছে সব সমান! সহসা সুরঙ্গমা চমকাইয়া উঠিল। শাখা-পত্রের মধ্যে কথা কহিতেছে কে! উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

"বাণী, বৃহদারণ্যক বলে' একটা উপনিষদ আছে জান?"

"জানি। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশই বৃহদারণ্যক। কেন—"

"তাতে একটা মজার কথা আছে। কোন এক ঋষি তাতে আমাকে ক্ষুধা বলে' কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছেন ক্ষুধা মানে মৃত্যু—এবং মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ। অর্থাৎ আমি। তাই বোধহয় এত ক্ষিধে পাচ্ছে আজ। ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মিশ্রিরের সমস্ত ফলগুলো নিঃশেষ করেছি, তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি। মনে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে' ফেলি। সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাক, নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হবে তারপর। চুপ করে' আছ যে—"

"তাই করুন—"

"চার্ব্বাক আর শিখর সেনের ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। করতেই হবে একটা কিছু। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে মনে, মৃত্যুরূপী ক্ষুধা অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরাতনকে গ্রাস করে' ফেলবার জন্যে—"

"এবার স্বৈরচর সৃষ্টিতে মন দেবেন ?"

"কি করব জানি না। উপাদান আর ইচ্ছা দুইই আমার মনের ভিতর আছে। দুটোর সমন্বয়ে কি যে গড়ে' উঠবে তা আমিও জানি না। বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথমে ছিলাম ক্ষুধা, তারপর হল জল, তারপর পৃথিবী তারপর সূর্যনক্ষত্র, তারপর কাল। আমার প্রেরণা যে কি রূপ নেবে তা আমিও জানি না। এখন এই গল্প দুটো শেষ করা যাক। এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই। বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু বাপী, কি খাই বল তো। পক্ষীরূপ তো বড় সাংঘাতিক রূপ, সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে কি খাই কি খাই—"

"বনে অনেক ফল আছে, চলুন খুঁজে দেখা যাক"

"তাই চল"

সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে দেখিল বৃক্ষ শিখর হইতে দুইটি অপরূপ শুকপক্ষী উড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে সে তাহাদের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল অতি শৈশবে মাতামহীর নিকট সে এক রূপকথা শুনিয়াছিল, সে রূপকথায় এক পক্ষীদম্পতী মনুষ্য-ভাষায় কথা কহিত। ইহারাই কি তাহারা ? কি বলিল কিছু বোঝা গেল না তো ! বৃহদারণ্যক কি ? বাণীই বা কে। একটি কথা কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সেই কথাটাই তাহার কানে বাজিতে লাগিল—"এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ওকে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই।" কোন মেয়েটার কথা বলিল উহারা ! তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল কি ? সিংহটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল সহসা। সুরঙ্গমা চাহিয়া দেখিল সিংহটা ঊর্দ্ধমুখে তাহাকেই দেখিতেছে। মনে হইল সে-ও যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে বসিয়া পড়িল এবং সামনের থাবায় মুখটা রাখিয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে এখন একটা ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ—অমন নাগালের বাহিরে বসিয়া আছ কেন। আর একটু নামিয়া এস না। সুরঙ্গমা মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার আমন্ত্রণের উত্তর দিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। খাঁচার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সিংহটাও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উন্মুখ আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, আর গর্জ্জন করিল না, কেবল তাহার কণ্ঠ-স্বর হইতে সম্ভবত তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা গর-গর গর-গর শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মাংস খাবার ইচ্ছে না কি ? আমি কি ভেড়া হরিণের মতো সাধারণ পশু ? কাল রাত্রে তো গান শুনেছ। আজ নাচ দেখবে ? দেখ—" সুরঙ্গমা সিংহের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার কেশ আলুলায়িত হইল, বেশবাস বিস্রস্ত হইল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে নাচিয়া চলিল। উন্মাদিনীর মতো নাচিতে লাগিল। ক্রমশঃ

চলার পথে

শ্রীবীণা দে

কাঁটার মাঝে ফুল ফুটে
রক্ত রাগে
ভুলনা নাই,
ব্যথার মাঝে কামনা টুটে
যে প্রেম জাগে
তারেই চাই।

কথার মাঝে যেটুকু কথা
যায়না বলা
সেই তো বাণী,
পথের মাঝে যেপথে ব্যথা
দুরূহ চলা
তারেই মানি।

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন

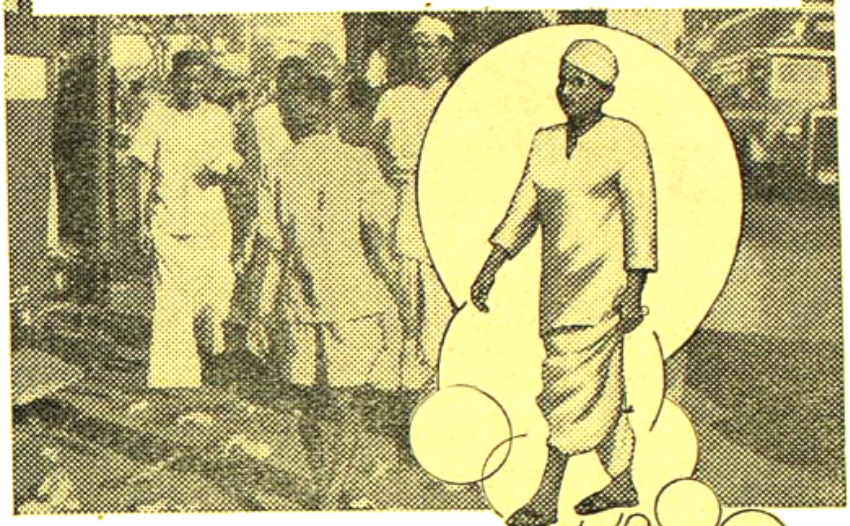

লাইফবয়ের

ফেনার আবরণে

তাতেই কেন ছাঁটাই হোন্ না—প্রতিদিনেই আপনি ধুলোময়লার রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান মেখে নিত্য স্নানের অভ্যাস কোরে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন। লাইফবয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধুলোময়লার রোগবীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ কোরে দেয় ও সারাদিন আপনার ত্বককে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।

L. 230-50 DG

লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১

মনে হয়, এই ত সে-দিনের কথা। এখনও চোখের উপর সে-সব ঘটনা চলচ্চিত্রের মত সজীব হয়ে উঠে। অথচ, হিসাব করলে দেখি, প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে। তখনও কলেজে পড়ি। শরৎচন্দ্রের লেখা—সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি ও আনন্দ আনে। আজও সে-আনন্দের সীমা নেই। শুধু লেখার মধ্যে দিয়ে লেখককে কেমন করে একান্ত আপনার করে নেওয়া যায় শরৎচন্দ্রের পাঠকবর্গের কাছে তা অজানা নয়। এমনি করে সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

তারপর, একদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটল। সেই থেকে তাঁর অতি-নিকটে আসার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। জীবনের স্মৃতি-ভাণ্ডারে সে আমার অমূল্য সম্পদ্। কিন্তু, সে-সব কাহিনী বলবার আজ এ-লেখা নয়।

রবীন্দ্রনাথের লেখা কয়েকখানি পত্র শরৎচন্দ্র আমাকে দিয়েছিলেন। এখনও সে-সব চিঠি আমারই কাছে আছে। আজ সে-চিঠিগুলি এখানে প্রকাশিত হোল, তার একটি শরৎচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র। অপর একখানি শরৎচন্দ্রের লেখা, রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রত্যুত্তর। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় নি। চিঠি দুইখানির বিষয়বস্তু শরৎচন্দ্রের পথের দাবী।

পথের দাবী ধারাবাহিকরূপে 'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২৯, থেকে প্রকাশিত হতে সুরু হয়। পত্রিকাখানি আমাদের বাড়ী থেকেই বা'র হোত। এই উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা-কালেই শরৎচন্দ্র জানতেন যে বইখানি ইংরাজ-রাজ বাজেয়াপ্ত করবেই। লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে সরকারের কুপিত দৃষ্টি প্রকাশকের উপরও পড়বে—এ-আশঙ্কার বিষয়েও তিনি বঙ্গবাণীর পরিচালকদের প্রথমেই সতর্ক করে দেন।

শরৎচন্দ্রের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাসগুলির এমনিতেই এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল। পথের দাবীর ত কথাই নেই। প্রতি মাসে তাঁর নতুন লেখার আশায় পাঠকবর্গ পত্রিকার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকত।

বইখানির শেষ অংশ বঙ্গবাণীর ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যায় বার হয়। কিন্তু, সমাপ্ত হোলেও লেখাটি সে-মাসেও 'ক্রমশঃ' বলে প্রকাশিত হয়েছিল। তার কারণ, উপন্যাসটি বই হ'য়ে ছাপা হোলেই বাজেয়াপ্ত হবে—এ-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। তাই শেষ অংশ বঙ্গবাণীতে প্রকাশ হওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বইখানিও ছাপতে আরম্ভ করা হয়। অথচ, বাইরে সবারই ধারণা থাকে, উপন্যাস তখনও শেষ হয় নি। ১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে বইখানি ছাপা হ'য়ে প্রেস থেকে বার হয়।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর যে-সব প্রসিদ্ধ প্রকাশক ছিলেন, তাঁরা বইখানি প্রকাশ করতে রাজী হন নি। শেষ পর্য্যন্ত, আমিই তার প্রকাশক হই। শরৎচন্দ্র সে-সময় আমাকে বলেন, যদি জেল হয়, কি করবে?

আমি তখনি বলি, হ'লে ত আর একা প্রকাশকের হবে না, লেখকেরও হবে। দুজনে জেলে একসঙ্গে থাকব—আপনার সঙ্গে থাকা,—সে-ত মহা-ভাগ্যের কথা।

শরৎচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন, দেখো, আমার গড়গড়াটা যেন সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি।

দুজনেই খুব হেসেছিলাম সেদিন। কিন্তু জেল হোল না। শুধু বইখানি বাজেয়াপ্তই হোল। অর্থাৎ, বাজেয়াপ্তির হুকুম বেরুল, কিন্তু একখানি মাত্র বই সরকারের হাতে গেল। আর সব বই-ই তখন অদৃশ্য হয়েছে। তার কারণ, ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনের মধ্যেই সব বই কলকাতা সহরের মধ্যে ও বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে রেখে দেওয়া হয়, যা'তে সন্ধানে এলেও সব বইগুলি পুলিসের হাতে না পড়ে। কয়দিনের ভিতর সব বইগুলি বিক্রীও হয়ে গেল। তাই আইনতঃ বই-এর প্রচার বন্ধ হোল। কিন্তু, ছাপা সব বই-ই তখন পাঠকদের হাতে। এদিকে বাঙলার বিপ্লবীদলের উৎসাহে ও উদ্যোগে অজ্ঞাত প্রেস থেকে নূতন সংস্করণ বা'র হয়ে বহু স্থানে বই ছড়িয়ে

পড়ল। তাতে-লেখা সম্পূর্ণ বই-এর কপিও আমি দেখেছি। বাঙলার ঘরে ঘরে পথের দাবী পড়ার বা এক কপি পথের দাবী কাছে পাওয়ার জন্যে সে কি আকুল আগ্রহ!

এমনি সময়ে, রবীন্দ্রনাথকে এক কপি পথের দাবী পাঠানো হয়। শরৎচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, বইখানি বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেন প্রতিবাদ করেন। এ-প্রতিবাদ, বিদেশী শাসকের দ্বারা সাহিত্যের কণ্ঠরোধের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকের প্রতিবাদ। কিন্তু, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা তাঁর চিঠিখানি থেকে প্রকাশ পাবে।

রবীন্দ্রনাথের সে-চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র আমাকে এই পত্রখানি লেখেন :

সামতাবেড়, পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু, বিনু, তোমার চিঠি পেলাম। রক্ত বন্ধ ত হয়ই নি, বরঞ্চ যেন বেশী বেশী পড়চে। যাক্, এ প্রসঙ্গ আর না।

শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেয়েছি। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে ইংরাজের মত ক্ষমাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।

তোমার গল্প পাতাখানেক লিখেই থেমে আছে। আজ আবার আরম্ভ কোরব। কিন্তু কোন কিছুতেই যেন আর মনঃসংযোগ করতে পারচিনে।

B. N. Ry. স্ট্রাইক তেমনিই চলেছে,—কলকাতায় পৌঁছতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা লাগে এবং ফেরা সুকঠিন।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। ইতি ৬ই ফাল্গুন ১৩৩৩

দাদা

তারপরেই আমি সামতাবেড়ে যাই। ফিরে দেখি, শরৎচন্দ্র বিশেষ উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ। তিনি ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা উত্তরও লিখে রেখেছেন ; কিন্তু পাঠান নি। জবাবটি পাঠানো উচিত হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাদের কথা হয়। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানতেন, তাঁকে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি কোরতেন। রবীন্দ্রনাথও অকৃপণ ভাষায় শরৎচন্দ্রের শক্তির ভূয়সী প্রশংসা কোরতেন। তবুও, অনেক বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতের অনৈক্য ছিল। দুঃখের বিষয়, এই মতের অমিল রবীন্দ্রনাথের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এই চিঠির মাত্র কয়েক মাস আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্মতিথির উৎসব সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে এই পত্রখানি লেখেন :

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আজ আমার জন্মদিন। তুমি এলে খুসি হতুম, তুমিও খুসি হও এমন আয়োজনও হয়ত ছিল। আমার মনে হচ্চে তুমি হয়ত এখানকার লোকসমাগমের কাল্পনিক বিভীষিকা একটা মনে মনে রচনা ক'রে তীব্র বিভ্রমের মত পালিয়েচ। তুমি যে আসতে পারনি হয়ত সেটা একটা কারণে ভালোই হয়েচে—এখানে যারা আমাকে নিয়ে এই অনুষ্ঠান করে থাকে তারা আমার অত্যন্ত কাছের লোক—এই জন্য স্বভাবতই বাড়াবাড়ি করে—তোমার অনভ্যস্ত চোখে সেটা হয় তো ভালো না লাগতে পারত, এমন কি, হয় তো ভাবতে যে, আমি এই রকম সম্মান সমাদরের ভূরি ভোজ পছন্দ করি। কথাটা একেবারেই ভুল।

আমি জানতুম শরৎ আসবেন না। হয় ত সেটাও ভালো হয়েছে—কারণ হয় ত প্রত্যেক ছোট বিষয়েই তিনি আমাকে ভুল বুঝতেন, কেন না তাঁর মন বিমুখ হয়েচে। এমন অবস্থায় দেশকালের নৈকট্য ঠিক নয়—এর পরে একদিন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে—জোর করে টানাটানি করা ভুল। খুব সম্ভব আমার প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তাঁর সুর মিলবে না। আজকের দিনে তাই নিয়ে বেজোড়কে জোড়া দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই—কেন না আমার সময় অল্পই বাকি—তাই, যা কিছু হয়ে উঠেছে সেইটেকেই রক্ষা করলেই যথেষ্ট, যা কিছু হতে পারত তাকে সম্ভবপর করে তোলবার মত অধ্যবসায় এখন আর জোগাতে পারব না। ইতি ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

স্নেহাসক্ত—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ-চিঠি শরৎচন্দ্রের কাছেই ছিল এবং পরে তিনি আমাকে এটি দেন। চিঠিখানি আজও আমার কাছে আছে। রবীন্দ্রনাথের এই চিঠির কথাও শরৎচন্দ্র ভুলতে পারেন নি। তাই, পথের দাবী নিয়ে আবার একটা বাদানুবাদের অবান্তি তোলায় তাঁর বিশেষ সঙ্কোচ ছিল। অথচ, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি কাছে রাখাও তাঁর কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তিনি আমাকে বলেন, দেখো, বার বার আমি এ-চিঠিখানি পড়ছি, আর ভাবছি, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও আমাকে লিখতে পারলেন!

অবশেষে, আমি রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও শরৎচন্দ্রের জবাব—দু'টিই কলকাতায় নিয়ে আসি। কথা থাকে, শরৎচন্দ্র তার দুদিন পরে যখন কলকাতায় আসবেন, তখন রবীন্দ্রনাথকে উত্তরটা পাঠানো হবে কিনা সে-বিষয়ে আমাকে জানাবেন।

দু'দিন পরে তিনি এলেনও। তখন অনেকটা শান্ত হয়েছেন। আমাকে বললেন, নাঃ। আর বাদানুবাদের মধ্যে নয়। ও আমার ভালো লাগে না। কবির এ-চিঠির প্রচার হওয়াও ঠিক নয়। আমার চিঠিও পাঠিয়ে দরকার নেই। এ-চিঠি দুখানিই তোমারি কাছে থাক্। কিন্তু কাউকে তুমি এ-গুলি দেখিও না—বিশেষতঃ যতদিন রবীন্দ্রনাথ ও আমি আছি। এ-চিঠির বিষয় নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনাও কোরো না। আমি সম্মতি জানিয়ে তখনি তাঁকে বলেছিলাম যে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কথা রাখব; কিন্তু তিনি নিজে কি এ-চিঠির সম্বন্ধে কাউকে না জানিয়ে থাকতে পারবেন?

হোলও তাই। সপ্তাহখানেকও গেল না। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এসে হাজির। তাঁরা শরৎচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর নিজের মুখেই চিঠির বিষয় শুনে এসেছেন। চিঠি দুখানি আমার কাছে আছে, সে-সংবাদও জেনে এসেছেন। এখন তাঁদের পড়তে দিতেই হবে।

আমি অবশ্য তাঁদের চিঠি দেখতেও দিই নি, পড়েও শোনাই নি। এ-বিষয়ে আলোচনাও করিনি। শুধু তখনি নয়। তারপরও বহুবারই এ-চিঠি দেখার জন্যে অনেকেই এসেছেন, কিন্তু আজ এ-চিঠি প্রকাশ করার আগে পর্য্যন্ত এগুলি কারও কাছে দেখাই নি।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানিতে শরৎচন্দ্র কত গভীর আঘাত পেয়েছিলেন, কয়েক মাস পরে আমাকে-লেখা তাঁর আরেক-খানি চিঠি থেকে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিনু, তোমার চিঠি পেলাম। বঙ্গবাণীতে গিরিজাবাবুর প্রতিবাদ, বিচিত্রায় নরেশবাবুর জবাব এবং শনিবারের চিঠিতে সজনীকান্তর মন্তব্য সবই পড়েছি। নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি ভয় হয়, আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন পাছে আমি ততটা না পেরে উঠি। রবিবাবুর সে চিঠি আমি ভুলতে পারি নি, কোনদিন পারবো বলেও ভরসা হয় না।

তবুও এ কথা তোমার সত্য যে আমারও একটা স্পষ্ট মতামত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, বিশেষতঃ, এই শনিবারের চিঠির পরে। সজনীকান্ত আমার ও তাঁর নিজের মতামতের সঙ্গে অনেকটা জড়িয়ে তুলে যে কথাগুলো লিখেছেন আমি ঠিক ঐ কথাগুলোই বলেছি কিনা স্মরণ করতে পারিনে কিন্তু আমার বাস্তবিক অভিমতের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। এবং একটু বেশি রকমই আছে। আচ্ছা, আমি নিজের একটা অভিমত লিখে তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রকাশ কোরো। আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ভাষাপ্রসাদ কেমন আছে?

ইতি—১০ই ভাদ্র, '৩৩
দাদা

এর পরেই 'সাহিত্যের রীতি ও নীতি'—নামে শরৎচন্দ্রের প্রবন্ধটি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের শেষ অংশে তিনি লেখেন:

"বিশ্বকবির এই সাহিত্য-ধর্ম্মের শেষের দিকটা আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করি। ভাগ্যদোষে আমার প্রতি তিনি

বিরূপ, আমার কথা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাঁহাকে সত্যই নিবেদন করিতেছি যে বাঙলা-সাহিত্য-সেবীদের মাঝে এমন কেহই নাই যে তাঁহাকে মনে মনে গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। আধুনিক সাহিত্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় যাঁহারা তাঁহার কানের কাছে "গুরুদেব" বলিয়া অহরহ বিলাপ করিতেছে তাহাদের কাহারও চেয়েই ইহারা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধায় খাটো নহে।"

পথের দাবী সম্বন্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি নীচে ছাপলাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সব লেখারই কপি রাখতেন। তাই, যদিও মূল চিঠিটি এতদিন আমারই কাছে আছে, শান্তিনিকেতনে রাখা কপিগুলি থেকে এ চিঠি পূর্ব্বে বিশ্ব-ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। লেখকের কর্ত্তব্য হিসাবে সেটা দোষের না হতে পারে—কেন না লেখক যদি ইংরেজ-রাজকে গর্হণীয় মনে করেন তাহলে চুপ করে থাকতে পারেন না। কিন্তু চুপ করে না থাকার যে বিপদ আছে সেটুকু স্বীকার করাই চাই। ইংরেজ-রাজ ক্ষমা করবেন এই জোরের উপরেই ইংরেজ রাজকে আমরা নিন্দা করব সেটাতে পৌরুষ নেই। আমি নানা দেশ ঘুরে এলেম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখ্‌লেম একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশী বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোনো গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনামাত্র—তাতে ইংরেজ রাজ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয় নিজের প্রতি নয়। রাজশক্তির আছে গায়ের জোর, তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের খাতিরে যদি দাঁড়াতেই হয় তাহলে অপর পক্ষে থাকা উচিত চারিত্রিক জোর—অর্থাৎ আঘাতের বিরুদ্ধে সহিষ্ণুতার জোর। কিন্তু আমরা সেই চারিত্রিক জোরটাই ইংরেজ রাজের কাছেই দাবী করি নিজের কাছে নয়। তাতে প্রমাণ হয় যে, মুখে যাই বলি নিজের অগোচরে ইংরেজকে আমরা পূজা করি—ইংরেজকে গাল দিয়ে কোনো শাস্তি প্রত্যাশা না করার দ্বারাই সেই পূজার অনুষ্ঠান। শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখ্‌লে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোনো প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজার দ্বারা এটি হ'ত না। আমরা রাজা হলে যে চলই না সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে? আমি তা বলি নে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চল্‌বে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে সেখানে এমনিই ঘটেছে—রাজবিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না এই কথাটা নিঃসন্দেহ জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজবিরুদ্ধ কথা লিখ্‌তে তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব নিয়ত চল্‌তেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালকবালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত লোকা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।

ইতি ২৭ মাঘ ১৩৩৩ তোমাদের—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎচন্দ্রের উত্তর

(পূর্ব্বেই বলেছি, শরৎচন্দ্রের এ-চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয় নি)

সামতা বেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা, কিন্তু সে

কিছুই নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন তার বিরুদ্ধে আমার অভিমানও নেই অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা' আছে সে সম্বন্ধে আমার দুই একটা প্রশ্নও আছে, বক্তব্যও আছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তখন আমিই যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ, রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চল্‌বেন এ দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং, দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি, এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ থাক্। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি, এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তি ভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা' মুখ বুজেই করি বা অশ্রু-পাত করেই করি, কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে, এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে, গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে এ সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয় তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয় তখন, দুবছর না হয়ে তিন বছর হল কেন এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ ছানা মাখন পায় না ব'লে কিম্বা, মুসলমান কয়েদীরা মোহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্চে, আমরা দুর্গোৎসবের খরচ পাই না কেন এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি Jail authorityরা ঘাসের ব্যবস্থা করে তখন, হয়ত তাদের লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি, কিন্তু ঘাসের জ্বালা কণ্ঠ-রোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্ত্তব্য মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা' বলা উচিত বলে মনে করি, তা বল্‌তে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্য সেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। এ কথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরাজ রাজশক্তির এ বই বাজেয়াপ্ত করবার justification যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে protest করার justificationও তেম্‌নি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের কড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু বাস্তবিক তা' নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে চৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি নিজে বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতাও আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে এ বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই, সেই আমার সান্ত্বনা হোতো। মানুষের ভুল হয়,আমারও ভুল হয়েছেমনে করতাম। আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে এ চিঠি আপনাকে লিখি নি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানা-লাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্ব্বাসনে বসে আছি। অর্থে সামর্থ্যে সময়ে কত যে গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশতঃ এ পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারি নে। ইতি ২রা ফাল্গুন ১৩৩৩।

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রের উত্তর পেলেন না। পথের দাবী নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে আলোচনা এইভাবে সুরু হয়েই থেমে যায়। কিন্তু, তবুও মতের অনৈক্য মনেই পুষ্ট হতে থাকে এবং প্রায় সাত বৎসর পরেও আর একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে এই

চিঠিখানি লেখেন। আশ্চর্য্য লাগে—চিঠিখানি "বিজয়ার অভিবাদন" পত্র!

ওঁ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

শরৎ, কোনো পত্রিকায় দেখলুম তোমার বিশ্বাস যে, উপন্যাস রচনা নিয়ে একটি পত্রে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তাতে তোমার রচনার প্রতিও আমার লক্ষ্য আছে। বোধ করি তোমাকে উত্তেজিত করবার জন্যই কেউ তোমার কাছে এই সঙ্কেত করে থাকবে। তোমার বা দিলীপের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য হওয়াটা আমার নির্লজ্জিতা হতে পারে কিন্তু সেটা আমার অপরাধ নয়। কিন্তু ইঙ্গিতে তোমাকে আক্রমণ করা যদি আমার কোনো লেখার উদ্দেশ্য হয় তবে সেটাকে অপরাধ বলেই স্বীকার করব। আমি এমন কাজ করিনি সে কথা বিশ্বাস করে নিয়ো। তুমি আমাকে বারবার তীব্র ভাষাতেই আক্রমণ করেচ—আমি কোনোদিন তার প্রতিবাদ করিনি এবং কখনই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে তোমাকে নিন্দা করে শোধ তুলি নি। এবারও সেই ক্রমে আর একটি সংখ্যা বাড়ল।—আমার বিজয়ার অভিবাদন—ইতি ১৬ আশ্বিন ১৩৪০

তোমাদের—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য-সাধনার দুইজনই মহান্ তপস্বী। দুইজনেই কত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। পরস্পরের অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে দুইজনেরই কত না গভীর শ্রদ্ধা। তবুও, উভয়ের মধ্যে একি অকরুণ-মনোগত মতভেদ!

সুগন্ধি-পুষ্প-বৃন্তে যেন কণ্টকের মর্ম্মব্যথা।

আজ রবীন্দ্রনাথও নাই, শরৎচন্দ্রও নাই। তাই, এই সব চিঠির অনবদ্য ভাষার মাঝে অপূর্ব্ব সাহিত্য-রসের আস্বাদ পাই, দুঃসহ আঘাতের স্পর্শ বোধ করি না।

কিন্তু, থাক সে-কথা। পথের দাবীর কথা বলেই এ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি।

৪

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩। পথের দাবী বই আকারে তখনও বা'র হয় নি। তবুও, সকলেই জানি, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সরকারের নিষেধাজ্ঞা সুনিশ্চিত।

সামতাবেড়ে গিয়েছি। এর আগেই বঙ্গবাণীর পাতা কেটে পথের দাবীর একটি সম্পূর্ণ ফাইল তৈরি করেছিলাম। বই প্রকাশের জন্যে শরৎচন্দ্র এ-তে সামান্য কোথাও কোথাও পরিবর্ত্তন করেছিলেন। সেই বাঁধানো ফাইলটি তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, 'দিন্, এর উপর কিছু নিজের হাতে লিখে।'

ব্যথা-ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন, লিখ্‌ব আর কি ব'ল? আমি লিখ্‌ব, আর গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করবে। এই ত? পরাধীন দেশে সত্যকার সাহিত্য-সাধনার ব্যথা কম?

তবুও, তাঁর প্রকাণ্ড মোটা ফাউণ্টেন পেন্‌টি হাতে নিয়ে ভাবতে থাকেন।

বলেন, নাঃ। কিছুই লিখ্‌তে পারছি না।

তারপর, ধীরে ধীরে কলম চলতে থাকে। দেখি, প্রথম পাতায় লিখেছেন—মাঝখানে আমার নাম। তার পাশেই তাঁর নিজের নামটি। নীচে তাঁর জন্ম-কুণ্ডলী এঁকেছেন। জন্ম-তারিখ, সময়ও লিখেছেন এবং মৃত্যু লিখে ফাঁক রেখেছেন। পাতার মাথার উপর বাঁকা করে লেখা—

"কিছুই লিখ্‌তে পারলাম না। শরৎ—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে—এই কামনা করি: শ"

খাতার শেষ পাতায় লেখা:

"যে ফুল না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

অস্ফুট স্বরে গানটি গাইতে গাইতে খাতাখানি আমার হাতে দিলেন।

এরও পরের কথা। ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৩। পথের দাবী বই আকারে তার আগের দিন বা'র হয়েছে। শরৎচন্দ্র সে-রাত্রিতে আমাদের ভবানীপুরের বাড়ীতে ছিলেন। দুজনে সারা-রাত জেগেছি। কাছে বসে কত গল্প করেছি, কত গল্প শুনেছি। এখনও কানে তার মূর্চ্ছনা বাজে, প্রাণে তার প্রতিধ্বনি শুনি।

সকালবেলায় নিয়ে এলাম তাঁর কাছে তাঁরি নিজ-হাতে লেখা সম্পূর্ণ পথের দাবীর পাণ্ডুলিপি। তিনি আশ্চর্য্য হলেন। বললেন, এ-সব তুমি রেখে দিয়েছিলে—এখন বয়ে করে? দাও, আমি তোমায় লিখে দিই।

তারপর, তাঁর সুন্দর হরফে লিখে দিলেন প্রথম পাতায় এই কটি কথা—

"বিনু, আমার হাতের লেখা বই এইখানি ছাড়া আর নেই। এ যেন তোমারই কাছে থাকে। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারবো।

দাদা

ভাদ্র, ১৩৩৩"

স্নেহের সেই দান সযত্নে রেখেছি। বার বার নিজে দেখি, সবাইকে দেখাই। কিন্তু জানি, এ তো আমার নিজ-স্ব নয়, এ-যে স্বাধীন ভারতের অমূল্য সম্পদ্। তাই ভাবি, কোথায় রেখে গেলে এটি, আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারি।

কুড়ানো ঘড়ি

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এস-সি

ট্রামে যাইতে যাইতে দেখিলাম আমার বন্ধু উত্তেজিত অবস্থায় থানা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঐ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া কারণ জানিবার জন্য আমি ট্রাম হইতে নামিলাম। তাড়াতাড়ি তাহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে রে অমল? আত্মীয়ের মৃত্যুতেও মানুষের মুখের তো এরূপ চেহারা হয় না।"

সে বলিল "আর বলিস কেন—ছেলে ধাবার হাত থেকে কোন রকমে রেহাই পেয়ে আসছি।"

আমি ভাবিলাম সে কালাবাজারের অসৎপথে মুনাফা লাভের চেষ্টায় ধরা পড়িয়াছে এবং সেইরূপ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছিলাম। সে বোধহয় কিছু আন্দাজ করিতে পারিয়াছিল তাই বলিল "তুই বুঝতে পারছিস না। একটা সোনার ঘড়ি কাল রাত্রিতে আমি রাস্তায় পাই, বরং সেইটা আমি থানায় জমা দিবার জন্য গিয়েছিলাম। আর সেই অপয়া ঘড়িটার জন্য আমার এই দুর্দশা। চল, ঐ চায়ের দোকানে একটু চা খেতে খেতে বলছি—গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে!"

চা খাইতে খাইতে সে যাহা বলিল তাহা এইরূপ :—"আজ সকাল ৯টার সময় ঐ চমৎকার ঘড়িটা লইয়া আমি থানায় যাই এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহিত দেখা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। ভদ্রলোক সবেমাত্র প্রাতরাশ সমাপন করিয়াছেন দেখিলাম—ভদ্রতাসূচক কোন কথা বলা বা বসিতে বলা বোধহয় তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ। গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি চাই হে!' পরোপকারের মনোবৃত্তি লইয়া গিয়াছি তাই আমার মনটা বেশ প্রফুল্লই ছিল। কোন রকম কিছু মনে না করিয়া আমি বলিলাম, 'মহাশয় গত রাত্রিতে রাস্তায় একটি ঘড়ি পাইয়াছি এবং তাহা আপনার নিকট—'

"আমাকে শেষ করিতে না দিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'ঘড়ি! কি ঘড়ি?' পাশের ঘরে অন্যান্য পুলিশরা বোধহয় তাস খেলিতেছিল। তিনি তাহাদের চিৎকার করিয়া বলিলেন—'কোন হায়, দরওয়াজা বন্ধ কর দেও!' একজন আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া গেলে তিনি বলিলেন—'কই, ঘড়িটা দেখি।' আমি ঘড়িটা দেওয়াতে তিনি সেটাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং তারপর গম্ভীরভাবে আমাকে বলিলেন—হাঁ, এটা একটা ঘড়ি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বলিয়া তিনি উহা টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে রাখিয়া চাবি দিয়া দিলেন। আমি আশ্চর্য হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—'কোথায় ঘড়িটা পাওয়া গেল।' আমি বলিলাম —'ঐ সিনেমার সামনে।'

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ফুটপাতের উপর?' আমি ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দেওয়ায় তিনি বলিলেন—'খুবই আশ্চর্যের বিষয়, ফুটপাতটা তো ঘড়ি রাখবার উপযুক্ত স্থান বলে মনে হয় না।' আমি অল্প হাসিয়া বলিলাম, 'আমি তো বলেছি ওটা—' শুষ্ক স্বরে উত্তর আসিল, 'ঠিক আছে, কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, আমার কাজ কি করিয়া করিতে হয় তাহা জানি।' আমি বিস্ময়ে কথা ও হাসি দুইই বন্ধ করিলাম। তিনি বলিলেন—'আচ্ছা তুমি কে? কোথায় থাক? কি করিয়া তোমার দিন চলে?' আমি আমার নাম, কোথায় থাকি এবং ব্যবসায়ে বৎসরে বার হাজার টাকা আয়ের কথাও জানাইলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কখন ঘড়িটা পেয়েছিলে?' 'রাত ১টার সময়।' 'তাহলে রাত্রিটা রোজগারের জন্য পথেই কাটাও, কেমন?'

"আমি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলাম তিনি তাড়াতাড়ি

বলিলেন, 'অত রাত্রিতে ওখানে কি দরকার ছিল?' আমি বলিলাম, 'বাড়ীতে আমার বৌদির প্রসব-বেদনা হওয়াতে ডাক্তার ডাকিতে ও তাঁহার বড় বোনকে আনিতে যাইতেছিলাম।' 'তাই নাকি?' আমি বলিলাম, 'তাই নাকির মানে?' উত্তর আসিল 'যা জিজ্ঞাসা করছি ভাল ছেলের মত উত্তর দাও। আমার কর্ত্তব্য হোল সমস্তর সদুত্তর পাওয়া। ঐ রকম রাত্রে বাড়ী থেকে দেড় মাইল দূরে যাবার কি প্রয়োজন ছিল সেটা প্রমাণ করতে হবে। বড় বোন কি বিবাহিতা?' আমি উত্তর দিলাম—'হাঁ।' 'বিবাহিতা, বেশ তাঁহার স্বামীর নাম কি?' আমি অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর দিলাম—'সে খোঁজে আপনার কোন প্রয়োজন নাই।' তিনি মুখ লাল করিয়া উত্তর দিলেন—'দেখ যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা ভালয় ভালয় উত্তর দাও—মেজাজ দেখিও না। মনে হচ্ছে যেন কোথায় তোমায় দেখেছি।' একটু থেমে বললেন, 'তোমার একবার বিচারে সাজা হয়েছিল না?'

"ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়াছিলাম উত্তর দিলাম—'আপনারও কি হয়েছিল?' হনুমানের মতো লাফাইয়া উঠিলেন তিনি, 'চুপ কর হারামজাদা।' আমি আরও জোরে বলিলাম, 'আপনি একটী নীরেট গাধা।' রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আমার দিকে অগ্রসর হইলেন, দেখিলাম হিংস্র পশুর মত তাঁহার চক্ষু দুটি জ্বলিতেছে মুখে কথা বাহির হইল না। অস্ফুট স্বরে কেবল বলিলেন, 'কি বললি?' আমি ভাবিলাম আমার সব শেষের দিন আসিয়াছে। প্রতিবাদ করিবার সুযোগ না দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন 'তোকে জেলে পাঠাব। আমার মুখের উপর কথা বলার কি শাস্তি তা চিরজীবনের মত মনে থাকিবে। যে আমি আইনের মর্যাদা রক্ষা করি তার প্রতি কুব্যবহার।' টেবিল চাপড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—'নিজের নাম তো বলছিস রাখাল। কে রাখাল? কি প্রমাণ আছে? বার হাজার টাকার আয় কে তোকে বিশ্বাস করে? কই বার কর তো দেখি তোর বার হাজার টাকা।' আমি অবাক হইয়া আছি। তিনি বলিয়া চলিলেন 'আর তুই যে ঘড়ি চুরি করিস নি তার প্রমাণ কি?' 'চুরি করেছি আমি আর জমা দিতে এসেছি আমি, বা!' পুলিশেরা গোলমালে ঘরের ভিতরে আসিয়াছিল, তিনি তাহাদের বলিলেন, 'ইহাকে সার্চ করো।' চক্ষের নিমেষে তাহারা আমাকে উলঙ্গ করিয়া ফেলিল। তবুও ইন্সপেক্টর সাহেব বলিতে লাগিলেন 'ভাল করিয়া দেখ, ভাল করিয়া দেখ।' একঘণ্টা অমানুষিক অত্যাচারের পর ছাড়িয়া দিয়াছে।"

আমি স্তব্ধ হইয়া দেশের আইন ও আইন-রক্ষকের কথা ভাবিতে লাগিলাম। *

* ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

মহালয়া

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

বন্দি তোরে মহালয়া যুক্তবেণী দ্বিধারা সঙ্গম,
মনোরাজ্যে দেহরাজ্যে বন্ধনের তিথি মহোত্তম।
ধ্যানলোকে মূর্ত্ত তুই ঋষির মানসী মহালয়া,
আসিয়াছে দ্বারে তোর জন্মমৃত্যু শঙ্খ বাজাইয়া—
জীবনের মন্ত্র পড়ি'। এ সৃষ্টির চৈতন্যের তলে
মূর্ত্তি ধরি মহাদেবী আসে ঐ ব্যাপি জলে স্থলে।
তাঁরি আগমনী বহি' তারা তাই গাহে শঙ্খে গান,
শরতের ছন্দিপদ্মে বিশ্বমাতা করে পদদান।
মৃন্ময়ী মাতার তুই ভুলাইলি সর্ব তাপ গ্লানি,
জন্মমৃত্যুহীন দেহে তোর স্পর্শে তার বক্ষখানি,
দেব ব্রহ্মে ধন্য আজি। গাহি জীবনের জয়গান,
এ সৃষ্টির মহাদিনে পুত্রেরে গৌরব করি দান।
তুই দেবী জেগে ওঠ্ পিতৃলোকে খুলে গেছে দ্বার,
দেবযানে পিতৃযানে তোর পথ আজি একাকার!
সপ্তর্ষি জেগেছে আজ অরুন্ধতী দৃষ্টি মেলে নীচে,
সর্বগ্রহ ছায়াপথ কায়া মাগে তোর পিছে পিছে।
মৃন্ময় জীবনে অরি বন্দী করা চিন্ময়ীর স্নেহ,
সর্বলোকে বাঁধি দেহে তুই আজ অমৃতের গেহ।
শারদার-তীর্থ তুই স্বর্গমর্ত্ত মিলনের দ্বার,
পর্বের পার্বণ গেহ মহালয়া নরদেবতার।

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট
সাবানের মৌলতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
B. 252-50 BG

হিমাচল পথে

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্তী

হরিদ্বার হচ্ছে বৈকুণ্ঠের দ্বার। এই স্থানের গঙ্গাতীরে পঞ্চ পাণ্ডব স্নান করে যাত্রা করেছিলেন মহাপ্রস্থানের পথে। তাঁদের চরণচিহ্নকে বলা হয় 'হর কি পৌড়ী'—যে স্থানে তাঁরা স্নান করেছিলেন তার নাম হয়েছে "ব্রহ্মকুণ্ড"। অবশ্যি অন্য ধর্মাবলম্বীরা এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মকুণ্ডের দৃশ্য এক অপূর্ব। এই কুণ্ডের ঘাট তৈরী হয়েছে হরিদ্বারের রাজপথ থেকে গঙ্গাতীর অবধি। কুণ্ডের জলকে বন্ধ করা হয়েছে অপর পারে গঙ্গার মধ্যভাগে এক প্রকাণ্ড চড়র তৈরী করে এবং সেই অংশকে সংযোগ করা হয়েছে উটচুনির সঙ্গে—দু'দিকে দু'টি পাকা পুলের দ্বারা। এই বিপুল জলরাশির স্রোতের বেগ প্রশমিত করা হয়েছে উত্তরাংশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড সংযোজনে সুদৃঢ়ীকৃত করে। নানাদিকের প্রবল স্রোত হতে রক্ষা করতে দক্ষিণ দিকের পুলে তোলার হয়েছে লোহার শিকল। ব্রহ্মকুণ্ডে অসংখ্য মাছ—নানান্ রাঙ্গার খেলনে ছুটে আসে তারা। কুণ্ডের ঘাটে আছে গঙ্গা, গায়ত্রী, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মীনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির। প্রত্যূষে ও সায়াহ্নে এই ঘাটে পুণ্যার্থীদের গঙ্গারতির "আরতি" একটি দর্শনীয় বস্তু। অসংখ্য দীপশিখার সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টার শব্দ ও স্তোত্রপাঠ মনে এক অপূর্ব ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে। ব্রহ্মকুণ্ড বা 'হর কি পৌড়ী' ঘাট পূর্বে ছোট ছিল, বর্তমানে প্রসারিত হয়েছে এবং উত্তর দিকের ঘাট ও পুল সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত ঘাটের চত্বরে গঙ্গার উপরে বিড়লাজী প্রস্তুত করেছেন এক প্রকাণ্ড ঘড়ি-ঘর। এই ঘড়ি-ঘর বা ক্লক-টাওয়ার 'হর কি পৌড়ী'র শোভা বর্ধন করেছে।

ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারে আছে নীল পর্বত—তার পাদ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নীল গঙ্গা। এই নীল পর্বতের উচ্চ শিখরে অবস্থিত আছে বিখ্যাত 'চণ্ডীদেবীর' প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরে উঠিবার রাস্তা খুব প্রস্তরময় ও চার মাইলের পথ। এখানকার অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে রাজা মানসিংহের চিত্তাকর্ষক ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করে গঙ্গাকে নির্মিত "মানসিংহ কি ছত্রী", বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দির ও জীমগোদা।

হরিদ্বার হতে দুই মাইল দূরে গঙ্গার পূর্বতীরে কনখল। কিম্বদন্তি এই কনখল বা অরণ্যাবতী ছিল দক্ষপ্রজাপতি মহারাজার রাজধানী ও বাসস্থান। এর পূর্বাংশে নীলধারা ভাগিরথী! বর্তমানে সামান্য জলরেখায় পরিণত হয়েছে। পুরাকালে যে এই নীলধারা ভাগিরথী বিপুলা ছিলেন তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বিরাট বৈকুণ্ঠ ভূমি ও ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতীর উপর প্রকাণ্ড সোপানশ্রেণী। এই স্থানে আছে এক প্রাসাদোপম বাড়ীর প্রাচীর, কিন্তু তার পুরাকীর্তি ও গঙ্গাবক্ষের ধ্বংসোন্মুখ ঘাট। স্থানীয় লোকেরা বলে এই চত্বরে দক্ষপ্রজাপতির প্রাসাদ ও ঘাট। তার প্রাসাদের দক্ষিণাংশে আছে এক কুড়ার কুণ্ড—নাম তার সতীকুণ্ড। এইস্থানে নাকি পতিনিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলেন দক্ষপ্রজাপতি কন্যা সতী। সেই সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন মহাকাল মহাদেব রুদ্রমূর্তিতে—তিনি ধ্বংস করলেন দক্ষপ্রজাপতিকে, হল দক্ষপ্রজাপতির যজ্ঞ ধ্বংস, হল তার গর্বচূর্ণ দেবাদিদেব মহাদেবকে অবজ্ঞা করার পাপে। তারপর সতীদেহ কাঁধে করে মহাকাল ধ্বংস করতে উদ্যত হলেন সমস্ত বিশ্ব। স্বয়ং বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্রে খণ্ডিত করলেন সতীদেহ ৫১ অংশে—সতীর সেই বিচ্ছিন্ন দেহাংশের পুণ্য স্পর্শে সমগ্র ভারতে একান্ন পীঠস্থান গড়ে উঠলো। কনখলের আরাধ্য হলেন আশুতোষ—ত্রিলোক রক্ষা পেল ধ্বংসের মুখ থেকে। এখানে আছে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির। সরওয়ামি মাসের প্রতি সোমবার এখানে বসে এক বিরাট মেলা।

এই পুণ্যতীর্থের অনতিদূরে আছে এক সনাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়" নামে পরিচিত। শহীদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী ১৯০২ সনে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করেন কনখলে। তাঁর স্বপ্ন সিদ্ধ হয়েছে স্বাধীন ভারতে। আজ এই বিশ্ববিদ্যালয় বিরাট শিক্ষানিকেতনরূপে পরিণত হয়েছে। এখানে বেদ বেদান্ত উপনিষদ দর্শন ব্যাকরণ নিরুক্ত প্রভৃতি শাস্ত্রাভ্যাসের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞান প্রভৃতি ও ইংরেজী শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে অতি অল্প বয়সের বালকদের ভর্তি করা হয় এবং তাদের বাস করতে হয় সংলগ্ন ছোয়েসে—প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বিদ্যাভ্যাসের আবহাওয়ার পরিস্থিতে। এখানকার উপাধী পরীক্ষার ডিগ্রী হচ্ছে "বিদ্যাবাচস্পতি" বেদ-বাচস্পতি, আয়ুর্বেদ বাচস্পতি ইত্যাদি। প্রায় এক মাইল ব্যাপী এক ভূখণ্ডের উপর বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত হয়েছে ছাত্রাবাস, বিদ্যামন্দির, হাসপাতাল, আয়ুর্বেদ-ঔষধাগার, শিক্ষকদের কোয়ার্টার, খেলার মাঠ, প্রভৃতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগণে বিড়লাজী নির্মাণ করেছেন এক বিরাট 'বেদমন্দির' গৃহ। এর নীচের তলায় আছে একাংশে বেদ পাঠকের বেদী ও অবশিষ্ট স্থান এক বিরাট হল, প্রোত্রাগণের বসবার স্থান। দ্বিতলে স্থাপিত হয়েছে এক প্রকাণ্ড মিউজিয়াম—সেখানে রক্ষিত আছে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, শিলালিপি, পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন রাজ্যের প্রাচীন মুদ্রা ও আরো কত কি। এখানে আমরা দেখলাম প্রাচীন তুলট কাগজে হাতে লেখা তুলসীদাসী রামায়ণ ও কাশ্মীররাজবংশের মহাভারত এবং মোঘলবংশের মুদ্রা।

হরিদ্বার থেকে ১৪ মাইল উত্তরে হৃষিকেশ। হৃষিকেশ পর্যন্ত সুন্দর বাঁধান মটরের রাস্তা আছে এবং মটর বাসে অথবা মটর কারে যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে। এ রাস্তায় দুইটি পুল পার হতে হয়—মনীর মাল সুরক্ষা ও সং নদী এবং রাস্তার দুই পাশে বিরাট জংগল। এখানে একটি 'অরেষ্ট অফিস' আছে—প্রতি যাত্রীকে ।৷০ আনা হিসাবে টোল

দিনে দিনে আরও নির্ম্মল,
আরও মনোরম ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন

রেক্সোনার ক্যাডিল্‌যুক্ত ফেনা আপনার গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো নির্ম্মল হ'য়ে উঠছে।

রেক্সোনা

ক্যাডিল্‌যুক্ত একমাত্র সাবান

• ত্বক্‌পোষক ও কোমলতাপ্রদ কতকগুলি তৈলের বিশেষ সংমিশ্রণের এক যাদিকাঠী বাধ

B.P. 100-X30 BG

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিঃএর তরফ থেকে ভারতে প্রস্তুত

দিয়ে হত এই রাস্তায় যানবাহনে যেতে হলে। হৃষিকেশ পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে অবস্থিত, কিন্তু এখানকার লোকেরা বলে এখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে পুণ্যতোয়া যমুনা ও সরস্বতী। হৃষিকেশের ঘাটের দুই পাশ থেকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হচ্ছে কৃষ্ণবর্ণা দুইটি জলধারা—এই দুই জলধারাই নাকি যমুনা এবং সরস্বতী। এই ঘাটে স্নান, তর্পণ—প্রশস্ত ও পুণ্যজনক। এই ঘাটের পশ্চিমাংশে "অমৃতকুণ্ড"—এই কুণ্ডের জল অতি পবিত্র। এই কুণ্ডের পাশে আছে শঙ্কর মন্দির ও শ্রীরাম মন্দির। এখানকার ঘাট থেকে সুস্থাস্ত একটি মনোরম দৃশ্য। হৃষিকেশের প্রধান মন্দির হচ্ছে "ভরতমন্দির"—এই পুণ্য শৈলশিখরে নাকি ভরতজী তপস্যা করেছিলেন বহুকাল। হৃষিকেশে ও কালী কমলী-ওয়ালার ধর্মশালা এবং অতিথিশালা আছে। এখানে সদাও আছে, প্রত্যহ অসংখ্য সাধু ও অতিথিদের আহার্য বিতরণ করা হয়।

হৃষিকেশ থেকে তিন মাইল পূর্ব-উত্তর দিকে হিমাচলের আরো উচ্চ শিখরে লছমন ঝোলা। এর পূর্ব দিকে অবস্থিতা মণিকূট পর্বত আর হৃষিকেশকে বলে মণিকূট পর্বত—মহাস্থানের পর্বত শিখরকে বলে লছমন ঝোলা বা স্বর্গের দ্বার। এখানে লছমনজী ২১১ বৎসর তপস্যা করেছিলেন "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র এবং মহামুনি অগস্ত্য, বিশ্বামিত্র ও শঙ্করাচার্য প্রভৃতি ঋষিগণ তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন এখানে। এই পর্বত গাত্রের একাংশে আছে "লছমনজী'র মন্দির—শঙ্করাচার্য নাকি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তপস্যান্তে। এখানকার মোহান্ত একটি মন্ত্র পাঠ করলেন :

প্রাপ্ত ত্রাকঃ তথ রামে বিহরতে মনস্করে
লক্ষ্মণেন তপস্তপ্তং লছমন লছমন নিহতঃ নীত

এই মন্দিরের পাশে আছে বাঁধান ঘাট—তীর্থযাত্রীদের স্নান ও তর্পণের জন্য। এখানকার পূজা আহ্নিকে কুসংস্কার থাকলেও খুব গভীর। মন্দিরের নিকটবর্তী গঙ্গাপার হবার জন্য বর্তমানে নির্মিত হয়েছে লৌহ-পুল—গঙ্গার দুই পাড়ে লোহার শিকল দিয়ে ঝুলান হয়েছে পুল—নীচে কোন পিলার নাই; তাই ঘাতায়াতের সময় পুলটি দোলে—সেই জন্যে পুলের নাম হয়েছে লছমনঝুলা। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী রায়বাহাদুর পেয়ারে মুরলীধর এই পুলের ব্যয় বহন করে যাত্রীদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা অর্জন করেছেন।

পুলটি পার হলে বামদিকে যে রাস্তা গিয়েছে সেইটি হচ্ছে কেদার-বদরীনারায়ণ যাবার পুরাতন পায়ে হেঁটে যাবার রাস্তা ও ডানদিকে স্বর্গাশ্রম যাবার পথ গঙ্গার তীর দিয়ে। এই পুল পার হলে বদরীনারায়ণ ১৪৮½ মাইল। এ রাস্তার মুখেই আছে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, মন্দির ও ধর্মশালা। আর পূর্বদিকে গেলে আকাশচুম্বী পর্বতমালা বিরাজমান—তার পর গঙ্গার তীর দিয়া চলতে চলতে সেই বিরাট পর্বতমালা পড়বে ডানদিকে, আর তার সমতল ভূভাগে কোথাও ছোট ছোট মন্দির। আর গঙ্গাতীরে ও পর্বতের পাদদেশে অসংখ্য কুটীর শ্রেণী—সাধুবাবাদের আশ্রম। স্থানীয় লোকেরা বলল—উর্ধ্বে পর্বত গাত্রে নাকি অসংখ্য গুহা আছে—আর গুহায় গহ্বরে যোগাবিষ্ট আছেন অসংখ্য মুনী, কিন্তু সে সব স্থানে যাবার রাস্তা নাই—পর্বত গাত্র ধরে সেই উচ্চ পর্বতে ওঠা বিপদ-সংকুল। এই পর্বতশ্রেণীর নাম মণিকূট পর্বত—আর গঙ্গার তীরবর্তী সমতল ভূমিকে বলে ধর্মধার। এই সমতল ভূমির উপরে প্রশস্ত রাস্তা চলে গেছে কালীকমলীওয়ালের আশ্রম পর্যন্ত—কালীকমলীওয়ালেই এ পথ নির্মাণ করিয়েছেন। রাস্তার দুধারে আছে ফলবান বৃক্ষশ্রেণী—অধিকাংশই আম গাছ। রাস্তার উপরে অবস্থিত এক সাধুর আশ্রমে প্রবেশ করেছিলাম কৌতূহলবশে। আশ্রমটি বেশ মনোরম—। খানাদানি পাকা, সামনে একটি বারান্দা—সেখানে সাধু বসেছিলেন—তিনি বড় সহকারে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে একটি মাদুর বসতে নির্দেশ করলেন। আমার নাবালী স্ত্রীর আদরকী চাওয়ায় তাকে বললেন যত খুসী কুড়িয়ে নিতে। আমরা সাধুকে প্রণাম করে দুই একটি মামুলী প্রশ্ন করলাম—কিন্তু তার উত্তর আমাদের হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাল না। সাধুর বিছানার দশারী খাটানো ও ঘরে দেখলাম চায়ের সরঞ্জাম। সব কথাকেও বলতে পড়েছিল।

ইহারই অনতিদূরে কালীকমলীওয়ালের আশ্রম। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী আত্মপ্রকাশজী—সাধারণভাবে লোকমুখে তাঁর নাম কালী-কমলীওয়ালে। ইনি একাধারে কর্মী ও সাধক। তিনি নিজের অধিপ্রায় চেষ্টা ও উদ্যমে এক বিরাট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন এই হিমাচল দেশে। এই বিরাট আশ্রমে আছে এক বিরাট অতিথিশালা—যেখানে প্রত্যহ আহার্য পান অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও দুঃস্থ ব্যক্তি। প্রত্যহ প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় ঘণ্টা মিনারের সংগে সমবেত হয় অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ও অতিথির দল—তাঁরা প্রত্যেকেই পান কিছু ফল ও ভরকারী। অসমর্থ সাধুদের আশ্রমে পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁদের আহার্য। তিনি পরদেশে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অর্থ সংগ্রহ করে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন এই পবিত্র আশ্রম—তপোবন। তাঁরই চেষ্টায় এখানে নির্মিত হয়েছে গীতা ভবন, শঙ্করজীর মন্দির ও গঙ্গার উপরে বিরাট বাঁধান ঘাট। ঘাট থেকে ঝিরা মাধুরে পারাপার করা হয় দর্শকদের অপর পারে শ্রীরাম ঘাটে। এই স্থানের দৃশ্য পরম রমণীয়—মনে স্মরণ করিয়ে দেয় পুরাকালের মুনিঋষিদের আশ্রমের কথা।

স্বাস্থ্য ও জীবন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলম্যান)

ইংরেজীতে একটি বড় সুন্দর কথা আছে 'Health is wealth' (স্বাস্থ্যই সম্পদ)। মানুষ তার জীবনে যেমন সম্পদ কামনা করে, স্বাস্থ্যও তেমনি তার কাম্য। সম্পদ সে চায় বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে সুখী-জীবনের দোরাক যোগাবার জন্য, নিজকে এবং পরিবারকে অর্থনৈতিক সমস্যা থেকে রক্ষা করার জন্য, তাই মানুষ করে জীবনবীমা। স্বাস্থ্যও তেমনি মানুষকে তার বর্ত্তমানেই সুখী করে না—সভাব মিটিয়ে ভবিষ্যতের

শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক (ষ্টীলম্যান)।
ব্যায়াম শিক্ষক, সিটি কলেজ ও রামমোহন রায় হোষ্টেল।

ফটো : কল ইণ্ডিয়া

ঠক সঞ্চিত রক্তও যেমন দূষিত রক্তের বাসস্থানের দোষ করে, তেমনি সঞ্চিত স্বাস্থ্যও দূষিত স্বাস্থ্যের বাসস্থানের পাত্র। তাই যেন যার স্বাস্থ্যবান শিশু ও সন্তানই মাতার সন্তান সন্ততিও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

স্বাস্থ্য কাকে বলে ?

আমরা কথায় বলি, "আমরা ভাল আছে কি"—"কিংবা মন্দ আছেনা।" কিন্তু স্বাস্থ্য শব্দটির মৌলিক অর্থ এভাবে হয় না। স্বাস্থ্য শব্দটির অর্থ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। যে অবস্থায় মানুষের দেহ ও মন সুস্থ থাকে, সে অবস্থাটিকে বলে স্বাস্থ্য। আরও সহজ কথায়—শরীরের সুস্থ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। কিন্তু আমরা মৌলিকভাবে স্বাস্থ্য শব্দটিকে শরীর এই অর্থে ব্যবহার করি।

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন

ধর্ম্মের জন্য, অর্থ, কাম, মোক্ষ যেমন করে অর্জন করতে হয়, স্বাস্থ্যও তেমনি করে অর্জন করতে হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবগুলির জন্য সাধনার প্রয়োজন। স্বাস্থ্যও তেমনি অর্জন করতে হয় সাধনার ভেতর দিয়ে। সুতরাং সাধনার জন্য যেমন বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার দরকার হয়—তেমনই স্বাস্থ্যের জন্যও ব্যায়ামাগারএর প্রয়োজন হয়। ব্যায়াম ঐ স্থানের আবহাওয়াতেই মনের ভিতর ব্যায়ামের প্রেরণা এনে দেয়। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন হয়, তা হোলো উপযুক্ত ব্যায়াম-শিক্ষকের, প্রেরণা ও উপদেশ দেওয়ার জন্য। আমার মনে হয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষেরও অনেক উপরে স্বাস্থ্য। কেননা উপরোক্ত চারিটি জিনিষের প্রাপ্তি নির্ভর করে স্বাস্থ্যের উপর। শরীর যদি সুস্থ না থাকে, তবে পৃথিবীটা নিরর্থক বলে মনে হয়। ধর্ম্মই বলুন, কাম অথবা মোক্ষ সবই যেন অর্থহীন মনে হয়। আবার মনের সঙ্গে শরীরের নিকট সম্পর্ক। শরীর সুস্থ হলে মনের উৎসাহ উদ্যম লোপ পাবে। কাজেই স্বাস্থ্যের সাধনা সকল সাধনার গোড়ার কথা। জগতে যত বড় কাজ দেখবে, কি যোদ্ধা—কি পুরী সকলেরই স্বাস্থ্যের সমান প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য সাধনার উপায়

তাহলে স্বাস্থ্য সাধনার উপায় কি ? এ সম্বন্ধে প্রথম এবং প্রধান কথা উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ ও রীতিমত ব্যায়াম করা। যা কিছু আমরা খাই, তাই খাদ্য নয়। আমাদের দেহের নব নব ক্ষয় সাধন হচ্ছে। এই ক্ষয় ক্রিয়া অতি গোপনে আমাদের বিশ্রামের মুহূর্ত্তেও চলে। সেই ক্ষয় পূরণের জন্য এবং দেহের পুষ্টি সাধনের জন্য যে সমস্ত খাদ্যোপাদান আমাদের প্রয়োজন তাকেই বলা হয় খাদ্য। শুধু মাত্র উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করলেই আমাদের খাদ্যচর্চ্চা শেষ হয়ে গেল মনে করলে ভুল হবে। স্বাস্থ্যচর্চ্চার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত এবং নিয়মিত ব্যায়াম। তাহলে ব্যায়ামের দুটি উদ্দেশ্য—প্রথম উদ্দেশ্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, দ্বিতীয় দেহে আমাদের বল বৃদ্ধি। তবে ব্যায়ামটি নিয়মিত হওয়াই প্রয়োজন। নিয়মিত ও পরিমিত ব্যায়ামে দেহ ও মন সবল থাকে। আবার এই ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া উচিত। বিশৃঙ্খলভাবে বা ইচ্ছামত অঙ্গচালনা করাকে ব্যায়াম বলে না। ব্যায়ামের আরেক উদ্দেশ্য দেহের শ্রী সম্পাদন করা। কিন্তু ইচ্ছামত অঙ্গচালনা করলে দেহের শ্রী নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তাই যাঁরা ব্যায়াম করবেন তাঁরা যেন উপযুক্ত ব্যায়ামের অধ্যাপকের কাছে উপদেশ বা শিক্ষা নেন। অবশ্য বিশেষে কোন দক্ষ ব্যায়াম-শিক্ষকের নির্দ্দিষ্ট অঙ্গচালনার চিত্র দেখে ব্যায়ামাভ্যাস করাও চলে। কিন্তু সাবধান যেন ভুল না হয়।

খাদ্য গ্রহণ সম্পর্কে আরও একটু বলা ভাল। কোন কোন দ্রব্যে কি পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন আছে তা জানা প্রয়োজন। সাধারণতঃ বাসি কিংবা পচা জিনিস খাওয়া অনুচিত। সবুজ টাটকা জিনিস খাওয়া শরীরের পক্ষে হিতকর। তার চেয়ে আরও একটি জিনিস বড় বেশী প্রয়োজন—সে হচ্ছে শুদ্ধ বায়ু সেবন। টাটকা খাদ্যের মত এরও প্রয়োজনীয়তা অনেক। আরও একটি কথা বলা আবশ্যক সেটি হচ্ছে সংযম—যা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের মধ্যে ছিল। পুরাকালে এক একজন মানুষের জীবনকাল কত দীর্ঘ ছিল, আজ তার চেয়ে অনেক কম দিন মানুষ বাঁচে। কিন্তু কেন ? উত্তরে বলা যায়, আমরা খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পাচ্ছি না। ব্যায়াম করলেও যুক্ত যথাযথ পাচ্ছি কম। সর্ব্বোপরি হারিয়েছি সেই আর্য্য ঋষিদের শান্ত সমাহিত সংযত জীবন। এই কয়টি জিনিষের প্রতি লক্ষ্য রাখলে আবার সুস্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারি।

বাঙালী একদিনে স্বাস্থ্য ও শক্তিতে ছিল অপরাজেয়, তখন বাংলার ঘরে ঘরে ছিল অন্ন, ছিল দুগ্ধ, ছিল টাটকা শুশ্রূষাকারী—আর গ্রামে গ্রামে ছিল ব্যায়ামের আখড়া। সেদিন বাঙ্গালী জীবন সংগ্রামে পিছপা হয় নি। কিন্তু আজ জীবনসংগ্রামে প্রতিপদে পরাজিত। তার কারণ বাঙালী তার দেহচর্চ্চার প্রতি করেছে অবহেলা, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি দেখিয়েছে একান্ত ঔদাসীন্য। যার স্বাস্থ্য নেই তার সম্পদও নেই ; সে রিক্ত, সে নিঃস্ব। বাঙালী আজ তাই রিক্ত, বাঙালী আজ তাই নিঃস্ব। আজ তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমরা বাঁচবো মানুষের মত, পৃথিবীর মাঝে অধিকার করবো শীর্ষস্থান।

মহাপুরুষদের বাণীতে শুনা যায়, কঠোর সাধনা করে এবং অনেক বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে তবে সিদ্ধিলাভ করা যায়। ব্যায়াম সাধনাও ঠিক সেই রকম। প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করলে, অনেক বাধা বিঘ্ন আসবে। সে বাধা জোর করে কাটাতে হবে, যেমন এই ধরণের বাধা প্রায় সবারই দেখা যায়—প্রথম ব্যায়াম আরম্ভ করলে ব্যায়ামবিদ বন্ধুদের কাছে শুনতে হয় নেগেটিভ বাণী। আবার ব্যায়ামের সময়টা বন্ধুবান্ধবদের পাল্লায় পড়ে অনেক সময় কাটাতে হয় আড্ডায়, সিনেমায় বা অন্য কোনও অস্বাস্থ্যকর জায়গায়। এই সব নানা বাধা উপেক্ষা করেও যদি বা ব্যায়াম আরম্ভ করা যায় ও কিছুদিন পরে বাধা আসে নিজের মনের

দিক থেকে। মনে হয়েছিল হয়ত দুচার দিন ব্যায়াম করেই, স্বাস্থ্য ভাল করে ফেলব। কিন্তু তা যখন হয় না, তখন মন যায় ভেঙ্গে। ফলে দশ দিনের পর আর কোনো উৎসাহ থাকে না। কাজেই প্রথমে দরকার ধৈর্য। অধৈর্য হলে চলবে না এবং ব্যায়াম প্রথম আরম্ভ করলেই স্বাস্থ্য ভাল হয় না। কারণ ব্যায়ামের আগে শরীর যে নিয়মে চলছিল সে নিয়মটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল না। শরীর (Rocaty) রোগা ছিল। ব্যায়ামের সাথে সাথে শরীরে রক্ত চলাচলের জন্য যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র দুর্বল বা খারাপ ছিল বলে সুস্বাস্থ্য ছিল না, প্রথম তেতরকার সেই সমস্ত যন্ত্রগুলি পুষ্ট ও সবল হয়। এর কিছুদিন পর স্বাস্থ্য ভাল হতে আরম্ভ করে। তখন ব্যায়াম করেও আনন্দ পাওয়া যায়। আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে, ব্যায়াম করার পর স্বাস্থ্য ভাল হবেই। তখন যে সমস্ত বন্ধুদের কাছ থেকে নিন্দা বা আঘাত এসেছিল তারাই বলবে "নারে, তোর স্বাস্থ্য ত খুবই ভাল হয়েছে—কোথায় ব্যায়াম করিস বল্ ত? আমাকে সেখানে নিয়ে চল্।"

এ কথা আমার নিজের কানে শোনা।

ব্যায়াম করার বয়স

একটা প্রবাদ আছে—দাঁত থাকতে দাঁতের প্রয়োজনীয়তা কেউ বোঝে না। সেইরূপ যৌবনে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেকে মানে না। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় ভুলে যায় তারা ভবিষ্যৎ জীবনের বার্দ্ধক্যের সেই জরা-ব্যাধিগ্রস্ত জীর্ণ দেহের কথা। ছুটে বেড়ায় তারা অলীক মোহের পিছু, অধিকের মনের শান্তির জন্য, রোগা দুর্বল শরীর নিয়ে। তার ফলে, তার যেটুকু আছে, তাও নষ্ট হয়ে যায় অত্যাচারে, অনিয়মে। তারা ভুলে যায় আনন্দ পেতে হলে, সুখ পেতে হলে চাই সুস্বাস্থ্য। সুস্বাস্থ্য না হলে সেই আনন্দ, সেই সুখ হয় অত্যাচারে পরিণত; ফলে আসে অকাল-বার্দ্ধক্য। মনে হয় সবই আছে—অথচ কিছুই নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে। এমন অবস্থায় হাত পা গুটিয়ে, অন্ধ হয়ে ঘরে বসে থাকতে দেখেছি অনেককে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে এও বলতে শুনেছি—"হায় হায় যৌবনের প্রথমে কি অত্যাচারই করেছি! ভগবান আজ তারই শাস্তি দিচ্ছেন।"

মানুষের যৌবন হোলো সত্যিকার পরীক্ষার সময়। এই সময়েই সে তৈরী করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথ। এর পর যখন তার বিয়ুদ্ধকুল কর্মজীবন আরম্ভ হবে তখন তাকে প্রতি পদে চলতে হবে ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে। আঘাত পেলে মুষড়ে পড়লে চলবে না তার। ভাঙ্গা বুক নিয়েই তাকে চলতে হবে টলতে টলতে। যেমন করেই হোক, বুড়ো বাপ, মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়েকে খাওয়াতে পরাতে হবেই, ওরা যে তারই মুখ চেয়ে রয়েছে। অভাবের সাথে, দারিদ্র্যের সাথে করতে হবে তাকে লড়াই, এমনি ভাবে তাকে তৈরী হতে হবে যৌবনে। কাজেই যৌবনে বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনের সাথে সাথেই তার অটুট স্বাস্থ্য সম্পদও লাভ করতে হবে। তার জন্য করতে হবে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিয়মিত ব্যায়াম। দেখা যায় যৌবনের উন্মাদনা কুপথে চালনা না করে, যে ব্যক্তি সুস্বাস্থ্য এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে চালনা করেছে সেই তার কর্মবহুল জীবনের পথ সুগম করে নিয়েছে এবং সোনার সংসার গেঁথেছে।

আর্থিক অনটনের কোন আশঙ্কা যাদের আসবার সম্ভাবনা নাই তাদেরও সুস্বাস্থ্য হওয়া প্রয়োজন সুখ-ভোগ করার জন্য। মনে করুন, ব্যাধিগ্রস্ত শরীর নিয়ে কেউ ছটফট করছে বিছানায় পড়ে। এমনি সময় তারই ছোট ছোট অবুঝ ছেলেমেয়েগুলি খেলা করতে করতে সেই ঘরে ঢুকে শিশুসুলভ চঞ্চলতা ও চেঁচামেচি করছে, আর তখনই গালমন্দ করছে তাদের প্রিয়জনের কাছে। সেই সব ছেলেমেয়েদের মনও আস্তে আস্তে বিষিয়ে ওঠে তাদের প্রিয়জনের উপর। এমনি করে ছোট ছোট জিনিস হতে সংসারের সমস্ত পরিবারবর্গের নিকট সেই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিটি হয়ে ওঠে বিষবৎ। জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য্য জেনেও মানুষ সেই অনিবার্য্য মৃত্যুভয়কে বা মৃত্যু যাতনাকে ভুলে থাকে কি নিয়ে? কিসের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে, সংসারের সুখ শান্তি সুস্থ, সুন্দর দেহ মন নিয়ে ভোগ করে, আনন্দ করে। এ সংসারে আমরা দুদিনের জন্য এসেছি। যে কয়দিনই বাঁচবো, সুস্বাস্থ্য নিয়ে আনন্দ করে বাঁচবো—চির-রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন হয়ে নয়। বাঁচবো ত নিশ্চয় হয়ে, মুমূর্ষুর মত নয়। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রত্যেক নরনারীর থাকা উচিত। তা হলে প্রতি ঘরে ঘরে উঠবে আনন্দের ঢেউ।

রাত্রির ব্যথা

নমিতা চট্টোপাধ্যায়

বাসন্তী-জ্যোৎস্নায় ছেয়ে ফেলেছে চারিদিকটা। রাত্রির কোল ঘেঁসে পাইন বনের ছায়া জমে উঠেছে বিক্ষিপ্ত ভাবে—ছড়িয়ে পড়েছে তারই ফাঁকে উঁকি মারা চাঁদের আলো, দুঃখ সুখের জলন্ত নিদর্শন হ'য়ে। কোথাও বা পাথরের গা'টা চিক্‌চিক্ ক'রে উঠছে বেনারসী ওড়না ঢাকা নববধূর সলাজ চোখের মত—আবার চক্‌মকি আলোর মত নিভেও যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মুখচোরা বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে এদিক ওদিক থেকে—পাতায় পাতায় সোহাগ জানানো মর্ম্মর ধ্বনি কানেও পশছে অতি সন্তর্পণ-ভাবে। পাখীর কল কাকলী মিলেছে স্তব্ধ হ'য়ে—হয়তো বা রাতের প্রেমে মাতাল হ'য়ে ব'সে আছে প্রেমিকের আশায়। ঘটিকের চিক্‌মিকিনি ভরা স্তব্ধ আকাশ লুব্ধ

চকোরের চঞ্চু মত হা করে তাকিয়ে আছে মায়াবী নিশির রূপের দিকে—অনিমিলিত নয়ন ভরে উপভোগ করছে প্রাকৃতিক উপচয়। পাহাড়ের বুকে নেচে বেড়ানো পাগলা ঝোরা ঝরে পড়ছে অঝোর ঝরে—কোন কোন উপল খণ্ড বাধা হানতে এগিয়ে গিয়েছিল তার চলার পথে, কিন্তু পারবে কেন? না-পারা অপমানের আগুনে তাই তো দিয়েছিল তারা আত্মাহুতি; আর কিছু মহলের শ্বেত-পাথরের ঝোয়ারা থেকে জল পড়ার মত তাই তো ঐ পাগলা ঝোরা জল ছিটোতে ছিটোতে নেমে গিয়েছিল নিঃসীম অনন্তের পানে। তারই বুকে আশ্রিত রঙ বেরঙের বাচ্চা মাছের দল খেলে বেড়াচ্ছিল ঝাঁক বেঁধে বেঁধে—ল্যাজে ল্যাজে জড়িয়ে জড়িয়ে জানাচ্ছিল তাদের আবেগভরা মনের ভাষা, আর তারই সঙ্গে নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল একটুখানি জায়গায় জমা হওয়া জলের উপর দু'টি মুখের প্রতিবিম্বকে—হাওয়া লাগা ঝুমকো লতার মত সহেলীও এক ঝিলিক হাসির ঝোয়ারা তুলে ঢ'লে প'ড়েছিল তার সাথীর বুকে—সাথীর পরা ফুলের মালাটাকে আঙুলে জড়াতে জড়াতে কত কি না বলতে চেয়েছিল তার না-বলা ভাষায়—আর সাথীও তার পিঠ-ভরা কালো চুলে হাত বুলিয়ে সমর্থন ক'রেছিল সহেলীর সেই ভাব-বিহ্বলতার না-জানা ইঙ্গিতকে। সহেলী ও সাথী। ফুলপাতার ঢাকা দেহ দু'টির উপর পেলে যাচ্ছিল কতই না জোৎস্নার ঝিকিমিকি—অবাধা বাঁশী তাই বার বার দেখে উঠছিল সাথীর হাতে নীরব ভাষার স্ফুরণ হ'য়ে।

ফুল ফুলের মালা দোলান সহেলীর দেহটা হঠাৎ দুলে উঠে বারেকের জন্য—চকিত বিদ্যুতের মত বন-হরিণী যায় লুকিয়ে—সাথী খুঁজতে থাকে তার সহেলীকে—ফুল ফোটা শাখাগুলো সাথীর পিঠের উপর পরশ বুলিয়ে জানাতে চায় যে সহেলীকে তারা লুকিয়ে রেখেছে, ঘিরে রেখেছে তারা তাদের ফুলের গুচ্ছ দিয়ে আলো ছায়া-ভরা পাতার ফাঁকে—কিন্তু তাদের সেই নীরব বিহ্বলতা বুঝতে পারে না সাথী—একান্ত বিরক্তিভরেই সরিয়ে দেয় সেগুলো—ঝরণা ঝরার সুর মিলিয়ে হাসতে থাকে সহেলী—সে হাসিতে তার বুক ফেটে যায়, না-পাওয়া চোখ দুটি তার বারে বারে খুঁজে ফেরে সহেলীর বাঁকা ভুরুর বাঁকে প্রেম-অঞ্জন মাখা লীলল চক্ষু দুটি। বাঁশীতে তার বেজে উঠে তাই মন-বেদনার ব্যাকুলিয়া সুর। উপল স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে কখন কখন দেখা যায় ছন্দ-চপল সহেলীর গা—পর মুহূর্তেই হারিয়ে যায় কোন অজানায়—সাথী ছুটে যায় এগিয়ে, কিন্তু খুঁজে সে পায় না তার মরমের সহেলীকে—তখন সে তার মন-বীণায় ঝঙ্কার তুলেই হাতে তুলে নেয় তার বাঁশরী—আমলকী ডালের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলো এসে আদর জানায় সহেলীর দেওয়া কুন্দ ফুলের মালাটাকে। ব্যাকুলিত সুরে বাথিয়ে উঠে আকাশ—আকুল হ'য়ে উঠে রিমঝিমিনী জোৎস্না—"আঁ···" সহেলীর বুক ফাটা চীৎকারে স্তম্ভিত হ'য়ে যায় আকাশ-বাতাস—চকিতের মধ্যে সাথীর বিরহ-নেশা যায় টুটে, মরমীয়া বাঁশীর সুর যায় থেমে। তীর-বেঁধা হরিণীর মত ছুটে এসে সহেলী মুখ লুকায় আমলকী গাছে হেলান দেওয়া সাথীর বুকের উপর—সাথী তাকে নিবিড় ভাবে কাছে টেনে নেয়—সহেলীর উন্নত বুকে স্পন্দিত হয় ঘন ঘন স্পন্দন—চাঁদনী রাতের মিঠে আলো এসে যোগ দেয় চুপি চুপি তাদের এই নিবিড়-আলিঙ্গনের পুণ্য-লগনে; প্রাণবন্ত ক'রে তোলে সহেলী সাথীর এই শাশ্বত প্রেমকে।

কিন্তু ওকি! ঘনান্ধকার রাতের বীভৎস রাহু যেন ছুটে আসছে তাদের গ্রাস করতে—ঢেকে যাচ্ছে নিশীথ রাতের অপরূপের মাধুরিমা—নৈঃশব্দের বেড়াজালে আস্তে আস্তে লীন হ'য়ে যাচ্ছে সব কিছু—সব কিছুই যেন ধরা দিচ্ছে মৃত্যুর অমোঘ ইঙ্গিতে।

"না—না—না, হ'তে পারে না, কিছুতেই না" চীৎকার ক'রে উঠলো সুস্মিতা—ধড়্‌ফড়িয়ে উঠে ব'সলো সে খাটের উপর—"কি হ'য়েছে সুস্মি? কি হয়েছে তোমার? ছিঃ, ওঠে না, ডাক্তার বাবু বারণ ক'রে গিয়েছেন, বেশী নড়াচড়া ক'রলে আবার জ্বর বাড়বে; শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি!" সান্ত্বনা দিতে থাকেন স্বামী অমিত।

অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে সুস্মিতা বাইরের দিকে—যাঃ, সহেলী সাথীকে আর হয়তো বাঁচাতে পারলো না সে এই নিষ্ঠুরের কবল থেকে—মাথাটা কেমন যেন কিম্‌ঝিম্ করতে থাকে সুস্মিতার—কয়েক দিনের টাইফয়েড জ্বরেই সে অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। 'শুয়ে পড়ো সুস্মি! ভয় কি, আমি ত' তোমার পাশেই আছি?'

শুয়ে পড়ে সুস্মিতা। আকাশ তখনও রাতের নেশায় মশ্‌গুল; দেওয়াল ঘড়িতে বেজে উঠলো 'ঢং ঢং'—

রাত দুটো। মাথার পাশে ব'সে অমিত সুস্মিতার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো আদর ক'রে—মুখের উপর এসে পড়া চুলগুলোকে সরিয়ে দিতে লাগলো আপন জায়গায়। সুস্মিতার চোখের পাতা ক্রমে ভারী হ'য়ে আসে—"আ·····হা····· !"

বেকার সমস্যার সমাধান—

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিবেন।—(১) আগামী জানুয়ারী মাস হইতে তিন বৎসরের জন্য ৩০ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে—তাহারা প্রত্যেকে মাগ্‌গী ভাতা সহ মাসে ৫৪ হইতে ৮৫ টাকা বেতন পাইবে। (২) ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে গৃহ নির্ম্মাণ পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হইবে তাহাতে আপাততঃ সাড়ে ৩ হাজার লোক কাজ পাইবে (৩) ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে ছোট ছোট শিল্প আরম্ভ হইবে, তাহাতে বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৪) তিন বৎসর ধরিয়া আসানসোলের নিকট যে কয়লার উনানের গ্যাস প্ল্যাণ্ট তৈয়ার করা হইবে তাহাতে ৯ কোটি টাকা ব্যয় হইবে ও বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৫) কলিকাতার ময়লা পরিষ্কারের জন্য ২ কোটী ব্যয়ে যে ব্যবস্থা হইবে তাহাতেও বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে। (৬) কলিকাতার নিকট জমী উদ্ধারের জন্য সাড়ে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে যে কাজ হইবে তাহাতে বহু সংখ্যক লোক কাজ পাইবে ও বহু সহস্র বিঘা চাষের জমী পাওয়া যাইবে। (৭) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা হইতে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক শক্তি কলিকাতায় আনার জন্য যে ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা আছে তাহাতে লোক মূলতঃ ঐ শক্তি পাইবে ও পথে বহু ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে। (৮) ৭১০ খানি বাস ট্যাক্সি চালাইবার অনুমতি দেওয়া হইলে ২৫০০ লোক কাজ পাইবে। (৯) ফরক্কায় ৩৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গঙ্গা বাঁধ নির্ম্মাণ করা হইলে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বহু জমী উদ্ধার হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের স্থায়ী উপায় হুগলী নদীকে বহতা রাখা হইবে। এই সব পরিকল্পনার কাজ অচিরে আরম্ভ হইলে দেশে আর এত অধিক বেকার সমস্যা থাকিবে না।

পল্লীশিল্প ও রাজশক্তি—

সম্প্রতি হরিজন পত্রিকায় এ বিষয়ে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি। প্ল্যানিং কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুপারিশ করিয়াছেন—তৈল কলগুলি কেবল অপাঙ্‌ক্তেয় তৈল তৈয়ার করিবে ও খাদ্য-তৈল উৎপাদনের কাজ পল্লীর ঘানির জন্য সংরক্ষিত করা হইবে। ঐ সুপারিশ সকল প্রাদেশিক সরকারের বিচারাধীন আছে। আর একটি খবর এই যে—কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী দপ্তরসমূহের জন্য ১৯৫১-৫২ সালে সাড়ে ৪ কোটি টাকা মূল্যের ও ১৯৫২-৫৩ সালে ৭ কোটি টাকা মূল্যের মিলে প্রস্তুত কাগজ ক্রয় করিয়াছেন। অথচ ১৯৪১-৫২ সালে মাত্র ৯০ হাজার ৭ শত টাকা মূল্যের দেশীয় তুলোট কাগজ ক্রয় করা হইয়াছে। ১৯৫২-৫৩ সালে এক পয়সারও তুলোট কাগজ ক্রয় করা হয় নাই। অন্য সকল কুটীর শিল্পের কথা বাদ দিয়াও যদি এই মাত্র ২টী কুটীর শিল্পকে সরকারী ব্যবস্থায় রক্ষা করা হয়, তবে দেশের কোটি কোটি বেকার লোকের কর্মের সংস্থান হইতে পারে। ঐ ২টি শিল্পের কলে অতি সামান্য মাত্র লোক কাজ করে—তাহাদের বেকার হইবার ভয় নাই। তাহারা অবশ্যই অন্য কাজ সংগ্রহ করিয়া লইবে। কেন্দ্রীয় সরকার কি সত্বর এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না?

কলিকাতায় দুগ্ধ সরবরাহ—

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার হাসপাতালসমূহে দুগ্ধ সরবরাহের জন্য কাঁচরাপাড়ার নিকট হরিণঘাটায় যে গোশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ৪ বৎসর পরে সেখান হইতে আজ কলিকাতার ৫০ হাজার লোককে দুগ্ধ সরবরাহ করা হইতেছে। সে জন্য সহরে ৪৫টি দুগ্ধ বণ্টন কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৩৩ শত একর স্থান লইয়া গোশালা প্রতিষ্ঠিত—এর পরিসীমা ১৯ মাইল। মোট জমির মধ্যে ৭ শত একর চলা—তথায় মৎস্য চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে। নদী গবেষণা মন্দিরকে ৩ শত

একর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর বিজ্ঞান গবেষণাগার ও পরমাণুতত্ত্ব গবেষণা মন্দিরকে ১৭০ একর জমী দেওয়া হইয়াছে। তথায় হাঁস, মুরগী প্রতিপালনের বিরাট কেন্দ্র সকলের দ্রষ্টব্য হইবে। গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতির খাদ্য তথায় উৎপাদন করা হয়। তা ছাড়া তথায় বহু নারিকেল, আম, লিচু, পেপে প্রভৃতির গাছ করা হইয়াছে। দুগ্ধ শোধনের জন্য একটি আধুনিক যন্ত্র বসানো হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যহ ৫ শত মণ দুধ শোধন করা যায়। ঐ সঙ্গে পশু গবেষণা ও প্রজনন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোক যাহাতে খাঁটি দুধ, ডিম ও ফল খাইতে পায় সে জন্যই সরকার হরিণঘাটায় এই বিরাট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

গত ১২ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ৫১ ভোট পাইয়া ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সভানেত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি থাইল্যাণ্ডের প্রিন্স ওয়ান ওয়াট থায়াকনকে পরাজিত করিয়াছেন—তিনি মাত্র ২২টি ভোট পাইয়াছেন। রাষ্ট্রসংঘে এই প্রথম একজন মহিলা সভানেত্রী হইলেন। শ্রীমতী পণ্ডিত বলেন—আমার নির্বাচনে যেমন জগতের সকল মহিলার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে—তেমনই আমার দেশের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে। তিনি তাঁহার সাধ্যমত সমগ্র বিশ্ব সমস্যার সমাধানের চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী—

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পদত্যাগ করায় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে অস্থায়ীভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঐ পদে ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনকে নির্বাচনের যে সংবাদ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নহে। ক্ষিতিমোহনবাবু গত ৪২ বৎসর কাল শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছেন।

পরলোকে নাট্যকার নটকৃষ্ণ রায়—

কলিকাতা অভয় গুহ রোড নিবাসী খ্যাতনামা চিকিৎসক ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায় মহাশয় পরিণত বয়সে গত ২০শে সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি ২ বৎসর পূর্বে বেলিয়াঘাটা বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনিষ্টিটিউসন ও উপেন্দ্র স্মৃতি চালপাতালের অধ্যক্ষতা এবং যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নট ও নাট্যকার ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বহু নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। তিনি কলিকাতার রসিক সমাজ ও সাহিত্য মহলে সুপরিচিত ছিলেন।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

আগামী ২৫শে অক্টোবর হইতে তিন দিন জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইবে। রাজস্থানের মহারাণাপ্রমুখ মেবারের মহারাণা জয়পুরে সমবেত বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীদিগকে চিতোর দুর্গ ও উদয়পুর সহর দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীমেবেশচন্দ্র দাশ আই-সি-এস জয়পুর অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন এবং সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

জয়পুরের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ নিবিড় ও দীর্ঘদিনের। এই সম্মেলন তাহা আরও দৃঢ়তর করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব—

বিহার প্রদেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা দোষমুক্ত সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি ভাগলপুর হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সে জন্য গত ১৪ই মার্চ যে সংস্থা গঠিত হইয়াছে ভাগলপুরের ব্যারিষ্টার সৈয়দ আবুল হাসান তাহার সভাপতি, প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) সহ-সভাপতি এবং ইষ্টার্ণ রেলের শ্রীওয়াই চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হইয়াছেন। বিহার প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ও বাঙ্গালী বিহারী সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া দেশের ক্ষতি সাধন করিতেছে। নূতন চেষ্টার ফলে ঐ অশান্তি দূরীভূত হউক।—আমরা সর্বান্তঃকরণে ইহাই কামনা করি।

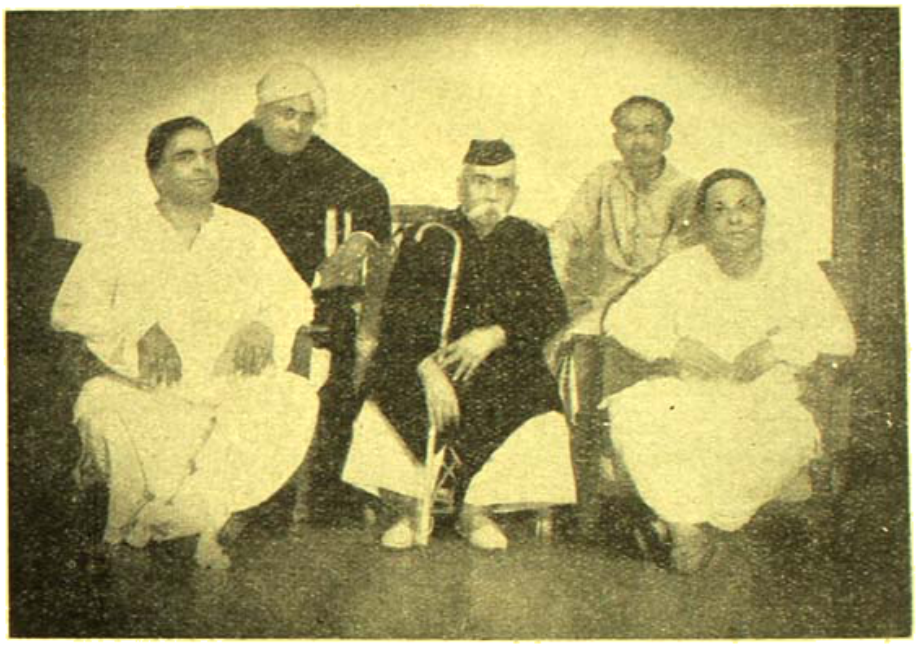

সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্মেলনের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক প্রভৃতি

মিউনিসিপাল শাসন—

স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপাল শাসনের ব্যবস্থার উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিতেছে। গত কয় মাসের মধ্যে কয়েকটি বড় বড় মিউনিসিপালিটীর শাসন ভার পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন—তাহাদের মধ্যে কামার হাটী, বালী প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। আমাদের মধ্যে দুর্নীতি ও দলাদলির অন্ত নাই। তাহা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বপ্রকাশ। মিউনিসিপাল শাসনে দলাদলি যে ক্ষতি সাধন করে, তাহা সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয়। তাহা ছাড়া মিউনিসিপাল আইনের গলদও কম নাই। এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেও সত্বর তাহার কোন প্রতিকার দেখা যায় না। ছোট ছোট মিউনিসিপালিটীগুলির ২।১টি একত্র করিয়া দিলে বহু অনাবশ্যক ব্যয় কমিয়া যায় ও দলাদলি ও কম হইতে পারে। বারাকপুর সহরে তিনটি ও দমদম সহরে ৩টি করিয়া মিউনিসিপালিটী রাখার কোন তাৎপর্য্য দেখা যায় না। অন্য দিকে খড়দহ মিউনিসিপালিটীর মত অতি ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী ও করদাতাদের কোন উপকার করিতে পারে না। শুধু বারাকপুর মহকুমায় ১৭টি মিউনিসিপালিটী আছে—যাহাদের কয়েকটিকে একত্র করিয়া অনায়াসে ৩।৪টি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায়। কলিকাতা সহর ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আর কোথাও গ্রাম ও সহরে পার্থক্য থাকা উচিত নহে। আমাদের বিশ্বাস, নূতন মিউনিসিপাল আইন রচনার সময় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে অবহিত হইয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যেন—ভবিষ্যতে এই অব্যবস্থাজনিত অসুবিধা ও দুঃখ কষ্ট হইতে জনগণ উদ্ধার লাভ করে। স্বায়ত্তশাসনের আর কোন অর্থ নাই—স্বাধীন দেশ সবটাই স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছে। কাজেই গভর্ণমেণ্টের শাসনই এখন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত শাসন। দেশবাসী প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশকে ভালবাসিয়া কর্তব্য পালন করিলেই স্বাধীনতার শাসন তাহাদের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি দান করিবে।

কাঁসাই নদীর বাঁধ—

মযূরাক্ষী পরিকল্পনার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গে কাঁসাই নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার সীমান্তে ৬২ বর্গ মাইল ধান জমীর উন্নতির জন্য ঐ বাঁধ নির্মিত হইবে। পরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় হইবে। সমগ্র পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিতে ১৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বাঁধ নির্মিত হইলে ৩৮১ লক্ষ একর ধান জমি ও ১ লক্ষ ১০ হাজার একর রবি শস্যের জমী উদ্ধার হইবে না, ৭ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হইবে। ১৯৫৪ সালের মধ্যে ঐ কার্যও সমাধা করিতে শেষ হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে

উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের অন্যতম শিল্পী কুমারী কৃষ্ণা চক্রবর্তী।
বর্তমানে ইনি নিজে একটি নৃত্যশিল্প ও সঙ্গীতকেন্দ্র
স্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ঋণ—

১৬ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে লোকসভার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়াছে—পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ৫২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। পাঞ্জাব রাষ্ট্র সর্বাপেক্ষা অধিক ঋণী—তাহাদের ঋণের পরিমাণ ৭৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রাদেশিক সরকারকে মোট ৩ শত ৩২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছে।

5 SOVIET JOURNALS

1. NEW TIMES

This weekly is devoted to questions of the foreign policies of the U.S.S.R. and to current event in international life.

Subscription rate : Yearly Rs. 6/12 ;
Half Yearly Rs. 3/6

2. NEWS

This fortnightly journal brings you news of the world economic, political & cultural.

Yearly Rs. 5/- ; Half Yearly Rs. 2/8

3. SOVIET UNION

This profusely illustrated monthly journal is a day to day record of life in the Soviet Union, its achievement in the task of Socialist Construction.

Yearly Rs. 7/8 ; Half Yearly Rs. 3/12

4. SOVIET WOMAN

This bi-monthly journal would create the interest of every woman to read the interesting features, stories & articles about Soviet Woman, their daily lives and their role in Soviet Society.

Yearly Rs. 2/6

5. SOVIET LITERATURE

This monthly journal is the indespensable guide to the art, literature & cultural events of the Soviet Union & the world.

Yearly Rs. 6/12 ; Half Yearly Rs. 3/12

BE A SUBSCRIBER AND OBTAIN COPIES DIRECT FROM MOSCOW.

Send Rs. 1/8 to cover postage for the specimen copies of the 5 journals.

A centre of Soviet publications :
CURRENT BOOK DISTRIBUTORS,
3/2, MADAN STREET,
CALCUTTA-13.

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধা সুরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ঃ

১৯৫৩ সালের আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতায় ৬১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। স্থানীয় দল ২৪টি এবং বাইর থেকে আগত ১৭টি। একদিকের সেমি-ফাইনালে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দল, জামসেদপুর দলের সঙ্গে প্রথম দিন ১-১ গোলে খেলা ড্র ক'রে দ্বিতীয় দিন ৩-০ গোলে জয়ী হয়ে ফাইনালে যায়।

সুদীর্ঘকাল পর বে-সামরিক বহিরাগত দল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো। বে-সামরিক বহিরাগত দল হিসাবে সর্বশেষ আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলে গেছে রেঙ্গুন কাষ্টমস, ১৯২৯ সালে।

অপর দিকের সেমি-ফাইনালে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ২-১ গোলে ওয়াড়ীকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে।

এই নিয়ে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ৯ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠলো। প্রথম শীল্ড ফাইনালে ওঠে ১৯৪২ সালে। শীল্ড পেয়েছে ৫ বার, তার মধ্যে উপর্যুপরি ৩ বার—১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল।

নামকরা স্থানীয় দলের মধ্যে গত বছরের ফাইনালিষ্ট মোহনবাগান ২-৪ গোলে চতুর্থ রাউণ্ডে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দলের কাছে হার স্বীকার করে। মোহন-বাগানের এই শোচনীয় পরাজয়ের জন্যে দায়ী গোলরক্ষক —চ্যাটার্জি এবং আক্রমণ ভাগের কয়েকজন খেলোয়াড়। মোহনবাগানের বিপক্ষে প্রথম গোলটি ছাড়া বাকি গোলগুলি হয়েছে চ্যাটার্জির মারাত্মক ভুল খেলার দরুণ; তেমনি মারাত্মক ভুল খেলে আক্রমণ ভাগের কোন কোন খেলোয়াড় গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করেছে, এমন কি মাত্র কয়েক হাত দূরের ফাঁকা গোলে বল মারতে পারেনি। মোহনবাগান বিপক্ষদলের তুলনায় গোল করার সুযোগ বেশী পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি।

খেলার অঘটন ঘটাতে পারদর্শী এরিয়ান্স ক্লাব ১-২ গোলে গুর্খাদলের কাছে ২য় রাউণ্ডে পরাজিত হয়। গুর্খা দল সৌভাগ্যক্রমে জয়ী হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং দল একাধিক গোল করার সুযোগ নষ্ট ক'রে তৃতীয় রাউণ্ডে ০-২ গোলে জামসেদপুর দলের কাছে হেরে যায়।

৪র্থ রাউণ্ডে গত বছরের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালিষ্ট রাজস্থান ক্লাব ১-২ গোলে পাঁচটি বাঙ্গালী খেলোয়াড় নিয়ে তৈরী ওয়াড়ীদলের কাছে হার স্বীকার করে। গোল দুটি (পেনাল্টি এবং ফ্রি-কিক্ থেকে) দর্শনীয় না হ'লেও ওয়াড়ীর খেলা তুলনায় ভাল হয়। সেমি-ফাইনালে ওয়াড়ী ১-২ গোলে শক্তিশালী ইষ্টবেঙ্গল দলের কাছে হার স্বীকার করলেও তাদের পরাজয় অগৌরবের হয়নি।

প্রেসে শেষ কপি দেওয়ার সময় পর্যন্ত ইষ্টবেঙ্গল বনাম ইণ্ডিয়া কালচার লীগের শীল্ড ফাইনাল খেলার কোন মীমাংসা হয়নি। দু'দিন খেলা হওয়ার পরও গোল শূন্য ভাবে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। আগামী সংখ্যায় শীল্ড ফাইনাল খেলার বিবরণ থাকবে।

ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটি ঃ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ঢাকুরিয়া লেকে ইণ্ডিয়ান লাইফ্ সেভিং সোসাইটির ৩১ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উৎসব

সোসাইটির নিজ ভবনে মহা সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় পৌরোহিত্য করেন।

এই উপলক্ষে সোসাইটি খাঁড় অঙ্কের একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক নাটক গল-নৃত্য সংযোগে অভিনয় করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবনের যুগোপযোগী ঘটনাবলী অবলম্বনে নাটকখানি রচিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের অনুকরণে সূত্রধার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাটকের প্রতি অঙ্কের কাহিনী আবৃত্তি করেন, আর সেই কাহিনীকে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গল-নৃত্যের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীকৃষ্ণ বিকাশ রায়। সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ব্রোশিওর থেকে জানা যায়, চলতি বছরে ৩০০জন অনগ্রসর এই প্রতিষ্ঠান থেকে সাঁতার শিক্ষা পেয়েছেন এবং ১৬জন 'ফুনিয়ার লাইফ সেভিং সার্টিফিকেট' লাভ করেছেন। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর জনহিতকর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অতি নগণ্য—আরও বেশি হওয়া প্রয়োজন।

এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

জাপানের টোকিও সহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বার্ষিক এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে জাপান দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করেছে। পুরুষদের দলগত বিভাগের ফাইনালে জাপান ৫-১ খেলাতে প্রথম বছরের বিজয়ী ভারতকে হারিয়ে বরোদা কাপ জয়ী হয়েছে। এবারের ফাইনালে ভারত ৫-২ খেলাতে জাপানকে হারিয়ে প্রতিযোগিতার ৩য়না বছরে বরোদা কাপ জয়ের কৃতিত্বলাভ করেছিল। এ ছাড়া ভারত ম্যাকাওয়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে মহিলা বিভাগের দলগত চ্যাম্পিয়ানের পুরস্কার কমলা কাপ জয়ী হয়েছিল।

এবারের প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে জাপান একটা খেলাতেও হার স্বীকার করেনি, ৭টি খেলাতেই জয়লাভ করেছে।

মহিলাদের ডবলস এবং মিক্সড ডবলসে জাপান জয়ী হয়। পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ডবলস ফাইনালে ভিয়েৎনাম জয়লাভ করে। মহিলাদের সিঙ্গলসে খেতাব পায় ফরমোসা। ভারতবর্ষ তার শক্তিশালী দল পাঠাতে পারেনি। ভারতীয় দলের অন্যতম খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত এবং দিলুভেঙ্গাডাম দলে যাননি। ভারতীয়দলে ছিলেন এই চারজন খেলোয়াড়—রণবীর ভাণ্ডারী (বাংলা) অধিনায়ক, ভায়াস (বোম্বাই), এস থাকার্দি (বোম্বাই) এবং কে এন ব্যানার্জি (বাংলা)। গত বছর কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশিয়ান টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় দলগত বিভাগে ভারতবর্ষ বিশেষ সুবিধা করতে না পারলেও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ বিভাগে ভারতবর্ষ তিনটি বিভাগের ফাইনালে জয়ী হয়—মহিলাদের সিঙ্গলস, মহিলাদের ডবলস (জাপানের সঙ্গে) এবং মিক্সড ডবলস। এ ছাড়া প্রতিযোগিতায় 'ত্রিমুকুট' সম্মান পেয়েছিলেন একমাত্র গুল নাসিকওয়ালা (ভারতবর্ষ) —মহিলাদের সিঙ্গলস, ডবলস এবং মিক্সড ডবলস ফাইনালে জয়লাভ করে। ১।১০।৫৩

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীসমরেশ বসু প্রণীত উপন্যাস "উত্তরণের দিন" ২য় খণ্ড —৩
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "পঞ্চভূত" (২য় সং)—২।০
শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অরক্ষণীয়া" (২য় সং)—১।০
কমল রায় প্রণীত উপন্যাস "মর্মের দুহিতা"—৩।০
শৈলজা বসু প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অব্যর্থ মোহন"—২৲
"আর এক মোহন"—২৲, পাহাড়ে ভয়ংকরের স্বপন"—২৲
শ্রীঅনি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "কেরাণীর জীবন"—১।০
প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মেঘ-কজ্জলী"—৩
শ্রীসুপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কিশোর পাঠ্য "পরাজিত একাদেই"—১।০
নরেশ রায় প্রণীত নাটক "মহাযাত্রিকী"—১।০
শ্রীগোপালদাস চৌধুরী প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "নবপর্ব"—২৲
শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "কুকার অভিযান"—১।০, "ডেইজির খোলা" (২য় সং)—৩৲, "পাকপাপ"—২৲
শ্রীসুধীরনাথ রাহা প্রণীত শিকার-কাহিনী "বাঘের খেপে"—১৲
শ্রীরতনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "অব্যর্থ সন্ধান"—১।০
শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী প্রণীত ছোটদের হাসির গল্প "জন্মদিনের উপহার"—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "রহস্যের মায়াপুরী"—৩৲, "রহস্যের মায়াজালে"—৩৲
শ্রীশৈলজা বসু প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "ভুল-পত্তন"—২৲
শ্রীসুপতিনাথ পাল প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "হে অতীত !"—১।০
নবভারত পাবলিশার্স-প্রকাশিত "প্রভাতকিরণ বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প"—৩৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীসারদাচরণ সেনগুপ্ত

বাস্তুহারা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অগ্রহায়ণ—১৩৬০

প্রথম খণ্ড | একচত্বারিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গীতা কি প্রক্ষিপ্ত ?

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ

গীতা মহাভারতের অঙ্গীভূত।

কুরু ও পাণ্ডবের মহাসমরের পটভূমিকায় পার্থসারথি গীতা বলিয়াছিলেন। গীতা বুঝিতে হইলে মহাভারতের সেই অপরূপ চরিত্রগুলি এবং সেই পরিবেশ মনে রাখিতে হইবে। এই কথা মনে না রাখিয়া গীতার আলোচনা করিলে তাহার মর্মার্থ হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুইটি মতবাদ ইহার পরিপন্থী—একটী অধ্যাত্মব্যাখ্যাবাদী, অন্য প্রক্ষিপ্তবাদ। য়ুরোপীয় অনেক পণ্ডিতেরা প্রক্ষিপ্তবাদ লইয়া মাতিয়া থাকেন। তাহারা নিজেদের কল্পনাপ্রসূত সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপ্তি, রীতি ও অর্থ প্রয়োগ করিতে গিয়া বহুস্থলেই ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে গীতা মূল মহাভারতের অংশ এবং ইহা আদৌ প্রক্ষিপ্ত নহে।

গীতার সহিত মহাভারতের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ প্রমাণ করে যে গীতা কেহ মূল মহাভারতে প্রবেশ করাইয়া দেয় নাই।

ভীষ্ম-স্রোতঃ-দুস্তরদুরা ধার্তরাষ্ট্র-নীলোৎপল-
শল্য-গ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামা-বিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ।

সমুচ্ছটশালিনী রণনদী বর্ণিতেছে। ভীষ্ম, তটভূমি, জয়দ্রথ ইহার জলরাশি, ধার্তরাষ্ট্র ইহার নীলোৎপল, শল্য কুম্ভীর, কৃপ প্রবাহ, কর্ণ ইহার বেলাকে আকুল করেন, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ ইহার ঘোর মকর, দুর্যোধন ইহার আবর্ত। এই রণ-নদী পার হইতে কাণ্ডারী কেশব। গীতার সহিত এই ভীষণ সংগ্রামের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। যুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর রূপ ও ক্ষতি উপলব্ধি করিয়াই অর্জুনের কৈবা এবং তাহার ফলই ভগবানের গীতা প্রচার।

কিন্তু অনেকে বলিবেন, যুদ্ধের এই আখ্যানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়াই গীতাকার গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

করিয়াছেন। ইহা যে ঠিক নয় মহাভারতের অন্তরঙ্গ প্রমাণই তাহা নির্ণয় করিবে। আদি পর্ব্বের অনুক্রমণিকায় ভগবদ্‌গীতাপর্ব্বের উল্লেখ আছে। অষ্টাদশ পর্ব্বের অধ্যায় বর্ণনার সময় এই শ্লোক পাই :—

কথ্যতে যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ।
মোহনং নাশয়ন্নাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥

ধৃতরাষ্ট্র বিলাপের প্রসঙ্গে আছে—ধৃতরাষ্ট্র যখন শুনিলেন যে অর্জ্জুনের মোহ বিনাশের জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছেন তখনই তিনি জীবনাশা ত্যাগ করিলেন।

শান্তিপর্ব্বে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে নারায়ণীয় ধর্ম্ম বর্ণনা করার সময় বলিতেছেন যে এই ধর্ম্ম হরিগীতায় সংক্ষেপে বিবিধপূর্ব্বক বলা হইয়াছে। হরিগীতা ভগবদ্‌গীতারই নামান্তর। এই পর্ব্বে পুনরায় এই শ্লোক পাওয়া যায়—

সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবসৃঞ্জয়ৈঃ।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ম্॥

কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সমুপস্থিত সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে বিমনস্ক অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান এই ধর্ম্ম বলিয়াছিলেন।

অশ্বমেধপর্ব্বে দ্বারকায় প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে অর্জ্জুন পুনরায় গীতা শুনিতে চাহিলে কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি যোগস্থ হইয়া যে গীতা বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বলা সম্ভব নয়। এইভাবে আভ্যন্তরিক উল্লেখ হইতেই ইহা নিঃসন্দেহ যে গীতা মহাভারতেরই অঙ্গ।

দ্বিতীয়তঃ ভাষার সৌসাদৃশ্যও বলিয়া দেয় যে গীতা ও মহাভারত একই ব্যক্তির রচনা। কিন্তু কেবল শব্দ সাদৃশ্য নয়, অর্থ ও ভাবের সাদৃশ্যও নিরূপিত করে যে উভয়ই একই ব্যাসদেবের লেখা। মহাভারতে শান্তি পর্ব্বের শেষে ভাগবতধর্ম্মের পরম্পরায় উল্লেখ আছে সেখানে মহাভারত-কার বলিতেছেন—

ত্রেতাযুগাদৌ চ ততো বিবস্বান্ মনবে দদৌ।
মনুশ্চ লোকভৃত্যর্থং সুতায়েক্ষ্বাকবে দদৌ
ইক্ষ্বাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ॥

ইহা হইতে পাওয়া যায় ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ এই ভাগবতধর্ম্ম মনুকে দিয়াছিলেন—লোক পরিপালনের জন্য নয় তাহা আপন পুত্র ইক্ষ্বাকুকে দেন। ইক্ষ্বাকু কথিত সেই ধর্ম্ম এক্ষণে পৃথিবীতে অবস্থিত আছে। এই পরম্পরার সহিত চতুর্থ অধ্যায়ের শ্লোকের তুলনা চলে :—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

পরম্পরা ছাড়া প্রবৃত্তিপরতা এই দুই ধর্ম্মের বিশেষত্ব।

নারায়ণ পরো ধর্ম্মঃ পুনরাবৃত্তিদুর্লভঃ।
প্রবৃত্তি লক্ষণশ্চৈব ধর্ম্মো নারায়ণাত্মকঃ॥

নারায়ণীয় ধর্ম্ম প্রবৃত্তিপর, নিবৃত্তিমূলক নহে। গীতাও মূলতঃ কর্ম্মযোগশাস্ত্র। এই কর্ম্মযোগশাস্ত্র যে পট-ভূমিকায় বলা হইয়াছে—সেটী মনে রাখিলে কেহই বলিবেন না যে গীতা প্রক্ষিপ্ত।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমর ক্ষেত্র—মহাব্যূহ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া সুসজ্জিত। বিদ্যুৎ-বজ্র পরিপূর্ণ দুই খণ্ড মেঘ পরস্পরের দিকে যেন অগ্রসর হইতেছে। এখনই রুধির-স্রোতে ধরণী প্লাবিত হইবে—তখন অর্জ্জুন ক্লৈব্য অনুভব করিলেন। সেই বিষাদ দূর করিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলিলেন। শোকমোহাচ্ছন্ন যে অর্জ্জুন প্রথমে বলিয়াছিলেন :

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে
গাণ্ডীবং সংস্রতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥

হে কৃষ্ণ, হে কেশব, স্বজনগণকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, রোমহর্ষ হইতেছে, গাণ্ডীব হাত হইতে পড়িয়া যাইতেছে, অঙ্গ যেন জ্বলিয়া যাইতেছে। সেই ক্লীব অর্জ্জুন গীতার শেষে উল্লসিত শৌর্য্যে বলিলেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদাৎ ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥

হে অচ্যুত! তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং আমার বিনষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মের স্মৃতি ফিরিয়া আসিয়াছে। আমি এখন আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, আমি এখন তোমার উপদেশ মানিয়া যুদ্ধ করিব।

গীতার মর্ম্মার্থ মহাভারতের এই রণ-সমুদ্যমের ভিতর

দিয়াই জানিতে হইবে। এই বিরাট বৃক্ষের সমস্তাকে বুলিয়া গীতার ব্যাখ্যা চলে না।

গীতাধ্যায়গুলির সঙ্গতি বিবেচনা করিলেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। অর্জুন বিষাদযোগে বলিলেন যে আত্মীয়স্বজন বধ করার চেয়ে তিনি ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবেন। কুলক্ষয়ের মত মহাপাপ তিনি করিবেন না। গীতা যে বৈরাগ্যের পুঁথি নয়, তাহা কৃষ্ণের কথায় প্রতিপন্ন হইবে। কারণ তিনি অর্জুনকে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিলেন না, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি অর্জুনকে বলিলেন—স্বধর্ম্ম পালন না করিলে প্রত্যবায় হইবে—তাহার অকীর্ত্তি হইবে। অর্জুন তাহাতেও শান্ত হইলেন না, বরং পণ্ডিতের মত তর্ক জুড়িলেন। তদুত্তরে গুরু বলিলেন—কর্ম্ম ত্যাগ বা কর্ম্ম-সাধন যে পন্থাই তুমি অবলম্বন কর না কেন, উভয় মার্গেই তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সংক্ষেপে গীতায় তিনি নিজ বক্তব্য বলিয়া উপদেশ দিলেন, নিষ্কাম বুদ্ধিতে সর্ব্বকর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কাজ করাই মানুষের কর্ত্তব্য।

তাহার পর তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি কর্ম্মযোগের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেন। কর্ম্মকে যজ্ঞের মধ্যে বিলীন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবার উপদেশ দিলেন। পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন জ্ঞানমার্গ এবং কর্ম্মমার্গের উভয়ের একটার শ্রেয়স্করতা নিশ্চয়রূপে জানিতে চাহিলেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয় বিচার করিয়া পার্থসারথি জানাইলেন যে কর্ম্মযোগী হওয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। নিষ্কাম ও নির্ব্বাসনা হওয়াই মানুষের চরম সাধ্য।

এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে পুরুষোত্তমের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাহীন হয় এবং মানুষ সমতা লাভ করে। সপ্তম অধ্যায়ে চরাচর জগতের বিচার হইয়াছে। অষ্টমে জ্ঞান-বিজ্ঞানকথা বলিতে গিয়া যেসব তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নবমে, দশমে, একাদশে এবং দ্বাদশে পুরুষোত্তমের ব্যক্তস্বরূপ যে প্রেমগম্য, সে কথাই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বিশ্বরূপ দর্শনের দ্বারা পুরুষোত্তম আগম পরম বিভূতি অর্জুনকে দেখাইবার পর ত্রয়োদশে এই বিশ্বেশ্বরই যে প্রত্যেক জীবে তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে দেখান হইল। যাহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে, একথা প্রকৃতি ও পুরুষ বিচারের মধ্যে ব্যক্ত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে একই আত্মা সর্ব্বব্যাপক হইলেও প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তম প্রকৃতির এই তিন গুণানুসারে জগতের এই বিপুল বৈচিত্র্য এবং পরে অর্জুনকে ত্রিগুণাতীত সাম্য লাভ করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চদশে ভগবান বলিলেন—ক্ষর ও অক্ষর এই দুয়ের অতীত যে পুরুষোত্তম, তাহাকে জানিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিলেই মানুষ জীবনে চরম সার্থকতা পায়। অর্জুনকে সেই কথা বলিয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের উপাসনা করিতে বলিলেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে মানুষে মানুষে কেন ভেদ হয় তাহা বুঝাইবার জন্য দৈবী ও আসুর সম্পদের ব্যাখ্যা করিলেন এবং ভেদতত্ত্বের মূল কারণ ব্যক্ত করিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায় সমস্ত গীতাশাস্ত্রের উপসংহার। পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া স্বধর্ম্মাচরণে যে মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করে তাহাই বুঝাইয়া অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছে এবং অর্জুন তাহা বুঝিয়া যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।

হে অর্জুন তুমি অহঙ্কারে বলিতেছ যে তুমি যুদ্ধ করিবে না। তোমার এই মনন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। তোমার স্বভাবই তোমাকে যুদ্ধ করাইবে। অতএব উদ্ধারের পন্থা কোথায় ?

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

তুমি সব ছাড়িয়া আমারই শরণও লও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় করিও না।

গীতার সার কথা এই আত্মসমর্পণ। ভগবানে দৃঢ়ভক্তি রাখিয়া মানুষ যখন ভগবৎপরায়ণ হইয়া নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বধর্ম্মাচরণ করে, তখন তাহার কোনই পাপ থাকে না—এই ধরণের কর্ম্মযোগী ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বত্র কল্যাণ লাভ করে।

অতএব অধ্যায় সামঞ্জস্য করিলে দেখা যায় যে গীতা বাহির হইতে প্রবেশ করা হয় নাই—ইহা মহাভারতের

আখ্যানের পটভূমিকায় কমলকোরকের শতদলের মত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে ইহার এই বীজভূমি হইতে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভব নহে, কাজেই প্রক্ষিপ্তবাদ আদৌ যুক্তিসহ নহে।

তার্কিকের তর্ক তবুও ইহাতে থামিবে না। তিনি বলিবেন যে সুচতুর ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে গীতা রচনা করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য মহাভারতে প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি উপরে যাহা বলা হইয়াছে সেই সমস্ত অনুধাবন করিয়াই অতি যত্নের সহিত গীতাকে মহাভারতের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন এবং যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া গীতা কথিত হইয়াছেন পুনঃ পুনঃ তাহা নিজের পুস্তকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই জন্যই অতি গম্ভীর দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহা যুক্তি নহে—তর্ক।

কারণ যিনি গীতার মত গ্রন্থ রচনার সামর্থ্য রাখিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতার উপর বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই মহাভারতে প্রক্ষেপ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভের তুলনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। গীতা অপূর্ব্ব সমন্বয় গ্রন্থ। তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত দার্শনিক তথ্যের ও মতের এমন সুন্দর সংক্ষেপ অতিব্যক্তি অতি ক্ষুরধারবুদ্ধি মনস্বীর পক্ষে সম্ভব।

এই মতবাদের সপক্ষে প্রমাণ কোথায়? বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। তথাপি সমস্ত টীকা ও ভাষ্য, সমস্ত প্রাচীন কিংবদন্তী ভুলিয়া আমরা কেন এই প্রক্ষেপবাদ গ্রহণ করিব।

যখনই জীবনে গভীর সমস্যা জাগে তখনই তাহার সমাধানের আকুলতা জাগে। চলিত কথায় বলে, যুদ্ধ উদ্ভাবনের প্রসূতি। সেই ভাবে কুরুক্ষেত্রের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের সম্মুখেই গীতার গভীরতম জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভবপর। এই জন্যই অর্জ্জুনের শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে তিনি যোগস্থ হইয়া গীতা বলিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বলা সম্ভব নয়। মহাভারতকার যিনি তিনি পরম জ্ঞানী কবি—সেই কবির অমর লেখনীতেই গীতা জাগ্রত হইয়াছে—তাহাকে প্রক্ষেপের কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবার আদৌ হেতু নাই।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভব হইলেও গীতা রূপক কাব্য নয়। গীতার যে সার্ব্বজনীন মতবাদ, গীতার যে শাশ্বত মাধুর্য্য তাহা রূপকের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই—তাহা জাতীয় জীবনের এক মহাসন্ধিক্ষণে এক মহাসমস্যা সমাধানের পথেই আপন অপূর্ব্বতায়, আপন চিরভাস্বর দীপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের দর্শন-বিদ্যার ইতিহাসে ভারতের ধর্ম্মজীবনের যাত্রার পথে গীতা এক দিব্যদ্যুতিময় অধ্যাত্ম গ্রন্থ। মানুষকে মর্ত্ত্য জীবনের মলিনতা হইতে দেবজীবনের পরিপূর্ণ শ্রী, সৌন্দর্য্য ও জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবার যে বিরাট প্রয়াস এই মহাগ্রন্থে প্রতিফলিত, তাহা মহাভারতের সুবিশাল পটভূমিকায় সম্ভব হইয়াছে—অন্যভাবে, অন্যরূপে তাহা সম্ভব হইত না।

সর্ব্ব বিষয় জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসুর সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া, গীতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিষয় বিবেচনা করিয়া, ভারতীয় ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করিতে পারি যে গীতা প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা পরম পুণ্য ইতিহাস মহাভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাভারতের অনুপম চরিত্রগুলির নৈতিক সমর্থনের জন্য উপযুক্ত কারণেই উপযুক্ত স্থানেই বেদব্যাস ইহা মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

প্রার্থনা

শ্রীচিন্ময়কুমার রায়

যে ঘন আঁধারে তোমার আলোক ভরে
আকুল আবেগে নয়ন আমার করে
সে আঁধারে প্রিয় তুমি চল মোর সাথে
থাক সে আঁধার আমার জীবন রাতে।
সে আলোকে প্রিয় নাহি মিলে তব দেখা
চাহি না জীবনে বৃথা সে আলোক রেখা

সে আলোক যাক্ মোর পথ হতে সরি
জীবন আমার উঠুক আঁধারে ভরি।
যে সুখ বিভবে তোমার চরণ ভুলি
বিলাস আবেশে মিছে কাজে দিনগুলি
তোমার পরশ যার মাঝে নাহি পাই
সে বৃথা বিভব কভু যেন নাহি চাই।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

গৌড়ের সিংহাসন

অমাবস্যার পরদিন প্রত্যূষে কর্ণসুবর্ণের অধিবাসীরা শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই শুনিল, রাজপথ দিয়া ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে একদল পদাতিক সৈন্য চলিয়াছে। সকলে দ্বার গবাক্ষ খুলিয়া দেখিতে লাগিল। পথ দিয়া দীর্ঘ সশস্ত্র সেনাদল চলিয়াছে। তাহাদের পৃষ্ঠে চর্ম, হস্তে শস্ত্র, কটিবন্ধে তরবারি। তাহারা রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে।

সেনাদলের অগ্রভাগে একটি সুসজ্জিত রথ। রথের ছত্র নাই, মুক্ত রথে পাশাপাশি বঙ্গ ও কোদণ্ড মিশ্র দাঁড়াইয়া আছেন। কোদণ্ড মিশ্রের বর্ম হস্তে অশ্বের রশ্মি, তিনি রথ চালাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয়, শুদ্ধ প্রাণশক্তির বলে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষে বিজয় গর্ব পরিস্ফুট। তাঁহার পার্শ্বে বঙ্গ বাহুবদ্ধ করিয়া বঙ্গ দাঁড়াইয়া। বঙ্গের মাথায় ধাতুময় শিরস্ত্রাণ, বক্ষে বর্ম, মুখে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা। সে অনিমেষ-চক্ষে সম্মুখ দিকে চাহিয়া আছে।

রথের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে কোকবর্মা। সে কদাকার মুখে বিকৃত ভঙ্গিমা লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, দেহে লৌহ-জালিক, হস্তে বিনিষ্কাষ্ণ অসি। সে দক্ষিণে বামে মর্কট-চক্ষু ফিরাইয়া পরিপার্শ্বস্থ জনগণের মুখভাব পর্যবেক্ষণ করিতেছে, যেন মুখ দেখিয়া তাহাদের মনোভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছে।

সর্বাগ্রে শাসন-ডিণ্ডিম ধ্বনিত করিয়া কোনক পদব্রজে চলিয়াছে। চলিতে চলিতে ডিণ্ডিম থামাইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—নগরবাসিগণ, অবহিত হও। অগ্নিবর্মার কালান্ত হয়েছে। কিন্তু গৌড়ের সিংহাসন শূন্য নয়। পুণ্ড্রবর্ধনে মহারাজ শশাঙ্কদেবের পৌত্র, অমিতবীর্য মহারাজ মানবদেবের পুত্র পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ বঙ্গদেব তাঁর পিতৃপুরুষের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তোমরা মহারাজ বঙ্গদেবের জয় ঘোষণা কর।

নাগরিকেরা কিন্তু জয় ঘোষণা করিতেছে না। তাহারা উৎসুক নেত্রে সোভাযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে, কিন্তু এই রাজ-পরিবর্তন ব্যাপারে নিজেদের আশুভাব মনে করিতেছে না। কোন রাজা মরিল, কোন নূতন রাজা আসিল, এ বিষয়ে তাহাদের কৌতূহল থাকিতে পারে কিন্তু তদধিক কিছু নয়। কে বাহিরে রাজা মহারাজার ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে? নিরুপদ্রবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলেই যথেষ্ট।

জনগণের মধ্যে কেবল একজন লোক এই আকস্মিক ঘটনাসম্পাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জয়নাগের দল। জয়নাগের মস্তিষ্ক প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। সাধারণ বাহিকের বেশে তাহার দলের পাঁচ সহস্র যোদ্ধা কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। স্বয়ং জয়নাগ ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিরা যে-সময় দণ্ডভুক্তির সীমান্ত বিরিয়া বসিয়া জয়নাগের গতিরোধের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই জয়নাগ অবকাশে ছদ্মপথে কর্ণসুবর্ণে প্রবেশ করিয়া রাজ্য কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবার কৌশল করিয়াছিলেন। গৌড়ের সেনাপতিগণ যতক্ষণে সংবাদ পাইয়া রাজধানী রক্ষার জন্য ফিরিবে, ততক্ষণে পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত এবং সম্মুখে প্রতিরুদ্ধ হইয়া ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। জয়নাগের এই কূটকৌশল কার্যে পরিণত হইতে আর দুইচারি দিন মাত্র বিলম্ব ছিল, সহসা এই নূতন সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

সে যাহা হৌক, কোকবর্মার সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইতে বাজাইতে রাজপুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। অগ্নিবর্মার মৃত্যুসংবাদ রাজপুরীতে গোপন ছিল না, রক্ষী প্রতীহার যে যেখানে ছিল পলায়ন করিয়াছিল। তৎপরিবর্তে

কোদণ্ড মিশ্রের সংগৃহীত দুইশত পণ্য বোঝা পুরদ্বার রক্ষা করিতেছিল। ইহারা যব-পুরুকল-চুণ-বরন শ্রেণীর যোদ্ধা; ইহাদের দেশ নাই, জাতি নাই, যে বেতন দিবে তাহার জন্য যুদ্ধ করিবে। ইহারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, কিন্তু যাহার বেতন লইয়াছে তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

কোদণ্ড মিশ্রের আজ্ঞায় তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিল। কোকবর্মা সদলবলে পুরভূমিতে প্রবেশ করিল এবং পঞ্চাশজন বাছা বাছা অনুচর লইয়া অন্তঃপুর অভিমুখে ধাবিত হইল। আর সকলে পুরী লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। চীৎকার আর্তনাদ হুড়াহুড়ির শব্দে রাজপুরী পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কোদণ্ডমিশ্র বন্ধুকে লইয়া রাজভবনের একদিকে চলিলেন যব-পুরুকলের কয়েকজন প্রধান যোদ্ধা রক্ষীরূপে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল।

কোদণ্ডমিশ্র রাজার প্রমোদ ভবনে উপনীত হইলেন। লুণ্ঠনকারীরা এখনও এদিকে আসে নাই, কেবল একজন পুরুষ প্রমোদ-ভবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, সে রাজার অনুচর অর্জুনসেন। তাহার কেশকলাপ সুবিন্যস্ত, চক্ষুদুটি উজ্জ্বল, বাক্যোৎফুল্ল। অর্জুনসেন প্রফুল্লমুখে বলিল—'আসুন কোদণ্ডমিশ্র আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। মহারাজের জয় হোক।'

কোদণ্ডমিশ্র বলিলেন—অগ্নিবর্মার দেহ কোথায়?'

'এই যে। আসুন।' অর্জুনসেন অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদের ভিতরে লইয়া গেল। বিশাল ভবন শূন্য, ছায়ান্ধকার; রাত্রির স্তব্ধতা যেন এখনও তাহার গাত্রসংলগ্ন হইয়া আছে। কোথাও পলাতকা সভাননিনীর দেহচ্যুত রক্তিম উত্তরীয় রক্ত রেখার ন্যায় পড়িয়া আছে, কোথাও স্খলিত নূপুর গড়াগড়ি যাইতেছে। কৃষ্ণবর্ণ শিলাকুট্টিমের উপর শুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি শব। অর্জুনসেন বস্ত্রের প্রান্ত তুলিয়া দেখাইল। মৃত্যুর কঠিন স্পর্শে অগ্নিবর্মার কামনা-বিধ্বস্ত দেহ চিরতরে স্থির হইয়াছে।

বন্ধু একবার সেইদিকে দেখিয়া চক্ষু ফিরাইয়া লইল। কোদণ্ডমিশ্র কিয়ৎ কাল মৃত মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিতৃষ্ণাসূচক মুখভঙ্গী করিলেন, তারপর রক্ষিদের বলিলেন—মৃতদেহ গঙ্গার জলে নিক্ষেপ কর। হয়তো সদ্গতি হবে।'

অগ্নিবর্মার দেহ প্রাকারশীর্ষ হইতে ভাগীরথীর জলে নিক্ষিপ্ত হইল। বন্ধু ভাবিল, তাহার পিতার দেহও এই পথে গিয়াছিল! গৌড় রাজগণের রাজপুরী হইতে নির্গমনের ইহাই বুঝি একমাত্র পথ।

অতঃপর সকলে সভাগৃহে আসিলেন।

ওদিকে রাজ অবরোধে যে বীভৎস ব্যাপার চলিতেছিল তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বেলা দ্বিপ্রহরে কোকবর্মা ও তাহার সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য শেষ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য পুরপ্রাঙ্গণে রক্ষণ করিল; রাণী শিখরিণীকে দোলায় তুলিল। তারপর বিদায় গ্রহণের পূর্বে কোকবর্মা কোদণ্ডমিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কার্যসিদ্ধির দম্ভে তাহার কদর্য মুখ আরও কদর্য আকার ধারণ করিয়াছে, মদমত্ততার বশে দেহ টলিতেছে। সে উচ্চ বিকৃতকণ্ঠে হাস্য করিয়া বলিল—'ঠাকুর, আমার কাজ শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম। তোমার রাজা আর তুমি মনের সুখে রাজত্ব কর।' বলিয়া আবার ধৃষ্টতা ভরা হাসি হাসিল।

কোকবর্মাকে দেখিয়া বন্ধুর অন্তর দুঃসহ ঘৃণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। নরকের পশুটাকে পদাঘাত করিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

কোকবর্মা বোধহয় কোদণ্ডমিশ্র ও বন্ধুর নিকট বহু প্রশস্তি ও চাটুবচন আশা করিয়াছিল, কিন্তু বন্ধুকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে শ্বাপদের ন্যায় দশন নিষ্কাশন করিয়া বলিল—'কুকুরের মাথায় রাজছত্র। কতদিন থাকে দেখব।

বন্ধু বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কোকবর্মা উচ্চ ব্যঙ্গহাস্য করিতে করিতে দ্রুতপদে সভাগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তাহার মনে যতই গরল থাক, বন্ধুর সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার দুঃসাহস তাহার নাই।

দুইদণ্ডের মধ্যে কোকবর্মার দল রাজপুরী ত্যাগ করিল। কোদণ্ডমিশ্রের সৈন্যদল তখন পুরী রক্ষার ভার লইল। তোরণে প্রাকারে শীর্ষে সর্বত্র ধনুর্ধর রক্ষিগণ পাহারা দিতে লাগিল।

সভাগৃহে বন্ধু ও কোদণ্ডমিশ্র ভিন্ন আর কেহ ছিল না; একটি রমণী দ্বারের নিকট উঁকি মারিল। বন্ধু অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কুহু। তুমি কোথায় ছিলে?'

কুহু হাসিয়া বলিল—লুকিয়ে ছিলাম।' তারপর নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—শ্রীমন্মহারাজ বঙ্গদেবের জয় হোক।'

বঙ্গের বদন কঠিন হইল। সে কুহুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কোদণ্ডমিশ্র আসিয়া বলিলেন,—কুহু। ভালই হল। এখনই রাজার অভিষেক হবে। আজই অভিষেক করব। তুমি ব্যবস্থা কর।

কুহু সবিস্ময়ে বলিল—'সে কি ঠাকুর। লোকজন কৈ, সভাসদ কৈ! কার সাক্ষাতে অভিষেক হবে?

কোদণ্ড মিশ্র বলিলেন—'আমি নগরে খবর দিয়েছি, প্রধান নাগরিকেরা এখনি আসবে। যদি না আসে তবু আমি একাই অভিষেক করব।'

'ভাল।' বলিয়া কুহু অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে গেল।

প্রধান নাগরিকেরা আসিলেন না, কেহই আসিল না। কোদণ্ড মিশ্র কয়েকজন রক্ষীকে ডাকিয়া রাজসভায় সমবেত করিলেন। অবরোধে যে-কয়জন প্রৌঢ়া-বৃদ্ধা নারী অবশিষ্টা ছিল তাহারা আসিয়া হুলুধ্বনি করিল, লাজাঞ্জলি ছড়াইল; কুহু শঙ্খধ্বনি করিল। কোদণ্ড মিশ্র বঙ্গের ললাটে রাজটিকা পরাইয়া দিলেন। বঙ্গ পিতৃপুরুষের সিংহাসনে বসিল। এইভাবে অভিষেকের হাস্যকর অভিনয় সম্পন্ন হইল।

সভা আবার শূন্য হইলে কোদণ্ড মিশ্র সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি বেদিকার উপর শয়ন করিলেন। বৃদ্ধের মনের অবস্থা অনুমান করা যায় না, কিন্তু দেহ যে ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। গত তিন চারি দিন যাবৎ তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই, নিদ্রাও যান নাই; এক সর্বগ্রাসী ভাবনা তাঁহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া বেদিকার উপর শয়ান রহিলেন।

সভাগৃহের অন্য প্রান্তে বসিয়া কুহু ও বঙ্গ নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল।

বঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল—'অবরোধের অবস্থা কি?'

কুহু বলিল—'ভাল নয়। যেন কদলী বনে একপাল বুনো হাতী ঢুকেছিল।'

'আর রাণী?'

কুহু মলিন মুখে বলিল—'রাণীকে কোকবর্মা ধরে নিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম আমার আনন্দ হবে, কিন্তু দেখে কান্না এল।'

বঙ্গ সহসা বলিল—'কুহু, চল এবার পালিয়ে যাই।'

কুহু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'সে কি, কোথায় পালিয়ে যাবেন?'

'যেখানে হোক। রাজা তো হলাম, আর কি!' বলিয়া বঙ্গ একটু তিক্ত হাসিল।

'কিন্তু—কিন্তু—এখনও যে সবই বাকি!'

'থাক বাকি। সত্যি বলছি কুহু, আমার রাজা হওয়ার সাধ মিটে গেছে, রাজার জীবনে বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে, নাগরিক জীবনে ঘৃণা জন্মেছে। এ জীবনযাত্রা আমার জন্যে নয়। আমি চলে যেতে চাই।'

কুহু গালে আঙুল রাখিয়া চিন্তা করিল, বঙ্গের মুখের উপর গুপ্ত স্নেহদৃষ্টি বুলাইল, শেষে কোদণ্ড মিশ্রের দিকে মাথা নাড়িয়া বলিল—'কিন্তু উনি? আপনি যদি চলে যান ওঁর কি অবস্থা হবে?'

বঙ্গ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'সেই একটা কথা। ওঁর এই রাজা-রাজা খেলা দেখে কৌতুক আর করুণা দুইই অনুভব করছি, কিন্তু ওঁকে ছেড়ে যেতে পারছি না।'

বেলা তৃতীয় প্রহরে একজন গূঢ়পুরুষ সংবাদ লইয়া আসিল। বলিল—'জয়নাগ ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে রাজপুরীর দিকে আসছেন।'

কোদণ্ড মিশ্র উঠিয়া বসিলেন—'জয়নাগ!'

গুপ্তচর জয়নাগ সম্বন্ধে সামান্য যাহা সংবাদ পাইয়াছিল তাহা বলিল। শুনিয়া কোদণ্ড মিশ্র শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

অল্পকাল পরে দ্বিতীয় গুপ্তচর আসিল। সে সংবাদ দিল—'কোকবর্মা জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দু'জনে একসঙ্গে পুরী অধিকার করতে আসছে।'

কোদণ্ড মিশ্রের কণ্ঠ মধ্যে অস্পষ্ট একটি শব্দ হইল। তিনি ধীরে ধীরে আবার শয়ন করিলেন।

* * * *

সঙ্কল্পিত কর্মে সহসা অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া জয়নাগ চারিদিকে গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা যে

সংবাদ লইয়া আসিল তাহাতে তিনি যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলেন। বঙ্গরাজ নামক এক যুবক নিজেকে মানবদেবের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া অগ্নিবর্মাকে হত্যা করিয়াছে এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার পৃষ্ঠপোষক কেবল কোদণ্ড মিশ্র নামধারী এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং দুই সহস্র সেনার অধিনায়ক কোকবর্মা।

কোকবর্মার পরিচয় জয়নাগ পূর্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার দুই হাজার সৈন্য ব্যতীত অন্য কোনও রাজকীয় সেনাদল উপস্থিত কর্ণসুবর্ণে নাই। কোকবর্মার সেনাদল উত্তম যোদ্ধা বটে, কিন্তু কোকবর্মা স্বয়ং অতি হীন চরিত্র ব্যক্তি। উপযুক্ত উৎকোচ পাইলে সে যুদ্ধ করিবে না।

তারপর জয়নাগ সংবাদ পাইলেন, কোকবর্মা রাজপুরী লুটপাট করিয়া সদৈন্যে নগরের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। জয়নাগ এই বিচিত্র সংবাদে উদ্বিগ্ন হইলেন, কোকবর্মা কোথায় যাইতেছে কি জন্য যাইতেছে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি চরিত্রবর্মা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি তৎক্ষণাৎ কোকবর্মার নিকট দূত পাঠাইলেন।

কর্ণসুবর্ণে কোকবর্মার রাজভবন ও সেনানিবাস ছিল। দূত সেখানে না গিয়া নগরের উত্তর তোরণের নিকট কোকবর্মাকে ধরিল। এদিকে উভয়ের কথা চলিল। দূতের প্রস্তাব শুনিয়া কোকবর্মার পাপ বুদ্ধি আবার জাগ্রত হইল। সে বলিল—'জয়নাগের প্রস্তাবে আমি সম্মত। তিনি যে গৌড় গ্রাস করবেন তা আগেই জানতাম, তাই সসৈন্য থাকতে কর্ণসুবর্ণ ছেড়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি যখন আমাকে তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন তখন আমি তাঁর দলে। যে কুকুরটাকে আমি সিংহাসনে বসিয়েছি, তাকে আমিই সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেব। জয়নাগকে কোনও কষ্টই করতে হবে না।'

নিয়তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কোকবর্মা ফিরিয়া চলিল। ইতিমধ্যে জয়নাগ প্রকাশ্যভাবে নিজে সৈন্যদের সমবেত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, গোপনতার আর প্রয়োজন ছিলনা। কোকবর্মা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি এবং বন্দিনী রাজ্ঞীকে নিরাপদে পাঠাইবার জন্য রাখিয়া জয়নাগের সঙ্গে যোগ দিল।

জয়নাগ স্থির করিয়াছিলেন নূতন রাজাকে শক্তি সংগ্রহ করিবার সময় দেওয়া হইবে না, গাছ শিকড় গাড়িবার পূর্বেই তাহাকে উৎপাটিত করিতে হইবে। তিনি কোকবর্মাকে পার্শ্বে লইয়া সম্মিলিত সৈন্যদলের অগ্রে অশ্বপৃষ্ঠে চলিলেন। নগরের অধিবাসিগণ প্রাতঃকালে যেমন শোভাযাত্রা দেখিয়াছিল অপরাহ্ণেও তেমনি শোভাযাত্রা দেখিল। কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করিল না।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

উজান স্রোত

কুহু বস্ত্রকে রণসাজ পরাইয়া দিল। বুকে পিঠে লোহার সাঁজোয়া, মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ, কটিতে তরবারি। পরাইতে পরাইতে কুহুর দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এতদিনে পাপিষ্ঠা কুহু ভালবাসিয়াছে। শুধু দেহের আসক্তি নয়, এই সরল স্বল্পবাক অ-নাগরিক মানুষটি তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছে।

বাষ্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কুহু বলিল—'চল, পালিয়ে যাই। কাজ নেই যুদ্ধে।'

বস্ত্র বলিল—'আর হয় না। শত্রু আসছে, যুদ্ধ না দিয়ে পালাতে পারিনা।'

'কিন্তু লাভ কি? ওরা সাত হাজার, আমরা মাত্র দু'শো জন।'

'তবু যুদ্ধ করতে হবে। যতক্ষণ একজন সৈনিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত থাকবে ততক্ষণ আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তা ছাড়া কোদণ্ডমিশ্র আছেন। এ আমার যুদ্ধ নয়, কোদণ্ডমিশ্রের যুদ্ধ। তিনি যতক্ষণ আজ্ঞা না দিচ্ছেন ততক্ষণ লড়তে হবে।'

বস্ত্র তোরণের দিকে চলিল। তোরণ দ্বার বন্ধ, তাহার ছায়াতলে পঞ্চাশজন যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে চোখে যুদ্ধের উদ্দীপনা ছিল না। বস্ত্রের সসজ্জ মূর্তি দেখিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। একজন অধিনায়ক সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল—'জয়নাগ আক্রমণ করতে আসছে একথা কি সত্য?'

বস্ত্র বলিল—'সত্য। তোমরা তোরণ দ্বার বন্ধ রাখো, কিন্তু এমন ভাবে বন্ধ রাখো যাতে সহজে খোলা যায়।'

'যে আজ্ঞা।'

বস্ত্র তখন প্রাকারের উপর উঠিল। আকৃষ্ট ধনুর জ্যা

অর্ধচন্দ্রাকৃতি প্রাকার, তাহার উপর দেড়শত সৈন্য যথেষ্ট নয়। তথাপি তাহারা প্রসারিত হইয়া সতর্কভাবে অবস্থান করিতেছে, শত্রু বিনাবাধায় প্রাকার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। বন্ধু সমস্ত পরিদর্শন করিয়া বুঝিল, ইহার অধিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু একটা দিক এখনও অরক্ষিত আছে। রাজপুরীর পশ্চাতে স্নানঘাট অরক্ষিত, শত্রু সেই দিক দিয়া প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। যদিও এ আশঙ্কা অমূলক, জয়নাগ এত অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট নৌকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই; তবু সাবধান থাকা ভাল। বন্ধু দশজন সৈনিককে ঘাট রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিল; যদি ওদিক দিয়া আক্রমণ আসে তাহারা গতিরোধ করিতে পারিবে। অন্তত সংবাদ দিতে পারিবে।

তারপর সূর্যাস্ত হইতে যখন আর দণ্ড দুই বাকি আছে তখন দূরে রাজপথের অন্ত প্রান্তে জয়নাগের সৈন্যদল দেখা দিল। অগ্রে দুই অশ্বপৃষ্ঠে জয়নাগ ও কোকবর্মা, পিছনে ঘনসন্নিবিষ্ট সৈন্য সমূহ; যেন তাঙ্গাল তাণ্ডিয়া বন্যার স্রোত আসিতেছে। তাহাদের সঙ্গে ভেরী-তূরী নাই; কিন্তু বিপুল জন-প্রবাহের সম্মিলিত শব্দ অবরুদ্ধ গর্জনের মত শুনা যাইতেছে।

বন্ধু তোরণশীর্ষে প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহার বক্ষে হর্ষোন্মাদনা নৃত্য করিয়া উঠিল। এ দৃশ্য যেন তাহার চিরপরিচিত। অস্তোন্মুখ সূর্যের ছটায় সৈন্যদের পদোদ্ধত ধূলা গৈরিকবর্ণ ধারণ করিয়া বিপুল বাহিনীর ঊর্ধ্বে কুণ্ডলিত হইতেছে। তাহার ভিতর দিয়া অস্ত্রের ঝকমকি, বহুবর্ণ কেতন পতাকার আন্দোলন। বন্ধু নিজের সমাসন্ন বিপদ ভুলিয়া গেল, ইহারা যে শত্রু তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার কর্ণমধ্যে রক্তের দ্রুত প্রবাহ কাঁকর-ঝঞ্ঝরীর মত ধ্বনিত হইতে লাগিল; তীব্রোজ্জ্বল চক্ষে, স্ফুরিত নাসাপুটে সে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

তোরণ হইতে অনুমান তিনশত হস্ত দূরে আসিয়া জয়নাগ অশ্ব স্থগিত করিলেন; দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা দাঁড়াইল।

জয়নাগ কোকবর্মার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। উভয়ের দৃষ্টি দুর্গের উপর; কথা কহিতে কহিতে সৈন্যদের পিছনে রাখিয়া দুই আরোহী সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

বন্ধু তোরণ শীর্ষ হইতে দেখিতেছিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদ্বয় কি কথা কহিতেছে সে শুনিতে পাইল না, কিন্তু কোকবর্মাকে চিনিতে পারিল। অন্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহ জয়নাগ। বন্ধুর চোখের দৃষ্টি কঠিন হইয়া উঠিল।

তোরণ শীর্ষের যোদ্ধারা ধনুতে তীর যোজনা করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল; এখনও শত্রু বহুদূরে, তীর নিক্ষেপ করা তীরের অপব্যয় মাত্র। সকলে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছে।

বন্ধু একজন নায়ককে কাছে ডাকিল। অশ্বারূঢ় ব্যক্তিদের নির্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—'ওরা এখান থেকে কত দূরে বলতে পার?'

নায়ক বিচার করিয়া বলিল—'আড়াইশো হাতের কম হবে না।'

বন্ধু বলিল—'ভাল। আমাকে একটা ধনু দাও।'

নায়ক বিস্মিত চক্ষু তুলিয়া বলিল—'এত দূর থেকে—'

বন্ধু বলিল—'একটা ভাল ধনুক দাও।'

অন্য যোদ্ধারা আসিয়া নিজ নিজ ধনু বন্ধুকে দেখাইল। বন্ধু একটি শার্ঙ্গ ধনু বাছিয়া লইল; ধনুর্মুষ্টি লৌহের, দুই দিকে শৃঙ্গ। চতুর্হস্ত প্রমাণ ধনু, তাহাতে মৃগচর্মের ছিলা। বন্ধু ধনুর গুণ খুলিয়া আবার টান করিয়া গুণ পরাইল। তারপর অতি যত্নে দুইটি বাণমুষ্টি পরিমিত রক্তপত্রযুক্ত শর নির্বাচন করিয়া লইল।

অশ্বারূঢ় দুইজন ইতিমধ্যে আর কিছু নিকটে আসিয়াছে; তাহারা গভীর ভাবে কোনও বিষয় আলোচনা করিতেছে। কিন্তু তাহারা এখনও দুইশত হস্তের অধিক দূরে আছে: দুর্গ হইতে তীর নিক্ষেপ করিলে তাহাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, কিন্তু বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। বিশেষত জয়নাগ ও কোকবর্মা উভয়ের দেহই লৌহজালিকে আবৃত, তীর গায়ে পড়িলেও বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

ঠিক দুইশত হস্ত পর্যন্ত আসিয়া জয়নাগ অশ্ব সংযত করিলেন: যেন অবচেতন মন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল ইহার অধিক নিকটে যাওয়া নিরাপদ নয়। দুই অশ্ব পাশাপাশি দাঁড়াইল: দুই আরোহী প্রাসাদের দিকে চক্ষু তুলিলেন।

বন্ধু ইন্দ্রকোষের ছিদ্রমুখে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে ধনুতে শরসংযোগ করিল। পাশে দাঁড়াইয়া নায়ক

অন্য তীরটি ধরিয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল—'কিন্তু এখনও দুই শত হস্ত দূরে।'

বন্ধু শুনিতে পাইল না। শর সন্ধান করিয়া ধীরে ধীরে গুণ আকর্ষণ করিল। কর্ণ পর্যন্ত গুণ আকর্ষণ করিয়া শর ছাড়িয়া দিল। টঙ্কার শব্দ হইল, যেন এক ঝাঁক ভ্রমর একসঙ্গে গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

কোকবর্মা হাস্য করিতে করিতে কিছু বলিতেছিল; তাহার মুখের হাসি সহসা মিলাইয়া গেল। সে নিজের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল একটি তীরের পুঙ্খ তাহার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আছে। বন্ধুর তীর তাহার লৌহজালিক ভেদ করিয়া বক্ষে প্রবেশ করিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে একটা শুষ্ক চিৎকার প্রায় শব্দ বাহির হইল। তারপর সে ঘোড়ার পিঠ হইতে ঢলিয়া পড়িয়া গেল। নরাধম কোকবর্মা জানিতেও পারিল না যে তাহার লালসা-কলুষিত পঙ্কিল জীবনের অবসান হইয়াছে।

জয়নাগ কিন্তু নিমেষ মধ্যে ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিজের ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া পশ্চাদ্দিকে ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। বন্ধু দ্বিতীয় শর লইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু শরসন্ধান করিবার পূর্বেই জয়নাগ লক্ষ্যের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তোরণশীর্ষে যাহারা বন্ধুর এই অদ্ভুত লক্ষ্যবেধ দেখিয়াছিল তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সাধারণ ধানুকী আধ শত হস্ত পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করিতে পারে, নবীন ধানুকী দেড় শত হস্ত পর্যন্ত পারে। কিন্তু অসামান্য শক্তি না থাকিলে দুই শত হস্ত দূরস্থ শত্রুকে লৌহজালিক ভেদ করিয়া বধ করা অসম্ভব। যোদ্ধৃগণের উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল, এমন ধনুর্ধরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া গৌরব আছে।

বন্ধু ধনু প্রত্যর্পণ করিয়া তোরণশীর্ষ হইতে নামিয়া গেল। সে মনে বিশেষ কোনও উল্লাস অনুভব করিল না, কেবল ভাবিল—'রাজা চরে অন্যত একটা সৎকার্য করেছি।'

ওদিকে কোকবর্মার তীরবিদ্ধ দেহ শবের উপর পড়িয়া ছিল, তাহার ঘোড়াটা পলায়ন করিয়াছিল। শত হস্ত পশ্চাতে বিশ্বস্তাহত সেনাদলের সম্মুখে জয়নাগ নিম্ন অধীনস্থ সেনানীদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রাসাদের রক্ষীরা যত অল্পসংখ্যক লোক তাহারা যুদ্ধ করিবে, স্বেচ্ছায় তোরণদ্বার খুলিয়া দিবেনা। জয়নাগের সঙ্গে হস্তী নাই, দ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার উপযোগী যন্ত্র নাই। এখন কী কর্তব্য!

ক্রমে সূর্য চক্রবাল রেখা স্পর্শ করিল; রাত্রির আর বিলম্ব নাই। প্রাসাদের রক্ষিসৈন্যদের মুখেও উদ্বেগের ছায়া পড়িল। তাহারা নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে জল্পনা করিতে লাগিল: রাত্রি হইলে প্রাসাদ রক্ষা করা কিরূপে সম্ভব হইবে? অন্ধকারে গা ঢাকিয়া শত্রু যদি পাঁচ দিক দিয়া প্রাকার উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করে তবে তাহাদের নিবারণ করার উপায় কি? একবার তাহারা তোরণদ্বার খুলিয়া দিতে পারিলে আর রক্ষা নাই, পুরীর সকলকে মরিতে হইবে।—

বন্ধু বক্র তোরণ দ্বারের সম্মুখে কুঞ্চিত ললাট পাদচারণ করিতেছিল এমন সময় বাহিরে দূরে বহুজনের কলকোলাহল উত্থিত হইল। কোলাহল ক্রমশ কাছে আসিতেছে। তোরণ শীর্ষ হইতে একজন যোদ্ধা ডাকিয়া বলিল—'ওরা আক্রমণ করতে আসছে।'

নীচে হইতে একজন নায়ক প্রশ্ন করিল—'কতজন?'

'তিন চার শো। একটা গো-শকট ঠেলে নিয়ে আসছে, বোধহয় তোরণদ্বার ভাঙবার জন্য।'

বন্ধু ত্বরিতে প্রাকারে উঠিয়া একবার দেখিয়া আসিল। তারপর নিম্নে দ্বার-রক্ষীদের বলিল—'তোমরা প্রস্তুত থাকো। ধনুর্বাণ রাখো, তরবারি নাও। আমি যা আদেশ করব তাই করবে।'

আক্রমণকারীরা কাছে আসিতেছে। তাহারা লক্ষ্যান্তরে আসিলে প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত শর তাহাদের মধ্যে গিয়া পড়িতে লাগিল; তাহারা বামহস্তে চর্ম তুলিয়া ধরিয়া শর নিবারণ করিতে লাগিল। দুই চারি জন হতাহত হইল, কিন্তু তাহাদের গতি রুদ্ধ হইল না।

তোরণদ্বারের ভিতর দিকে পঞ্চাশজন অসিধারী যোদ্ধা অপেক্ষা করিয়া রহিল। তারপর শত্রুদল গো-শকট ঠেলিয়া সবেগে দ্বারের উপর আঘাত করিল। দ্বার অটুট রহিল বটে কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে বারম্বার এইরূপ আঘাত পাইলে দ্বার ভাঙিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় বার গো-শকট দ্বারের উপর সবেগে প্রক্ষিপ্ত হইল। তারপর বাহির হইতে উচ্চ পরুষ কণ্ঠস্বর আসিল—

'শোন সবাই। তোমরা খুবী রক্ষা করতে পারবে না। যদি দ্বার খুলে দাও, যোদ্ধারা সকলে মুক্তি পাবে, জয়নাগ সকলকে নিজ সেনামধ্যে স্থান দেবেন। কিন্তু যদি বাধা দাও, রাত্রি দিতে কাউকে রাখব না। যদি ইষ্ট চাও দ্বার খুলে দাও।'

কিছুক্ষণ দ্বারের উভয় পক্ষ নীরব, কোনও শব্দ নাই। তারপর বজ্র তরবারি নিষ্কাশন করিয়া বলিল—'দ্বার খুলে দাও।'

বজ্রের পশ্চাতে যে পঞ্চাশ জন রক্ষী ছিল তাহারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিল। সকলে তরবারি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইল।

দ্বার খুলিয়া গেল। এত শীঘ্র দ্বারোন্মোচনের জন্য শত্রু প্রস্তুত ছিল না, তাহারা ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া রহিল। এই অবকাশে বজ্র ও তাহার দল সিংহনাদ করিয়া তাহাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।

অতর্কিত আক্রমণে প্রথমেই শত্রুদলের অনেক সৈনিক কাটা পড়িল। তারপর প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বজ্রের পক্ষে পঞ্চাশ, বিপক্ষে তিন শত। কিন্তু বজ্র একা এমন মত্তহস্তীর মত যুদ্ধ করিল যে কেহই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। তাহার সৈন্যগণও তাহার আদর্শে উদ্দীপিত হইয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিল। শত্রুপক্ষ যেন হতবুদ্ধি হইয়াই পলায়নে আরম্ভ করিল। প্রায় অর্ধদণ্ড যুদ্ধ হইবার পর জয়নাগের দল গো-শকট ফেলিয়া মূল সৈন্যদলে ফিরিয়া গেল। বজ্রের রক্ষীদল বিজয়োল্লাসে শকট টানিয়া ভিতরে আনিল এবং আবার তোরণদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিল।

বজ্র সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ছিল; তাহার পক্ষের কয়েকজন যোদ্ধা অল্পবিস্তর আহত হইয়াছিল, কেহ মরে নাই। সকলে মহোল্লাসে বজ্রকে ঘিরিয়া কলরব করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের উল্লাস অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। সূর্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। একজন প্রবীণ যোদ্ধা অগ্রে আসিয়া বজ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'মহারাজ, আপনার মত বীরের পাশে যুদ্ধ করতে করতে আমরা প্রত্যেকে প্রাণ দিতে পারি! কিন্তু প্রাণ দিয়ে লাভ কি? আপনাকে রক্ষা করতে পারব না। ওরা অসংখ্য, আমরা মাত্র দুই শত। শেষ পর্যন্ত হার মানতেই হবে।'

বজ্র বলিল—'তোমাদের ইচ্ছা কি?'

নায়ক বলিল—'আমরা আপনার বেতনভুক, যতক্ষণ আদেশ করবেন ততক্ষণ যুদ্ধ করব। কিন্তু প্রাসাদ রক্ষা করা যাবে না। আমাদের প্রাণ তো যাবেই, আপনারও প্রাণ যাবে। তার চেয়ে আপনি যদি গোপনে প্রাসাদ ত্যাগ করেন তখন আমাদের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। আমরা যেমন ইচ্ছা করতে পারব।'

বজ্র একটু চিন্তা করিয়া বলিল—'আমিও নিরর্থক নরহত্যা চাই না। কিন্তু কোদণ্ড মিশ্র আছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন। তুমি এস আমার সঙ্গে।'

দুইজনে সভাগৃহের অভিমুখে চলিল। কুহু পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রাসাদের মধ্যে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল, সে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রের সঙ্গে চলিল।

সভাগৃহ প্রায় অন্ধকার। কোদণ্ড মিশ্র বেদিকার উপর পূর্ববৎ শুইয়া আছেন। বহুক্ষণে বৃদ্ধ গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু এখন না জাগাইলে নয়। বজ্র তাঁহার কাছে গিয়া ডাকিল—'আর্য কোদণ্ড মিশ্র!'

কোদণ্ড মিশ্র উত্তর দিলেন না। বজ্র আবার ডাকিল, এবারও তিনি নীরব। তখন বজ্র তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া দেখিল অঙ্গ হিমবৎ শীতল। কোদণ্ড মিশ্র আর জাগিবেন না।

বজ্র কুহুর দিকে ফিরিয়া বলিল—'কুহু, যাঁর জন্য যুদ্ধ তিনি নিজেই চলে গেছেন। সুতরাং আমাদের পালাতে আর বাধা নেই।' সেনানায়ককে বলিল—'তোমরা দুর্গের দ্বার খুলে দাও। যুদ্ধ শেষ হয়েছে।'

ক্রমশঃ

পুনর্গতিময়

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সবার আকর্ষণে সেবার কড়লফ সেখানের সুন্দর বিদ্যালয়ে। নাম—School of Design. সেখানে বন্ধুবর হরিদাসকে প্রথম দিন দেখলাম—ধুতি প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে। আমরা এদেশে ধুতি পরি বেশ একটু লজ্জাভাবে—চাদরটা সবাই ঢাকায়, তবে : কোন্ চিড়িয়াখানার চিড়িয়া ছাড়া পেয়েছে মো ? তাই বন্ধুবরকে বেপাওাও ওদের পরে বড়লোক ক'রে বলতে সাহস পাই না যে এদেশে খাঁটি বাঙালিবাবু ধুতি ছেড়ে বেরুবে না কেন ? কিন্তু যদি বলি—এদেশে ধুতি পাঞ্জাবী পরে এলে কখনো সাহেব অপমান চাবে—তাহ'লে টাঁরা তর্ক করবেন কিনা বুঝতে পারছি না কিন্তু আমি অনেকদিন থেকে এই দুঃসাহস দেখিয়ে আসছি যে এদেশে কেউই কেউ করে নি, আমিই করি না কেন ? এ প্রশ্ন তোলা-চাপকানও তো এদেশে "নতুন কিছু করা" নয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়দের কাছে হবে এদেশে প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে ধুতি পাঞ্জাবী প'রে বেরুনে এ রাজ্যে কেন, এদেশে ধুতি পরলে মারা পড়বে যে—এ ধারণার বিরুদ্ধে যদি সাহিত্যিকরা অভিযান। এমন কিছু ঘোর নয়—বিদেশে বিনয়ে যেমন। বিলেতে জানুয়ারি মাসে গাঁও বেশকার চেয়ে বেশি হবে। বিলেতে যদি ধুতি পরা চলে, এখানে চলবে না কেন শুনি ? তারা সেই কাজ কেন করতে সাহস পেলো না ? বরঞ্চ তাঁরে বেশকার ধুতি চাদর প'রে প্রথম দিন ভারতীয় কলেজের ক্লাসে ঢুকতেই ছাত্রীরা হিসেবে—হেসে জানুয়ারি। কই ! কেউ তো হাসছে না দেখিয়ে বিলেত ! তারপর থেকে ধীরে সুস্থে ধুতি প'রে বেড়াতে লাগলাম—বিলেত ক'রে বড় বড় হলে গায় যাওয়া হ'লে। ইন্ডিয়া লাউঞ্জ পাড়ি প'রে, আমি পাইজামা ধুতি প'রে। কই, কেউ তো হাসল না অপমান। বরং অনেকেই বলতে লাগল : "কী সুন্দর বেশ—এই ধুতি পাঞ্জাবী !" পরে আমার সাহস বেড়ে গেল—প্রায়ই সময়ে সময়ে ধুতি বেড়াতে লাগলাম এখানে ওখানে ধুতি প'রে। সবাই চেয়ে চেয়ে দেখত, হাসে তো তোপা-চাপকান প'রে বেরুলেও হাসে। হাসুক। কত হাসবে ? যাই হোক, যা বলছিলাম বলি।

পরদা যাই হোক্ সেদিনের মত হলে হরিদাস বক্তৃতা দিল শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে। বড় সুন্দর বলল। তাকে আমি বললাম তার বক্তৃতার সারমর্ম আমাকে দিতে, আমার প্রবন্ধ-কাহিনীতে জুড়ে দেব। সানন্দে হরিদাস বলল হাসিমুখে : তথাস্তু। শুধু বলা নয়, করা। পরদিনে। লিখে দিই আগে সেটুকু—কার না ভালো লাগবে এমন সুন্দর ভাষা, এমন পণ্ডিতের লেখনীজাত ? অবশ্য এ-আলোচনাটুকু ওর ইংরাজি বক্তৃতার তর্জমা।

হরিদাস বলল : "আমি আজ আপনাদের কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু বলব। যোগ সম্বন্ধে এবং বিশেষ সম্বন্ধে এখানে অনেকেরই আগ্রহ যথেষ্ট আছে। যোগ বলতে অনেকেই এখানে জানে কয়েক ম্যাজিক ভাইটাল কিছু, অথবা অলৌকিক কোনো শক্তিপ্রদর্শন, যেমন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, অথবা কাচের টুকরো খাওয়া, অথবা পয়ালদের বসে শূন্যের উপর ওঠা, ইত্যাদি। কিন্তু এ যে কতবড় ভুল তা' হিন্দুধর্মের যে কোনো ভাল বই পড়লেই আপনারা বুঝতে পারবেন। "যোগ" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দুইটি : Union এবং control, সংযোগ এবং সংযম। সুতরাং যোগ কথাটির নিহিতার্থ হ'ল আত্মসাধনে, অর্থাৎ যার দ্বারা দিয়ে ভগবানের সঙ্গে মানুষের সহজের সংযোগ, অসীমের সঙ্গে সসীমের সংযোগ, শিবের সঙ্গে শক্তির সংযোগ, আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ। এই সংযোগের ফলে আসে চিত্তের সমতা ও বুদ্ধির নমনীয়তা, যা' নাকি পরম জ্ঞানের লক্ষণ। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে "Integration of personality," অর্থাৎ মানুষের মনের ও সত্তার সর্বাঙ্গীণ ও সুসমঞ্জস আত্মবিকাশ, যোগ সেইরূপ আত্মবিকাশের প্রণালী ও উপায়ের নির্দেশ দেয়।

হিন্দুধর্ম বলতে অনেকে মনে করেন কতগুলো বহুদাবিলাস ও কর্মবিমুখতা। এ ধারণা যে কতবড় ভ্রান্তি তা' আপনারা বুঝতে পারবেন যদি হিন্দুধর্মের বাইবেল স্বরূপ "গীতা" পাঠ করেন। গীতার মূলমন্ত্র হ'ল কর্ম, ভাগবত কর্ম, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের ভিত্তিতে বিধায়িত লীলায়িত কর্ম। আমেরিকা কর্মে বিশ্বাস করে, তাই কর্মের বেশাতে যেতে উঠেছে। কিন্তু কর্ম যখন শুধু কামনা ও ভোগলিপ্সায় পরিপুষ্ট হয় তখন তা' বন্ধনের কারণ হয়, সমাজে অশান্তি আনে, অন্তরের সুস্থতা ও চারিত্রের বাড়িয়ে তুলে। কর্মযোগ হ'ল জ্ঞানমিশ্র, নিষ্কাম কর্মের ওজনহস্ত, যা' অন্তর ঘরে দেয় ভাগবত-সম্পদে এবং সমাজ-জীবনে শান্তি, প্রেম ও সুষমার সমুদ্ভব করে তোলে। দক্ষিণাত্রত ভারতের যাঁরা মহাত্মা গান্ধী গীতার এই কর্মযোগ থেকেই নিজের জীবনের অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। আর বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দ গীতার শিক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে জগতকে শিখিয়েছেন—কী করে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব এবং কী করে এই সমন্বয়ের মধ্যেই পৃথিবীতে ভাগবত-জীবন রচনার চাবিকাঠি নিহিত আছে। আমার পরবর্তী বক্তৃতায় আমি এই সমন্বয়ের মূল ধারাটি আলোচনা করবো।

সুখের সৌভাগ্যের বিষয় যে আজ আমাদের মধ্যে ভারতের দুইজন পাইজামা ঋষি ও মনীষী উপস্থিত আছেন—শ্রীদিলীপকুমার রায় ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। আপনাদের যা প্রশ্ন আছে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দিলীপকুমার দুটো ভক্তিমূলক গান গাইবেন এবং ইন্দিরা দেবী গুরু মাস্টারের মূল গ্রন্থ থেকে আপনাদের কিছু পড়ে শুনাবেন। আগামী রবিবার রাত্রি ৮টার সময় তাঁরা এখানে এসে একটি কনসার্ট দেবেন।"

তারপর ইন্দিরা পাঠ করল গুরু নানকের বাণী গুরুগ্রন্থ থেকে। শ্রোতৃবৃন্দ তাকে যে ধন্যবাদ দিলেন তার মধ্যে আন্তরিকতার আমেজ পেয়ে মন খুশি হ'য়ে উঠল। পরিশেষে আমি গাইলাম একটি মীরা ভজন —পিলালো থাড়িয়ে।

গান সারা হ'লে ভোজন সুরু হ'ল। শেষার সাহেব পরম আমায়িক। বীণার সঙ্গে রান্নাঘরে ঢুকে তাকে সাহায্য করা সুরু করলেন। বললেন যে তাঁর এখন বৃহৎ পরিবার, তাই হরিদাস, বৌমা বীণা, দুই প্রাতুষ্পুত্রী। বড় সংসার মানুষটি। হরিদাস বিদেশে এমন বন্ধু পেয়েছে যাঁর মধ্যে রসিকজন সংযোগ হয়েছে—অর্থাৎ শেষারের হৃদয়ের মণি ও কোহাপারের কাকন। তৈলে এ ধরণের আত্মগুপ্তার দেশে হরিদাস সপরিবারে এমন সুখে বাস করতে পারত কি না সন্দেহ। তবে "ভাগাবানের বোঝা ভগবানে বয়" বলে না? হরিদাস বিদ্বান্ সজ্জন। কিন্তু সেই সঙ্গে ভাগ্য কাঁধ মেলালে যা হয় তাই তো নাম সোনায় সোহাগা। ইন্দিরা শেষারের স্বভাবে মুগ্ধ হ'য়ে বলল তাঁকে: "জানেন—আমি লালাকে একবার বলেছিলাম যে শেষার ভাগ্যবান্ যে হরিদাসের মতন ভাই পেয়েছেন। কিন্তু এখন ঠিক করতে পারছি না—হরিদাস আরো বেশি ভাগ্যবান্ কিনা এমন দাদা পেয়ে।" তবে আমার মনে হয় ভাগ্য বেশি প্রসন্ন হরিদাসেরই। কারণ বিদেশে এমন বিদ্বান্ মনস্বী তথা ধনী বন্ধুর শুধু স্নেহস্পর্শই নয় প্রত্যক্ষ আতিথেয়তা পাওয়া! তবে একটা কথা আছে: "It is more blessed to give than to receive." এখানে দুজনের মধ্যে কে বেশি দিচ্ছে? এ-প্রশ্ন ক'রেই আজ ক্ষান্ত হই, সমাধানের ভার চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকার উপর ন্যস্ত ক'রে।

হোটেলে ফিরে মনে এক বিচিত্র ভাবোদয় হ'ল। কালচক্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনসংগ্রাম জটিলতর হ'য়ে আসছে—হয়ত নানা বিষয়ে নৈতিকতার শিথিলতা তথা ভ্রষ্টাচারও বাড়ছে। কিন্তু—মনে হ'ল—এদিক দিয়ে ক্ষতির পরিমাণ যাহোক এটা যদি মেনেও নিই, তাহ'লেও কি বলা চলে না যে অন্য একদিকে মানের ভোঠাতেও কিছু অন্তত জমা হচ্ছে: অর্থাৎ মানুষ নানা বাহ্য শত্রুবানকে ডিঙিয়ে আন্তর-মৈত্রীর অঙ্গনে পরস্পরের কাছে আসছে? শেষার মহৎ মানুষ, হরিদাসও অতি সজ্জন। কিন্তু আগেকার যুগে এ-ধরণের দুটি ভিন্নদেশী কি এভাবে বন্ধুতা করতে পারত শুধু প্রীতি ও স্নেহের মূলধনে?

* * *

কনলাল সুলেন সাহেব টেলিফোন করলেন, প্রেস কনফারেন্স হবে আমাদের কেন্দ্র ক'রে। জনশ্রুতিতে শোনা ছিল প্রেস-কনফারেন্স মানে হচ্ছে—পাঁচ বাঘারে—প্রেস প্রতিনিধিদের হাজারো রোমহর্ষক প্রশ্নের জবাব দেওয়া। কাজেই একটু ভয় পেয়ে গেলাম বৈকি, আগে এই জন্যে যে পকাপোক্তে মন না দিয়ে আমেরিকায় এসে বহু আমেরিকানদের ইংরাজি উচ্চারণ শুনতে শুনতে শেখ যাচ্ছে—যমমর্ধরের ধর্মী অন্তত এর চেয়ে বেশি বোধগম্য হ'ত। যাহোক ধন্য সাহেব-পুরাণে যখন বলেছে "যা যুদবে তেম্নি ফল ফলবে" তখন নিরুপায়। ভরসা ছিল ইন্দিরার প্রতি তীক্ষ্ণ—প্রশ্ন যদি না যায়, মানটা হয়ত উনি টার টেঁকে যাবে। ফলের পরিচ্ছেদে।

গভর্মেন্টের প্রতিনিধি হ'য়ে প্রেস কনফারেন্সের জন্যে আমার কথামৃতের বীজবপনের ভরসা জনান বৈকি—যার নাম পাবলিসিটি। কিন্তু সেকথা থাকগে। উপস্থিত, কনলালের প্রথানে যেতে না যেতে এল সপরীরে তিন তিনটি প্রেস রিপোর্টার। শুনলাম work-day ব'লে পার পেলাম, নইলে হাজিরি দিতে আধাডজন।

ওদের একজন এসেই ফ্ল্যাশ লাইটে নিল আমাদের ছবির পর ছবি। আমি ছোপা চাপকান প'রে, ইন্দিরা শাড়ি। তারপর সুরু হ'ল প্রশ্নের তীর-বাজি। তখন তাদের বিদায় দেব, না বন্ধুবর বেব ভেবে পেলাম না—যেহেতু তাদের প্রশ্নের আধাআধি আমার কানেই ঢুকল কিন্তু বক্তব্যের নাগাল পেল না। যাহোক ইন্দিরা এগিয়ে এল অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে। আমাকেও কিন্তু বলতে হ'ল বৈকি: যোগ কী বস্তু, আশ্রম-বাসের অর্থ কী, আমেরিকা কেমন লাগছে, স্পিরিচুয়ালিটি বলতে কী বোঝাচ্ছে—আরও কত কী মাই সহের। যা পারি বললাম: বলাবাহুল্য কাগজে বেরুল আমাদের ছবি বটে—উপরে তাজ্জবলাগান শিরোনাম মোটা হরফে "YOGA EXPONENTS TO TEACH GIVE CONCEIT" তার পরে কুইকতর মোটা হরফে: "Two Pursuers of the 'Inner Light' Here from India."

শিরোনামা দেখে একটু স্তম্ভিত না হ'য়ে উপায় কি? তবে যাহিটুকু প'ড়ে ঈষৎ আশ্বস্ত হওয়া গেল। পেসিমিস্ট বলে তাকে যে মনে—ভালো হ'ত আরো ভালো হ'লে। অপ্টিমিস্টের মন্ত্র: "মন্দের ভালো।" মনকে বোঝালাম: "ভোলা মন, অপ্টিমিস্ট হ'তে বাধা কি? এ হ'ল আমেরিকা—ভাবো ওরা আরো কত কী লিখতে পারত যা লেখে নি, গুরুর কৃপাই বলব।" তবে একটা মন্তব্য উদ্ধৃত করি রসিকদের কাছে রস পরিবেষণ করবার মহদুদ্দেশ্যে। আমাকে ওরা জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের যোগের কী উদ্দেশ্য। আমি বলেছিলাম, যথাসম্ভব শুদ্ধগতীর ভাষায়, যে শ্রীঅরবিন্দ চান চেতনার রূপান্তর—Transformation of consciousness. 'চৈতন্য' ওকে consciousness সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলাম যা লিপিবদ্ধ হ'লে হয়ত অনেকেই বাহবা পেতেন কী বলছি, কিন্তু এটুকু অন্তত মানত যে কথাগুলি গালভরা, খুড়ি কানভরা। কিন্তু ওরা—(হয়ত এখানে conscious শব্দটি ওদের কাছে mysticism শব্দটির মতন প্রতিকটু ভাবে ব'লেই।—রিপোর্ট শুধু লিখল যে আমি বলেছি: "We start by trying to transform ourselves. If we do, then we have enough light to give to others"—তা একথার নিহিতার্থ যাই হোক। হাজার, এটুকু বলে থাকলেও যা কথা ছিল, কিন্তু ওরা লিখল তার পরেই: "Roy has been transforming himself at the Ashram for twenty-four years, Miss Indira, for three."

হয় তাহাতেই বলতে হবে আমার মনোভাব ব্যক্ত হ'ত, কিন্তু তবে দেখবার যে ওই চাহনিই নির্ণয় হ'তে যায়নি। ঐ যে বলনাম, আরো কত কীই যে নিহিত থাকত! নিশ্চয় থাকত—কিন্তু দেখতে আমাদেই হবে। কারণ বোধহয় এই যে, আমাদের আকৃতি ওদের খুব পছন্দ লাগেনি। কারণ মনে হয়, ওরা হয়তো হ'তে পেরেই লিখেছিল আমার বর্ণনা "grey-haired, benevolent-smiling, respectable plumpish man of fifty-six." এবং ইন্দিরার: "Miss Indira Devi, thirty-two, blue-eyed and with the red-spot of the Brahmin on her forehead." এরা এক একটি কথা হয়তো বুঝে ফেলে, যথা "ব্রাহ্মণ" বা "আসন"। এর পরেই দেখবার বিখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহিনের ছবি—তিনি "আসন" পিঁড়েতে বোস্ এক ঘোড়ীর কাছে—জিভ বের ক'রে ব'সে—সত্যি বলছি। আর সে কি লোভ! জিভ! পরবর্তীদের মাথায় সুমতিতে হয়তো তাই "এই এতো বড়"! তখন তখনকে পুনরায় ধন্যবাদ দিলাম: "প্রণমামি কৃপাময়ম্বয়ীন্দ্র্"

ক্রমশঃ

রামায়ণী

শ্রীঅসিতকুমার হালদার

মেঘদূতের গোড়াতে যেমন এক বৎসরের শুরে বিরহীমনকাশে কান্তা-বিরহে অধির হ'য়ে (ভূতলশয্যা হলেও) সর্বহারাটিকে যেমন (১ম শ্লোকে) বিরহীপুরুষে চুকিয়ে হ'তে দেখে সবাইকে আহ্বান ক'রে ওরকম পুরো মানুষ বদল ক'রে আনতে বলেছেন, তেমনি রামও রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের পর পৃষ্টবিরহে মনীষাকে চুকিয়ে ক'রে বলছেন (লঙ্কাকাণ্ড ৩ সর্গ, ১৩ শ্লোক):

ন মে দ্রাঘীয়সী ত্রিংশ দ্বে মে দুঃখায়তেতিথি
এতেষামুপপন্নোহি বধোঽপ্যাকৃতিদারুণে।
যা তিষ্ঠত্যাহতা বালা তাং স্মরন্তী মমাপ্রিয়ম্
ইতি মে গাত্রসংস্পর্শক্লেশং বুদ্ধিঃ সমাধয়ঃ।

—প্রিয়ে যে দূরে আছেন বা। অল্পতা তার জন্যে দুঃখ নেই; কিন্তু রাবণ যে বাস দুই সময় দিয়েছে সীতাকে, তার জন্যে যে অবশিষ্ট চৌদ্দদিন তার অতীত হচ্ছে তারই জন্য শোক। সখীগণ! জানকী যেখানে আছেন হয়তো যাও—তাঁর অঙ্গস্পর্শ ক'রে এসে আমায় অঙ্গস্পর্শ কর।

মেঘদূতেও ঠিক এই ভাবেই। পূর্বমেঘ ৪৭ শ্লোকে) আছে:

প্রত্যাদেশান্ন খলু ন ভবান্ পঙ্কজাক্ষীবিয়োগ-
ব্যক্তং দুঃখং বহতি বিধুরা ত্বদ্বিপদ্ভাবনা যা।
কাঠিন্যং মে হৃদয়নিহিতং প্রেমরাশীভবন্তী
প্রত্যাসন্নে নয়নযুগলস্পন্দশঙ্কী প্রবৃত্তম্।

কেবল তফাৎ এই—বায়ুর মুখে মেঘদূতে যক্ষ মেঘকে নিবেদন করছেন প্রতিদূতের মর্যাদায় ক'রে বেশ একটু আড়ম্বর ক'রে। যক্ষেরও যেমন অকালে প্রিয়ার মরণভয় দেখা দিয়েছে—রামেরও ঠিক তাই।

মেঘদূতে কবিকালিদাস যেরূপ যক্ষের মুখে মেঘকে যাবার পথে নানা দৃশ্যের বর্ণনা ক'রে দেখিয়েছেন, তেমনি রামও লঙ্কাজয়ের পর রথে সীতাকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনার কালে (লঙ্কাকাণ্ডের ১২৪ সর্গে) গগনপথে রথে যাবার সময় পথের স্থান ও বৃত্তান্তাবলীর বর্ণনা করেছেন। মেঘদূতে (পূর্বমেঘ, ৫৮ শ্লোকে) যে ক্রৌঞ্চপর্বতের রন্ধ্রপথের কথা পাওয়া যায়, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪০ সর্গে ২৪ শ্লোকেও তার উল্লেখ আছে। রামায়ণে (সুন্দরকাণ্ড ৩৪ সর্গ। ২১ শ্লোকে) সীতা বলছেন:—'স্বপ্নেও যদি রামকে দেখতে পাই।' আর (উত্তর মেঘে ৩৮ শ্লোকে) মেঘদূতে আছে—যক্ষ বলছেন—"স্বপ্নেও যদি প্রিয়া আমাকে অল্পকালের জন্যে কুশবন্ধনে পান।" মেঘদূতে যক্ষ বলছেন—"পাশ অবসানে বীতশোক হয়ে কান্তার বেণীসংহার নিজ হাতে করব" (উত্তর-মেঘ ৩১ শ্লোক); ঠিক এই ভাবেই রাম বলে আছে: সরমা সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন:—(লঙ্কাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ, ৩২ শ্লোক) "সীতা, তুমি যে কয়েক মাস রাবণবিলম্বিত এক বেণী ধারণ করেছ, মহাবল রাম তা' শীঘ্রই নিজ হাতে মোচন করবেন।" মেঘদূতের পূর্বমেঘে ৫৪ শ্লোকের গোড়ায় যেমন—কৈলাস অঙ্কে শ্রেণী রচা কিন্নরাদের ঘরে পড়ার বিষয় উল্লেখ আছে:—(ত্রিভোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব ভূতরক্ষা গুহাদ্যাঃ) তেমনি উপমার ছলে রামায়ণে (সুন্দরকাণ্ড, ১৪ সর্গ, ২৯ শ্লোকে) আছে;

অস্তাদ্রিমনুপতা শ্রিয়ক্ত পতিতাংশ্রিয়াম্
চলেনিপতিতাত্রেয়ন্তাদপৈক্ষন্তপশোভিতাম্।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, ১৬ সর্গে আছে রাবণ কৈলাসগিরি উত্তোলিছিলেন এবং উত্তরকাণ্ডে ২১ সর্গে ১৯ শ্লোকে আছে:

প্রপাতপতিতৈর্নীরৈ
র্মাটহাসনিবাদুভিঃ।

এই দুই ব্যাপার মেঘদূতের (পূর্বমেঘ, ৫৯ শ্লোকে) আছে:

গরা গৌরীবদনপবনপ্রস্থভাজঃ পিসক্ষে:
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃস্যা।

পুরোপান্তাঃ কুসুমবিশদৈর্যো বিতন্বন্নিব ত্বং
বাসীভূত প্রতিদিবমিবাভ্যুক্তকাটহাসঃ।

অনন্তর উত্তরদিকে রাবণের বাহুপাশে রুদ্ধ সাগরকে যেখানে বিশিষ্ট হয়েছে এবং যারা অমরবন্দীর দর্পবিমর্দন (ভুজমুক্ত) সেই কৈলাস-পর্বতের অভিমুখে যাও।

কুসুম-ধবল এই পর্বত তুষারশুভ্র গগন ব্যাপিয়া অবস্থিত। দেখলে মনে হয় মহাদেবের প্রতিদিনের অট্টহাস্য যেন রাশীভূত করা হয়েছে।

রামায়ণের উক্ত শ্লোকটিতেই আছে, রাবণ কৈলাস শৈল উর্দ্ধে উঠিয়ে ধরায় ফলে পার্বতী চঞ্চলা হয়ে শংকরকে আলিঙ্গন করলেন। মেঘদূতে (পূর্বমেঘের ৫২শ্লোকে) আছে:

যমারাভ্যুদ্ধিতসময়ে যান্তমুদ্বীক্ষ্য সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয়সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি।
—গুরু গরজন গুমিয়া তোমায়
সহচরী যবে শিহরি চরি
চমকি যাঁধিবে আলিঙ্গনেতে···ইত্যাদি।

কালিদাসের মেঘদূতের পূর্বমেঘের ৬১ শ্লোকের সঙ্গে এইভাবে বাল্মীকি রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ২৮ সর্গের ২ এবং ৪ শ্লোকের তুলনা করা যায়। যথা:

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ঃ শম্ভুনাম্নুদ্যতস্য
ক্রীড়া শৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গী ভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণাগ্রায়ণী।

—মহাদেব ক্রীড়া শৈলে ভুজবলয় ত্যাগ ক'রে গৌরীর হাত ধ'রে পদচারণা করলে তুমি আগে আগে যাবে এবং নিজ অন্তরস্থ জলপ্রবাহ দ্বারা ঘনীভূত হয়ে পর্বত রচনা করে মণিসোপান তৈরী করলে পার্বতী সুখে উঠে যাবেন।

রামায়ণেও ঠিক এইভাবে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ২৮ সর্গ, ৩-৪ শ্লোকে। আছে:—

অয়ং সকাশঃ সংপ্রাপ্ত সময়োঽয়ঞ্জনাশ্রয়ঃ
সংপক্ক জং নভো মেঘৈঃ সংবৃতঃ গিরিগৈরিবৈঃ।
পক্ষাম্বরবলাকস্থ মেঘ সোপান পংক্তিভিঃ
কূটমর্জুনবর্ণাভিরলংকর্তুং দিবাকরঃ।

—মেঘ, বর্ষাকাল আসন্ন হয়েছে; পর্বততুল্য মেঘে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন।··· এই মেঘের সোপান পংক্তি দিয়ে আকাশে উঠে কূটমর্জুনসুশোভন আকাশ সূর্যকে অলংকৃত করা যেতে পারে! (কূটের দ্বারা মেঘকে যক্ষ যে অর্চনা করেছেন, তারও ইঙ্গিত এতে পাওয়া গেল।)

মেঘদূতের উনিশটি শ্লোকে যে শম্ভুর লীলাবিহারের কথা আছে, তার বিবরণ বাল্মীকি রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে (১৬ সর্গ, ১০ শ্লোকে) আছে: নন্দী বলছেন:

নির্বর্তয়ধ্বং শৈলেন্দ্রাৎ শীঘ্রতি শংকরঃ
সর্পনাগরক্ষাগাঃ দেবগন্ধর্বরক্ষসাম্।

—সর্পগণ! ফিরে যাও, এই পর্বত শংকরের লীলাভূমি। এইস্থান পক্ষী, নাগ, যক্ষ, দেব, গন্ধর্ব বা রাক্ষসেরও অগম্য।

বাল্মীকি-রামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে (১৪ সর্গে ১৩ শ্লোকে) আছে:

সৌবর্ণ-রাজতৈস্তাম্রৈর্দেশে দেশে তথা শুভৈঃ।
পর্বাকীর্তা ইবাভান্তিপথাঃ পরমবল্গিভিঃ।

—সুবর্ণ, রজত ও তাম্র থাকায় কাঞ্চনময় পর্বত হস্তীর মত শোভা পাচ্ছে।

মেঘদূতে আছে:

রেবা দ্রক্ষ্যত্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা:,
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমাঙ্গপ্রভস্য।

—রেবা নদী অসমান উপলে পতিত হয়ে বিন্ধ্যপাদদেশে বিস্তৃত হচ্ছে। দেখে মনে হয় যেন গজ অঙ্গে বিভূতির চিত্র রচনা।

প্রত্যেক জাতি বা দেশের কবিকল্পনা বা শিল্পকলা সে দেশের প্রাচীন কবিদের এবং প্রাচীন শিল্পীদের ঐতিহ্যের উপর (Tradition) যে নির্ভর করে তা' এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টই অনুমিত হয়।

নাটকীয় ভঙ্গীর প্রয়োগ (Dramatic action) রামায়ণের বহু স্থানে আছে। তার সকল বিবরণ দেওয়া সাধ্য নয়। যেমন রাবণের বর্ণনায় (সুন্দরকাণ্ড, ১৮ সর্গে) আছে:

পক্ষ ধীরে উত্তোলিত পথে
পক্ষীগণে ধরে আগে আগে
অচিন্ত্য প্রবল দশানন
প্রবেশেন যায়বেগে;
কম্পমান বিশাল ধরে
তায় দর্পে কম্পমানই মত
পানেতে বিহ্বল তাম্রবর্ণ নিদ্রাঘূর্ণ আঁখি;
অঙ্গে শোভে অমৃত ফেনার তুল্য
বসন,—বিমুক্ত,
অঙ্গদে সংলগ্ন
বার বার করিছে মোচন।

বৃক্ষ, জনপদ প্রভৃতি তথ্য

কাব্যের কথা বাদ দিলেও তৎকালের ভারতবর্ষের বহু তথ্য রামায়ণে নিহিত আছে।

প্রাচীনকালের নগর ও জনপদের বিবরণ (বালকাণ্ড ৩২ সর্গে) আছে: কৌশাম্বী, মাহোদয়, ধর্মারণ্য, বিদিশা, শিবিভূত প্রভৃতির কথা। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে (৪১ সর্গে) আছে,—কলিঙ্গ, কোশল, দশার্ণ, পুণ্ড্র, কেরল, মলয়, পাণ্ড্য প্রভৃতি প্রদেশের কথা। তা ছাড়া, নদীর মধ্যে সরযূ, গঙ্গা, মন্দাকিনী, গোদাবরী, কৃষ্ণবেণী, গোমতী, তামপর্ণী প্রভৃতি বহু নদীর পরিচয় পাই। রামায়ণে সীতা অন্বেষণ কালে (কিষ্কিন্ধ্যা

কাণ্ডে ৩০ সর্গে। ভারতের বাইরের নদনদীসহিত ধনধান্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য খনির কথা আছে। ভারতবর্ষের ভৌগলিক পরিস্থিতির কতকটা পরিচয় যে তৎকালীন লোকের জানা ছিল না তা নয়। মধুবন হতে অযোধ্যা থেকে কতদূরে বা পৌঁছনো কি করে? অযোধ্যাকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গে নগরের বর্ণনা, উদ্যান, কর্মকার, মধুমক্ষিকার পুঞ্জের ছত্র যা পাওয়া যায়। তৈরী করত), ক্রাকচিক (করাতি), বেধক (ছুতার, রোজক। কাঠামি যারা তৈরী করত), যন্ত্রোপজীবী, সুবর্ণকার, তন্তুবায়কার, স্থপতি, তক্ষকবর্ধক, বৈদ্য, ধূপক, গৌণ্ডক, তরুণ, চুনারু ধুনুরী ও রঙ্গি এবং নট প্রভৃতির বিবরণ আছে।

রামায়ণে সকাল হতে তৎকালীন ভারতবর্ষের নানা প্রকার পশুপক্ষী এবং বৃক্ষাদির নাম, বাজনা এবং বৈজয়ন্তের পরিচয় পাওয়া যায়। বাল্মীকির হনুমান সুন্দরকাণ্ড ৩ সর্গে। রাক্ষসেরা রাবণ নিধনে চতুর্দিক হতে চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়েছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক অধুনা আবিষ্কৃত Mamoth Elephant এর কথা জানা যায়। যুদ্ধকাণ্ডের ১০৪ সর্গে। শঙ্খ, ভিন্দিপাল, ঋষ্টি, বিশসি, মুষল, মুদ্গর, পরশু, আড়ম্বর, ভিন্দিমাল প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে একটি উদ্ধৃতাংশের বিবরণ যেখানে যেখানে বিশেষ ছন্দের দেওয়া আছে তার উদাহরণ দিচ্ছি।

সুন্দরকাণ্ডে ত্রিষষ্টিতম সর্গে (৮৮ শ্লোকে। আছে—

সন্দংশাংস্তাপনীন্ কুম্ভানধিকুট্টকুট্টকান্।
অধরাংশ্চ পরিস্তোমান্ কুটাকারাংশ্চ পাদপান্।
দদর্শ মাণিবজ্রাণি বিমলান্ মলবালকান্।
শৈলাংশ্চাপি তরুণান্ তরুণীবাংশ্চ পুষ্পিতান্।
কর্ণিকারান্ মহাকর্ণান্ কুরুবকলতাস্তথা।

যুদ্ধকাণ্ডে একপঞ্চাশত্তম সর্গে (২৩১৯ শ্লোকে) আছে:

তিলকৈর্নীপসূর্যৈশ্চ শুক্লৈশ্চম্পকপাটলৈঃ।
পুন্নাগৈঃ করবীরৈশ্চ পুন্নাগৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ।
সালতালতমালৈশ্চ তথা নীপবিভূষিতৈঃ
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কেতকৈরতিমুক্তকৈঃ,
আবৃতং বিবিধৈর্বৃক্ষৈঃ প্রমদাবিষয়োপমম্।

অযোধ্যাকাণ্ডের চতুর্বর্ণত্রিতম সর্গে (৮০ শ্লোকে) আছে, রাম চিত্রকূটের শোভা সীতাকে দেখাচ্ছেন এবং বৃক্ষের বর্ণনা করছেন:

আম্রজম্বুপনসৈর্ধবৈঃ পিয়ালৈঃ পনসৈরপি।
অন্যৈশ্চ বনজাতিনৈর্বিচিত্রকুসুমদ্রুমৈঃ
কদম্বৈশ্চিরিবিল্বৈশ্চ সালৈস্তিনিশকৈরপি।
বন্যাভিরাত্মগুপ্তাভিরাবৃতং পশ্য কাননম্।

এইরূপ অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গে (১৬-১৭ শ্লোকে) পঞ্চবটি বনের বর্ণনায় আছে—

চূতৈরশোকৈস্তিলকৈঃ কেতকৈরপি চম্পকৈঃ
পুন্নাগনাগবকুলৈস্তথোদ্দালকসপ্তপর্ণৈঃ।
স্বাদ্বৈঃ ফলৈঃ প্রপতিতৈঃ পর্বতৈর্বহুভোজনৈঃ
ধন্যাশ্রমপদপ্রখ্যৈঃ পশ্যৈনং গুরুপাটলৈঃ।

এইপ্রকার বৃক্ষলতার বর্ণনা আরো বহুস্থানে রামায়ণে আছে। মহাকাণ্ডের ৫৭ সর্গে (২২-২৩ শ্লোকে এবং ৭৮-৮১ শ্লোকে); উত্তরকাণ্ডে ৪২ সর্গে। ২-৭ শ্লোকে। উদ্যানতরুর নাম বহু পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ১২ সর্গে ৪০ শ্লোকে 'পদ্মপুষ্পীলতা'র নাম আছে এবং অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চত্রিংশ সর্গে রাবণ যখন সীতাহরণে মারীচের কাছে সাহায্য পার হয়ে লঙ্কা থেকে যাচ্ছেন তখন তাঁর পথবর্ণনায় কদলী, নারিকেল এবং বদরী (গোলমরিচ) গুল্মের কথা পাওয়া যায়। নারিকেলের কিছু সুন্দরকাণ্ডে ১ম সর্গে ২০৩ শ্লোকেও আছে।

অনেকের ধারণা গৃহস্থের ঘরে কুকুর পোষা আমরা ইংরেজিদের কাছে প্রথম শিক্ষা করেছি ইনবিংশশতাব্দীতে; কিন্তু তা ঠিক নয়। অযোধ্যাকাণ্ডে। সপ্তত্রিংশ সর্গে। আছে, ভরতদের বাড়ী থেকে ভরত অযোধ্যায় ফিরে যাবার কালে মাতুল তাঁকে যাত্রাবসর বলবার কালে কতকগুলি কুকুর অন্যান্য উপহারের সামগ্রীর সঙ্গে দিয়েছিলেন।

উত্তরকাণ্ড

উত্তরকাণ্ড যে প্রক্ষিপ্ত এবং বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে কোনো সময়ে রচিত হয়েছিল, তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রথমেই গ্রন্থারম্ভে নারদ সংক্ষেপে বাল্মীকিকে যে রামায়ণ কাহিনী শোনালেন তাতে উত্তরকাণ্ডে বর্ণিত কোনো কাহিনীই লক্ষিবেশিত হয় নি। লঙ্কাকাণ্ডের সমাপ্তিতে যেরূপ বর্ণিত আছে আদিকাণ্ডের ১ সর্গ ৬-৯৯ শ্লোকেও তাই আছে।

সীতাকে দ্বিতীয়বার উত্তরকাণ্ডে অযোধ্যার প্রজাদের মনোরঞ্জনার্থে নির্বাসিতা প্রমাণ করার জন্য উদ্যোগ থেকে বোঝা যায় বৌদ্ধযুগে বর্ণাশ্রমের সূত্রপাত হওয়ায় তৎসময়কার কালের বিশেষ একটি মনোভাব নিয়েই রামায়ণে এই উত্তরকাণ্ড জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকির সময়ে এই অংশ লেখা হয় নি। উত্তরকাণ্ডে (৬০ সর্গ, ২০ শ্লোকে) আছে—

'উৎপাদ্যতে হি লোকেঽস্মিন্ মনুষ্যা কীর্তিবর্ধনঃ
—বাসুদেব ইতি খ্যাত বিষ্ণু পুরুষ বিগ্রহঃ।'

...মনুষ্যরূপে এবং বাসুদেব নামে বিষ্ণু জন্মাবার কথা থেকে পরবর্তীকালের মহাভারতের কথাই মনে আসে। উত্তরকাণ্ডের বৌদ্ধযুগপ্রভাবের কথা আরো বোঝা যায়, মূল রামায়ণে যে-সকল জনপদের উল্লেখ আছে তার পরবর্তী বৌদ্ধযুগে তার কোনোই অস্তিত্ব ছিল না দু একটি ছাড়া। কিন্তু উত্তরকাণ্ডে যে প্রক্ষিপ্ত এবং বৌদ্ধযুগে কোনো সময়ে লিখিত তার প্রমাণ 'প্রাবস্তি' 'প্রতিষ্ঠানপুর' গান্ধার, তক্ষশীলা, পুষ্করাবতী প্রভৃতি বৌদ্ধযুগের জনপদের উল্লেখ থাকায় আরো জানতে পারা যায়। 'মধুপুর' ও 'মথুরা' বৌদ্ধযুগের একটি বিশেষ জনপদ; উত্তরকাণ্ডে (৮৫ সর্গ ৫ শ্লোকে) এর উল্লেখ আছে; কিন্তু মূল রামায়ণে কোথাও তার উল্লেখ নেই। রামায়ণ প্রথমে লোকমুখে প্রচলিত ছিল এবং লিপি প্রচলিত হবার পর কৌশাম্বীতে রাজা উদয়নের দ্বারা প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।

তখন বৌদ্ধধর্ম আরম্ভ হয়েছে। বুদ্ধ নিজে কৌশাম্বীতে ধর্মপ্রচার করেছেন সেই সময়। অধিকাণ্ডে (৭ম সর্গে ২৩ শ্লোকে) আছে—

"তথা সর্বাগতাং বুদ্ধস্তথাগতমনাময়ম্।"

এই 'তথাগতম্' কথাটেই খটকা লাগে এবং প্রমাণ হয় উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত। তা ছাড়া উত্তরকাণ্ডের ১০৪ সর্গের প্রথম শ্লোকেই এইভাবে গোঁজামিল দিয়ে লেখা আছে: 'এতাবদেতদাখ্যানং পৌলস্ত্যবধকারণম্।' বাল্মীকীয় এবং কাথোজে যে রামায়ণ প্রচলিত আছে তাতে উত্তরকাণ্ড নেই। এ-থেকেও উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত অংশ বলে বেশ বোঝা যায়।

রামায়ণের প্রাদেশিক সংস্করণ

পরিশেষে উত্তর প্রদেশের তুলসীদাস এবং বাংলাদেশের কীর্ত্তিবাসের মত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে-সকল কবি রামায়ণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রচনা করেছেন তার যথাসম্ভব একটা পরিচয় দিয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করব।

যবদ্বীপ, খোটান, তীব্বত, কাম্বোজ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও রামায়ণ গিয়েছিল। আজও যবদ্বীপে রামায়ণের ছায়াভিনয় (Shadow show) পুতুলনাচ দেখানোর এবং রামায়ণগান প্রচলিত আছে। বাংলাদেশের পটুয়ারা বিংশশতাব্দীর গোড়াতেও গ্রামে গ্রামে ওটোনো ছবির সঙ্গে রামায়ণ গান ক'রে জীবিকা অর্জন করতো। দক্ষিণে মহাত্মা রামানুজম বাল্মীকির মূল রামায়ণের একটি সংস্করণ দেখেন এবং টীকা সংযোজন করেন। গৌড়ীয় সংস্করণ অপেক্ষা এই গ্রন্থই সকলে সঠিক সংস্করণ বলেন। আমি এই পন্থানুসারে রামানুজ সংস্করণ, যা পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন (বাংলা ১৩১১ সালে) প্রকাশ করেছিলেন তারই অনুসরণ করেছি। মৌলিকভাবে দক্ষিণদেশে রামায়ণ যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় দেব।

উৎকল রামায়ণ

উৎকল বা উড়িষ্যা ভাষায় শ্রীসিদ্ধেশ্বর যোশী রচিত রামায়ণই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সাধু সিদ্ধেশ্বর যোশীর আধ্যাত্মিক জীবনে যে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছিল তারই ফলে রামায়ণের অন্তরের গুঢ় আধ্যাত্মরস তাঁর রচনায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তিনি যোশী ছিলেন। জ্যোতিষচর্চায় তাঁর মন লিপ্ত না থাকার ফল, অর্থ বা রাজাকে সাধারণ লোকের সামান্য অবস্থা অপেক্ষা বড় বলে মনে করতেন না। সমগ্র উৎকল-সাহিত্যের মধ্যে তাই তাঁর রামায়ণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে আজও গণ্য হয়।

তামিল রামায়ণ

নবম শতাব্দীতে 'কাম্বান' নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি তামিল ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণ কাম্ব-রামায়ণ নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ চোলরাজ এবং চের-রাজদের সভাকবি ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে তিনি একটি বিরাট সাহিত্য-সভায় স্বরচিত রামায়ণ আবৃত্তি করেন। সভার পণ্ডিত-মণ্ডলী শ্রীত হ'য়ে তাঁকে 'কবিচক্রবর্তী' উপাধি দেন। তাঁর তামিল ভাষার উপর এত অধিকার ছিল যে সকলে তামিল-কবি-চক্রবর্তীদের মধ্যে তিনি চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করতেন।

তেলেগু রামায়ণ

তেলেগু (বা অন্ধ্র) ভাষায় বহু রামায়ণ আছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রামায়ণ 'রঙ্গনাথ-রামায়ণ'—কোনাবুদ্ধ রেড্ডী নামে এক কবির দ্বারা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই রামায়ণ-কাব্য 'দ্বিপদী' ছন্দে রচিত হয় এবং সঙ্গীতের মত সুর ক'রে গাওয়া হয়ে থাকে। এই কবির কোনো জীবনী লিপিবদ্ধ হয় নি। গ্রামে গ্রামে আজও 'রঙ্গনাথ-রামায়ণ' সকলে পাঠ করে এবং রামায়ণ বিষয়ে পুতুলনাচও খেলা হয়।

তেলেগুতে 'ভাস্কর-রামায়ণ' 'মোল্লা-রামায়ণ' নামে আরো দুটি প্রসিদ্ধ রামায়ণ আছে। ভাস্কর-রামায়ণ রচনা করেন কবি ভাস্কর। এই কাব্যে ভাবরসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থ মহাকাব্য শ্রেণীর।

'মোল্লা-রামায়ণের রচয়িতা একটি বিধবা মহিলা—মোল্লা বা মহাদেবী—। তিনি কুম্ভকার পরিবারভুক্ত এবং বাল-বিধবা ছিলেন। সারা জীবন আতুর জনের সেবা এবং সাহিত্য-চর্চায় তিনি অতিবাহিত করতেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজা শ্রীকৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। জনশ্রুতি আছে, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য এবং সাহিত্য-খ্যাতি-গৌরবে মুগ্ধ অনেক রাজন্য তাঁর পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু তিনি 'জনকে পতিত্বে বরণ করেছেন' ব'লে সকলকেই প্রত্যাখ্যান করেন। এঁকে অন্ধ্র বেদের মীরা বলা যায়। মোল্লা-রামায়ণ পাঠে মহিলার আধ্যাত্মভাবাবেগের উন্মেষ এবং কাব্য-প্রতিভার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কানাড়া রামায়ণ

দক্ষিণ ভারতে কানাড়া ভাষায় 'রামচন্দ্র-চরিত-পুরাণ' বা 'পম্পা-রামায়ণ' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১১০০ খৃষ্টাব্দে নাগচন্দ্র বা অভিনব পম্পার দ্বারা এই রামায়ণ রচিত হয়। তিনি জৈন ছিলেন এবং বল্লাল-রাজ বিট্টিদেবের (বা বিষ্ণুবর্দ্ধনের) সভার সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই পম্পা রামায়ণের একটি জৈন সংস্করণ আছে। তাতে বাল্মীকি বর্ণিত রামায়ণের বিষয় সমস্ত ভাবে উল্টে পাল্টে লেখা। বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধেই এই রামায়ণ রচিত হয়। রামকে বিষ্ণুর অবতার করা হয়নি এবং লক্ষ্মণকেই রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করে দেখানো হয়েছে এবং লক্ষ্মণই রাবণ বধ করেছেন দেখানো হয়েছে। রাক্ষসদের বিদ্যাধর বা দেবতা বলা হয়েছে এবং বানরদের মানুষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের ভাষায় উমেশযোগ্য কুমুদেন্দু রচিত 'কুমুদেন্দু-রামায়ণ' (১২৭৪ খৃঃ) পয়ারী ছন্দের কাব্য এবং 'রামকথাসত্র'—দেবেন্দ্র কর্তৃক বিরচিত। ইনি মহীপুর রাজসভার সভাকবি ছিলেন।*

মরাঠী বা গুজরাটী ভাষায় রামায়ণ গাথা রচয়িতাদের কোনো বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তুলসীদাস কৃত—'রামচরিত মানস' চলিত ভাষাতে বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং সকলেই পাঠ করেন।

এবার যৎরচিত পদ্যানুবাদের বিষয় বিবেচনা করার ভিতর চলে নিবন্ধ শেষ করব। সকলেই স্বীকার করবেন যে বাল্মীকিকৃত সংস্কৃত রামায়ণের বাঙলায় পদ্যানুবাদ করার বিশেষ অসুবিধা আছে দুইটি। প্রথমতঃ বিশেষ করে বিশেষণবহুল বর্ণনার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ভাষার লঘু গুরু ভাব এবং পদগুণ থাকায়। এই সংকটে আমি অনুষ্টুপ ছন্দের 'অখিল প্রবহমান যুক্তক' ছন্দেরই আশ্রয় নিয়েছি। অবশ্য ছান্দসিক পণ্ডিতদের বলে রাখা ভাল যে আমি ছন্দের বাঁধা পথ মানিনি। চতুষ্পদ, ছয়টি উচ্চারিত পর্ব নির্বাচন দ্বারা ছন্দের ওজ এবং মাধুরী আনবার চেষ্টা করেছি মাত্র। পদ্যানুবাদের দ্বারা আমি মহাকবি বাল্মীকির সংস্কৃত কাব্যে অনুপ্রবেশ করতে হ'লে মূল কাব্যের অর্থ, ভাব ও রসের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। এদিক যৎপ্রণীত মেঘদূতের পদ্যানুবাদের সুবিজ্ঞ সাহিত্যরসিক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যা বলেছেন সেই কথাই উদ্ধৃতযোগ্য। তিনি বলেছেন :

"বাঙলা কবিতায় সংস্কৃতকাব্যের অনুবাদের সাফল্যের পরীক্ষা দুইটি। মূলের সঙ্গে যার নিবিড় পরিচয়, অনুবাদের কবিতা তার স্মৃতিকে জাগিয়ে আনন্দ দেয় কিনা। এবং মূলের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, অনুবাদ প'ড়ে সে কাব্য-পাঠের আনন্দ পায় কিনা।"

অতুলবাবুর উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছি কিনা এই সংস্কৃত মহাকাব্যের পদ্যানুবাদে তা গুণীজনই বলতে পারেন। একটা কথা আরো বলা প্রয়োজন বোধ করি যে আমার রামায়ণীতে মূল রামায়ণের যত শ্লোক যার দিয়ে সংক্ষেপ আকারে অনুবাদ করতে হয়েছে। কেন না অতিরিক্ত বর্ণনা এবং একই প্রকারের তুলনা উপমায় বাহুল্য আধুনিক কালের উপযোগী নয়।

পরিশেষে কোনো প্রাচীন কবির একটি প্রচলিত শ্লোক অবলম্বন ক'রে আমি কবি বাল্মীকি মহামুনিকে বন্দনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করি।

মন্ত্রবর্ণাপিনির্দোষা সংবৃত্তাপিসুকোমলা।
নরস্যেব কৃতা বেন রম্যা রামায়ণী কথা।
খর আছে তবু যারা রহে সুকোমল
দূষণ থাকিতে দোষ না ঘটিয়ে যায়।
যেন রামায়ণী কথা রম্য সুবিমল
বাঁহার রচনা তাঁরে করি নমস্কার।

* কবিবর রামায়ণ-রচয়িতাদের বিবরণ অনুসন্ধানী বন্ধু ইন্দ্রজিৎ দেব সংগ্রহ করে দেন; তার জন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী আছি।

প্রতীক্ষা

দীপা সান্যাল

বন্ধু তোমার আশাহত চোখে
আজো কি কামনা জাগে—
আজো কি আশায় বেঁধে আছ তব বুক;
নয়নে কি তব আজিও তেমনি
মায়া অঞ্জন লাগে—
নূতন নেশায় আজো বুঝি উৎসুক!
বন্ধু কেবলি ভুল—
এ শুধু স্বপ্ন, মরুসুর বুকে
কখনো কি ফোটে ফুল!

বন্ধু আজিকে চাদের মায়ায়
চাহিয়ো না দূর নভে,
সেদিনের চাঁদ গেছে আজ দূরে সরে,
বন্ধু সে সব ব্যর্থ হয়েছে,
ব্যর্থ হয়েছে কবে—
আলো নাই আজ, কলঙ্কটুকু
দিয়ে গেছে বুক ভরে।

বন্ধু কেবলি ভুল,
সম্মুখে তোমার অন্ধ সাগর—
হারায়েছো দুটি কূল!
বন্ধু গো শোনো শোনো;
নূতন যুগের যাত্রী আসিছে
তারই লাগি দিন গোনো।

দেওয়ালীর পুতুল

শ্রীঅমরমোহন মুখোপাধ্যায় এম-এ

শুধু আলো আর আলো।……সমস্ত শহর আলোয় হয়ে উঠেছিল আলোকিত, ছাদে ছাদে, বারান্দায় বারান্দায়, আলমারির তাকে সব জায়গায় আর কিছু হোক না হোক অন্ততঃ জ্বলছিল এক একটা মাটীর প্রদীপ……আলোর উপরে আলো পড়ে বাড়ীগুলোর ছায়া পড়ছিল না কোথাও।

বড়লোকদের বাড়ীর ছাদে ছাদে চিক্‌মিক্ করে জ্বলছিল কত রংয়ের বৈদ্যুতিক ছোট ছোট বাল্বগুলো, মনে হচ্ছিল বুঝি নানা রঙের আসন চুণি পান্না রয়েছে দেয়ালের গায়ে একের পর এক গাঁথা……

চারিদিকে অপার আনন্দ, অফুরন্ত হাসি…কোথাও বা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটা একটা করে প্রদীপ-গুলো সাজাতে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে তাদের মা কি দিদিমা আগুন থেকে সাবধান করে দিচ্ছে তাদের—"দেখিস রে পুড়ে মরিস্ না" তারা শুধু একবার ছোট্ট একটি 'না' বলে সমস্ত বাড়ী কোলাহল-মুখরিত করে সাজাচ্ছে প্রদীপ রাশি। পথের ধারে বসেছে কত রকম খেলনা পুতুলের কত রকম দোকান…সেখানে কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলনা কিনতে ব্যস্ত। কেউ বা এটা চাই ওটা চাই বলে ক'রে তুলছে তার মাকে কি বাবাকে ব্যতিব্যস্ত; কেউ বা কোন খেলনা মনের মত হয়নি বলে জুড়ে দিয়েছে কান্না, মা বেচারী তাই থামাতে ব্যস্ত।…কেবল ভীড়…

সবার মুখেই হাসি আনন্দের ছায়া উঠেছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে। মনে হচ্ছিল বুঝি এ পৃথিবীতে এখন আর নেই কোন রকম জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণা; আছে কেবল বিপুল সুখ-আনন্দের কোমল শিহরণ… নানা রংএর আলো করে তুলেছিল সমস্ত সহরটাকে মনোহর।

কেবল আলো ছিল না, আনন্দ ছিল না, শহরের একটি নোংরা সংকীর্ণ গলির একটি ভগ্ন জীর্ণ বাড়ির একখানি ঘরে।

ঘরটা ছোট্ট। মাঝখানে কুট দুয়েক জায়গা ছেড়ে সেই ছোট ঘরটার দুপাশে পড়েছিল দুটো ভাঙ্গা খাট। আর একটা খাটে অনেক দিনকার বহু পুরাতন ছেঁড়া কম্বল ও কয়েক টুক্‌রো কাপড় ঢাকা দিয়ে পড়েছিল একটি ছোট্ট সাত কি আট বছরের মেয়ে। সমস্ত দেহে ছিলনা তার একটুও মাংস, হাড়গুলো বিশ্রীভাবে ছিল বেরিয়ে। মাথার ছোট ছোট চুলগুলি মাসাবধি তেল জল না পেয়ে বিবর্ণ হ'য়ে জট পাকিয়ে গেছে। মেয়েটি হাঁপাচ্ছিল বিশ্রীভাবে! আর ওধারের উনানের ধোঁয়ায় ঘর গিয়েছিল ভরে।

আর খাটের পায়া ধরে যে আধ-বয়সী লোকটি ছিল দাঁড়িয়ে তাকে দেখলে সত্যিই হয় দয়া। টিম্ টিম্ করে যে প্রদীপটা জ্বলছিল তার ম্লান আলোর একটা অস্পষ্ট আভা এসে পড়েছিল তার মলিন বেদনাভরা মুখের উপর। দাড়ি বোধ হয় তার অনেকদিন কামান হয়নি, চুল যে তেল জলের মুখ কদিন দেখেনি সেটা নির্ণয় করতে বোধহয় কোন কল্পনা-শক্তিসম্পন্ন ঐতিহাসিকের দরকার। গায়ে তার এক ছোট তুলোর কুর্ত্তি, সেটা যে কবে তৈরী করান হয়েছিল ও কার জন্য তৈরী করান হয়েছিল বলা যায় না।

আসলে কোন রংএর কাপড়ে তৈরী সেটা কোন রকমে তাই-ই ঠিক করা যেতে পারে না। পরিধানের কাপড় শতছিন্ন। সেলাই করা ও গাঁট দেওয়া হয়েছে।

হাঁ; কি হয়ে উঠেছিল?…

খাটের ভাঙ্গা বাঁশের উপর একটা হাতের ভর দিয়ে, স্নেহময় অথচ কাতর দৃষ্টি তার মেয়ে মুন্নার উপর নিবদ্ধ করে যে খাপ ছাড়া ভাবে যাচ্ছিল ভেবে…

হাঁ…আজ ত দুধ দেবার পর্য্যন্ত পয়সা নেই…গয়লা তো আর আজকের দিনে ধারে দুধ কখনই দেবে না—দেওয়ালীতে ধারে যে কোন দোকানদারই জিনিষ বিক্রী করে না…আহা সে ছিল একদিন যখন আমি মাসে পনের

বিশ টাকা মেহেরবাণী করুন, তাই ত রামিয়াকে করেছিলুম বিয়ে···সে ত সেই আঁধারে মেয়েটীকে রেখে তাড়াতাড়ি পাড়ি দিলে···আমাদের ও কাজ এখন করতে গেলে ইংরাজী-জানা বাবুরা, তবে আর আমাদের কে রাখবে সেই মাইনেয় ?···সেখানে যাই সেখানে শুনি 'কোন কাজ তো খালি নেই সীতারাম'···দিনের পর দিন ত এই-ই আসছি শুনে···এই রকম ভাবে সে ভেবে যাচ্ছিল তার গত জীবনের কত কথা। সে ছিল এক সময় যখন সে এক বড় ব্যারিষ্টারের বাড়ী মাসে পঁচিশ টাকায় চাকুরী করত। তখন ছিল তার যৌবন আর তারই নেশায় সে ভালোবেসেছিল রামঅবতার কাহারের মেয়ে রামিয়াকে। এরও ছিল তাকে অনেক যত্নে নিজের বাড়ীর গৃহিণী করে। তারপর দেশবাস পরে যখন সে আলাদিন্ন ওস্তার সঙ্গে হাতাহাতি উঠাও, তখন তার মনে লেগেছিল এক ভয়ানক ধাক্কা।···

তবে তখন ছিল তার যৌবন তাই সে টাল সামলে নিয়েছিল কোন রকমে। ও শেষে পঞ্চায়েতের পরামর্শে ছেলেবেলাতেই মা-বাবা দিয়েছিল বিবাহ, তবে সে বৌ অল্প বয়সেই মারা যাওয়ায় পঞ্চায়েতের পরামর্শে এ মেয়ের মা-টীকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিল। তার পর যখন এক বছরের এক মেয়েকে রেখে তারও ইহলীলা সাঙ্গ হল তখন সীতারাম কাহার মনে মনে ভাবলে যে বিবাহিত জীবনের সুখ হয়ত তার কপালে যখন নেই-ই তখন মিছামিছি পরের মেয়েকে ঘরে আনা আর ভাল নয়। সেই অবধি সে অনেক যত্নে বহু কষ্টে এই ছয় বছর ধরে এই মেয়েটীকে মানুষ করছে। সম্প্রতি মাস-খানেক থেকে তারই অসুখ।···

হঠাৎ তার চিন্তা সূত্র ছিন্ন করে ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে মুহুয়া বল্লে—'বাবা !'

গলার স্বর যেন তার আটকে যাচ্ছিল ; কোন রকমে অনেক কষ্টে সীতারাম বল্লে—'কী ?'

জড়িত কণ্ঠে অনেক কষ্টে মুহুয়া বল্লে 'আজ দেওয়ালী, না বাবা ?'

নিজের স্বরে সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে সীতারাম জবাব দিলে—'হাঁ মা, আজ দেওয়ালী'।

দোসরা এই শুনে মুহুয়ার আনন্দ হলো। আনন্দের এক ম্লান হাসি হেসে সে বললে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে—'আর বছর কত খেলনা এনে দিয়েছিলে না বাবা ?'

মূঢ় চেতনপ্রায়ের মত সীতারাম বল্লে শুধু—'হাঁ'। অস্পষ্ট স্বরে মুহুয়া বললে, 'তবে আজ এনে দাও না বাবা আমায় খেলনা।'

চমকে উঠলো সীতারাম। সেই ত তার মেয়েকে এক চামচ দুধ খাওয়াবার একটাও পয়সা, সে খেলনা এনে দেবে কোত্থেকে ? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মুহুয়া ক্ষীণ স্বরে ফের বল্লে—'আজ খেলনা এনে দাও না বাবা।' সীতারাম নিরুত্তর।···সত্যি সেই কয়েক সেকেণ্ড সেই ছোট্ট ঘরটি যেন ভয়ানক খালি খালি বোধ হচ্ছিল।

মুহুয়া অতি কষ্টে আবার বল্লে কম্পিত কণ্ঠে 'এনে দেবেনা খেলনা বাবা ?···তাহলে কিন্তু আমি আজ রাত্তিরেই মরে যাব'

সীতারামের সমস্ত গায়ে যেন কিসের কশাঘাত সজোরে লাগল। সে মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠল একেবারে সচেতন। বিজলীর মত খেলে গেল সমস্ত মনে তার এক কিসের শিহরণ···

সীতারাম মৃদুস্বরে বল্লে, 'তুই একটু শো' মুহুয়া আমি এক্ষুণি খেলনা এনে দিচ্ছি।'

এই বলে দেওয়ালের গায়ের এক খুটীর গা' থেকে একটা পুরাতন মলিন কাপড় নিয়ে সমস্ত দেহটাকে কোন রকমে শীতের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্যে ঢেকে নিলে, একবার মুহুয়ার দিকে বিচলিত নয়নে চেয়ে দেখলে, তারপর সে যে-কয়েকটা পেতলের বাসন ঘরে ছিল, সেগুলোকে একে একে তুলে নিলে।

বাসনের ঘন্ ঘন্ শব্দ পেয়ে মুহুয়া ক্ষীণ স্বরে বল্লে—'কিসের শব্দ বাবা ?'

অনেক কষ্টে সীতারাম গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলে,—'খেলনা আনতে যাব কিনা, তাই বাসনগুলোকে এক পাশে তুলে রাখছি।'

বাপের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, মুহুয়া একবার একটু কেসে পাশ ফিরে চুপ করে শুয়ে রইল।···

সীতারাম সেখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট ঠক্ ঠক্ করে কাঁপল ; ও পরে মেয়েকে ঘুমুতে দেখে বাসনগুলো আস্তে আস্তে একটা ছেঁড়া কাপড়ে বেঁধে, কোন শব্দ না করে চুপচাপ একেবারে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ অবসাদযুক্ত নিশ্বাস, মনে হল তার এই কথা—'কতদিনকার এ বাসনগুলো আজ বিক্রী করতে হবে ?···হোক্‌গে—এই ভেবে সে যেন অল্প সান্ত্বনা পেলে তার মনে—'যদি আমার মুন্নুয়া মেরে ওঠে···

কিন্তু অন্য চিন্তায় পরক্ষণেই সে কেঁপে উঠল—'আর কাল মুন্নুয়াকে দুধ খাওয়াব কি করে ?··যাক্‌গে'···বলে অনেকদিনকার মায়া কাটিয়ে সে সোজা পথে বার হয়ে পড়ল···

চলতে আর সে কোন রকমেই পারছিল না। সমস্ত দেহে যেন এক অনেকদিনকার সঞ্চিত অবসাদ এসে জড় হয়েছিল। পাদুটো যেন মাটির উপর থর থর করে কাঁপছিল; সে যেন টলে পড়ছিল গলির ধারের বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে।··

যা হোক অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে যখন সে গলির মুখে এসে দাঁড়াল অকস্মাৎ দেখা তার বহু দিনের জানা শীতলের সঙ্গে। শীতল এখন বড় লোকের বাড়ী করছে চাপরাশির কাজ। তাকে দেখে শীতল একটু চমকিত হয়ে বললে—'বাসন বেচে জুয়ো খেলবে নাকি ?'

সীতারাম কেঁদে ফেললে। কাতর স্বরে অনেক কষ্টে বললে—'আমার কি আর জুয়ো খেলবার অবস্থা আছে ভাই ? এই গুলো বেচে মুন্নুয়ার জন্যে খেলনা কিনতে যাচ্ছি।'

ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে শীতল আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে বল্লে—'বাসন বিক্রী করে খেলনা কিনবে ?'

একবার ম্লান হাসি হাসলে—তার চেহারা ঠিক যে রকম হয়েছিল সেটা কলমে বোধহয় লেখা যায় না। হেসে বল্লে সে—'মুন্নুয়া যে খেলনা চায়···' তারপর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে সমস্ত বলে, হঠাৎ বাসনগুলো ধপ্ করে মাটীতে রেখে দিয়ে, শীতলের দুহাত ধরে মিনতির সুরে বল্লে,—'তুমি বাসনগুলো কিনে নেবে শীতল ?'

নাসা-কুঞ্চিত করে শীতল বোধহয় ব্যঙ্গ হাসি হেসে বল্লে—'আমি এখন বাসনগুলো নিয়ে কি করব ?'

সীতারাম অপলক নয়নে চেয়ে রইল তার দিকে।···

শীতল বল্লে—'বরং একটা দোকানে বিক্রী কর।'

সীতারামের সমস্ত আশার ক্ষীণ আলো শীতলের কথাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল কোন অন্ধকারের সঙ্গে। একটা ব্যথার নিশ্বাস ফেলে বাসনগুলো ফের তুলে নিয়ে ক্ষোভ-ভরা কণ্ঠে সে বল্লে—'কোথায় দোকান আছে দেখিয়ে দেবে ?'

আট-দশ টাকার বাসন যখন দশ আনায় বেচে মুন্নুয়ার খেলনা কিনবার জন্যে দোকানের দিকে পা বাড়াল, তখন শীতল বল্লে—'এক কাজ কর না সীতারাম, মুন্নুয়া তো এখন নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। চল ঐ দশ আনা দিয়ে 'ফটকা' খেলা যাক। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে।'

সীতারামের মনে হঠাৎ যেন কিসের বিপুল আনন্দ হোলো। 'আমার হাতে অনেক টাকা এসে যাবে ?'—সে খাপছাড়া ভাবে ভাবতে লাগল,—'হাঁ তাহলে আমি দুটাকা দিয়ে বৈদ্য ডেকে আনব, গয়লাকে বলব বেশী করে দুধ দিয়ে যেতে—'

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে শীতল বল্লে—'ভাবছ কি, চল না।' একরাশ প্রলোভন শুধু···

সীতারাম একবার আপত্তি করলে, 'না আমি যাবো না। আমাদের কপালে জুয়োয় জেতা নেই কখন—যাকখান থেকে হাতে যা আছে তাও যাবে।'

উৎসাহ দেবার জন্যে শীতল বল্লে—'কপালে আবার নেই ? কার কপালে কি আছে কেউ বলতে পারে না কখনও।'

সীতারাম বল্লে—'দশ আনা দিয়ে ত খেলা যায় না।'

আরও উৎসাহিত করবার জন্যে শীতল বল্লে—'খুব যায়, চল্ না। ভাল করে খেল ব্যস।'

সীতারামও যে প্রলোভনে পড়ল না তা নয়। তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে শীতল জুয়োর আড্ডায় বস্‌লো।

তারপর এক পয়সা দু পয়সা করে সীতারাম শুধু হারে। আর আকাশ-কুসুম দেখিয়ে শীতল বলে—'ব্যস এইবার দু পয়সা লাগাও, হারলে আমি দশগুণ দেব।'

পয়সার আশায় মেতে উঠে সীতারাম ফের খেলতে লাগল।···

দেখতে দেখতে তার হাতে আর একটা পয়সাও রইল না। সীতারাম তখন করুণ সুরে শীতলের দিকে চেয়ে বললে—'আমায় এক টাকা ধার দেবে ?'

শীতল নিষ্ঠুর হাসি হেসে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লে,—'বাসন

বেচে যে ভুয়ো খেলে তাকে আবার ধার দেবে, হাঃ, যাঃ, অন্য জায়গায় যা ধার পাবিখ'ন।'

আর কিছু না বলে সে কাঁপতে কাঁপতে উঠে সেখান থেকে উঠে বাড়ীর গলির দিকে অনেক কষ্টে চলতে লাগল।···

হঠাৎ একটা ল্যাম্প-পোষ্টের ধাক্কা খেয়ে গলির মুখে সে বসে পড়ল ধপ করে।

* *

পরদিন সকালে থানায় ভিড় লেগে গিয়েছিল। পুলিসে কোথা থেকে দুটো মৃতদেহ নিয়ে এসেছে : একটা পরিণত বয়স্ক এক ব্যক্তির, অন্যটি শীর্ণকায়া এক বালিকার।

শৈতলও সেই ভিড়ে ছিল। সে একেবারে শিউরে উঠল।··· সমস্ত শরীরে তার কিসের স্রোত বইতে লাগলো। সে পকেট থেকে সমস্ত পয়সা পথে ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—'সীতারাম···আমি···আমি···' স্বর তার রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া

অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ

বিশ্বের সবদেশে একই সুর বাজছে—'মনে রেখো'—তাই কতো মানুষের অতীতকে মনের মধ্যে ধরে রাখবার, সঞ্চয় করবার। কিন্তু তবু হারিয়ে যায় অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্ন—মানুষ ভুলে যায়। মনে রাখা, এও যেমন সত্য, ভুলে যাওয়া এও তেমনি সত্য। তাই এই মনে রাখা—ও ভুলে যাওয়া—আমাদের আলোচনার বিষয়।

প্রথমে অবশ্য আমাদের সমস্যাগুলি বলা যাক। কোন একটা কিছু যখন যারে যারে পড়ি বা করে' আমরা সেটা শিখি। অভ্যাস বিষয় আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে সঞ্চয় বা সংরক্ষণ (Retention) ঘটে বলেই আমরা পুনরাবৃত্তি (recall) করতে পারি। আবার অভ্যাস ছেড়ে দিলেই ক্রমে ক্রমে আমরা অনেক সময়ই দুরে যাই বা পূর্বে রক্ষতা হারিয়ে ফেলি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে (১) অভ্যাসের ফলে আমাদের যে রক্ষতা তথায় স্মৃতি শক্তিতে বা কাজে সেই অবের মধ্যে সংরক্ষিত হয় কি কি কারণে? (২) অভ্যাস ছেড়ে দিলে কত দ্রুত এবং কি ভাবে ক্রমে ক্রমে সে স্মৃতি বা রক্ষতা লোপ পায়? (৩) অভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার ফলে স্মৃতির যে মালিন্য বা বিলুপ্তি ঘটে বা রক্ষতার যে হ্রাস বা বিলুপ্তি ঘটে পুনরভ্যাসের দ্বারা পূর্বের সে শক্তি ফিরে পেতে কতটা সময় লাগে? (৪) বহুদিন অনভ্যাসের ফলে অর্জিত স্মৃতি বা কার্যদক্ষতা কি একেবারেই খুব মুছে যায়, না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে?

আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি স্মরণশক্তি বা স্মৃতি শক্তি একটা অভ্যাস —সেটা অর্জিত হয় পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়নের দ্বারা বা চিন্তার দ্বারা। Sandiford এর ভাষায় it "simply means that we have acquired certain language habits" or muscular habits.

এক একটা জিনিস আমাদের অনেকদিন মনে থাকে। তার কারণ এক একটা জিনিস আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। যে যে কারণে মন কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে সে কারণেই সেটা মনের মধ্যে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়। কোন ঘটনা বারে বারে ঘটলে (Repetition) সেটা মনে গভীর দাগ কাটে এবং সেটা মনেও থাকে অনেকদিন। তাই অভ্যাস স্মৃতিশক্তিকে দৃঢ় করে—অনভ্যাস স্মৃতিশক্তিকে মলিন করে। যে ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্ট (vivid), সেটা মনকে সহজেই আকর্ষণ করে এবং সে জন্যে এ রকম ঘটনা মনেও থাকে অনেক দিন। যে ঘটনা খুব অল্পদিন বা অল্পক্ষণ আগে (recently) ঘটেছে তার স্মৃতিও উজ্জ্বল। যে ঘটনায় আনন্দ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় সেটাও মনে থাকে অনেক দিন। আচ্ছা এই 'মনে থাকা' বা Reteption ব্যাপারটা কি? যে পড়াটা শেখা হোল বা যে কাজটা শেখা হোল "সেটা আমার মনে আছে" একথাটা যখন বলি—তখন কি এই বুঝি যে মনে মনে যে পড়াটা বা কাজটা ক্রমাগতই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? তা নিশ্চয়ই নয়। Woodworth বলছেন "Retaining is certainly not a continued repetition of the learned performance। যে পড়াটা বা যে কাজটা "মনে আছে" সেটা ঘুমের মধ্যেও মনে আছে। কাজেই এটা হচ্ছে দেহের বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র (nervous system) মধ্যে একটা পরিবর্তন সেটা ঘটেছে পড়াটা বা কাজটা শেখবার ফলে। "Activity has left behind it some modified structure of the organism mostly modified brain structure. এটাকে ইংরাজীতে বলা হয় memory trace. এটা প্রত্যক্ষ করা যায় না,কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই এরকমএকটা দাগ রেখে যায় এটা আমরা ধরে নিতে পারি—তা না হলে অভিজ্ঞতাটা অতীত হয়ে গেলে আবার সেটাকে আমরা স্মরণ করতে পারতুম না।

সে ছাপটা কি চিরস্থায়ী থাকে? কবি বলেছেন "হারায় না কিছু"। যত কথা যত গান সবই আছে, সবই থাকে। "ভুলে থাকা, সে তো নয় ভোলা, বিস্মৃতির মর্মে যদি রক্তে দোর দিয়েছে যে দোলা।" একথাটা একেবারেই কবিত্ব নয়। বাল্যকালের বিস্মৃত ঘটনা হঠাৎ যেন মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে।

"যাকে আমার পড়ে না মনে
শুধু কখন খেলতে গিয়ে হঠাৎ অকারণে
একটা কি সুর গুণগুণিয়ে কানে আমার বাজে
নামের কথা মিলায় যেন আমার খেলার মাঝে।
যা বুঝি গান গাইত আমার দোলনা ঠেলে ঠেলে
না দিয়েছে, খেতে খেতে, গানটি গেছে ফেলে।"

এমন অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই ঘটে। বয়ের বিকারের মধ্যে কখনো মানুষ তাদের অতীত জীবনের এমন ঘটনার কথা বলে—যা সত্যি ঘটেছিল কিন্তু সুস্থ হয়ে তাকে সে কথা জিজ্ঞেস করলে সে কিছুতেই তা স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু এসব দৃষ্টান্তের থেকে কিছুই মন থেকে হারায় না এরকম একটা ব্যাপক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো বিপজ্জনক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথে এ সিদ্ধান্তই বরং সঙ্গত যে অনেক অভিজ্ঞতা কেন, অধিকাংশ অভিজ্ঞতাই আমরা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। মনের মধ্যে অতীতের সব অভিজ্ঞতা, সব কথাই যদি ভিড় করে থাকতো তা হলে সে দুঃসহ চাপে আমরা যে পাগল হয়ে যেতুম।

ভুলি কেন?

সময় যত গত হয়, তত আমরা ভুলে যাই। সময়ের গতি এর জন্য দায়ী নয়—সময়ের মধ্যে যা ঘটে তাই এজন্যে দায়ী—"It is not time, but what occurs in time that produces the effect."

একটা মত হচ্ছে অব্যবহারের দ্বারা Memory trace বা স্মৃতির ছাপ মলিন হয়ে যায়। শরীরের যে কোন যন্ত্র বা তন্তু বা muscle সম্বন্ধেই এটা সত্য যে, ব্যবহার না করলে সে রক্তস্রোত থেকে পুষ্টি আহরণ করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত ভেঙে গেলে হাড় জোড়া লাগাবার জন্যে হাতটা plaster করে দিলে যে muscleগুলি নড়াচড়া করতে পারলো না সেগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই কোন পড়া বা কাজ যেটা শেখা গেছে সেটার আর ব্যবহার না হলে মস্তিষ্কের তন্তু ও শিরার মধ্য দিয়ে যে পথ তৈরী (Nerve Path) হয়েছিল সেটার ছাপ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

আর একটা মত হচ্ছে interference বা বাধা দ্বারা memory trace অস্পষ্ট হয়। একটা কাজ বা পাঠ শেখার সময় যে nerve path তৈরী হোল—সেটা মস্তিষ্কের অন্য সমস্ত তন্তু ও শিরার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কাজেই অন্য কাজ বা পাঠ শেখার সময় সে nerve path অন্য nerve path দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। ফেটে এক ঘণ্টার ওপর অন্য খেলা দিয়ে ফেলে আগের খেলাটা অস্পষ্ট হবেই। কাজেই একটা স্মৃতি পরবর্তী অন্য অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে—এটা বোঝা শক্ত নয়।

এ মতের অনুকূলে কতকগুলো তথ্য দেওয়া যায়। দিনের বেলায় আমরা যারে যারেই কাজের বদল করি। কিন্তু রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন হয় বিশ্রাম। দিনের বেলায় এক অভিজ্ঞতা আর এক অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে কেবলই বাধা দেয়। রাতের বেলায় সুযোগ মধ্যে তা ঘটে না। তাই দেখতে পাই দিনের বেলায় বিস্মৃতির হার (rate) রাত্রে ঘুমের সময়ের তুলনায় অনেক দ্রুততর। একটা পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। কতকগুলো অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি (nonsenses syllables) একজন দিনের বেলায় মুখস্থ করে অন্য নানা কাজে ব্যস্ত রইলেন। দিনের শেষে দেখা গেল অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অনুরূপ অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি সেই ব্যক্তি মুখস্থ করার অল্পক্ষণ পরেই ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা করে দেখা গেল ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা কম। একটা কাজ শেষ করেই আর একটা কাজে সুরু করলে memory trace নষ্ট হয় বেশী। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলে সংরক্ষণ (retention) দীর্ঘতর হয়। পাঁচটা বানান ঘুঁটির অবস্থান ১০ সেকেণ্ডের জন্যে লক্ষ্য করে একজন মনে রাখতে চেষ্টা করলেন। ঠিক তার পরের মিনিট তাকে দেওয়া হোল কতকগুলো রাশি যোগ করতে। যোগ শেষ হওয়া মাত্রই তাঁকে বানার ঘুঁটিগুলি আগের জায়গায় ঠিক ঠিক বসাতে বলা হোল। শতকরা পঞ্চাশটাই তার ভুল হোল। তাকে ১০ সেকেণ্ড আবার ঘুঁটিগুলি লক্ষ্য করতে দেওয়া হ'ল। তারপর ১ মিনিট তাঁকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হোল। তারপর ঘুঁটিগুলি জায়গামত বসাতে বলাতে তার ভুল আগের বারের তুলনায় অর্ধেক হোল। এ ধরণের বাধাকে Woodworth বলেছেন retro-active inhibition. এখন ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে সংরক্ষণের শক্তি শতকরা ৫০ ভাগ কমে যায়—"Retrospective inhibition lowered the retention by over 50 per cent.

কখনও কখনও দেখা যায় শারীরিক (বিশেষতঃ মস্তিষ্কের) বা মানসিক আকস্মিক গুরুতর আঘাত পেলে আঘাতের সময়ের এবং তার পূর্বেও কিছুক্ষণ সময়ে যে সব ঘটনা ঘটেছে তার স্মৃতি লোপ পায়—একে Woodworth বলেছেন Retro-active shock effect। এটাতেও Interference theoryর সমর্থন পাওয়া যায়।

Freudপন্থীরা এ ভোলা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেন অন্যভাবে। তাঁরা বলেন আমাদের অহংবোধ বড় প্রবল—যখন আমরা সচেতন নই তখনও এই অহং অবচেতন মনে অতন্দ্রভাবে জেগে থাকে। যা আমাদের এই অহংকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়, তার উপর রোষ তোলে সে তাকে বিস্মৃতির রাজ্যে নির্বাসন দিয়ে। এটাকে তাঁরা বলেন

repression অবলম্বন। তাহাই দেখা যায় আমরা এমন ঘটনাগুলো ভুলে যাই, যেগুলি আমাদের পক্ষে অনুবিধাজনক, অপ্রীতিকর, যা আমাদের এই মহৎআত্মকে আঘাত করে। তাই সেগুলো ভুলে যাই, পাঠকটি স্মরণ রাখি। Sandiford বলছেন "Repression is a biological function, a defence mechanism guarding the mind against the intrusion of experience which would cause it pain or discomfort. Consequently the mind purchases peace by refusing to remember disquieting experience. We remember our cheques, but forget our bills.

ভোলার কারণ সম্পর্কে Behaviourist মনস্তাত্ত্বিক Watson এর আর একটা মত রয়েছে। তিনি বলতে চান যে সেই ঘটনাই শুধু আমরা মনে রাখতে পারি যেগুলোর সঙ্গে আমরা কথার সম্পর্ক (Verbal association) স্থাপন করতে পেরেছি। একটা বাগানে বেড়াতে গেলাম—সেখানে দক্ষিণে আটটা সুপারি গাছ রয়েছে—পশ্চিমে তিনটি আম গাছ ও কাঁঠাল গাছ, পুবে রয়েছে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়। বাগানে বেলী, রজনীগন্ধ, গোলাপ, ফ্লক্স, জবা আর বহুবর্ণী ও সৌখিন ফুলের bed রয়েছে ১০টি। মনে মনে এটা লক্ষ্য করলুম—Watson বলবেন নিজের কানে কানেই নীরবে কথা বলা হোল—'thinking is subvocal speech'—অথবা এগুলো নিয়ে আর কারু সঙ্গে আলোচনা করলুম—তা হলে এবার চোখের স্মৃতির সঙ্গে বাচনিক স্মৃতির ডোর বাঁধা হোল—এটা মনে রইল। এটা ভুলতে দেরী হবে। তিনি বলেন শিশুকালের প্রথম চার বছরের কথা আমাদের মনে থাকে না, তার কারণ তখনও বাচনিক সংযোগ গঠবার সুযোগ হয় না "Our inability to remember the experiences of the first three or four years of life is due to our lack of language, at the time.

এই মতগুলোর কোনটাকেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মনে করলে ভুল হবে। প্রত্যেকটা মতই কতগুলো ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। হয়তো এ মতগুলো আপাতবিরুদ্ধ মনে হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

The Rate of Forgetting certain general Conclusions re-forgetting.

যে পড়া বা কাজ শেখা হয়েছে অনভ্যাসে তা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সকলের ভোলার হার সমান নয়। কেউ তাড়াতাড়ি ভোলে, কেউ ভোলে দেরীতে। অনেকগুলো Muscle একত্র যে সব কাজে লাগে যেমন সাঁতার কাটা, বাইসিকেল চালানো, টাইপ করতে শেখা, এগুলো একবার শিখলে প্রায়ই একেবারে ভুলে যাওয়া যায় না। কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপার যাতে তাদের ব্যবহার দরকার সেগুলি ঠিক অতদিন মনে থাকে না। যে কাজ বা পড়া আমরা খুব ঘাড়ে করে বা পড়ে শিখেছি (over learned) সেগুলি আমরা খুব কমই ভুলি না। সেখানে মিল আছে; রস আছে বা যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) আছে যা অর্থপূর্ণ তা আমরা ভুলি অনেক ধীরে ধীরে। আমার অনভ্যাসের দ্বারা কোন জিনিষ ভুলে গেলে তা পুনরায়ত্ত করতে আগের মত অতো সময় লাগে না। ভোলার হারটা গোড়াতে খুব দ্রুত—পরে সেটা মন্থর হয়ে আসে। যারা আরও দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে, তারা অনেক রাখতে পারে অনেকদিন। Lyon কতগুলো পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন, "We are entitled to say that with material that is logical in character, those who learn quickly remember the longest." যারা যত বেশী বুদ্ধিমান তাদের স্মরণ-শক্তি জন্মগত এবং একে খুব বেশী পরিবর্তন করা চলে না "no amount of culture would seem capable of modifying a man's general retentiveness." অবশ্য সকলে তার মত সমর্থন করে না।

এ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষার উল্লেখ করা যাক। Redall সাহেব তিন বৎসর অনভ্যাসের ফলে Type writing কতটা ভুলেছেন (সে কতটা মনে আছে) তা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। Type writing শেখার শেষ দুই সপ্তাহে তিনি মিনিটে ২০টি শব্দ type করতে পারতেন এবং তার ভুলের পরিমাণ ছিল শতকরা ৪। সাহেব তিন বছর পর আবার পরীক্ষা করে প্রথম পাঁচদিনে কটি শব্দ তিনি type করতে পেরেছিলেন এবং কতটা হয়েছিল তা দেওয়া হোল। প্রথম দিন প্রতি মিনিটে শব্দ type করলেন ১৮·৭৪, ভুলের পরিমাণ শতকরা আট। দ্বিতীয় দিন ১৮·৯ ও ভুল ৭½%; তৃতীয় দিন ২১, ভুলের পরিমাণ ৬½; চতুর্থ দিন ২২·১, ভুল ৫; পঞ্চম দিন ২২·৫, ভুল ৮½। পাঁচ ঘণ্টা অভ্যাস করে তিনি পূর্বে ৩০ ঘণ্টা অভ্যাসের ফলে যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তা প্রায় ফিরে পেলেন। Sandiford ১৮৮৪ সালে skating শিখেছিলেন, মাঝে ১৮ বছর এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তার পরে আবার skating শুরু করে দেখলেন পূর্বের দক্ষতা খুব কমই হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ১৮৮৯ সাল থেকে ডেনমার্কে দু বছর থাকতে তিনি Danish ভাষা শিখেছিলেন কিন্তু ১৯১৩ সালে দেখলেন সবটাই প্রায় ভুলে গেছেন। দুই তিন মিনিট বহু চেষ্টা করেও তিনি Danish ভাষার ১ থেকে ১০ পর্যন্ত গুনতে পারলেন না। Ebbinghaus, Radossavljic Witch, Borcars, ভোলার হার নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন—Nonsense syllables নিয়ে এবং কবিতা নিয়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে overlearned বিষয় আমরা কম ভুলি। যত বেশী overlearned হয় ভুলে যাওয়া তত মন্থর।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মনে আবৃত্তি করে কোন পড়া তৈরী করলে তা বেশী মনে থাকে; মনে মনে সে পড়া তৈরী করার চেয়ে। তা ছাড়া একটা পড়া তৈরী হয়ে গেলে, সেটাকে দুদিন ফেলে না রেখে, ঘণ্টা পরে আবার শানিয়ে নিলে সেটা মনে থাকে বেশী।

Witasek ও Gates nonsense syllableএর ১৬টি তালিকা এবং জীবনী ৫টি নমুনা এবং নীচের মুখস্থ করে যে ফল পেয়েছেন তা নীচে দেখানো হোল।

Type of learning	Sixteen nonsense syllables percent remembered		Five biographies percent remembered	
	Immediately	After 4 hrs	Immediately	After 4 hrs.
All time devoted to reading	35	15	35	16
One fifth of time devoted to recitation	50	26	37	19
Two third of time devoted to recitation	54	28	41	25
Three-fifth of time devoted to recitation	52	32	42	26
Four-fifth of time devoted to recitation	74	48	42	26

Recitation versus Reading methods of memorisation.

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অনভ্যাসে, শেখা বা কাজ আমরা ভুলে যাই। কিন্তু সেটা যে একেবারে লোপ পেয়ে যায় না, তা আমরা বুঝতে পারি এ থেকে, যে আবার অভ্যাসে সুরু করলে পূর্বের দক্ষতা ফিরে পেতে অনেক কম সময় লাগে। একটা কবিতার stanza মুখস্থ করতে ১০ মিনিট সময় লাগলো। সে কবিতাটা অনেক যত্নের পর আবার নূতন করে মুখস্থ করতে সময় লাগলো ৮ মিনিট। কাজেই দেখা যাচ্ছে আবার শিখবার পরিশ্রম বাঁচলো ২০%। অর্থাৎ ২০% পূর্ব-অর্জিত বিষয়-বস্তু মনের মধ্যে সংরক্ষিত হোল। প্রথম শেখবার যত কম পরে Re-learningটা হবে সময় লাগবে ততকম। Ebbinghaus ইত্যাদির curves of forgetting থেকে ও কথাটা বুঝতে পারা যাবে।

Application of the results to the field of education—How to avoid forgetting.

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে কথাগুলো জানা গেল—শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের মূল্য রয়েছে। বাবের পড়াগুলো করে পরীক্ষা দিতে হয় তাদের পক্ষে কি করে মনে রাখা যেতে পারে—এ কথাটা জানা জীবনমরণের প্রশ্ন। এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক কি সাহায্য করতে পারেন? এখানে মনস্তাত্ত্বিক যে উত্তর দেবেন তাতে অনেক কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে—তবুও মোট কথাগুলো এক জায়গায় বলে নেওয়া মন্দ নয়।

কোন পড়া তৈরী করবার সময় সরবে আবৃত্তি করলে সেটা মনে থাকে ভালো।

যা মনঃসংযোগে বাধা সৃষ্টি করে, তা শিক্ষার পথে বিঘ্ন—স্মরণ রাখবার পথেও। তাই সুস্থ দেহ ও শান্ত অনুদ্বিগ্ন মন স্মরণশক্তির পক্ষে অনুকূল।

পড়াটা তৈরী করার সময় যা, কাজটা শেখার সময়, ঠিক যতটুকু শিখলে তখন তখন মনে থাকে (Just learnt), সেটুকুই শিখে সময় বাঁচানো মূর্খতা। এ রকম (Just-learnt material) বেশীক্ষণ মনে থাকে না। বরং প্রথম শেখার সময় কিছু বেশী সময় নিয়ে শেখাটা পোক্ত (consolidate) করে নেওয়া ভালো। যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে এ উপদেশটি স্মরণ রাখা বিশেষ দরকার। over-learning এর দ্বারা একটা বিষয় মনের মধ্যে গেঁথে যায়। তাই শিক্ষকদেরও উচিত নিতান্ত বিদ্যুরোজন তথা over learn করতে ছাত্রদের বাধ্য না করা। তাতে মন অযথা ভারাক্রান্ত হয়।

পড়াটা তৈরী করে বা কাজটা শিখে—সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে বিশ্রাম করলে ভাল হয়—তাতে শিক্ষিত বিষয়টা মনের মধ্যে গেঁথে বসে (consolidation)।

পড়াটা বা কাজটা শিখে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী। প্রথম দিকেই ভোলাটা বড় দ্রুত—তাই কয়েকঘণ্টা পরেই আবার পড়াটায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া দরকার। তার পর আবার দীর্ঘতর সময় পরে পরে পড়াটা দেখে নিলে খুব ভাল শেখা হয়ে যায়।

পড়াটা তৈরী করতে বা কাজটা শিখতে মনের মধ্যে যত বেশী যুক্তি-সঙ্গত সম্বন্ধ (logical relations) স্থাপন করা যায় ততই ভাল। কাজেই, না বুঝে মুখস্থ করা সবরের অপব্যবহার—তাতে পরিশ্রমও বেশী, ফলও কম। যেখানে শিক্ষার বিষয় যুক্তিসঙ্গত সম্বন্ধহীন তালিকা বা নামের সমষ্টি মাত্র, সেখানেও সম্ভব হলে মনগড়া সম্বন্ধ গড়ে নিতে পারলে তাদের শিখতে সময় কম লাগে—মনেও থাকে বেশী দিন।

বিষয়টাতে রুচি জন্মাতে পারলে—সেটাতে রস পেলে মন তাতে ভাল করে—তা ভাল মনে থাকে। বিরক্ত মন বিস্মরণের অনুকূল।

How to forget ? ভুলতে পারা যায় কি করে ?

জীবনে অনেক দুঃখময় অভিজ্ঞতা আমরা ভুলে যেতেই চাই। আমরা প্রিয়জনকে হারাই, তাকে স্মরণ করে বুক ভেঙে যায়। যাকে বিশ্বাস করেছি, সে ভুল বুঝে চলে যেতে। অন্যায় করেছি, লজ্জা পেয়েছি, অপদস্থ হয়েছি—এমন অপ্রীতিকর স্মৃতি আমরা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাই। Freudপন্থীরা বলবেন তা পারিও—কিন্তু সেটা অবচেতন মনের দুরূহ ব্যাপার—সেটাকে সচেতনভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই সমস্যা হোল—চেষ্টা করে, সচেতন ভাবে আমরা ভুলতে পারি কিনা? ওপরের আলোচনা থেকে কিছুটা উত্তর আমরা পেতে পারি। যেটা ভুলতে হবে সেটা পুনরাবৃত্তি (review) না করলে তার স্মৃতি দুর্বল হবে—সেই ঘটনার সঙ্গে যে সব বস্তু বা ঘটনার সংযোগ ঘনিষ্ট, তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। তবুও হয়তো বেদনাপূর্ণ স্মৃতি মনের দুয়ারে এসে হানা দেবে। অনেক সময় জোর করে আমরা ভুলতে চেষ্টা করি—কখনো কখনো কতকটা সফলও হই তাতে। কিন্তু এর বিপদ আছে। এটার থেকে দুশ্চিন্তা, হৃৎস্পন্দন, মাথা ঘোরা ইত্যাদি ব্যাধিই শুধু নয়—কখনো কখনো দুর্ঘটনা বা পক্ষাঘাতও ঘটতে দেখা গেছে। তা ছাড়া এতে নানা রকম মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি ঘটে (neurosis & complexes)। অর্থাৎ জোর করে ভোলার চেষ্টা বিপজ্জনক। ঘটনার সবটা স্থিরভাবে চিন্তা করে—তার সবটা দুঃখ ও বেদনার মুখোমুখি হতে পারলে বরং তার চেয়ে সুফল লাভের আশা বেশী। যদিও প্রথম অবস্থায় মানসিক বেদনার পরিমাণ তাতে বেশই হতে পারে। Woodworth বলেছেন "If involved in something we shall hate to remember, the best rule is to face the facts, think them through, do what needs to be done, and reach a satisfactory adjustment before laying the matter aside."

বাহির-বিশ্ব

শ্রীঅতুল দত্ত

অনুন্নত ও পশ্চাদ্বর্তী জাতিগুলিকে উন্নত ও প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়াই নাকি বৃটিশ বণিকী সাম্রাজ্যবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে দিকে দিকে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরবর্তীকালে সে ঘোষণা করে যে, অধিকৃত রাজ্যগুলিকে ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদানই তাহার নীতি; অনুন্নত সাধারণ জাতিগুলি রাজনৈতিক সাবালকত্ব লাভ করিলেই সে শাসনকর্তৃত্ব হস্তান্তর করিয়া চিরতরে প্রত্যাবর্তন করিবে। বিংশ শতাব্দীতে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার অভিনব পদ্ধতি আমরা লক্ষ্য করিতেছি। অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৃটিশ ট্রেড্ মার্কা স্বাধীনতার রক্তমাংসী সনদ রচিত হইতেছে লণ্ডনের ডাউনিং ষ্ট্রীটে। এই অপূর্ব স্বাধীনতা গিলাইবার জন্য স্থানীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সহিত জোট বাঁধিয়া প্রগতিপন্থীদিগকে নিষ্পেষিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, —প্রয়োজনমত সামরিক আইনও জারি হইয়াছে। (যেমন হইয়াছিল মিশরে)। কোথাও কৃত্রিম উপায়ে বিভেদ ঘটাইয়া স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে আত্মঘাতী কলহ সৃষ্টি করা হইয়াছে। মিশরকে বৃটেন স্বাধীনতা দিয়াছিল ১৯২২ সালে; কিন্তু সামরিক প্রভুত্ব সে কিছুতেই ত্যাগ করে নাই। পরবর্তীকালে মিশরের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণে সম্মত হইলেও বৃটেন আজও সুয়েজ খাল অঞ্চল আঁকড়াইয়া রহিয়াছে এবং মিশর হইতে সুদানকে পৃথক করিয়া বৃটিশ ভেদ-নীতির চূড়ান্ত আঘাত হানিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। সম্প্রতি লিবিয়াকে "স্বাধীনতা" প্রদান করিয়া সেখানে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এই লিবিয়া নাইজেরিয়ার বৃটিশ মার্কা স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার জন্য সেখানে সৈন্য গুলি চালাইয়া সেগুলি হইয়াছিল। অনুন্নত জাতির ত্রাতা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূপ আজ সর্বাপেক্ষা বীভৎস কেনিয়ায় ও মালয়ে। ইহার কারণ কেনিয়ায় বৃটিশ ধনিকবাদের লোভের ও শোষণে আত্মসমর্পণ করিয়া ভ্রাতৃকর্তার মহিমা কীর্তনে কেনিয়াবাসী অস্বীকার করিয়াছে, মালয়ে বৃটিশের রবার ও টিনের ব্যবসা পুষ্ট রাখিয়া মালয়বাসীকে বৃটিশ ট্রেড-মার্কা-স্বাধীনতা দেওয়াকে সম্ভব হয় নাই। তবে, বৃটেন বাজীমাৎ করিয়াছে ভারতে। এখানে বৃটিশের অর্থনৈতিক ফাঁস গলায় ঝুলাইয়া স্বাধীনতার মহিমা কীর্তনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন দেশবরেণ্য নেতারা।

বৃটিশ গায়ানা—

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে বৃটিশ গায়ানার স্বাধীনতা বন্টনের তথ্যাদী অতি কুৎসিতভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত রূপ প্রকট হইয়াছে নগ্নভাবে। পাঁচ লক্ষ নর-নারী অধ্যুষিত ক্ষুদ্র বৃটিশ গায়ানার আবের ক্ষেতের মালিক ইংরাজ, চিনির কলের মালিক ইংরাজ, খনির মালিক ইংরাজ। মাঠে, কারখানায়, খনিতে কাজ করে প্রধানতঃ ভারতীয় কুলির বংশধরেরা। ভারতীয়, নিগ্রো ও মিশ্র জাতি গায়নায় শতকরা ৯৯ জন; তাহারাই উকিল, ডাক্তার, কেরাণী। শতাব্দীকালের অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এই সুদূরবর্তী বৃটিশ উপনিবেশেও। এই আন্দোলন উপেক্ষা করা যখন সম্ভব হইল না, তখন ইংরাজ তাহার চাউমিং ষ্ট্রীটের মোহরাঙ্কিত এক অপূর্ব সংবিধান এই রাজ্যে প্রবর্তন করিল। গণতন্ত্রকে যাহারা পথের ধূলায় নামাইয়া উহাকে স্বৈরাচার ও শোষণের যন্ত্রে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের ভাষায় ইহা গণতান্ত্রিক সংবিধান। বস্তুতঃ, যাহা কিছু অ-গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বলিয়া এ যুগে নিন্দিত, এই শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি তাহাতে। গত মে মাসে প্রবর্তিত এই শাসনতন্ত্রের বিধানে বৃটিশ গভর্নরই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী,—তিনি প্রায় সামন্তরাজীয় নিরঙ্কুশ সম্রাট। নিম্ন পরিষদের ২৯ জন সদস্য নির্বাচিত এবং ৩ জন গভর্নরের মনোনীত হইবার বিধান। স্পীকারটিকে নিযুক্ত করিবেন গভর্নর; অবাঞ্ছিত বিলের বা কোনও প্রসঙ্গের আলোচনা গোড়াতেই বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এই পাকা ব্যবস্থা। উচ্চ পরিষদটির সকল সদস্যই গভর্নরের মনোনীত। অথচ ইহার ক্ষমতা যথেষ্ট; উচ্চ পরিষদের আপত্তিতে যে কোনও প্রস্তাব বা বিল এক বৎসর পর্যন্ত ঝুলিয়া চাপা থাকিতে পারে। সর্বোপরি, বৃটিশ গভর্নরটির হাতে ব্রহ্মাস্ত্র "ভিটো" রহিয়াছে; নিম্ন পরিষদে কোনও বিল গৃহীত হইবার পর উহা উচ্চ পরিষদের চাইও লেবে গিয়া মাথা খুঁড়িবে। সেখান হইতে যদি উহার উদ্ধার সম্ভব হয়, তাহা হইলে লাট সাহেবের ভিটোতে উহা অস্তিম হইয়া যাইতে পারে। এই খেল ব্যবস্থাপক বিভাগের বিচিত্র ব্যবস্থা। শাসন পরিষদের জন্য গোড়াতেই অভিনব ব্যবস্থা এই যে, পরিষদের সদস্যরা গোপনে ভোট দিয়া মন্ত্রী নির্বাচন করিবেন। রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক স্বাভাবিক-ভাবে মন্ত্রিমণ্ডল যদি গঠিত হয়, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী প্যাঁচ কষিবার পথে বিঘ্ন ঘটিতে পারে; তাই এই অপূর্ব পদ্ধতি। অবশ্য, গত নির্বাচনে পিপলস্ প্রগ্রেসিভ পার্টি নিম্ন পরিষদের ২৯টি আসনের মধ্যে ১৮টি অধিকার করায় এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে। নিম্ন পরিষদের ৯ জন মন্ত্রী, ৩ জন সরকারী কর্মচারী (চিফ্ সেক্রেটারী, এটর্নি জেনারেল এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী) এবং উচ্চ পরিষদের একজন সদস্য লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইবার ব্যবস্থা; এই পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন বৃটিশ গভর্নর স্বয়ং।

এই বিচিত্র শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গত মে মাসে বৃটিশ গায়নায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয়। পিপলস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টি পূর্ব হইতে এই শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা ভূমি-সংস্কার,

শাসনতন্ত্রের সংস্কার, ট্রেড ইউনিয়নের বাধ্যতামূলক বীমৃতি প্রভৃতি উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া নির্বাচন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নিম্ন পরিষদের ২৪৫টি আসনের ১৮টি আসনই অধিকৃত হয় এই দলের দ্বারা। এই দলের নেতা চেক্কি জাগান্ (টমি জাতিতে তারতীয়) নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন। দলের বিঘোষিত রীতি অনুসারে মনোমতে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে নূতনমন্ত্রিমণ্ডল সর্বপ্রথম উচ্চ পরিষদের সদস্যদের বেতন দিতে অস্বীকার করেন। সুতরাং বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে গভর্ণর বোধ হয় লজ্জা অনুভব করিয়াছিলেন : তাই বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। তাহার পর অনাবৃষ্টিজনিত ফসলের ক্ষতি নিবারণের জন্য জমিদারদিগকে সেচের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে একটি জরুরী বিল উত্থাপিত হয়। উচ্চ পরিষদ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কোনও শিল্পের অধিকাংশ শ্রমিক কোনও ইউনিয়নের সদস্য থাকিলে উহা মানিয়া লইবার ব্যবস্থাসম্বলিত বিলটি গভর্ণরের নিযুক্ত সভার উত্থাপন করিতে দেন নাই। গণতন্ত্রের আলার এইখানেই শেষ নহে। পররাষ্ট্র বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং অর্থবিভাগ তো স্থায়ী কর্মচারীদের (শাসন পরিষদের সভ্য চিফ্ সেক্রেটারী, এটর্নি জেনারেল এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী) হাতে রহিয়াছেই। অন্যত্রও স্থায়ী কর্মচারীরা মন্ত্রীদের নির্দেশ অবাধে অমান্য করেন। একজন মন্ত্রী একটি সেচের পাম্প চালু করিবার আদেশ দিলে বিভাগীয় স্থায়ী কর্মচারী বিতর্কে সে আদেশ অমান্য করেন। বর্ষবট তাড়িবার জন্য একটি বন্দুকের লাইসেন্স করিয়া পুলিস লইয়া যাওয়া হইয়াছিল শুনিয়া বিভাগীয় মন্ত্রী যখন আপত্তি করেন, তখন তাঁহাকে শুনাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহাই রীতি।

লিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টির রাজনৈতিক আদর্শ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অজানা ছিল না। এই দলের প্রতিষ্ঠিগণ তাঁহাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তবুও, সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ত আশা ছিল,—ক্ষমতার চাকায় জোতা হইলে এই দলের প্রতিনিধিরা পোষ মানিবেন। এই জন্যই বোধহয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সময়ে, নির্বাচনের পূর্বে অথবা অব্যবহিত পরে কিংবা কেহই শোনে নাই যে, বৃটিশ গায়নায় লিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টিটি হঠাৎবরণে কম্যুনিষ্ট পার্টি,—নিয়মতন্ত্র-বিরুদ্ধ পন্থায় কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠাই ঐ দলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্য। নির্বাচনে জয়ী হইবার পর ঐ দলের প্রতিনিধিরা যখন পোষ মানিলেন না,—অবলম্বনের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনে অগ্রসর হইলেন, তখনই চার্চিল গভর্ণমেণ্ট প্রমাদ গণিলেন : ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ—বৃটিশ রণিকী স্বার্থ বিপন্ন হইতে চলিয়াছে দেখিয়া হুজুরাবকে তাঁহাদের মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। তাঁহারা স্থির করিয়া ফেলিলেন—জাগান্ গভর্ণমেণ্টকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কোনও পন্থা যখন নাই, তখন অবিলম্বে শাসনতন্ত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে। পূর্বে কমিশন বসাইয়া তদন্ত করাইয়া, পরে সেই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সমস্ত আঁট-ঘাট বাঁধিয়া যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইল, তাহা প্রত্যাহার করিতে হইলে একটা নূতনই অনুহাত দরকার। অতি খল চার্চিল গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন,—জাগান্ মন্ত্রিসভা এবং তাঁহাদের লিপ্‌লস্ প্রগ্রেসিভ্ পার্টি কম্যুনিষ্ট "ক্যাণের" দ্বারা কবলিত হইতেছিল এই অনুহাতেই সর্বাধিকৃষ্ট : ইহাতে আমেরিকার সমর্থন সহজেই পাওয়া যাইবে, আমেরিকার অনুপূরীত রাষ্ট্রগুলিও জাগান্ মন্ত্রিমণ্ডলের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে নারাজী হইবে না। সে মতলব, অবিলম্বেই সেই কাজ : গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধজাহাজ তরী হইতে বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হইল, বৃটিশ গায়নায় জাগান্ মন্ত্রিসভা পদচ্যুত হইলেন, শাসনতন্ত্র স্থগিত হইল, গভর্ণর স্যার্ ফ্রাঙ্কের শাসন-ক্ষমতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবাদীর পরিচয় দিলেন। অবশ্য, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র ইতিহাসই এইরূপ কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত ; বৃটিশ বণিকী স্বার্থ রক্ষার জন্য যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ সে ইতিহাসের এই প্রথম ঘটনা নয়।

যাহা হউক, ব্যাপারটি অত নীরবে ঘটানো সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল, তত নীরবে উহা ঘটিতে পারে নাই : কম্যুনিষ্ট-বিরোধী মার্কিনী প্রিন্সিরের নিকট উদারপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ যাঁহারা এখনও বিসর্জন দেন নাই, তাঁহারা বৃটিশের এই অপকীর্তির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ; জাতিসঙ্ঘের অন্তি কমিটিতেও প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হইয়াছিল। সর্বোপরি, বৃটিশ গায়নার পদচ্যুত মন্ত্রিবৃন্দ বৃটিশের এই স্বৈরাচারী উদ্ধত্য নীরবে সহ্য করেন নাই ; তাঁহারা বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি ও দলের নিকট সহানুভূতি ও সমর্থন চাহিয়াছেন। বৃটিশ জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ডাঃ চেক্কি জাগান্ এবং তাঁহার সহ-মন্ত্রী মিঃ বার্ণহাম্ সম্প্রতি লণ্ডনে গিয়াছেন। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ জাগান্ চার্চিল গভর্ণমেণ্টের অভিযোগগুলির সমুচিত উত্তর দিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার জন্য তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কম্যুনিষ্ট বলিয়া নির্দিষ্ট ব্যক্তির মুখে বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকিবার এই অকৃত্রিম আগ্রহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বস্তুতঃ, ডাঃ জাগান্ বলেন যে, তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা যদি কম্যুনিষ্ট হন, তাহা হইলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও কম্যুনিষ্ট। পণ্ডিত নেহরুর কমনওয়েলথ-প্রীতিকে ইঁহাদের সহিত তাঁহার স্বাভাবিক যোগসূত্র বলিতে হইবে। এই সূত্রের যে নামই হউক, উহা কম্যুনিজম্ যে নহে, তাহা সমসাময়িক রাজনীতির সহিত পরিচিত ব্যক্তি-মাত্রই স্বীকার করিবেন।

আমেরিকার সমর্থনেই গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রের কবরালো প্রতি বৃটেন এইরূপ নির্লজ্জভাবে আঘাত করল। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নিন্দার সর্বপ্রধান উপাদান—"কম্যুনিজম্ গণতন্ত্রবিরোধী, কম্যুনিজম্ হিংসাশ্রয়ী।" কিন্তু বৃটিশ গায়নায় জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রিমণ্ডলকে এইভাবে গদীচ্যুত করিয়া যাঁহারা ক্ষমতায় বসাইলেন তাঁহারা কোন্ "ইজম্" ? বৃটিশ গায়না একটি শুল্কবহীন রাজ্য : সেখানকার জনসংখ্যাও মুষ্টিমেয়। মালয়ে ও কেনিয়ায় যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা জগৎ সমক্ষেও হার মানাইয়াছে, ক্ষুদ্র বৃটিশ গায়নায় তাহার এই আচরণে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই ; গণতান্ত্রিক

সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নীতি মুখোশ বাস্তব স্বার্থের সংঘাতে এইভাবেই খসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ঘটনায় শিক্ষণীয় বিষয় আছে প্রচুর। বিশেষতঃ প্রাচ্যে যে সব রাজ্য দুইদিনের মহানুভবতায় (?) স্বাধীনতা পাইয়াছে, তাহারা ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুক; সতর্ক হউক মিশর, ইরাণ প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলি। ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করিতে পারিতেছে একমাত্র এই কারণে যে, এই সব দেশের শাসন ক্ষমতা ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির অবাঞ্ছিত কোনও শক্তির হাতে যায় নাই। ইরাণে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে উস্কানী দিয়াই অবাঞ্ছিত মোসাদেক গভর্ণমেণ্টের উৎসাদন সম্ভব হইয়াছে; ইহা অসম্ভব হইলে গণতন্ত্রের স্বপ্ন ভুলাইয়া অন্যথা ইঙ্গ-মার্কিন রণপোত পারস্যোপসাগরে উপস্থিত হইত। মিশরের সহিত বৃটিশের মীমাংসায় যতই বিলম্ব হউক, নাসির্ গভর্ণমেণ্টকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এখনও অবাঞ্ছিত মনে করিতেছেন। ভারত, পাকিস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রে যদি ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর অনভিপ্রেত শক্তি শাসন ক্ষমতা লাভ করে, এই অঞ্চলে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর অর্থনৈতিক স্বার্থ কতি বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে, এই সব রাজ্য যদি সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক সামরিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধতা করিবার স্পর্দ্ধা দেখায়, তাহা হইলে অবিলম্বে ভারত মহাসাগর ইঙ্গ-মার্কিন রণপোতে ভরিয়া যাইবে। ইহা নৈরাজ্যবাদীর অনুমান নহে, কম্যুনিষ্টের উত্তেজ-প্রণোদিত প্রচার নহে,—ইহা দিবালোকের মত সত্য। ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতায় বৃটিশ নীতির স্বার্থে আঘাত লাগে নাই, পররাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ভারতের নিরপেক্ষতা এখনও আন্তর্জাতিক সামরিক ষড়যন্ত্রে বিঘ্ন ঘটায় নাই। তবুও ভারতকে পরিপূর্ণরূপে ইঙ্গ-মার্কিন শিবিরে লইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতকে চাপ দেওয়া হইতেছে, পাকিস্তানকে মধ্য-প্রাচ্য কমাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ভারতকে অন্তর্বিবাদে ফেলিবার আয়োজন চলিতেছে। এই সব আয়োজন ও অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ভারতে যদি এমন শক্তির উদ্ভব ঘটে, যাহা সাম্রাজ্যবাদীর অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থের পক্ষে বিঘ্নকর, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাহার স্বরূপ ধারণে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না।

কোরিয়ার যুদ্ধ-বিরতির জের—

কোরিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি ঘটিয়াছে বটে। কিন্তু কোনও পক্ষের বিচারে এই যুদ্ধের সামরিক মীমাংসা হয় নাই; যে মনোভাব লইয়া তিন বৎসর এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলিল, তাহারও পরিবর্তন ঘটে নাই। বিশ্বের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ যে নৈতিক চাপ দিতেছিল, তাহা উপেক্ষা করা আর সম্ভব ছিল না; তাই, অন্ততঃ সাময়িকভাবে কোরিয়ায় অস্ত্র সংবরণ করিতে হইয়াছে। অর্দ্ধেক-কম্যুনিষ্ট কোরিয়ার সহিত সীঙ্‌ম্যান্ রীর শাসিত ক্যাপিটি অপরার্দ্ধের শান্তিপূর্ণ মিলন বর্ত্তমানে কিছুতেই সম্ভব নহে। এই বাস্তব সত্য উপেক্ষা করিয়া মার্কিণ যুদ্ধনেতা তাঁহাদের আশ্রিত রীকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, রাজনৈতিক সম্মেলনে যদি তিন মাসের মধ্যে কোরিয়ার দুই অংশকে মিলিত করিবার ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে দক্ষিণ কোরিয়া তখন সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষে একাকী সামরিক বল প্রয়োগ করা অসম্ভব; সে বলের উৎস মার্কিণ সমর-ভাণ্ডার। বস্তুতঃ, সিঙ্‌ম্যান্ রীকে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেস্ এই আশ্বাসবাণীই শুনাইয়াছেন যে, তিন মাসের মধ্যে রাজনৈতিক সম্মিলনীতে কোরিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা না হইলে মার্কিণ সামরিক সাহায্য লইয়া দক্ষিণ কোরিয়া পুনরায় উত্তরাভিমুখে অভিযান আরম্ভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই বিষয়ে একটি অস্ববিধা রহিয়া গিয়াছে: আমেরিকায় পিতামাতারা কোরিয়ায় নিজ নিজ তাহাদের পুত্রদের মৃত্যুবরণ আর সহ্য করিতে প্রস্তুত নয়। কোরিয়ায় মার্কিণ যুবকদের নিধন বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াই আইসেনহাওয়ার গত বৎসর প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এখন পুনরায় কোরিয়ায় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রীকে আমেরিকা সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে পারিবে; কিন্তু দিতে পারিবে না মার্কিণ সৈন্য। "এশিয়াবাসীকে দিয়া এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে লড়াইবার" যে ডালেস্-আইসেনহাওয়ারী রীতি ইতিপূর্ব্বে ঘোষিত হইয়াছে, তাহাই তখন পুরাপুরি অনুসরণ করিতে হইবে। যুদ্ধবন্দী-বিনিময়ের প্রশ্ন লইয়া ডালেস্-রীর বলের যে এত ভিন্ন, তাহার মূল কারণ ইহাই। কম্যুনিষ্ট পক্ষের যে বিপুলসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য বন্দিরূপে তাহাদের হাতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে হাতছাড়া করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নন। বন্দী-বিনিময় সম্পর্কে যখন একটা "ফরমুলা" আবিষ্কৃত হইল এবং উভয়পক্ষের সম্মতিতে এই ব্যাপারে মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন সিঙ্‌ম্যান্ রী বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সাতাশ হাজার বন্দীকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যের পশ্চাতে যে মার্কিণ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের গোপন পরামর্শ ও সমর্থন ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই সব প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট সৈন্য এখন নিশ্চয়ই দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেতে-কারখানায় শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে না; তাহাদিগকে আধুনিক মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত করিয়া উত্তর কোরিয়া অভিমুখে এবং সম্ভবতঃ চীন হইতে দক্ষিণ চীনে ফেলাইয়া দিবার আয়োজন চলিতেছে।

যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীর ভার এখন পড়িয়াছে একটি নিরপেক্ষ কমিশনের উপর। ভারত, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড এই কমিশনের সদস্য; ভারত উহার চেয়ারম্যান্; ভারতীয় সৈন্য এখন বন্দিশিবিরের রক্ষী। যুদ্ধ-বিরতির সর্ত্ত অনুসারে—এই সময় উভয়পক্ষ তাহাদের বক্তব্য যুদ্ধবন্দীদের নিকট ব্যক্ত করিবে; এই বক্তব্য শুনিয়া বন্দীরা তাহাদের চূড়ান্ত স্থির করিবে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিবার অথবা না ফিরিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। কিন্তু এই কার্য্য কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারিতেছে না। দক্ষিণ কোরিয়ার রীর দল যুদ্ধ-বন্দীদিগকে নিরপেক্ষ কমিশনের হাতে দিবার পূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে গুপ্তচর ও প্ররোচক রাখিয়াছে প্রচুর সংখ্যায়; সংবাদ আদান-প্রদানের গোপন ব্যবস্থাও করিয়াছে। এই সব গুপ্তচর ও প্ররোচক বন্দিশিবিরের

অভ্যন্তরে এমনই বল পাকাইয়াছে এবং ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে যে, বন্দীদিগকে প্রকৃত অবস্থা শুনাইবার ব্যবস্থা করা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না; তাহাদিগকে উত্তর কোরীয় ও চীনা প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থাপিত করাই অসম্ভব হইতেছে। প্রথম দিকে ইহারা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করিয়াছিল। সে ব্যবস্থায় দুই জন যুদ্ধবন্দীর প্রাণহানি ঘটায় দক্ষিণ কোরিয়ার পেশাদার ভিক্ষোভকারীদিগকে রাজপথে বাহির করিয়া ভারত-বিরোধী মিছিল তোলা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ কোরিয়ার এখন সর্বপ্রকার দুষ্কার্যের জন্য এক শ্রেণীর পেশাদার ভিক্ষোভকারী পাওয়া যায়; ইহারা শ্মশানে চিতার সারির পাশে দাঁড়াইয়াও মহামারী-নিবারণ-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে। যাহা হউক, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল থিমায়ার বিচক্ষণতায় এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃঢ়তায় দক্ষিণ কোরিয়ার এই চাল ব্যর্থ হইয়াছে; যদিশিবিরে হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর অযোগ্যতা বা কম্যুনিষ্টদের প্রতি তাহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। এখন উত্তর কোরীয় ও চীনা প্রতিনিধিদের নিকট বন্দীদের উপস্থাপন অসম্ভব করিয়া প্রকৃত অবস্থা এবং আত্মসমর্পণে বন্দীদিগকে শুনিতে না দিবার নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ কমিশন ও ভারতীয় সেনাবাহিনী অত্যন্ত জটিল অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছেন। বলপূর্বক বন্দীদিগকে "ব্যাখ্যাশিবিরে" উপস্থিত করাইতে গেলে হাঙ্গামা এবং রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। অথচ, শান্তিপূর্ণভাবে বন্দীদিগকে উপস্থাপিত করাও অসম্ভব। অবস্থা যেরূপ মনে হয়, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-বিরতি সর্ত্তের এই অংশে একটা গোঁজামিল দিবারই চেষ্টা হইবে। উত্তর কোরিয়া ও চীন সে গোঁজামিল সহ্য করে কি না, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ত্রিয়েস্ত প্রসঙ্গ—

আন্তর্জাতিক সাগরের উত্তর উপকূলের ত্রিয়েস্ত পোতাশ্রয়ের ভবিষ্যৎ ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃপক্ষ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। ইতালীয় শান্তি-চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে এই পোতাশ্রয়টি এক জন নিরপেক্ষ গভর্ণরের শাসনাধীনে স্বাধীন মসরীতে পরিণত হইবার কথা। কিন্তু শান্তি-চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে মতদ্বৈধের জন্য গভর্ণর নিযুক্ত হইতে পারে নাই। বিশেষতঃ ত্রিয়েস্তকে স্বাধীন নগরে পরিণত করিয়া এই সামরিক গুরুত্ব-সম্পন্ন পোতাশ্রয়কে আপন কর্তৃত্বচ্যুত করিতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি প্রস্তুত নয়। ত্রিয়েস্ত লইয়া ইতালী ও যুগোস্লোভিয়ার মধ্যে যে বিরোধ, তাহাকে জীয়াইয়া রাখাই এই পোতাশ্রয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃত্ব বজায় রাখার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই নীতি অনুসারে সম্প্রতি ত্রিয়েস্তের "ক" অঞ্চল ইতালীকে প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে: "খ" অঞ্চল রহিয়াছে যুগোস্লোভিয়ার কর্তৃত্বাধীনে। ত্রিয়েস্তকে এইভাবে বিভক্ত করায় এবং সমগ্র পোতাশ্রয়ের জন্য যুগোস্লোভিয়ার দাবী উপেক্ষিত হওয়ায় মার্শাল টীটো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; তিনি হুমকী দিয়াছেন যে, "ক" অঞ্চলে ইতালীর সৈন্য প্রবেশ করিলেই তিনি তথায় যুগোস্লাভ সেনাবাহিনী প্রেরণ করিবেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অটল; মার্শাল টীটোর হুমকীতে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ—ইতালীতে মার্কিণ প্রভুত্বের ভিত্তি শিথিল হইবার লক্ষণ সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে। ইতালীর সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে দেখা গিয়াছে যে, কম্যুনিষ্ট এবং বামপন্থী সোস্যালিষ্টরা যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী পেলা অতি সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া কোন প্রকারে মন্ত্রিত্ব-তরণী টিকাইয়া রাখিয়াছেন। ইতালীতে বামপন্থীদের এই শক্তি-বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হইয়া ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ ইতালীর জনমতকে কতকটা তোষণ করিতে আগ্রহী হইয়াছে। ত্রিয়েস্ত সম্পর্কে ইতালীতে জনমত অত্যন্ত প্রবল। সমগ্র ত্রিয়েস্তের পরিবর্ত্তে উহার অন্ততঃ অর্দ্ধেকও যদি ইতালীর অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির আঁচলধরা পেশা-মন্ত্রিমণ্ডলের মর্য্যাদা জনসাধারণের নিকট কিছু বাড়িবে বলিয়া তাঁহারা আশা করেন। পক্ষান্তরে, মার্শাল টীটোর হুমকীতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি কিছুমাত্র বিচলিত নন; কারণ তাঁহাদের বিরোধিতা করিবার শক্তি যে মার্শাল টীটোর নাই, ইহা তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের শিবিরে ভিড়িয়া যাইবার পথ তাঁহার রুদ্ধ: কি অর্থ-নৈতিক, কি সামরিক—সকল দিকেই তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে মার্কিণ অনুগ্রহের প্রতি নির্ভরশীল।

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা ব্যর্থ—

সুয়েজ অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ সম্পর্কে পাঁচ মাস ধরিয়া যে আলোচনা চলিতেছিল, গত অক্টোবর মাসে তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় বৃটিশ সৈন্য পুনরায় সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে, এই প্রশ্নের কোনও মীমাংসা সম্ভব হয় নাই। মিশরের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে, ককাসস্-ইরাক্ সীমান্ত যদি আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে বৃটিশ সৈন্য পুনরায় সুয়েজ অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু বৃটেন দাবী করে যে, তুরস্ক আক্রান্ত হইলেও বৃটিশ সৈন্যকে সুয়েজে প্রবেশাধিকার দিতে হইবে; তাহা ছাড়া পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জাতি-সঙ্ঘ যদি স্থির করে, তাহা হইলেও বৃটিশ সৈন্যকে সুয়েজে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আর একটি দাবী—বৃটিশ সৈন্য অপসারিত হইবার পর সুয়েজ অঞ্চলে চার হাজার বৃটিশ বিশেষজ্ঞ থাকিবে এবং তাঁহারা সামরিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিবে। সামরিক বিশেষজ্ঞের অবস্থানে মিশরের আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাহাদের সামরিক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে দিতে মিশর সম্মত নয়, কারণ তাহাতে জনসাধারণের মনে এই ধারণার সঞ্চার হইবে না যে, বৃটিশ সৈন্য সত্যই অপসারিত হইয়াছে।

পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জাতি-সঙ্ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেই তাহাকে তর্ত্তি বৃটিশ সৈন্য আসিবে সুয়েজ অঞ্চলে,—এই দাবী অদ্ভুত। এই ব্যবস্থা অনুসারে কোরিয়ার সাম্প্রতিক

মুক্তা স্থায় অবস্থায় বৃটিশ সৈন্য মুহূর্তে প্রবেশের অধিকারী হইবে; ইন্দোচীনে কমুনিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ভারত-সম্ভ হইতে যদি কোন প্রকারে একটা ঘোষণা বাহির করা যায়, তাহা হইলে সৈন্য বোঝাই হইয়া বৃটিশ রণপোত মুহূর্তে আসিতে পারিবে। প্রকৃত কথা এই—বিশেষজ্ঞের ছদ্মবেশে চার হাজার মাত্র বৃটিশ সৈন্য মুহূর্তে অকাল রাখিবার ব্যবস্থায় বৃটেন তাহার মধ্যপ্রাচ্য স্বার্থ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামান্য চাঞ্চল্য ঘটিলেই সেই অছুহাতে মুহূর্তে সে পুনরায় প্রবেশ করিতে চায়। বস্তুতঃ বৃটেনের মধ্য প্রাচ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য মুহূর্তে অকাল তাহার সামরিক প্রভুত্ব চাই-ই। সম্প্রতি ইরাণে তৈল স্বার্থ বিপন্ন হইবার সময় রক্ষণশীল বৃটিশ সংবাদ-পত্রগুলি এই যুক্তিরই আশ্রয় করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের উপর বৃটেনের সামরিক প্রভুত্ব না থাকিবার জন্যই মোসাদ্দেক্ গভর্ণমেণ্টের এইরূপ দুঃসাহস সম্ভব হইতে পারিয়াছে। ভারতে বৃটেনের সামরিক প্রভুত্ব নিরাপদ; এখন মুহূর্তে অকাল হইতে সৈন্য অপসারণ করিয়া বৃটেন মধ্য প্রাচ্যে তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্ভাগ্যের পরোয়ানা লিখিয়া দিতে কিছুতেই পারে না। ২৪।১০।৫৩

পাশ্চাত্ত্য দর্শন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়কে আমি ছেলেবেলা হইতেই জানি। ইনি ১৯০০ সালে জেনারেল এসেমব্লি হইতে বি-এ পাশ করেন। দর্শন শাস্ত্রে ইহার অনার্স ছিল এবং একমাত্র ইনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছিলেন। ইনি পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী পাইয়া আর কলেজে অধ্যয়ন করেন নাই। ইনি এম, এ পরীক্ষা দিলে দর্শন বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন সে বিষয়ে কোন ভুল নাই। ডেপুটি হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিয়া যখন ইনি অবসর লইলেন তখন মনে করা গিয়াছিল যে এইবার অবসরের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াই সময় কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু দেখিতেছি যে দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে অবসরের স্বাচ্ছন্দ্য হইতে টানিয়া আনিয়াছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস সংকলনে। এই কঠোর কার্য্যে অনেকে যুবা বয়সেও হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত। কিন্তু তিনি অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই দুরূহ কার্য্যে শুধু হস্তক্ষেপ করা নহে—ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা সাহিত্যে প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন। আমার বোধহয় এই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসের প্রকাশন একটি যুগান্তকারী ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গহন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইনি যে ভাবে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ধারাবাহিকরূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের ব্যাপার। আমাদের পঠদ্দশায় দেখিয়াছি দর্শন শাস্ত্রের জটিল বিষয়সমূহ ইংরাজীতে না বলিলে বা ব্যাখ্যা করিলে ভাল বোঝা যাইত না। কিন্তু বিগত ৫০ বৎসরে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি। আমরা যাহা ইংরাজীতে পড়ি তাহাও বাংলা ভাষায় ব্যক্ত না করিলে আমাদের জ্ঞান-স্পৃহা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। এই ধারণাই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস প্রণয়নে রায় মহাশয়কে উদ্বুদ্ধ ও প্রণোদিত করিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করিত না, বাংলা দেশে তাহারই চাহিদা মিটাইবার জন্য এই প্রয়াস।

তিনখণ্ডে প্রকাশিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস বাংলায় ইতিপূর্ব্বে বাহির হয় নাই। তিনখণ্ডে ঘন-সন্নিবিষ্ট মুদ্রণ কার্য্য দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, কি অসাধারণ দক্ষতা ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। বাংলায় ত এরূপ পুস্তক নাই-ই, ইংরাজী ভাষায়ও ইহার মত পুস্তক এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই। ইংরাজীকে অবলম্বন করিয়াই লেখক এই বিরাট পুস্তকখানি সঙ্কলন করিয়াছেন, ইহা ঠিক। কিন্তু নির্বাচন-কুশলতার এবং অনুরাগের জন্য এই পুস্তকখানি যে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রীকদর্শনে (প্রথমখণ্ড) সক্রেটিস, প্লেটো ও আরিষ্টটল সম্বন্ধে লেখক যে মনীষার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে পাঠক মাত্রেই উপকৃত হইবেন। প্লেটোর Communism সম্বন্ধে তিনি যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা উপাদেয় হইয়াছে। কাহারও বাক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না।

Platoর আদর্শ রাষ্ট্রে সমস্ত সম্পত্তি এজমালী বলিয়া গণ্য হইবে। স্ত্রী ও ছেলেপেলেদের উপর কাহারও কোনও ব্যক্তিগত অধিকার থাকিবে না। কে কাহার পিতা তাহা যখন কেহ জানে না তখন পিতা হইবার উপযুক্ত বয়সের সকলকেই লোকে পিতা বলিয়া ডাকিবে। লটারী দ্বারা যুবক যুবতীদের মিলন ঘটাইতে হইবে। সন্তান হইবার পরেই তাহাকে পিতামাতার নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইতে হইবে—ইত্যাদি, আরিষ্টটল সম্বন্ধে তিনি সত্যই লিখিয়াছেন যে "তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোক জগতে অধিক আবির্ভূত হয় নাই।" তিনি তর্কবিদ্যা, অলঙ্কার (Rhetoric), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, তত্ত্ববিজ্ঞান, প্রাণী বিজ্ঞান, প্রাণ বিজ্ঞান, মনবিজ্ঞান, চরিত্রনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং আরও অনেক বিষয় রীতিমত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা করিয়াছিলেন। এর প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে লেখক অদ্ভুত প্রতিভার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটো শ্রেয়ঃ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, শ্রেয়ই বিশ্বের আদি, অন্ত, সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা এবং সূর্য্যের স্রষ্টা ও পিতা বলিয়া, আমাদের জগতেরও স্রষ্টা ও পিতা। তিনি শ্রেয়কে ইন্দ্রিয় জগতের ও চিন্তা জগতের স্রষ্টা বলিয়াছেন। শ্রেয় (The good) সম্বন্ধে আমাদের দর্শনেও অনুরূপ কথা আছে। লেখক কঠোপনিষদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রেয়ঃ ও প্রেয় উভয়েই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। তিনি প্রেয় অপেক্ষা উত্তম বলিয়া শ্রেয়কে বরণ করেন।

মধ্যযুগে আসিয়া তিনি স্পিনোজা সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও সুন্দর হইয়াছে। স্পিনোজার চরিত্র ও সমাজের অভিসম্পাত এখনও আমাদের নিকট সমস্যার সৃষ্টি করে। যাঁর চরিত্র সর্ব্ববিষয়ে অনবদ্য ছিল, তাহার সম্বন্ধে সমাজকর্ত্তাদের এরূপ কঠোর হওয়া, বড়ই রূঢ় আচরণ বলিয়া মনে হয়। "সে দিবাভাগে অভিশপ্ত হউক, রাত্রিকালে সে অভিশপ্ত হউক, শয়নে অভিশপ্ত হউক, শয্যাত্যাগে বহির্গমনে সে অভিশপ্ত হউক, গৃহ প্রবেশে সে অভিশপ্ত হউক। ঈশ্বর যেন কখনও তাহাকে ক্ষমা না করেন ইত্যাদি—মধ্যযুগেরই আচরণ বলিয়া মনে হয়। এই মধ্যযুগেই লোককে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা খৃষ্টীয় সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কাহাকেও মারিতে হইবে, অথচ রক্তপাতও হইবে না, এই অবস্থায় তাহাকে Inquisitionএ পাঠাইয়া দেওয়া হইত। অর্থাৎ তাহাকে জীবন্ত অগ্নিতে সমর্পণ করা হইত। বর্ত্তমান যুগের এই গৌরব যে, আমরা এইরূপ বর্ব্বরতাকে পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছি।

Immanuel Kant সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা সবদিক দিয়াই ভাল হইয়াছে। আমার বোধহয় কাণ্টের দর্শন মানবের চিন্তাকে যত প্রভাবিত করিয়াছে এত আর কিছুতেই করে নাই। কাণ্টের বৈপ্লবিক মতবাদ তাঁহার Critique of Pure Reasonএ প্রতিফলিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার Critique of Jdgementএ সে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইয়াছিল। নৈতিক বিচার এবং ভগবানের সত্তা নিঃসন্দেহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যাহা যুক্তির সদর দরজা দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহাই অনুভূতির জানালা দিয়া প্রবেশ করিল। ইহার পর Fichteএ অহংবাদ, Schellingএর ব্রহ্মবাদ এবং শোপেনহরের দুঃখবাদ বিশেষ বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত দার্শনিক রাজচক্রবর্ত্তীদিগের মতবাদ বিশ্লেষণে লেখক অসামান্য বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। শোপেনহরের দুঃখবাদের মধ্যে আমাদের দর্শনের অনেক আভাষপ্রাপ্ত হওয়া যায়। "জীবনে দুঃখই সত্য পদার্থ। সুখ দুঃখের অভাবমাত্র। এ দুঃখ কখনও নিবৃত্তি হইবে না। কারণ জগৎ ইচ্ছা-স্বরূপ। ইচ্ছা অভাব হইতে উদ্ভূত এবং যত চায় তত পায় না। একটা কামনা যদি পূর্ণ হয়, দশটা অপূর্ণ থাকে। ইচ্ছা ভিক্ষুকের মত। ভিক্ষার দ্বারা ভিক্ষুক প্রাণরক্ষা করে। কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা প্রাণরক্ষার ফল দুঃখের স্থিতিকালের বৃদ্ধি। যে কামনা পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইতে নূতন কামনার উৎপত্তি হয়। সুতরাং কামনার অন্তহীন স্রোত বহিতে থাকে। বৌদ্ধেরাও বলিয়াছেন যে, অনাদি বাসনা হইতেই জগতের উৎপত্তি।

হেগেল সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। হেগেলের দর্শন অনেকের পক্ষেই দুর্ব্বোধ্য। এ সম্বন্ধে একজন ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, একমাত্র লোক আছেন যিনি হেগেল বোঝেন এবং তিনিও ভাল বোঝেন না। সেই একমাত্র লোকটী হেগেল নিজেই। এ অবস্থায় হেগেলের দর্শন বুঝিতে যাওয়া নিতান্তই কষ্টকর। হেগেল

Abstract চিন্তার অধিকারী হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার Logic অনেকে বুঝিতে পারে নাই। তাহা সত্ত্বেও তিনি Heidelberg বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অথচ এই হেগেল সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তিনি যখন ডিগ্রী পাইলেন তখন তাহাতে লেখা ছিল যে তাঁহার দর্শন শাস্ত্রে কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। হেগেলের দর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনের সমন্বয় বলা যাইতে পারে। গ্রীক দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া Kantএর মধ্য দিয়া Fichte Schellingএর মতবাদ তিনি যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেগেলের মতের প্রধান কথা হইল Absoluteএর ধারণা। হেগেলের অসঙ্গ বা Absolute স্ব-সংবিদ Self-conscious ইহাতে Aristotleএর ন্যায় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ঈশ্বর চৈতন্যরূপী"। তিনি রূপের রূপ এবং চিন্তার চিন্তা। তিনি আপনাকেই চিন্তা করেন। ন্যায়ের নিয়ম হইতে এই জগৎ উদ্ভূত। অসীম হইতেছে সীমাহীন। সুতরাং অসীম অনির্দ্দিষ্ট। তাহার কোন গুণ নাই। অসীম কেবল আপনা কর্ত্তৃক বিশেষিত ও নিয়ন্ত্রিত। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে অবস্থিত যে একত্ব তাহাই Absolute. হেগেলের মতে হিন্দুরা Absoluteএর ধারণায় পৌঁছিতে পারেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ইতিহাস লেখক দেখাইয়াছেন যে হেগেলের এই ধারণা হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতারই ফল। হিন্দুদের ব্রহ্ম—যাহার সম্বন্ধে উপনিষদে নির্গুণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা হেগেলের Absolute ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হেগেলের মৃত্যুর পর এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিতেই সমস্ত দেশে তাঁহার মত ছড়াইয়া পড়ে। ব্যবহারশাস্ত্র Law, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান, চরিত্রনীতি এবং অন্যান্য শাস্ত্র হেগেলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এমন কি সাম্যবাদ বা Communism হেগেলের নিকট ঋণী। Carl Marx হেগেলের Dialectic বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিয়াছেন। Communism প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। Platoর মধ্যে আমরা ইহার পূর্ণপরিণতি দেখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে ধনিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বিবাদের ফলে Carl Marxএর Communism নূতনরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে যত রকম মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে Communism বহুবিস্তৃত ও বিশেষ শক্তিশালী। রুশিয়া, চীন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দেশে ইহা একরূপ ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড, আমেরিকা—এমন কি বর্ত্তমান ভারতেও ইহার প্রভাব অনুভূত হইতেছে। Marx লিখিয়াছেন, ধনিকদের নির্ম্মূল না করিলে শ্রমিকদের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। "ধনিকতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিয়াও ফল হইবে না।" "ধনিকতন্ত্রের গর্ভেই সাম্যবাদ জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু অবশেষে একদিন আসে সেদিন জননীর গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া এবং তার প্রাণনাশ করিয়া সাম্যবাদ পরিপুষ্টি লাভ করে।" Capitalist বা ধনিকতন্ত্র নির্ম্মূল হইলে জগতে শ্রেণীবিহীন সমাজের আবির্ভাব হইতে পারে। জগতের মূলে কোন যুক্তির প্রেরণা নাই। সেইজন্য ইহা অসম্পূর্ণ। বিরোধের মধ্য দিয়াই ইহার অগ্রগতি। Marx হেগেলের ন্যায় আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ঈশ্বর এবং ধর্ম্ম বলিয়া কোন কিছু নাই। ধর্ম্ম নামে যে ভুজুর ভয় চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, মানুষ যখন তাহা হইতে উদ্ধার পাইবে, তখনই সে স্বাধীন হইবে। জড় হইতে অবস্থা বিশেষে প্রাণের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং Marx জগতের মূলে যে কোন যুক্তি আছে তাহাও মানেন না। ইহাই হইল Marx Materialistic Conception of History, অর্থাৎ ইতিহাসের জড়বাদমূলক ধারণা।

Marx ব্যতীত তৃতীয় খণ্ডে কোমৎ, বার্গসঁ, হোয়াইট-হেড্, এবং ক্রোচে প্রভৃতির দর্শন সম্বন্ধে যথেষ্ট সারগর্ভ আলোচনা আছে। আমেরিকার Pragmatist দর্শন সম্বন্ধেও লেখক অনেক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তারকচন্দ্র রায়ের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এর পাঠ্যপুস্তক মধ্যে এই পুস্তকখানির স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমি আশা করি ছাত্র-ছাত্রীরা এবার পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান-লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদের পরিশ্রমও অনেকটা বাঁচিয়া যাইবে। শুধু তাহাই নহে; দর্শনশাস্ত্রের অনুরাগী ভক্তেরাও এই তিন খণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ করিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস যে, এই গ্রন্থ পাঠের ফলে আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে তুলনা মূলক সমালোচনা আরম্ভ হইতে পারিবে। অনেকে বলেন যে, আমাদের দেশের চিন্তাধারায় দর্শনের স্রোত থামিয়া গিয়াছে। সে কথা যে অনেক পরিমাণে সত্য, সে সম্বন্ধে সংশয় নাই।" তাহার কারণ এই যে, আমাদের প্রতিভাবান ছাত্রেরা পাশ্চাত্য দর্শনের ভাসাভাসা জ্ঞান লইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা সুরু করেন। এখন আমার আশা হইতেছে যে, তারকচন্দ্র রায় পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া দেশে স্বাধীন দার্শনিক চিন্তার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে যে সত্য ব্যাখ্যাত হয় না তাহার রস গ্রহণে কয়েক-জন ভাগ্য-বান ব্যক্তি ব্যতীত অবশিষ্ট কেহই সমর্থ হইতে পারেন না।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—শ্রীতারকচন্দ্র রায় বি, এ, প্রণীত। তিনখণ্ড। মূল্য সর্ব্বসমেত ১৮৲। প্রকাশক। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

যারা শাসনকার্যে এই সব বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবীদের কাজে লাগাতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফরাসী-দেশে সেসময় যে বিপ্লব (French Revolution) হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে কিছু নূতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারের দায়ভার যাঁরা কাঁধে নিয়েছিলেন। এঁরা যাতে দেশে বিপ্লবীভাব জাগ্রত করে—এই ছিল তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যাঁরা কাঁধিনের আমলে ভাল ছাত্র বলে

'তার' বিপ্লবোত্তরের আমলে প্রকাণ্ড ভাবে মূর্তিকে চতুর্থ মাত্রার দৌড়—প্রতীক এক প্রতিকৃতি

বিবেচিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে কয়েকজনকে বিদেশে পাঠানো হয়েছিল। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) ও 'Hermitage' বা 'হার্মিটেজ' নামে অপরূপ শিল্প-সংগ্রহশালার একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। এই শিল্প-ভাণ্ডারে বিদেশ থেকে কাঁধিনের সংগৃহীত যে সুন্দর প্রাসাদে এখন ঐটি সেই প্রাসাদটি আধুনিক সোভিয়েট সরকারের হাতে। সোভিয়েট-আমলে ঐ প্রাসাদে 'প্রাচীন চিত্রশালা-ভবন' এছাড়া রাণী কাঁধিনের প্রতিষ্ঠিত কালে সেন্ট পিটার্সবুর্গের (বর্তমান লেনিনগ্রাড) অবস্থিত 'Smolny Institute' ভবনটি বিখ্যাত। এই বিরাট ভবন ছিল অভিজাত-কন্যাদের জন্য শিক্ষা-কেন্দ্র। সেখানে শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার-কল্পে রাণী কাঁধিন্ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—তবে, একমাত্র অভিজাত-সম্প্রদায় ছাড়া অন্যের সাধারণ-প্রবেশের সেখানে সহজে প্রবেশাধিকার মিলতো না। পীটার্সবুর্গ প্রাসাদের ভক্ত রাণী কাঁধিন্ দেশের অনেক জায়গায় বহু অট্টালিকা

স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া দেশে অভিজাতদের বাদে যে শিক্ষিতরা শাস্ত্র অধ্যয়নের সুবিধার্থে রাণী কাঁধিন্ তাঁদের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সেসময়ে চরম বর্বর দেশের প্রাচীনে শিক্ষিত ছিল খুব বেশী। সে দেশের প্রতিবিপ্লবের কালে, রাণী কাঁধিন্ রাজ্যে সম্রাটের বাদের ঠিক উল্টোদের দৌড়ি প্রচলন করেন সাধারণতন্ত্রের কর্মকুশলতার জন্য দায়ী করা হোতো। তাঁকে রাণী কাঁধিন্ সরকারের ভাড়া নিজের কাজে বেশী প্রতিপত্তির ঠিক এমন

ব্যবস্থার উন্নতি-কল্পে রাজ্যের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের নিয়ে একটি অর্থনৈতিক-সংঘ (Free Economic Society) গঠন করে রীতিমত গবেষণা-অনুশীলন চালিয়েছিলেন। কাথ্‌রিনের আমলে দরবারে বীর-যোদ্ধাদেরও বিশেষ খাতির ছিল। রাণীর এই অসীম গুণগ্রাহিতার ফলেই অল্পকালমধ্যে সুভোরোভ্, নামে এক সুদক্ষ-বীর যুদ্ধ-বিদ্যায় অতুলনীয় পারদর্শিতা-লাভ করে রাজ্যের সর্ব-শ্রেষ্ঠ সেনানায়ক হিসাবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হন।

সম্রাজ্ঞী-হিসাবেও রাণী কাথ্‌রিনের দক্ষতা ছিল অসাধারণ! অতি-বড় বিপদের মাঝেও কাথ্‌রিনের মনে এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যেতো না···রাজ্য-কর্তৃত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন নির্ভীক, অটল। কূটনৈতিক-ব্যাপারেও তাঁর নিপুণতা ছিল অসামান্য। বিদেশিনী হয়েও বিরাট রুশ-দেশের অনেকখানি জমে গিয়েছিল। উপরন্তু, প্রজার মঙ্গলেও তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ থাকার ফলে, দরবারের অন্যান্য রুশ-অমাত্যদের প্রতি তাঁর ছিল বিজাতীয়-আক্রোশ। সে-আক্রোশের বশে যে-কোনো সামান্য ত্রুটি-সাতায় রাজ্যের সম্ভ্রান্ত অমাত্য-অনুচরদের তিনি প্রকাশ্যে নির্মম-ভাবে অপমান-অপদস্থ বা শাস্তি দিতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। এমন কি, রাণী কাথ্‌রিনের জীবদ্দশায়, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর পরম-অনুরাগী অমাত্যাচারী-অমাত্যদের চূড়ান্ত-শিক্ষা দেবার জন্য পল্ যে কাণ্ড করেছিলেন, সে-কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হতে হয়! দেশের সম্ভ্রান্ত-অভিজাতদের সাদরে প্রাসাদে রাণীর শয়ন-কক্ষে আমন্ত্রণ করে এনে, তাঁদেরই চোখের সামনে, মৃত্যুশয্যা-শায়িতা কাথ্‌রিনের শব-দেহের পাশে কবর থেকে তুলে-আনা বিহত-সম্রাট তৃতীয় পিটারের গলিত-কঙ্কালটিকে শুইয়ে রেখে উন্মত্ত-খেয়ালী রাজা পল্ মহা-আড়ম্বরে রাজ-মুকুট পরিয়ে তাঁর মৃত কাথ্‌রিন পিতা-মাতার অভিষেক-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন! শুধু তাই নয়, পলের কঠোর-নির্দেশে কাথ্‌রিন্ পিটারের গলিত-পূতিগন্ধময় শব-দেহের পাশে শুইয়ে দীর্ঘ ছয়-মাস নারকীয় যাতনা সয়ে মৃতা-রাণীর প্রণয়াসক্ত-অনুচরদের প্রত্যেককে দীর্ঘ ছিন্ন-রাত সমানে পাহারা দিতেও হয়েছিল। খামখেয়ালী-সম্রাটের উদ্ভট-পীড়নের ফলে, রাজ্যের অভিজাত-অমাত্য-বৃন্দ সে-আমলে এমন বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন যে, শেষে নির্মম-চক্রান্ত এঁটে নিতান্ত সুসংগতভাবে তাঁরা পলকে হত্যা করেন।

বালাক্লাভার ঐতিহাসিক যুদ্ধে আহত সেনাদের শুশ্রূষায় রত ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে প্রথম-প্রতাপে তিনি রাজা-শাসন করে গেছেন সুদীর্ঘ-কাল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে কাথ্‌রিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পল্ সিংহাসনে বসেন। পল্ যখন রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন—তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর। দেখতে তিনি ছিলেন দারুণ কুশ্রী-কদাকার এবং তাঁর স্বভাব-চরিত্র ছিল উদ্ভট-খেয়ালী···পাগলাটে-গোছের। এ-সব খুঁত থাকা সত্ত্বেও, তিনি ছিলেন পরম উদার-পন্থী এবং কঠোর শাসক। পলের কড়া-শাসনে, রাজ্যে দুর্নীতিপরায়ণ-অমাত্যকুলের যথেচ্ছ-অত্যাচার ও প্রজা-পীড়নের মাত্রা বিশেষ হ্রাস পেয়েছিল; দেশের কৃষি ও শ্রমজীবী দীন-দরিদ্র সাধারণ-প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন সব বিধান করেছিলেন যে, তার ফলে তাদের আশির্বাদ-পাত্রটীর

এমনি খেয়ালী-শাসন চালিয়ে মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করার পর, ১৮০১ সালে পলের মৃত্যু হলে তাঁর সুদর্শন পুত্র আলেকজান্ডার রাজ্যের রাজা হন। লোকারাধিতা-পিতামহী কাথ্‌রিনের উদার-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুদক্ষ-সম্রাট আলেকজান্ডার রাজ্য-বিস্তারে এবং রাজ্যের সংস্কৃতি-সাধনে বিশেষ মনোযোগী হন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের দিকেও ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। তাঁর সদয়-সহানুভূতির ফলে সে-সময়ে দেশের কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা কতক উন্নতিলাভ করেছিল। যুদ্ধ-বিদ্যাতেও আলেকজান্ডার ছিলেন বিশেষ কুশলী। রণ-জয় করে ফিন্‌লণ্ড্ দেশটি তিনি রুশ-রাজ্যভুক্ত করেন। ফিন্‌লণ্ড্-বিজয়ের পর, সে-দেশে দাস-শাসন প্রবর্তন করাও উদার-পন্থী আলেকজান্ডারের এক স্মরণীয় কীর্তি। সে-যুগে এ-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব।

সম্রাট আলেকজান্দারের রাজ-কালে ইউরোপের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ ফরাসী-বীর নেপোলিয়নের আবির্ভাব ঘটে। দোর্দণ্ড-প্রতাপে সারা ইউরোপ জুড়ে তিনি যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন, তার ঢেউয়ে সুবিশাল রুশ-সাম্রাজ্যও রীতিমত প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। দিগ্বিজয়ী-নেপোলিয়নের সঙ্গে অষ্টারলিৎজ, ইলাউ এবং ফ্রাইড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধে রুশ-শক্তিকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অবশেষে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তিল্‌সিতে (Tilsit) নেপোলিয়ন এবং আলেকজান্দারের ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ঘটে। সেখানে নাইমেন্ (Niomen River) নদী-বক্ষে রচিত অপরূপ-সুসজ্জিত 'ভাসমান-শিবিরে' মিলিত হয়ে তাঁরা চুক্তি করেন, দুজনে একজোটে সারা ইউরোপ জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেবেন! চুক্তি হলেও আলেকজান্দার জানতেন—নেপোলিয়ন চান একাধিপত্য···আর কেউ পাশে থাকবে প্রতিদ্বন্দ্বীর মত, এ ছিল তাঁর অসহ্য। কাজেই, বাইরে বন্ধুত্বের ভাব দেখালেও মনে-মনে দুজনেরই ছিল বেশ রেষারেষি। সাম্রাজ্য-লোভী নেপোলিয়নের আসল মতলব ছিল, ছলে-বলে-কৌশলে আলেকজান্দারকে হারিয়ে রুশ-রাজ্য দখল করা। আলেকজান্দারের বন্ধুত্ব-স্বীকারের পর রুশ-সহযোগিতায় ফরাসী-সৈন্যদলকে আরো সুদৃঢ়-শক্তিশালী করে তুলে সুদূর ভারতবর্ষের পানে বিজয়-অভিযান চালাবেন—নেপোলিয়নের ছিল অভিপ্রায়। অন্যদিকে আলেকজান্দারও, দুর্ধর্ষ বিদেশী-শত্রুদের উচ্ছেদ-কল্পে, প্রুশিয়ার অধিপতি ফ্রেড্‌রিক উইল্‌হেল্‌মের সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত চালিয়েছিলেন। স্বার্থসিদ্ধির মানসে প্রতাপশালী নেপোলিয়ন অকস্মাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রচুর সৈন্য নিয়ে আচম্বিতে রুশ-সীমান্তে আক্রমণ করে বসেন। ফরাসীদের এই অতর্কিত-আক্রমণের জন্য রুশ কাদো প্রস্তুত ছিল না। সম্রাট আলেকজান্দার তখন 'ভিল্‌না'র প্রাসাদে 'বল্'-নাচের আসরে মত্ত···নেপোলিয়নের আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তিনি অবিলম্বে মস্কো-রাজধানীতে হাজির হলেন। দেশের সুদক্ষ সেনাপতিদের সাহচর্য্যে সৈন্যসমাবেশ করে সম্রাট আলেকজান্দার তৎক্ষণাৎ তাঁদের রণাঙ্গনে পাঠালেন।

মস্কোর কাছে সুবিস্তৃত 'বোরোদিনো'-প্রান্তরে ফরাসী-সৈন্যদের সঙ্গে রুশের তুমুল যুদ্ধ হলো। সে-যুদ্ধে রুশ-সেনাদল এমন অপূর্ব্ব রণ-চাতুর্য্য দেখালো যে, তাঁর ধাপ্পাটে নেপোলিয়নের মত দুর্ধর্ষ-বীর রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে উঠেছিলেন! বিজয়-লাভে সমর্থ না হলেও এ-যুদ্ধে নেপোলিয়নের প্রবল-সেনাদলের হাতে রুশ-সৈন্যের অর্দ্ধেক প্রায় বিনষ্ট হয়। সম্মুখ-সমরে সুবিধা করতে না পেরে সম্রাট আলেকজান্দারের নির্দ্দেশে, রুশ-সেনাদল শেষে এক অভিনব 'গেরিলা' (Guerilla) কৌশল অবলম্বন করে। নেপোলিয়নের আস্তানা এবং শিবির ঘিরে রুশ-সৈন্য সারুশ অগ্নিকাণ্ড বাধালো···অগ্নি-চক্রের ব্যূহ! সে-ব্যূহ ভেদ করে নেপোলিয়নের পক্ষে দলবল নিয়ে নিষ্ক্রমণ ছিল অসম্ভব! বিপদ বুঝে নেপোলিয়ন আলেকজান্দারকে পত্র লিখে পাঠালেন—সন্ধি প্রার্থনা করে। আলেকজান্দার কিন্তু সে-পত্রের কোনো জবাব দিলেন না···মস্কো থেকে সেণ্টপিটার্সবুর্গে সরে গিয়ে তিনি চুপচাপ বসে রইলেন।

নেপোলিয়ন পড়লেন মহা ফাঁপরে! বিপদের উপর বিপদ···রুশ-জনগণও ইতিমধ্যে ক্ষেপে উঠেছে! দেশের যত চাষা কুলী-মজুর সবাই একজোট হয়ে মেতে উঠলো বিদেশী-শত্রুদের নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন এবং উচ্ছেদ করতে। মস্কো রাজধানী এবং আশ-পাশের গ্রাম-নগর খালিয়ে, ঘর-বাড়ী পুড়িয়ে, ক্ষেত-খামার তছনছ্ করে, খাদ্য-পণ্য নষ্ট করে সারা দেশ তারা এমন ভাবধারা করে রেখেছিল, যে, শত্রু সৈন্যদের বরাতে না জোটে একমুঠো অন্ন, না মেলে মাথা-গোঁজবার ঠাঁই!

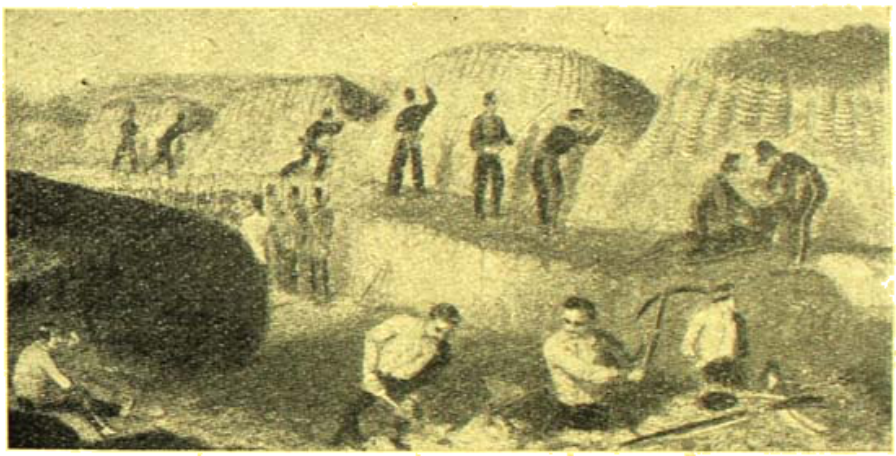

সেভাস্টোপোলের রণাঙ্গণে সৈন্য-সমাবেশের প্রাচীন প্রতিচিত্রপি

চারিদিকে অভাব আর রিক্ততার হাহা! তাছাড়া রুশের দুরন্ত-শীত আর প্রচণ্ড তুষার-পাতে, বিদেশী ফরাসী-সৈন্যদের দুরবস্থা ক্রমে অত্যন্ত সঙ্গীন হয়ে উঠলো! নেপোলিয়নের শিবিরে, মড়ক-মহামারী যেন দিল ঘাপ্‌টা-ভাবে···রোগে, কষ্টে, অনাহারে দারুণ দুর্দ্দশা-ভোগ করে নিতান্ত অসহায়-অবস্থায় দুর্ধর্ষ ফরাসী-সৈন্যেরা দলে-দলে প্রাণ হারাতে লাগলো।

চোখের সুমুখে এভাবে লোকক্ষয় হতে দেখেও কেমলিন্-প্রাসাদের দুর-দ্বি, নির্জ্জন-কক্ষে বসে হতাশার নিশ্বাস ফেলা ছাড়া অবরুদ্ধ নেপোলিয়নের গত্যন্তর ছিল না! এক দিকে নিদারুণ অগ্নি-ব্যূহ-চক্র··· অন্য দিকে প্রবল রুশ-জনতার অপরিসীম নির্য্যাতন···এ-দুয়ের মাঝে অমিত-বিক্রমী নেপোলিয়নের দুর্দ্দশা নিতান্ত শোচনীয় হয়ে ছিল। শেষে একান্ত-নিরুপায় হয়ে মোলেন্স্ক, এবং ভিল্‌নার বিঘ্নসঙ্কুল প্রান্তর-পথে নেপোলিয়ন সদলে পলায়নপর হলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে 'বোরোদিনো' নদী। এ-নদী পার হয়ে নেপোলিয়ন রুশ-অভিযানে এসেছিলেন একলাখের বেশী সৈন্য নিয়ে, কিন্তু রুশের প্রচণ্ড শীতে, এই

অস্ত্রাব-কাষ্ঠে—আর প্রবল রুশদের নির্মম-উৎপীড়নে বিপর্যস্ত হয়ে দেশে ফেরবার সময় 'বোরোদিনো' গাঁয় হয়ে তিনি দেখেন, তাঁর সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ষাট হাজার···চল্লিশ হাজার সৈন্য সাফ্ হয়ে গেছে এর মধ্যে!

রুশ-পরাজয়ের গ্লানি-মোচনের উদ্দেশ্যে নেপোলিয়ন স্বদেশে ফিরে এসে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করে আবার অভিযানে বেরুলেন। এবারে তাঁর লক্ষ্য—মধ্য-ইউরোপের রাজ্যগুলি অধিকার করা। রুশ-সম্রাট আলেকজান্দার ওদিকে হাত মেলালেন অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়ার সঙ্গে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পর-পর দুটি যুদ্ধে নেপোলিয়ন এই 'ত্রি-শক্তিকে' পরাজিত করে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। সে-সন্ধি কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। কিছুদিন পরেই 'ত্রি-শক্তি' প্রবল যুদ্ধে নেপোলিয়নের সেনাদলকে পরাস্ত করে। অবশেষে 'লাইপ্‌জিগের' তুমুল-সংগ্রামে 'ত্রি-শক্তির' কাছে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। আলেকজান্দারের অধিনায়কত্বে 'ত্রি-শক্তি' সেনার প্রবল-বিক্রমে ফরাসী-মুলুকে এসে হানা দেয়। পরাজয়-স্বীকারে নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়···। বিজয়-

মাল্‌মাজোঁর ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রতিলিপি

গর্বে আলেকজান্দার ১৮১৫ সালে প্যারিসে প্রবেশ করেন। অতঃপর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে ইউরোপের শক্তিপুঞ্জের কাছে নেপোলিয়নকে বাধ্য হয়ে সন্ধি-কর্মে আবদ্ধ হতে হয়। এ-সন্ধির ব্যাপারে অধিনায়ক ছিলেন রুশ-সম্রাট আলেকজান্দার। 'ভিয়েনা-সন্ধির' ফলে নেপোলিয়নের গ্রাসের-ত্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে সারা ইউরোপ অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো এবং রুশ-সম্রাট আলেকজান্দারের গৌরবে শান্তি-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন ইউরোপের রাজ-শক্তিবর্গের মধ্যে রুশ হয়ে দাঁড়ালো সবার অগ্রণী!

এরপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ওয়াটার্লুর যুদ্ধে হেরে নেপোলিয়ন যখন চির-তরে সেণ্ট হেলেনায় নির্বাসিত হলেন, তখন ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলে সন্ধি-বদ্ধ হন,—আর যুদ্ধ-বিগ্রহ নয়··· ইউরোপে শান্তি রক্ষা করতে হবে। এ-সন্ধি স্বাক্ষর-কালে, সম্রাট আলেকজান্দার সেণ্টপিটার্সবুর্গ সহরে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। সে-উৎসবে সেণ্টপিটার্সবুর্গে (আধুনিক লেনিনগ্রাড্ সহর) আলেকজান্দার অপরূপ শিল্প-শ্রীমণ্ডিত প্রকাণ্ড একটি 'তোরণ' রচনা করেছিলেন। সে-তোরণ (Arch of Alexander I) আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে,—সোভিয়েট দেশের অতীত-ইতিহাসের অন্যতম গৌরব-নিদর্শন হিসাবে!

বিচক্ষণ-সম্রাট আলেকজান্দারের রাজত্বকালে রুশে আরো এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটেছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে রাজ্যের অর্পিত 'দাসের' (Serfs) দলও রাজ-সৈন্যের পাশে দাঁড়িয়ে দেশ-শত্রু-বিতাড়নে বিশেষ সহায়তা করেছিল। দাসের দল তখন অর্ধ-চেতন হয়েছে··· তাহলেও, দাসত্ব-বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি মেলেনি! গণ-জাগরণের মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করেছিল, শক্তি-সামর্থ্যে তারা হীন নয়···বরং বলীয়ান। এই আত্মোপলব্ধি তাদের মনে দেশের দুর্দিনে সকলের সঙ্গে সমানভাবে মিলে-মিশে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ-গ্রহণ করার ফলে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ সম্রাট আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে উত্তরাধিকারী-হীন অবস্থায় 'জার' আলেকজান্দারের মৃত্যু হলে তাঁরই কনিষ্ঠ সহোদর পরলোকগত সম্রাট পলের তৃতীয় পুত্র নিকোলাস (Nicholas I) সিংহাসনে বসেন। নিকোলাস যে সময়ে রাজা হন, রুশ-দেশে তখন পরম-যুগ-সন্ধিক্ষণ! ফরাসী-বিপ্লবের পর, অষ্টাদশ শতকের শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সারা ইউরোপ জুড়ে আভিজাত্য-বিনাশী গণ-জাগরণের যে নব্য-ভাবধারা, আদর্শের যে ব্যাপক-প্লাবন বইতে সুরু করেছে, তার উত্তাল ঢেউ এসে লেগেছিল রুশ জনসাধারণের মনে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই রুশ জনসমাজের মধ্যে বিক্ষোভ বেগ প্রবল হয়ে ওঠে··· 'জার'-অনুগৃহীত রাজ-অমাত্যকুলের অবজ্ঞা-নির্যাতন সহিত করতে দেশের সাধারণ প্রজারা সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়। শুধু তাই নয়, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য এবং শিল্পে গণ-জাগরণের এ-সাড়া প্রকাশ পেতে লাগলো ব্যাপকভাবে! সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী-সাহিত্যিক ভল্‌তেয়ার, জার্মান-দার্শনিক হেগেল—এঁদের লেখা পড়ে, নব-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত রাশিয়ার জনসাধারণ চেতনা পেলো। রুশদেশের সাধারণ প্রজাদের নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা আর দুর্ভোগ-নির্যাতন দেখে বিক্ষুব্ধ হয়ে, স্বার্থান্ধ-উদাসীন 'জার'-আভিজাত্যের উচ্ছৃঙ্খলাধর্ম-কল্পে ওমেগের যে-সব মুক্তিকামী বিদ্রোহী কবি-সাহিত্যিক, শিল্পী-দার্শনিক এবং সমাজ-সংস্কারকের দল প্রতিষ্ঠিত রোমানীদের গণতন্ত্রের মহান আদর্শে সে-যুগে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ স্মরণীয় হলেন—সুবিখ্যাত রুশ-কবি আলেকজান্দার পুশকিন্, রুশী-লেখক নিকোলাই গোগোল, ইউক্রেনের লোক-কবি তারাস্ শেভচেঙ্কো, প্রখ্যাতনামা কবি-নাট্যকার মাইকেল লিয়েরমন্টভ, সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক ফিয়োদর্ ডষ্টয়েভস্কী, প্রতিভাবান

নাট্যকার-সমালোচক ডিমারিয়ো বেলিন্স্কী এবং খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ্ প্যুত্রাশেভ্স্কি উহাঁ সামারিন্। অভিজাত 'জার্'-অধ্যুষিত রাজ্যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা-সাধনে, সেকালে এই সব প্রগতিশীল দেশপ্রেমী-মনীষীদের যে অপরিসীম নির্য্যাতন আর সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল—তার তুলনা জগতের ইতিহাসে খুব কমই মেলে। এঁদের এই একনিষ্ঠ সাধনা আর অপরূপ আত্মোৎসর্গের ফলেই দিনে-দিনে সুবিশাল সোভিয়েট দেশে প্রজাতন্ত্রের পত্তন কায়েমী হতে পেরেছে। অতীত যুগের এই সব জনকল্যাণকারী মহাত্মাদের পুণ্য-স্মৃতি পূজাকল্পে সোভিয়েট দেশবাসীরা আজ যে শুধু রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র বিরাট বিবিধ সৌধ-মন্দির, এবং মর্ম্মর-প্রতিমূর্ত্তি রচনা করে রেখেছেন তাই নয়, দেশের প্রত্যেকটি নগরে এবং গ্রামে বিভিন্ন পথ-ঘাট, সরকারী ভবন ও বিশিষ্ট জনপ্রতিষ্ঠান-গুলিও বিগত দেশপ্রেমীদের নামে উৎসর্গিত করে নিজেদের অন্তরের সশ্রদ্ধ-সম্মান জানান নিত্য-নিয়ত।

নিকোলাসের রাজ্য-শাসনের ঘোড়াতেই গণতন্ত্রবাদী-সেনানায়ক কর্ণেল পেস্তেল এবং তাঁর সহযোগী আরো চারজন বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীর নেতৃত্বাধীনে বিক্ষুব্ধ রুশ-প্রজারা অবশেষে ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে 'জার্'-সম্রাটের বিরুদ্ধে তুমুল বিপ্লব বাধিয়ে তোলেন। ডিসেম্বর মাসে এ-বিপ্লবের সূচনা—রুশ ইতিহাসে এর নাম 'Decembrist Revolt' বা 'ডিসেম্বর-বিপ্লব'। বিপ্লবীদের দলে শুধু যে বিক্ষুব্ধ প্রজা-সাধারণ আর বিদ্রোহী রাজকর্ম্মচারীরাই ছিলেন তা নয়, দেশের অভিজাত-সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য অনেকেই গোপনে এ-বিপ্লবে যোগদান করে ছিলেন। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন অবশ্য ইউরোপের তৎকালীন নব্য-ভাবধারায় অনুপ্রাণিত···এঁদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত জীর্ণ-প্রাচীন 'জার্'-শাসন ও ঘুণধরা আমলা-তন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়ে রাশিয়ার নূতন আদর্শে নবীন গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করা। কিন্তু দূরদর্শিতার অভাবে এবং বিপ্লবীদের মধ্যে মতদ্বৈধতার ফলে এ-বিপ্লব বিশেষ ফলপ্রসূ হতে পারলো না। 'জার্' নিকোলাসের সুরক্ষক সেনাবলের সঙ্গে সংঘাতে সেন্টপিটার্সবুর্গ (আধুনিক লেনিনগ্রাড) সহরের সুপ্রসিদ্ধ 'উইন্টার্ প্যালেস্' প্রাসাদের সামনে 'ডিসেম্বর-বিপ্লবীদের' পোচমীয় পরাজয় ঘটে। বিদ্রোহ-দমনের পর সম্রাট নিকোলাসের আদেশে নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে বিপ্লবী-নেতাদের হত্যা করা হয়।

এমনিভাবে বিদ্রোহ দমন হলেও গণ-বিক্ষোভের আগুন কিন্তু নিভলো না···ছাই-চাপা তুষের মত সে আগুন ধুমতে লাগলো সারা রাশিয়া জুড়ে। রাজ্য-সংস্কারের অনুহাতে, কঠোর শাসন-বিধান আর নিষ্ঠুর নির্য্যাতন চালিয়ে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের শায়েস্তা রাখার উদ্দেশ্যে 'জার্' নিকোলাস সে-যুগে যে সব অমানুষিক বর্ব্বর বিধি-ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, সে কাহিনী শুনলে রীতিমত শিউরে উঠতে হয়! নিকোলাসের নির্ম্ম অনুশাসনের ফলে, রুশদেশের অধিকাংশ কৃষাণ-মজুর এবং জন-সাধারণের দুরবস্থা দিন দিন প্রায় কুকুর বেড়ালের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে আমলে তাদের না ছিল কোনো স্বাধীনতা···না ছিল মনের সুখ-শান্তি বা উন্নতির এতটুকু আশা! সারা জীবন উপবাসক্লান্ত করে শুধু রাজা আর রাজানুগৃহীত অভিজাত-আমলাকুলের কেবল পোষণ করে, অধেক্ষ পীড়ন সয়ে মনিবের পেষাল চরিতার্থ করা এবং মুখ বুজে বেগার-খাটাই ছিল তাদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান-মোক্ষ! সামান্য কারণে, অর্থাৎ পাশ থেকে চুপ শব্দলেই রাজার কড়া-বিধানে রাজ্যের বেজাচারী কর্ম্মচারীর দল চামড়ার ঘোড়া তাদের মোটা মোটা চাবুক (Knout) হাঁকড়ে প্রকাশ্যভাবে বেপরোয়া অবাধ অপরাধী রুশপ্রজাদের বেয়াদবির চূড়ান্ত শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতো না। এমন কি মেয়েরা পর্য্যন্ত এই ভয়ঙ্কর-বর্ব্বর চাবুকের মারার হাত থেকে রেহাই পেতেন না এতটুকু!

নিকোলাসের আমলে রুশদেশের এই মর্ম্মন্তুদ নির্ম্ম চাবুক মারার প্রথা, সারা ইউরোপে এমন নিদারুণ কুখ্যাতি লাভ করেছিল যে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মারসাস্ কালেস্কী নামে 'ওয়ারস'র' (Warsaw) এক সম্ভ্রান্ত মহিলাকে চাবকানোর সাজা রদ করার জন্য ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত এক মাসিক-পত্রিকার তরফ থেকে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে সবিনয় সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানানো হয়েছিল। চাবকানী ছাড়া 'জার্' নিকোলাসের রাজ্যকালে রাজ-বিধানের বিরুদ্ধ সমালোচনা বা অবহেলা করলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে রুশ জনসাধারণকে লোকালয়-বর্জ্জিত নির্জ্জন-নিঃসঙ্গ সুদূর-প্রান্তরে কিম্বা সাইবেরিয়ার বরফাচ্ছাদিত-বন্দীশালায় সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করতে পাঠানো হতো। এছাড়া প্রজাদের বিদ্রূপাত্মক বড়যন্ত্র এবং ক্রিয়াকলাপের চরবারী এবং তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'জার্' নিকোলাস সারা রাশিয়ার বুকে একরাশ দুর্দ্ধর্ষ গুপ্তচর পোষেছা নিযুক্ত করেছিলেন। এই সব রাজ-পোষেছার দল সামান্য সন্দেহে, সামান্য ছুতো-নাতায় দেশের লোকজনের উপর যখেচ্ছ জুলুম চালিয়ে ঘর-বাড়ী তল্লাশী, গ্রেপ্তার এবং নির্ম্মম-কঠোর শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা করে সারা রুশ-রাজ্য আতঙ্ক-বিভীষিকায় ঝাঁপিয়ে তুলেছিল। রাজ-গুপ্তচরদের যোগুণ্ড-পাণ্ডে রাশিয়ার অসহায় জন-সাধারণ এমনই বাস্তবানুযুব এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে কোনোমতে বেঁচে থাকাও সে-সময়ে নিতান্ত দুষ্কিলহ বলে মনে হতো তাঁদের কাছে!

এই নিদারুণ-কঠোর শাসন-নীতি অনুসরণ করেই 'জার্' নিকোলাস্, অনুসৃষ্টীত অভিজাত-আমলাদের সহায়তায় সুদীর্ঘকাল (১৮২৫-১৮৫৫) একাধিপত্য করে গেছেন রুশ-সিংহাসনে বসে। দেশে গণতান্ত্রিক-মতবাদের অঙ্কুরও যাতে মাথা তোলবার সুযোগ না পায়—সেদিকে ছিল তাঁর প্রখর-সজাগ দৃষ্টি! রাজ্য-রক্ষার ব্যাপারে নিকোলাসের এই কড়া-নজরের ফলে, সে-যুগের লোকেরা পরিহাসচ্ছলে তাঁর নাম দিয়েছিলেন—'ইউরোপের কোতোয়াল'! ব্যঙ্গ হলেও, 'জার্' নিকোলাসের এই নূতন নামকরণের পিছনে তারিফ-প্রশংসারও আভাস ছিল অনেকখানি। রাজ-একাধিপত্য বজায় রাখার দিকে 'জার্' নিকোলাসের ছিল একাগ্র-নেত্র। সে-লক্ষ্যের বশবর্ত্তী তিনি ১৮৩০ সালে সামন্ত-রাজ্য পোলাণ্ডের প্রজা-বিপ্লব দমন করে গণ-জাগরণ ও যুক্তি-স্বাধীনতা প্রভৃতির যা কিছু আশা-ভরসা সবই নির্ম্মমভাবে মুছিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়া আশেপাশের প্রতিবেশী-রাজ্যের কোথাও গণ-আন্দোলনের আভাস পেলেই, প্রতাপশালী 'জার্' নিকোলাস্ সাগ্রহে ছুটে গিয়ে সে-বিপ্লব দমনে সক্রিয়-সহায়তা করতেন। এমনিভাবেই ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে, প্রতিবেশী-রাষ্ট্র হাঙ্গেরীর গণ-অভ্যুত্থান দমনে সম্রাট নিকোলাস সসৈন্য-সহযোগিতা করে সে-দেশের বিপন্ন রাজ-শক্তি এবং রাজ-সিংহাসনের মান-মর্য্যাদা-আভিজাত্য অক্ষয় অটুট রেখেছিলেন! এই সবের ফলে সারা ইউরোপের অভিজাত-রাজশাসকদের কাছে রুশ-সম্রাট নিকোলাস পরম বন্ধু, সহায় ও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু ১৮৫৩-৫৫ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে, সেবাস্তোপোল বন্দরে এবং বালাক্লাভার রণাঙ্গনে ইংরাজ এবং ফরাসীদের সম্মিলিত-সেনাসৈন্যের কাছে রুশ রাজসেনাবলের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানিতে দুর্দ্ধর্ষ-জার্ নিকোলাসের সৌরভ-গরিমা-প্রতিপত্তি কিম্বদন্তীর মত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। লুপ্ত-মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার-মানসে সম্রাট নিকোলাস্ প্রাণপণ-প্রচেষ্টায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্যদের বিরুদ্ধে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, নিয়তির নির্ম্মম-বিধানে যুদ্ধ-ফলাফল নির্দ্ধারিত হবার আগেই ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নিতান্ত অকস্মাৎ ভাবেই 'জার্' নিকোলাসের জীবনান্ত ঘটে!

(ক্রমশঃ)

শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

[শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা]

৩০শে জানুয়ারি' ২৬
শিবপুর, হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠিতে আনন্দ পেলাম। আত্মীয়তার সম্বন্ধ বছর মাস দিয়ে মাপ্‌তে গেলেই ভুল হয়, অথচ এই ভুল অধিকাংশ লোকেই করে।

তুমি ফিরে এলে[১] আবার দেখা হবে। বাইরের লোকের জানাবার দরকার কি।

দশাশ্বমেধ ঘাটে কবিরাজ শ্রীমান হরিদাস শাস্ত্রী থাকেন, খাঁটি মানুষ। তাঁকে বাস্তবিকই আমি বড় ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে বোধ হয় তোমার আলাপ নেই, যদি পারো—পরিচয় কোরো, খুসি হবে।

আমার মেজভাই[২] এ যাত্রা রক্ষা পেলেন। আরোগ্য হবার মুখে চলেছেন, আশা করি শীঘ্রই পুনরায় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারবেন।

আমি ঠিক ভাল নই বটে, তবে মোটের ওপর আছি এক রকম। Constipationএর জ্বালাই হয়েছে আমার সব চেয়ে অশান্তি। রোজ রোজ ভাল ভাল হজমি বাটা খেয়ে চালিয়ে যাচ্ছি।

সম্প্রতি একজন কোব্‌রেজ আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছেন, ভরসা দিয়েছেন এ রোগ মানসিক। অতএব মাস খানেকের মধ্যেই আমাকে নিরাময় করতে পারবেন। পারেন ভালই, না পারেন আমার হজমি এবং Liquid paraffin ত আর কেউ ঘুচোবে না। দিন কেটে যাবে।

আমার—স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১) উমাপ্রসাদবাবু এই সময় কাশিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

(২) প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবেশ করে সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী বেদানন্দ নাম গ্রহণ করেন।

কল্যাণবরেষু,

তোমার চিঠি পাইলাম। আমি শয্যাগত হইয়াই পড়িয়াছিলাম। এখন ভাল হইয়াছি। পথের দাবীর শেষ অধ্যায়টা[৩] যদি দেখানো প্রয়োজন জ্ঞান করত দেখাইয়ো। এখানে আমার ত নিমন্ত্রণের আবশ্যকতা নেই—এতদূরে যে-কোন প্রিয়জন কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি আসেন সত্যই খুসি হই।

খবরের কাগজ ত পড়ি না, তবে শুনিয়াছি, কলিকাতায় নাকি হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া-ঝাঁটি হইতেছে,—সে ত এতদিনে নিশ্চয় থামিয়া গিয়াছে।

সুধীর সরকার[৪] আজও বই ছাপানোর সম্বন্ধে তাহার অভিমত দিল না। আমার বিশ্বাস যে সে ছাপাইবে না।

রমাপ্রসাদ[৫] কেমন আছেন?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিয়ো—ইতি ২৮শে চৈত্র, ১৩৩২

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সামতাবেড়
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

পরম কল্যাণবরেষু,

বিজু[৬], কাল রাত্রে তোমার চিঠি পেলাম। বোধ করি ৩১শে ভাদ্রই এই লিপিটুকু তোমার হাতে গিয়ে পড়বে—আর সেদিন আমার জন্মদিন, বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হবে। নিশ্চয়

(৩) এই সময় উমাপ্রসাদ বাবুদের বাড়ী থেকে "বঙ্গবাণী" নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার হ'ত। এই বঙ্গবাণী পত্রিকাতেই শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" উপন্যাসটি প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

(৪) কলকাতার এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স নামক পুস্তক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অধিকারী। ইনি প্রথমে "পথের দাবী" পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে রাজদ্রোহিতার ভয়ে প্রকাশ করতে রাজী হন নি।

(৫) উমাপ্রসাদবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(৬) উমাপ্রসাদবাবুর ডাক নাম।

জানতাম এর আগে আর কিছু হবে না, কিন্তু একার বছরে আর বিশ্বাস নেই। বলি, ভগবান এই যেন করেন। আমাদের বংশে পঞ্চাশ কেউ পূর্ণ করেনি, আমিই প্রথম।

কলকাতা থেকে এসে পর্য্যন্ত এক প্রকার যেন শয্যাগত হয়ে পড়েছিলাম। অর্শ থেকে ভয়ানক রক্ত পড়তে সুরু হয়েছিল। এমেটিন্ ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে তবুও একটা আর কাল একটা—আজ দেখচি আর রক্ত পড়ে নি।

তোমাদের বাড়ীর খবর কি? বেরি বেরি ভাল হ'ল কি? কি নাগাদ কলকাতায় ফিরবে?

কাল ভাবচি কলকাতায় যাবো। মণ্টু[৭] নেমতন্ন করেছে।

বইটার সম্বন্ধে নানা গুজব যে বাজেয়াপ্ত হবেই কিম্বা হয়েই গেছে।[৮] কিছু জানো?

আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রইল। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৩

দাদা

সোমবার, ৩১শে জানুয়ারী ২৭
পানিত্রাস পোষ্ট
জেলা হাবড়া

বিনু, এবার দেখচি injectionএ কোনও সুবিধে হচ্চে না। রক্তপাত হচ্চে যুদ্ধ ক্ষেত্রের মত[৯]।

হরিদাসকে[১০] লিখে দাও আমি এ সময় কোথাও যেতে পারব না। আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ হবে না। বোধ হয় আর এ অসুখ ভালও হবে না, স্থগিত ও থাকবে না।

দাদা

সামতা বেড়, পাণিত্রাস
জেলা—হাবড়া

বিনু, তোমার পাঠানো বইখানা পেয়েছি।[১১] ধন্যবাদ।

এই চিঠিখানা[১২] তোমাকে পাঠালাম কারণ আত্মশক্তির বর্ত্তমান সম্পাদকের[১৩] সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তুমি যদি তাঁকে বলে কিম্বা উপীনকে[১৪] বলে করে এটা আত্মশক্তিতে ছাপানোর ব্যবস্থা করতে পারো ত বড় ভাল হয়। আমার হাতের লেখা M.s.s টা তুমি চেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখো।

আর যদি ছাপতে তাঁরা সম্মত না হন ত লেখাটা তোমার কাছেই রেখো, পরে দেখা যাবে।

৫ই আশ্বিন, '৩৪ দাদা

সামতা বেড়
পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিনু তোমার কাছ থেকে বহুকাল পরে চিঠি পেয়ে বড় আনন্দ লাভ করেছিলাম। বাবার[১৫] সময়ে যদি একবার দেখা করে যেতে কি জানি, হয়তো বা সত্যিই যাবার চেষ্টা কোরতাম। বহুদিন থেকে বদরীকাশ্রম দেখবার সাধ ছিল, কিন্তু হয়ে উঠলো না। এবারের মত এ ইচ্ছে

---

(৭) শ্রীমতীপতুমার রায়।

(৮) সপ্তম বাণী প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েকদিন পরেই তৎকালীন ইংরাজ সরকারের বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন।

(৯) শরৎচন্দ্র অর্শে ভুগতেন। এখানে অর্শের রক্তপাতের কথাই বলছেন।

(১০) রাজনৈতিক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। হরিপদবাবু শরৎচন্দ্রকে নদীয়া জেলার একটি রাজনৈতিক সম্মেলনে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন।

(১১) শরৎচন্দ্র ফরাসী ভাষা কিছু কিছু জানতেন। তাই তিনি পড়বার জন্য মূল ফরাসী ভাষায় লেখা মোপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" (The cousins of the colonelle) এবং "বেলামি" (Bel-Ami) বই দুখানি কিনে উমাপ্রসাদবাবুকে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলেছিলেন। উমাপ্রসাদবাবু তখন মোপাসার "লে কুঁজে দলা করনেল" বইখানি পাননি, মাত্র "বেলামি" বইখানি পেয়েছিলেন এবং এই বইখানিই তিনি সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

(১২) "আত্মশক্তি" পত্রিকার সম্পাদককে লেখা চিঠি। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৩৩৪ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের "আত্মশক্তি" পত্রিকায় মুদ্রাঙ্কির লেখা "সাহিত্যের দামনা" নামক প্রবন্ধের পত্রাকারে প্রতিবাদ।

(১৩) গোপালচন্দ্র সান্যাল।

(১৪) বিপ্লবী ও সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শরৎচন্দ্র ও গোপালচন্দ্র সান্যাল—উভয়েরই বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

(১৫) উমাপ্রসাদবাবু এই সময় মানস সরোবর ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন।

স্থগিত রইল। কারণ ইচ্ছে করবার বয়সটাও পার হয়ে গেছি।

তুমি লিখেছিলে ১৬ই মের আগে চিঠির জবাব দিতে। আজ ১৭ই মে। আশা করি এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছুবে। তোমার চিঠি পাবার পরে থেকে অনেকবার মনে হয়েছে তোমার মা সঙ্গে ছিলেন, আমাদের কারও যাবার অভাবটা হোতো না। মস্ত সুযোগ বয়ে গেল।

আমার শরীর তেম্‌নিই চলচে। এ আর ভালো হোল না। আজকাল ডাক্তাররা বলছেন, এ হয়েছে আপনার ধাপে বয়। প্রাচীনকালে এ একটা Safty valve.

ভাল বয়সও তো নেই, এখন আমিও ভাবতে সুরু করেছি এ একপ্রকার—সুবিধেই হয়েছে।

তুমি বাড়ী আসার পরে যদি সময় পাও একবার এদিকে এসো, তোমার কাছে গল্প শোনা যাবে।

শুনেচি, ওদিকে নাকি চমৎকার লাঠি পাওয়া যায়। যদি মনে থাকে একটা আমার জন্যে এনো।

আমার স্নেহাশীর্বাদ জেনো। প্রার্থনা করি তোমাদের যাওয়া-আসা যেন নির্বিঘ্নে হয়।

ইতি—১৭ই মে। ১৯২৮।

দাদা

Sarat Chandra Chatterjee
P 566 Monohar Pukur
Kalighat, Calcutta.

কল্যাণবরেষু,

বিনু তোমার চিঠি পেলাম। আমার স্নেহ এবং আশীর্বাদ জেনো।

কালিয়া (যশোর) থেকে[১৫] পরশু রাত্রে ফিরেচি, আজ বাড়ী যাচ্চি। কাল আমার লোকান্তরিত স্নেহ ভাই বেদানন্দর মৃত্যুর দিন। তার সমাধির কাছে দু-পাঁচ জনকে নিয়ে বসতে হয়। দেশের দশজন খায় দায়, কীর্ত্তন করে। এই জন্যে যাওয়া। ৮।১০ দিন পরে ফিরবো।

৯ই কার্ত্তিক ১৩৩১, তোমাদের শুভার্থী

দাদা

(১৫) শরৎচন্দ্র কালিয়ার এক সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলেন।

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
২রা আশ্বিন ১৩৪৩

পরম কল্যাণীয়েষু,

বিনু, কাল বিধান ডাক্তার কুইনিন injection দিয়েছেন। শরীরের যে অংশে তার দিয়ে মানুষে বেশ সুস্থ হয়ে বসে ঠিক সেই যায়গায়। উঃ কি এর ব্যথা! সুনের পুঁটুলি এবং ভাঙা একটা হরিকেন লণ্ঠন নিয়ে সকাল থেকে বসে আছি। বেশি দিন ওখানে থেকো না, নইলে ফিরে এসে তোমার জন্যেও হয়ত এম্‌নি ব্যবস্থা করতে হবে। মুর্শিদাবাদে[১৭] যাবার দুর্বুদ্ধি যে তোমার মাথায় কে দিলে তাই ভাবি। অন্যান্য কুশল।

শুভার্থী—দাদা

২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কালীঘাট
কলিকাতা। ১২ই কার্ত্তিক ১৩৪৩।

কল্যাণীয়েষু,

বিনু, কাল বাড়ী থেকে এখানে এসে তোমার চিঠি পেলাম। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হলো তার কারণ বড় বৌ[১৮] নিওমোনিয়ায় শয্যাগত হয়েছেন সেখানে খবর গিয়ে পৌঁছলো। তবে বাড়াবাড়ি ব্যাপার নয়—আশা হয় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। নইলে গরীব মানুষ, কলকাতার চিকিৎসার বিরাট ব্যয়ভার বইতে পারব না।

আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভকে কবি আশীর্ব্বাদ[১৯]

(১৭) মুর্শিদাবাদে উমাপ্রসাদবাবুর শ্বশুর-বাড়ী।

(১৮) শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

(১৯) রবিবাসরের উদ্যোগে উদয়ন-সম্পাদক অনিলকুমার সে সাহিত্য-বন্ধুর বেলিয়াঘাটায় "প্রফুল্লকানন" নামক উদ্যানবাটীতে শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত থেকে সেদিন এক লিখিত অভিভাষণে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ৩০শে ভাদ্র সভা না হয়ে ২৭শে আশ্বিন তারিখে সভার অনুষ্ঠান হয়েছিল। কবির সেই অভিনন্দনবাণীটি এই সঙ্গে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল—

কল্যাণীয় শরৎচন্দ্র,

তুমি ষাটকের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উত্তীর্ণ হয়েছ। এই উপলক্ষে তোমাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে তোমার বন্ধুবর্গের এই আমন্ত্রণ সভা।

করেছেন। অকৃপণ ভাষায়, মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকায় যেটুকু প্রকাশিত হয়েছিল সেটা তোমাকে পাঠালাম। তাঁর নিজের হাতের লেখাটি আমাকে দিয়েছেন। তুমি এলে তাঁর অন্যান্য পত্রের মতো এখানিও তোমাকে রাখতে দেবো। তখন কিন্তু এই পত্রাংশটুকু আমাকে ফিরিয়ে দিও। আমি ভাল নই বটে, তবে পূর্ব্বের চেয়ে অনেক সেরে গেছি। অরটা গেছে। তুমি আমার আশীর্ব্বাদ নিও এবং দাদারা যদি কেউ থাকেন আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা দিও।

শুভার্থী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বয়স বাড়ে, আয়ুর সঞ্চয় ক্ষয় হয়, তা নিয়ে আনন্দ করবার কারণ নেই। আনন্দ করি যখন দেখি জীবনের পরিণতির সঙ্গে জীবনের দানের পরিমাণ কম হয়নি, তোমার সাহিত্যরস-সত্রের নিমন্ত্রণ আজও রয়েছে উন্মুক্ত, অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরে উঠবে তোমার পরিবেশনপাত্র, তাই অধ্বনি করতে এসেছে তোমার দেশের লোক তোমার দ্বারে।

সাহিত্যের দান যারা গ্রহণ করতে আসে তারা নির্ধন। তারা কাল যা পেয়েছে তার মূল্য প্রভূত হলেও আজকের মুঠোয় কিছু কম পড়লেই প্রভূত করতে দ্বিধা হয় না। পূর্ব্বে যা ভোগ করেছে তার কৃতজ্ঞতার ঘোর থেকে দাম কেটে নেয় আজ যেটুকু কম পড়েছে তার হিসাব করে। তারা লোভী, তাই ভুলে যায় রসসৃষ্টির প্রমাণ-ভরা পেট দিয়ে নয়, আনন্দিত রসনা দিয়ে : নতুন দান যোগাই দিয়ে নয়, সুধাভাণ্ডের চিরন্তনত্ব দিয়ে ; তারা বুঝতে চায় না রসের ভোজে বয়স যা তাও বেশী : এক যা তাও অনেক।

এটা জানা কথা যে, পাঠকদের চোখের সামনে নিজেকে জানান্ দিলে পুরোনো ফটোগ্রাফের মত জানার রেখা হয়ত ঘষে মিলিয়ে আসে। অবর্ত্তমানের ঝাপ্সাটা একটু লম্বা হলেই লোকে সন্দেহ করে যেটা পেয়েছিল সেটাই কাঁকি, যেটা পায়নি সেটাই খাঁটি সত্য। একবার আলো জ্বলেছিল তারপরে তেল ফুরিয়েছে—অনেক লেখকের পক্ষে এইটেই সব চেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। কেননা আলো জ্বলাটাকে মানুষ অশ্রদ্ধা করতে থাকে তেল ফুরোনোর নালিশ নিয়ে।

তাই বলি, মানুষের মাপ-কাঠি যখন পেরিয়ে গেছে তখনো যারা তার অভিনন্দন করে তারা কেবল অতীতের প্রাপ্তি স্বীকার করে না, তারা অনাগতের পরেও প্রত্যাশা জানায়। তারা শরতের আউষ ধান ঘরে বোঝাই করেও সেই সঙ্গে হেমন্তের আমনধানের পরেও আশার দাবী রাখে। খুসি হয়ে বলে, মানুষটা এক-ফসলা নয়।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনের মূল্য এই যে, দেশের লোক কেবল যে তাঁর দানের অকৃপণতা ভোগ করেছে তা নয়, তার অক্ষয়তাও মেনে নিয়েছে। চিরন্তন যদি কিছু প্রতিধ্বনি থাকে তো ভালোই, না থাকলেই ভাবনার কারণ—এই সহজ কথাটা লেখকেরা অনেক সময়ে মনের দেবে ভুলে যায়। ভালো লাগতে বহুবছরই ভালো লাগে না এমন লোককে সৃষ্টিকর্ত্তা যে সৃজন করেছেন। বেলায় করে তাদেরও তো মেনে নিতে হবে—তাদের সংখ্যাও তো কম নয়। তাদের কাজও আছে নিশ্চয়ই। ভোলো মনের উপরে তাদের যে কটাক্ষ যদি না পড়ে তবে সেটাকে ভাগ্যের অনাদর বলেই ধরে নিতে হবে। মিশার কুগ্রহ যাকে পাপ কাটিয়ে যায়, জানবে তার প্রশংসার দাম বেশি নয়। আমাদের দেশে কবির দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাপ মা ছেলের নাম রাখে এককড়ি দুকড়ি। সাহিত্যেও এককড়ি দুকড়ি যারা তারা নিরাপদ? যে লেখার প্রাণ আছে প্রতিপক্ষতার দ্বারা তার মনের মূল্য বাড়িয়ে তোলে তার মানুষতার মূল্য। এই বিরোধের কাজটা যাদের তারা বিপক্ষীয়-পক্ষের গুরু। রামের জয়ধ্বজ গুরু যেমন রাবণ।

জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মিধারায় পড়া, নানা কক্ষ পথে নানা বেগে আবর্ত্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিরহে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুসি হয়েছে এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্ব্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষ্যাভাজন।

আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাঁকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার, কিন্তু তিনি কারো স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্যে অপেক্ষা করেন নি। আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃউচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।

সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির পূর্ণ সৃষ্টিই সাহিত্যে শাশ্বত মর্য্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই স্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি পরমায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন—তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়,—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়—মানুষের চিরন্তন অকৃত্রিমতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

২৫শে আশ্বিন ১৩৪৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

প্রাচ্য—কুপ্রাচ্য—ভাপ্রাচ্য—

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঙালার লোকের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কথায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "কোন্ দেশে মানুষ খেতে না পেয়ে গাছ খায়, পাটা খায়, উইঢাপী খায়, অনেক পাতা খায়?" তখন যে দুরবস্থা ছিল, বাঙালার মানুষের সৃষ্টি ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে তাহাই স্বাভাবিক হইয়াছিল এবং তদবধি পশ্চিমবঙ্গের নরনারী অন্নকষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। সেই দুর্ভিক্ষের সময় সরকার যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে লোককে যে খাদ্যের জন্য দুখাস্ত ও অখাস্ত ভক্ষণ করিতে হইতেছে, তাহা জাতির সর্ব্বনাশ করিতেছে। দেশ-বিভাগের পরে স্বাধীন-শাসনশীল রাষ্ট্রের সরকার সে অবস্থার প্রতীকার করিতে পারেন নাই। তাহা লজ্জার কথা। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামেশিক সরকার প্রদেশকে খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে অক্ষমতারও সেই অজুহাতে নিষ্ফল কারণ তালিকার কথায় বলেন—পূর্ব্বঙ্গ হইতে—যাহারা আজ সরকারকে পরিচালিত করিতেছেন তাঁহাদিগের কার্য্যকরে—যে সকল হিন্দু নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদিগের জন্যই এমন হইয়াছে। কেহ কেহ দেখাইয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব নাই, অথচ বলা হইতেছে, চাউলের অভাব।

যাঁহারা সরকারী হিসাব অবলম্বন করিয়া এইরূপ কথা বলিতেছেন, তাঁহাদিগের ভুল পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখাইতে পারিতেছেন না; সুতরাং তাঁহারা যেমন বলিতেছেন, তাহাকে খোসামদি ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। প্রথমে খাদ্য-সচিব সেই খোসামদি দিতে যাইয়া যে বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে কেবল চাউলের নহে—পরন্তু দাইলের, গোল আলুর, দুগ্ধের, মৎস্য ও মাংসেরও অভাব তাহার আলোচনা আমরা গত মাসে করিয়াছি। তাহার পরে প্রধান-সচিব সেই সুরে সুর মিলাইয়াছেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে খাদ্যের নামে যে অখাদ্য দেওয়া হয়, তাহার জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে—বিদেশ হইতেও চাউল আনিয়া প্রয়োজন মিটাইতে হয়, সুতরাং ভাল মন্দ দেখা চলে না। এ দেশে চলিত কথা—"ছিদামের চাল—তা' আবার ঝাড়া আর আসাড়া!" কিন্তু বিদেশ হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনা হয় না—ন্যায্য মূল্যেও অধিক মূল্য দিয়া কিনিয়া আনা হয়। সুতরাং ভাল মন্দ বেছিয়া আনা অসম্ভব হইতে পারে না। আর তাঁহার কথায় দুইটি বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে :—

(১) দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও যথেষ্ট সাহায্য কৃষিপ্রাণ পশ্চিমবঙ্গকে তাহার প্রধান খাদ্যোপকরণ চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

(২) সরকার যে হিসাব করিতেছেন, তাহা রেশনে ১২ আউন্স খাদ্যোপকরণ প্রদান করা ধরিয়া।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে প্রদেশকে খাদ্যোপকরণে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিতে না পারা সরকারের অযোগ্যতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কি বলা যায়?

আর রেশনের পরিমাণ সম্বন্ধে আমরা প্রধান-সচিবকে তাঁহার একটি উক্তি স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১৩ই মাঘ (১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী) তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রমুখ মহিলাদিগের যে মিছিলের প্রতিনিধিবর্গকে তিনি বলিয়াছিলেন—

"My view is that 16ozs of food should be provided for every person."

অর্থাৎ আমার মত এই যে, প্রত্যেক লোককে ১৬ আউন্স খাদ্য দিতে হইবে।

দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে যে তিনি সে ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাহা কি তিনি কলিকাতায় ভূমিতলে রেল পরিচালন, সরকারী পরিবহন-বিভাগ প্রতিষ্ঠা, সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার আয়োজন—এই সকল বহুব্যয়সাধ্য পরিকল্পনার অসাফল্যের দুশ্চিন্তায় ভুলিয়া গিয়াছেন? এই পাঁচ বৎসর অপূর্ণাহারে থাকিয়া যাহারা তিলে তিলে মরিয়াছে তাহাদিগের মৃত্যুর দায়িত্ব কি তাঁহাকে ও তাঁহার সহসচিবদিগকে পীড়িত করিতেছে না? খাদ্য-সচিব বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে চারিদিকে অভাব; তিনি কেবল বলেন নাই, পশ্চিমবঙ্গে সচিবের অভাব নাই।

প্রধান-সচিব বলিয়াছেন, পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে মাছ, ডিম প্রভৃতি আসিত, এখন না আসায় অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু দেশের লোক কি জানে না যে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে খাদ্যোপকরণ না আসিলেও ভারত রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশ ও সকল বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী হইতেছে? তবুও লোককে কি কারণে অপূর্ণাহারে থাকিতে হয়, তাহা কি তিনি বলিতে পারেন?

খাদ্যোপকরণের অভাব দূর করিবার জন্য কত উপায় যে অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহা ব্যর্থ হইয়াছে ও লোকের পক্ষে পীড়াদায়কই হইয়াছে,

তারা পশ্চিমবঙ্গের লোক অনুভব করিয়াছে। লোককে জমী হিসাবে ধান দিতে বাধ্য করা সে সকলের অন্যতম। এতদিনে প্রধান-সচিব কবুল জবাব দিয়াছেন, তাঁহার সুযোগ্য পুলিস—সাংঘাতিকদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারে বটে, কিন্তু গুলী চালাইয়াও লুকান ধান বাহির করিতে পারে নাই। তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন—ইহার কারণ হয় লুকান ধান নাই, নয় ত কোন অজ্ঞাতকুল কারণে পুলিস তাহা বাহির করিতে বিরত হইয়াছে। ইহার কোনটি তিনি গ্রহণ করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

চাউলে পশ্চিমবঙ্গের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে যখন সন্দেহের অবকাশ আছে, এখন নিয়ন্ত্রণ বাতিল করিয়া কল লক্ষ্য করা কি অসঙ্গত ?

এ কথা কি সত্য যে—

(১) উড়িষ্যার যখন যে চাউল পূর্বে হস্তীকে খাওয়ান হইত, তাহাই পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরত মূল্যের অনেক গুণ অধিক মূল্যে কিনিয়া লোককে সেশানে লইতে বাধ্য করিয়াছেন ?

(২) অন্য প্রদেশে যে চাউল মানুষের অখাদ্য বলিয়া সরকার কর্তৃক ত্যক্ত হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে তাহাও আনা হইয়াছে ?

(৩) কেন্দ্রী সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সময় অন্যান্য প্রদেশ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বর্জন করিতেই আগ্রহশীল, সেই সময়েও যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহা বহাল রাখিতে চাহেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয় ?

কেন্দ্রী সরকারের মন্ত্রীর সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবদিগের আলোচনার ফলে যে পদ্ধতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—

(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর ধান ও চাউল লোকের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লইবেন না বা সংগ্রহ করিবেন না।

(২) কেন্দ্রী সরকার কলিকাতা ও নিকটবর্তী যে সকল স্থানে রেশন-ব্যবস্থা আছে সে সকলের জন্য মাসিক ১০ হাজার টন চাউল সরবরাহের বাধ্যিত গ্রহণ করিবেন।

(৩) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ ও রেশনিং অঞ্চল বেষ্টনিবদ্ধ থাকিবে ; পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রদেশের বাহিরে ধান ও চাউল প্রেরিত হইতে পারিবে না—রেশনিং অঞ্চলে বাহির হইতে ধান ও চাউল আসিতে ও পারিবে না।

(৪) রেশনে যে খাদ্যোপকরণ দেওয়া হইবে, তাহার পরিমাণ পূর্ববৎ থাকিবে।

(৫) লুকান ধান ও চাউল বাহির করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করা হইবে।

(৬) লোককে (চাউলের পরিবর্ত্তে) অধিক পরিমাণ গম বা অন্যান্য খাদ্যোপকরণ ব্যবহারে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

(৭) যদি সরকার খাদ্য ও চাউল সংগ্রহে বিরত হওয়ায় কোন অঞ্চলে খাদ্য ও চাউলের মূল্য অসঙ্গতরূপ হ্রাস পায়, তবে সরকার চাষীর স্বার্থ রক্ষার্থ তথায় খাদ্য ও চাউল কিনিবেন।

এই ৭ দফার মধ্যে পঞ্চম দফার জন্য যে অনাচার অনুষ্ঠানের সুযোগ থাকিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। ষষ্ঠ দফার কোন অর্থ হয় না।

কিন্তু মূল কথা—কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে কেন মাসে ১০ হাজার টন চাউল লইতে হইবে ? যতক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সত্য সত্যই চাউলের অভাব আছে, ততক্ষণ তাঁহারা যেমন মাসিক ১০ হাজার টন চাউল পাইবার অধিকারী নহেন, কেন্দ্রী সরকারও তেমনই উহা দিতে বাধ্য নহেন। অভাব কোন সচিবের বা সচিবদলের কথায় প্রমাণিত হয় না।

আর একটি কথা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশে ধান্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টায় কি ফললাভ হইয়াছে ?

শুনা যাইতেছে, জাপানী প্রথায় চাষের পরীক্ষা হইবে। কিন্তু দেশে যে সকল প্রথা অবলম্বন করিলে সত্য সত্য ফলন বৃদ্ধি পায়, সে সকল কি নিষেধ করা হইয়াছে ? আশা করি, জাপানী প্রথায় চাষের ফল ডেন-মার্কের প্রথায় দমদমে ঘাসের বীজ বপন করিয়া কলিকাতায় ঘাসের অভাব দূর করিবার মতই হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু অকারণ ব্যঙ্গবাক্যপ্রয়োগ করাও যাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইবে না।

বেকার-সমস্যা—

কেন্দ্রী সরকারের মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারও বেকার-সমস্যা লইয়া বেশ বিব্রত হইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শুধু কলিকাতায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার বেকার অন্নার্জ্জনের জন্য চাকরীর চেষ্টায় পথে ঘুরিতেছে। সরকারী হিসাবে—কলিকাতার অধিবাসীদিগের সংখ্যা ২৭, ৯৯, ৭০০ ; তাহাদিগের মধ্যে ১৩, ৭৭, ২০০ জনের বয়স ১৯ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর এবং অবশিষ্টের সংখ্যা ৭, ৯৯, ৫০০—যাহা-দিগের বয়স ১৯ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর তাহাদিগের মধ্যে প্রায় শত-করা ৮২ জন বাঙ্গালী এবং শত-করা প্রায় ১৮ জন অবাঙ্গালী। যাহাদিগের বয়স ১৯ বৎসর হইতে ৮০ বৎসর, তাহাদিগের মধ্যে—

কার্য্যে রত—৮,৫৫,১০০ জন

কাজের চেষ্টা করিতেছে—২,৫১,৩০০ জন

অবশিষ্ট—২,৯৯,৮০০ জন

যাহারা কাজের চেষ্টা করিতেছে, তাহারাও বেকার।

এই হিসাব কতটা নির্ভুল অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অবস্থাও যে ভয়াবহ, তাহা বলা বাহুল্য।

ভারত সরকার যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেখাইয়া লোককে আশা দিয়া আসিতেছেন, তাহাতেও পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন, তাহে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। কখন বা ভারত সরকার বলিতেছেন, প্রাথমিক পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হয়, তাহাদিগকে শিক্ষক হইতে বাধ্য করা যায় কি না, তাহা বিবেচনা করা হইবে ; কখন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছেন।

প্রথমে দেখা যাইতেছে, সরকার শিক্ষিত বেকারদিগের সমস্যা লইয়াই সর্ব্বাধিক অবহিত ও উৎকণ্ঠিত। ইহার কারণ হয় ত এই যে, ইংলণ্ডের, ফ্রান্সের ও রিশ্বের অভিজ্ঞতায় দেখা দিয়াছে—

"It is at the point where education and starvation meet that the flame breaks forth."

সেই জন্যই বাঙ্গালার গভর্ণরকে সার হল এডারষন এদেশে সন্ত্রাসবাদের নিদান-নির্ণয়-চেষ্টায় বলিয়াছিলেন—অবশ্য যে শোচনীয় সরকার তাহা অনবগত নহেন : কারণ দেখা যাইতেছে—

"Year after year our youngmen are growing up—ago and our girls now,—to find no outlet for their energies".

বৎসরের পর বৎসর যে তরুণ তরুণীরা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহারা তাহাদিগের উদ্যম ও উৎসাহ প্রযুক্ত করিবার পথ পাইতেছে না।

ইহাও বেকার অবস্থাই সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ না-ও হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে মনের যে অবস্থা ঘটে, তাহা সন্ত্রাসবাদের উপযোগী।

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি যাঁহারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেই ইংরেজরাই এক দিন স্বীকার করিয়াছেন, ইহার ফলে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইবে, তাহাদিগকে লইয়া সরকার কি করিবেন—তাহাতে সমাজের কি অবস্থা ঘটিবে; তিনি পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাহার প্রতিকারোপায় অবলম্বন করেন নাই। করেন নাই সরকারও যে করিয়াছেন, এমন বলা যায় না। বেকার—উপার্জ্জনে অক্ষম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে যদি বলা হয়—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত না হওয়া পর্য্যন্ত অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে সময় কর, তবে তাহা উপহাসের মতই শুনায়। তাহাতে কি ফল ফলিবে?

অথচ বেকার-সমস্যা নানারূপ দুর্নীতিতে সমাজ কলুষিত করে এবং তাহাতে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, তাহা যখন আগ্নেয়গিরির অন্তর্নিহিত নৈরিকস্রাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহাই বিপ্লবের রূপ—তাহাই ফরাসী বিপ্লবে ভেদা দিয়াছিল, আইরিশ ও রুশ বিপ্লবে দেখা দিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন নানা দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছিল, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশ—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, তুরস্ক—যে যাহার উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল। সে সকল মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করিলে হয়ত এ দেশের সরকার দেশের উপযোগী ব্যবস্থার সন্ধান পাইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহারা কি তাহা করিতেছেন? সরকারের সহিত দেশের জনগণের যোগ নাই; সরকারী কর্ম্মচারীরা আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করেন—কেহ কেহ শিষ্টাচার পরিহার করিয়া অধিকাংশ লোককে "তুমি" যাহাতে "আপনি" বলেন না!

সচিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বেকার-সমস্যার সমাধান করা যায় না। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্য বিস্তার প্রভৃতি ব্যতীত শিক্ষিত বেকারদিগকে কাজ দেওয়া যায় না।

বেকার-সমস্যা কেবল শিক্ষিত সমাজেই নিবদ্ধ নহে। পশ্চিম বঙ্গে কৃষিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোকের অবলম্বন; উহার শিল্পের মধ্যে বয়নশিল্পের গুরুত্ব অধিক। কৃষি ও বয়ন শিল্পের আলোচনা করিলে আমরা কি দেখিতে পাই?

কৃষককুল মহাজনের কৃপায় নিঃস্ব—উৎসাহ ও আশা উভয়ে বঞ্চিত। কোন ইংরেজ লেখক বলিয়াছিলেন :—

"The province is not poor either in natural resources or in manpower, but there must, I feel, be some maladjustment somewhere in a system which keeps a vast agricultural population groaning under a load of debt, eking out a narrow and penurious existence and yet, in most districts, lacking useful occupation for nearly nine months out of the twelve."

কৃষক ঋণে জর্জ্জরিত, কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে—অথচ বৎসরে প্রায় ৯ মাস কাল কোন উপার্জ্জন-সহায় কাজ পায় না।

ইহার কারণ, এ দেশ কৃষিপ্রধান ছিল, কিন্তু কৃষিপ্রাণ ছিল না। দেশে নানারূপ উটজ শিল্প লোককে অবসরকালে ব্যাপৃত ও উপার্জ্জনক্ষম রাখিত। সে সব লুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষির উন্নতির উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে না—পথের অভাবে কৃষির পণ্য নিকটবর্ত্তী সহরে বা বন্দরে আনাও ব্যয়সাধ্য।

আর বয়ন শিল্প যে সরকারের সুদৃষ্টিলাভে সম্প্রতি নিত্য নূতন বিঘ্নে, অভাবে ও অনাচারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। বিনিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ, পুনর্নিয়ন্ত্রণ—এই সকলে শিল্পের উপকরণ সংগ্রহ দুষ্কর হওয়া অনিবার্য্য।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে তৎকালীন সরকার বাঙ্গালার বিভিন্ন উটজ-শিল্পের সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল হইতে বর্ত্তমান সরকার, ইচ্ছা করিলে, অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা তাহা করিবেন কি না বলিতে পারি না। অল্প উটজ শিল্পের পরিচালন-পদ্ধতিতে উন্নতি সাধনের চেষ্টা বাঙ্গালা সরকারের শিল্প বিভাগ করিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পে উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে নূতন নূতন উটজ শিল্প ও ছোট ছোট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কাঞ্চনপল্লীর ছুরি কাঁচি, নাটাগড়ের তালা প্রভৃতি আর দেখা যায় না। কলাহরের চিরুণী, চুমরাল প্রভৃতি অল্প লাভ করিয়াছিল। চাকার শঙ্খ-শিল্পীরা অনেকে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়াছে। যদি বর্ত্তমানের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও উন্নতি সাধন এবং নূতন নূতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করা যায়, তবে যে বেকার-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করা হয়, তাহা বলা বাহুল্য। চাকার কাশিদা নামক যে কাপড়ে সুতার কাজ করা টেবল ঢাকা প্রভৃতি প্রস্তুত হইত, পশ্চিমবঙ্গে তাহা প্রস্তুত করান সহজসাধ্য। পূর্ব্বে হুগলী জিলায় "চিকন" দরিদ্র নারীরা গৃহকর্ম্মের অবসরকালে প্রস্তুত করিত এবং বিদেশেও তাহার চাহিদা ছিল।

বড় বড় কলকারখানার জন্য প্রভূত মূলধন প্রয়োজন—তাহা সহজে সংগৃহীত হয় না। কিন্তু উটজশিল্প সম্বন্ধে—বিশেষ একাধিক ব্যক্তির দ্বারা সমবায় পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত করা যায়। সে জন্য সরকারের শিক্ষা-পরিচালন ও সাহায্যের (আর্থিক ও বিক্রয়-ব্যবস্থার) প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যার সমাধান বন্দুকের দ্বারা হইতে পারে না। সে জন্য দেশের জনগণের প্রতি প্রকৃত—আন্তরিক সহানুভূতির ও সহজ উপায় নির্ধারণের প্রয়োজন।

বেকার-সমস্যা যাহাতে সমাজে দুষ্টক্ষতের মত না হয়, সে দিকে সকলেরই অবহিত হওয়া কর্তব্য।

ধর্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ ও অশান্তি—

কিছুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ ও অশান্তি যে প্রবল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ইহার ফল যে অতিপ্রেত নহে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ, ইহাতে এক দিকে যেমন শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন, অপর দিকে তেমনই অনিশ্চয় অবস্থার জন্য ব্যবসায়ীরা ব্যবসার বিস্তার সাধনে ভয় পাইতেছেন এবং প্রদেশে অশান্তি ব্যাহতভাব করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অন্যান্য বৎসর এই সময়ে পাটকলের জন্য পাট ক্রীত হয়—চাষী ভাল দাম পায়। এ বার সেই অবস্থার ব্যতিক্রম হওয়ায় চাষিদিকে অভাব তীব্রতর হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব জনগণের সহিত ঘনিষ্ঠ নহেন; কিন্তু ধনিক ও ধনীদিগের ধাতু তিনি অবগত আছেন। প্রধান-সচিব হইয়া তিনি প্রথম যে বার বড়বাজারীসহ য়ুরোপ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন যাত্রাকালে বিমান ঘাঁটীতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"একি! এ যে সারা বড়বাজার এখানে হাজির!" পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার্থ ৯ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে; কিন্তু প্রধান-সচিবের জন্মদিনে যাঁহারা তাঁহাকে লক্ষ টাকা উপহার দিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধনিক ও ধনী। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট, শ্রমিক-বিক্ষোভ ও অশান্তি হেতু অনেক ব্যবসায়ী পশ্চিমবঙ্গে আর কারখানা করিতেও ব্যবসা চালাইতে চাহিতেছেন না।

যাঁহারা তাঁহার সমর্থক সেই ধনিকরাও যেন ধৈর্যচ্যুত হইতেছেন। য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের একমাত্র মুখপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যান' (১৯শে অক্টোবর) "বর্তমান কলিকাতা" সম্বন্ধে মিষ্টার মোরওয়ানার একটি প্রবন্ধ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পরেই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে:—

(১) কম্যুনিষ্ট প্রভাব দমনজন্য কেন্দ্রী সরকার অবহিত হউন:

(২) প্রদেশ সরকার শাসনকার্য পরিচালিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন।

কিন্তু প্রদেশ সরকার কি স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা কম্যুনিষ্ট প্রভাব দমন করিতে অক্ষম এবং তাঁহারা শাসনকার্যে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না? ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচন যদি লোকমতজ্ঞাপক হয়, তবে দেখা যায়—নির্বাচিত সদস্যগণ (যে কারণেই কেন হউক না) অধিকাংশ কংগ্রেসপন্থী; এমন কি যে দিন কলিকাতার গড়ের মাঠে সাংবাদিকরা পুলিসের আক্রমণকেন্দ্র হইয়াছিলেন, সে দিনও কংগ্রেসী সদস্যগণ অস্থায়ী প্রধান-সচিব শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ভবনে সমবেত হইয়া তাঁহার অবলম্বিত নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন। সেই নীতি অনুযায়ী অস্থায়ী প্রধান সচিব ও স্বরাষ্ট্র-সচিব বেলা ১০টার সময় ডাক্তার রাধাবিনোদ পাল, ডক্টর্‌ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যকুমার বসু প্রভৃতিকে অপরাহ্ণে টালাডাঙ্গা বস্তি প্রতিরোধ সমিতির ৫ জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। কাজেই প্রদেশের লোকের মধ্যে কম্যুনিষ্টের আধিপত্য থাকার কথা সত্য কি না, সন্দেহ। শাসনকার্যে দৃঢ়তার অভাব সুচিন্তিত যেখানে নাই; চরম অকারণ আতিশয্য প্রকট করিয়াছেন: কলিকাতার রাজপথে পুলিসের গুলিতে নিহত ৩জনদিগের রক্তে রঞ্জিত হইয়া তাহার সাক্ষ্য দিয়াছে।

এমন কি লোকসভা নির্বাচনে যে সচিবদিগের সম্বন্ধে আস্থার অভাব দেখাইয়াছে, তাঁহাদিগকেও—অল্প সময়ে—সচিব করিবার সাহস প্রধান-সচিবের হইয়াছে। প্রমাণ—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—যে দুইজন পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

বিদেশী ধনিকদিগের মুখপত্রের পরে ভারতীয় ধনিকসম্প্রদায়ের মুখপত্রও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিন্দা প্রকাশিত হইয়াছে। যে দিন 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার পরদিন দিল্লী হইতে প্রকাশিত ব্যবসায়ী বিড়লাপরিবারের 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রে বলা হয়—

(১) পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সমাধানে পশ্চিমবঙ্গের সচিব-সঙ্ঘের ব্যর্থতা স্বপ্রকাশ;

(২) সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রধান-সচিবের "প্রাণবিক দৌর্বল্যের" পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদলের (অর্থাৎ সচিবসঙ্ঘের) জনগণের সমর্থন অতি সামান্য।

(৪) সাম্প্রতিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে প্রধান-সচিব-পরিকল্পিত "কল্যাণী" নামক স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হইবে কি না, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে।

চতুর্থ কথায় যে সন্দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আরও অনেকের আছে। তাহার কারণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-ব্যবস্থা লোকের পক্ষে সন্তোষজনক হয় নাই এবং ঐ স্থানের নিকটে বহু উদ্বাস্তু বাস করিতেছেন; "কল্যাণী" সহর গঠনার পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন নহে; "কল্যাণী" গঠনার জন্য বহু লোককে উদ্বাস্তু করা হইয়াছে; অদূরে সুন্দরবনে যে অবস্থা তাহা পশ্চিমবঙ্গ সরকার "দুর্ভিক্ষ" বলিতে অসম্মত হইলেও "অন্নকষ্ট" বলিতে বাধ্য হইবেন।

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নিশ্চয়ই মনে আছে—

(১) উদ্বাস্তুরা পাছে তাঁহার গাড়ীবেষ্টন করে সেই ভয়ে তাঁহাকে সম্বর্ধনার জন্য সজ্জিত পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে হবরম বিমান ঘাঁটী হইতে রাজভবনে যাইতে হইয়াছিল।

(২) তাঁহার দান লক্ষ্য করিয়া পাদুকা এবং তিনি যে সভায় বক্তৃতা করেন তাহাতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

(৩) তিনি—পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবেরই মত—বিধানসভা বেলা-টেবিলে উদ্বাস্তুদিগের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে গমন করেন নাই।

ইহাদের শিবিরে সরকারের নারীদিগের প্রবেশের অধিকার সম্বন্ধে তাঁহার মধুর বিদ্রূপের কথা উল্লেখিত হইয়াছিল।

যে কুয়োদিং ও তাংচৌর ঘটিকরা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিবের প্রধান সহায়ক ছিলেন, তাঁহাদিগের মধুরের চক্রই তাঁহাকে বিদায়ে যাইতে ঘড়যন্ত্র করিয়াছিল—কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই মতই সত্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু বিদায়ে যাইয়া তবে তিনি পশ্চিমবঙ্গে ঘটিক বিকোষের নিয়ন্ত্রণভার বিধান করিবার জন্য যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, রোগ পশ্চিমবঙ্গের, ঔষধের ব্যবস্থা বিদেশে করা হইয়াছে।

প্রধান সচিবের ব্যবস্থাপত্রের কথা—শ্রমিকদিগের নিম্ন ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য তাহাদিগের কিরূপ পারিশ্রমিক প্রয়োজন তাহা স্থির করিবার জন্য একটি সমিতি নিযুক্ত করা হইবে।

ইহা ঔষধের উপকথার পক্ষীরাজের মুখিক প্রসব ব্যতীত আর কি বলা যায়? শ্রমিক বলিতে কেবল শ্রমিক, কি পরিবারসহ শ্রমিক বুঝিতে হইবে? আর সমিতি যে পারিশ্রমিক সঙ্গত মনে করিবেন, শিল্প তাহা দিয়া উৎপন্ন পণ্য প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কি না, তাহা দেখিবার দিবে? কিন্তু সে পারিশ্রমিক দিতে অক্ষম হইলে কি সরকার অর্থ-সাহায্য করিবেন? যদি আসে, শুধার্ত জনতা পাগলাভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া ডাংকল বিদ্রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহারা যদি রুটি না পায়, তবে পিষ্টক খায় না কেন? এ ব্যবস্থা তেমনই প্রহরিবেষ্টিত দৃষ্টবাণীর উপযুক্ত।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঘটিকে শ্রমিকে, সচিবে জনসংঘে, সরকারে প্রতিপক্ষ সহানুভূতির অভাব দূর করিলে যে বর্তমান প্রভৃতির কারণ দূর করা সুদূর হইতে পারে ইহা কেহই বিবেচনা করিতেছেন কি না-সন্দেহ। বাস্তিক-এই কি বহু বিপদের কারণ হয় না?

অপব্যয় ও কালক্ষয়—

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু যদি ভারতচন্দ্রের কথা মনে করেন, তবে ভাল হয়—"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।" বক্তৃতায় বক্তৃতায় তিনি অনেক কথাই বলেন এবং সময় সময় তাঁহার সরকারের ব্যবস্থারই নিন্দা করেন। গত ২৮শে অক্টোবর সেচ ও ঘটিশক্তি কেন্দ্রী বোর্ডের বার্ষিক সভায় তিনি এঞ্জিনিয়ারদিগকে উপদেশপ্রদানের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

সেই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার সরকারের ব্যবস্থারই নিন্দা করিয়া কিরূপে অকারণ অপব্যয় ও কালক্ষয় হয়, তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধের সময় নয়াদিল্লীতে কর্মী সরকারের চাপরাশীর সংখ্যা ছিল ১ হাজার, আর আজ হইয়াছে ১৯ হাজার। অথচ এখন প্রায়ই "ফাইল" না পাইয়া টেলিফোনে আলোচনা করিয়া কর্মচারীরা সহজে কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন।

তিনি বলিয়াছেন, নয়াদিল্লী শাসনের জন্য—তাহাতে লোক পথ হারাইয়া ফেলে। এখনও সরকারী লোকরা মোটা মাহিয়ানা, ভাতা-ভরক প্রভৃতি ভোগ করেন, আর বস্তুরথাদ্য অতিকায় হইয়া উঠিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গেও আমরা ইহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন বাঙ্গালা (সমগ্র) বিহার ও উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল তখন এক জন ছোটলাট—একজন চীফ সেক্রেটারী লইয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতেন—হয়ত কাহারও ভাল হইত। আর আজ? আজ সচিবের উপর সচিবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াও বিস্তার নাই—মধ্যসচিব ও উপসচিবও প্রয়োজন। কাজের জন্য কি অপব্যয়ের জন্য তাহা বলা দুষ্কর। উপসচিবদিগকে সরকারের কাজ না হইলেও সরকারের অবলম্বন কংগ্রেসের জন্য অকংগ্রেসীর নিকটেও চাঁদা আদায় করিয়া বেড়াইতে হয়। প্রত্যেকেরই চাপরাশী প্রয়োজন, মোটর গাড়ী নহিলে চলে না, লক্ষের ভাতা আছে। দেখিলে এবর্ণ সাকের সেই কথা মনে পড়ে :—

"While the Indian villager has to maintain the glorious phantasmagoria of an imperial policy, while he has to support legions of scarlet soldiers, golden chupassies, purple politicals, green commissions, he must remain the hunger-stricken, over-driven phantom he is."

এই অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হইয়াছে কি? আজ ভারতকে কুটনের সাম্রাজ্যবাদ নীতির জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয় না বটে, কিন্তু কমনওয়েলথে থাকার প্রধান মন্ত্রীকে কুটনের রাণীর অভিষেকোৎসবে যোগ দিতে যাইতে হয়, মূল্যমূল্য হ্রাস করিতে হয়—ইত্যাদি; আজ ভারতকে, অহিংসার প্রতি ভক্তি দেখাইলেও, কোটি কোটি টাকা সামরিক ব্যয় সঙ্ক করিতে হয়; চাপরাশীর বাহুল্য সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর খীকৃতিই যথেষ্ট; রাজনীতিকদিগকে পুরুষানুক্রমে পেনশন না হইলেও নানা সুবিধা (যথা বাসের ও ট্যাক্সীর ভাড়া) দিয়া তুষ্ট রাখিতে হইতেছে; কমিশনের বাহুল্য অসাধারণ হইয়াছে; আর দুর্নীতির কথা বলা বাহুল্য। যে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতালাভের পূর্বে চোরাবাজারীদিগকে ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার চারিদিকে চোরাবাজারীরা বিরাজ করিতেছে।

অপব্যয়ে ও কালক্ষয়ে দেশের শাসন-ব্যবস্থা লোকের মনে কেবল বাহুল অসন্তোষ সৃষ্টি করিতেছে। তাহার অনিবার্য্য ফল কি, ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে।

কেবল বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে কখন প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। সেজন্য সাধনার প্রয়োজন—সেজন্য কাজ প্রয়োজন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দেশের লোককে তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি তাহার উপযোগী পরিবেশ রচনা করিবার উপায় করিয়াছেন বা করিতেছেন?

রোগাক্রান্ত স্বাস্থ্যনিবাস—

কিছুদিন হইতে এ দেশে যক্ষ্মারোগের প্রাবল্য ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার নানা কারণের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব অন্যতম। ক্ষয়রোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসা ব্যয়সাধ্য। পশ্চিমবঙ্গে রোগীর সংখ্যার তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা অতি অল্প। যাদবপুর

চিকিৎসাগারে স্থানাভাবহেতু সরকার বাঁচড়াপাড়ায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহাতেও স্থানাভাব। আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসার ব্যবস্থা যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের হাসপাতালে আছে—তাহাও যথেষ্ট নহে।

হাসপাতালের একটি অসুবিধা—রোগী যখন আরোগ্যলাভ করে, তখনও গৃহে যাইতে পারে না—পরিবারস্থ ব্যক্তিরা ভয় পায় এবং গৃহে রোগ পুনরায় আক্রমণ করিতে পারে। ফলে নূতন রোগীর পক্ষে হাসপাতালে স্থানলাভ দুর্ঘট হয়। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় রোগীদিগের রোগমুক্তির পর কোথাও কিছুদিন থাকিয়া সবল হইবার ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া রোগমুক্ত বাসাবাড়ী স্থাপনের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্বে যাদবপুরে হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে তিনি সেই পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। তাহাতে তখায় সামান্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়—রোগীরাও সে জন্য যথাসাধ্য অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। রাজ্যপাল মহাশয় সার্জ্জেন্ট-এ দেশবন্ধু স্মৃতিরক্ষায় যে ব্যবস্থা করিতেছেন, তাহার জন্য আবশ্যক অর্থ (কিঞ্চিদধিক ৫ লক্ষ টাকা) সংগৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা রেঞ্জার্স ক্লাব পল্লীবাসীদিগের রোগার্ত স্বাস্থ্যাবাসের জন্য তাঁহাকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

কিন্তু কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। সুখের বিষয় সদুদ্যোগীরবতী—স্বাস্থ্যাবাসের উপযোগী স্থান বীরায় (মেদিনীপুর) এক ব্যক্তি ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমি দান করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বীরায় খাস মহলে সরকারের অনেক জমী পতিত আছে। তাহা হইতেও আবশ্যক জমী পাওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের মনে হয়, এই কাজে সরকারের সাহায্য সর্ব্বাগ্রে প্রদত্ত হইলে সঙ্গত হয়। ডক্টর হরেন্দ্রকুমার যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া দেশের লোক অর্থদানে আগ্রহশীল হইবেন, এ আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি। কিন্তু সরকার যদি ইহার অঙ্কে ব্যয়ভার বহন করেন, তবে কাজ অল্পদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইতে পারে।

রেঞ্জার্স ক্লাবের মত টার্ফ ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে আমরা এই কার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতে অনুরোধ করি। পশ্চিমবঙ্গের ঘোড়দৌড় প্রতিষ্ঠানগুলি সকল সৎকার্য্যে সাহায্যদান করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে এ কাজে সাহায্য দিতে অগ্রসর হইবেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। চলিত কথা আছে—সাধু যাহার সম্বল, ভগবান তাহার সহায়। রাজ্যপাল মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, দেশের কল্যাণকর এই কার্য্য অর্থাভাবে অসম্পন্ন রহিবে না। কলিকাতায় অবস্থাপন্নদিগের সম্মিলন-কেন্দ্র ক্যালকাটা ক্লাব, লেক সাঁতারের ক্লাব প্রভৃতিকেও এই কার্য্যে সাহায্যদানের জন্য অগ্রসর হইতে বলা অসঙ্গত নহে। প্রদর্শনীর ও সার্কাসখেলার দ্বারাও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের জমীদারেরা দানের উৎস ছিলেন, সে উৎস শুকাইয়াছে। কিন্তু দেশের লোকের সহযোগে এই কল্যাণকর কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন মিটিবে—এ আশা অবশ্যই করা যায়।

পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনটি তাহার প্রতি দেশের মনোযোগে সকলের সাহায্য আকৃষ্ট করিবার পক্ষে যথেষ্ট।

জমীদারী প্রথার উচ্ছেদ—

এতদিনে পশ্চিমবঙ্গে জমীদারী প্রথার বিলোপ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নের আয়োজন হইয়াছে। জমীদারী প্রথার বিলোপ অনিবার্য। যে অবস্থায় ও যে কারণে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সে অবস্থার অবসান ঘটিয়াছে—সে কারণ আর নাই। এই প্রথার উপযোগিতার অবসান হইয়াছে।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আইন প্রণয়ন করিতেছেন, তাহাতে কালোপযোগী ব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নাই। ইহাতে—

(১) সরকার জমীদারী ক্রয় করিয়া জমীদার হইবেন।

(২) প্রজার অবস্থা যে তিমিরে সে তিমিরে থাকিবে।

এ অবস্থায় সরকারের পক্ষে জমীদারীর মূল্য—কত টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমর্থনযোগ্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

প্রজা জমীতে স্থায়ী অধিকার পাইবে না—ইহা যাঁহাকে "স্বামিত্বের ইন্দ্রজাল" বলিয়াছেন, তাহার ফলে কৃষকের জমীর উন্নতিসাধনের ও উৎপাদনবৃদ্ধির উৎসাহ সঞ্জাত হইবে না। পরন্তু তাহার দুর্ভোগ বর্দ্ধিত হইবে। কারণ, জমীদারকে আদালতে নালিশ করিয়া অনেক ক্ষেত্রে বাকিপাজনার টাকা আদায় করিতে হয়, সরকার খাসমহলে সরাসরি সার্টিফিকেট জারি করিয়া, অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র কুলা, প্রজার ঘটী বাটি গরু ও ধান সব বিনাশ করাইয়া বাকি খাজনার টাকা ওয়াশিল করিতে পারেন। এখনই দেখা যায়, জমীদারের প্রজা খাসমহলের প্রজার তুলনায় অনেক সুবিধা লাভ করে।

যদি প্রজাকে বিনা অধিকার প্রদান করা না হয়—তবে সরকার জমীদারী কিনিলে তাহাকে জাতীয়করণ বলা যায় না—তাহা দুর্বৃত্ত জমীদারের পরিবর্ত্তে সৎ জমীদারের প্রথা হওয়া। গল্প আছে, রাজপুত গরু বেচিয়া গরুকে যে কথা বলিতে বলিয়াছিল—তাহাতে তাহার ইষ্টাপত্তি কিছুই থাকিতে পারে না—এখানেও খাসমহল সেখানেও তাহাই।

বরং জমীদার উদারতাবশে বা অন্যান্য কারণে রাস্তাঘাট করিয়া, পুষ্করিণী খনন করাইয়া, বারমাসে তের পার্ব্বণে, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া আয়ের কিছু অংশ ব্যয় করিয়াছেন। সরকারকে সময়ের জন্যও সে সব করিতে হইবে না।

প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনে জমীদারের স্বেচ্ছাচারের ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে; সে কথা ব্যক্তিমাত্রই বলিয়াছেন।

শাসতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে যে অধিকার প্রজার প্রাপ্য প্রজাকে যদি তাহাতে বঞ্চিত রাখা হয়, তবে বহু অর্থব্যয় করিয়া সরকারের জমীদার হইবার অধিকার কি সমর্থনযোগ্য? যদি প্রজাকে যথাযথানুমোদিত অধিকার না দিয়া সরকার জমীদারী ক্রয় করেন তবে সে

ব্যবস্থা হইবে, তাহা বন্ধ হইবে, তাহার ব্যবস্থা না হয়, তবে "না মাটিকা না সরকা" হইবে।

অর্থাৎ তাহাতে দেশের চর্মী শিল্পীকরণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

পণ্ডিতজীর সরকার বহুদিন বিদেশে—"অনেক চিন্তার পর" যাহা করিতে যাইতেছেন, তাহাতে প্রজার কোন উপকার হইবে না—হইতে পারে না। অথচ সরকার বিরাট আয়ের ও বিরাট ব্যয় গ্রহণ করিবেন। গঙ্গাজলী প্রথার উচ্ছেদসাধন সর্ব্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য—কিন্তু যেভাবে তাহা হইতেছে, তাহা প্রজার স্বার্থ ও অর্থনীতিকদিগের দ্বারা কোনরূপেই সমর্থিত হইবে না।

নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৫শে অক্টোবর (৩০শে কার্ত্তিক) হইতে রাজস্থানে—জয়পুর নগরে নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩ দিবসব্যাপী বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ১৩১০ বঙ্গাব্দে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্যোগে ও মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশিমবাজারে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়। তদবধি ভারতের উত্তরে বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার অনুকরণে ও আদর্শে বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীরা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত করেন। নানা কারণে, বিশেষ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যখন জন্মভার গুরু দায়িত্ব আরম্ভ করে তখন পরিষদের ভয়ে সাহিত্য সম্মেলন পরিচালন-ভার ক্রমে হওয়ায়, প্রতিষ্ঠানটির শক্তি ও কর্ম্মপ্রিয়তা হ্রাস পায়। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তখন মাঝে মাঝে চলিতে থাকে। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় দুই প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়াছে। আশা করা যায়, যোগ্য ব্যক্তিদিগের পরিচালনায় নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন—কেবল যে ভারতের সর্ব্বত্র বাঙ্গালী-দিগের প্রধান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হইয়া থাকিবে, তাহাই নহে; পরন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি সাধন করিবে।

সাহিত্যে বৈশিষ্ট্য তাহার সাহিত্যে রক্ষিত ও প্রতীত হয়। সেই জন্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের দুই জন সিদ্ধপাদের—মধুসূদনের ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় অরসিক বলিয়াছিলেন, তাঁহারা পৃথিবীকে এই তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

(১) বাঙ্গালা ভাষা

(২) বাঙ্গালা সাহিত্য

(৩) বাঙ্গালী জাতি।

রাজস্থানের আদর্শ বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বিশ্ব বাঙ্গালার ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে। টডের রাজস্থান ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হইবার পরে তাহা বাঙ্গালায় এত আদর লাভ করে যে, সেই বিরাট গ্রন্থের দুইটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়—প্রথম রঙ্গলাল মিত্রের, দ্বিতীয় সঞ্জীবের বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বরাট প্রেস কর্ত্তৃক প্রকাশিত)। বাঙ্গালী কবি রঙ্গলাল টডের ভিত্তিতে কাব্যরচনার জন্য রাজস্থানের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন; বাঙ্গালী ঔপন্যাসিক জগদীশচন্দ্র দত্ত তাঁহার শতকর্ম্মের ভারতের ইতিহাস অবলম্বনে রচিত উপন্যাস চতুষ্টয়ের একখানিতে রাজপুত বীরত্বকাহিনীর বিবরণ বিবৃত করিয়াছিলেন; মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, নাটককার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি রাজস্থানের সহিত বাঙ্গালীকে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন।

জয়পুরের সহিত বাঙ্গলার সম্বন্ধ মোগল সম্রাটদিগের সময় হইতে। জয়পুরের (অম্বরের) মহারাজা মানসিংহই বাঙ্গালাকে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন—তিনিই প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করিয়া তাঁহার শিলা-বিগ্রহ কালী অম্বরে লইয়া যাইয়া তথায় প্রতিষ্ঠিত করেন—দেবীর যথাবিধি পূজার জন্য তিনি বাঙ্গালী পুরোহিত লইয়া গিয়াছিলেন। জয়পুর নগর গঠনায় বাঙ্গালীর সাহায্য গৃহীত হইয়াছিল; জয়পুরই আমেরিকার শিকাগো সহরের আদর্শ। ইংরেজের আমলেও কাশিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জয়পুরের দেওয়ান—সংসারচন্দ্র সেন তাঁহার পরবর্ত্তী।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অবাঙ্গালীরাও বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালীর অবদান অকুণ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

এ বার সম্মেলনে—

(১) রাজস্থানের নরনারায়ণবংশ বেদোরের মহারাজা তাঁহার বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

(৩) নব্যভারতী লক্ষ্মীকুমারীজী চুন্দাবত সাহিত্য শাখার অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

(৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সভাপতিত্ব করেন।

(৫) শ্রীযতীন্দ্র বসু সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন।

(৬) ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাস শাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

(৭) শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি হইয়াছিলেন।

(৮) শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

(৯) রাজপুতানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলার শ্রীমুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রাজস্থানী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-শাখার সভাপতিত্ব করেন।

(১০) পণ্ডিত রবিশঙ্কর চারুশিল্প (নবীন) শাখার সভাপতি ছিলেন।

বাঙ্গালার (পশ্চিমবঙ্গের) আর্থিক অবস্থার আলোচনা হয় এবং সে আলোচনায় ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দেন।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রকৃত ইতিহাস রচনা করিবার জন্য যে আহ্বান জানাইয়াছেন, তাহা কেবল সময়োপযোগীই নহে, পরন্তু অত্যাবশ্যক। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, বাঙ্গালা যখন মুসলমান শাসন সচিবদলের দ্বারা শাসিত তখন কেবল যে সরকারই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ইতিহাস বিকৃত করাইবার চেষ্টা (বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকে) করিয়াছিলেন তাহাই নহে, পরন্তু কোন বিখ্যাত ইতিহাস লেখকও লিখিতে দ্বিধাসঙ্কোচ করেন নাই যে, ঔরঙ্গজেব যেভিন্না কর রদ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার (মুসলমান) কর্ম্মচারীদিগের ঘোরে সে

নির্দেশ যথাযথরূপে পালিত হয় নাই। আবার কংগ্রেসের উদ্যোগে লিখিত কংগ্রেসের ইতিহাসে রাজনীতিতে বাঙ্গালার অবদান যথাযথ অস্বীকার করিবার চেষ্টা প্রকাশ।

বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় তাহা বুঝেন নাই। সেই জন্যই তিনি ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান অবস্থায় বৃহত্তর প্রাদেশিকতার আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বৃহত্তর বঙ্গ বলিতে বিহারের কিয়দংশ বা উড়িষ্যার অংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত করা নহে; বাঙ্গালীর যাহা বৈশিষ্ট্য তাহাই সমগ্র ভারতে প্রসারিত করা। সে বৈশিষ্ট্য রামমোহন রায় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ পর্যন্ত সাহিত্যের মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; সেই বৈশিষ্ট্য স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল; সেই বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার গোধূলীমুখ হইতে প্রবাহিত জাতীয়তার পাবনী ধারা ভারতের দিকে দিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রসারণ; সেই বৈশিষ্ট্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নকরণে; সেই বৈশিষ্ট্য সুভাষচন্দ্র বসুর স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বে সপ্রকাশ। সেই বৈশিষ্ট্য যদি সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত ও গৃহীত হয়, তবে সমগ্র ভারতকে আমরা বৃহত্তর বঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিব এবং তাহাতে সেই বৃহত্তর বঙ্গের উপকার ও উন্নতিই হইবে।

বাঙ্গালা সাহিত্য যে বর্তমান ভারতীয় সাহিত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র দেশের কল্যাণ করুক—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উত্তরোত্তর অধিক শক্তিশালী হউক, আমরা এই কামনাই করি।

সমগ্র ভারতে বাঙ্গালা সাহিত্য সমাদর লাভ করুক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ধনভাণ্ডার—

কিসের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালন জন্য যে সকল ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুভাষচন্দ্র সংগৃহীত ভাণ্ডার সে সকলের মধ্যে সর্বপ্রধান। ঐ সকল ভাণ্ডারের কি হইয়াছে, এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে; সংপ্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব সে সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

(১) জাপানে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর যে ধনভাণ্ডার ছিল, তাহা ভারতে আনা হইয়াছে। তাহার মূল্য প্রায় ১০ হাজার টাকা। উহার ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা প্রধান মন্ত্রী স্থির করিবেন।

(২) শ্যামে (থাইল্যাণ্ড) ভারতীয় স্বাধীনতা-লীগের টাকা তথায় বৃটিশ কর্তারা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। তাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ব্যাঙ্ককে ভারতীয় দূতাবাসের জিম্মায় আছে। এই টাকার সুদ হইতে ভারতীয় ছাত্রদিগকে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা হইতেছে।

(৩) যুদ্ধের পরে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার কোন কোন স্থান হইতে পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পত্তি বলিয়া কিছু স্বর্ণাদি পাওয়া গিয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বলিয়াছেন—ঐ ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে আর কোনরূপ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ভারত সরকারের তাহাই মত। কিন্তু যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, ঐ ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত অর্থের ও স্বর্ণাদির পরিমাণ আরও অধিক ছিল; সুতরাং অনুসন্ধান প্রয়োজন।

যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেশের লোকের মত না লইয়া প্রধান মন্ত্রী যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে তাহা যে স্বৈরাচারসূচক হইবে তাহা কখনই সমর্থনীয় নহে।

বর্ণবিদ্বেষ—

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষের প্রাবল্য হ্রাস না হইয়া যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। একটি চলিত কথা আছে—বিবাহের পূর্বে গর্ব ও পতনের পূর্বে অশিষ্টতা দেখা যায়। শ্বেতকায়দিগের গর্ব ও ঔদ্ধত্য দীর্ঘকাল হইতে তাহাদিগকে যে পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহাই পতনের ও বিনাশের পথ। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমান সমৃদ্ধি ভারতীয়দিগের দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছে, তাহা একদিন ইংরেজও অসভ্য বলিয়া বুয়ারদিগের সহিত যুদ্ধের অন্যতম কারণে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে—দক্ষিণ আফ্রিকাতে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়া ইংরেজ বলিয়াছিল—স্বায়ত্ত-শাসনশীল হেম, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও—তাহার শাসননীতিতে হস্তক্ষেপ করা যায় না। ভারতীয়দিগের প্রতি সেই ব্যবহারের প্রতিবাদে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তখনই তিনি বাঙ্গালার নীলকরদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবলম্বিত অহিংস প্রতিরোধনীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ আর ভারত ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নহে; কিন্তু ভারত সরকার কমনওয়েলথের মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে পারেন নাই। ভারত সরকার কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে যে ভাবে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে আগ্রহশীল, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের দুঃখ-দুর্দশায় কেন যে সেই ভাবে আগ্রহ দেখাইতেছেন না, তাহা বলা যায় না। ভারত সরকার কি স্বীকার করেন না—"নিগৃণ স্বজন ভ্রেয়ঃ—পর পর সদা"? দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে ভারত সরকারের কাজ বিস্ময়কর।

বৃটিশ প্রচেষ্টা—

গল্প আছে, মহারাজা রণজিৎ সিংহ ভারতের মানচিত্র দেখিয়া রক্ত-রঞ্জিত অংশগুলি ইংরেজের অধিকৃত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "সব লাল হো যায়েগা"—আজ য়ুরোপের ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা তেমনই দেখিতেছেন, "সব লাল হো যাতা"—সর্বত্র কম্যুনিষ্ট-ভীতি। সেই জন্য বৃটিশ গায়েনার মন্ত্রিমণ্ডল কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত মনে করিয়া বৃটিশ সরকার তথায় মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গিয়া দিয়া (২২শে আশ্বিন) গভর্ণর সার আলফ্রেড ক্রাসেল্‌ককে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়া—সঙ্কটকালীন অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। দেশের লোক যদি সত্য সত্যই কম্যুনিজম ভক্ত হয়, তবে বাহুবলে তাহাদিগকে রাজভক্ত রাখা যে অসম্ভব তাহা নানা দেশেই দেখা গিয়াছে। বিশেষ দেশের লোককে গণতন্ত্রানুগ বা গণতন্ত্র মুখী। ক্ষমতা দিয়া তাহা হরণ করিয়া বৈধ শাসন পরিষদ মনের ফল কি হয়, তাহা ফ্রান্সের আমরা

প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহার কি কারণে আমেরিকা হারাইয়াছিল এবং পরে আয়ার্লণ্ড ও ভারত হারাইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যে শাসন পরমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তাহা বিদেশীরই হউক আর স্বদেশীরই হউক তাহার ভিত্তি দুর্ব্বল এবং তাহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। বৃটিশ পার্লেমেণ্ট পরবর্ত্ত ঘোষণা করিয়াছেন, অল্পকাল পরামর্শদিগকে লইয়া শাসন কার্য্য পরিচালনের পরে তিনি নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করিবেন এবং তাহাতে পার্লেমেণ্টের অধিবাসী প্রহণ করা হইবে। কিন্তু দেশের জনমত কি, তাহা তিনি বলেন নাই। পরমতের সমর্থনপুষ্ট শাসন কখন স্থায়ী হয় না।

পাকিস্তান—

ভারত সরকারের ঘোষণা নীতি অব্যাহত থাকিলেও পাকিস্তানের সহিত ভারতের সম্প্রীতি ঘটিতেছে না। ঐ ঘোষণা নীতির ফলেই হয়ত তাহা ঘটিতেছে না। করাচী-চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হইয়াছে। সে জন্য কে দায়ী, তাহার আলোচনা করিতে পাকিস্তান অসম্মত। বাণিজ্য-চুক্তি ভারতের পক্ষে সন্তোষজনক হইতেছে না। অথচ উভয় দেশের পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিবার কারণ সুপ্রকাশ। মিষ্টার লিয়াকৎ আলীর পরাজয়ে যে সমস্যার সমাধান হয় নাই, তাহা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি। তবে কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ব্যতীত কোন সমস্যারই স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। আবার পাকিস্তানে কোন কোন রাজনীতিক—"ভাঙ্গি তবু মচকাই না" নীতির অনুসরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে ভিয়ানের ভয় দেখান। ধমকি দিতেছেন। বাণিজ্য-চুক্তির আবার পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় সমস্যার মূলে সমাধান হইতেছে না। কেন-বিচ্ছেদের পূর্ব্বে যে লোকের যে প্রাপ্য পাকিস্তানের তাহা আদায় হইতেছে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুরা সাধারণ নাগরিকের অধিকার লাভ করিতেছেন না। পূর্ব্ব পাকিস্তানেও আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক নহে—বরং পীড়াদায়ক। মূলা মূল্য, বোধ হয়, তাহার প্রধান কারণ। কাশ্মীর সম্বন্ধে শেখ আবদুল্লার ব্যাপার ধামা চাপা পড়িলেও তাহাতে পাকিস্তানের মনোভাবের পরিচয় যে পাওয়া যায় নাই, তাহাও নহে। তাহার প্রতিক্রিয়া ভারত সরকারের উপর কিরূপ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই—শুধু নেহরুলাল তাহা কাশ্মীরের "পারিবারিক ব্যাপার" বলিয়া চাপা দিয়াছেন। কিন্তু "মনের কথা মনই জানে।"

কোরিয়া—

কোরিয়ায় এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ভারত হইতে প্রেরিত সৈনিকরা বিপদ-সম্ভাবনার সম্মুখীন অবস্থায় তথায় রহিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তথায় সৈনিক প্রেরণ সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, সাধারণতঃ যুদ্ধ করিবার জন্য সেনাদল প্রেরণ করা হয়; ভারতীয় সেনাদল কোরিয়ায় যুদ্ধ করিতে প্রেরিত হয় নাই—তাহারা ভারতীয় পতাকা লইয়া গিয়াছে, সে পতাকা শান্তির ও সদ্ভীতির প্রতীক। তাঁহার কথা, যুদ্ধের সময় বিবদমান দেশসমূহ নিরপেক্ষ মধ্যস্থের প্রয়োজনে ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিল, ইহাতে ভারতের প্রতি তাহাদিগের আস্থাই সপ্রকাশ হইয়াছিল। কাজেই ভারত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে দ্বিধাভূভব করে নাই এবং তাহার দায়িত্ব সে পালন করিবেই। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে সদ্ফলাভের আশায় জওহরলাল যেন যিশু খৃষ্টের সেই উপদেশ বিস্মৃত না হন—

যাহারা তোমাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করে, তাহাদিগের নগর ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং—"Whosoever shall not receive you nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under you feet for a testimony against them."

কোরিয়ার ব্যাপারে জড়িত হইয়া ভারত সরকারকে কত টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে ও হইবে, তাহার হিসাব পাইলে এ দেশের লোক—জওহরলালের আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি ক্রয়ের জন্য ভারতকে কি মূল্য দিতে হইল, তাহা বুঝিতে পারিবে। শেষে সে খ্যাতি মৃগতৃষ্ণিকা না হয়।

ব্রহ্ম, শ্যামদেশ ও মিশর—

ব্রহ্ম এখনও অশান্তির-কেন্দ্র। যে সরকারকে ভারত ব্রহ্ম সরকার বলিয়া স্বীকার করে, সে সরকার এখনও তথায় শান্তি স্থাপিত করিতে সমর্থ হন নাই। তাহা দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক কি সে সরকার দেশের জনগণের সমর্থনে বঞ্চিত, তাহা বিবেচনার বিষয়।

শ্যামদেশে আপাততঃ অশান্তির কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না। যদি তথায় রাজতন্ত্রীরা সত্য সত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া থাকে, তবে তথায় বহু সমস্যার সমাধান ও দেশের উন্নতি সাধিত হইবে, এ আশা অবশ্যই করিতে পারা যায়; কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, গণ আন্দোলন কোটরস্থ বহ্নির মত শাসনতন্ত্র নষ্ট করে—সহসা তাহার বিকাশ লক্ষ্য করা যায় না।

মিশরেও আপাততঃ শান্তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পলায়িত রাজার ত্যক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা হইতেছে—বিক্রয়লব্ধ অর্থ দেশের হইবে; পলায়িত রাজার অনুরাগীদিগের দিকে নূতন সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। সুয়েজ-সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। সে সমস্যার অন্তরে কিরূপ রাজনীতিকরা ইন্ধন যোগাইতেছেন, ইহাই মিশরে অনেকের বিশ্বাস।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৬০

নিরুদ্দেশ

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রত্যূষে নিতাই বলাই মুন্সী পুনি প্রভৃতি সকলে চণ্ডীতলা পরিষ্কার করিয়া, লেপিয়া পুঁছিয়া সুন্দর করিয়া তুলিল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গোপাল আসিয়া যাহা প্রয়োজন সমস্ত গোছাইয়া লইয়া সংকল্পবাক্য পাঠ করিলেন এবং ৺শ্রীশ্রীচণ্ডীর উদ্দেশ্যে ভক্তি ভরে প্রণাম করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—কিছুক্ষণ পরে শালবনের পিছনে রক্তিম নির্ম্মেঘ আকাশ নবোদিত সূর্য্যের আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অদূরের শালবন, মাঠ, প্রান্তর রক্তিম আলোকে ঝলমল করিতেছে। একে একে গ্রামের দুই একজন আসিয়া চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিল—বাগ্দী বাউরী পাড়ার গৃহবধূগণ বসন্তসায়র হইতে ফিরিবার পথে চণ্ডীতলায় প্রণাম করিয়া গেল—

ধীরে রৌদ্র প্রখরতর হইল—পথের কাঁকর বালি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—গোপালের এক রূপ চণ্ডীপাঠ শেষ হইল,—তিনি ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—শশী বাউরী অদূরে বসিয়া আছে,—সেও মা চণ্ডীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। আরও দুই একজন অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ বসিয়াছিল কিন্তু তথাকথিত ভদ্রলোক কেহ বিশেষ নাই। তিলি তামুলীপাড়ায় দুই একজন আসিয়া গিয়াছে মাত্র। ছোটলোক পাড়ায় একটি তরুণ যুবক পাচনী হাতে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—শশী জেঠা, এ যে বড় রোদ ছুটে গেলেন বটে!

শশী কহিল—তা যাক্, বৃষ্টি হবেক যে হবেক—ভগমান কি বাবুনের কথা শুনবেক নাই রে! তা কি হয় বটে! গোপাল পুনরায় চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন—পিছনের ওই তরুণটির অবিশ্বাসের কথা তাহার কানে না গিয়াছিল এমন নয়; তথাপি তিনি পাঠ করিয়া চলিলেন—কিন্তু মনটা খারাপ, বিমনা হইয়া যাইতে লাগিল। বহুদিন পূর্ব্বে একদিন মতি ঠাকুরের সঙ্গে এই চণ্ডীতলায়ই তিনি চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন, সেদিন চারিপাশে গ্রামের কতলোক ভক্তিভরে আকুল আগ্রহে এখানে বসিয়া ছিল, তাহারা কত আগ্রহে মায়ের চরণে মাথা খুঁড়িয়াছে কিন্তু আজ এই অবিশ্বাস ও একেক প্রার্থনায় কি দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন? বার বার তাহার মন বিমনা হইয়া যাইতেছে এই বিচ্ছিন্ন মনোযোগসহ চণ্ডীপাঠেই বা কি হইবে! গোপাল একবার রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুদূরদিগন্তের পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, তবুও একান্ত কর্ত্তব্য ও সংকল্প হিসাবে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু বার বার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিতে লাগিল। বার বার মনে মনে বলিলেন—মা আজ যদি তুমি প্রার্থনা পূর্ণ না কর, তবে তোমার মহিমা যে এই পাপময় পৃথিবীতে লোপ পাইয়া যায়? তোমার যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, আমার কর্ত্তব্য আমি করিতেছি—

বিচ্ছিন্ন মনকে সংযত করিয়া তিনি পুনরায় চণ্ডীর আখ্যানভাগে মনঃসংযোগ করিলেন এবং ঐকান্তিকতার সঙ্গে বার বার উচ্চারণ করিলেন—দেহি দেহি ননস্বতে।

শশধর প্রায় দেড় প্রহর বেলায় একবার ঘুরিয়া গেলেন,—বিষণ্ণমনে। তাহার সঙ্গে একটা বৃহৎ সিধাও আসিয়াছিল। চণ্ডী পাঠরত গোপালকে কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তিনি একবার মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন, তাহার পর এক অধ্যায় পাঠ শুনিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।—

ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইল—আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই—কয়েকখানি তুলোমেঘ মাত্র আকাশের বুকে ঝুলিয়া আছে। চারিদিকে প্রখর রৌদ্র—ছায়া শীতল চণ্ডীতলাকেও উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে—

গোপালের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, একাকী চণ্ডীপাঠ করিতে করিতে তৃষ্ণার্ত্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন—

ক্রমে অপরাহ্ণ—তাহার পর বেলা পড়িতে লাগিল।

গোপাল একান্ত নৈরাশ্য ও বেদনার সঙ্গে চণ্ডীপাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন—কিন্তু কেন যেন চোখ দুইটি বার বার অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—তিনি কি পারিবেন? মতি ঠাকুরের যে সাধনা ছিল তাহার ত তা নাই—মনটা কিছুতেই সংযত হয় না—

শশী বাউরী অকস্মাৎ লাঠিতে ভর দিয়া উবু হইয়া প্রণাম

করিতে করিতে তারস্বরে কহিল—মা চণ্ডী, মোদের কথা শুনবেক রে—মা শুনবেক—মা মা—

উপস্থিত সকলে আশ্চর্য্য হইয়া তাড়াতাড়ি সকলের চারিপাশে তাকাইতে লাগিল কিন্তু কোথায়ও মেঘ নাই। শশী উঠিয়া কহিল—ইশানে মেঘ উঠ্‌লেক রে, ভেসে যাবেক সব ভেসে যাবেক—ছাতা আনা করা কেনে, মোদের ঠাকুর ভিজে যাবেক—

কয়েকজন শশীর প্রলাপ বচনে হাসিয়া উঠিল। একজন কহিল—ইশানে মেঘ আসবেক, ত ছাতা আনা করাবেক—

কিছুক্ষণ বাদেই অকস্মাৎ দেখা গেল ইশানের ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ বায়ুচালিত হইয়া আকাশের অর্দ্ধেক ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে ঘন কালো মেঘ ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া পাতুর হইয়া গেল—প্রবল বায়ু রাস্তার ধূলি উড়াইয়া দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া দিল—তাহার পর আসিল বর্ষণ—প্রবল, ক্রমে প্রবলতর—

উপস্থিত জনগণ শশীর কথায় মা চণ্ডীর জয়ধ্বনি করিল। কে একজন ছাতা আনিয়া দিলে গোপাল কোনমতে পুঁথি রক্ষা করিয়া তাহার সংকল্পিত পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবিশ্বাসীর দল বার বার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বর্ষণ থামিল—মাঠঘাট প্লাবিত হইয়া জল কাদোড়ে নামিতেছে। আর চাষ আবাদের ভয় নাই—কয়েকদিনে বহু জমি পোতা হইয়া যাইবে। সাধারণে গোপালের ধন্য ধন্য করিল—ব্রাহ্মণের মুখে এখনও আগুন জ্বলে একথাটা যেন পুনরায় প্রমাণিত হইয়া গেল।

পশ্চিমের ছেঁড়া কালো মেঘের ফাঁকে অস্তায়মান সূর্য্যের রক্তরশ্মি চণ্ডীতলার ভিজা ঘাসের উপর পড়িয়া ঝলমল করিতে লাগিল—গ্রামের অনেকেই সিধাহস্তে চণ্ডীতলায় আসিয়া মাতা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া গেল—

সন্ধ্যার পূর্ব্বে চাদমোহন চটি পায়ে, ছড়ি হাতে করিয়া আসিলেন—চণ্ডীতলায় লোকসমাগম লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই আসিলেন—তখনও গোপাল চণ্ডীপাঠ করিতেছেন।

চাদমোহন উপস্থিত লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লোকসমাগমের কারণটা জানিয়া লইলেন এবং অদূরে দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে চণ্ডীপাঠ শুনিতে লাগিলেন—

তখন সূর্য্যাস্তের পরে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, গোপালেরও চণ্ডীপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি সিধাগুলি নিবেদন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভিজা কাপড়ে থাকিয়া উপবাসী গোপালের জীর্ণ শরীর শীতার্ত্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিয়াছে—

চাদমোহন আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—ঠাকুরমশায় চণ্ডীপাঠ করলেন বুঝি—কেন?

—অনাবৃষ্টির জন্যে কৃষি হচ্ছিল না, তাই উদয়াস্ত চণ্ডীপাঠের সংকল্প করেছিলাম—

—চণ্ডীপাঠের জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তা হ'লে—কি বলেন?

গোপাল ঠিক বুঝিলেন না, চাদমোহন কি বলিতে চায়। তাই তিনি নীরব রহিলেন। চাদমোহন পুনরায় কহিলেন—আপনার জন্যেই বৃষ্টিটা হ'ল তাহ'লে—

গোপাল কহিলেন—না না, আমার সাধ্য কি? মায়ের কাছে সকলে প্রার্থনা করেছে, তাই তিনি দয়া করেছেন—

চাদমোহন হাসিয়া কহিল—তা কিন্তু নয় ঠাকুরমশায়, বৃষ্টি আজ হ'ত কারণ নৈসর্গিক কারণগুলি আজ অনুকূল। চণ্ডীপাঠের সঙ্গে বৃষ্টির কোন যোগাযোগ নাই। চাদমোহন মূঢ় ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিলেন।

গোপাল কহিলেন—হ'ত সে ত ভাল কথাই, লাভের মধ্যে ভগবানের নাম হ'ল—সেই আনন্দ—সেটাই ত ভাগ্য!

চাদমোহন পুনরায় কহিলেন—হ্যাঁ ভাগ্য বই কি, তাই সিধে জুটেছে মন্দ নয় দেখছি—

গোপাল অপরাধীর মত কহিলেন—আমি সিধে আনতে বলিনি—লোকে স্বেচ্ছায় এনে দিয়েছে—

—হ্যাঁ, সংস্কার ওদের মজ্জাগত—ওরা ত আনবেই—

গোপাল কহিলেন—থাক্ ওসব কথা, পরে হবে। বড় ক্লান্ত, আজ আসি—

গোপাল যাইবার উদ্যোগ করিলেন, কয়েকজন সিধার চাল প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া তাহার সঙ্গে গেল। চাদমোহন ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাড়ীর দিকে ফিরিলেন—দেশের অশিক্ষা ও সংস্কারান্ধ সমাজ দেখিয়া সম্ভবতঃ বেদনাবোধ করিলেন।

শশধর কাছারী বাড়ীতে বসিয়াছিলেন,—সরকার তিন্থ খাসজমির চাষ-আবাদের হিসাব লিখিতেছিল। পেয়াদা কালী বাগ্দী গোপাল ঠাকুরকে ডাকিয়া আনিল। গোপাল

আসিতেই শশধর কহিলেন—পরশু পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণ তা মনে আছে ত ঠাকুরমশায় ? ফর্দ্দটা করে দিয়ে যান্—

উভয়ে বসিয়া সত্যনারায়ণ পূজার ফর্দ্দ করিতেছিলেন। ভিন্থ কহিল—তা হলে বড়কর্ত্তা একবার মাঠটা ঘুরে আসি, কে কি করছে—

—হ্যাঁ দেখে এসো। আলগুলো ঠিক ঠিক বাঁধা হ'য়েছে কিনা নজর রেখো—এই জলে অন্ততঃ অর্দ্ধেক জমি ওঠা চাইই—

ভিন্থ চলিয়া গেল।

সত্যনারায়ণের ফর্দ্দ সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় চাঁদমোহন কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল—দাদা আমি আর কতদিন ব'সে থাক্‌বো ?

শশধর কহিলেন—এখন হয় না, বরং আশ্বিনে কিছু হতে পারে।

—তাই বলে বাড়ী আরম্ভ করে বন্ধ ক'রবো ? ধান না হয় বিক্রি করে দাও—খাজনা আদায় করতে দেবে না, ধান বিক্রি করতে দেবে না—তাহ'লে আমি যাই কোথা—

—এই চাষের সময় খাজনা চাওয়াই চলে না, বরং তাদের দিতে হবে—টাকা, ধান, চাল। নইলে জমি উঠ্‌বে না। আর সুদৃঢ়ভাবে চাষ হ'য়ে গেলে তবে ধান বিক্রি হ'তে পারে। তা নইলে বিক্রি হবে না—তাতে গ্রামের লোক মারা যাবে।

চাঁদমোহন দৃঢ়স্বরে কহিলেন—কিন্তু টাকা আমার চাইই, বাড়ীর ছাদটা দিলেই হয় এখন থামতে পারবো না—

—বাড়ীটা ছ'মাস পরে সম্পূর্ণ হ'লে ক্ষতি কি ? তুমি চাষ-আবাদ এসব ব্যাপার বুঝ্‌তে পারো না, কাজেই বুঝ্‌বে না—

চাঁদমোহন কহিলেন—বুঝি আমি সবই। কারণ বিনা কার্য্য হয় না। আমার চেয়ে তোমার দরদ বেশী হল ছোট-লোকদের প্রতি—

—তা নয়, ওরা আছে তাই জমিদারী, নইলে ধানই বল টাকাই বল কিছুই আস্‌তো না। তাদের বাঁচাতে হবে ত ? যদি চাষ ভাল না হয় তবে কি করে তারা বেঁচে থাক্‌বে বল ?

চাঁদমোহন এবার শেষ অস্ত্র ছাড়িলেন—কিন্তু আমার ভাগটাও কি আমি বিক্রি করতে পারবো না ?

শশধর উত্তেজিত হইয়াছিলেন, সে কেবল নিজে কি পাইতেছে—কি দরকার তাহাই ভাবিতেছে, অন্য কাহারও দিকে এতটুকু তাকাইতে শিখে নাই। তাই শশধর দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন—না তোমার ভাগের ধানও এখন বিক্রয় করা হবে না। যদি ইচ্ছে কর পূজার সময় এসে ভাগ করে নিও—সমস্ত সম্পত্তি ভাগ করে নিও,তাতেও আপত্তি নেই।

—আমার ন্যায্য ভাগও আমি পাব না ?

—নিশ্চয়ই পাবে কিন্তু এখন নয়।

—আমি চাই—আমি বিক্রয় করবো—

শশধর কহিলেন—আমি দেব না। তোমার ক্ষমতা থাকে তুমি ধান বিক্রি করে নিয়ে যাও।

চাঁদমোহন কহিলেন—বেশ তাই হবে—

চাঁদমোহন উঠিয়া যাইতেছিলেন। গোপাল কহিলেন—বসো চাঁদমোহন, জিনিষটা বুঝে দেখ। ওই ধানের মধ্যে তোমাদেরই হাজার হাজার প্রজার জীবন রয়েছে, সেটা কি এমনি সময়ে ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত। যদি আবাদ না হয় তবে সকলে কি করে বেঁচে থাক্‌বে—বুঝে দেখ—

চাঁদমোহন ব্যঙ্গের সুরে কহিলেন—আমি অত্যন্ত কম বুঝি এটাই বা আপনি ধারণা করছেন কেন ?

গোপাল কহিলেন—তুমি বোঝ বই কি ? তবে গ্রামে ত থাকো না, গ্রামের এই সব ব্যাপার ত ঠিক তোমার জানা নেই—তাই বলি—

চাঁদমোহন কহিলেন—থাক্ থাক্, আমি হিতোপদেশ চাই না। যাকে দিচ্ছেন তাকেই দিন—পূজোর ফর্দ্দগুলো বেশ মোটা মোটা করে ধরুন, তাতেই সুসার হবে—

গোপাল ধৈর্য্য হারাইয়াছিলেন তিনি কহিলেন—তুমি সবই বুঝে ফেলেছ—এ অহমিকা থাকাও ত ভাল কথা নয় চাঁদমোহন। তোমরা এ শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছ জানি না—তবে এত মঙ্গলের লক্ষণ নয়—

চাঁদমোহন কটু কটাক্ষে গোপালের দিকে চাহিয়া কহিলেন—বিদ্যার অহমিকা যদিও সহ্য করা যায়, অজ্ঞতার অহমিকা অসহ্য। আপনি কেন আমাদের কথায় কথা বলেন, বলুন ত ?

শশধরের দিকে ফিরিয়া চাঁদমোহন কহিল—আমি আজ চলে যাচ্ছি, পূজার সময়ই আস্‌বো এবং আমার সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থেকো—

শশধর কোন জবাব দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া

রহিলেন। চাঁদমোহন উঠিয়া গিয়া ডাকিলেন—কালী এখুনি গাড়ী তৈরী কর, আমি এখুনি যাবো—

চাঁদমোহন উল্লাসহকারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন—

শশধর ও গোপাল জানিতেন—আত্মকেন্দ্রিক বর্ত্তমান ভোগগত শিক্ষা তাহাদের একান্নবর্ত্তী বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সংসার ও সমাজকে খান্ খান্ করিয়া দিবে। চাঁদমোহন সম্পত্তির ভাগ চাহিয়াছে সহরে বসবাসের জন্যে, হরিহরও চাহিয়াছে, এমনি করিয়া সকলেই সহরে যাইবে—পড়িয়া থাকিবে যত দুর্গত অশিক্ষিত লোক এই ভগ্ন জীর্ণ পল্লীর অস্বাস্থ্য ও অজন্মার মাঝে। তাই তাহারা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তিলি, তাঁতি ও তাম্বুলী পাড়ায় পরিত্যক্ত বাড়ী দুই একখানি বন্যজন্তুর আবাসস্থল হইয়াছে—চারিপাশে চুরি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা চলিতেছে। সততা, বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া মানুষ কেবল ধন-সম্পদের পূজা আরম্ভ করিয়াছে—গোপালের শিক্ষা উপদেশ, ভগবতীর ত্যাগ সেবা এ প্লাবনের পথরোধ করিতে পারে নাই, গোপাল ভাবিয়া ভাবিয়া বিষণ্ণ হন মাত্র এবং নিরুপায়ের মত দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—

তিনু নিতাই এর উপর আদেশ দিয়াছিল যে সে খাসজমি চাষ করিতে পারিবে না। চাঁদমোহন এই আদেশ দিয়াছিলেন—সকলে ভাবিয়াছিল ওটা হুমকি মাত্র, কিন্তু চৈত্রের শেষে তিনু এই আদেশ জানাইয়াছে। অবাধ্য প্রজার মধ্যে আরও অনেকের সঙ্গে নিতাই ও তাহার ভগ্নিপতি মথুরও আছে। খাস জমি ছাড়িয়া দিলে নিতাই এর চলিবার দুইবিঘা—তাহা চাষ করিয়া এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া গ্রামে থাকা চলে না। নিতাই এই সব লইয়া বহুচিন্তা করিয়াছে কিন্তু পরিশেষে ঠিক করিয়াছে, জমি চাষ করিয়া রাখিয়া খাদে যাইবে। মথুরও অনুরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল।

ভরত আর আদুরী মিলিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে গাইতে চালাইয়া ও পাথর কুড়াইয়া যে দু'বিঘা জমি উঠাইয়াছিল,সে দু'বিঘা জমি আজও সোনার ফসল দিতেছে। শ্রাবণের প্রথম বর্ষণে দেখিতে দেখিতে জমি চাষ করিয়া নিতাই ও সুমী জমি পুঁতিয়া দিয়াছে। এখন পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া দুইচার আনা যাহা হয় তাহাতেই দিন চলে। ঘরের ধান ফুরাইয়াছে'। চারিপাশে আবাদও শেষ হইয়া আসিল—কেহ মনিষ' চাহে না। সংসার অচল হইয়া আসিলে নিতাই গরু বিক্রয় করিল, এমনি করিয়া আশ্বিন আসিল—তখন সংসার একান্তই অচল—

আদুরী ও-ভরত যেমন করিয়া একদিন গৃহ ফেলিয়া খাদে গিয়াছিল তেমনি করিয়া একদিন প্রভাতে সুমী ও নিতাই গৃহ ও গ্রাম ছাড়িয়া ভাদুলিয়া কলিয়ারীতে চলিয়া গেল। পাড়ার নবীন বুড়া লাঠি হাতে করিয়া দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া ছিল অশ্রু চোখে। সে যাইবার সময় বলিল—আবার অঘাণে আসবেক একটা ব্যবস্থা বড়কর্ত্তা করবেক। ভয় কি! আসবি—

নিতাই হাঁ বলিয়া প্রস্থান করিল—

ওদিক মথুর ও সরোজিনীও এমনি করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া ভাদুড়িয়া কলিয়ারীতে উপস্থিত হইল।

এখানে স্বামী-স্ত্রীতে যে রোজা পাওয়া যায় তাহাতে খাদ্য, বস্ত্র ও নেশাটা কোনমতে চলে—

ভাদুলিয়া কোলিয়ারীর ধাওড়া—জানালাহীন অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘর পিছনে একটু ঘুলঘুলি—গৃহ অন্ধকার। বারান্দায় রান্না করা যায়—গ্রীষ্মে বাহিরেই শোয়া চলে, শীতে কেবল ঘরে আসিতে হয়—

সকাল ৬টায় নিতাই আর সুমী খাদে নামে, এগারটায় উঠিয়া আসে—আবার ২২টায় নামে ৬টায় উঠিয়া আসে। তখন দিনের আলো নিষ্প্রভ—পৃথিবীর উপরের মাঠ ঘাট বন যখন রৌদ্রে ঝলমল করে তখন তারা ভূগর্ভের নিবিড় তিমিরের মধ্যে গাঁইতি চালায়, সুমী কয়লা বহন করিয়া টব বোঝাই করে। নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন ছোট ছোট মিশকালো কয়লার গলির মাঝে সেফটি ল্যাম্পের আলোয় তাহারা কাজ করে—সন্ধ্যায় আসিয়া খাঁধিয়া খায়, সন্ধ্যার পরে ক্লান্তদেহে নিদ্রা যায়। এমনি করিয়া দিন যায় রাত্রি আসে—কলের মত নিয়মিত জীবন! ঘণ্টা ও বাঁশীর সঙ্গে জীবন বাঁধা—গ্রামের উদার স্বাধীনতা নাই। সে মুক্ত বাতাস নাই, চারিপাশের নয়নাভিরাম সবুজাভা নাই—কয়লার কালি, ধূলা, ধূম দিকমণ্ডল মলিন করিয়া রাখে—সে মালিন্য আসিয়া জমে মানুষের অন্তরে, কালিমা লেপন

করে বসে, দেহে, অন্তরে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগত পশুত্ব সমাজশীল অপরিচয়ের সুযোগে এবং ধনলিপ্সার কালিমার মাঝে জাগ্রত হইয়া উঠে—ভূগর্ভে নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখে সে পশুত্ব। গ্রামের সরল সুন্দর লোকগুলিকে টানিয়া আনিয়া তিমিরাচ্ছন্ন পশুত্বের গর্ভে নামাইয়া দেয় এই যন্ত্রদানব—তাহারা ভাসিয়া যায় নিরুপায়ের মত, সে কারাগার হইতে বাহির হইবার উপায় থাকে না। মানুষের হৃদ্ বুভুক্ষা, পশুত্ব জাগিয়া উঠে অকস্মাৎ উদ্দাম শক্তি লইয়া।

সেদিন শনিবার নিতাই ও সুমী ছুটা পাইয়াছিল—ধাওড়ায় ফিরিবার পথের অদূরে পচুইএর দোকান। বহু সহকর্মী তেলে ভাজা ও পচুইএর হাড়ি সামনে করিয়া ইতিমধ্যেই জমিয়া গিয়াছে। সারা সপ্তাহের ক্লান্তির পর নিতাইএর কাল ছুটি—সে প্রলুব্ধ হইয়াছে, একদিন একটু আনন্দ না করিলে বাঁচিবে কি করিয়া। নিতাই কহিল—সুমী তু ঘরকে যা, রস খাওয়া করে নু যাবেক—

সুমী তাহার হাত ধরিয়া কহিল—তু কেনে যাবি—রস খেলে ভাল হবেক নাই—মাতাল হবে বটে! গাকে কেমনে যাবি?

গ্রামের প্রসঙ্গে নিতাইএর অন্তর অভিমানে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল—গাঁয়ে যাবেক? হুঁ···, কোন গাঁয়ে? ছোটবাবুর ও পচা গাঁয়ে নু যাবেক নাই—যা তু ঘরকে, রাঁধা কর—নিতাই হেঁচকা টানে হাত ছাড়াইয়া লইয়া দোকানের উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল। সুমী অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে ধাওড়ায় ফিরিয়া আসিল।

নিতাই ভরপেট পাচুই ও তেলেভাজা গিলিয়া, সুমীর জন্যে আধসেরটাক পাচুই লইয়া যখন ফিরিল তখন রাত্রি হইয়াছে। অভিমানে নিতাই ভাসিয়াছে—ভাসিয়া যাইবে—

সুমীর শাকান্ন রাঁধা হইয়া গিয়াছিল, সে একটা ছেঁড়া খেজুরের পাতার তালাই বা পাটিতে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়া শুইয়াছিল। নিতাই মত্ত, দ্রবাগুণে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ধাওড়ায় আসিয়া ডাকিল—সুমী—সুমী—

সুমী শুইয়াই কহিল—ডাকছিস্ কেনে—

—রাঁধা হল বটে!

—হাঁ।

—তবে, লে মালটো খাওয়া কর—একসঙ্গে ভাত খাবেক—

—মাল নু খাবেক নাই—

—কেনে—তু খা। শরীরটা ত বেদনা বটে! কয়লা টানা ক'রলেক না কত? ব্যথা ন'রবেক—

সুমী খাইতে ইচ্ছুক ছিল না কিন্তু সারা সপ্তাহ কয়লা টানিয়া টানিয়া শরীরটা বেদনা হইয়াছে। নিতাইএর অনুরোধে অবশেষে সে পুচইটুকু পান করিল।

আহারান্তে উভয়ে তামাক সাজিয়া লইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিল—মত্ত অবস্থায় নিতাই বলিয়া যাইতেছিল—গাকে আর মোরা যাবেক নাই—হোথা কি আছে বল কেনে? পেটভাত হবেক নাই—বারো দুয়ারে মনিষগাটা করে কুকুরের মত আর বাঁচবেক নাই—হেথাই কাটাবেক—

সুমী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—কুটুম, আত্মীয় সব ছাড়া করবেক? হেথা তোর কোন কুটুম আছে?

নিতাই হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—অনেকক্ষণ আপন মনে হাসিয়া কহিল—বড় কুটুম হেথা রে সুমী, বড় কুটুম রইছেন?

—কে বটে?

—টাকা, টাকা,—টাকা! এ কুটুম ছাড়া ক'রে বড় কুটুম ছোটবাবুর গায়ে যাবেক কেনে? শিবু নিতাই মাছ চুরি ক'রলেক, তারই খালনা দিলেক—তাদের খাস জমি বাড়তি দিলেক। নু চুরি করবেক নাই, ধরম খোয়াবেক নাই তাই—জমি ছাড় করালেক। লে—লে—ধরম কেনে তবে? বল সুমী বল—ধরম কেনে তবে? ও গায়ে নু যাবেক নাই—টাকাই ত ধরম বটে—নিতাই পুনরায় হাসিল।

সুমীর নেশা লাগিয়াছিল, সে অতটা কিছু এখন বুঝিতে পারিল না, সেও নিতাইএর দেখাদেখি হাসিল। কহিল—টাকাই ত ধরম বটে—ধরম বটে—

পচুইএর উগ্রতার মাঝে ধাওড়ার বারান্দায় শুইয়া তাহারা শনিবারের দুর্লভ রাত্রি কাটাইয়া দিল—

সুমীর বর্ণ নিকস কালো, কিন্তু দেহটা তাহার ক্ষীণ ও মজবুত। এখানে যাহারা কাজ করে তাহাদের দেহের লালিত্য ও কমনীয়তা বহুদিন পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু গ্রামের উদার মাঠ, মুক্ত বায়ু, সবুজ গাছের দেওয়া স্বাভাবিক কমনীয়তাটুকু সুমীকে তখনও লোভনীয় করিয়া রাখিয়াছে—

বয়স তাহার আঠার উনিশ, সন্তান হয় নাই, কচু সরল ক্ষীণ চঞ্চল দেহ। চোখ দুটি টানাটানা, ক্ষীণ কটি, বিপুল নিতম্ব—এখানে কালিকামণ্ড কয়লার খাদে তাহার দেহসৌষ্ঠব লোভনীয়—তাই অনেকেই চাহিয়া দেখে। সিফ্‌টবাবু, লোডিংবাবু সকলেই চাহিয়া দেখেন—পরিচয় করেন কিন্তু সুখী তাহার সংশয়হীন অকুণ্ঠ মনে তাহার অর্থ বুঝিতে পারে না—ভাবে, তাহারা নতুন বলিয়া তাহাদের প্রতি এটা কৌতূহল মাত্র!

প্রভাতে উঠিয়া নিতাই হাটে গিয়াছে সপ্তাহের দোকান আনিতে এবং তরিতরকারী কিনিতে—সঙ্গে পাড়ার সহকর্মীরাও গিয়াছে। পূবের পুরাতন বটগাছের মাথার উপরে সূর্য উঠিয়া ঝলমল করিতেছে। সুখীর পূব-দুয়ারী খাওড়ার বারান্দায় রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। সরু গলির দুইদিকে খাওড়া—সুখী সকালে উঠিয়া গৃহ-মার্জনা, জল আনা প্রভৃতি সমাপ্ত করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—নিতাই কি সত্যই আর গ্রামে ফিরিয়া যাইবে না? এখানেই সারাজীবন কাটাইয়া দিবে—এখানে গৃহ নাই, স্বজন নাই, আপনার বলিতে কিছু নাই। এখানে কেমন করিয়া সারাজীবন কাটান যাইবে।

সামনের খাওড়ার কুলি হাটে গিয়াছে তাহার স্ত্রী বসিয়া বাসন মাজিতেছে, দুইটি ছেলেমেয়ে দিগম্বর হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওরাও কাজ করে—এখানেই রহিয়া গিয়াছে পুরুষানুক্রমে। ওই ছেলেমেয়ে দুইটিও এখানে কাজ করিবে।

সুখী হঠাৎ লক্ষ্য করিল একজনবাবু সরু গলির মধ্য দিয়া ছড়ি হাতে যাইতে যাইতে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছেন এবং তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছেন। চোখে চোখ পড়িতেই বাবু ডাকিলেন—এই শোন ত!

সুখী উঠিয়া গেল। তিনি প্রশ্ন করিলেন—তোর নাম কি?

—সুখী।

—তোর লোকের নাম কি?

—নিতাই বটে।

—কি করিস?

—খাদকে কয়লা কাটি—

—ওঃ কুলি! কতদিন এসেছিস?

—দু হপ্তা চল—

—বিকেলে আমার বাসায় যাবি—

সুখী বিস্মিত হইয়া কহিল—কেনে?

—কেনে কি? যাবি বলছি—যাবি। তার আবার কেনে কি?

সামনে যে মেয়েটি বাসন মাজিতেছিল সে উঠিয়া আসিয়া যুক্ত করে নমস্কার করিয়া কহিল—হুজুর এদিকে—

—এমনি বেড়াতে এসেছি—

মেয়েটি সুখীকে কহিল—সিফ্‌টবাবু—হুজুর—উনি বলছেন তা যাবেক নাই কেনে?

সুখী তবুও কহিল—কেনে যাবেক?—মোর মনিষ ঘরকে আসুক। শুনবেক নাই—

মেয়েটি বুঝাইয়া বলিল—বাবু কইছেন তা মনিষকে কি শুধাবেক! বড় ভাল মনিব—মন মত কাজ করবি, কত পাবি, রস খাবি, গয়না পরবি—টাকা পাবি—

সুখী তখনও ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। বাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন—যাবি, বুঝলি—আমি বিনি পয়সায় কাউকে দিয়ে কিছু করাই না—বাসনটা মেজে দিলেও আমি পয়সা দেই—বুঝলি—আর তোদের দিয়ে খাইয়েই ত আজি ফকুর—বাবু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেলেন।

সামনের খাওড়ার মেয়েটি মুচকি হাসিয়া কহিল—তোর বরাৎ খুলবেক রে, সুখী, বরাৎ খুলবেক—

সুখী বিষণ্ণভাবে পুনরায় খাওড়ায় আসিয়া বসিল—তাহার মনে ভাসিয়া উঠিতেছে হিজল বনের মাঠ, বসন্তসায়র, চণ্ডীতলার বিরাট বটগাছ—গাঙী, গ্রামের পায়েচলা পথ, —পাড়ার লোকজন, প্রতিবেশী বন্ধু—গোপাল ঠাকুর আরও কত কি। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত বসিয়া সে গোপালপুরের স্বপ্ন দেখিতেছে—কি মোহময় সেই ক্ষুদ্র গ্রাম—কি সুন্দর —অথচ একান্ত নিরুপায়ের মত তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এই শিশির ঝলমল ঘাস, শস্য-শ্যামল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, তাহার মাঝে বুক ভরিয়া নিশ্বাস লইয়া কাজ করা যায়—সেখানে কি আর ফিরিয়া যাওয়া চলে না—এই অপরিচিত হৃদয়হীন প্রতিবেশী ও কয়লার কালির মধ্যে কেমন করিয়া জীবন অতিবাহিত করা যায়—

সুমী ভাবিতে ভাবিতে ব্যথিত হইয়া উঠিল—অজ্ঞাতে চোখ দু'টি টলমল করিতে লাগিল।

নিতাই হাট করিয়া ফিরিতেছিল—সপ্তাহের দোকান খরিদ জিনিষপত্র ও তরি তরকারী। একপোয়া মাংসও সে আজ কিনিয়াছে। রবিবারের হাটে মাংস পাওয়া যায়।

কলিয়ারীর প্রান্তে ঢুকিতেই দেখে একটা ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গণে একটি মেয়ে রস পাইয়া নেশার ঘোরে কি সব বলিতেছে, আর মাঝে মাঝে গান গাহিতেছে—

মেয়েটির রং ফরসা, ক্ষীণ তন্বীদেহ, সুন্দর স্বচ্ছন্দ। বয়স কুড়ি বাইশ হয়ত হইবে কিন্তু যৌবনের গ্লানিমা দেখা যায় না। কেবল মাত্র চোখের কোনে একটা কালিমা তাহার দৈহিক অত্যাচারের কথা ঘোষণা করে। এখানে ওমনি একটি মেয়ে, ভদ্রঘরের মেয়ে কি করিয়া আসিল, কি বা করে—তাহা নিতাই ভাবিয়া পাইল না। কৌতূহলবশতঃ সাথী নগরবাসীকে প্রশ্ন করিল—উ কে নগরবাসী। এই কয়দিনে নগরবাসী বাউরীর সঙ্গে তাহার একটু ভালবাসা হইয়াছে। লোকটি ভাল, নিতাইকে ভাল-চোখেই দেখে। সে প্রায় দশবৎসর এইখানে কাজ করে। নগরবাসী কহিল—জানিস্ না? উ সুন্দরী বাউরীর বেটি। সুন্দরীর মনিষ দেখা খাদে চাপা পড়ে মারা গেলেক—সুন্দরী দারোয়ান পাড়েজির কাছে রইলেক। পাড়েজির রং ছেলো টুকটুকে—তাই ওই বেটী হলেক সুন্দরীর। ওর নামটা বট লছমী—

নিতাই প্রশ্ন করিল—খাদকে কাজ করে?

—কাজ করবেক কেনে? বাবুরা আসবেক থাবেক টাকা দেবেক—উর অভাব কি? রস খেয়ে দিবারাত্রি হল্লা করবেক—বড় সাহেব জনসন্ তিন বছর উকে রাখলেক—

কথা বলিতে বলিতে তাহারা লছমীর প্রাঙ্গণের নিকটবর্ত্তী হইল—প্রাঙ্গণের পাশ দিয়াই পথ। লছমী উঠিয়া আসিয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইল, অত্যধিক মদ্য পানে তাহার দেহ টলিতেছে। সে প্রশ্ন করিল—তু কোন বট রে?

নগরবাসী কহিল—নগরবাসী—

—তু কোন? তোকে কে বলছেক?

অর্থাৎ নিতাইকে সে প্রশ্ন করিয়াছে। নিতাই জবাব দিল—মু নিতাই বাগ্দী।

লছমী একগাল হাসিয়া কহিল—তু বাউরী নয়, বাগ্দী কুলীন বট? নতুন বট?

—হাঁ নতুন বটি—

—পাদকে কাম করিস্—

—হাঁ বটে।

—আচ্ছা জোয়ান বট! তু আয় বসবি, গান শুনবি রস খাবি, আয় তু—আয় মোর ঘরকে—

নগরবাসী যাগ করিল তাহার অর্থ এই যে নিতাইএর সুন্দর সুডৌল তরুণ দেহ দেখিয়া লছমী মজিয়াছে। সুযোগ লইলে নিতাই বিনাপয়সায় যথেষ্ট রসপান ও স্ফূর্ত্তি করিতে পারিবে।

নিতাই লছমীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল—এমন একটি দিব্যরমণী তাহাকে রসপান করিতে ডাকিতেছে সে কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করে! সে কহিল—নগরদা তু আয়—

নগরবাসী কহিল—না মু ঘরকে যাবেক—

লছমী নিতাইএর হাত ধরিয়া একখানি গান গাহিয়া শেষে কহিল—তু যা নগরবাসী ঘরকে- নিতাই আয় রস খাবি—

নগরবাসী চলিয়া গেলে, লছমীর হাতে বন্ধ অবস্থায় নিতাই বিস্মিতভাবে তাকাইতে লাগিল। লছমী কহিল—আয় তু জোয়ান বটে, রস খাবি—

নিতাই একটু ভীত ভাবে কহিল—সকালে কেনে রস খাবেক?

—বিকালে আসবি বল?

নিতাই বিহ্বল ভাবে কহিল—আসবেক—

—তবে যা—আসবি।

নিতাই ছাড়া পাইয়া চলিয়া আসিল—কিন্তু লছমীর অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ ও অকুণ্ঠ আবেদনের কাছে হৃদয়টা রাখিয়া আসিল। তাহার স্পর্শ, তাহার আহ্বান, তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিয়া দিল। এমন বিচিত্র ঘটনা তাহার জীবনে ঘটে নাই—

ধাওড়ায় ফিরিয়া দেখে সুমী বিষণ্ণ মুখে স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া আছে। নিতাই একবার তাহার দিকে ভাল করিয়া তাকাইল—লছমীর সুন্দর সুডৌল দেহের কাছে সুমীর দেহ যেন অত্যন্ত কুৎসিৎ। নিতাই কহিল—উঠ্ সুমী, রাঁধা কর—

সুমী গোপালপুরের স্বপ্ন ছাড়িয়া উনুনে আঁচ দিতে গেল—তখন বেলা ৯টা—

ক্রমশঃ

প্রাচীন ভারতের গণিত-সাধনা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন এম-এস্‌সি

১

বৈদিক যুগ

ভারতীয় গণিতের ইতিহাস ভারতীয় সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন। সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খ্রীঃ পূঃ তিন হাজার বৎসর পূর্বে যে লিপির অপূর্ব সভ্যতা ছাপমের নিদর্শন দেখিয়া আজ আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই, সে লিপির সাংকেতিক জ্ঞান সম্বন্ধেও প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কিছু কিছু কথা সাম্প্রতিককালে উদ্ধার করিয়াছেন। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ছোট বড় নানা রকমের বহু ওজন পাওয়া গিয়াছে। বর্ণকারের কষপাথরের উপযোগী অতি ক্ষুদ্র ওজন হইতে আরম্ভ করিয়া টানিয়া তুলিতে কষ্ট হয় এইরূপ বড় ও ভারী ওজনও কয়েকটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড় ওজনগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ পাথর আকারে লিখিত। ছোট ওজনগুলির আকার অনেকটা ঘোড়ের ঘুঁটি ও এলাচের মতন। এইরূপ ওজনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। একক (unit) হিসাবে মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পার যে ওজনের ব্যবহার দেখা যায় তাহা ৭-এ (gram) পর্যবসিত করিলে ইহার মান দাঁড়ায় ০·৮৫৫ গ্রাম। এ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত যে ওজন পাওয়া গিয়াছে তাহার মান ছিল ১০৬০০ গ্রাম। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা হইতে ১২৭০ গ্রাম ভারী একটি ঢিলের ওজন অথবা সংখ্যায় আধিক্যের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এই ওজনটিই সাধারণ লেনদেনের কাজে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। ইহা উপরোক্ত একক ওজনের ঠিক ১২০ গুণ। মাপ জোক ও হিসাবনিকাশের ব্যাপারে ভারতীয় পদ্ধতিতে ১২ এর প্রাধান্য সুবিদিত। হয়ত মহেঞ্জোদড়োর আমলেই এই প্রাধান্য দ্বিতীয়ত হইয়াছিল।

কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশেষও পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি দাঁড়িপাল্লার উপরের দণ্ডটি পিতলের ও পাল্লা দুইটি তাম্রার। ছালুনা ও মূলধনে দ্রব্যাদি ওজনার্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হইত। ভারী দ্রব্যাদি ওজনের জন্য সম্ভবতঃ কাষ্ঠের দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা ছিল।

৮৫২ টঙ্কি লম্বা একটি ঝোলকের বা স্কেলের মাপনী পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ম্যাকে দেখাইয়াছেন, এইরূপ মাপনীর সাহায্যে দৈর্ঘ্য মাপিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার এককের মান ০·২৬৯ ইঞ্চি। মাপনীটি আবার পাঁচটি করিয়া ভাগে (১০৭ ইঞ্চি) পর পর বিভক্ত। ইহাতে ম্যাকে অনুমান করেন, দৈর্ঘ্য ব্যাপারে সিন্ধু-উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা সম্ভবতঃ দশমিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিল। উপরোক্ত মাপনীটি সম্ভবতঃ ১০২ টঙ্কি লম্বা একটি সম্পূর্ণ মাপনীর ভগ্নাবশেষ। চতুর্থ দাদশবংশের আমল হইতে মিশরে এবং একই সময়ে এলামে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রথমে কোন একটি সভ্যতার কেন্দ্রে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়া পরে বাণিজ্যিক লেনদেন ও যোগাযোগের মাধ্যমে দশমিক পদ্ধতি অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে অবশ্য কোন প্রত্নতাত্ত্বীয় প্রমাণ নাই; তবে স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ব্যবহার আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বীয় নিদর্শন হইতে ইহার অধিক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের অমূল্য বৈদিক সাহিত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। পৃথিবীতে সভ্যতা-বিকাশের প্রথম যুগে বৈদিক ঋষিগণ অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া যে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার কোন তুলনা নাই।

বৈদিক যুগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক-চেতনার বিকাশ বিষয়ক আলোচনার পূর্বে এই যুগের প্রাচীনত্ব ও সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীর রচনা কাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব স্বীকারে কুণ্ঠাবোধবশতঃ একদল পাশ্চাত্য পণ্ডিত যেমন বৈদিক কালকে ক্রমশঃ খ্রীষ্টীয় শতকের কাছাকাছি আগাইয়া আনিবার জন্য উদ্বিগ্ন, সেইরূপ অনেক ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সুমহান প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৈদিক যুগকে ক্রমশঃ অতীতের দিকে ঠেলিয়া এক ঐতিহাসিক অবাস্তবতার ও অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ফলে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৪০০০ অব্দের মধ্যে অসংখ্য তারিখ বৈদিক যুগের আরম্ভ হিসাবে নানা পণ্ডিতের রচনায় উল্লিখিত দেখা যায়। এমন কি যজ্ঞ-সংস্থানের জ্যোতিষীয় বিচার হইতে কেহ কেহ শুল্বসূত্রের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০০ বৎসর বলে করেন। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সিন্ধু ও মিশর প্রাচ্যের সর্বত্র তখন মধ্য-প্রস্তর যুগ চলিতেছে; পৃথিবীর কোথাও কৃষিনির্ভর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে নাই; এবং সর্বোপরি খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের আগে কোনও প্রকার আক্ষরিক লিপি আবিষ্কারের প্রত্নতাত্ত্বীয় প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-এশিয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এক আলোচনা-সভায় বৈদিক যুগের ও প্রাচীন ভারতের কাল সম্পর্কে উপরোক্ত মতান্তর ও অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ঐ সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে* এবং আরও বিশদভাবে

---

* Scientific Achievements of the Ancient Hindus: Chronological and Sociological Background'—By Dr. R. C. Majumdar; দক্ষিণ-এশিয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ; ১৯৫০।

সম্প্রতি প্রকাশিত 'The Vedic Age' গ্রন্থে বৈদিক যুগের প্রাচীনত্ব ও বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক সভ্যতার কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১০০০ অব্দ মধ্যে মনে করাই এখন সব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত। ইহা হইল বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৫০০ অব্দ। প্রাচীনতম বেদ ঋক্-সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ; এই বেদের কিছু কিছু অংশ হয়ত ইহার কয়েক শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময় হইতে ঋক্-সংহিতার রচনা অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কিছু আগে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পরবর্তী কালের রচনা (যদিও ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত ও অবধেশনারায়ণ সিংহ History of Hindu Mathematics-এ তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ লিখিয়াছেন)। সাম, যজু, অথর্ব প্রভৃতি পরবর্তীকালের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ-সাহিত্য সম্ভবতঃ রচিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে। ঋক্-সংহিতার মত ইহাদের কিছু কিছু অংশ আবার উপরোক্ত সময়ের কিছু আগে, এমন কি ঋক্-সংহিতার কালেও রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

উপনিষদের কাল-নির্ণয় সুকঠিন, কারণ ইহাতে যে সকল তথ্যের ও তত্ত্বের আলোচনা আছে তাহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তবে উপনিষদের প্রাচীনতম অংশগুলি যে প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ নবম কি অষ্টম শতাব্দীর, তাহাতে কোন সংশয় নাই। উপনিষদ্ রচনার সর্বশেষকাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অতিশয় মূল্যবান। সূত্ররূপে (খ্রীঃ পূঃ ৮০০-২০০) ইহা সঙ্কলিত হইয়াছিল। ডাঃ বসু ও সিংহ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দের উল্লেখ করিয়া বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। স্মৃতি ও পুরাণ রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে।

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধেও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও মতদ্বৈধ আছে। মহাভারতের বর্ণিত ঘটনাবলী, ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ সংঘটিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে। এই বৃত্তান্ত বহু শত বৎসর মুখে মুখে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিত হইতে আরম্ভ হয় এবং বর্তমান আকারে পৌঁছিতে এই মহাকাব্য যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত খাড়াইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। জ্যোতিষের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, ইহার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ; এখন দেখা যাইতেছে ইহার অন্ততঃ দুইশত হইতে চারিশত বৎসর পরে এই বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদির তারিখ সম্বন্ধে নানা অনিশ্চয়তা ও পরস্পর-বিরোধী নানা দাবী থাকায় এ বিষয়ে তথ্যাতিরিক্ত ঐতিহাসিক মহলের সর্বশেষ অভিমত উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনার প্রারম্ভে প্রামাণ্য গ্রন্থাদির রচনা কাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক। এইবার আমরা প্রবন্ধের মূল বিষয় অবতারণা করিব।

গণিত অর্থ গণনাবিদ্যা। বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলিতে সাধারণতঃ পাটী-গণিত ও জ্যোতিষকে বুঝিতেন; ক্ষেত্রমিতি বা রেখাগণিত (ক্ষেত্র গণিত) ছিল কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গণিত যে শ্রেষ্ঠবিদ্যা, বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আমরা একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান সর্বোচ্চ; যেমোক্ত সকল বিদ্যার ইহা শীর্ষস্থানীয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের এক জায়গায় আছে:

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।

তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্।"—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ৪।

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতের অবস্থিতি।

বৈদিক হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি দশমিক। মিশরীয়দের মত বিরাট সংখ্যাসমূহ কল্পনা করিবার ক্ষমতা হিন্দুদের এক বিশেষত্ব। হিন্দুরা বিরাট সংখ্যার নানা নামকরণ পর্যন্ত করিয়াছে। যজুর্বেদ সংহিতায় বিভিন্ন সংখ্যার আমরা এইরূপ নামকরণ পাই: এক (১), দশ (১০), শত (১০২), সহস্র (১০৩), অযুত (১০৪), নিযুত (১০৫), প্রযুত (১০৬), অর্বুদ (১০৭), ন্যর্বুদ (১০৮), সমুদ্র (১০৯), মধ্য (১০১০), অন্ত (১০১১), ও পরার্ধ (১০১২)। বিভিন্ন ও এইরূপ বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গ্রীকদের গণিতে মিরিয়াড বা ১০৪-এর উর্ধ্বে কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না; অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার দুর্বলতার জন্য বৃহৎ সংখ্যা চিরদিনই গ্রীকদের কল্পনাতীত থাকিয়া গিয়াছে।* সাধারণ ব্যবহারিক কাজে অবশ্য সহস্রের উপর সংখ্যা ব্যবহারের বেশী প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অযুত, নিযুত, প্রযুত ইত্যাদি ব্যবহারের পরিবর্তে সহস্র বা শতকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ করিবার আর একপ্রকার রীতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চাশৎ সহস্রম্ (৫০,০০০), ঘানপ্তি সহস্রাণি (৭২,০০০), ইত্যাদি।

আমরা ১০-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি মাত্রার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংখ্যার নাম দিয়াছি। ইহাদের মধ্যবর্তী নানা সংখ্যা নির্দেশ করিতে যোগ ও বিয়োগ উভয় ধারণারই ব্যবহার দেখা যায়।

---

* আর্কিমিডিস ইহার ব্যতিক্রম: "Sand Reckoner"-এ গ্রীক সংখ্যার সাহায্যে বড় সংখ্যা কিরূপে প্রকাশ করা যায় আর্কিমিডিস্ তাহা দেখান।

'একাশৎ' (১০+১), 'দ্বাবিংশতি' (২০+২) প্রভৃতি নামকরণে যোগের এবং 'একোন-বিংশতি' (২০-১), 'একোন-ত্রিংশৎ' (৩০-১) প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিয়োগের ব্যবহার অবলম্বিত হইয়াছে। 'একোন-বিংশতি' কথারই অপভ্রংশে 'ঊনবিংশতি' ও 'ঊনত্রিংশ'।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহরে ও অন্যান্য লিপিতে সংখ্যা লিখিবার যে নমুনা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলিয়া অনুমিত হয়। এক বা একাধিক দাঁড়ির সাহায্যে সংখ্যা লিখিত হইত। ২০, ৩০, ৪০ প্রভৃতি বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ কিছু চিহ্ন ব্যবহৃত হইত কিনা তাহা জানা যায় না। মহেঞ্জোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধার এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর ভারতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালিপির যে নমুনা পাই তাহা হইল খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। অশোকের শিলালিপিতে এই উদ্ভবিধ সংখ্যালিপির প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খরোষ্ঠী লিপি খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত ব্যবহৃত দেখা যায়; ব্রাহ্মী খরোষ্ঠী হইতেও প্রাচীনতর লিপি।

প্রাচীন পাঞ্জাব বলিতে আধুনিক পূর্ব-আফ্‌গানিস্থান ও উত্তর-পাঞ্জাব। খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিবার রীতি। অশোকের শিলালিপিতে এই লিপির যে নমুনা দেখা যায়, তাহার অনেক উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি শক, পার্থিয়ান ও কুষাণদের আমলের খরোষ্ঠী লিপিতে। এই সময়ের উন্নত খরোষ্ঠী সংখ্যা লিপির একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল—

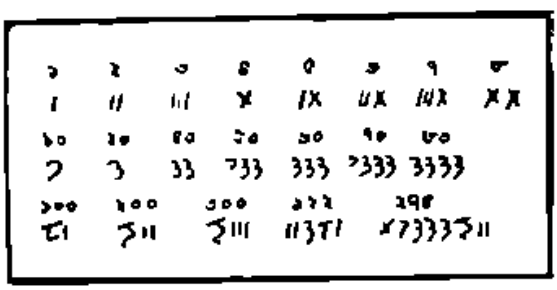

(১নং চিত্র)

এই লিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৪ সংখ্যা লিখিবার মধ্যে। পূর্বে এই লিপিতে ৪ লিখা হইত শুধু পর পর চারিটি দাঁড়ির সাহায্যে (IIII); এখন সম্পূর্ণ একটি নূতন প্রতীকের উদ্ভব হইয়াছে। উহার সহিত ব্রাহ্মী ৪—এর, + , কিসের সাদৃশ্য আছে। ৯—সংখ্যার কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই; ডাঃ দত্ত ও সিংহ অনুমান করেন ইহা সম্ভবতঃ লেখা হইত I × ×. তারপর দশ লিখিবার জন্য কেন একটি ভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন হইল এবং X ও I প্রতীকদ্বয় ব্যবহার করিয়া কেন ইহা II × × ভাবে লেখা হইল না, তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। খরোষ্ঠী সংখ্যা যৌগিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সব শেষের সংখ্যার দৃষ্টান্তই ধরা যাক। ২৭৪-এর অর্থ: ২০০+৭০+৪ (দক্ষিণ হইতে বামে লিখিলে, কারণ খরোষ্ঠীর উহাই রীতি)।

খরোষ্ঠী বিদেশী লিপি। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তনের কাল অজ্ঞাত। পাণিনিক যুগে ব্যবহৃত হয় কিনা (বা পারস্যযোগের) (খ্রীঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর এদেশে খরোষ্ঠীর প্রচলন অনেকে অনুমান করেন।

খরোষ্ঠী লিপির পাশাপাশি আমরা ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহারও দেখিতে পাই। ভারতের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ের ব্রাহ্মী সংখ্যা লিপির যে সব নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য কোন সমতা পাওয়া যায় না এবং তাহা আশা করাও অসঙ্গত। কালের ব্যবধানে ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই লিপির যথেষ্ট রূপভেদ ঘটিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে অশোকের শিলালিপিতে, মধ্যভারতে পুনার ৭৪ মাইল দূরে নানাঘাট পাহাড়ের গুহাভ্যন্তরে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) ও বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলায় এইরূপ আর একটি গুহায় (খ্রীঃ অঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শতক। ব্রাহ্মী সংখ্যা-লিপির কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার রীতি, খরোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত। প্রাচীনতম খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী সংখ্যা লিপিতে আমরা শুধু ১, ১০, ২০, ও ১০০-র জন্য পৃথক পৃথক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মীতে ১, ৪ হইতে ৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০…১০০০, ২০০০…ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহৃত হইত। ১০, ২০,…১০০, ২০০,…ইত্যাদি সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শূন্যের ব্যবহার ও দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই।

খরোষ্ঠীর মত মধ্যবর্তী নানা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য যৌগিক নিয়মের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, উপরোক্ত তালিকার নানাঘাট লিপি অনুযায়ী।

২৮৯ = ২০০ + ৮০ + ৯

প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা লিপি বিবর্তনের ইতিহাস যাহারা বিশদভাবে জানিতে আগ্রহী তাহাদের ডাঃ দত্ত ও সিংহের 'History of Hindu Mathematics' এবং স্মিথ্ ও কাসিন্স্কির "The Hindu Arabic Numerals" পড়িতে অনুরোধ করি।

সংখ্যা সম্বন্ধে যে জ্ঞান বহুদূর অতীতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, পাটীগণিতে তাহারা যে নানা মৌলিকতার পরিচয় দিতে ইহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রথমে সমান্তর প্রগতির (arithmatic progression) কথা ধরা যাক। তৈত্তিরীয় সংহিতার কাষ্যাকারে রচিত কয়েকটি স্থানে আমরা নিম্নলিখিত প্রগতির উল্লেখ পাই :—*

* The Cultural Heritage of India, vol III, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত; ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্তের 'Vedic Mathematics' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১, ২, ৪,.....১২, ২৪, ৪৪,...৯৯

২, ৪, ৮,.....২০,

৪, ৮, ১২,.....২০,

৪, ১০, ১৪,.....১০০,

১০, ২০, ৩০,.....১০০,

	ব্রাহ্মীলিপি	খরোষ্ঠীলিপি	সাংখিক লিপি
১	।	—	—
২	॥	=	=
৩			≡
৪	+	✕ ✕	✕ ✕
৫			⊓ ⊔
৬	৬, ৫	⊓	⊓
৭		?	?
৮			⊔ ⊔
৯		?	?
১০		⊏ ⊏⊏	⊏ ⊏
২০		০	⊖
৩০			
৪০			✕
৫০	৩. ৩		
৬০		⊣	
৭০			✕
৮০		⊞	
৯০			
১০০		⊼	⊓
২০০	৭, ✕, ৪	✕	⊓
৩০০		✕	
৪০০		✕⊏	
৫০০			⊓
৭০০		⊼⊣	
১০০০		⊤	⊓
২০০০			⊓
৩০০০			⊓
৪০০০		⊏✕	⊓
৬০০০		⊏⊓	
৮০০০			⊓
১০০০০		⊏⊏	
২০০০০		⊏০	

(২৯২ চিত্র)

সমান্তর প্রগতিগুলিকে আবার মূল ও অমূল দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একটি গুণোত্তর প্রগতির (geometric progression) দৃষ্টান্ত আছে :

২৮, ৪৮, ৯৬, ১৯২...৪৯১৫২, ৯৮৩০৪,...১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬

শ্রৌতসূত্রে এই প্রগতিটি পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

সমান্তর বা গুণোত্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বৈদিক হিন্দুরা জানিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের একটি দৃষ্টান্ত আছে (১+(১+২)+(১+২+৩)+...৭টি রাশি পর্যন্ত) = ৭৭)। একটি বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একটি সমান্তর প্রগতিতে রূপান্তরিত করিতে হয় যৌধায়ন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সহিত বৈদিক হিন্দুরা পরিচিত ছিলেন। শুল্বসূত্রে লিপিবদ্ধ ভগ্নাংশ গণিতের কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

$$১\frac{১}{৩} - ১\frac{১}{৪} = \frac{১}{১২} ;$$

$$(২\frac{১}{২})^২ = (২ + \frac{১}{২})(৩ - ১) = ৭\frac{১}{২} ;$$

$$\sqrt{৭\frac{১}{২}} = ২\frac{১}{২} ;$$

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{২} \text{ এর } ১ = ২১৫ ।$$

দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য আধুনিক পরিভাষিত পদ্ধতিতে লিখিত হইল। উপরোক্ত দৃষ্টান্তের তৃতীয়টিতে বর্গমূলের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। বর্গমূল নির্ণয়ে ও অমূলদ রাশির ব্যবহারে বৈদিক হিন্দুরা নিঃসন্দেহে তদানিন্তন অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন। যৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক গণিতজ্ঞের শুল্বসূত্রে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ প্রভৃতি অমূলদ রাশির বর্গমূল নিখুঁতরূপে বাহির করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বর্গক্ষেত্রকে নানাভাবে ভাগ করিয়া নির্ণীত $\sqrt{২}$ ও $\sqrt{৩}$ অমূলদ রাশির মূল্যমান হইল :—

$$\left.\begin{aligned} \sqrt{২} &= ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩\cdot৪} - \frac{১}{৩\cdot৪\cdot৩৪} = ১\cdot৪১৪২১ \\ \sqrt{৩} &= ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩\cdot৪} - \frac{১}{৩\cdot৪\cdot৩২} = ১\cdot৭৩২৩২ \end{aligned}\right\} \text{দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিলে}$$

বেদী নির্মাণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বেদী নির্মাণ হইতে যে শুধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তাহা নহে, ইহা বীজগণিতের প্রাথমিক বিকাশের জন্যও দায়ী। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারে বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এই সব সমীকরণের সমাধান বাহির করা হইত। শুল্বসূত্র ও বাখ্‌শালী পাণ্ডুলিপিতে একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ-সমীকরণ সমাধানের অনেক বস্তুর আছে। একঘাত সমীকরণের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—"প্রথম রাশিটি অজ্ঞাত ; দ্বিতীয় রাশি প্রথম রাশির দ্বিগুণ ; তৃতীয় রাশি দ্বিতীয়ের তিন গুণ ; চতুর্থ রাশি তৃতীয়টির চার গুণ ; এখন চারিটি রাশির যোগফল ১৩২ হইলে, প্রথম অজ্ঞাত রাশিটি কত ?" আধুনিক পদ্ধতিতে অজ্ঞাত রাশিকে x ধরিয়া সমীকরণটি লিখিলে তাহা দাঁড়ায় :—

$$x + ২x + ৬x + ২৪x = ১৩২$$

বেদীর ক্ষেত্র সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কিরূপে বিভিন্ন মাত্রার সমীকরণ সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করা যাক, একটি প্রদত্ত বর্গক্ষেত্রকে (বাহু $= a$) একটি আয়ত

ক্ষেত্র রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহার একটি বাহু হইতেছে x অর্থাৎ আমাদের

$$x^2 = ab$$

একঘাত সমীকরণটি সমাধান করিতে হইবে।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 'মহাবেদীর' প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাবেদী আসলে একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম, ইহার দুই সমান্তরাল বাহুর মাপ হইল ৩০ ও ২৪ এবং উচ্চতা ২৮। এখন এই সমান্তরাল বাহুদ্বয় ও উচ্চতাকে সমান অনুপাতে, অর্থাৎ x গুণ বাড়াইলে ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল যদি m গুণিত হয়, তবে x ও m-এর সম্পর্ক কিরূপ? অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে,

$$m = x^2 + \frac{(24x - 24)}{2} \cdot \frac{(28x - 28)}{2} = 196x^2 - 196$$

ভাগিয়া সহজ করিয়া লিখিলে উপরোক্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়

$$196x^2 - 196x + m$$

$$x = \frac{196 \pm \sqrt{196^2 - 4 \cdot 196 \cdot m}}{2 \cdot 196} = \frac{196 \pm \sqrt{196(196 - 4m)}}{2 \cdot 196}$$

মতে

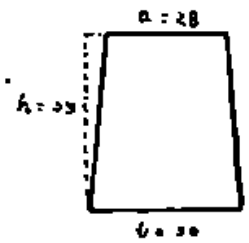

২৮ চিত্র

ইহা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। শতপথ ব্রাহ্মণে m-এর কতকগুলি বিশেষ মান ধরিয়া এইরূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হইয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা বৈদিক হিন্দুদের জ্যামিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানেরও বিশেষ পরিচায়ক, ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল $\left[\frac{h}{2}(a+b)\right]$, যদিও না থাকিলে এইরূপ সমীকরণে পৌঁছান অসম্ভব। বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল 'শুল্ব'। শুল্বকারগণ রচ্ছুদ্বারা ক্ষেত্র (rectilineal figure) রচনায়, ক্ষেত্রফল ও সমতল নির্ণয়ে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত করিতে (squaring the circle) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক হিন্দুদের পাইথাগোরাস ও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ শুল্বকারগণের নাম উল্লেখ করিয়া পণ্ডিতের অনেক বিদেশী ঐতিহাসিক মনে করেন, ঠমাকথিত পিথাগোরীয় উপপাদ্য হিন্দুদের আবিষ্কার। এই উপপাদ্য হইল, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উহার অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ প্রধান বৈদিক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—"কেহ অঙ্কে ক্ষেত্রের কর্ণে যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল পার্শ্বক্ষেত্রদ্বয়ের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান।" য়ুঙ্গে (Junge) প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পিথাগোরাস উহার নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হীথ এই উপপাদ্য আবিষ্কার সম্পর্কে গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন ও চীনের দাবী তুলনায় আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস ইহার আবিষ্কর্তা এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার অভিমত, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত বৌধায়নের কাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০ বলিয়া মনে করেন, পিথাগোরাসের অনেক পূর্বে হিন্দুরা এই উপপাদ্যের কথা জানিত। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপপাদ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।*

কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা খুবই কঠিন। কারণ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি শুল্বকারদের কাল অনিশ্চিত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাহারা বৈদিক সাহিত্যের এইরূপ প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"Some of the writers quoted below (for example, G. Milhand, 1910) claim that Pythagorean geometry may have been partly inspired by Hindu models. This argument is based upon the assumption that the high antiquity of Apastamba's work is proved. It is not. The dates of the S'ulvasûtras (rules of the chord) are so uncertain that I cannot deal with them in this part of the Introduction···It is highly probable that the S'ulvasûtras date from a period posterior to 500 B. C. and pre-christian. They are most probably post—Pythagorean. Introduction to the History of Science. G. Sarton, Vol I, pp. 74.

এই কাল যিনি সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রাধিকার চিরকাল নিষ্ফল বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য।

---

* ···The Hindu Baudhâyana (800 B. C.) in whose S'ulva we now meet with the general enunciation of the theorem, was much anterior to the Greek Pythagorus. Instances of application of it occur in the Baudhâyana S'rauta and Śatapatha Brâhmana (C 2000 B. C.) There are reasons to believe it to be as old as the Taittirîya and other Saimhitâs (C. 3000 B. C.)—Vedic Mathematics, Cultural Heritage of India; pp 385.

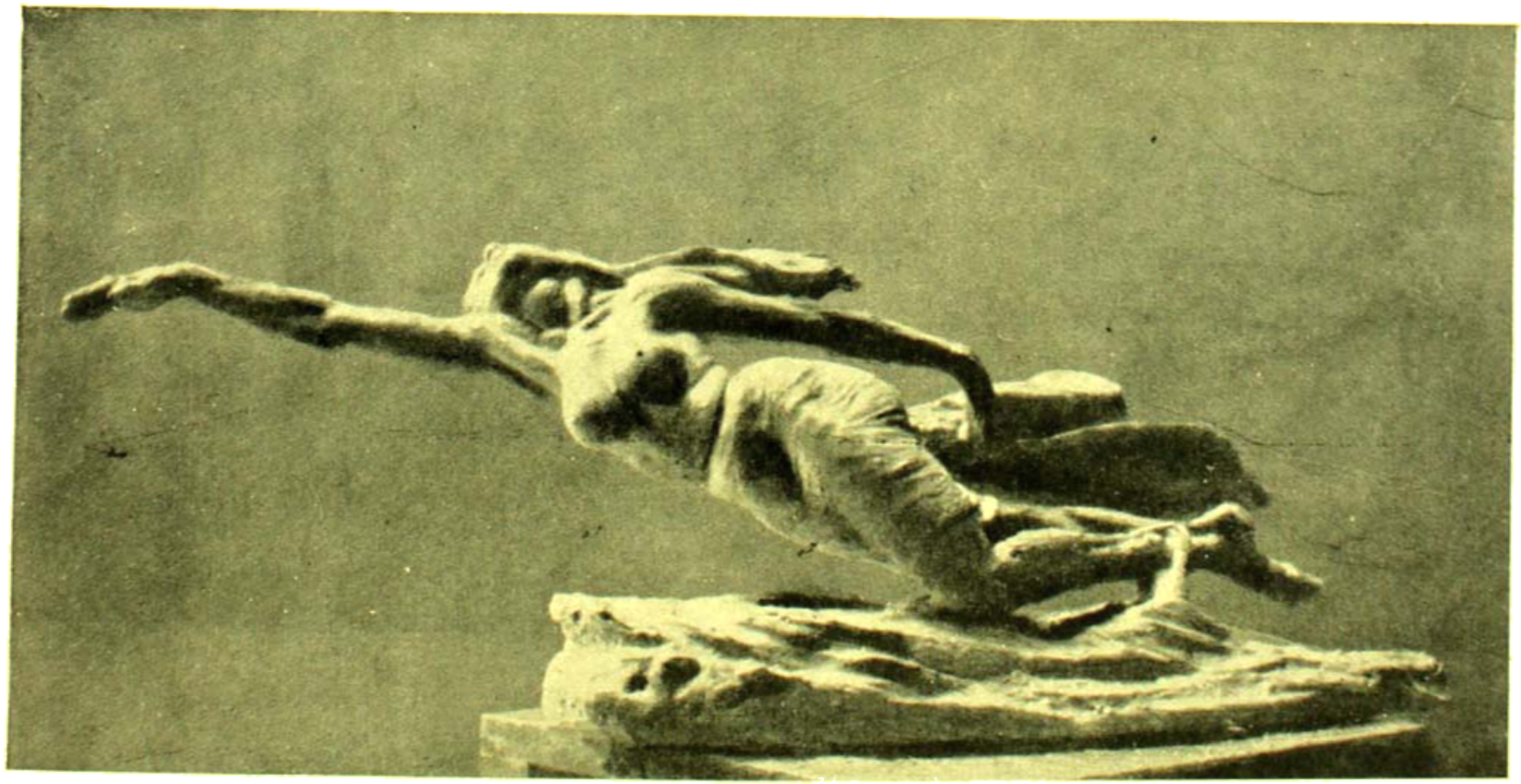

সাঁতার

ভাস্কর—হিরণ্ময়প্রসাদ রায়চৌধুরী

আনমনা

ছাত্তর—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুখের কাটা দাগ

সমারসেট ম্যম্

মাথার রগ থেকে গালের নীচে পর্যন্ত একটা অদ্ভুত লাল কাটা দাগের ছক লোকটির ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। আঘাতের চিহ্নটা যে গভীর, আর সেটি বোমার না বন্দুকের তাই ভাবতে সুরু করলাম। মোটা সোটা গোলগাল সদাহাস্য চেহারার মধ্যে ঐ দাগটা বেমানানই নয়—আতংকেরও। গায়ে শক্তির প্রাচুর্য পুষ্ট মাংসপেশীই প্রমাণ দিচ্ছে। সাধারণের চেয়ে একটু যেন বেশী লম্বা। ছাই রং-এর সস্তা প্যাণ্টের ওপর বুক খোলা সাদা সার্ট ছাড়া অন্য কিছু বড় একটা পরতো বলে মনে হয় না। তার ওপর মাথা সর্বদাই একটা দোমড়ানো টুপিতে ঢাকা থাকতো। শহরের 'প্যালেস' রেস্তরাঁয় রোজ-ই তাকে দেখা যায় লটারীর টিকিট বিক্রী করছে। 'বারের' এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধীর পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে প্রত্যেকের কাছে টিকিট কেনার বিনীত অনুরোধ জানাতো। অন্য সংস্থানের এ পথকে সহজ বলতে পারি না—কারণ কোনদিন কেউ তার কাছ থেকে টিকিট কিনতো না, তা জোর করে বলতে পারি। তবে প্রায়ই মদ খাবার জন্য তাকে যে কেউ অনুরোধ করতো না তা নয়। টেবিলের ধার দিয়ে তার হেলে দুলে যাবার চলন্ত মূর্তি দেখে ভাবতাম নির্বিবাদে অনেকখানি পথ সে নিশ্চয়ই অক্লেশে হেঁটে যেতে পারে। প্রত্যেক টেবিলের কাছে মুহূর্তের জন্য থেমে তার অনুরোধ জানাতো। কেউ শুনতো কেউ ফিরেও তাকাতো না। তাতে অবশ্য তার খুব বেশী অসুবিধা হয় না, আর দুঃখও পেত কিনা জানি না, তবে বেশ লক্ষ্য করেছি এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে যাবার সময় তার ঠোঁটের প্রান্তে একটুকরো হাসি খেলে যায়। মনে ভাবতাম ওর এই টিকিট বিক্রী যেন এক পুরানো নেশা।

গুয়াতামালার রেস্তরাঁর সবচেয়ে ভালো খাবার হচ্ছে শুকনো মাংস। একদিন সন্ধ্যেবেলায় এক বন্ধুকে নিয়ে সেই রেস্তরাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় সেই লোকটি এসে হাজির। তার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তাকে কিছু বলতে না দিয়েই অসম্মতির মাথা নাড়লাম আমি। এর আগে অনেকবার টিকিট কাটবার অনুরোধ জানিয়েছে, কিন্তু কোনবারই ওর কথা রাখি নি। আমাকে অবাক করে পাশের বন্ধু বলে উঠল—'গুড ইভ্‌নিং।'

স্মিত হেসে সে-ও অভিবাদন জানালো।

'দিনগুলো কাটছে কেমন?'

'এই এক রকম আর কি। এ ব্যবসায় তেমন সুবিধা করা যায় না।'

'কি খাবেন জেনারেল কোয়েন্টাল?'

'সামান্য ব্রাণ্ডি হলেই চলবে।'

বয়কে ফরমাস করল বন্ধু। এক চুমুকে সবটা খেয়ে নিয়ে গ্লাসটা বয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—'অশেষ ধন্যবাদ। এবার চলি। নমস্কার!'

'নমস্কার!'—বন্ধুও হাত তুলে অভিবাদন জানালো।

ধীরে ধীরে সে অন্যদিকে পা বাড়ায়।

লোকটি সরে যেতেই বন্ধুকে বললাম—'ও কে? মুখের কাটা দাগটা কিন্তু ভয় পাইয়ে দেয়।'

কি মনে করে বন্ধুটি আমার দিকে নিষ্পলক নয়নে তাকালো। তারপর এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে বলল—'মুখের কাটা দাগটা খুবই বেমানান, না? ওকার মত দেখতে হলেও আসলে ও লোক খুব খারাপ নয়। নিকারগুয়া থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই মাঝে মাঝে ওকে সাধ্যমত সাহায্য করি। সেখানকার বিদ্রোহীদের নায়ক ছিল ও। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস দেখ ও

কোথায় প্রধান মন্ত্রী হবে—তা না এমনি ভিক্ষা করতে চলেছে। যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ গুলি বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় আজ ওর এই দুর্দশা। শেষ পর্যন্ত দলের সবাই ধরা পড়ে। পরদিনই সামরিক বিচারালয় বসল। সেখান থেকে পরের দিন রায় বের হোল—গুলি করে মারা হবে সবাইকে। এ সব বিচার ও সব দেশে খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলা হয়। যখন রায় বের হোল তখন ভগবান বোধহয় একটু মুচকি হেসেছিলেন। শাস্তির কথাতেও খুব বেশী গুরুত্ব ছিল না। সে রাত শুধু জুয়া খেলেই কাটিয়ে দিল। দলে ওরা পাঁচজন। শুধু গোলাম পর্যন্ত তাস নিয়ে ওদের খেলা চলছিল। কিন্তু দু'দানের বেশী ও জিততে পারল না।

সকাল হোল। সিপাইরা শাস্তির আদেশটা আবার জানিয়ে দিয়ে গেল। কিছু পরে সবাই বেরিয়ে আসতে দেখা গেল যত দেশলাইএর কাঠি ও ছেরেছে তাতে করে একটা মানুষ সারাজীবন জ্বালিয়ে শেষ করতে পারবে না।

ছেলের পাঁচিলের ধারে পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোল। গুলি যে করবে সে ততক্ষণে প্রস্তুত হয়ে এসেছে। চারিদিকে কেমন যেন এক থমথমে ভাব। সবার চোখে-মুখে বিস্ময় আর আতঙ্ক। ও তখন প্রধান অফিসারকে ডেকে জিগ্যেস করে বসল—'এ রকমভাবে পুতুলের মত আর কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হবে?'

প্রধান সেনাপতি উত্তর দিলেন—'সরকারী সৈন্য বিভাগের কর্মকর্তা শেষ সময় উপস্থিত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তাই এত দেরী।'

'একটা সিগারেট খাওয়া যাক। সরকার সময়মত কিছু করতে তো অভ্যস্ত নয়!'

সিগারেটে টান দেবার আগেই দেহরক্ষীকে সংগে নিয়ে প্রধান কর্মকর্তা এসে হাজির হলেন। কর্মকর্তা হচ্ছেন সান্ ইগ্নাশিও। একবার চারিদিকে ঘুরপাক খেয়ে এসে বন্দী পাঁচজনের সামনে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন—তাদের অন্তিম বাসনা কি? পাঁচজনের মধ্যে চারজন চুপ করে রইল। কেবল ও বলল—'চাঁ আমি শুধু আমার স্ত্রীর কাছ থেকে শেষ বিদায় চাই।'

'বেশ তাই হবে। তিনি থাকেন কোথায়?'

"জেলের দরজায় অপেক্ষারতা।'

'তাহলে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দেওয়া যায় না।'

'অতখানি সময়েরও প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে তুমি সরে দাঁড়াও।'—প্রধান কর্মকর্তা আদেশ দিলেন।

দুদিক থেকে দু'জন সেপাই ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতেই প্রধান কর্মকর্তা মাথা নেড়ে ইংগিত করলেন গুলি ছোড়বার জন্য। লক্ষ্য ব্যর্থ হোল না। চারজনের নির্জীব রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর। এক সংগে নয়—একটার পর একটা! ঠিক যেন অভিনয়-মঞ্চের পুতুলের মত। জনৈক কর্মচারী তাদের দিকে এগিয়ে এলেন—একজন কেমন করে যেন বেঁচে ছিল—কর্মচারীর রিভলবার আবার যেন গর্জে উঠল।

গোটের কাছে অস্পষ্ট গোলমাল শোনা যায় হঠাৎ। পরমুহূর্তে সবেগে ছুটে এলো একটি মেয়ে—মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল, তারপর আবার ছুট দিল।

প্রধান কর্মকর্তা চীৎকার করে উঠলেন—'ক্যাবাযা!'

কালো পোশাকে মেয়েটীর সর্বাংগ ঢাকা। মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখখানা। বয়স খুব বেশী হবে না হয়ত। রোগা তন্বী হলেও বেশ সুশ্রী। টানা টানা চোখ দুটোয় সরলতার চাউনি। সারা মুখে কৈশরের এমন একটা সারল্যের ছাপ না দেখে সমস্ত সৈনিকেরাও বেদনাহত দৃষ্টিতে মেয়েটীর দিকে তাকালো। ও ধীরে ধীরে এক পা দু' পা করে এগিয়ে আসছে—কিন্তু মেয়েটীর গলা দিয়ে শুধু একটু ঘর্ঘর শব্দ বের হোল। নিজেকে সামলাতে না পেরে ওর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।

ও গভীর এক চুম্বন এঁকে দেয় মেয়েটীর গালে। ঠিক সেই সংগে ছেঁড়া সার্টের ভেতর থেকে হাতির দাঁতের তৈরী এক সাদা ছুরি বের করে আমূল বিদ্ধ করে দিল মেয়েটীর গলায়। চারিদিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে ঐ ছুরি ওকি করে রেখেছিল তা রীতিমত রহস্যের। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে তার সার্ট ভিজিয়ে দিল। সেই অবস্থাতেই মেয়েটীকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে গভীর এক চুম্বন করল।

এক পলকে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল তাই প্রথমে সবাই নির্বাক হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেদের সামলে

নিয়ে চীৎকার করে উঠল।—কয়েকজন সেপাই ওকে ধরে ফেলল। হাতের শিথিল বাঁধনে মেয়েটী পড়বার উপক্রম হতেই প্রধান কর্মকর্তার এক দেহরক্ষী মেয়েটিকে ধরে ফেলল। মেয়েটীর রক্তাক্ত জীবিহীন দেহ মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হোল। ওর আঘাত ঠিক যায়গাতেই লেগেছিল তাই সঙ্গে রক্ত বন্ধ করা গেল না। দেহরক্ষী হাঁটু গেড়ে বসে তাকে একবার পরীক্ষা করে চুপি চুপি বলল—'সব শেষ।'

ও তাদের প্রথানুযায়ী নিজের বুকের ওপর হাত দিয়ে ক্রশ আঁকল।

'এ কাজ করার উদ্দেশ্য কি ?'—গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন প্রধান কর্মকর্তা।

'ভালোবাসার যোগ্য সমাদরের চিহ্ন এটা।'—নিষ্কম্প স্বরে জবাব দিল ও।

চারিদিকে কৌতূহলী ভীড়ের মধ্যে চাপা নিঃশ্বাসের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। তার ওপর সবার বিস্ময়াহত দৃষ্টি ততক্ষণে ওর মুখের ওপর আটকে গেছে।

'সত্যিকারের প্রেমিক না হলে এ কাজ করা অসম্ভব।'—আগের মতই গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন প্রধান কর্মকর্তা—'এ মহান্ প্রাণ ফাঁসীতে ঝোলানো উচিত নয়। যাও একে সহরের শেষ সীমার বাইরে দিয়ে এসো। বীরের কাছে বীরের মর্যাদাই আজ তোমাকে দিলাম।'

আগে পাশের সবাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। দেহরক্ষী হাত দিয়ে আস্তে আঘাত করল ওর পিঠের ওপর। তারপর মাথা নীচু করে সবার মাঝখান দিয়ে নীরবে হেঁটে গেল গাড়ী পর্যন্ত .....

• • • •

বন্ধু তার কাহিনী শেষ করল। আমিও বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলাম। বলতে ভুলে গেছি আমার বন্ধুটি গুয়াতামালার বাসিন্দা এতক্ষণ স্প্যানিস্ ভাষায় কথাবার্তা চলছিল। উচ্ছ্বাসের আবেগে ভেসে না গিয়ে যতদূর সম্ভব ততখানি সহজ করে তার কথার অনুবাদ করলাম। এ কথা সত্যি এ গল্পে উচ্ছ্বাসের স্থান নেই।

সবশেষে বন্ধুকে জিগ্‌গেস করি—'তবে মুখের ও দাগটা কিসের ?'

'জিনজারের বোতল খুলতে গিয়ে কেটে যায়—তাই তার চিহ্ন ঐ মুখে লেগে।'

আমি শুধু দীর্ঘশ্বাস চাপবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম !

অনুবাদক—শ্রীতন্ময় বাগচী

কাশ্মীর-স্বপ্ন

নবনীতা দেব

মানসবিহঙ্গ মোর উড়ে চলে স্বরগের টানে,—
অমরা-কাননে নয়, তুচ্ছ এই ধরাকোণ-পানে।
যেখানে উন্নত-রবি ধবল তুষারশৃঙ্গগুলি
বর্ণ বিচিত্রিত করে বুলাইয়া আলোকের তুলি !
নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ হ্রদে কমলকানন ফুল্ল হাসে,:
শিকারা-তরণী বাহি ভেসে যাই শীতল বাতাসে।

মানসবিহঙ্গ মোর উড়ে যায় তুষর্গের মোহে,
প্রকৃতি উচ্ছল যেথা কুসুমের দীপ্ত সমারোহে।
পাইন ঝাউএর দোলা—আখরোট আপেলের বন,
নির্ঝর প্রপাত-গান—স্বপ্নে ভরে পথিকের মন।
বাতাস বিহ্বল যেথা আফরাণ কেশর-সৌরভে—
ট্রেবেরি-রক্তিম ক্ষেতে দৃষ্টি-প্রাণ-স্বাদ তৃপ্তি লভে।

মানসবিহঙ্গ মোর গন্তব্য করেছে তার স্থির,—
চেনার-কানন-ঘাস-পরিবৃতা পুষ্পিতা কাশ্মীর।
দিগন্ত-বিস্তার-হ্রদে ভেসে যায় শ্যামশষ্পভূমি,—
'তখ্‌তমুকুটে'র শীর্ষে স্বর্ণ রবিকর আছে চুমি'।
চলিয়াছে সৌধতরী ধীরে ধীরে ঘাট হতে ঘাটে।
'ডেনিস্' আঘাত দেয় বারংবার মনের কবাটে।

মানসবিহঙ্গ মোর কল্পাকাশে মেলিয়াছে ডানা।
মানেনা পথের বাধা, মানেনা দূরের বিঘ্ন নানা।
নিশাতের তরুকুঞ্জ, শালেমার-উদ্যান-কুসুম,—
পপলার-বীথির ছাওয়া মর্মরিয়া ভাঙ্গে মোর ঘুম।
কাশ্মীর—তোমার লাগি চিত্ত মোর হয়েছে আকুল—
স্বপ্নে দেখি ডাল্-লেক—ক্ষেত-ভরা আফিমের ফুল।

সমুদ্র-পথ

শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়

১৯২৮ সনের ২৩শে মার্চ, শুক্রবার। বেলা চারটার সিডনি বন্দর হ'তে পি অ্যাণ্ড ও কোম্পানীর ষ্ট্রেথেয়ার্ড (Strathaird) জাহাজে ভারতাভিমুখে রওনা হ'লাম। জাহাজ ছাড়ল কাঁটায় কাঁটায় চারটায়। জাহাজ ছাড়বার বহু আগে থেকেই পিয়ারবর্ট (Piermont) ছেঁই লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। জাহাজের যাত্রী হয়ে এগারোশ মাকিনার ও কর্মচারী আরও পাঁচশ। যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই মিলে হাজার পাঁচেক নরনারীর সমাগম হয়েছিল। মোটরগাড়ী ছেঁইর উপর দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এসেছেন তাঁরা প্রায় সবাই জাহাজের দিকে রঙীন ক্যাপের কিরণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন, আর জাহাজের থেকে দাঁড়িয়ে কিনারী বন্ধু ও প্রিয়জন সেইগুলি লুফে নিচ্ছেন। কারু, নীল, সবুজ, হলুদ ক্যাপের কিরণে তীর ও তরঙ্গের

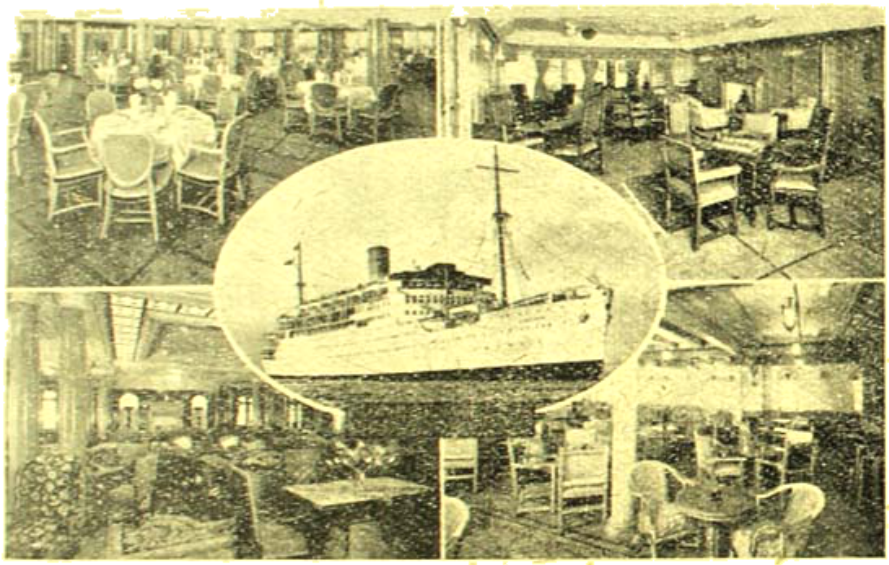

একটি আধুনিক জাহাজের আহারঘরের দৃশ্য

সাবধানী ঘুচিয়ে আবার বিদেশীকে বিমর্ষিত করবার নিষ্ফল প্রয়াস। অনতিপ্রেত ভবিষ্যতকে শেষ পর্যন্ত যারা মেনেছাই ভোগ হয় মানুষের স্বভাব। ধীরে ধীরে মাটির মায়া কাটিয়ে বিরাট বপু জাহাজখানা গতি-চঞ্চল হয়ে উঠল। ছেঁইতে দাঁড়িয়ে অগণিত নরনারী হাত নেড়ে, রুমাল উড়িয়ে বিদায় জ্ঞাপন করতে লাগল। ক্ষণ-ভঙ্গুর কাগজের সিকলগুলি অগত্যানান জাহাজের আকর্ষণে পটপট শব্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ছে। জাহাজ ক্রমেই ছেঁই ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্রুত তালে জাহাজের ব্যাণ্ড বেজে উঠল। ওপো কর্ণধার-তোমারে করি নমস্কার, বোধের যাত্রা হ'ল সুরু—এবার তুফান উঠুক যতদূর-খুশি কিম্বা নাই আর।

এদিকে জাহাজের যাত্রীমহল—বেশীর ভাগই বেহাল—যাত্রা-পর্ব উদ্‌যাপন করছে আকণ্ঠ সুরাপানে। দলে দলে নরনারীর মদের বোতল শূন্য ক'রে জাহাজ থেকে জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে—আর সেই বোতল গুলি খাড়া ভাবে জলে ভাসছে। উপসাগরের দুইতীরে সুদৃশ্য সিডনি শহর যেন হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকছে। কিন্তু অকারণ এই পেছনের ডাক—নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পেছন ফেরা।

পশ্চিম দিগন্তে সিন্ধুপারে সূর্যদেব অস্তাচল গমনোদ্যোগী। সন্ধ্যার অন্ধকারে দারা আকাশ ও পুঞ্জীভূত মেঘ নানা বর্ণে বৈচিত্র্যময়, দূর আকাশের গায়ে বলাকাবদ্ধ বিহঙ্গমন কোন সুদূরের যাত্রী। দলে দলে বুদ্ধু সীগাল (Sea gull) জাহাজের আশে পাশে উড়ছে। তাদের আকুলী ধ্বনিতে সমুদ্র বক্ষ মুখর। সিডনির শেষ দৃশ্য—বিপাট সিডনি হারবার ও ব্রীজ, ক্রমে আমার চোখের আড়ালে পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। পাইলট ডাঙ্গা ও সমুদ্রের মোহনা পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়ে আমার বন্দরে ফিরে গেল। সমুখে অনন্ত বিস্তার সুনীল জলধি। ডেকে দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভ'রে জলধির এই বিরাট রূপকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলাম।

"কোথা তা'র তল, কোথা কূল।
কেবা কে বুঝিতে পারে
তাহার অগাধ পাথি, তাহার
অপার ব্যাকুলতা,
তা'র সুগভীর মৌন, তা'র
সমুচ্ছল কলকথা,
তা'র হাস্য, তার অশ্রুরাশি।"

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে আকাশ ও সমুদ্র আচ্ছন্ন হ'য়ে এল। একটি দুটি ক'রে তারার তারায় নীল গগন ভ'রে গেল। জাহাজের গতি এতক্ষণে প্রবল হয়ে উঠেছে। একটানা ইঞ্জিনের ফাঁ ফাঁ গর্জন। জাহাজের গতিবেগে সমুদ্রের জল দু'ভাগে ভাগ হয়ে প্রবল ফেনোচ্ছ্বাসে দুই পাশে ভেঙ্গে পড়ছে।

তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি'
ফেনে ঢাল কুটি কুটি।

দুর্নিবার বেগে সিন্ধু বক্ষ মথিত করে জাহাজ চলেছে। দূরে অষ্ট্রেলিয়ার তটরেখার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে থেমে-থেমে বিক্ষিপ্ত লাইট-হাউস বা আলোক স্তম্ভগুলি।

সিডনি থেকে রওনা হয়ে প্রথম তিনদিন বেশ আরামে কাটানো গেল। অনেকেই সঙ্গে ট্র্যাভল টেবলেট (Travel tablets) নিয়ে এসেছিলেন এবং পাছে সমুদ্র পীড়া হয়, সেই ভয়ে দু'চারটে ট্যাবলেট আগেই খেয়ে নিয়েছেন। আমি কোন ট্যাবলেট খাই নি। সমুদ্র-পীড়া যদি একান্তই হয়, তা' হবে। প্রকৃতির উপর নির্ভর ক'রে থাকব। দেখা যাক কি হয়। জাহাজ মেলবোর্ণ বন্দরে তিন দিন বোঝাই ফেলে থাকল। মহাদেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলভাগ প্রায় সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে অষ্ট্রেলিয়ার শেষ বন্দর ফ্রিম্যাণ্টল হ'তে জাহাজ ভারত-সমুদ্রে পাড়ি জমাবে কলম্বো অভিমুখে। মেলবোর্ণ ছাড়ার পর গ্রেট অষ্ট্রেলিয়ান বাইট (Great Australian Bight) অতিক্রম করবার পালা। অষ্ট্রেলিয়ান বাইটের বদনাম নাকি বে অব্ বিস্কের (Bay of Biscay) চাইতেও বেশী। একজন সহযাত্রী গল্প করেন যে একবার এই বাইট অতিক্রম করবার সময় সমুদ্রের এমনই তাণ্ডব অবস্থা হয়েছিল যে তিন দিন কোন যাত্রীই কেবিনের বাইরে আসতে পারে নি। এমন কর্দাকার উঁচু ঢেউ জাহাজের ডেকের উপর দিয়েও কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আরোগ্যশালা নাকি মাতালের মতো হলে দুলে বুড়ু বুড়ু খাচ্ছিল। আমাদের ভাগ্যে বাইটের এ রুদ্ররূপ দেখতে হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছিল তারই ফলে আমাকে একদিন কেবিনে শুয়ে থাকতে হ'ল। অনেক যাত্রীরই এই অবস্থা। সমুদ্রপীড়ায় লাঞ্ছিনি যদনেচ্ছা ও মাথা ঘোরা চলল। আহার্য ও পানীয় কোনটাই গ্রহণ করা গেল না। কেউ কেউ উপদেশ দিলেন উঠে খোলা ডেকে হেঁটে বেড়াতে" to develop the sea-leg" অর্থাৎ সমুদ্র পীড়াকে সহজে বা স্বাভাবিক করে নিতে। কিন্তু আমার তত সী-লেগ ডেভেলপ করতে গিয়ে যদি দমার সামনে বমি আরম্ভ হয় তবে সে অবস্থাটা হবে বড়ই অবাঞ্ছনীয়, কাজেই বন্ধুদের উপদেশ গ্রহণ না ক'রে কেবিনেই শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। ফল হ'ল ভালই। পরদিন বেশ সুস্থ বোধ করলাম, যদিও বাইটের উত্তাল তরঙ্গে জাহাজের গতি তখনো টলটলায়মান।

এর পর আর সমুদ্রপীড়া বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নি। আমি বাঙলার লোক। মাদারীপুরে থাকাকালীন সরকারী চাকরীর দায়ে তিনবৎসর নদী আর খালে বিলে বহুদিন নৌকায় নৌকায় কাটিয়েছি। ছেলেবেলায় যখন কোনদিন river sickness-এ ভুগিনি, তখন Sea-sickness-ও বোধ হয় আমার হবে না। কিন্তু মহাসমুদ্র মাদারীপুরের ডুম্বা অভিজ্ঞতাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। তার পরাক্রমের একটু

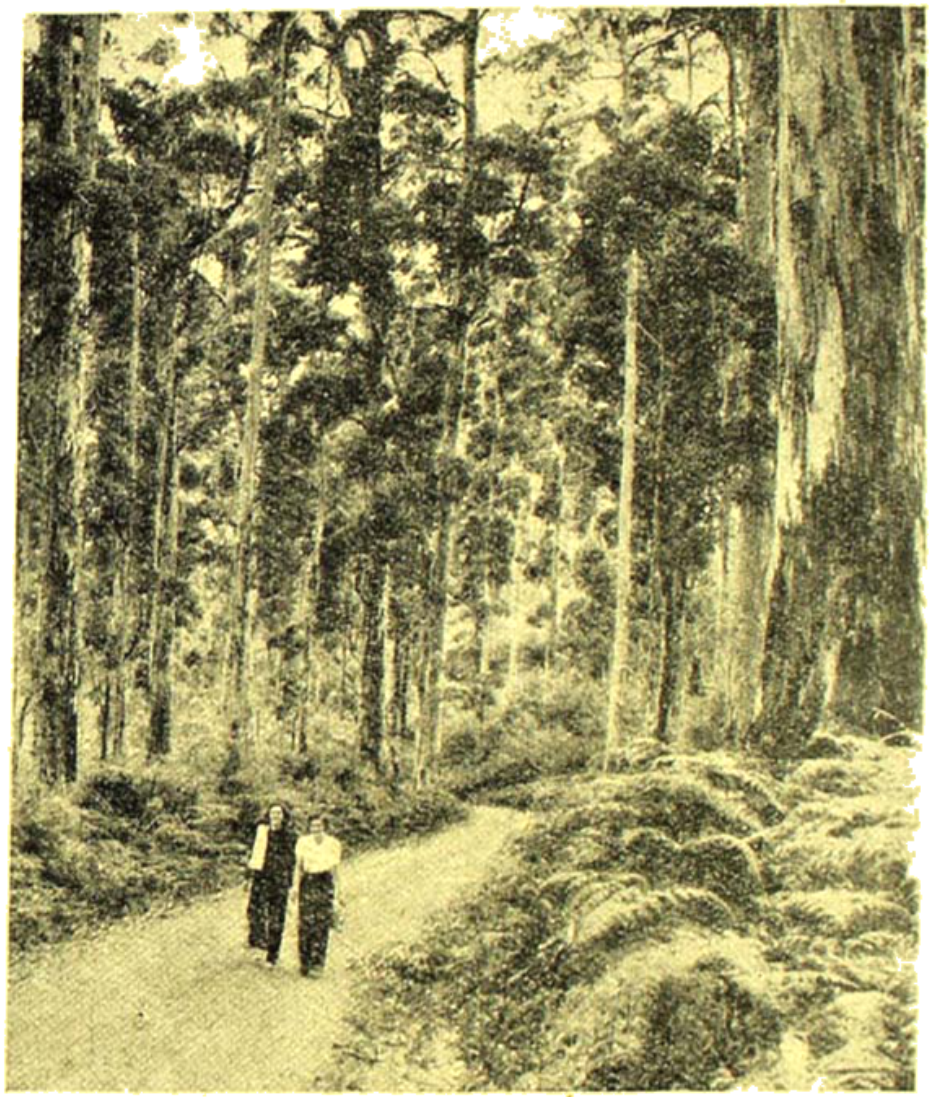

অষ্ট্রেলিয়ার বুদ্ধ বনস্পতি

মৃদুস্পর্শমাত্র দিয়ে গেল—আর তাতেই আমরা প্রায় কাবু। দক্ষিণ সমুদ্র হ'তে প্রবাহিত তুষার-শীতল বায়ু অষ্ট্রেলিয়ান বাইটের জলরাশিকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। বিশাল ফেনীল তরঙ্গের দোলায় এতো বড় জাহাজটি মোচার খোলার মতো নাচতে থাকে—আর সেই নর্তনের তাণ্ডবে ক্ষীণপ্রাণ মানুষের হয় মরণদশা।

যাহোক এযাত্রা ঝড়ের উপর দিয়েই ক্রাঁড়া কাটল। পর পর মেলবোর্ণ, অ্যাডিলেড ও ফ্রি ম্যাণ্টল বন্দর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগার দিনের

দিনে আমাদের জাহাজ ইক্যুর সন্নিকটে সুখে শান্তিতে মহানন্দে পাড়ি জমাল। এবার আমাদের সম্বর্ধনার সিংহল ঈশানের পুজোরী কলম্বো বন্দর। পূরো সাত দিন সাত রাত্রি অবিরাম চলার পর কলম্বো বন্দরে পৌঁছান যাবে। মাঝে পড়বে বিষুব রেখা। বিষুব রেখা অতিক্রম করার সময় প্রাচীন প্রথানুযায়ী জাহাজের নাবিকেরা বরুণ দেবতার (King Neptune) প্রতি সম্মান দেখান বুড়াইতে ও সংবর্ধনার অনুষ্ঠান করে। জাহাজের ক্যাপ্টেন বিষুবরেখা অতিক্রম করার নিদর্শনরূপে আমাকে তার স্বাক্ষরযুক্ত একখানা অভিজ্ঞানপত্র দিলেন। নীচে সেই সার্টিফিকেটের অবিকল অনুলিপি তুলে দেওয়া হল :—

This is to certify that Mr. N. Roy on board "Strathaird" has been duly initiated as a Son of Neptune according to the ancient rites and ceremonies existing from time immemorial.

I hereby grant him Freedom of the Seas and charge all kippers, haddocks and other denizens of the deep from molesting him in any way should he fall overboard. Given under our Hand on the Equator.

Henry S. Allan
By Command of His Majesty
King Neptune
Lord of the Seas, Sovereign of all Oceans
Ruler of the Waves.

জাহাজের যাত্রীরা প্রায় সবাই কৃতিবাস ও সাদুদে লোক। বেশীর ভাগই ইংরাজ, জনকয়েক বিহারী, আর আমরা চারজন ভারতীয়। আমাদের চারজনের একজন চন্দ্রশেখর ডুবিলেই অপর কৃতিবাসদের দলে ভীড়ে পড়লেন। অনেক অষ্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক ও মহিলা সাত মাসের ছুটিতে ইংলণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছেন। ভাবটা—

Oh! to be in England,
Now that April's there.

ইংলণ্ডে এখন বসন্তের বসন্ত কাল, আর অষ্ট্রেলিয়ায় এখন শীত পড়ি পড়ি করছে। এদের কল্পিটা মন্দ নয়। অষ্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে ইংলণ্ডে চলেন বসন্তকাল উপভোগ করতে, আবার সেখানের উষ্ণ মাসগুলি উপভোগ করে যখন ফিরবেন তখন অষ্ট্রেলিয়ায় শীত অবসান হয়ে গ্রীষ্মের সমাগম হচ্ছে। শীতের জুজুকে ফাঁকি দেওয়ার বেশ কিকির! বারমাসে তিন বসন্ত!

বাইশ হাজার টনের যাত্রী জাহাজ। নিষ্ণাতরা যাত্রীদের আরাম আয়েসের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি করেন নি। সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা। সেবাপরায়ণ ও ভদ্র পরিচায়ক সর্বদাই যাত্রীদের নানা ভাই ফরমাস খাটছে। স্নান আহার, ভ্রমণ, খেলাধুলা, বিশ্রাম, অধ্যয়ন, চলচ্চিত্র, বলনাচ, সাঁতার ও প্রচুর মদ—যার যেরকম অভিরুচি সে সেই ভাবেই তার সময় কাটাতে পারে। আমাদের চন্দ্রশেখর বলনাচ ও অন্য অনেক রকমের কুর্তি নিয়ে খুব মেতে উঠলেন। যাত্রীদের মধ্যে মহিলার সংখ্যাও প্রচুর। যাঁরা ঝানুদী তাঁরা প্রায়ই সেলাই বা উলবুনন নিয়ে ব্যস্ত, অথবা খোলা ডেকে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। বুড়োরা খুব কম বেড়াচ্ছেন আর প্রায়ই বেশ আলাদী। অনেক বিশিষ্ট লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হ'ল, কেউ বা পার্লামেন্টের (অষ্ট্রেলিয়ান) সদস্য, কেউ আইনজীবী, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষাব্রতী ইত্যাদি। ইংলণ্ডে যাচ্ছেন অবকাশ বিনোদনের জন্য। আর যারা থাক ইংরাজ তারা যাচ্ছেন স্বদেশে। সাময়িকতা এদের চরিত্রের একটা বিশেষ গুণ। যেচে এসে আলাপ করবে। দেখা হলেই অভিবাদন করবে—কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে।

যাত্রীদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী তাদের চালচলন আবার অন্য ধরণের। দুরন্ত যুবতীর দল জোড়ায় জুটির খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মদ্য-পানের পরিমাণ দেখে অবাক হ'তে হয়! এক আসনে বসে একটানা ৩।৪ ঘণ্টা মদ খেয়ে যাচ্ছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র স্নান বা ডেক টেনিস ইত্যাদি নিয়ে এক দল মত্ত। কেউ কেউ আবার ডেকের কোন এক নিভৃত কোণে বিশ্রম্ভালাপে মত্ত। তরুণীর দল সকাল সন্ধ্যা অত্যন্ত চুস্ত জাঙ্গিয়া এবং এক খণ্ড সংকীর্ণ বক্ষাবরণ পরিহিতা হয়ে নয় বুটিতে আবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেহায়া নাকি শরম! কিন্তু মাইমিনের বেহায়াপনার শোধ তুলে নিবে সন্ধ্যাবেলা ডিনারের সময়। পুরুষদের বেলায় ডিনার সুট সাদা শার্টের উপর কালো বো-টাই ও কালো কোট, আর মেয়েদের বেলায় আপাদলম্বিত গাউন—এই হচ্ছে অনুমোদিত ডিনার সুট। এ না পরে ডিনারে গেলে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমার ডিনার টেবিলে বসত এক সিংহলী ছোকরা। তিন বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় থেকে লেখাপড়া বিশেষ কিছু না শিখলেও আবদ-কায়দা আর মজগান এ দুইটা জিনিসে খুব রপ্ত হয়ে এসেছে। খুব ফলাও ক'রে তার সাহেবীয়ানার গল্প করত। ছোকরার নাম সুপলিঙ্গম, সিংহলের কোন সরকারী স্কুলের শিক্ষক। ছোকরা যে পরিমাণ মদ খেতে শিখেছে তাতে মাষ্টারীর চাকুরী নিয়ে তার দিন চলা ভার হবে। সিংহলের আরও জনকয়েক ছাত্র ও সরকারী কর্মচারীর সঙ্গেও অষ্ট্রেলিয়ায় আলাপ পরিচয় হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় এরা সবাই পানীয় ব্যাপারে খুব উদার-নৈতিক ও অগ্রগামী। ইংরাজের ভাল গুণ বেশী কিছু গ্রহণ করতে না পেরে, এরা যেগুলি ইংরাজের দোষ অনেকটাই পেয়েছে।

আমার পৌর-প্রতিবেশীর জীবনযাত্রা

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ তখন ছিল বিদেশীর নাগপাশে বাঁধা—পরাধীন। আমাদের নাগরিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত ছিল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মুষ্টিগত। ব্যারিস্টার সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় জীবন গঠনে আন্দোলনের কর্মসাধনা ব্যর্থ হয় নি। আমলাতন্ত্র সরকারের কবল থেকে বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কোলকাতা সহরের পৌর ব্যবস্থার প্রথম বরাহ পত্তন করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্যদলের গঠিত সংবিধান বলে ১৯২৪ সালে মহানগরীর পৌর-প্রতিষ্ঠান নব কলেবর লাভ করলো। নববিধানানুযায়ী নির্বাচনে জনগণপ্রতিনিধিরাই হলেন পৌর-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। সংখ্যাগরিষ্ঠদলরূপে জাতীয় কংগ্রেস এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন সে-সময়। মহানগরীর সাহেবী পাড়া ও সরকার-তাঁবেদার ভাগ্যান্বেষীদের পৌর সুখসাচ্ছন্দ্যের সীমাবদ্ধ অবস্থাকে সমগ্র

শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবি-কে-সেন

পৌরবাসীদলের কল্যাণ পথে কর্মযোগের সাধনায় সর্বপ্রথম নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম নির্ভীক বীর ও ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রথম পৌরাধিপতির পদে বৃত হয়ে তাঁর সকল কর্মযোগের আদর্শের মূলমন্ত্র হইলো—দরিদ্রনারায়ণের সেবা—বড়া নয়। তারপর পৌর উন্নতির সকল কাজের সেরা কাজের দিকে নজর দিলেন তদানীন্তন পৌরনায়কগণ। তখনকার দিনে তাঁরা বুঝে-ছিলেন, নগরবাসীকে পৌরাধিকার সম্পর্কে আত্মসচেতন করতে না পারলে উন্নতিমূলক কোন কাজই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে না।

পৌর প্রতিনিধি স্বর্গীয় মদনমোহন বর্মন পৌর মুখপত্র প্রকাশ করবার প্রস্তাব আনলেন পৌর-সভাতে। পৌরাধিপতি দেশবন্ধু এ-প্রস্তাবে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পৌর-জনগণ শিক্ষা প্রচারের সর্ব ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিলেন তিনি। পৌর-শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-চৈতন্যের আধারস্বরূপ পৌর মুখপত্র—কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেট জন্মলাভ করলো ১৯২৪ সালেই। বেসরকারী আয়ত্ত কাজের মুষ্ঠু পরিচালন ভার পড়লো শিবকালন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মযোগী পুরুষসিংহ সুভাষচন্দ্রের যোগ্য হস্তে। পৌরপ্রধান কর্মকর্তারূপে সুভাষচন্দ্র পৌর মুখপত্রখানির কথা ভোলেন নি। তিনিও বুঝেছিলেন যে, নাগরিক জনমত গঠনের দ্বারাই পৌর স্বাচ্ছন্দ্যকে সার্বজনীন রূপ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের সাংবাদিক-শিরোমণি সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, ইতিহাস নেহরু, লালা

প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে দর্শকগণ

লাজপত রায়, কালিনাথ রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের সাহচর্য ও সহকারী রূপে যাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত, তাঁর উপর ন্যস্ত হোল এই মুখপত্রখানির সম্পাদনা ও পরিচালন ভার। ইনি সাংবাদিক শ্রীঅমল হোম। এঁর পরিচর্যাতে পৌরবার্তাখানি সত্বরই ভারতীয় জনসমাজে সমাদৃত হোল। বার্ষিক ও আয় প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাগুলি পৌরজীবনের অপরিহার্য বিষয় বস্তুর সম্ভারে কোলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানকে দেশে ও বিদেশে সুনামের গৌরব শীর্ষে তুলে ধরে। কোলকাতার পৌরবার্তাখানি স্বাধীনোত্তরকালে বিদেশমহলেও সমাদর লাভ

করেছে। পরাধীন ভারতে স্বায়ত্তশাসনের পথপ্রদর্শক কোলকাতা করপোরেশন থেকেই সুচিন্তিত পৌরহাতা-সাংবিধিকতার পোড়াপত্তন হয়। ভারতীয় আন্দোলনের ক্রমোন্নয়নের যুগে বাংলার এই পৌর-প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক কর্মীদের শিক্ষা শিবির বলে অনায়াস কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বহু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্বায়ত্তশাসন পৌরদেরে মজুতদার রেখেছিলেন তখনকার পৌর নায়কগণ। পঁচিশ বছর পূর্বেকার কোলকাতা নগর ও অধুনাকালের ঐ নগরকে নিরপেক্ষভাবে তুলনামূলক সমালোচনা করলে, মাধ্যমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের সার্বজনীন উন্নতির প্রমাণ আরও পাওয়া যায়। পেছনে ফেলে আসা তিনকুড়ির পথে নীরবেও চৌদ্দ, বোধ হলে আসা যাক স্বাধীনোত্তরকালে।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে কবীন্দ্রপার অস্ট্রাপাল থেকে

পৌর-প্রতিষ্ঠানের জীবন যাত্রা (১)

আমরা মুক্ত হয়েছি। পৌর-ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এখন বিদেশী সরকারের কোন সংস্রবের কথা উঠা অসম্ভব। আমরাই এখন আমাদের ভাগ্যবিধাতা। ঊর্ধ্বতনের মহাধিকরণে এবং পৌরাধিকরণে যাঁরা শাসন ও পরিচালন হস্তে আসীন, তাঁরা সমগ্র রাজ্যের এবং পৌরবাসীদেরই নিতান্ত আপনার জন—একেবারে ঘরের লোক বলা চলে। সকলেই আমাদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমাদেরই আচার ব্যবহার, নিয়ম ও নিষ্ঠার প্রতিচ্ছবি করছেন, এই জন-গণ-মন প্রতিনিধিরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে। এঁদের কর্মকাণ্ড নির্ভর করছে এখন আমাদেরই ব্যক্তিগত মিত্রম, মিত্রা, কর্তব্যবোধ ও আচরণের উপর।

শুনেছি ধরিত্রী দেবী নাকি সমাজাগ্রত এবং ঘূর্ণায়মান। মানুষের বাস সেই পৃথিবীর উপর। মানুষের জীবনচক্রও ঘুরবে। ঘোরাটাই সত্য। পরিবর্তন। মানবিক আপাতের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত সমাজ-ব্যবস্থার প্রয়োজন তাগিদে মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবর্তন আসাটা প্রাকৃতিক নিয়মাধীন মানু পরিবর্তনের ন্যায় স্বাভাবিক ধর্ম। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। সর্বকালেই পরিবর্তনমুখী নয়া সৃষ্টির পথে নানা অন্তরায়ও ঘটে, পৌর জীবনবিকাশের উপাদানগুলিও ব্যতিক্রম হয়ে থেকে যেতে পারে না, প্রকৃতির গতিশক্তি এখানেও সচল। তাই দেখি, যুগপরিবর্তনক্ষণে মানুষের জীবন গতি ও মতি পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কৃতিরও ধারা বদলে যায়। প্রগতির অগ্রগতি পথে এগিয়ে চলাটাই মানুষের জীবনবিকাশের প্রতীক।

স্বাধীনোত্তরকালে আমাদের পৌর-জীবনে নূতন ক'রে আত্মবিকাশের পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। বিগত পৌর-প্রতিষ্ঠানের একদা অন্যতম পৌরবিনায়ক অ্যাল্ড এ-রাজ্যের কর্ণধার। তাঁর সক্রিয় অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩ সালের পৌর সংবিধান রদ-বদল ক'রে পরিবর্তিত যুগোপযোগী করে ১৯৫১ সালের পৌর সংবিধানে রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৫২ সালের মে মাস থেকে এই সংবিধানানুযায়ী পৌরসভার ও পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি পরিকল্পিত ও পরিচালিত হচ্ছে। দু-বছরের মধ্যে ইহাই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে করলে বর্তমান প্রতিষ্ঠানের মাসিক পদ-মর্যাদা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর অর্পিত করা হবে।

স্বাধীনোত্তর কালে নব নির্বাচিত পৌরনায়কগণের পরিচালিত পৌর প্রতিষ্ঠানে এবার পদগঠনের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বর্তমানে নব পৌর সংবিধানানুযায়ী পৌরসভাতে জাতীয় কংগ্রেস দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন। তাই বলে বিরোধী দলকেও নগণ্য বলে উপেক্ষা করবার নয়। আজকের বিরোধীরাও পৌরবাসীদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁদের মতামত পৌরবাসীদেরই একাংশের মতামত বলে গণ্য হবে। প্রগতিসম্পন্ন ও পৌরবাসীদের কল্যাণকামী এই প্রতিষ্ঠানে সকল দলের মধ্যে সম্প্রীতি ও পরস্পর সহযোগিতার আত্মশোধন ও আত্মকর্তব্য নির্ধারণের দ্বারাই আগামী কালের কোলকাতাকে সুন্দর ও মনোরম করে গড়া সম্ভব হবে। স্বপন-রচিত নানা কল্পনার একটা দিকে যেন এখনই সাড়া জেগেছে। কোলকাতাকে নূতনতর রূপে রূপায়িত করবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। এ-বিষয়ে বর্তমান পৌরসভাগণের এগিয়ে চলবার প্রমাণ পাওয়া গেছে বহুদিনের সাধনার ধন সার্থক হয়েছে এঁদের হাতে—টালিগঞ্জ মিউনিসিপাল এলাকাভুক্ত হওয়ায় কোলকাতা সহরের সঙ্গেই মিশে গেছে সম্প্রতি। বৃহত্তর কোলকাতা নগর পরিকল্পনায় ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কবিগুরুর জন্মভূমি কোলকাতা সহরে তাঁর স্বপ্নরচিত সুন্দর ও মনোরম সহর আজিও গড়ে উঠে নি,—এ-কথা যেন আমরা না ভুলি। বর্তমানের আলো আর আঁধার, সুন্দর ও কুৎসিত মিলিয়ে মোটা কোল-কাতাকে সুন্দর ও মনোরম করতে হ'লে শুধু নিজে আর অকেজো আলো-চনার মধ্যে আমাদের কর্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখলে কোন কাজই হবে না। পৌরবাসী হিসেবে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীগণের উদ্যমীল যোগাতে ও দায়িত্ববোধে সচেতন করতে যতখানি আমাদের অধিকার আছে, তেমনি পৌর প্রতিষ্ঠান কর্মী ও পৌর অধি-

নায়কগণের সঙ্গে সকল কাজে সহযোগিতার দ্বারা নাগরিক কর্তব্য পালন করবার কথা মনে রাখতে হবে। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে পৌর কর্তব্য পালনে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ বাণীকে স্মৃতিপথে স্মরণ করতে হবে। আমরা যেন না ভুলি, আমাদের সকলের ধন দৌলত, বিত্ত জীবন ও ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; আমাদের পৌর সমাজ সেই বিরাট মহামায়ার একটা ছায়া ; এখানকার নীচ জাতি, মূর্খ, বিদ্বান, ধনী, দরিদ্র, ভক্ত, বিজ্ঞ, মুচি, মেথর সকলেই আমাদেরই রক্ত ও আমাদেরই ভাই বলে স্ব স্ব কর্তব্য পালনে তৎপর হতে হবে।

বর্তমান পৌরাধিপতি শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এবং পৌর প্রধান কর্ম কর্তা শ্রীবিনয়কুমার সেনের সহযোগিতায় কোলকাতার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযানের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন এলাকাতে পৌরনায়কগণের প্রতিটি এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সমস্যার সাথে সম্যক পরিচয়ের দ্বারা এই বিরাট সহরের সামগ্রিক কল্যাণই সূচনা করে। বস্তীগুলির উন্নয়ন, সহর থেকে খাটাল অপসারণ, ফুটপাথ দখল করে রাস্তার দোকান থেকে অনধিকারি পথচারীর বিতাড়ন প্রভৃতি প্রস্তাবগুলি আজিও পৌর সভার বিবেচনাধীন। তবে এসব কর্মপদ্ধতির প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে সহরের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধানের মানকে সুচক ও বৃদ্ধিমত্তার পরিচয়জ্ঞাপক। অগ্নিনির্বাপণের সপ্তাহিক অভিযান ব্যবস্থা ও এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিভাগীয় কর্মকর্তারা বিভিন্ন এলাকার গিয়ে পৌরবাসীদের অভিযোগগুলি কে প্রত্যক্ষ দেখা ও প্রতিবিধানের উপায় নির্ধারণ ও বিভাগীয় কর্মচারীদের তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানো, ইত্যাদি কর্মপদ্ধতিকেও অনাগত শুভদিনের শুভ লক্ষণ বলতে হয়। ছেলেমেয়েদের খেলা-ধূলা ও বৈকালিক ভ্রমণ জন্য কোলকাতার বাগান-বাটিকাগুলির সাম্প্রতিক পুনোদ্ধার নগরবাসীদের কাছে বিশেষ আনন্দের বিষয় হয়েছে।

পৌর প্রতিবেশীর জীবন যাত্রা (২)

পৌর জনশিক্ষা বিষয়ে আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান পরম্পরাগত পৌরব সংস্কারকে কেবলমাত্র অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, স্বাধীনদেশের পৌর-জীবন ও সমাজকে উন্নত করবার জন্য নূতনতর পরিবেশে নব-পথ আবিষ্কারে মনঃসংযোগ করেছেন জন সংযোগ বিভাগটী। জনশিক্ষা কথাটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হ'লেও কোলকাতার মতো বিরাট সহরের পৌর সমাজের কল্যাণকে পুরোভাগে তুলে ধরে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এখানকার পৌর শিক্ষা দ্বারা পশ্চিম বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র মহানগরীর মধ্যে যে সামাজিক মনোভাবের সৃষ্টি হবে, তাই হবে এ-রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিটী প্রতিষ্ঠানের উন্নতির প্রকৃষ্ট আদর্শ।

সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিকে এক মনোরম আলোকচিত্র প্রদর্শনী—এক অভিনব জনশিক্ষামূলক প্রদর্শনী বলা যেতে পারে। পৌরাধিকরণের কেন্দ্রভবনের যে স্থানে পৌরবাসীদের সুখ-সুবিধার্থ একটা ছোট-খাটো প্রদর্শনী অনুষ্ঠান আজিসটী অবস্থিত, ঠিক এরই বিপরীত দিকে দ্বিতলে উঠবার সিঁড়ির নীচেতে প্রদর্শনীকে বর্ণন করেছেন যথাযথই। সেখানে এও দেখে এসেছি আমাদের প্রতিবেশী কিভাবে বাস করে—এই নামেই প্রদর্শনীটী সর্বসাধারণে পরিচিতি লাভ করেছিল। প্রদর্শনীর আলোক-চিত্রগুলি এক চিলে দুটি পাখী মারার মতো পৌরপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের মধ্যে আলোকচিত্রবিদ্যার প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে তাঁদের কর্মজীবনের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেওয়াও হোল, আবার পৌরবাসীদের প্রতিবেশীরা কিভাবে বাস করে তাদেরই পাশে, তাও দেখানো হোল। ম্যানচেষ্টার পৌরসভার অন্ত সংলাপেই চিত্ত নিবদ্ধ করেন মি, সেখানে শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন বুদ্ধিমত্তারও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁরই মস্তিষ্কপ্রসূত মন ও জনসংযোগ অফিসারের অন্তরঙ্গত বুদ্ধিতেই সাম্প্রতিক আলোকচিত্র প্রদর্শনীটী জন শিক্ষার জন্য পৌর-সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এঁদের প্রচার কাজের নব উদ্ভাবনকে সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমরাও এলাকে কোন কোন সার্বজনীন প্রদর্শনী উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে।

চিত্রগুলির সাজ-সজ্জার কিছু বুদ্ধির ঝাঁক-অভাব না-থাকাতে পৌর সচেতনার দিক থেকে প্রদর্শনী চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। মনোগ্রাহী

আলোকচিত্রের চিত্রবিচারে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে দেখানো হয়েছে পৌর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূর্ণ মহানগরীর সৌন্দর্যের এক পৌরযোদ্ধন অথবা চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গীতে চিত্রবিচার বিখুঁত পারদর্শিতার চিহ্নের ফুটে উঠেছে নাগরিক জীবনের সর্ববিধ দুঃখের আকর—পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পথি-পার্শ্বের দু-ধারে ছবিগুলি সুরম্য অট্টালিকাশ্রেণি মহানগরীর সৌন্দর্যের অলঙ্কারস্বরূপ। নগরবাসীদের নাগরিক শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতীক হয়ে মনটি খুশীতে ভরে উঠে। পাশা-পাশি—একটু তলাতে ছবির চিত্রগুলির দিকে চোখ ফিরালেই কি দেখেছি—একই সহরের অন্যাংশে, কটিপ্রস্ত মানবের পরিবেশের সীমার ধারে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদেরই আশে-পাশে আমাদের প্রতিবেশী আলো বাতাস-বিহীন, সভ্যতাস্পর্শের বঞ্চিত-বিবর্জিত, কলঙ্কার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কুটীরগুলির দৈন্যের অবশ্য চোখে চড়াতে চাইনি, বেদনা অনুভব করেছি। মুক্ত-পথি ধারার দু ধারে অবস্থিত কুটীরগুলির পরিবেশ দেখে শিউরে উঠেছি। চারপাশে বিক্ষিপ্ত চক্রাকের ছোট ছোট স্তূপগুলিই দুর্বিষহশ্বাস-বায়ু তৈরী শুধু সাহায্য করে না, মফিকাগণ মহানগরের মহাপুরীষাগারের গুরুদায়িত্ব ভোগে। নরকসম দুর্বিসহতার আলোকচিত্রের পরিবেশ থেকে আমাদের ছেলের একশ্রেণির অশিক্ষা ও আলস্য-জড়িত কলহাসির মানসিক দুর্বিচার কথাই কেবল মনে আসেনি, মনে হয়েছে যেন স্বাধীন হয়েও আমাদের মানসিক পরাধীনতার ঐতিহাসিক আত্ম-স্বার্থের অধীনতা ভোগেনি।

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতার চিত্র-বিচারে কৃতিত্ব ও নিপুণতার কথা আমার আলোচ্য বিষয়ের বাইরে, তবু বলবো আমাদেরই পৌরপ্রতিষ্ঠানের পৌরকর্তৃত্ব কাজের কর্মীগণের অন্তরে কোলকাতা সহরের আলো আর আঁধার সুন্দর ও কুৎসিত সমভাবে স্থান পেয়েছে। এবং কোলকাতা বিরাট সহরের পৌরজীবনের সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও মনোরমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি বর্তমান কর্মীদের মানসক্ষেত্রে নিহিত, এ বুঝে নেওয়া যায়। এখন দেখতে হবে, যাঁরা আমাদের এই সহর কোলকাতাকে নোংরা ও কদর্য করে রাখেন, তাঁদের বিরুদ্ধে পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সঙ্গে পৌরবাসীদের সহযোগিতার সমবেত আন্দোলন না-হলে পৌরনায়কগণের কোনও প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারবে না।

আমাদের কোলকাতা সহরকে সুন্দর ও মনোরম করতে হলে পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কথাও ভাবতে হবে, তাদেরও মানুষের মতো বাঁচবার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মীরাই এ-প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত প্রাণশক্তি, তাদেরই নিরলস অভিযানই পৌর জীবন বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে। তাদের সেবা ও সাধনা, নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সংযম পৌরজীবনকে মহান ও পৌরবান্বিত করবে। তবেই সুন্দর জয় করতে সমর্থ। পৌরবাসীদের বিবাচিত প্রতিনিধিবর্গ সদাসেবক ও সহানুভূতি অন্তর দিয়ে পৌর-প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তবেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হবে। এ-কথাও তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, পর্যবেক্ষণ শক্তির স্পর্শিত আবেগে মানুষের শরীর নড়তে পারে, কিন্তু অন্তর তা'তে সাড়া দেবেনা।

• কলিকাতা কর্পোরেশনের জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে কর্পোরেশনের কেন্দ্রভবনে বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক একটী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, কমিশনার শ্রীবিনয়-কৃষ্ণ সেন কর্মচারীদের মধ্যে এইরূপ আলোক-চিত্র গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং জনসংযোগ বিভাগের প্রচেষ্টাতে প্রদর্শনীটি পৌরবাসীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। ক্রমবর্দ্ধমান জনসমাগমের জন্য প্রদর্শনীটী নির্দ্ধারিত তারিখের পরও একদিন খোলা রাখা হইয়াছিল। প্রতিযোগিতায় আলোক-চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-অধিকর্তা শ্রী পি এস মাথুর, ব্রিটিশ সংবাদ সার্ভিসের কর্তা মিঃ ডনেলম্ ব্রাউন ও ফটোগ্রাফার ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রীফাকন মুখোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া যথাক্রমে ১ম, ২য় ও তৃতীয় পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্রেস বিভাগের শ্রীঅমিয় মল্লিক, হিসাব বিভাগের শ্রীশচীন বোস, হিসাব দপ্তর, বিভাগের শ্রীঅমল বোস যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এই রচনাটী উক্ত আলোক-চিত্র প্রদর্শনী অবলম্বনে রচিত।

গান

শ্রীঅজিত ভট্টাচার্য

তোমার গানের নাম্নে আমি তোমায় খুঁজি কবি,
রাঙা-বরণ পলাশ-বনে আঁকি তোমার ছবি।
তোমার যে-সুর তারায় তারায়
বাজে উছল ঝরণা ধারায়—
সেই সুরে আজ পূর্বাচলে জাগে প্রভাত-রবি।
ওগো কবি!

নূতন দিনের বন্দনা-গান কণ্ঠে তোমার লয়,
অনাগতের বরণ-ধ্যানে আবেশ-মোহ-মগ্ন।
দুঃখ-ব্যথার রক্ত-রেখায়
পুরাতনের মৃত্যু-লেখায়—
নীহারিকার আলিম্পনে রচো রাঙা ছবি।
ওগো কবি!

ধপ্‌ধপে
ক'রে কাচা
ঝক্‌ঝকে
ক'রে কাচা
সানলাইট
সাবানের ফেনাতে
না আছড়ে কাচলেও
কাপড়চোপড় সাদা ও
ঝক্‌ঝকে ক'রে দ্যায়!
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
B. 203-50 BG

পিতামহ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হাসা তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল শুধু সিংহ নয়, স্বয়ং কুমারও একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিতেছেন। কুমারকে দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল এতক্ষণ সে যাহা ভাবিতেছিল তাহা ভুল, কুমারের চোখের দৃষ্টি হইতে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে ঔদাসীন্যের কোনও চিহ্ন নাই—তাহা অনুরাগপূর্ণ। কুমার আগাইয়া আসিলেন।

"সুরঙ্গমা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি চারিদিকে"

"ভয় হয়েছিল না কি যে আমি পালিয়ে যাব? আমি হরিণ বা ভেড়ার মতো সাধারণ পশু নই কুমার, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি পালিয়েও যাব না, আপনার সুখের জন্যে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও ইতস্তত করব না"

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার পুষ্পিত দেহ-লতার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগলে কৌতুকদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ—"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম চারিদিকে। মরবার আগে পৃথিবীটাকে ভাল করে' দেখে নিচ্ছিলাম একবার।—"

"সিংহটার সামনে নাচছিলে দেখলাম"

"ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে চাইছে। কিন্তু আমার দেহটা তো দেবতার উদ্দেশ্যে আগেই নিবেদন করেছি, তাই ওকে নাচই দেখাচ্ছিলাম শুধু। গানও শুনিয়েছি কাল রাত্রে—"

সুন্দরানন্দের চোখের দৃষ্টি আরও কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"একটা হিংস্র পশুর প্রতি এ পক্ষপাত কেন বুঝতে পারছি না ঠিক—"

মুচকি হাসিয়া সুরঙ্গমা বলিল, "সম্ভবত ও নিছক পশু বলেই। চলুন, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক এবার। যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে—"

"কাল—"

"আজ কি আমাকে উপবাস করে' থাকতে হবে"

"আমি ঠিক জানি না। মহর্ষি পর্ব্বত কিন্তু তোমাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে চাইছেন না"

"কেন—"

"তিনি বলছেন নারী-পশু যজ্ঞে বলিদান দেওয়ার রীতি নেই। তিনি বলছেন নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে—"

"নিষ্ক্রয় ব্যাপারটা কি"

"তোমার বদলে আর একটি মানুষ বলি দিতে। মহর্ষি বলছেন যথোচিত মূল্য দিলে মানুষ পাওয়া যাবে"

"আপনি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছেন?"

"এখনও হইনি। কাউকে টাকার জোরে বশীভূত করে' তারপর তাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলে বলেই এ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। তোমারি অনুরোধে করেছিলাম। মিশ্মিয়ের কথার উত্তরে তুমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলে—যজ্ঞের আয়োজন করুন আমিই তাতে আত্মাহুতি দেব! জানিনা এ কথা কেন বলেছিলে তুমি—"

"কেন বলেছিলাম তা যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বুঝিয়ে বলবার দরকারও নেই। কারণ ঠিক বোঝান যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি আত্মাহুতি দিতে এখনও আমি রাজি আছি, আমার মত এতটুকু বদলায় নি। তবে মহর্ষি পর্ব্বত যদি আমাকে অমনোনীত করেন সে আলাদা কথা—"

"তুমি বজ্রাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চাইছ কেন"

"আপনাকে ভালবাসি বলে'। ওই ম্লেচ্ছ মিহিরের যে তার তানেকে বিসর্জন দিতে পেরেছে বলে' আপনার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাঁকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমিও তাঁর তানের চেয়ে কিছু কম নই। আর আপনিও তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নন"

"কিন্তু আমি ভাবছি—"

কুমার সুন্দরানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেলেন।

"কি ভাবছেন—"

সুরঙ্গমা সোৎসুকে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"ভাবছি মিহিরের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তোমাকে চিরকালের মতো হারানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?"

"ম্লেচ্ছ মিহির কিন্তু তানেকে হারিয়েই চিরকালের মতো পেয়েছে। আপনিও হয়তো পাবেন আমাকে। সেই ভরসাতেই যজ্ঞের আয়োজন করেননি কি?"

"না। আমি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম আমার দেশের মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু এখন ভাবছি ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিছুক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি—"

সুরঙ্গমার কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরানন্দ বলিতে লাগিলেন, "তাছাড়া, স্পর্দ্ধা করে' কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। তার বৈশিষ্ট্য বিনয়ে নীরব-সাধনায় নম্রতায়। তোমাকে যজ্ঞে যদি আহুতি দিতেই হয় তা তোমার এবং আমার প্রয়োজনের জন্যে দেব। তার সঙ্গে মিহিরের সম্পর্ক কি। তুমি ভেবে বল তোমার অভিপ্রায় কি। তুমি যা বলবে তাই হবে—"

সুরঙ্গমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি যদি এখন আত্মাহুতি দিতে রাজি না হই, আপনি কি যজ্ঞ বন্ধ করে' দেবেন? এত আয়োজন করেছেন"

"যজ্ঞ বন্ধ করব না। মহর্ষি পর্ব্বত যা ব্যবস্থা করবেন তাই করব। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, তাঁর আদেশই পালন করতে হবে। শুধু একটি অনুরোধ তাঁকে করব টাকা দিয়ে কিনে এনে তিনি জোর করে' কাউকে যেন বধ না করেন—"

"কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ কি প্রাণ দিতে রাজি হবে! কোনও উপায়ে তাকে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই"

"তুমি তো স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি হয়েছিলে—"

"আমি তো অনেক আগেই আপনার বশীভূত হয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখনও আমি আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি"

"না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, চল, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—"

সিংহটা আর একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"ও বেচারীর আর একটু নাচ দেখবার ইচ্ছে আছে। আপনি ওই পাথরটার উপর বসুন না, ওকে আর একটু নাচ দেখাই"

সুন্দরানন্দ সহসা সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তাহার পর প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়া বসিয়া বলিলেন, "নাচবার আগে মাথায় কিছু ফুল পরে' নাও। ওই যে লতায় থোকো থোকো ফুল ফুটে রয়েছে, দাঁড়াও পেড়ে দিই আমি—"

নিকটেই একটা বল্লতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছিল, সুন্দরানন্দ উঠিয়া গিয়া কিছু ফুল পাড়িয়া আনিলেন এবং সুরঙ্গমাকে সাজাইতে লাগিলেন। ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া সুরঙ্গমা নাচিতে লাগিল। মনে হইল কোনও অপ্সরী বুঝি নাচিতেছে।

২৩

রাত্রির ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব অন্ধকারকে শব্দ খচিত করিয়া একটা অদৃশ্য জগত সৃষ্টি করিয়াছিল প্রচণ্ড গর্জ্জনে তাহা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন। সেই নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, পাখা ঝটপট করিয়া একদল বাদুড় উড়িয়া গেল। একটি

বৃক্ষতলে চার্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল। অরণ্যে আত্মরক্ষা ও আত্মগোপন করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত দিন যে দুরূহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে তাহার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামিয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল সে। সিংহের প্রচণ্ড-গর্জ্জনে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কি আকাশ-লোকে বসিয়া আছে? চতুর্দ্দিকে এত নক্ষত্র কেন! শব্দটা কি বজ্রের? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এ ভ্রম ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিল জোনাকী-পরিবৃত হইয়া সে বসিয়া আছে, গর্জ্জনটা সিংহের, বজ্রের নয়। সুরঙ্গমা কখন আসিবে? আসিবে কি না? সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল কেন? কাছাকাছি কেহ আসিয়াছে কি? গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করা সমীচীন হইবে কি না, এই ধরণের চিন্তা তাহার মনে পর পর জাগিতে লাগিল। কিন্তু একটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, চার্ব্বাক গাছের তলার ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ভাবিল সুরঙ্গমা যদি সত্যই আসে, কোন না কোন সঙ্কেত দ্বারা সে নিশ্চয়ই আপনার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু চার্ব্বাক বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঝোপের ভিতর হইতে কোঁক্ কোঁক্ শব্দ হইতে লাগিল। চার্ব্বাকের মনে হইল সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বিষধর সর্পের এত নিকটে বসিয়া থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। গাছের নীচে অন্ধকার সূচীভেদ্য ছিল, বাহিরে আসিয়া চার্ব্বাক অনুভব করিল—আকাশের অগণিত নক্ষত্র অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিয়াছে। স্বল্পালোকিত অন্ধকারে সিংহের খাঁচাটা দেখা যাইতেছে। জমাট অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চার্ব্বাকের ব্যক্তিত্বও যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল বটে, কিন্তু অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্বস্তিও ভোগ করিতে লাগিল। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে সে? অপেক্ষা করাও কঠিন। রাত্রি যত বাড়িতেছে, গভীর অরণ্য তত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। তাছাড়া অসংখ্য মশা। কোথাও সুস্থির হইয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার উপায় নাই। এত কষ্ট সত্ত্বেও কিন্তু চার্ব্বাক অবিচলিত ছিল। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা তাহার একবারও হয় নাই। বরং কষ্ট যতই বাড়িতেছিল ততই তাহার সমস্ত হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিবার আগ্রহ তো তাহার ছিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল এই বেদ-পন্থী ভণ্ডদের যজ্ঞটা পণ্ড করিয়া দিবার। সুরঙ্গমাকে সে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া আগ্রহটা হয়তো তীব্রতর হইয়াছিল কিন্তু সুরঙ্গমা না হইয়া অন্য কোন নর বা নারী যদি যজ্ঞীয় পশু রূপে মনোনীত হইত তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যও চার্ব্বাক অনুরূপ কষ্ট-স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। শুধু প্রেমের জন্য নহে, একটা বিশেষ আদর্শের জন্য কষ্ট সহ্য করিতেছিল বলিয়া চার্ব্বাকের আনন্দ হইতেছিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চার্ব্বাক পুনরায় ঘনতর অন্ধকারে আত্মগোপন করিবার জন্য গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় গাছের উপর হইতে সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"মহর্ষি, আপনি এসেছেন না কি। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্য অপেক্ষা করছি"

"কোথায় তুমি"

"গাছের উপর"

"নেমে এস"

সিংহ পুনরায় গর্জ্জন করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন আপনি"

"অনেকক্ষণ"

"আমিও অনেকক্ষণ এসেছি"

"সিংহটা কি তোমাকে দেখেই গর্জ্জন করছে"

"হ্যাঁ। ও, আমার নাচ দেখতে চায়। চলুন, এখান থেকে সরে' যাওয়া যাক"

"কোথায় যাওয়া যায় বলতো। এই জঙ্গলে তো সুস্থির হ'য়ে কোথাও বসবার দাঁড়াবার উপায় নেই"

"আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আপনাকে"

"আমার সাহসের অভাব নেই। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারি"

রোজকার ধুলোময়লার

রোগবীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন

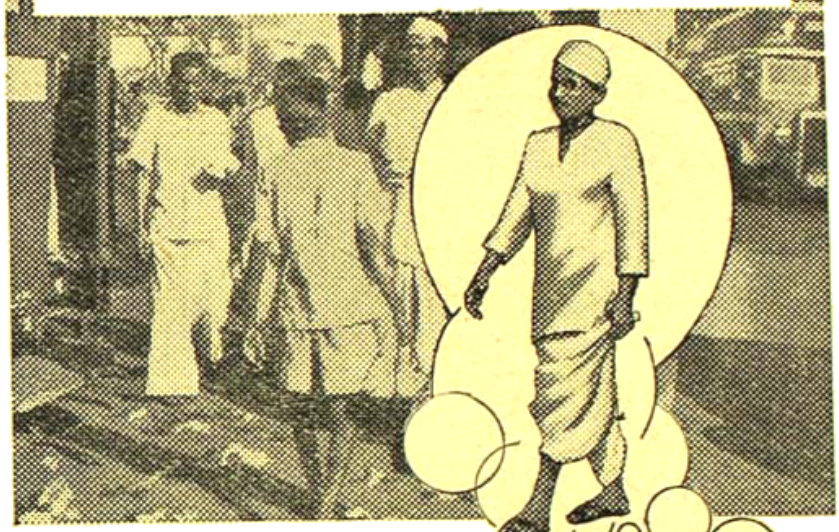

লাইফবয়ের

ফেনার আবরণে

কতই কেন হাঁসিয়ার হোন্ না—প্রতিদিনই আপনি ধুলোবালির রোগবীজাণু থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি নিচ্ছেন। লাইফবয় সাবান ফেনা দিয়া গলার অভ্যাস করে আপনার স্বাস্থ্যকে নিরাপদে রাখুন।

লাইফবয়ের রক্ষাকারী ফেনা ধুলোবালির বীজাণুকে ধুয়ে সাফ্ করে দেয় ও সারাদিন আপনার ত্বককে স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখে।

লাইফবয় সাবান

দৈনন্দিনের রোগবীজাণু থেকে প্রতিদিনের নিরাপত্তা

L. 230-50 BG

"মৃত্যুর মুখেই যেতে হবে, যদি যান"

"কোথা যেতে হবে বল"

"যজ্ঞের জন্য অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে অনেক ঘর তৈরি করা হয়েছিল। সব ঘরগুলো কাজে লাগেনি। পশ্চিমদিকে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়ার বিপদ আছে, যদি কেউ এসে আপনাকে হঠাৎ চিনে ফেলে তাহলে আপনাকে বন্দী করবে। আপনার অপরাধ প্রমাণ করতে শক্ত হবে না, ধারাবতী মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গেই এসেছে এ কথাতো আগেই জানিয়েছি আপনাকে"

"তার চেয়ে চল না এখনই এ অরণ্য ত্যাগ করি। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে, রাত্রির অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না—"

"মাপ করবেন মহর্ষি, তা আমি পারব না। আমি সামান্য নগণ্য হতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ আমি করব না। কুমারকে না জানিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পালাতে পারব না। তবে আপনার বক্তব্য আমি শুনব—"

"কিন্তু তা শুনে লাভ কি—যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ঝেঁকড়ে বসে থাক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এইটেই হল আমার বক্তব্যের মূল কথা—"

"আপনার বক্তব্য শুনে যদি মনে হয় যে আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু কুমারকে বলে' যাব। লুকিয়ে পালিয়ে যাব না"

"কিন্তু কুমার কি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবেন ?"

"তিনি তো চিরকালের মতোই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এ যজ্ঞে তো আমাকেই বলিদান দেওয়া হবে। কুমার তো আপত্তি করেন নি। আমি যদি চলে' যেতে চাই, তাহলেও আপত্তি করবেন না।"

"তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কি তোমাকে বলিদান দেওয়া হচ্ছে ?"

"হাঁ—"

"তোমার এরকম ইচ্ছে করার মানে—?"

"মানে একটা আছে বই কি। সব কথা শুনতে যদি চান তাহলে চলুন পশ্চিম দিকের একটা খালি ঘরে গিয়েই ঢোকা যাক। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ দেখতে পাবে না আমাদের"

"চল—"

অরণ্যের অন্ধকারে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিচিত্র-পক্ষ শুক পক্ষীদ্বয় সেই অরণ্য মধ্যে বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় পাশাপাশি বসিয়াছিল।

"প্রথম শুকপক্ষী দ্বিতীয় শুকপক্ষীকে বলিল, "মানুষের ভাষায় এখন কথা কইব না। এ গাছে অনেক পাখী আছে, তারা ভয় পাবে। তুমি শুকের ভাষায় উত্তর দিও। আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে খুব। সরলভাবে উত্তর দিও। তোমার কি আনন্দ হচ্ছে ?"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"হচ্ছে। আপনার আনন্দ হলে আমার হবে না ?"

"আমার আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি সেটা ?"

"পারছি বই কি—"

"সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি চিরকাল, কত কোটি কল্প এল আর গেল, এ আনন্দের আর শেষ নাই। সৃষ্টির আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। জানি না পালন করে' বিষ্ণু এ আনন্দ পাচ্ছে কি না। পাচ্ছে নিশ্চয়। ধ্বংস করে' মহাশও কি আনন্দ পাচ্ছে ?"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর কি আলাদা ?"

"আলাদা নয়, কিন্তু আলাদা করে' ভাবতে ভাল লাগছে! যে-আমি সৃষ্টি করছি, সেই-আমি আবার অন্যরূপে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছি, একথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ওই চার্ব্বাক-সুরম্যা শিখর-অবরুনা কেউ থাকবে না জানি, কিন্তু আমি নিজেই ওদের ছবি এঁকে আবার নিজেই ছবি মুছে ফেলছি—ভাবতে কি রকম লাগছে। নিজেকে একটা ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না বাণী"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"তা না দিতে পারি। কিন্তু আসলে আপনি একটি খামখেয়ালী শিশু"

"সত্যি ?"

কথাটা বলিয়া প্রথম শুক শুকপক্ষীদের ধরণে খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শিশু ও পিতামাতা

শ্রীগোরাচাঁদ কুণ্ডু

নরনারীর পারস্পরিক প্রেমের সৃষ্টি—সন্তান। পিতামাতা তাই তাঁদের নতুন ক্ষুদ্র সৃষ্টিকে গর্ব্বের এক অপরিহার্য্য বস্তু বলে মনে করেন। জগৎ তাঁদের এই গর্ব্বকে স্বীকার করে—সন্তানের সঙ্গে। দীর্ঘ কয়েক মাস ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষার পর, প্রসবের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্য, মাতা তাঁর সাহসকে অভিনন্দিত করেন—নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেন। কিন্তু এই গৌরবের প্রধান মূল প্রকৃতি। অতএব শিশুর লালন-পালনের অধিকাংশ প্রকৃতির উপর ন্যস্ত করা উচিত।

শিশুর সৃষ্টি মুহূর্ত্তে : কিন্তু সৃষ্টিভাবে বহু বৎসর প্রতিপালিত করে—পত্রপুষ্পে শোভিত বৃহৎ মহীরুহে পরিণত করার কর্ত্তব্য প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতারও অনেক। সন্তানকে নিজের অধিকারযুক্ত জীবন্ত এক সম্পত্তি, কখনই বিবেচনা করেন না। মনে করবেন না যে নিজের খুসীমত তাদের বিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে—ইচ্ছানুসারে গাঁচে ঢালবেন। নিজেকে, নতুন জীবনের একজন অছি (Trustee) মাত্র মনে করবেন। নিজের মনোবাসনা পূরণের পরিবর্ত্তে, মানুষের মাঝে সহজাত অব্যক্ততা (innate potentiality) সকল পরিপুষ্টির পর, পরিস্ফুট হয়—তারে প্রতি দৃষ্টি রাখা আপনার প্রকৃত কর্ত্তব্য বিবেচনা করবেন। হৃদয়ঙ্গম করবেন যে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার আওতায় শিশুকে প্রতিপালিত করে তার ক্রমবৃদ্ধির সহায়তা যদি না করেন, তা'হলে সন্তানের কর্ত্তব্য স্বরূপ, ভবিষ্যতে শিশুর কাছে পিতামাতা কিছুই দাবী করতে পারেন না।

ডাক্তারদের জীবনের এক একটি সম্মোহজনক মুহূর্ত্ত, যখন নবজাতকের ক্রন্দনে প্রাণের সাড়া পেয়ে যায় ; বলতে পারেন—যাক বিপদ কাটল। ঠিক তেমনি নরনারীর সম্মোহজনক সময় তখনই ; যখন পিতামাতা বেশ হাইচিত্তে একাগ্রে বলতে পারবেন—যাক আমাদের বিপদ কাটল, সন্তান সব মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। প্রসব করানর জন্য ডাক্তারকে বেশ কয়েক বছর শিক্ষা করতে হয়। মাতাপিতা, নরনারী প্রত্যেককে শিশুপালনের জন্য শিক্ষা নিতে হবে। সন্তান পালন উদ্দেশ্যে বিধি-নিষেধ কিছু মানতে হবে।

উত্তর হয়ত অনেকে বলবেন—"শিশুপালন উদ্দেশ্যে আমাদের পিতামাতাকে কখন শিক্ষাদীক্ষা নিতে হয়নি। আমাদের তাঁরা বড় করে তুলেছেন তাঁদের সাধারণ বুদ্ধির সাহায্যেই"। তাঁদের এই উক্তি, মানি ; বিশ্বাস করি কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও পিতামাতা তাঁদের শিশু প্রতিপালিত করেছেন সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা। সাধারণ বুদ্ধিকে অঙ্গভাবে বলা হয়, আমাদের সুপরিচিত তথাকথিত পুরাণপন্থা অবলম্বন। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে পুরাণপন্থা অবলম্বন করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ—আমাদের পিতামাতা যতখানি জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে পারতেন, ততখানি আমরা পারি না। দৈনন্দিন ক্রমবর্দ্ধিত পারিপার্শ্বিক চাপ আমাদের অস্থির করে তুলছে। মানসিক ব্যাধিতে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। পুরাতন সব কিছুর উপর আস্থা হারিয়েছি। মানব জনম দুর্লভ জনম। সকল সময়ে তাই আমরা মানবজাতিকে একটি দীর্ঘক জাতিতে পরিণত করতে সচেষ্ট ; সেই কারণে পুত্রকন্যাদের সুষ্ঠুভাবে লালনপালনের জন্য আমরা ব্যগ্র। শুধু এই নয়—বর্ত্তমান বিশ্বের চাপে আমাদের যে পরিমাণ শক্তি অপচয় হচ্ছে ও হচ্ছে ; তার থেকে পুত্রকন্যাদের বাঁচাবার জন্য, সকলেই ইচ্ছুক। এই জন্য শিশুপালনের বিধিনিষেধ মানা প্রয়োজন। সাধারণের ধারণা যে শিশুর জন্মের পর শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন সঙ্গে সঙ্গে তা' প্রয়োগ করে শিশুকে লালিতপালিত করবেন। এ ধারণা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। কারণ শিশুর প্রথম পাঁচ বৎসর অত্যন্ত মূল্যবান বৎসর। এই পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই শিশুর উত্তর জীবনের ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ, ইত্যাদি এমন কি মানসিক ব্যাধিরও বীজ উপ্ত হয়—বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বীজ সকল পরিপুষ্ট হয়ে স্থান, কাল, পাত্র, সময় প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রকাশিত হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যদি শিশু-পালনের শিক্ষা নেওয়া হয় তা'হলে কিছুটা সময় শিশুর নষ্ট হয়। উপরন্তু তাড়াহুড়া করে শিক্ষালাভের ফল ভাল হয় না ; শিক্ষাদানেরও ফল শুভ হয় না।

শিক্ষককে শিক্ষিত হবার জন্য যেমন কিছুটা সময় প্রয়োজন, সেইরূপ শিশুপালনের জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য কিছুটা সময় দেওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণে মনোবিদের মতে শিশু সৃষ্টির সাথে সাথে শিশু লালনপালনের শিক্ষা গ্রহণ করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। আমার মতে দাম্পত্য-জীবনের আরম্ভেই শিশু লালনপালন সম্বন্ধে শিক্ষা নেওয়া কর্ত্তব্য। স্কুল ত্যাগ করে কলেজে ভর্ত্তি হয়ে ছাত্রছাত্রী সকল যেমন কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয় ; নব সম্পত্তিও ঠিক তেমনই কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়। নতুন জীবনের উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও উচ্ছৃঙ্খলতা আসছে জেনে—শিশুপালনের বিধিনিষেধ মেনে প্রকৃত শিশুপালন বেশ কষ্টসাধ্য। প্রথম থেকেই যদি বিধিনিষেধ জানা যায় এবং তা আসছে জানা যায় তা'হলে পরে শিশুপালনে আর তত কষ্ট হয় না। এই জন্য সামান্য কয়েকটি বিধিনিষেধ নিম্নে দেওয়া হল। এই বিধিনিষেধ সকলই মনোবিদের বিরচিত। প্রথমেই বলে রাখি যে—বিধিনিষেধগুলি প্রয়োগ করবার আগে একটু চিন্তা করবেন। অঙ্কের সূত্রের মত চোখ কান বুজে ব্যবহার করবেন না। মনে রাখবেন বিধিনিষেধের কোন একটি একবার ব্যবহারে সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে যে বার বার ভাল ফল পাওয়া যাবে তা' নয় ; আবার কোন একটি বিশেষ কোন এক বালকের উপর প্রয়োগ করায় সুফল পাওয়া গিয়েছে বলে যে প্রত্যেক বালকের ক্ষেত্রেও শুভ—এমন নয়। তবে সকল বিধি-

নিয়েই, আগে পরে, যখনই হোক প্রয়োগ। কখন, কোথায় ও কি ভাবে বিধিনিষেধের ব্যবহার করবেন, সেটা আপনার চিন্তা—সেখানেই আপনার বুদ্ধির প্রকাশ।

প্রবাদটা নিশ্চয়ই জানেন যে "আষাঢ়ে না হলে পুত; হা পুত যো পুত"। অর্থাৎ—আষাঢ় মাসের দিনমান দীর্ঘ, সে মাসে যদি পুত্রো কাটা না হয়, তা'হলে পুত্রার জন্য কষ্ট পেতে হয়। উপযুক্ত সময়ে কোন কাজ না করলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। আপনারা শিশুদের যদি সময় মত লালনপালন না করেন, পরে অনুতাপ করে বা ঔষধ খাইয়েও ভাল করতে পারবেন না।

অনেক পিতামাতার ধারণা যে শিশুদের ছোটবেলা থেকে বেশী দেখাশুনা করতে না গিয়ে ও সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশতে না দিলে তারা সহজেই ভীরু হয়। অনেককে বলতে শুনেছি যে "ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট পাটে"। বাইরে মিশতে দিয়ে ওদের নষ্ট করে কেনব! তার চেয়ে ঘরে বন্ধ হয়ে থাকা অনেক ভাল। এই সমস্ত শিশুদেরই প্রাপ্ত-বয়স্কদের দেখা যায় অস্বাভাবিক, অমিশুক জীব বিশেষ। এরা বাইরের না পায় সাহায্য; খুঁজে না পায় পারি। এরাই বেশীর ভাগ মানসিক অসুখে অসুস্থ হয়, নানা রকম মানসিক ব্যাধিতে ভোগে। তাই শিশুদের ঘরছাড়া না করে বিভিন্ন বয়সানুযায়ী সমবয়স্কদের সঙ্গে মেলতে দেওয়া উচিত।

শিশুর প্রীতি অপরিসীম। স্নেহমমতার আধারে শিশু একে অন্যের সহিত মিশতে শেখে, নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হয়। দায়িত্বপূর্ণ কাজের মূল্য বোঝে, এবং ঐ সমস্ত করে সন্তোষপ্রবৃত্তি (প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা) তাদের পূরণ হয়। পিতামাতা শুধু শিশুর খেলাধূলার উপর নির্ভর করে থাকলেই চলবে না। শিশুদের সন্তোষ প্রবৃত্তি (যথা—সাবাস, প্রশংসা পাবার, সঙ্গীতের সঙ্গে খেলবার ইত্যাদি) যাতে পূরণ হয়, সেদিক দৃষ্টি রাখবেন। বয়সানুপাতে তাদের শক্তি ও বুদ্ধি বিবেচনা করে, উপযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবেন, সাথে সাথে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাও দেবেন।

দায়িত্বপূর্ণ কাজ শিশু যাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে সমাধা করতে পারে, তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। নিজের ইচ্ছানুসারে পিতামাতা কখনই শিশুর চিন্তা বা ভাবধারাকে পরিচালিত করবেন না, উপরন্তু তাদের অভাব, অভিযোগ সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন।

সময় সময় শিশুদের অভাব, অভিযোগ, অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে। এমন কি নিজেদের মনোভাবের পুরণের জন্য তারা এমন অনেক কাজ করে যা "বোম" বলে বিবেচিত হয়। পিতামাতা আবার কখনো মিষ্ট কথা বলে শিশুদের আবদার অস্বীকার বুঝিয়ে দেবেন; সেই সঙ্গে দোষ সংশোধন করবারও চেষ্টা করবেন। এই পন্থা, একেবারেই দুঃসাধ্য নয়। প্রথম থেকেই যদি শিশুকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা হয়; তা'হলে সহজে রূঢ় ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু একবার রূঢ় ব্যবহার দ্বারা পরিচালিত করলে পরে আর মিষ্ট কথায় চালিত করা সহজসাধ্য নয়। কথায় আছে, "লাখির চোটে কি ছেড়ে উঠে!" অর্থাৎ যাদের স্বভাবই প্রহার দিয়ে কাজ করান হচ্ছে; তাদের কাছ থেকে বাধ্য বাধ্য হয়ে কাজ পাওয়া যায় না।

অনেক সময় শিশুরা মিষ্ট কথা শুনতে না বলে মনে হয়; পিতামাতা তখন বলপ্রয়োগ করেন। এখানে জানা প্রয়োজন যে শিশুরা বিধি, নিষেধ, উপদেশ প্রভৃতি শুনে বিশেষ কিছু শিক্ষা করে না। তারা পিতামাতা ও গুরুজনস্থানীয়দের আচার ব্যবহার, কথাবার্তা, হাবভাব ইত্যাদি দেখে শিক্ষা করে। অতএব শিশুদের সামনে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সংযমী হবেন।

শিশুদের স্বাবলম্বী হতে শেখাবেন। তাদের অতিরেক কাজ চেষ্টা করতে দেবেন। অযথা তিরস্কৃত হয়ে নিরুৎসাহ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সকল প্রকার বিপদ আপদের সম্মুখীন হবার উৎসাহ দেবেন। সুখ দুঃখ সহ্য করার শক্তি অর্জন করতে শেখাবেন। কিন্তু পিতামাতা শিশুর দুঃখ কষ্টে ধীর থাকবেন।

বহুক্ষেত্রে দেখা যায় সন্তানের দুঃখ কষ্টে মাতা ধীর থাকলেও পিতা স্থির থাকতে পারেন না; অথবা পিতা শান্ত থাকলেও মাতা অধীর হন। অনুরূপ মাতাপিতা উভয়ে সকল সন্তানকে সমান ভালবাসেন না। ফলে সৃষ্টি অশান্তির সৃষ্টি হয়—সংসারে আগুন ধরে। প্রতিকার স্বরূপ বলা যায় যে পিতামাতা উভয়েই সন্তানকে সমান ভালবাসবেন।

চার থেকে আট নয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা পিতার নিকটে থাকতে ও নানা প্রশ্ন করতে চায়। মাতা এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হন, অভিমানও করেন সময় সময়। কিন্তু মাতার অভিমান না করে শিশুর এ কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। এমন কি যে পিতা শিশুর সঙ্গে থাকতে চান না; তারা যাতে কিছু সময়ের জন্যও সন্তানের সঙ্গী হয়ে তাদের সাথী হন সে বিষয়ে মাতার শিশুদের সাহায্য করা কর্ত্তব্য। মনে রাখবেন কেবল মাত্র মাতার বা পিতার শিক্ষাতেই শিশু লালিতপালিত হয় না, উভয়ের শিক্ষা-দীক্ষা শিশুর মনে প্রতিফলিত হয়। মনে রাখবেন একজনের কর্ত্তৃত্বাধীনতায় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

পিতামাতাই শিশুর সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান বন্ধু। জন্মের পর হ'তেই শিশু পিতামাতাকে কাছে পায়—উপলব্ধি করতে পারে যে তাকে সকল রকম সুখ সুবিধা দেবার জন্য তাঁরা সকল সময় চেষ্টিত ও সমস্ত রকম বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁরা ব্যস্ত। এই কারণে শিশু সর্ব্বপ্রথম পিতামাতার কাছেই মনের কথা খুলে বলে। পিতামাতাও শিশুর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন যাতে শিশুর এই বন্ধুভাব জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত থাকে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা উপহাস করে শিশুর মনে আঘাত দেবেন না। অনেক সময় শিশু কি, কেন, কোথায় প্রভৃতি প্রশ্ন করে পিতামাতাকে বিপদগ্রস্ত করে। বহুক্ষেত্রে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও কি ভাবে উত্তর দেবেন ভেবে পান না। (যেমন যৌন বিষয়ক প্রশ্ন) সেখানে আপনারা ডেঁপো বা আজিল ইত্যাদি বলে তাদের কৌতূহলকে চাপা দেন। এটা অন্যায়। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করবেন। (যৌন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর কি ভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয় পরে আলোচিত হবে)। জোর করে তাকে খাবারেন না। এমন কি

ডালডা বনস্পতি দিয়ে রান্না কোরলে যে কোনো ভোজের আয়োজন সার্থক হয়। সব রকম রান্নার পক্ষেই ডালডা বনস্পতি বিশেষ উপযোগী। বায়ু-রোধক সীল-করা টিনে ডালডা বনস্পতি সর্ব্বদা তাজা বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর অবস্থায় পাবেন। বিয়ের ভোজের জন্যে ডালডা বনস্পতি চাইই-চাই। আর এতে খরচও কত কম!

কি কোরে ভালভাবে বিয়ের ভোজের আয়োজন করা যায়?
বিনামূল্যে উপদেশের জন্য আজই লিখে নিন:
দি ডালডা এ্যাডভাইসারি সার্ভিস্ (পোঃ, আঃ, বক্স, নং ১০৩, বোম্বাই ১)

ডালডা
বনস্পতি

HVM. 722. X52 BG

জোর করে এক কাজ থেকে অন্য কাজ করাবার চেষ্টাও কখন করবেন না।

অবশ্য আমি একথা বলছি না যে শিশুর সকল আবদারের প্রশ্রয় দেবেন। বরং এ কথা বলব যে সকল আবদারের প্রশ্রয় দেবেন না। কোন ছাত্রকে, যে শিশুর আবদার প্রশমিত করার জন্য, স্কুলক্লাসেও যেন অন্য ছেলেদের সঙ্গে তুলনা করবেন না। মনে রাখবেন শিশুর চিত্ত অতি চঞ্চল; এক বিষয় বস্তু থেকে অন্য বিষয় বস্তুতে অতি শীঘ্র ধাবিত হয়। পিতামাতা শিশুর চঞ্চল চিত্তের সুযোগ গ্রহণ করবেন। নিজেদের বুদ্ধির দ্বারা পরিবেশ অনুধাবন করে, শিশুর মন আবদারের বিষয়বস্তু থেকে অন্য বিষয়বস্তুতে পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত করতে পারেন অনায়াসে। "তোর চলবলচ্চিত্তির কথনই প্রয়োজন হয় না শিশুর আবদার থামাবার জন্য। আবার মনে রাখি যে জোর জবরদস্তি করে ক্ষুব্ধ শিশুকে থামাবেন না। জোর জবরদস্তি করে ক্ষুব্ধ শিশুকে থামাবার ফল ত ভাল হয়ই না, বরং মৈহিক ও মানসিক দু'য়েরই ফল অশুভ হয়।

আপনারা ক্ষুব্ধ শিশুকে বিশ্বাস করেন না। শিশুদের সামান্য ভুল ভ্রান্তি তাই আপনাদের বিচলিত করে। শিশুদের অস্বাভাবিক বাসনা ও ব্যবহার দেখে আপনারা ভীত হন, আতঙ্কিত হন। বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুদের অস্বাভাবিক ইচ্ছার প্রকাশ বলে বর্ণিত অধ্যায়, প্রকৃতপক্ষে শিশুদের দ্বারা সংঘটিত হয়নি। পিতামাতার অজ্ঞান মনের অবদমিত অস্বাভাবিক ইচ্ছা শিশুর উপর অভিক্ষেপিত (projection) হয়েছে। পিতামাতা সজ্ঞানে যে এই করেছেন তা নয়; সম্পূর্ণ নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁদের এই মানসিক কার্য্য সাধিত হয়েছে। এই অস্বাভাবিক ইচ্ছার অস্তিত্ব যে আপনার মনে, তা আপনারা অনুধাবন করতে পারেন না। চলতি কথাই আছে তাই, "আপনি যেমন তপর তেমি তেমন।"

অস্বাভাবিক ইচ্ছা বা কার্য্য আমরা পছন্দ করি না। তাই আমরা শিশুর কোন অস্বাভাবিক কার্য্য বা ইচ্ছা দেখলেই তা দমন করবার জন্য চেষ্টিত হই। শিশুকে তিরস্কার ও প্রহার করি তার "দুষ্কর্ম্ম" দূরীকরণের জন্য। এই কারণে শিশুকে জোর বা অবশ্য শাসন করা উচিত নয়। প্রহার যতদূর সম্ভব ত্যাগ করা উচিত। সহ্যাদতা স্থানান্তর প্রভৃতির ধারণা শিশুর চিত্তে অতি প্রবল। শিশুর অন্যায় আচরণ রোধবার চেষ্টা না করে তার প্রতি কঠোর ব্যবহার করলে বা সামান্য দোষে কঠোর শাস্তি দিলে—শিশুর মনে তা গভীর ক্ষত রূপে অবস্থান করে। শিশু প্রতিশোধের জন্য সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। প্রতিশোধ তারা নেবেই—সে আজই হক বা বৃদ্ধি বয়েসেই হক। প্রতিশোধের রূপ এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যে পিতামাতা চমকে উঠেন—শিশুর বন্ধুবান্ধব বা অন্ধকার উপর দোষারোপ করে নিজের মনকে প্রবোধ দেন। শিশু প্রতিশোধের রূপ অন্য কার কাছে দেখে না—পিতামাতার কাছ থেকেই দেখে। মনে করুন একদিন আপনি রাগ করে শিশুকে অথবা শিশুর প্রিয় কাউকে বলেন যে "লাথি মারব।" আপনি মুখে বলেন কিন্তু শিশু একদিন সত্যই লাথি মারল। এ সব যদি শিশুকে সংশোধিত না করা হয় তা'হলে পরে যে শিশু লাথি মানুষকে না, কিম্বা লাথি মারব বলবে না এ ধারণা একেবারে অনুচিত।

সংশোধনের জন্য আমি শিশুকে প্রহার করতে বলছি না। পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রহার যতদূর সম্ভব ত্যাগ করা উচিত। এ ধারণা অবশ্য আজকাল বহুলভাবে প্রচলিত হয়েছে। এটা বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দান মনে করে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। সামান্য কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিজ্ঞান যা প্রকাশ করেছে; তার বহু পূর্ব্ব থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, "ছেলে ধরে, কাপড় ছেঁড়ে; আপনার ক্ষতি আপনি করে।"

একথাও আপনারা মনে করবেন না যে শিশু লালনপালনের জন্য অত্যধিক আদর দিতে হবে। দোষ সংশোধনের জন্য মাঝে মাঝে সামান্য তিরস্কারের প্রয়োজন হতে পারে। তিরস্কারের পর শিশুকে ভালবেসে আদর কোলে টেনে নিতে হবে; তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার ভালর জন্যই তাকে তিরস্কার করা হয়েছিল। কোন অন্যায়ের জন্যই শাসন করার জন্য শিশুকে দূরে ঠেলে রাখবেন না—কিম্বা অতি সামান্য সময়ের জন্যও তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করবেন না। পিতামাতার এইরূপ আচরণ যদি শিশু লক্ষ্য করে, পরে তা'হলে পিতামাতার বা আত্মীয়-স্বজনের সহিত ঐরূপ আচরণ করতে দ্বিধা করবে না। শাসন করার পর শিশু যাতে অভিমান করে না থাকে তার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। সেই কারণে শাসিত শিশুকে একটু বেশী সমাদর করবেন এবং সম্ভব হলে কিছু-ক্ষণের জন্য কাছে রাখবেন—মিষ্টি কথা বলে তাকে তুষ্ট করতে চেষ্টা করবেন।

শাসন করার অভিনয়ে পিতামাতা ভূত প্রেত বা ভূতুর ভয় দেখিয়ে থাকেন। ভূত, প্রেত, ভূতু প্রভৃতির ভয় শিশুর মনকে দুর্ব্বল করে দেয়। শিশু আতঙ্কগ্রস্ত হয়। এর উপর যদি এটা পারবে না, ওটা পারবেনা; —পারবে না, পারবে না বলে নিরুৎসাহ করা হয়—তা'হলে শিশু নিজের প্রতি বিশ্বাস হারায়; মনে হীনতা ভাব (inferiority complex) বাসা বাঁধে। ফলে উত্তরজীবনে উৎসাহিত হয়ে নতুন কিছুর সৃষ্টি অথবা কোন কিছুর ভার নেওয়া শিশুর পক্ষে দুঃসাধ্য। সকলের পিছনে সে পড়ে থাকবে।

পিতামাতা শিশুদের সামনে ঝগড়া করবেন না, বা অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি যতদূর সম্ভব কম রূঢ় ব্যবহার করবেন। কারণ আপনাদের রূঢ় ব্যবহার দেখেই শিশুরা খারাপ ব্যবহার করতে শেখে—ঝগড়া করে। শিশুদের ঝগড়ায় তখন হস্তক্ষেপ করবেন না; নিজেদের মীমাংসা করার জন্য উৎসাহ দেবেন এবং যাতে নিজেরা মিটমাট করে তার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। আপনারা যদি হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে তাদের জীবনের প্রায় শেষ দিন অবধি ঝগড়া করে যাবে—কিন্তু মীমাংসা করতে পারবে না আর কোনদিন।

শিশুদের কাছ থেকে যদি শ্রদ্ধা পেতে চান তা'হলে মাঝে মাঝে শিশু-দের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাবেন। তাদের মতামত বা পরামর্শকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না বা ধমক দিয়ে তাদের থামাবেন না—সে মতই অযৌক্তিক হোক না কেন। তাদের পরামর্শ যদি গ্রহণ করতে না পারেন তা'হলে সময় মত বুঝিয়ে দেবেন যে কেন তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারলেন না। ভবিষ্যতে যাতে আরও ভাল মতামত দেয়, তার জন্য তাকে উৎসাহ দেবেন।

উপসংহারে বলে রাখি যে পিতামাতা বলতে কেবল মাত্র পিতা-মাতাকেই বোঝাচ্ছি না। পিতামাতা, শিক্ষক, গুরুজন ও ভবিষ্যতের সকল মহামান্যকেই আমি পিতামাতা রূপে অভিহিত করেছি আমার বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্য। সর্ব্বশেষে প্রকাশ করি যে শিশুকে সকলের নিকট হতে দূরে রাখবার চেষ্টা করবেন না। লেখাপড়া না শিখলেও কেবল ভদ্রসমাজে থাকলেই শিশু অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবে। কথায় আছে, "পড়ুক বা না পড়ুক পো, সভায় যেতে শো।" তাই অনুরোধ করি নিজেদের দোষ ত্রুটি সংশোধন করুন; শিশুকে ভদ্র হতে সহায়তা করুন—সমাজকে ভদ্র হতে ভদ্রতম করে তুলুন।

যোগ-ব্যায়াম

শ্রীলাবণ্য পালিত

আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু···সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। যে কোন কাজ করুন না কেন তার মূলে আছে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য অর্থাৎ সু-স্বাস্থ্য···। ছোট বড় সকল কাজেরই উৎসাহ আনে আমাদের স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ···নিরুৎসাহ ব্যক্তিকে আমরা রুগ্ন বলতে পারি। যার কাজ করবার ক্ষমতা নেই··· মানুষকে কাজে অনুপ্রেরণা জাগাবার সামর্থ্য নেই যার অনাবিল পবিত্র আনন্দ নেই···, দিন রাত যে আছে রোগ-শয্যায়···তার জীবন হ'য়ে গেছে জড়·· পঙ্গু! কোন সৎ চিন্তা তাকে দেবেনা আনন্দ···কোন বিবেক বুদ্ধি তাকে দেখাবে না শুভ পথ···!! সৎ চিন্তা, বিবেকবুদ্ধি আসে কোথা থেকে? স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্যবতী মানুষের কাছ থেকে। ভগবানের ধ্যান করতে গেলেও সুস্বাস্থ্যের প্রয়োজন— সংযমের প্রয়োজন। সংযম আসে সুস্বাস্থ্য থেকে। স্বাস্থ্য ভাল না হলে কোন কাজেই একাগ্রতা আসবে না, বার্ধক্যে মন বসবে না···। তাই কুস্বাস্থ্য হোল মানুষের প্রধান শত্রু।

যে কোন পরিবেশের মাঝে নিজেকে ঠিক্ সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হ'বে। তবেই জীবনকে সমাজের কাজে উৎসর্গ করতে পারবো···, তবেই হ'বে দেশের দশের সেবা। তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হ'লে চাই সু-স্বাস্থ্য অর্থাৎ জীবনী-শক্তির বিকাশ।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে রোগ ও রুগীর সংখ্যা সব চাইতে বেশী! এটা আমাদের পক্ষে কম লজ্জার কথা নয়। খাদ্য পথ্যের বিচার করে যদি দেহের স্বাস্থ্য বিকাশের চেষ্টা করা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হ'তে পারবো শরীর গড়ার কাজে। বাংলা মায়ের চরণে হাত রেখে বলতে পারবো—শক্তিরূপিণী মা, শক্তি দাও···শান্তি দাও···

বিভিন্ন রকম শরীর চর্চ্চার ভেতর দিয়ে আমরা নীরোগ শরীর গড়তে পারি, তার মধ্যে 'যোগাসন' প্রণালী একটি। শুধু এটুকু বললেই তার যথেষ্ট গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না··, যোগ-প্রণালী দ্বারা শরীরচর্চ্চা করার পক্ষপাতী ছিলেন আমাদের মুনিঋষিরা; তাঁরা এই ভারতবর্ষের তপোবনে বসে শত শত বছর ধরে যোগাসনে ভগবানের ধ্যান ধারণায় লিপ্ত ছিলেন। তাঁদের কোন অসুস্থতাই বিপদে ফেলতো না, তার কারণ তাঁরা ঐ যে একাসনে দীর্ঘ দিন ধরে ধ্যান করতেন এতে তাঁদের শরীরে ব্যায়ামের কাজ হোত··· এই ভাবে বিভিন্ন রকম 'আসনে' বসে তাঁরা ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ-সাধন করতেন, তাই এর নাম হ'য়েছে 'যোগাসন'। অবশ্য আমরা গৃহী, সাধু সন্ন্যাসী নই। সেই হেতু আমরা এই 'যোগাসন'কে শুধু ব্যায়ামরূপে ব্যবহার করে দেখ্‌ছি, এতে বহু লোকের হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হ'য়েছে।

আজ আপনাদের কাছে আমি এনেছি তার প্রেরণা, যদি আপনাদের কোন উপকারে লাগে তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

পদ্মাসন

ধ্যান ধারণার আসন। আপনারা অবশ্য এইটি বিশেষ করেই জানেন, তাই গোড়ার দিকে 'পদ্মাসন' দিয়েই

পদ্মাসন

আরম্ভ করলাম। ছবিটি দেখে বুঝেছেন নিশ্চয়ই যে কেমন ভাবে বসতে হ'বে, প্রথমে শরীর সোজা করে বসবেন, তারপর একটির পর একটি পা উরুর ওপর তুলবেন। পা দু'টির গোড়ালি যেনো তলপেটের কাছে ঠেলে

যায়। এই বসে দু'টি হাত পরস্পর আঙুল জড়িয়ে ছবি অনুযায়ী ধ্যানের ভঙ্গিতে রাখবেন, অথবা দু'হাঁটুর ওপর হাতের তালু দু'টি রেখে দেবেন সাধারণভাবে। দেহের মধ্যে কোন রকম অস্বস্তি থাকবে না, আর দেহ শক্ত করবেন না, সহজ ভাবে বসে আসন করবেন। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হওয়া উচিত। ৩ বার আসন করে, প্রতিবার শুয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল করে বিশ্রাম করবেন।

উপকারিতা

বয়স্কদের পায়ের বাতের পক্ষে এ আসন অত্যন্ত উপকারী। এই আসনে যদি প্রথম থেকেই অভ্যস্ত থাকেন, তাহলে পায়ের পেশী নমনীয়তা বজায় থাকবে। তাছাড়া ধমনী ও শিরার গায়ের স্থিতিস্থাপকতার শক্তি দৃঢ় হয়। এই জন্যে পায়ের রক্ত চলাচলের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয়।

রক্তের প্রবাহশক্তি সহজ ভাবে হতে থাকলে দেহের মল ঠিক্ ভাবে বেরিয়ে আসে তাছাড়া দেহের ভেতরে মল জমে যে সকল শক্ত অসুখ হবার সুযোগ থাকে, তা নষ্ট হয়।

ক্যানভাসার

শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায়

"পিপাসার শান্তি—তানসেন গুলি……"

শেয়ালদা ষ্টেশনে আপ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে বসে আছি—ট্রেণটা ছাড়তে আধঘণ্টা দেরী—এর মধ্যে যদি ঘুম আটকে মরে না যাই তবেই ভরসা হবে আবার মাতৃভূমি দেখতে পাবো, এই ভীড়েও কি কৌশলে জানিনা ক্যানভাসার দুই বাড়িয়েছে—বারোয়ারী পুজোর মাইকের মত কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে চলেছে তার মুখস্ত করা বুলি, তানসেন গুলি, আশ্চর্য মলম, সার্জিক্যাল অয়েলের গুণগান, মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠলেও কিছু বলতে মুখে আটকাচ্ছিল। কিন্তু বলবার লোকের অভাব হলনা—আমার বয়সী একটি ছেলে বলে উঠলো, "কেন মিথ্যে এখানে চেঁচাচ্ছেন—বাইরে গিয়ে যত খুসি চেঁচান।" ক্যানভাসার এতে বাধার কোন লক্ষণই গ্রাহ্য করলেনা, ধীরে সুস্থে বক্তৃতা শেষ করার পর সে তার সুটকেশটা বন্ধ করে বাইরে চলে গেল—পাশের কামরা থেকে ভেসে এল তার কণ্ঠের পুনরাবৃত্তি · "সার্জিক্যাল অয়েল…"

বাবা ছিলেন সরকারী চাকুরে, বদলী হলেন কৃষ্ণনগরে, নতুন স্কুলে ভর্তি হয়েছি, প্রথম দিনেই একটা ডিবেটিং ক্লাস ছিল—বিষয় "ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত"। এতদিন ছিলাম বাংলার বাইরে—তবু বাংলাভাষার ওপর টান ছিল সবচেয়ে বেশী। এই ক্লাসে বাংলাকে সমর্থন করে যে বলতে উঠল তাকে চিনলাম—সে সেদিন লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ক্যানভাসারটাকে তাড়াতে চেয়েছিল। আধঘণ্টা ধরে চমৎকার যুক্তি দিয়ে যখন সে বসল তখন বিপক্ষে কাউকেই দাঁড়াতে দেখা গেলনা—শিক্ষকের অনুরোধ তাদের ভাষাপ্রীতি টলাতে না পারায় আমিই উঠলাম কিছু বলতে—যখন শেষ করলাম তখনও বুঝতে পারছি বাংলার স্বপক্ষের প্রায় যুক্তিই আমি খণ্ডন করতে পারিনি। সেই দিন টিফিনে রাস্তার ধারে তার সঙ্গে আলাপ হল—নাম তার রণেন—আশা ভবিষ্যতে সে হবে ব্যারিষ্টার।

বছর দুয়েক পরের কথা—কৃষ্ণনগর কলেজে পড়ছি, বহুদিন পর হঠাৎ রাস্তায় রণেনের সঙ্গে দেখা, অনেক কথা হল—ম্যাট্রিক পাশ করে সে কলেজেই ঢুকেছিল। বোধহয় খরচ চালাতে না পেরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়েছে—কোথায় যেন সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখছে—ব্যারিষ্টার হবার আশা আর তার নেই। সে চায় একজন নামকরা 'ষ্টেনো' হতে।

ছাত্রজীবনের কটা বছর কেটে গিয়েছে—তারপর এই বেকার জীবনের দিনগুলো যেন আর চলতে চায়না, দিনের পর দিন, দরখাস্তের পর দরখাস্ত ছেড়ে চলেছি—হঠাৎ চাকরী একটা মিললো—বাংলা ছাড়িয়ে সুদূর মাদ্রাজে, বাক্স বিছানা গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম কলকাতার দিকে—ডাউন লালগোলা প্যাসেঞ্জার—কোনক্রমে মালপত্তর তুলে একটা কোণে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়াবার জায়গা পেলাম। পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই শোনা গেল এক বাঙ্গালী গলার আওয়াজ "Passengers Look at me, I am not a Canvasser" বক্তৃতার অভিনবত্বে আগ্রহ হল ক্যানভাসারটিকে দেখবার—বহু কষ্টে যখন দেখতে পেলাম তখন নিজের চোখের ওপর নিজেই যেন বিশ্বাস হারিয়েছি, ক্যানভাসার—রণেন।

দিনে দিনে আরও মসৃণ ও রমণীয় ত্বক্

রেক্সোনার ক্যাডিলুক আপনার জন্যে এই যাদুটি ক'রতে দিন

রেক্সোনার ক্যাডিলুকে ফেনা আপনার গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিন ও পরে ধুয়ে ফেলুন। আপনি দেখবেন দিনে দিনে আপনার ত্বক্ আরও কতো মসৃণ, কতো নির্মল হ'য়ে উঠছে।

রেক্সোনা

ক্যাডিলুক একমাত্র সাবান

★ ত্বকবিশেষজ্ঞ ও কোলগেট-এর কর্তৃকগুলি বৈশেষিক বিশেষ সংমিশ্রণের এক অনিবার্য ফল

BP. 101-50 BO

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড থেকে ইংরেজি প্রচার

জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

আর কারণে এ অধিবেশনটি উল্লেখযোগ্য ও অভূতপূর্ব হয়ে থাকবে। কেন্দ্রীয় রাজধানির বাইরে এই দ্বিতীয় অধিবেশন হলেও রাজস্থান বা রাজপুতানার এই হল সর্বপ্রথম অধিবেশন, তাই এর দিক থেকে গুরুত্ব আছে।

অতীত আর বর্তমান—রাজপুতানার উষর মরুভূমি আর শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ—স্বাধীনতা রক্ষার রাজপুতের আত্মদান আর স্বাধীনতালাভের জন্য বাঙালীর আত্মবলি—রাজপুতানের বীরত্ব আর বাংলার প্রেম—রাজপুতের অমিত তেজস্কর আর বাংলার সোনার আখরে লেখা সে ইতিহাস, তার মাঝে যেন স্থান ও কালের দূরত্ববিহীন বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনটি হোলো! অতীতে বাংলার সম্পদ আর বাঙালীর উদ্ভট

মূল সভাপতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

প্রস্তাবটি দিয়ে ডেকেছিল মোগল সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহকে, বাঙালী সেদিন নিজের পরিহাসে জয়পুর রাজের নিকট পরাজয় স্বীকার করে বিজয়ীকে উপঢৌকন দিয়েছিল পরীক্ষিতে কেদার রায়ের মেয়েকে আর দেবী কণোজেশ্বরীকে! পরবর্তী কালে নির্বাসিতা বাঙালীর দেবী আর বৃন্দাবন হতে নির্বাসিত বাঙালীর প্রেমের ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়লো রক্তবিজয়ী রাজপুতের শির! ধীরে ধীরে পরবর্তী কালে বাঙালীর বিদ্যাবুদ্ধি, মনীষা ও সংস্কৃতি একটা উচ্চ আসন অধিকার করলে, জয়পুরকে নতুন সাজে, নতুন ভাবে গড়ে তোলবার কাজে! সুতরাং বিজয়ীর কাছে বিজিতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য যেখানে প্রভার আসন পেয়েছে—সে মিলনতীর্থে, যেখানে আজও একজন বাঙালী রাজকন্যা বীর মহারাজ রাজপ্রভুদের মহিষী রূপে অধিষ্ঠিতা—নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাদর আহ্বান, বাঙালীর হৃদয়কে নতুন করে জয় করবার প্রচেষ্টা নয় কি? বাঙালী যে প্রেমের হাতছানিতে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি, তার প্রমাণ এ অধিবেশনে সাড়ে চারশোরও বেশী ডেলিগেটের সাদর আমন্ত্রণে ছুটে যাওয়া। অন্য কোন কারণ না থাকলেও শুধু এই একটি কারণেই জয়পুর-অধিবেশনটি উল্লেখযোগ্য বলে দাবী করতে পারতো!

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন জয়পুরের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ৺কাম্বিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি রাজস্থান বিধান সভার একজন সদস্য! তাঁরই প্রচেষ্টায় আগতীতসংখ্যক ডেলিগেটদের বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল এম্ এল্ এ দের জন্য নির্দিষ্ট বিরাট গবর্ণমেণ্ট হোষ্টেলে। সম্মেলনের অধিবেশনের জন্যও স্থান হয়েছিল ঐ প্রাসাদোপম অট্টালিকার প্রাঙ্গণে। প্রতি দুটি ঘরের কামরার সঙ্গে একটি করে স্নানাগার ছিল এবং প্রথমে ব্যবস্থা হয়েছিল যে প্রতি কামরায় দুজন করে ডেলিগেট থাকবেন, কিন্তু ডেলিগেটের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার জন্য অগত্যা প্রতি কামরায় দুজনের পরিবর্তে ছয়জনের থাকার ব্যবস্থা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ডেলিগেটদের খাওয়ানোর ভার দেওয়া হয়েছিল হোষ্টেল সংলগ্ন হোটেলটির উপর—প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, সান্ধ্য চা এবং নৈশভোজনের জন্য প্রতিদিন চারখানি করে কুপন বা টিকিটের সাহায্যে।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে আমরা কোলকাতার প্রায় একশোজন ডেলিগেট জয়পুরে গিয়ে পৌঁছলুম ২৪শে অক্টোবর বিকেল প্রায় সাড়ে চারটার সময়ে। পাটনা, বেনারস, মুঙ্গের, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতির ডেলিগেটগণও এঁরই ট্রেণে এসে পৌঁছলেন জয়পুরে। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কাণ্ড! গবর্ণমেণ্ট হোষ্টেলের বিশাল ভবনটি হঠাৎ যেন কোন আলাদীনের প্রদীপের ছোঁয়াচ লেগে কোলাহলমুখর ও জীবন্ত হয়ে উঠলো! সান্ধ্য-চা-টি শেষ করে একটু বেড়িয়ে আসার জন্য বাইরে যাচ্ছি, এমনি সময়ে সম্মেলনের মূল-সভাপতি শ্রীযুক্ত রায়ের সঙ্গে জ্যোতিষবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইউরোপা,' 'প্রেমরাগ' ও 'রাজোয়ারা'র লেখক সুসাহিত্যিক সৌম্য-দর্শন যুবক শ্রীযুক্ত রায়, কয়েক মিনিটের পরিচয়েই মনে একটা বিশেষ ছাপ রেখে গেলেন। তখুনি আবার ডাক পড়লো সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ঘরে। কোলকাতা হতে জয়পুর পর্যন্ত সঙ্গাতা ও সপাঠী আমার সঙ্গে আগেকার দিন পরিচয় নিবিড়তর হয় পুত্র ও জামাতাসহ শ্রীযুক্ত বসু ও শ্রীমতী বসুর সঙ্গে—একই কামরায়

যাত্রীহিসেবে। পথে ঠাণ্ডা ও ধুলোবালিতে মনোরমাবাবুর গলা বসে গেছে, হবুনি তার একটা বিহিত করতে হবে! নারদ-বাহনের ভাগ্য আর কাকে বলে! সাহিত্যসম্মেলনে এসেও যার না ভেবে অর্থাৎ প্রেস্‌ক্রিপশন না লিখে চলে না। গলা বেঁধে নাড়ী টিপে যার দুই "হয়, সাড়ি পায় না" ব'লে হতে আরম্ভ করে সইর নীচে registration নম্বর পর্যন্ত লিখে মাসিক যাবাজির (চামাড়া) হাতে দিলুম ওষুধের তালিকা তুলে!

হাজিতে বেঞ্চেতে ঘড়ির কার্পেটের উপর সারি সারি বিছানা—পরিশ্রান্ত দেহে তারই উপর নিঝুম ঘুম ভেঙে গেল রাত্রি চারটায়—কারণ বাথোয়ারী স্নানাগার ও শৌচাগার—"যে জানে দুনিয়ার ভাও, সে মারে আগের দাও" দেখতে দেখতে অন্ধকারের আগেই ঘাঁড়ি কামানো পর্যন্ত প্রাতঃকৃত্য সব হয়ে গেল! অর্থাৎ সব কিছুর জন্যই প্রস্তুত!

সাহিত্য-শাখার সভাপতি—শ্রীযুক্ত বসু

২৭শে তারিখ বেলা ন'টার জন্য নির্দিষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ ব্যাস উদ্বোধন করলেন রাজস্থানী চারু ও শিল্প প্রদর্শনীর, একটি স্মরণীয় প্রাসঙ্গিক ভাষণে বেলা প্রায় দশটায়। জয়পুরের প্রবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন ঘোষ ও তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা লতিকা ঘোষের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত ঘোষের এবং অন্যান্য বাঙালী ও রাজপুত শিল্পীর অঙ্কিত নানা চিত্রের রেখা ও রঙে ফুটে উঠেছে রাজস্থানের সঙ্গে সুদূর বাংলার মানস চেতনার ঐক্য! রাজপুত শিল্পী ও কবি শ্রীরামগোপাল বিজয় বর্গীয়ের অনেকগুলি ছবিও প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ! অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুসহায়, শ্রীকুন্দন মুখার্জি, শ্রীমতি গাঙ্গুলী, বী বি, লক্ষ্মেনা প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। রাজস্থানী কোট, কাঙ্‌রা, বুন্দী, যোধপুরী অন্তর্বেশী রাজপুতানার প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনও প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া গেল।

প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পরে অনেকেই অমর রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি দেখতে চলে গেলেন। "কনডাক্টেড টুরের জন্য টাকা জমা দিতে দেরী হওয়াতে আমাদের গুলতে হলো "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।" তাই অগত্যা দুখানি টাঙ্গা করে লক্ষ্ণৌয়ের শ্রীযুক্ত বিজেন লালাল, তাঁর পত্নী ও পুত্র এবং বন্ধু ইতিহাস ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমরা জয়পুরের নানা দ্রষ্টব্য দেখতে বের হলুম।

জয়পুর খুব পুরানো শহর নয়। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয়, জ্যোতির্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বর হতে রাজধানী সরিয়ে এনে জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পুরেরই একজন বাঙালী, কেদারনাথের কুলদেবী শিলামাতার প্রথম পূজারীর বংশধর বিদ্যাধর ভট্টাচার্য নামক ইঞ্জিনীয়ারের পরিকল্পনায় জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়! প্রায় আড়াইশো বছর আগে তিনি যে পরিকল্পনার সাহায্যে নগরীর পত্তন করেন, বর্তমান যুগেও তার চেয়ে উন্নততর কোন

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতি—শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়

পরিকল্পনার ধারণা করা যায় না। পরে অবশ্য বর্তমান যুগোপযোগী নগরীর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে! জয়পুর হিন্দু স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন, নয়তলাযুক্ত বিরাট সৌধ হাওয়াই! এতে গৃহ-শিল্পে স্থাপত্যের কাজ অপলক দৃষ্টিতে দেখবার মত ছিনিস! এই বিরাট সৌধের অপরূপ গঠন কৌশল প্রতিটি মনকে বিস্ময়ে মুগ্ধ ও অভিভূত করে তোলে। এটি পার হয়েই রাজস্থান বিধান পরিষদের বিশাল ভবনটি। সম্পূর্ণ আধুনিক ব'লে তার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ নেই। এর কাছ দিয়েই একটি বিশাল ফটক পার হয়ে পড়তে হয় রাজপ্রাসাদ সম্মুখবর্তী প্রশস্ত একটি চত্বরে। সোজাসুজি দুখোমুখি চারটি বিশাল ফটককে যুক্ত করেছে সিসের বাঁধানো রাস্তা, আর তাই ভাগ করেছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণটিকে গালিচার মত সবুজ ঘাসে-

ঢাকা চতুষ্কোণ চারটি মাঠে। একদিকের ফটক পার হয়ে পড়তে হয় গোপালজীর মন্দিরের সামনের রাস্তায়, আর তাই দিয়ে গিয়ে পৌঁছতে হয় মহারাজ জয়সিংহের 'যন্তর-মন্তর' নামক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রবেশদ্বারে। সংস্কৃত, প্রাকৃত প্রভৃতি পুথির ও ছাপার বাংলা সহজ নির্ঘণ্টের জন্য বড়পাড়ি দূর উত্তুক পরেষণাগারে! শিল্পী, ইঞ্জিনিয়ার ও বাস্তুকারদের জয়সিংহের এরূপ 'যন্তর-মন্তর' আছে; তাহলেও মনে হয় জয়পুরের 'যন্তর-মন্তর'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। অপর বৃহৎ ফটক দিয়ে আধুনিক রাজপ্রাসাদে ঢুকতে হয়। সম্প্রতি সেন্সাস-টপলক্ষে বাঙালী সেন্সিসেটরা যাতে ঘুরে ঘুরে প্রাসাদটি ভাল করে দেখতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। প্রায় শিল্পী ও আগ্রা কোর্টের অনুকরণে জয়পুর মহারাজের 'দেওয়ানী খাস' ও 'দেওয়ানী আম' দরবারগৃহ দুটি স্থান। এগুলো প্রতি বছরে কয়েকবার দরবারের জন্য ব্যবহৃত হয় বলে তাদের পারিপাট্য ও কারুকার্য অটুট আছে। দেওয়ান ও দেওয়ানী উপলক্ষে দুবার সভায় হয়,

ইতিহাস পাথার সভাপতি—ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

সুতরাং মহাবতী ক'টি দিন দেওয়ানের সোনালী ও রূপালী কারুকার্য খোলা অবস্থায় ছিল বলেই আমরা ভাল করে দেখতে পেয়েছিলুম। দেওয়ানীর পরে তা' পুরু কাপড়ের আবরণে ঢেকে দেওয়া হয়ে। দেওয়ানী আমের মেঝেকে রাগাগোড়া ঢাকবার জন্য জয়পুরেই প্রস্তুত যে গালিচাখানি গুটানো অবস্থায় আছে, এত প্রকাণ্ড কারুকার্যখচিত গালিচা আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! রাজপ্রাসাদের মধ্যে যে অন্যশালা আছে সেগুলি শুধু সাধারণ দর্শকের কাছেই নয়, ইতিহাসের গবেষণাকারীদের নিকটও অত্যন্ত মূল্যবান্।

প্রাসাদের একটি কক্ষে মহারাজ মানসিংহ হতে আরম্ভ করে অদ্যতন চৌদ্দজন রাজার নিজ নিজ তরবারি থালের মধ্যে রক্ষিত আছে। নূতন রাজকুমারের জন্মের পর নামকরণ-উৎসবের কালে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ঐখানে। রাজপুত যে পরলোকগত মহারাজের তরবারি প্রথমে স্পর্শ করে, তার নামানুসারেই রাজপুত্রের নামকরণ হয়। বর্তমান মহারাজ নাকি এতিহ্যের সুবিধ্যার অবহাবিপত্তি মহারাজ মানসিংহের তলোয়ার স্পর্শ করেছিলেন, সেজন্যই তাঁরও নাম মহারাজ মানসিংহ।

প্রাসাদের একাংশে মহারাজের প্রথমা মহিষী যোধপুর-তনয়া বাস করেন। তিনি প্রাসাদে থাকলে, প্রাসাদের সমস্ত জানালাগুলি সবকটিকেই বন্ধ করে রাখা হয়। রাজপ্রাসাদের পশ্চাতস্থ অতি প্রশস্ত অন্তরঙ্গকর বাগানে প্রাসাদের সোলহুদ্দি প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরটি অবস্থিত —যাতে বাগানটি পার হয়েই রাজঅন্তঃপুরবর্তিনীরা ইচ্ছামত মন্দিরে পূজো দিতে পারেন। প্রাসাদের অন্যান্যরে আয়নাগুলি নাকি এমনভাবে বসানো আছে, যাতে প্রাসাদে থেকেও রাণী ও সহচরীরা আরতির সময়ে রাধা-গোবিন্দের সম্পূর্ণ মূর্তি দেখতে পান। এই রাধা গোবিন্দই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামীর স্থাপিত শ্রীবৃন্দাবনের আসল বিগ্রহ। ঔরংজেবের নিষ্ঠুর নিগ্রহের হাত হতে বিগ্রহকে বাঁচাবার জন্য মির্জারাজা জয়সিংহ তাঁকে অম্বরে এনে কাম্যবনে স্থাপন করেন পরে মহারাজা সওয়াই জয়সিংহ তাঁকে এনে নিজের নবনির্মিত রাজপ্রাসাদের সন্নিকটের বর্তমান মন্দিরে স্থাপন করেন। একই ভাবে বৃন্দাবনের গোপীনাথজী ও মদন-মোহনজীর মন্দিরও জয়পুরে স্থাপিত হয়। মদনমোহনের আসল বিগ্রহটি আর এখন জয়পুরে নেই! করৌলীর মহারাজ জয়পুরের সঙ্গে বিয়ের সূত্রে বিশিষ্ট যৌতুকরূপে মদনমোহনকে বাঙালী সেবায়েৎসহ করৌলীতে নিয়ে যান—এখনও তিনিই করৌলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! জয়পুর রাজ্যের আমার সবচেয়ে বিশেষ আকর্ষণ ছিল এই গোবিন্দজী! বলাবাহুল্য শুধু একবার নয়, প্রতিদিন অর্থাৎ যেকদিন আমরা জয়পুরে ছিলুম, তিনি মন্দিরে গিয়ে সন্ধ্যারতি দেখতেন এবং সৌভাগ্যক্রমে ২৮শে তারিখ গোবিন্দের অন্ন-প্রসাদও পেয়ে সহীয় আত্মতৃপ্তির সঙ্গে বলে উঠলেন "গোবিন্দজীর দর্শন ও প্রসাদ পেয়ে শুধু আমিই ধন্য হই নি, গোবিন্দজীও নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত হয়েছেন!"

প্রাসাদ সমুখস্থ বিশাল চত্বরের চতুর্থ ফটক পার হয়ে আবার আমরা চত্বরের চারিদিকে অবস্থিত বস্তুরাজির মালা খিরাশ পার হয়ে পুনরায় জয়পুরের প্রসিদ্ধ জিলেপীর বাজারে পড়লুম। একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে জয়পুরের বিখ্যাত যাদুঘরটি অবস্থিত। তার মধ্যে নানাদেশের কার্পেট, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি সত্যি সত্যি দেখবার জন্য, কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুবই কম ছিল বলে, যাদুঘরের সকল কিছু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে আমাদের দেখবার সুযোগ হয়নি। যাদুঘরের কাছেই একটি ছোট চিড়িয়াখানা আছে! লক্ষ্ণৌয়ের চিড়িয়াখানার অনুকরণে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় তাতে পশুপাখীদের বসিবার ব্যবস্থা আছে। জন্তু-জানোয়ারগুলি হৃষ্টপুষ্ট এবং মোটেই ঘুরিবৃত্তির জন্য লালায়িত ব'লে মনে হলো না। বাঘিনীরা বিবি আরামে রেলগাড়ীতে উপরের যাত্রে উঠে আমরা যেমন আরাম করি তেমি আরাম করছে, অথচ খাবার ও খাবার ছড়াছড়ি, তার প্রতি দৃক্‌পাতও নেই। চিড়িয়াখানার একটি গ্রাম-পাঁচ

বাকি দিনে আবশ্যক করে তুব দেয় এবং ছুটি উপভোগ করে আবার ফিরে আসে। আমার মত দুর্বোধ বিশেষজ্ঞ চাকরের পক্ষে গবেষণার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্দেহ নেই! বাংলার প্রতি বীতরাগিণী এবং আধুনিকাদের মত উপরের থাকে ঠাঁই পেতে অন্যান্য যাবিনী, দুধ যেন পুরুষ-ব্রাহ্মণ, পোষাকে-পরিচ্ছদে চেনা যায় না কী স্ত্রী কী পুরুষ প্রভৃতি ধরিণ—সুতরাং ব্যাস্তরিক বিষুদ্ধ' তার উপযুক্ত নন্দিনী-পরিয়াসপ্রিয়া বৌদি, অনুগামী বন্ধু চিরঞ্জীব, আর আমার উপযুক্ত লক্ষণ ভাইটি, সকলেই তখন রসিকতা-সাগরে ডুব দিয়েছে। শুধু 'কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা'র মত আমার সহধর্মিণী একান্তই নির্বাক শ্রোত্রীছিলেন।

মূল অধিবেশন প্রথমে আড়াইটায় আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা' আরম্ভ হ'ল সাড়ে তিনটায়। সুবৃহৎ মণ্ডপটি লোকে লোকারণ্য, তিল ধারণেরও স্থান নেই বল্লেই চলে। পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত কণ্ঠে "অম্বেমাতরম্" সঙ্গীতের দ্বারা মূল অধিবেশন আরম্ভ হলো। এবারও

অধি সম্মেলনের উদ্বোধক—শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস (রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী)।

প্রধান মন্ত্রী প্রায় তার সকাল বেলাকার ভাষণটিকে পরিবর্তিত রূপ দিয়ে সম্মেলনের মূল অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। তারপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ভরতপুর মহারাজ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ, বাংলা-ভাষা ও বাঙালী জাতির অতিশয় ক্ষতির উল্লেখ করে ভরতপুর দুই শতাব্দীরও অধিককাল বাঙালীদের অবদান সম্বন্ধে সারগর্ভ বিবরণ দিয়ে অধিবেশনে সমবেত ডেলিগেটদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন—ভরতপুর বন্ধুকে বন্ধুকে, লেখা অভিভাষণটি পাঠ করে। অতঃপর অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেশচন্দ্র দাশ তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ কবিজনোচিত কণ্ঠে পাঠ করলেন তাঁর অভিভাষণটি, তাতে বাংলায়, বাংলার সাহিত্যে রাজস্থানের বীরত্ব-গাথা, ভরতপুরের পরিচ্ছন্ন ও গঠনে বাঙালীর বিশিষ্ট দান, সম্মেলনের সভ্যদের ভরতপুর সফর আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, চতুর্থ প্রাদেশিক সম্মেলনের অকাল-প্রয়াণে শোকোচ্ছ্বাস, রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে বাঙালীর চরিত্রের তুলনা, মরাঠী বিদ্বানের সঙ্গে বর্তমান বাঙলার তুলনায় অবস্থানের সাদৃশ্য, একদা হরপ্রসাদ বাংলার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে। তাই সব দেখিয়ে তিনি বলেছেন "এই দুর্যোগের চিত্রে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আমরা চাই শুধু জীবনের দর্শন.....এ সাহিত্য সম্মেলনে জীবন সমস্যার সমাধানের শুরু হোক। সাহিত্য কি আমাদের নূতন প্রাণ, নবীনতর প্রেরণা। .....তাই আসুন আমরা আজ ভারতের পশ্চিমতম প্রদেশে সমবেত হয়ে পূর্ব তোরণে আলোর জন্য তাকিয়ে আছি। থাকুক জীবনে শত ব্যথা-ব্যর্থতা-পরাজয়! সব ছাপিয়ে সব কিছুর ঊর্ধ্বে বিরাজ করছে জীবন অমৃত-করা বিষে নীলকণ্ঠ বাঙালীর অমৃত পিপাসা।"

সভাপতিদের ভাষণ শেষ হলে শ্রীযুক্ত দাশ অভ্যর্থনা সমিতির তরফ থেকে, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ ঘোষণা করছিলেন। উদয়পুরের মহারাণার সম্মেলনের ডেলিগেটদের জন্য শ্রীযুক্ত দাশের নিকট লিখিত আমন্ত্রণ লিপি

রাজস্থানী সাহিত্য পাথার সভাপতি—ডাঃ মথুরালাল শর্মা

পড়া হলে, শ্রীযুক্ত দাশ ঘোষণা করলেন যে যাঁরা উদয়পুরের আতিথ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা যেন একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিবেশনের অফিসে তাদের নাম লিখিয়ে আসেন। এরপরেই প্রথম দিনের অধিবেশনের পরি-সমাপ্তি ঘটলো। কথাছিল রাত্রিতে কুমারী অরুন্ধতী গুহ সমবেতে বৃত্যশিল্পে সকলকে আপ্যায়িত করবেন, কিন্তু কোন কারণে তিনি উপস্থিত হতে না পারায়, শান্তিনিকেতনের শান্তিদেব ঘোষ প্রথমে একটি গান করলেন, গুজরাটি মেয়েরা গরবা নৃত্যে সকলের মনোরঞ্জন করলে, কিন্তু সে রাত্রিতে আমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেছিল রাজপুতানার নিজস্ব লোক নৃত্যে পুরুষ-দেখবাদী আর একটি মেয়ের সঙ্গে ঐড়ানরূপ অবগুণ্ঠনবতী একটি রাজপুত বালিকার সাবলীল নৃত্য! আর সকলকে আনন্দ দিয়েছিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' পর্বে পরিবাসরসিক ও সুকণ্ঠ বিষ্ণুর ক্যারিকেচার ও গান।

২০শে তারিখ সকালবেলা অন্যান্য দিনের মত দেরীতে প্রায় দশটায় আরম্ভ হল শ্রীযুক্ত অমোক বসুর সভাপতিত্বে ছাত্রিত্যশাখার অধিবেশন। উদয়-

পুরের সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রাবৎ বংশীয় রাণা লক্ষ্মী কুমারীর দ্বারা উদ্বোধন বেতিনের অধিবেশনের ইতিহাসটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শিক্ষার মূলে অসাধারণ একটি পরিবারের ঐতিহ্য বেথুনের সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন যে সুধারাণী তিনি, সেই শিশোদীয় কুলগৌরব ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চন্দ্রাবৎ বংশের রাজকুমারীর একান্ত সহায় যোগ দিয়ে তার উদ্বোধন করা এককালে অসাধারণ ব্যাপার ছিল। রাজপুত জাতির বাঙালীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতির ফলেই তা সম্ভবপর হয়েছিল। সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে চন্দ্রাবৎ-রাণী লক্ষ্মী কুমারী নিজের চাটীর মনোরম পোষাকে সজ্জিতা হয়েই সভায় এসেছিলেন এবং নারীসুলভ কমনীয়তার সঙ্গে রাজপুত নারীর স্বাভাবিক দৃঢ়তার তাঁর প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ফুটে উঠেছিল।

তার পর আরম্ভ হ'ল সাহিত্যশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর ভাষণ। প্রথমে একটু জড়িত কণ্ঠ সবেও ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠের স্বাভাবিক সাবলীলতা ও দৃঢ়তা ফিরে এল। ভাষণের ভাব, ভঙ্গিমা,

শিল্পকলা শাখার সভাপতি—পণ্ডিত রবিশঙ্কর

ভাষার সর্বত্র এমন একটি মৃদু বলিষ্ঠতা ফুটে উঠেছিল যে আজকালকার বহু সাহিত্যিকের লেখনী ছাঁদে লেখার মধ্যে কখনও আশা করতে পারা যায় না। তাতে শুধু ভাবুকতা নয়, বোঝবার এবং করবারও অনেক কিছুর নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। "মাতৃভাষা মায়ের মতই প্রিয়। তার উপরে আক্রমণ নাই করি বলি—অবহেলা অন্তরে কঠিন আঘাত হানে। যেমন ব্যক্তি ও ছোট জীবনে তেমনি ভাষার ব্যাপারেও নিরাপত্তা চাই রাষ্ট্রকর্তাদের কাছে।...সহ্য ভাষা থাকা সত্ত্বেও এতে ছেদ বাড়বে না, প্রতিটি পর্ব রূপে গন্ধে প্রস্ফুট হয়ে বেশ আস্ত একটি শতদল হয়ে ফুটবে।" মনোজবাবুর ভাষণ ও ভাষার মধ্যে কোন জড়তা নাই, বরং সাহিত্য ও প্রত্যেক মানুষের প্রতি যে গভীর মমত্ববোধ আছে, তাই আজ তাঁকে স্থান দিয়েছে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর পুরোভাগে, তাঁরই কথায় "সাহিত্য তাই একাধারে জীবনের ভাষ্যকার ও পথিকৃৎ।"

মনোজবাবুর ভাষণ শেষ হতে না হতেই ডাক পড়লো যে "রথ প্রস্তুত, নারথি দাঁড়ায়ে দ্বারে," অন্তরে যেতে হবে। মহারাজ মানসিংহের রাজধানী ও অম্বরের প্রাসাদ আজ জনমানবহীন, কেবল ধ্বংসকের আক্রমণ করে আছে। দু-উচ্চ পাহাড়ের উপর অম্বরের প্রসিদ্ধ দুর্গ এবং তার মধ্যে শিলাদেবী বা যশোরেশ্বরীর মন্দির, বীরাষ্টমীর মন্দির এবং মহারাজ মানসিংহের বিরাট প্রাসাদ অতীতের সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়ে আছে। বাংলার বারো ভুঁইয়ার আক্রমণে পর্যুদস্ত ও রণক্লান্ত মানসিংহকে স্বপ্নে দেবী স্বয়ং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁকে পুজো করলে তার পক্ষে জয়লাভ সম্ভবপর হবে। তাই নিরোধার্থ করে তিনি দেবীকে পুজোয় সন্তুষ্ট করেন এবং রণক্ষেত্রের পর প্রচুর লুণ্ঠন সামগ্রীর সঙ্গে যশোরের রাজার কন্যাকে পত্নীরূপে এবং দেবী যশোরেশ্বরীকে আরাধ্যা দেবীরূপে নিয়ে এসে অম্বর প্রাসাদের সম্মুখে মর্মর নির্মিত মন্দিরে স্থাপন করেন। মনোজবাবুর ভাষায় বলতে হয় "তা আছেন চমৎকার। পাহাড়ের উপর অপরূপ মন্দির, সোনা আর মণিমাণিক্য দেবীর গায়ে ধরে না। ভোগের অতি

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ (রাজস্থান)

উত্তম ব্যবস্থা। পুরুত সেবাইত মশায়দের চেহারা দেখে হিংসে হয়।" সম্প্রতি দেবীর মন্দিরের মার্বেল নির্মিত চৌকাঠের উপর আর একজন বাঙালী রাণী গায়ত্রী দেবীর আদেশে মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে ঘণ্টাধারসহ দুটি কলাগাছের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়েছে। বীরাষ্টমীর মন্দিরে চতুর্ভুজ বিষ্ণুর পুরোভাগে বীরার নিজস্ব মঙ্গলালের মূর্তি। মুসলমানের অত্যাচারের ভয়ে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের সঙ্গে এ বিগ্রহটিকেও অম্বরে নিয়ে আসা হয়।

অম্বর প্রাসাদে অসংখ্য নানা কারুকার্যখচিত হল ও কামরাগুলির মধ্যে জোতলার মহারাজ মানসিংহের নিজস্ব বাসের কামরাগুলি এবং তেতলার প্রধান মহিষীর কামরাগুলিই সর্বাপেক্ষা চমৎকারিত্ব। তাঁদের দৈনন্দিন পূজার স্থান, তুলসীমঞ্চ, এমন কি ভোজন-কক্ষের দেওয়ালে সপ্তরথীর ছবি পর্যন্ত এখনও অবিকৃত আছে। দিনদুনিয়া একটি

"চেষ্টা ক'রে দেখুন...

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান মেখে ...আপনি আরও সুন্দর হ'তে পারেন।"

রেহানা বলেন।

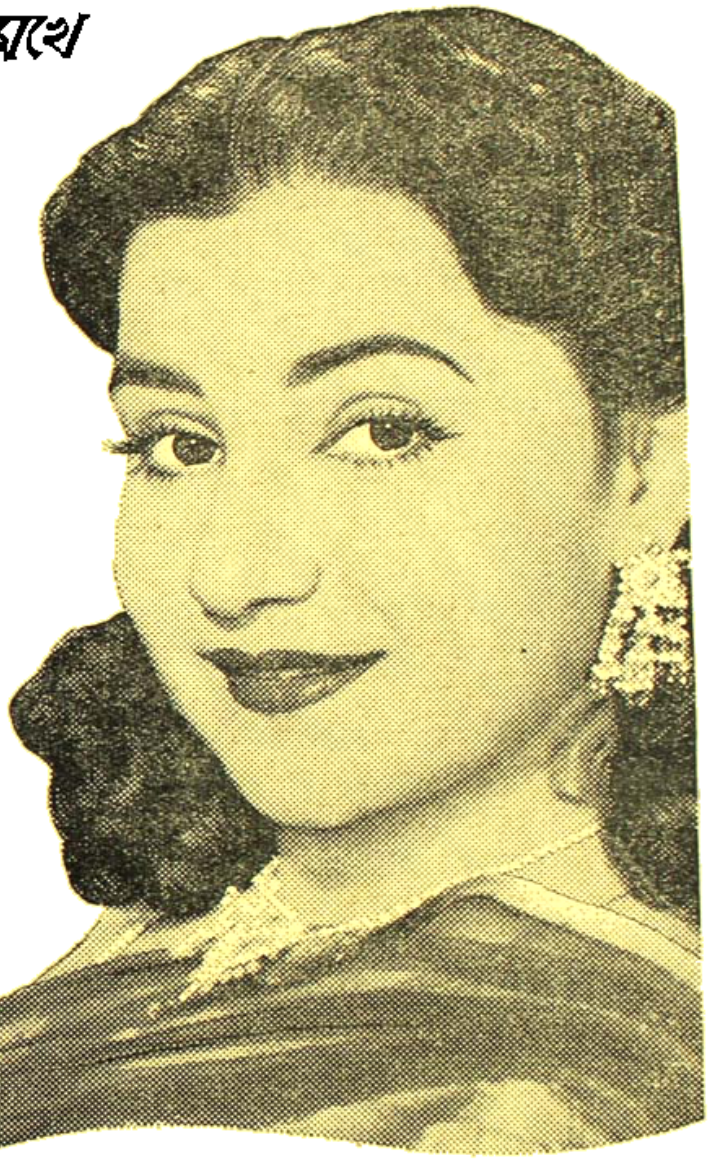

"এ এক সৌন্দর্য্যচর্চ্চার অপূর্ব্ব সহায়," রেহানা বলেন, "লাক্স্ টয়লেট্ সাবানের সরের মত ফেনা মুখে ও গায়ে বেশ ভাল ক'রে ঘ'ষে নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। নিয়মিত ব্যবহার ক'রলে, লাক্স্ টয়লেট্ সাবান আপনার ত্বকের এক নতুন সৌন্দর্য্য এনে দেবে।"

লাক্স্ টয়লেট্ সাবান

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

LTS. 368-X52 BG

বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। তেওরালে, যাহে অসংখ্য উজ্জ্বল কাচ এমন ভাবে বসানো আছে যাতে ভিতরের যা কিছু, এমন কি বিছের মুখকে পর্যন্ত অসংখ্যবার প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। রাজা মানসিংহের বাকি বারোজন রাণী ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের জন্য ঘরসম্পূর্ণ একটি করে মহল ছিল। সেগুলি দেখে মনে হয় "মালাবারে চায়ার কাণ্ড" বটে!

দুপুরবেলা আমাদের আবাসিক হোটেলে ফিরে এসে হঠাৎ মনে হল যেন কী একটা কি ঘটেছে! যে পাঁচ মুহূর্ত্তান পরিবেশন জন্য অধিবেশন এগিয়ে চলেছিল তা যেন আর নেই! চারিদিকে বিস্বাদ—গভীর দুঃখ ও চাপা অসন্তোষ! যেহে ছিল ক্লান্তি আর মনের হতাশায়, সুতরাং কোনরকমে দুটিমুখে করে খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্য শয্যায় শুয়ে পড়লুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না—সাড়ে তিনটায় ঘুম-জড়িত চোখে যখন ঐতিহাসিক মজুমদার মহাশয়ের ভাষণ আরম্ভ হয়েছে। শ্রীযুক্ত মজুমদার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সুতরাং তাঁর অভিভাষণে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে আমাদের চোখের সামনেই রাজনীতিকদের সুবিধের জন্য যে ভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করা হচ্ছে প্রতিদিন—তাতে পুরাতন ঐতিহাসের সত্যান্বেষী সমস্তে সন্দিহান হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক! সুতরাং প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাজ—অন্ধ কোন স্বার্থসঙ্কল্পনীয় নির্দ্দেশে ও খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করা! তাঁর মতে রাজনৈতিক কারণে অসমার্থ সিরাজদ্দৌলাকে আদর্শ স্থানে বসিয়ে তৎকালীন হিন্দু-মুসলমানের মনগড়া মিলনসূত্রকে আঘাত বলে না চালালে হয়ত বাংলাদেশের বুকে এ ভাবে অন্তর্বিরোধ বেদনাক্লান্ত-জনিত বিপর্যয়ে এসে পড়তো না। তাঁদের পর অনেকেই নানা প্রশ্ন করলেন এবং মজুমদার মশাইও অতি প্রাঞ্জল-ভাবে যুক্তি-তর্কের দ্বারা সে সকল প্রশ্নের যোগ্য উত্তর দিলেন!

এইদিনই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর এস এল শর্মার সভাপতিত্বে রাজস্থানী সাহিত্য ও কৃষ্টি শাখার অধিবেশন আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। রাজস্থান সরকারের রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকিরণপুরী এর উদ্বোধন করেন। ডক্টর মধুরালালশর্মা অতি প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হিন্দীতে বাংলাদেশ, বাঙালীজাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন "সূর্যোদয়ের দেশের ন্যায় বাংলাদেশও ভারতের চেতনাবোধ ও মনন্তাত্ত্বিকের দেশ। বাংলা দেশেই প্রথম হিন্দী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় এবং রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম হিন্দী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।.....মহারাজ মানসিংহ বাঙালী রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁরই গর্ভজাত পুত্র যে বীরত্ব দেখিয়ে গেছেন রাজস্থানের ইতিহাসে তার তুলনা নেই।.....রাজস্থানের ইতিহাসে বাঙালীর অবদান অতুলনীয়।"

এই অধিবেশনের আর একটি বৈশিষ্ট্য দুরাগত ও স্থানীয় কবিদের একত্র সম্মেলন। বাংলা ও হিন্দী-ভাষাভাষী কবি ও রাজস্থানী চারণ কবির একত্র সমাবেশ সত্যসত্যই অতুলনীয় এবং অভূতপূর্ব! এই কবিত্ব-মহিমা প্রভাবে প্রধানমন্ত্রী যাদব পন্থে যে ভাবে শুধু কবিতাই আওড়ালেন এবং পরে ছেড়ে গান ধরলেন, তাতে তাঁর পণ্ডিত নেহেরু, রাজাগোপাল আচারি, বিধানচন্দ্র রায়, কিংবা গোবিন্দবল্লভ পন্থের রাজনীতির মুখোসপরা মুখের সঙ্গে তুলনা করা চলে না! শ্রীযুক্ত যাদব পরে আমাদের বলেছিলেন "যে অনুরোধ করলে হয়ত আনন্দের আতিশয্যে তিনি নাচতেই আরম্ভ করতেন—এটি আমোদ-প্রিয় সকলের প্রিয় নেতা তিনি।"

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাতটায় সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্করের পৌরোহিত্যে চারু শিল্পকলা ও সঙ্গীত শাখার অধিবেশন হলো। তাঁর ভাষণের চেয়ে তাঁর সঙ্গীতে ও সেতার বাদনেই অনেকে অধিক পরিতৃপ্ত হলেন। কিন্তু আমার সে সঙ্গীত-রস আস্বাদনে বার বার বিঘ্ন ঘটতে লাগলো—দলে দলে ডেলিগেটদের আমার কাছে সমাগমনে! শুনতে পেলুম দুপুরে নাকি শ্রীযুক্ত যাদব ঘোষণা করেছেন যে উদয়পুরের মহারাণা ব্যক্তিগতভাবে তাঁকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন—এ আমন্ত্রণ ডেলিগেটদের সকলের জন্য নয়। সুতরাং...অপমান...একটা কিছু করতেই হবে... ইত্যাদি, ইত্যাদি।" ব্যাপার গুরুতর দেখে উঠেই আসতে হলো, ডক্টর শ্রীকুমার ব্যানার্জিকে জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে শ্রীযুক্ত যাদব ঐ রকম কিছু বলেছেন বটে, কিন্তু হয়ত ঐ ভাবে বলা তাঁর ইচ্ছে ছিল না—হঠাৎ বেরিয়ে গেছে!" এদিকে আবার বিপদ—এলাহাবাদের একটি ছেলের ১০৪° ডিগ্রী জ্বর, মনোজবাবুর ছেলেরও জ্বর, তাঁর স্ত্রীরও আমাশয়, আমার দুখানি ঘর পরেই একজন ভদ্রলোক গত রাত্রি পাইপাস করে কী রকম হয়ে পড়েছেন, পুরুলিয়ার এক ভদ্রমহিলার ৪।৬ রাত্রি ঘুম নেই ইত্যাদি ইত্যাদি! সুতরাং প্রতিবিধানের আশায় গিয়ে ডাক্তারের প্রাথমিক কার্য সেবা কার্যে এ ঘর হতে ও ঘরে ছুটোছুটি করতে করতে রোগীদের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে কিংকর্তব্য তাই পরামর্শ করে বেড়াতে লাগলুম। ওদিকে শ্রীযুক্ত যাদবের কন্যাটি অতি চমৎকার গান গেয়েছে—খেতে খেতে এক ঝলক দেখে গেলুম, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও বসে শোনার উপায় নেই! এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত কিরণ সিংহ রয়েন—নিখিল নির্বাচনী সভার তাঁকিতে শ্রীযুক্ত যাদবকে ভিজেস করতে হবে—অধিবেশনের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে তাঁর দুরকম ঘোষণার কারণ কি?

রাত্রিতে প্রায় সাড়ে এগারোটায় ফিরে নির্বাচনী ঘড়িটি বসলো! কোলকাতার এবং অন্যান্য স্থানের ডেলিগেটরা আমাকে যুগপাত্রূপে এগিয়ে দিলেন, কিন্তু মেঘেশবাবু সেখানে অনুপস্থিত—এবং তাঁর পরিবর্তে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক রূপেন রয় মশাই সভাপতিত্ব করলেন। অন্যান্য বিষয় নির্বাচনের পর স্থির হলো যে তিনি ও আমি পরদিন শ্রীযুক্ত যাদব এলেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখব! রাত প্রায় দুটোয় এ বিতর্কসভা ভাঙলো!

পরদিন অর্থাৎ ২৭শে সকাল বেলা আমি শ্রীযুক্ত বসুকে দেখতে যাচ্ছি এমন সময়ে মেঘেশবাবু এলেন। রূপেনবাবু ও আমি একটু পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলনুম। ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে তিনি বুঝতেই পারেননি আগে, এ বিষয় খোলাখুলি সমাধান না হলে কোন ডেলিগেটই উদয়পুরে যাবেন জেনে-তিনি চিন্তিতভাবে আমাদের পরামর্শমতে যাতে কারো মনে সন্দেহ বা সংশয় না থাকে সে ভাবেই ঘোষণা করবেন বললেন। যাক অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ভারতবর্ষের গ্রাহক ও পাঠকগণের প্রতি

সুদীর্ঘ ৪১ বৎসর পূর্বে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সাহিত্যের মাধ্যমে দেশ-সেবার যে মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 'ভারতবর্ষে'র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেন সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বহুকাল যাবৎ যোগ্যতার সহিত "ভারতবর্ষে"র সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পর হইতে অদ্যাবধি ভারতবর্ষ সেই মহান্ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা এই ভারতবর্ষেই লেখনী ধরিয়া সুদীর্ঘকালব্যাপী দেশবাসীকে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষই শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশের গৌরব অর্জন করিয়াছে। প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক ও গল্প-লেখকগণের উপন্যাস ও গল্পে এবং বিখ্যাত প্রবন্ধকারগণের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ-সম্ভারে ভারতবর্ষ আজও নির্ভীক ও অকুণ্ঠভাবে দেশের সেবা করিয়া আসিতেছে।

এই সেবার পথে গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে বহু অসুবিধা ও আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়িয়াও আমরা সমপর্যায়ের অন্যান্য পত্রিকাগুলির ন্যায় ভারতবর্ষের মূল্য বৃদ্ধি করি নাই। কলেবর বর্ধনও তেমন সম্ভবপর হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বহু গ্রাহক ও পাঠক ভারতবর্ষের কলেবরবৃদ্ধির জন্য বারংবার অনুরোধ করায় আমরা আগামী পৌষ সংখ্যা হইতে ভারতবর্ষের কলেবর ও মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সৌষ্ঠব এবং উৎকর্ষও বর্ধিত হইবে। আগামী পৌষ হইতে ভারতবর্ষ প্রতি সংখ্যা এক টাকা, ষাণ্মাসিক ছয় টাকা এবং বাৎসরিক বার টাকা হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, ডাক বিভাগের নিয়মানুসারে তাঁহাদের অনুমতিপত্র ব্যতীত ভি, পি, পাঠানো সম্ভব নয়। সুতরাং ভারতবর্ষ পাঠাইবার নির্দেশপত্র পাইলেই আমরা কাগজ পাঠাইব। তবে ভি-পি-তে কাগজ লওয়া অপেক্ষা মণি-অর্ডারে টাকা পাঠাইয়া দিলে উভয় পক্ষেরই সুবিধা।

আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক ও এজেন্টগণের সহযোগিতা ও সহানুভূতি একান্তভাবে কামনা করিতেছি।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

—দশ—

"Os senhores estão em sua casa—"

আবার ডাক পড়েছে সুলতান খোদাবক্স খাঁর দরবারে।

কিন্তু এ ডাকের অর্থ এবারে আর দুর্বোধ্য নয়। আহত সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভয়েই কারাগার থেকে বেরিয়ে এলেন ডি-মেলো। যা হবে তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। দর্প সুলতান এখন খোঁচা-খাওয়া গোখরো সাপের মতো ভয়ঙ্কর হয়ে আছেন। পালানোর ব্যর্থ চেষ্টার পরে এখন একটি মাত্র পরিণামই সম্ভব। এইবার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে ধর্মতলিতে। হয় বন্দুকের গুলিতে হত্যা করা হবে, নয় তলোয়ারের মুখে মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে, আর নতুবা মাটিতে গলা পর্যন্ত পুঁতে দিয়ে খাওয়ানো হবে কুকুর দিয়ে। আরো কত নিষ্ঠুরতা আছে কে জানে! মুরদের অসাধ্য কোনো কাজই নেই।

ডি-মেলো একবার তাকিয়ে দেখলেন সঙ্গীদের দিকে। সবাই বুঝেছে, তাঁর মতোই সকলে অনুমান করে নিয়েছে নিজেদের পরিণতি। কিন্তু কেউ কি ভয় পেয়েছে? মৃত্যুর আশঙ্কায় কি বিবর্ণ হয়ে গেছে কোনো কাপুরুষ? ডি-মেলো জ্বলন্ত চোখে যেন সকলকে পরীক্ষা করে দেখলেন একবার। না—কারো মুখেই আতঙ্কের ছায়া নেই কোনোখানে। পর্তুগালের বীর সন্তান সব। মৃত্যুবিজয়ী শক্তি। সাত-সমুদ্র জয় করেছে—লড়াই করেছে সব বাধা—সব দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। বীরের মতো মরবার জন্যেই সকলে প্রস্তুত।

কিন্তু মুরদের এ আনন্দ বেশি দিন থাকবে না। আছে দুর্জয় পর্তুগীজের দল—আছে দুরন্ত নৌবহর—আছে ভয়ঙ্কর কামান—আছেন দুর্ধর্ষ ডুনো-ডি-কুন্‌হা। এরও বিচার হবে। আদমীতার নৃশংসতার পুনরাবৃত্তি হবে—কালিকটের মতোই কামানের গোলায় এই মুরদের হাত-পা-মাথা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে দিকে দিকে।

ডি-মেলো দাঁতে দাঁতে ঘষলেন একবার।

কিন্তু গঞ্জালো? কোথায় সে? মুরদের হাতে পড়লে তিনি জানতে পারতেন। যেখানেই হোক—সে অন্তত নিরাপদে থাকুক। হয়তো কোয়েল হো আর ভ্যাস্‌কনসেলস তাকে জাহাজে করে তুলে নিয়ে গেছে। সেইটেই সম্ভব। নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করলেন ডি-মেলো।

শিকলে বাঁধা বন্দীরা সার দিয়ে দাঁড়ালেন সুলতানের দরবারে। সেই হিংস্র গম্ভীর পরিবেশ। সেই চারদিকে বিষিষ্ট ক্রুদ্ধ দৃষ্টির আঘাত।

খোদাবক্স খাঁ কী যেন বললেন। উঠে দাঁড়াল মো-ভাষী। কী বললে আগেই অনুমান করে ক্ষিপ্তভাবে চেঁচিয়ে উঠলেন ডি-মেলো।

—এর প্রতিশোধ একদিন পেতে হবে সুলতানকে।

সেই আকস্মিক চিৎকারে সমস্ত দরবারটা যেন গম্ গম্ করে উঠল। নিজের আসনে পরম অস্বস্তিতে নড়ে উঠলেন খোদাবক্স খাঁ। মুর সেনাপতি—সেই বিশ্বাসঘাতক—কোমর থেকে টেনে বের করলে তার তলোয়ার। মুর সৈনিকদের হাত চলে গেল কোমরবন্ধে। একটা তীক্ষ্ণ চঞ্চলতার বিদ্যুৎ বয়ে গেল সমস্ত দরবারের ওপর দিয়ে।

এক মুহূর্ত থমকে গিয়ে, তারপর হেসে উঠল মো-ভাষী।

—সুলতানের আদেশে খ্রীষ্টান ক্যাপিটান সসৈন্যে

মুক্তিলাভ করলেন। তাঁর যে-জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে—তাও সরকার থেকে ফেরৎ দেওয়া হবে।

কথাটা বজ্রপাতের মতো শোনালো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না ডি-মেলো। পর্তুগীজেরা বিহ্বল-বিভ্রান্তভাবে তাকালো এ ওর মুখের দিকে।

বিস্ময়ের চমকটা সামলে নিয়ে ডি-মেলো বললেন, একি ব্যঙ্গ ?

—না ব্যঙ্গ নয়। সুলতান সসৈন্যে ক্যাপিটানকে মুক্তি দিচ্ছেন।

সেই মুহূর্তে সেনাপতির উদ্দেশ্যে দো-ভাষী আদেশ উচ্চারণ করলে একটা। কিছুক্ষণ সেনাপতিও যেন হতবাক হয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বন্দীদের হাতের শিকল খুলে দিতে লাগল সৈনিকরা।

তবুও যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এ কেমন করে সম্ভব ? এ কি মা মেরীর অনুগ্রহ ? না—মুরদের আবার কোনো চক্রান্ত ? মুক্তি দেবার ভাণ করে একটা নিষ্ঠুর কৌতুক ?

দো-ভাষী আবার বললে, যা হয়ে গেছে, তার জন্যে সুলতান অত্যন্ত দুঃখিত। যাদের প্রাণ গেছে, তাদের জন্যেও তিনি বেদনা বোধ করছেন। কিন্তু তাদের মৃত্যুর জন্যে সুলতানের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তারা অধৈর্য হয়ে কারাগার ভেঙে পালাতে চেয়েছিল বলেই তাদের এ শাস্তি পেতে হয়েছে। তা ছাড়া সুলতানের দুজন সিপাহীকেও তারা হত্যা করেছে। যাই হোক—অতীতের কথা এখন ভুলে যাওয়াই ভালো। পর্তুগীজ ক্যাপিটান এখন সুলতানের বন্ধু।

বন্ধু! ডি-মেলোর বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। এই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কিন্তু কোনো জবাব দিলেন না তিনি—দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

দরবারের মধ্য থেকে একটি নতুন মানুষ এগিয়ে এল ডি-মেলোর দিকে।

মধ্য বয়েসী একজন পারসী ধনিক। গায়ে মূল্যবান পোশাক—মাথায় জরির কাজ করা টুপি। মুখে প্রসন্ন হাসি।

—আদাব ক্যাপিটান।

—কে আপনি ?

—আমি খাজা সাহেব-উদ্দিন।

—কী প্রয়োজন ?

ভাঙা পর্তুগীজ ভাষায় সাহেব-উদ্দিন বললেন, এই বন্দরে আমার জাহাজ আছে। সেখানে আপনাদের সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কয়েক মুহূর্ত খাজা সাহেব-উদ্দিনকে বিশ্লেষণী চোখে লক্ষ্য করলেন ডি-মেলো। তারপরেই বন্ধুত্বের দক্ষিণ হাত বাড়িয়ে দিলেন সাহেব-উদ্দিনের দিকে।

দামী কার্পেট, ইরাণী মদ, প্রচুর ফলমূল, রাশি রাশি মাংসের খাবার। জাহাজ নয়—যেন নবাবী মহল। সাহেব-উদ্দিন আর এক গ্লাস মদ তুলে দিলেন ডি-মেলোর হাতে।

বললেন, মাননীয় ডুনো-ডি-কুনহা আমার হাতেই ক্যাপিটানের তিন হাজার 'ক্রুজাডো' মুক্তিপণ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁরই প্রতিনিধি।

ডি-মেলো শুনে যেতে লাগলেন।

—পর্তুগীজ ক্যাপিটান ভাজ-পেরিরা আমার দুখানি জাহাজ আটক করেন। তার কারণ, আমার জাহাজ দুখানা দেখতে অনেকটা পর্তুগীজ জাহাজের মত ছিল। ভাজ-পেরিরার সন্দেহ হল, ওই জাহাজ নিয়ে আমি সমুদ্রে ডাকাতি করি আর অপবাদ যায় পর্তুগীজদের ওপর। আল্লার দোহাই, ওসব কোনো মতলব আমার ছিলনা। পর্তুগীজ জাহাজের ধরণ ভালো দেখে আমি ইচ্ছে করেই ও ভাবে আমার জাহাজও তৈরী করিয়েছিলাম।

ডি-মেলো এবং সাহেব-উদ্দিন এক সঙ্গেই চুমুক দিলেন ইরাণী মদের পাত্রে।

সাহেব-উদ্দিন বলে চললেন, পেরিরা মালপত্রশুদ্ধ আমার জাহাজ আটক করলেন—তারপর পাঠিয়ে দিলেন গোয়াতে। নিরুপায় হয়ে আমিও গোয়াতে গেলাম। সেখানে পরিচয় হল মহামান্য ডুনো-ডি-কুনহার সঙ্গে। দোষী হতেও দেরী হল না। ডি-কুনহা চাকারিয়া আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। আমি বুঝিয়ে বললাম, যে বাংলা দেশে বাণিজ্য করবার জন্যে তিনি এত ব্যস্ত—সেখানে যুদ্ধ করে লাভ হবে না, বন্ধুত্ব করে কাজ আদায় করতে হবে।

ডি-মেলো উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

—অনেক আলোচনা হল এ নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ডি-কুনহা যদি আমার জাহাজ দুখানা ছেড়ে দেন,

আমি ক্যাপিটান ডি-মেলোর মুক্তির ব্যবস্থা করব। তিন হাজার ক্রুসাডোর বিনিময়ে তা সম্ভব হয়েছে।

মঞ্চের গ্লাস নামিয়ে ডি-মেলো সাহেব-উদ্দিনের হাত চেপে ধরলেন।

—এখানে এসে শুধু পেয়েছি বিশ্বাসঘাতকতা আর শত্রুতা। বন্ধু বলতে কেউ ছিলনা। স্বয়ং জননী মেরী আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—সে তো বটেই—সে তো বটেই!—বিচক্ষণ খাজা সাহেব-উদ্দিন আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন: আল্লার দোয়া না থাকলে কিছুই হয় না। আমি আপনাকে বলছি ক্যাপিটান—যদি আমাকেও আপনারা সাহায্য করেন, তা হলে চট্টগ্রামে পর্তুগীজ কেল্লা বসাবার ফরমান আমি জোগাড় করে দেবই।

ডি-মেলো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: নিশ্চয়—নিশ্চয়। আমাদের দিক থেকে সাহায্যের কোনো ত্রুটিই হবে না। বলুন—কী করতে হবে।

—গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের সঙ্গে আমার বিরোধ চলছে। তার একটা মীমাংসা না হলে আমার পক্ষে এ দেশে বাস করা অসম্ভব।

—আমরা যথাসম্ভব করব।

সাহেব-উদ্দিন হাসলেন: পর্তুগীজদের কাছে যে উপকার পাব—তার ঋণ শোধ করতে আমারও চেষ্টার ত্রুটি হবে না। আসুন—আল্লার নামে আর একবার আমাদের চুক্তি পাকা করে নেওয়া যাক। আবার দুপাত্র ইরাণী মদ ঢাললেন সাহেব-উদ্দিন, গ্লাসে গ্লাসে ঠেকিয়ে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি রচনা করলেন, তারপর চুমুক দিলেন দুজনে। সেইখানেই তা থামল না। বোতলের পর বোতল ইরাণী মদ শূন্য হয়ে চলল।

নেশায় রক্তিম চোখ মেলে সাহেব-উদ্দিন বললেন, ক্যাপিটান—নাচ চলবে?

—নাচ?

—হাঁ, খাঁটি ইরাণী নর্তকীর নাচ। এমন নাচ কখনো দেখোনি তুমি।

—তোমাদের জাহাজে এসবও থাকে নাকি?

নেশার উচ্ছলতায় সাহেব-উদ্দিন হেসে উঠলেন: থাকে বইকি। আমাদের ব্যাপার তোমাদের মতো শুকনো নয়। তোমরা শুধু যুদ্ধ আর বাণিজ্য করো—একটু রঙ্গ নইলে আমাদের চলেনা। দাঁড়াও—আনাচ্ছি নর্তকীদের—

সাহেব-উদ্দিন হাততালি দিয়ে অনুচরদের ডাকলেন।

এল বাজনা—এল নর্তকী। শুরু হল উগ্রতর উৎসব। নেশার জড়তার মধ্যে শুধু একটা ভাবনায় বার বার ডি-মেলোর মনের সুর কেটে যেতে লাগল: গঞ্জালো? গঞ্জালো কোথায় এখন?

• • •

ভেরী রাজশেখর থর থর করে কেঁপে উঠলেন একবার।

—গুরুদেব, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—না বোঝবার মতো কোনো দুর্বোধ্য কথাই তোমাকে বলা হয়নি।—সোমদেব কঠোর কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—কিন্তু প্রভু, এ আমি হতে দেবনা। না—কিছুতেই না।—রাজশেখরের সমস্ত মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ মনে হল।

—তুমি হতে দেবার কে?—তীব্র ভাবে সোমদেব বললেন, দেবী চামুণ্ডা যা চান তাই হবে।

—কিন্তু আমি শৈব।

—না থাক।—সোমদেবের ভয়ঙ্কর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল—সাপের ফণার মতো দুলতে লাগল মাথার জটা: শিব আজ শব—তাঁকে দিয়ে আজ আর কোনো প্রয়োজনই নেই।

—আমি পারব না প্রভু! একে ছেলেমানুষ, তার ওপরে আমার আশ্রিত। তাকে—

—রাজশেখর!

সোমদেবের ভয়ঙ্কর গর্জনে বাক্য পথে থেমে গেলেন রাজশেখর।

—প্রভু!

—প্রভু নয়। দেবীর আদেশ পালন করবে কিনা জানতে চাই।

—পারব না।—মৃতের মতো ক্ষীণ গলায় রাজশেখর বললেন, ক্ষমা করুন।

—ক্ষমার প্রশ্ন নেই। আজ ধর্মের জন্যেই এর প্রয়োজন। ও সব দুর্বলতা দূর করতে হবে তোমাকে।

—গুরুদেব!

—তোমার সঙ্গে আর তর্ক করার প্রবৃত্তি আমার নেই রাজশেখর। তুমি জানো, আমি যে সংকল্প করি, তার কখনো অন্যথা হয় না। এবারেও তা হবে না। যা বলেছি, তাই করো। কাল অমাবস্যা—কাল মধ্যরাত্রেই মায়ের পুজো। সব আয়োজন করে রাখো!

রাজশেখর একবার শেষ চেষ্টা করলেন। যেন ডুবতে ডুবতে আঁকড়ে ধরলেন একটি তৃণখণ্ডকে।—প্রভু, একি না হলেই নয়?

—না—না—না!—আবার আকাশ ফাটানো চিৎকার করে উঠলেন সোমদেব: বলেছি তো, এ তোমার আমার ইচ্ছার ব্যাপার নয়। এ দেবীর আদেশ।

রাজশেখর মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার ভেতরে সব যেন বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে—চোখের সামনে শুধু একরাশ ধোঁয়া যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

ক্রমশঃ

অভিবাদন—

মহাপূজার অন্তে ভারতবর্ষের সকল পাঠকপাঠিকা ও শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণকে আমাদের প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ ও অভিবাদন জানাইতেছি, মাতৃশক্তির শুভস্পর্শে জাতি-জীবনের সকল অঙ্গে নূতন বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চারিত হউক—নূতন আশা ও আনন্দ বুকে লইয়া স্বাধীন দেশ সংগঠন ও কল্যাণের সাধনায় আরও অগ্রসর হউক—ইহাই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। পূজা-কালীন সংবাদসমূহ বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমরা পূজার উৎসবে আধ্যাত্ম মর্ম ভুলিয়া, এমন অতি-রাজসিক বাহ্য প্রমত্ততায় পড়িয়াছি, যাহা উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর। এই উচ্ছৃঙ্খলতা শুধু যে আজ পূজার উৎসব ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ তাহা নহে, কারণ ইতিপূর্বে আমরা চায়ের দোকান, ছাত্রছাত্রীদের প্রীতি-সম্মিলনে, ট্রামে, বাসে সর্বত্র কারণে-অকারণে বোমা ও পটকার আবির্ভাব দেখিয়াছি। জাতির এই শোচনীয় মনোগতি কোথা হইতে কোথায় আমাদের টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, তাহা সকলের চিন্তার বিষয়। তরুণ মনের উচ্ছৃঙ্খল মতি-গতির সুচিকিৎসা-ব্যবস্থা আশু চিন্তনীয় ও করণীয়।

পুনর্বসতি দান—

পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য ও পুনর্বসতি বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে গত ৩১শে জুলাই পর্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ পরিবারগুলি ক্যাম্পে অর্থাৎ অস্থায়ী অবস্থায় বাস করিতেছিল—

কৃষিজীবী—	২৭৮৩	পরিবার
বাস্তুজীবী—	৫৫৯	"
মৎস্যজীবী—	১৮১	"
অন্যান্য—	৫৫৮৭	"
মোট—	১৬১১৫	পরিবার
অর্থাৎ	৬০৭০২	জন লোক

যে ভাবে জমী সংগৃহীত হইতেছে, সেই ভাবেই ঐ সকল পরিবারের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইতেছে। আশা হয়, ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ পরিবারগুলিকে পুনর্বসতি প্রদান করা যাইবে—(১) কৃষিজীবী ৪ হাজার পরিবার (২) বাস্তুজীবী—২০০ পরিবার (৩) মৎস্যজীবী—১৮১ পরিবার ও (৪) অন্যান্য ২০০০ পরিবার। মোট ৬৩৮১ পরিবার। বাকী থাকিবে ৯৭৩৪ পরিবার—তাহাদের ১৯৫৪-৫৫ সালের মধ্যে পুনর্বাসন প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। মোট ২০৭১৯টি পরিবার জোর করিয়া বা বেআইনিভাবে দখল-করা জমীতে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ৫৫২৪টি পরিবার যে জমীতে বাস করে, সরকার সে জমী গ্রহণ ও ক্রয় করিয়া ঐ সকল পরিবারের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবেন—তাহাদের মধ্যে ২ হাজার পরিবারকে ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যেই জমী দেওয়া সম্ভব হইবে। ১০৬৭টি পরিবার যে জমীতে বাস করে তাহাদের কতক জমী গ্রহণ ও ক্রয় করা সম্ভব হইবে, কতক হইবে না। আর ৮১৩৮টি পরিবার যে জমীতে বাস করে, সে সকল জমী গ্রহণ বা ক্রয় করা আদৌ সম্ভব হইবে না। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রথম শ্রেণীর ৩৭৯৪ পরিবার ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ৮০৬৭ পরিবার—মোট ৬৬৬১ পরিবারকে জমী দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু বাকী যে ১২১৩৮ পরিবার জমী পাইবে না তাহাদের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালে ৪ হাজার পরিবারের জন্য অন্যত্র জমী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে—অর্থাৎ তাহাদের স্থানচ্যুত করা হইতে পারে। যে সকল পরিবার পরের বাড়ী জোর করিয়া দখল করিয়া বাস করিতেছে তাহাদের সংখ্যাও ১০ হাজারের কম নহে। তন্মধ্যে ২ হাজার পরিবারকে ১৯৫৩-৫৪ সালে ও বাকী ৮ হাজারকে ১৯৫৪-৫৫ সালে অন্যত্র জমী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া ১০ হাজার পরিবার নিজ অর্থে জমী সংগ্রহ করিয়াছে—তাহাদের ১৯৫৩-৫৪ সালে গৃহ-নির্মাণ ঋণ দেওয়া হইবে ও ১৯৫৪-৫৫ সালে ঐরূপ ২০ হাজার পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেওয়া হইতে পারে। সমস্যা এত বিরাট যে কিছুতেই ইহার সমাধান করা সম্ভব হইতেছে না। সেজন্য এখনও বহু সময় ও অর্থের প্রয়োজন হইবে।

সাহায্য দান—

গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৭ মাসে পশ্চিমবঙ্গের সাহায্য বিভাগ হইতে মোট ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৪ টাকা বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন খাতে দান করা হইয়াছে। ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্প্রতি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু ২৪পরগণা জেলায় মোট ২৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯ শত ৭৯ টাকা দেওয়া হইয়াছে—তাহা এই ভাবে দেওয়া হইয়াছে (১) বিনা সর্ত্তে দান—২০২৫০০ টাকা (২) কাজ করাইয়া পারিশ্রমিক দান—১১১৯৭৮৫—যে অঞ্চলে খাদ্যাভাব হয়, সেখানকার কার্য্যক্ষম লোকদিগকে কাজ দিয়া সাহায্য করা হয়—কাজের অভাবে তাহারা কষ্ট পাইতেছিল (৩) কৃষি ঋণ—১০০২৫০ টাকা (৪) শিল্পীদের দান—২৬৭৫০ টাকা (৫) শিল্পীদের ঋণ—৩৫১০০ (৬) গৃহ-নির্ম্মাণ দান—২৮১৫ টাকা (৭) অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্তদের দান—৭২০ টাকা (৮) দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের দান—১১৪০০ টাকা। ঐরূপ দান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদা, জলপাইগুড়ী, পশ্চিম দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং, কুচবিহার, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাতেও দেওয়া হইয়াছে—যেখানে যেমন অভাব সেখানে সেইরূপ অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কৃষি বিভাগ হইতে মোট ১৮৭৬০০ টাকা ও ২৩ হাজার টন সার দেওয়া হইয়াছে। ২৪পরগণা জেলা ফসল ঋণ বাবদ—১০২৬৭০০ টাকা, জমীর উন্নতির জন্য ঋণ—২০ হাজার টাকা, পশু কিনিবার ঋণ—৩৫০০০ টাকা, বড় চাষীকে ঋণ—১০ হাজার টাকা এবং এমন সালফেট, সুপার ফসফেট ও মিশ্র সার—তিন রকম যথাক্রমে ১৭১০ টন, ১০০ টন ও ১৫০ টন বিনামূল্যে পাইয়াছে। ধুতি, সাড়ী, কম্বল ও জামা বিতরণ করা হইয়াছে—জলপাইগুড়ী জেলায় ৪৪৫ খানি ধুতি, ৬২৫ খানা সাড়ী, ১২০ খানা কম্বল ও ৫ হাজার জামা বিতরণ করা হইয়াছে—গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর ৭ মাসে। সকল জেলাই কৃষি বিভাগের টাকা ও জামাকাপড় প্রভৃতি পাইয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারী সাহায্য বিভাগ গুঁড়া দুধ, ভিটামিন-ট্যাবলেট প্রভৃতিও বিতরণ করিয়াছেন। নানা কারণে দেশে যে খাদ্যাভাব হইয়াছিল, তাহা দূর করার জন্য সরকারী চেষ্টার অভাব ছিল না। তবে চাহিদার তুলনায় দান হয় ত অত্যন্ত কম। জাতি হিসাবে আমরা যাহাতে ভিখারী হইয়া না যাই, তাহা দেখাও সকলের কর্ত্তব্য।

আগামী ২ বৎসরে রেলপ্রসার

পরিকল্পনা—

ভারতীয় রেলের অর্থবিভাগীয় উপদেষ্টা শ্রীপি-সি ভট্টাচার্য্য গত ২রা নভেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন যে রেলের উন্নতি বিধানের জন্য আগামী ২ বৎসরের মধ্যে ১০০ কোটি টাকার কর্ম্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। ২ বৎসরে বিদেশ হইতে ৭৫০ খানা এঞ্জিন আমদানী করা হইবে—ইতিমধ্যে জাপান, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানীকে ১৫ কোটি টাকা মূল্যের ৪ শত এঞ্জিনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। আগামী ২ বৎসরে যাত্রী ও মালবাহী গাড়ীর সংখ্যাও বাড়ান হইবে। মোট প্রায় ৪ হাজার হইতে ৫ হাজার যাত্রী ও মালবাহী গাড়ী বিদেশ হইতে আমদানী করা হইবে। চিত্তরঞ্জন ও টেলকো কারখানায় উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ায় পুরাতন গাড়ীগুলিকে অনেক বেশী ছুটিতে হইতেছে। নূতন গাড়ী না আনাইলে এ অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যদি এদেশে এঞ্জিন ও গাড়ী তৈয়ারীর ব্যবস্থার উন্নতি ও বৃদ্ধি করা না হয়, তবে ত আমাদের চিরদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়াই থাকিতে হইবে।

সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্য নিবাস—

কলিকাতা হইতে মাত্র ১৫০ মাইল দূরে মেদিনীপুর জেলার কন্টাই রোড রেল ষ্টেশন হইতে ৫২ মাইলের মধ্যে দিঘা নামক স্থানে সমুদ্রতীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইতেছে। ঐ ৫২ মাইল পথ পীচ-ঢালা হইয়াছে ও অতি সহজে ও আরামে ঐ পথে দিঘা যাওয়া যায়। ঐ স্থানে এক হাজার একর জমী দখল করা হইয়াছে ও একটি সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ১৫০ একর জমীতে গৃহ নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ২৫ লক্ষ টাকা সমিতির মূলধন—আপাততঃ তথায় ১০০ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। সমুদ্রতীর ধরিয়া একটি ভাল পথ গভর্ণমেণ্ট এ বৎসরই নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। গভর্ণমেণ্ট, স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহকে ঐ সকল বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে—তাঁহাদের কর্ম্মীরা প্রয়োজনমত স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্য তথায় গিয়া বাস করিবেন। স্কুল কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণও ইচ্ছা করিলে

ছাত্রদের তথায় অবকাশমত থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। ঐ স্থানে সমুদ্রের ধার প্রশস্ত ও কঠিন—দিঘা হইতে ১৬ মাইল সুবর্ণরেখা নদের মুখ পর্যন্ত মোটরে বেড়ান যায়। গত পূজার সময় বহু লোক যাইয়া ঐ স্থান দেখিয়া আসিয়াছেন।

১৯৪৯ সালের ৩১া জানুয়ারী মেদিনীপুর পরিভ্রমণে আসি মহাত্মার কৃষ্ণনগর গান্ধীভবন সম্মুখে প্রার্থনা সভা। গান্ধীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই সভাকে সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে। প্রতি বৎসর মাঘমাসে এখানে প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়। গান্ধীজীর প্রতিকৃতি সভামণ্ডপে রাখিয়া সম্প্রতি একটি অনুরূপ সভা হইয়া গেছে

ফটো—শ্রীঅবিনাশ বেরা

প্রাচ্য সম্মেলন

গত ৩০শে অক্টোবর হইতে তিনদিন আমেদাবাদে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সপ্তদশ নিখিল ভারত প্রাচ্য সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীমি-বি-মবলঙ্কার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে ৪ শতাধিক পণ্ডিত ও বহু বিদেশী কোবিদ ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসারের জন্য ১৯১৯ সালে এই অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল।

নূতন পুলিস কমিশনার—

শ্রীযুত উপানন্দ মুখোপাধ্যায় কলিকাতার নূতন পুলিস কমিশনার নিযুক্ত হইয়া গত ১৩ই অক্টোবর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালে ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে যোগদান করিয়া গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি ঢাকায় পুলিস সুপারের পদে কাজ করেন ও তথায় প্রশংসা লাভ করেন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি পশ্চিমবঙ্গ পুলিস বিভাগের

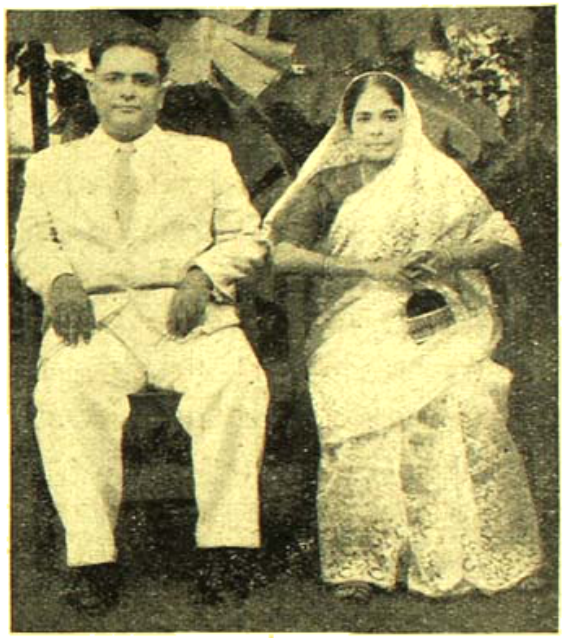

নবনিযুক্ত পুলিস কমিশনার : সস্ত্রীক।

পুনর্গঠন ও নূতন পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালেই তিনি ডেপুটী ইন্সপেক্টার-জেনারেল হন। তাঁহার মত একজন ধর্মপ্রাণ, ধীর ব্যক্তি পুলিস কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় লোক তাঁহার দ্বারা পুলিস কর্তৃক সুশাসনের আশা করিবে। তাঁহার এই সম্মান লাভে আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করি।

কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্ট—

গত ২৮শে অক্টোবর ভারতের সকল রাষ্ট্রের বিধান সভা ও বিধান পরিষদসমূহের সভাপতিগণ বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষে ইন্দোরে সমবেত হইয়া ইন্দোর হইতে ৬ মাইল দূরে কস্তুরবা গান্ধী স্মৃতি ট্রাষ্টের প্রধান কেন্দ্রও পরিদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমি-ভি-মবলঙ্কর উক্ত ট্রাষ্টের সভাপতি। ১৯৫২ সালের শেষ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ

২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে ও মোট ৪৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ১৪৫ ৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গ্রাম্য মহিলা ও বালিকাদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থাই ট্রাষ্টের কার্য্য।

তারাশঙ্কর

আমার আরম্ভ হয় দুঃখ অর্থাৎ বেরো পুর - তোমাদের কর্মীর কলমে কিরোয়, কারুর কলমেই নিলে আসবার। কারুর অভ্যাস হয়ে গেলের মত কলমে কলমে কলমে কলমে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

এলোকেশী কলমের চলের মত কলমে সেখানে কলমে। কলমের কলমে যার কলম লেখে না কিন্তু কলমের মত ভার নয়।

২৭।১০।৫৩ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা ১) কর্তৃক প্রচারিত

এ পর্য্যন্ত ৮১টি কেন্দ্রে গ্রাম-সেবিকা প্রস্তুতের শিক্ষা দেওয়া হয়, ১৩০টি কেন্দ্রে চিকিৎসা ও ২০৬টি কেন্দ্রে গ্রাম-সেবা করা হয়। ১৯৫৪ হইতে ১৯৫২ পর্য্যন্ত ৮ বৎসরে ট্রাষ্ট মোট ১৪২১জন কর্মীকে শিক্ষাদান করিয়াছে। ১৩০টি কেন্দ্রে প্রসূতি পরিচর্য্যা করা হয়। প্রধান কেন্দ্রটির নাম কস্তুরবা গ্রাম। সকলে উহা পরিদর্শন করিয়া উহার আদর্শ প্রচার করিলে সারা ভারতে কস্তুরবা ট্রাষ্টের কার্য্যের বিস্তার লাভ হইবে।

আড়িয়াদহে মাতৃমঙ্গল—

একজন মাত্র কর্মীর চেষ্টায় ২৪ পরগণা জেলার আড়িয়াদহে যে বিরাট শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে তাহা উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে।

আড়িয়াদহ—শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃমঙ্গলে চিকিৎসকগণসহ প্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ দত্তের ট্রাষ্ট ভাণ্ডার হইতে তথায় নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। রেঞ্জার্স ক্লাব হইতে সম্প্রতি ৫ হাজার টাকা ও শ্রীযোগেশচন্দ্র মল্লিক ও তাহার কন্যার নিকট হইতে ৫ হাজার ৫ শত টাকা পাওয়া গিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ উপকারে লাগিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূদান যজ্ঞ—

পশ্চিমবঙ্গ ভূদান যজ্ঞ কমিটীর পক্ষ হইতে শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী সম্প্রতি 'ভূদান যজ্ঞ কি ও কেন' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। বাংলা দেশে ভূদান যজ্ঞের কথা প্রচারিত হয় নাই এবং এ বিষয়ে সাধারণে প্রায় কিছুই জানেন না। সে জন্য সুবৃহৎ পুস্তকখানি মাত্র

৮ আনা মূল্যে দেওয়া হইতেছে ও তাহা ২৪ পরগণা, ডায়মণ্ডহারবারে ভাণ্ডারী মহাশয়ের নিকট পাওয়া যাইবে। ভূমি সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় ভূদান যজ্ঞ জানিয়া মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং তাঁহার যোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত বিনোবা ভাবে ঐ আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভাণ্ডারী মহাশয়ও ঐ আন্দোলনে সর্বতোভাবে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রচার ও কার্যফলে এ দেশের ভূমি সমস্যার সমাধান হউক, সকলেই ইহা কামনা করে। ভূমি সমস্যার সমাধান না হইলে খাদ্য সমস্যার সমাধান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

শিল্পী দেবীপ্রসাদের সম্মান—

আগামী বৎসর টোকিওতে রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে যে এসিয়ার প্রাস্তিক সম্মিলন হইবে তাহাতে শিল্পকলা বিভাগের পরিচালনার ভার পাইয়াছেন মাদ্রাজ আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল, খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। এসিয়ার বিভিন্ন দেশের কথাবিদ্ ও শিল্পীরা তাঁহার নেতৃত্বে মিলিত হইয়া শিল্পকলার মধ্য দিয়া সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের উন্নতির পরিকল্পনা স্থির করিবেন। আমরা শিল্পী দেবীপ্রসাদের এই সম্মান লাভে তাঁহাকে অভিনন্দিত করি ও প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া সমগ্র ভারতের গৌরব বর্দ্ধনে সহায়তা করুন।

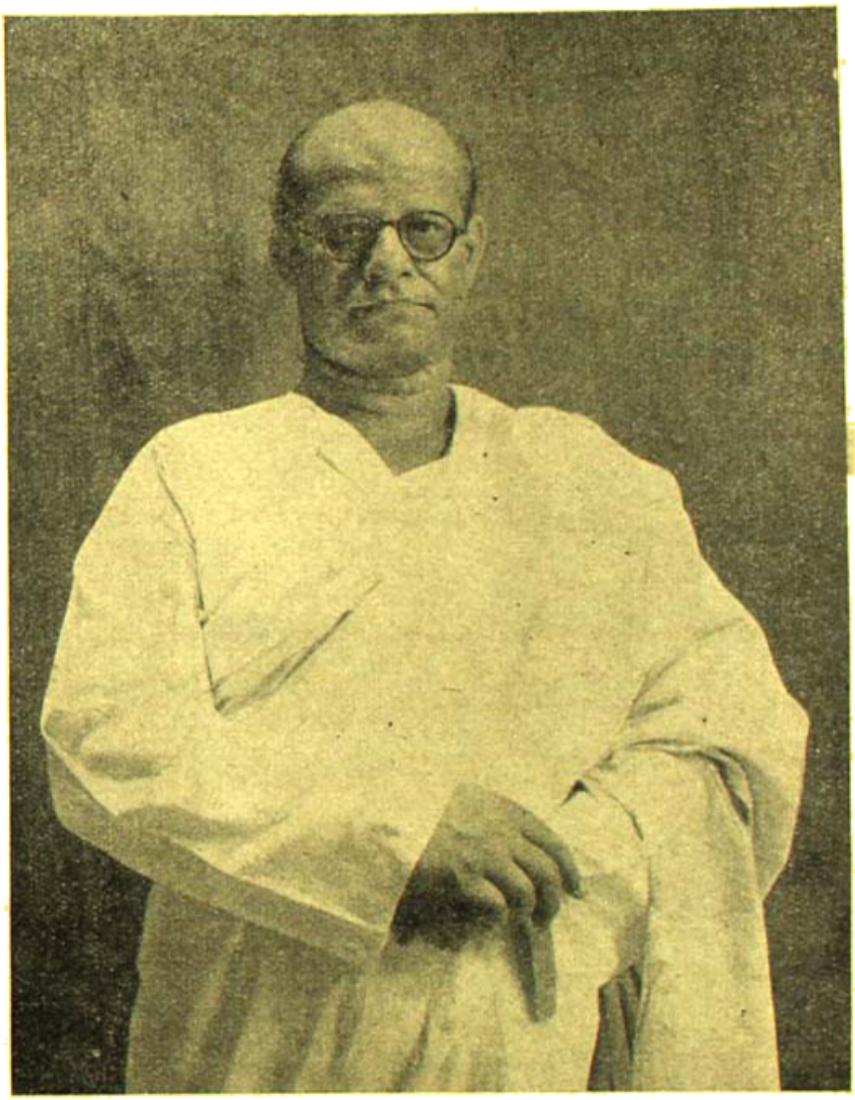

শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

সাংবাদিক ও পুলিস—

কলিকাতায় গত জুলাই মাসে পুলিস কর্তৃক সাংবাদিক নিপীড়ন ও গ্রেপ্তারের অভিযোগ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়কে একমাত্র সদস্য করিয়া গঠিত তদন্ত কমিশন তদন্তানুষ্ঠান শেষে গত ২রা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহা ৫ই নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কমিশন তাহার রিপোর্টে পুলিসের হস্তে সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা ও গ্রেপ্তার পূর্ব-পরিকল্পিত বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন—২২শে জুলাই বিকালে কলিকাতা ময়দানে সাদা পোষাকের পুলিস দল কর্তৃক কয়েকজন রিপোর্টার ও প্রেস ফটোগ্রাফারকে

লাঞ্ছনা করা হয় এবং তাঁহাদের কয়েকজনকে ধরপাকড়ও করা হয়। কমিশন সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে নিজ অভিমত প্রদান করিয়া বলিয়াছেন, ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিয়া এবং পুলিসের কার্যে হস্তক্ষেপ ও বাধা প্রদান করিয়া উভয়বিধ আইন অমান্য পূর্বক সাংবাদিকগণ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনানুযায়ী যে অপরাধ অনুষ্ঠান করেন, তাহার জন্য তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা সঙ্গত ছিল। কমিশন ঘোষণা করিয়াছেন যে, কলিকাতার পুলিস কমিশনার ও প্রধান দপ্তরের ডেপুটী কমিশনার অথবা অন্য কোন ডেপুটী কমিশনারগণ অথবা সহকারী কমিশনারগণ কেহই সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা করা অথবা গ্রেপ্তারের ব্যাপারে কোনও প্রকারে জড়িত নহেন। এই রায় প্রকাশের পর সাংবাদিকগণ স্তম্ভিত হইয়াছেন ও দেশের লোকের মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে।

কল্যাণীতে কংগ্রেস-নগর নির্মাণ—

আগামী ২০শে হইতে ২৬শে জানুয়ারী কাঁচরাপাড়ার সন্নিহিত কল্যাণীতে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে তাহার জন্য নগর নির্মিত হইতেছে। কল্যাণী ষ্টেশন হইতে কংগ্রেস নগরের প্রদর্শনী পর্য্যন্ত রেলপথ নির্মিত হইতেছে। বারাসত হইতে কল্যাণী যাওয়ার রাস্তাও প্রশস্ততর করা হইতেছে। কংগ্রেস-সেবাদলের কর্মীরা কল্যাণীতে থাকিয়া সকল কাজের তত্ত্বাবধান করিতেছেন ও তথায় শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা মণ্ডপ সজ্জার জন্য চিত্র অঙ্কন করিতেছেন। ২০ বৎসর পরে বাংলায় কংগ্রেস হইবে—কাজেই তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ভার গ্রহণ প্রত্যেক পশ্চিমবঙ্গবাসীর কর্ত্তব্য।

গ্রামবাসী গৃহ-ভৃত্যের আদর্শ—

মেদিনীপুর জেলার কাঁথির এক গ্রামে শ্রীহরিপদ মণ্ডল নামক একটি গ্রামবাসী গৃহভৃত্য তাহার জীবনের সমগ্র সঞ্চয় মোট ৪ শত টাকা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া গ্রামের দুর্গতদের কর্ম সংস্থানের জন্য মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদককে দান করিয়াছেন। হরিপদর বয়স মাত্র ২২ বৎসর—তাহার এক কাঠা ভিটা আছে। ২৫ টাকা বেতনে গৃহ-ভৃত্যের কাজ করিয়া সে ঐ টাকা জমাইয়াছিল। তাহার আদর্শ সকলেরই অনুকরণীয়।

পাকিস্তান হইতে খাদ্য আমদানী—

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাকিস্তান হইতে খাদ্য আমদানীর লাইসেন্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহার ফলে ছাসমুরগী, মাছ, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য, আলু ও সকল প্রকার শাকসবজী, নারিকেল, সকল প্রকার ফল, ফলের, ডিম, বেত, বাঁশ, বনৌষধি, ঔষধ, জালানী কাঠ, হিং প্রভৃতি পাকিস্তান হইতে ভারতে আমদানী করা চলিবে। ইহাতে পাকিস্তানের সুবিধা হইলেও ভারতের লোকেরও আপাততঃ হয়ত সুবিধা হইবে। কিন্তু ভারতে এই সকল জিনিষের অভাব স্থায়ীভাবে দূর করিতে হইলে, আমাদের আমদানীর কথা ভুলিয়া দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইবে।

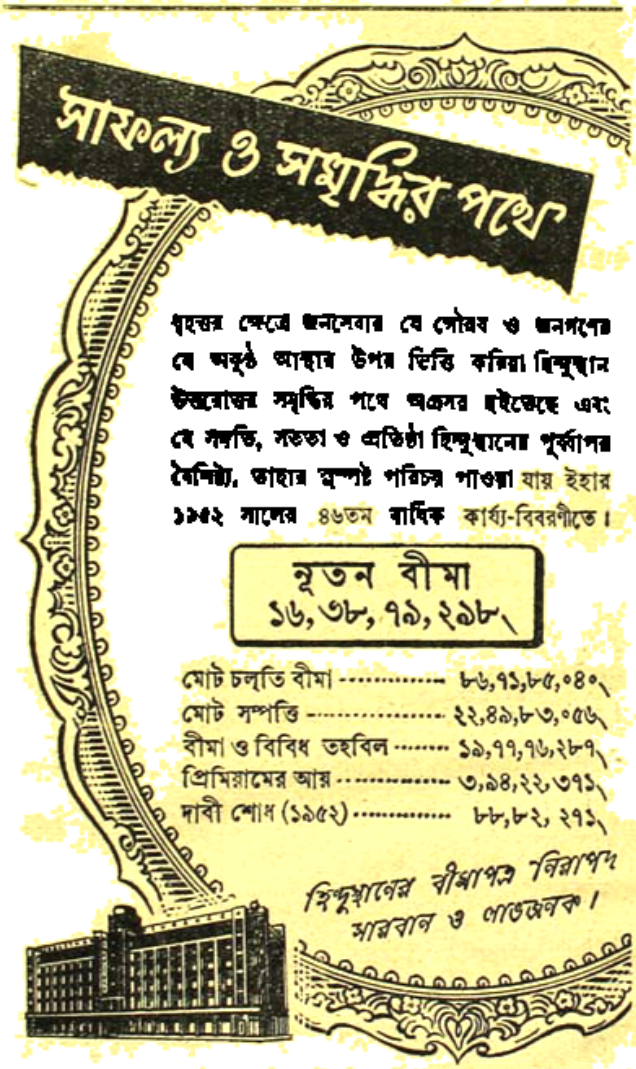

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল ঃ

আই এফ এ শীল্ড খেলায় যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে। সেই সঙ্গে ক'লকাতার ফুটবল খেলার ওপরও। ১৯৪২ সালে মোহনবাগান-রাজস্থানের শীল্ড ফাইনাল খেলা দু'দিন অমীমাংসিত থাকার পর আর খেলানো সম্ভব হয়নি। ফুটবল মরসুম সরকারীভাবে শেষ হওয়াতে রাজস্থান ক্লাবকে পুনরায় ফাইনালে খেলতে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ রাজী করতে পারেন নি। ফলে আই এফ এ-র সভায় ১৯৪২ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৪৩ সালে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম চারটি বিভাগের ফুটবল লীগ খেলাও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব হবে না এই কারণে মাঝপথে পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪৩ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালের মীমাংসাও সাধারণভাবে হয়নি। গত মাসে ছাপাখানায় শেষ লেখা দেওয়ার সময় পর্য্যন্ত ইস্টবেঙ্গল-ইণ্ডিয়া কালচার লীগের ফাইনাল খেলা দু'দিন খেলানোর পরও গোলশূন্য অবস্থায় অমীমাংসিত থাকে। তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলাতেও কোন পক্ষই জিততে পারেনি, উভয়পক্ষই একটি ক'রে গোল দেয়।

ক'লকাতার ফুটবল মরসুম সরকারীভাবে শেষ হলেও পুলিস কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আই এফ এ তৃতীয় দিনের ফাইনাল খেলার ব্যবস্থা করে এবং খেলার পূর্ব্বে নাকি ঠিক হয়, তৃতীয় দিনের খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হ'লে উভয় দলকে যুগ্মভাবে ১৯৪৩ সালের আই এফ শীল্ড জয়ী ঘোষণা করা হবে। কিন্তু ইণ্ডিয়া কালচার লীগের এক প্রতিবাদে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হয়নি। খেলা আরম্ভের আগে মৌখিকভাবে এবং খেলার শেষে লিখিতভাবে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ প্রতিবাদ জানায়, তৃতীয় দিনের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে ফকরী এবং নিয়াজের যোগদান আইনসঙ্গত হয়নি। এই প্রতিবাদের ফলে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার টুর্ণামেণ্ট কমিটি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছ থেকে লিখিতভাবে এক বিবৃতি গ্রহণ করে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইণ্ডিয়া কালচার লীগ দলকে ১৯৪৩ সালের আই এফ এ শীল্ড জয়ী ঘোষণা করে; ফকরী এবং নিয়াজকে অনুমতি ব্যতিরেকে খেলানোর দরুণ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তারা ১৯৪৩ সালের পরবর্ত্তী কোন ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবং পুরো ১৯৪৪ সালের কোন ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে পারবে না; ফকরী এবং নিয়াজও এ বছরের মত খেলায় যোগ দিতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে মনে থাকতে পারে যে, ক'লকাতায় ফুটবল লীগ খেলার সময় পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেশন পাকিস্তানের যে কয়েকজন ফুটবল খেলোয়াড় তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে ক'লকাতায় বিভিন্ন দলে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের যোগদান বে-আইনী ঘোষণা ক'রে এক নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রে। ফকরী এবং নিয়াজ এই খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন।

এই নিষেধাজ্ঞা কার্য্যকরী না হওয়াতে পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেসন আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেসনের শরণাপন্ন হয়। আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ফেডারেসন পাকিস্তানের আবেদন মঞ্জুর করে এবং এ আই এফ এল-কে উক্ত খেলোয়াড়দের সম্পর্কে পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে নির্দ্দেশ দেয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে তৃতীয় দিনের

ফাইনাল খেলায় রুকরী এবং নিয়াজ ইস্টবেঙ্গল দলের পক্ষে খেলেছিলেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ওই দিনের ফাইনাল খেলার দিন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ আই এফ এ-কে জানায়, পাকিস্তানের অনুমতি অনুসারে তাঁরা রুকরী এবং নিয়াজকে ঐদিনের খেলায় দলভুক্ত করছেন ; আই এফ এ কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেসনের কাছ থেকে সরকারীভাবে কোন লিখিত চিঠিপত্র না পাওয়াতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে জানান, এ ব্যাপারে আই এফ এ কোন অনুমতি দিতে পারে না ; একান্তই যদি ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ঐ দু'জনকে খেলায় তাহলে নিজের ঝুঁকিতে খেলাবে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগের প্রতিবাদের ফলে টুর্ণামেণ্ট কমিটির তরফ থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে লিখিতভাবে এক বিবৃতি এবং রুকরী এবং নিয়াজ সম্পর্কে অনুমতি পত্রাদি পেশ করতে বলা হয়। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কিছু দিন সময় চায়। আরও প্রকাশ, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের লিখিত বিবৃতিতে জানান, তাঁরা এ আই এফ এফ-এর সভাপতি শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্তের মৌখিক অনুমতি পেয়েই রুকরী এবং নিয়াজকে খেলিয়েছেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত এ কথা সরাসরি অস্বীকার ক'রে বলেছেন, এরূপ অনুমতি দেওয়ার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জানায় কোন এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে অনুমতি লাভের বিশেষ আশা পেয়েই রুকরী এবং নিয়াজকে খেলানো হয়েছিল এবং টেলিফোনে অনুমতি এসেছিলো। টুর্ণামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে আই এফ এ-র গভর্নিং বডিতে আবেদন করা হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিনিধি মারফৎ এ আই এফ এফ-এর সভাপতি পাকিস্তান ফুটবল ফেডারেসনের সভাপতির কাছ থেকে অনুমতি সম্পর্কিত এক চিঠি পেয়েছেন।

এই চিঠিখানি নতুন ক'রে ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছে এই বিবেচনায় আই এফ এ-র গভর্নিং বডি মামলাটি টুর্ণামেণ্ট কমিটিতে পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছে, কারণ টুর্ণামেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তাদের কাছে এ চিঠি পেশ করা হয়নি। এদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আই-এফ-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে এবং হাইকোর্ট থেকে আন্তর্বর্তীন-কালীন একতরফা ইনজাংশন পেয়েছে যে, আদালতে এই মামলার চূড়ান্ত রায়ের পূর্বে অথবা আদালতের আদেশ ভিন্ন টুর্ণামেণ্ট কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশ ইস্টবেঙ্গল দলের উপর প্রযোজ্য হবে না। বর্তমানে মামলাটি আদালতের বিচারাধীন সুতরাং এ সম্পর্কে কোন রকম অভিমত প্রকাশ সমীচীন হবে না।

শীল্ড ফাইনাল খেলার চূড়ান্ত মীমাংসা না হওয়ার দরুণ গতমাসে এ সম্পর্কে অল্প বিবরণ দিয়েছিলাম। তিন দিনের ফাইনাল খেলার মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় দিন ইস্টবেঙ্গল দলই তাদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। প্রথম দিনের খেলায় গোল করার যে সব সুযোগ নষ্ট হয়েছে তা না হলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবেরই জয়লাভ হ'ত। তৃতীয় দিনের প্রথমার্দ্ধের খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই একতরফা আক্রমণ চালিয়ে কালচার লীগকে চেপে রাখে। এই সময়ের মধ্যে কালচার লীগ মাত্র একবার ইস্টবেঙ্গলের হাফ-লাইন ডিঙিয়ে বল নিয়ে যায় এবং তা থেকেই অতর্কিতে গোল হয়। কালচার লীগ দলের গোলরক্ষক সঞ্জীব দু'দিন দলকে পরাজয়ের হাত থেকে একাধিকবার রক্ষা করেন। তাঁর এ খেলার জন্যই ইস্টবেঙ্গল দলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

এবারের শীল্ড প্রতিযোগিতার পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আই এফ এ-র খুবই দুর্নাম হয়েছে। ইণ্ডিয়া কালচার লীগ বোম্বাইয়ের থেকে এসেছিল, তাদের ওপর খুবই অবিচার করা হয়েছে। প্রথম দিনের শীল্ড ফাইনাল খেলা নিয়ে তাদের পাঁচটি ম্যাচ খেলতে এক মাসের মত ক'লকাতায় থাকতে হয়েছিল। শীল্ডে তারা প্রথম ম্যাচ খেলে ৩রা সেপ্টেম্বর আর প্রথম দিনের শীল্ড খেলা হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর। এই দলের অনেকেই ছিলেন চাকুরী-জীবী ; অনেকেরই ছুটি ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং কর্মস্থানে যোগদানের জন্য জরুরী তাগিদ এসেছিলো। দলের ক্যাপটেন শেষের দু'দিনের খেলাতে যোগ দিতেই পারেননি, ১ম ফাইন্যাল খেলার পরই বিমানপথে বোম্বাইতে ছুটতে হয়েছিলো। আরও অনেকের ছুটি মঞ্জুর করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। আই এফ এ-র এই ব্যবস্থাপনায় ইণ্ডিয়া কালচার লীগ এক অভিযোগ পত্রে জানিয়েছে, কোন একটি বিশেষ দলকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার দরুণই তাদের ক'লকাতায় এতদিন থাকতে হয়েছে নানা অসুবিধা সহ্য ক'রে।

বাইরের ফুটবল দলের ওপর এরূপ ব্যবহারে সত্যই

বাংলার ফুটবল ক্রীড়াসংস্থার সুনাম নষ্ট হয়েছে। তাদের ওপর বরং কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করলে আমাদের সুনাম বই দুর্নাম হবে না। মনে রাখা উচিত, ভবিষ্যতে এইরূপ ত্রুটির পুনরাবৃত্তি হলে আই এফ এ শীল্ড খেলায় বাইরে থেকে ভালদল যোগদান করবে না। ফলে আই এফ এ শীল্ডের কৌলিন্য লোপ পাবে।

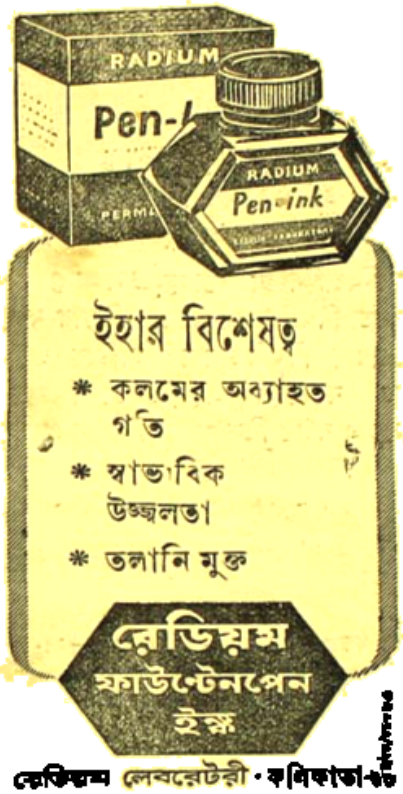

রেডিয়ম লেবরেটরী · কলিকাতা-৬৮

এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল ঃ

রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়ে কলম্বো কাপ এবং ব্রহ্মকাপ (স্থায়ীভাবে) জয়ী হয়েছে। কলম্বোতে অনুষ্ঠিত প্রথমবারের প্রতিযোগিতায় সমান পয়েন্ট পেয়ে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্থান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ানশীপ পেয়েছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় চারটি দেশ যোগদান করে—ভারতবর্ষ পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহল। লীগ প্রথায় খেলা হয়—প্রত্যেক দেশ তিনটি ক'রে খেলে। ভারতবর্ষ তিনটি খেলাতেই জয়ী হয়। ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্তানের খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায়—১টা জয়, ১টা হার এবং ১টা ড্র। সিংহল তিনটে খেলাতেই হেরে যায়। ভারতবর্ষ ১-০ গোলে পাকিস্তানকে, ২-০ গোলে সিংহলকে এবং ৪-২ গোলে ব্রহ্মদেশকে পরাজিত করে। এ প্রসঙ্গে একটা কথার উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি। জাতীয়তা-বোধের অভাব আমাদের দেশের ফুটবল খেলার দর্শক সাধারণের মধ্যে কত কম তার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল যেদিন ভারতীয়দল রেঙ্গুন থেকে দম দম বিমান ঘাঁটিতে পৌছালো। ভারতীয়দলকে জয়মালা বা অভিনন্দন দিতে কোন জনসমাগম হয়নি। সব থেকে দুঃখের কথা, আই এফ এ-র কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিলেন না। অথচ এই ফুটবল খেলার দৌলতেই তাঁদের সামাজিক প্রতিপত্তি এবং কারও কারও অন্ন সংস্থানও হয়ে থাকে। ভারতীয়দলের আগমনবার্তা তার যোগে আই এফ এ-কে জানিয়ে দেওয়াও হয়েছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আমাদের দেশের বিভিন্ন খেলার দর্শক সাধারণ হ'লেন উগ্র দলগত সমর্থক। তাঁদের মধ্যে দলীয় বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব এমনই উগ্র যে, সেখানে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হ'তে পারেনি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব। তাদের মধ্যে খেলাধূলা নিয়ে কম রেশারেশি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় না; বরং আমাদের দেশের থেকে অনেকগুণ বেশী। বিদেশী শাসককুল এদেশের লোকের চোখ থেকে সে সব ঘটনা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতো, নিজের দেশের কেলেঙ্কারী শাসিত দেশে পৌছলে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতো। কিন্তু এসব নোংরামী থাকা সত্বেও ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে একটা মহৎ গুণ আছে, তা জাতীয়তাবোধ। সাম্প্রদায়িকতা বা প্রাদেশিকতা যেমন আছে, তেমনি তাদের জাতীয়তাবোধ। আমাদের মধ্যে আছে প্রথমটা, দ্বিতীয়টা নেই বলেই ১৯২৮ সালে বিশ্ব অলিম্পিকজয়ী হয়ে ভারতীয় হকি দল বোম্বেতে ফিরে এলে দেখা গেল, জনসাধারণ দূরের কথা কর্মকর্তারাও খেলোয়াড়দের সম্বর্দ্ধনা জানাতে উপস্থিত হ'ন নি। এমন ধরণের ঘটনা অনেক আছে। অথচ কোন স্থানীয় দলকে (জাতীয়দল নয়) সম্বর্দ্ধনা জানাতে দলীয় সমর্থকদের মধ্যে বিরাট সাড়া পড়ে যায়। রেঙ্গুন থেকে এশিয়া কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল জয়ী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জনসাধারণের পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়নি বলেই যে এক্ষেত্রে জনসমাগম হয়নি এমন নয়, অন্যান্যক্ষেত্রে দেখা গেছে সংবাদপত্রে কোন জাতীয় দলের স্বদেশত্যাগ বা প্রত্যাবর্তনের সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও যে সাড়া পাওয়া গেছে তা জাতির পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

বিমান ঘাঁটিতে ভারতীয় ফুটবল দল সম্বর্দ্ধনা তো পেল না, পেল কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে—কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ ভারতীয় দলের জয়লাভের পুরস্কার কলম্বো এবং ব্রহ্ম কাপ দুটি বাজেয়াপ্ত ক'রলেন। প্রকাশ, কাগজপত্রে এ দু'টির কথা ঠিক ভাবে নাকি উল্লেখ করা ছিলনা। তা যদি হয়েও থাকে তাহলে একটা কথা বলার আছে। এই টেক্‌নিক্যাল ভুলের দরুণ যা করা হয়েছে তা কি বড় বেশী কড়াকড়ি হয়নি? সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে ঘটনার সহজ

মীমাংসা হয়; এই দুটি তিনিষ জয়লাভের পুরস্কার, ব্যবসায়ের প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানী হয়নি। আমাদের দেশে কাষ্টমস সম্পর্কে নানা অভিযোগে সংবাদপত্রে প্রায়ই চোখে পড়ে যার অর্থ দাঁড়ায় আরোহীদের অনর্থক হায়রানী।

রোভার্স কাপ ঃ

১৯৫৩ সালের রোভার্স কাপের ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ২-০ গোলে বাঙ্গালোর মুসলীমদলকে হারিয়ে উপর্যুপরি চারবার রোভার্স কাপ পেয়েছে এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে নতুন রেকর্ড করেছে। ইতিপূর্বে কোন দলই উপর্যুপরি চারবার রোভার্স কাপ পায়নি।

রজতজয়ন্তী বৈদেশিক ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের রজতজয়ন্তী বৎসর উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগত বেন বার্ণেটের নেতৃত্বে বৈদেশিক ক্রিকেটদল এ পর্য্যন্ত ৭টি ম্যাচ খেলেছে; ফলাফল জয় ০, হার ১ (ভারতীয় একদশদলের কাছে ৩ উইকেটে) ড্র ৬। লক্ষ্ণৌতে গত ৭ই নভেম্বর থেকে প্রথম টেষ্ট ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু খেলাটি বাতিল হয়ে গেছে। লক্ষ্ণৌতে ছাত্র সমাজের ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে সহরে হরতাল পালন এবং নানা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। এই সময় বিক্ষোভকারীরা টেষ্ট ম্যাচ খেলার মাঠের পীচ নষ্ট ক'রে দিয়ে পীচের ওপর গাছ পুঁতে দেয়। ফলে খেলাটি বাতিল করতে হয় অন্য কোন উপায় না থাকায়।

প্যানচাঁদ হকি ট্রফি ঃ

১৯৫৩ সালের ধ্যানচাঁদ হকি প্রতিযোগিতার ২য় দিনের ফাইনালে গতবারের রাণার্স-আপ্ হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফট ১-০ গোলে গতবারের বিজয়ী পাঞ্জাব পুলিশ দলকে হারিয়ে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে।

দিল্লী ক্লথমিলস ফুটবল ঃ

ফাইনালে এরিয়ান জিমখানা (বাঙ্গালোর) ৩-২ গোলে ই আই আর একাউণ্টসক্লাবকে (ক'লকাতা) হারিয়েছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল ঃ

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতার ফাইনালে ১-০ গোলে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে প্রথম আশুতোষ শীল্ড লাভ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শৈলেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "প্রলয়ের অগ্রদূতী" (২য় সং)—২৲
[illegible]রেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত "বিবাহে জ্যোতিষ" (২য় সং)—২৲
ইন্দুবালা দেবী প্রণীত উপন্যাস "হারানো পাতা" (২য় সং)—২৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ইতিকথা" (১ম—১৮শ সং)—৩৲,
"পথের দাবী" (১৯শ সং)—৩৲, "নব-বিধান" (৮ম সং)—১৸৹
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "লালমাটি" (২য় সং)—৸৹
শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "স্বপ্নমল্লিকা"—১৸৹
শ্রীঅনিলকুমার ভাদুড়ী প্রণীত সচিত্র কাব্য-গ্রন্থ "মানস-মুকুর"—৫৲
রমাপতি বসু প্রণীত উপন্যাস "রোশনচৌকি"—২৸৹
শ্রীহরীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত "প্রাচীন কবির কাহিনী"—১।৹,
"অমরকাব্যের কাহিনী"—১।৹
নবরত্ন প্রণীত "বুকুর পরপারে"—।৹
শ্রীতারানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "পূর্ণানন্দ-বিবেক"—১ম খণ্ড ১০, ২য় খণ্ড ।৵৹
শ্রীঅপূর্বকুমার চৌধুরী প্রণীত "সংগীতের অভিধান" (১ম খণ্ড)—৩৲
শ্রীসলিলমোহন ভট্টাচার্য্য প্রণীত গল্প গ্রন্থ "অমিতাভ"—।৹
শ্রীগোপেন্দ্র সাঙ্গারী প্রণীত "ভূবন যন্ত্র কি ও কেন?"—৷৹
শ্রীসলিলানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "সাধনা-রীতি" (২য় খণ্ড)—২৲
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "দীপায়ন"—৷৹

শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "নীহারিকা"—১৷৹
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত শারদীয় সংকলন "পূর্বরঙ্গ"—১।৹
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝণঝাল"—৩৲
অমলা দত্ত প্রণীত ভ্রমণ-কাহিনী "আয়েক আকাশ"—২৸৹
শ্রীস্বপনকুমার প্রণীত রহস্যোপন্যাস "বিষাক্ত হাসি"—৷৹
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-অনূদিত "অস্কার টমস্ কেবিন"—১৷৹
শ্রীপূর্ণশশী দেবী প্রণীত উপন্যাস "মনের মানা নাই"—৩৲
বেঙ্গল সাহিত্য-মুটীর-প্রকাশিত ছোটদের পূজাবার্ষিকী "বহুধারা"—৪৲
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক-সম্পাদিত "শারদীয়া মৈমনসিংহ বসুমতী"—৩৲
শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য-সম্পাদিত "শারদীয়া আনন্দব্যজার পত্রিকা"—৩৷৹
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-সম্পাদিত শারদীয়া সংখ্যা "বিবর্তী"—১।৵৹
শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত শারদীয়া সংখ্যা "আর্যিক প্রবন্ধ"—১৷৹
শ্রীভক্তিরোধ রায়-সম্পাদিত শারদীয় সংখ্যা "হিন্দু"—১৲
শ্রীঅন্নপূর্ণা গোস্বামী প্রণীত উপন্যাস—"দৃগ্‌ভূষিকা"—১৷৹
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "চোরকাঁটা"—২৲
ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অমর মিলন"—১।৹
কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "ভাব-রূপা"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

২০৷১৷১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত